রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা

ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছর মেয়াদী বি. এ./বি. এস. এস. (পাস) কোর্সের সংশোধিত রেগুলেশনসহ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা

(তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাস কোর্সের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র)

PAPER-I : Subject Code-451
PAPER-II : Subject Code-452
PAPER-III : Subject Code-453

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

এম. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইংরেজি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি এইচ. ডি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; সাবেক চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; রাষ্ট্রচিন্তা, 'তুলনামূলক রাজনীতি, বাংলাদেশ প্রশাসন, সামরিক বাহিনী সম্পর্কে ৩৩টি গ্রন্থের লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলো Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth, (1980); Development Administration : Bangladesh (1981), SAARC : Seeds of Harmony (1985), Military Rule and Myth of Democracy (1988), Foreign Policy of Bangladesh, ed. (1984), তুলনামূলক রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ (১৯৮২), মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা (১৭৭৫), উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি (১৯৯৯), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন (১৯৮০), বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট (১৯৯১), গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (১৯৯৪)।

বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ
ঢাকা

প্রকাশনায় ঃ

এ. এফ. এম. খলিলুর রহমান
বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ
২৬ বাংলাবাজার (আলীরেজা মার্কেট ২য় তলা),
ঢাকা-১১০০; ফোন ঃ ৭১১৪৯২০

প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৬৪
পঞ্চবিংশ সংস্করণ ঃ এপ্রিল ২০০০
পুনর্মুদ্রণ ঃ মে ২০০১
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০২
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৩
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৪
পুনর্মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৫
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
ষষ্ঠবিংশ সংস্করণ ঃ জুলাই ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০১০

মূল্য ঃ ৩২৫.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ

নিউ পূবালী মুদ্রায়ণ
৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

বেগম শেফালী আহমদকে

ষষ্ঠবিংশ সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে ***রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*** নতুন আঙ্গিকে, নতুন নতুন তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হলো। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং কার্যক্রমে যেসব পরিবর্তন এসেছে তার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। উপস্থাপিত হয়েছে তাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। আলোচিত হয়েছে সকল সমস্যার বিভিন্ন দিক। বইটি লেখা হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। যখন লিখিত হয়েছিল তখন এটিই ছিল বাংলায় লেখা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর একমাত্র বই। এখন বাজারে আরো কয়েকটি বই এসেছে। কিন্তু ***রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথার*** মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়নি বিন্দুমাত্র। এই সংস্করণে যেসব তথ্য সংযোজিত হয়েছে, আমার মনে হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আগ্রহী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিকট তা অনেক বেশি উপযোগী হবে। এর পরেও কোন আগ্রহী পাঠক যদি এর মানোন্নয়নে কোন সুপারিশ পেশ করেন তাহলে তা সাদরে গৃহীত হবে। যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে গ্রন্থটিকে ভালবেসেছেন এবং যোগ্য শিক্ষকরা যেভাবে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশনের প্রকাশক এ এফ এম খলিলুর রহমানের নিকট।

ঢাকা
৫ জুলাই ২০০১

এমাজউদ্দীন আহমদ

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একখানি বই বাংলায় লিখিবার ইচ্ছা আমার বহুদিন হইতেই ছিল। সেই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ায় আজ আনন্দবোধ করিতেছি। এই ব্যাপারে যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের নিকট আমার ঋণ শোধ হইবার নহে। রংপুর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ফুলে হুসেন, রংপুর মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা খালেদা আদিব ও হোস্‌নেআরা আখ্‌তার তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া বইটির প্রকাশনায় যেভাবে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। প্রকাশক বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাতে সত্যই তিনি ধন্যবাদের পাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নিকটও আমি ঋণী তাঁহাদের মূল্যবান গ্রন্থ হইতে আমি প্রচুর উদ্ধৃতির দ্বারা ইহাকে যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ জাগাইয়া তোলা এবং এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমি অধিতব্য বিষয়গুলিকে সহজ, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রচেষ্টা আমার সফল হইলে শ্রম সার্থক হইবে। অনুরাগী পাঠক ইহার উন্নয়নের জন্য কোন বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে অত্যন্ত প্রীত হইব।

রংপুর কলেজ, রংপুর
৫/১/৬৪

এমাজউদ্দীন আহমদ

NATIONAL UNIVERSITY

Syllabus for 3 year B. A./B.S.S. Pass Course
Subject : Political Science

First Year

Subject Code-451 (Paper-I) : Political Theory **Marks—100**

Political Science : Meaning, Nature, Scope, Methods, Relations to other Social Sciences, Importance to Study Political Science.

State : Definition, Elements, State and Government, State and the Individual, State and Society, Theories of the origin of the State.

Fundamental Concepts : Sovereignty, Law, Liberty, Equality, Rights and Duties, Nation, Nationalism, Internationalism.

Political Thinkers : Plato, Aristotle, St. Augustine, St. Thomas Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke and Rousseau.

Second Year

Subject Code-452 (Paper-II) : Political Organisation and the Political System of U. K. and U. S. A. **Marks : 100**

Political Science : Meaning and significance; Classification, Methods of Establishing Constitution, Requisites of a good Constitution.

Forms of Government : The Concept of Traditional and Modern Forms, Democracy, Dictatorship, Parliamentary, Presidential, Unitary and Federal.

Theory of Separation of Power : Meaning, Significance and Working.

Organs of Government : Legislature, Executive, Judiciary and Electorate.

Political Behaviour : Political Parties, Pressure Groups and Public Opinion.

British Political System : Nature, Features and Sources of the Constitution, Conventions, Monarchy, Parliament, The Prime Minister and the Cabinet, Party system.

American Political System : Nature and Features of the Constitution, The System of Checks and Balances, The President and Congress, Judiciary and-Political Parties.

Third Year

Subject Code-453 (Paper-III) : Government and Politics in Bangladesh Marks—100

Political Background and Constitutional Developments : Growth of Nationalism; Partition of Bengal-1905 and its Annulment, Formation of Muslim League-1906, Act of 1909, 1935. Lahore Resolution-1940, Cripps Mission-1942, Cabinet Mission Plan-1946, Indian Independence Act of 1947, Constitutions of 1956 and 1962.

Emergence of Bangladesh : Language Movement of 1952; Elections of 1952; Autonomy movement and the 6-Point Programme; Mass upsurge of 1969; Elections of 1970; War of Liberation and Birth of the New nation.

The Constitution and Bangladesh : Constitution making 1972; Features, Fundamental Principles, Constitutional Amendments.

Major Political Trends : Sheikh Mujib Regime, Zia Regime, Military intervention of 1982 and the Military Regime of General Ershad and struggle for democracy; The Fall of Ershad Regime. Working of Parliamentary Government.

সূচিপত্র
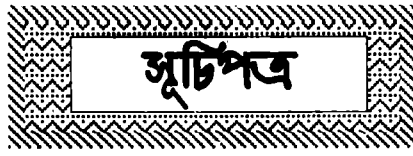
প্রথম খণ্ড
রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রচিন্তা

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাংক

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাংক

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাংক

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠাংক

প্রথম খণ্ড
রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রচিন্তা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

DEFINITION OF POLITICAL SCIENCE AND ITS NATURE

১

সূচনা
Introduction

বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। অত্যন্ত গতিশীল শাস্ত্র বলে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকদের মত বদলেছে দিন দিন। রাজনীতি সমাজের মত প্রাচীন, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান তুলনামূলকভাবে নবীন। এই নবীন অধিতব্য বিষয় বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ জীবনের চারিদিক জড়িয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত আধুনিক সমাজের অনেক মৌল সমস্যা অনুধাবন সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা
Definition

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। তাই বিশিষ্ট লেখকগণের সংজ্ঞা নিচে উদ্ধৃত করে তার একটি চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু এরিস্টটল (Aristotle) তাঁর রাষ্ট্রসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিকে **'রাজনীতি'** (The Politics) বলে আখ্যায়িত করেন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্লেষণকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান' (The Master Science) বলে চিহ্নিত করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ সেই সময় থেকে শুরু হয়। আজও এর কোন সমাপ্তি নেই। পরবর্তীকালে পল জানে (Paul Janet), উইলোবি (W. W. Willoughby), জেলিনেক (Jellinek), সিজউইক (Sidgwick), স্যার ফ্রেডারিক পোলক (Sir Frederick Pollock) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই গতিশীল শাস্ত্রের বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্নভাবে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন।

পল জানে (Paul Janet) বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যা রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তি ও সরকারের নীতিমালা বিশ্লেষণ করে" ("Political Science is that part of social science which analyses the foundations of the state and the principles of government")। এ সম্পর্কে উইলোবির (W. W. Willoughby) মতও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই বিজ্ঞান যার লক্ষ হলো রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান যুক্তিবাদী ও কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐ সব ঘটনার সুসমন্বিত বিন্যাস সাধন" ("The Science which has for its object the ascertainment of political facts and arrangement of them in systematic order as determined by the logical and causal relations which exist between them.")। প্রসিদ্ধ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেলিনেকের (Jellinek) মতে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মৌল সূত্র অনুধাবন, যে সকল অবস্থায় তার অভিব্যক্তি ঘটে ও লক্ষ অর্জিত হয় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির অনুসন্ধান" ("The task of political science is to study in their fundamental relations the public power, to examine the conditions under which they manifest themselves, their end and effects and to investigate the state in its inner nature")।

প্রখ্যাত জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লন্টসলীর (Bluntschli) কথায়, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই বিজ্ঞান যার মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় রাষ্ট্র, যা রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা ও অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে তার স্বরূপ অনুধাবনে সাহায্য করে" (The science which is concerned with the state, which endeavours to understand and comprehend the state in its fundamental conditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, and its development.")। প্রসিদ্ধ লেখক ক্যাটলিন (Catlin) বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজে মানুষের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দান করে এবং মানুষের ভিন্নমুখী সামাজিক ভূমিকার বিশদ বিবরণ দান করে" ("Political science deals with political activities of men in society and their different social roles.")।[১]

কোন কোন লেখক আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের পক্ষপাতী নন। তাদের বক্তব্য—গতিশীল কোন শাস্ত্রকে সংজ্ঞার চার দেওয়ালে আটকানো সম্ভব নয়। কেননা, সংজ্ঞার পরিধি ক্ষুদ্র হলে তা যেমন অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, অন্য দিকে বহু ব্যাপক হলেও তা অসংবদ্ধ হয়। অধ্যাপক রবসন (Robson) এ মত পোষণ করেন। তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ অব্যাহত থাকে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এক সম্মেলনে নতুনভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। তাদের মতে, "সর্বজনীন জীবনের সমস্যা, ক্ষমতার বিস্তার ও প্রয়োগ সম্পর্কে মতবাদ, বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জয়যাত্রা এখানেই থেমে থাকেনি। গত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও অধ্যয়ন রীতিতে এমন নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা এই শতকের প্রথম দিকে প্রায় অকল্পনীয় ছিল। এ ক্ষেত্রে আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা নতুনভাবে রাজনীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, নতুনভাবে বিষয়বস্তুর বিন্যাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তত্ত্ব গঠন ও তার প্রকৃতি, পরিমাপ ও পরিমাপ সূচকের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে নতুন দিগদর্শনের ইঙ্গিত দিয়া এ ক্ষেত্রকে আরও উর্বর করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সনাতন ধারণাকে আনুষ্ঠানিক ও সংকীর্ণ বলে তারাই আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে, অতীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো, আইনগত বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বর্তমানে তাই তারা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামো ও তাদের কার্যাবলি বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন এবং বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনাকে অধিক অর্থপূর্ণ মনে করেন।

---

১. *G. Catlin, A Study of Principles of Politics, p ৮৭*

এ ক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ প্রধানত চারিটি মৌল সূত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই চারটি সূত্র হলো : **(এক)** রাজনৈতিক পর্যালোচনার বৃহত্তর ক্ষেত্র রচনা; **(দুই)** রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বাস্তবতার সন্ধান; **(তিন)** সঠিক তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতার আলো, এবং **(চার)** বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন। এই প্রেক্ষিতে গতানুগতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্র, সংবিধান, প্রতিনিধিত্ব, নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি সনাতন ধারণার পরিবর্তে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান নতুন নতুন ধারণা ও শব্দ ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র (State) বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political system), রাজনৈতিক কার্যকলাপ (Political functions) রাজনৈতিক ভূমিকা (Political role), পদ (office) কাঠামো (Structure), নাগরিক প্রশিক্ষণ (Citizenship training) রাজনৈতিক দীক্ষাদান (Political socialization) নামে আখ্যায়িত হচ্ছে।[১] রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় এ সব প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষেপে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান (Political Science is the science of the state) এতে কোন সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত সেই শাস্ত্র যার মূল বিষয়বস্তু রাষ্ট্র এবং তার কার্যাবলির তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। কিন্তু যেহেতু এর সদস্যদের কার্যক্রমের মূল নিহিত রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বর্তমান ও অতীতের হাজারো উপাদানে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঠিক বিশ্লেষণ সব কিছুর প্রেক্ষিতে সম্ভব। এই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্তমানে এক ব্যাপকভিত্তিক শাস্ত্রে রূপ লাভ করেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু
Scope of Political Science and Contents

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল হলো রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যই এর পরিধি। উইলোবীর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : (১) রাষ্ট্র (State), (২) সরকার (Government) এবং (৩) আইন (Law)। অধ্যাপক বারজেস (Burgess) বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Civil Liberty) এবং সার্বভৌম ক্ষমতাই (Sovereignty) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আসল বিষয়বস্তু। এও উল্লেখযোগ্য যে, এ দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা সার্থক হয় যদি তা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত কি কি বিষয় থাকা উচিত, সে সম্বন্ধে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) একটি সম্মেলনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, নিম্নলিখিত চতুর্বর্গই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত।[২] **প্রথম,** রাষ্ট্রীয় মতবাদ এবং তাদের ইতিহাস; **দ্বিতীয়,** রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তার অন্তর্গত সংবিধান, জাতীয় সরকার, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন প্রণালী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা; **তৃতীয়,** রাজনৈতিক দল ও উপদল, সরকারি কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ ও জনমত, এবং **চতুর্থ,** আন্তর্জাতিক বিধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা।

---

১. *Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, Jr., Comparative Politics, Boston : 1966.*

২. *UNESCO, Contemporary Political Science, pp 17 - 18.*

অনেকের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু বর্তমান নিয়েই আলোচনা করে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্তমানকে নিয়ে আলোচনা করে তা ঠিক, কিন্তু সাথে সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অতীতের গভীরেও প্রবেশ করে। বর্তমানে রাষ্ট্রের নীতি, সরকারের গঠন প্রণালী, শাসনপদ্ধতির সাথে সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে রাষ্ট্রের অতীত সম্বন্ধেও যথোপযুক্ত জ্ঞানলাভ করতে হবে। রাষ্ট্র কীভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তার সঠিক উপলব্ধির প্রয়োজন। তাই অধ্যাপক **লিপসন** (Lipson) সত্যই বলেছেন, "কেউ বর্তমানের যথার্থ অর্থ বুঝতে সক্ষম নয় এবং আরও বড় কথা, কেউ ভবিষ্যতের গতি অনুধাবন করতে সক্ষম নয় যদি না সে অতীতে ডুব দেয়" ("One cannot properly grasp the meaning of the present, still less can one chart a course of action for the future without diving into the past.")।

আবার অনেকে তর্কের তুফান তুলেছেন এই নিয়ে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। রাজনৈতিক জীবনের ও কার্যাবলির গভীরে প্রবেশ করে নৈতিকতা (values) নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু অনেক বিজ্ঞজনের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু ঘটনাবলি নিয়েই ব্যস্ত থাকবে না বরং সাথে সাথে ঘটনাবলির মান নির্ণয়ার্থে ঘটনাক্রমে গভীরেও প্রবেশ করবে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও সিদ্ধান্তের জন্মের কাহিনী বর্ণনা করবে ঠিক তেমনি সমালোচকদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিশ্লেষণ করে নীতির মানদণ্ডে বিভিন্ন কার্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুষ্ক আলোচনা করে না, তা প্রত্যেক প্রকারের সামাজিক সংগঠনের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তাও আলোচনা করবে এবং দিক নিরূপণ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও সুচিত করবে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং রীতিনীতির মধ্যে গুণাগুণের বিচারে কোন্‌গুলো কাম্য তার অনুসন্ধান পরিচালনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। অধ্যাপক রবসন (Robson) তাই বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু কী আছে তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, কী হওয়া উচিত তাও নির্ধারণ করে" ("It is concerned both with what it is and what it should be.")। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘটনার বৈচিত্র্য নিয়ে শুধু আলোচনা করে না, তাদের মূল্যায়নও করে। যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে মানুষ তার মুক্তির সন্ধান করছে। তাই আদর্শ রাষ্ট্রের পদ্ধতি কীরূপ হবে তা মানব মনকে সতত আলোড়িত করেছে।

অধ্যাপক গার্নারের (Garner) উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে। রাষ্ট্র থেকেই এর উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রেই এর লয়" ("Political Science begins and ends with the state.")। অধ্যাপক গেটেল (Gettell) বলেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানত তিনটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করে। **প্রথম,** রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও তার সংগঠনসমূহের বিশ্লেষণ করে। **দ্বিতীয়,** রাষ্ট্রের রূপ ও কার্যক্রম অতীতে কেমন ছিল তা পর্যালোচনা করে। **তৃতীয়,** ভবিষ্যতে তা কী রূপ পরিগ্রহ করবে এবং তার কার্যক্রম কেমন হবে তাও আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে তার প্রকৃতি, তার উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক দিক তথা কার্যাবলি ও

রেখাচিত্র / রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি
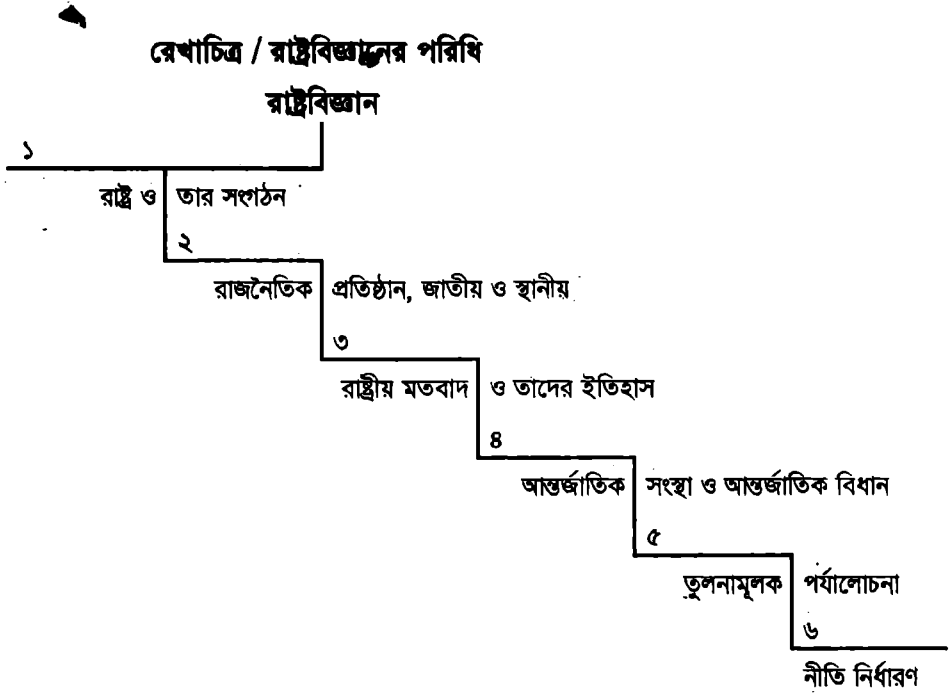
মূল্যবোধ সবকিছুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র। তাই ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, দর্শন, এমনকি মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত প্রায় সবাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞাতিভ্রাতা ও সহযোগী।

এই পৃষ্ঠায় প্রদত্ত রেখাচিত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধির বিবরণ দেয়া হলো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। সংক্ষেপে রাষ্ট্র এবং তার কাঠামো, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মতবাদ এবং তাদের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং নীতি নির্ধারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস, দর্শন, আইন শাস্ত্র, অর্থনীতি প্রভৃতির তীর ঘেঁসে অগ্রগতি সাধন করে এবং কালে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

নামকরণ
Nomenclature

বিখ্যাত পণ্ডিত এরিস্টটলকে (Aristotle) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি গুরু বলে অভিহিত করা হয়। তিনি নগররাষ্ট্র ও তার সভ্যদের সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা **রাজনীতি** (Politics) নামে খ্যাত। 'Politics' কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ *polis* থেকে। এর অর্থ নগর। নগর সভ্যতার আলেখ্য রূপে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রীকদের নিকট খুবই প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। জেলিনেক (Jellinek), সিজউইক (Sidgwick) ও স্যার ফ্রেডারিক পোলক (Sir Frederick Pollock) প্রমুখ পরবর্তী লেখকও আলোচ্য বিষয়কে রাজনীতি বলেছেন। তবে তাঁদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুটি বিভাগ রয়েছে, তত্ত্বগত রাজনীতি (Theoretical Politics) ও ব্যবহারিক রাজনীতি (Applied Politics)। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাটলিনও তাই বলেন। তাঁর মতে,

রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় দর্শন এ দুই বিষয় সমন্বয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রীয় দর্শন বলতে তিনি সে অধ্যয়নকে বুঝিয়েছেন যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বর্ণনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল্য বিচার করে এবং আদর্শ স্থাপনে সহায়ক হয়।

সংশ্লিষ্ট লেখকদের মতে, তত্ত্বগত রাজনীতি রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে এবং ব্যবহারিক রাজনীতি রাষ্ট্রের কার্যাবলি (state-in-action) পর্যালোচনা করে। তবে আধুনিককালে রাজনীতি শব্দটির ব্যবহার হয়েছে বহু ব্যাপক। যে ব্যক্তি সরকারের অনুসৃত বিশেষ কোন নীতি কিংবা নির্বাচন সম্বন্ধে আগ্রহী তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞও হতে পারেন। তিনি বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রকে গ্রহণ না করে বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের দিকেই বেশি মনোযোগী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ ঃ রাজনীতি বলতে সাধারণত শাসনপদ্ধতি, প্রচলিত নিয়মকানুন ও সরকারের বিভিন্ন সমস্যার কথা বোঝায়। রাজনীতিবিদ মোটামুটিভাবে সমসাময়িককালের প্রবহমান ঘটনাবলি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহশীল। কিন্তু কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তার উৎপত্তি, রাষ্ট্রীয় দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহশীল। তিনি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের কোন অভিলাষ নাও রাখতে পারেন। রাজনীতিবিদ সাধারণত কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাঁদের কার্যস্থল আইন পরিষদ বা দলীয় কার্যালয় বা জনসভা। তিনি রাষ্ট্রীয় দর্শন সম্বন্ধে উদাসীন থাকতেও পারেন। তিনি তত্ত্বগত রাজনীতি (Theoretical Politics) অপেক্ষা 'ব্যবহারিক রাজনীতি' (Applied Politics) আলোচনা করতেই আনন্দ পান বেশি।

এ প্রসংঙ্গে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, "রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য" ("There must always be a conflict between the politician and a political scientist.")। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনকারী। ফলে রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনা করাই তার প্রধান কাজ এবং পাঠাগার তাঁর কার্যালয়। কিন্তু রাজনীতিবিদ হলেন ব্যবহারিক রাজনীতিতে মনোযোগী। দলের সদস্য হিসেবে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভে তিনি অধিক আগ্রহী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য নয়। কোন ব্যক্তিকে একই সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ হতে হলে তাঁকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করতে হবে। ব্যবহারিক রাজনীতিতে সফলতা অর্জনের জন্য তাঁকে তাত্ত্বিক রাজনীতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন একজন খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিলেন। তবে এও উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না হয়েও ভাল রাজনীতিবিদ হওয়া যায়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি আলোচনাকে অতীতে রাষ্ট্রীয় দর্শন নামে অভিহিত করা হতো এবং তা দর্শনশাস্ত্রের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের বন্দোবস্ত ছিল। সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কার্যাবলির বিশদ আলোচনা, এমনকি দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

ফরাসী দেশীয় অনেক পণ্ডিতের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি একক বিষয় নয়। সুতরাং একে রাষ্ট্রবিজ্ঞান না বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানমালা (Political Sciences) বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ রাষ্ট্রকে পূর্ণরূপে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাংবিধানিক তথ্যাদির সাহায্য ছাড়া সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নয়। এ ক্ষেত্রে

অধ্যাপক জেলিনেকের (Jellinek) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "যে কোন নামই যুক্তিযুক্ত এবং প্রযোজ্য যদি তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাপক অর্থে প্রকাশিত ভাবধারাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রকাশিত ভাবধারা থেকে পৃথক করে দেখে।" যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়, তা হলে তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে কোনো বাধা নেই। আর যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ছাড়া আরও অনেক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষণা করে এবং ইতিহাস, অর্থনীতি ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের শাখা সম্পর্কে আলোচনা করে, তবে তাকে **রাষ্ট্রবিজ্ঞানমালা** (Political Sciences) বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সে প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অখণ্ড ও সামগ্রিকভাবে চিন্তা করাই সঠিক। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক অথবা একক ও বহুবিধ—এভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিভক্ত করা আর ঠিক নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের উপকারিতা
Utility of Study of Political Science

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজন।

(১) রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা ঃ এ যুগে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড মানুষের আচার-ব্যবহার, আচরণ ও প্রয়োজন, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে রাষ্ট্রীয় কর্মের যেন শেষ নেই। শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সাধারণ কার্যগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং রাষ্ট্র বিষয়ে ঔদাসীন্য অন্ধকারের নামান্তর। এই অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ একান্ত প্রয়োজন।

(২) রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ জীবনের কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। এ সত্য বহু পূর্বে গ্রীক দার্শনিকগণ উপলব্ধি করেছিলেন। প্লেটোর (Plató) মতে, "সুবিচার ও বিধি বিধানের আওতা বহির্ভূত মানুষ নিকৃষ্টতম জীব, যদিও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে মানুষই হয় উৎকৃষ্টতম জীব" ("Man when perfected is the best of animals, but when separated from law and justice, he is the worst of all.")। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে সমাজ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান দান করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ফলে মানুষ সমাজকে জানতে পারে। সমাজের প্রতি তার কী কর্তব্য, সমাজে তার কী অধিকার, কী উপায়ে সে অধিকার রক্ষা করা যায় ও কর্তব্য পালন করা যায়, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, বিধিবিধান কীভাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে—এসব তথ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করলে মানুষ শুধু যে নিজেকেই জানতে পারে তা নয়, সমাজে তার স্থান কোথায় এবং কীভাবে সে সামাজিক কল্যাণে অংশীদার হতে পারে, তাও এর দ্বারা নির্দেশিত হয়।

(৩) রাষ্ট্র ও জনকল্যাণ ঃ রাষ্ট্র এখন জনকল্যাণে নিয়োজিত। আজ্ঞা কে দেয়, কেন দেয়, কেনই বা তা প্রতিপালিত হয়, রাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস কী, কী উপায়ে সকলকে সংযত ও সংহত করে জনকল্যাণের পথে ব্যবহার করা যায়—এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। জনসাধারণ যদি এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পরে তাহলে স্বার্থান্ধ ও ক্ষমতালোভীদের হাতে তাদের স্বার্থ বলি দিতে হয় না। সর্বজনীন মঙ্গলও শতগুণে বৃদ্ধি পাবে।

(৪) তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের ফলে জনসাধারণ কুযুক্তি ও অপসিদ্ধান্তের শিকারে পরিণত হয় না। যুগে যুগে স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা অন্যায় ও নীতিবিগর্হিত কার্য সমাধা হয়ে আসছে এবং সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণই তার প্রধান শিকার। কিন্তু যে কাজ অন্যায় ও নীতিবহির্ভূত তা রাষ্ট্র বা জাতির নামে সংঘটিত হলেই তা ন্যায়সঙ্গত হয় না। যে প্রলয়ঙ্করী নাৎসীবাদ বিশ্ব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তা সব সময়ে পরিত্যাজ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এসব মারাত্মক নীতির কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সাবধান করে দেয়।

(৫) উদারনীতি ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের আর একটি সুফল এই যে তা পাঠককে উদারনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া, ক্ষমতার উৎপত্তি, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিভিন্ন রূপ সরকারের দোষ-গুণ প্রভৃতি আলোচনার মাধ্যমে যুগোত্তীর্ণ মনীষীগণের চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হলে বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ হবে এবং নাগরিকগণ স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণে উৎসাহী হবে।

(৬) সর্বজনীনতা ঃ বর্তমানে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে এবং প্রযুক্তির জয়যাত্রার ফলে বিজিত হয়েছে দূরত্ব আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের সকলের সাথে সকলের আত্মীয়তা। বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে কেউ আর বসবাস করে না। সমগ্র বিশ্বের সাথে সকলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ যেমন অপরিহার্য তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ আজ অপরিহার্য। বর্তমানে সকলে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদের মধ্যে আমাদের সহ-অবস্থানের শিক্ষা লাভ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান সকলের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা এবং তার মাধ্যমে সকল ব্যবস্থার তুলনামূলক গুণাগুণ আমাদের জন্য এক আশীর্বাদতুল্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার সৃজনশীল পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের চিন্তার দিগন্ত বিস্তৃত করতে পারে।

(৭) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিগদর্শন ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত থাকে না। অতীতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেমন ছিল, বর্তমানে কী অবস্থা চলছে, ভবিষ্যতে তা কোন্ রূপ পরিগ্রহ করবে তা জানা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠে। এভাবে অতীতের ভিত্তিতে বর্তমান এবং বর্তমানের সত্তায় ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোর নিদর্শন লাভ করা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চা যে কোন নাগরিকের জন্য একান্ত কাম্য।

(৮) স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অঙ্গীকার ঃ বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক রক্তের নদী সাঁতরিয়ে বাঙালীরা ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল গোলাপ ও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে রয়েছে কৃতসংকল্প। স্বাধীনতা অর্জন যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি এর সংরক্ষণও অত্যন্ত কঠিন। গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাও অত্যন্ত জটিল। এজন্য একদিকে প্রয়োজন নাগরিকদের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও অধিকার রক্ষার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন কর্তব্যবোধের অনুরণন, নাগরিক হিসেবে প্রশিক্ষণ ও জনকল্যাণের অদম্য এক স্পৃহা। বাংলাদেশের নাগরিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে এ সকল গুণের অধিকারী হতে পারবে ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী বিজ্ঞান

Is Political Science a Science

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু এরিস্টটল (Aristotle) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেন এবং গ্রীক রাজনীতি বিশ্লেষণে নিয়ম মাফিকভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তী যুগেও বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হব্‌স (Hobbes), বোঁদা (Bodin), সিজউইক (Sidgwick), মন্তেস্কু (Montesquieu), ব্রাইস (Bryce) এবং ব্লুন্টসলির (Bluntschil) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক এ মত পোষণ করেন নি। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে আমোস (Amos), বাকলে (Buckle), মেটল্যাণ্ড (Maitland) ও কোঁতের (Comte) নাম উল্লেখযোগ্য। আমোস বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, জটিলতা ও বিশালত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এর অনুসন্ধান ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ অসম্ভব।" বাকলের মতে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা তো দূরের কথা, তা কলা শাখারও সর্বনিম্ন স্তর" ("Politics, far from being a science, is the most backward of all arts.")। মেটল্যাণ্ড রসিকতা করে বলেন, "প্রশ্নপত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শীর্ষক কতকগুলো প্রশ্ন যখন দেখি, তখন আমি দুঃখিত হই প্রশ্নগুলোর জন্য নয়, শুধু শিরোনামের জন্য" ("When I see a good set of examination questions headed by the words 'Political Science', I regret not the questions but the title.")।

কোঁতে তিনটি কারণে বিজ্ঞান হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দাবি অস্বীকার করেছেন। **প্রথম,** রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একমত নন। **দ্বিতীয়,** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে ধারাবাহিকতা এবং অখণ্ড গতি নেই। **তৃতীয়,** ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ব্যাপারে এর নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র বা মান নেই।

সুতরাং এই মতদ্বৈততার কুয়াশা কাটাতে হলে বিজ্ঞান কাকে বলে তার সঠিক ধারণা আমাদের থাকা চাই। সাধারণভাবে কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific method) অনুসরণ করে সুসংবদ্ধ, অধ্যাপনাযোগ্য জ্ঞানের বিকাশ ঘটালে তা বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়। পোলানস্কির (Norman A. Polanski) মতে, গবেষণা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণই হল বিজ্ঞানের প্রধানতম মানদণ্ড। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন হয় পর্যবেক্ষণ (Observation), শ্রেণীবিভাগ (Classification), অনুমান .(Hypothesis) এবং অনুমিত বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Verification) পরিচালনা। পিয়ারসনও (Pearson) এ কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁর মতে, "আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও লক্ষ্য হলো ঘটনাবলীর শ্রেণীবিভাগ করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।" বিজ্ঞানের মূলকথা বলতে তাই আমরা বুঝি **প্রথম,** শ্রেণীবিভাগ, **দ্বিতীয়,** তার মাধ্যমে কোন বিষয়ে সাধারণ সূত্র খুঁজে বের করা এবং **তৃতীয়,** এই সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক অনুমান করা।

এই আলোকে বিচার করলে বিজ্ঞান হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দাবি কে অস্বীকার করবে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আদিকাল থেকে বহু দেশের ও বহু যুগের শাসনপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমধর্মী সরকারগুলোকে এক এক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার চুলচেরা বিচার করেছেন এবং বিশেষ ধরনের সরকার হলে কীরূপ ফল হবে তা পর্যালোচনা করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান নিশ্চয়ই।

কিন্তু রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তফাত এই যে, উক্ত বিজ্ঞানসমূহে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে সুযোগ রয়েছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তা নেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু; যেমন—উত্তাপ, বিদ্যুৎ, পরমাণু প্রভৃতির স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তারা নিয়মের অধীন এবং গবেষণাগারে নিয়ম অনুসারেই কাজ করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার মানুষকে নিয়ে। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। সংঘবদ্ধভাবে বাস করতে করতে এক রকম সমষ্টিগত চেতনাশক্তি অর্জন করেছে সামাজিক মানুষ। ফলে তা কীরূপ ঘটনায় কিভাবে প্রকাশিত ও বিকশিত হবে তা অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। ব্যষ্টি পুরুষের আচরণ অপেক্ষা সমষ্টিগত পুরুষের আচরণ আরও অনিশ্চিত। সুতরাং গবেষণাগার বা পর্যবেক্ষণাগারে যেমন করে কোন পদার্থকে অন্য পদার্থ থেকে পৃথক করে পরীক্ষা চালানো সম্ভবপর, তেমনিভাবে মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে পরীক্ষা চালানো সম্ভবপর নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা কতকগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করতে পারা যায়, যা সব দেশে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে এমন কিছু বলা সম্ভবপর নয় যা কাল-পাত্র নির্বিশেষে সত্য হতে বাধ্য। তার কারণ, মানব সমাজের এবং মানব মনের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল এবং পরিবর্তনশীল।

তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান না বলে পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান বলাই শ্রেয়। অবশ্য ইতিহাসের বিরাট পর্যবেক্ষণাগারে বিশেষ বিশেষ সত্যের এবং বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার কার্যকারিতা লক্ষ্য করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। সে পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এরূপ ঘটলে এরূপ কার্য ঘটে। এরিস্টটল ১৫৮টি সংবিধানের ফলাফল লক্ষ্য করে রাষ্ট্র বিষয়ে যে মন্তব্য করেন, আজও তার মূল্য বিন্দুমাত্র কমে নি। লর্ড ব্রাইসও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে যে সকল সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাও অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের দৃষ্টান্তগুলো পর্যবেক্ষণ করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাও অনেকটা নির্ভুল। ফরাসী বিপ্লবের কারণাদি লক্ষ্য করে এবং রুশ বিপ্লবের কারণগুলো অনুসন্ধান করে যদি কোন অনুসন্ধানকারী অন্য দেশ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন তাও নেহায়েৎ অসত্য হবে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বরূপ এক নয়। তাদের উপাদানও এক নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রধান উপজীব্য কোন পদার্থ বা বস্তু, কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু মানুষ। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আবেগপ্রবণতা ও নৈতিকতা বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার উপাদানসমূহ অত্যন্ত জটিল ও পরিবর্তনশীল। এজন্য অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'সম্ভাব্যতার বিজ্ঞান' (Science of Probability) বলে অভিহিত করেছেন। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা প্রবণতা অনুসন্ধান করি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হই" ("We deal with tendencies; we predict upon the basis of experience")। এসব কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental science) না বলে পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান (observational science) বলাই যুক্তিসঙ্গত।

অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ধনবিজ্ঞানী মার্শালের (Marshall) মতে, অর্থনীতিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা অনেকটা জোয়ার-ভাঁটার গতির মত। আমরাও সেরূপ বলতে পারি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আবহ বিজ্ঞানের (Meteorology) সমপর্যায়ের বিজ্ঞান। ঝড়-বৃষ্টি সম্বন্ধে যেমন আবহ বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় সত্য হয়, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণীও অনেক সময় সত্য হয়। অধ্যাপক

আর্নেস্ট বার্কার (Ernest Barker) এ মত পোষণ করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নীহারিকাতুল্য হলেও সামাজিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখা সম্বন্ধেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সম্প্রতি যে সকল আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রযোজ্য হচ্ছে তার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভূত নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব বিজ্ঞানের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সিস্টেমস তত্ত্ব, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব, সংঘ তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও আচরণবাদের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। তাই লর্ড ব্রাইসের *(Bryce)* সাথে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি, **রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিশ্চয়ই বিজ্ঞান**। তবে তা পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান রীতি
Methods of Inquiry in Political Science

রাষ্ট্রের কার্যক্রম, সংগঠন ও উদ্দেশ্যের সুসংবদ্ধ অধ্যয়নকে সংক্ষেপে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের তুলনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপরিণত ও অসম্পূর্ণ। প্রয়োগাত্মক বিদ্যার তুলনায় তা অনেকটা পশ্চাৎপদ। সে জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও অনুসন্ধান কোন নির্দিষ্ট প্রণালী বা পদ্ধতি অনুসারে সম্ভবপর নয়। সমস্যার প্রকারভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে উপযোগী। তাই এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রণালী অনুসরণ করা হয়। অবশ্য সকল প্রকার পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর। ইতিহাসে অনুসন্ধান রীতি যেমন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল (static), রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান রীতি তেমনি গতিশীল (dynamic), কারণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী একান্তভাবে পরিবর্তনীয়। সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে সতত রাজনৈতিক ঘটনাবলী রূপ পরিবর্তন করছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজ অত্যন্ত সাবধানতার সাথে পরিচালিত হতে হবে। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে জানতে হবে এবং বর্তমানের ভিত্তিমূলে ভবিষ্যৎ রচনা করা প্রয়োজন। সুতরাং বিভিন্ন রীতি শুধু প্রয়োজনীয় নয়, একান্ত উপযোগীও বটে।

আগস্ট কোঁতে (Auguste Comte) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় তিনটি বিশিষ্ট পদ্ধতির উল্লেখ করেন। **প্রথম,** পর্যবেক্ষণমূলক, **দ্বিতীয়,** পরীক্ষামূলক, এবং **তৃতীয়,** তুলনামূলক। মিলের (J. S. Mill) মতে চারটি প্রণালীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনুসন্ধান চালানো সম্ভবপর। **প্রথম,** পর্যবেক্ষণমূলক (Observational); **দ্বিতীয়,** জ্যামিতিক (Geometrical); **তৃতীয়,** প্রাকৃতিক (Physical); এবং **চতুর্থ,** ঐতিহাসিক (Historical)। এই চার পদ্ধতির মধ্যে তিনি প্রথম দুটিকে অর্থহীন বলে উল্লেখ করেন। ব্লুন্টসলির (Bluntschli) মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method) এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) সর্বাধিক উপযোগী। কিন্তু অধ্যাপক রবসন বলেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিত সাতটি পদ্ধতির সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে বিশেষ ফল লাভ করেছেন ঃ (১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), (২) আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method), (৩) দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method), (৪) প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতি (Institutional Method), (৫) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method), (৬) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Method) এবং (৭) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method)।

পোল্যাণ্ডের এক বিশিষ্ট গবেষক আটটি পদ্ধতি উল্লেখ করেন ঃ (১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), (২) আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method), (৩) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method), (৪) প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতি (Institutional Method), (৫) মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Psychological Method), (৬) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method), (৭)

ডায়ালেকটিক বা তর্কমূলক পদ্ধতি (Dialectical Method), এবং (৮) সামগ্রিক পদ্ধতি (Integrated Method)। তাছাড়া, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observational Method), পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) এবং জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method) তো আছেই।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রণালী বা পদ্ধতির মধ্যে সাতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং নিচে তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method) ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের স্থান অতি সংকীর্ণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহে যেমনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোন সত্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঠিক তেমনিভাবে কোন গবেষণাগারে পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করা সম্ভবপর নয় যে কোন পরিবেশে গণতন্ত্র কার্যকর হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী খেয়ালখুশিমত নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ করলে তাঁর কী ফল হবে তা দেখতে পারেন না। তাই স্যার জর্জ ল্যুই (Sir George Lewis) বলেন, **"রসায়ন শাস্ত্রে একজন গবেষক যেমন পরীক্ষা চালাতে পারেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা তেমনটি পারি না।"** কারণ হিসেবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ-কারবার স্বাধীন চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ নিয়ে, কোন রাসায়নিক পদার্থ বা অচল পদার্থ নিয়ে নয়। সুতরাং পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করাই শ্রেয়। বিভিন্ন দেশে নানা প্রকার আইন-কানুন প্রচলিত হয়েছে, নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান ও নতুন নতুন রীতি প্রবর্তিত হচ্ছে। তাদের ফল কোথায় কীরূপ হয়, তা পর্যবেক্ষণ করার অর্থ অনেকটা পরীক্ষার মত। মদ্যপান নিষিদ্ধ করলে দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর তার প্রভাব কীরূপ হয়, তা যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে খুজলেই যথেষ্ট। একনায়কতন্ত্রের ফল দেশের আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কীরূপ হয় তা মহাযুদ্ধের পূর্বের ইতালি ও জার্মানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি এবং তা অনেকটা পরীক্ষামূলকই বটে। এ কথারই প্রতিধ্বনি অধ্যাপক গার্নার করেছেন ঃ "প্রত্যেকটি নতুন আইনের প্রণয়ন, প্রত্যেক নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও নতুন নীতির প্রবর্তন মাত্রই পরীক্ষামূলক এ অর্থে যে, এদের উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত হয়ে চিরস্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সাময়িক হিসেবে ধরা হয়" ("The enactment of every new law, the establishment of every new institution, the inauguration of every new policy is experimental in the sense that it is regarded merely as provisional or tentative until the results have proved its fitness to become permanent.")।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণাত্মক ও তুলনামূলক পদ্ধতির একত্র সমাবেশ করে আদিযুগ থেকে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি গুরু এরিস্টটল থেকে লর্ড ব্রাইস পর্যন্ত অনেকেই এ পথে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনেক মূল্যবান অধ্যায় সংযোজন করেছেন। ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে হলে পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। তবে কেবল এক যুগের বা এক দেশের ঘটনাবলী সংগ্রহ করলেই চলবে না।

ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে নিজেকে ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিছিন্ন করে তথ্যরাজি একত্র করতে হবে, শ্রেণীবিন্যস্ত করার পর একের সাথে অন্যের কী সম্পর্ক তা বের করে, অপ্রাসঙ্গিক তথ্যাদি কেটে ছেঁটে কার্যকারণাত্মক

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। যদি পরিলক্ষিত হয় যে, বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একই ঘটনা বহু যুগে সংঘটিত হয়েছে, তা হলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, উক্ত ঘটনা অনুরূপ পরিবেশে পুনর্বার ঘটবে।

এই পদ্ধতিতে এরিস্টল ১৫৮টি দেশের সংবিধান আলোচনা ও পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন সম্পর্কে যা লিখে গিয়েছেন তা জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। ফরাসী পণ্ডিত মন্তেস্কু (Montesquieu) বহু দেশের বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অধ্যয়ন করে *The Spirit of the Laws.* নামক একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন। হেনরী মেইন (Henry Maine) ও লর্ড ব্রাইসও (Bryce) এ পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক সহজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন আলোক দান করেন। তবে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। **প্রথমত,** ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকারে অনুসন্ধান করতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** জাতীয় সংস্কারমুক্ত মন এখানে একান্ত প্রয়োজন। **তৃতীয়,** দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ঈগলের দৃষ্টিতে চুলচেরা বিচারে বসতে হবে।

দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method) ঃ দার্শনিক পদ্ধতিতে কতকগুলো সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে তা থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে নতুন মতবাদ স্থাপন করতে হয়। মানব প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এবং তার প্রয়োজনকে সামনে রেখে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কী, তার কার্য কী ধরনের হওয়া উচিত, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের কেমন সম্বন্ধ থাকা উচিত এবং কী প্রকার হলে তা যুক্তিযুক্ত হয়—এ ধরনের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা দার্শনিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার মাধ্যমে করা হয়েছে। তবে এ পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে হলে গবেষকদের মাটির সাথে সম্বন্ধ রাখতে হবে। কাল্পনিক হয়ে মহাকবি শেলীর মত আকাশচারণ করলে চলবে না। প্লেটো, হেগেল, কান্ট, ব্রাড্‌লে, গ্রীন প্রমুখ দার্শনিক এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের চিন্তার দিগন্ত বিস্তৃত করেছেন।

আইনগত পদ্ধতি (Juridical Method) ঃ বিশ্লেষণাত্মক আইনজ্ঞগণ (Analytical Jurists) আইনগত পদ্ধতিতে সাংবিধানিক আইন ও শাসন সম্পর্কীয় আইনসমূহের বিবিধ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রকে একটি কল্পিত বৈধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানরূপে মনে করে তার কর্তব্য ও অধিকার বিচার করা হয়েছে। তাদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আইন ও সংবিধানের এক বৃহৎ ক্ষেত্ররূপে গড়ে তুলেছে। লিখিত আইন-কানুন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার প্রভাবে সমাজে অনমনীয় কতকগুলো সূত্র যা সামাজিক রীতি-নীতির কাছে কোনক্রমেই নতি স্বীকার করবে না।

তবে এ পদ্ধতি সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ, কারণ সামাজিক রীতিনীতির কোন স্থান এখানে নেই। জন অস্টিন (John Austin) এই ক্ষেত্রের একজন প্রধান লেখক।

সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Sociological Method) ঃ সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিতে আইনমূলক পদ্ধতির সংকীর্ণতাকে পরিহার করে ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিবর্তনের আলোকে রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীকে তুলে ধরার বলিষ্ঠ প্রয়াস রয়েছে। এই পদ্ধতি রাষ্ট্রকে একটি বৈধ ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ না করে একটি বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করা হয় এবং তার প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে কিনা, অথবা আইন-কানুনসমূহ প্রয়োজন মিটাতে সমর্থ কিনা, এ সব বিচার করা হয়। আইনের পুঁথিতে কী লেখা আছে তা অপেক্ষা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কী ঘটছে, কেন ঘটছে তা আবিষ্কার করতেই সমাজবিজ্ঞানী বেশি আগ্রহী। প্রাচীন গোষ্ঠীগুলির রীতি-নীতি ও জীবন-প্রণালী পর্যালোচনা করে বহু সমাজবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করেছেন।

মনোবিজ্ঞান পদ্ধতি (Psychological Method) ঃ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সম্প্রতি অনেক রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান বের করা হচ্ছে। গণতন্ত্রায়নের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় বিবিধ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে; যেমন—রাজনৈতিক দল, জনমত গঠন। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে জনমতের সংগঠন, দলের কার্যপ্রণালী, যুক্তি ও সহজাত সংস্কারের প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি প্রশ্নের বিচার করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলো নির্বিবাদে স্বীকৃত হচ্ছে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু রাষ্ট্র। এর স্বরূপ, বিভিন্ন রূপ, গণতন্ত্র প্রভৃতি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু করা সম্ভবপর হয় নি।

প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতি (Institutional Method) ঃ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান কীভাবে কাজ করছে তা প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতির দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে যদি পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিরও একত্রে সমাবেশ ঘটে তা হলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রের ভেতর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোক কতজন, কতজনের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে, বিভিন্ন নির্বাচনী যুদ্ধে কতজন অংশগ্রহণ করেন, দেশের কতজন জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে এবং ফলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে এবং এর কার্যকারিতা ও কার্যকরণ সম্বন্ধে কতটুকু সচেতনতা আছে তা জানতে পারলে রাষ্ট্রের একটি স্পষ্ট চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর। গণতন্ত্রায়নের যুগে এসব ব্যাপারে মনোযোগী হবার প্রয়োজনও আছে। আইন পরিষদ কাদের দ্বারা গঠিত, কোন্ শ্রেণীর কোন্ পেশার কতজন লোকের হাতে নেতৃত্ব অর্পিত হয়েছে, দেশের কৃষি এবং শিল্পের ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে কিনা এসব পরিসংখ্যানের সাহায্যে অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হয়ে থাকে।

যে সমস্ত পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় ঘটনা ও তথ্যাদির বিশ্লেষণ এবং বিচার করে।

আধুনিক পদ্ধতি (Modern Methods) ঃ উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ ছাড়াও সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আধুনিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ, এর অনুশীলন রীতি, গবেষণা পদ্ধতি ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন ক্ষেত্রে সনাতন বা গতানুগতিক পদ্ধতি নিম্নলিখিত কারণে অপ্রতুল প্রমাণিত হয়েছে। **প্রথমত,** দেখা গেছে, সনাতন পদ্ধতি ছিল বর্ণনামূলক আলেখ্য (descriptive), বিশ্লেষণধর্মী নয়। **দ্বিতীয়ত,** সনাতন প্রক্রিয়ায় শুধু রীতিসিদ্ধ ও আইনগত (Legal-formal) দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু রাজনীতির মৌল বিষয় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব তার বিভিন্ন দিকে তেমন নজর দেয়া হয় না। **তৃতীয়ত,** সনাতন পদ্ধতি সংকীর্ণ (parochial)। ব্যাপকতর অনুসন্ধান এতে ছিল না। **চতুর্থত,** এ পদ্ধতি ছিল রক্ষণশীল (conservative), কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিসমূহ গতিশীল। **পঞ্চমত,** সনাতন পদ্ধতি ছিল তত্ত্বের প্রতি উদাসীন (non-theoretical emphases), কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্ব গঠনে আগ্রহী।

এই প্রেক্ষিতে আধুনিক পদ্ধতিসমূহের আবেদন গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(১) আচরণবাদ (Behavioralism) ঃ পরীক্ষালব্ধ ও প্রয়োগযোগ্য তত্ত্ব উদ্ভাবন, রীতিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ও তাদের সত্যাসত্য যাচাই-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যক্রমের সুসমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুসন্ধানই আচরণবাদ। আচরণবাদে দুটি বিষয়ের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একটি হলো

সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন ধারণা ও অনুমিত সত্য (hypothesis) উদ্ভাবন এবং অন্যটি হলো পরীক্ষালব্ধ ও প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় পরিমাপযোগ্য উপাত্ত ব্যবহার, ঐ সকল উপাত্তের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

(২) সংঘ তত্ত্ব (Group Theory) : কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান হাজারো সংঘের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারা লক্ষ্য করে ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেন গৃহীত হয়, ঐ সব সিদ্ধান্তের ফলে কোন্ সংঘ লাভবান হয় এবং কেন হয়, ঐ সব গ্রুপের প্রভাবের মূল কী ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান সম্ভব হয় সংঘ তত্ত্বের মাধ্যমে। এর ফলে সমাজে, রাজনৈতিক কার্যক্রমের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

(৩) সিস্টেমস তত্ত্ব (Systems Theory) : সামগ্রিকভাবে কোন বিষয় পর্যালোচনার জন্য, বিশেষ করে নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা (a political system) কীভাবে টিকে থাকে তা নির্ধারণের জন্য সিস্টেমস তত্ত্ব অত্যধিক উপযোগী। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয় সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো : (ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইন্‌পুটের বৈশিষ্ট্য ও গতিপ্রকৃতি; (খ) কোন্ অবস্থায় ইন্‌পুট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি করতে পারে; (গ) পরিবেশ কোন্ ভূমিকা পালন করে; (ঘ) কোন্ পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঐ সব চাপের মোকাবেলা করে; (ঙ) তথ্য প্রেরণ ও অবগতির ভূমিকা; (চ) কীভাবে আউটপুট ঐ চাপ হ্রাস করে। ডেভিড ইস্টন এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন।

(৪) কাঠামো কার্যগত তত্ত্ব (Structural-Functional Theory) : গ্যাব্রিয়েল আলমণ্ড কাঠামো-কার্যগত তত্ত্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইনপুট ও আউটপুট বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তুলনামূলক পর্যালোচনা ক্ষেত্রে এক শুভ সূচনা করেছেন।

(৫) তাছাড়াও রয়েছে এলিট গ্রুপের বিশ্লেষণ, শ্রেণী বিশ্লেষণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এ সব পদ্ধতি আধুনিক পদ্ধতি।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এর প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Define political science and discuss its nature and scope.) [D. U. 1984, N. U. 2007]

২। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী আদৌ বিজ্ঞান ?** (Discuss the scope of political science. Is political science a science at all?)

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী হিসেবে বিজ্ঞান তা আলোচনা কর। (In what sense is political science a `science' ? Discuss.)

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী সত্যই বিজ্ঞান ? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি কীভাবে প্রমাণ করবে ? (Is political science really `science' ? How would you prove its scientific nature ?)

৫। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে, নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করে না।" এ সম্বন্ধে তোমার মত কী ? ("Political science deals with questions of facts, not with values"—Do you agree ?)

৬। "রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে দ্বন্দ্ব অনিবার্য"—এ সম্বন্ধে তোমার মত কী ? আলোচনা কর। ("There must always be a conflict between the politicians and the political scientist."—Do you agree ? Discuss.)

৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নে কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত ? (What methods should be followed in the study of political science ?)

৮। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the nature and scope of political science.) [C. U. '86; D. U. '80, '89; N. U '96, '98]

৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের উপকারিতা কী কী ? রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সাথে কীভাবে সম্বন্ধযুক্ত? (What are the uses of the study of political science ? How is it related to sociology ?)

১০। কীভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করবে? ইতিহাস ও ধনবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কীভাবে সম্বন্ধযুক্ত ? (How do you define political science ? How is it related to economics and history ?) [N. U. 1999]

১১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। অর্থনীতির সাথে এর কী সম্বন্ধ ? (Discuss the nature and scope of political science. How is it related to economics ?)

[D. U. '84, '89; N. U. 2007]

১২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাকে বলে ? রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য কোন্ পদ্ধতি উত্তম ? (What is political science ? Which method is more useful for its study ?)

১৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থ ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the meaning and subject matter of political science.)

১৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী ? রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রধান পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। (What is political science ? Briefly discuss the major methods for studying political science.)

[D. U. '84; R. U. '81]

১৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। (Define political science. Discuss its relations with sociology and economics.)

[R. U. '82. '84]

১৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। (Define political science. Discuss the utility of the study of political science.) [R. U. 1983]

১৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করার পক্ষে যুক্তি দেখাও। (Define Political Science. Show reasons to prove that it is a science.) [N. U. 1997]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ২

RELATION OF POLITICAL SCIENCE WITH OTHER SOCIAL SCIENCES

সূচনা
Introduction

মানুষের সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেন মানুষের সমাজ জীবনকে ঘিরে লতার মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। তাই, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র, ভূগোল, নীতিশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব যেন বিশেষ সূত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। একটিকে জানতে হলে অপরের সাহায্য ছাড়া এক পা নড়ার উপায় নেই। এক বিদ্যা অন্য শাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। একে অন্যের পরিপূরক এবং সম্পূরক। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কীরূপ সম্পর্ক তা আলোচনা করা দরকার।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান
Political Science and Sociology

সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কার্যক্রম, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সুসংবদ্ধ অধ্যায়নকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয়। অন্যদিকে সমাজ, সামাজিক কাঠামো এবং সমাজে বসবাসকারী মানুষের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান, কৃষ্টি, আচার-আচরণের সুসংবদ্ধ অধ্যয়ন হলো সমাজবিজ্ঞান। সংক্ষেপে, সমাজ ও সামাজিক জীবনের বিজ্ঞান (Science of society) হলো সমাজবিজ্ঞান। ফলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

(১) সমাজবিজ্ঞান বৃহৎ পরিধিবিশিষ্ট, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ক্ষুদ্রতর : সমাজবিজ্ঞান অত্যন্ত বৃহৎ পরিধি বিশিষ্ট অধ্যয়ন ক্ষেত্র। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এর মূল উপজীব্য। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সকল শ্রেণীর সংঘ, সংঘের বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, তাদের উৎপত্তি, স্বরূপ ও বিকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে মানবজীবন সম্বন্ধীয় সকল জ্ঞানকে মালার মত একত্রে গেঁথেছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সাথে অতি সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে মনে হয়, তরুণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেন বৃদ্ধ সমাজবিজ্ঞানের পৌত্র অথবা প্রপৌত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সুসংহত এবং রাজনৈতিক সমাজকে নিয়ে কারবার করে। সমাজবিজ্ঞান রাজনৈতিক সমাজের পেছনে গিয়ে অতীতের অসংবদ্ধ সমাজ জীবন নিয়েও আলোচনা করে এবং সামাজিক জীবনের মূল সূত্র খুঁজে বের করে।

(২) সমাজবিজ্ঞান যেন এক বিরাট বটবৃক্ষ আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাঁর এক শাখা : আয়তনের দিক দিয়েও সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে বৃহত্তর। সমাজবিজ্ঞানের আওতায় আসে মানুষের সকল শ্রেণীর সংঘ। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রধান সংঘ। সে হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা বলা যেতে

পারে। সমাজবিজ্ঞান যেন একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার বৃহত্তম শাখা। সমাজবিজ্ঞান মানুষের আচার-ব্যবহার, প্রথা, আর্থিক জীবন প্রভৃতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে এসব বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু মানুষের রাজনৈতিক জীবন নিয়েই ব্যস্ত।

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান সুসংবদ্ধ সমাজজীবনের পাঠ, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সমাজের সকল স্তর পর্যালোচনা করে ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান উপজীব্য হলো রাজনীতি সচেতন মানুষের সংঘবদ্ধ সমাজ, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের আওতাধীন সংঘবদ্ধ ও অসংহত উভয় সমাজই। সংক্ষেপে, সমাজবিজ্ঞানের শুরু হয় সামাজিক জীবনের সূচনা থেকে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার কাজ-কারবার শুরু করে তার বহু পর থেকে। এ অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বিশেষীকৃত বিজ্ঞান। তাই বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের পাঠ ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। অন্যদিক থেকে বলা হয়, একজন আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে প্রথম হতে হয় একজন সমাজবিজ্ঞানী।

(৪) একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান একে অন্যের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎপত্তি কী ভাবে হলো, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কীভাবে উদ্ভূত হলো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যের জন্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের নিকট ঋণী। আবার সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট থেকে রাষ্ট্রের সংগঠন, কার্যাবলী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে। গিডিংসের (Giddings) মতে, "রাষ্ট্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকগণের উচিত সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো আয়ত্ত করা"। গিডিংস ও মরগ্যান প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক তথ্যরাজি সংগ্রহ করে এর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। সুতরাং, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান একে অপরের সম্পূরক।

অধ্যাপক **গিডিংস** (Giddings) বলেন, "যারা সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো আয়ত্ত করেন নি তাদের রাষ্ট্রতত্ত্ব শিক্ষাদান অনেকটা নিউটনের গতি সূত্রের জ্ঞানবর্জিত ব্যক্তিদের জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার মতই।"

(৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্য এবং আদর্শগতভাবে ভবিষ্যৎমুখীও হয় ঃ অতীত ও বর্তমানেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে না। আইন-কানুন সম্পর্কে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং আরও বহু বিষয়ে ভবিষ্যতে কী হবে অথবা কী হওয়া উচিত তাও আলোচনা করে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান অতীত ও বর্তমান নিয়েই অধিক ব্যস্ত। ভবিষ্যতের কল্পনায় তেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস
Political Science and History

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একে অন্যের উপর নির্ভর করে বেড়ে উঠেছে।

(১) ইতিহাসের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ঃ ইতিহাসকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগার বলা হয়। ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় অতীতে কী কী ঘটেছে, কেন ঘটেছে, ঘটনাবলীর ফল কী হয়েছে ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এসব প্রয়োজনীয় তথ্যরাজি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন এবং অতীতের উপর ভিত্তি করে বর্তমানকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক চিন্তাধারা তিল তিল করে ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) তাই বলেছেন, "ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকণাসমূহের মধ্যে স্বর্ণরেণুর মত রাষ্ট্রবিজ্ঞান জমে উঠেছে" ("The science of politics is the one science that is deposited by the stream of history like the grains of gold in the sands of a river.")।

ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র গঠন করা হয়েছে। তাই **উইলোবী** (W. W. Willoughby) বলেন, "ইতিহাসই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীরতা দান করেছে" (History provides the third dimension to political science.")।

(২) ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট কম ঋণী নয় ঃ রাষ্ট্রের আইন ও অন্যান্য নীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসকে অনেক মাল-মসলা যোগান দেয়। ইতিহাস তারই সাহায্যে ঘটনাবলীর সুসংহত বিবরণ রচনা করতে পারে। ষোল শতকের জাতীয়তাবাদ, সতর শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আঠার শতকের গণতন্ত্রায়ন ইতিহাসের ঘটনাসমূহকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সুতরাং একটি অপরের উপরে এমনভাবে নির্ভরশীল যে, দুটিকে নিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি হয়। তাই বার্জেস (Burgess) বলেন, "উভয়কে যদি পৃথক করে দেয়া হয়, তা হলে ইতিহাস মৃত, তা না হলেও হবে বিকলাঙ্গ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হবে আলেয়ার মত অস্পষ্ট ও অবাস্তব" ("When these two are cut off, history becomes a cripple, if not a corpse and political science is reduced to a will-o-the wisp")। ঐতিহাসিক জন সিলী (Seeley) তাই মন্তব্য করেছেন, 'ইতিহাসের দ্বারা বিশদভাবে ব্যাখ্যায়িত না হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হয়ে পড়ে অসার এবং যদি ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ হারায় তা হলে তা মাত্র সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে" ("Politics is vulgar when not liberalised by history and history fades into mere literature when it loses sight of its relation to politics.")।

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র ঃ কিন্তু এই নির্ভরশীলতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ফ্রিম্যান (Freeman) যা বলেছেন তাও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, "ইতিহাস শুধু অতীত রাজনীতি নয় এবং অন্যদিকে রাজনীতি শুধু বর্তমান ইতিহাস নয়"। সকল প্রকার ইতিহাসের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ নেই। স্থাপত্যবিদ্যার ইতিহাস, মুদ্রার ক্রমবিকাশের কাহিনী বা শিল্পকলা, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছেদের ইতিহাসের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই।

(৪) রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি সামাজিক সমস্যা ঃ রাজনীতি বা রাষ্ট্রতত্ত্ব শুধু ইতিহাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। এর মূলে অর্থনৈতিক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং আইনশাস্ত্রেরও অনেক উপাদান রয়েছে। তাই বার্কার (Barker) বলেছেন, "ঐতিহাসিক পাঠ বাদ দিয়েও ভাল রাষ্ট্রনৈতিক নীতি হতে পারে।" ইতিহাসের ভিত্তিতে গঠিত নয় এমন মতবাদও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে।—যেমন, প্লেটোর 'রিপাবলিক' (`Republic' of Plato)।

(৫) ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক এবং সম্পূরক ঃ সিলী (Seeley) আর একটি উদ্বৃতি দিয়ে এ সম্পর্কে বলতে চান, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাস ফলপ্রসূ নয় এবং ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন" ("History without political science has no fruit and political science without history has no root.")। তবে এও সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের মত শুধু অতীত এবং বর্তমানেই বাস করে না। ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আইন ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের বহুবিধ সমস্যার সমাধান আনতে ব্যস্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি
Political Science and Economics

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাজনীতি অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে। অন্যদিকে অর্থনীতি রাজনীতিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে।

(১) প্রাচীন লেখকগণ অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাখা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমন কী গ্রীক পণ্ডিতগণও এ মত পোষণ করতেন। তাই অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে জড়িত করে বহুদিন একত্রে আলোচনা করেছেন। আঠার শতক পর্যন্ত এ ভাবধারা প্রচলিত ছিল। এ উপমহাদেশেও ১৯৩৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল না। অর্থনীতি বিভাগের একাংশ হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ দেয়া হত। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতির (Political economy) অংশবিশেষ। আজকে কেউ দুটিকে একত্র করে ভাবেন না। তবে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পর্কে সকলেই সচেতন।

(২) অর্থনৈতিক অবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে ঃ এটি আধুনিককালে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অর্থনৈতিক অবস্থা রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রাষ্ট্র সুপরিকল্পিত আর্থিক পরিকল্পনার (Economic planning) মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানে মনোযোগী। তার ফলে আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু জনকল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত, তাই প্রত্যেকটি প্রগতিশীল দেশে রাষ্ট্র বৃদ্ধ, বেকার, অক্ষম ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ, রুগ্নদের সেবা, ছাত্রদের বিনা খরচে লেখাপড়ার সুযোগ দান প্রভৃতির বন্দোবস্ত করছে। এমন কী সরকারের বিভিন্ন রূপ, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং কাঠামোকে পর্যন্ত প্রভাবিত করছে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অতি যত্নে সংরক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি যদি দুর্বল হয়, তা হলে নাগরিকগণ আত্মরক্ষার জন্য অধিক শক্তি ব্যয় করতে ব্যস্ত থাকে এবং উৎপাদনে কৃতকার্য হয় না। উৎপন্ন সম্পদ শ্রমিক, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হবে তা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে।

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে ঃ অর্থনৈতিক অবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। যে দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত হয় না অথবা যেখানে সকল প্রকার উৎপাদনক্ষম উপাদান সমাজের নিয়ন্ত্রণে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গতানুগতিক পথে চলতে সমর্থ হয় না। সেখানে সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক হতে বাধ্য। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা যেখানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণঅধিকার স্বল্পকালীন হলেও খর্ব হতে বাধ্য। অতীত ইতিহাসেও এর অনেক নমুনা পাওয়া যায়।

(৪) উভয়ের মধ্যে মিলও প্রচুর ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক কতকগুলো বিষয়ে প্রচুর মিল রয়েছে। ট্যারিফ আইন (Tariff law), বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতামূলক নিয়মাবলী, শ্রম আইনসমূহ শুধু অর্থনৈতিক কারণে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও এর শর্তাবলী রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে। সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো নিছক অর্থনৈতিক। সুতরাং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মী, সহগামী এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান আনয়নে সমানভাবে আগ্রহী।

(৫) অর্থনীতি অধিকতর বাস্তববাদী ঃ অর্থনীতির অধিকাংশ প্রশ্ন একান্ত বাস্তবধর্মী এবং শুধু বাস্তবতাকে ভিত্তি করে রচিত, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শবাদকে ভুলতে পারে না। তাই দর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরিচালিত করে। এ সত্য বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেন বহু মনীষী। তাই তাঁরা অর্থনীতিকে 'শয়তানের শাস্ত্র' (science of the devil) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অর্থনীতির প্রভাব এড়িয়ে যাবে কে? প্রত্যেকের জীবনমূলে নাড়া দিয়ে অর্থনীতি আপন আসন পাকা করেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র

Political Science and Ethics

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্র পাশাপাশি পথ চলে। একে অপরের সহায়তা লাভ করে বিকশিত হয়েছে।

(এক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র উভয়েরই উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন। নীতিশাস্ত্র চিন্তার বিশুদ্ধি ও আচরণের পবিত্রতা বিশ্লেষণ করে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবল বাহ্যিক আচরণের বিচার করে। ফলে উভয়ে নৈতিকতার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।

(দুই) নীতিশাস্ত্র বিরাট পরিধিসম্পন্ন এবং ব্যাপকতর প্রয়োগক্ষেত্রবিশিষ্ট। চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে, ব্যবহারিক জীবনে এবং নব নব নীতি প্রণয়নে নীতিশাস্ত্র উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরূপ। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু বাহ্যিক ও ব্যবহারিক জীবনে কর্ম ও নীতি গ্রহণে নৈতিকতার আস্বাদ পায়।

(তিন) নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর এক ক্ষেত্রে সমদর্শী এবং একে অপরের পরিপূরক। কোন নৈতিক আদর্শ সর্বজন স্বীকৃত হলে তা রাষ্ট্রীয় আইনে রূপ লাভ করে। আবার কোন রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন প্রচলিত নৈতিকতার মাপকাঠিতে না টিকলে তা কোনদিন কার্যকর হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের সারদা আইনের (The Sarda Act, 1928) কথা উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের মদ্যপান নিবারণ আইনও (Prohibition Act of the U.S.A.) উল্লেখ করা যেতে পারে। সমকালীন নৈতিক বোধ দ্বারা সমর্থিত হয় নি বলে এই আইনগুলো অচল হয়ে পড়েছিল।

(চার) এও স্পষ্ট করে জানা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের কাজ-কর্মের অধিকাংশই নীতি নিরপেক্ষ (Non-moral)। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, মিউনিসিপ্যাল আইন-রাস্তার বামে চলার পদ্ধতি- নীতিশাস্ত্রের সাথে সম্পর্কহীন, যদিও তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত।

(পাঁচ) আদিকাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের যোগসূত্র স্থাপন করার প্রচেষ্টা চলে এসেছে। এরিস্টটল নৈতিকতার মাপকাঠি দিয়েই রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের দোষ-গুণ বিচার করেছেন। প্রখ্যাত লেখক বোঁদা ((Bodin), ইতালির মেকিয়েভেলীর (Machiavelli) নীতি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতির তীব্র নিন্দা করেন। নীতিশাস্ত্র অনুমোদন করে না, এমন পন্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা উচিত নয়। ইংল্যাণ্ডের এডমাণ্ড বার্ক (Edmund Burke) চেয়েছিলেন, নীতিশাস্ত্রের বৃহত্তম অংশ রাষ্ট্রনীতিতে প্রযুক্ত হয়ে রাজনীতিকে উজ্জ্বল করে তুলুক। ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) বলেছেন, "সরকার কী করছে তা অপেক্ষা সরকারের কী কর্তব্য তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত।"

(ছয়) ধীরে ধীরে এ বিষয়ে চিন্তার দিগন্ত আরও প্রসারিত হওয়া উচিত, নতুবা আন্তর্জাতিকতার যুগে এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের সময় রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুলের জন্য পৃথিবীর জনসাধারণকে সীমাহীন মাসুল দিতে হবে। তাই বিশ্বমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং সার্বজনীন কল্যাণ সামনে রেখে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নীতিশাস্ত্রের তালে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

মূলকথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে এমন মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান যে, যা নৈতিকতার মানদণ্ডে সমর্থিত হয় না তা রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ববিদ্যা

Political Science and Anthropology

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ববিদ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নৃতত্ত্ববিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গভীরতা এনেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করেছে।

(এক) নৃতত্ত্ববিদ্যা লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সমাজ ও আদিম সভ্যতাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে সমাজের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণত সেই সব সমাজের কথা আলোচনা করে, যাদের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক জীবন আছে এবং যারা সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সাধারণভাবে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

(দুই) সমাজ ও সভ্যতা বিবর্তনমূলক পথে অগ্রসর হয়ে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানকে ভাল করে বুঝতে হলে প্রাচীনতার যাদুঘরে একবার উঁকি দেয়া প্রয়োজন। পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠু আলোচনা করতে হলে পরিবার কোন্ সময় পিতৃতান্ত্রিক ও কোন্ সময়ে মাতৃতান্ত্রিক ছিল তা জানতে হবে। যুগ্ম পরিবার প্রথা কিভাবে রহিত হয়ে একক পরিবার প্রথা প্রবর্তিত হচ্ছে তাও লক্ষণীয়। আদিম সমাজের গঠন-প্রণালী এবং বিধি-নিষেধ কেমন ধরনের ছিল নৃতত্ত্ববিদ্যা তার উপর আলোকপাত করে বর্তমান সমাজের অনেক সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করেছে। রাষ্ট্র প্রথমে কীভাবে উদ্ভুত হলো, জনসাধারণের নিকট প্রথমে কোন আলোকে রাষ্ট্র অনুভূত হলো, আইনের প্রয়োজন এবং আইনের বিভিন্নরূপ প্রথমে কীভাবে উদ্ভাসিত হলো এ সব ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকর্মী এবং সহধর্মী। নৃতত্ত্বের অনুসন্ধানকারী স্যাভিগ্নী (Savigny), হেনরী মেইন (Henry Maine), এডওয়ার্ড জেমস্ (Edward James), মরগ্যান (Morgan) প্রমুখ চিন্তানায়ক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে নতুন নতুন সত্য উদ্‌ঘাটন করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

তবে এ ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য যে, নৃতত্ত্ববিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতা ও বিষয়বস্তু এক নয়। নৃতত্ত্বে প্রাচীনকালের বিভিন্ন দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য বর্তমান ব্যবস্থার রূপরেখা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল
Political Science and Geography

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ভূগোলের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক ভূখণ্ডে। সেই ভূখণ্ড রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

(এক) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ভূ-প্রকৃতির সুসম্বদ্ধ অধ্যয়নই ভূগোল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে ভূগোলের সম্বন্ধ অনস্বীকার্য, কারণ রাষ্ট্র গড়ে উঠে ভূমির উপর, আকাশে বা বাতাসে নয়। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে জমির উর্বরতা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির উপর। নাগরিকগণের চরিত্র গঠনেও পাহাড়, সমুদ্র, নদী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যথেষ্ট সাহায্য করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ ভূগোলের আলোকে হলে সুবিধা হয়।

(দুই) ভূগোলের প্রাকৃতিক বা ভৌতিক অংশ আবহাওয়া, জোয়ার-ভাটা, ভূমির অবস্থান, নদী-পর্বতের অবস্থিতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং এ অংশের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ভূগোলের সামাজিক অংশ আর্থিক সম্পদ, নগরের উৎপত্তির কারণ, রাষ্ট্রের আয়তন, কৃষি ও খনিজ সম্পদ আলোচনা করে। এর সাথে রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল ও সমৃদ্ধির কথা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

(তিন) রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করতে হলে রাজধানী কোথায় থাকা উচিত, প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্র রাষ্ট্রের কোথায় কোথায় স্থাপিত হওয়া দরকার, নদী বা সমুদ্রের প্রভাবকে জাতীয় সমৃদ্ধির পথে কীভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন ইত্যাদির যথাযথ উত্তর পেতে হলে ভূগোলের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(চার) বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত রাষ্ট্রের উপর ভৌগোলিক প্রভাব সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছেন। তারা বলতেন, 'গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শাসনতন্ত্র স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল হতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জনসাধারণ অলস ও অকর্মণ্য হয়। শীতপ্রধান দেশের জনগণ কর্মঠ হয়। অত্যধিক শীতের দেশের লোকেরা অত্যাচারী হয়।' অবশ্য আজকাল এসব মন্তব্য নির্বিবাদে মেনে নেয়া যায় না। বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতাবলে প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হয়ে তাকে মানব

কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু এও লক্ষণীয় যে, অতীতকাল থেকে রাষ্ট্রের উপর ভূগোলের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। এরিস্টটলের মত বিজ্ঞজনও বিশ্বাস করতেন এবং সে বিশ্বাস বলেই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, গ্রীক সভ্যতাই সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ, উত্তর ইউরোপের লোকেরা বুদ্ধি ও চতুরতায় হীন হতে বাধ্য, যদিও শৌর্যেবীর্যে তারা অতুলনীয় এবং এশিয়ার লোকেরা তুলনামূলকভাবে হীন মনোবলসম্পন্ন ও ভীরু, যদিও বুদ্ধিবৃত্তিতে তারা হীন নয়। সাম্প্রতিককালেও জার্মানীর হিটলার ভূগোলের দোহাই দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়েছিলেন নরডিক (Nordic) বা আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান
Political Science and Psychology

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান এক ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ।

(এক) প্রায় একশো বছর পূর্বে পণ্ডিত বেজহট (Bagehot) কর্তৃক লিখিত (Physics and Politics) বইখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্থাপনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallace) *Human Nature in Politics* গ্রন্থ লিখে প্রবল এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। লেবঁ (Leibniz), ম্যাকডুগাল (Macdougal) এবং লাসওয়েলও (Lasswell) এই পথের দিশারী। লাসওয়েল তাঁর *Politics—Who Gets What, When, How* গ্রন্থে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনৈতিক অনেক তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা যেভাবে দিয়েছেন, তাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজকাল এটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, রাজনীতি কেবল বিচারবুদ্ধি প্রসূত নয়। অবচেতন মনের এবং সহজাত সংস্কারের প্রভাব রাজনীতির উপর গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ, বিপ্লব ও একনায়কত্বের অনেক প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত পথে সমাধান করা সম্ভবপর।

(দুই) লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) সত্যই বলেছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল কথা মনোবিজ্ঞানের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে।" রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যাই হলো ক্ষমতা, ক্ষমতার ব্যবহার ও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব। এ সব প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানীরা সুন্দরভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন। লোক কেন ক্ষমতা চায়, কতটুকু ক্ষমতা চায়, ক্ষমতার ব্যবহার কীভাবে হওয়া উচিত এবং কাদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হলে তার অপব্যবহার হবে না— এসব প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ করতে হবে।

(তিন) তাছাড়া, গণতন্ত্রের যুগে কীভাবে জনমত গঠিত হয়, ব্যষ্টি মন সমষ্টি মনে কীভাবে রূপলাভ করে, তা উক্ত আলোকে লক্ষ্য করাই শ্রেয়। বিপ্লব এলে কিভাবে জনমত সাড়া দেয়, কেন দেয়– কী করলে তা প্রতিহত করা যায় তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানীদের নিকট থেকে শিখতে পারবেন।

(চার) অন্যদিকে, রাষ্ট্র মানবমনকে রাষ্ট্রীয় নীতি, কানুন ও কর্মের দ্বারাই প্রভাবিত করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে কিভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলীর দ্বারা মানবমনকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেকে সমাজকেন্দ্রিক করা হচ্ছে তা লক্ষনীয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লেবঁ বলেন, "মানব মনকে জেনেই রাষ্ট্রকে জানতে হবে।" একনায়কতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে জনমনকে নেতার পেছনে টেনে আনা হয়। জার্মানীর হিটলার, ইতালির মুসোলিনীর কর্মপন্থা মনোবিজ্ঞানীর ঢালাই করা ছাঁচে প্রবর্তিত হয়েছিল। অতীতেও এমন ধরনের শিক্ষাদান প্লেটোর 'রিপাবলিক' (Republic) এবং রুশোর 'সোস্যাল কনট্রাক্ট' (Social Contract) প্রভৃতিতে দেখা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের রসে জারিত না হলে জনমনকে রাষ্ট্রীয় কর্মে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভবপর হবে কেন?

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন
Political Science and Philosophy

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন গভীরভাবে সম্পর্কিত। উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে গভীর নিবিড় এক সম্পর্ক।

(এক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পূর্বে "রাষ্ট্রীয় দর্শন" বলা হত। রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্বন্ধ কীরূপ, রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির কী সম্পর্ক, রাষ্ট্রের স্বরূপই বা কী, তার সম্পর্কের সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ব্যক্তিজীবনে কতটুকু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাব শুভ ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনিকের মতবাদ ও ভাবধারা অনুসরণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

(দুই) যুগে যুগে বহু দার্শনিক ও চিন্তাবিদের চিন্তার ফসলে বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একান্তভাবে দার্শনিকগণের সুচিন্তিত অভিমত এবং চিন্তাধারার ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে। গণতন্ত্রই বলা যাক অথবা রাষ্ট্রীয় কর্মের সীমারেখাই ধরা যাক–প্রত্যেক ক্ষেত্রে দার্শনিক মতবাদ এদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। আজকের সমাজতন্ত্রের গোড়ায় রয়েছে কার্ল মার্কসের (Karl Marx) মতবাদ। গণতন্ত্রের রূপ বিভিন্ন মনীষীর চিন্তার ফলে বহুযুগ পার হয়ে বর্তমানের স্বরূপে বিবর্তিত হয়েছে। জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) মতবাদকে ভিত্তি করে আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে। সর্বগ্রাসী ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন এ ধরনের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে স্বার্থান্বেষীরা স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

(তিন) প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্ব সর্বযুগের জন্য মহামূল্যবান। মূলত দার্শনিক হয়েও তিনি রাষ্ট্র সম্পর্কে বিপ্লবাত্মক তথ্য দিয়েছেন। বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও বলেছেন, 'মহামতি প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' (Republic) গ্রন্থে সর্বাত্মক রাষ্ট্র ও উন্নত সমাজের যে রূপরেখা দিয়েছেন তা আজও অভিনব এবং অনবদ্য।"

(চার) তাছাড়া, আইন–কানুনের, সংবিধানের এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দার্শনিক মতবাদ বা চিন্তাধারা আইন, সংবিধান বা নীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে। জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সেগুলো গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োজিত হতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্র
Political Science and Jurisprudence

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আইনশাস্ত্র পরস্পরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।

(এক) অতি পুরাকাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যবহারশাস্ত্র বা আইনবিদ্যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রাষ্ট্র কর্তৃক আইন তৈরি হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিয়ম–কানুনসমূহ অনুমোদিত হয়। আবার পরিবর্তন বা সংশোধন অথবা কোন আইনের রহিতকরণ রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভবপর। প্রয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শক্তিই এর একমাত্র ধারক বা বাহক।

(দুই) আইন বা সংবিধান ব্যতীত কোন সংস্থা বা রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। আইনহীন রাষ্ট্র ঠিক তেমনি দীঘির সাথে তুলনীয় যেখানে বৃহৎ মৎস্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যশিশুদের ভক্ষণ করছে। তাছাড়া, আইনের উৎস হলো সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। কোন্ দেশে কেমন ধরনের আইন প্রয়োজন তা নির্ধারিত হয় প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পার্থক্যের সাথে আইন–কানুনও ভিন্ন হতে বাধ্য। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আইনসমূহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।

(তিন) রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকটা আদর্শভিত্তিক। বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত না থেকে ভবিষ্যতের দিকে কিছু কিছু ভাবনা এর রয়েছে। কিন্তু আইনশাস্ত্র নিত্য বর্তমানের। আইন আদেশ করে, নিষেধ করে এবং দয়াহীনভাবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে।
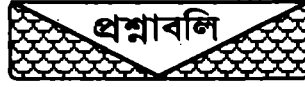
১। ইতিহাস ও অর্থনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচনা কর। (Discuss the relation of political science with history and economics.)

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ কী তা আলোচনা কর। (Discuss the relationship of political science to sociology.)

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং রাজনীতি ও ইতিহাসের সাথে এর সম্বন্ধ কী দেখাও। (Discuss the nature and scope of political science and show its relation to history and politics.) [D. U. 1984]

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্রের সম্বন্ধ কী তা আলোচনা কর। (Discuss the relation of political science with history and ethics.)

৫। "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল মনোবিজ্ঞানে নিহিত রয়েছে"—এই তথ্য ব্যাখ্যা কর ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় কর। ("Political science is essentially psychological"— Discuss and state the relation between political science and psychology.)

৬। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখার মধ্যে নেই"—এই সম্বন্ধে তোমার মত কী? যুক্তি দাও। ("No social science is more closely related to political science than economics"—Do you agree? Give reasons.)

৭। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কী সম্বন্ধ তা দেখাও। (Point out the relationship of political science to sociology and history.)

৮। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শনের সাথে কীভাবে সংযুক্ত আলোচনা কর। (Discuss how political science is related to history, economics and philosophy.)

৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সাথে কীভাবে সম্বন্ধযুক্ত? (How political science is related to sociology and ethics?)

১০। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের কী সম্বন্ধ? (How is political science related to sociology and economics?) [R. U. 1982]

১১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের কী সম্বন্ধ? (How is political science related to sociology?) [D. U. 1986]

১২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the relationship of political science and economics.) [D. U. 1989]

রাষ্ট্রতত্ত্ব ঃ আদর্শবাদী, প্রায়োগিক, আচরণবাদ

POLITICAL THEORY : NORMATIVE, EMPIRICAL, BEHAVIORAL
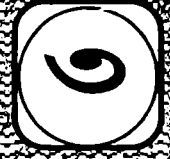
সূচনা
Introduction

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যকলাপ ও সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করে। এর এক অংশে আলোচিত হয় রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory) । অন্য অংশে আলোচিত হয় রাজনৈতিক সংগঠন (Political Organization) এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া (Political Process)। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারা রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে আলোচিত হয় সমাজজীবনের আদর্শ ও রাষ্ট্রের নীতি। রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রতত্ত্বের সম্যক জ্ঞানলাভ করা প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য। রাষ্ট্রতত্ত্ব সংগঠনের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু পরোক্ষভাবেও তা সংগঠনের সাথে সংযুক্ত, কেননা, কোন কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হলে যথোপযুক্ত সংগঠন তৈরি করতে হবে।

রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রকৃতি
Nature of Political Theory

রাষ্ট্রতত্ত্বের (Political Theory) প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে এর শ্রেণীবিভাগ করতে হবে। রাষ্ট্রতত্ত্ব দু' প্রকারের হতে পারে; যথা—আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব (Normative Political Theory) ও প্রায়োগিক বা বাস্তববাদী তত্ত্ব (Empirical Political Theory)। রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory) আবার রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ বা রাষ্ট্রচিন্তা (Political Thought) হতেও স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের আচরণবাদের (Behavioralism) এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করা হলো।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
Political Science

রাষ্ট্রের কার্যক্রম, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সুসংবদ্ধ অধ্যয়নকে সংক্ষেপে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয়। কোন বিষয়ের সুসংবদ্ধ ও অধ্যাপনাযোগ্য জ্ঞানকে সাধারণভাবে বিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ, অনুমান ও অনুমিত বিষয়ের সত্যতা যাচাই-এর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলতে কোন বাধা নেই। এই শাস্ত্রে রাষ্ট্রের কার্যধারা বিশ্লেষণ করা হয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সঠিক কার্যক্রমের স্বরূপ নির্ধারণ করা হয় এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংগঠনগুলোর দোষ-ত্রুটি বা উৎকর্ষতা তুলে ধরা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে কী-না তা বিশ্লেষণ করার পূর্বে যে দেশে গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়, যে সকল কারণ তার মূলে কাজ করে তা চিহ্নিত করা হয় এবং সার্বিকভাবে তা দেখা হয়, তারপর মন্তব্য করা হয়। এ

দিক দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত, তবে তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত তেমন উন্নত এখনও হয় নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গৃহীত বহু রাষ্টতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব (Theory) যেমন তার বিষয়বস্তুর মধ্যে এক সুসমন্বিত ঐক্যসূত্র সৃষ্টি করেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও রাষ্ট্রতত্ত্ব তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাষ্ট্রের আদর্শ, শাসন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে নতুন নতুন সত্যের জন্ম দিয়াছে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে উর্বর করেছে।

রাষ্ট্রতত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা, রাষ্ট্রীয় দর্শন এবং রাজনৈতিক আদর্শ

এ প্রসংগে কয়েকটা প্রত্যয়ের (Concept) সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন, যদিও এ সকল ক্ষেত্রে অনেক মতবিরোধ বিদ্যমান। রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory) বলতে আমরা বুঝি "সামঞ্জস্যপূর্ণ এক নীতিমালা যার ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সংগত করে তোলে" (A body of principles on which it operates and a body of normative beliefs to justify it")।[১] উদাহরণস্বরূপ, বৃটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতি রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি উদাহরণ। রাষ্ট্রচিন্তা (Political Thought) বলতে বুঝি যে কোন কালের বা যুগের রাজনৈতিক ধারণার সমষ্টি। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী চার্চের প্রভাব রাষ্ট্রচিন্তার একটি নমুনা। রাষ্ট্রীয় দর্শন (Political Philosophy) বলতে বুঝি রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ, যা আদর্শ রাষ্ট্রতত্ত্বকে গভীরতা দান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল নিহিত রয়েছে মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনে। অন্যদিকে রাজনৈতিক আদর্শ (Political ideology) হলো এমন এক ধরনের রাজনৈতিক বিশ্বাস যা কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সরকারিভাবে প্রচার ও প্রকাশ করে এবং যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিক ও অন্যান্যের স্থান নির্দিষ্ট হয়। সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই আদর্শ ছিল মার্কসবাদ–লেনিনবাদ।

রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ বা রাষ্ট্রচিন্তা
Political Thought

রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সত্যের সন্ধান দেয়, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ বা রাষ্ট্রচিন্তা (Political Thought) কোন বিশিষ্ট যুগের বা কালের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটায়। মানুষের জীবন বরাবরই সুসংবদ্ধ। তাই দেখা যায়, সর্বকালে সর্বযুগে মানুষের ইতিহাসে কোন না কোন প্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন বিদ্যমান রয়েছে। সাংগঠনিক পর্যায়ে সকলে এক নীতিমালা বা নিয়মরাজি মেনে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ঐ নীতিমালা ও নিয়ম–কানুন বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবহারকে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। ফলে রাষ্ট্রচিন্তার (Political Thought) জন্ম হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতবাদের জন্ম হয়েছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মূল্যায়ন প্রসংগে। কোন কোন লেখক নতুন কর্তৃত্ব ব্যবস্থার কল্পনা করেছেন, যেমন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। আবার কেউ কেউ কর্তৃত্ব ব্যবস্থার সার্বিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন, যেমন—ইতালির রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ মেকিয়েভেলী।

রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রচিন্তা
Political Theory and Political Thought

সাধারণভাবে রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory) ও রাষ্ট্রচিন্তা (Political Thought) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।

---

১. Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory,* New York : 1960, P. 11.

প্রথম, রাষ্ট্রতত্ত্ব কোন চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক ধারণা, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তা সমগ্র কালব্যাপী রাজনৈতিক ধারণার সমষ্টি। সেন্ট অগাস্টিনের বক্তব্য- রাষ্ট্র মানুষের পাপের ফলস্বরূপ—রাষ্ট্রতত্ত্বের এক উদাহরণ, কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী চার্চের গভীর প্রভাবের কথা রাষ্ট্রচিন্তার উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে আর্নেস্ট বার্কারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "রাষ্টতত্ত্ব হচ্ছে বিশিষ্ট কোন চিন্তাবিদের ধ্যান-ধারণা। সে ধ্যান-ধারণা বাস্তব ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। রাষ্ট্রচিন্তা কিন্তু একটি সমগ্র যুগের অন্তর্নিহিত দর্শনস্বরূপ" ("Political theory is the speculation of particular thinkers which may be remote from the actual facts of the time. Political thought is the immanent philosophy of the whole age")।

দ্বিতীয়, রাষ্ট্রতত্ত্ব তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তা অধিকতর ব্যাপক। রাষ্ট্রতত্ত্বে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তায় প্রতিফলিত হয় সমগ্র যুগের বা কালের চিন্তাধারার সমষ্টি।

তৃতীয়, রাষ্ট্রতত্ত্ব অনেকটা সর্বজনীন এই অর্থে যে, এককালের রাষ্টতত্ত্ব অন্য যুগেও প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তা বিশিষ্ট যুগের এবং কালের সম্পদ। অন্য যুগে তা প্রায়ই অচল।

চতুর্থ, রাষ্ট্রতত্ত্ব বাহ্যিক রাজনৈতিক অবস্থার ফলশ্রুতিস্বরূপ। এতে বাস্তব রাজনৈতিক অগ্রগতির চিন্তাভাবনা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠনের রূপরেখা ও উদ্দেশ্য এতে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। ফলে সমাজে পরিবর্তনের গতিধারা নির্ধারিত হয়। রাষ্টতত্ত্ব কখনও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পূর্বে আবার কখনও তা পরে জন্মলাভ করে। ফলে তা কোন সময় কারণ ও কোন সময় ফলাফল হিসেবে (cause and effect) চিহ্নিত হয়। পরিবর্তিত অবস্থা আবার নতুন তত্ত্বের জন্ম দেয় ও নতুন তত্ত্ব বাস্তব ঘটনারাজিকে প্রভাবিত করে।

সর্বশেষে, এও উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রতত্ত্ব শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও তা কাজ-কারবার করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রচিন্তা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, এমন কী সাহিত্য ও ঐতিহ্য সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। অধ্যাপক গেটেলের মতে, "রাষ্ট্রচিন্তা কোন যুগের উন্নত বুদ্ধিমত্তা ও দার্শনিক চিন্তাসূত্রের প্রতিফলন ঘটায়" ("Political thought represents a high type of intellectual achievement")। তা বাস্তব অবস্থার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন না করলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের এবং গভীরতার জন্যও মহামূল্যবান।

আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব (Normative Political Theory) ঃ রাষ্ট্রতত্ত্ব দু প্রকারের হতে পারে ঃ আদর্শবাদী ও প্রায়োগিক বা পরীক্ষালব্ধ রাষ্ট্রতত্ত্ব। আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বে (Normative Political Theory) মূলত আদর্শ বা রাজনৈতিক আচরণের সঠিক বিধি-বিধান ও উন্নত মানের উপর জোর দেয়া হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব। মানুষ কীভাবে রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করবে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত, রাষ্ট্রনায়কের কোন্ কোন্ গুণ থাকা প্রয়োজন, কোন্ কোন্ গুণে নাগরিকদের ভূষিত হওয়া প্রয়োজন, কীভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করা উচিত, কোন্ পদ্ধতিতে নাগরিকগণ তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে ইত্যাদি প্রশ্ন আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রধান উপজীব্য। সমাজে ন্যায়নীতি, সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সম্পর্কে যে সব আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্থান পেয়েছে তাই আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথা। অতীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌল আলোচনার ক্ষেত্র ছিল আদর্শবাদী তত্ত্ব। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রতত্ত্ব, এরিস্টটলের বাস্তব রাষ্ট্রের আলেখ্য, সেণ্ট টমাস একুনাসের আইনতত্ত্ব-সব কিছুই এর আওতাভুক্ত। অনেকের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ অংশ রাষ্ট্রীয় দর্শন (Political Philosophy) নামেও পরিচিত।

আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের অবাস্তব দিকের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানও মাঝে মাঝে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। অনেক সময় বলা হয়েছে, কী হওয়া উচিত অপেক্ষা কী হচ্ছে এবং কেমনভাবে বা কেন হচ্ছে তাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে প্রায়োগিক বা পরীক্ষালব্ধ রাষ্ট্রতত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রায়োগিক বা পরীক্ষালব্ধ রাষ্ট্রতত্ত্ব (Empirical Political Theory) ঃ প্রায়োগিক বা পরীক্ষালব্ধ রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Empirical theory refers to a reliance upon experience, observation and experiment.)। এ ধরনের রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌল বিষয়বস্তু হচ্ছে বাস্তব ঘটনা ও পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়, কোন কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। প্রায়োগিক রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্গত **প্রথম,** পর্যবেক্ষণ; **দ্বিতীয়,** তা থেকে সাধারণত সূত্র আবিষ্কার ও **সর্বশেষ,** সে সূত্র দ্বারা বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যা দান। উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রসমূহে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রভাব সাধারণত অনেক বেশি— এ তত্ত্ব প্রায়োগিক রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের তত্ত্ব গঠনের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ **(এক)** সমস্যা নির্বাচন, **(দুই)** পর্যবেক্ষণ, **(তিন)** সাধারণ সূত্র উদ্ভাবন ও **(চার)** সাধারণ সূত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগ। এ সকল পর্যায় পরস্পরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

আচরণবাদ
Behavioralism

আচরণবাদ বা বিহেভিওরালিজমের (Behavioralism) জনপ্রিয়তা সাম্প্রতিককালের এক উল্লেখযোগ্য দিক। জে. বি. ওয়াটসনের (J. B. Watson) নামের সাথে আচরণবাদের প্রয়োগ জড়িয়ে রয়েছে। তিনি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা ধারণাভিত্তিক সব আধ্যাত্মীয় উপাত্তকে (subjective data) দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আচরণবাদের বহুল প্রচার করেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় উপাত্ত (data) হবে শুধু ঐসব বিষয় যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য।

আচরণবাদের সংজ্ঞা (Definition) ঃ পরীক্ষালব্ধ ও প্রয়োগযোগ্য তত্ত্ব উদ্ভাবন, রীতিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ও তাদের সত্যাসত্য যাচাই-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যক্রমের সুসমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুসন্ধানই হলো আচরণবাদ ("Behavioralism can be defined as the systematic search for political patterns through the formulation of empirical theory and the technical analysis and verfication thereof")। আচরণবাদে দুটি বিষয়ের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন ধারণা ও অনুমিত সত্য (hypothesis) উদ্ভাবন ও তাদের ব্যাখ্যা এবং অন্যটি গবেষণা ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ ও প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি (empirical methods of research)। আচরণবাদী বিজ্ঞানের মৌল বিষয় হচ্ছে, "আচরণের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে কোন অনুমানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা।"

ডেভিড ইস্টনের (David Easton) মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণবাদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণের দ্বারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে ঃ

(১) একরূপতা (Regularities) ঃ রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে নিহিত একরূপতাকে সাধারণ সূত্ররূপে প্রকাশ করা।

(২) যাচাই বা প্রতিপাদন (Verification) ঃ রাজনৈতিক কার্যকলাপের ও আচরণের একরূপতা সম্পর্কিত সূত্রের সত্যাসত্য যাচাই করা।

(৩) প্রণালী (Techniques) ঃ রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও আচরণ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী বা পদ্ধতি অনুসরণ করা।

(৪) সংখ্যাভিত্তিক পরিমাপযোগ্যতা (Quantification) ঃ উপাত্ত লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য এককের প্রয়োগ করা।

(৫) মূল্যবোধ (Values) ঃ কোন তথ্য বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে নীতি বা আদর্শকে স্বতন্ত্র রাখা।

(৬) সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা (Systematization) ঃ সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করা।

(৭) খাঁটি বিজ্ঞান (Pure Science) ঃ আচরণবাদে তত্ত্ব গঠন ও ব্যাখ্যাদানই অধিকতর কাম্য, সমস্যা সমাধান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(৮) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ (Linkages) ঃ আচরণবাদে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং আন্তঃবিষয় প্রক্রিয়া (multidisciplinary) প্রয়োগ করা।

রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রকৃতি
Nature of Political Theory

রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

(এক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি গুরু এরিস্টটল সত্যই বলেছেন, 'মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব এবং যে লোক সমাজের সভ্য নয় সে হয় দেবতা, না হয় পশু।" মানুষের এই সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাবোধ থেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বশক্তিমান।

মানুষের জীবন বরাবরই সংঘবদ্ধ। এজন্য দেখা যায়, সর্বকালে, সর্বযুগে মানুষের ইতিহাসে ছিল এক প্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন। সুদূর অতীতেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সাংগঠনিক পর্যায়ে সকলে এক নীতিমালা বা আদর্শ মেনে চলেছে। সব যুগেই কিছু কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা হতো। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ঐ সকল নিয়ম-কানুন ও নীতির মূল্যায়ন বিভিন্নভাবে হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির দোষ- গুণ সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতবাদ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির সমাধান সম্পর্কেও বিভিন্ন মতবাদ উপস্থাপিত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, **রাষ্ট্রের আদর্শ, শাসন পদ্ধতি, আইনের উন্নতি সাধনকল্পে সে সকল মতবাদ রয়েছে তাকে রাষ্ট্রতত্ত্ব বলা হয়।**

(দুই) খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে গ্রীকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ও সুসংহতরূপে রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের ধ্যান-ধারণা আজও মহামূল্যবান। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আমল থেকেই রাষ্ট্রতত্ত্ব সুবিন্যস্তরূপে গড়ে ওঠে। প্রথমে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রথা, রীতি-নীতি, অভ্যাস, বিশ্বাস প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষা বিস্তারের ফলে ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় যুক্তিবাদের আবির্ভাব ঘটে। প্রাচীন প্রথা, রীতি-নীতি ও অভ্যাসগুলোর যৌক্তিকতা প্রমাণিত হতে লাগলো যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে, শাসনের আইনগত ভিত্তি রচিত হলো এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য নতুন নতুন মতবাদ উপস্থাপিত হতে লাগল। অন্ধবিশ্বাসের পর্যায় অতিক্রম করে যখন থেকে রাজনৈতিক চিন্তাধারা যুক্তিবাদের পর্যায়ে উপনীত হলো, তখন থেকে রাষ্ট্রতত্ত্বে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা শুরু হয়।

(তিন) রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমকালীন শাসন কর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করতে বা সমর্থন জানাতে অধিকাংশ রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভব হয়। কোন কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব সমকালীন শাসন ব্যবস্থার বিকল্পস্বরূপ। টমাস হব্সের চিন্তাধারা তদানীন্তন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে। জন লকের রাষ্ট্রতত্ত্ব ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবকে কেন্দ্র করেই জন্মলাভ করে। তাই অধ্যাপক **লাস্কি** (Laski) সত্যই বলেছেন ঃ "কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব সমসাময়িক অবস্থার প্রেক্ষিত ছাড়া কখনও বোধগম্য হয় না" ("No theory of the state is ever intelligible save

in the context of its time")। হব্‌স, লক ও রুশোর চুক্তিবাদ বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পরি, সে মতবাদ তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য তারও কারণ নিহিত রয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার বিভিন্নতার মধ্যে। ইতালির চিন্তানায়ক মেকিয়েভেলীর মতবাদের ভিত্তিমূল তৎকালীন ইতালীর রাজনৈতিক অবস্থা। খণ্ডছিন্ন অসহায় ইতালির রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেকিয়েভেলী তাঁর মতবাদ গড়ে তোলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী এক শাসনের মাধ্যমে ইতালিতে ঐক্য স্থাপন করা। সুতরাং দেখা যায়, প্রায় সব রাষ্ট্রতত্ত্বই গড়ে উঠেছে হয় প্রচলিত কোন কর্তৃত্ব বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে, না হয় অন্য কোন উচ্চ আদর্শের মানদণ্ডে তাদের উন্নততর করার প্রচেষ্টায় অথবা নতুন ব্যবস্থা দানের স্পৃহা থেকে। তাই বলা হয়, "রাষ্ট্রতত্ত্ব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাপক, সুসংহত এবং সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র" ("Political theory is an attempt to arrive at a comprehensive, coherent and general account of political phenomena")।

(চার) অবশ্য এও সত্য, কোন দার্শনিক বা রাজনৈতিক চিন্তাবিদ আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন বা কল্পলোকে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার এক অতীব রঙিন চিত্র অঙ্কন করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এ চিত্র অত্যন্ত আদর্শবাদী ও অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু সঠিকভাবে অনুধাবন করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সে চিত্রের পারিপার্শ্বিকতা সমকালীন চিন্তাদর্শ এবং অবস্থা থেকে গৃহীত। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যে ছবি অঙ্কন করা হয়েছে, তা গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর পতনের যুগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। মার্কসের 'রাষ্ট্রহীন' অবস্থার চিত্র ধনিকতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে অত্যাচারের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবনযোগ্য।

(পাঁচ) রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে জন্মলাভ করে। রাষ্ট্রতত্ত্বে সে যুগের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়। এতে তৎকালীন চিন্তাধারাও প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। বর্তমান রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তার প্রভাবে তা দূরীভূত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রতত্ত্ব কোন কোন সময় প্রচলিত রাজনৈতিক সংগঠনের অনুসরণ করে, কোন কোন সময় তা প্রভাবিত করে। আবার কোন কোন সময় রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রচলিত ব্যবস্থার মহিমাই কীর্তন করে। সুতরাং রাষ্ট্রতত্ত্ব একাধারে কারণ ও ফলাফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রুশোর মতবাদ ফরাসী বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করে, কিন্তু গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল হিসেবে লকের চিন্তাধারাকে গণ্য করা যেতে পারে।

(ছয়) রাষ্ট্রতত্ত্বের সাথে কেবল যে সমকালীন রাজনৈতিক সংগঠনের সংযোগ থাকে তা নয়। অন্যান্য চিন্তাধারার সাথেও তা সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক সংগঠনের বিবর্তনের ন্যায় রাষ্ট্রতত্ত্বেও এক ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন ও অর্থনীতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ইতিহাসের গতিধারার সাথে রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিবর্তিত হয়। সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের অগ্রগতির সাথে রাষ্ট্রচিন্তা দোল খেতে থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় সংগঠনও পরিবর্ধিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রতত্ত্ব এককভাবে বৃদ্ধি লাভ করে না। রাষ্ট্রতত্ত্ব বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে বিভিন্ন পর্যায়ে উৎক্ষিপ্ত হয় ও বিবর্তন ধারায় প্রবাহিত হয়। বিজ্ঞান, কৃষ্টি, ধর্ম, সাহিত্য, ঐতিহ্য, এমনকি প্রথা ও কুসংস্কারও রাষ্ট্রীয় মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। তাই রাষ্ট্রতত্ত্বের বিবর্তন ধারা সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে বিভিন্ন যুগের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা যথেষ্ট নয়। এর সাথে তৎকালীন সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রথা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ধর্ম-ভাবের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করতে হবে।

(সাত) রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বশেষে এও বলা প্রয়োজন, কোন মতবাদ সর্বকালের বা সর্বদেশের জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। রাষ্ট্রচিন্তায় চূড়ান্ত কোন কিছু নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা খুব কম ক্ষেত্রেই একমত হতে পারেন। সমস্যা ও পরিবেশের বিভিন্নতায় মতপার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। এর কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল ((dynamic) বিজ্ঞান। প্রতিক্ষণে প্রতি পলে এর বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সুতরাং গতিশীল এ শাস্ত্রে কোন স্থিতিশীল (Static) সিদ্ধান্ত আশা করা যায় না। তাই দেখি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে, সার্বভৌমিকতার প্রশ্নে, রাষ্ট্রের কার্যাবলির ব্যাপারে, গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দুজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একমত নন। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যায় বিভিন্ন মতাবলম্বনের ফলে সমস্যাগুলোর গুরুত্ব হ্রাস পায় না। বরং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। হেনরী সিজউইকের (Henry Sidgwick) একটি বক্তব্য পেশ করে আমরা এই আলোচনা শেষ করতে চাই। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রতত্ত্বের লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় প্রশ্নগুলোর যুক্তিপূর্ণ সমাধান আনয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কলাকৌশল উপস্থাপন করা নয়, বরং যে সব চিন্তা ও যুক্তির সাথে আমরা পরিচিত সেগুলোকে সুচিন্তিত উপায়ে সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে পরিবেশন করা।"

রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্ক
Relation between Political Theory and Political Conditions

রাষ্ট্রতত্ত্ব রাজনৈতিক অবস্থারই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ যা ভাবেন, তাই সুবিন্যস্ত হয়ে রাষ্ট্রতত্ত্বে রূপলাভ করে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব সময়ের প্রেক্ষিত ব্যতীত বোধগম্য হয় না" (No political theory is ever intelligible save in the context of its time")। মেকিয়েভেলীর রাষ্ট্রচিন্তা তৎকালীন ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। হব্‌সের চুক্তিবাদ তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে উদ্ভূত হয়। রুশো, হেগেল, গ্রীন, মার্কসের চিন্তাধারাও অনুরূপভাবে প্রচলিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বোধগম্য হয়।

মেকিয়েভেলী (Machiavelli) ঃ ষোল শতকের প্রথমভাগে ইতালির অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। ইতালি ছিল শতধাবিভক্ত এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পূর্ণ। বিদেশী শক্তিসমূহ তাই তাদের রাজনৈতিক অক্ষক্রীড়ার ক্ষেত্র হিসেবে ইতালিকে ব্যবহার করত। অরাজকতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় ভরা ইতালির এই প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মেকিয়েভেলী চেয়েছিল এক শক্তিশালী ইতালি গঠন করতে। তাঁর সামনে ছিল স্পেন ও ফ্রান্সের আদর্শ। তাঁর চিন্তাধারা ও মতবাদ তৎকালীন ইতালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি ইতালির পাঁচটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে 'ঐক্যবদ্ধ ইতালির' স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তাই দেশপ্রেমিক মেকিয়েভেলীর লেখায় মূর্ত হয়ে ওঠে ঐক্যের বাণী, শক্তির স্বপ্ন ও উন্নতির আদর্শ। তিনি বুঝেছিলেন তা সম্ভব হবে শুধু একজন সর্বশক্তিমান রাজার আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে। তাই তিনি ইতালির অবস্থার সম্যক উপলব্ধি করে অনুধাবন করেন, জাতির ভাগ্য একজন চরম ক্ষমতাশালী রাজার হস্তে ন্যস্ত করতে হবে।

তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্স'–এ (The Prince) তাঁর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দান করেন। এ ব্যাখ্যা ছিল বাস্তবভিত্তিক। তিনি 'প্রিন্স' গ্রন্থে শাসকের জন্য কতকগুলো বাস্তব পরামর্শ দান করেন যাতে রাজা নিজের পদমর্যাদা বজায় রাখতে পারেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পর্যুদস্ত করতে পারেন এবং দেশে বিপ্লব প্রতিরোধ করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তিনি শাসককে সিংহের ন্যায় শক্তিশালী ও শৃগালের ন্যায় ধূর্ত হতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মানুষের আচরণের দুটি মান নির্ধারণ করেন। একটি রাষ্ট্রনায়কের জন্য এবং অপরটি নাগরিকদের জন্য।

মেকিয়েভেলীর নিকট থেকে আমরা কোন সুষ্ঠু ও সর্বজনীন রাজনৈতিক দর্শন আশা করি না এবং তা তিনি প্রচার করেন নি। তিনি তৎকালীন ইতালিতে দেখেছেন ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী কীভাবে নিজেদের স্বার্থ অর্জনের জন্য নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে জনসাধারণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন, কীভাবে ধর্ম রাজনৈতিক স্বার্থ অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তিনি ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। ধর্ম ও নীতির প্রশ্ন তাঁর নিকট মুখ্য ছিল না। তিনি চেয়েছেন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করতে। তা যে কোন উপায়েই সম্ভব হোক তাই শ্রেষ্ঠতর পন্থা। "প্রিন্সের" লেখক এই মতবাদ প্রচার করেন।

হব্স (Hobbes) ঃ সতর শতকের খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক টমাস হব্স তাঁর গ্রন্থ লেভায়াথান (Leviathan)-এ তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে। তখন ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আকাশ গৃহযুদ্ধের কালো মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ক্রমওয়েলের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা হব্সের মনঃপূত হয়নি। তাছাড়া তিনি স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক হিসেবে রাজশক্তির সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি সে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহজনিত অশুভ পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেন রাজশক্তির দুর্বলতাকে। তিনি জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এক সার্বভৌম চরম রাজশক্তির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। 'লেভায়াথান' গ্রন্থে তিনি এরূপ রাজশক্তির মহিমাই কীর্তন করেছেন।

হব্স স্টুয়ার্ট রাজবংশের চরম ক্ষমতার গুণ-কীর্তন করেন এবং চূড়ান্ত ও সর্বশক্তিমান এক রাজশক্তির চিত্র অংকন করেছিলেন। তিনি সামাজিক চুক্তিবাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু এই চুক্তিবাদ দ্বারা তিনি জনগণের উপর রাজার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা জনগণের নিকট দায়ী থাকবেন না। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যা প্রয়োজন হব্স 'লেভায়াথান'-এ তারই ছবি অংকন করেন। এই চিত্র ছিল এক ক্ষমতাশালী রাজশক্তির যিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।

লক (Locke) ঃ জন লক ছিলেন সতর শতকের শেষভাগের একজন চিন্তানায়ক। ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের পর যখন দেশের অবস্থা আমূলভাবে পরিবর্তিত হয় তখন জন লক নতুনভাবে চিন্তা শুরু করেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'গৌরবময় বিপ্লব' (Glorious Revolution) ইংল্যাণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় জেমস সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হন এবং উইলিয়াম ও মেরী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। এই বিপ্লবের ফলে রাজা ও পার্লামেন্টের দীর্ঘদিনের সংগ্রামেরও অবসান হয় এবং অবশেষে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে জন লক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মহিমা কীর্তন করেন তাঁর 'সিভিল গভর্নমেন্ট' (Two Treatises of Civil Government") গ্রন্থে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে। এ গ্রন্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত অবস্থা অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণগান করেন ও রাজার স্বেচ্ছাচারিতাকে অযৌক্তিক বলে প্রকাশ করেন। তিনি চুক্তিবাদের মাধ্যমে জনগণের শক্তির স্বীকৃতি দান করেন। তাই দেখে জন লক তাঁর গ্রন্থে তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেন।

রুশো (Rousseau) ঃ রুশো ছিলেন আঠার শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। তদানীন্তন ফরাসী দেশের বাস্তব অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হন। ফরাসী দেশে সমাজব্যবস্থা তখন সামন্ত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজশক্তি ছিল অপ্রতিহত ও স্বৈরাচারী। এ স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থায় জনজীবন

দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি এর বিরুদ্ধাচরণ করেন ও স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তাই তাঁর বিখ্যাত "সামাজিক চুক্তি" (The Social Contract) গ্রন্থে তিনি নতুন এক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি চুক্তি মতবাদ গ্রহণ করে জনসাধারণের সার্বভৌম শক্তির কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন। প্রকৃত ক্ষমতার উৎস ও অধিকারী জনসাধারণ। তাঁর মতবাদের প্রভাব এত সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী হয় যে, তা একদিকে যেমন আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে তেমনি ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্‌গাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফরাসী দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক অবস্থা রুশোকে তাঁর মতবাদ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর যুগান্তকারী মতবাদ প্রচার করেন।

১। রাজনৈতিক তত্ত্ব কী? রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (What is political theory? Discuss the nature of political theory.) [D. U. 1989]

২। "কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত বোধগম্য হয় না।"–লাস্কি। নিম্নলিখিত রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের প্রসঙ্গে উক্তিটির আলোচনা কর। (ক) মেকিয়েভেলী, (খ) হব্‌স, (গ) রুশো। ["No political theory is ever intelligible save in the context of its time"—Laski. Discuss this with reference to the following thinkers : (a) Machiavelli, (b) Hobbes, (c) Rousseau.]

৩। "রাষ্ট্রতত্ত্ব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাপক, সুবিন্যস্ত ও সাধারণ বিবরণে উপনীত হবার একটা প্রচেষ্টা"—আলোচনা কর। ("Political theory is an attempt to arrive at a comprehensive,, coherent and general account of political phenomena"— Discuss.)

সমাজ, সংঘ, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র ঃ কয়েকটি মৌলিক ধারণা

SOCIETY, ASSOCIATION, COMMUNITY AND STATE : SOME FUNDAMENTAL CONCEPTS

৪

সূচনা
Introduction

রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানত রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতে হলে সে সাথে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও আলোচনা করতে হয়, যাদের সাথে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। অধ্যাপক লাস্কি (Laski) সত্যই বলেছেন, একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক শেষ হয় নি। রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও তার বাইরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের সাথে রাষ্ট্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক আলোচনা করতে হলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানতে হবে।

সমাজ
Society

কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদল লোক সংঘবদ্ধ ও সংহত হয়ে সমাজ গঠন করে। মানুষ সামাজিক জীব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে সমাজে লালিত-পালিত হয়ে বিভিন্ন উপায়ে সামাজিক জীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে। গিডিংসের (Giddings) মতে, "সমাজ বলতে আমরা সংঘবদ্ধভাবে সে জনসাধারণকে বুঝি, যারা সাধারণ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয়েছে।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি গুরু এরিস্টটল বলেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব এবং যে লোক সমাজের সভ্য নয়, সে হয় দেবতা না হয় পশু" (Man is by nature a social and political animal and a man who is not a member of society is either a god or a beast")। অধ্যাপক ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, 'সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক ব্যবস্থা" ("Society is the whole system of social relationships")।[১] সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যে মিলন, তাই সমাজের বৈশিষ্ট্য।

ঢাকার পল্টন ময়দানে পাঁচ লক্ষ লোকের মিলনকে আমরা সমাজ বলব না, কিন্তু যদি পাঁচজন লোক মিলিত হয়ে খেলাধুলার আসর জমায় এবং সপ্তাহে সপ্তাহে উপস্থিত হয় তা হলে আমরা তাকে খেলাধুলার সমাজও বলতে পারি। তা বড় হতে পারে, ছোটও হতে পারে। পৃথিবীব্যাপী সমাজ গঠনও সম্ভবপর, যেমন- রেডক্রস সমাজ। সমাজের সাথে ভূ-খণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ নিয়েই সমাজের কাজ কারবার। অধ্যাপক লিকক (Leacock) বলেছেন, 'সমাজ শব্দটিতে ভূমি দখলের কোন সম্বন্ধ নেই। তা শুধুমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে গঠিত। তার পরিবেশ সম্পর্কে কোন কথা বলে না" ("The term society has no reference to a territorial occupation; it refers to man alone and not to his environment")। রাজনৈতিক সংহতি এর নেই তবে শাসন ব্যাপারে তা একেবারে অজ্ঞও নয়। কিছু লোকের উপর সমাজের সংঘবদ্ধতার ভার থাকতে পারে।

---

১. RM Mac Iver and C.H. Page, *Society : An Introductory* Analysis, P. 5

সংক্ষেপে, সমাজের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলো : **(এক)** এক সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি; **(দুই)** সাধারণ উদ্দেশ্য; **(তিন)** উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসমষ্টির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এবং **(চার)** সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বন্ধন।

সম্প্রদায়
Community

এরূপ জনসমষ্টি সমন্বয়ে সম্প্রদায় গঠিত হয় যারা একই রীতিনীতি, একই ধরনের আচার-ব্যবহার, একই ঐতিহ্য, একই সামাজিক আদর্শ ও স্বার্থে উদ্বুদ্ধ এবং একই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করে। অধ্যাপক জি. ডি. এইচ. কোল (G.D.H. Cole) সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেনঃ 'সম্প্রদায় হলো সেই জনসমষ্টি, যা সতত পরিবর্তনশীল অথচ একই আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির মধ্যে বসবাস করে এবং যা একই আদর্শ ও স্বার্থে উদ্বুদ্ধ ("A number of human beings living together by a common, however, constantly changing stock of conventions, customs and conscious to some extent of common social objects and interests")।

সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : **(এক)** সাধারণ জীবনধারা এবং জীবনাদর্শ, **(দুই)** একই ধরনের আচার ব্যবহার, একই প্রকারের সামাজিক আদর্শ ও স্বার্থ এবং একই ঐতিহ্য, **(তিন)** বিশেষ ঐক্যবোধ-যা দ্বারা সম্প্রদায়ের সকলে একত্রিত হতে পারে। গোত্র বা গোষ্ঠীকেও সম্প্রদায় বলা যায়। এর পরিধি বড় হতেও পারে, ছোট হওয়াতেও কোন অসুবিধা নেই। বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়ও কল্পনা করা সম্ভবপর, যেমন-মুসলমান সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। সমাজের ন্যায় সম্প্রদায় ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে না, অথবা এতে রাজনৈতিক সংহতিরও প্রয়োজন নেই। যা বিশেষ করে প্রয়োজন তা হলো সভ্যবৃন্দের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক আইভার (Mac Iver) সম্প্রদায় সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনকারী দলকে সম্প্রদায় বলা যায়। ঐক্যবদ্ধ জীবনযাত্রা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার এবং ঐতিহ্য সৃষ্টি করে" ("Any circle in which a common life is lived, within which people more or less freely relate themselves to one another in the various aspects of life and thus exhibit common social characteristics")। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে, সম্প্রদায় একটি প্রতিষ্ঠান বা দল নয়। সম্প্রদায় একটি সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস মাত্র- বিশিষ্ট ভাবধারায় ঐক্যবদ্ধ অনুভূতি।

সংঘ
Association

সংঘ বলতে আমরা বুঝি একদল লোককে-যারা স্বেচ্ছায় কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলে বিশেষ পদ্ধতিতে কার্য উদ্ধারে মনোযোগী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে সংঘ বলা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল সংঘের উদাহরণ। পরিবারকেও সংঘ বলা যায়। অনেকে রাষ্ট্রকে বিশিষ্ট ধরনের সংঘ বলে অভিহিত করেন। সংঘের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেছেন, "সংঘ হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা তার সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছায় গড়ে তোলে বিশেষ কোন সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য" ("An organisation deliberately formed for the collective pursuit of some interests or set of interests which the members of it share.")।

সংঘ ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, যেমন- ফুটবল ক্লাব বা থিয়েটার পার্টি। পরিবার বা রাষ্ট্রের মত সংঘগুলো চিরস্থায়ীও বটে।

সংঘের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখা প্রয়োজন : **(এক)** একদল লোক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং স্বার্থে অনুপ্রাণিত। **(দুই)** উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সচেষ্ট। **(তিন)** বিশেষ কতকগুলো আইন-কানুনের মাধ্যমে এবং আনুগত্য স্বীকার করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার বাসনা।

রাষ্ট্র
State

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ খুব সহজ নয়। বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন সত্যই, তথাপি বিভ্রান্তির অন্ত নেই। কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞার উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি সহজভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব। গার্নার বলেন, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় রাষ্ট্র হলো এমন একটি জনসমাজ, যা সংখ্যায় অল্পাধিক বিপুল, যা স্থায়ীভাবে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড অধিকার করে থাকে, যা বাহিরের কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন অথবা প্রায়-স্বাধীন এবং যার এমন একটি সংগঠিত সরকার আছে যার প্রতি প্রায় সকলেই স্বভাবত আনুগত্য স্বীকার করে" ("The state is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience")। উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত একটি সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেনঃ "কোন নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যে আইনের মাধ্যমে সংগঠিত জনসমূহকে রাষ্ট্র বলে" ("A state is a people organised for law within a definite territory")।

ম্যাকআইভার (MacIver) বলেন ঃ "রাষ্ট্র এমন একটি সংঘ, যা সরকারের ঘোষিত আইন অনুসারে কার্য করে। সরকার আইন ঘোষণা করার এবং তা পালন করবার শক্তির অধিকারী। ঐ শক্তির সাহায্যে সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলার বাহ্যিক ও সর্বজনীন অবস্থা বজায় রাখে" ("The state is an association which acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintaining within a community territorially demarcated, the universal external condition of social order")। অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Laski) রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলেছেন, "আধুনিক রাষ্ট্র ভূখণ্ডে অবস্থিত এমন এক সমাজ, যা শাসকগোষ্ঠী ও শাসিত-এ দুভাগে বিভক্ত এবং নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত অন্য সকল সংস্থার উপর প্রাধান্য দাবি করে" ("The modern state is a territorrial society divided into government and subjects, claiming within its alloted physical area supremacy over all other institutions")।

উপরিউক্ত যে-কোন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান পাই- জনসমষ্টি, ভূমি, সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্রগঠনে এদের প্রত্যেকটি একান্ত প্রয়োজনীয়। জনসমষ্টি বাদ দিলে দেবতা বা দানব অথবা পশু-পক্ষী অথবা জীন-পরীর বাসস্থান কল্পনা করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্র কখনো হয় না। ভূমি বাদ দিয়ে রাষ্ট্র দেহশূন্য প্রাণের মত যা ধোঁয়াটে, অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট এবং নিরর্থক। আর জনসমষ্টি এবং ভূমি যদি থাকে, তা হলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা থাকতে হবে। তা না হলে 'রাষ্ট্র আইন-কানুনবিহীন এমন এক বনভূমির মত হবে, যেখানে শক্তিশালী এবং হিংস্র প্রাণীরা নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় সকলকে স্বচ্ছন্দে গ্রাস করতে থাকবে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাকারী প্রতিষ্ঠান যদি সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত না হয়, তা হলে রাষ্ট্র কৃপার পাত্র হয়ে জনড় এবং অচল এক প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করবে। সুতরাং, রাষ্ট্র সম্বন্ধে যাই বলা হোক না কেন, উপরিউক্ত উপাদান এর জন্য অপরিহার্য।

সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, বিশেষ করে আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, তার ফলে অনেক মৌলিক ধারণাকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। 'রাষ্ট্রের (state) পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' (Political system) শব্দটি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ করে ডেভিড ইস্টন (David Easton) বলেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো "লক্ষ্যস্থির করার, নিজেকে রূপান্তরিত করার এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার

সৃজনমূলক এক ব্যবস্থা ("a goal setting. self-transforming and creatively adaptive system")। রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ হলো "সমাজে উপযোগের প্রভুত্বব্যঞ্জক বরাদ্দ" ('The authoritative allocation of values')।[১] গ্যাব্রিয়েল অ্যালমণ্ড (G.A. Almond) রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন অন্যভাবে। তাঁর মতে, "রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো এমন একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা যা প্রত্যেকটি স্বাধীন সমাজে বিদ্যমান আর যেখানে বৈধ উপায়ে কম-বেশি বল প্রয়োগ করে বা বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংহতি সাধন ও অভিযোজনের কাজ সম্পন্ন করা হয়।" রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো "একটি বৈধ, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও রূপান্তর সাধনকারী ব্যবস্থা" ("The political system is the legitimate, order maintaining or transforming system in the society")।[২]

এই সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা করলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐ চারটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। **প্রথম,** রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যা লক্ষ্য স্থির করে। **দ্বিতীয়,** যেহেতু জনসমষ্টি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট তাই ভূখণ্ড কোন না কোনভাবে জড়িত। **তৃতীয়,** এ ব্যবস্থা নিজেকে রূপান্তর করতে সক্ষম। তাই এর রয়েছে সংগঠন বা সরকার, এবং **চতুর্থ,** এর বলপ্রয়োগ ক্ষমতা বা বলপ্রয়োগের ভয় দেখাবার ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব। ফলে জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্বের সমন্বয়ই রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌল উপাদানগুলোর বিবরণ প্রয়োজন।

জনসমষ্টি
Population

রাষ্ট্রের প্রথম উপাদান হলো জনসমষ্টি, কারণ জনসমষ্টির ইচ্ছা প্রণোদিত পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। কাজেই জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্রের ধারণা করা অসম্ভব। পশুদল কর্তৃক রাষ্ট্র গঠিত হয় না। আবার জনশূন্য দেশও রাষ্ট্র হয় না। কিন্তু একটি রাষ্ট্রে কীরূপ লোকসংখ্যা হওয়া উচিত, এই প্রশ্ন নিয়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেক তর্কবিতর্ক করেছেন। মহাপণ্ডিত প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হাজার পাঁচেক হওয়া উচিত। তাঁর শিষ্য এরিস্টটল বলেন, "জনসংখ্যা দশ হাজার হলে ভাল হয়, তবে তা কোন ক্রমেই এক লক্ষের উর্ধ্বে যেন না হয়।" ফরাসী পণ্ডিত রুশোও এরিস্টটলের সাথে সুর মিলিয়েছেন। মতেঁস্কু এবং ডি-টকভিলও (De Toqueville) রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম রাখার পক্ষপাতী। তবে গ্রীক পণ্ডিতগণ রাষ্ট্র বলতে নগর বুঝতেন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উপযোগী জনসংখ্যা তাঁরা পছন্দ করতেন। ফলে শেষ লক্ষ্য তাঁদের ছিল হাজার দশেকের মধ্যে। কিন্তু এ যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলেই হোক আর পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রয়োজনেই হোক– উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এবং খবরাখবর অতি দ্রুত দেয়া-নেয়া সম্ভবপর বলে দশ হাজার বা দশ লক্ষ যে কোন রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অতি নগণ্য। তাছাড়া, রাষ্ট্রের জনসংখ্যার সীমা বেঁধে দেবার সার্থকতা এই যুগে আর স্বীকৃত হয় না। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাষ্ট্র। বর্তমানে চীনের জনসংখ্যা একশত কোটি ছাড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দুটি রাষ্ট্র স্যান মেরিনো ও মোনাকো। তাদের জনসংখ্যা যথাক্রমে বিশ হাজার ও চৌদ্দ হাজার। নেহায়েত ঐতিহাসিক কারণেই আজও সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো টিকে রয়েছে। তবে ক্ষুদ্র জনসংখ্যার রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড সত্যই আদর্শস্থানীয়। জনসংখ্যা যদিও অপরিহার্য, তথাপি রাষ্ট্রীয় সম্মান, গৌরব এবং সুনাম জনসংখ্যার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তা প্রধানত নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জনসমষ্টির শিক্ষা, সংস্কৃতি, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা এবং চরিত্রের সৌন্দর্যের উপর।

---

১. David Easton, *A Framework for Political Analysis,* Engle-wood cliffs. N. J. : 1965. P.–92.
২. G.A. Almond and James Coleman, eds *The Politics of Developing Areas,* Princeton : 1960 PP–3-4.

ভূ-খণ্ড
Territory

জনসমষ্টি যেমন রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য তেমনি একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, কারণ জনসমষ্টিকে কোন না কোন স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করতে হবে। স্থায়ি আবাস-ভূমিহীন ভবঘুরে যাযাবরেরা রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। এমন কী সুসভ্য ইহুদীরাও প্যালেস্টাইনে জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে রাষ্ট্র গঠন করতে পারে নি।

আবার ভূ-খণ্ড বলতে শুধু মাটির উপরিভাগকে বুঝায় না। মাটির নিচের সম্পদ, মাটির উপরে নদী, পাহাড়-পর্বত, এমনকি সমুদ্রের উপকূলভাগকেও বুঝায়। এখন সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে বার মাইল পর্যন্ত জলরাশি রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়। ভূ-খণ্ডের উপরিস্থিত আকাশও রাষ্ট্রের আয়ত্তে। অন্য দেশের এরোপ্লেন বিনানুমতিতে সে আকাশের উপর দিয়া উড়ে গেলে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়। ভূ-খণ্ডের পরিমাণ নিয়েও সেকালে পণ্ডিতগণ অনেক বিচার-বিবেচনা করেছেন। এরিস্টটলের মতে, গাছপালা বৃদ্ধির যেমন একটা পরিমাণ আছে, রাষ্ট্রের জনসমষ্টির জীবন ধারণ এবং মানবিক বিকাশের জন্যও তেমন একটি সীমারেখা থাকা উচিত। তবে এও সত্য যে, তারা নগর-রাষ্ট্রের আদর্শ সামনে রেখে ভূ-খণ্ডের পরিসীমা নির্ধারণে আগ্রহী ছিলেন। আধুনিক দেশব্যাপী রাষ্ট্রের কল্পনা করতে তারা অপারগ ছিলেন। দার্শনিক রুশো চোখের সামনে ফ্রান্স এবং স্পেনের মত বড় বড় রাষ্ট্র দেখেও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সম্বন্ধে তার দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র আকারে যত ক্ষুদ্র হবে সে অনুপাতে তার শক্তিও তেমন বড় হবে। তাছাড়া, রাষ্ট্র আয়তনে বড় হলে তার মতে, শাসনকার্য চালানো কষ্টকর। লোকেরা দেশনায়কদের প্রতি প্রীতিবদ্ধ ও শ্রদ্ধাশীল থাকে না। প্রত্যেক লোককে রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োগ করাও সম্ভব হয় না এবং একই আইন দেশের সর্বত্র চালানোও অসুবিধাজনক। তার মতে, বৃহদাকার রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের জন্য উপযোগী এবং মধ্যম পর্যায়ের রাষ্ট্র গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী। এমন কী ডি-টকভিলও (De Toqueville) বলেছেন, 'বিশাল সাম্রাজ্যের মত জনসাধারণের কল্যাণ ও স্বাধীনতার বিরোধী আর কিছুই নেই।'

আজকাল যুগ বদলেছে। পদ্মা ও যমুনা দিয়া প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতি, যানবাহন এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। সুতরাং কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ভূ-খণ্ড সম্বন্ধে অনুসরণ করা ঠিক নয়। রাশিয়ার মত দেশ পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে। কিন্তু সেখানে শাসনকার্যের ব্যাঘাত হচ্ছে এমন কথা শোনা যায় না। পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য সমন্বয়ে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তার ফলেও তেমন অসমতা অথবা শাসন কর্মে অসুবিধার কথা শোনা যায় না। আবার ক্ষুদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে যেমন লুক্সেমবার্গ ও জর্ডানের শাসনকার্যে যে অত্যন্ত দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তাও বলা যায় না। লুক্সেমবার্গের আয়তন মাত্র ৯৯৯ বর্গমাইল। তাছাড়া এ যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে টিকে থাকা শক্ত। অর্থনৈতিক দিকটাও ভেবে দেখতে হবে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে সুইজারল্যান্ড সত্যই আদর্শস্থানীয়।

সরকার
Government

সরকার রাষ্ট্রের আর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কোন এক ভূ-খণ্ডের উপর কতকগুলো লোক যদি বাস করে তা হলেও তাদের মধ্যে রাষ্ট্র সংগঠিত হবে না। তাদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে হবে, আইন ও শৃংখলার বন্ধন থাকতে হবে এবং সর্বোপরি একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে যা শান্তি রক্ষা এবং শৃংখলা স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্য দায়ী থাকবে। সংক্ষেপে, তাই সরকার বা গভর্নমেন্ট।

সরকার রাষ্ট্রের সমবেত ইচ্ছার প্রতীকস্বরূপ। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত এবং কার্যকর হয়। যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য পরিচালকমণ্ডলী প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় কর্মে এ পরিচালকমণ্ডলী হচ্ছে সরকার। সরকারের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণ উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ে। সরকারবিহীন অবস্থাকে 'মাৎস্য ন্যায়' বলা হয়। কারণ, সরকারের অনুপস্থিতিতে প্রবল দুর্বলকে ছলে-বলে-কৌশলে কাহিল করে দেয়, যেমনভাবে পুকুরে বড় বড় মাছ ছোট ছোট মাছগুলো গিলে খায়।

'সরকার' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রিমণ্ডলিকে বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে তা শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত সকলকে বুঝায় যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অন্য কথায়, যারা আইন প্রণয়ন করছেন, আইন সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন এবং আইনের প্রয়োগ করে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন তাদের সমবেতভাবে 'সরকার' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই অর্থে গ্রাম্য চৌকিদার থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত সকলকেই সমবেতভাবে আমরা সরকার বলতে পারি।

সার্বভৌমত্ব
Sovereignty

রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের অর্থ সর্বোচ্চ এবং চরম ক্ষমতা যা অনমনীয়, অবিভাজ্য, একক এবং অদ্বিতীয়। সার্বভৌমত্ব নির্দেশ দেবার এবং আদেশ পালন করাবার সর্বোচ্চ পার্থিব ক্ষমতা। রাষ্ট্রের ভেতরে বা বাইরে সার্বভৌমত্বের উর্ধ্বে কোন আইনগত ক্ষমতা নেই এবং এর বিরুদ্ধে নালিশ করার মত উর্ধ্বতন ক্ষমতাও নেই। সাধারণত রাষ্ট্র সংগঠনের কষ্টিপাথর বলে সার্বভৌমত্বকে আখ্যায়িত করা হয়, উৎকৃষ্ট স্বর্ণ যেমন কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয় ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে যাচাই করতে হলে সার্বভৌম ক্ষমতার মানদন্ডে তাকে পরীক্ষা করতে হবে।

রাষ্ট্রের ভেতরে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যে ক্ষমতা মেনে চলে এবং না মেনে চললে দণ্ডনীয় হয় তাই অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব। যে শক্তি বিদেশের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ মানে না, তাকেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বলে। এর বলেই রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এবং আইনকে দেশের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। সুতরাং রাষ্ট্র গঠনে জনসমষ্টি, ভূ-খন্ড এবং সরকার হলেই চলবে না, রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ সার্বভৌম ক্ষমতাও থাকতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র জনপদ বা উপনিবেশ অথবা অধীন রাজ্য বলে পরিগণিত হবে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্টের পূর্বে ভারতের অবস্থা ঠিক এমনি ছিল।

সার্বভৌমত্ব ঃ ব্যক্তিগত না স্থানগত
Sovereignty : Personal or Territorial

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এটি জানা একান্ত প্রয়োজন। সার্বভৌমত্ব স্থান কাল নির্বিচারে সকল ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য, না ব্যক্তি নির্বিচারে নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের উপর প্রযোজ্য তা জানা দরকার। সার্বভৌমত্ব ব্যক্তিগত হলে রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা স্বদেশ কিংবা বিদেশে-সর্বত্রই তার নাগরিকদের উপর প্রয়োগ করতে পারবে। অপরপক্ষে সার্বভৌমত্ব যদি স্থানগত হয় তা হলে রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা সে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল লোকের উপর, কী নাগরিক, কী বিদেশী-সমানভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যে যারাই বসবাস করুক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আওতাভুক্ত থাকতে বাধ্য। তবে আধুনিক যুগে সার্বভৌমত্ব স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক সংস্থা। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের বাইরে প্রযোজ্য হয় না। কেননা, তা হলে অন্য রাষ্ট্রের অনুরূপ সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয়। তবে কয়েকটি বিষয়ে এর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। কোন দেশের রাষ্ট্রদূত বা বাণিজ্য জাহাজ সাময়িকভাবে অন্য দেশে অবস্থান করলেও তখন সে

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের উপর অবাধভাবে প্রযোজ্য হয় না। তাই দেখা যায়, আধুনিককালে সার্বভৌম অধিকার রাষ্ট্র বহির্ভূত এলাকায় প্রযোজ্য হয় না (It has no extra-territorial jurisdiction)।

তবে একটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ এখনও দেখা যায়। জন্মসূত্রে (jus Sanguinis) কোন নাগরিকের কোন সন্তান অপর রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে বা অবস্থান করলে সে রাষ্ট্র তার পিতৃত্বের দাবিতে নিজ নাগরিক বলে দাবি করতে পারে।

আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব ব্যতীত আধুনিক রাষ্ট্রের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লখযোগ্য ঃ

১. স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (Permanence and Continuity) ঃ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসেবে অক্ষয়, অব্যয়, অজর ও অমর। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংঘ অস্থায়ী, কিন্তু রাষ্ট্র চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সরকারের পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটতে পারে কিন্তু তার বিনাশ হয় না। রাশিয়ায় অতীতে জারতন্ত্র (Czardom) বিদ্যমান ছিল। পরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তরে রাশিয়ার রাষ্ট্রত্ব বিনষ্ট হয় নি।

২. স্বীকৃতি (Recognition) ঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র মতে জাতিসংঘ কর্তৃক অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিদানকেও রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা হয়। জাতিসংঘ কোন রাষ্ট্রকে রাষ্ট বলে স্বীকার না করলে সে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, চীনের অবস্থা উল্লেখ করা যেতে পারে। চীন ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তা ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করছে।

৩. সাম্য (Equality of States) ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র স্বীকৃতি লাভ করলে তা সমান অধিকার দাবি করতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র, ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক, সমান অধিকার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি দাবি করতে পারে। এই সাম্য রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট প্রকৃতি।

আন্তর্জাতিক আইনের চোখে রাষ্ট্র
State as a Concept of International Law

সাধারণভাবে রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি এক জনসমষ্টিকে যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং আইনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে এক সার্বভৌম সরকার গঠন করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন জনসংস্থা রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হতে হলে তাকে নিম্নলিখিত গুণে বিভূষিত হতে হবে ঃ

(এক) রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করতে হবে।

(দুই) রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হতে হবে যেন তা অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে, স্বেচ্ছায় চুক্তি সম্পাদন করতে পারে এবং তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবে।

(তিন) রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতার আশীর্বাদ লাভ করতে হবে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার পেতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে নতুনভাবে পথপরিক্রমা শুরু করে

তখন তার কোন আন্তর্জাতিক মর্যাদা ছিল না। পরবর্তীকালে অবশ্য তা স্বীকৃতি লাভ করে রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। চীনের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ ছিল।

রাষ্ট্র এবং সরকার
State and Government

সরকার ও রাষ্ট্রকে অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। ফলে উভয়ের অর্থ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তি এবং ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম, রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সংস্থা। কিন্তু সরকার এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা গঠিত হয়, প্রকাশিত হয় এবং কার্যকর হয়। রাষ্ট্র গঠনে চারটি উপাদান- জনসমষ্টি, ভূ-খণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা অপরিহার্য। কিন্তু সরকার উক্ত চারটি উপাদানের অন্যতম। রাষ্ট্রকে মানবদেহের সাথে তুলনা করলে সরকারকে আমরা তার মস্তিষ্ক বলে ধরতে পারি।

দ্বিতীয়, রাষ্ট্র অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবক্ষেত্রে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা জড়িত থাকেন, তাঁরাই সরকারি লোক। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনে জনসমষ্টির প্রত্যেকেই অংশীদার। সরকারের সদস্য থেকে আরম্ভ করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। শাসক এবং শাসিত সকলেই রাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিক।

তৃতীয়, রাষ্ট্র একটা তত্ত্বগত ধারণা। রাষ্ট্রকে কল্পনা করতে হয়। রাষ্ট্রের ছবি চোখে দেখা যায় না, কারণ তা একটি তত্ত্বগত ধারণা (Abstract)। সরকার কিন্তু রাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (Concrete) রূপ। রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের মাধ্যমেই প্রকাশিত এবং কার্যকর হয়। বিশিষ্ট লেখকের মতে, "সরকারের সাথে জাহাজের 'হাল' শব্দটির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে ("The word `government', judged by its philological derivation, apparently has a close affinity to the rudder or steering of a ship")। হাল ব্যতীত যেমন কর্ণধারের পক্ষে জাহাজ চালানো সম্ভব হয় না, ঠিক তেমনি সরকার না থাকলে জনতা বিশৃংখল হয়ে পড়ে এবং সুষ্ঠুভাবে কোন কাজই তাদের দ্বারা সম্ভবপর হয় না।

চতুর্থ, রাষ্ট্র একটি ভাবগত ধারণা বলে সর্বদেশে এবং সর্বকালে তার স্বরূপ এক এবং অভিন্ন। চারটি উপাদানে গঠিত এ সংস্থা সর্বযুগে এক। কিন্তু সরকার বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। অনেক সময় রসিকতা করে সরকারকে 'বহুরূপী'ও বলা হয়। কারণ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বেশে সরকারকে দেখা যায় সামাজিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে।

পঞ্চম, রাষ্ট্র অনেকটা চিরন্তন, চিরস্থায়ী এবং নিত্য। বৈধ উপায়ে হোক অথবা অন্তর্বিপ্লবের ফলেই হোক, সরকারের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন হয় না উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ায় যখন রাজতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন রুশ রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। সরকার আসে, যায়, বিলুপ্ত হয়। নতুন সরকার পুরাতন সরকারের স্থান অধিকার করে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিলোপ কিছুতেই ঘটে না।

ষষ্ঠ, রাষ্ট্র আইনগত সকল অধিকারের উৎস। ফলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের কারো কোন অধিকার নেই। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ নিজের সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেকে বিপন্ন করা। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অধিকার রয়েছে। সরকার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে তার বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত দায়ের করা সম্ভব।

সপ্তম, রাষ্ট্র একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার সীমাহীন ক্ষমতা আছে। সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত। এ সম্পর্কে অধ্যাপক লাস্কির (Laski) কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকার রাষ্ট্র" ("The state for all practical purposes is the government")। আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র অপ্রত্যক্ষ, স্পর্শের উর্ধ্বে, অপরিবর্তনীয়, আদর্শ ব্যক্তিস্বরূপ এবং সরকার তার প্রতিনিধি মাত্র।

অষ্টম, রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সরকারের কিন্তু নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়। এ অর্থে সরকারের ক্ষমতা সীমিত এবং সংবিধানের মাধ্যমে এ সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়।

সর্বশেষে, রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক (territorial) সংস্থা, কিন্তু সরকার এই সংস্থার সংগঠিত (organized) অংশ। সাংগঠনিক দিকটি সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ
State and Other Associations

সংঘবদ্ধ জীবনই বর্তমান যুগের নিয়ম এবং বর্তমান সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলো সংঘের সমষ্টি মাত্র। রাষ্ট্রও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংঘ। কিন্তু অন্যান্য সংঘের সাথে রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তাদের গঠন প্রণালী, কাঠামো, কার্যাবলি, শক্তি এবং প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে। এই পার্থক্যগুলো রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘ থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং রাষ্ট্রকে বিশিষ্ট গৌরবময় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথম, রাষ্ট্র অপরিহার্যরূপে একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান। এর সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাষ্ট্র একটি সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক অঞ্চল। বাংলাদেশ বলতে আমরা বাংলার জনগণের নির্দিষ্ট আবাসভূমিকে বুঝি। সীমানা চিহ্নিত বিরাট অঞ্চল যেখানে বাংলাদেশীরা নিজেদের আশা আকাঙ্খা নিয়ে উন্নততর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ তাই বাংলাদেশ। কিন্তু রেডক্রস সোসাইটি অথবা কোন খেলাধূলার ক্লাব বা সংঘ অপরিহার্যরূপে কোন দেশ বা অঞ্চলের সাথে জড়িত নয়।

দ্বিতীয়, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এক সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; যেমন, বাংলাদেশের আইন-কানুন শুধু বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কোন কোন সংঘ আছে, যাদের আওতা বিশ্ব-বিস্তৃতও হতে পারে। নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যেই তাদের আওতা সীমাবদ্ধ থাকে না, যেমন, রেডক্রস সোসাইটি অথবা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রতিষ্ঠান। তারা সমগ্র বিশ্বে দুস্থের সেবায় এবং খেলাধূলা পরিচালনায় ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকতে পারে। ভৌগোলিক সীমার চার দেয়ালের মধ্যে তাদের কর্মক্ষেত্র সীমিত নাও থাকতে পারে।

তৃতীয়, রাষ্ট্র একটি বাধ্যতামূলক সংঘ। রাষ্ট্রের প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সভ্য, যদি তারা আইনগতভাবে অন্য রাষ্ট্রে চলে না যায়। লোকে কোন সংঘের সাথে কোন সম্পর্ক নাও রাখতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন রাষ্ট্রের সদস্য হতে হয়।

চতুর্থ, এক সময়ে এক ব্যক্তি কেবল একটি রাষ্ট্রেরই সভ্য হতে পারে। কারণ একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে কেউ একই সময়ে বহু সংঘের সভ্য হতে পারে। একই সময়ে যে কেউ ধর্মীয় সমিতির, খেলাঘরের, মাতৃমঙ্গল সমিতির সভ্য হতে পারে। কিন্তু কেউ একই সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বা ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর সদস্যপদ পেতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য বহু নাগরিকত্ব দেখা যায়, কিন্তু তা রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হতে হয়।

পঞ্চম, সংঘ গঠিত হয় একটি বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কিন্তু রাষ্ট্র রয়েছে জনসাধারণের সর্বপ্রকার কল্যাণকর কাজের জন্য। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্র মানব কল্যাণকর সব রকম কাজের সাথে জড়িত থাকে। রাষ্ট্রের কার্যাবলি এত ব্যাপক যে, রাষ্ট্র বা নাগরিক জীবনের 'বন্ধু' দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক' বলা হয় ('friend, philosopher and guide')। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের উন্নতি ও স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। খেলার কোন সমিতি খেলাধূলার ব্যাপারেই নিয়োজিত।

ষষ্ঠ, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অন্যান্য সংঘ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যখন তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখন সংঘের বিলোপসাধন ঘটে। কিন্তু ব্যাপক কার্যাবলির মাধ্যমে রাষ্ট্র নিত্য, চিরন্তন এবং স্থায়ী। 'স্টেট' কথাটি মূলত চিরস্থায়িত্বের সূচক।

সপ্তম, রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে। কিছু সংখ্যক লোকের সলা-পরামর্শ ও সভাসমিতির কার্যবিবরণীর ফল রাষ্ট্র নয়। কিন্তু অন্যান্য সংঘ মানুষ ইচ্ছা করে সৃষ্টি করেছে। সংঘ অনেকটা সভা-সমিতির ফলস্বরূপ।

সর্বশেষে, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু অন্যান্য সংঘ সেরূপ চরম ক্ষমতার অধিকারী নয়। রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত সংঘগুলোর উপরও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত। অন্যান্য সংঘের স্বাধীন ইচ্ছা এবং কার্যক্ষমতা রাষ্ট্রীয় কার্যের অথবা ইচ্ছার অথবা ক্ষমতার বিরোধী হলে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও ক্ষমতাই বলবৎ থাকে। সংঘের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তই চরম বলে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, একমাত্র রাষ্ট্রেরই প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা রয়েছে। অন্যান্য সংঘ বড় জোর সদস্যগণকে জরিমানা অথবা বিতাড়িত করতে পারে, প্রাণদণ্ড দিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সমাজ
State and Society

মানুষের সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিকতাকে সমাজ বলা হয়। সমাজ মানুষের এরূপ একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান যা পারস্পরিক সকল সম্বন্ধকে অন্তর্ভুক্ত করে। সমাজ সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাষ্ট্র এর এক প্রধান সংগঠন। রাষ্ট্র তাই সমাজের মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে না। সুতরাং সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। সমাজ মানুষের এরূপ সামাজিক সম্পর্কসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত করে না, যথা—ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। এগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য প্রধানত মানুষের রাজনৈতিক কার্যাবলি ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা । কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য সামগ্রিক। উভয়ের মধ্যে অবশ্য গভীর ঐক্যসূত্র বিদ্যমান। কিন্তু দুইএর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম, রাষ্ট্র অপরিহার্যরূপে একটি আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সমাজের সাথে কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের সম্পর্ক অপরিহার্য নয়। রাষ্ট্র বিশেষ কোন ভূ-খণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমগ্র বিশ্বে তাদের কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমান সমাজ, হিন্দু সমাজের উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়, সমাজ রাষ্ট্রের মত সুসংগঠিত নয়। সমাজ সংগঠিত হতে পারে, আবার তার কোন সংগঠন নাও থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র সুসংবদ্ধ, সুসংগঠিত এবং পূর্ণরূপে সংহত। রাষ্ট্রই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখে।

তৃতীয়, রাষ্ট্রই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং অন্যায়ের গুরুত্বভেদে নাগরিকদের উপর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে। রাষ্ট্র মানুষের কার্যাবলি বিধিবদ্ধ আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সমাজ মানুষের কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক প্রথা এবং অভ্যাস দ্বারা। সামাজিক

প্রথা বা পদ্ধতি ভঙ্গকারীর উপর সমাজ বল প্রয়োগ করার বা শারীরিক শাস্তি প্রদানের অধিকারী নয়। সমাজের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ, সহযোগিতামূলক মনোভাব, সামাজিক নিন্দার ভয় প্রভৃতির জন্য মানুষ সামাজিক নিয়ম ও প্রথা মেনে চলে।

চতুর্থ, রাষ্ট্রের কার্য কী হবে, তা সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। গ্রীক পন্ডিতদের মতে, রাষ্ট্র ছিল সর্বাত্মক এবং সর্ববৃহৎ সংগঠন। মধ্যযুগে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় কার্যক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। একনায়কতন্ত্রের আমলে রাষ্ট্রকে আবার সর্বাত্মক বলে ঘোষণা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্র একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে জনকল্যাণকর সকল কার্য সম্পাদিত হয়। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়।

পঞ্চম, রাষ্ট্র মূলত মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে কার্যপ্রণালী নির্ধারিত করে, কিন্তু সমাজ হচ্ছে "সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক রূপ"। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক সহযোগে সামাজিক কর্ম পরিব্যাপ্ত, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সাধারণত মানুষের রাজনৈতিক কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

ষষ্ঠ, সমাজের পরিধি রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর। সমাজের কার্যক্রম বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কার্যধারা এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যেই সাধারণভাবে সীমিত থাকে। সমাজ যেন বিরাট এক বটবৃক্ষ এবং রাষ্ট্র সে বৃক্ষের বৃহত্তম শাখা তুল্য।

সর্বশেষে, সময়ের দিক থেকেও রাষ্ট্র অনেক নবীন, কিন্তু সমাজের জন্ম হয়ছে রাষ্ট্রের জন্মের বহু পূর্বে। রাষ্ট্র যেন সমাজের পৌত্র বা প্রপৌত্র।

রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি

রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। রাষ্ট্র না হলে ব্যক্তির সামাজিক অর্থনৈতিক, এমন কী নৈতিক জীবনও অপূর্ণ থেকে যায়। অন্যদিকে ব্যক্তি না হলে রাষ্ট্রের জন্মই হতো না। তবে এও উল্লেখ্য যে, ব্যক্তির সমষ্টিই রাষ্ট্র নয় এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছা মানে ব্যক্তির ইচ্ছা নয়। দুয়ের সম্পর্কের বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

(এক) ব্যক্তির দ্বারাই রাষ্ট্র গঠিত। ব্যক্তিহীন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না, যেমন পানিহীন সমুদ্র অথবা বালিহীন মরুভূমি কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রের এক মৌলিক উপাদান জনসমষ্টি।

(দুই) রাষ্ট্র কল্যাণকর। ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য, কেননা রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তির সকল সামাজিক এবং নৈতিক জীবন সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়। এ জন্য গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, **"ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতার জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য।"** আসলে ব্যক্তি তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্রের সভ্য হয়েই টিকে থাকে।

(তিন) উভয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির যেমন অসীম দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি ব্যক্তির প্রতিও রয়েছে রাষ্ট্রের সীমাহীন দায়িত্ব। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও স্বার্থরক্ষা যেমন ব্যক্তির পবিত্র দায়িত্ব, তেমনি ব্যক্তির সামাজিক উন্নতি ও সেবা করাও রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(চার) ব্যক্তির কৃতিত্ব রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে নাগরিকদের কৃতিত্ব, সফলতা এবং দেশপ্রেম। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের আলোকেই রাষ্ট্র আলোকিত।

(পাঁচ) অতীতে **রাষ্ট্রকে উপেয়** বলা হতো এবং ব্যক্তি চিহ্নিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় গৌরব অর্জনের মাধ্যম রূপে। বর্তমানে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে এবং রাষ্ট্রকে দেখা হয় এক কল্যাণকর সংস্থারূপে যা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত ব্যক্তির কল্যাণ সাধনে।

১। সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। নিম্নলিখিতগুলো কোন্ শ্রেণীতে পড়ে? (ক) ফরাসী জাতি, (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (গ) একটি ফুটবল ক্লাব, (ঘ) পরিবার? (Distinguish between an association and a community. Under which category fall : (a) The French Nation, (b) The University of Dhaka, (c) A Football club, and (d) A family?)

২। সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য সংক্ষেপে তা বর্ণনা কর। (Give a brief outline of the differences between a community and the state.)

৩। নিম্নলিখিত ধারণাগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। (ক) সমাজ, (খ) রাষ্ট্র ও (গ) জাতি। (Analyse the characteristics of the following concepts : (a) society, (b) state and (c) nation.)

৪। সমাজ ও অন্যান্য সংঘের সাথে রাষ্ট্রের পার্থক্য কী কী? (What are the differences between the state and society and other associations?)

৫। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। পরিবার ও অন্যান্য সংঘ থেকে রাষ্ট্রের পার্থক্য কী তা নির্দেশ কর। (Describe the nature of the state and distinguish it from the family and other associations.)

৬। রাষ্ট্রের প্রকৃতির বিবরণ দাও ও অন্যান্য সংঘ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Describe the nature of the state and distinguish it from other associations.)

৭। সমাজ কাকে বলে? রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (What is society? Distinguish between the state and society.) [R. U. 1984]

৮। রাষ্ট্র কী? রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক আলোচনা কর (What is a state? Discuss the relation between the state and society.) [N. U. 1996]

৯। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কী? রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক আলোচনা কর। (What is the objective of the state? Discuss the relation between the state and individual.) [N.U. 1997, 2006]
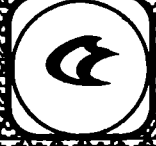
সূচনা
Introduction

চিন্তানায়কদের সুচিন্তিত অভিমত এবং চিন্তার ফসলে জ্ঞানরাজ্যের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে যুগে যুগে। জ্ঞানই মুক্তি। জ্ঞানের আলো বিভিন্নকালের ও বিভিন্ন যুগের জীবনধারায় আনয়ন করেছে অভিনবত্ব এবং স্বাচ্ছন্দ্য। সভ্যতা লাভ করেছে অগ্রগতি। সভ্যতার পথ হয়েছে প্রশস্ত। অবশ্য এও সত্য, কোন কোন যুগের জ্ঞানের মশালবাহী চিন্তানায়কগণ স্বীকৃতি লাভ না করে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন। মহামতি গ্যালিলিও এবং মহাপ্রাণ যীশুর উদাহরণ বিরল নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? জ্ঞানের সাধক যাঁরা তাঁদের গতিপথ যতই কণ্টকাকীর্ণ হোক না কেন তাঁরা কোনক্রমেই পশ্চাৎপদ হন না। বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি, শাসন ব্যবস্থার সারল্য, গণতন্ত্রের জয়যাত্রা, জীবনধারার পূর্ণ বিকাশের মূলে রয়েছে চিন্তানায়কদের চিন্তার ফসল। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল; বৃটেনের চিন্তাবিদ হব্‌স, লক্‌, মিল, বেন্থাম; ফরাসী স্বাপ্নিক রুশো, ইতালির চিন্তানায়ক মেকিয়েভেলী, জার্মান দার্শনিক হেগেল এবং মার্কস সর্বযুগের, সর্বদেশের এবং সর্বকালের। দেশ কাল পাত্রের ব্যবধান তাঁদের জ্ঞানের পরিধি কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ন করতে সক্ষম হয় নি। প্লেটো সেরূপ একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ যাঁর চিন্তাধারা সর্বকালের সম্পদ।

প্লেটো
Plato

মহামতি প্লেটো ছিলেন গ্রীক পণ্ডিতপ্রবর দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্য। বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রখ্যাত উদ্‌গাতা এরিস্টটল ছিলেন প্লেটোর শিষ্য। এই ত্রয়ী–সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল–বিশ্ব সভ্যতার তিনটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রসম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের অতুলনীয় অবদান চির ভাস্বর। এই মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি গুরু। প্লেটো খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে এথেন্সের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্প বয়সে সক্রেটিসের সাহচর্যে আসেন এবং তাঁর চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন।

প্লেটোর চিন্তাধারা ছিল বৈপ্লবিক। তাঁর গ্রন্থসমূহ চিন্তাক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর 'দি রিপাবলিক' *(The Republic)*, দি লজ' *(The Laws)*, 'দি স্টেটসম্যান' *(The Statesman)* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দশটি গ্রন্থের অন্যতম। আজ পর্যন্ত যত প্রকার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছে 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থে তা সূচিত হয়েছে। তাই 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থের প্রণেতা প্লেটো সকল বিদগ্ধ জনের নমস্য।

প্লেটোর চিন্তাধারার পটভূমি
Background of Plato's Thought

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্লেটোর ছিল অত্যন্ত হীন ধারণা। তাছাড়া, তিনি আইন প্রণেতাদের সম্পর্কেও অত্যন্ত নিচু ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর মতে জ্ঞানই সর্ব গুণের উৎস। অভিজাততন্ত্র, বিশেষ করে জ্ঞানী ও দার্শনিকদের শাসনই ছিল তাঁর নিকট সর্বোত্তম। তাঁর এসব ধারণা ও দৃষ্টিকোণকে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে হলে তাঁর চিন্তার পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

প্রথম, তিনি এথেন্সের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অভিজাতদের সাহচর্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন এথেন্সের শেষ রাজা কোড্রুসের বংশধর এবং মাতার দিক থেকে ছিলেন এথেন্সে গণতন্ত্রের প্রবক্তা সোলোনের (Solon) আত্মীয়। তাঁর বাল্যকাল ও যৌবন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় অভিজাতদের মধ্যে।

দ্বিতীয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁর প্রিয় শিক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের গুরু বলে অভিহিত মহান সক্রেটিসের মৃত্যু যেভাবে ঘটেছে তাও তাঁর চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর এতটুকু আস্থা ও শ্রদ্ধা রইল না।

তৃতীয়, তিনি সক্রেটিসের শিক্ষায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হন। সক্রেটিসের মহান মন্ত্র— 'জ্ঞানই গুণ', 'জ্ঞানই পুণ্য'—এভাবে প্লেটোর চিন্তাসূত্রের প্রধানতম স্তম্ভে পরিণত হয়ে ওঠে।

চতুর্থ, তিনি নিজে ছিলেন গাণিতিক এবং তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠতম গাণিতিক পিথাগোরাসের (Pythagorus) সাহচর্যে এসে গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

পঞ্চম, তখনকার দিনে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর খণ্ড-ছিন্ন-দুর্বল অবস্থাও তাঁর চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। একজন এথেন্সবাসী হিসেবে তিনি গ্রীসের নগর রাষ্ট্র, বিশেষ করে এথেন্সকে, আরও শক্তিশালী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি সব সময় মনে করতেন, একমাত্র অভিজাততন্ত্রই গ্রীসের রাষ্ট্রগুলোকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম

সর্বশেষ, জ্ঞান সম্পর্কে এথেন্সবাসীদের উদাসীনতা তথা তাদের মানসিক নৈরাজ্য (intellectual anarchy) তাঁকে গভীরভাব ব্যথিত করে তোলে। তাই তিনি গ্রীসের রাষ্ট্রগুলোকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করে নতুনভাবে সংহত করতে চেয়েছিলেন।

দি রিপাবলিক
The Republic

এই গ্রন্থটি বিশেষ কোন নীতি বা তত্ত্বের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নয়, বরং তা শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল দিকের জ্ঞানভাণ্ডারের পরিপূর্ণ প্রামাণ্য বিশ্লেষণ। রিপাবলিকে চারটি মূলসূত্র রয়েছে ঃ (১) আদর্শ রাষ্ট্রতত্ত্ব (Theory of Ideal State), (২) ন্যায়নীতি (Justice), (৩) সাম্যবাদ (Communism) এবং (৪) শিক্ষা ব্যবস্থা (Scheme of Education)। শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এমন নিখুঁত আলোচনা দেখে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) গ্রন্থটিকে শিক্ষাতত্ত্বমূলক আলেখ্য ('A treatise on education') বলে উল্লেখ করেন।

এ গ্রন্থে প্লেটোর দর্শনের প্রায় সর্বদিক বিশ্লেষিত হয়েছে এবং বলা যেতে পারে, মানব জীবনের সব দিকই তা স্পর্শ করেছে। এর মূল বিষয়বস্তু হলো উন্নত জীবন (good life) এবং পুণ্যবান ব্যক্তি (good man) যা প্লেটোর মতে শুধু একটি আদর্শ রাষ্ট্রে (ideal state) বিকশিত হতে পারে। তিনি বলেছেন, "একজন পুণ্যবান ব্যক্তি অবশ্যই একজন আদর্শ নাগরিক। কেননা, একটি আদর্শ রাষ্ট্র ছাড়া অন্য

কোথাও একজন পুণ্যবান ব্যক্তি থাকতে পারেন না" ("The good man must be a good citizen; a good man could hardly exist except in a good state")।[১]

"রিপাবলিক" গ্রন্থের মূল সুর তাই হয়েছে— "জ্ঞানই গুণ" বা "পুণ্যই জ্ঞান" (Virtue is knowledge)। তিনি বিশ্বাস করতেন, যা ভাল বা পুণ্য যুক্তিবাদের মাধ্যমে অথবা দর্শনের প্রক্রিয়ায় তা জানা ও অর্জন করা চলে। জ্ঞান অর্জন বা পুণ্যকে চেনার জন্যই তাঁর বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'একাডেমির" (Academy) প্রতিষ্ঠা করেন যাতে দার্শনিক রাষ্ট্র পরিচালনা তত্ত্ব (Philosophic statecraft) অর্জিত হয়। তাঁর এ বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়, যে ব্যক্তি জ্ঞানবান তিনিই দার্শনিক বা বিদ্বান বা বৈজ্ঞানিক এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু দার্শনিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত (The man who knows—the philosopher or the scholar or the scientist—ought to have decisive power in government) এবং জ্ঞানই এ ক্ষেত্রের একমাত্র যোগ্যতা।[২]

প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা এ ক্ষেত্রে সম্মিলিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, যেহেতু মানবের সকল কার্যক্রম তার নাগরিকত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই তার ধর্ম হলো রাষ্ট্রধর্ম এবং তার কলা হলো মূলত নাগরিক জীবনের কলা-কৌশল। তাই তিনি সব বিষয়কে একত্রিত করেছেন তাঁর এই অমর গ্রন্থে ("Since his religion was the religion of the state, and his art, very largely a civic art, there could be no sharp separation of these questions.")।[৩]

প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটিসের ন্যায় বিশ্বাস করতেন, পুণ্যই হলো জ্ঞান (Virtue is knowledge)। জ্ঞানকে কার্যে প্রতিফলিত করতে হলে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। যে রাষ্ট্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত, তাই আদর্শ রাষ্ট্র (Ideal State)। আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার থাকা উচিত দার্শনিক রাজা বা দার্শনিক শাসকের (Philosopher-king) উপর। দার্শনিক রাজা বা দার্শনিক শাসক যাতে কোনরূপ প্রলোভন বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হন তাই তিনি অভিভাবক শ্রেণীর জন্য ব্যবস্থা দিয়েছেন সাম্যবাদের (communism)। ফলে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ব্যক্তিগত পরিবার ব্যবস্থার মায়াজালের উর্ধ্বে থেকে জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারেন। যোগ্য পরিচালনার জন্য বিশিষ্ট এক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন। এই হলো প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর মূল সুর। এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিবৃত হলো ঃ

আদর্শ রাষ্ট্রতত্ত্ব
Theory of Ideal State

প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য উত্তম জীবন। সুতরাং তাঁর মতে, শুধু তাঁরাই আদর্শ রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য যাঁরা জানেন সমাজ জীবনের সর্বোত্তম পন্থা কী। শুধু তাঁরাই শাসনদণ্ড ধারণ করার যোগ্য যাঁরা নাগরিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা সম্বন্ধে সচেতন এবং জ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বল। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, 'দার্শনিক রাজাই' (Philosopher-king) আদর্শ রাষ্ট্রের কর্ণধার। এ ব্যবস্থা শুধু আদর্শ রাজতন্ত্র অথবা অভিজাততন্ত্রেই সম্ভব। তাঁর মতে, অবিমিশ্র অভিজাততন্ত্রই (Perfect Aristocracy) আদর্শ রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। গণতন্ত্রকে তিনি নিকৃষ্টতম সরকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হিসেবে তিনি গণতন্ত্রকে 'মুর্খের শাসনব্যবস্থা' বলে ঘৃণা করেছেন। তাঁর

---

১. George H. Sabine, *History of Political Theory*. New York : 1950. p-41.
২. Ibid
৩. Ibid, p-40

মতে গণতন্ত্রের মূলে জ্ঞানের, দর্শনের বা আলোকের কোন রশ্মি থাকে না। গণতন্ত্র মূলত জনতাতন্ত্র (mobocracy)। গণতন্ত্রে 'স্বাধীনতা' ও 'সাম্যের' (liberty and equality) বদলে তিনি রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন।

প্লেটোর মতে রাষ্ট্র সর্বাত্মক। রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে তিনি গণ্য করতেন। রাষ্ট্রের আওতা ছিল সর্বব্যাপী। জ্ঞানালোকে ভাস্বর 'দার্শনিক-রাজা (philosopher-king) একমাত্র রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্লেটো বিশিষ্ট মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র পাশবিক ক্ষমতার ফলস্বরূপ নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসৎ ব্যক্তি কোনদিনই সুখী হতে পারে না। তিনি মনে করতেন, মানুষের বাসনা ও কামনা সীমাহীন। তাছাড়া, বিভিন্ন ব্যক্তির বাসনা বিভিন্ন রূপ। এই বিভিন্ন বাসনা ও লক্ষ্যকে চরিতার্থ করার জন্য মানুষ স্বাভাবিকভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনে প্রয়াসী হয়। এই পারস্পরিক সহযোগিতা তথা সামাজিক প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

ব্যক্তিমন ঃ সামাজিক শ্রেণী

প্লেটোর মতে, মানুষের প্রবৃত্তি ও বাসনার মধ্যে তিনটি প্রবণতা উল্লেখযোগ্য ঃ (ক) ক্ষুধা বা ইতর প্রবৃত্তি (appetite), (খ) শৌর্যবীর্য বা গৌরববোধ (courage), এবং (গ) বিবেক বা উন্নত প্রবৃত্তি (reason)। মানব মনের এ তিন প্রবণতাকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যথা- (ক) কর্মী বা উৎপাদক শ্রেণী (labourers)। তারা দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা পার্থিব প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। (খ) সৈনিক গোষ্ঠী (warriors)। তারা প্রয়োজনবোধে স্বীয় জীবন বিপন্ন করেও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। (গ) শাসক গোষ্ঠী (magistrates)। তাঁরা জনগণের উন্নত জীবনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও সকলের মঙ্গল নিশ্চিত করেন।

ন্যায়নীতি

প্লেটোর মতে, ন্যায়নীতিই উন্নত সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ও সর্বোত্তম তাকে সে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করাই ন্যায়নীতি। এ ন্যায়নীতির উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রে কর্ম বিভাগ সম্পন্ন হয়। ফলে যে যে কার্যের জন্য পারদর্শী ও অভিজ্ঞ, তাকে সেই কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। এ শ্রম বিভাগের নীতিই বিশ শতকের অর্থনৈতিক তত্ত্বে এত গুরুত্ব লাভ করে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে এ ন্যায়নীতি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

দার্শনিক রাজা

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পিত হবে 'দার্শনিক রাজার' উপর। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ভাস্বর এক ব্যক্তি। প্রয়োজনবোধে 'দার্শনিক রাজা' অভিভাবক শ্রেণীর লোকদের সাহায্য গ্রহণ করবেন। আদর্শ রাষ্ট্রের কাঠামো সর্বাত্মক প্রকৃতির (totalitarian)। প্লেটোর মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম আইন হলো জ্ঞান (knowledge)। জ্ঞানই হলো পূণ্য। আইন রাষ্ট্র ও জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর। 'দার্শনিক রাজা' আইনের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আদর্শ রাষ্ট্রে বিধিবদ্ধ আইনের কোন স্থান নেই। দার্শনিক রাজা' ও অভিভাবকবৃন্দ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভায় পরিপূর্ণ হয়ে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে যা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য নির্দেশ দেবেন তাই আইন। তাই তিনি বলেছেন, "দার্শনিকগণ শাসক না হলে অথবা শাসকগণ দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ না করলে রাষ্ট্র কখনও অন্যায় থেকে মুক্তি লাভ

করতে পারে না" ("Unless the philosophers are kings or the kings have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from their evils.")।

'দার্শনিক রাজাকে' কতকগুলো মৌলিক নীতি মেনে চলতে হবে। মূলত চারটি মৌলিক নীতি বা কাঠামোর ভিত্তিতে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, যদিও কোন লিখিত আইনের গণ্ডিভুক্ত তিনি নন।

প্রথম, রাষ্ট্রে যেন ধন প্রাচুর্য না ঘটে, অথবা দারিদ্র্যের প্রবেশ না ঘটে সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

দ্বিতীয়, রাষ্ট্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্র খুব বৃহৎ হওয়াও সমীচীন নয়। খুব ক্ষুদ্র হওয়াও বিপদজ্জনক।

তৃতীয়, ন্যায়নীতির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক নাগরিক স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে পারে।

চতুর্থ, শিক্ষা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রবর্তিত। তাতে যেন কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত না হতে পারে তা তিনি দেখবেন। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থাই আদর্শ রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি।

প্লেটো দার্শনিক শাসকগণকে আইন প্রবর্তক হিসেবে কল্পনা করেননি। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যতদিন দার্শনিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে, ততদিন আইনের কোন প্রয়োজন থাকবে না। কারণ দার্শনিকগণ সর্বজ্ঞানী। তিনি বলেনঃ "যখন শাসক হবেন ন্যায়বান, তখন আইন নিষ্প্রয়োজন। আবার যখন শাসক দুর্নীতিপরায়ণ হন তখন আইন হবে নিরর্থক" ("When the prince is virtuous, laws are unnecessary; when prince is not virtuous, laws are useless")।

পরে অবশ্য তিনি এ মত পাল্টাতে বাধ্য হন। রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধান এবং আইনের যে প্রয়োজন আছে, তা পরবর্তী গ্রন্থ 'লজ' *(The Laws)*-এ তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করেন, বস্তুত জ্ঞানী ও পূর্ণ মানবের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তাই তিনি সংবিধান ও আইন ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক প্রকার দ্বিতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র (second best state) কায়েম করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

আদর্শ রাষ্ট্রের সমালোচনা
Criticisms of the Ideal State

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা অত্যন্ত অভিনব, কিন্তু বিভিন্নভাবে তা সমালোচিত হয়েছে।

প্রথম, এই রাষ্ট্র অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থে সৃষ্ট। উৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থ এতে সংরক্ষিত হয় নাই।

দ্বিতীয়, রাষ্ট্র ও মানব প্রকৃতির মধ্যে যে সাদৃশ্য অবলোকন করে তিনি এই আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে এক পঙক্তিতে ফেলে কোন সাধারণ সূত্র উদ্ভাবন সঠিক নয়।

তৃতীয়, তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে তাতে উৎপাদক শ্রেণীর কোন ভূমিকা নেই। তাই তা অপূর্ণ।

চতুর্থ, এই রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার ব্যবস্থার তিরোধান করে তিনি যে ব্যবস্থার সৃষ্টি করেন তা মানব মনের চিরন্তন অভিব্যক্তি ও প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেছে। তা স্বাভাবিকও নয়, সংগতও নয়।

পঞ্চম, তিনি শাসক শ্রেণীর জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাস্তবে এর সন্ধান নাও মিলতে পারে।

ষষ্ঠ, শাসকশ্রেণীর হাতে তিনি যেভাবে ক্ষমতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাতে রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হবে এবং এই ক্ষেত্রে প্লেটো কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখেন নি।

সপ্তম, তিনি যেভাবে রাষ্ট্রে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেন সেভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে এরিস্টটল প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রকে সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে।

এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র শুধু কল্পনাবিলাস। এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিধিবদ্ধ আইনবিহীন কোন রাষ্ট্র কোন কালে সম্ভব হয় নি, হতেও পারে না। আইন অধিকার বা স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে না। বরং তা সংরক্ষণ করে। তাঁর সাম্যবাদও ছিল নিছক আদর্শ। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি তাঁর 'স্টেটস্‌ম্যান' *(The Statesman)* এবং 'লজ' *(The Laws)* গ্রন্থে আইনের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো কল্পনার রথে চড়ে ভাবরাজ্যে বিচরণ্ করেন। কিন্তু তা হলেও তাঁর আদর্শ, ন্যায়নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সমাজকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। মর্তে যদি তাঁর আদর্শ বাস্তবায়িত না হয় তা হলে ত্রুটি বাস্তবতার, মর্তের, তাঁর আদর্শের নয়। সন্ধ্যাকাশের রঙিন স্বপ্নের ন্যায় তাঁর ভাবাদর্শ মানব জাতিকে সর্বদা হাতছানি দিতে থাকবে।

প্লেটোর দার্শনিক রাজা
Philosopher King

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের (Ideal state) মধ্যমণি দার্শনিক রাজা (Philosopher king)। প্লেটো যেভাবে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি অঙ্কিত করেছেন তাতে দার্শনিক রাজার পদমর্যাদা সর্বোচ্চ। তাঁর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের মৌল ভিত্তি হলো—"পূণ্যই জ্ঞান" (Virtue is knowledge)। এ সত্য তিনি তাঁর গুরু সক্রেটিসের নিকট থেকে লাভ করেছেন। তাছাড়া, এথেন্সের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাও এ সত্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসকে করেছে দৃঢ়। তিনি বিশ্বাস করতেন, "যা উত্তম তা জানা সম্ভব ও অর্জন করা সম্ভব। তা অন্তর্দৃষ্টি, অনুমান বা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যুক্তি বা যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের উপর নির্ভরশীল।"

এ সত্য যে তিনি শুধু বিশ্বাস করতেন তাই নয়, সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে দার্শনিক রাষ্ট্র তত্ত্বের (philosophic statecraft) উদ্ভাবন এবং তাঁর শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁর অমর বিদ্যায়তন 'একাডেমি' (Academy) পরিচালনা করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল অত্যন্ত সরল। একজন উত্তম ব্যক্তি অবশ্যই একজন উত্তম নাগরিক এবং উত্তম নাগরিক শুধু উত্তম রাষ্ট্রেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর নিকট রাষ্ট্র ছিল সকল নৈতিকতা, সততা ও পুণ্যের আবাসভূমি।

তিনি বলতেন, জ্ঞানই যদি পুণ্য হয়, তবে পুণ্যবান হলেন তিনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী–দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক। এবং সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রে একমাত্র জ্ঞানীদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকা উচিত ('The one who knows—the philosopher or scholar or scientist ought to have decisive power in government')। এ সত্যই প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থের সর্বত্র অনুরণিত এবং এই হলো তাঁর দার্শনিক রাজার (philosopher king) ভিত্তিভূমি।

প্লেটোর দার্শনিক রাজার শাসন সম্বন্ধে অধ্যাপক গেটেল বলেন, "জ্ঞানই যদি পুণ্য হয় এবং জ্ঞান যদি অর্জন করা সম্ভব হয় এবং শুধু কিছুসংখ্যক ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন, তা হলে জ্ঞানী ব্যক্তির হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। সোজা কথায়, দার্শনিকগণ হবেন রাজা।"[১] প্লেটোর কথায়, যে পর্যন্ত দার্শনিকগণ নিজের দেশের শাসক হচ্ছেন কিংবা যারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাঁরা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা অণুপ্রাণিত না হচ্ছেন,–অন্যকথায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দর্শনের সম্মিলন যতক্ষণ পর্যন্ত

---

১. R.G. Gettell, *History of Political Thought,* P. 52.

সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ বিশৃংখল পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের কোন আশা নেই" ("Unless either philosophers become kings in their countries or those who are now called kings and rulers come to be sufficiently inspired with a genuine desire for wisdom... political power and philosophy meet together... there can be no rest from troubles.")।[১]

দার্শনিক রাজার বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Philosopher-King

১। প্লেটোর মতে, দার্শনিক রাজা সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী। তিনি সত্য ও সুন্দরের পূজারী এবং অসত্য ও অসুন্দরকে অবজ্ঞাকারী। ২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন। "প্রকৃত জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর রয়েছে গভীর আগ্রহ।" তাঁর অন্তর অত্যন্ত উদার এবং মন সংস্কার মুক্ত। ৩। তিনি ন্যায় ও নম্রতার প্রতীক। তাঁর বোধশক্তি তীব্র এবং স্মরণশক্তি প্রখর।

২। "তাঁর চরিত্রে রয়েছে সঙ্গীতের মূর্ছনা এবং আচরণ স্বর্গীয় দীপ্তিতে ভাস্বর। দৈহিক ভোগবিলাসে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। অর্থ ও সম্পদের প্রতি তাঁর রয়েছে এক প্রকার অনীহা।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দার্শনিক রাজা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের কর্ণধার। কোন জাহাজের নিরাপত্তা যেমন সুদক্ষ নাবিকের পরিচালনার উপর নির্ভরশীল, তেমনি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং গৌরব নির্ভর করবে দার্শনিক রাজার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর।

সমালোচনা
Criticisms

প্লেটোর দার্শনিক রাজার নীতি প্লেটোর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথম, তাঁর দার্শনিক রাজার নীতির জন্যই তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনাবিলাসী ও অবাস্তব আখ্যা লাভ করেছেন। যেহেতু রাজা সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী, কোন আইনের বাধাবন্ধন তাঁর কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করবে না। তিনিই আইনের উৎস। অস্টিন যেমন পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'আইন হলো সার্বভৌমের আদর্শ" ('Law is the command of the sovereign') তেমনি প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিক রাজার আদেশ-নিষেধই আইন। যে কোন বিষয়ে তিনি নিজের প্রজ্ঞা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তাই প্লেটোর দার্শনিক রাজার নীতিকে স্বৈরাচারী বলে আখ্যায়িত করা হয়। অধ্যাপক বার্কার (Barker) বলেন, "তাঁরা যে নামেই পরিচিত হোন, দার্শনিক রাজা স্বৈরাচারী,-স্বৈরাচারী এ অর্থে যে কোন লিখিত আইন দ্বারা তাঁদের কার্যকলাপ সীমিত নয়" ("By whatever name they go the philosophic rulers are absolute, absolute in the sense that they are untrammelled by any written law")।[২]

দ্বিতীয়, প্লেটোর দার্শনিক রাজার শাসন দায়িত্বহীন। জনগণের নিকট রাজার কোন দায়িত্বশীলতা নেই। এটি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যবস্থা। রাজার সাথে জনগণের কোন সম্পর্কের কথা প্লেটো চিন্তা করেননি। রাজা জনসাধারণের ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে।

---

১. *The Republic* of Plato (Translated by F.M. Cornford). Oxford : 1951. P 174.
২. E. Barker, *Greek Political Theory : Plato and his Predecessors.* P. 237.

তৃতীয়, প্লেটোর দার্শনিক রাজার নীতি "শাসিতের সম্মতিভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ" ("A challenge to government by the consent of the governed")।[১] শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে গণতন্ত্রের যে আন্দোলন পরবর্তীকালে গণমনকে উদ্বেল করে তা প্লেটোর এ তত্ত্বে অস্বীকৃত হয়েছে।

চতুর্থ, এ নীতি অভিজাত এক ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছে। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা, সাম্যবাদ ও শাসন ব্যবস্থা সব কিছুই তার ইঙ্গিত বহন করে।

তবে এ ক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, প্লেটো রাষ্ট্রতত্ত্বকে এমন এক স্তরে উন্নীত করেন যা শুধু বিজ্ঞানসম্মত নয়, অত্যন্ত উচ্চ স্তরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্বেষণদর্শী এক কলাও বটে। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর প্রচেষ্টাকে এক মহতী প্রচেষ্টা বলে গণ্য করা চলে। রাষ্ট্রতত্ত্বকে আজ পর্যন্ত কেউ এমন সুমহান উচ্চ বেদীতে আসীন করেননি।

পঞ্চম, প্লেটো বাস্তব রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রেক্ষিতে এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করেন। ফলে আদর্শের সাথে বাস্তবের সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি যে সব সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন তাও অনেকটা বিশ্বজনীন। এজন্য তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের হাতছানি সব সময়ই মানবকে নতুনত্বের পথে আকৃষ্ট করবে।

ন্যায়নীতি
Justice

প্লেটোর মতে ন্যায়নীতি সমাজজীবনের ভিত্তিমূলস্বরূপ। ন্যায়নীতিকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের ঐক্য (unity of state) প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হার তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্র' (Ideal state)। ন্যায়নীতিকে সমাজে ও রাষ্ট্রনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্লেটো তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি (system of education) এবং 'সাম্যবাদ' (communism) প্রবর্তন করেন।

এখানে প্রশ্ন হলো- ন্যায়নীতি' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? কিভাবে তা নির্ধারিত হয়?

প্লেটোর মতে ব্যক্তির বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। তাই নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সকলে পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়। এ সহযোগিতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী সামাজিক কার্যে নিযুক্ত হয়। প্লেটো মনে করেন যে, ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে কার্যে নিয়োগ করলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ ঘটে। স্বাভাবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য সর্বোত্তম তাকে সে কাজে নিয়োগ করলে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়। যোগ্যতার মানদণ্ডে পরিমাপ করে যথাযোগ্য পর্যায়ে নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটো বলেন যে, "ন্যায়নীতি হলো সে উদার নীতি, যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব স্ব প্রাপ্য দেয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে" ("giving every man his due")।

প্লেটোর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে কর্তব্য পালন করে এবং যদি ব্যক্তির যোগ্যতানুসারে কার্য বিভাগ বা শ্রমবিভাগ সংগঠিত হয়, তা হলে ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রের ঐক্য দৃঢ় হয়।

---

১. Peter H. Markb, *Political Continuity and Change.* New York : 1967, P. 30.

ন্যায়নীতি সম্বন্ধে প্লেটোর সিদ্ধান্ত তাঁর রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মতবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি চেয়েছেন এক আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে। তিনি অনুভব করেন, রাষ্ট্র তখনই সুশৃংখল ও সুসংহত হবে যখন রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তাদের প্রকৃতিগত নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকবে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক যদি নিজ নিজ স্বভাবগত কাজে নিযুক্ত থেকে কাজ করে যায়, তা হলে রাষ্ট্র থেকে বিশৃংখলা ও অনিয়ম চিরতরে বিলুপ্ত হবে। উৎপাদকেরা শুধু রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করবে। সৈনিকেরা রাষ্ট্র রক্ষায় নিযুক্ত থাকবে। জ্ঞানী ও দার্শনিকেরা রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন। তা হলে রাষ্ট্রের মধ্যে সামগ্রিক সংহতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের বিভক্তিকরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে দার্শনিক শাসকদের উপর।

ন্যায়নীতির সমালোচনা
Criticisms of Justice

(এক) প্লেটোর ন্যায়নীতিকে গতিহীন বলে সমালোচনা করা হয়। কেননা, শ্রমবিভাগ ও বিশেষত্বশীলতার মধ্যে গতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি এ নীতির ফলে সারা জীবন ধরে বিশিষ্ট এক স্থানে অবস্থানে বাধ্য হয়। ফলে তাদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই তাঁর ন্যায়নীতিকে 'অপূর্ণ' এবং 'মৃত' এক নীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

(দুই) প্লেটোর অনুসৃত ন্যায়নীতির সাথে বর্তমান যুগের ন্যায়ধর্মের প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। এ ন্যায়নীতি প্রত্যেক মানুষকে কি কি করতে হবে তারই নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকার কিভাবে সংরক্ষিত হবে তার কোন নিশ্চয়তা এতে নেই।

(তিন) প্লেটোর ন্যায়নীতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঘোর পরিপন্থী। তিনি রাষ্ট্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণরূপে শ্রেণীগত পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যা সাম্যের পরিপন্থী হিসেবে দণ্ডায়মান হয়েছে।

তবে আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্লেটো যে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন বিশ শতকের উৎপাদন ব্যবস্থায় সে শ্রমবিভাগ ও বিশেষত্বশীলতার সার্থক প্রয়োগ দেখে সমালোচকরা শুধু যে হতবাক হন তাই নয়, তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্বে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন।

প্লেটোর ন্যায়নীতি ও আধুনিক ন্যায়নীতি
Plato's Justice and Modern Justice

প্লেটোর ন্যায়নীতি (Justice) এবং আধুনিক ন্যায়নীতির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট ব্যবধান। প্লেটোর ন্যায়নীতির মূল কথা হলো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের তিন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অন্যদের হস্তক্ষেপ ছাড়া কর্ম সম্পাদন। অন্যকথায়, বিশেষত্বশীলতাই (specialization) প্লেটোর ন্যায়নীতির মূল লক্ষ্য। যারা যে কাজের উপযুক্ত তাদের সে ক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখাই প্রধান কথা।

আধুনিক ন্যায়নীতি কিন্তু এক আইনগত ধারণা। আইন ভঙ্গ হলে আইন ভঙ্গকারীর জন্য বিচার বিভাগ বিচারপূর্বক শাস্তি প্রদান করবেন। আধুনিক ন্যায়নীতির মৌল বিষয় হলো আইনের আওতায় যার যা প্রাপ্য তা নিশ্চিত করা। আইনের রাজত্ব এ ক্ষেত্রে মুখ্য।

সুতরাং উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবধানগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

(এক) প্লেটোর ন্যায়নীতি এক প্রকার নৈতিক ধারণা, কিন্তু আধুনিক ন্যায়নীতি এক প্রকার আইনগত এবং বিচার বিভাগীয় ধারণা।

(দুই) প্লেটোর ন্যায়নীতি মূলত কর্ম সম্পাদন ও কর্মের বিভাগ সংক্রান্ত। যে যে কাজের যোগ্য তার সে ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকা প্রয়োজন। আধুনিক ন্যায়নীতি কিন্তু অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারো অধিকার ভঙ্গ হলে ন্যায়নীতির প্রশ্ন ওঠে, অন্য সময়ে নয়।

(তিন) প্লেটোর ন্যায়নীতি প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত, কিন্তু আধুনিক ন্যায়নীতি নাগরিকের জীবনকে ঘিরে সব প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(চার) প্লেটোর ন্যায়নীতি অভিজাত প্রকৃতির, কিন্তু আধুনিক ন্যায়নীতি সর্বব্যাপক ও সর্বজনীন।

সাম্যবাদ
Communism

প্লেটোর সাম্যবাদের ভিত্তি হলো তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্রতত্ত্বের' ন্যায়নীতি (Justice)। আড়াই হাজার বছর পূর্বে সাম্যবাদ সম্বন্ধে প্লেটো যা চিন্তা করেছেন আধুনিককালের সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁর সাথে একমত না হলেও তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও যুক্তিযুক্ততায় সকলেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে ওঠেন।

ন্যায়নীতির ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে অভিভাবক শ্রেণী কোনরূপ প্রলুব্ধ না হয়ে যেন নিঃস্বার্থভাবে এবং দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে ও প্রতিরক্ষা কার্যে নিয়োজিত থাকতে পারেন, সে সাম্যবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়। প্লেটো বলেন, সর্বজনীন অভিজ্ঞতায় অনুধাবন করা যায় যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হলে শাসন ব্যবস্থার দক্ষতা ও সততা গুরুতররূপে ব্যাহত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করেই সমাজে দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অনৈক্য, কলহ, স্বার্থপরতা এবং হিংসা-দ্বেষ। ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। অন্যপক্ষে, পরিবারিক জীবন সমাজে আনয়ন করে মায়ার বন্ধন। ফলে উদ্ভূত হয় স্বার্থপরতা। ফলে সমাজ অন্যায়, অবিচার ও স্বজনপ্রীতি দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়ে।

তাই প্লেটো মনে করতেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। সাম্যবাদ প্রবর্তন করে তাই তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবনকে বিলুপ্ত করে 'আদর্শ রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, প্লেটোর সাম্যবাদে 'আদর্শ রাষ্ট্রের' শাসক শ্রেণী (ruler) এবং সৈনিক শ্রেণীর (warrior) কোনরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারবে না। তাঁরা স্বতন্ত্র নিবাসে বসবাস করবেন এবং একই স্থানে আহার গ্রহণ করবেন (They shall live in barracks and have their meals at a common table)। সম্পত্তির কোনরূপ লোভ না থাকায় তাঁরা নির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে প্রতিপালনে সক্ষম হবেন।

তাঁদের ভরণপোষণের ব্যাপারে প্লেটো বলেছিলেন, শাসক শ্রেণীর ভরণপোষণের ব্যয়ভার অবশ্যই রাষ্ট্র বহন করবে। তাঁদের ব্যয়ভার বহনের জন্য টাকা-পয়সা রাষ্ট্রের উৎপাদক শ্রেণী যোগাবে। কারণ, উৎপাদক শ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়।

দ্বিতীয়ত, অভিভাবক শ্রেণীর কোন স্থায়ী এক-পত্নীক যৌন সম্বন্ধ (Permanent monogamous sexual relation) বা কোনরূপ স্থায়ী বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে না। তার পরিবর্তে, শাসক শ্রেণীর নির্দেশক্রমে নিয়ন্ত্রিত জন্মদান ব্যবস্থার ফলে **প্রথম,** উন্নত ধরনের সন্তান-সন্ততি উৎপাদন সম্ভব হবে। **দ্বিতীয়,** সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে। **তৃতীয়,** সকলেই রাষ্ট্রের সাথে একাত্মতা অনুভব করবে এবং সকলে একই স্বরে 'আমার' বা 'তাঁর' উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হবে না। বরং অভ্যস্ত হবে সমস্বরে "আমাদের" বলতে। সকলে সমভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করবে।

প্লেটো তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার পরিজনের প্রতি মানুষের প্রকৃতিগত মায়া স্বভাবত মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। মানুষ নিজের সন্তান সন্ততি, স্ত্রী, পরিবার-পরিজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে। সেজন্য প্লেটো শাসক শ্রেণীকে পরিবারের আওতা থেকে মুক্ত করেন। যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নারীর সাথে মিলিত হতে পারবেন।

তবে প্লেটোর সাম্যবাদে উৎপাদক শ্রেণীর কোন স্থান নেই। তাদের ক্ষেত্রে এ সাম্যবাদ প্রযোজ্য হবে না। তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবন উপভোগ করতে পারবে।

প্লেটোর সাম্যবাদের সমালোচনা
Criticisms of Plato's Communism

প্লেটোর সাম্যবাদ বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথম, প্লেটোর সাম্যবাদ তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য নয়। তা আংশিক সাম্যবাদ; কেননা, এ সাম্যবাদ শুধু রাষ্ট্রের দুটি শ্রেণীর জন্য-শাসক শ্রেণী ও সৈনিক শ্রেণীর-জন্য প্রযোজ্য। এ ব্যবস্থায় উৎপাদক শ্রেণীর জীবন যাপন প্রণালী, তাদের শিক্ষা, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সাথে তাদের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় প্লেটোর নিকট অত্যন্ত গৌণ মনে হয়েছিল।

দ্বিতীয়, প্লেটো তাঁর সাম্যবাদে শাসক ও সৈনিক শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তিগত পরিবার প্রথা রহিত করে যে ব্যবস্থার কথা বলেন, তা মানব সভ্যতা বিরোধী বলে অনেকে আখ্যায়িত করেন। মানবের ব্যক্তিত্ব ও সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশে এ দুটি প্রতিষ্ঠান অনন্তকাল থেকে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্লেটো এই প্রতিষ্ঠানের তিরোধান ঘোষণা করে মানব সভ্যতার গতি-প্রকৃতির বিরোধিতা করেন।

তৃতীয়, প্লেটোর সাম্যবাদে পরিবার প্রথা উচ্ছেদের যে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তা মানবের শালীনতাবোধের বিরোধী।

চতুর্থ, এ ব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতি তেমন জোর দেয়া হয় নি, এবং যোগ্যতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে অভিজাততন্ত্রের মূলে বারি সিঞ্চন করা হয়েছে।

পঞ্চম, প্লেটো জ্ঞান ও নৈতিকতার ভিত্তিতে তাঁর সৌধ নির্মাণ করেন। এ ব্যবস্থা কিন্তু ইতিহাসের সাথে সম্পর্কহীন।

এরিস্টটলের সমালোচনা
Criticisms by Aristotle

প্লেটোর যোগ্যতম শিষ্য এরিস্টটলও এ সাম্যবাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। প্লেটোর পরিবার প্রথা উচ্ছেদের সমালোচনা করে এরিস্টটল বলেন, বিবাহ ব্যবস্থা মানব সমাজের একটি সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতে প্লেটোর ব্যক্তিগত পরিবার উচ্ছেদের প্রস্তাব সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করবে ও পারিবারিক ঐতিহ্য ও পরিবেশ বিনষ্ট করবে। ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ হ্রাস পাবে। সন্তানরা হবে স্নেহবঞ্চিত ও সমাজ হারাবে এক সুস্থ প্রতিষ্ঠান।

সম্পত্তির সাম্যবাদ সম্পর্কেও তিনি বলেন, অভিভাবক শ্রেণীর সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করে প্লেটো মানুষের প্রবৃত্তি ও মানসিকতাকে অস্বীকার করেছেন ও তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছেন। এরিস্টটলের মতে, সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্যবাদের প্রয়োজন নেই, বরং শিক্ষা ব্যবস্থার সুসংগঠনই তা সম্ভব করতে পারে।

তাছাড়া, এ ব্যবস্থা মানবের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকাশের জন্য বিরাট প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

প্লেটোর সাম্যবাদ ও আধুনিক সাম্যবাদ
Plato's Communism and Modern Communism

প্লেটোর সাম্যবাদ ও আধুনিক সাম্যবাদের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

প্রথম, প্লেটোর সাম্যবাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং শাসকদের দক্ষতা ও নিঃস্বার্থ উদ্যোগের নিশ্চয়তা বিধান করা। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদের লক্ষ্য সর্বহারাদের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধান করা। আধুনিক সাম্যবাদে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দ্বিতীয়, প্লেটোর সাম্যবাদ আংশিক ও অপূর্ণ। এই সাম্যবাদ শুধু অভিভাবক শ্রেণী ও সৈনিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উৎপাদক শ্রেণীকে তিনি এর অন্তর্ভূক্ত করেন নি। উৎপাদক শ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবারিক জীবনে সুখ সম্ভোগ করতে পারবে। তাই প্লেটোর সাম্যবাদকে বলা হয় **'অভিজাত সাম্যবাদ'**। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদ সর্বশ্রেণীর, সর্বজনের এবং এক সর্বজনীন ব্যবস্থা। প্লেটোর সাম্যবাদ সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য, কিন্তু সমগ্র সমাজে তা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদের লক্ষ্য সর্বজনীন মঙ্গল করা এবং সকলের উপরই তা প্রযোজ্য।

তৃতীয়, প্লেটোর সাম্যবাদে শুধু যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটবে তা নয়, এতে পারিবারিক জীবনেরও বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটেছে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এ ব্যবস্থায় পারিবারিক ব্যবস্থা অক্ষত থাকে।

চতুর্থ, প্লেটোর সাম্যবাদে রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। তাঁর মতে, 'আদর্শ রাষ্ট্রে' শাসক, যোদ্ধা ও উৎপাদক–এ তিন শ্রেণী বিদ্যমান। সাম্যবাদের আওতাধীন থাকবে শাসক ও যোদ্ধা–এ দুই শ্রেণী। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদে কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। বরং শ্রেণীহীন সমাজ (Classless Society) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আধুনিক সাম্যবাদের লক্ষ্য।

পঞ্চম, এও বলা যায়, প্লেটোর সাম্যবাদ ছিল এক অভিজাত শাসন ব্যবস্থা। বর্তমান সাম্যবাদ কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।

ষষ্ঠ, প্লেটোর সাম্যবাদে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ভিত্তি ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা। এই উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়। আধুনিক সাম্যবাদে কিন্তু রাষ্ট্র উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সকল প্রকার বিপদ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে দৃঢ় সংকল্প।

সপ্তম, প্লেটোর সাম্যবাদ ও আধুনিক সাম্যবাদের মৌলিক অঙ্গীকার ছিল স্বতন্ত্র। প্লেটো মনে করেন সমাজবদ্ধ জীবনের জন্য রাষ্ট্র অপরিহার্য। তাছাড়া তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্রের পরিচালনা ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকাই মুখ্য হওয়া উচিত। আধুনিক সাম্যবাদীরা কিন্তু রাষ্ট্রকে সমাজবদ্ধ জীবনের জন্য অপরিহার্য মনে করেন না। তাঁদের মতে, এক শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজন। শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হলে রাষ্ট্রের তিরোধান (withering away of the state) ঘটবে। তাছাড়া, রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে আধুনিক সাম্যবাদীরা কোন অভিজাতশ্রেণীর মুখ্য ভূমিকার কথা বিশ্বাস করেন না।

উভয় ব্যবস্থার মধ্যে মিলও রয়েছে প্রচুর। **(এক)** উভয় ব্যবস্থাতে একই মানসিকতা লক্ষণীয়। তা হলো জন্ম ও বংশ এবং মর্যাদার উর্ধ্বে এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। **(দুই)** উভয়ের লক্ষ্য মানুষের মন থেকে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা দূর করে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বৃদ্ধি করা ও মানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। প্লেটো চেয়েছিলেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বন্দ্ব যেন না থাকে। আধুনিক সাম্যবাদীরা চান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতা যেন না থাকে। **(তিন)** উভয় ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য এক আদর্শ

সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। **(চার)** উভয় সাম্যবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন করে মানবিক প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ অস্বীকার করেছে। **(পাঁচ)** উভয় ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিরোধিতা করেছে ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত এক ব্যবস্থার সূচনা করেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা
Scheme of Education

প্লেটো যে 'আদর্শ রাষ্ট্র' গঠনের পরিকল্পনা করেন, তা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি বিশিষ্ট এক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির বৈচিত্র্য এবং যৌক্তিকতায় মুগ্ধ হয়ে ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) তাঁর 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থটিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এক মহান আলেখ্য বলে আখ্যায়িত করেন।

মূলত তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি ছিল প্রগতিশীল। অনেক বিজ্ঞজন তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'মহান বস্তু' ("A great thing") বলে উল্লেখ করেন। সমগ্র জীবনের ব্যাপ্তি সমন্বয়ে তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত। আসলে তিনি সাম্যবাদের চেয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ন্যায়নীতি ভিত্তিক প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার মাধ্যমে মানব মনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে আদর্শ রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্লেটো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে (Ideal State) শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অত্যধিক। এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল শাসনক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংযোজন। অধ্যাপক বার্কারের কথায়, 'তা (শিক্ষা ব্যবস্থা) মানসিক ঔষধের মাধ্যমে মানসিক রোগ নিরাময়ের এক উদ্যোগ" ("It is an attempt to cure a mental malady by mental medicine")। দার্শনিক রুশো (Rousseau) প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "প্লেটোর "রিপাবলিক' গ্রন্থটি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর লিখিত সর্বাপেক্ষা উত্তম আলেখ্য" ("The Republic is the finest treatise on education that was ever written")।

তিনি নিয়ন্ত্রিত এক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন (A state controlled system of compulsory education)। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়বস্তু ছিল দ্বিবিধ। **প্রথম,** শরীর গঠনমূলক (gymnastics), **দ্বিতীয়,** মন উন্নয়নমূলক (music)।

শরীর গঠনমূলক বিষয়সমূহে নাগরিকদের শরীর চর্চা তথা দৈহিক গঠনের প্রতি গরুত্ব আরোপ করা হয়। মন উন্নয়নমূলক বিষয়সমূহে নাগরিকদের মানসিক বিকাশ সাধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সর্বসাধারণের জন্য, কিন্তু মনোনীত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শিক্ষার বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভূক্ত ছিল অংকশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, দর্শন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধীয় বিদ্যা।

প্লেটো তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থাকে দু ভাগে বিভক্ত করেন ঃ **(ক) প্রাথমিক শিক্ষা,** ও **(খ) উচ্চ শিক্ষা।** প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক বালক ১২ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যায়াম, সংগীত, কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে। তার পর ২০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক যুবককে যুদ্ধ বিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ২০ বছর বয়স থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত তারা উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে অধিকতর জটিল বিদ্যায় জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করবে। এ সময়ে তাঁরা গণিতশাস্ত্র, জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করবে ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ আয়ত্তে আনয়ন করবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ শাসন পরিচালকদের মধ্যে দার্শনিক জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার উন্মেষের চেষ্টা করা হবে, যাতে, তাঁরা ভবিষ্যতে দার্শনিক শাসকরূপে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

৩৫ বছর কাল শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থিগণ দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদসমূহে অধিষ্ঠিত হবেন এবং যারা এ পর্যায়ের শিক্ষায় দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হবেন তারা অধঃস্তন পদে নিয়োজিত হবেন। তবে এই পর্যায়ই শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি নয়। দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হবার পরেও ১৫ বছর কাল তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই শিক্ষা হবে ব্যবহারিক, বাস্তব ও প্রায়োগিক। বিভিন্ন কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে শিক্ষা তাই এই পর্যায়ের মৌল শিক্ষা। এভাবে প্লেটো তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্রে" অভিভাবকদের সমগ্র জীবন প্রলম্বিত এক শিক্ষা ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত বা বেসরকারি নয়। তা রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত (state controlled) ও সরকারি।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র মানব মনের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই নাগরিকবৃন্দ উচ্চতর নৈতিকতা, তীব্র বুদ্ধিমত্তা ও গভীর দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। তাই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বহু বছর পূর্বে এভাবে প্লেটো তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্রের' জন্য এক আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত যে, বর্তমান যুগেও একে অনুসরণের চেষ্টা চলছে। তিনি মানসিক শিক্ষার উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করেন তেমনি শিক্ষার্থীদের শারীরিক গঠন ও সামর্থ্য অর্জনের উপরেও জোর দিয়েছেন। কোন জটিল আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করতে গেলে দার্শনিকের শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকা প্রয়োজন।

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার অভিনবত্ব সম্পর্কে অবশ্য কোন কোন লেখক মত প্রকাশ করেন যে, এ ব্যবস্থা নতুন নয়। **অধ্যাপক স্যাবাইনের** (Sabine) কথায়, "এটি ছিল এথেন্স (Athens) নগরীর তরুণদের যে শিক্ষা দেয়া হতো তার সাথে স্পার্টা নগরীর (Sparta) রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংমিশ্রণ। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়বস্তু প্লেটো ভয়ঙ্করভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন" ("Combining the training usually given to the son of an Athenian gentleman with the state controlled-training given to a youthful Spartan")।[১]

এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য, প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এক অভিজাত শিক্ষা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত। নাগরিকদের স্বাধীন ও সহজাত অগ্রগতিতে এ ব্যবস্থা তেমন সহায়ক ছিল না। এতে এক প্রকার রক্ষণশীলতা বিদ্যমান ছিল। তা ছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী।

এ ব্যবস্থা বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথম, এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। ফলে এ ব্যবস্থা ছিল সর্বাত্মক।

দ্বিতীয়, এ ব্যবস্থা মোটেই গণতান্ত্রিক ছিল না। আদর্শ রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর জন্য তা প্রযোজ্য ছিল না। শুধু শাসকশ্রেণী ও সৈনিক শ্রেণী এর সুবিধা লাভে সক্ষম হতো। উৎপাদক শ্রেণীর জন্য এ ব্যবস্থায় কোন ব্যবস্থা ছিল না।

তৃতীয়, এ শিক্ষা ব্যবস্থা সময় ও অন্যান্য দিক থেকে ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সারাজীবনব্যাপী শিক্ষা এ ব্যবস্থায় স্থির করা হয়।

---

১. George H. Sabine, *OP Cit* P-61.

চতুর্থ, এই ব্যবস্থায় বৃত্তিগত ও প্রায়োগিক শিক্ষার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। বেঞ্জামিন জোয়েট (Benjamin Jowett) বলেন, এ ব্যবস্থায় ছিল সঙ্গীতের অভূতপূর্ব প্রয়োগ। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় দেহের উপর আত্মার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্বশেষে, এও বলা যায়, প্লেটোর এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সংকীর্ণ। সামাজিক প্রেক্ষিতে তা পুরাপুরি কার্যকর ছিল না। ব্যক্তির দিক থেকে এটি অবাস্তব ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল অগণতান্ত্রিক।

আইন সম্পর্কে প্লেটোর অভিমত
Plato's Views on Law

প্লেটোর 'আদর্শ রাষ্ট্রে' বিধিবদ্ধ আইনের (formulated law) কোন স্থান নেই। "দার্শনিক রাজা" ও অভিভাবকবৃন্দের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাই ছিল প্লেটোর নিকট মহামূল্যবান। জ্ঞানোলোক উদ্ভাসিত "দার্শনিক রাজার" নির্দেশই আইন। প্লেটো বলেছেন, দার্শনিকগণ শাসক না হলে অথবা শাসকগণ দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ না করলে রাষ্ট্র কখনও বিশৃংখলা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না।" অন্য কথায়, প্লেটোর মতে জ্ঞানই সার্বভৌম আইন। সুতরাং যাদের জ্ঞান রয়েছে শুধু তারাই নির্দেশ করতে সক্ষম। ফলে তাঁরা আদর্শ রাষ্ট্রে কোন আইন পরিষদ বা আইন প্রণেতার উল্লেখ নেই। দার্শনিক রাজাই আইন প্রণয়নকারী। তিনি যে নির্দেশ দিবেন তাই আইন। জ্ঞানই হলো পুণ্য। জ্ঞান রাষ্ট্র তথা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর। দার্শনিক রাজা যেহেতু এ জ্ঞানের অধিকারী, তাই তিনি কোন বিধিবদ্ধ আইনের সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমিত নন।

প্লেটো দার্শনিক রাজাকে আইন প্রবর্তক হিসেবে কল্পনা করেননি। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যতদিন দার্শনিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে ততদিন বিধিবদ্ধ কোন আইনের প্রয়োজন হবে না, কেননা দার্শনিক রাজাই সর্বজ্ঞ। তিনি বলেন, "শাসক যখন ন্যায়বান হন তখন আইন নিষ্প্রয়োজন। আবার যখন শাসক দুর্নীতিপরায়ণ হবেন তখনও নিরর্থক হয়ে উঠবে; কেননা, দুর্নীতিপরায়ণ শাসক আইন ভঙ্গ করবেন।" ফলে বিধিবদ্ধ আইনের কোন প্রয়োজন নেই।

পরবর্তীকালে প্লেটো তাঁর মত পাল্টাতে বাধ্য হন এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লজ *(The laws)*-এ তিনি স্বীকার করেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধান ও বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োজন রয়েছে। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে চিত্রিত মহাজ্ঞানী দার্শনিক রাজার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেও তিনি এ সত্য অনুধাবন করেন। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ স্টেটসম্যান *(The Statesman)*-এ এই সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। তাই তিনি পরবর্তীকালে সংবিধান ও বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে এক প্রকার দ্বিতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র (the second best state) সংগঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি 'আদর্শ রাষ্ট্র' হিসেবে 'রিপাবলিক' গ্রন্থে চিত্রিত রাষ্ট্রের যে আদর্শ সমুন্নত করেছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব কোন সময়ে অস্বীকার করেন নি।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্লেটোর অভিমত
Plato's Views on Democracy

প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক', 'লজ' ও 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি অমর গ্রন্থে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, দার্শনিক রাজার নিয়ন্ত্রণে অভিভাবক শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত অভিজাততন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার ব্যবস্থা। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র নিকৃষ্টতম সরকার ব্যবস্থা। অভিজাততন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্লেটো যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো উত্তম জীবন। কিন্তু উত্তম জীবনের মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে জ্ঞানের মধ্যে। ফলে যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানালোকে ভাস্বর শুধু তাঁরাই জানেন সর্বোত্তম জীবন কীভাবে অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং জ্ঞানালোকে সমুজ্জল

'দার্শনিক রাজা' এ পথের দিশারী হবার যোগ্য। 'আদর্শ রাষ্ট্রের' কর্ণধার তাই 'দার্শনিক রাজা'। এক মাত্র তাঁরাই সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ও উন্নত জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম।

গণতন্ত্রে কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন জনগনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং এ অংশে জ্ঞানের আলোক প্রায় অনুপস্থিত। তাই গণতন্ত্রকে তিনি 'মুর্খের শাসন' বলে উল্লেখ করেন। এর কারণ দ্বিবিধ ঃ **(এক)** গণতন্ত্রের লক্ষ্য উন্নত ও সৎ জীবন নয়, বরং গণতন্ত্রের লক্ষ্য স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ। এ সকল আদর্শ প্লেটোর মতে সৎ জীবনের পক্ষে সহায়ক হতে নাও পারে। **(দুই)** গণতন্ত্রের মূলে জ্ঞানের, দর্শনের বা আলোকের কোন রশ্মি থাকে না, থাকে শুধু সংখ্যার জোর। তাই গণতন্ত্র কোন আদর্শ জীবনের উপযোগী নয়।

প্লেটোর মতে গণতন্ত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো আকাঙ্ক্ষা (desire), উপভোগের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা। এর ফলে স্বাধীনতা পর্যুদস্ত হয়, এমন কী গণতান্ত্রিক নীতিমালার বাড়াবাড়ির ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। স্বার্থপর ও অগ্নিগর্ভ বক্তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে ধনিকতন্ত্রের রূপ লাভ করে। গণতন্ত্রকে প্লেটো তুলনা করেছেন বহু মস্তক বিশিষ্ট একটি মানুষের সাথে যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রচুর কিন্তু মেধা বলতে কিছুই নেই, যদিও অন্তঃকরণ রয়েছে। এ ব্যবস্থা কোন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালকদের তিনি এমন কর্ণধারের সাথে তুলনা করেন যিনি রাষ্ট্রীয় জাহাজ চালনায় অদক্ষ, যিনি দূরের বস্তু দেখতে অক্ষম এবং দূরের শব্দ শুনতে অপারগ, অথচ সে কর্ণধার দাবি করেন সকল প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব। প্লেটো এ দাবিদারদের এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেন এবং জ্ঞানভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র যার কর্ণধার দার্শনিক রাজা সে ব্যবস্থার আবেদন সৃষ্টি করেন।

১। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বিবরণ দাও। (Describe the elements of Plato's Ideal State.)
[R. U. '80, '93; D. U. '82]

২। প্লেটোর মতে ন্যায়নীতির বৈশিষ্ট্য কী? (What are the characteristics of justice according to Plato?) [D. U. '83, 2003, 2006]

৩। প্লেটোর সাম্যবাদ সম্বন্ধ কী জান? (What do you know of Plato's Communism?)
[D.U. '83, 1999]

৪। প্লেটোর সাম্যবাদ এবং আধুনিক কম্যুনিজমের তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of Plato's Communism and modern communism.) [D. U. '80]

৫। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the system of education as enunciated by Plato.) [D. U. '80, 2000, 2002]

৬। প্লেটোর দার্শনিক রাজার শাসন সম্বন্ধে কী জ্ঞান? (What do you know of the rule of Philosopher King of Plato?)

৭। প্লেটোর রিপাবলিক সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss Plato's Republic) [D. U. 1981]

৮। প্লেটো কে ছিলেন? তাঁর সাম্যবাদ বিশ্লেষণ কর। (Who was Plato? Explain his theory of communism.) [R. U. 1984]

৯। প্লেটো আইন এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে কেমন ধারণা পোষণ করতেন? (What were Plato's views on law and democrecy?)

ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা কবি কোলরিজ (Coleridge) বলেছিলেন "প্রত্যেক মানুষ হয় প্লেটোপন্থী হয়ে, না হয় এরিস্টটলপন্থী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।" অনেকে আবার এ বক্তব্যকে সংশোধন করে বলেন, "প্রত্যেকে জীবনের এক পর্যায়ে হয় প্লেটোপন্থী এবং আর এক পর্যায়ে হয় এরিস্টটলপন্থী।" গ্রীক দর্শনের এ দুই মহাপণ্ডিতের গুণাবলী এতই সর্বজনীন এবং আমাদের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য তাঁদের মতবাদে এমনভাবে বিন্যস্ত যে প্রায় প্রত্যেকে আমরা মানসিকতার দিক দিয়ে হয় প্লেটোপন্থী, না হয় এরিস্টটলপন্থী। কেউ প্লেটোর ন্যায় সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট (general to particular), আবার কেউ এরিস্টটলের ন্যায় নির্দিষ্ট থেকে সাধারণ (particular to general) সূত্রে উপনীত হয়। কেউ অনুসরণ করে প্লেটোর অবরোহ পদ্ধতি (deductive)। আবার কেউ এরিস্টটলের আরোহ পদ্ধতি (Inductive) অনুসরণ করে।

সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল–এই মহান ত্রয়ী (trio) জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ এবং তাঁদের তুলনা সাধারণত মেলে না। জোর করে তুলনা করতে চাইলে কিছুটা নমুনা মেলে জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte), কাণ্ট (Kant) এবং হেগেলের সাথে অথবা মার্কস, লেনিন ও স্ট্যালিনের সাথে।

অসংখ্য পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করেছেন যে, 'এরিস্টটল জ্ঞানীদের গুরু' ("the master of them that know")। সমগ্র অতীতকালে এত গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং এত বড় উন্নত মন (encyclopedic mind) আর একটিও দেখা যায় না। অনেকে আবার মনে করেন, তিনি এত প্রশংসার দাবিদার নন। তবে এ কথা ভুললে চলবে না, এত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর এমন ব্যাপকভাবে এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য খুব কম লোক পেশ করেছেন এবং বিদ্যাবত্তার 'চূড়ান্ত আদালতে' তাঁর যে প্রাধান্য তা একক, অপূর্ব এবং অনবদ্য। যুক্তিবিদ্যার উপরে তিনি যা বলেছেন, যান্ত্রিক কলা-কৌশল (mechanics) সম্পর্কে তিনি যা প্রকাশ করেছেন, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তার যে মতামত, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে তার যে অভিমত, চারুকলা ও কাব্যের উপরে তাঁর যে বক্তব্য, বিশেষ করে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর যে সিদ্ধান্ত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তা চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়েছে। তাঁর তথ্য ছিল নিখুঁত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ এবং সুতীক্ষ্ণ। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল অজেয়। তাঁর তুলনাহীন পাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে তাঁর গ্রন্থের প্রতি ছত্রে। গ্রীক দর্শন ও সংস্কৃতির অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র এরিস্টটল। প্রাচীনকালে তিনি ছিলেন অনেকটা সবজান্তার মত। তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

তাঁর জীবনী
His Life

এরিস্টটলের জন্ম হয় থ্রেসের (Thrace) উপকণ্ঠে স্টাগিরা (Stagira) শহরে খ্রিঃ পূঃ ৩৮৪ সনে। তিনি এথেন্সের আদি অধিবাসী ছিলেন না, যদিও এ শহরে জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন। প্লেটোর ন্যায় তিনি অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন না। তবে তাঁর পিতার অবস্থা ছিল

সচ্ছল। তাঁর পিতা নিকোমেকাস (Nichomachus) ছিলেন ম্যাসিডন অধিপতির চিকিৎসক। তাঁর সম্পদ ছিল এবং তিনি নিজ সন্তানকে দেশের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত শিক্ষায়তনে শিক্ষা দিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর পিতা ও অন্যান্য চিকিৎসকদের অধীনে তিনি চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। খ্রিঃ পূঃ ৩৬৬ সনে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি ১৮ বছর বয়সে এথেন্সে আসেন ও প্লেটোর স্বনামখ্যাত শিক্ষায়তন একাডেমির (Academy) ছাত্র হন। তখন প্লেটোর বয়স ছিল ৬২ বছর। এক প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে তিনি প্লেটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্লেটো তাঁকে একাডেমির 'মধ্যমণি' বলতেন। এখানে তিনি সুদীর্ঘ ২৪ বছর শিক্ষা লাভ করেন। সকলে আশা করেছিলেন প্লেটোর মৃত্যুর পর তিনি একাডেমির প্রধান হবেন। কিন্তু অবশেষে তিনি নিরাশ হলেন। প্লেটোর স্থলাভিষিক্ত হলেন প্লেটোর ভ্রাতুস্পুত্র স্পুসিপ্পাস (Spusippus)। এতে তিনি দুঃখিত হন এবং এথেন্স ত্যাগ করে এশিয়া মাইনরে এক স্বৈরাচারী শাসক হার্মিয়াসের (Hermias) চিকিৎসক ও তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। খ্রিঃ পূঃ ৩৪২ সনে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক হিসেবে তাঁকে আহবান করেন। এখানে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেন এবং খ্রিঃ পূঃ ৩৩৬ সনে এথেন্সে ফিরে আসেন। লাইসিয়ামের মন্দির পার্শ্বে প্লেটোর একাডেমির মত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় 'লাইসিয়ামে'র (Lyceum), ভিত্তি স্থাপন করেন। এখানে তিনি সুদীর্ঘ বার বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত থাকেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এথেন্সে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাঁর বিরুদ্ধে অসতর্কতার অভিযোগ আসে, যেমনটি এসেছিল সক্রেটিসের বিরুদ্ধে। তখন তিনি এথেন্স ত্যাগ করে চ্যালসিস (Chalsis) নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে খ্রিঃ পূঃ ৩২২ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

এরিস্টটলের লেখনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। গুণের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি একদিকে যেমন নীতিশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য এবং অর্থনীতির উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন, অন্যদিকে তেমনি পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, শরীরবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও অনেক সৃষ্টিধর্মী আলোচনা করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। এজন্য তাঁকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক (Father of Political Science) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত **'রাজনীতি'** *(The Politics)* গ্রন্থটি একটি অমর গ্রন্থ। তাছাড়াও তিনি **'দি কনস্টিটিউশন অব এথেন্স'** *(The Constitution of Athens)* এবং **'দি কনস্টিটিউশনস'** *(The Constitutions)* গ্রন্থও লেখেন। 'দি পলিটিক্স' গ্রন্থে তাঁর বিশ্বগ্রাসী এক মনের (encyclopedic mind) পরিচয় পাওয়া যায়।

প্লেটো এবং এরিস্টটল
Plato and Aristotle

এরিস্টটল প্লেটোর ভাবাদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক বিষয়ে তিনি স্বীয় গুরু প্লেটোর মতামত থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন।

(এক) প্লেটো ছিলেন ভাববিলাসী এক আদর্শবাদী, কিন্তু এরিস্টটল ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। প্লেটো যেখানে কল্পনার স্বর্ণরথে আকাশ চারণ করতেন, এরিস্টটল সেখানে ধূলির ধরণীতে স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। প্লেটো তাঁর অমর গ্রন্থ **'দি রিপাবলিক'** *(The Republic)* সর্বকালের সর্বজনের সর্ব অবস্থায় এক 'আদর্শ রাষ্ট্র' (Ideal State) গঠনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এরিস্টটল তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **'পলিটিক্স্'** *(Politics)*-এ দেখিয়েছেন কিভাবে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ পরিস্থিতিতে এক আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়।

(দুই) প্লেটোর সৃষ্টিতে একটি সুর প্রাধান্য পেয়েছে এবং তা হলো আদর্শের মধ্যেই চূড়ান্ত বাস্তবতা বর্তমান। অরূপের মধ্যে তিনি রূপের সন্ধান করেছেন। এরিস্টটল কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন

অন্যপথে এবং অন্য পদ্ধতিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাস্তবতা ও প্রকৃত সত্তা পূর্ণ আদর্শে মেলে না। আমরা আমাদের চারপার্শ্বে যা দেখি, অনুভব করি এবং যার সংস্পর্শে আসি, তাদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব সত্তা। তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ, সচেষ্ট পর্যালোচনা ও সাবধানে অবলোকন করলে তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে দেখেছেন অবিশ্বাসের সাথে এবং তাঁর মতে অভিজ্ঞতা থেকে কোন সত্য আবিষ্কৃত হয় না। তাঁর পদ্ধতি ছিল একজন গাণিতিক বা অঙ্কবিশারদের। প্লেটোর একাডেমির দ্বারপ্রান্তে উৎকীর্ণ ছিল- **"যে গণিত বোঝে না, এ বিদ্যাঙ্গনে প্রবেশের কোন অধিকার তার নেই"**। কিন্তু এরিস্টটল বাস্তব ঘটনাকে ভালবাসতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই তিনি সবিশেষ মূল্য দিয়েছেন। তাই যেখানে প্লেটোর কল্পনা ডানা ঝাপটেছে, সেখানে এরিস্টটল বিজ্ঞানীর মত অভিজ্ঞতার নুড়ি কুড়িয়েছেন। বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল যে তত্ত্ব সম্ভাব্যতার সীমানায় বাস্তবায়িত হতে পারে তাই মূল্যবান।

(তিন) প্লেটো সাধারণ সূত্র (general) থেকে নির্দিষ্ট তত্ত্বে (particular) নেমে আসেন, কিন্তু এরিস্টটল হাজারো ঘটনা বৈচিত্র্য অবলোকন করে সাধারণ সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত। মন যত সুন্দর ছবি আঁকতে পারে প্লেটো এমনি এক আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি অঙ্কন করেছেন। কিন্তু এরিস্টটল বর্তমান পরিস্থিতির উপর বর্তমান অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।

(চার) রচনাভঙ্গির ক্ষেত্রেও রয়েছে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ভাষা প্রয়োগে প্লেটো ছিলেন এক দক্ষ কথাশিল্পী। এরিস্টটল এ বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। কিন্তু উভয়েই চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রে মানুষ আদর্শ জীবন-যাপন করুক। এরিস্টটল মত প্রকাশ করেন, প্লেটো যে রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন তা মানুষের আদর্শ জীবন সংগঠনে সক্ষম হবে না। প্লেটো ছিলেন সর্বপ্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি সর্বাত্মক (totalitarian) ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, কিন্তু এরিস্টটল ছিলেন সর্বপ্রথম চিন্তাবিদ যিনি শাসনতান্ত্রিকতার কথা বলেন এবং আইনের প্রশাসনকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দেন।

(পাঁচ) রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। প্লেটোর মতে, রাষ্ট্রে ঐক্য ও সংহতি যত বৃদ্ধি পাবে রাষ্ট্রের মঙ্গল তত বেশি সম্পন্ন হবে। কিন্তু এরিস্টটলের মতে, রাষ্ট্রে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে রাষ্ট্র প্রথমে একটি পরিবার ও পরে একটি ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হবে।

(ছয়) প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র মূলত অভিজাত শ্রেণীর জন্য। সমাজের উৎপাদক শ্রেণীর জন্য তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কোন সুবিধা সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্রে বিশেষ কোন সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করা হয় নি।

(সাত) প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে সম্পত্তি ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এক সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তাদের মূলোচ্ছেদ করতে চান, কিন্তু এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্রে সম্পত্তি ও পরিবারে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি।

(আট) রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দার্শনিকের মধ্যে ছিল বিরাট মত পার্থক্য। প্লেটোর মতে, রাজনীতি নীতিশাস্ত্রের অধীন। নীতিশাস্ত্রই রাজনীতিকে পরিচালিত করবে। কিন্তু এরিস্টটলের মতে রাজনীতি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যদিও উভয়ের মধ্যে রয়েছে গভীর এক যোগসূত্র।

(নয়) প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র ছিল এক সর্বাত্মক শাসন ব্যবস্থা। দার্শনিক রাজাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজার কার্য সকল আইনের উর্ধ্বে। কিন্তু এরিস্টটল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আইনের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করেন।

(দশ) সরকারের শ্রেণীবিভাগ ও প্রকৃতি সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে ছিল কিছুটা পার্থক্য। প্লেটোর মতে, সর্বোত্তম সরকার অভিজাততন্ত্র। কিন্তু এরিস্টটল আদর্শ রাজতন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট সরকার বলে চিহ্নিত করেন।

উভয়ের মধ্যে এই যে বিরাট ব্যবধান তার কতকগুলো কারণ রয়েছে।

প্রথম, জীবনের প্রভাতকাল থেকেই এরিস্টটল জীববিজ্ঞানের প্রতি ছিলেন আগ্রহী। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং এ সকল তাঁর চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্লেটো ছিলেন অঙ্ক বিশারদ। তাঁর নিকট সংখ্যা বা একক ছিল মুখ্য। দুই আর দুই–এ মিলে চার হয় এবং তা অপরিবর্তনীয়। তাই তিনি বলতেন, জ্ঞানই যদি গুণ হয়, তবে তর্ক আর কিসের? জ্ঞানের অনুসন্ধান কর। কিন্তু এরিস্টটল বলতেন, জ্ঞানই গুণ সত্যি, কিন্তু সে জ্ঞানের মাত্রা আছে, স্থান–কাল–পাত্র ভেদে তা বিভিন্ন হতে পারে।

দ্বিতীয়, প্লেটো ছিলেন একজন অভিজাত এথেন্সবাসী। রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা। উঁচু বেদী থেকে তিনি আরও উঁচুতে দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু এরিস্টটল ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণতর ছিল। তাই তিনি বাস্তবতার প্রতি হয়েছেন গভীরভাবে আকৃষ্ট। তাই উভয়ের চিন্তাধারায় এত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

তবে এও উল্লেখযোগ্য, দুইজনের মধ্যে মিলও ছিল প্রচুর। প্লেটো ছিলেন এরিস্টটলের গুরু এবং এরিস্টটল ছিলেন প্লেটোর শিষ্য। অধ্যাপক ফস্টারের (Foster) মতে, প্লেটোর ভাবধারায় যারা সর্বাপেক্ষা বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এরিস্টটল ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য ('Aristotle is the greatest of all platonists')। এক অভিন্ন ঐতিহ্যের ক্রোড়ে উভয়েই লালিত। হোমার থেকে সক্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত যে পটভূমি, প্লেটো ও এরিস্টটল দুজনেই তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। দুজনেই গ্রীসের খণ্ড–ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, পারস্পরিক কোন্দলে জীর্ণ নগর–রাষ্ট্রগুলোর রোগগ্রস্ত অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়েছেন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতিকার চিন্তায় ছিলেন ক্লিষ্ট। প্লেটোর মৌলিক শিক্ষা–'পুণ্যই জ্ঞান' (Virtue is knowledge) এরিস্টটল মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন এবং তার বিরুদ্ধচারীদের বিরুদ্ধে উভয়েই সমানভাবে সোচ্চার। সোফিস্টদের প্রতি দুজনেই ছিলেন ক্রুদ্ধ। উভয়েই বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে মানব জীবনের প্রয়োজনে এবং মানবের উন্নততর জীবনের প্রয়োজনে রাষ্ট্র বিদ্যমান রয়েছে।

এরিস্টটলের পদ্ধতি
Methods of Aristotle

এরিস্টটলের পদ্ধতি ছিল পর্যবেক্ষণমূলক। তিনি তাঁর গুরু প্লেটো যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তা গ্রহণ না করে গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। প্লেটোর পদ্ধতি ছিল দার্শনিক। দার্শনিক পদ্ধতিতে কতকগুলো সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে তা থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে নতুন মত স্থাপন করতে হয়। এরিস্টটল প্লেটোর পদ্ধতি সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন তা হলো, ইতিহাসের প্রতি প্লেটো যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। শৈশবের ও প্রথম যৌবনের প্রাণিবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল তার ফলে এরিস্টটল বাস্তবতার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অতীতের ও সমকালীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাই তিনি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেন। তাই শোনা যায়, এরিস্টটল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পলিটিক্স' রচনার সময় প্রায় দেড়'শ নগর–রাষ্ট্রের সংবিধান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, **"পর্যবেক্ষণই আমাদিগকে সর্বপ্রথম জ্ঞান দান করে।"** তাই তিনি রাজনৈতিক সমস্যা অনুধাবনের জন্য তুলনামূলক পঠন–পাঠনের রীতি প্রচলিত করেন। তিনি অনুভব করেন, বিভিন্ন রাষ্ট্র অতীতে যে রূপ বা আকারে ছিল, তার জ্ঞান ছাড়া সে সকল রাষ্ট্রের পরিণতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

তাঁর পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো অতীত ঐতিহ্য ও প্রথাপদ্ধতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। প্রকৃতপক্ষে তিনি বৈপ্লবিক কোন প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে বরং সংস্কারের প্রতি ছিলেন অধিক মনোযোগী। সুতরাং এ সকল দৃষ্টে মনে হয়, তিনি তাঁর অভ্যাস, শিক্ষা ও মানসিকতার প্রভাবেই ঐতিহাসিক এবং পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাঁর গ্রন্থ পলিটিক্‌স
The Politics

তাঁর অমর গ্রন্থ **'পলিটিক্‌স'** (রাষ্ট্রনীতি) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সংযোজন। অধ্যাপক জেলার (Zeller) বলেন, **"স্মরণাতীত কাল থেকে মানব সমাজে যে অমূল্য সম্পদ আমাদের নিকট এসেছে, এ গ্রন্থটি তাদের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান"**। এরিস্টটলের **'পলিটিক্‌স'** গ্রন্থ সম্পর্কে অধ্যাপক বাউল (Bowle) যা বলেন, তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "**এ বিষয়ে যতগুলো গ্রন্থ আছে তার মধ্যে 'পলিটিক্‌স' গ্রন্থটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।**

অবশ্য এও সত্য যে, তাঁর 'পলিটিক্‌স' গ্রন্থটি যেভাবে আমাদের নিকট এসে পৌছেছে তাতে একে এক অসম্পূর্ণ রচনা বলে মনে হয়। এক অংশের সাথে অন্যটি যেন অসংলগ্ন। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে সব মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে 'পলিটিক্‌স' গ্রন্থটি সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ। ফলে এর মূল্যায়নে যে সকল অভিমত প্রকাশিত তাও পরস্পর বিরোধী। অধ্যাপক টেইলর (Taylor) এ গ্রন্থটিকে "এক অসাধারণ সৃষ্টি" বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে অনেকে এই গ্রন্থটিকে "অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন" বলেও চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক বার্কারের (Barker) মতে, এ গ্রন্থটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক গ্রন্থ নয় বরং তা একটি প্রবন্ধ সংকলন।

এ অসংলগ্নতার কারণ হিসেবে অনেকে অনেক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কারো মতে 'পলিটিক্‌স' ছিল এরিস্টটলের বক্তৃতারাজির সার সংকলন। কারো মতে এটি ছিল তাঁর বক্তৃতার সারাংশ। কেউ কেউ আবার বলেন, এটি এরিস্টটলের রচনা নয়, এটি ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন লাইসিয়ামের (Lyceum) কোন অধ্যক্ষের রচনাবলী। তবে খুব সন্তোষজনক এবং প্রামাণ্য অভিমত এই যে, **'পলিটিক্‌স'** গ্রন্থ এরিস্টটলের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সংকলন। এ গ্রন্থের অসংলগ্নতার অন্যতম কারণ হলো গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নি। এর কোন কোন অংশের খোঁজ আজও মিলে নি।

এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এবং এর মধ্যে দুটি মূল সুর সংযোজিত হয়েছে। প্রথমটি আদর্শ রাষ্ট্র ও তার অন্তর্ভুক্ত নীতিসমূহ এবং দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও তাদের রূপান্তর। গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সমালোচনাসহ পূর্ববর্তী তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে। গ্রন্থের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকৃত সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ সকল সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ, পার্থক্য প্রভৃতিও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য
Nature, Origin and Objectives of the State

'পলিটিক্‌স' গ্রন্থের প্রথমদিক এরিস্টটল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর পূর্ববর্তী সোফিস্ট মতবাদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি প্রমাণ করতে উদ্যত হন যে, রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান (a human organization)। রাষ্ট্র কোন চুক্তি বা জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে। রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র ঐশ্বরিক কোন ক্ষমতার বলে অথবা কোনরূপ চুক্তির ফলে গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্র কোন পাশবিক শক্তির ফলস্বরূপ নয়। মানুষের আদর্শ জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে মানুষ সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা" ("Man is by nature a social and political animal. Who does not live in society is either a beast or a god.")। সমাজ জীবনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এবং উত্তম জীবনের তাগিদে তা চালু রয়েছে।

যে অর্থে পরিবারকে স্বাভাবিক বলা হয়ে থাকে, সে অর্থে রাষ্ট্র স্বাভাবিক। পরিবার যেমন ব্যক্তি জীবনের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক, রাষ্ট্রও তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার জন্য যেমন পরিবারের জন্ম হয়েছে, তেমনি সমাজজীবনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে এও বলা প্রয়োজন, এরিস্টটল তাঁর গুরু প্লেটোর ন্যায় সামাজিক মানুষের নৈতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধির কথা কখনও ভুলেননি। রাষ্ট্র মানুষের নৈতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি আনয়নের একটি মৌলিক একক। এডমণ্ড বার্কের (Edmund Burke) ন্যায় তিনি অনুভব করেছিলেন, "রাষ্ট্র হলো সমস্ত কলা, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত সংস্কৃতির অংশীদারী মানবীয় মহান প্রতিষ্ঠান।"

রাষ্ট্র সর্বোচ্চ সংস্থা
Highest Organisation

মানবীয় সকল সংস্থার সর্বোচ্চ রাষ্ট্র। নাগরিকগণ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং পরিবার বা জনপদ থেকে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। রাষ্ট্র নৈতিকতা বৃদ্ধির জন্য অধিকতর প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করেছে। তাই রাষ্ট্রের স্থান সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সর্বোচ্চ।

রাষ্ট্রের ঐক্য
Unity of State

এরিস্টটল রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। রাষ্ট্র হলো সকল প্রকার মানবিক সংস্থার সামগ্রিক রূপ এবং সকলের উর্ধ্বে রাষ্ট্রের মর্যাদা। রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জার সংমিশ্রণে যেমন মানব দেহ, তেমনি হাজারো মানবিক প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত রূপ রাষ্ট্র। পরিবার এবং জনপদ প্রভৃতির সমন্বয়ে রাষ্ট্রের জন্ম। তবে রাষ্ট্র শুধুমাত্র এদের সম্মিলনই নয়। মানবের যেমন থাকে এক আত্মা, যা মানব দেহ ও মনকে সচল করে রাখে তেমনি রয়েছে রাষ্ট্রের এক সত্তা। সদস্য হিসেবে মানুষ স্বীয় ব্যক্তিজীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। রাষ্ট্র ছাড়া মানুষ কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাঁর মতে, প্লেটোর সাম্যবাদ ঈপ্সিত রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনয়নে সক্ষম হবে না। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবনের বিলোপ ঘটলে রাষ্ট্রের প্রতি অনেকে উদাসীন হয়ে পড়তে পারে। কলহ বিবাদের ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিরোধানের সাথে সাথে ঔদাসীন্য বেড়ে উঠতে পারে। কেননা, যে সম্পত্তি সকল সন্তানের তা সকলেই পরিত্যাগ করতে পারে। এরিস্টটল আরো বলেন, "স্ব-অধিকারই সকল স্নেহের ভিত্তি" ("Personal affection is the basis of all affections")। সুতরাং পাবিরারিক জীবন উচ্ছেদ করলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং লক্ষ্য
Nature and End of State

মানুষের জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র এক অপরিহার্য সংঘ। মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। তিনি একশত আটান্নটি রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ **(এক)** সমাজে আইনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা (To establish sovereignty of law)। **(দুই)** নাগরিকদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা (To establish equality for all)। **(তিন)** শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা (To set up constitutional government), এবং **(চার)** উত্তম জীবনের প্রতিষ্ঠা করা (To promote good life)।

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ
Classification of State

এরিস্টটল কর্তৃক রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ সর্বজনবিদিত। তিনি গুণ ও সংখ্যার (Quality and Quantity) ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন করেন। রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্রকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ঃ

(ক) রাজতন্ত্র ঃ যে শাসন ব্যবস্থায় একজন সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

(খ) অভিজাততন্ত্র—যে শাসন ব্যবস্থায় কতিপয় ব্যক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

(গ) পলিটি বা গণতন্ত্র-যে শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র জনসাধারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্রকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

(১) রাজতন্ত্র (Monarchy) ঃ এই শাসন ব্যবস্থায় সকলের মঙ্গলের জন্য এক ব্যক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

(২) স্বৈরতন্ত্র (Tyranny) ঃ এই শাসন ব্যবস্থায় স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য এক ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

(৩) অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) ঃ এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রে জনসাধারণের জন্য কতিপয় ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

(৪) ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) ঃ এই ব্যবস্থায় কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় কার্য উদ্ধারের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

(৫) পলিটি বা গণতন্ত্র (Polity) ঃ এই ব্যবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের জন্য সকলে শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

(৬) জনতাতন্ত্র (Democracy) ঃ এই শাসন পদ্ধতিতে জনতা নিজ নিজ শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষমতা করায়ত্ত করেন।

এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ/রেখাচিত্র—১

	শাসকের সংখ্যা ১		স্বাভাবিক রূপ ২		বিকৃত রূপ ৩
১	একজনের শাসন (Rule by one)		রাজতন্ত্র (Monarchy)		স্বৈরতন্ত্র (Tyranny)
২	কয়েকজনের শাসন (Rule by few)		অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)		ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)
৩	বহুজনের শাসন (Rule by many)		গণতন্ত্র (Polity)		জনতাতন্ত্র (Democracy)

এরিস্টটলের মতে, জনতাতন্ত্র ছিল নিকৃষ্টতম সরকার এবং আদর্শ রাজতন্ত্র ছিল সর্বোৎকৃষ্ট সরকার। তিনি তাঁর গুরু প্লেটোর ন্যায় 'আদর্শ রাষ্ট্রের' কোন চূড়ান্ত স্বরূপ বর্ণনা করেন নি। তাঁর মতে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সরকার উত্তম বা নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়। তবে তিনি আইনের সার্বভৌমত্বের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শাসনতান্ত্রিক সরকার তাঁর নিকট আদর্শ শাসন ব্যবস্থা।

এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। **প্রথম,** তাঁর শ্রেণীবিভাগ আধুনিক যুগে অচল। আধুনিক সরকারের রূপ ও প্রকৃতি গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং আধুনিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগে প্রতিফলিত হয়নি। **দ্বিতীয়,** এরিস্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করেছেন তা অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু বর্তমানে সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। **তৃতীয়,** তিনি গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে যে শ্রেণীবিভাগ করেন তা আধুনিককালের বৃহদায়তন রাষ্ট্রের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। **চতুর্থ,** তিনি জনতাতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট ধরনের রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেন, কিন্তু আধুনিককালে তাঁর নির্দেশিত বহুজনের সরকার শ্রেষ্ঠ সরকার বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। **পঞ্চম,** তাঁর মতে আদর্শ রাজতন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার, কিন্তু আধুনিককালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত প্রায়।

এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি

Nature of Aristotle's Best Possible State or Ideal State

এরিস্টটল প্লেটোর ন্যায় কোন 'আদর্শ রাষ্ট্রের' কল্পনায় সচকিত হয়ে ওঠেননি। তাঁর মতে, জনসাধারণের মঙ্গলই ছিল রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং যে শাসন ব্যবস্থায় তা অর্জন করা সম্ভব হয় তাই সর্বোৎকৃষ্ট সরকার। তিনি সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নি। তিনি জাতীয় সরকার অথবা আধুনিক কালের বৃহৎ রাষ্ট্রের সম্বন্ধে কোন ধারণা দিতে সক্ষম হন নি। তাঁর চিন্তাধারা গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ সময়ে যে রাষ্ট্র স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় তাই তার নিকট আদর্শ রাষ্ট্র। এই আদর্শ রাষ্ট্রের এক অনবদ্য চিত্র তিনি অঙ্কন করেন। নিচে তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হলো।

(এক) রাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অধিক হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, জনসংখ্যা ১০ হাজার হলে ভাল হয়। কিন্তু কোন মতেই এক লক্ষের অধিক হওয়া উচিত নয়। তদানীন্তন এথেন্সের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ। আয়তন সম্পর্কেও তিনি তাই বলেন। রাষ্ট্রের আয়তন এমন হওয়া উচিত যাতে জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। তিনি বলেন, যে রাষ্ট্রের আয়তন যত বড় হবে, সে অনুপাতে তার শক্তি তত হ্রাস পাবে।

(দুই) রাষ্ট্র সমুদ্রের উপকূল হতে বেশি দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত নয়। সমুদ্রের উপকূলে রাষ্ট্র অবস্থিত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে এর সুবিধা হবে। তখন রাষ্ট্র শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে। তবে তেমন রাষ্ট্রের একটি নৌবহর থাকা দরকার।

(তিন) রাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে জলবায়ুর কথা বিবেচনা করা উচিত। উষ্ণ অঞ্চলে রাষ্ট্র অবস্থিত হলে তার শক্তিহানি ঘটবে। শীতপ্রধান অঞ্চলে রাষ্ট্র অবস্থিত হলে রাষ্ট্র সংস্কৃতি চর্চায় উদাসীন হবে। রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ পরিবেশ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া পরিবেষ্টিত অঞ্চল। সেখানকার জলবায়ু ও আবহাওয়া জনগণের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষতার সহায়ক হবে।

(চার) নগরের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য, রাজনৈতিক ও যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে দেখতে হবে। নগরের চতুর্দিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তর ভাগও পরিকল্পনামাফিক গড়ে তুলতে হবে। তবে নগরের রাস্তাঘাট অনেক বেশি প্রশস্ত বা সুবিন্যস্ত হবে না যাতে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা সহজেই নগরের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।

(পাঁচ) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীগত বিভেদের উপর ভিত্তি করে। যে যে কাজের উপযুক্ত সে সেই কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে। কৃষক শস্য উৎপন্ন ও সরবরাহ করবে। বণিকরা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করবে। কারিগররা যন্ত্রপাতি তৈরি করবে। দাস প্রভুর আদেশ পালন করবে। সৈনিকরা যুদ্ধ

পরিচালনায় রত থাকবে। সরকারি কর্মচারীরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করবে শুধুমাত্র রাজ কর্মচারীবৃন্দ, সৈনিক এবং পুরোহিতগণ। তিনি কৃষক, বণিক, দাস ও কারিগরদের রাজনৈতিক অধিকারদানে সম্মত ছিলেন না। তাছাড়া, শাসক শ্রেণী যৌবনকালে সৈনিকরূপে, মধ্য বয়সে রাজকর্মচারী রূপে এবং বৃদ্ধকালে পুরোহিতরূপে রাষ্ট্রের সেবা করবে। প্রত্যেকেরই সম্পত্তির অধিকার ও পারিবারিক জীবনের সুখ সম্ভোগ করার অধিকার থাকবে।

(ছয়) তাঁর মতে, বিবাহ সম্বন্ধীয় রীতিনীতি সরকারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। রাষ্ট্র আইন করে বিবাহের উপযোগী বয়ঃসীমা নির্ধারণ করবে। স্বাস্থ্যগত কারণে বা অন্যান্য প্রকৃতিগত কারণে কেউ বিবাহের অযোগ্য ঘোষিত হলে তার বিবাহের কোন অধিকার থাকবে না। সন্তান সংখ্যাও সীমার মধ্যে রাখা হবে, কেননা জনসংখ্যা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হলে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

(সাত) রাষ্ট্রের আদর্শের দিকে নজর রেখে জনকল্যাণের লক্ষ্যে এক আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে যেন প্রত্যেক নাগরিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। সে দিকে নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, ন্যায়ধর্মই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত এবং শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকের স্বভাব ও মুক্তবুদ্ধিকে উন্নত করতে হবে। আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার আদর্শ।

দাসত্বের প্রকৃতি ও তার যৌক্তিকতা
Nature of Slavery and Its Justification

এরিস্টটলের পূর্বে তাঁর গুরু প্লেটো দাসত্ব প্রথাকে সমর্থন করেছেন। এরিস্টটলও এ প্রথাকে সমর্থন করেন। অতীতের অ্যান্টিফোন (Antiphone) প্রমুখ সোফিস্ট চিন্তাবিদরা দাসত্ব প্রথাকে অন্যায় ও অস্বাভাবিক রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মনে করতেন, দাসত্বের জন্ম হয়েছিল প্রথাগতভাবে, কোন আইন বা নৈতিকতার ভিত্তিতে নয়। এরিস্টটল কিন্তু দাস প্রথাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং বলেন নাগরিকের কার্য পরিচালনার জন্য যে সকল যন্ত্র বা সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়, ক্রীতদাস সেরূপ এক যন্ত্র। প্রয়োজনীয় যন্ত্র দু প্রকারের হতে পারে, যথা— জৈব এবং অজৈব। ক্রীতদাস এক ধরনের জৈব যন্ত্র।

এ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য তিনি বলেন, চিরন্তন নীতি অনুযায়ী কোন বস্তু বা পদার্থের নিকৃষ্ট অংশগুলো উৎকৃষ্ট অংশের অধীনতা স্বীকার করে থাকে। মানব দেহে আত্মাই রাজত্ব করে। চিন্তারাজ্যে যুক্তি ক্ষুধার উপর আধিপত্য করে। এ যুক্তি অনুযায়ী পরিবার বা রাষ্ট্রের ন্যায় মানবিক সংস্থায় শুধুমাত্র তারাই রাজনৈতিক এবং প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করার এবং নিয়োগ লাভ করার অধিকারী যারা জ্ঞানে ও নৈতিকতায় শ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র দৈহিক শক্তি যাদের সম্বল, প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী তারা দাস হবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

এরিস্টটল দাস প্রথাকে প্রভু এবং দাস-এই দু-এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। **প্রথম**, দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান থাকলে প্রভু রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে অধিক সময় ব্যয় করতে পারেন। সংসার জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় প্রভু ও দাসদের সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায়। প্রভুর রয়েছে মানসিক বল এবং দাসদের রয়েছে দৈহিক ক্ষমতা। সংসার পরিচালনায় উভয় প্রকার ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় প্রভুদের প্রচুর অবকাশ থাকে এবং এ অবকাশ সৃষ্টিধর্মী কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়, এ প্রথা দাসদের জন্যও প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতার অভাব রয়েছে এবং শুধুমাত্র দৈহিক ক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তি কোন না কোন প্রভুর অধীনে কার্য করলে পরোক্ষভাবে উপকৃত হয় এবং সংযম ও সদাচরণ লাভ করতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যা প্রয়োজন দাসরা প্রভুদের অধীনে থেকে তা অর্জন করতে পারে।

দাসত্ব প্রথার প্রতি এরিস্টটলের সমর্থনকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে নাগরিকত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। এরিস্টটলের মতে, যারা নাগরিক তারা রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে অবসর এবং একনিষ্ঠ মননশীলতা। কায়িক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি তাদের পেতে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুষ্ঠু সম্পাদনা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সার্থক ও দৃঢ়ভিত্তি রচনার জন্য দাস প্রথা অপরিহার্য।

এ প্রসংগে এও উল্লেখযোগ্য, এরিস্টল দুটি স্বতঃসিদ্ধের উপর তাঁর দাসত্ব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। **(এক)** মানুষ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও সৎগুণের প্রেক্ষিতে অসমান। **(দুই)** শাসন কাজই হোক আর নেতৃত্বই হোক, উত্তম অধমের উপর কর্তৃত্ব করবে। এ স্বতঃসিদ্ধ থেকে দাসত্বের যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। তাঁর মতে, এটি প্রকৃতির বিধান। আত্মার অধীন যেমন দেহ, যুক্তির অধীন যেমন ক্ষুধা, ঠিক তেমনি নাগরিকদের অধীন দাস। এরিস্টটল বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সমাজে "কেউ শাসন করবে এবং অন্যরা শাসিত হবে। তা শুধু যে অপরিহার্য তাই নয়, সুবিধাজনকও বটে। জন্মক্ষণ থেকেই কেউ শাসন করার জন্য চিহ্নিত এবং অন্যরা চিহ্নিত হয় শাসিত হতে" ("Some should rule and other be ruled is a thing, not only necessary but expedient; from the hour of their birth, someone is marked out for subjection, others for rule.")।

এরিস্টটল ক্রীতদাসকে "কার্যের যন্ত্র" নামে অভিহিত করেছেন। কোথাও তিনি ক্রীতদাসকে "উৎপাদনের যন্ত্র" বলে বর্ণনা করেন নি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যম রূপে তিনি ক্রীতদাসদের দেখেন নি। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের যে ভূমিকা, এরিস্টটলের ক্রীতদাসরা সে ভূমিকা পালন করার জন্য সৃষ্টি হয় নি। এ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নিহিত ছিল সৎ ও সাধু রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও নৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে।

এরিস্টটল দাস প্রথাকে সমর্থন করলেও ক্রীতদাসদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন, ক্রীতদাসদের কারো নিকট বিক্রয় করা চলবে না এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী সম্ভব হলে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেয়া উত্তম। তিনি স্বয়ং তিনজন পুরুষ ও একজন নারী ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

দাসত্ব প্রথার সমালোচনা
Criticisms

দাসত্ব প্রথার প্রতি এরিস্টটলের মনোভাব এবং তার সমর্থনে তিনি যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেন তা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন যুগে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথম, তিনি যেভাবে দাস প্রথার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত নয়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে দাসত্বের পর্যায়ে অবনমিত করা নীতিবিরোধী।

দ্বিতীয়, প্রকৃতিগতভাবে দাস কে বা কারা তা নির্ধারণ করবে কে? তিনি আইনগতভাবে দাস ও প্রকৃতিগতভাবে দাস এ দুই-এর মধ্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশে ব্যর্থ হয়েছেন।

তৃতীয়, তিনি দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মর্যাদা যেভাবে তাঁর পর্যালোচনায় দান করেছেন তাঁর দাসত্ব তত্ত্বে তা প্রতিফলিত হয় নি।

চতুর্থ, তৎকালীন সোফিস্ট লেখকগণ দাস প্রথাকে অমানবিক ও অন্যায় এক ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেন। এন্টিফোন (Antiphone) এ ব্যবস্থাকে প্রকৃতি বিরোধী (against nature) বলে চিহ্নিত করেন। অ্যালসিডেমাস (Alcidamus) বলেন, "ঈশ্বর সকলকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন" ("God has made all free")। এরিস্টটলের মত পণ্ডিত প্রবর এসব আলোচনা ও মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে এক শ্রেণীর মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করেন।

পঞ্চম, এরিস্টটলের দাসত্ব প্রথা মানবতা বিরোধী এক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে মোটেই সহায়ক নয়, বরং মানবতার এক নিদারুণ অপমানস্বরূপ।

ষষ্ঠ, দাসত্ব প্রথার বিশ্লেষণে তাঁর এক প্রকার পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি গ্রীকদের দাসরূপে গণ্য করতে রাজি হন নি, অথচ বিদেশী যাদের তিনি 'বর্বর' (Barbarian) বলে চিহ্নিত করেছেন তাদের দাসরূপে গণ্য করেন। **সর্বশেষে** দাসদের জৈব কর্ম মাধ্যম বলে চিহ্নিত করে মানবতার অপমান করেছেন তিনি।

নাগরিকতা সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণা
Aristotle's Concept of Citizenship

এরিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' (The Politics) গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে নাগরিকতা এবং নগর রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তাঁর সম্মুখে ছিল নগর রাষ্ট্রের চিত্র। তাই তিনি নগর রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখে নাগরিকদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিবর্গ নাগরিক নয়। যারা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে তারাই নাগরিক। এরিস্টটলের কথায়, "শুধুমাত্র তারাই রাষ্ট্রের নাগরিক যারা নগর রাষ্ট্রের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে" ('A citizen must be an active member of a city state')।

সক্রিয় অংশগ্রহণের অর্থ হলো নগর রাষ্ট্রের বিচার সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ, আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে অবদান এবং রাষ্ট্রীয় সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ। তিনি বলেন, "সে ব্যক্তি নাগরিক যিনি বিচার বিভাগীয় কাজে অংশগ্রহণ করেন, শাসন সংস্থার সদস্য হিসেবে আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন এবং রাষ্ট্রীয় সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন" ('A citizen is he who participates in the administration of justice and in legislating as a member of the governing body and takes part in the deliberations of state assemblies')।

এরিস্টটলের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ঃ

(এক) রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী নাগরিক নয়। শুধুমাত্র তারাই নাগরিক যারা নগর রাষ্ট্রের সকল অধিকার ও কর্তব্যে অংশগ্রহণ করেন। উন্মাদ, বন্দী, মহিলা, দাস, বিদেশী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা নাগরিক নয়।

(দুই) তিনি যেভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা থেকেও নাগরিকদের সংখ্যা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। রাজতন্ত্রে যেহেতু রাজাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাই এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকদের সংখ্যা অল্প সংখ্যক।

(তিন) নাগরিকতার সাথে জন্ম বা জন্মসূত্রের কোন সম্পর্ক নেই। কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলেই এক ব্যক্তি ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না। নাগরিকতার অধিকার জড়িত রয়েছে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সাথে।

নাগরিকদের গুণাবলি
Qualities of Citizens

এরিস্টটল নাগরিকদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি নাগরিকদের গুণাবলীর বিবরণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, নাগরিকদের গুণাবলী দ্বিবিধ ঃ **মৌল** (Essential) এবং **গৌণ** (Non-essential)। নাগরিকদের গৌণ গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাদের আবাসস্থল, গোত্র এবং

আইনগত সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু মৌল গুণাবলীই একজন নাগরিককে দান করে মর্যাদা এবং সম্মান। নাগরিকদের মৌল গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

প্রথম, সুষম মন-মানসিকতা ঃ তিনি একদিকে যেমন শাসন করার যোগ্যতাসম্পন্ন, অন্যদিকে তেমনি শাসিত হবার যোগ্যতাসম্পন্নও।

দ্বিতীয়, সম্পদ ও অবকাশের অধিকারী ঃ নাগরিক হবেন সমৃদ্ধ এবং সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য তার যথেষ্ট অবকাশ থাকতে হবে।

তৃতীয়, সততা ঃ একজন নাগরিক নৈতিক দিক থেকে যেমন উন্নত, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কাজে দক্ষ। অন্যকথায়, **একজন উত্তম নাগরিক একজন উত্তম ব্যক্তি, শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি।**

নাগরিকতা সম্পর্কে এরিস্টটলের যে ধারণা তা আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হয়, কিন্তু এও উল্লেখযোগ্য যে তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে নাগরিকতার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন না।

বিপ্লব ও তার কারণসমূহ
Revolution and its Causes

স্থিতিশীলতার অভাব এবং পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর ছিল গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুটি বিরাট বৈশিষ্ট্য। কার্যত, গ্রীসের প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে ধনিকতন্ত্র, গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতি শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সময় অতিবাহিত করে। এ সব কারণ এরিস্টটলের নিকট এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করার বিরাট সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ধনিকতন্ত্র ও গণতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্থিতিশীল। যে কোন শাসনব্যবস্থা অধিকতর অগ্রগামী হলে এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার কারণ অনুসন্ধান করা। তাই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও রূপান্তরের কারণ নির্দেশে প্রবৃত্ত হন এবং বিদ্রোহের কারণ নির্দেশ করেন।

তবে এরিস্টটল প্রদত্ত বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করার পূর্বে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের মত রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হননি। একটি প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা ছোট হোক আর বড় হোক-তাই তাঁর নিকট মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবকে তিনি রাষ্ট্রের বিরাটতম সমস্যারূপে চিহ্নিত করেন। কোন গণতন্ত্রে যেভাবে ধনিকতন্ত্রের বীজ উপ্ত হয় বা কোন ধনিকতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষে যেভাবে গণতন্ত্র এক পা এক পা করে অগ্রসর হয় বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে পর্যুদস্ত হয়ে চরমপন্থীদের আয়ত্তাধীনে চলে আসে বা স্বৈরতন্ত্রে স্বৈরাচারী যেভাবে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে-এ সকলই ছিল তাঁর নিকট বিদ্রোহের কারণস্বরূপ। বিপ্লব বলতে আমরা যা বুঝি, এরিস্টটল তাঁর "পলিটিকস" গ্রন্থে তার ইঙ্গিত দেন নি। প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামোকে অক্ষত রেখে যদি কোন একজন বা একদল ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা আর একজন বা আর এক দলের নিকট থেকে জোরপূর্বক দখল করে তা হলে তা বিদ্রোহ। কিন্তু বিপ্লব হলো ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন এক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। পুরানো জরাজীর্ণকে সমাধিস্থ করে নতুনের পতাকা উত্তোলনের নাম বিপ্লব। এ অর্থে এরিস্টটল বিপ্লবের কোন ইঙ্গিত দেন নি।

প্রথমে তিনি বিপ্লবের কারণকে **সাধারণ** (general) এবং **নির্দিষ্ট** (particular) এই দু ভাগে বিভক্ত করেন। সাধারণ কারণগুলোকে তিনি আবার আট ভাগে বিভক্ত করেন।

নিচে এর আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

তিনি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী আটটি কারণ নির্দেশ করেছেন। এগুলোকে তিনি সাধারণ কারণ বলে চিহ্নিত করেন। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

(এক) সম-যোগ্যতার ভিত্তিতে অসম সুযোগ-সুবিধা ভোগের বিরুদ্ধে তীব্র এক ঘৃণা বা ন্যায়নীতি বিরোধী এক মানসিকতা।

(দুই) শাসক গোষ্ঠীর চরম ঔদ্ধত্য এবং সীমাহীন লোভ, যার ফলে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ জনসংখ্যা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

(তিন) এক বা কতিপয় ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতার এমন সমাবেশ যা অনেকের মনে এ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয় যে, সে বা তারা কালক্রমে রাজতন্ত্র অথবা ধনিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বসবে।

(চার) কোন অন্যায়কারী নিজের কৃত দুষ্কর্মকে চাপা দেবার জন্য বিদ্রোহের এক ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে পারে অথবা আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় আক্রমণ করে বিদ্রোহের সূচনা করে।

(পাঁচ) রাষ্ট্রের যে কোন অংশের বা যে কোন একটি উপাদানের অসম বৃদ্ধি।

(ছয়) দেশে বা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কোন্দল।

(সাত) পারিবারিক বা বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব।

(আট) পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন দল, উপদল বা অংশের মধ্যে সংগ্রাম।

তাছাড়া তিনি বিপ্লবের কতকগুলো নির্দিষ্ট কারণেরও উল্লেখ করেন যা বিপ্লব ঘটাতে পারে।

প্রথম, শাসক শ্রেণীর অত্যধিক ধনলিপ্সা জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করে তুলে।

দ্বিতীয়, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্তির ইচ্ছা যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গকে বঞ্চিত করে।

তৃতীয়, শাসকবর্গের চক্রান্ত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে।

চতুর্থ, ভয়ভীতি থেকেও অনেক সময় বিপ্লবের সূচনা হয়।

পঞ্চম, অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনারাজি থেকেও বিপ্লবের শুরু হয়।

তাছাড়া, বিশেষ শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লবের জন্য বিশেষ বিশেষ কারণ রয়েছে এবং সে গুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গণতন্ত্রে সাধারণত অগ্নিবর্ষী বক্তা, অবিবেচক ও বাস্তব জ্ঞানহীন স্বার্থান্বেষী বক্তার বক্তৃতা। সামগ্রিক পর্যায়ে ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং বিপ্লবের বিষবাষ্প দেশে ছড়িয়ে দেয়। ধনিকতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লবের কারণ মূলত দুটি ঃ

(এক) শাসকের অত্যাচার ঃ দরিদ্র জনসাধারণ নিস্পেষণের যাতাকলে অবদমিত হয়ে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে এবং শাসকগোষ্ঠীর চণ্ডনীতির ফলে তারা সুসংহত হয়।

(দুই) শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ঃ কে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, কার হাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকবে ইত্যাদি সম্পর্কে দ্বন্দ্ব। অভিজাততন্ত্রে বিপ্লব সূচিত হয় অভিজাতদের সংকীর্ণমনা নীতি এবং তাঁদের সুনির্দিষ্ট আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। স্বৈরতন্ত্রে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয় স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচার, ঔদ্ধত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ঘৃণার জন্য। এ সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক হস্তক্ষেপও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(তিন) তাছাড়া, তিনি সাধারণভাবে বলেছেন, কোন সমাজে অসন্তোষ ও বিপ্লবের মূল হলো অসাম্য। অসাম্যের উপর ভিত্তি করে সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যেমন- ধনিক শ্রেণী, দরিদ্র শ্রেণী। সমাজে এই শ্রেণীবিভাগই অসন্তোষের মূল কারণ।

বিপ্লবের কারণ নির্ণয়ে এরিস্টটলের যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা সত্যই অপূর্ব। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও তা অনেকাংশে সত্য। এদিক দিয়ে এরিস্টটল সর্বজনীন।

কোন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অসাম্য বিদ্যমান থাকলে বিপ্লব দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের যে পর্বত রচিত হয়েছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের যে বঞ্চনা তাই ১৯৭১ সালে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সহায়তা করে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্নীতি ও ক্ষমতার লোভ বহুবার সামরিক শাসনের জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন পদ ও ক্ষমতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা বহু রাষ্ট্রে সরকারের পতন ঘটিয়েছে। এ সব লক্ষ্য করলে এরিস্টটল যে কত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদ ছিলেন তা অনুধাবনে এতটুকু অসুবিধা হয় না।

প্রতিরোধের উপায়
How to Prevent

এরিস্টটল শুধুমাত্র বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি তা প্রতিরোধের উপায়ও নির্দেশ করেন। তাঁর নির্দেশিত পন্থাগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) আইনের প্রতি আনুগত্য বোধ ঃ আনুগত্য শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা এবং নির্ভরশীলতা থেকে উদ্ভূত হয়।

(২) শাসন ব্যবস্থার বাইরে যাঁরা থাকেন তাদের প্রতি কোন অন্যায় ও অবিচার থেকে বিরত থাকা ঃ এই চেতনা শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু নীতি এবং ন্যায়নীতি থেকে জন্ম লাভ করে।

(৩) দেশপ্রেম জাগ্রত রাখা ঃ দেশের প্রতি প্রীতি ও প্রেম জন্মলাভ করে দেশের প্রতি একাত্মবোধ থেকে। তাছাড়া, শাসককে মাঝে মাঝে বৈদেশিক শত্রুর ভয়-ভীতির সৃষ্টি করতে হবে যেন জনগণ আত্মরক্ষা তথা দেশ রক্ষার জন্য অধিকতর সুসংহত হতে পারে।

(৪) শাসক গোষ্ঠীর ন্যায়নীতি ঃ শাসক গোষ্ঠীকে এমনভাবে নীতি নির্ধারণ করতে হবে যেন তারা জনগণের অর্থের অপচয় না ঘটায় এবং তাদের পদমর্যাদার মাধ্যমে কোন লাভ অর্জন না করতে পারে। শাসকদের কার্যকাল সীমিত হতে হবে এবং শাসন বিভাগের কোন অংশ যেন অসমভাবে বৃদ্ধি না পায়, তাও দেখতে হবে। ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে যেন অহেতুক কোন বৈষম্য না দেখা দেয় তাও লক্ষ্য করতে হবে। রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি যেন যোগ্যতার ভিত্তিতে যে কোন পদে উন্নীত হতে পারে তাও নির্দিষ্ট করতে হবে।

(৫) শিক্ষাব্যবস্থা ঃ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রবর্তিত করতে হবে যেন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার মূলে তা বারি সিঞ্চন করে। শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(৬) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ যাতে তীব্র আকার ধারণ না করে তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

(৭) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেন সমতা বিরাজ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। অধিকাংশ বিপ্লব সংঘটিত হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসমতাকে ভিত্তি করে।

(৮) স্বচ্ছ এবং সৎ সরকারি ব্যবস্থা ঃ সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জনসমক্ষে উন্মুক্ত রাখতে হবে। সরকারি অর্থের অপচয় যেন না ঘটে তা দেখতে হবে।

(৯) ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ সরকারি ব্যবস্থায় সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করেও বিপ্লব এড়ানো যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান

Aristotle's Contribution to Political Science

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের দান অপরিসীম। তাঁর তুলনাহীন পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থের প্রতি ছত্রে। গ্রীক সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং দর্শনের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র এরিস্টটল। তাই তাঁকে **'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' বলে** অভিহিত করা হয়। এও অনস্বীকার্য যে, এরিস্টটল প্রণীত এবং উদ্ভাবিত অনেক মূল্যবান তত্ত্ব বর্তমানকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। সমকালীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে তাঁর মতবাদ তেমন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ না করলেও পরবর্তীকালে তাঁর ধ্যান-ধারণা গভীরভাবে প্রভাবিত করে সকল শাখার বিদ্যা-বুদ্ধিকে।

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক : তিনি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি পৃথক বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করেন। তিনি গ্রীক রাজনীতির অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আরোপ করেন ও তাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান (Master of Science) বলে অভিহিত করেন। বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাঁরই সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার ফলস্বরূপ।

(২) বাস্তববাদ : এরিস্টটল ছিলেন একজন বাস্তবধর্মী দার্শনিক। তিনি রাষ্ট্রীয় শাসন, রাষ্ট্রীয় গঠন ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদগুলো তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহের প্রচলিত ও অতীত ঘটনাপ্রবাহ ও তথ্যের পটভূমিতে অনুধাবন করেছিলেন। রাষ্ট্র ও সরকারের স্থায়িত্ব রক্ষার যে সকল উপায় তিনি উল্লেখ করেন তা আজও সত্য বলে গৃহীত হয়। এরিস্টটল ১৫৮টি দেশের সংবিধান আলোচনা ও পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন সম্পর্কে যা লিখে গেছেন তা জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

(৩) রাজনীতির পরিবেশ এবং প্রতিবেশ : তিনি রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার ওপর অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে যে আলোকপাত করে গিয়েছেন, তাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। এ ক্ষেত্রে তিনি রুশো ও মঁতেস্কুর পূর্বসুরি। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, জলবায়ু যে বিভিন্নভাবে সরকারের স্বরূপ নির্ধারণ করে তা সর্বজন স্বীকৃত। দারিদ্র্য ও অসাম্য যে অপরাধের জননী তা তিনি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

(৪) রাষ্ট্রের সূচনা : রাষ্ট্রের উৎপত্তি যে মানবের সহজাত প্রবৃত্তি ও সামাজিক প্রবণতা থেকে উদ্ভূত তা এরিস্টটলের কথা। রাষ্ট্র একটি মানব কল্যাণরূপী প্রতিষ্ঠান। তাই রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা। তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক সম্প্রসারণ বা জনগণের ধনবৃদ্ধি রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো নাগরিকদের মহৎ ও উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করা।

(৫) পথ প্রদর্শক : এরিস্টটল ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আইনের সার্বভৌমত্বকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রে সার্বভৌম কোন ব্যক্তি হতে পারে না, তা সে যতই ক্ষমতাশীল হোক না কেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে আইনের মধ্যে। এ ধারণা থেকে সার্বভৌমত্বের আধুনিক ধারণা জন্মলাভ করেছে। এ জন্য তিনি প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সমালোচনা করেন।

(৬) দিশারী : মার্কসবাদের প্রধান স্তম্ভ ঐতিহাসিক জড়বাদ (Historical Materialism), অর্থাৎ মানুষের ক্রমবর্ধমান সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব মানুষের অর্থনৈতিক সংগঠন ও সম্পর্কের দ্বারাই সংঘটিত হয় এরিস্টটল বহু যুগ পূর্বে এমনি এক ধারণা দিয়ে গিয়েছেন। এরিস্টটল অনুধাবন করেন, নাগরিকদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপরই আপেক্ষিক সম্বন্ধ বজায় রেখে রাষ্ট্রে সরকারের পরিবর্তন সূচিত হয়।

(৭) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বরূপ : সরকারি ক্ষমতা এক হস্তে ন্যস্ত হলে তা যে কুফল দেখা দেয়, সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। শাসন ক্ষমতা এক হাতে কেন্দ্রীভূত হলে তা একনায়কতন্ত্রেরই

নামান্তর। তাই তিনি বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আধুনিককালের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির তিনিই পূর্বসূরি।

(৮) গণতন্ত্রের পুরোহিত ঃ এরিস্টটল যদিও গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে স্বীকৃতি দেন নি, তথাপি এক অর্থে তাঁকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুরোহিত বলে গণ্য করা চলে। তিনি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে মুষ্টিমেয় জ্ঞানী লোকের প্রজ্ঞার চেয়ে জনগণের সম্মিলিত মতামতকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন।

(৯) শিক্ষানীতি ঃ তিনি আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের এক আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা ও নাগরিকদের মহত্তর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা। তাছাড়া, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য তাঁর যে সুপারিশ তা অত্যন্ত আধুনিক।

(১০) আদর্শ রাষ্ট্রের স্বরূপ ঃ তিনিই সর্বপ্রথম বলেছেন, রাষ্ট্রের শক্তির মূল নাগরিকদের চরিত্র ও সাহসিকতা, রাষ্ট্রের সংবিধান নয়। তবে এরিস্টটলের চিন্তাধারায় কতকগুলো অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম, তিনি গণতান্ত্রিক সরকারকে নিকৃষ্টতম সরকার বলে গণ্য করেছেন যদিও আজকের গণতান্ত্রিক সরকার এক সর্বজনীন ব্যবস্থায় রূপ লাভ করেছে।

দ্বিতীয়, তিনি দাস প্রথাকে সমর্থন করেন কেননা, দাস প্রথা বিদ্যমান না থাকলে নাগরিকেরা সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হবে না।

তবে এও উল্লেখযোগ্য তিনি কোন সুদূর অতীতে-প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে লিখেছেন। ফলে বর্তমান চিন্তাধারার সাথে তাঁর চিন্তাধারার গরমিল হতে বাধ্য। তথাপি তাঁর চিন্তার গভীরতা ও সর্বজনীনতা সকলকে বিস্মিত করে।

এরিস্টটলের চিন্তাধারা যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিককে অনুপ্রাণিত করেছে। তের শতকের মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা তাঁরই প্রভাবে অভূতপূর্বভাবে আন্দোলিত হয়। চার্চ প্রথমে এরিস্টটলকে অবিশ্বাস করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে 'জ্ঞানীদের শিক্ষক' বলে চিহ্নিত করেন। সেণ্ট টমাস একুয়নাস এরিস্টটলের ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন ও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় যুক্তিবাদের প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁকে "মধ্যযুগীয় এরিস্টটল" বলা হয়। পাদুয়ার মারসিলিও ও দাঁন্তে তাঁরই প্রভাবে খ্রিস্টীয় তত্ত্বের সাথে যুক্তিবাদের সামঞ্জস্য বিধান করেন। মেকিয়েভেলি এরিস্টটলের বিপ্লব তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রাজার জন্য তাঁর "দি প্রিন্স" গ্রন্থখানি রচনা করেন। এরিস্টটলের প্রভাব পরোক্ষভাবে আধুনিককাল পর্যন্ত বিস্তৃত। হেগেলের সংবিধান সম্পর্কিত মতবাদ ও মার্ক্সের শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা এরিস্টটলই সর্বপ্রথম সূচনা করেন। তাই এক অর্থে এরিস্টটলকে "জ্ঞানী-গুণীদের গুরু" বলে আখ্যায়িত করা চলে।
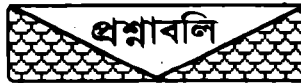
১। প্লেটো এবং এরিস্টটলের তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of the ideas of Plato and Aristotle.) [R. U. 1983]

২। এরিস্টটলের পদ্ধতি সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the methods followed by Aristotle?)

৩। এরিস্টটলের 'পলিটিক্স' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা কর। (Write what you know about Aristotle's 'Politics'.)

৪। এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the nature, ends and origin of the state according to Aristotle.)

৫। কীভাবে এরিস্টটল রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন? আধুনিককালে তা কী প্রযোজ্য? (How did Aristotle classify state? Is that classification applicable today?) [D. U. '80]

৬। এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা কর। (Describe the characteristics of Aristotle's ideal state.)

৭। এরিস্টটল কীভাবে দাসত্বের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন? (How did Aristotle justify slavery?) [D. U. '80]

৮। এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ কী কী? বিপ্লব দূরীকরণের উপায় কী কী? (What are the causes of revolution according to Aristotle? What are the methods to prevent revolution?) [R. U. '83; D.U. '80, '82, 2002, 2004, 2006]

৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the contributions of Aristotle to Political Science.) [R. U. 1980, '84]

১০। সরকার সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণা কী ছিল? কোন্ প্রকার সরকারকে এরিস্টটল সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং কেন? (What was Aristotle's concept of government? What form of government did Aristotle identify as the best practicable and why?) [D. U. 1983]

১১। দাস প্রথা সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণা আলোচনা কর। তুমি কী তাঁর ধারণার সাথে একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। (Discuss Aristotle's concept of slavery? Do you agree with his views? Give reasons for your answers.) [D. U. 1983]

১২। এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত ধারণার রূপরেখা পেশ কর। (Give an outline of Aristotle's classification of government.) [D. U. 1984, 2000]

স্টয়িকবাদ

STOICISM

৭

সূচনা
Introduction

প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের তিরোধানের সাথে সাথে রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে এক যুগের অবসান ঘটে। অধ্যাপক কারলাইলের কথায় (A. J. Carlyle) রাষ্ট্রদর্শনের ধারাবাহিকতায় কোন সময় ছেদ পড়ে থাকলে তা সংঘটিত হয়েছিল এরিস্টটলের মৃত্যুর সাথে সাথে" ("If there is any point where the continuity of political philosophy is broken, it is at the death of Aristotle")। আসলে এরিস্টটলের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে এক গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্রীক পণ্ডিতদের লেখনীতে যে দার্শনিক চিন্তাসূত্র এতদিন প্রাণবন্ত হয়েছিল তার মূল কথা ছিল সামাজিক মঙ্গল, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও সমষ্টিগত স্বার্থ। এখন থেকে যে চিন্তাধারা দানা বাঁধতে থাকে তার মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে স্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ। এ নতুন চিন্তাধারার অভিব্যক্তি হলো দুটি দার্শনিক মতবাদ। তাঁদের একটি ছিল এপিকিউরিয়ানবাদ (Epicureanism) ও অন্যটি স্টয়িকবাদ (Stoicism)। উভয় মতবাদের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন, ব্যক্তি স্বাধীনতার জয়গান ও ব্যক্তির পারস্পরিক আদান-প্রদান ক্ষেত্রে সাম্য ও সহযোগিতার গুরুত্ব।

স্টয়িকবাদের জন্ম
Origin of Stoicism

এ মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন জেনো (Zeno)। তিনি সাইপ্রাসের সিটিয়াম (Citium) শহরে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নৈরাশ্যবাদীদের (cynicism) প্রবক্তা ক্রেটসের (Crates) শিষ্য। স্টয়িকবাদের দ্বিতীয় শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন ক্রিসিপাস (Chrysippus)। জেনো এবং ক্রিসিপাসের চিন্তাধারা গ্রীসের পণ্ডিতবর্গের মতবাদ দ্বারা, বিশেষ করে সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

প্রাথমিক পর্বে স্টয়িকবাদ ছিল নৈরাশ্যবাদের একটি শাখাতুল্য। এ পর্যায়ে স্টয়িকবাদ এক "আদর্শ রাষ্ট্রের" কল্পনায় রোমাঞ্চিত। 'এই আদর্শ রাষ্ট্রে' মানুষকে চিত্রিত করা হয়েছিল পরিবার ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তিরূপে, যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রবৃদ্ধি লাভ করতে পারে। এ অবস্থায় জাতি, ধর্ম বা পদমর্যাদাভিত্তিক কোন বিভেদ ও অনৈক্য মানুষকে স্পর্শ করত না অথবা রাষ্ট্রে কোনরূপ মুদ্রা বা বিচার কার্যেরও প্রয়োজন হতো না। জেনো কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে নৈরাশ্যবাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন যদিও নৈরাশ্যবাদের বিভিন্ন উপাদান স্টয়িকবাদে বিদ্যমান থাকে। অন্যদিকে এপিকিউরিয়ানদের সাথেও স্টয়িকদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, যদিও উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল বিরাট ব্যবধান। এপিকিউরিয়ানবাদে মানুষের দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে শ্রেয় জ্ঞান করা হয়, কিন্তু স্টয়িকবাদে

মানুষের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যই অধিক গুরুত্ব লাভ করে। নৈরাশ্যবাদের মৌলিক উপাদানসমূহ; যেমন, স্বয়ংসম্পূর্ণতা (self-sufficiency), আত্মসংযম (self-control), আত্মপ্রত্যয় (self-reliance), প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা (reliance on nature) স্টয়িকবাদের মৌল বিষয়বস্তুতে পরিণত হলেও স্টয়িকবাদ নৈরাশ্যবাদের উর্ধ্বে এক মৌলিক মতবাদে পরিণত হয়।

সত্য বটে, স্টয়িকবাদ সর্বপ্রথমে রাজনীতি নিরপেক্ষ এক মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু কালক্রমে তা এক রাজনৈতিক মতবাদে রূপান্তরিত হয়। জেনো প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারা কর্তৃক প্রভাবান্বিত হন এবং ক্রিসিপাসের হাতে তা রাজনৈতিক মতবাদে রূপ পরিগ্রহ করে এথেন্সের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী চিন্তাসূত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। রোমানদের মধ্যেও এ মতবাদ এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অধ্যাপক স্যাবাইনের (Sabine) মতে, "স্টয়িকবাদ দ্বিতীয় শতকের শিক্ষিত রোমানদের নিকট এক অদ্ভুত আবেদন সৃষ্টি করে এবং এভাবে গ্রীক দর্শনের মাধ্যমে রোমান আইনশাস্ত্র-তার গঠনমূলক পর্বে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়" ("Of special importance was the fact that stoicism made a strong appeal to educated Romans of the second century and thus became the medium by which Greek Philosophy exerted an influence in the formative stage of Roman Jurisprudence.")।

স্টয়িকবাদের উপাদান

Elements of Stoicism

(এক) স্টয়িকবাদের নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তি জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

প্রথম, এ মতবাদ ব্যক্তি সংকল্পকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রথম পাঠ সমাপ্ত করত। এ ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্প, কর্তব্যপরায়ণতা, ধৈর্য ও জাগতিক আনন্দের প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতি গুণকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হতো।

দ্বিতীয়, এই মতবাদে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে কর্তব্যবোধ (sense of duty) জাগ্রত করা হতো।

(দুই) প্রকৃতি (Nature) এবং প্রাকৃতিক আইনের (Natural) নতুন ব্যাখ্যাদান ছিল স্টয়িকবাদের অন্যতম অবদান। স্টয়িকদের মতে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহে (divine providence) ব্যক্তি ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে নিজেকে উৎসর্গ করে জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারে। ঈশ্বরই প্রকৃতি। প্রাকৃতিক আইন অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই হলো ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা। প্রাকৃতিক আইন ঈশ্বর এবং ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক সেতুবন্ধন। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক আইনের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাত্রা পরিচালনাই ছিল স্টয়িকদের মতে আদর্শ জীবন। প্রাকৃতিক আইন হলো সর্বজনীন যুক্তির বিধান এবং এ বিধানের উপর ভিত্তি করেই প্রকৃতির সকল উপাদান ও জীবজন্তু এক প্রাকৃতিক সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ, বর্বর ও সভ্য মানুষের মধ্যে মিলন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাম্য প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্টয়িক চিন্তাবিদগণ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন নাগরিক আইনেরও ভিত্তি হওয়া উচিত প্রাকৃতিক আইন, কেননা সে আইনই চিরন্তন, সর্বজনীন ও সার্বভৌম।

(তিন) স্টয়িকদের নিকট প্রকৃতি ও ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ছিল এক ও অভিন্ন। স্টয়িকদের রচনাবলীতে পার্থিব জীবনকে প্রায়ই তুলনা করা হয়েছে এক রঙ্গমঞ্চের সাথে। অধ্যাপক স্যাবাইনের (Sabine) কথায়, "প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হলো তার নির্দিষ্ট ভূমিকা যথাযথ পালন করা তা সে ভূমিকা ছোটই হোক আর বড়ই হোক-সুখের বা দুঃখের হোক" (The duty of every man is to play well the part for which he is cast whether it be conspicuous or trifling, happy or miserable.")।

এই রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নির্ধারিত ভূমিকা পালন করে মাত্র। এ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণ করা; যেমন, প্রত্যেক সৈনিক তার অধিনায়কের নির্দেশ মেনে স্বীয় কর্তব্য আরও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে থাকে। স্টয়িকদের শিক্ষার মৌল বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতির ঐক্য ও প্রাকৃতিক জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর অভিব্যক্তি। এ ধরনের জীবনেই শুধু পরিপূর্ণ নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক জীবনের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য হলো ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা, ব্যক্তির উর্ধ্বে যে অক্ষয় ক্ষমতা রয়েছে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্ব প্রকৃতির যুক্তিযুক্ততা ও মহত্ত্বের প্রতি অখন্ড বিশ্বাস।

(চার) স্টয়িকবাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ব্যক্তিসত্তাকে সামাজিক সত্তা থেকে পৃথক করা। স্টয়িকদের পূর্বে সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল সামাজিক সত্তাকে পরিপূর্ণ সত্তা বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই মহৎ জীবন-যাপন করতে পারে। রাষ্ট্রকে তাঁরা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফলস্বরূপ বলে চিহ্নিত করেন এবং মহৎ জীবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেন। স্টয়িকরা কিন্তু বলেন, মানুষ কোন রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়। মানুষ পারস্পরিক আবদ্ধ রয়েছে নৈতিকতার এক বন্ধনে। ফলে রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তি হীনপ্রভ নয়। রাষ্ট্র উপায় মাত্র, উপেয় নয়। ব্যক্তি জীবনের সার্থকতার মাধ্যম হলে রাষ্ট্র এবং এ রাষ্ট্রই মহত্তর হয়ে ওঠে নৈতিকতার আলোকে। এভাবে স্টয়িক চিন্তাবিদগণ সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি ব্যক্তি জীবনের পরিপূরক গুণাবলীকে অধিক গুরুত্ব দান করেন।

(পাঁচ) স্টয়িকবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান এক বিশ্ব রাষ্ট্রের ধারণা (Conception of the World State)। এ বিশ্ব রাষ্ট্রের ধারণার ভিত্তিমূল ছিল প্রকৃতি ও বিশ্ব পিতা সম্পর্কে তাঁদের ঐকান্তিক চিন্তা। স্টয়িকদের মতে, সব মানুষই বিশ্ব পিতার সন্তান। ফলে সকলে ভাই ভাই। সুতরাং সকল মানুষ তা সে ধনী হোক আর নির্ধন হোক, যে কোন জাতির বা বর্ণের হোক-একই রাষ্ট্রের নাগরিক। এভাবে তাঁরা সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। এ বিশ্ব রাষ্ট্রের সংবিধান হবে সঠিক যুক্তি (right reason) এবং সঠিক যুক্তি হলো প্রাকৃতিক আইন। এ আইন সম্পর্কে ক্রিসিপাস (Chrysippus) যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "দেবতা ও মানুষের সকল কার্যাবলির নিয়ন্ত্রক আইন। কোন্ কর্ম সম্মানজনক বা কোন্ কর্ম হীন তা নির্ধারণ করবে আইন। আইন হলো শাসক, পরিচালক ও পথ প্রদর্শক" ("Law is the ruler over all the acts of gods and men. It must be the director, the governor and the guide in respect of what is honourable and base.")।

স্টয়িকবাদে অবশ্য দু প্রকার আইনের উল্লেখ রয়েছে। **প্রথম** শ্রেণীর আইন হলো প্রথাভিত্তিক আইন (law of custom) এবং **দ্বিতীয়** শ্রেণীর আইন সঠিক যুক্তির আইন (law of right reason)। এ দুই আইনের মধ্যে সঠিক যুক্তির আইনই মূল্যবান এবং তার প্রাধান্য সর্বত্র প্রতিফলিত। স্টয়িকদের মতে, মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে এক আত্মিক যোগসূত্র। মানব ও বিশ্বপিতা উভয়েই যুক্তিবাদী (rational)। যে ঐশ্বরিক সত্তা সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ সঞ্চারিত করেছে, মানব মনেও তা বিচ্ছুরিত। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানবের স্বাতন্ত্র্য শুধু একটি ক্ষেত্রে ঃ প্রাণীর কোন যুক্তিবোধ নেই, কিন্তু মানবের রয়েছে যুক্তিবোধ ও প্রজ্ঞা। ফলে একমাত্র মানবই সামাজিক জীবনের অধিকারী এবং যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সকল মানব বিশ্বময় বিশ্ব রাষ্ট্রের নাগরিক হবার অধিকারী। অধ্যাপক স্যাবাইনের (Sabine)

কথায়, যুক্তিবাদের প্রতি বিশ্বাসই "স্টয়িকবাদকে এক বিরাট নৈতিক ও সামাজিক মতবাদে পরিণত করে" ("It was this conviction that made Stoicism a moral and a social force.")।

(ছয়) স্টয়িকবাদের আর একটি উপাদান হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিলাসহীন আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই সমাজে ব্যক্তির লক্ষ্য। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার যে উদগ্র কামনা তাই স্টয়িকবাদকে মহতী এক মতবাদে পরিণত করেছে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ দাস প্রথাকে সমর্থন করেন। কিন্তু স্টয়িকবাদে দাস প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই। ক্রিসিপাস বলেছেন, "প্রকৃতিগতভাবে কেউ দাস নয়।" যে বিশ্ব রাষ্ট্রের কথা স্টয়িক চিন্তাবিদগণ বলেছেন সে রাষ্ট্রে সকলেই নাগরিক, কেউ তার অধীন নয়।

স্টয়িকবাদের অবদান ঃ স্টয়িকবাদে সমাজের অভ্যন্তরে যেমন সকল নাগরিক সমান, অন্যদিকে তেমন সকল জনগণের মধ্যেও রয়েছে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে এক ঐক্য। এ মতবাদে ব্যক্তিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার যেমন এক মহাপরিকল্পনা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়েছে। প্রকৃতি ও আইনকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে স্টয়িকবাদ ভবিষ্যতের চিন্তাবিদদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করেছে। রোমান আইনবিদদের লেখায় প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে সকল নাগরিকদের সাম্য ও মৈত্রীর যে অনুরণন দেখা যায় মূলত তা স্টয়িকবাদের অবদান। মধ্যযুগব্যাপী সে চিন্তাসূত্র প্রসারিত হয়েছে। এমন কি আধুনিককালের বিশ্ব রাষ্ট্রের যে হাতছানি মানব মনকে নতুন সম্ভাবনায় সচকিত করেছে তাও স্টয়িকবাদের অবদান। সতর শতকের চিন্তাবিদ হিউগো গ্রোসিয়াস (Hugo Grotius) ও পিউফেনডর্ফের (Pufendorf) আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত যে সব পর্যালোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেছে তাও পরোক্ষভাবে স্টয়িকবাদের অবদান।

১। স্টয়িকবাদের জন্ম সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the origin of stoicism?)

২। স্টয়িকবাদের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the elements of stoicism.)

৩। স্টয়িকবাদের উপাদান ও অবদান সম্বন্ধে কী জান? (What do you know about the elements and contribution of stoicism?)

৪। স্টয়িকবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে এর গুরুত্ব নিরূপণ কর। (Discuss the salient features of stoicism and assess its importance in the history of political thought.) [D. U. 1982]

মধ্যযুগে রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি

৮

THE NATURE OF POLITICAL THOUGHT IN THE MEDIAEVAL AGE

অনেক সময় মনে হবে মধ্যযুগের রাষ্ট্রতত্ত্ব এক ঊষর মরুভূমির মত এবং তা প্রায়ই সম্রাট ও পোপের কর্তৃত্ব-দ্বন্দ্বের ধূলিঝড়ে অশান্ত। দাঁন্তের **'রাজতন্ত্র প্রসঙ্গে'** বা মারসিলিওর **'শান্তির রক্ষক'**-এর মত সৃজনশীল আলেখ্যের সবুজ মরূদ্যান সেখানে সচরাচর মেলে না। সেখানে রয়েছে প্রাণহীন আলোচনার বিস্তীর্ণ এক অরণ্য আর রয়েছে মরীচিকার মত এক ধরনের অবাস্তবতা। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে অধ্যাপক বার্কারের এ যুক্তি যথার্থ, কেননা হাজার বছর ব্যাপী পাশ্চাত্য ইতিহাসের এ অধ্যায়ে সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তেমন কোন মূল্যবান মণিমুক্তা সংগৃহীত হয় নি। রাষ্ট্রতত্ত্ব আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে নি বা লেখকরাও এ ক্ষেত্রে তেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। যখন তাঁরা বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন দেখা গেছে নিজেদের তৈরি স্বপ্নরাজ্যের সুখস্বপ্নে তাঁরা মগ্ন। রাষ্ট্রতত্ত্বের স্বতন্ত্র কোন সত্তা ছিল না এবং লেখকরা তাঁর জন্য এতটুকু দুঃখবোধও করেন নি। হাজারো সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ইউরোপে তারা অবিভক্ত এক সার্বজনীন সাম্রাজ্যের কথা বলেছেন। যে সমাজে খ্রীষ্টীয় চার্চ ছিল দিবালোকের মত স্পষ্ট সত্তা এবং যার প্রাধান্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত, সেখানেও তারা প্রাক-খ্রিস্টান যুগের রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের কথা বলেছেন। তাই অনেকে বলেন, মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় আর যাই থাক, 'রাষ্ট্র' ছিল না, আর মুক্ত 'চিন্তা'ও ছিল না। রাষ্ট্রনীতি ছিল ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব এবং অর্থনীতির গহ্বরে বন্দিনী। অন্য কথায়, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ছিল ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত এবং ন্যায়শাস্ত্র ঐশীবাণীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় তা ছিল ধর্মতত্ত্বের অনুগত। সমগ্র মধ্যযুগে চিন্তাবিদরা এক বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যের কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু সে সাম্রাজ্য ছিল লেখক ও চিন্তাবিদদের কল্পনার সৃষ্টি, অবাস্তব, মরুভূমিতে এক মরীচিকার মত।

অধ্যাপক ডানিং (Dunning) তাই যথার্থই বলেছেন, **"মধ্যযুগ ছিল অরাজনৈতিক। এ যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মতাদর্শ ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপ ও প্রকৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল** ('The middle age was unpolitical. Its aspirations and ideals centred around the form and content of religious belief.')।[১]

কিন্তু তাই বলে মধ্যযুগের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা কোনক্রমে গুরুত্বহীন নয়। আধুনিকতার জৌলুস তার নাইবা রইলো, কিন্তু রয়েছে তার দুর্নিবার আকর্ষণ, সীমাহীন মায়া আর রহস্যঘন মমত্ববোধ। তাই আজও আমরা উদগ্র বাসনা নিয়ে তাকাই মধ্যযুগের দিকে, মধ্যযুগের তত্ত্ব এবং বিশ্বাসের দিকে, আধুনিক জীবনের সমস্যা সমাধানের কোন সোনার কাঠি যদি সেখানে পাই। মধ্যযুগের মতবাদে যেমন রয়েছে অবাস্তবতা, তেমনি রয়েছে প্রেরণা ও প্রাণের প্রাচুর্য। মধ্যযুগীয় লেখকগণের রাষ্ট্রতত্ত্বের দিকে না তাকিয়ে যদি আমরা মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় মনোনিবেশ করি, তবে তার রত্ন ভাণ্ডারের সন্ধান আমরা পেতে পারি। সমগ্র মধ্যযুগকে এক বিরাট প্রস্তুতিপর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা এ পর্বে নতুন নতুন মতবাদের পাপড়িগুলো বিকশিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে দেখা যায় এগুলোকে কেন্দ্র করেই আধুনিক জগৎ আলোয় ঝলমল করে উঠল।

---

১ W. A. Dunning, *A History of Political Theories : Ancient and Mediaeval*, p. 131

খ্রিস্টীয় চার্চের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তা নতুন এক বিশ্বরচনার জন্য স্বপ্নে বিভোর এবং সমাজের সর্বস্তরে আপন প্রভাব বিস্তারের আশায় উদ্বেল। যাজক শ্রেণী একদিকে যেমন শাসক শ্রেণীর সাথে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, তেমনি অন্যদিকে শান্তি ও ন্যায়নীতির নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প। সামন্ততন্ত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, নতুন এক তত্ত্ব সমাজ জীবনকে সুসংহত করার জন্য প্রস্তুত। ব্যক্তিগত আনুগত্যের বন্ধনে সমগ্র সমাজকে বেঁধে তা শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বোধের প্রতীকস্বরূপ এক স্বর্ণসূত্রে রূপ নিয়েছে। সুতরাং মধ্যযুগ কোনক্রমেই নিষ্প্রাণ ছিল না। জীবন তখন ছিল অত্যন্ত জীবন্ত। এ দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে পারি, আমাদের জীবনের বহু সূত্র ও বহু প্রেরণার উৎসভূমি মধ্যযুগ। তাই সমকালীন জীবনের চড়াই উৎরাই–এর মাঝে আমরা মধ্যযুগের স্পর্শ পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

যুগ বিভাজন

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক–এ তিনভাগে বিভক্ত করার প্রথা সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু কখন প্রাচীন যুগের শেষ আর মধ্য যুগের শুরু তা নিয়ে তর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ম্যাক্‌ইলওয়েনের মত লেখকেরা অবশ্য মধ্যযুগকে **পূর্ববর্তী** এবং **পরবর্তী মধ্যযুগ**–এ দুভাগে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সব চিন্তাবিদদের মতে, মধ্যযুগের সূচনা হয় খ্রিস্টীয় চার্চ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে। সেন্ট আম্ব্রোজ, সেন্ট অগাস্টিন, পোপ গ্রেগোরী প্রমুখ খ্যাতনামা ধর্মযাজক পূর্ববর্তী মধ্যযুগের চিন্তাবিদ। এ যুগকে চার্চের স্বর্ণযুগও বলা হয়, কেননা তখন পোপের মাথায় ছিল রাজমুকুট, চার্চ ছিল দিগ্বিজয়ী এবং খ্রিস্টীয় নীতি ছিল সর্বাত্মক। কিন্তু পরবর্তী মধ্যযুগে চার্চের পরাক্রম হ্রাস পেয়েছে, সম্রাটদের নিকট পোপ হীনপ্রভ হয়ে উঠেছেন এবং বিশ্বাসের স্থলে যুক্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। এমন সময় রাষ্ট্রতত্ত্ব হয়েছে প্রগতিবাদী এবং বিপ্লবাত্মক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সূত্র দানা বাঁধতে শুরু করেছে। দাঁন্তে, মারসিলিও, ওকাম প্রমুখ চিন্তাবিদ এ পর্যায়ের।

কখন থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয় এ বিষয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকদের কোন চূড়ান্ত রায় নেই। তবে মোটামুটিভাবে মনে করা হয়, টিউটন জাতিগুলোর দ্বারা রোম সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত হবার পর পরই মধ্যযুগের শুরু। এ কাল বিশ্ব ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায় এবং সমগ্র পাঁচ ও ছয় শতক ধরে এ রূপান্তর ঘটে। সুতরাং ছয় শতকের পরবর্তী পর্যায়কে মধ্যযুগ বলা সংগত। অন্যদিকে মধ্যযুগের অবসান কখন হলো–তাও বলা শক্ত। অবশ্য এটা বলা সম্ভব যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে এ যুগের যবনিকাপাত হয়। রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, মেকিয়েভেলির পর মধ্যযুগের অবসান হয়। তিনিই মধ্যযুগের সর্বশেষ চিন্তাবিদ এবং আধুনিককালের সর্বপ্রথম চিন্তানায়ক।

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য

(এক) মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য সকলের চোখে পড়ে। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার মর্মবাণী বিশ্বজনীনতা। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে এক সার্বজনীন সমাজ–এ ধারণা সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী প্রাণবন্ত ছিল। জাগতিক দিক দিয়ে তা ছিল প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে যীশুর সার্বজনীন প্রতিচ্ছবি চার্চে মূর্ত হয়ে ওঠে। এ বিশ্বজনীন সমাজের এক রূপ সাম্রাজ্য এবং অন্যরূপ চার্চ। জাগতিক ক্ষেত্রে পরিচালক ছিলেন সম্রাট আর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের দিকদর্শন মহান পোপ। এ দুই–এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ নিয়ে তাই সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপৃত। পাঁচ শতকের শেষ দিকে পোপ গেলাসিয়াস দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণকল্পে তাঁর সমান্তরাল নীতি উদ্ভাবন করেন। "সম্রাটের যা পাওনা তা সম্রাটকে দাও আর ঈশ্বরের যা পাওনা তা ঈশ্বরকে দাও"–এই ছিল সমান্তরাল নীতি। পোপ গ্রেগোরীর আমল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে এ স্থিতাবস্থা কার্যকর ছিল, কিন্তু গ্রেগোরীর হাতে চার্চ বিজয়তিলক পরে সাম্রাজ্যের উপরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। সেন্ট টমাস এক্যুনাস এ অবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য এরিস্টটলের দর্শনকেও কাজে লাগান। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য চার্চ তাঁর উঁচু বেদী থেকে ক্রমে ক্রমে নেমে আসে এবং মেকিয়েভেলির হাতে দুটি ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

(দুই) মধ্যযুগের চিন্তাধারা ছিল খ্রিস্টীয় নীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। রাষ্ট্রনীতি ছিল ধর্মতন্ত্রের গভীর গহ্বরে বন্দিনী। চার্চ ও রাষ্ট্র মিলে ছিল সমাজ এবং তা ছিল এক ও অভিন্ন। সে অভিন্ন সমাজের শাসনব্যবস্থা এক ছিল। রাজনৈতিক সমাজের সদস্য হতে হলে কোন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম হতে হত একজন খ্রিস্টান। সে কোনক্রমে ধর্মচ্যুত হলে তার রাষ্ট্রীয় অধিকারও লোপ পেত। সুতরাং মধ্যযুগে রাজনীতি বা রাষ্ট্রতত্ত্বের কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র ছিল না। রাজনীতি ছিল অর্থনীতি, ন্যায়শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের সাথী।

(তিন) মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা মূলত ছিল চার্চ ও সাম্রাজ্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সেণ্ট অগাস্টিন চেয়েছিলেন ধূলির ধরণীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাঁর মতে তা সম্ভব হত একমাত্র চার্চের সোপান ধরে। পোপ গ্রেগোরী চার্চকে করেছিলেন বিজয়িনী, শক্তিকেন্দ্র, মানসম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আশীর্বাদের শীর্ষস্থান। সেণ্ট একুনাস সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিজয়িনী চার্চের ভিত্তিমূলে স্থাপন করেছেন এরিস্টটলের সর্বগ্রাসী দর্শনকে। খ্রিস্টীয় নীতি দর্শন এবং যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় বিধান করে তিনি নতুন জগতের আবিষ্কার করেন। ইগিডাস রোমানা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে পোপকে করে তোলেন প্রকৃতির মত নিত্য আর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

অন্যদিকে দাঁন্তে, মারসিলিও, উইলিয়াম এবং জন প্রমুখ লেখক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মৌলিকত্ব প্রমাণ করার জন্য চার্চকে নামিয়ে এনেছেন তার সর্বোচ্চ বেদী থেকে। তাকে করেছেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আজ্ঞাবহ। এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী চলেছে সে অন্তর্দ্বন্দ্ব—কখনও ধীরে, আবার কখনও তীব্র গতিতে, কিন্তু অবিরত, নিরবচ্ছিন্ন ধারায়।

(চার) মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তা সম্যক অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন ঐ সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জানা, যাদের সুসমন্বিত প্রাণরসে জারিত হয়ে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তা আধুনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্র রচনা করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টীয় চার্চের প্রভাব, পোপের ক্ষমতার প্রাচুর্য, সামন্তবাদের জন্ম ও ব্যাপ্তি, সাম্রাজ্য তথা রাজকীয় মতাদর্শের পুনরভ্যুদয়।

প্রাচীন রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় চার্চের অভ্যুদয় সত্যই বিপ্লবাত্মক। প্লেটো ও এরিস্টটলের গ্রীক নগর রাষ্ট্রে বা পলিবিয়াস, সিসেরোর রোমক সভ্যতায় এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণ পরিচিত ছিল না। তাই রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে কী সম্পর্ক হবে বা হওয়া উচিত, তা নিয়ে অতীতে কোন চিন্তা-ভাবনা হয় নি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে চার্চের প্রভাব ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রতিপত্তি রাষ্ট্রচিন্তায় নতুন এক চিন্তা-সূত্রের সংযোজন ঘটায়। প্লেটো ততদিন বেঁচে থাকলে চার্চের এ প্রভাব দেখে হয়তো আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন।

চার্চের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পোপেরও প্রভাব বেড়ে যায় অভূতপূর্বভাবে। পোপের প্রচণ্ড দাপটের সামনে গেলাসিয়াসের "সমান্তরাল তত্ত্ব" বা রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে বিদ্যমান স্থিতাবস্থা স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে গেল। পোপ গ্রেগোরী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পোপদের অন্যতম এবং রাজন্যদের পরিচালক।

(পাঁচ) মধ্যযুগের আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল সামন্তবাদ। রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারে টিউটনদের এ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। সমগ্র মধ্যযুগে এ ব্যবস্থা চালু ছিল। শুধুমাত্র ইউরোপেই নয়, প্রাচ্যের বহু রাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্তবাদ এক ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার কেন্দ্র ছিল ভূমি। সার্লেমেইনের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর এ ব্যবস্থা প্রাণ পায় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত তা চালু থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ভূমি ভিত্তিক অর্থনীতি, অধিকার ও সুবিধা, পর্যায়ক্রমিক ক্ষমতা বিন্যাস এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(ছয়) মধ্যযুগীয় স্মৃতিচারণের আর একটি উপাদান সাম্রাজ্য। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরেও যুগে যুগে রোম সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের দুঃস্বপ্ন মধ্যযুগের সকলকে তাড়া করে ফিরেছে। সার্লেমেইনের সাম্রাজ্যের পর অস্তিত্ববিহীন "পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের" অবাস্তব সত্তা এই সেদিন পর্যন্ত ইউরোপ স্বীকার করে এসেছে। কিন্তু মধ্যযুগের বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের ধারণা ছিল অনেকের নিকট বাস্তব।

মধ্যযুগের রাষ্ট্র চিন্তার মূল্যায়ন

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা আধুনিক বিচারে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু তাই বলে তা কোনক্রমে গুরুত্বহীন ছিল না। আজকের ইউরোপ যে পথ ধরে প্রগতি এবং অগ্রগতির সিংহদ্বারে পৌঁছিয়েছে, তার বেশির ভাগই মধ্যযুগে প্রোথিত। যে সব প্রতিষ্ঠান এবং মতবাদের মণিমুক্তায় আধুনিক যুগ তার স্বর্ণ সিংহাসন সাজিয়েছে, তাদের বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে মধ্যযুগের সংঘাতময় ইতিহাসের অঙ্গনে। গ্রীক সভ্যতা ছিল নগরভিত্তিক। নগর রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করার কলাকৌশল গ্রীক পণ্ডিতদের জানা ছিল না। গ্রীক সভ্যতার ভিত্তিভূমিতে রোম তার সুদৃশ্য সৌধ নির্মাণ করে এবং এক পর্যায়ে সে সভ্যতার সৌধ হয়ে ওঠে চিরন্তন ও শাশ্বত। কিন্তু তার সীমারেখা ছিল এবং রোমের দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়করা সে সীমারেখা উত্তরণের কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হন নি। ফলে, রোমক সভ্যতা কালক্রমে হারায় তার গতি ও চিৎশক্তি এবং টিউটন বর্বরদের আক্রমণে তা পাপড়ি ঝরা গোলাপের মত অতি অনায়াসে ঝরে পড়ে। সভ্যতার বিবর্তনে তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয় অসভ্য বর্বর জার্মান বা টিউটনের নতুন ধ্যান-ধারণা ও নতুন প্রতিষ্ঠানের সঞ্জীবনী সুধার। টিউটনরা সাথে করে এসেছিল প্রচুর জীবনীশক্তি, উদ্দামতা আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা শক্তিমত্তা। প্রাচীন স্থৈর্যের সাথে নবীন উদ্দামতা মিশে যে প্রাণবন্যা সৃষ্টি করে, কালক্রমে তাই হয়ে ওঠে আধুনিক সভ্যতার জীবনীশক্তি। অধ্যাপক অ্যাডমস্ যথার্থই বলেছেন, "মধ্যযুগের সৃষ্টি অগ্রগতির ধারাকে প্রবাহিত করে নি। প্রাচীন বিশ্বে সৃষ্ট স্ববিরোধী ও অসংলগ্ন উপাদানের মধ্য থেকে মধ্যযুগ সুসমন্বিত ও সুসামঞ্জস্য এক ভাবের পসরা সাজিয়ে দেয় মাত্র। পুরাতন যা করতে পারে নি আধুনিক যুগ ঐ পসরাকে সম্বল করে তাই করেছে-ঝড়ের বেগে জয়যাত্রা শুরু করেছে।" মধ্যযুগের সৃষ্টির গুরুত্ব এখানেই।

১। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the nature of mediaeval political thought.) [D. U. 1983]

২। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা কীভাবে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করেছে? (How did mediaeval political thought influence the future direction?)

ল্যাটিন চার্চের শ্রেষ্ঠ পুরোধা সেণ্ট অগাস্টিন বিশ্ব ইতিহাসের এক মহাসংকটময় মুহূর্তে জীবনের পথ পরিক্রমা শুরু করেন। তিনি ছিলেন সেণ্ট আম্ব্রোজের শিষ্য, কিন্তু ভাবীকালের চিন্তাক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা তাঁর মহান গুরুও কল্পনা করতে পারেন নি। সেণ্ট পলের পর খ্রিস্টীয় চার্চের ইতিহাসে এমন প্রভাবশালী প্রতিভা আর দেখা যায় না। সেণ্ট অগাস্টিনের লেখায় সর্বপ্রথম যুক্তিবাদ ও দার্শনিক তত্ত্বের কাঠামোয় মৌলিক খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসের রূপরেখা অঙ্কিত হয়। এক যুগ-সন্ধিক্ষণে জীবনের পথ রচনা করে, সনাতন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা এবং খ্রিস্টীয় সভ্যতার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি মানব সমাজের জন্য তাঁর অভয়বাণী উচ্চারণ করেন। গ্রীকদর্শন ও মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্যে কোন মিলন সূত্র থাকলে তা খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর চিন্তাধারায়।

জীবনী (Life) ঃ তিনি ৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার নুমিদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর আফ্রিকা তখন রোম সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। অগাস্টিনের পিতা ছিলেন নিঃধর্ম গোষ্ঠীর (pagan) এবং তাঁর মাতা ছিলেন খ্রিস্টান। সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা তিনি লাভ করেন। তাঁর মাতা তাঁকে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানদান করেন। যখন তার বয়স ৩৪ বছর তখন তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি 'মেনিচীয়বাদ'-এ দীক্ষা নিয়েছিলেন। নব্য প্লেটোবাদের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না। ৩৪ বছর বয়সে মিলানের বিশপ সেণ্ট আম্ব্রোজের নিকট তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যাজক নিযুক্ত হন এবং চার বছর পর হিপ্পোর বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন চার্চের একজন বিশ্বস্ত সেবক এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবা করে গিয়েছেন। ৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে যখন ভ্যাণ্ডাল জাতি তাদের বিজয় অভিযানে হিপ্পোর দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়, তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সৃজনশীল একজন লেখক। তাঁর বিশিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে সেরা হচ্ছে **'কনফেসান্স'** (স্মৃতিচারণ) এবং **'দি সিটি অব গড'** (স্বর্গরাজ্য)। তা ছাড়া তিনি সারা জীবন ধরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখে গিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লেখা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধমালা, ধর্মগ্রন্থের পর্যালোচনা, খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের যৌক্তিকতা। সেন্ট অগাস্টিন খ্রিস্টীয় চার্চের ইতিহাসে অমর এক নাম। চিন্তার গভীরতায়, দৃষ্টির স্বচ্ছতায় এবং লক্ষ্য অর্জনের গতিশীলতায় তাঁর তুলনা নেই।

তাঁর চিন্তাধারার পটভূমি
Background of his Thought

পশ্চিম ইউরোপ তখন রোম সাম্রাজ্যের পাষাণ প্রশান্তি থেকে মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্যের পথে পা বাড়িয়েছে। বিশ্ববিশ্রুত রোম সাম্রাজ্য নিয়তির মত স্থির ও অনন্ত বলে জনসাধারণের নিকট প্রতিভাত ছিল। আট শো বছর ধরে সমগ্র সভ্য জগতে তা শান্তি রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু অকস্মাৎ তার গতিরুদ্ধ হল। তার বিভিন্ন গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল। পাঁচ শতকে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বর্বরদের যে অভিযান শুরু

হয়, তাতে রোমের পাষাণ প্রাচীরেও চিড় লাগে। রোমের দুর্ভেদ্য সীমান্তব্যূহ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। যে রোমক বাহিনী অজেয় বলে এতদিন পরিচিত ছিল তারা হল পর্যুদস্ত। ৩৭৬ সালের দিকে সাম্রাজ্যের সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া অঞ্চলে তারা আস্তানা গাড়ল। আর পরবর্তী বিশ বছর ধরে চলল তাদের আক্রমণ। ৪১০ সালে রাজা এ্যালারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথরা অবশেষে রোম আক্রমণ করে এবং পুরা তিন দিন ধরে চলে তাদের নৃশংস লুণ্ঠন। রোমের পতন হল। রোমের পতনে সভ্য মানুষ আঁতকে উঠল কারণ, এতে তারা সভ্যতা ধ্বংসের করুণ সুর শুনতে পেল। খ্রিস্টানরা আতঙ্কগ্রস্ত হল। নিঃধর্ম গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা ভীত-বিহ্বল হয়ে উঠল। সবারই একই প্রশ্ন-এ কী হলো? কি করে হলো এমন?

নিঃধর্মীয় ব্যক্তিরা অভিযোগ আনল, খ্রিস্টীয় যুগে রোমের পতন হলো। জুপিটার, নেপচুন, সিবেল, ইসিম, মিথাস প্রভৃতি সনাতন দেবতা খ্রিস্টধর্মের আগমনে রুষ্ট হয়েছে বলে রোম নগরী আজ আশীর্বাদ বঞ্চিত।

খ্রিস্টানরা এই অভিযোগ স্বীকার করে নি, কিন্তু তবুও অন্তরের গভীরে তারাও বেদনা অনুভব করল। তারা ভাবল-খ্রিস্টধর্ম রোমকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারল না। তারা শঙ্কিত হলো এই ভেবে যে, যে সাম্রাজ্যের উপর তারা ভরসা করতে পারত, তাও গেল।

এমন সংকটময় মুহূর্তে সেণ্ট অগাস্টিনের আবির্ভাব। সেণ্ট অগাস্টিন ছিলেন যুগপৎ মহান রোমের এক অধিবাসী এবং সেরা একজন খ্রিস্টান। তাই সে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সঠিক তাৎপর্য তাঁর সমকালীন ব্যক্তিবর্গের নিকট সঠিকভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করলেন। যে সাম্রাজ্য তাদের নিকট ছিল নিত্য ও শাশ্বত, তার পতনের অর্থ তিনি তুলে ধরতে চাইলেন তাদের কাছে। আরও তিনি বলতে চাইলেন—ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্রের রূপরেখা কেমন হবে, কীভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির গৌরবে গৌরবান্বিত খ্রিস্টীয় চার্চ মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে,-কোন্‌পথে 'স্বর্গরাজ্য' মানুষকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে।

এই দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন সেণ্ট অগাস্টিন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও রয়েছে বৈচিত্র্যের সমাবেশ। নিঃধর্মীয় ব্যক্তিদের মনোবেদনা তিনি গভীরভাবে অনুভব করলেন নিজের হৃদয় স্পন্দনে, কেননা তিনি নিজেও ছিলেন তেমন এক ব্যক্তির সন্তান। নিজের জীবনে তিনি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে 'মেনিচীয়বাদ', 'সংশয়বাদ', 'নব্য প্লেটোবাদের' প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে তিনি গভীর বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হন। তাই রোমের পতনের পর উদ্ভুত পরিস্থিতির সম্যক মোকাবেলার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। নিঃধর্মীয়দের প্রতি ইতিহাসের ছিল গভীর আবেদন। তাই তিনি ঐতিহাসিক সূত্রের প্রতি মনোযোগী হলেন। খ্রিস্টধর্মের আধ্যাত্মিক শক্তি কিভাবে নতুন পথের সন্ধান দেবে-এই দিক ভেবে তিনি দ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর সামনে তিনটি প্রশ্ন বিস্তৃত ফণা উদ্যত করে দাঁড়ায় ঃ

(এক) খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর রোমের পতন হলো কেন ?

(দুই) খ্রিস্টধর্মের প্রতি নিঃধর্মীয়দের সন্দেহ নিরসন হবে কীভাবে ?

(তিন) খ্রিস্টীয় চার্চের সমৃদ্ধি সাধন কিভাবে সম্ভব ও কী উপায়ে খ্রিস্টীয় চার্চ মানুষকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে ?

স্বর্গরাজ্য

De Civitas Dei

সেণ্ট অগাস্টিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'স্বর্গরাজ্য' (De Civitas Dei–The City of God) রচনায় আত্মনিয়োগ করেন ৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে এবং তা সমাপ্ত করেন ৪২৬ খ্রিষ্টাব্দে। অবশ্য এই সমগ্রকাল ধরেই যে তিনি লিখেছেন, তা নয়। এই সময়ে বিভিন্ন কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ২২টি খণ্ডে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়।

এ গ্রন্থে প্রচুর ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া, সুদীর্ঘ গ্রন্থে আলোচনা সূত্র প্রায়ই আলগা হয়ে পড়েছে। তিনি যে সব সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তাও সব সময় স্পষ্ট নয়। অনেক সময় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাও ভাবপ্রবণ। তথাপি যে মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং যে বিরাট পটভূমিকার অবতারণা করেছেন তা সত্যই অনবদ্য। তিনি ঐতিহাসিক সূত্র ধরে মানুষের সমগ্র ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষ সৃষ্টির পর থেকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত দুই রাজ্যের নিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছে। এ দু'রাজ্যের একটি হলো স্বর্গরাজ্য' (De Civitas Dei) যার সৃষ্টি হয়েছে দেবতাদের জন্মের পর থেকে এবং অপরটি হলো পার্থিব রাজ্য (Civitas Terrena) যার সৃষ্টি হয়েছে শয়তানের পতনের পর থেকে। পৃথিবীর বুকে একটি এসেছে নিষ্পাপ আবেলের (Abel) মাধ্যমে এবং অপরটি এসেছে পাপী কায়েনের (Cain) মাধ্যমে।

প্রথম থেকে গ্রন্থের দশম খণ্ড পর্যন্ত তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এবং তা হল খ্রিস্ট ধর্মের জন্য রোমের পতন হয় নি। সেণ্ট অগাস্টিন বহু যুক্তির অবতারণা করে বলেছেন যে, ধ্বংস ও মৃত্যু প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। রোমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। অতীতে অনেক সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। এ প্রসংগে তিনি আসিরীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেন। তার ধ্বংসের সাথে খ্রিস্টধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আসিরীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় রোমের পতনের মূলে রয়েছে অনেক কারণ এবং খ্রিস্টধর্মের সাথে এদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই, বরং তাদের মূল প্রোথিত রয়েছে নিঃধর্মীয় অবস্থায়, যেমন- হিংস্র মনোভাব, অহংকার, বিলাসিতা, পাপাচার ও হাজারো অনুরূপ দুষ্কর্মে। তাছাড়া, তিনি বলেন যে, ৪১০ খ্রিষ্টাব্দে রোমের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে ৩৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও তেমন বিপর্যয় রোমের জীবনে নেমে এসেছিল। সুতরাং রোম পতনের জন্য খ্রিস্টধর্ম মোটেই দায়ী নয়, বরং পতনের মুখে খ্রিস্টধর্ম এনে দিয়েছে কিছুটা প্রশান্তি এবং কিছুটা সান্ত্বনা, কেননা গথিক বিজয়ীরা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

গ্রন্থের শেষ বারটি খণ্ডে তিনি মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর মতে যখন প্রত্যেকটি পার্থিব সাম্রাজ্যের শেষ পরিণতি এই, তখন 'স্বর্গরাজ্যই' হল একমাত্র ভরসা। এটি স্থায়ী, চিরন্তন, নিত্য এবং শাশ্বত। এরই পার্থিব রূপ খ্রিস্টীয় চার্চ। সুতরাং অত্যন্ত ভাবগম্ভীর স্বরে তিনি মানুষকে চিরন্তন সেই 'স্বর্গরাজ্যের' দিকে আহ্বান করে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। তিনি খ্রিস্টীয় চার্চের বিজয়াভিযানের সূচনা করেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি বলেন, বিশ্বের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে চার্চের উপর নির্ভরশীল।

ইতিহাস তত্ত্ব
Theory of History

সেণ্ট অগাস্টিন তাঁর অমর গ্রন্থ 'স্বর্গরাজ্য' রচনা করেন খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা খণ্ডন করার জন্য। রোম সাম্রাজ্যের পতনের জন্য খ্রিস্ট ধর্ম কোনক্রমেই দায়ী নয়-এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য। কিন্তু কার্যত তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই গ্রন্থে তাঁর সকল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেন এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। এই তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস তত্ত্ব।

তাঁর মতে ইতিহাস হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের বিরাট রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চের দুটি নায়ক—ভাল ও মন্দ প্রকৃতি। তারা মানবের আত্মা অধিকারের জন্য নিয়ত সংগ্রামে রত। শেষ পরিণতিই এই নাটকের যবনিকা টেনে দেবে। 'ভাল'র প্রতি যাদের আকর্ষণ, তারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে অনন্তকাল শান্তিতে দিন কাটাবে, কিন্তু 'মন্দ'র দিকে যাদের গতি, তারা অভিশপ্ত এবং চির অভিশাপের মধ্যে তাদের থাকতে হবে। সৃষ্টির পর থেকে প্রত্যেক মানুষের গতি এই পরিণতির দিকে। খ্রিস্টের সীমাহীন অনুকম্পায় মুক্তিলাভই হলো কাম্য বাস্তব, কেননা আত্মার প্রকৃতি গুণে মানুষ অনন্তকালের জন্য থাকবে স্বর্গে বা নরকে। ইতিহাসের সকল অঙ্ক পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় না—এখানে অভিনীত হয় শুধুমাত্র মধ্যম অঙ্ক, কিন্তু এই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সেণ্ট অগাস্টিনের চিন্তাধারার মূল ছিল রোম সাম্রাজ্যের বিপর্যয়, যেমন প্লেটো ও এরিস্টটল অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন 'নগর রাষ্ট্রের' বিপর্যয়ে। গ্রীক দার্শনিকগণ নগর রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার অবতারণা করেন, কিন্তু সেণ্ট অগাস্টিন ধর্মতত্ত্ব ও খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, কোন দেবতার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার জন্য অথবা কোন দেবতার আশীর্বাদ বা অভিশাপের জন্য কোন সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে পারে না। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমেই কেবল ইতিহাসের গতিধারা ব্যাখ্যাত হতে পারে। তাঁর মতে, পৃথিবীতে 'স্বর্গীয় রাজ্য' প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই এক নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ধাবিত হচ্ছে। রোমের পতন হয়েছে, কেননা ঈশ্বরের সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য তার প্রয়োজন ছিল। তাঁর মতে, নিঃধর্মীয় অবস্থার কবল থেকে রোমবাসীদের অব্যাহতি দেয়ার জন্য ও সৃষ্টিকর্তার অনুকম্পার আলোকে সকলকে সঞ্জীবিত করার জন্য রোমের জীবনে এই বিপর্যয় নেমে আসে। শাসকদের লোভ-লিপ্সাই ছিল তার কারণ। কার্ল মার্কস যেমন ইতিহাসের সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্বময় শ্রেণী সংগ্রামের নিয়ত কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করেন, তেমনি সেণ্ট অগাস্টিন বলেন, সত্য ও অসত্যের যে নিয়ত সংগ্রাম, আলো ও অন্ধকারের যে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব, ভাল ও মন্দের যে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-একমাত্র তাই ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম।

মূলত সেণ্ট অগাস্টিন স্টয়িক মতবাদকে তাঁর খ্রিস্টধর্মের আলোকে প্রকাশ করে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করেন। স্টয়িক মতবাদ মানুষকে দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বর্ণনা করে। প্রথম, সে তার জন্মভূমির নাগরিক এবং দ্বিতীয়, সারা বিশ্বের। সেণ্ট অগাস্টিন নতুন আলোকে এর পরিবর্তন সাধন করে বলেন, একদিকে রয়েছে 'পার্থিব রাজ্য' যার ভিত্তিমূল হলো মানবের হীন প্রবৃত্তিজাত বাসনা কামনা যা পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়। অন্যদিকে রয়েছে আলোর সেই রাজ্য, জ্যোতির্ময় 'স্বর্গরাজ্য', যার ভিত্তিমূল হলো স্বর্গীয় শান্তি এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। প্রথমটি শয়তানের রাজ্য, যার শুরু হয় অভিশপ্ত দেবতার অবাধ্যতা থেকে এবং যা মূর্ত হয়ে ওঠে অতীতের নিঃধর্মীয় আসিরীয় ও রোম সাম্রাজ্যে। দ্বিতীয়টি 'যীশুর রাজ্য' যা সূচিত হয় সর্বপ্রথম হিব্রু জাতির আধিপত্য এবং পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় চার্চ ও খ্রিস্ট সাম্রাজ্যে। সুতরাং ইতিহাস হচ্ছে এই দুই সমাজের মধ্যে নিরন্তর যে সংগ্রাম তারই নাটকীয় কাহিনী। এর সমাপ্তি ঘটবে যখন সবকিছু 'স্বর্গরাজ্যে' মিলিয়ে যাবে।

তবে সেণ্ট অগাস্টিনের ঐতিহাসিক সূত্র ব্যাখ্যা করার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তাঁর 'স্বর্গরাজ্য' বা 'পার্থিব রাজ্য' প্রচলিত মানবীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনীয় নয়। খ্রিস্টীয় চার্চকে তিনি স্বর্গরাজ্যের সাথে এক পঙক্তিতে ফেলে বিচার করেন নি অথবা রাষ্ট্রকে 'পার্থিব রাজ্যের' সাথে তুলনা করে তাকে দীন বা হীন প্রমাণ করতে চান নি। স্বর্গরাজ্যের মূল সুর সৃষ্টিকর্তার প্রতি উৎসাহ ও ত্যাগের মহিমা। তাই তিনি খ্রিস্টীয় চার্চকে তার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীরা পৃথিবীতে প্রবাসীর ন্যায় অল্পক্ষণ অবস্থান করে আর নিজের ধর্ম বিশ্বাসে সঞ্জীবিত থাকে। পার্থিব রাজ্যে সে বন্দী ও অপরিচিতের ন্যায় কাল কাটায়। তিনি কোথাও চার্চের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নি। এক জায়গায় তিনি এর বর্ণনা করেছেন সৃষ্টিকর্তার মনোনীতদের অদৃশ্য গির্জা হিসেবে। অন্যত্র তিনি একে "বিশ্ববাসীদের এক প্রতীয়মান সংঘ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। খ্রিস্টীয় চার্চ যেমন 'স্বর্গরাজ্যের' প্রতীক, তেমনি রাষ্ট্র 'পার্থিব রাজ্যে'র প্রতীক মাত্র।

স্বর্গরাজ্য ও পার্থিব রাজ্য
Civitas Dei and Civitas Terrena

সেণ্ট অগাস্টিনের মতে রাজ্য (city) কোন ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক একক নয়। রাজ্য এক জনসমাজ যা এক স্বতন্ত্র মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ। তিনি জীবনধারাকেই মুখ্য জ্ঞান করতেন। কোন সংগঠন তাঁর নিকট ছিল গৌণ। 'স্বর্গরাজ্য' সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মহত্ত্বের সমাজ, কিন্তু 'পার্থিব রাজ্য' স্বার্থপরতা, নীচতা ও হিংসার প্রতীক। 'স্বর্গরাজ্য' আত্মার এবং 'পার্থিব রাজ্য' দেহের প্রতীক। স্বর্গরাজ্য

স্বর্গীয় এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেমই এর বৈশিষ্ট্য। এই ঈশ্বরপ্রেম আত্মবিস্মৃতির নামান্তর। কিন্তু পার্থিব রাজ্য পৃথিবীর এবং এখানে আত্মপ্রীতি, ক্ষমতা-লোলুপতা ও কামনার লেলিহান শিখা ঈশ্বরপ্রেমকে নিঃশেষ করে ফেলে। স্বর্গরাজ্য অনন্ত আশীর্বাদ পুত, কিন্তু পার্থিব রাজ্য অনন্তকালের জন্য অভিশপ্ত। একটি আলোর রাজ্য, চিরভাস্বর এবং জ্যোতির্ময়, কিন্তু অপরটি অন্ধকারের, মোহের এবং দুর্ভেদ্য কালিমার। তিনি তাঁর 'স্বর্গরাজ্য' (The City of God) গ্রন্থে এই দুটির নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। "দ্বিবিধ প্রেমের জন্য দ্বিবিধ রাজ্য গড়ে ওঠে। পার্থিব রাজ্য গড়ে ওঠে আত্মপ্রেমের ফলে—যে আত্মপ্রেম ঈশ্বরকেও অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করে। কিন্তু স্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠে ঈশ্বর প্রেমের ফলে—যে ঈশ্বরপ্রেম আত্মপ্রেমকে হীন বলে ঘৃণা করে। প্রথমটি আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত, কিন্তু দ্বিতীয়টি ঈশ্বরের গৌরবে গর্ববোধ করে।"

সেণ্ট অগাস্টিনের এই দ্বিবিধ শ্রেণীভেদ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সমগ্র মনুষ্য সমাজকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ স্বার্থান্বেষী ও অসত্যের অনুসারীবৃন্দ যারা মানুষকে মুখ্যজ্ঞান করে রচনা করেছে এক জীবনবোধ। অন্যভাগে আছে সত্যানুসন্ধান-যাঁরা সৃষ্টিকর্তাকে মুখ্যজ্ঞান করে শাশ্বত এক জীবন গড়ে তুলেছেন। এই দুই ভাগকে সেণ্ট অগাস্টিন দুই রাজ্য বলে অভিহিত করেছেন। এক রাজ্য ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অনন্তকাল স্বর্গশাসন পরিচালনা করবে, কিন্তু অন্য রাজ্যটি অভিশাপের মধ্যে নরকে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

রাষ্ট্র ও সরকার
State and Government

সেন্ট পল্, সেন্ট আইরেনিয়াস ও অন্যান্য খ্রিস্টান ধর্মযাজক রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করতেন, সেণ্ট অগাস্টিনের মতবাদে তারই অনুরণন দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, সরকারের জন্ম হয়েছে মানুষের পাপ-পঙ্কে। পাপ ছিল বলে সরকারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক আদি মাতাপিতার আমলে স্বর্গে কোন সরকার ছিল না। পাপের পথে পা বাড়িয়েই মানুষকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসতে হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাই ঈশ্বর চেয়েছেন পাপের বিষক্রিয়া নিঃশেষ করতে। এটিই প্রতিবিধানের স্বর্গীয় বিধান। "ক্ষমতার উৎস সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা"। ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হলো মানুষের অসৎ প্রবৃত্তির ফলে। সেণ্ট অগাস্টিন বলেছেন, যে মানুষকে ঈশ্বর তাঁর সীমাহীন করুণা ও স্নেহের আপন প্রতিচ্ছায়ায় সৃষ্টি করেছেন তাদের উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চান নি। তাই প্রথমে শাসকদের বলা হতো 'দলীয় নেতা', পালের পালক ('Shepherd of their flocks')। পরে তাদের মধ্যে মানবিক গুণের বিকৃতি দেখা দিলে শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাঁর মতে সরকার খারাপ নয়। মানুষের খারাপ প্রবণতা রয়েছে বলে সরকারের সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

কিন্তু 'স্বর্গরাজ্য' ও 'পার্থিব রাজ্যে'র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে সেণ্ট অগাস্টিন এক অসুবিধায় পড়েন। তিনি বলেন, নিঃধর্মীয় যুগের প্রাক-খ্রিস্টান সাম্রাজ্যগুলো 'স্বর্গরাজ্যের' আওতায় পড়ে না। রোম সাম্রাজ্যও তাই। এদের জন্ম হয় জাতিগত প্রয়োজনে। ন্যায়নীতি ও সুন্দর জীবনের আদর্শ অনুসরণের জন্য তাদের জন্ম হয় নি। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে মানুষ কেন তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে ?

সেণ্ট অগাস্টিন এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তথাপি ঐ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। কেননা, তা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং নাগরিকদের সম্পত্তি সংরক্ষণ করে।' সেণ্ট অগাস্টিন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে তিনি বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারো কিছু আয়ত্তে রাখা উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু থাকলে তা সর্বসাধারণের জন্য বিলিয়ে দেয়া উচিত।

রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ন্যায়নীতি। ন্যায়নীতিই রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্বরূপ। প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তির সংরক্ষণ, প্রত্যেকের মর্যাদার নিশ্চয়তা ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রতিটি অন্যায়ের শাস্তি বিধান এই ন্যায়নীতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর 'স্বর্গরাজ্য' (The City of God) গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'ন্যায়নীতি প্রত্যাহার করা হলে রাষ্ট্র এবং বিরাট এক দস্যুদলের মধ্যে কোন তফাত থাকে না।"

ন্যায়নীতি ও শান্তি
Justice and Peace

সেণ্ট অগাস্টিনের মতে, ন্যায়নীতি ও শান্তি 'স্বর্গরাজ্যের' দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ন্যায়নীতি এবং শান্তির আদর্শ তাই বাস্তবায়িত হতে পারে শুধুমাত্র 'স্বর্গরাজ্যের' অনুরূপ শাসন ব্যবস্থায়। 'পার্থিব রাজ্যে' এ আদর্শ কোনক্রমেই রূপায়িত হতে পারে না। তাঁর মতে, খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে যে সব রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, সে সব ক্ষেত্রে কোন ন্যায়নীতি ছিল না। শুধুমাত্র খ্রিস্টান রাষ্ট্রে এই নীতি কার্যকর হতে পারে।

ন্যায়নীতি ও শান্তির প্রশ্নে সেণ্ট অগাস্টিন সিসেরোর অভিমতের প্রতিধ্বনি করেন। সিসেরোর মত তিনিও বলেছেন, ন্যায়নীতি ব্যতীত কোন সঠিক রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না এবং যে রাষ্ট্রে ন্যায় নীতি নেই, সেখানে আইনও থাকতে পারে না।

এভাবে তিনি 'পার্থিব রাজ্যকে' হেয় প্রতিপন্ন করেন এবং বলেন, অ-খ্রিস্টান কোন রাষ্ট্রে ন্যায়-নীতির মত কোন সামাজিক নীতি প্রবর্তিত হতে পারে না। তিনি বলেছেন, ন্যায়নীতি বর্জিত রাষ্ট্র একদল দস্যু বা লুণ্ঠনকারীর সাথে তুলনীয়।

সেণ্ট অগাস্টিনের ন্যায়নীতির সংজ্ঞা বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্লেটো যার যা প্রাপ্য তাকে দেয়াকেই ন্যায়নীতি বলে অভিহিত করেন। কিন্তু গ্রীক দার্শনিক ও খ্রিস্টীয় যাজক অগাস্টিনের ন্যায়নীতির ধারণায় এক মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। প্লেটোর নিকট রাষ্ট্র ছিল সর্বোচ্চ একক। রাষ্ট্র কোন বৃহত্তর পরিধি বিশিষ্ট শৃঙ্খলার অংশবিশেষ নয়। সুতরাং কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি এই নীতি মেনে চলে এবং আনুগত্যের সাথে সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে তবেই ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অগাস্টিনের মতে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ একক নয়। রাষ্ট্র বিশ্ব নিয়ন্তার আওতাভুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন। তারই ইচ্ছামত গড়ে উঠেছে বিশ্বজনীন এক শৃংখলা এবং পরিবার, নগর, রাষ্ট্র তারই অংশবিশেষ। তা যেন সর্বজনীন এক সম্প্রদায়, যা খ্রিস্টীয় চার্চের মাধ্যমে 'স্বর্গরাজ্যে' প্রবেশ করে। ধর্মবিরোধী কোন নীতি রাষ্ট্র গ্রহণ করলে তা হবে ন্যায়নীতি বিরোধী। ন্যায়নীতি শুধুমাত্র সেই রাষ্ট্রে রূপায়িত হতে পারে যে রাষ্ট্র খ্রিস্টীয় চার্চের নির্দেশের অনুসারী।

শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সেণ্ট অগাস্টিন বলেন, খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে সব রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছিল তারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় নি। তারা নিজেদের এলাকায় শান্তি রক্ষায় সক্ষম হলেও নিজেদের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয় নি, কেননা বিশ্বজনীন শান্তির দুটি শর্ত আছে। প্রথমটি, সকলকে বিশ্বজনীন শৃঙ্খলার সাথে একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সর্বজনীন আইনের নিয়ন্ত্রণে আসতে হবে। দ্বিতীয়টি, সকলকে নিজেদের মত ভালবাসতে হবে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

দাস প্রথা
Slavery System

সেণ্ট অগাস্টিন ক্রীতদাসদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে তুলনা করেছেন এবং এই প্রথা সংরক্ষণের যৌক্তিকতা প্রদান করেন। দাস প্রথার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "স্বাধীনতা ও দাসত্বের প্রশ্ন প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশেই নির্ধারিত হয়েছে"। যে মানুষকে তিনি স্বীয় প্রতিচ্ছায়ায় সৃষ্টি করেছেন, তাদের উপর অন্য মানুষ প্রভুত্ব করুক তা তিনি চান নি। তিনি চেয়েছেন, মানুষ জীবজন্তু ও বুদ্ধিবৃত্তিহীন প্রাণিদের উপর প্রভুত্ব করবে, মানুষের উপর নিশ্চয়ই নয়। তাই পুরাকালে সৎ ব্যক্তিদেরকে রাজা না বলে

পরিচালক বা পথ প্রদর্শক বলে চিহ্নিত করা হতো। এ থেকে বুঝা যায় মানুষের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত এবং পাপের পূর্ব পর্যন্ত এই ছিল নিয়ম। ন্যায়নীতির দিক থেকে বলা হয়, দাসত্ব পাপের ফল। তাই কোন ধর্মগ্রন্থের কোন অংশে আমরা 'দাস' কথাটির উল্লেখ দেখতে পাই না। এর প্রথম ব্যবহার হয় যখন হযরত নূহ তাঁর অবাধ্য ছেলেকে তার পাপের জন্য এই শব্দ দিয়া নিন্দাবাদ করেন।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় সেন্ট অগাস্টিনের প্রভাব

Influence of St. Augustine in Political Philosophy

সেন্ট অগাস্টিন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রিস্টীয় চিন্তানায়ক। তিনি খ্রিস্ট ও সনাতন প্রাচীনতা এ মহান ঐতিহ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্ব সমস্যা অনুধাবন করেছেন। সেন্ট পলের পর পরবর্তী কোন খ্রিস্টীয় লেখক চিন্তারাজ্যে এমন প্রভূত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন নি। রাষ্ট্রচিন্তায় মধ্যযুগীয় যে স্রোত প্রবাহিত হয় তার গতি তিনিই নির্দিষ্ট করে দেন।

ক্রিস্টোফার মরিস যথার্থই বলেছেন, মহামতি গ্রেগোরী, এনশ্লেম, এব্রেরাড্, ডানস্ স্কোটাস, উইক্লিফের ন্যায় মধ্যযুগের চিন্তানায়কগণ প্রত্যেকেই তাঁর মতবাদে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁর বক্তব্যকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন। তাঁর 'স্বর্গরাজ্য' (The City of God) গ্রন্থটি প্রত্যেকের নিকট ছিল প্রামাণ্য একটি গ্রন্থ।

অধ্যাপক স্যাবাইন তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন, তা ছিল মতবাদের এক রত্ন খনি স্বরূপ, যা থেকে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় গোষ্ঠীর লেখকই মণিমুক্তা ও অন্যান্য দুর্মূল্য রত্নরাজি আহরণ করেছেন। এ গ্রন্থে পরিপূর্ণ রাজনীতির সব উপাদান বর্তমান ছিল, যা সার্লেমেইন ও মহামতি অটোর ন্যায় মধ্যযুগীয় সম্রাটের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীকালে তাঁরই মতবাদ 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' (Holy Roman Empire) ভিত্তি পত্তন করে। খ্রিস্টীয় শাসন ব্যবস্থা (Christian Commonwealth) সম্পর্কে তাঁর যে মতবাদ তাই মধ্যযুগে বিশ্বজনীনতার ধারাকে সুদৃঢ় করে।

সেন্ট অগাস্টিন ছিলেন এক যুগপ্রবর্তক মহান চিন্তানায়ক। তাঁর 'স্বর্গরাজ্য' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সভ্যতার সূত্র ধর্মতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাত হতে শুরু করে এবং শিক্ষার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে ধর্মীয় তত্ত্বের আওতাধীনে এসে পড়ে।

১। সেন্ট অগাস্টিনের রাজনৈতিক দর্শনের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা কর। (Describe the background of St. Augustine's political philosophy.) [N. U. 2003, 2005]

২। সেন্ট অগাস্টিনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্বর্গরাজ্য' সম্বন্ধে কী জান? (What do you know of St. Augustine's famous book–De Civitas Dei?)

৩। সেন্ট অগাস্টিনের ইতিহাস তত্ত্বের বিবরণ দাও। (Describe the theory of history according to St. Augustine.)

৪। রাষ্ট্র এবং সরকার সম্বন্ধে সেন্ট অগাস্টিনের অভিমত বিবৃত কর। (Describe St. Augustine's opinion on the state and government.)

৫। ন্যায়নীতি এবং শান্তি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী? (What did he say about justice and peace?)

৬। কিভাবে সেন্ট অগাস্টিন রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেন? (How did St. Augustine influence the political thought?)

সেণ্ট টমাস একুয়নাস

১০

ST. THOMAS AQUINAS

(১২২৫—১২৭২)

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সেণ্ট টমাস একুয়নাসের প্রতিভা ছিল অনন্য। তের শতকের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকই তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা। তাঁর চিন্তাধারার আলোকে মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত ভাস্বর হয়ে রয়েছে। দুটি কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। **প্রথম,** তাঁর চিন্তা-ভাবনায় এবং ধ্যান-ধারণায় নব্য ইউরোপের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। ইউরোপ তখন অন্ধকার গহ্বর থেকে আলোর রাজ্যে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে। টমাস একুয়নাসের প্রতি ছত্রে শোনা যায় তারই আহ্বান। তখন মাত্র ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে শুরু হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকটিতে আশাবাদী বহু সংখ্যক নবীন শিক্ষার্থী চিন্তা ও ভাবাদর্শের দিগন্ত উন্মোচনে ব্যস্ত। সেই যুগের দুঃসাহসিক অভিযানের চমকে সেণ্ট টমাস একুয়নাস সচকিত। তিনি তাই সমুন্নত আদর্শকে মূলধন করে সেণ্ট অগাস্টিনের 'ধর্ম রাজ্যকে' ধূলির ধরায় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলেন। এই দিক দিয়ে তাঁর তুলনা নেই। **দ্বিতীয়,** তিনি হলেন মধ্যযুগের সর্বপ্রথম চিন্তাবিদ যিনি খণ্ড- ছিন্ন-ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রগুলোকে এক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করে সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ সুষম এক ব্যবস্থা প্রাণবন্ত করেন। তাই তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়।

জীবনী
Life

সিসিলি ও ক্যাম্পানিয়া রাজ্যের উপকণ্ঠে রক্কাসিক্কা নামক স্থানে ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজকীয় ঐতিহ্যে লালিত পরিবারে বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল কাটে। তাঁর দুই ভাই সম্রাটের অধীনে উচ্চ পদে চাকরি রত ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে মণ্টিক্যাসিনোর বেনেডিক্টাইন শিক্ষাপীঠে তাঁকে পাঠান হয়। বার বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেন। মণ্টিক্যাসিনো যখন সম্রাটের আদেশে বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি নেপলসের বিদ্যায়তনে যান। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং অকল্পনীয় স্মৃতিশক্তি দেখে এখানে তার শিক্ষকবৃন্দ বিস্ময় বোধ করেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, একবার পাঠ করলে তিনি কোনদিন তা ভুলতেন না। অবোধ্য বলেও তাঁর কাছে কিছু ছিল না। জীবনে তাঁর সবকিছুর সম্ভাবনা ছিল। সম্মান, পদমর্যাদা কোন কিছুর অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। উনিশ বছর বয়সে সবকিছু তুচ্ছ করে তিনি সেণ্ট ডোমিনিক্যান গোষ্ঠীর যাজক হিসেবে দলভুক্ত হন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অনুরোধ উপরোধে কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাকে জোর করে ধরে এনে পারিবারিক বন্দীশালায় বন্দী রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বপক্ষে স্বয়ং সম্রাট এবং পোপ হস্তক্ষেপ করায় তিনি মুক্ত হন এবং ইচ্ছামত কাজে যোগদান করেন।

তাঁর ধীশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অনেক গুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সার্থকতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য মহান আলবার্টের নিকট শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁকে কোলোনে পাঠান হয়। একুয়নাস আলবার্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। আলবার্ট যখন কোলোন ত্যাগ করে প্যারিসে যান,

তখন একুয়নাসও তাঁর সাথে প্যারিসে যান। এরিস্টটলের শিক্ষা ও দর্শন পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আলবার্টের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ১২৫২ খ্রিষ্টাব্দে একুয়নাস ডোমিনিক্যান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে আবার প্যারিসে যান। তারপর তিনি নিজেই শিক্ষকতা কাজে ব্রতী হন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও দৃষ্টির উদারতার জন্য তিনি সারাবিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত তিনি রোম, বোলোগনা, অরভিয়েট, পেরুজিয়া প্রভৃতি স্থানে পোপের দরবারে শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। একবার তিনি লণ্ডনেও গিয়েছিলেন এবং লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তাঁর মতাদর্শীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শেষে তিনি সাধারণ এক শিক্ষায়তন সংগঠনকল্পে নেপল্‌সের পথে প্যারিস ত্যাগ করেন এবং পথে লায়ন্স-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৭ বছর। তিনি সম্রাট ও রাজন্যবর্গের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছেন। পোপের সান্নিধ্য পেয়েছেন। ইউরোপের আনাচে-কানাচে ভ্রমণ করেছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রচলিত ঘটনারাজি অবলোকন করেছেন এবং শিক্ষক হিসেবে অমর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন সত্যই অপূর্ব ও অনবদ্য।

তাঁর চিন্তাধারার পটভূমি
Background of his Thought

মধ্যযুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের জটিলতম সমস্যা ছিল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চরম বহুত্ববাদ এবং ধর্মনীতি ও চিন্তাধারায় ঐক্যানুভূতির তীব্র আকুতির সমন্বয় প্রচেষ্টা। মধ্যযুগের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে সামন্ত প্রথার ফলশ্রুতি হিসেবে বহুত্ববাদ ও বিকেন্দ্রীকরণ ধারা মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ধর্ম ও পার্থিব ব্যাপারে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় ঐক্যনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঈশ্বরের একত্ববাদ, ঐশ্বরিক বিধান ও যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে একত্ববাদ সমাজ, প্রকৃতি তথা সমগ্র বিশ্বচরাচরে অনুরণন তুলেছেন। সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে, কেননা সবার উপরে রয়েছে একই ঐশ্বরিক বিধি-বিধান এবং একই সরকার ব্যবস্থায় সকলেই সুসংহত। বস্তুজগতে বিভিন্নতা রয়েছে বটে, কিন্তু সবার উপরে যে বিশ্ব প্রভু, তার অস্তিত্বের কেন্দ্রভূমিতে ঐক্যনীতি স্ফূরিত হতে চলেছে। মানবের দেহ ও আত্মার মধ্যে যে দ্বিত্ব তা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে চার্চ ও সাম্রাজ্যে, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কর্তৃত্বে। কিন্তু মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তাধারায় কেউ এই দ্বিত্বকে চরম ও সার্থক বলে গ্রহণ করতে রাজি হন নি। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের উপরে সার্বগ্রাসী যে মিলন বন্ধন রয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সুষম এক সমন্বয় সাধন যে সম্ভব, এ বিষয়ে প্রত্যেকে উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষমান। সাম্রাজ্য ও চার্চের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাও এক দিক দিয়ে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। চার্চ ও সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা রাজতন্ত্রের মাধ্যমে যে সম্ভব এবং তা সম্ভব হলে সবার প্রভু-বিশ্বপ্রভুর ঐক্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তাও ছিল অনেকের চিন্তাসূত্রে। সেণ্ট টমাস একুয়নাসের অবদান এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবনযোগ্য।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টিকে অবলোকন করা চলে। বার শতকের শেষ দিকে মধ্যযুগীয় বন্ধ্যা চিন্তারাজ্যের প্রান্তসীমায় ইউরোপের দর্শন ও মতবাদের ভূমিতে এক সাড়া অনুভব করা যায়। সৃজনশীল তত্ত্ব, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা এ সময় থেকে গুরুত্ব পেতে থাকে। রোমের পতনের পর থেকে সমগ্র ইউরোপব্যাপী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি আলোচিত হয়েছে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে। আধ্যাত্মিক আলোচনা ও ধর্মতত্ত্ব ছিল সব আলোচনার মধ্যমণি। সেণ্ট অগাস্টিন এ ধারার সূচনা করেন। এর ফলও হয়েছিল বড় মারাত্মক। ধর্মের একচেটিয়াত্ব মানব চিন্তার সর্বক্ষেত্রে এনেছিল অনভিপ্রেত বন্ধ্যাত্ব। কিন্তু বার শতকের শেষ দিকে কয়েকজন দুঃসাহসী বুদ্ধিজীবী এ উষর চিন্তারাজ্যে গড়ে তোলেন আশার মরূদ্যান। খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদের (Scholasticism) শ্রেষ্ঠরত্ন সেণ্ট টমাস একুয়নাস এ ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়।

খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদের আলোচনার পূর্বে আর একবার পেছন ফিরে তাকানো প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় দুটি বলিষ্ঠ স্রোতধারা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। একটি ছিল খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং অন্যটি ছিল প্রাচীনকালের সনাতন 'গ্রীকো-রোমান' সভ্যতার অবদান। খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস ও প্রাক-খ্রিস্টীয় দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন মহতী প্রচেষ্টা গৃহীত হলে তখন অতি সহজে তা সম্পন্ন হতে পারত, কেননা তখন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর তত ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারা সংরক্ষিত ছিল বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি গীর্জা ও তীর্থস্থানে। তখনকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব কেন্দ্রিভূত ছিল চার্চ ও অধর্মাচরণের মধ্যে, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে নয়। তাছাড়া, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে তখন ছিলেন প্লেটো। এরিস্টটল তখনও রয়েছেন অবজ্ঞাত ও অখ্যাত।

এগার ও বার শতকের দিকে মানবতাবাদের শিক্ষা দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। বোলোগ্না, চার্তারস্, প্যারিস, অক্সফোর্ড প্রভৃতি কেন্দ্রে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার দ্রুত ঘটতে থাকে। এর পূর্বে বিদগ্ধজন ধর্মীয় আইন ও রোমান আইনের সমন্বয় বিধান করেছেন। গ্রীক, বাইজাইনটাইন ও ইসলামী সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অনুশীলন শুরু হয়েছে। সিসিলি, স্পেন ও ফ্রান্সের সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলোতে নতুন ও উত্তেজনাপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ শুরু হয়েছে। তের শতকের দিকে এই প্রচেষ্টা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসে। রেনেসাঁর পূর্বে প্রাচ্যই পাশ্চাত্যকে শিখিয়েছিল। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের জ্ঞানকে ধারণ করে বুদ্ধিবৃত্তি প্রসারের ধারাকে আরও দ্রুত প্রবাহিত করে। তের শতকের পর তাই দেখা যায় এক কালের শিক্ষক প্রাচ্য তার শিষ্যের বহু পিছনে রয়ে গিয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির এ ধারাকে খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদ (Scholasticism) বলে অভিহিত করা চলে। এ ধারায় সঞ্জীবনী স্রোত হিসেবে কাজ করে এরিস্টটলের দর্শন ও যুক্তিবাদ। বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রে লেখক, দার্শনিক ও তাত্ত্বিকগণ এমন এক ঐক্যনীতি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ছিলেন, যেখানে বিশ্বাস ও যুক্তি, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, খ্রিস্ট ধর্ম ও প্রাচীন সভ্যতার সমন্বয় ঘটে। খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদ মধ্যযুগীয় আলোকে আলোকিত। অধ্যাপক ইবনেস্টাইনের মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ত প্রথা যেমন, মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদও তেমনি।

তের শতককে পাণ্ডিত্যবাদের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময় অবশ্য পোপের ক্ষমতাও সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট তাই বলেছেন, "চাঁদ যেমন সূর্যের আলোকে আলোকিত এবং গুণ, আয়তন, মর্যাদা ও প্রভাবে যেমন চাঁদ সূর্য থেকে হীনপ্রভ, তেমনি রাজকীয় কর্তৃত্ব পোপের নিকট থেকে লাভ করে তার ঔজ্জ্বল্য ও মর্যাদা।" চার্চ বিশ্বজনীন হয়ে ওঠার সাথে সাথে এক সর্বজনীন, ব্যাপক এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শনেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়। হাজার বছর ধরে ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে সমন্বয় বিধান হয়, তাই হয়ে ওঠে নতুন সৌধের একটি স্তম্ভ আর তার একটি হলো এরিস্টটলের পুনরুদ্ধার।

প্রাচ্য ভূমিতে এরিস্টটলের অনুশীলন চলে আসছিল বহুদিন থেকেই। কনস্টান্টিনোপল ছিল গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। কনস্টান্টিনোপল্ থেকে তা নিকট প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আরব পণ্ডিতদের মাধ্যমে তার লেখা অনূদিত হয়ে তাঁর লেখার উপর হাজার হাজার ভাষ্য রচিত হয়ে স্পেনে তা বিস্তার লাভ করে। বার শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এরিস্টটলের লেখা ইউরোপে তেমন পরিচিত হয় নি, কিন্তু তের শতকের দিকে তার চিন্তাধারা ইউরোপে নবযুগের সূচনা করে। এরিস্টটল অনুশীলনের জন্য টলেডো এক কালে ছিল এক বিরাট কেন্দ্র এবং সেখান থেকে তা প্যারিস ও অক্সফোর্ডে বিস্তৃতি লাভ করে।

ক্রমে ক্রমে তাঁর সকল লেখাই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তাঁর দর্শন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি এবং নীতিশাস্ত্র পাশ্চাত্যের সাধারণ সম্পদে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে চার্চ এ নতুন মতবাদগুলোকে অপরিচ্ছন্ন বলে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। প্রাচীনকালের জনৈক বিশপ টারচুলিয়ন (Tertullion) ঘোষণা করেছিলেন, খ্রিস্ট ধর্ম ও দর্শন পরস্পরবিরোধী। তাঁর মতে, দর্শনই

অধর্মাচরণের উৎস। প্লেটো, এরিস্টটল ও স্টয়িক মতবাদ খ্রিস্টধর্মে অসংলগ্নতা ও বিচ্ছিন্নতার সূচনা করবে। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে এরিস্টটলের অনুশীলন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে চার্চেরও মত পরিবর্তন হলো। প্রথমে সহিষ্ণুতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বীকৃতির মাধ্যমে এরিস্টটল তত্ত্ব ধর্মতত্ত্বে নতুন প্রাণবন্যার সূচনা করে। টমাস একুয়নাসের ভূমিকা এ প্রেক্ষিতে সত্যই উল্লেখযোগ্য। তা অবশ্য মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মের সজীবতারও পরিচায়ক, কেননা একশত বছর আগে যে পাঠ খ্রিস্টধর্মের বিরোধী বলে গণ্য হত, এখন তা খ্রিস্টীয় দর্শনের মধ্যমণি হয়ে উঠল।

সেন্ট টমাস একুয়নাস ও সেন্ট অগাস্টিন
St. Thomas Aquinas and St. Augustine

খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে বিরাট দুই দিকপাল সেন্ট অগাস্টিন ও সেন্ট টমাস একুয়নাস। সেন্ট অগাস্টিনের মতবাদে প্রস্ফুটিত হয়েছে খ্রিস্টধর্মের মূলমন্ত্র এবং প্লেটোবাদ, কিন্তু টমাসের মতবাদে খ্রিস্টধর্মের মূলমন্ত্রের সাথে এরিস্টটলবাদের ঘটেছে সুষম সম্মিলন। খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাবের পর কয়েক শতক ধরে প্লেটোর মতবাদ বারে বারে দোলা দিয়েছে খ্রিস্টতত্ত্বের দ্বারে। খ্রিস্টধর্মের দুর্জ্ঞেয়বাদ ও আদর্শবাদ প্লেটোবাদের অনেকটা কাছাকাছি। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে প্লেটোর চিন্তাধারা খ্রিস্টান গুরুদের মতবাদকে প্রভাবিত করেছে প্রচুর পরিমাণে। সেন্ট অগাস্টিন নিজেই বলেছেন, খ্রিস্টতত্ত্ব ও ঐশীবাণীর সাথে প্লেটোবাদ সংগতিপূর্ণ এবং প্রথম থেকেই খ্রিস্টতত্ত্ব প্লেটোর ভাবধারায় প্রবাহিত। কিন্তু তের শতকের দিকে খ্রিস্টতত্ত্ব ও চার্চ সংগঠনে এমন পরিবর্তন সূচিত হয়, যার ফলে প্লেটোবাদ চার্চের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কয়েক শত বছরের ব্যবধানে চার্চের মূল সুর ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা থেকে সরে গিয়ে অনুরণিত হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতি ও সৌষ্ঠবে। পরিবর্তিত এ অবস্থায় চার্চ অগাষ্টিনবাদ পরিহার করে টমাসবাদকে গ্রহণ করে এবং ফলে এরিস্টটলের প্রতি চার্চের আকর্ষণের সূচনা হয়। অগাস্টিনের নিকট খ্রিস্টধর্ম ছিল বিশ্বাস আর প্রেম। দর্শন, যুক্তিবাদ বা আইন তাঁর নিকট গৌণ। কিন্তু টমাসের কাছে বিশ্বাস ও প্রেমের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল চার্চের সাংগঠনিক স্থিতি, যুক্তিবাদী ভিত্তি এবং আইনগত কাঠামো।

খ্রিস্টীয় দর্শনে এরিস্টটলের বিজয় দুটি দিকের উন্মোচন ঘটায় ঃ

(এক) তের শতক পর্যন্ত বিশ্বাস করা হতো যে, প্লেটো ও এরিস্টটল সর্বদেশের ও সর্বকালের জন্য দুটি সম্ভাব্য দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। প্রাক-খ্রিস্টান দর্শনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন স্বত্ত্বেও মধ্যযুগের পাণ্ডিত্যবাদ প্লেটো ও এরিস্টটলের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় নি, তা আর একবার প্রমাণিত হলো।

(দুই) বিশ্বাস ও যুক্তিবাদ তথা আধ্যাত্মবাদ ও বুদ্ধিবাদের ক্ষেত্রে সেন্ট টমাস একুয়নাসের সামঞ্জস্য বিধানে এও প্রমাণিত হলো যে, চার্চ অনড় অচল কোন তত্ত্বগত সংস্থা ছিল না। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রবণতা ও ক্ষমতা চার্চ হারায় নি। এগার শতকের পর ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে এমন পরিবর্তন দেখা দেয়, যার সম্মুখে ধর্মতত্ত্ব অপ্রতুল প্রমাণিত হয়। চার্চকে নবজাগ্রত মানবতাবোধ এবং রাষ্ট্রীয় মতবাদের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। এরিস্টটলের মধ্যে চার্চ এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিশ্বগ্রাসী চিন্তাধারার সন্ধান পায়। এরিস্টটলের দর্শনে যে নমনীয়তা ছিল,সামঞ্জস্য বিধানের যে ক্ষমতা ছিল-যা ছিল মানবতাবাদের রসে জারিত, যা ছিল জাতি, ধর্ম ও কালের উর্ধ্বে-চার্চ টমাসের মাধ্যমে তাই প্রয়োগ করে এক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এতে প্লেটোবাদের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য না থাকলেও ছিল স্থায়িত্ব ও সংহতির গৌরব। জন্মক্ষণে চার্চের প্রয়োজন ছিল প্লেটোর, কিন্তু জীবনীশক্তি ও স্থিতির জন্য এখন তার প্রয়োজন হলো এরিস্টটলের। টমাস তাই সংযোজন করেন।

খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদ
Scholasticism

খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদ একটা মতবাদ, একটা স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তাপ্রবাহ এবং একটা আন্দোলন। একুয়নাস এ আন্দোলনের সূচনায়ও ছিলেন না, এর সমাপ্তিতেও ছিলেন না, তবে তিনি যে এর মধ্যমণি এতে কোন সন্দেহ নেই। একুয়নাসের পূর্বে যারা এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এনস্লেম, এবিলার্ড, পিটার লম্বার্ড এবং মহামতি আলবার্ট। তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ডানস্ স্কোটাস এবং ওকামের উইলিয়াম। জনৈক পণ্ডিতের মতে পাণ্ডিত্যবাদ ছিল এমন এক চিন্তাস্রোত যাতে যুক্তির কষ্টিপাথরে দর্শন ধর্মতত্ত্বের অধীন হয়ে পড়ে। যেখানে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বিহার ঘটত, সেখানে ধর্মনীতিই সত্যের চরম মানদণ্ডরূপে পরিগণিত হতো। এ আন্দোলন বার এবং তের শতকের ইউরোপে এক যুগান্তকারী ধারা সংযোজনে সমর্থ হয়েছিল। এর পূর্ব পর্যন্ত চিন্তাধারা ধর্মতত্ত্বের গহ্বরে বন্দিনী ছিল, কিন্তু এ আন্দোলনের ফলে ইউরোপে সর্বপ্রথম ধর্ম প্রভাবিত চিন্তাজগতে আধ্যাত্মবাদের সাথে যুক্তিবাদের সমন্বয় ঘটে।

এই চিন্তাপ্রবাহ যে যুক্তিবাদী ছিল তা নয়, ধর্মের প্রভাব তখনও ছিল অত্যন্ত প্রবল। এই পাণ্ডিত্যবাদের অন্যতম মূলসূত্র ছিল এরিস্টটলের যুক্তিবাদী দর্শন। পরিপূর্ণ পর্যায়ে এ আন্দোলন গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এবং আধুনিক যুগেও তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃত। সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে 'গিল্ড' হিসেবে বা পরিচালক ও পণ্ডিতদের সমিতি হিসেবে। প্রথমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল পেশাভিত্তিক। এক বা একাধিক ক্ষেত্রে তা ছিল জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র স্বরূপ। সালেরনো (Salerno) বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলে ধরা হয়। সেটিও ছিল চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের বিদ্যাপীঠ। বোলোগ্না ও পাদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র আইন শাস্ত্রের চর্চা হতো। এসব পেশাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যবসায় সমিতির মধ্যে বিশেষ কোন ব্যবধান ছিল না। শিক্ষার্থীদের পেশা সম্পর্কে জ্ঞানদানই ছিল এদের লক্ষ্য। উভয়ের মধ্যে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। গিল্ড বা সমিতিগুলোতে শিক্ষণীয় বিষয়কে সদস্য ছাড়া অন্য সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হতো, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন ছিল সকলের জন্য মুক্ত এবং এখানকার অধিতব্য বিষয় ছিল সর্বজনীন শিক্ষা। চার্চেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল এবং প্রাচীনকাল থেকে গীর্জা অঙ্গনে বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু এ শিক্ষা প্রধানত ছিল ধর্ম সংক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয় তখনই যখন বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষার একত্র সমাবেশ ঘটে। তের শতকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে বিকশিত হয় এবং তার অনুকরণে গড়ে ওঠে বহু বিশ্ববিদ্যালয়।

এমন পরিবেশে পাণ্ডিত্যবাদ গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অনুশীলন ছাড়াও অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের অনুশীলন হতো। ফলে ব্যবহারিক বিদ্যার সাথে ঐশীবাণীর সমন্বয় ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের পর পাণ্ডিত্যবাদ যে বিকাশ লাভ করে তা নয় বরং উভয়ে ধীর পদক্ষেপে অগ্রগতি লাভ করে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে। সেকাল ছিল সৃষ্টিধর্মী এক প্রাণবন্ত কাল। সার্তারস, প্যারিস, সলস্‌বারী প্রভৃতি গীর্জায় যে সুনিপুণ ও কুশলী স্থাপত্য শিল্প বিকাশ লাভ করে, তা এরই পরিচায়ক। বিভিন্ন স্থানে বিদ্যাপীঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং প্যারিস, অক্সফোর্ড, বোলোগ্না, কোলোন, সালের্নো, নেপল্‌স প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন নতুন সংস্কৃতির আস্বাদনে হাজারো ছাত্রের ভিড়ে মুখরিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুসংহত হতে লাগল। ভাসা ভাসা কথামালা তত্ত্বে রূপ পেল, চিন্তাক্ষেত্রে নতুন সমন্বয়ের প্রচেষ্টা হলো এবং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহত্তর এক সভ্যতা ও জীবনের প্রতি উদার এক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হলো। পাণ্ডিত্যবাদের লক্ষ্য ছিল দুটি ঃ (ক) চার্চের নীতি যে অভ্রান্ত ও সন্দেহের উর্ধ্ব, তা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া, এবং (খ) ধর্মতত্ত্বকে যুক্তিবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা এবং সাথে সাথে প্রমাণ করা যে ধর্মতত্ত্ব অযৌক্তিক কিছু নয়।

সুতরাং দর্শন হিসেবে বিচার করলে দেখা যায়, পাণ্ডিত্যবাদ বিস্তৃত হয়েছে নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং তা যুক্তিবাদ, চরমবাদ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান আনয়নে উদ্যত। এটি কোন খাপছাড়া আন্দোলন নয়, বরং যুগের গতির সাথে তা সংশ্লিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবত এটি ছিল মধ্যযুগীয় সাধারণ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ। এ যেন সভ্যতার এক অধ্যায়ের পরিপূর্ণ বিকাশ। মধ্যযুগীয় জীবন সংস্কৃতি অনুধাবনের প্রধান চাবিকাঠি তের শতকের পাণ্ডিত্যবাদ। ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্তিবাদের, হেলেনীয় ঐতিহ্যের সাথে চার্চ মতবাদের-তথা সামগ্রিকভাবে সর্বপ্রকার জ্ঞানের সমন্বয় সাধনই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। পাণ্ডিত্যবাদে জ্ঞানরাজ্যকে ত্রিতল বিশিষ্ট এক সৌধ হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যার একতলায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ, দোতলায় দর্শন, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বজনীন এক ঐক্যসূত্র স্থাপন করে এবং তিন তলায় ধর্মতত্ত্ব বা ঐশ্বরিক যুক্তিবাদ। তা জ্ঞানরাজ্যের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। জ্ঞানরাজ্যে নীতি শাস্ত্র, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি সবকিছু এক ছন্দে মিলিত এবং ধর্মতত্ত্বের অনুগত ভৃত্য হিসেবে সংন্যস্ত। পাণ্ডিত্যবাদের মূল সুর তাই।

মধ্যযুগীয় এরিস্টটল
Mediaeval Aristotle

সেন্ট টমাস একুয়ানাসকে মধ্যযুগের এরিস্টটল বলা হয়। তিনি এতদিন পরে এরিস্টটলের যুক্তিবাদী দর্শনকে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের সৌরভময় পরিচ্ছদে আবৃত করে তাঁর মতবাদ সংন্যস্ত করেন। মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ। **প্রথমত,** খ্রিস্টীয় মতবাদ যে অভ্রান্ত এবং সর্বপ্রকার সন্দেহের অতীত তা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করা। **দ্বিতীয়ত,** ধর্মতত্ত্বকে যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা তথা প্রমাণ করা যে ধর্মতত্ত্ব অযৌক্তিক কোন তত্ত্ব নয়। জ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখার সমন্বয়ে এক বিরাট মহীরূহের জন্মদান ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা হিসেবে তাই সেন্ট টমাস একুয়ানাস চেয়েছিলেন এরিস্টটলের দর্শন রসে জারিত করে তাঁর মতবাদ গড়ে তুলতে, ধর্মতত্ত্বের সুরে এরিস্টটলীয় মতবাদকে ছন্দময় করতে এবং হেলেনীয় ঐতিহ্যের সাথে চার্চ তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করতে। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ছিলেন একুয়ানাস এবং তাই তাঁর মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যযুগের তিনটি মহান চিন্তাসূত্র-বিশ্বজনীনতা, পাণ্ডিত্যবাদ আর এরিস্টটলীয় দর্শন। তিনি খ্রিস্টীয় ভাবধারায় সুসজ্জিত করে এরিস্টটলকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। সেন্ট টমাস একুয়ানাস এরিস্টটলের মৌল দর্শনে প্রভাবিত হয়ে তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেন, মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাণী। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা। রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংস্থা এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার মহত্তম জীবনের উপলব্ধি লাভ করে। সেন্ট টমাস একুয়ানাস তাঁর আইনের আলোচনা এরিস্টটলের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বের ভিত্তিমূলে তাঁর আইন সম্পর্কিত মতবাদ গড়ে তুলেন এবং আইন, বিবেক-বিচার, যুক্তিবাদ যে সমার্থক, তাও স্বীকার করেন। তাঁর কথার অনুসরণ করে টমাস বলেন, গুণভিত্তিক রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র সর্বোত্তম সরকার। এরিস্টটল যেভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেন টমাস তাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন- এবং এরিস্টটলের মতো তিনিও মিশ্রিত সরকারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। জ্ঞানরাজ্যে যে মহান ঐক্য বিদ্যমান এরিস্টটলের ন্যায় টমাসও তা অনুধাবন করেন এবং পিরামিডের সাথে তাকে তুলনা করেন। এ পিরামিডের পাদভূমিতে রয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ। তার উপর রয়েছে দর্শন, কেননা তা বিভিন্ন জ্ঞানশাখার মধ্যে ছন্দবদ্ধ এক ঐক্যতান সৃষ্টি করে। সুতরাং এ দিক দিয়ে টমাসকে এরিস্টটলের খ্রিস্টীয় সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু একুয়নাস তাঁর ব্যাপকতর মননশীলতায় যে সৃষ্টির বেদনা অনুভব করেন, তাতে এরিস্টটলের যুক্তিবাদী দর্শনের উর্ধ্বে তাঁর সৃষ্টিসৌধ সমুন্নত হয়ে ওঠে। এরিস্টটল দর্শনকে গ্রহণ করেন চূড়ান্ত জ্ঞান হিসেবে এবং তাঁর কাছে সাধারণ যুক্তি ছিল দর্শনের অমোঘ অস্ত্র। কিন্তু একুয়নাস দর্শনের উর্ধ্বে তুলে ধরেন ধর্মতত্ত্বকে এবং ধর্মতত্ত্বের অমোঘ অস্ত্র হয় ধর্মবিশ্বাস ও ঐশীবাণী। জ্ঞানের যে পিরামিড তিনি রচনা করেন, তার শীর্ষে স্থাপন করেন ধর্মতত্ত্বকে। এরিস্টটলের নিকট যুক্তিবাদ ছিল জ্ঞান ও সত্য সন্ধানের চরম পথ এবং প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে যে জ্ঞান ও সত্য, তার জন্য যুক্তিবাদই যথেষ্ট। কিন্তু একুয়নাস মনে করতেন, দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতের উর্ধ্বে রয়েছে আর এক বৃহত্তর জগৎ যা অনুধাবন করার চাবিকাঠি ধর্মবিশ্বাস। মানুষের অন্তরে তা ঐশীবাণীর মাধ্যমে প্রতিভাত হয় এবং ধর্মতত্ত্ব তার সার্থক রূপায়ণ ঘটায়। সুতরাং দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে বা যুক্তিবাদ ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শন যার সূচনা করে, ধর্মতত্ত্ব তাকে সার্থকতার স্বর্ণদ্বারে পৌছে দেয়। কখনও এর ধারাবাহিকতা বিনষ্ট করে না। ধর্মবিশ্বাস যুক্তিবাদের পূর্ণতা নিয়ে আসে। একত্রে তারা এক ধর্মমন্দির গড়ে তুলে, কিন্তু কোথাও তাদের মধ্যে এতটুকু দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় না।

সেণ্ট টমাস একুয়নাস এরিস্টটলের 'চূড়ান্ত কার্যকারণ' বা চূড়ান্ত লক্ষ্যের তত্ত্বক গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সাথে একমত হয়ে বলেন, প্রকৃতির অংশবিশেষ হিসেবে মানুষেরও আছে চরম লক্ষ্য এবং তা হলো জীবনের চরম সার্থকতা অর্জন করা। এরিস্টটলের মতে, এর সার্থকতা হলো যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণা, কেননা যুক্তিবাদ মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানসিক গুণ। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের আলোকে টমাস আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন, যুক্তি মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম অংশ আত্মা। সুতরাং মানব জীবনে চরম লক্ষ্য হলো মোক্ষ বা আত্মার মুক্তি। ঈশ্বর মানুষকে আপন প্রতিচ্ছায়ায় সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের মৌল প্রকৃতি তার আত্মায়, যুক্তিতে নয়। তাই যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতি অনুধাবন না করে আত্মার সাহায্যে ঈশ্বরের প্রকৃতি অনুধাবন করাই শ্রেয়। সূর্যের উজ্জ্বল আলো যেমন নিশাচর বাদুড়ের চোখ ঝলসে দেয়, তেমনি পরম পুরুষ সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানালোকের ঔজ্জ্বল্য মানব মনকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সুতরাং যুক্তিবাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুধাবন বা আত্মার মুক্তি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন যুক্তিবাদের উর্ধ্বে কিছু এবং তা ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরের পরম করুণা (Grace)। এরিস্টটল যুক্তিবাদী মনের বাইরে কোন আত্মার কল্পনা করেন নি। তাই তাঁর দর্শনে মোক্ষ, বিশ্বাস বা পরম করুণার কোন সূত্র নেই। কিন্তু ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান হিসেবে একুয়নাস তাঁর জ্ঞানসৌধের শীর্ষে, দর্শনের উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন ধর্মতত্ত্বকে। তাঁর মতে, ঈশ্বরকে অনুধাবন করার পরম পাঠ হলো ধর্মবিশ্বাস।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কেও একুয়নাস এরিস্টটলকে পাথেয় করে অগ্রসর হন এবং শেষ পর্যায়ে খ্রিস্টীয় তত্ত্বের বাণী দ্বারা তা সম্পূর্ণ করেন। এরিস্টটলের সুরে তিনি গেয়েছেন, মানব সমাজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের এক সংস্থা। এখানে অধম উত্তমের সেবায় নিয়োজিত এবং উত্তম অধমের পরিচালনা ও পথ প্রদর্শনে রত। তিনি অগাস্টিনের ধারণা-"রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে মানুষের অধঃপতন ও পাপ"-এ মত পরিত্যাগ করেন। এরিস্টটলের মত তিনিও বলেন, রাষ্ট্র এক স্বাভাবিক সংস্থা এবং এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি। আদর্শ ও উন্নত জীবনের জন্য পারস্পরিক সেবার ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত। তিনি এরিস্টটলের সাথে সুর মিলিয়ে আরও বলেন, রাষ্ট্র হলো সামাজিক কল্যাণ সাধনের এক সার্থক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের সৎ জীবন অর্জনই এর লক্ষ্য। সেণ্ট অগাস্টিন ও অন্যান্য যাজকের মতামত উপেক্ষা করে একুয়নাস এই মতবাদ প্রচার করেন এবং তা বিভিন্ন দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি রাষ্ট্রকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার গুহা থেকে টেনে আনলেন আলোকের রাজ্যে। মানবীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র যে বিরাট সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান, তা তিনি মধ্যযুগে সর্বপ্রথম তুলে ধরলেন। এটি তাঁর বলিষ্ঠ আশাবাদেরও পরিচায়ক। কিন্তু এরিস্টটলের মতবাদের উর্ধ্বে তিনি তাঁর আদর্শের কথাও তুলে ধরে বললেন, সৎ জীবনকে ব্যাখ্যা করতে হবে খ্রিস্টধর্মের আলোকে। রাষ্ট্র ব্যক্তির পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজ করে যাবে, কিন্তু সাথে সাথে আত্মার মুক্তির জন্য উন্নততর

আদর্শের অনুগত থাকতে হবে। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনভাবে সংহত করতে হবে যাতে পার্থিব সুখের উর্ধ্বে যে অপার্থিব আনন্দলোক রয়েছে তা যেন অর্থহীন হয়ে না পড়ে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম যেন সেই মহতী লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, তাই রাষ্ট্র ও সমাজকে মহত্তর সামাজিক সংগঠন বা চার্চের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। সার্থক যে কোন মানবিক সংস্থার থাকতে হবে জাগতিক ও ধর্মীয় সংগঠন এবং জাগতিক সংগঠনটি হবে ধর্মীয় সংগঠনের অনুগত।

এরিস্টটলের সামনে ছিল শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের আদর্শ। তাই তিনি দিয়েছেন সর্বজনীন এক পার্থিব রাষ্ট্রতত্ত্ব। কিন্তু একুয়নাস এরিস্টটলের তত্ত্বের সংশোধনী হিসেবে জুড়ে দিয়েছেন সামাজিক সংগঠনের শীর্ষে চার্চকে। তাঁর মতে চার্চ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তা রাষ্ট্রের সার্থক সম্পূরক। সুতরাং একুয়নাস এরিস্টটলের তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন নি বা তার কোন বিকৃতিও ঘটান নি। রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাকে সঠিক বলে মেনে নিয়ে তিনি নিজের ব্যাপকতর তত্ত্বের মধ্যে তার স্থান করে দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চিন্তারাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে একুয়নাস গ্রীক চিন্তাধারার ভিত্তিভূমিতে খ্রিস্টীয় মতবাদের প্রস্তর স্থাপন করে মহান সৌধ নির্মাণ করেছেন। নগর রাষ্ট্রকে এরিস্টটল বলেছেন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিখুঁত সংগঠন, কিন্তু একুয়নাস নগর রাষ্ট্রকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন নি। তিনি মনে করতেন, কতকগুলো নগর রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটা বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠনই শ্রেয়। তা হলে রাষ্ট্র সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে অধিকতর সফল হবে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণও প্রতিরোধ করতে পারবে। এই বিষয়ে একুয়নাস রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শ ও মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের আদর্শে প্রভাবিত হন।

প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে এরিস্টটল যে মতবাদ দিয়েছেন তাও একুয়নাস গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি সম্পর্কে এরিস্টটলের বক্তব্য সঠিক। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতই যে সমগ্র জগৎ নয়, এর উর্ধ্বে যে বিশ্ব-পিতার পরম করুণার এক স্বর্গীয় রাজ্য আছে, এরিস্টটল তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। নীতিশাস্ত্রে এরিস্টটলের যে বক্তব্য তাও একুয়নাস গ্রহণ করেছেন বিনা দ্বিধায় এবং বলেছেন, মানুষ স্বাভাবিকভাবে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, সুখের ঘরের চাবিকাঠি পেতে পারে, কিন্তু এরিস্টটলের ব্যর্থতা এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি জীবনের প্রাকৃতিক দিক শুধু দেখেছেন, অতিপ্রাকৃত দিকের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ একুয়নাসের মতে, মানুষের পরম সুখ আত্মার মুক্তি এবং ভবিষ্যতে শুভাশিষপূত জীবন। তাই নীতিশাস্ত্রেও একুয়নাস এরিস্টটলের তত্ত্বের উর্ধ্বে সংযোজন করেন অতিপ্রাকৃত জীবনের পরম আনন্দকে।

আইন প্রসঙ্গে সেন্ট টমাস একুয়নাস
St. Thomas Aquinas on Law

একুয়নাসের মতে, রাষ্ট্র একটি অর্থপূর্ণ সংস্থা। নাগরিকদের নৈতিক জীবনকে উন্নততর করা তথা জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করাই এর কাজ। এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ করতে হবে আইন অনুসারে। শাসক আইনের নৈতিক গণ্ডি লঙ্ঘন করলে তিনি আর শাসক থাকেন না। তিনি হয়ে ওঠেন স্বৈরাচারী।

সেন্ট টমাস একুয়নাস বিশ্বাস করতেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বহু স্তরবিশিষ্ট এক সংগঠন যার শীর্ষে রয়েছে বিশ্ব-পিতা। এই সংগঠনে প্রত্যেকের একটা ভূমিকা রয়েছে তা যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন। সামগ্রিক সার্থকতা বা পূর্ণতার জন্য সে ভূমিকা মূল্যবান। এই সংগঠনে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়, বরং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে ব্যবস্থাপনায় স্বর্গ-মর্ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, মানবিক আইন তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা উৎসারিত হয়েছে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা থেকে এবং তাই বিশ্বের সব সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করছে, তা প্রাণীই হোক আর বস্তুই হোক-মানব হোক আর জন্তু হোক। সংকীর্ণ অর্থে, মানবিক আইন এরই একটা বিশিষ্ট দিক, গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু একটা দিক মাত্র। সেন্ট টমাস একুয়নাস এ সত্য

অনুধাবন করেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁর আইনতত্ত্ব সংগঠন করেন। তাই তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আইনের শ্রেণীবিন্যাস। একজন অবৈধ শাসক মানবীয় অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের আইনই শুধু ভঙ্গ করে না, বরং তার কাজ হয়ে ওঠে সমগ্র স্বর্গীয় ব্যবস্থাপনার বিরোধী।

টমাসের চতুর্বিধ আইনের একটি হলো মানবিক আইন, কিন্তু তা সেই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞারই অংশ মাত্র। যে ব্যবস্থায় বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত তার ভিত্তিমূলে রয়েছে স্বর্গীয় যুক্তিবাদ। টমাস মনে করতেন, সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো সে সামগ্রিক সত্তারই অংশবিশেষ। সুতরাং কোথাও স্বেচ্ছাচারের কোন স্থান নেই, সর্বত্র রয়েছে নিয়মের রাজত্ব। সর্বক্ষেত্রে আইন হলো বিশ্বনিয়ন্তার প্রজ্ঞার প্রতিফলন। তাই তাঁর আইনে ইচ্ছার কোন প্রকাশ ঘটে নি। প্রকৃতির নিয়ম হোক আর সমাজের নিয়ম হোক কোথাও কারো নির্দেশের ইঙ্গিত নেই। যে কোন পর্যায়ে হোক না কেন, আইনে মূলত যুক্তির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি আইনের চতুর্বিধ শ্রেণী বিভাগ করেছেন, যেমন- **শাশ্বত, প্রাকৃতিক, স্বর্গীয় ও মানবিক আইন**। এ চতুর্বিধ আইন যুক্তির চারটি প্রকাশ মাত্র, বিশ্ব-প্রকৃতির চার পর্যায়ে একই যুক্তিবাদ চাররূপে প্রতিভাত যেন।

সেণ্ট টমাস একুনাস প্রথমটিকে **শাশ্বত আইন** বা **চিরন্তন আইন** (Eternal Law) বলে অভিহিত করেছেন। **শাশ্বত আইন আর ঈশ্বরের প্রজ্ঞা একই। সমগ্র সৃষ্টি রহস্যের মূলে যে স্বর্গীয় যুক্তি কাজ করছে তা সেই চিরন্তন পরিকল্পনা। সামগ্রিকভাবে এই স্বর্গীয় পরিকল্পনা মানব প্রকৃতির বহু উর্ধ্বে ও মানব বোধের অগম্য। কিন্তু মানব এর কিছুটা অনুধাবন করতেও সক্ষম। সীমিত মানব জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যেটুকু সম্ভব, মানব সে পর্যন্ত ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও মহত্ত্বে অংশগ্রহণ করে। মানব মনে এর প্রতিফলন ঘটে, যদিও স্বর্গীয় পরিপূর্ণতার বিন্দুমাত্র মানুষ অনুধাবনে সক্ষম।**

দ্বিতীয়টি **প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) ঃ সৃষ্ট বস্তুতে স্বর্গীয় যুক্তির প্রতিফলনই** প্রাকৃতিক আইন। **এই বিশ্বে চিরন্তন আইনের যেটুকু প্রতিফলন ঘটেছে তাই মূলত** প্রাকৃতিক আইন। **এই আইন মানুষের অন্তরে যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে প্রত্যেকটি সৃষ্ট** প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে। এর প্রতিফলন ঘটেছে প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব ও বস্তুর প্রবৃত্তি-প্রবণতায়, যার ফলে তারা আপন আপন মঙ্গল কামনা করে, অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেতে চায়, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রয়াসী হয় এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যতটুকু সার্থক জীবন সম্ভব, তা পেতে চায়। প্রাকৃতিক আইনের প্রভাবেই মানুষ সমাজে বাস করতে চায়, আপন জীবন রক্ষায় প্রয়াসী হয়, সন্তান উৎপাদন এবং তাদের শিক্ষাদানে উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং জ্ঞান সন্ধানী হয়। মানুষের যে সব সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে প্রাকৃতিক আইনের প্রভাবে তারা সর্বস্তরে সুযোগ পেতে উদগ্রীব। এরিস্টটল এই প্রবৃত্তিকেই বলেছেন মানবের 'যুক্তিবাদী সহজাত প্রবণতা'। সেণ্ট টমাস একুনাসের মতে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণী চিরন্তন আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু মানুষ বিবেকবান প্রাণী হিসেবে বিশেষভাবে এই স্বর্গীয় পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে। যেখানে অন্যান্য বস্তু বা প্রাণীর প্রবণতায় তার প্রকাশ সেখানে মানুষ এর প্রভাবে নিজের ও অন্যান্যের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক আইন মানুষের কার্যকর ও নৈর্ব্যক্তিক 'বিচার বুদ্ধি', চিরন্তন আইনে মানুষের অংশগ্রহণ।

তিনি তৃতীয় আইনের নাম দিয়েছেন **'স্বর্গীয় আইন' (Divine Law)**। স্বর্গীয় আইন বলতে তিনি কার্যত শ্রুতি বা ঐশীবাণীকে বুঝিয়েছেন। স্বর্গীয় আইনের নিদর্শন স্বরূপ তিনি ইহুদীদের প্রতি ঈশ্বর যে বিশেষ আইনে আশীর্বাদ পাঠান বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে খ্রিস্টান জগতে নৈতিকতা ও আইনের বিশেষ বিশেষ বিধি অবতীর্ণ করেন বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের নিকট যে বাণী প্রেরণ করেন, তারই উল্লেখ করেছেন। টমাসের মতে স্বর্গীয় আইন ঈশ্বরের পরম করুণার আশীর্বাদ। প্রাকৃতিক যুক্তির অভিব্যক্তিতে নয় বরং ঐশীবাণীর মাধ্যমে যে নির্দেশ মানুষ লাভ করেছে, তাই স্বর্গীয়

আইন। তিনি খ্রিস্টধর্মের ঐশ্বরিক বিধানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, কিন্তু ঐশীবাণী ও যুক্তিবাদের মধ্যে যেন কোন ব্যবধান রচিত না হয় সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে, ঐশীবাণী যুক্তির ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে, কোনক্রমে তাকে সঙ্কুচিত করে না। তিনি ধর্ম বিশ্বাস ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে তাঁর চিন্তার সমুন্নত সৌধ গড়ে তোলেন। যুক্তিবাদ ও বিশ্বাস তাঁর নিকট ছিল এক এবং অভিন্ন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ বেশ আকর্ষণীয়। স্বর্গীয় আইন এক এক সম্প্রদায়ে এক এক রকম হতে পারে এবং বিভিন্ন সময়েও তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন সবার নিকট সমান, কেননা তা নিছক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট। এই আইন খ্রিস্টান, ইহুদী ও মুসলমানদের উপর একই প্রকার দায়িত্ব অর্পণ করে, কিন্তু তাই বলে স্বর্গীয় আইন ও প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে কোন বিরোধের অস্তিত্ব নেই, কেননা যা যুক্তি বিরোধী, ঈশ্বর তেমন নির্দেশ দেন নি। স্বর্গীয় আইন গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, সত্য ও ন্যায়নীতি অনুধাবনে মানুষের বিবেক-বিচার সব সময় নির্ভুলভাবে কাজ করে না। তাই ঈশ্বর তাঁর অপার করুণায় মানুষের নিকট বাণী প্রেরণ করেন।

চতুর্থ ও সর্বনিম্ন স্তরের আইনকে তিনি **মানবিক আইন (Human Law)** বলে বর্ণনা করেছেন। সেন্ট টমাস একুয়নাস মানবিক আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, এ আইন সাধারণ কল্যাণের জন্য যুক্তির নির্দেশ। সম্প্রদায়ের ভার যাঁর উপর ন্যস্ত, তিনি ঘোষণার মাধ্যমে এ নির্দেশ কার্যকর করেন। দুটি কারণে মানবিক আইন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। **প্রথম,** স্বর্গীয় যুক্তিবাদ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, এবং **দ্বিতীয়,** নির্দিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক আইনের সাধারণ সূত্র প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক।

তবে মানবিক আইনেও কোনও প্রকার স্বেচ্ছাচারের সুযোগ নেই, কেননা কয়েকটি অগ্নি পরীক্ষাতে মানবিক আইনকে উত্তীর্ণ হতে হবে। **প্রথম,** যুক্তিভিত্তিক না হয়ে কোন নির্দেশ আইন পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। **দ্বিতীয়,** যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, আইনের বিধি এবং যুক্তিবাদের মধ্যে একটা সাধারণ সূত্র থাকতে হবে। **তৃতীয়,** মানবিক আইন বৈধ ও সঠিক উৎস হতে উদ্ভূত হবে। এর উৎস হবে হয় সমগ্র জনসাধারণ, না হয় কোন ব্যক্তি যার উপর শাসন কাজ ন্যস্ত হয়েছে। রাজতন্ত্রকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার বলে চিহ্নিত করেছেন এবং স্বৈরাচারী সরকারকে তিনি অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। **চতুর্থ,** মানবিক আইনের ঘোষণা একান্ত প্রয়োজন। যুক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক আইন সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব, কিন্তু মানবিক আইনের কোন চূড়ান্ত নির্ভুলতা নেই। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাদের প্রয়োগ হয় এবং এ জন্য তাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা একান্ত অপরিহার্য। সেন্ট টমাস একুয়নাস আইনের সুস্পষ্ট ঘোষণার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আইন ব্যবস্থায় তা তাঁর বিশিষ্ট এক অবদান, কেননা এর ফলে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। **পঞ্চম,** মানবিক আইনের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র মানবিক এবং জাগতিক। কোন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় বিষয়ে মানবিক আইন প্রণীত হতে পারে না।

সেন্ট টমাস একুয়নাস মানবিক আইনের ক্ষেত্রে অতি সন্তর্পণে আনুগত্যের সূত্র সংযোজন করেছেন এবং এই আনুগত্য একদিকে যেমন রাজনৈতিক, অন্যদিকে তেমনি নৈতিক। তিনি বলেন, মানুষের আনুগত্য লাভের যোগ্য হতে হলে আইনকে হতে হবে ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁর মতে, ন্যায়নিষ্ঠতার শর্ত হলো প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংগতি রক্ষা। যে আইন প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় তা নাগরিকগণ ভঙ্গ করতে পারে এবং তার জন্য তাদের কোন খেসারত দিতে হবে না। তাছাড়া, আইনের লক্ষ্য সাধারণ কল্যাণ এবং এর পেছনে থাকে সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন। বিবেকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

সেন্ট টমাস একুয়নাসের পর্যায়ক্রমিক আইন তত্ত্বের ব্যাখ্যা অধ্যাপক ডার্নিং অত্যন্ত সহজভাবে দিয়েছেন ঃ "শাশ্বত আইন হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা এবং পূর্ণরূপে তা রয়েছে বিশ্ব-পিতার অন্তরে। বিবেকবান প্রাণী হিসেবে মানুষ চিরন্তন আইনে অংশগ্রহণ করে এবং ভালমন্দের পার্থক্য

অনুধাবন করে সঠিক লক্ষ্যের সন্ধানে পথ রচনা করে। শাশ্বত আইনে অংশগ্রহণ হলো প্রাকৃতিক আইন। নির্দিষ্ট পার্থিব বিষয়ে মানবিক যুক্তি বিচারে প্রভাবিত হয়ে প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের প্রয়োগই মানবিক আইন। স্বর্গীয় আইনের মাধ্যমে মানবিক যুক্তি বিচারের সংকীর্ণতা দূর হয় এবং সীমিত দৃষ্টিকোণ প্রসারিত হয়। এবং মানুষ সব ত্রুটি, সব সংকীর্ণতা, সব অসম্পূর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তার অপার্থিব লক্ষ্যে সার্থকতা অর্জন করে এবং চিরন্তন প্রশান্তির আশীর্বাদ লাভ করে। তাই ঐশীবাণীর বিধি।"

রাষ্ট্র প্রসংগে একুয়নাস

Aquinas in Regard to State

সেণ্ট অগাস্টিনের মতে রাষ্ট্র হলো মানুষের আদি পাপের ফলশ্রুতি। রাষ্ট্রীয় জীবনের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হলে মানুষ আবার স্বর্গরাজ্যের যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেণ্ট টমাস একুয়নাস অগাস্টিনের এ মতবাদ পরিহার করেন এবং এরিস্টটলের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, রাষ্ট্র একটি প্রাকৃতিক সংস্থা। তাঁর মতে, রাষ্ট্র কল্যাণ সাধনের এক বিশিষ্ট সংস্থা, 'প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান নয়'। কল্যাণকর সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এর শিক্ষামূলক কার্যক্রম রয়েছে। এরিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনি বলেন, সুন্দর ও সৎ জীবনের জন্য সুষ্ঠু এক অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রয়োজন এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এক উজ্জ্বল ভূমিকা আছে। রাষ্ট্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। ন্যায়ানুগ মজুরির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দ্রব্যমূল্য সঠিক পর্যায়ে রাখবে এবং মুনাফা সীমিত করবে। রাষ্ট্র দরিদ্র ও দুস্থদের সহায়তা করবে। তাঁর মতে, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করবে। তাছাড়া, আত্মার মুক্তির জন্য চার্চ যাতে তার যথার্থ কাজ করে যেতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবে এবং নাগরিকদের জীবনে এক শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করবে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে টমাস রাষ্ট্রকে ব্যাপক স্বর্গীয় ব্যবস্থার অংশবিশেষ হিসেবে দেখেছেন। এরিস্টটল ও সেণ্ট টমাস একুয়নাসের মতবাদের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য তার মূল এখানে।

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও তিনি এরিস্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যে রাষ্ট্র শাসিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে সে রাষ্ট্র কল্যাণকর ও বৈধ। যে রাষ্ট্রে শাসকদের স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করে সে রাষ্ট্র অকল্যাণকর এবং অবৈধ। এরিস্টটল অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার বলে বর্ণনা করেন, কিন্তু টমাস খুব জোরেসোরে রাজতন্ত্রের পক্ষে রায় দেন। এরিস্টটল মনে করতেন, শাসন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক গুণপনা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। তাই তিনি রাজতন্ত্রকে সেরা শাসন ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এ ধরনের সরকারের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব সন্দেহাতীত ছিল না, কেননা তাঁর আশঙ্কা ছিল, তেমন যোগ্যতম শাসক মিলে কি না।

কিন্তু সেণ্ট টমাস একুয়নাস তাঁর ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবেই রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠতম সরকার বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, "সমগ্র বিশ্বে রয়েছে এক সৃষ্টিকর্তা, সর্বনিয়ন্তা, এক ঈশ্বর। দেহের হাজারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে এক অন্তকরণ। মৌমাছিদেরও রয়েছে এক রাজা এবং প্রত্যেকটি স্বাভাবিক সরকার একজনের সরকার।" অসংখ্য জিনিসের মধ্যে মৌল জিনিস হল আদর্শ লক্ষ্য। রাজনৈতিক সমাজেও প্রধানতম বিষয় হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও আদর্শ। টমাস শান্তি ও ঐক্যকে এক করে দেখেছেন। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একজন শাসক শান্তি প্রতিষ্ঠার যোগ্যতম প্রতিভূ। যে সরকার একাধিক ব্যক্তি সহযোগে গঠিত হয়, সে সরকার অনৈক্যের দ্বারা সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করে তুলতে পারে।

তবে রাজতন্ত্র যেন স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত না হয়, তারও ব্যবস্থা তিনি দিয়ে গিয়েছেন। **প্রথম**, তিনি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের চেয়ে নির্বাচিত রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। **দ্বিতীয়**, তিনি রাজতন্ত্রকে

সীমিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। রাজতন্ত্র সীমিত না হলে তা উৎপীড়নমূলক হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য কিভাবে রাজতন্ত্র সীমিত করা যাবে, তার কোন স্পষ্ট বিধান তিনি দেন নি, যদিও তাঁর গ্রন্থের একস্থানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, সরকার পরিচালনায় প্রত্যেকের কিছু কিছু অংশ থাকা দরকার। অন্যত্র তিনি অভিজাত ও জনগণের মিলিত শাসন ব্যবস্থা বা মিশ্র সংবিধানের কথাও সহানুভূতির সাথে ভেবে দেখেছেন।

অত্যাচারী শাসক
Tyrannical Ruler

অত্যাচারী শাসককে সলসবারীর জন যেমন তীব্রভাবে ঘৃণা করেছেন, সেন্ট টমাস একুয়নাসও তেমনভাবে ঘৃণা করেছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে নৈতিক মানের ঔজ্জ্বল্যে। তাই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হবে সীমিত এবং তা আইনের সীমারেখায় হবে আবর্তিত। যে সরকার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় না তা অবৈধ ও পীড়নমূলক। অবশ্য সরকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আর তেমন কিছু তিনি বলেন নি। তিনি রোমান আইনের সাথে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু আইনের উপরও সার্বভৌমের ক্ষমতা বিস্তৃত হতে পারে, সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। পোপ এবং রাজকীয় কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তৎকালীন সাহিত্যে যা লেখা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তথাপি তিনি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঠিক ভিত্তি সম্পর্কে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন নি।

তিনি মনে করতেন, অত্যাচারী শাসককে প্রতিরোধ করা উচিত, যদিও তিনি সলসবারীর জনের মতো অত্যাচারী শাসককে নিধনের ব্যবস্থা দেন নি। বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর পাপ, কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক প্রতিরোধ সমর্থনযোগ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজতন্ত্র সীমিত হোক আর শাসনতান্ত্রিক হোক, উৎপীড়নের পর্যায়ে তা যেন উপনীত হতে না পারে। তিনি অবশ্য ছোটখাট উৎপীড়ন এবং বৃহৎ উৎপীড়নের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ছোটখাট উৎপীড়নের ক্ষেত্রে তিনি জনগণকে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দেন, কেননা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হটকারিতামূলক কোন কাজ অচিন্তনীয়। তা অনেক দুর্দৈব ডেকে আনতে পারে যা মূল অন্যায়কে ছাপিয়ে যেতে পারে। যে অন্যায়ের প্রতিকারে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলে তার ফলে সে অন্যায়ের চেয়েও বড় অন্যায় সংঘটিত হতে পারে। ছোটখাট উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্য কোন বিদ্রোহ সংঘটিত হলে এবং তা সফল হয়ে উঠলে বিপ্লবী নেতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবিপ্লবকে দমনে প্রয়াসী হয় এবং ফলে সংঘটিত হতে পারে সবচেয়ে বড় অন্যায়। তার ফলে বহু লোককে দাসত্ব বরণ করতে হতে পারে। তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি বিপ্লবের অন্তর্নিহিত স্বয়ংক্রিয়তা সম্পর্কে সঠিক অনুধাবন করেন। একবার শুরু হলে তার শেষ হয় না। বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লব, তারপর বিপ্লব, ঘটনা প্রবাহ এমনভাবে এগিয়ে চলে। পরবর্তীকালে এডমান্ড বার্ক টমাসের এই সত্যকে ভিত্তি করে ফরাসী বিপ্লবের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

কিন্তু উৎপীড়ন ও অত্যাচার যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তার প্রতিরোধ সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না এবং অত্যাচারী শাসককে হত্যা করাও ঠিক নয়। জনগণ এই মনোভাব গ্রহণ করলে তা শাসক ও জনগণ উভয়েরই অনিষ্ট ডেকে আনবে, কেননা দেখা গিয়েছে, মন্দ লোকেরা সৎলোকের শাসনকেও পীড়নমূলক মনে করে। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সরকারি পর্যায়ে তা গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসংগে তিনি দুটি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা দিয়েছেন ঃ

(এক) যেখানে অত্যাচারী শাসকের ক্ষমতা জনগণ থেকে উদ্ভূত, জনগণ সে ক্ষেত্রে শাসককে পদচ্যুত করবে অথবা তার ক্ষমতাকে সীমিত করে দেবে।

(দুই) শাসক যদি উচ্চতর কোন শাসক কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তবে জনগণের উচিত উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা, কেননা তিনিই একমাত্র উৎপীড়ক শাসককে পদচ্যুত করতে পারেন।

কিন্তু মানবীয় কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তার প্রতিবিধান না হলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে হবে, যেন তিনি অত্যাচারীর অন্তঃকরণ কোমল করে দেন এবং অত্যাচারের পথ থেকে তাকে সরিয়ে নিতে পারেন। জনগণের পাপ বাড়িয়ে লাভ কি? তিনি চেয়েছেন শাসকের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে তার কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সম্ভব হলে শাসন কর্তৃত্বে শাসিতদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে। তাঁর মতে, শাসন ব্যবস্থা এক ধরনের ন্যাসী ক্ষমতা, জনকল্যাণের এক সংস্থা মাত্র। সাধারণ কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রত্যেকের মত তিনি ক্ষুদ্রতম অবদান রেখে যাবেন। মানব জীবনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট থেকে ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং লাভ করেছেন জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য। টমাসের মতে শাসন ব্যবস্থার সর্ব পর্যায়ে রয়েছে নৈতিক শৃংখলা ও নৈতিক সীমারেখা।

রাষ্ট্র ও চার্চ
State and Church

মানব জীবনের দুটি লক্ষ্য স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তা হলে দুটি স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল সংস্থা মানবজীবনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারত। রাষ্ট্র আনে পার্থিব জীবনের সুখ ও প্রশান্তি এবং চার্চ নিয়ে আসে পারলৌকিক প্রশান্তি ও আত্মার মুক্তি। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে দুটি লক্ষ্য অচ্ছেদ্য স্বর্ণসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে। নৈতিক উন্নতির সাথে চিরন্তন মুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সেণ্ট টমাস একুয়নাস এরিস্টটলের পথ অনুসরণ করে বলেছেন, একজন সৎ নাগরিক হতে হলে তাকে একজন সৎ খ্রিস্টান হতে হবে। চার্চ ও রাষ্ট্র উভয়ই সেই সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম।

অন্যান্য খ্রিস্টীয় যাজকদের মতো সেণ্ট টমাস একুয়নাসও চার্চের সর্বাত্মক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের (plenitudo potestatis) কথা ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রের লক্ষ্য চার্চের উদ্দেশ্যকে সার্থকভাবে সফল করা, কেননা পার্থিব প্রশান্তি চিরন্তন প্রশান্তির প্রথম সোপান। সুতরাং চার্চের মহত্তর লক্ষ্যের নিকট রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হীনপ্রভ। মানুষকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করাই চার্চের কাজ। তাই রাষ্ট্র চার্চের অনুগত। টমাস শাসকের কাজকে জাহাজের প্রকৌশলীর কাজের সাথে তুলনা করে বলেছেন, শিল্পী সমুদ্র যাত্রায় জাহাজকে সুঠাম ও সুস্থ রাখবেন। কিন্তু চার্চের কাজ ছিল নাবিকের কাজ। তিনি মহাযাত্রার পথ নির্দেশ করবেন।

এভাবে তিনি চার্চের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোন পরিস্থিতিতে পোপ শাসককে পদচ্যুত করতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর মতবাদের অন্তর্নিহিত সূত্র দেখে মনে হয় না যে, তিনি শাসকের উপর পোপের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এক ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য বলেছেন, চার্চের কর্তৃত্ব ও শাসকের কর্তৃত্ব একই স্বর্গীয় উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে।

কারলাইল (Carlyle) তাঁর *'Mediaeval Political Theory'* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সেণ্ট টমাস একুয়নাসের সুচিন্তিত অভিমত হলো, পার্থিব বিষয়ে পোপ পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করবেন শাসকের উপর। তিনি চার্চের প্রভাবকে আইনগত প্রাধান্যে পরিণত করতে চান নি। আসলে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী এবং চার্চের প্রাধান্য সম্পর্কে যে মত পোষণ করতেন, তা চার্চের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। অবশ্য স্বীকার করতে হবে, একুয়নাস রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎপত্তির ব্যাপারে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি সেণ্ট পল, অগাস্টিন এবং বাইবেলের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দাসত্ব প্রথা
Slavery System

এরিস্টটল ও অগাস্টিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একুয়নাস দাসত্ব প্রথাকে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য ন্যায়সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে সেণ্ট অগাস্টিন যে যুক্তি দিয়েছেন,

এক্যুনাসের যুক্তি তা থেকে স্বতন্ত্র। সেণ্ট অগাস্টিনের মতে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মানুষ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। এরিস্টটলের মতে, মানুষে মানুষে বিচার বুদ্ধি ও গুণপনার অসমতা হলো দাসত্বের মূল। কিন্তু টমাস বলেন, সৈন্যদের সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এর প্রয়োজন। সৈন্যদের জন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করাই অনেক শ্রেয়।

এক্যুনাসের অবদান
Contributions of Aquinas

আধুনিক ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সেণ্ট টমাস এক্যুনাস। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে যে সূত্র কাজ করেছে, এরিস্টটলের যুক্তিবাদী দর্শন তাদের অন্যতম। আর টমাস আধুনিক ইউরোপে তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটিয়ে আধুনিকতার আলোর বন্যা প্রবাহিত করেছেন। এরিস্টটলের রাষ্ট্রীয় দর্শন ও সেণ্ট অগাস্টিনের খ্রিস্টীয় তত্ত্বের মধ্যে যে সমন্বয় সাধন সম্পন্ন হয়েছে, বিশ্ব ইতিহাসে তা বৃহত্তম এক ঘটনা। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউরোপ যে আলোকে উদ্ভাসিত তা সাংবিধানিকতার আলোক। তা শাসনতান্ত্রিক আশীর্বাদ। এরিস্টটলের যুক্তিবাদী দর্শন তথা আইনের প্রশাসনের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা তা রূপ লাভ করল সেণ্ট টমাস এক্যুনাসের মাধ্যমে। 'আইন সার্বভৌম', 'সরকার আইনের ভৃত্য', 'শাসক ও স্বৈরাচারী শাসকের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান', 'শাসক নির্বাচনে জনগণের আদিম অধিকার'–এই সব কথা নতুন নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে চারিদিক উষ্ণ করে তোলে এবং তা সম্ভব হয় টমাসের মতবাদের জন্য। লর্ড অ্যাক্টন বলেছেন, সেণ্ট টমাস এক্যুনাস হলেন প্রথম 'হুইগ'। অধ্যাপক বার্কার তাঁর বক্তব্যকে সংশোধন করে বলেন, প্রথম 'হুইগ' টমাস নন, বরং এরিস্টটল, কেননা তাঁর কাছ থেকেই এই মহান চিন্তানায়ক পাঠ গ্রহণ করেন এবং রিচার্ড হুকারকে (Hooker) দীক্ষা দেন। হুকারের মাধ্যমে তা আসে জন লকের (Locke) নিকট এবং জন লক তাঁর অনবদ্য গ্রন্থে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাস্তব পন্থা নির্দেশ করেন।

১। সেণ্ট টমাস এক্যুনাসের চিন্তাধারার পটভূমি সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the background of thought of St. Thomas Aquinas?)

২। সেণ্ট টমাস এক্যুনাস এবং সেণ্ট অগাস্টিনের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা কর। (Give a comparative view of St. Thomas Aquinas and St. Augustine in respect of their political ideas.)

৩। খ্রিস্টীয় পাণ্ডিত্যবাদ কী? সেণ্ট টমাস এক্যুনাসকে এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম মুখপাত্র বলা হয় কেন? (What is scholasticism? Why is St. Thomas Aquinas called the greatest spokesman of the movement?)

৪। সেণ্ট টমাস এক্যুনাসকে কেন মধ্যযুগীয় এরিস্টটল বলা হয়? (Why is St. Thomas Aquinas called Mediaeval Aristotle?)

৫। আইন প্রসঙ্গে সেণ্ট টমাস এক্যুনাসের মতামত বর্ণনা কর। (Describe the views of St. Thomas Aquinas on law.)

৬। রাষ্ট্র এবং চার্চ সম্পর্কে তাঁর অভিমত কী ছিল? (What did he think of the relation of the state with the church?)

৭। এক্যুনাসের শ্রেষ্ঠতম অবদান কী ছিল? (What was the greatest contribution of Aquinas?)

দাঁন্তে ছিলেন মধ্যযুগের একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ছিল অনন্য। সম্ভবত মধ্যযুগে এত বড় কবি ও মহান বুদ্ধিজীবী আর জন্মগ্রহণ করেন নি। শিল্পী হিসেবে তিনি রেনেসাঁর আগমনী সঙ্গীতে মধ্যযুগকে আনন্দ বিহ্বল করে তোলেন এবং কবি হিসেবে বিশ্বে অর্ধডজন শ্রেষ্ঠতম কবির মধ্যে তিনি নিজের আসন অলংকৃত করেন। তিনি মধ্যযুগের আলো-হাওয়ায় বড় হলেও তাঁর সৃজনশীল লেখনীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেন 'ব্যক্তির আবেগময় আলোকোজ্জ্বল সত্তা' এবং মানবের ব্যক্তিগত সৌকর্যের এক আলো-আঁধারি পরিবেশ, যা স্থান, কাল, শ্রেণী ও জাতিকে ছাপিয়ে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। মাতৃভাষায় তিনি তাঁর অনবদ্য কাব্য 'ডিভাইন কমেডি' (Divine Comedy) রচনা করে ইতালিতে এক জাতীয় ভাষার জন্মদান করেন। তখন একমাত্র ল্যাটিন ভাষায় সাহিত্য কর্ম রচিত হত। ল্যাটিন ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বাইবেল পর্যন্ত ছাপা হত না। তাঁর মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়াস ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। কবি হিসেবে দাঁন্তে আজও আধুনিক, কেননা তাঁর রচনাশৈলী, তাঁর মননশীলতা, তাঁর আবেগের উষ্ণতা আজও সাহিত্য রসিকদের হৃদয়ে জাগায় উষ্ণ আবেদন।

দাঁন্তের জীবনী
Life-Sketch

১২৬৫ সালে তিনি ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ছিলেন একাধারে সৈনিক, কূটনৈতিক, কবি, ভাষাবিদ, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। জীবনের শেষ এক-তৃতীয়াংশ তাঁকে নির্বাসিতের জীবন কাটাতে হয় জন্মভূমি ফ্লোরেন্স থেকে বহুদূরে। ১৩২১ সালে আভেরনায় (Averona) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। *De Monarchia* বা "রাজতন্ত্র প্রসংগে" তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি সাম্রাজ্যবাদী দর্শন তুলে ধরেন। অধ্যাপক ডানিং-এর মতে, এ গ্রন্থে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বাঙ্গ সুন্দর সাম্রাজ্যবাদী এক দর্শন।

তাঁর চিন্তাধারার পটভূমি
Background of His Philosophy

রোমান সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন শহরাঞ্চলে। 'নগর' ও 'সভ্যতা'র (City and Civilization) মূল খুঁজে পাওয়া যায় লাতিন 'Civis' (পৌর) শব্দের মধ্যে। শহর এলাকায় ছড়িয়ে ছিল সভ্যতার ফসল আর গ্রামাঞ্চলে ছিল ফসলের গোলা। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোম আক্রান্ত হলে ক্রমে ক্রমে শহরাঞ্চলের আয়তন ও সভ্যতার উপাদানগুলো হ্রাস পেতে থাকে। তাই দেখা যায়, প্রথম শতকে রোমের জনসংখ্যা দশ লক্ষ হলেও চার শতকে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি এবং ১৩৭৭ সালে রোমের জনসংখ্যা নেমে আসে মাত্র সতর হাজারে।

সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ইউরোপে পৌর সভ্যতার অবক্ষয়ের পরিচায়ক। বাণিজ্যিভিত্তিক জটিল অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে কৃষিভিত্তিক হয়ে ওঠে। কালক্রমে সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ভূমি। ভূমির মালিকানা হয় কর্তৃত্বের মানদণ্ড। চার্চ এই অবস্থার সাথে বোঝাপড়া করে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। ভূমির মালিকানার দিক থেকেও চার্চ হয়ে ওঠে দেশের বৃহত্তম সামন্ত এবং ফলে লাভ করে সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চার্চের অবস্থা হয় অগ্রগণ্য। বহু শতাব্দী পর্যন্ত চার্চ শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে অসামান্য প্রভাবের অধিকারী হয়।

কিন্তু এগার শতক থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নতুন ভাবধারা সূচিত হয়, তার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে বহু বাণিজ্যকেন্দ্র, বহু সংস্কৃতি কেন্দ্র, অনেক শহর, বন্দর ও নগর। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তার অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে ক্রমে ক্রমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে অন্যান্য সামন্তের মত চার্চও সৃষ্টির এই গতিকে অবিশ্বাস ও ঈর্ষার চোখে দেখেন এবং দেখেন যথার্থই, কেননা নতুনভাবে গড়া শহর এবং নগরের জনসমূহ চার্চের প্রভাব ও অভিজাতদের প্রতিপত্তিকে এড়িয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতার প্রতি তাদের যে অনুরাগ ও জীবনের গতিশীলতার যে আস্বাদ তারা পেল, তার ফলে তারা জীবনকে নতুন আলোকে দেখতে চাইল। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চার্চের যে একচেটিয়া প্রভাব ছিল, তাও গেল। জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে নতুন উন্মাদনা দেখা দিল। সৃষ্টি হলো শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং সংঘাতে সংঘাতে সেকেলে চার্চতন্ত্র এবং ভূমিভিত্তিক অভিজাততন্ত্র অবক্ষয়ের গভীরে নেমে যেতে লাগল।

বার ও চৌদ্দ শতকের মধ্যে রেনেসাঁর প্রাণবন্যা সমগ্র ইতালিকে ভাসিয়ে দিল। এবং রেনেসাঁর ফলশ্রুতি হিসেবে গ্রীস ও রোমের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হলো। ইতালির নগরগুলোর মধ্যে ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, ভেনিস শুধুমাত্র ইতালিতেই নয়, বিশ্বময় খ্যাত হয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। ইতালিতে তখন যে পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেনের যে প্রথা তখন চালু হয়, তা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তাই বলা যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সূচনা আঠার শতকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু হয় নি, বরং তার সূচনা লক্ষ্য করা যায় তের শতকের ইতালির বাণিজ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক অভিযানে। এই পৌর ও বাণিজ্যিক সভ্যতার প্রভাবে চার্চের প্রভাব হ্রাস পায় এবং সমগ্র ইউরোপব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী এক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়। ফ্লোরেন্সের দাঁন্তে এই দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা।

দাঁন্তের আদর্শ সাম্রাজ্য

Dante's Ideal Empire

দাঁন্তে তাঁর ডি মনার্কিয়া (De Monarchia) গ্রন্থে মোটামুটি তিনটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। প্রথম খণ্ডে যে প্রশ্নটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো মানব জাতির কল্যাণের জন্য রাজতন্ত্রের কাঠামোয় এক বিশ্বরাষ্ট্র কি অপরিহার্য? মূলত এতে তিনি দুটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। **প্রথমত,** বিশ্বজনীন সরকার বা বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠন মানব কল্যাণের জন্য প্রয়োজন কী? **দ্বিতীয়ত,** তেমন হলে রাজতন্ত্র অপরিহার্য কী?

(এক) দাঁন্তে মানব প্রকৃতি ও মানব জীবনের লক্ষ্য অনুধাবন করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশ্বজনীন সরকার বিশ্বমানবতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি ঐক্যের মধ্যে দেখেছেন বাস্তবতার রূপ এবং বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত সত্তা প্রকাশিত হয় সর্বোচ্চ ঐক্যে। যেখানে ঐক্য পৌঁছে সর্বোচ্চ শিখরে, সেখানে মহত্তম কল্যাণ পায় প্রাণ। এরিস্টটলের যুক্তির উপর নির্ভর করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, পরিবারের পথ ধরে আসে গ্রাম ও জনপদ এবং জনপদের সোপান বেয়ে আসে রাষ্ট্র। এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু দাঁন্তে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন বিশ্বজনীন রাষ্ট্র হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এখানেই মানুষ পায় সার্থকতার আস্বাদ।

(দুই) এরিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনি বলেছেন, মানুষ যুক্তিবাদী এবং সৎ জীবনের কামনাই তার পরম কামনা। একমাত্র প্রশান্তি ও অবকাশে মানুষ লাভ করে তার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা। যুক্তিবাদী জীবনের জন্য তা অপরিহার্য। ব্যক্তি জীবনে যা দরকার, সমষ্টিগত জীবনেও তা প্রয়োজনীয়। এ সূত্র ধরে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষ যা আশীর্বাদস্বরূপ লাভ করে তা শান্তি এবং শান্তির মাধ্যমে মানুষ তার চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে। বিশ্বজনীন শান্তি তাই তাঁর কাছে এত মূল্যবান ও কাম্য।

(তিন) বিশ্বজনীন শাসন ব্যবস্থার পক্ষে তিনি আর একটি যুক্তি তুলে ধরেন যার আবেদন অত্যন্ত আধুনিক এবং তা বিনা যুদ্ধে আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ মীমাংসার যুক্তি। যেখানে রয়েছে সংঘর্ষের সম্ভাবনা, সেখানেই রয়েছে বিচারের প্রয়োজন। এবং বিচার কার্য অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে যদি কোন কর্তৃত্বের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হয়। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম যে শর্তটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রায় ছয়শত বছর আগে দাঁন্তে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তা হলো নির্দিষ্ট বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার প্রণয়ন। বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত অতীতের কার্যকলাপকে স্পর্শ করে, কিন্তু আইন বিভাগীয় কার্যকলাপে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জড়িয়ে যায়। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্র আপোষ মীমাংসার ক্ষেত্রে ঐক্যনীতি অনুসরণ করবে তাই তো স্বাভাবিক।

(চার) রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, যখন কতকগুলো বিষয়কে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাজানো হয়, তখন শাসন করার দায়িত্ব একজনের উপরই ন্যস্ত হয় এবং অন্যেরা সে শাসনে সম্মত হয়। ব্যক্তি সুখের জন্য মানবিক যে সব গুণ রয়েছে তাদের মধ্যে যুক্তিই সবার উপর প্রাধান্য লাভ করে। যে কোন সংস্থাই ধরা যাক না কেন-পরিবার বা গ্রাম বা নগর বা রাজ্য-সব ক্ষেত্রেই ঐক্য এবং শান্তির জন্য একজনকে শাসন ভার গ্রহণ করতে হয়। মানব জাতিরও রয়েছে একটি লক্ষ্য এবং তা তাদের সকল সম্ভাবনার যথার্থ স্ফূরণ। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও একজনের শাসন বা পথ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তিনি হলেন রাজা বা সম্রাট। বিশ্বের কল্যাণের জন্য রাজতন্ত্রই প্রকৃষ্ট পন্থা।

(পাঁচ) সেন্ট টমাস একুয়্যনাসের অনুকরণে দাঁন্তে প্রকৃতির শাসন ব্যবস্থায় বিশ্ব নিয়ন্তার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। বিশ্বপ্রভু একচ্ছত্র সম্রাট। ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হিসেবে বিশ্বমানবের উচিত বিশ্বপ্রভুর অনুকরণ করা। তবে বিশ্বজনীন রাষ্ট্র যেন সর্বজনীন অত্যাচারের বাহন না হয়ে ওঠে তাই তিনি বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক পক্ষপাতিত্ব ও লোভের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে এবং বিভিন্ন রাজন্য ও শাসকের মধ্যে অসদ্ভাব দেখা দেবে। সম্রাট অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য অর্থহীন হয়ে উঠবে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, সম্রাট শাসিত বিশ্বরাষ্ট্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বজনীন শাসন ব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি এরিস্টটলের 'আইনের প্রশাসন নীতি' সংন্যস্ত করেন এবং 'ব্যক্তির শাসন' নীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সম্রাট ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন।

বিশ্বসাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি তাঁর 'De Monarchia' গ্রন্থে যা বলেছেন তার উদ্ধৃতি বড় উপাদেয় ঃ "এখন এটি স্পষ্ট যে, সমগ্র মানব জাতির রয়েছে একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য এবং এর আলোচনা আগেই করেছি। সুতরাং শাসন ও পথ প্রদর্শনের জন্য একজনেরই প্রয়োজন এবং তাঁর যথাযোগ্য উপাধি সম্রাট বা রাজা। এও খুব স্পষ্ট যে, রাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্য বিশ্ব কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়"।

মানব জাতির ঐক্যের সাথে ঈশ্বরের একত্ব অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাও উল্লেখযোগ্য ঃ 'ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী যা সংঘটিত হয় তাই সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গীয় মহত্ত্ব এবং সার্থকতার

পরিচায়ক। এ কথা যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ছাড়া সবার কাছেই এটি স্বতঃসিদ্ধ। এও ঈশ্বরের অভিপ্রেত যে, প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরের এই প্রকৃতি প্রতিফলিত হোক।

(ছয়) দাঁন্তে তাঁর আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠনে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। তিনি বিশ্বাস করেন, যদিও বিশ্বরাষ্ট্রে আইন ও সরকারের ক্ষেত্রে বিশ্বমানব সুসংহত এবং ঐক্যবদ্ধ হবে, তথাপি সেখানে বহু সংস্কৃতি, ভাষা, কুলভিত্তিক সম্প্রদায় এবং জাতি স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে, নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুসরণ করবে এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সব ছোট খাট ব্যাপারে সম্রাট মাথা ঘামাবেন না, বরং আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে সেই সব সমস্যার সমাধান হবে। শুধুমাত্র সর্বজনীন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সর্বজনীন আইন এবং সর্বজনীন কর্তৃত্ব তাঁরা প্রয়োগ করবেন। এভাবে দাঁন্তে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের সাথে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় বিধান করেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে দাঁন্তে আর একটি প্রশ্নের অবতারণা করেন। রোমান জাতি কী ন্যায়ত বিশ্বসাম্রাজ্যের গৌরব অর্জন করেছিল?

(এক) এ ক্ষেত্রে দাঁন্তে কবি ভারজিলের অনুকরণ করেছেন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এবং প্রাক-খ্রিষ্টীয় যুগের কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তাঁকে রেনেসাঁর অতি কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাসে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে এবং রোমের ইতিহাস স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় রোমান জাতি শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করেছিল। ইতালির অধিবাসী হিসেবে তাঁর পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় এ ক্ষেত্রে মিলে, কেননা তিনি বলেন, রোমান জাতি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং বিশ্বসাম্রাজ্যের জন্য ঈশ্বর তাঁদের চিহ্নিত করেছেন। রোমের কীর্তিগাথায় রয়েছে হাজারো অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় রোমকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন।

(দুই) দাঁন্তে ছিলেন গভীরভাবে ধর্মানুরাগী, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব রোমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার এতটুকু কমতি ছিল না। তিনি বলেন, রোমান জাতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা আত্মস্বার্থ পরিহার করে সৎ ও মহৎ জাতি হিসেবে মানবতার কল্যাণে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের সাহায্যও গ্রহণ করেন। তাঁর মতে বেবিলনিয়া, আসীরীয়, পারসিক ও মিসরীয় জাতি এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। আলেকজাণ্ডার সার্থকতার মুখোমুখি এসেও সফল হন নি। এই প্রচেষ্টায় একমাত্র রোমান জাতি সফলতার স্বর্ণতোরণে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে বিশ্বনিয়ন্তার নির্দেশক্রমেই। দাঁন্তের এই কথা হেগেলের বক্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেন, 'বিশ্ব ইতিহাস হলো বিশ্ব আদালত' ('World history is the world court')।

(তিন) এখানে অবশ্য এ কথা বলা একান্ত প্রয়োজন যে, তের শতকে রোমান জাতি কারা এ কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে কোথাও বলেন নি। যদিও ইতালির অধিবাসী হিসেবে তিনি সব সময় মনে করতেন, রোমই এ সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং ইতালি এ সাম্রাজ্যের একটা বিশিষ্ট অংশ। তিনি অবশ্য রোমান সাম্রাজ্য ও জার্মান সম্রাটের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ড বা ফরাসী সাম্রাজ্যের মত কোন ইতালীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন নি। তাঁর ধারণা ছিল পুরাপুরি মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের। তবে এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে খণ্ড-ছিন্ন-শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ।

(চার) এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানবের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে সে সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাও উল্লেখযোগ্য। মানব জাতির যে ব্যবস্থা সর্বোত্তমরূপে সুসংহত সেখানেই তার স্বাধীনতা সর্বাপেক্ষা বেশি। স্বাধীনতার নীতি অনুধাবন করলেই তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। সুতরাং রাজতন্ত্রের কাঠামোয় বিশ্বরাষ্ট্রে মানব জাতির অবস্থা হবে সর্বোৎকৃষ্ট এবং তা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় ঃ "বিশ্বকল্যাণের জন্য রাজতন্ত্র অপরিহার্য"।

গ্রন্থের শেষাংশে তিনি বিতর্কমূলক বক্তব্য পেশ করে প্রশ্নের অবতারণা করেন। সম্রাটের কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে, না পরোক্ষভাবে পোপের নিকট থেকে এসেছে?

(এক) দাঁন্তে বিশ্বাস করতেন, মানব প্রকৃতি দ্বিবিধ। তার একটি অংশ দৈহিক আর একটি অংশ আত্মিক। এরিস্টটলের পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি বলেন, এই দ্বিবিধ প্রকৃতির লক্ষ্যও দ্বিবিধ। দৈহিক প্রকৃতির সার্থকতা আসে পার্থিব জীবনের আশীর্বাদে এবং আত্মিক প্রকৃতির সার্থকতা আসে স্বর্গীয় জীবনের শুভ আশীর্বাদে। মানব জীবনের এ দুটি লক্ষ্য স্বতন্ত্র। তাই এদের সার্থকতার পথও ভিন্ন। দাঁন্তে বলেন, পার্থিব জীবনের আশীর্বাদ আসবে যুক্তি ও দর্শনের পথ ধরে এবং স্বর্গীয় জীবনের আর্শিবাদ আসবে যুক্তির ঊর্ধ্বে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মবিশ্বাস, আশা ও দানশীলতার পথ ধরে। দার্শনিক সত্য আয়ত্ত এলে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে আর দার্শনিকদের প্রজ্ঞার সাথে পরিচিত হতে হবে, কিন্তু অতি-প্রাকৃত সত্য অনুধাবন করতে হলে প্রয়োজন ধর্মগ্রন্থে যে ঐশীবাণী ও দিব্যজ্ঞান রয়েছে তার উপলব্ধি করা। তাই দাঁন্তে বলেন, মানব জীবনের দুটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য চাই দুজন পথ প্রদর্শক, দুটি আলোকবর্তিকা। শাশ্বত জীবনের শুভ পথ দেখাবেন পোপ, ধর্মগ্রন্থের দিব্যজ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে, আর পার্থিব সুখের দিশারী হবেন সম্রাট, তাঁর দার্শনিক সত্যের পসরা নিয়ে।

(দুই) পোপ বিরোধী বক্তব্যের সমর্থনে দাঁন্তে আরও বলেন, সর্বময় কর্তৃত্বের উৎস বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বপ্রভু। সম্রাট যে কর্তৃত্ব লাভ করেন, তা তিনি কারো মাধ্যমে লাভ করেন না। ঈশ্বরের অপার করুণার স্রোতধারা প্রবাহিত, কিন্তু অন্য কোন মাধ্যমে তা সঞ্চালিত হয় না। সুতরাং সম্রাটের ক্ষমতার উৎস সেই মহাপ্রভু। তিনি আরও বলেন, চার্চের জন্মের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ মহত্তর সত্তা আর চার্চ এবং সাম্রাজ্য-এ দুটি আশীর্বাদ প্রবাহিত হয় তাঁরই ইঙ্গিতে। চার্চ সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তা ভাবা সঠিক নয়।

(তিন) পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকেও তিনি উদাহরণ সংগ্রহ করেন এবং প্রমাণ করেন, চার্চ সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নয়। তাছাড়া, তিনি কনস্ট্যান্টাইনের সাম্রাজ্যদান এবং সার্লেমেইনের উপর পোপের সাম্রাজ্য ন্যস্তকরণ-ইতিহাসের ঘটনাদ্বয়কেও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেন যে, সাম্রাজ্যের উপর পোপের কর্তৃত্বের দাবি ভিত্তিহীন। কনস্ট্যান্টাইন সাম্রাজ্যের কোন অংশ দান করলেও তা বেআইনী, কেননা সম্রাট আইনগত কোন অংশের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বিলোপ করতে পারেন না। আইনজ্ঞদের অভিমত তাই। তাছাড়া, এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষ। দ্বিতীয় ঘটনার প্রেক্ষিতে এ যুক্তি দেখানো হয় যে, পোপের কোন রাজকীয় ক্ষমতা নেই। সুতরাং তিনি সার্লেমেইনের উপর কোন সাম্রাজ্য ন্যস্ত করতে পারেন নি। সর্বশেষে, এ যুক্তিও দেখানো হয় যে, কোন পার্থিব ক্ষমতার অধিকার চার্চের নীতি বিরোধী, কেননা চার্চের সাম্রাজ্য ইহলৌকিক নয়। চার্চের সাম্রাজ্য চিরন্তন স্বর্গরাজ্য।

দাঁন্তের অবদান
Contributions of Dante

সেণ্ট টমাস এক্যুনাসের লেখায় যেমন সেণ্ট অগাস্টিন ও এরিস্টটলের সমন্বয় ঘটে, দাঁন্তের লেখায় তেমনি রাষ্ট্রের সূচনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সেণ্ট অগাস্টিন ও সেণ্ট টমাস এক্যুনাসের ভিন্নমুখী ভাবধারার সমন্বয় ঘটে। সেণ্ট অগাস্টিনের মতে, মানবের আদি পাপের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবিধানের মাধ্যম রাষ্ট্র। কিন্তু এরিস্টটলের প্রভাবে টমাস বলেন, রাষ্ট্র মানবের স্বাভাবিক প্রবণতার চূড়ান্ত রূপ। দাঁন্তে টমাসের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, মানব তার পূর্ণ সত্তা এবং দৈহিক ও

নৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকার ও রাষ্ট্রের মত সমষ্টিগত সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করে। স্বাভাবিক রাজনৈতিক সংগঠন হলো জনপদ, নগর, প্রদেশ ও রাজ্য, কিন্তু মানুষের লোভ ও হিংসার ফলে এ সংস্থাগুলোর বিকৃতি ঘটে। তাই তিনি প্রতিবিধানের জন্য বিশ্ব সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা দেন যেখানে ন্যায়নীতি ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত এবং নাগরিক জীবন সুন্দরভাবে বিকাশ লাভ করবে।

বিশ্বজনীন সম্প্রদায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা শাসন ব্যবস্থার যে মতবাদ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা একদিক থেকে বিপ্লবাত্মক, কেননা তাঁর মতে, বিশ্বজনীন রাষ্ট্রের সম্রাট চার্চ বা অন্য কোন মাধ্যম ব্যতীত স্বয়ং যিনি সব কর্তৃত্বের উৎস সে বিশ্বনিয়ন্তার কাছ থেকে সরাসরি ক্ষমতা লাভ করেছেন। মানবের দ্বিবিধ লক্ষ্য–পার্থিব জীবনের সুখ সম্ভোগ এবং স্বর্গীয় জীবনের আশীর্বাদ–তিনি খ্রিস্টান ঐতিহ্য থেকে লাভ করেছেন। সেণ্ট টমাসের মতে, পার্থিব জীবনের শান্তি মানবের চূড়ান্ত লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং চার্চের মাধ্যমেই মানব তার দ্বিবিধ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চার্চের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হোক, তা দাঁন্তে চান নি। তাই তিনি চার্চ ও বিশ্বরাষ্ট্র এ দুটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানের হাতে মানবের দ্বিবিধ লক্ষ্যকে সমর্পণ করেন। চার্চ ও সাম্রাজ্য দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৃথিবীতে তাদের কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেই। তারা শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগত এবং তাঁর নিকটই দায়িত্বশীল।

চার্চ ও সাম্রাজ্যকে স্বতন্ত্র করে দাঁন্তে চার্চের পার্থিব কর্তৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি বলেন, চার্চের লক্ষ্য থেকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের লক্ষ্য স্বতন্ত্র এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পন্থা ভিন্ন। মানবের পার্থিব সুখের জন্য শাসক যুক্তি ও দর্শনের সাহায্য নিবেন। কিন্তু অপার্থিব আশীর্বাদের জন্য পোপ সাহায্য গ্রহণ করবেন ধর্মতত্ত্ব, ধর্মবিশ্বাস ও ঐশীবাণীর সাহায্যে। সুতরাং তিনি পার্থিব কর্তৃত্ব ও চার্চের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে ধর্মতত্ত্ব থেকে দর্শনের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা চার্চ থেকে সাম্রাজ্যের পৃথকীকরণ অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। সেণ্ট টমাস একুনাস দর্শনকে ধর্মতত্ত্বের ভৃত্যে পরিণত করেন, কিন্তু দাঁন্তে দর্শনের মুক্তি ঘোষণা করলেন। দাঁন্তের এই চিন্তাসূত্রের তাৎপর্য চার্চ অনুধাবন করেন এবং ১৩২৯ সালে পোপ জন দ্বাবিংশের আদেশে তাঁর এই গ্রন্থটিকে ধর্মবিরোধী বলে ভস্মীভূত করা হয়। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৫৫৯ সালে।

১। দাঁন্তের চিন্তাধারার পটভূমিকা সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the background of Dante's political thought?)

২। দাঁন্তে ও সেণ্ট টমাস একুনাসের চিন্তাধারার মধ্যে কোন মিল রয়েছে কী? (Do you find any similarity between Dante's political ideas and Thomas's thought?)

৩। দাঁন্তের আদর্শ সাম্রাজ্য সম্পর্কে কী জান? (What do you know of Dante's Ideal Empire?)

৪। রাষ্ট্রচিন্তায় দাঁন্তের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর? (Discuss the contribution of Dante to political thought?)

পাদুয়ার মারসিলিও (Marsilio) [তিনি মারসিগ্‌লিও নামেও পরিচিত] মধ্যযুগের একজন খ্যাতনামা লেখক। তাঁর "ডিফেনসর পেসিস" (Defensor Pacis---শান্তি রক্ষক) মধ্যযুগের এক অনবদ্য সৃষ্টি। অধ্যাপক মারে (Murray) মারসিলিওকে চৌদ্দ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও তিনি সমকালীন এক সমস্যার মোকাবেলার জন্য লেখনী ধারণ করেন, চার্চের বিরুদ্ধে সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তৎকালীন জীবন ধারায় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁর অজান্তে সর্বকালের ও সর্বযুগের এক অপূর্ব সৃষ্টি সম্পন্ন হলো।

জীবনী
Life Sketch

মারসিলিও আনুমানিক ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাদুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর চরিত্রে তাই দেখা যায় বাস্তবতাভিত্তিক আত্মপ্রত্যয়ের এক দৃঢ় স্বাক্ষর। প্রাচীন ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐতিহ্যবাহী ইতালীয় প্রজাতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীর যোগ্য আত্মসচেতনতা এবং অভিজ্ঞান তাই রয়েছে মারসিলিওর চিন্তাস্রোতের প্রতি বাঁকে। তিনি দর্শন, আইন ও ধর্মতত্ত্ব বিশেষ অনুরাগের সাথে অধ্যয়ন করেন এবং পেশা হিসেবে চিকিৎসা শাস্ত্রকে গ্রহণ করেন। যাজক হবার শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন এবং ফ্রানসিস্‌ক্যান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। এক সময় তাঁকে মিলানের আর্চবিশপ পদে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু সে পদ তিনি গ্রহণ করেন নি। বিচিত্র তাঁর জীবনালেখ্য। একাধারে তিনি ছিলেন আইনবিদ, সৈনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিল বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী এক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমালোচনার এক প্রবণতা। তাই তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় তিনি অধিক পরিমাণে মধ্যযুগীয় তত্ত্ব ও চিন্তাধারা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সৃজনধর্মী বয়োকালের বেশ কিছু অংশ তিনি ফ্রান্সে কাটান। এই সময়ে তাঁর চিন্তাধারায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৩১২ খ্রিস্টাব্দে তিন মাসের জন্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মনোনীত হয়। দর্শন, কলা, সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তখন বিশ্বের সেরা শিক্ষাকেন্দ্র। তাছাড়া, ফ্রান্সের হাতে পোপ পর্যুদস্ত হলে প্যারিস নগরী ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীরও বিরাট কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। এমনি প্রাণবন্ত রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিচ্ছুরণ কেন্দ্রে তাঁর জীবন সমাপ্ত হয়। সম্ভবত ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ডিফেন্সর পেসিস' (Defensor Pacis—"শান্তি রক্ষক") রচনা করেন। তাঁর জনৈক বন্ধু ও সহযোগী বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত জান্দুনের জন এই গ্রন্থের কিছু অংশ রচনা করেন বলেও অনেকে মনে করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার দুই বছর পর যখন জানাজানি হয় যে, মারসিলিও এর লেখক, তখন অত্যাচারিত হবার আশঙ্কায় তিনি বাভারিয়ার লিউইসের রাজদরবারে পলায়ন করেন। জার্মানীতে লিউইসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে

মারসিলিও তাঁর পৃষ্ঠপোষকের সাথে জীবনের অবশিষ্ট অংশ শান্তিতে কাটিয়ে দেন। ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মারসিলিওর রাষ্ট্রচিন্তা
Political thought of Marsilio

(এক) এরিস্টটলকে অনুসরণ করে মারসিলিও তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, মানুষের হাজারো প্রয়োজন মেটাবার জন্য রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং রাষ্ট্রের নীতি হলো পারস্পরিক ভিত্তিতে সেবার মূলনীতি। সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ও জনপদের মধ্যে মৌলিক সহযোগিতা রাষ্ট্রের ভিত্তি। রাষ্ট্র উন্নত জীবনের লক্ষ্য অর্জনের স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা। রাষ্ট্র একটি জীবন্ত সত্তাস্বরূপ। কৃষিজীবী, হস্তশিল্পী, সৈনিক, কর্মচারী, বণিক, যাজক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সুসংহত প্রচেষ্টার ফলেই রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করলে রাষ্ট্র সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের এই অবস্থাকে তিনি শান্তি (Tranquillitas) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং দেখা যায়, তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি এরিস্টটলীয় যুক্তিবাদ। মারসিলিও যখন বলেন, রাষ্ট্র স্বাভাবিক ও জীবন্ত এক সত্তা, তখন তাঁর কথার মধ্যে এরিস্টটলীয় সুরের প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

(দুই) শান্তি রক্ষার প্রশ্নে তিনি সরকারের কার্যপরিধি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর মতে সরকারের কাজ দ্বিবিধ ঃ (১) প্রতিরোধমূলক এবং (২) সহযোগিতামূলক। একটি নঞার্থক-প্রতিহত করা। অপরটি সদর্থক-বৃদ্ধি করা।

(তিন) প্রতিরোধের প্রশ্নে তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণে উদ্যত হন। তাঁর মতে মানুষ স্বার্থপর, আগ্রাসী ও কলহপ্রিয়। একজন অন্যজনকে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে সহযোগিতার সূত্র ছিন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রতি মুহূর্তে। তারই ফলে, লেখকের মতে, সমাজে ন্যায়-অন্যায় বোধের কৌশল বা 'ন্যায়-নীতির' উদ্ভব হয়। যুক্তিবাদের ভিত্তিতে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' (Natural Law) গড়ে উঠেছে। মানুষ সমাজের পক্ষে যা ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকে এবং যা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক তার প্রতি অনুরক্ত হয়। মারসিলিওর এ মতবাদ মেকিয়েভেলি, এমনকি হবসের, মতবাদের মতই।

(চার) মানুষের প্রবণতা থেকেই সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য মানুষের অসামাজিক প্রবণতাগুলোকে দমন করা যেন সামাজিক জীবন অচল না হয়ে যায়। দ্বিতীয় কর্তব্য শান্তি প্রতিষ্ঠা। তাঁর মতে শান্তির (Tranquillitas) অর্থ সমাজে নিরাপত্তাবোধ। নিরাপত্তাই সকল প্রগতি ও অগ্রগতির উৎস। রাষ্ট্র সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের সমবায়ী সংস্থা। সুতরাং পূর্ণ শান্তি আনতে হলে প্রয়োজন হয় লক্ষ্যের সাথে উপায়ের সুসংহত সমন্বয়, যেখানে কোন ক্ষয়ক্ষতি বা সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সরকারকে একদিকে যেমন দমনমূলক কাজে হাত দিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি মনোযোগী হতে হয় সহযোগিতার সূত্র সুদৃঢ় করতে।

(পাঁচ) সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর নির্ধারিত কাজ আছে। সৈনিক বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে। কৃষক কৃষিজাত ও খাদ্যের সংস্থান করে। বণিকেরা দেশের মূলধনকে বিনিয়োগে সাহায্য করে। হস্তশিল্পীরা ঘরবাড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন করে। অনুরূপভাবে যাজকদেরও বিশেষ দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন এ সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কাজ-কর্মের সুসামঞ্জস্য সংগঠন, যার ফলে কোথাও যেন সময় ও শ্রমের কোন অপচয় না ঘটে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৈনিক রাখাও যেমন ঠিক নয়, প্রয়োজনের তুলনায় অল্প কৃষকের সংখ্যাও তেমনি ঠিক নয়।

(ছয়) যাজকদের কার্যক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হন। যেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর কার্যকলাপ অত্যন্ত স্পষ্ট, যাজকদের কার্যকলাপ তাঁর নিকট তেমন স্পষ্ট নয়। তবে তিনি মনে করেন,

যেহেতু সর্বকালে সর্ব দেশে মানব সমাজে কোন না কোনরূপে যাজকীয় সম্প্রদায় বিদ্যমান, তাই এর কিছুটা যৌক্তিকতা রয়েছে। তিনি মনে করেন যে, অসামাজিক ও কলহপ্রিয় মানুষকে নরকের ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার জন্যই ধর্মের উৎপত্তি। তাই আইন প্রণেতাগণ সর্বজ্ঞ এক ঈশ্বরের কল্পনা করেন, যার ভয় দেখিয়ে মানুষকে আইনের অধীনে আনা যায়। সুতরাং যাজক সম্প্রদায়ের আসল কাজ হয়েছে নরকের ভয় দেখিয়ে পুলিশ ও বিচারকের কাজের সম্পূরণ করা।

(সাত) এই মতবাদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এতে হতাশ হতে পারেন। তাই মারসিলিও বলেন, যাজকের কাজ হলো পরকালে উন্নত জীবনের নিশ্চয়তার আশ্বাস। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের কাজ উন্নত জীবন সংগঠন এবং তা ইহকালে শুধু নয়, পরকালেও। ইহকালে উন্নত জীবনের আস্বাদ পেতে পারি আমাদের বুদ্ধি, বিবেকের ও দর্শন অনুশীলন থেকে। কিন্তু পরকালে সৎ জীবনের আশীর্বাদ পেতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হবে ঐশীবাণী ও যাজকের উপর। সুতরাং যাজকের আসল কাজ হচ্ছে পরকালে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করা। মারসিলিও বলেছেন, যাজকদের মৌল কাজ হলো "চিরন্তন মুক্তিলাভ ও অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী যা বিশ্বাস করা, সম্পাদন করা বা সম্পাদন থেকে বিরত থাকার সকল বিষয় জানা এবং শিক্ষা দেয়া"। পার্থিব সুখের জন্য যাজকদের কিছুই করণীয় নেই। তাঁদের যা কিছু করণীয়, তা করতে হবে পরকালের জন্য। জাগতিক বিষয়ে যাজক সম্প্রদায়ের কোন কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত। তাঁদের কাজ জনগণকে ধর্মীয় বিষয়ে সাবধান করা ও ধর্মনীতি প্রয়োগ করা। সুতরাং এক বিশেষ শ্রেণী হিসেবে তাঁদের বিশেষ সুবিধাভোগের কোন অধিকার নেই। অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় এ শ্রেণীকেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে কাজ করতে হবে। পার্থিব ব্যাপারে রাষ্ট্র কর্তৃক যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ নীতিগতভাবে কৃষি বা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের ন্যায়। মারসিলিও ধর্মকে এক সামাজিক বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন এবং পার্থিব সংস্থার মাধ্যমে তা সামাজিক কল্যাণ আনয়ন করবে।

(আট) এভাবে মারসিলিও ঐতিহ্যবাহী 'দুই তরবারি' তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেন এবং ধর্মের সর্বব্যাপক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে চার্চ যে স্বাধীন ও সার্বভৌম এক কর্তৃত্ব সে দাবিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। তাঁর এই বিশ্লেষণে চার্চ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বিভাগের পর্যায়ে অবনমিত হয়। মারসিলিওর পূর্বে মধ্যযুগীয় কোন লেখক তত্ত্বগত দিক থেকে এত সুস্পষ্টভাবে চার্চের উপর রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় সক্ষম হন নি। তিনি সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে হোক আর জাগতিক ক্ষেত্রেই হোক চার্চ বা ধর্মযাজকদের আধিপত্য অস্বীকার করেন তাঁর নির্মম যুক্তির মাধ্যমে। সুতরা তাঁর গ্রন্থ 'ডিফেন্সর পেসিস' যে ধর্ম ও নীতি বিরোধী বলে নিন্দা কুড়াবে এতে সন্দেহ কী? পোপ ষষ্ঠ ক্লিমেণ্ট তাই মারসিলিওকে 'ঘৃণ্যতম পাতক' বলে চিহ্নিত করেন।

(নয়) কিন্তু মারসিলিও এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হন যে, চার্চ রাষ্ট্রের সমকক্ষ ও সমান কর্তৃত্বের অধিকারী হলে ইতালি তথা ইউরোপে কোনদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা তাঁর মতে সব অনৈক্য ও বিভেদের মূল দুটির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তাই তিনি সেণ্ট টমাস একুয়নাসের বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কোন সমন্বয় বিধান না করে দুটির মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে তুলেন এবং দুটিকে স্বতন্ত্র করে ফেলেন। তিনি যথাশক্তি দিয়ে ঘোষণা করলেন, পার্থিব ব্যাপারে ধর্মের কোন হস্তক্ষেপ সঠিক নয়। অবশ্য চিন্তার এই সূত্র দু শত বছর পর মেকিয়েভেলির হাতে আরও বিকশিত হয়ে ওঠে। পার্থিব ব্যাপারে সমাধান খুজতে হবে যুক্তির ভিত্তিতে, কোন দৈববাণী বা ঐশীবাণীর মধ্যে নয়।

(দশ) রাষ্ট্রচিন্তায় মারসিলিও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে এরিস্টটলকে অনুসরণ করেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা মধ্যযুগীয় এরিস্টটলপন্থীদের সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রীক দর্শনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিবাদের উপর ভিত্তি করে এরিস্টটল তাঁর রাষ্ট্রীয় আদর্শের

সৌধ নির্মাণ করেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পলিটিক্স'-এ এমন ধর্মের তিনি ইঙ্গিত দান করেন, যার আবেদন হয়ে ওঠে অতিপ্রাকৃত। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম অলৌকিক বলে মারসিলিও একে যুক্তিভিত্তিক বিচারবিবেচনার অযোগ্য বলে চিহ্নিত করেন। প্যারিসের জন চার্চের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও দায়িত্বকে সীমিত করতে চেয়েছিলেন। সেণ্ট টমাস একুয়নাস ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের অপূর্ব এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন এবং চার্চের মহিমা কীর্তন করেন। কিন্তু মারসিলিও ধর্ম তথা চার্চকে তার সুউচ্চ বেদী থেকে নামিয়ে এনে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় বিভাগের পর্যায়ে অবনমিত করেন। আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য ধর্মের যে ভূমিকাই থাক না কেন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তা যে অপ্রাসঙ্গিক তা তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

আইন ও আইন প্রণেতা

Law and Law-giver

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার পর মারসিলিও সরকার সংগঠন সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর মতে, সরকার সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আইন। সম্প্রদায়ের জন্য যা মঙ্গলজনক এবং ন্যায়সঙ্গত তার মৌল উপলব্ধিই আইন। তিনি আইনের যে সংজ্ঞা দান করেন, তা আধুনিকতার আলোকে সমুজ্জল। আইন বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন এমন সব বিধি-বিধানকে যা সাধারণ প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম, যা বিচার বুদ্ধি প্রসূত, যা সর্বজনস্বীকৃত কর্তৃত্ব কর্তৃক প্রযোজ্য এবং যার পেছনে রয়েছে ক্ষমতার সমর্থন। এ কারণে আইন প্রণেতা হবেন হয় সমগ্র সম্প্রদায়, না হয় সম্প্রদায়ের 'ফলপ্রসূ অংশ' (Pars Valentior)। সাধারণভাবে এ শব্দ দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বুঝায়, কিন্তু মারসিলিও খুব সম্ভব তা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন 'ফলপ্রসূ অংশ'। মারসিলিও খুব জোরের সাথে ঘোষণা করেন, আইন প্রণেতা হবেন সমগ্র সম্প্রদায় বা তার 'ফলপ্রসূ অংশ'। অধিকারের কোন প্রশ্ন এখানে জড়িত হয় নি। অবশ্য লেখক সচেতন রয়েছেন যে, সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায় কোন আইন প্রণয়নে সক্ষম নন। তাই আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সম্প্রদায় কোন অংশের উপর তুলে দিতে পারেন। কিন্তু আইন প্রয়োগের মৌল অধিকার যে সম্প্রদায়ের, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আইন সার্থকভাবে কার্যকর করতে হলে আইনকে হতে হবে সর্বজনীন ইচ্ছার প্রকাশস্বরূপ। শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আইনের বৈশিষ্ট্য এমনি। বাস্তবে অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয়। তিনি বলেন, আইন ঘোষণার দ্বারা প্রণীত হতে পারে, তবে আইন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে আনুগত্যের বন্ধনে এবং আনুগত্য তখনই নিশ্চিত হয়, যদি তা সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। যে আইন সাধারণ ইচ্ছা ভিত্তিক হয় না, তা হয় অত্যাচারের হাতিয়ার। সম্প্রদায় মেনে চলে বলেই আইনের জন্ম হয়েছে।

মারসিলিওর আইনের সংজ্ঞা বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। **প্রথমত,** মানবিক আইন ঐশ্বরিক আইন থেকে উদ্ভূত নয়, যদিও তা পূর্বে সেণ্ট টমাস একুয়নাস বলেছেন যে, মানবিক আইন ও স্বর্গীয় আইন একই স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত, কেননা উভয়ই একই অভিজ্ঞানের ফলশ্রুতি। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক আইনের যুক্তিবাদী বিবর্তন মানবিক আইন।কিন্তু মারসিলিও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বললেন, মানবিক আইন নাগরিকদের বিচার-বিবেচনাপ্রসূত এবং ঐশ্বরিক আইন ঈশ্বরের নির্দেশ।

দ্বিতীয়ত, মারসিলিওর মতে আইনের পশ্চাতে থাকে কর্তৃপক্ষের সমর্থন। এ সমর্থন ব্যতীত আইন অর্থহীন। ঐশ্বরিক আইনের পশ্চাতে থাকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সমর্থন। তিনি পরলোক বিশ্বাসীদের পুরস্কার বিতরণ বা দণ্ড বিধানের মাধ্যমে আইনকে চালু রেখেছেন। তেমনি মানবিক আইনের পশ্চাতে আছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন। আইন ভঙ্গকারী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে শাস্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। সম্প্রদায়ের পক্ষে এই শাস্তির বিধান দেয় রাষ্ট্র বা সরকার। যে আইন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা প্রযোজ্য হয় না, তা আইন নামের অযোগ্য। এভাবে তিনি যাজকীয় বিধি বিধানকে আইনের আওতার বাইরে নিয়ে আসেন। তাঁর

মতে, শুধুমাত্র ঐ সব যাজকীয় বিধি-বিধান আইন বলে পরিগণিত হতে পারে যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত, মানবিক আইন প্রণীত হয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থে। সম্প্রদায়ের জনসমষ্টি ইহলোকের জীবনকে বিকশিত ও পরিপূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর এবং এ উদ্দেশ্য সাধনে মানবিক আইন ফলপ্রসূ। ঐশ্বরিক আইন পরলোকের জন্য, কিন্তু কোন বিধি-বিধান পৃথিবীতে মানব জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হলে সম্প্রদায় বা তার 'ফলপ্রসূ অংশ' তার পিছনে রাষ্ট্রীয় সমর্থনযুক্ত করে তাকে মানবিক আইনের মর্যাদা দিতে পারে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইচ্ছা বা নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, মারসিলিও উল্লেখ করেন যে, আইন মূলত যুক্তির বিধান বা ন্যায়নীতির আদর্শ। সেণ্ট টমাস একুয়্যনাসও আইনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু মারসিলিও সেণ্ট টমাসের ধারণা নীতিগতভাবে গ্রহণ করলেও তিনি আইনের আর একটি বিশিষ্ট দিকের উন্মোচন করেন। তাঁর মতে আইন মূলত ন্যায়-নীতির বিধান, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো বৈধ কর্তৃপক্ষের দ্বারা তার বিধিবদ্ধকরণ ও প্রকাশ্য ঘোষণা।

আইনের এই সংজ্ঞা আইন প্রণয়নকারীর ইঙ্গিত বহন করে এবং মারসিলিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ দিকেরও নির্দেশ দেন তাঁর 'ডিফেন্সর পেসিস' গ্রন্থে। তিনি বলেন, আইনের প্রাথমিক ও সঠিক উৎস আইন প্রণয়নকারী'। আইন প্রণয়নকারী হয় সমগ্র জনসমষ্টি বা সমগ্র নাগরিক গোষ্ঠী বা তার 'ফলপ্রসূ অংশ'। তারা সাধারণ পরিষদে বিচার-বিবেচনা করে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেবে কোন্ কোন্ সামাজিক কাজ করণীয় বা কোন্ কোন্ কাজ দূষনীয়। এই নির্দেশ অমান্যকারী নির্দিষ্ট পার্থিব দণ্ডভোগ করতে বাধ্য হবে। সুতরাং মানবিক আইনের উৎস জনসমষ্টির সমষ্টিগত কাজকর্ম। এরই মাধ্যমে কোন জনপদ তার সদস্যদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী হয়। তাই তিনি তাঁর 'ডিফেন্সর মাইনর' গ্রন্থে বলেন, রাষ্ট্র সেই জনসমষ্টি যে নির্দিষ্ট বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। মারসিলিও সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছেন যে, বৈধ কর্তৃত্বের উৎস সব সময় জনগণ বা তার ফলপ্রসূ অংশ, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মর্যাদা বা সংস্থার উপর জনগণ এই ক্ষমতা ন্যস্ত করে থাকে সম্রাটের মাধ্যমে। মারসিলিওর নগর রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুরাগ এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চার্চ ও ধর্মযাজক
Church and Clergy

রাষ্ট্রের কাঠামোর বিবরণ দেবার পর মারসিলিও চার্চের সংগঠন, তার কর্তৃত্ব, ধর্মযাজকদের কর্মধারা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের কি সম্পর্ক-এসব নির্ধারণে মনোযোগী হন। মারসিলিও বলেছেন, জনপদের প্রত্যেক কর্মকর্তার ক্ষমতার উৎস জনসমষ্টি। জনসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন কর্মকর্তার হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করলে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হন। এদিক দিয়ে ধর্মযাজকদের প্রকৃত কোন ক্ষমতা নেই। কোন সময় ক্ষমতা প্রত্যর্পিত হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা তা প্রয়োগ করতে পারেন। ধর্মযাজক শ্রেণী রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানে কার্যরত থাকতে পারেন এবং তখন অন্যান্য শ্রেণী বা বিভাগ যেভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করে, ধর্মযাজকদেরও তেমনি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতে হবে। মানবিক আইনের আওতায় কোনরূপ ধর্মীয় অপরাধ থাকতে পারবে না। ধর্মীয় কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তার বিচার করবেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং তার দন্ডবিধান হবে মৃত্যুর পরপারে। আর কোন ধর্মীয় অপরাধের জন্য পার্থিব দণ্ডদানের ব্যবস্থা করলে তা করতে হবে মানবিক আইনের মাধ্যমে। তখন তা হবে পার্থিব অপরাধ। সুতরাং পৃথিবীতে অধর্মাচরণের কোন দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হলে তা হবে রাষ্ট্রীয় অপরাধ। এভাবে তিনি প্রমাণ করেন যে,

অধর্মাচরণ বা ধর্মহীনতার বিচার চার্চ করতে পারে না। ধর্মচ্যুতকরণকে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত করেন। যাজকীয় আইনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐশ্বরিক আইন ভঙ্গ হলে ঈশ্বর তার দণ্ডবিধান করবেন, কিন্তু কোন অপরাধে পার্থিব শাস্তির বিধান থাকলে তা হবে মানবিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ধর্মযাজকবৃন্দ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করা ছাড়া খুব জোর জনগণকে উপদেশ দিতে বা পরামর্শ দিতে পারেন, যেমন স্বাস্থ্যরক্ষামূলক বিষয়ে ডাক্তার পরামর্শ দেন। দুষ্টদের কাজের পরিণাম সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করতে পারেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দানের ক্ষমতা তাঁদের নেই।

চার্চের সম্পত্তি সম্পর্কেও মারসিলিওর মন্তব্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁর মতে, চার্চের কোন সম্পত্তি থাকা উচিত নয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দান এবং দাক্ষিণ্য হিসেবে ভূমি বা অন্য কোন সম্পত্তি দান করার ফলেই চার্চের সম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছে। মারসিলিওর মতে চার্চ কোনরূপ কর ধার্য করতে পারে না বা জনসমষ্টির বিনা অনুমতিতে কোন কর মওকুফও করতে অক্ষম। তিনি আরও বলেন, ধর্মীয় আদালতের ন্যায় চার্চের সম্পত্তিও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম যাজকরা সম্প্রদায়ের দেয়া সুবিধা ভোগ করেছেন, ততক্ষণ তাঁদের ধর্মীয় কাজে বাধ্য করা যেতে পারে এবং পোপ থেকে শুরু করে প্রত্যেক বিশপকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের পদ থেকে বরখাস্ত করতে পারেন। চার্চ কর্তৃপক্ষ ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে মারসিলিও তাঁর এই মতবাদের সমর্থনে ধর্মগ্রন্থ থেকেও উদ্ধৃতি দান করেন। ধর্মযাজকরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন, এমন সমর্থন ধর্মগ্রন্থে নেই। তাঁদের জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার বেশি তাঁরা দখলে রাখতে পারেন না। অবশ্য এই সম্পত্তির ঠিক মালিক কে হবেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। একবার বলেছেন যাঁরা চার্চকে সম্পত্তি দান করেছেন, তাঁরাই এর যোগ্য অধিকারী। অন্যত্র বলেছেন, সম্প্রদায়ই এর অধিকারী। যাই হোক যেভাবে তিনি তাঁর এ যুক্তির গাঁথুনি রচনা করেছেন তা অনেকটা দুঃসাহসিক বলে মনে হয়।

এই যুক্তি দেবার আগেই তিনি 'সম্পত্তির' ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মালিকানা এমন এক অধিকার যার পেছনে রয়েছে আইনের সমর্থন। মালিকানা আইনগত এক অধিকার এবং তা সমর্থিত হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কর্তৃক। আইনের মাধ্যমে ধর্মযাজকরা এ অধিকার উপভোগ করতে পারেন কী? তিনি প্রশ্ন করেছেন। যাঁরা পরিপূর্ণ মানুষ, প্রাচীন ধর্মগুরুরা তাঁদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। ধর্মগ্রন্থে রয়েছে, তোমরা পূর্ণতা অর্জন করতে চাইলে তোমাদের যা আছে তা বিক্রয় করে দাও এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। ধর্মযাজকরা পেশাগতভাবে পরিপূর্ণ মানুষ। সুতরাং তাঁদের জাগতিক সম্পদের প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে দান গ্রহণ পার্থিব ব্যাপার এবং তাও এক ধরনের সম্পদ। চার্চের তাও গ্রহণ করা উচিত নয়। সুতরাং চার্চের যে সম্পত্তি রয়েছে তা দাতা এবং দাতার খোঁজ না পেলে সম্প্রদায় বা তার প্রতিনিধির হাতে ফিরিয়ে দেয়া দরকার। ধর্মযাজকরা শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন, তা পেতে পারেন।

মারসিলিও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতা সূচিত হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। অবশ্য অধ্যাপক স্যাবাইন এ মতকে ভিত্তিহীন বলেছেন। মারসিলিও চেয়েছিলেন চার্চকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে। মারসিলিও যে চার্চকে রাষ্ট্রের অন্যতম বিভাগ হিসেবে দেখিয়েছেন, তাও নয়, কেননা তা হলে যতগুলো রাষ্ট্র আছে চার্চের সংখ্যাও তত হয়ে যাবে। ১৩২৪ সালের দিকে প্রত্যেক রাষ্ট্রের এবং প্রত্যেকটি স্বাধীন নগরীর স্বতন্ত্র চার্চ থাকবে এই কথা ভাবাও কঠিন। তিনি যা চেয়েছেন, তা হলো যাজকীয় কর্তৃপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং পোপের সর্বাত্মক ক্ষমতার মূলে কুঠারাঘাত করা।

তাঁর অবদান
His Contributions

মারসিলিওর চিন্তাধারায় যতই অস্পষ্টতা থাকুক না কেন বা তা যতই অবাস্তব হোক না কেন,তিনি সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ যিনি রাষ্ট্রকে তত্ত্বগতভাবে অভিনব এক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। তাঁর মতবাদে পোপ ও চার্চের বাধ্যকারী সব ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে এবং আধুনিক রাষ্ট্রের চিন্তাদল অঙ্কুরিত হয়, যা পরবর্তীকালে মেকিয়েভেলির নিপুণ হাতে সার্থকতা লাভ করে। তাছাড়া, তিনি জনগণকে সকল প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার উৎস ও আইনের আদিম কারণ বলে চিহ্নিত করে জনগণের সার্বভৌমত্বের পথ নির্দেশ করেন। তৎকালে তাঁর মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। চার্চের মধ্যে কোন বিবাদ বা ধর্মসংক্রান্ত কোন প্রশ্নে মতদ্বৈধতা দেখা দিলে, তাঁর মতে, সাধারণ পরিষদই ছিল সমাধানের যোগ্যতম ক্ষেত্র। পোপ পর্যন্ত এই পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই চিন্তাসূত্র পরবর্তীকালে বিরাট এক আন্দোলনে রূপ লাভ করে। তাই কনসিলিয়ার আন্দোলন বা সমন্বয়ের আন্দোলন।

কিন্তু মূলত তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রবাহিত হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের আদর্শে এবং তাঁর চিন্তাধারায় এরিস্টটলের মতাদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। প্রাচীন নগর-রাষ্ট্র যেমন নাগরিক জীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করত, তেমনি মারসিলিও চেয়েছিলেন রাষ্ট্র হয়ে উঠুক সর্বাত্মক। তাছাড়া, তাঁর চিন্তাসূত্রে ইতালির রেনেসাঁরও যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ধারা মেকিয়েভেলিতে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে ওঠে। মারসিলিওর রাষ্ট্র পুরাপুরি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে নি এবং চার্চও সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক এক সংস্থায় রূপ লাভ করে নি। এ দু-এর সার্থকতার জন্য প্রয়োজন রয়েছে আরও কয়েক শত বছরের চিন্তা-ভাবনার ফসল।

১। মারসিলিও'র চিন্তাধারার পটভূমি আলোচনা কর। (Discuss the background of Marsilio's thought.)

২। মারসিলিও'র রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে কী জান? (What do you know of Marsilio's theory of the state and government?)

৩। আইন এবং আইন প্রণেতা সম্পর্কে মারসিলিও'র অভিমত কী ছিল? (What did Marsilio think of law and law-givers?)

৪। চার্চ এবং ধর্মযাজক সম্পর্কে মারসিলিও'র বক্তব্য তুলে ধর। (Describe Marsilio's views on the church and clergy.)

৫। রাষ্ট্রচিন্তায় মারসিলিও'র অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss Marsilio's contribution to political thought.)

মেকিয়েভেলি

MACHIAVELLI

(১৪৬৯—১৫২৭)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকপাল ছিলেন নিকোলো মেকিয়েভেলি। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে প্লেটো, এরিস্টটল, হব্‌স, লক ও রুশোর মতো তাঁরও রয়েছে বিশিষ্ট স্থান এবং অবদান। সাধারণভাবে তাঁকে বলা হয় সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তাবিদ ('The first modern political thinker') এবং তিনিই আধুনিক যুগের প্রবক্তা। রাষ্ট্রনীতি, শাসন পদ্ধতি ও কূটনীতির বিশাল ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ইতালির যে কয়জন সুধী সর্বজন পরিচিত, মেকিয়েভেলি তাঁদের অন্যতম। তিনি কবিগুরু দাঁন্তে অপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ নন। তাঁর মত ও পথকে অনেকেই জঘন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কে অস্বীকার করবে যে, ষোল শতকের মেকিয়েভেলির নীতি বিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছে। তিনি স্বদেশে নিগৃহীত হয়েছেন, বিদেশেও নৈতিকতাবর্জিত পাষণ্ড বলে চিহ্নিত হয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মনীষা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তাঁর জীবনী
His Life History

১৪৬৯ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫২৭ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে একজন অখ্যাত ব্যক্তির মত অবহেলিতভাবে ফ্লোরেন্সের সান্তাক্রুস গীর্জার প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁর মনীষা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং আঠার শতকে তাঁর সম্মানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে গভীর শ্রদ্ধাভরে নিম্নলিখিত শব্দগুলো উৎকীর্ণ করা হয় ঃ **"এই পুরুষ সিংহের জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়"**।

অনেকেই তাঁকে 'শয়তানের অবতার', 'অমঙ্গলের প্রতীক', 'অসত্যের নমুনা'-বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর যে ছবি আমরা পেয়েছি তা ধূলিমলিন, কালিমালিপ্ত। কেউ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে বা কাউকে প্রতারণা করে বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তখন তাকে মেকিয়েভেলির ভাবশিষ্য বলে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং তাঁকে জানার ও তাঁর মতবাদের সাথে পরিচিত হবার আগ্রহ সকলের।

তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ও মানব চরিত্র সম্পর্কে ধারণা
His Political Thought and his Ideas on Human Nature

রাষ্ট্রতত্ত্বে তাঁর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। প্লেটোর মত তিনি কোন নতুন রাষ্ট্রীয় দর্শনের জন্ম দেন নি বা কার্ল মার্কসের মত সমাজের জন্য কোন নতুন নীতি উদ্ভাবন করেন নি। তিনি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যক্ষম করার মানসে কতকগুলো বাস্তব পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো থেকে তার রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় মেলে। তাঁর গ্রন্থগুলো, বিশেষ করে 'দি প্রিন্স'

(The Prince,), 'ডিসকোর্সেস' *(Discourses on the first ten books of Titus Livius)*, **'আর্ট অব ওয়ার'** *(Art of War)* শাসনব্যবস্থার পর্যালোচনাস্বরূপ। তাঁর মতে, রাজনীতি হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। শাসক কীভাবে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন এবং কিভাবে ক্ষমতার স্থায়িত্ব বিধান করতে পারেন এ প্রসংগে তিনি শাসককে পরামর্শ দিয়েছেন। নিম্নে তার পর্যালোচনা রয়েছে।

(এক) শুরুতে তিনি মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। মানব প্রকৃতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি রাষ্ট্রতত্ত্বের বিশাল সৌধ নির্মাণ করেন। মেকিয়েভেলি বিশ্বাস করতেন, "মানুষ ইতর হয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানুষের কোন সহজাত সততা নেই। মানুষ দুর্বলতা, নির্বুদ্ধিতা এবং কপটতার এক সংমিশ্রণ। ফলে প্রকৃতিগতভাবে সে হয় কোন সুচতুর ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হবে, না হয় কোন ক্ষমতাদর্পি শাসকের কবলিত হবে"। তিনি মানুষকে বর্ণনা করেছেন "অকৃতজ্ঞ, চঞ্চল, প্রতারক, কাপুরুষ ও লোভাতুর হিসেবে" ('Ungrateful, fickle, deceitful, cowardly and avaricious')।[১] মানুষ শুধুমাত্র ভয়-ভীতির প্রবণতা, ক্ষমতার মোহ ও আত্মস্বার্থের টানে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। বাধ্য না হলে তারা কোন ভাল কাজ করতে উদ্যত হয় না।

(দুই) এ প্রেক্ষিতে শাসকের কাজ বড় জটিল। শাসককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ মাত্রই খারাপ এবং সুযোগ পেলেই তারা মন্দ প্রবণতা দ্বারা চালিত হবে। মানুষের জীবন সংগ্রামে তারা চায় ক্ষমতা এবং সম্পদের অধিকার। মেকিয়েভেলি মনে করতেন, সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নেই। অত্যন্ত হতাশার সাথে তিনি ঘোষণা করেন, "কোন ব্যক্তি বরং তার পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করবে, কিন্তু পিতৃ সম্পত্তির দখলকারীকে ক্ষমা করবে না" ("A man rather forgives the murderer of his father than the confiscator of his patrimony')। সুতরাং তাঁর মতে, সরকারের জন্ম হয়েছে মানুষের দুর্বলতা ও মন্দ প্রবণতা থেকে। মানুষ সরকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে, কারণ তারা অন্যের অত্যাচার ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। সুতরাং শাসকের একমাত্র লক্ষ্য নিজেকে আরও প্রবল ও প্রতাপশালী করা, যার মাধ্যমে তিনি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন।

(তিন) এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাসককে হতে হবে কর্মদক্ষ এবং স্বার্থপর। কোন আদর্শ বা নৈতিকতার উপর তার নির্ভর করা উচিত নয়। একজন বিজ্ঞ রাষ্ট্রপরিচালক চাইবেন লোকে তাকে ভয় করুক। মানুষ কেবলমাত্র একটি অস্ত্রের দ্বারাই সংযত হয় এবং তা হলো ক্ষমতা। ক্ষমতা থেকে জন্মলাভ করে ভীতি। এবং শৃঙ্খলাবিধানে প্রীতি অপেক্ষা ভীতিই অনেক বেশি কার্যকর। মেকিয়েভেলি বলেন, "পুরাতন হোক আর নতুন হোক, প্রত্যেক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো উত্তম আইন এবং সুগঠিত বাহিনী। যেখানে সুগঠিত বাহিনী নেই, সেখানে উত্তম আইন কার্যকরী হয় না। কিন্তু যেখানে সুগঠিত বাহিনী রয়েছে, সেখানে উত্তম আইন-আপনা-আপনি কার্যকর হয়"।

(চার) রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে এমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কোন চিন্তাবিদ এর পূর্বে সাহসী হননি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার বিধানকে এত হেয় প্রতিপন্ন করতে কেউ এতদূর অগ্রসর হন নি। তাঁর মতে, মানুষ যদি প্রকৃতিগতভাবে নীচ হয় এবং যুগে যুগে যদি তা অপরিবর্তিত থাকে, তবে এর সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং প্লেটো ও এরিস্টটল যেমন সঠিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে মানব মনকে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছেন অথবা কম্যুনিস্টরা যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবেশের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক মন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, মেকিয়েভেলি তা অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানবের অন্তর্নিহিত নীচতাকে শুধুমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা চলে। ফলে সরকারের পদ্ধতি বল প্রয়োগের পদ্ধতি।

---

১ Niccolo Machiavelli, *The Prince*, Chapter, XVI.

(পাঁচ) এ প্রসঙ্গে তিনি দ্বিবিধ পথের সন্ধান দিয়েছেন। এদের একটি আইনের মাধ্যমে এবং অপরটি বল প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর হয়। প্রথমটি প্রযোজ্য মানুষের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়টি প্রযোজ্য পশুর ক্ষেত্রে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, প্রথমটি প্রায় ব্যর্থ হয়। তাই শাসককে দুটি পন্থার যথার্থ প্রয়োগ করতে হবে। প্রাচীন লেখকেরা রূপকের মাধ্যমে শাসকদের এ শিক্ষাই দিতেন। অন্য কথায়, নিজেকে বাঁচাতে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য শাসককে মানব ও পশু এ দু-এরই গুণ আয়ত্ত করতে হবে।

(ছয়) অপরপক্ষে পশুর মধ্যে রয়েছে দ্বিবিধ গুণ। একটি তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি বা ধূর্ততা এবং অপরটি দৈহিক বল। ফলে শাসককে পশুর গুণ আয়ত্তে আনতে হলে তাকে শৃগাল ও সিংহের অনুকরণ করতে হবে। কোন সুচতুর ব্যক্তি জঙ্গলে খোয়াড় পাতলে সিংহ অসহায় হয়ে পড়ে। আবার নেকড়ের সামনে শৃগালও বড় অসহায়। সুতরাং জঙ্গলে খোয়াড় চেনার জন্য শাসককে শৃগালের মত ধূর্ত হতে হবে ও নেকড়ে তাড়াবার জন্য সিংহের মত বলবান হতে হবে ("A prince should combine the qualities of a fox and a lion")।

(সাত) শাসকের শ্রেষ্ঠতম কাজ রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং তার উন্নতিবিধান। এর জন্য যে কোন পথ সম্মানজনক এবং সমর্থনযোগ্য। তাঁর মতে, 'রাষ্ট্রের যুক্তি' (reasons of state) নৈতিকতার যুক্তি অপেক্ষা অনেক মূল্যবান। প্রয়োজন হলে নৈতিকতার বিধানকে তিনি ভেঙ্গে চুরমার করতে পারেন, যদি রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের জন্য তা প্রয়োজন হয়। উদ্দেশ্য সৎ হলে যে কোন পথই গ্রহণযোগ্য ('End justifies the means')।

তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের পটভূমি
Background of his Political Thought

তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের পটভূমি সম্যকরূপে অনুধাবনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। প্লেটো, এরিস্টটল, হব্‌স ও লকের ন্যায় তিনিও ছিলেন সেই সময়ের সৃষ্টি (Child of his time) এবং পরিবেশের প্রবক্তা (spokesman of circumstances)। তিনি নিম্নলিখিত ঘটনারাজি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন ঃ **(এক)** খণ্ডছিন্ন ইতালির বিশৃঙ্খল এবং অধঃপতিত অবস্থা; **(দুই)** সমগ্র ইউরোপে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; **(তিন)** রেনেসাঁর উত্তাল তরঙ্গ, এবং **(চার)** রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। তখনকার ইতালীর অবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ

(এক) গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের ন্যায় সমগ্র ইতালি জুড়ে ছিল কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র। ভেনিস এবং ফ্লোরেন্সের ন্যায় কতকগুলো ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী নগর এবং অধিকাংশ ছিল একনায়কদের শাসনাধীনে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই খণ্ডছিন্ন রাষ্ট্রগুলোকে কেন্দ্র করে সর্বক্ষণ লেগে থাকত রাজনৈতিক কোন্দল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৈদেশিক ক্ষেত্রে ছিল বিদেশী শক্তিগুলোর শিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ষোল শতকের প্রথম দিকে ইতালিতে খানিকটা স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসে এবং কয়েকশত নগর-রাষ্ট্রের বদলে ইতালিতে জন্ম হয় পাঁচটি রাষ্ট্রের। এগুলো ছিল নেপলস, রোমান ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্রস্থল ভ্যাটিকান রাজ্য, মিলান, ভেনিস এবং ফ্লোরেন্সের গণপ্রজাতন্ত্র। এই পাঁচটি রাষ্ট্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী জার্মান, স্পেন ও ফ্রান্সের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ আয়তন বৃদ্ধিতে মনোযোগী ছিল। ইতালি ছিল মানচিত্রে, কিন্তু বাস্তবে তার অবস্থা ছিল দুঃখজনক। মেকিয়েভেলি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর দেশভক্ত। তিনি ভাবতেন, ইতালি সুসংহত না হলে যে কোন সময়ে পরপদানত হতে পারে। তিনি অনুভব করেন অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, প্রতিরক্ষার অভাব ছিল ইতালির দুঃখের কারণ। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন, ইতালি চায় এমন একজন শাসক যিনি হবেন পরম পরাক্রমশালী। প্রয়োজন বোধে তিনি হবেন শৃগালের মত ধূর্ত ও সিংহের মত বলবান, এবং স্বীয় কার্যপ্রণালীতে তিনি কোন নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না।

(দুই) রেনেসাঁ ছিল এমন একটি আন্দোলন যা মেকিয়েভেলির চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রেনেসাঁ কথার অর্থ জ্ঞান ও সংস্কৃতির পুনর্জন্ম (re-birth)। প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিতদের জ্ঞানভাণ্ডার মুসলিম মনীষীদের মাধ্যমে ইউরোপে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। তের থেকে পনের শতকে ইতালিতে এই আন্দোলনের প্রাণবন্যা প্রবাহিত হয় তীব্র বেগে। এই ধারা মানুষকে নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে। চার্চের প্রতি মানুষের বিশ্বাস শিথিল হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও দেশপ্রেম প্রাণ পায়। এমনি পরিবেশে মেকিয়েভেলি যে চার্চের বিরুদ্ধে লিখবেন এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। তিনি যুক্তি দেখালেন, ইতালির মধ্যখানে অবস্থিত ভ্যাটিকান চার্চ অবস্থিত থেকে চক্রান্তের জাল বুনে চলেছে। অতীতে সে রাজত্ব করেছে। এখন তার দিন শেষ। ইতালির গৌরবের জন্য প্রয়োজন হলে ভ্যাটিকানকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে হবে।

(তিন) তখন ইউরোপের সর্বত্র নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় শুরু হয়েছে। স্পেনে এরাগন ও ক্যাস্টাইলের সম্মিলন ঘটে। ইংল্যান্ডে টিউডরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের রাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে চার্চের অবস্থিতি। রাজা দয়া করে যেটুকু স্বাতন্ত্র্য বা অধিকার চার্চকে দিলেন তাই এর সম্বল। মেকিয়েভেলি তা লক্ষ্য করেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন যে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী যে রাজা তার হস্তে সব ক্ষমতা তুলে না দিলে ইতালির মুক্তি নেই।

(চার) তাঁর জীবনের কয়েকটি তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিও আমরা তাঁর চিন্তাধারায় দেখতে পাই। তিনি শুধুমাত্র চিন্তাবিদই ছিলেন না, বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন সময়ে নিজ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি অনুভব করেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রাচুর্য না থাকলে রাজকর্মচারী অথবা নাগরিক কারো সম্মান বাড়ে না, বরং শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নিকট সর্বদা ছোট হয়ে থাকতে হয়।

এ সকল কারণে তিনি সর্বদা অনুভব করতেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতাই হলো মৌল বিষয় এবং এ জন্য শাসককে হতে হবে পরাক্রমশালী। প্রয়োজনবোধে শাসক ন্যায়নীতি বর্জন করেও নিজের এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধান করবেন।

মেকিয়েভেলি : আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ

Machiavelli : The First Modern Political Thinker

মেকিয়েভেলি ছিলেন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা। তিনি ছিলেন আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী যেন রাষ্ট্রচিন্তাকে মধ্যযুগীয় গহ্বর থেকে উদ্ধার করে।

(এক) বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা করলে আমরা একে মোটামুটি চারটি খাতে প্রবাহিত দেখতে পাই। **প্রথমত**, গ্রীকদের রাষ্ট্রচিন্তা, **দ্বিতীয়ত**, মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা; **তৃতীয়ত**, আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা ও **চতুর্থত**, সাম্প্রতিক রাষ্ট্রচিন্তা। গ্রীকদের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা নগর-রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং গ্রীক মানসিকতার যুক্তিবাদী বৈশিষ্ট্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। মধ্যযুগে মানবের মন প্রভাবিত হয় মূলত দুটি সূত্রের দ্বারা। তাদের একটি পোপ এবং অপরটি সম্রাট। এ দু ধরনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশ্বজনীন সমাজের ধারণা এবং অপরটি খ্রিস্টীয় চার্চকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারীরূপে স্বীকৃতি। কিন্তু মেকিয়েভেলি রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রবক্তা। এ নতুন চিন্তাসূত্রের প্রধান উপাদান ধর্মনিরপেক্ষতা। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মৌলিক নীতি ছিল ঐশ্বরিক বিধি-বিধানের নীতি। কর্তৃপক্ষ ছিল ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কোন পৃথক সত্তা ছিল না। সকলই ধর্মনীতি তথা খ্রিস্টীয় চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বলা হয়ে থাকে, মধ্যযুগীয় রাজনীতি তত্ত্বে 'রাজনীতি' ছিল না এবং 'তত্ত্ব'ও ছিল না। তা ছিল অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির সংমিশ্রণ। সবকিছুই আবার ধর্মতত্ত্বের আশ্রয়ে এবং চার্চের ক্রোড়ে লালিত হতো। তত্ত্ব বলতে আমরা যা বুঝি, তাও মধ্য যুগে ছিল না। যা ছিল তা শুধুমাত্র ঐশ্বরিক বিধান। ষোল শতকের পর থেকে শাসন ব্যবস্থা ধর্মনীতি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। চার্চ ও রাষ্ট্র দুই-ই স্বতন্ত্র পরিবেশে গড়ে উঠতে লাগল। মেকিয়েভেলি সর্বপ্রথম এই সুরের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শাসকের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পন্থা প্রয়োজন তা সম্মানজনক।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা নীতিসম্মত, শাসকের নিকট তা নীতিসম্মত নাও হতে পারে। যেখানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সেখানে ন্যায়-অন্যায়, মানবতা বা নিষ্ঠুরতা অথবা লজ্জা বা গৌরবের কোন বন্ধন থাকা উচিত নয়। দেশের সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে কোন নীতিই উৎকৃষ্ট।

(দুই) আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার আর একটি সূত্র ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ। মেকিয়েভেলি ক্ষমতাকে এক বিশিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তিনি ক্ষমতা অর্জন, ক্ষমতার সংরক্ষণ ও ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধনের পন্থা নির্দেশ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্র থেকে পৃথক করে দেখেন এবং রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র এক মূল্যবোধের সংস্থা ("autonomous system of values") হিসেবে দাঁড় করান। এভাবে তিনি রাষ্ট্রের যুক্তির (reasons of state) তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। রাষ্ট্রের যুক্তি তাঁর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপক বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন খণ্ডছিন্ন ইতালিকে একত্রিত করতে এবং ইতালিবাসীদের সম্মান বৃদ্ধি করতে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই ধারা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

(তিন) আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার আর একটি বৈশিষ্ট্য জাতি রাষ্ট্রের মতবাদ (nation state)। জাতীয়তাবাদ আজ সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ। মধ্যযুগে এই মতবাদ ছিল অজ্ঞাত। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার মধ্যমণি ছিল বিশ্বজনীনতা। কিন্তু ষোল শতকে জাতি রাষ্ট্রের মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং মেকিয়েভেলি ছিলেন তার অন্যতম পুরোহিত। বিশ্বসমাজে ইতালিকে বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখতে এবং ইতালির অধিবাসীদের গৌরববোধে সঞ্জীবিত করতে তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন। 'দি প্রিন্স' গ্রন্থের ভূমিকায় যা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা জাতীয়তাবাদের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। তিনি তাঁর 'দি প্রিন্স' গ্রন্থের ভূমিকায় এমন একজন রাজা বা শাসকের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন যিনি তাঁর ক্ষমতা বলে ইতালিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেন এবং ইতালিকে এক সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন।

মেকিয়েভেলি এবং নৈতিকতা

মেকিয়েভেলি রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিকতা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছেন এবং মধ্যযুগের অতল গহ্বর থেকে তিনি রাষ্ট্রনীতিকে আধুনিকতার আলোকে নিয়ে আসেন। এরিস্টটলের 'পলিটিক্স' গ্রন্থে এর কিছু কিছু নমুনা মিলে। রাষ্ট্র ভাল হোক আর মন্দ হোক, কীভাবে তাকে সংরক্ষণ করা যায়, এ বিষয়ে এরিস্টটলের চিন্তাভাবনা অনেকটা মেকিয়েভেলির মত। মধ্যযুগের আর একজন চিন্তা নায়কের সাথে মেকিয়েভেলির এ স্বেচ্ছাকৃত স্বতন্ত্রীকরণের মিল রয়েছে। তিনি পাদুয়ার মারসিলিও। মেকিয়েভেলি ও মারসিলিও উভয়েই পোপকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং খ্রিস্টীয় চার্চ যে ইতালির ঐক্যে বিরাট প্রতিবন্ধক, তা উভয়েই অনুভব করেছিলেন। তবে মেকিয়েভেলি আরও এক পদক্ষেপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, খ্রিষ্টীয় চার্চ অপ্রয়োজনীয়, কেননা তার নীতিমালা জাগতিক জীবনে অর্থহীন।

মেকিয়েভেলি স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। তাঁর হস্তে দুই এর ব্যবধান সম্পূর্ণ হয়। মানব প্রকৃতি, সরকারের বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতার বিবরণ সম্পর্কে তিনি যে মতবাদ পোষণ করতেন, তাই এর মূলে কাজ করেছে। মেকিয়েভেলি মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ পরিত্যাগ করে ঘোষণা করেন, রাষ্ট্র কিছু অর্জনের কোন উপায় বিশেষ নয়, রাষ্ট্র উপেয়। রাষ্ট্র যে ক্ষমতার প্রতীক, তা তিনি বিভিন্নভাবে বিবৃত করেন। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় শক্তির অর্জন, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি বিষয়ে শাসককে উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য শাসক যে পন্থা অবলম্বন করবেন তা সম্মানজনক ও সমর্থনযোগ্য।

তাঁর নীতি-নিরপেক্ষতার আর একটি দিক হলো খ্রিস্টধর্মে তাঁর অবিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের কোন পারলৌকিক লক্ষ্য নেই। মানব জীবনের পরিপূর্ণতা আসে এই পৃথিবীতে। মহত্ত্ব, ক্ষমতা,

খ্যাতি প্রভৃতি গুণ মানুষকে অমরত্ব দান করে। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন ঐশ্বরিক বিধানের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার জন্য নৈতিকতার বেড়াজালে তিনি শাসককে আবদ্ধ রাখেন নি। অবশ্য তাঁকে ধর্মবিরোধী বলা ঠিক নয়। তিনি রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অবতারণা করেন। তিনি নৈতিকতার দুটি মান রচনা করেন (double standard of morality)। একটি নাগরিকদের জন্য আর অপরটি শাসকের জন্য। তাঁর মতে, ক্ষমতাই সবকিছু ঠিক করবে (might is right)। এর কারণ ছিল দুটি ঃ **(এক)** রাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম সামাজিক সংস্থা। রাষ্ট্র সামাজিক মঙ্গলের ধারক ও বাহক। তাই 'রাষ্ট্রের যুক্তি' এত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে আনা যায় না। রাষ্ট্রের লক্ষ্য মহৎ। তাই এর কাজের বিচার হবে সততার ভিন্ন মানদণ্ডে। **(দুই)** মানব প্রকৃতি নীচ। নৈতিকতার শাসনদণ্ডে মানবকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়।

মেকিয়েভেলিকে অবশ্য নৈতিকতাবর্জিত এবং ন্যায়নীতির প্রতি উদাসীন চিন্তাবিদ বলা সঙ্গত নয়, যদিও যুগে যুগে মেকিয়েভেলির বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উথাপিত হয়েছে যে, তিনি ছলচাতুরী ও ক্ষমতাকে সরকারের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে নৈতিকতাকে বেছে নিয়েছেন ('government's basis on force and craft and use of immoral means for political purposes')। প্রকৃতপক্ষে, তিনি নৈতিকতা বর্জিত ছিলেন না। তিনিও প্লেটোর মত বিশ্বাস করতেন, নাগরিকদের নৈতিক মান উন্নত না হলে রাষ্ট্রের মান উন্নত হয় না। কিন্তু প্রচলিত অবস্থায় তিনি নাগরিকদের মধ্যে নৈতিকতার যে মান লক্ষ্য করেছিলেন সেই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিনি শাসককে উপদেশ দিয়েছেন সাধারণ নৈতিকতার উর্ধ্বে উঠে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। তাঁর কথায়, "জনগণ যদি সত্যই উত্তম হতো তা হলে এই উপদেশের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁরা অসৎ এবং আপনার উপর তারা আস্থাহীন। সুতরাং তাদের উপর আপনারও বিশ্বাস রাখার দরকার নেই" ("If men were entirely good this precept would not hold, but because they are bad and will not keep faith with you, you too are not bound to observe it with them")।[১]

এসব কারণে অনেক লেখক মেকিয়েভেলিকে নীতিহীন (immoral) না বলে নীতি-নিরপেক্ষ (non-moral) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক ডানিং (Dunning) মেকিয়েভেলিকে বলেছেন **"নীতি-নিরপেক্ষ, নীতিহীন নয়"** ("He is not immoral but non-moral in his politics")। অধ্যাপক স্যাবাইন অবশ্য মেকিয়েভেলিকে সম্পূর্ণরূপে নীতি-নিরপেক্ষ রূপে চিত্রিত করেন নি। তিনি বলেছেন, "তিনি (মেকিয়েভেলি) যতটুকু নীতিহীন তার চেয়ে অনেক বেশি নীতি-নিরপেক্ষ ("For the most part he is not so much immoral as non-moral")।[২]

মেকিয়েভেলির অবদান
Contributions of Machiavelli

মেকিয়েভেলির চরিত্র এবং তাঁর চিন্তাধারার সঠিক মূল্যায়ন আধুনিক ইতিহাসের এক বিস্ময়কর দিক। অনেকে তাঁকে চিহ্নিত করেন একজন নিরঙ্কুশ দুঃখবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে। কারো মতে তিনি ছিলেন আবেগময় এক দেশপ্রেমিক। কেউ বা তাঁকে জ্বালাময়ী এক জাতীয়তাবাদী হিসেবে দেখিয়েছেন। আবার কারো মতে, তিনি ছিলেন এক বিশ্বস্ত গণতন্ত্রবাদী। এ সব বর্ণনা পরস্পর বিরোধী হলেও সম্ভবত প্রত্যেকটির মূলে কিছুটা সত্য রয়েছে। অপরপক্ষে কোন একটি বর্ণনার মাধ্যমে মেকিয়েভেলি বা তাঁর চিন্তাধারার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়।

---

১. Machiavelli; *The prince,* Chapter XVIII.

২. George Sabine, *Op. Cit.* p. 339.

(এক) আসলে তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী চিন্তাবিদ। রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস গভীরভাবে অনুশীলন করে তিনি ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর বাস্তববাদ তাঁর চিন্তাধারাকে গভীরতা দিতে সক্ষম হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা ধীশক্তিসম্পন্ন চিন্তাবিদ। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার বিবর্তন ধারাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করেন। তিনি এমন সময় ঘটনাপঞ্জীর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন, যখন ইউরোপে প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছিল অতি দ্রুতগতিতে। এবং তার বদলে এক নতুন ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হচ্ছিল।

(দুই) প্লেটো, এরিস্টটল বা মার্কসের মত তিনি কোন রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন নি। তবে আধুনিককালে রাষ্ট্র যে রূপ পরিগ্রহ করেছে–জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সার্বভৌম সংস্থা, ক্ষমতার প্রতীক–রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ চিন্তা তিনিই সর্বপ্রথম করেন। আধুনিককালে রাষ্ট্রই সর্বাধিক মহৎ ও ক্ষমতাশালী সামাজিক সংস্থা এবং এর অভ্যন্তরে অন্য যে সব সংস্থা রয়েছে, তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে রাষ্ট্রই দিক নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের এ সব বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে হব্স, লক, বেন্থাম, অস্টিন ও মিলের হাতে আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই বলা হয়, বিশ্বের যে অর্ধ ডজন গ্রন্থ চিন্তাক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করেছে, মেকিয়েভেলির 'দি প্রিন্স' গ্রন্থটি তাদের অন্যতম।

(তিন) আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে মেকিয়েভেলির অবদান চিরস্মরণীয় এবং তা হলো রাষ্ট্র সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার ক্ষেত্র রচনা। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী রাষ্ট্রকে কল্পনা করা হতো এক অতি–প্রাকৃত প্রতিষ্ঠান রূপে। শাসনকর্তা ছিলেন ঈশ্বরের নিকট দায়ী এবং আইন–কানুন ছিল ঐশীবাণী। মেকিয়েভেলি ঘোষণা করেন, রাষ্ট্র এক মানবিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্র সংগঠিত। সুতরাং শাসকের উচিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা অনুধাবন করা এবং মানব মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। সম্প্রতি শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উপাদানের প্রয়োগ যে ভাবে হচ্ছে তা সর্বপ্রথম সূচিত হয় মেকিয়েভেলিতে। এ দিক থেকে মেকিয়েভেলি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিশারী।

(চার) অন্য এক ক্ষেত্রে মেকিয়েভেলির অবদান অক্ষয় হয়ে রয়েছে এবং তা জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। আন্তর্জাতিকতার এ যুগেও জাতি রাষ্ট্রের আদর্শ রয়েছে সমুন্নত। তিনি ছিলেন মূলত জাতীয়তাবাদের পথপ্রদর্শক ও দিশারী। খণ্ড–ছিন্ন শতধাবিভক্ত ইতালিকে এক সূত্রে গ্রথিত করার জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জাতীয়তার ভাবধারা উন্মেষের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর অনুসৃত পথে পরবর্তীকালে ম্যাজিনী (Mazini), গ্যারিবল্ডী (Garibaldi) ও কেভুর (Cavour) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ খণ্ড–ছিন্ন ইতালিকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে জাতি রাষ্ট্রের চিন্তা গুমরিয়ে মরেছিল, কিন্তু সামন্ততন্ত্র নস্যাৎ হবার পর, বিশেষ করে শিল্প–বিপ্লবের পর, যে চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে, তা জাতি রাষ্ট্রের তত্ত্ব। তিনি তাঁর 'দি প্রিন্স' গ্রন্থে শাসককে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন যেন জাতীয়তার কোন উপাদানকে উপেক্ষা করে তিনি রাষ্ট্রের সীমা বৃদ্ধি করতে না যান–যেমন, জনসমূহের কূলগত ঐক্য বা ভাষা ও ঐতিহ্য।

(পাঁচ) 'সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন পন্থাই উৎকৃষ্ট'–মেকিয়েভেলির এ বক্তব্য বিভিন্নভাবে সর্বযুগে সমালোচিত হয়েছে। তাই মেকিয়েভেলি হয়েছেন ধিকৃত যুগে যুগে। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য টিকে আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক জীবন্ত সত্য হিসেবে কূটনীতি ক্ষেত্রে। কে বলেছে মেকিয়েভেলি মৃত? তিনি মৃত হলেও তাঁর নির্দেশিত পথ আজ সকলের দ্বারা অনুসৃত। অতীতের দিকে না তাকিয়ে বিশ শতকের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হবে যে, মেকিয়েভেলি মৃত নয়। ১৯২২ সালের ইতালি, তিন দশকের জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখল, সমগ্র আঠারো ও উনিশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন প্রভৃতিই মেকিয়েভেলিবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু তাই নয়, বর্তমান বিশ্বে দুই পরাশক্তির রাজনৈতিক কার্যক্রম, আত্মরক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের কূটনীতি, বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিজোট গঠন প্রভৃতিও মেকিয়েভেলিবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সংক্ষেপে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আধুনিক বিশ্লেষণ, রাষ্ট্রীয় ঐক্য অর্জনের পন্থা নির্ধারণ, জাতি রাষ্ট্রের দিক নির্দেশ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বতন্ত্র মর্যাদা-এবং ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রীকরণ, জাতীয় স্বার্থে কূটনৈতিক কার্যক্রমের ব্যাপক বৃদ্ধি-এ সব ক্ষেত্রে মেকিয়েভেলির অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক কথায়, মেকিয়েভেলি তেমনি এক "রাজপুত্র যিনি মধ্যযুগের অন্ধকার গুহা থেকে রাজনীতিকে আধুনিকতার আলোতে নিয়ে আসেন"। তাই অধ্যাপক স্যাবাইন (Sabine) বলেন, 'অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদের তুলনায় মেকিয়েভেলির প্রচেষ্টাই আধুনিক রাজনৈতিক ধারণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অধিক অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। এমন কি তাঁর লেখাই সার্বভৌম রাজনৈতিক সংস্থার মত শব্দকে বর্তমানে জনপ্রিয় করেছে সর্বাধিক" ('Machiavelli more than any other political thinkers created the meaning that has been attached to the state in modern political usage. Even the word itself, as the name of a sovereign political body, appears to have been made current in the modern languages largely by his writings')।[১]

১। মেকিয়েভেলির রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে কী জান? (What do you know of Machiavelli's political thought?) [N. U. 2002]

২। মেকিয়েভেলির রাজনৈতিক মতবাদের পটভূমিকা আলোচনা কর। (Discuss the background of Machiavelli's political thought.) [D. U. '81]

৩। "মেকিয়েভেলিকে সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তানায়ক বলা হয়"-এই উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ("Machiavelli is regarded as the first modern political thinker"—Justify the statement.) [N. U. 2002, 2005, 2007]

৪। মেকিয়েভেলির নীতি নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কী জান? (What do you know of Machiavelli's separation of politics from morality?)

৫। রাষ্ট্রচিন্তায় মেকিয়েভেলির অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the contributions of Machiavelli in political thought.) [C. U. '81; D. U. '82]

৬। মেকিয়েভেলির মূল বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। মেকিয়েভেলিবাদ কী? মেকিয়েভেলিবাদের তাৎপর্য কী? (What is Machiavellism? What is the significance of Machiavellism?) [R. U. 1980]

৮। মেকিয়েভেলিবাদ কী? রাজনীতি, নৈতিকতা এবং ধর্ম সম্বন্ধে মেকিয়েভেলির ধারণা আলোচনা কর। (What is Machiavellism? Discuss Machiavelli's ideas on politics, morality and religion.) [D. U. 1983, '84]

৯। মেকিয়েভেলিকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক বলা হয় কেন? আলোচনা কর। (Why is Machiavelli called the father of modern political thought Discuss.) [R. U. 1984]

---

১. Sabine *Op. cit.* p. 351

জাঁ বোঁদা

JEAN BODIN

(১৫৩০—১৫৯৬)

১৪

জাঁ বোঁদা ছিলেন ষোল শতকের অন্যতম প্রখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় তাঁর অবদান চিরস্থায়ী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিক' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন। অধ্যাপক ম্যাক্সির (Maxey) মতে, এই গ্রন্থখানি "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম এবং প্রধান আলোচনা গ্রন্থ"। অধ্যাপক ফিগিস (Figgis) বলেন, "এটি ষোল এবং সতর শতকে লেখা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর সুবিখ্যাত গ্রন্থগুলোর পথপ্রদর্শক"। মূলত জাঁ বোঁদাকে সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার নায়ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। মেকিয়েভেলি সরকারের কলাকৌশল সম্বন্ধেই তাঁর আলোচনা সীমিত রাখেন, কিন্তু বোঁদা রাষ্ট্রতত্ত্বের উপর তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রথম প্রবক্তা। গ্রীক চিন্তায় যেমন নগর রাষ্ট্র ছিল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু, মধ্যযুগে তেমনি ছিল সর্বজনীন সমাজের ধারণা। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র হলো মৌল বিষয়বস্তু এবং জাঁ বোঁদা সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিন্তায় সকলকে সচকিত করে তোলেন।

জাঁ বোঁদার জীবনী এবং তাঁর চিন্তার পটভূমি

জাঁ বোঁদা ষোল শতকের একজন খ্যাতনামা চিন্তানায়ক। তিনি ফ্রান্সে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ আমলে ধর্মীয় উন্মত্ততা এবং নির্যাতন ছিল অনেকটা গা-সহা গোছের। ক্যাথলিক শাসকগণ প্রোটেস্ট্যান্টদের ধ্বংস করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রোটেস্ট্যান্ট শাসকগণ ক্যাথলিকদের নির্মূল করতে ছিলেন সদা উদ্যত। ধর্মক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাস ও উন্মত্ততা এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা গোটা জনসংখ্যার উপর একটি মাত্র ধর্মকে চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার উপর একটি মাত্র ধর্মকে চাপিয়ে দেয়ার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা, শান্তি ও প্রগতির পক্ষে অনুকূলও নয়, সম্ভবও নয়। বরং ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে স্বতন্ত্র করে রাষ্ট্রকে ধর্মীয় কোন্দলের উর্ধ্বে তুলে ধরার মনোভাব অনেক চিন্তাবিদের মধ্যে দেখা দেয়। জাঁ বোঁদার চিন্তাধারায় তা মূর্ত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, সত্য ধর্মের প্রচার নয়। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রয়োজন যা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষম হবে এবং পোপের কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। এই মতবাদ ফরাসী দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং জাঁ বোঁদার লেখায় তা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।

তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক হিসেবে লেখনী ধারণ করলেও তাঁর অবদান চিরস্থায়ী। তিনি মূলত রাষ্ট্রতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র এবং ইতিহাসের উপর লিখলেও সাথে সাথে শিক্ষা ও ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেও

ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী। ধর্মীয় উন্মত্ততার যুগে তিনি ধর্মীয়ক্ষেত্রে সহনশীলতার (toleration) আবেদন সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন ধর্মমতের তিনি একজন সুষম সমালোচক ছিলেন।

পদ্ধতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন আধুনিক চিন্তাবিদ। তবে এও স্মরণযোগ্য, ষোল শতক সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ছিল না। তাই ষোল শতকের চিন্তানায়ক জাঁ বোঁদা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অধ্যাপক স্যাবাইনের (Sabine) কথায়, "পুরাতন এবং নতুনের সংমিশ্রণ"। একদিকে যেমন তিনি ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে রাষ্ট্র এবং নীতিকে স্বতন্ত্র রূপে দেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি ভূত-প্রেত ও অশরীরী দৈত্য-দানবকেও বিশ্বাস করতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন ষোল শতকের যোগ্যতম প্রতিনিধি এবং সে কালে রাষ্ট্রচিন্তাও ছিল নতুন এবং পুরাতনের সংমিশ্রণ।

জাঁ বোঁদার রাষ্ট্রচিন্তা প্রস্ফুটিত হয় তাঁর গ্রন্থ 'রিপাবলিকের' ছয়টি অংশের মধ্যে। তাছাড়া, অন্য একটি গ্রন্থে তিনি ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতির বিশেষ বর্ণনা দান করেছেন। তাঁর মতে, আইন ও রাষ্ট্রতত্ত্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তাকে ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে এবং দার্শনিক ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মেকিয়েভেলির বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল, তিনি দর্শনের সাহায্যে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে মার্জিত করেন নি। রাষ্ট্রকে ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে স্বতন্ত্র করেছেন সত্য, কিন্তু তা কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে পরিশোধিত হয়নি। প্লেটো এবং ম্যূর সহ অন্যান্য দার্শনিকদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের মূলে ছিল, তাঁরা রাষ্ট্রতত্ত্ব ও দার্শনিক সত্যকে ইতিহাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তিনি তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছেন, কীভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং কিভাবে জনগণের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তবে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে তাঁর যে অবদানের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন তা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিবরণ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি
Origin of the State

জাঁ বোঁদার মতে রাষ্ট্র হলো এমন একটি সংঘ, যা পরিবারসমূহ এবং তাদের সম্পত্তি সহযোগে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র ব্যক্তির সংঘ থেকে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক উপাদান ব্যক্তি নয়। এর মৌলিক উপাদান পরিবার। এই সংঘ একটি সর্বোচ্চ শক্তি দ্বারা যুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বোঁদার এ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

প্রথমত, রাষ্ট্র পরিবারসমূহ এবং তাদের সম্পত্তির একটি সংঘ। ব্যক্তি এখানে মুখ্য নয়। ব্যক্তি পরিবারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, এ সংঘ মানুষের স্বভাবের বা সহজাত প্রবৃত্তির ফলস্বরূপ নয়। রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে বল বা জোরের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয়ত, এ সংঘ সর্বোচ্চ ক্ষমতার দ্বারা শাসিত হয়। এই সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা বলে উল্লেখ করেন। তাই সমাজের অন্যান্য সংঘ থেকে রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে। তাই রাষ্ট্র গঠনের মৌল বস্তু। এর অভাবে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা দ্বারা শাসিত হলেও এর মূলে রয়েছে যুক্তির প্রাধান্য। বল বা জোর এর প্রধান উপাদান। তবে বল বা জোর একমাত্র উপাদান নয়। রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো এক প্রকার নৈতিকতা বা প্রাকৃতিক আইন যা যুক্তিসঙ্গত। এ যুক্তি রাষ্ট্রকে একটি দস্যুদল থেকে পৃথক করে।

বোঁদার মতে সার্বভৌমত্ব
Sovereignty according to Bodin

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জাঁ বোঁদা যা বলেছেন তা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজন্য বোঁদা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্লেটো এবং এরিস্টটল প্রমুখ খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ ধারণা উপস্থাপিত করেন নি। রাষ্ট্রের মধ্যে যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার কথা এরিস্টটল বলেছেন তা সার্বভৌমত্ব নয়, কেননা তা বিভিন্নভাবে ছিল সীমিত এবং তা আইনের উৎস ছিল না। মধ্যযুগেও এ ধারণা বিকশিত হয়নি, কেননা মধ্যযুগে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দ্বিবিধ উপাদানে সীমাবদ্ধ ছিল। **প্রথমটি** ছিল চার্চ এবং পোপের কর্তৃত্ব, এবং **দ্বিতীয়টি** সামন্তবাদের প্রভাব। ফলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ছিল না। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে এ ধারণা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশও ছিল না। কিন্তু ষোল শতকে এর উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে রাজন্যবর্গ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন এবং তাদের শাসনাধীনে রাষ্ট্র সুসংহত হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন রাষ্ট্রের এলাকা ঐক্যবদ্ধ হয়, অন্যদিকে তেমনি সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্বীকৃত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। রাজা চার্চ এবং পোপের ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে স্বীয় কর্তৃত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এ পরিবেশে সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী হয়। বোঁদা চেয়েছিলেন ধর্মতত্ত্ব এবং সামন্ততন্ত্রের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে এবং রাষ্ট্রের অধিকারে যে একটি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আছে এবং যা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য পালনীয় তা প্রমাণ করতে। তাই তিনি সার্বভৌমত্ববাদের ধারণা দান করেন।

তিনি সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের মধ্যে নির্দেশ দানকারী, নিরঙ্কুশ এবং স্থায়ী ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেন এবং নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ক্ষমতা বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথায়, "সার্বভৌমত্ব নাগরিক এবং প্রজাদের উপর আইনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা" ('Sovereignty is the supreme power over citizens and subjects unrestrained by laws')[১]। তাঁর বর্ণিত সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের এক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সকল ব্যক্তি এবং সংঘের উপর প্রযোজ্য। বোঁদা এ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বাইরে এবং ভেতরে এর সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্র কোন পার্থিব বিষয়ে পোপ বা চার্চের কোন কর্তৃত্বের অধীন নয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সকল সংঘ বা সামন্ত প্রভুদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকারী। এ অর্থে রাষ্ট্র বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সকল নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

তৃতীয়ত, এ সার্বভৌম ক্ষমতা চিরস্থায়ী। সার্বভৌমত্ব সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। যদি কোন ব্যক্তি বা সংঘ কিছুদিনের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয়, তা হলে সেই ব্যক্তি বা সংঘ সার্বভৌম হবে না। যে রাজা জীবনব্যাপী নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই সার্বভৌম।

চতুর্থত, সার্বভৌমত্ব আইনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ('unrestrained by laws')। যদি সার্বভৌম রাজা কোন আইন প্রণয়ন করেন, তা হলে তিনি সেই আইনের দ্বারা আবদ্ধ হবেন না। সার্বভৌম শক্তি সকল আইনের উৎস, কিন্তু সেই শক্তি আইনের অধীন নয়। যদি তা আইনের অধীন হয়, তবে তা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নয়।

পঞ্চমত, সার্বভৌমত্ব হলো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। যে সব আইনের দ্বারা সাধারণ বিষয়গুলো পরিচালিত হয় এবং জনগণের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের একমাত্র উৎস। তাঁর মতে, আইন উর্ধ্বতম মানবীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং তা শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বলবৎ হয়।

---
১. Jean Bodin, *De Republica;* Chapter one, p-2

তবে বোঁদা সার্বভৌমত্বের যে রূপরেখা অঙ্কন করেন, তা অসীম ছিল না। তিনি এ সার্বভৌম ক্ষমতার কয়েকটি সীমারেখা স্বীকার করেন। অধ্যাপক এলেনের (J. W. Allen) মতে, "জাঁ বোঁদা নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন সার্বভৌমত্বের কথা ভাবেন নি। তাঁর চিত্রিত সার্বভৌমত্ব আইনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল না" ("It appears, after all, that Bodin did not conceive of sovereignty as necessarily involving strictly unlimited power, even in law")।

প্রথমত, বোঁদার মতে, রাজা সকল আইনের উর্ধ্বে নন। ঐশ্বরিক আইন (law of God) এবং প্রাকৃতিক আইন (law of nature) রাজার কার্যাবলীকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। যদি কোন রাজা ঐশ্বরিক আইন অথবা প্রকৃতির বিধান উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করেন, তা হলে তিনি হবেন স্বৈরাচারী এবং তার শাসন হবে অবৈধ।

দ্বিতীয়ত, তিনি স্বীকার করেন যে, শাসনতান্ত্রিক আইনকে (constitutional law)উপেক্ষা করাও কোন রাজার উচিত নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে কতকগুলো শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকে এবং রাজা সেগুলোর অধীন। খেয়াল-খুশিমত তিনি সেগুলোর পরিবর্তন করতে পারেন না।

তৃতীয়ত, বোঁদার মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলংঘনীয়তা রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। তিনি বলেন, মালিকের সম্মতি ব্যতীত সার্বভৌম রাজা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্পর্শ করতে পারেন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বোঁদা অলংঘনীয় মনে করেছেন। এ ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property) অধিকারে রাজার কোন হস্তক্ষেপ চলবে না।

চতুর্থত, বোঁদার মতে, রাজা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে তা ভঙ্গ করতে পারবেন না। এ চুক্তি (contractual law) সার্বভৌমকে খর্ব করে।

সর্বশেষে, রাজা বা শাসকের কর ধার্য করার যে সীমারেখা তাও তিনি লংঘন করতে পারবেন না। এ প্রসংগে তিনি তৎকালীন ফ্রান্সে প্রচলিত সাম্রাজ্যের বিধিবিধানের *(Leges imperii)* উল্লেখ করেন। তা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় মৌলিক। তাঁর মতে, পরিবারের সমষ্টি রাষ্ট্র। পরিবারের উপর কর ধার্য পরিবারকে ধ্বংস করার সামিল। তাই রাজা এ কাজ করতে সক্ষম নন।

এ সকল কারণে বোঁদার সার্বভৌম তত্ত্ব অসম্পূর্ণ, সঙ্গতিহীন ও সীমিত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বোঁদার অবদান

Contributions of Jean Bodin

জাঁ বোঁদা নিঃসন্দেহে একজন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রচিন্তানায়ক ছিলেন না। তাঁর রচনাভঙ্গী, বিন্যাস এবং পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর যুক্তিতেও ছিল অনেক ত্রুটি। তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতিও অত্যন্ত নিটোল ছিল না। তথাপি বলা যেতে পারে, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় তাঁর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। অধ্যাপক মারে (Murray) তাই জাঁ বোঁদার রচনার প্রশংসা করে বলেন, তিনি ছিলেন এক নতুন যুগের প্রবর্তক। তাঁর গ্রন্থ 'রিপাবলিক' প্রকাশিত হবার পর থেকে তা প্রচুরভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথমত, জাঁ বোঁদা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতির সূত্রপাত করেন এবং তা ছিল আংশিক ঐতিহাসিক এবং আংশিক তুলনামূলক। এরিস্টটল সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, কিন্তু মধ্যযুগে তা বিস্মৃত হয়ে যায়। মেকিয়েভেলি অবশ্য এর প্রচলনে অনেক সাহায্য করেন, কিন্তু এ

পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ হয় জঁা বোঁদার হাতে। তাই তাঁকে অনেকে বলেন ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আইন শাস্ত্র অধ্যয়নের অগ্রদূত।

দ্বিতীয়ত, জঁা বোঁদাই সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্ব মতবাদের উপস্থাপক এবং বিশ্লেষক। এ অবদান বোঁদার মৌলিক অবদান। তিনিই সর্বপ্রথম জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন। জাতীয়তাবাদ এবং সার্বভৌমত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং বর্তমানে রাষ্ট্রচিন্তা এ দু ধারণার কুঠরীতে বন্দিনী। এ ধারণার জনক হিসেবে জঁা বোঁদার অবদান সত্যই অনন্য। অবশ্য তাঁর সার্বভৌমিকতাবাদ অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ, বিশেষ করে তিনি যেখানে তার সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর যুক্তিধারা এবং চিন্তাসূত্র আধুনিকতার আলোকে উজ্জ্বল।

১। জঁা বোঁদার রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার পটভূমি আলোচনা কর। (Discuss the background of Jean Bodin's political thought.)

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন? (What did he say about the origin of the state?)

৩। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জঁা বোঁদার বক্তব্য কী ছিল? (What were the views of Bodin on state sovereignty?)

৪। রাষ্ট্র চিন্তায় জঁা বোঁদার কী অবদান ছিল? (What were the contributions of Jean Bodin to political thought?)

টমাস হবস
THOMAS HOBBES
(১৫৮৮—১৬৭৯)

১৫

বৃটেনের বহু চিন্তাবিদ তাঁদের উন্নত চিন্তাধারার সোনালী ফসলে চিন্তাক্ষেত্রের গোলা ভরেছেন। কিন্তু হবসের ন্যায় এমন সূক্ষ্মজ্ঞান, যুক্তিপূর্ণ বিচারবুদ্ধি ও বাস্তব চিন্তাধারা অতি অল্প সংখ্যক চিন্তানায়কের মধ্যেই মেলে। সতর শতকে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তিধারা চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর জড়বাদ (materialism) সামাজিক সমস্যা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন পথের নির্দেশ দেয়। তাঁর প্রণীত 'লেভায়াথান' (Leviathan) গ্রন্থ রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সংযোজন।

তাঁর জীবনী
His Life Sketch

হবসের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের সঠিক মূল্যায়নের জন্য তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সাথে আমাদের পরিচিত হতে হবে। তিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের মাম্‌সবারীতে (Malmesbury) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান যাজকের সন্তান এবং বাইবেল সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু কোন দিন তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। প্রথমে তিনি ছোট শহর মাম্‌সবারীতে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে অক্সফোর্ডে শিক্ষা গ্রহণ করেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর তিনি উইলিয়ম ক্যাভেনডিশের উত্তরাধীকারীর গৃহশিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। এ উত্তরাধীকারীকালে আর্ল অব ডেভনশায়ার (Earl of Devonshire) হয়েছিলেন। ক্যাভেনডিশ পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সারাজীবন স্থায়ী হয়েছিল এবং এ ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এ অভিজাত পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংযোগে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির গতিধারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ লাভ করেন। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন লেখক ফ্রান্সিস বেকন (Bacon) ও ডঃ জনসনের (Johnson) সংস্পর্শে আসেন। তাঁর ছাত্রের সাথে শিক্ষা সফরে ইউরোপ ভ্রমণের জন্য তিনি তিনটি সুযোগ লাভ করেন- ১৬২০, ১৬২৮ এবং ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে। এই ভ্রমণগুলো তাঁর চিন্তাধারার গতিপথ নির্ধারণে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তিনি বিদেশে ডেকার্ট (Descartes), গ্যালিলিও (Galilio) প্রমুখ চিন্তানায়কদের সংস্পর্শে আসেন।

ইংল্যাণ্ডে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন টমাস্ হবস্ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে পলায়ন করেন এবং দীর্ঘ এগার বছরকাল তিনি নির্বাসিত জীবন-যাপন করেন। প্যারিসে নির্বাসিত রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে কেন্দ্র করে রাজার পক্ষ সমর্থনকারী যে দলটি গড়ে ওঠে, তাতে তিনি যোগদান করেন। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'ডি সাইভ' *(De Cive)* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের পূর্বাভাষস্বরূপ। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেভায়াথান' *(Leviathan)* প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটায়। তিনি সুদৃঢ় রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন এবং রাজার অনুকূলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু এ গ্রন্থে এমন কিছু ছিল, যা রাজতন্ত্রীদেরকেও সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তিনি রাজার

ঐশ্বরিক অধিকারকে নস্যাৎ করেন, এমনকি পোপের পদমর্যাদার উপর চরম আঘাত করেন। এসব কারণে হব্‌স ফরাসী কর্তৃপক্ষের কোপানলে পতিত হন এবং ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স পরিত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অন্যগ্রন্থ 'ডি করপোর' *(De Corpore)* প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'ডি হোমিন' *(De Homine)* প্রকাশিত হয়। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্রের পুনর্বাসনের সাথে সাথে তিনি রাজদরবারে সাদর সম্ভাষণ লাভ করেন। কিন্তু এই রাজানুগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তাঁর সুবিধাবাদী মনোভাবের জন্য রাজা তাঁর কার্যকলাপের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি ইতিহাস, আইন, প্রাচীন সাহিত্য ও পদার্থ বিদ্যার উপর কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে জীবন অতিবাহিত করেন। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পটভূমিকা
Background of his Political Thought

টমাস হব্‌সের জীবদ্দশায় ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে যা তাঁর চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হব্‌সের চিন্তাস্রোতের সম্যক উপলব্ধির জন্য এ সব ঘটনাবলীর সাথে পরিচিতি একান্ত প্রয়োজন। যখন প্রথম জেমস (James I) বৃটেনের সিংহাসনে আরোহণ করে রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকার তত্ত্বের (Divine Rights) উপর ভিত্তি করে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন, তখন হব্‌সের বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। স্পেনের আর্মাডার (Spanish Armada) পরাজয়ের পর বৃটেনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার হুমকীর অবসান হয় চিরদিনের জন্য। রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাজা বা রানীর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের অবসান ঘটে। ফলে প্রথম জেমসের ঐশ্বরিক অধিকারের দাবি জনসাধারণের নিকট হয়ে ওঠে অত্যন্ত বিরক্তিকর। তাঁর রাজত্বকাল কোন রকমে কেটে গেলেও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লসের (Charles I) অদক্ষ শাসন ব্যবস্থায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। পিউরিট্যান ও রক্ষণশীলদের মধ্যে ব্যবধান বৃহত্তর হয়ে ওঠে। প্রথম জেমস ও প্রথম চার্লসের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির ফলে ইংল্যাণ্ডকে অনেক ব্যয়-বহুল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। এ সবের ফলে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এভাবে পিউরিট্যান বিপ্লবের (Puritan Revolution) ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়। ফলে ইংল্যাণ্ডে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়,তা বহুদিন স্থায়ী হয়। ১৬৪২ সালে শুরু হলেও তার সমাপ্তি ঘটে ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) সাথে সাথে। হব্‌স ছিলেন এই সমগ্র উত্তেজনাপূর্ণ নাটকের দর্শক। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি দেশে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও আত্মঘাতী কলহ অবলোকন করেন তার ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দেশে শান্তি-শৃংখলা সংরক্ষণ করতে হলে বজ্র কঠিন রাজশক্তি অপরিহার্য। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সভ্য জীবনের প্রধানতম শর্ত হিসেবে এক শক্তিশালী ও স্থায়ী সরকারের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি। অন্যদিকে তিনি অনুধাবন করেছেন, এক শক্তিশালী ও স্থায়ী সরকারের জন্য প্রয়োজন জনগণের শর্তহীন আনুগত্য। স্টুয়ার্ট রাজা জেমসের তিনি ছিলেন গৃহ শিক্ষক। তাই তিনি মত প্রকাশ করেন, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা রক্ষাকল্পে সার্বভৌম রাজশক্তির হস্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা একান্ত প্রয়োজন।

হব্‌সের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ
Scientific Materialism of Hobbes

টমাস হব্‌স ছিলেন পাশ্চাত্যের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন একজন চিন্তাবিদ। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মূলে ছিল তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতি যা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Scientific Materialism) নামে পরিচিত। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সপক্ষে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন

তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা মৌলিক ছিল না। তিনি ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে সম্পূর্ণ ব্যবধান রচনা করেন তাও মৌলিক ছিল না, কেননা বোঁদা (Bodin) এবং আরও অনেকে রাজতন্ত্রের সপক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন। প্রায় একশত বছর পূর্বে মেকিয়েভেলি রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিচ্ছেদের বাণী প্রচার করেন। কিন্তু হব্‌সের পূর্বে কোন চিন্তাবিদই নিজের মতবাদকে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নি। হব্‌সের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। তিনি তাঁর মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হব্‌স রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জ্যামিতিক পদ্ধতি (geometrical system) প্রয়োগ করেন। তাকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলেন। জ্যামিতিতে কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ (axioms) ধরা হয়। এ সব স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে অনেক জটিল উপপাদ্যের প্রমাণ সহজতর হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী পথে পরবর্তী তত্ত্বটি সংস্থাপন করে স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা হয়। হব্‌স সমাজ ও মানব মনের কতকগুলো সর্বজনীন অনুভূতি ও উপাদানকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান আনয়ন করতে চেষ্টা করেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর মতে মানুষ স্বার্থপর। তাই স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা আত্মকলহ এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এগুলো তাঁর মতে স্বতঃসিদ্ধ। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাই প্রয়োজন এমন এক শক্তিশালী শাসকের যিনি প্রত্যেকের মনে ভয়ের উদ্রেক করতে সমর্থ হন।

তাঁর এই জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ হয় সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীতে বস্তু ছাড়া কোন কিছুই বাস্তব নয়। যা পদার্থ নয় তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন অংশ নয়। মানুষও যন্ত্রের মত বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা চালিত হয় এবং এ সব উপাদান হচ্ছে ভাবাবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি। এ সব উপাদানে গঠিত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁর মতে প্রয়োজন এমন এক শাসক যিনি সর্বশক্তিমান।

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মাধ্যমে টমাস হব্‌স্ যে ব্যবস্থা সংগঠন করতে উদ্যত হন তার ত্রিবিধ অংশ ছিল। প্রথমে তিনি জ্যামিতি এবং পদার্থবিদ্যার ভিত্তিতে বস্তুর বিশ্লেষণ করেন। দ্বিতীয় অংশে ছিল শরীর তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তির আলোচনা এবং সর্বশেষে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ত্রুটি যাই থাক না কেন তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং রাজনীতিকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করতে উদ্যত হন।

অবশ্য এও স্মরণযোগ্য যে, হব্‌সের প্রয়োগকৃত পদ্ধতি আধুনিককালের মানদণ্ডে বৈজ্ঞানিক নয়, কেননা তা পর্যবেক্ষণমূলক ছিল না এবং আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁর সূত্রগুলো যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে হব্‌সের প্রতি ন্যায়বিচার করার জন্য আমাদের মনে রাখা দরকার যে, হব্‌স ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সমস্ত বিজ্ঞান ছিল জ্যামিতিক মোহমন্ত্রের অধীন। তিনি এই পদ্ধতিতে তাঁর মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্য
State of Nature

হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভয়াবহ। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর ভিত্তিতে তিনি প্রকৃতির রাজ্যের এই চিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর মতবাদের মৌলিক উপাদান হলো ব্যক্তিত্ববাদ বা অহংবাদ। প্রত্যেক মানুষ আত্মকেন্দ্রিক এবং তাঁর মতে প্রত্যেকে নিজের ভাল চায়। তাই মানব চরিত্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, সব মানুষই প্রায় এমনভাবে সমান যে, জীবনে ভাল জিনিসগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে কেউ সুনির্দিষ্টরূপে অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তাই ক্ষমতা ও উত্তম জিনিস লাভের কামনায় মত্ত হয়ে মানুষ বিরামহীন এক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা, ক্রোধ প্রভৃতি মানবের আদিম ও অপরিবর্তনীয় অনুভূতি। এ সব আদিম অনুভূতির চরিতার্থে সব মানুষ তাই বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যার ক্ষমতা থাকে, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। যার ক্ষমতা অল্প, সে চতুরতা ও বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে সংগ্রাম বিরামহীনভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে। মানবের

ক্ষমতা লাভের প্রবণতা সম্পর্কে হব্‌স বলেন, "সমগ্র মানবজাতির প্রবণতা হলো ক্ষমতা লাভের প্রতিনিয়ত এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা যার সমাপ্তি ঘটে শুধু মৃত্যুতে" ("A general inclination of all mankind is perpetual and restless desire for power after power, that ceaseth only in death")।[১] একে অন্যের আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং ক্ষমতা ও চাতুর্যের দ্বারা যে নিরাপত্তা সম্ভব, তা অপেক্ষা অন্য কিছুর সম্ভাবনা সেখানে থাকে না। হব্‌সের কথায়, তাই ছিল "প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষের যুদ্ধ" ("War of every man against every man")। এ অবস্থায় কোন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না এবং অধ্যাপক স্যাবাইনের (Sabine) কথায়, "সেখানে না ছিল কোন শিল্প, নৌ-চলাচল, ভূমিকর্ষণ, প্রশস্ত অট্টালিকা,কোন সুকুমার কলা বা সাহিত্য" ("There is no industry, navigation, cultivation of the soil, building, art or letters')। যেখানে "ছিল শুধু ক্রমাগত ভীতি ও উৎপীড়নজনিত মৃত্যু ভয়"। ফলে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে "নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুতুল্য এবং স্বল্পায়ু" ("solitary, nasty, poor, brutish and shrot.")।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, হব্‌সের চিত্রিত প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের দ্বারা অঙ্কিত মানব চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র। এমন কি মধ্যযুগেও যেভাবে মানব চরিত্রের চিত্রন হয়েছে তা থেকে হব্‌সের ছবি স্বতন্ত্র। হব্‌সের অঙ্কিত প্রকৃতির রাজ্যে ন্যায়-অন্যায় বা ভাল-মন্দের কোন স্থান নেই। মানুষের প্রতি মানুষের যে সহজাত দায়িত্ব বা সহযোগিতা, তার কোন স্থান নেই এখানে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত।

এমন প্রকৃতির রাজ্যে জীবন কদর্য হয়ে ওঠে। তবে হব্‌সের মতে মানুষ যুক্তিবাদী। যুক্তির সাহায্যেই মানুষ সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হয় এবং যুক্তিই লাভ-ক্ষতি নির্ধারণে সহায়ক হয়। যুক্তিবাদের সাহায্যে মানুষ সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতার মন্ত্র গ্রহণ করতে চায়, যদি সে সহযোগিতা এক মহান শক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়। হব্‌সের মতে, এ মহান শক্তিই সার্বভৌম ক্ষমতা। তাই তিনি তাঁর গ্রন্থ 'লেভায়াথানে' বজ্রকঠিন রাজশক্তির আহবান করেন। 'লেভায়াথান' শব্দের অর্থ মরণশীল এক অতিপ্রাকৃত দৈত্য, যা কারো অধীন নয়। মানুষ প্রকৃতির রাজ্যের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বিনা শর্তে এক সার্বভৌম শক্তির উপর তার ক্ষমতা অর্পণ করে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করে।

হব্‌স কর্তৃক চিত্রিত প্রকৃতির রাজ্যের (state of nature) বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। **প্রথমত,** প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিযোগিতার যে রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার কারণ মূলত তিনটি। **(এক)** নিজেদের প্রয়োজন তথা ক্ষুধা মেটাবার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে ছিল অবিরাম প্রতিযোগিতা। **(দুই)** সকলের মধ্যে এ ভয় বিদ্যমান ছিল যে, অন্যজন তাকে ছাড়িয়ে অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। **(তিন)** যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি বা দৈহিক জোরের দিক থেকে সকলেই প্রায় সমান, তাই প্রত্যেকেই প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত হতে আগ্রহী। ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হতো প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস এবং ক্ষমতা ও গৌরব লাভের উগ্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা।[২]

যে প্রকৃতির রাজ্যে মানবের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস ও গৌরব লাভের বাসনা দ্বারা নির্ধারিত হয় সে প্রকৃতির রাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ হতে বাধ্য। **(এক)** ঐ রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। **(দুই)** ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পত্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। **(তিন)** প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধাচরণ করতে সদা প্রস্তুত। **(চার)** প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেকেই যুক্তি দ্বারা পরিচালিত।

---

১. Thomas Hobbes, *Leviathan,* Chapter II
২. Thomas Hobbes, *Leviathan* Chapter XIV

এ অবস্থায় যুক্তিবাদী মানবের পক্ষে নিশ্চিত জীবন, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং উন্নত ভবিষ্যতের জন্য একটি মাত্র কাজই যুক্তিপূর্ণ এবং তা চুক্তির মাধ্যমে এক মহাপরাক্রমশালী শাসকের নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দান।[১]

হব্‌সের প্রাকৃতিক রাজ্য বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। মানুষ যে কোন সময়ে প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করত তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, আদিম মানুষেরা পর্যন্ত কোন না কোন প্রকারের সামাজিক জীবন ও নৈতিক এক সংহতির মধ্যে কালাতিপাত করত। হব্‌সও অবশ্য বিশ্বাস করতেন না যে, মানুষ সত্যই প্রাকৃতিক রাজ্যে বাস করত। তাঁর প্রকৃতির রাজ্য ছিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের এক বিকল্প ব্যবস্থা। তবে মানুষের যে ছবি তিনি অঙ্কন করেছেন, তা যদি সত্য হয় তবে তাদের আচরণ ও কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন এক শক্তিশালী শাসক বা শাসক গোষ্ঠীর। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার শ্রেষ্ঠত্ব এখানে। তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করার একমাত্র পথ হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ তা খণ্ডন করা। প্রকৃতির রাজ্য কল্পনাপ্রসূত বলে হব্‌সের যুক্তিকে খণ্ডন করা চলে না। বরং যদি বলা হয় যে এরিস্টটলের মতানুযায়ী মানুষ সামাজিক এক জীব, তা হলে হব্‌সের আলোচনাকে অপ্রাসঙ্গিক বলা যেতে পারবে।

হব্‌সের মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি ও তাঁর প্রকৃতি
Foundation of the State and its Nature

হব্‌সের মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের সম্মতি। তাঁর মতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ জনগণের সব ক্ষমতা ও শক্তিকে একজন ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা। ইচ্ছার 'বহুত্ব' (plurality) থেকে উদ্ভূত হয় দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ। তাই ইচ্ছার 'বহুত্ব' যখন 'একত্বে' (unity) রূপ লাভ করে এবং তা একজন ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। হব্‌সের কথায়, 'একটি রাষ্ট্র বা কমনওয়েলথ' গঠিত হয় তখনই, যখন বহু সংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার ও অন্যদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য একমত হয়ে চুক্তি করে যে কোন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি তাদের পক্ষে কার্য সম্পন্ন করবে।' সুতরাং জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্র গঠনের প্রধানতম ভিত্তি। হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ একে অন্যের নিকট নিম্নলিখিতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে চুক্তি সম্পাদন করেছে ঃ "আমি পরিত্যাগ করি এবং নিজেকে শাসন করার অধিকারকে এই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির নিকট সমর্পণ করি এ শর্তে যে তুমিও তোমার অধিকার তাঁর উপর সমর্পণ কর এবং পরিত্যাগ কর"। ("I authorize and give up my right of governing myself to this Man or to this Assembly of Men on this condition, that thou give up thy right to him and authorize all his actions in like manner.")।

হব্‌সের এ চুক্তিবাদ অতীতের চুক্তিবাদ থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। **প্রথমত,** অতীতের প্রায় সব চিন্তাবিদ শাসক ও জনগণের মধ্যে চুক্তির কথা বলেছেন। শাসক সে চুক্তি লঙ্ঘন করলে তাকে শাসন ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যবস্থাও অনেকে দান করেছেন। কিন্তু হব্‌সের চুক্তি মূলত সামাজিক চুক্তি। এ চুক্তি সম্পাদিত হয় জনগণের মধ্যে। শাসক এ চুক্তির শর্তাধীন নন। তিনি রয়েছেন চুক্তির বাইরে এবং ঊর্ধ্বে। **দ্বিতীয়ত,** অন্যান্য চুক্তিবাদী লেখকগণ এই মতবাদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করেছেন এক তীব্র ও শক্তিশালী যুক্তি। কিন্তু হব্‌স চুক্তিবাদের মাধ্যমে রাজশক্তির নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করেছেন।

---
১. Ibid

হব্‌সের চুক্তিবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। **প্রথম,** তাঁর চুক্তিবাদ এই ইঙ্গিত দেয় যে, রাষ্ট্র একটি মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং জনসম্মতি এর মূল। এ কারণে হব্‌স একজন ব্যক্তিত্ববাদের শ্রেষ্ঠ সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধনের জন্যই রাষ্ট্র। এ দিক দিয়ে তিনি উনবিংশ শতকের উপযোগবাদিগণের শিক্ষাগুরু। **দ্বিতীয়,** হব্‌সের চুক্তিবাদে রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হয় সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্রের আইনের প্রতি মানুষের রয়েছে সীমাহীন আনুগত্যের দায়িত্ব। **তৃতীয়,** হব্‌স দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে যুক্তি থেকে, ভীতি থেকে নয়। যুক্তির নির্দেশই মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি করেছে আকৃষ্ট। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি হলো যুক্তি, ভীতি নয়। **চতুর্থ,** সামাজিক চুক্তি দ্বারা যে রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো, তা চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়।

সার্বভৌমত্ব
Sovereignty

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হব্‌সের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। জঁা বোঁদা যা সূত্রাকারে প্রবর্তন করেন, হব্‌স তাতে অস্থি-মাংস সংযোজন করে তাকে জীবন্ত করে তোলেন। পরবর্তীকালে অস্টিন এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাবিদগণের হাতে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হব্‌সের মতে, সব প্রজার জন্য বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়নের ভিত্তি সার্বভৌমত্ব। যেহেতু শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য সব জনগণ তাদের কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা পরিত্যাগ করেছে সেজন্য যিনি এ ক্ষমতার অধিকারী হলেন, তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। হব্‌সের মতে, এই সার্বভৌম ক্ষমতার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। **প্রথম,** সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিমূল জনগণের সমর্থন। জনগণ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে সার্বভৌমের জন্ম দিয়েছে। **দ্বিতীয়,** এর লক্ষ্য জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কেননা শান্তি ও নিরাপত্তার অন্বেষণেই জনগণ নিজেদেরকে পরিচালনার অধিকার তুলে দিয়েছে সার্বভৌমের হস্তে। **তৃতীয়,** এই সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণবিহীন। সার্বভৌমের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কোন মানবিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা সীমিত নয়। জনগণ তাদের সর্ব অধিকার সমর্পণ করে একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য সার্বভৌমের হাতে অসীম ও বাধা বন্ধনহীন ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন। তাই সার্বভৌম হলো আইনের উৎস এবং আইন সার্বভৌমের নির্দেশ। সার্বভৌমত্ব কোন ঐশ্বরিক আইন বা প্রাকৃতিক বিধান দ্বারাও সীমিত নয়। **চতুর্থ,** সার্বভৌমের বিরুদ্ধে জনগণের কোন অধিকার নেই। জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করতে পারে না বা কোন অজুহাতে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম নয়। **পঞ্চম,** সার্বভৌম ক্ষমতাই ন্যায় অন্যায়, নৈতিকতা-অনৈতিকতা প্রভৃতির ব্যবধান সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা হলো প্রকৃতির রাজ্যে কোনরূপ ন্যায়-অন্যায় বোধ অথবা কোন অধিকার থাকতে পারে না। সব অধিকারের সৃষ্টিকর্তা সার্বভৌম। সার্বভৌমই বিচার এবং অধিকারের উৎস। **সর্বশেষে,** হব্‌স সার্বভৌমের অবিভাজ্যতা, স্থায়িত্ব এবং হস্তান্তরের অযোগ্যতার কথারও ইঙ্গিত দেন।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে টমাস হব্‌স যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। **প্রথম,** এ ধরনের সার্বভৌমত্বকে অবাস্তব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমন নিরঙ্কুশ ও চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করা কোন শাসকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই বলা হয়, তাঁর সার্বভৌমত্বের ধারণা আধুনিক কালের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। **দ্বিতীয়,** হব্‌সের সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব শাসককে স্বেচ্ছাচারী হতে সহায়তা করেছে। এই ধারণা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। তাঁর মতে, শাসক যা নিষেধ করেন না কেবলমাত্র তাই স্বাধীনতা। **তৃতীয়,** টমাস হব্‌সের সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি তুল্য। বাস্তব ক্ষেত্রে তা স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রূপরেখা অঙ্কিত করেছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা
Individual Liberty

হব্‌সের সামাজিক চুক্তি মানবিক স্বাধীনতার দলিল নয়, বরং তা একটি দাসত্বের বন্ধনস্বরূপ। তাই হব্‌সের মতবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা কিভাবে গৃহীত হয়েছে তা দেখা প্রয়োজন। হব্‌সের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে সার্বভৌমের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে এবং সার্বভৌম হয়ে ওঠে সীমাহীন কর্তৃত্বের অধিকারী। সার্বভৌম শাসকের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার নেই, কারণ তাঁর নিকট ব্যক্তি সব ক্ষমতা ও দাবি সমর্পণ করেছে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, হব্‌সের মতানুসারে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা রয়েছে কি?

হব্‌স ছিলেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তিনি রাজনৈতিক মতবাদে যথার্থ স্থান দিয়েছেন। সুতরাং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম বা 'লেভায়াথানের' সৃষ্টিকর্তা হয়েও তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বিস্মৃত হন নি। তাঁর বর্ণিত ব্যক্তি স্বাধীনতার রূপ কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এর ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কুচিত। **প্রথম,** হব্‌সের মতে রাষ্ট্রের আইনগুলো যা করতে নিষেধ করে না, তা করার অধিকার ব্যক্তির রয়েছে। তবে এ অধিকার সার্বভৌমের কোন অধিকারকে খর্ব করে না। যদি সার্বভৌম মনে করেন, তাও ব্যক্তির করা উচিত নয়, তবে ব্যক্তি তা করতে পারে না। এই স্বাধীনতা নিছক কাগজী। **দ্বিতীয়,** যা কোন চুক্তির দ্বারা সমর্পণ করা যায় না, তা করার বা উপভোগ করার অধিকার ব্যক্তির রয়েছে। এ অর্থে ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় আইন তাঁর জীবনে নিরাপত্তা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে রাষ্ট্রকে অমান্য করতে পারে।

সুতরাং হব্‌সের মতবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকলেও তা অত্যন্ত সঙ্কুচিত অবস্থায় রয়েছে। আধুনিক কালের মৌলিক অধিকার বলতে যা বুঝায় তার কোন স্থান নেই হব্‌সের মতবাদে।

আইন প্রসংগে হব্‌স
Hobbes on Civil Law

রাষ্ট্রের সব জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন সার্বভৌমের প্রথম ও প্রধান কাজ। সার্বভৌম কর্তৃক প্রণীত আইনগুলো নির্ধারণ করে জনগণের জন্য কোন্‌টি ন্যায় এবং কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি বেঠিক। এর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ঃ **প্রথম,** সার্বভৌম কর্তৃক প্রণীত আইন জনগণের আচরণ ও কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করে। **দ্বিতীয়,** এই আইনগুলো জনগণের নৈতিকতাবোধ ও মানসিকতার দিক নির্দেশ করে।

এ সব আইন প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। আইন মান্য করার ক্ষেত্রে জনগণের কোন ব্যক্তিগত বিচারের সুযোগ নেই। তাদের শর্তহীনভাবে আইনের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। জনগণ আইন মেনে চলবে এ জন্য নয় যে, আইনগুলো উৎকৃষ্ট। জনগণ আইন মান্য করতে বাধ্য এ জন্য যে, তা সার্বভৌম কর্তৃক প্রণীত ও প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবে হব্‌সের স্থান
Hobbes as a Political Thinker

চিন্তাধারার মৌলিকত্ব এবং দর্শনের গভীরতা বিচার করলে হব্‌সের তত্ত্বকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। তাঁকে বৃটেনের সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তাধারা সম্পন্ন রাজনৈতিক দার্শনিক বলা হয়ে থাকে। শুধু বৃটেনেই নয়, সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে হব্‌সের গ্রন্থ "লেভায়াথান' *(Leviathan)* এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাঁর দর্শনে কোন অস্পষ্টতা নেই। তাঁর চিন্তাধারায় কোন জড়তা নেই। তাঁর মতবাদকে তিনি নির্মম যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অধ্যাপক স্যাবাইনের (Sabine) কথায়, "হব্সের রাজনৈতিক দর্শন ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধকালে রচিত হলেও তা এক অতুলনীয় চিন্তাসূত্র যা নিখুঁত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ" ("Hobbes's Political philosophy is beyond all comparison the most imposing structure that the period of English Civil Wars produced.")।

অবশ্য তাঁর প্রচেষ্টা এবং মতবাদ বিভিন্ন মহল কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। সি. ই. ভনের (C. E. Vaughan) মতে, "হব্সের গ্রন্থ 'লেভায়াথান' ছিল প্রভাবহীন এবং ফলহীন।" অধ্যাপক মারে (Murray) বলেন, "হব্স সারাজীবন নিঃসঙ্গ রয়ে গেলেন এবং তাঁর সমালোচকদের সংখ্যা অনেক বেশি"। অধ্যাপক গেটেলও (Gettell) বলেছেন, "ইংরেজ রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে হব্সের কোন প্রত্যক্ষ সমর্থক ছিল না"। কিন্তু কালক্রমে হব্সের দর্শন অনেক সমর্থক খুঁজে পেয়েছে এবং তিনি ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। স্যাবাইনের (Sabine) মতে, "হব্স সম্ভবত ইংরেজি ভাষাভাষী জাতিগুলোর সব রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের লেখকদের অগ্রগণ্য"। এও সত্য যে, তাঁর অমর গ্রন্থ 'লেভায়াথান' যখন প্রকাশিত হয়, তখন তা কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া লাভ করে নি। হব্সের জড়বাদ, নাস্তিকতাবাদ ও স্বেচ্ছাচারবাদও বিভিন্নভাবে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। হেনরী ম্যুর (Henry Moore), কাড্ওয়ার্থ (Cudworth), কাম্বারল্যাণ্ড (Cumberland) প্রমুখ ধর্মতত্ত্ববিদ, এবং ফিলমার (Filmer) প্রমুখ রাষ্ট্র চিন্তাবিদ্ তাঁর মতবাদকে নস্যাৎ করতে উদ্যত হন। পরবর্তীকালে জন লকও (John Locke) এর সমালোচনা করে বলেন যে, হব্সের মতে, "মানুষ এত নির্বোধ যে খেকশিয়াল তাদের কি অনিষ্ট করতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকলেও সিংহের পেটে প্রবেশ করে নিরাপত্তা অনুভব করে"।

হব্স বর্ণিত মানব চরিত্র অপূর্ণ। মানুষের মধ্যে নীচতা এবং স্বার্থান্ধতা বিদ্যমান তা সত্য। কিন্তু নীচতা এবং স্বার্থান্ধতাই মানব প্রকৃতির সবটুকু নয়। মহত্তর গুণেও মানুষ বিভূষিত। অবশ্য হব্স এক পর্যায়ে স্ববিরোধিতা করে এ সত্যকে স্বীকৃতি দেন। সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন অর্থাৎ মানুষের যুক্তিবাদ ও দূরদর্শিতা, তাও মানবিক গুণ এবং তা মানুষের মধ্যে বর্তমান।

অন্য আর এক দিক দিয়ে হব্স নিঃসঙ্গ থেকে যান। তিনি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা করেন তা পরবর্তীকালে আর অনুসৃত হয় নি। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে জ্যামিতিক পদ্ধতি বা অবরোহ পদ্ধতির সাথে এক করে দেখা হতো, কিন্তু সে পদ্ধতি স্পিনোজা (Spinoza) ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ গ্রহণ করেন নি।

তথাপি তাঁর অবদান চিরস্থায়ী। **প্রথমত,** তাঁকে ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে অত্যন্ত উচ্চ আসন দান করা হয়। যদিও তিনি সার্বভৌমত্বের ধারণা সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন নি, তথাপি তিনি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকতাবাদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেন। ষোল শতকের জাঁ বোঁদা সর্বপ্রথম সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত সার্বভৌমের কথা বলেন। কিন্তু বোঁদা বর্ণিত সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোচ্চ হলেও তা ঈশ্বরের আইন, প্রাকৃতিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ছিল। ব্যবহারশাস্ত্রবিদ গ্রোসিয়াস (Grotius) বলেছেন যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাকৃতিক আইন ও

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে। কিন্তু হব্‌স বলেন, প্রাকৃতিক আইন বা আন্তর্জাতিক আইন মানা না মানা নির্ভর করে সার্বভৌমের ইচ্ছার উপর। এভাবে তিনি নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকতাবাদের ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি রাষ্ট্রকে সব রকম নৈতিকতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তার পূর্বে ষোল শতকের দুঃসাহসী লেখক মেকিয়েভেলি ধর্ম ও নৈতিকতাকে রাষ্ট্রনীতি থেকে স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি পর্যন্ত রাষ্ট্রের হাতে সর্বাত্মক ক্ষমতা তুলে দিতে সাহসী হন নি। হব্‌স কিন্তু রাষ্ট্রকে ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে শুধুমাত্র স্বতন্ত্রই করেন নি, তিনি রাষ্ট্রকে উভয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মূলত "তিনি ছিলেন সতের শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের একজন প্রধান প্রতিনিধি। ব্যক্তির সুখ, শান্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যই রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে"— তা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং সার্বভৌমের হস্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করে যে স্বৈরাচারের সূচনা করেন, তার ভিত্তিমূলে ছিল ব্যক্তির সম্মতি। এ সব কারণে অনেকে তাকে **'গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের'** জনক বলে অভিহিত করেন। তাঁর সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌমের যে রূপ, তার মূলে রয়েছে জনগণের সমর্থন ও চুক্তি। সম্মতিই এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত. আইন সম্পর্কে টমাস হব্‌স যা বলেছেন তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক আইন আইন নয়। আইন সার্বভৌমের আদেশ। জনগণকে আদেশ দেবার বা নিরস্ত করার ক্ষমতা একমাত্র সার্বভৌমের। হব্‌সের কথায়, "আইন হলো আইনগতভাবে অপরকে আদেশ দেবার সার্বভৌমের কথা" ["Law properly, is the word of him (sovereign) that by right has command over others."]। হব্‌সের এই সংজ্ঞা অত্যন্ত আধুনিক এবং অস্টিনের মত বিশ্লেষণবাদী লেখকগণ এ অর্থেই আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

পঞ্চমত, তাঁর দর্শনে কোন অযৌক্তিকতা নেই। তবে তাঁর পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। তিনি তাঁর দর্শনকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে জড় পদার্থের পর্যায়ে এনে বিশ্লেষণ করতে। তবে এও সত্য যে, তাঁর ধারণা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলস্বরূপ ছিল না। তা ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। তাঁর আমলে বৃটেনের অবস্থা ছিল পর্যুদস্ত। মহা অরাজকতায় দেশ ছিল নিমজ্জিত। গৃহযুদ্ধের বিশৃঙ্খলা, চতুর্দিকে অরাজকতা, শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অভাব এবং এ অবস্থায় মানুষের পশুসুলভ আত্মকেন্দ্রিক আচরণের যে প্রকাশ তিনি স্বচক্ষে দেখেন, তাই তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি মানুষের এই রূপকে চিরায়ত প্রকৃতি বলে গ্রহণ করেন।

এ সব দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও হব্‌সের রাজনৈতিক দর্শন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে এক মূল্যবান সম্পদ। সর্বপ্রথম তিনিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানী ও আধুনিক গবেষকের দৃষ্টিতে বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে তিনি গোষ্ঠী ও ধর্মীয় শাসন এবং সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক সর্বশক্তিমান সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার যুক্তি প্রদর্শন করেন। রাষ্ট্রগঠনের মূলে যে জনগণের সমর্থন রয়েছে তাও তার দর্শনে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নাবলি

১। হব্‌সের রাষ্ট্রচিন্তার পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the background of Hobbes's political thought.)

২। হব্‌সের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে কী জান? (What do you know of Hobbes's scientific materialism?)

৩। হব্‌স কর্তৃক অঙ্কিত প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দাও। (Draw a pen picture of the state of nature as pictured by Hobbes.)

৪। টমাস হব্‌সের মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যা জান বর্ণনা কর। (Describe the foundation of the state and its nature as thought by Thomas Hobbes.)

৫। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে হব্‌স কী বলেছেন? (What did Hobbes say on state sovereignty?) [R. U. '81; D. U. '80]

৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে হব্‌সের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the contributions of Hobbes as a political scientist.) [R. U. 1980]

৭। হব্‌সের চিন্তাধারার মূলসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the main principles of Hobbes's political thought.)

৮। হব্‌সের চুক্তিবাদের সাথে লকের চুক্তিবাদের তুলনামূলক আলোচনা কর। (Compare and contrast the social contract theory of Hobbes with that of Locke.)

[D. U. 1984; R. U. 1984]

৯। "হব্‌স নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবাদী ছিলেন"। তুমি কী এই মত সমর্থন কর? ("Hobbes was an absolulist." Do you agree with this view?) [D. U. 1981, '84; R. U. 1984]

১০। টমাস হব্‌সের মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা আলোচনা কর। তুমি কী তাঁর ধারণার সাথে একমত? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। (Discuss Thomas Hobbes's concept of 'human nature'. Do you agree with his views? Give reasons for your answer.) [D. U. 1983]

জন লক

JOHN LOCKE

(১৬৩২—১৭০৪)

১৬

সূচনা
Introduction

জন লককে বৃটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুরোধা ('Forerunner of Parliamentary Democracy') বলে আখ্যায়িত করা হয়। শাসন করার অধিকার জন্ম লাভ করে শাসিতদের সম্মতির মাধ্যমে, এ সত্যকে তিনি চরম সত্য বলে গ্রহণ করেন। স্বৈরাচারকে অন্যায় এবং অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। মূলত এই তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের মূল কথা। হব্‌সের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেভায়াথান' *(Leviathan)* পাঠ করলে দার্শনিক হব্‌সের যে প্রতিচ্ছবি মনের কোণে ভেসে ওঠে তা একজন ক্ষুরধার যুক্তিবাদীর, একজন দুঃখবাদীর এবং চরমপন্থী একজন ব্যক্তিবাদের পূজারীর ছবি। কিন্তু লকের "টু ট্রিটাইজেস অব সিভিল গভর্নমেণ্ট" *(Two Treatises of Civil Government)* পাঠ করলে গ্রন্থকারের যে ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে তা একজন আশাবাদী দার্শনিকের, একজন প্রাণখোলা উচ্ছল মানুষের এবং একজন হৃদয়বান ব্যক্তির ছবি। 'লেভায়াথানের' পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন, নির্মম এবং যান্ত্রিক, কিন্তু 'সিভিল গভর্নমেণ্টের' পৃথিবী আলোকোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও মানবিক।

তাঁর জীবনী এবং রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের পটভূমি

জন লক ছিলেন কর্মতৎপর প্রতিভাবান এক ব্যক্তি। একাদিক্রমে তিনি ছিলেন ডাক্তার, কূটনীতিক, সরকারি কর্মচারী, অর্থনীতিবিদ্ এবং দার্শনিক। তিনি ছিলেন সমারসেট শহরের একজন অখ্যাত আইনজীবীর পুত্র। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স ১০ বছর, তখন ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধে তাঁর পিতা পার্লামেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করে রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। জন লক তখনকার দিনে ইংল্যাণ্ডের সেরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুলে লেখাপড়া করেন এবং ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ (Christ Church) স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি এই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। যখন রাজা দ্বিতীয় চার্লস (Charles II) ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। রাজতন্ত্রের পুনর্বাসনে (Restoration) অন্যদের ন্যায় তিনিও খুশি হয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধে পার্লামেন্টের বিজয়ের ফলে ইংল্যাণ্ডে সামরিক একনায়কতন্ত্রের জন্ম হয় এবং স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে অনেক অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্রের পুনর্বাসনের পর তিনি লেখেন ঃ "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে কথা বলে অনেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করেছে। স্বাধীনতা সর্বসাধারণের বন্দীদশায় পর্যবসিত হয়েছে।"

তখনকার দিনে কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ডের প্রত্যেক শিক্ষককে যাজকীয় কর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি কূটনীতি বিশারদ হওয়ার মনস্থ করেন এবং সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তিনি একবার

চিকিৎসা শাস্ত্রেও শিক্ষাগ্রহণ করতে মনস্থ করেন এবং বেশ কিছুদিন এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ডিগ্রী লাভ করতে সক্ষম হন নি।

তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয় লর্ড অ্যাশলি কুপারের (Ashley Cooper) সাথে সাক্ষাতের পর। লর্ড অ্যাশলি কুপার ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিক ও রাষ্ট্র পরিচালক। পরবর্তীকালে তিনিই স্যাফ টস্‌বারীর প্রথম আর্ল (First Earl of Shaftesbury) রূপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি জন লককে অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করতে রাজি করান। শেষ পর্যন্ত লক স্যাফটস্‌বারীর বন্ধু, উপদেষ্টা ও চিকিৎসক হিসেবে সে পরিবারে অবস্থান করতে রাজি হন। স্যাফ্‌টস্‌বারী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হুইগ (whig) দলের প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে লকের অবদান কম ছিল না। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে স্যাফটস্‌বারী লর্ড চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হলে জন লক ধর্মবিষয়ক সচিব নিযুক্ত হন। এক বছর তিনি বাণিজ্য ও কৃষিবিষয়ক পরিষদের সচিব নিযুক্ত ছিলেন। এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি বৃটেনের রাজনীতির গতিধারা সম্যকরূপে অনুধাবনের সুযোগ লাভ করেন। স্যাফটস্‌বারী ছিলেন ধর্ম বিষয়ে উদার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে জন লক তাঁকে সে নীতি অবলম্বনে প্রচুর সহায়তা করেন।

১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে স্যাফ্‌টস্‌বারী তাঁর ক্যাথলিক বিরোধী মনোভাবের জন্য রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কোপানলে পতিত হন। স্যাফটস্‌বারীর ক্যাথলিক বিরোধী মনোভাব আরও দৃঢ় হয় যখন তিনি স্পষ্টরূপে অনুধাবন করেন যে, রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পর রাজা হবেন তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস (James II) এবং ফলে প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বীদের হবে সমূহ ক্ষতি। তাই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে নিরস্ত করতে উদ্যত হন। কিন্তু পরিণামে তা ব্যর্থ হয় এবং প্রাণভয়ে স্যাফ্‌টস্‌বারী হল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। জন লকও হল্যাণ্ডে তাঁর নেতাকে অনুসরণ করেন।

লক যখন নির্বাসিত অবস্থায় হল্যাণ্ডে কালাতিপাত করছিলেন, তখন ক্যাথলিক দ্বিতীয় জেমস ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল অত্যন্ত অশুভ হয়ে ওঠে এবং স্যাফ্‌টস্‌বারীর আশঙ্কা পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হয়। রাজা দ্বিতীয় জেমস ইংরেজদের উপর ক্যাথলিক ধর্ম চাপিয়ে দিতে উদ্যত হন। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন এবং জনসাধারণের অনেক অধিকার খর্ব করেন। অবশেষে সমগ্র জাতি ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং বিদ্রোহের পতাকা সমুন্নত হয়। দ্বিতীয় জেমস দেশ ত্যাগ করেন। উইলিয়ম অব অরেঞ্জ (William of Orange) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ইংল্যাণ্ডে স্ব-শাসনের ভিত্তি রচিত হয়। এই হলো বিখ্যাত গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution)। জেমস দেশত্যাগ করলে জন লক দেশে ফিরে আসেন এবং অনতিবিলম্বে তিনি এই বিপ্লবের দার্শনিক (philosopher) বলে পরিচিত হন। কেননা এইসব বিপ্লবাত্মক ঘটনারাজির মধ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'টু ট্রিটাইজেস অব সিভিল গভর্নমেণ্ট' (Two Treatises of Civil Government) প্রকাশিত হয়। তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন ঃ "আমাদের মহান রাজা উইলিয়ামের শাসনাধিকার জনসাধারণের সম্মতির সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই কাগজপত্রই যথেষ্ট।"

জন লকের গ্রন্থকে সমসাময়িক ঘটনাবলীর পর্যালোচনামূলক আলেখ্য বলে চিহ্নিত করেছেন অনেকেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর রচনাবলী ছিল নিছক সাময়িক উত্তেজনার ফলশ্রুতি এবং সাময়িক ঘটনারাজির প্রতিক্রিয়া। এই সমসাময়িক ঘটনাবিন্যাস তাঁর গ্রন্থের দার্শনিক মূল্যকে কোন ক্রমেই হ্রাস করে না। প্লেটোর 'দি রিপাবলিক' হতে শুরু করে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'অন লিবার্টি' (On Liberty) এর মতো অনেক অনবদ্য সৃষ্টিই সমসাময়িক ঘটনার পর্যালোচনামূলক রচনা। রাজতন্ত্র পুনর্বাসনের পর পুনরায় তিনি সরকারি চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি "আপীলের" কমিশনার পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই চাকুরীতে তিনি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হব্‌স ও জন লকের চারণক্ষেত্র ছিল সতর শতক এবং এ শতকেই পাশ্চাত্যের অনেক মতবাদ ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের অধিকার সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং দার্শনিক ক্ষেত্রে যুক্তির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই আমলকে বলা হয় 'যুক্তিবাদের যুগ' (Age of Reason)। জন লকের বিখ্যাত গ্রন্থের মূল কথাই ছিল 'জনগণের সম্মতি' (consent of the people) শাসকের শাসন করার অধিকারের ভিত্তি। জনসাধারণের সম্মতি সতর শতকে ছিল বিতর্কমূলক। জন লক প্রমাণ করতে চাইলেন জনসম্মতি ব্যতীত কোন শাসকের শাসন করার কোন অধিকার নেই।

জন লকের রাজনৈতিক মতবাদ
Political Thought of John Locke

জন লকের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের মূল কথা সরকার বা শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বশীলতা। যাঁরা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন, তিনি রাজাই হোন অথবা পার্লামেন্টের সদস্যই হোন, তিনি বা তাঁরা শাসনের অধিকার লাভ করে থাকেন জনগণের সম্মতির মাধ্যমে। প্রত্যেক সংগঠিত সমাজে সরকার বা শাসন ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য সংস্থা এবং তার অধিকার সার্বিক। কিন্তু এ অধিকার সীমিত দ্বিবিধ বন্ধনের দ্বারা। এদের একটি নৈতিক আইন এবং অপরটি দেশের শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও প্রথামালা। শাসনাধিকার সীমাবদ্ধ এই অর্থে যে, তা শুধুমাত্র জাতীয় কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায়, সরকার যদি সম্প্রদায়ের মঙ্গল সাধনে ব্রতী না হয় অথবা যদি তা জনগণের সম্মতি ভিত্তিক না হয় অথবা সরকার যদি তার অধিকারের সীমা লংঘন করে, তবে আইনগতভাবে সে সরকারের পতন ঘটানো যাবে। যে কোন সমাজে শাসকের অধিকার জনগণের অধিকার দ্বারা সীমিত। ব্যক্তির অধিকার তার নিকট পবিত্র আমানত স্বরূপ। দেশে যে ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন অথবা রাষ্ট্রের প্রকৃতি যেমনি হোক 'ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করার অধিকার সরকারের নেই।' এভাবে তিনি জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করেন এবং এ জন্য তাঁকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

শুধু তাই নয়, জন লক (John Locke) সীমিত সরকারের (Limited Government) যে রূপরেখা অঙ্কিত করেন তাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক দিক্‌দর্শন স্বরূপ। জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে শুধু যে সরকার গঠিত হয়েছে তাই নয়, জনগণের অধিকারের কাঠামোয় সরকার টিকে থাকে। যদি কোন সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অক্ষম হয় অথবা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে তা হলে সে সরকার অবৈধ এবং সে সরকারকে মান্য করার দায়িত্ব আর জনগণের থাকে না। এ কারণে জন লককে গণতন্ত্রের পুরোধা বলে চিহ্নিত করা হয়।

তাছাড়া, তিনি সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং সরকারের দায়িত্বশীলতার (accountability) যে শর্ত আরোপ করেন তাও জন লকের গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতীক।

প্রকৃতির রাজ্য এবং প্রাকৃতিক আইন
State of Nature and Natural Law

একজন দক্ষ কারিগরের ন্যায় তিনিও রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ শুরু করেন ভিত্তিমূল থেকে। তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদগণের ন্যায় তিনিও শুরু করেছেন 'প্রাকৃতিক অবস্থা' থেকে। এই অবস্থায় ছিল না কোন শাসক অথবা শাসিত, কোন রাষ্ট্র অথবা সরকার, কোন কর্তৃত্ব অথবা আনুগত্যবোধ। চুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণ এক সংগঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের পত্তন করে।

চুক্তিবাদের ইতিহাস দীর্ঘতর। গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদের নিকটও এ মতবাদ সুপরিচিত ছিল, যদিও প্লেটো এবং এরিস্টটল এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। সামন্ত যুগেও এ মতবাদের প্রভাব নেহায়েত কম

ছিল না। মধ্যযুগে চুক্তিবাদ রাজকীয় স্বৈরাচারকে প্রতিহত করার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে ষোল ও সতর শতকে প্রধানত জার্মানীর আলথুসিয়াস (Althusius) এবং হল্যাণ্ডের গ্রোসিয়াসের (Grotius) হস্তে এই মতবাদ শক্তিশালী এক মন্ত্রের রূপ ধারণ করে। হব্‌স নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য চুক্তিবাদকে সম্যকরূপে কাজে লাগান। লক সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে চুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন চুক্তিবাদের মাধ্যমে দৈবী মতবাদকে (theory of Divine Origin and theory of Divine Rights) খণ্ডন করতে এবং জনসাধারণের সম্মতিকে সরকারের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। এ সময় ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে দৈবী মতবাদ শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি এর পরিচায়ক। চতুর্দশ লুই বলতেন, "আমিই রাষ্ট্র" ("I am the state")। জেমস প্রচার করেছিলেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট থেকে শাসনের অধিকার লাভ করেছেন। এ মতবাদ শুধুমাত্র শাসকমহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছু কিছু লেখকও এর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ফিলমারের (Filmer) 'প্যাট্রিয়ার্কা' *(Patriarcha)* গ্রন্থ এর বিশিষ্ট নিদর্শন।

লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য
Locke and State of Nature

লকের মতে 'প্রকৃতির রাজ্য' (state of nature) ছিল পরম সুখকর এবং মনোরম। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল মুক্ত এবং স্বাধীন। প্রত্যেকে সমান অধিকার উপভোগ করত। 'এ অবস্থায় মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করত এবং অপরের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক আইনের (natural law) সীমারেখার মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের কার্যধারা ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত"। প্রকৃতির রাজ্যে অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করত। মানুষ মোটামুটিভাবে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করত। এ ছিল অনেকটা স্টয়িকদের (Stoic) চিত্রিত স্বর্ণযুগের মত এবং হব্‌সের অঙ্কিত প্রকৃতির রাজ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। হব্‌সের 'প্রকৃতির রাজ্যে' মানুষ সর্বদা অন্যের ভয়ে থাকত ত্রস্ত। সেখানে ছিল প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। মানব চরিত্র ও মানবের কার্যকলাপ সম্পর্কে হব্‌সের যে ধারণা, তাই প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থা চিত্রায়নে হব্‌সকে অনুপ্রেরণা দেয়। কিন্তু প্রাকৃতিক রাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লক প্রাকৃতিক বিধানকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট প্রাকৃতিক বিধান ছিল যুক্তির বিধান এবং ঐশ্বরিক বিধান স্বরূপ। লকের চিন্তারাজ্যে প্রাকৃতিক বিধান ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। নিম্নলিখিতভাবে তিনি প্রাকৃতিক বিধানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন ঃ

"প্রাকৃতিক বিধানই প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যেকের জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তা যুক্তির বিধান। যেহেতু সকল মানুষ সমান এবং স্বাধীন, এ যুক্তির বিধান সকলকে শিখিয়েছে যে অন্যের জীবন, স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা এবং সম্পদের ক্ষতি সাধন করা উচিত নয়" ("The state of nature to govern it, which obliges everyone, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions")। তিনি আরও বলেন যে, "প্রাকৃতিক বিধান সকল মানুষকে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং অন্যের উপর আঘাত হানা থেকে নিবৃত্ত করে। এ বিধান সকল মানুষকে শান্ত ও নিরাপত্তার সতর্ক প্রহরী" ("Willth the peace and preservation of all mankind.")। প্রাকৃতিক বিধান শুধুমাত্র প্রকৃতির রাজ্যেই মানুষের জীবন ও কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করত না, তা সুসংগঠিত সমাজেও (civil society) মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। লকের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে প্রাকৃতিক বিধান সম্পর্কে নিম্নলিখিত সূত্রগুলো পাওয়া যায় ঃ

প্রথমত, প্রাকৃতিক বিধান যুক্তির বিধান এবং তা প্রত্যেক মানুষকে অপরের জীবন, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির উপর আঘাত করা থেকে নিবৃত্ত করে, কেননা সকল মানুষ সমান ও স্বাধীন। লক মনে

করতেন, প্রাকৃতিক বিধান অত্যন্ত কার্যকর, কেননা সকলেই বিশ্বপিতার সন্তান এবং বিশ্বপিতা মানুষকে তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক বিধান সাম্যের বিধান এবং একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিক উপভোগ করুক, তা প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়। প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষমতা ও অধিকার পারস্পরিক দাবি ও অধিকারের দ্বারা সীমিত। প্রত্যেকে আত্মরক্ষা করবে। ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে অন্যের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হবে না।

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক আইনের প্রধান লক্ষ্য মানব সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান। সুতরাং এ বিধানের কার্যকারিতা ন্যস্ত ছিল সকল মানুষের উপর। যে কেউ এই বিধান ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করতে পারত।

লকের মতে, প্রাকৃতিক বিধান সুস্পষ্ট, মৌলিক এবং সমাজ নিরপেক্ষ। যে কেউ নিজের দিকে তাকিয়ে এ বিধান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। ঈশ্বরই মানুষের অন্তরে এ বিধান রোপণ করেছেন। এ বিধান মানুষকে করেছে সমান, মুক্ত এবং সামাজিক। এ বিধানকে কেউ অমান্য করলে সে প্রাকৃতিক বিধান বহির্ভূত অন্য আইন অনুযায়ী চলতে উদ্যত হয় এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় প্রাকৃতিক বিধান লংঘনকারীকে যে কেউ শাস্তি প্রদান করতে পারে। তবে এই বিধানের লক্ষ্য দুটি ঃ **(এক)** বিধান ভঙ্গের জন্য কোন ক্ষতি হলে তা পূরণ (reparation), **(দুই)** বিধান ভঙ্গ থেকে কাউকে নিরস্ত করা (restraint)।

রাজনৈতিক সমাজ সংগঠন

Formation of Civil Society

লকের মতে, রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় প্রকৃতির রাজ্য থেকে। প্রকৃতির রাজ্য ছিল সুখকর এবং মনোরম। প্রকৃতির রাজ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহনশীলতার এক পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার ছিল মৌলিক এবং সর্বজনীন। সকলেই এই অধিকার উপভোগ করত। জনগণ জন্মসূত্রে এ সকল অধিকার লাভ করত। প্রাকৃতিক বিধানই এসব অধিকারের রক্ষাকবচস্বরূপ ছিল। প্রাকৃতিক বিধান ভঙ্গকারীকে সকলে শাস্তি দিতে পারত। এখন প্রশ্ন ওঠে, প্রকৃতির রাজ্য এত শান্তিময় ও সুখকর হলে এবং ব্যক্তির অধিকার এত নিরাপদ থাকলে সাধারণ মানুষ প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক সমাজ গঠনে উদ্যোগী হলো কেন? জন লক এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন দু'ভাবে ঃ

প্রথমত, লক বলেন, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মনে এমন কতকগুলো প্রবণতা সংযোগ করেছেন যার ফলে মানুষ একাকী থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার জন্য যা প্রয়োজন, সে অনুযায়ী এবং সে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাষা দিয়ে ঈশ্বর মানুষকে সুসজ্জিত করেছেন। অন্য কথায়, মানুষ তার অভ্যন্তরীণ প্রবণতার ফলেই রাজনৈতিক সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে পরিবার গঠন, যেখানে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্রতম সমাজ গঠন করে। প্রথম সমাজ গঠিত হয় একজন পুরুষ ও তার স্ত্রীকে নিয়ে ("The first society was between a man and his wife")। তা যেন ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র (little commonwealth)। তবে তা রাজনৈতিক সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র, কেননা পরিবারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে পরিবার কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না। পরিবারের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই ("The family has no political power")। লকের মতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো মৃত্যুদণ্ডসহ আইন প্রণয়নের অধিকার এবং সমাজের প্রতিরক্ষা ও সমাজে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের জীবন ও সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী। পরিবারকে সমাজের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে লক

এরিস্টটল কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন গভীরভাবে। লকের এ ধারণা উনিশ শতকে হেগেলের চিন্তাধারায় আরও সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয়।

দ্বিতীয়ত, তিনি স্বীকার করেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে একটি ভীষণ ত্রুটি বর্তমান ছিল। প্রাকৃতিক বিধানকে বলবৎ করার ও লংঘনকারীকে শাস্তিদানের অধিকার প্রত্যেক মানুষের ছিল। কিন্তু আত্ম-প্রীতি, ভাবাবেগ, প্রতিশোধ স্পৃহা প্রভৃতির কারণে মানুষের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না। বরং মানুষের পক্ষে শাস্তি প্রদানে অধিক আগ্রহী ও নিজের ত্রুটির প্রতি উদাসীন হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাই প্রাকৃতিক অবস্থায় এ ত্রুটি দূর করার এবং বিশৃঙ্খলা এড়াবার যথাযথ প্রতিকার হলো রাজনৈতিক সমাজ গঠন। এ ক্ষেত্রে লক হব্‌সের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েন, কারণ প্রকৃতির রাজ্য সুখকর হলেও তা মানুষের সামাজিক জীবনের উপযোগী ছিল না। তবে লকের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যই লক সামাজিক চুক্তির কথা উল্লেখ করেন। কোন ব্যক্তি অন্যায় ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করার চেয়ে প্রকৃতির রাজ্যের অসুবিধা সত্ত্বেও তা জনগণের জন্য উৎকৃষ্টতর। সুতরাং তিনি এরূপ সরকারের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী যে সরকার নাগরিকদের স্বাধীনতা বিনষ্ট করবে না, কেননা অধিকার মানুষের জন্মগত।

সামাজিক চুক্তি
Social Contract

লকের মতে, মানুষ প্রকৃতির রাজ্যের বিভিন্ন অসুবিধাকে এড়াবার জন্য রাজনৈতিক সমাজ গঠনে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজ গঠন করে। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ সমগ্র সমাজের নিকট সে প্রাকৃতিক অধিকারগুলো প্রদান করতে রাজি হয় যে অধিকারগুলো প্রকৃতির রাজ্যে প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক ছিল, যেমন প্রাকৃতিক বিধানের ব্যাখ্যাদান। এসব বিধানের বাস্তবায়ন এবং বিধান লংঘনকারীদের শাস্তি বিধান প্রভৃতি অবশিষ্ট অধিকারগুলো ব্যক্তির হাতেই থেকে যায় এবং তা অলংঘনীয় অধিকাররূপে সরকারের কাজের সীমা নির্ধারণ করে। রাজনৈতিক সমাজ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করার ব্যবস্থারূপে প্রাণ পায়। মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার যা প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ উপভোগ করে এসেছে, তা রাজনৈতিক সমাজেও অলংঘনীয় অধিকাররূপে স্বীকৃতি লাভ করে। অন্য কথায়, লকের চুক্তিতে শাসকের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের দাবির সমাপ্তি ঘটে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। লকের চুক্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সর্বসম্মত ব্যবস্থা। মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বাস করছিল। কারো মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সমাজে কাউকে যোগদান করানো সম্ভব নয়। অন্য কথায়, রাষ্ট্র অবশ্যই জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লক ঃ গণতন্ত্রের পুরোধা
Locke : The Forerunner of Democracy

জন লক সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজ এবং সরকার সমার্থক নয়। প্রকৃতির রাজ্যে (State of nature) মানুষ মূলত দুটি চুক্তি সম্পাদন করে। **প্রথম,** চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজের গোড়াপত্তন হয়। তাঁর মতে, মানবিক অধিকার বা কর্তব্যের উদ্ভব হয় প্রাকৃতিক বিধান (natural law) থেকে। প্রাকৃতিক বিধান থেকেই মানুষ তাঁর অধিকার লাভ করে। প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ মানুষের এক চিরন্তন ও সহজাত অধিকার। এদের মধ্যে তিনটি অধিকারের কথা জন লক একাধিকবার উল্লেখ করেন, যথা—'জীবনের অধিকার', 'স্বাধীনতার অধিকার' এবং 'সম্পত্তির অধিকার' ('right to life', 'liberty' and 'property')। যেহেতু এ

অধিকারগুলো প্রাকৃতিক বিধান থেকে উদ্ভূত, তাই এদের সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এ অধিকারগুলোকে খর্ব করার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নেই।

দ্বিতীয়, চুক্তির মাধ্যমে সরকার সৃষ্টি হয়। এ সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি মানুষের জন্মগত অধিকারের মানদণ্ডে সীমিত। সরকারের ক্ষমতা চূড়ান্ত বা নিরঙ্কুশ নয়। হব্‌সের সাথে জন লকের মৌলিক পার্থক্য এখানে। হব্‌স ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সমর্থক, কিন্তু লক ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুসারী। মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারসমূহকে অধিক মাত্রায় বিকশিত করার এবং পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করার জন্যই সরকার বিদ্যমান। কোন সরকার যদি উক্ত অধিকারসমূহ সংরক্ষণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় অথবা অধিকারসমূহকে নস্যাৎ করতে উদ্যত হয়, তা হলে জনগণ উক্ত সরকার উৎখাত করে সরকারের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারে। অথবা নতুন সরকার গঠন করতে পারে। এ সকল কারণে জন লককে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পুরোধা বলা হয়। মূলত ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় জন লক তাঁর মতবাদে তারই স্বীকৃতি দান করেন এবং বৃটেনের 'সংসদীয় সার্বভৌমত্ব' স্বীকার করেন। বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জন লকের মতবাদ গভীরভাবে অভিনন্দিত হয়।

সম্পত্তি সম্পর্কে লকের মতবাদ
Locke's Theory of Property

সম্পত্তি সম্পর্কে লকের মতবাদ মূলত তাঁকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরূপে চিহ্নিত করেছে। কেননা এ ক্ষেত্রে লকের অভিমত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁর মতে, সম্পত্তি এমন একটি প্রতিষ্ঠান (institution) যা প্রকৃতির রাজ্যেও বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের উদ্ভবের সাথে তা কোনক্রমে জড়িত নয় বরং রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের মুখ্য কাজই হলো সম্পত্তির সংরক্ষণ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বেশ উন্নত অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে বিদ্যমান ছিল। মানুষ এ অধিকার প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে সাথে এনেছে। সুতরাং তা মানুষের জন্মগত অধিকারের মত। রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজের প্রধান কাজ এর সংরক্ষণ। এ অধিকারকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত এর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব নয়। কর ধার্যের ক্ষেত্রেও সম্পত্তি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া কোন কর ধার্য করা সঙ্গত নয়।

লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তির উদ্ভব হয়। পরম স্নেহশীল বিশ্বপিতা অতি আদরে আপন প্রতিচ্ছবিতে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তাও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাই প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক বিধান মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। প্রাকৃতিক বিধানের লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতির সংরক্ষণ এবং তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা। এ জন্য ঈশ্বর মানুষের জীবন রক্ষা ও জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমস্ত মানুষকে উপভোগ করতে দিয়েছেন পৃথিবীর সকল সম্পদরাজি। পৃথিবীর সম্পদ কিন্তু সীমিত, অন্যদিকে মানুষ কর্মক্ষম এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। ফলে, মানুষ তার প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সীমিত উৎপাদনকে আরো বৃদ্ধি করতে পারে। দৈহিক পরিশ্রম ও মানসিক তৎপরতা মানুষের একান্তভাবে নিজস্ব। এ নিজস্ব জিনিস সহযোগে যা উৎপন্ন হবে, তা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ ("Though the earth and all inferior creatures are common to all men, yet every man has a property in his own person; this nobody has any right to but himself. The labour of his body and the works of his hands, we may say, are property of his.")। "নিজস্ব পরিশ্রমের দ্বারা যা সৃষ্টি হলো তা তার নিজস্ব সম্পদ" ("whatsoever, then, he removes out of the state that nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with and joined to it something that in his own and thereby he makes it his property")।

এখন প্রশ্ন ওঠে, এ সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কী কারো অনুমতি দরকার? এর জন্য কী কোন অনুমোদন প্রয়োজন?

লকের মতে, সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন অনুমোদন প্রয়োজন নেই অথবা এ বিষয়ে কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই, কেননা অনুমতি সাপেক্ষে কোন সম্পত্তি সৃষ্টি করতে হলে মানুষ প্রাচুর্যের মধ্যেও অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে। অনুমতি কে দেবে ? অনুমোদনের জন্য কোন কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল না। অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে কেমন করে ?

কিন্তু কোন ব্যক্তি কর্তৃক সীমাহীন সম্পত্তি অর্জনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। "ফল-মূল-শস্য কুড়ানো যদি যুক্তিযুক্ত হয়,তা হলে যে কেউ যে কোন পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে" ("if gathering the acorns or other fruits of the earth etc. make a right to them, then anyone may engross as much as he will")। কিন্তু এর উত্তরে লক বলেছেন, "তা যথার্থ নয়"। যে প্রাকৃতিক বিধান সম্পত্তির অধিকার সৃষ্টি করেছে, তাই সম্পত্তির সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। ঈশ্বর পৃথিবীর সকল সম্পদ শান্তি এবং সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ উপভোগের জন্য সম্পত্তি লাভ করবে, তা বিনষ্ট করার জন্য নয়। সম্পত্তি বিনষ্ট হবার পূর্বে তা ব্যবহারের এবং উপভোগের জন্য যতটুকু দরকার মানুষ ঠিক ততটুকু করবে। এর অধিক হলে সে সম্পত্তিতে অন্যের অংশ রয়েছে ("more than his share and belongs to other") এবং তা প্রাকৃতিক বিধানের বিরোধী।

সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে আর একটি সীমারেখা হলো পরিশ্রমের পরিমাণ। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করে সকলকে জীবনের প্রয়োজন মিটাতে পরিশ্রম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমানদের পুরস্কার সম্পত্তি। সুতরাং ব্যক্তির প্রয়োজন এবং ব্যক্তির পরিশ্রম উভয়ে মিলে সম্পত্তির সীমারেখা নির্ধারণ করবে।

লকের সম্পত্তি তত্ত্বের কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। **প্রথমত**, লকের মতে, পরিশ্রমই সম্পত্তির মূল। এ ক্ষেত্রে বর্তমানকালের সমাজতান্ত্রিকদের যুক্তি লক প্রয়োগ করেছেন। তবে লক শ্রমিকদের যুক্তি প্রয়োগ না করে মালিকদের যুক্তি প্রয়োগ করেছেন এবং সর্ব বিষয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে সমগ্র বিষয়টি দেখেছেন। **দ্বিতীয়ত**, সম্পত্তির ক্ষেত্রে লক যে সীমারেখা স্থাপন করেছেন তা মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে কোন সীমারেখাই থাকেনি, কেননা মুদ্রা ব্যবস্থার ফলে সম্পত্তি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। **তৃতীয়ত**, তাঁর সম্পত্তি তত্ত্ব প্রাকৃতিক অধিকারের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব কালে অবাস্তব প্রমাণিত হলে তাঁর সম্পত্তি তত্ত্বও দুর্বল হয়ে পড়ে, কেননা রাষ্ট্র ও সরকারের অনুপস্থিতিতে প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করা সঠিকও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। **চতুর্থত**, এও বলা প্রয়োজন যে, লকের সম্পত্তি তত্ত্ব তখনকার দিনের মতামতের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সামন্ততন্ত্র ধ্বংসের সাথে সাথে ধনতন্ত্র ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি মানুষের তথা সম্পদশালীদের প্রতি শ্রদ্ধা গভীরতর হচ্ছিল। জন লক সে মতামত প্রকাশ করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের পর, বিশেষ করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পর, সম্পত্তি সম্পর্কে এ মতবাদ পাশ্চাত্য সমাজে প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত হয়ে ওঠে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা লাভে সহায়ক হয়।

জন লকের অবদান
Contributions of John Locke

জন লক সর্বকালের এবং সর্বযুগের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অন্যতম। তাঁর বাস্তবধর্মী চিন্তাধারা গণতান্ত্রিক সচেতনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁকে শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণের প্রথম সারিতে দাঁড় করিয়েছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনা ও সমস্যাবলী তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শনে প্রতিফলিত হয়ে সে গুলোকে এক বাস্তবমুখী রূপ দান করেছে। তিনি প্রাকৃতিক আইনের নব রূপরেখা নির্দেশ করে গণনিয়ন্ত্রিত সরকারের পক্ষে মত প্রকাশ করে, ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সহনশীলতার নীতি ঘোষণা করে

এবং সর্বোপরি গণপ্রতিরোধ অধিকারের মতবাদ ব্যাখ্যা করে এক গণমুখী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করেন।

প্রথমত, তিনি শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অন্যতম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হিসেবে জন লকের নাম টমাস হব্‌সের সাথে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থকে তিনি মুখ্য স্থান দিয়েছেন। হব্‌স যেখানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়েছেন, লক সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের জন্য এবং সীমিত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য মত প্রকাশ করেছেন। লক ব্যক্তির মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যম হিসেবে রাষ্ট্রকে দেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, লকের দর্শনের সমসাময়িকতা তাঁর জন্য এনেছে চরম খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। তিনি হব্‌সের ন্যায় কোন গভীর ও মৌলিক দর্শনের উদ্‌গাতা নন। তাঁর যুক্তি ও তত্ত্ব হব্‌সের ন্যায় তেমন জোরালো ও তীক্ষ্ণ ছিল না। তিনি একজন মধ্যপথ অবলম্বনকারী ও বাস্তবধর্মী দার্শনিক। এ সব কারণে তাঁর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর যুগের ধারাকে সঠিকরূপে অনুধাবন করেছিলেন যা পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাকে প্রভাবিত করে। তিনি যথার্থই অনুধাবন করেন যে, ইউরোপে রাজতন্ত্রের দিন সীমিত। তিনি বুঝেছিলেন, মধ্যবিত্ত এক শ্রেণী অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তাই তিনি সম্পত্তির ব্যাখ্যা দান করে এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উন্মেষের পথ পরিষ্কার করেন। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এ সব কারণ।

তৃতীয়ত, তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন সর্বপ্রথম। তাঁর মতে, রাষ্ট্র অক্ষয়, অজর ও অমর। কিন্তু সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ সূত্রই গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত্তি পত্তন করতে সহায়ক হয়।তাই তাঁকে বলা হয় 'সংসদীয় গণতন্ত্রের উদ্‌গাতা'। তিনি আইন পরিষদকে সার্বভৌম হিসেবে বর্ণনা করেন। আইন পরিষদের সার্বভৌমত্বই কালে বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথ সুগম করে।

চতুর্থত, প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ জন লককে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকারকে তিনি ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সীমিত সরকারের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে এ সকল অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করেছেন।

পঞ্চমত, জন লকের সম্পত্তি তত্ত্বও তাঁর এক বিশিষ্ট অবদান। তিনি জনগণের সম্পত্তির অধিকারকে একটি প্রাকৃতিক অধিকাররূপে গণ্য করেন। তাঁর মতে, সম্পত্তির অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। জন লকের সম্পত্তির তত্ত্ব বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে তা সত্য, কিন্তু তথাপি বলতে হবে যে, এ তত্ত্বের মাধ্যমেই তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

ষষ্ঠত, ধর্ম এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে সহনশীলতার দার্শনিক তত্ত্বও জন লকের একটি বিশিষ্ট অবদান। তাঁর মতে ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন কিছু করণীয় নেই। চার্চ ও রাষ্ট্র দুটি পৃথক সত্তা। একটি অপরটির ক্ষেত্রে কোন নীতি নির্ধারণের অধিকারী নয়। এভাবে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন।

সপ্তমত, তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুরোধা। তাঁকে অনেক সময় বলা হয় আধুনিক গণতন্ত্রের জনক। গণনিয়ন্ত্রিত সরকার,, নির্বাচন, জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার, দায়িত্বশীল আইন পরিষদ তত্ত্ব- সবই রয়েছে তার রাজনৈতিক দর্শনে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

অষ্টমত, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কেও তিনি নতুন তত্ত্ব দান করেন। তাঁর মতে, সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা লাভ করেছে এবং এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সরকার

ক্ষমতাচ্যুত হবে। অন্য কথায়, জনগণের অধিকারই মৌলিক। এভাবে তিনি জনগণের সার্বভৌমত্বের (popular sovereignty) নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন।

লকের রাজনৈতিক দর্শন পরবর্তী যুগের বহু বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনৈতিক ঘটনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। মর্তেস্কু, রুশো প্রমুখ দার্শনিক তাঁর ভাবশিষ্য। তাঁরা লকের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বকে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শকে নিজেদের চিন্তাধারায় গ্রহণ করে নতুনভাবে ব্যাখ্যা দান করেন। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, আইরিশদের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি যুগান্তকারী গণআন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক পটভূমি রচনার ব্যাপারে লকের চিন্তাধারা কাজ করেছে গুরুত্বপূর্ণভাবে।

১। জন লকের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সম্পর্কে কী জান ? (What do you know of the background of John Locke's political thought?)

২। জন লকের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the political ideas of John Locke.)

৩। লক কর্তৃক অঙ্কিত প্রকৃতির রাজ্যের বিবরণ দাও। প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন ? (Describe the 'state of nature' as drawn by John Locke. What did he say on natural law?)

৪। লকের মতে, কিভাবে রাজনৈতিক সমাজ সংগঠিত হয়? (How was the civil society organized according to Locke?)

৫। সীমিত সরকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি কী বলেছেন? (What did he say about limited government?)

৬। সম্পত্তি সম্পর্কে লকের মতবাদ সম্পন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the views of Locke on property.) [D. U. 1980; R. U. '80, '81, 2000]

৭। জন লকের অবদান সম্পর্কে কী জান? (What do you know of Locke's contribution?)

৮। গণতন্ত্র সম্পর্কে লকের মতবাদ আলোচনা কর। (Discuss the views of Locke on democracy.)

৯। সরকার ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জন লকের ধারণা আলোচনা কর। (Discuss Locke's concept of government and sovereignty.) [D. U. 1983]

১০। জন লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদটি আলোচনা কর। (Discuss John Locke's social contract theory.) [D. U. 1984]

জাঁ জ্যাক রুশো

JEAN JACQUES ROUSSEAU

(১৭১২—১৭৭৮)

১৭

ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অমোঘ বাণীর উদ্‌গাতা এবং গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক ফরাসী দার্শনিক রুশো রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাক্ষেত্রে চির উজ্জ্বল একটি নাম। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ, 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' *(Social Contract)* পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অন্যতম। একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী যুগে যুগে মানব সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর অমর গ্রন্থ 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' প্রকাশিত হলে ফরাসী জনগণ মুক্ত কণ্ঠে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। ফরাসী বিপ্লবে তাঁর ভূমিকা হয়ে ওঠে অতুলনীয়। 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে সর্বত্র শৃঙ্খলিত" ("Man is born free but everwhere he is in chains.")। তাঁর দর্শনের মূল কথাও তাই। প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সংসারের ঘূর্ণাবর্তে সকলকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করতে হয়।

তাঁর জীবনী
His life Sketch

রুশো ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে জেনেভায় (Geneva) এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণের পর তাঁর মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দক্ষ ঘড়ি মেরামতকারী। তবে তিনি সুস্থ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন না। তাঁর চরিত্রে কোন স্থিরতা ছিল না। তাই তিনি সন্তানের লালনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে ব্যর্থ হন। রুশোর বয়স যখন ১০ বছর, তখন তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর ভাইয়ের নিকট রেখে জেনেভা থেকে পলায়ন করেন। বাল্যকালে রুশো অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। কিছুদিন তিনি এক নিষ্ঠুর নক্সা অঙ্কনকারী খোদাইকারীর অধীনে শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করেন এবং অনেক তিরস্কার-গঞ্জনা সহ্য করেন। যখন তার বয়স ১৬, তখন তিনি জেনেভা পরিত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে বের হন এবং সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে ভবঘুরে জীবন অতিবাহিত করেন। এ ভবঘুরে জীবনে তিনি অনেক উপকারী ও মহৎ লোকের সান্নিধ্যে আসেন, কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করার সঙ্কল্প তাঁর ছিল না। তাঁর অহঙ্কার ও অশোভন আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বন্ধুদের ক্ষুব্ধ করেছে। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভেনিসের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন, কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে ঝগড়া করে তা পরিত্যাগ করেন। তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন এবং শান্তশিষ্ট হয়ে বসবাস করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিজনের (Dijon) একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত এক রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। রচনার বিষয়বস্তু ছিল-'বিজ্ঞান ও কলার অগ্রগতি মানবের পক্ষে কী শুভ হয়েছে? ('Have the arts and sciences conferred benefits on mankind?')। রুশো এ প্রবন্ধে বর্ণনা করেন, বিজ্ঞান ও কলার অগ্রগতি মানবের জীবনে কৃত্রিম প্রয়োজন সৃষ্টি করে মানবের স্বভাবজাত যে নির্মল নৈতিকতা তা বিনষ্ট করেছে। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত 'ডিসকোর্স অন ইকুয়ালিটি *(Discourse on Equality)* প্রবন্ধ তিনি তাঁর এ

ভাবধারা আরও সুস্পষ্ট করে তোলেন এবং বলেন যে, 'মানুষ স্বাভাবিকরূপে সৎ, কিন্তু প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সহজাত সততা নষ্ট করেছে" ("Man is naturally good and only by institutions is he made bad")। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়–একটি হলো শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, 'এমিল' *(Emile)*, এবং অন্যটি 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' *(Social Contract)*। 'এমিল' প্রকাশিত হবার পর তাঁর জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তার এক ভাব। কেননা তা যাজক শ্রেণীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। প্যারিসের আর্চবিশপ ও ফরাসী পার্লামেণ্টও তাকে নিন্দা করে। জেনেভার (Geneva) সরকারও বইটিকে 'অসৎ গ্রন্থ' বলে চিহ্নিত করে। এ প্রবন্ধে তিনি শিশুদের শিক্ষাকে যাজক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে উপদেশ দেন এবং ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেন। এর পর থেকে তিনি ভবঘুরের মত জীবন কাটান। জার্মানীতে গিয়ে তিনি মহামতি ফ্রেডারিকের বন্ধুত্ব লাভ করেন, কিন্তু তিন বছর পর স্থানীয় পর্যায়ে সন্দেহের উদ্রেক হলে তিনি জার্মানী ত্যাগ করেন। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করেন এবং ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় জর্জ (George III) তাঁর জন্য এক পেনসনের ব্যবস্থা করেন। এখানে তিনি হিউম ও বার্কের (Hume and Burke) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। বার্ক কিন্তু রুশোর অহঙ্কারকে অসহনীয় মনে করেন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব হয় ক্ষণস্থায়ী। হিউম রুশোকে ভালবাসেন। এখানেও রুশো সব কিছুকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে তিনি প্যারিস গমন করেন। দারিদ্র্যের মধ্যে কাল কাটিয়ে অবশেষে রুশো ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে আত্মহত্যা করে জীবনের অবসান ঘটান।

তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ
His Political Thought

জঁা জ্যাক রুশো ছিলেন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা। তাঁর মতে, ব্যক্তি স্বাধীন এবং মুক্ত। ব্যক্তি স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সমগ্র জীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকা প্রয়োজন। যে কোন সমাজ অথবা রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের উচিত ব্যক্তির জীবনে মুক্তি ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা। তা হলে সে সমাজ অথবা রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান হবে আদর্শ স্থানীয়। তিনি তাঁর চিন্তাধারায় হব্‌স ও লকের চিন্তাস্রোতের সমন্বয় সাধন করেন। হব্‌সের ন্যায় তিনি বলেন, ব্যক্তি সার্বভৌম এবং সর্ব প্রকার নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। লকের ন্যায় তিনি বলেন, ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্যই রয়েছে রাষ্ট্রীয় সমাজ এবং সরকার। তাঁর মৌলিক বক্তব্য হলো, সভ্যতা ও কৃত্রিমতাই মানবজীবনে এনেছে নীচতার গ্লানি।

রুশোর চিন্তাধারায় বহুমুখী প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি গ্রীক এবং রোমানদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের প্রতি ছিল তাঁর এক বিরাট আকর্ষণ। অনেকের মতে, গ্রীক নগর রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর দুর্বলতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, রুশো তাঁর সমগ্র বাল্যকাল কাটিয়ে ছিলেন জেনেভায়। জেনেভা ছিল একটি ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র। তা ছিল 'এক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের জগতে অবশিষ্ট কয়েকটি সাধারণতন্ত্রের একটি'। তাই তিনি নগর রাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি প্লেটো এবং এরিস্টটলের ন্যায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং পরোক্ষ গণতন্ত্রকে অপছন্দ করতেন। তিনি এরিস্টটলের ন্যায় মনে করতেন যে, রাষ্ট্রের আয়তন হওয়া উচিত ক্ষুদ্রতর এবং জনসংখ্যা হওয়া উচিত ক্ষুদ্র, যাতে নাগরিকরা পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদের এ প্রভাব ব্যতীত তিনি সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণের দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ইংল্যাণ্ডের জন লক তাঁর চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। তাছাড়াও তিনি জার্মানীর জোহান্‌স আলথুসিয়াস (Johannes Althusius) এবং পিউফেনডর্ফ (Pufendorf) ও ফরাসী দার্শনিক মতেঁস্কু (Montesquieu) কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হন।

রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য

State of Nature

অতীতের অনেক চিন্তাবিদের ন্যায় রুশোও শুরু করেছেন 'প্রকৃতির রাজ্য' থেকে। হব্‌স এবং লকের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাস করত। তবে সেই প্রকৃতির রাজ্য হব্‌সের প্রকৃতির রাজ্যের অনুরূপ ছিল না। তা ছিল অনেকটা লকের অঙ্কিত প্রাকৃতিক অবস্থার ন্যায়। রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল পৃথিবীতে স্বর্গের ন্যায়। মানুষ ছিল সুখী, আনন্দবিহ্বল এবং পরিপূর্ণ। মানুষের জীবন ছিল সৎ, স্বাভাবিক এবং সুন্দর। প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন কৃত্রিমতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ছাপ ছিল না, ছিল শুধু সুখ ও সম্প্রীতি। মানুষ সুখী, সহজ, সরল এবং সততার জীবনে অভ্যস্ত ছিল। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিয়ে অধ্যাপক ডানিং (Dunning) বলেন, 'প্রাকৃতিক মানুষের মধ্যেই ছিল পরিপূর্ণ সুখের উপাদানগুলো। সে ছিল স্বাধীন, পরিতুষ্ট এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ' ("In the natural men are to be found the elements of perfect happiness. He is independent, contented and self-sufficing")। কিন্তু প্রকৃতির এ অবস্থা ছিল অনিশ্চিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব অনুভূত হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হয় এবং ব্যক্তিগত মালিকানা দানা বাঁধতে থাকে। সাম্য বিনষ্ট হয় এবং মানুষের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে ওঠে। কেউ ধনী হয়ে ওঠে, আবার কেউ দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত হতে থাকে। এভাবে সমাজ জীবনে নেমে আসে বিবাদ-বিসম্বাদ, স্বার্থপরতা, নীচতা এবং ফলে বিভেদের সূত্রপাত হয়। মানুষ ক্রমে ক্রমে অনুভব করে যে, প্রকৃতির রাজ্যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাই তারা চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

রুশো কর্তৃক অঙ্কিত প্রকৃতির রাজ্যের চিত্রটির ভিত্তি মানুষের প্রকৃতি। মানুষের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে তিনি প্রকৃতির রাজ্যের এ আদর্শিক মধুর (idyllic) ছবি অঙ্কিত করতে সক্ষম হন। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি পরস্পরবিরোধী মত পোষণ করা হয়েছে। মেকিয়েভেলি ও হব্‌সের ন্যায় চিন্তাবিদগণ মত প্রকাশ করেন যে, মানুষ স্বভাবত মন্দ, ক্ষমতালোলুপ, স্বার্থপর, হিংসুটে এবং নীচ প্রকৃতির। ক্ষমতার প্রভাব ব্যতীত মানুষ ভালভাবে চলতে পারে না। তাই মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে, সুষ্ঠু নাগরিক হিসেবে এবং সর্বোপরি সৎ মানুষ হিসেবে বাঁচতে দেবার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন শক্তিশালী শাসকের এবং ক্ষমতাশালী শাসনব্যবস্থার। অন্যদিকে প্লেটো, লক ও রুশোর মত চিন্তাবিদগণ মানুষকে স্বাভাবিকভাবে ভাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, মানুষ সৎ, বন্ধুভাবাপন্ন, সহৃদয় এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। রুশো বলেন, মানুষ সুন্দর এবং সাধু। তাঁর মতে অনিষ্টকর প্রবণতা, দুর্নীতিপরায়ণ ভাব বা স্বার্থপরতা সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি। সুতরাং তাঁর বক্তব্য হলো, মানুষকে সৎ ও মুক্ত জীবনের অধিকারী করতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নততর করতে হবে। আদর্শ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সামঞ্জস্য বিধান হবে। তাই তিনি 'সামাজিক চুক্তি মতবাদের' আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রুশোর চুক্তি

রুশোর মতে, একমাত্র চুক্তির উপর ভিত্তিশীল একটি সমাজ তার সদস্যদের জন্য নৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিধান করতে পারে। এ ব্যবস্থায় কর্তৃত্বের সাথে আনুগত্যের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়। তিনি বলেন যে, কোন মানুষ অন্য আর একজন মানুষের উপর স্বাভাবিকভাবে কর্তৃত্বের প্রয়োগ করতে পারে না। তিনি আরও বলেন, বল প্রয়োগের মাধ্যমে আইনগত কর্তৃত্বের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং আইনগত কর্তৃত্বের মূল ব্যক্তির সম্মতি। এ সম্মতির মূল তাই সামাজিক চুক্তি। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাজ গঠনে সক্ষম হয়।

তবে রুশোর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে সামাজিক চুক্তির শর্ত ছিল দুটি। **প্রথমত,** মানুষ তার দেহ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সমগ্র জনসমাজের সমর্থন পাবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে এক রাজনৈতিক সমাজে সংগঠিত করে। **দ্বিতীয়ত,** মানুষ চুক্তি সম্পাদনের সময় যথাসম্ভব স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য নিজেদের হাতে রেখে দেয়। তাঁর মতে, নিম্নলিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয় ঃ 'আমাদের প্রত্যেকে তাঁর দেহ এবং তার সকল ক্ষমতা যৌথভাবে সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে স্থাপন করে এবং আমাদের সম্মিলিত সামর্থ্যে আমরা প্রত্যেক সদস্যকে সমগ্র সত্তার একটি অবিভাজ্য অংশরূপে গণ্য করি' ('Each of us puts into a single mass his person and all his power under the supreme direction of the General Will; and we receive as a body each member as an indivisible part of the whole.')[১]।

এভাবে চুক্তি সম্পাদনের ফলে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক সদস্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করে এক যৌথ ব্যক্তিত্বের (collective body) সৃষ্টি করে। রুশোর মতে, এ যৌথ ব্যক্তিত্বের নাম 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will)। এ যৌথ ব্যক্তিত্ব এর ঐক্য। তার সাধারণ পরিচয়, জীবন এবং ইচ্ছা আসে চুক্তিবদ্ধ সদস্যদের ব্যক্তিত্ব থেকে। চুক্তির ফলে যে 'সাধারণ ইচ্ছার' জন্ম হলো তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ **প্রথম,** প্রত্যেক সদস্য তার অধিকার রাজনৈতিক সমাজকে দান করে। তবে শর্তগুলো সকলের সমান হওয়ায় 'সাধারণ ইচ্ছা' অত্যাচারী হতে পারে না বরং সকলে 'সাধারণ' ইচ্ছার' অংশ হিসেবে রাজনৈতিক সমাজের কর্তৃত্বের সমানভাবে অংশীদার হয়ে ওঠে। **দ্বিতীয়,** চুক্তির অধীনে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং সকলেই লাভবান হয়েছে। সকলের নিকট যে যা দান করেছে সমাজের অবিভাজ্য অংশ হিসেবে পুনরায় সে তা ফিরে পেয়েছে। **তৃতীয়,** প্রত্যেক সদস্য যা দান করেছে বা সমর্পণ করেছে তা কোন দায়িত্বহীন সার্বভৌমের নিকট দান করেনি, যেমনটি হয়েছিল হব্‌সের ক্ষেত্রে, বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যা দান করেছে তা একটি সত্তার নিকট দান করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এ সত্তার উপাদান হিসেবে বা অবিভাজ্য অংশ হিসেবে সে সত্তার উপর সমপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। **চতুর্থ,** সামাজিক চুক্তির দ্বারা যে 'সাধারণ ইচ্ছার' জন্ম হয় তা প্রত্যেকের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য।

রুশোর মতে, চুক্তি দ্বারা প্রত্যেক সদস্য তার দেহ ও তার সকল ক্ষমতাকে যৌথভাবে সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে স্থাপন করে এবং প্রত্যেকে সমগ্র সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। হব্‌সের মতে এ চুক্তি কোন দাসত্বের দলিল নয়। এ চুক্তি মানুষকে কোন স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকের অধীনস্থ করেনি। লকের মতে এ সাধারণ ইচ্ছা সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর প্রভুত্ব কায়েম করেনি। এ চুক্তি বরং নৈতিক এক সত্তার সৃষ্টি করে।

সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব
Theory of General Will

'সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বকে' (Theory of General Will) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়ে থাকে। অনেকের মতে, এ ধারণা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূর্ত প্রতীক এবং রাজনৈতিক দর্শনের চরম প্রকাশ। আবার অনেকে একে 'কল্পিত রূপরেখা' (fiction) বলেও আখ্যায়িত করেন। আসল কথা, 'সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিশারী, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে রুশোর শ্রেষ্ঠতম অবদান।

রুশোর মতে, চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পর 'সাধারণ ইচ্ছার' জন্ম হয়। সাধারণ ইচ্ছা 'সকলের ইচ্ছা' অথবা 'অধিকাংশের ইচ্ছা' (Will of all or will of the majority) নয়। সকলের ইচ্ছা হলো সকল নাগরিকের ইচ্ছার সমষ্টি, কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা সকলের মঙ্গলার্থে সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হলে নাগরিকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যবধান দূর হয়।

---

১. Jean Jacques Rousseau, *Social Contract ঃ Principles of Political Right.*

সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য হলো প্রত্যেক নাগরিকের কল্যাণ সাধন। সাধারণের কল্যাণই সাধারণ ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ইচ্ছা সকলের বা অধিকাংশের বা সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছা কিনা, এ ক্ষেত্রে তা নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা, সাধারণ ইচ্ছা সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনের উপায়। কোন কোন সময়ে তা সকলের ইচ্ছাও হতে পারে, আবার কোন কোন সময়ে তা অধিকাংশের ইচ্ছাও হতে পারে।

তিনি বলেন, একজন ব্যক্তির 'ব্যক্তিগত ইচ্ছা' (Actual Will) ও "প্রকৃত ইচ্ছা" (Real Will) থাকতে পারে। ব্যক্তির ইচ্ছা তার স্বার্থ বিজড়িত ইচ্ছা। তা ব্যক্তির স্বার্থভিত্তিক। কিন্তু প্রকৃত ইচ্ছা ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত ইচ্ছা। তা সমাজের সাধারণ কল্যাণে নিয়োজিত। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রকৃত ইচ্ছা চিরস্থায়ী। একটি সীমিত গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু অন্যটি সীমাহীন কল্যাণ অর্জনে ব্রতী হয়। রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will) ব্যক্তি সমষ্টির প্রকৃত ইচ্ছার সমষ্টি (sum total of real will)। 'সাধারণ ইচ্ছার' উল্লেখযোগ্য দিক হলো- "তা সাধারণের জন্য ইচ্ছা; সাধারণ জনগণ কর্তৃক ইচ্ছা প্রকাশিত হতে নাও পারে" ("What is important about General Will is that it wills general and not that it is willed by the generality.")।

রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' অভ্রান্ত, অবিভাজ্য, চিরস্থায়ী এবং হস্তান্তরের অযোগ্য। এটি অপরাজেয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে কোন সংঘাত বাধলে সাধারণ ইচ্ছা সর্বদা জয়ী হয়। সাধারণ ইচ্ছাই সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি। সাধারণ ইচ্ছা নিঃস্বার্থ।

সাধারণ ইচ্ছা নিঃস্বার্থ দুভাবে ঃ **(এক)** সাধারণ ইচ্ছা সব সময় সাধারণ কল্যাণের দিকে নজর রাখে এবং সাধারণ স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে তা সংযুক্ত। **(দুই)** সাধারণ কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে তা জনহিতকর চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। যদি সমাজের সদস্যগণ শুধু ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ পরিত্যাগ করে এবং সাধারণ স্বার্থের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করে তবে তা 'সাধারণ ইচ্ছায়' রূপান্তরিত হয়। রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' অবশ্যই সাধারণ হবে। শুধু এর উদ্দেশ্যই নয়, তা অবশ্যই সমাজের প্রত্যেক সদস্যের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করবে এবং গঠনের দিক থেকে তা অন্তত্পক্ষে অধিকাংশের মতকে প্রতিফলিত করবে।

সরকার 'সাধারণ ইচ্ছার' ভৃত্য। 'সাধারণ ইচ্ছা' সকল ক্ষমতার উৎস। সুতরাং সরকারের কোন মৌলিক ক্ষমতা নেই। সরকার 'সাধারণ ইচ্ছার' মতানুযায়ী কার্যকর থাকে। রাষ্ট্র সর্বজনীন এবং সার্বভৌম। সরকার সে সার্বভৌম ক্ষমতার ন্যাসী। সুতরাং সরকারের ক্ষমতা সীমিত।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা সকলের ইচ্ছা' থেকে স্বতন্ত্র। সকলের ইচ্ছায় জড়িত থাকে সদস্যের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কিন্তু 'সাধারণ ইচ্ছা' সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ইচ্ছা। রাষ্ট্র যেমন শুধু নাগরিকদের সমষ্টি মাত্র নয় বরং তার উর্ধ্বে এক বিশিষ্ট সত্তা, তেমনি 'সাধারণ ইচ্ছা' সকলের ইচ্ছার উর্ধ্বে এক পরিচ্ছন্ন, সাধারণ কল্যাণের অনুভূতিসম্পন্ন ইচ্ছা। তা মাথা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না, বরং হৃদয় বিচার করে তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণ ইচ্ছা এ জন্য অভ্রান্ত যে, তার যথার্থ প্রকৃতি অনুযায়ী তা সাধারণ কল্যাণ ব্যতীত কিছুই চিন্তা করে না।

রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। **প্রথম,** বলা হয় যে, 'সাধারণ ইচ্ছা' অত্যন্ত অস্পষ্ট এক মতবাদ। সাধারণ কল্যাণের জন্য যে ইচ্ছা, রুশোর মতে তাই সাধারণ ইচ্ছা। কিন্তু কোন্ অবস্থা বা কোন্ বাস্তব পরিস্থিতিতে আমরা এর সন্ধান লাভ করতে পারি এই বিষয়ে রুশোও নিশ্চিত নন। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন, জনসমাজের সকল সদস্য যখন একমত হয়, তখন সাধারণ ইচ্ছা পাওয়া যায়, যদিও সকলের ইচ্ছা 'সাধারণ ইচ্ছা' নয়। কোন কোন সময়ে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে 'সাধারণ ইচ্ছা' বলে আখ্যায়িত করেন। আইন প্রণেতাদের সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতে এও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সোলোনের (Solon) ন্যায় একজন ব্যক্তির মাধ্যমেও 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রকাশিত হয়। সুতরাং

'সাধারণ ইচ্ছার' অবস্থান কোথায়, কীরূপে তা কার্যকর হয়, এ সব প্রশ্ন রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বকে অত্যন্ত ঘোলাটে করে তুলেছে।

দ্বিতীয়, রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারকে আরও শক্তিশালী করেছে, যদিও তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা। যে ব্যক্তি বা সমষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠের 'সাধারণ ইচ্ছার' সাথে একমত হতে পারে না, রুশোর মতে, তাকে স্বাধীন হতে বাধ্য করা হবে (forced to be free)। অন্য কথায়, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয় না, তাদের কোন স্বাধীনতা নেই। রুশোর মতে, ব্যক্তি তার সকল ক্ষমতা 'সাধারণ ইচ্ছার' নিকট সমর্পণ করে এবং 'সাধারণ ইচ্ছা' সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে শাসন করে। রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন রক্ষাকবচ নেই।

তৃতীয়, রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' সামাজিক ন্যায়নীতির একমাত্র মানদণ্ড। তিনি বলেন, ন্যায়নীতি অনুসারে কর্মসম্পাদনের অর্থ 'সাধারণ ইচ্ছার' অনুসরণ করা। কিন্তু 'সাধারণ ইচ্ছা' কিভাবে ন্যায়নীতির মানদণ্ড তা সুস্পষ্ট নয়।

চতুর্থ, তাঁর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার শ্রেষ্ঠতম রক্ষাকবচ, কিন্তু কিভাবে তা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করে তা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া, আধুনিক বহুজাতিক রাষ্ট্রে সাধারণ স্বার্থরক্ষা অত্যন্ত কঠিন। এ সকল ক্ষেত্রে রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব প্রয়োগযোগ্য নয়।

পঞ্চম, রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' অপ্রতিনিধিত্বমূলক। এ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম শুধু জনগণ। তাঁর প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কি তা হলে এ তত্ত্ব অচল ?

সর্বশেষ, এও বলা যেতে পারে যে, 'সাধারণ ইচ্ছার' বাস্তবায়ন শুধু রাষ্ট্রীয় সংকট কালেই সম্ভব, কেননা তখন সকলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে সমষ্টিগত স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়।

এ সকল সমালোচনা সত্ত্বেও রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। জর্জ কাতেবের (George Kateb) মতে, 'সাধারণ ইচ্ছার' তত্ত্বই রুশোর মৌলিক অবদান' ('The central idea in Rousseau's political thought is the idea of the General Will')। ব্রাডলি (Bradley), বোসাঙ্কেট (Bosanquet), গ্রীন (Greene), হেগেল (Hegel) ও কাণ্টের (Kant) মত আদর্শবাদী চিন্তাবিদ্‌দের হাতে রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব নতুনভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাত্ত্বিক ক্ষেত্র ছাড়াও ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ফরাসী বিপ্লবের মূল শ্লোগান–সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—রুশোর সাধারণ ইচ্ছারই বাস্তব রূপ। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও এর প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়েছে। সাধারণ ইচ্ছা বাস্তবে কতটুকু প্রয়োগযোগ্য তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু আদর্শ হিসেবে তা মৃত্যুঞ্জয়ী।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় রুশোর অবদান

His Contributions

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় রুশোর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য অনেক সমালোচক তাঁর অবদান সম্পর্কে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নি এবং তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিগণের অনেকে তাঁর সঠিক মূল্যায়নে কার্পণ্য করেছেন। ভলটেয়ারের (Voltaire) মতে, রুশোর 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থটি অতি নিম্নমানের এবং তিনি বিদ্রূপ করে বলেন "তা তাঁর মনে হামাগুড়ি দেবার বাসনা জাগিয়েছিল।" অন্য কথায়, এ গ্রন্থ কোন উন্নত চিন্তার জন্ম দেয় নি, বরং অবনতির পথেরই সন্ধান দিয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের এবং অধিকারসমূহের বিশ্লেষণে রুশো যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, এডমাণ্ড বার্ক (Burke) ও মর্লি (Morley) সেই পদ্ধতিকে নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেন। অধ্যাপক ডানিং (Dunning) রুশোর অবদান সম্পর্কে যা বলেন, তাও অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে এবং তা নিন্দাবাদের নামান্তর। তাঁর মতে,

'রুশোর শিক্ষা ছিল ইঙ্গিতসূচক, সিদ্ধান্তমূলক নয় এবং তাঁর কল্পনা ছিল ভুলে ভরা এবং চুক্তিসমূহ আবেগ প্রবণ'।

কিন্তু এত সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাক্ষেত্রে রুশোর আবেদন বিন্দুমাত্র কমে নি, বরং কালক্রমে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা প্রত্যহ বৃদ্ধি পাচ্ছে' ('It is increasing everyday')। নতুন নতুন লোক যখন রুশোর গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে, তখন তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের স্থায়ী মূল্যের সাথে পরিচিত হবে। অধ্যাপক জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H. Cole) তাই সত্যই বলেন, "সোশ্যাল কনট্রাক্ট" গ্রন্থটিকে রাজনৈতিক দর্শন আলোচনার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থসমূহের অন্যতম এবং সত্যানুসন্ধ স্থায়ী মূল্যের সৃষ্টিকারী।

প্রথমত, রুশোর চিন্তাধারায় রয়েছে সত্যের এক বিশিষ্ট উপাদান। তাঁর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব অস্পষ্ট মনে হলেও এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, সমাজ জীবনকে যা সম্ভব করে, তা 'সাধারণ ইচ্ছা' অথবা সাধারণ উদ্দেশ্যাবলীর সাধারণ চেতনা ও অনুভূতি। রুশো এ সত্যের সন্ধান দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় এক স্থায়ী অধ্যায় সংযোজন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রকে সৎ জীবনের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত এবং মানুষের নৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপকরণ হিসেবে বর্ণনা করেন। এরিস্টটলের মত তিনি ঘোষণা করেন, "মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব এবং একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সে পূর্ণতার আস্বাদ পেতে পারে।" রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সুষ্ঠু ধারণা ছিল। মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদগণের ন্যায় তিনি কখনও বলেন নি যে, রাষ্ট্র মানুষের আদি পাপের ফলস্বরূপ। অন্যদিকে মেকিয়েভেলি (Machiavelli) অথবা হব্‌সের (Hobbes) ন্যায় তিনি কখনো রাষ্ট্রকে মানুষের অসামাজিক বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার অস্ত্র হিসেবে কল্পনা করেন নি। তিনি এরিস্টটলের ন্যায় বলেন, রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে নাগরিকের সৎ জীবনযাপন সম্ভব হয়। এ দিক দিয়ে তিনি জার্মানীর কাণ্ট (Kant) ও হেগেলের (Hegel) পথ প্রদর্শক এবং বৃটেনের ব্রাড্‌লি (Bradley) ও গ্রীনের (Greene) পূর্বসুরি। তাঁদের ন্যায় তিনি বলেন, রাষ্ট্র একটি নৈতিক জীব এবং নাগরিকেরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নৈতিক জীবনের আস্বাদ লাভ করে।

তৃতীয়ত, সার্বভৌম তত্ত্বের বিকাশেও রুশোর অবদান অসামান্য। তিনি 'সাধারণ ইচ্ছার' মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার স্থান নির্ণয় করে আধুনিক গণ সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) সূত্রপাত করেন। রুশোর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদগণের লেখায় সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধিকার সংরক্ষণের উপায় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। জন লক গণ-অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তবে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সম্পর্কে তিনিও সুস্পষ্ট ছিলেন না। কিন্তু রুশোর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হয়ে উঠে জনসাধারণ।

চতুর্থত, রুশো ছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতার দিশারী। তিনি বিশ্বাস করতেন, "জনগণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী" (*Vox populi vox dei*)। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন আবেদনময় বক্তব্য খুব কম চিন্তাবিদ দিয়েছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উদ্‌গাতা রুশো সর্বকালের, সর্বযুগের গণদাবির প্রতীক স্বরূপ।

এ সকল কারণে রুশোর অবদান অত্যন্ত যুগান্তকারী হয়ে ওঠে। তাঁর অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক হার্নশ (Hearnshaw) যা বলেন তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "রুশো জনগণকে রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎসরূপে প্রদর্শন করেন। তিনি সাধারণ কল্যাণকে সরকারের যথার্থ লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, "রাষ্ট্র একটি সামাজিক ও নৈতিক জীব এবং একটি জীব হিসেবে তার সাধারণ বিবেক ও একটি সাধারণ ইচ্ছা রয়েছে।" তিনি বলেন, "রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের সঠিক ভিত্তি সম্মতি। তিনি সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের চরম পুনর্মিলনের সম্ভাবনা ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শবাদিগণের মধ্যে তিনি এক উচ্চ আসনের অধিকারী।"

তাছাড়া, পরবর্তী ঘটনাবলীর উপর রুশোর গভীর প্রভাব ছিল। **প্রথমত,** তাঁর রচনাবলী ফরাসী বিপ্লবের (French Revolution) পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়। **দ্বিতীয়ত,** তিনি বিপ্লবের পরিবেশ রচনায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এ ক্ষেত্রে শুধু তাঁর রাজনৈতিক দর্শনই কার্যকর হয়েছিল তা নয় বরং তিনি বিপ্লবীদের বাণী এবং শ্লোগান প্রভৃতিও যোগান দেন। তাঁর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতাংশগুলো উত্তেজিত জনতাকে পড়ে শোনান হতো। **তৃতীয়ত,** সর্বযুগে ও সর্বদেশে কোন বিপ্লবী তাঁর বাণী ও বক্তব্য ব্যতীত তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে পারেন না। **সর্বশেষে,** তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইউরোপকে তার জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থা পরিহার করে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার পদক্ষেপে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উদ্বুদ্ধ করেন।

রুশোর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মতবাদ অবশ্য রয়েছে। মর্লির মতে, রুশো চিন্তার পদ্ধতি কখনও নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন নি। বার্ক (Burke) বলেন, রুশোর চিন্তাধারা অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন। রুশোর প্রাকৃতিক জীবনের প্রতি আকর্ষণকে অনেকে 'সভ্যতার নিম্নস্তরে নামার অপচেষ্টা' বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণই অনেকটা শালীনতাবিহীন ছিল। তাঁর রচনাশৈলীও খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। তিনি কোন সময়ই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহকারে কোন শব্দ বা পদ ব্যবহার করেন নি।

তথাপি বলতে হবে, তিনি ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্লেটো ও এরিস্টটল ব্যতীত অন্য যে কোন চিন্তাবিদের অন্তর্দৃষ্টি অপেক্ষা ছিল গভীরতর। রুশো উদ্ভাবিত 'সাধারণ ইচ্ছার' (General Will) ধারণা এমন মোহময় এক দর্শনে পরিণত হয় যা পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

তাই বলতে পারি, আধুনিক বিশ্ব সৃষ্টিতে রুশোর প্রভাব ছিল যুগান্তকারী। তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের শীর্ষস্থানীয় অগ্রদূত। রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি এবং সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি মৌল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ল্যানসনের (Lanson) মতে, "তাঁকে আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি প্রবেশ পথে দেখা যায়।" অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেন, "বর্তমান বিশ্বে এমন অর্ধডজন ব্যক্তি নেই যারা আমার মনকে এমনভাবে অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছে।"

১। জাঁ জ্যাক রুশোর চিন্তাধারার বিবরণ দাও। (Discuss the political thought of Jean Jacques Rousseau.)

২। রুশো কর্তৃক অঙ্কিত প্রকৃতির রাজ্যের বিবরণ দাও। (Describe the state of nature as drawn by Rousseau.)

৩। রুশোর মতে কিভাবে রাষ্ট্র সংগঠিত হয়? (How did the state come into being according to Rousseau?)

৪। 'সাধারণ ইচ্ছার' প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the nature and characteristics of General Will.)

৫। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় রুশোর অবদান কী? (What are the contributions of Rousseau to political thought?)

৬। রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' সম্পর্কে আলোচনা কর। [Discuss Rousseau's General Will.)

[R, U, 1980, '82; D. U. 1982, '84, 2002, 2007]

সূচনা
Introduction

আধুনিককালের ইতিহাসে কার্ল মার্কস একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। সমাজতন্ত্রকে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করেন এবং কল্পনা বিলাস পরিত্যাগ করে ঐতিহাসিক কার্যকরণের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন এবং কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে তার দিক নির্দেশ করেছেন।" তাই কার্ল মার্কসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের (Scientific Socialism) জনক এবং পুরোহিত বলা হয়।

জীবনী
Life Sketch

কার্ল মার্কস (Karl Marx) প্রুশিয়ার (বর্তমানে জার্মানী) রাইনল্যাণ্ড (Rhineland) প্রদেশের ট্রিভস নামক স্থানে ১৮১৮ সালে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হারশেল মার্কস (Herschel Marx) ছিলেন একজন আইনজীবী। তাঁর মাতা ছিলেন হল্যাণ্ডের অধিবাসী।

বাল্যকালে মার্কস একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্থানীয় গ্রামার স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নে চরমপন্থী মতবাদের জন্য তা কোনদিন সম্ভব হয় নি। তাঁর বন্ধু ও সহযোগী বয়ার (Bauer) দেশ থেকে বিতাড়িত হন। তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন নি। ১৮৪১ সালে তিনি রাইনিস জেইতুং (Rheinishe Zeitung) নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু সংবাদপত্রটির চরম ভাবাদর্শের জন্য তা ১৮৪২ সালে বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৪৩ সালে মার্কসকে প্রুশিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়।

মার্কস প্রুশিয়া থেকে প্যারিসে গমন করেন এবং সেখানে তিনি তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (Friedrich Engels) সাথে পরিচিত হন। এঙ্গেলসের পিতা ছিলেন একজন ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ী। ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারে তাঁর ছিল কাপড়ের কারখানা। এঙ্গেলসের সাথে পরিচিত হয়ে মার্কস শিল্প ব্যবস্থা ও শ্রমিক জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পান। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ১৮৪৮ সালে **কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো** (*The Communist Manifesto*) প্রকাশিত হয়। এ বইটি প্রকাশ হবার পর মার্কসকে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফ্রান্স থেকে তিনি ব্রাসেলসে যান। অল্প কিছুদিন পরে সেখান থেকেও তিনি বিতাড়িত হন। অবশেষে তিনি ইংল্যাণ্ডেই গমন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডেই তিনি বসবাস করেন। ইংল্যাণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি প্রুঁধোর (Proudhon) সাথে পরিচিত হন। জার্মানীতে অবস্থানকালে হেগেলের (Hegel) দার্শনিক তত্ত্বের সাথে তার পরিচয় ঘটে। এভাবে তিনি নিজের দর্শনে পরিচিত স্রোতধারার সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **দাস ক্যাপিটাল** (*Das Capital*)। এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো **দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি** (*The Critique of Political Economy*) **১৮৫৯, ভ্যালু প্রাইস এণ্ড প্রফিট** (*Value, Price and Profit*), ১৮৬৭, **দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স** (*The Civil War in France*), ১৮৭১।

কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র
Scientific Socialism of Karl Marx

কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের অন্যান্য শাখাকে এবং অতীতের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে 'কাল্পনিক' এবং কল্পনাবিলাসী। (utopian) বলে চিহ্নিত করেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। মার্কসের সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলা হয় এ জন্য যে, নতুন শিল্পায়িত সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এবং তার ভবিষ্যৎ পর্যালোচনায় মার্কস অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসে অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি শুধু বর্ণনামূলক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ঐতিহাসিক কার্যকরণের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন এবং সমাজতন্ত্রকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব তার সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। তাই মার্কসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক ও পুরোহিত বলা হয়।

অন্যদিকে কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিকগণ মহান দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের দরিদ্র এবং সর্বহারাদের দুঃখ-দুর্দশা অবলোকন করলেও কিভাবে তাদের দুঃখ লাঘব হবে তার দিক নির্দেশ করতে সক্ষম হননি। তাঁরা ছিলেন অনেকটা ভাববাদী, আকাশচারী, কিন্তু মার্কস ছিলেন বাস্তববাদী এবং তার বিশ্লেষণ পদ্ধতি ছিল বিজ্ঞানসম্মত। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূল সূত্রগুলো হলো ঃ **(এক) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, (দুই) উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব, (তিন) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ, (চার) শ্রেণী সংগ্রাম, (পাঁচ) সামাজিক বিপ্লব ও সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র, এবং (ছয়) শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের তিরোধান।**

(এক) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
Dialectical Materialism

দার্শনিক হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্ল মার্কস ইতিহাসের ধারাকে দ্বন্দ্ববাদের দ্বারা বিশ্লেষণ করেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের মূলে আছে ভাবের ক্রিয়া, কিন্তু মার্কসের মতে জড়বস্তুই সমাজে নিরন্তর পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। হেগেলের দৃষ্টিতে ভাবই সব সৃষ্টির মূলে, কিন্তু মার্কস বলেন বস্তুজগতই একমাত্র বাস্তব। এ ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তাই সমাজে পরিবর্তন আনয়ন করে। মার্কসের মতে, পৃথিবী প্রকৃতিগতভাবে বস্তুবাদী। জড়বস্তুর গতি অনুসারে বিশ্বে অগ্রগতির ধারা প্রভাবিত হচ্ছে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, বস্তুবাদী পৃথিবী যেমন মুখ্য এবং ভাব যেমন গৌণ, সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তেমনি মুখ্য এবং তাত্ত্বিক উন্নতি তেমন গৌণ। সমাজে অর্থনৈতিক উন্নতি একটি বৈষয়িক সত্য এবং তা মানুষের চিন্তাধারা থেকে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল। মানুষের চিন্তাচেতনা এ বৈষয়িক সত্যের প্রতিফলন ('It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness.)।

(দুই) উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব
Surplus Value Theory

কার্ল মার্কসের মতে, কোন সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে তা উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শ্রম (labour) ব্যয় হয় তার উপর। অন্য কথায়, শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণ হওয়া উচিত অনেক বেশি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য শ্রমিকরা সর্বদা বঞ্চিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমি, কলকারখানা, পুঁজি, ব্যাংক, বীমা এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে। শ্রমিকগণ একান্তই দুর্বল। তাদের শক্তি একমাত্র কায়িক পরিশ্রম, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবল। তাই তারা পুঁজিপতিদের নিকট শ্রম বিক্রয় করে। পুঁজিপতিগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং শ্রমিকরা যা উৎপাদন করে তা অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প মজুরি দিয়ে শুধু তাদের বেঁচে থাকার সুযোগ দান করেন। বাকিটুকু পুঁজিপতিগণ মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করেন।

শ্রমিকরা যে মজুরি লাভ করে তা উৎপন্ন করতে তাদের সময় লাগে মোট ব্যয়িত সময়ের এক–চতুর্থাংশ বা তারও কম। অন্য কথায়, শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের জন্য বাড়তি সময় শ্রম দান করে এবং এই বাড়তি মূল্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খাজনা, সুদ, মুনাফা প্রভৃতির আকার ধারণ করে। পুঁজিপতিরা নিজেরা তা উপভোগ করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এই বাড়তি মূল্যের বিলোপসাধন করতে দৃঢ়সংকল্প।

কিভাবে তা সম্পন্ন হবে তা বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস বলেন, "ধনতন্ত্র আপন অন্তরের বিষক্রিয়ায় বিষাক্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করবে।" শ্রমিকেরা অল্প মজুরি পায় বলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে, কিন্তু শিল্পপতিগণ বেশি লাভের আশায় বেশি উৎপাদন করতে থাকবে। শেষে এমন এক পর্যায় উপনীত হবে যে, উৎপন্ন দ্রব্য আর দেশে বিক্রয় করা সম্ভব হবে না। তখন উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা চলবে এবং পুঁজিপতিগণ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সংগ্রাম বাধাতে উদ্যত হবে। তাছাড়া, পুঁজিপতিগণ প্রথমে ছোট ছোট শিল্পপতিগণকে গ্রাস করে বড় হতে থাকবে এবং ফলে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হবে। অন্যদিকে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়বে এবং দুঃখ–দৈন্যে একদিকে যেমন তারা অতীষ্ট হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমনি শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে আগ্রহী হবে।

(তিন) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ
Material Interpretation of History and Economic Determinism

মার্কসের মতে, সমাজের পরিবর্তন ধারা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালের বুকে বিলীন হচ্ছে এবং নতুন ক্রমশ জয়যুক্ত হচ্ছে। কার্ল মার্কস বলেন, এই পরিবর্তন ধারার গতি নির্ধারণ করছে আর্থিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। সম্পদ উৎপাদনে কে কতটুকু কর্তৃত্ব করছে এবং কে কতটুকু অংশ পাচ্ছে তাই সামাজিক ঘটনাবলীকে নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করছে। প্রত্যেক সমাজের আইন–কানুন, রাজনৈতিক অবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক জীবনের মান নির্ণীত হয় তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং শ্রমিক গোষ্ঠীর সুখ–সুবিধার জন্য। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তাকে কেন্দ্র করেই সমাজে শ্রেণীবিভাগ সংগঠিত হয়। তাই বলা যায়, প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে এবং উৎপাদনের পদ্ধতি ও বিনিময়কে ভিত্তি করে যুগে যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো রচিত হচ্ছে। নিরন্তর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজ তাই নতুন থেকে নতুনতর পথে প্রবাহিত হচ্ছে এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে।

(চার) শ্রেণী সংগ্রাম
Class Struggle

কার্ল মার্কস বলেন, সামাজিক ইতিহাস নিছক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে। যাদের হাতে উৎপাদনের উপাদান আছে তারা অন্য শ্রেণীকে নিজেদের পদানত করছে। ফলে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে শুধু শ্রেণী সংগ্রামের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলেও এ সত্য চোখে পড়ে। প্রাচীন গ্রীসে নাগরিকগণ দাসদের পদানত রেখে নিজেরা সুখ উপভোগ করেছে। রোমে পেট্রিসিয়ানরা (Patrician) প্লেবিয়ানদের (Plebian) উপর, মধ্যযুগে সামন্তবর্গ (feudal lords) ভূমিদাসদের (Serf) উপর এবং শিল্পযুগে কলকারখানার মালিকগণ (bourgeoisie) শ্রমিকদের উপর প্রভুত্ব করছে।

কিন্তু ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনের সাথে সাথে এও পরিলক্ষিত হয় যে, উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্তৃত্ব হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সর্বহারারা বেশিদিন চুপচাপ থাকে না। তারা উৎপন্ন সম্পদের অংশ পাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করেছে। যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে তারা সর্বহারাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে অবিরত চেষ্টা করেছে। ফলে শ্রেণী সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এও দেখা যাচ্ছে যে, নতুন শ্রেণী অবশেষে জোর করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করছে। ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে, বর্তমানের বিত্তহীন শ্রেণী ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। তা থেকে মার্কসের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমানের শ্রমিকগণ পুঁজিপতিদের ধ্বংস করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তখনই শ্রেণী সংগ্রামের সমাপ্তি হবে।

(পাঁচ) সামাজিক বিপ্লব এবং সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র
Social Revolution and Dictatorship of the Proletariat

মার্কসের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমাগত শোষণ এবং নির্যাতনের ফলে এমন এক সময় আসবে যখন সমাজের শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণী, শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবের পথ অবলম্বন করবে। ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন হবে এবং সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত হবে। এ পর্যায়ে শ্রমিক এবং কৃষক প্রমুখ সর্বহারা শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ রক্ষার একনায়কতন্ত্র পরিচালনা করবে।

(ছয়) শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের তিরোধান
Classless Society and Withering Away of State

বিপ্লবের পর সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমি ও পুঁজির মালিকানা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং উৎপাদন পরিচালিত হবে সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য, ব্যক্তিগত লাভ বা মুনাফার জন্য নয়। শ্রেণী ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যবধান দূর হবে। ফলে রাষ্ট্র যাকে মার্কস " শ্রেণী সংগ্রামের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র" বলে আখ্যায়িত করেছেন তা বিলুপ্ত হবে, কেননা শ্রেণী সংঘাত ও শ্রেণী সংগ্রামের বিলোপ ঘটলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও ফুরাবে। তবে অন্তর্বর্তীকালে ধনিক শ্রেণীর সর্বস্ব কেড়ে নেবার জন্য এবং মুনাফার মনোভাবকে দূর করার জন্য রাষ্ট্র বর্তমান থাকবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে "প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে এবং প্রত্যেকে সাধ্যমত কাজ করবে এবং প্রয়োজনমত ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করবে।" ('From each according to capacity and to each according to necessity')। এই অবস্থায় রাষ্ট্র শুন্যে মিলিয়ে যাবে।

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ন
Evaluation of Marxian Socialism

মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে, যদিও কোন এক সময়ে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক লোক মার্কসবাদকে (Marxism) ধর্মবাণীর ন্যায় শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করেছে। মার্কসবাদ রাষ্ট্র এবং সমাজের ভিত্তিমূল, এমনকি গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছ। মহাকাল শুধু এর মূল্যায়নে সমর্থ, তবে বলা যায়, মার্কসের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি। **প্রথমত,** তাঁর সিদ্ধান্ত ও বর্ণনা অনুযায়ী ধনতন্ত্র তাঁর অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার কথা, কিন্তু তা না হয়ে বরং ধনতন্ত্র নিজেকে সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছে এবং ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের জীবনমানও উন্নত হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** তাঁর বিবরণ অনুযায়ী সমাজতন্ত্র সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মত অধিকতর শিল্পায়িত দেশসমূহে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি বরং রাশিয়া ও চীনের মত কৃষিপ্রধান অনগ্রসর দেশগুলোতে হয়েছে। **তৃতীয়ত,** মার্কসের মতে, বিশ্বের শ্রমিকরা জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে শ্রেণী স্বার্থেই উদ্বুদ্ধ হয়, কেননা, 'শৃঙ্খল ছাড়া তাদের হারাবার অন্য কিছুই নেই'। কিন্তু দুটি মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, শ্রমিকরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং শ্রেণী স্বার্থ ভুলতে সমর্থ হয়েছে। **চতুর্থত,** তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রাষ্ট্র আপনা আপনি বিবর্ণ ফুলের মত ঝরে পড়বে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে রাষ্ট্র দিন দিনই শক্তিশালী হয়েছে এবং রাষ্ট্রের কার্যপরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া, মার্কসবাদের সূত্রগুলোও সমালোচিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। **প্রথমত,** মার্কসের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রচুর সত্য থাকলেও তা একদেশদর্শী এবং অনেকটা আংশিক। যুগে যুগে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার মূলে শুধু আর্থিক পরিবেশ বা অর্থনৈতিক অবস্থাই কাজ করে নি, তার সাথে ভৌগোলিক পরিবেশ, ধর্মের প্রেরণা, মহাপুরুষদের কার্যাবলী বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। **দ্বিতীয়ত,** সমাজে শ্রেণীসংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপারটা একটু অতি নাটকীয় বলে মনে হয়। ইতিহাসে যে শ্রেণীসংগ্রামের খতিয়ান তা একচোখাও বটে। মানুষের ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রাম যেমন সত্য, পরস্পরের সহযোগিতার ফলে ধর্ম, সাহিত্য, ললিতকলার বিকাশও তেমনি সত্য। **তৃতীয়ত,** মার্কসের মূল্যতত্ত্বও আংশিক। শ্রম মূল্য সৃষ্টির উপকরণ বটে, কিন্তু সাথে সাথে চাহিদা, যোগান, বাজারের অবস্থা, যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা, আন্তর্জাতিক অবস্থাও মূল্যের উপর প্রভাব ফেলে। **চতুর্থত,** মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচন করে। মার্কস যেমন একদিকে উৎপাদনের সকল প্রকার উপাদান রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তি স্বাধীনতাও বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। বাস্তবে কিন্তু তা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে।

কার্ল মার্কসের অবদান
Contributions of Karl Marx

(এক) কার্ল মার্কস আধুনিক বিশ্বের সর্বাপেক্ষা পরিচিত এক দার্শনিক এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী চিন্তাবিদ। তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক। তাঁর পূর্বে যে সকল লেখক ও চিন্তাবিদ সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন তাদের প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির কুফল, সমাজে অসাম্য, ধনবৈষম্যের ত্রুটি বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু কেউ সমাজের কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতি, সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং সামাজিক বিবর্তনে তাদের প্রভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন নি। ইংল্যাণ্ডের রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), ফ্রান্সের চার্লস ফুরিয়ার (Charles Fourier) প্রমুখ সমাজতান্ত্রিকদের তাই বলা হয় কল্পনাবিলাসী বা কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক। কার্ল মার্কস কিন্তু এ ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক। তিনি একদিকে যেমন সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি কিভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায় তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষণে তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করেছেন।

(দুই) কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা বিশ্বের বিপ্লবী ও সমাজ সংস্কারকদের সম্মুখে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ দিক থেকে তিনি আধুনিক বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। যদিও তাঁর মতবাদ তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যে তাঁর মতবাদকে "ভয়ঙ্কর" এবং "অগ্রহণযোগ্য" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তথাপি সকলের অজান্তে আধুনিক কালের প্রায় সকল মতবাদ, এমন কি ধনতন্ত্র পর্যন্ত, তার মতবাদকে গ্রহণ করে পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় সাধন করেছে এবং প্রায় অর্ধেক বিশ্বে তাঁর মতবাদ জীবন্ত সত্যে রূপান্তরিত হয়।

(তিন) সর্বহারাদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে, অত্যাচারী শাসকদের দাবি গ্রহণে বাধ্য করার ক্ষেত্রে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দান ক্ষেত্রে মার্কসের মতবাদ অত্যন্ত কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে।

(চার) অন্য আর একদিক থেকে মার্কসের মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূলে যে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত, অর্থনৈতিক দাবি অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যে অন্তঃসারশূন্য এ সত্য মার্কসের মতবাদে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষে, কার্ল মার্কসের মতবাদ বিশ্বব্যাপী সর্বহারাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছে এবং বৈষম্য ও বঞ্চনা পীড়িত সমাজে নতুন আশার সঞ্চার করে। ইবেনস্টাইন (Ebenstein) যথার্থই বলেন, "সর্বত্রই সামাজিক চিন্তাবিদ, সংস্কারক এবং বিপ্লবীদের উপর মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে" ("The doctrines of Marx and Engels made a profound impression on social thinkers, reformers and revolutionaries everywhere.")।

১৯৮৯-৯০ থেকে পূর্ব ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে সমাজতন্ত্রের পতনের পর মার্ক্সের চিন্তাভাবনা নতুনভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। একজন চিন্তাবিদ হিসেবে অবশ্য তাঁর মর্যাদা এখনও অনেক উচ্চে।

১। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। তাকে বিজ্ঞানসম্মত বলা হয় কেন? (Discuss the leading features of Marxian Socialism. Why is it called scientific?)

২। মার্কসের কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the Communist Manifesto of Marx.)

৩। মার্কসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদটি আলোচনা কর। (Discuss the Marxian theory of state.)

ইবনে খালদুন

IBN-E-KHALDUN

১৯

জীবনী

Life-sketch

ইবনে খালদুনের সম্পূর্ণ নাম ওয়ালীউদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে খালদুন। তিনি উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন। ইসলামের গৌরব-রবি যখন অস্তমিত প্রায়, যখন মুসলিম বিশ্বের সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট এবং রাজনৈতিক আকাশ রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব, অরাজকতা ও অসহিষ্ণু মনোভাবে কলঙ্কিত হয়ে ওঠে, তখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণের আদি বাসভূমি ছিল মুসলিম অধিকৃত আন্দালুসিয়াতে। কিন্তু যখন খ্রিস্টানরা স্পেন দখল করে, তখন তাঁরা স্পেন ত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিউনিস শহর তখন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইবনে খালদুন বাল্যকাল থেকেই মননশীলতার পরিচয় দেন। তিনি তিউনিসের জ্ঞানী-গুণীদের সংস্পর্শে এসে জ্ঞানানুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিউনিস শাসনকর্তা দ্বিতীয় আবু ইসহাক তাঁকে মাত্র ২০ বছর বয়সে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাছাড়া তিনি আরও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কায়রো গমন করেন ও সেখানে 'কাজী-উল-কুজ্জত' বা প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে শতধা বিভক্ত মুসলিম বিশ্বের অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখেন। শাসনকার্যে নিযুক্ত থেকে তিনি এ সব পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে এ সব লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রণয়ন করলেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও মেধা স্বীকৃতি লাভ করে তাঁর মৃত্যুর চারশত বছর পরে। এ অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তির কথা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে তেমনভাবে জানা যায় নি। এর কারণ ছিল সম্ভবত রেনেসাঁ যুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুদার ও সংকীর্ণ মনোভাব, যার ফলে তাঁর চিন্তাধারা তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক শত বছরের মধ্যে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপিত হয় নি।

তাঁর চিন্তাধারা

His Thought

ইবনে খালদুন ছিলেন প্রধানত একজন সমাজবিজ্ঞানী। ইতিহাসকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিহাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইতিহাস বিবর্তনশীল সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের সুসংবদ্ধ দলিল। রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী ইতিহাস নয়। সার্থক ইতিহাস প্রণয়ন করতে হলে ঐতিহাসিককে লক্ষ্য রাখতে হবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পরিবর্তনের কার্যকারণের দিকে। তাঁর তথ্যের সত্যতা ও সুসংবদ্ধতাও নির্ভুল হওয়া চাই। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক কোন সংগঠন ক্ষমতাশীল কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। তাঁকে সামাজিক রীতি-

নীতি, ধ্যান-ধারণা ও সমাজব্যবস্থার গতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তিনি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির উপর নির্ভর করতেন। তাঁর সুসংবদ্ধ আলোচনা এবং চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।

এক দিক দিয়ে ইবনে খালদুনকে এরিস্টটলের উত্তরসুরিও বলা যায়। এরিস্টটল তাঁর সময়ের ও অতীতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র ও অন্যান্য রীতি-নীতির তুলনামূলক আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। একই ধরনের রীতি-নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুসৃত হয়ে একই রূপ ফলদান করছে কি না তা অনুধাবন করতেন। কিন্তু এরিস্টটলের তুলনামূলক পদ্ধতিকে ইবনে খালদুন সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁর মতে, তুলনামূলক পদ্ধতি নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে না। ইবনে খালদুন বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে ঘটনার কার্যকারণের সত্যতা যাচাই করে কোন সিদ্ধান্তে আসতেন। তিনি বলতেন রাষ্ট্রে ও সমাজে উদ্ভূত কোন ঘটনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিশদভাবে দেখতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সাথে ঐ ঘটনার আপেক্ষিক সম্বন্ধ কি। এরিস্টটল কিন্তু এত গভীরভাবে দেখেন নি।

ইবনে খালদুন ছিলেন এক প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী। তিনি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন রীতি-নীতি সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, মানব সমাজের নির্ভুল ইতিহাস রচনাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে ঐতিহাসিক এই কার্য তিনি সমাধান করতে পারবেন যদি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুকাদ্দমা বা মুখবন্ধ
Prolegomena

১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইবার' (Universal History) রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থের মুখবন্ধ বিশ্ব সাহিত্যে এক বিস্ময়কর অবদান। এই মুখবন্ধে তিনি বিভিন্ন সমাজ, রাষ্ট্র, জনপদ ও জাতির উত্থান-পতনের প্রাকৃতিক কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ, রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় শাসন, সার্বভৌমের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় তিনি এই মুখবন্ধে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া পরবর্তীকালে যে সব তথ্য বর্ণনা করে মতেঁস্কু বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, তাও এই মুখবন্ধে সূচিত হয়। রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও নাগরিকদের চরিত্র গঠনে সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রভাবের কথা তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন।

পাশ্চাত্যের বহু দার্শনিক ও চিন্তাবিদ খালদুনের চিন্তাধারার মৌলিকত্বে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় শাসনকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা। মধ্যযুগের শেষ দিকে লিখে আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তানায়ক হিসেবে ইতালির দার্শনিক মেকিয়েভেলি পরিচিত হলেন। কিন্তু তাঁর বহু পূর্বেই খালদুন এই সূত্রের ব্যাখ্যাদান করেন। তিনি বলেন, ধর্মের প্রভাব ও অনুশাসন থেকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় শাসন বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

তাঁর রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা
His Political Thought

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইবনে খালদুন অনেকাংশে এরিস্টটলের অনুসারী। তিনি মুখবন্ধে রাষ্ট্রকে 'দওলত' (Daulat) নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি 'সংহতি' বা 'আসাবিয়াত'। এই সংহতি রচিত হয় মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকে। মানুষ জীবন ধারণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অনুভব করে। এরিস্টটলের ন্যায় তিনি বলেন, মানুষ একাকী বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। 'রাষ্ট্র' এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকে উদ্ভূত।

ইবনে খালদুন রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আর একটি উপাদানের কথা বলেন যা পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের টমাস হবসের কথায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, মানুষের স্বভাবে ও প্রকৃতিতে পশুসুলভ মনোবৃত্তি বিদ্যমান। এই মনোবৃত্তির ফলেই সমাজে কলহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় ও পরিণামে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয়। এই দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য এমন এক শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির প্রয়োজন যা ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যমে জনগণকে কলহ ও দ্বন্দ্ব থেকে বিরত রাখতে পারে। এরূপ শক্তি বা কর্তৃত্ব সার্বভৌম নামে পরিচিত। সার্বভৌমত্ব জনগণের মধ্যে সংহতি বজায় রাখতে অপরিহার্য।

এই রাষ্ট্রীয় সংহতিকে দৃঢ় করার জন্য ইবনে খালদুন আর একটি প্রয়োজনীয় সূত্রের উল্লেখ করেন। তা হলো রক্তের সম্পর্ক। রক্তের সম্বন্ধ পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ সহায়ক হয়। তিনি আরব বেদুঈনদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, বেদুঈনদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ অত্যন্ত দৃঢ়। তাই তারা সর্বদা সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় প্রাণপণ সংগ্রাম করে। তিনি আরও বলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও বহুদিন একত্রে সংগ্রাম করলেও সমাজে এরূপ সংহতি গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্র ও সংহতি সৃষ্টির মূলে যে ধর্মের প্রভাব আছে, তা ইবনে খালদুন অস্বীকার করেন নি। তিনি ধর্মকে রাষ্ট্রীয় সংহতির মূল ভিত্তিরূপে চিত্রিত করেছেন। ধর্মের অনুপ্রেরণার ফলে কোন বিশেষ জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আরব জাতির গৌরবময় বীরত্বের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে খালদুন বলেন, গভীর ও ঐক্যবদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়ক হয়। তবে ধর্মে মানুষের আস্থা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে পড়ে। তাই ধর্মের বন্ধন ও ঐক্য বেশিদিন বজায় থাকে না।

তাঁর মতে অভ্যন্তরীণ সংহতি ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই টিকে থাকে না। এই সংহতি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে। আবার অনেকগুলো দলের মধ্যে মাঝে মাঝে কোন দল অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এই সমন্বয় সাধন করে। এদের মূলে আবার কোন প্রভাবশালী বংশ বা পরিবারের দানও থাকতে পারে, যেমন আরবের ইতিহাসে ছিল কোরায়েশ বংশের প্রভাব। এই বংশের প্রধান সকলকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করে নিজেই রাজদণ্ড গ্রহণ করতে পারে।

রাষ্ট্রচিন্তায় ইবনে খালদুনের আর একটি অবদান হলো রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ। এরিস্টটল রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নি। ইবনে খালদুন এ ক্ষেত্রে এক নতুনত্বের সৃষ্টি করেন। তিনি রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে দু'টিকে আলাদা সংগঠনরূপে চিত্রিত করেন। তিনি আরো বলেন উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

রাষ্ট্র শাসনের ভিত্তি
Basis of Government

দার্শনিক হব্সের ন্যায় তিনি এ মত পোষণ করতেন যে, রাষ্ট্রের শাসনভার এক হস্তে ন্যস্ত থাকাই উত্তম, কেননা তার ফলে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাবে ও রাষ্ট্রের উন্নতি সর্বাধিক হবে। ক্ষমতা বহু হাতে বিন্যস্ত হলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। মানুষের প্রকৃতিগত পাশব প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করতে হলে এককেন্দ্রিক শক্তিশালী সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন।

প্রত্যেক সমাজ তার স্থায়িত্বের জন্য এমন এক শক্তির প্রয়োজন অনুভব করে, যা তার সদস্যদেরকে আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিরত রাখবে। এ ক্ষমতা কোন এক শক্তিশালী প্রধানের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিহত করে। এই শক্তিশালী ব্যক্তির অপরিসীম ক্ষমতার প্রয়োগকে 'সার্বভৌম'

ক্ষমতা বলা যায়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর লেখক জাঁ বোঁদা (Jean Bodin) সার্বভৌমত্বের যে ব্যাখ্যা দান করেন, ইবনে খালদুনের বেলায় তা বহু পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছিল।

ইবনে খালদুন শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে এ সত্য অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগে রাজতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাসনব্যবস্থা তেমন আবেদন সৃষ্টি করার মত ছিল না। ইসলামী খেলাফতের পর সমগ্র মুসলিম জাহানে রাজতন্ত্রের বীজ অঙ্কুরিত হয়। তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, খালদুন ব্যাখ্যাত সার্বভৌমত্বের পেছনে জনসমর্থন ছিল। সংহতি বা আসাবিয়াতই ছিল রাষ্ট্রশাসনের ভিত্তি। জনগণের সদিচ্ছা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকে সংহতির জন্ম হয়।

রাষ্ট্রের কার্যকাল
Tenure of the State

রাষ্ট্র কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং এর আয়ুষ্কাল কতদিন স্থায়ী হবে-এ সম্বন্ধে ইবনে খালদুন আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কোন দল বা সম্প্রদায় অভ্যন্তরীণ সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে পার্শ্ববর্তী বিবদমান দল বা সম্প্রদায়গুলোকে পরাজিত করে এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলে। যাযাবর জাতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যাযাবর জাতিও রাজ্য স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। বিভিন্ন স্থানে শহর গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে। এ নগর সভ্যতার প্রভাবে যাযাবর জাতি তাদের উদ্দামতা হারিয়ে ফেলে এবং সংঘবদ্ধ স্থায়ী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ধনসম্পদ অর্জন করে কালক্রমে তারা বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত কর্তৃত্ব রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। রাজা তখন ভাড়াটে সৈন্য ও রাজকর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। এভাবে জাতির পতনের সূচনা হয়। কালক্রমে আল্লাহর ইচ্ছায় সে জাতির কর্তৃত্ব অন্য কোন সুসংহত জাতির হাতে চলে যায়।

ইবনে খালদুন বলেন, স্বাভাবিকভাবে কোন রাষ্ট্র তিন "যামানার" (যুগ) বেশি টিকে থাকে না। এক যামানায় ৪০ বছর। সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে দলীয় সংহতি অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই সময়ে জাতির লোকেরা শৌর্যবীর্য ও আদর্শের উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রকে ক্রমশ উন্নতির পথে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল নগর-সভ্যতায় গোত্রীয় সংহতি অনেকটা শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু তথাপি পূর্ব পুরুষের শৌর্যবীর্য তখনও অবশিষ্ট থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে তারা হীনবল হয়ে পড়ে, কারণ তখন তারা নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-বিলাসের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। তখন অন্য কোন সুসংহত জাতি বা সুযোগ সন্ধানী কোন পরাধীন সম্প্রদায় সে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আয়ত্তে এনে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

এখানে খালদুনের এ বক্তব্যে তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু জাতির উত্থান ও পতনের তেমন কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ এতে প্রকাশিত হয় না। তাই এই বক্তব্যকে যথার্থ বলে গ্রহণ করতে অনেকেই রাজি নন।

সমাজের উপর জলবায়ু ও ভৌগোলিক প্রভাব
Influence of Climate and Topography on a Society

সমাজের জনগণের চরিত্র গঠন, রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের উপর জলবায়ু ও ভৌগোলিক প্রভাবের গুরুত্ব সম্পর্কে ইবনে খালদুন এক মৌলিক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও নাগরিকদের চরিত্র গঠনে জলবায়ু ও রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান

সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর অবস্থান বিচার করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেন। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ঘনবসতির কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, চরম উষ্ণ-অঞ্চলে জনবসতি কম, কারণ এ সব অঞ্চলের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর। তাঁর মতে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকেরা হয় সংযমী, মিতাচারী ও কৃষ্টিবান। এজন্য এ সব স্থানে নতুন নতুন সভ্যতার উদয় হয়। এ সব এলাকার লোকেরা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদে স্বাভাবিকভাবেই হয় উন্নত। গ্রীক, রোমান ও আরবরা এই অঞ্চলের অধিবাসী। তাই তাদের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে নতুন নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে।

ইবনে খালদুনের এ চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছেন ফরাসী লেখক জাঁ বোঁদা ও মতেঁস্কু। অবশ্য তাঁদের চিন্তাকে মৌলিক বলে গণ্য করা হয়। কেননা ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা তখনও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি সসম্মানে আবির্ভূত হন।

১। ইবনে খালদুনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the political philosophy of Ibn-E-Khaldun.)

২। রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর মতামত কী ছিল? (What were his views on the state?)

৩। তাঁর মতে রাষ্ট্র শাসনের ভিত্তি কী ছিল? রাষ্ট্রের কার্যকাল সম্বন্ধে তিনি কী বলেছেন? (What were the bases of government according to him? What did he say about the tenure of the state?)

মোহাম্মদ আল-ফারাবী

MOHAMMAD AL-FARABI

২০

জীবনী
Life-sketch

আবু নসর মোহাম্মদ আল-ফারাবী ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। ইসলামী রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে আল-ফারাবী একটি অমর নাম। রাজনৈতিক দার্শনিক হিসেবে তাঁর স্থান এরিস্টটলের পরেই। প্রাচ্যের দার্শনিক মহলে তাই তাঁকে দ্বিতীয় 'ওস্তাদ' বা 'মুয়াল্লিম সানী' বলা হয়। তিনি তুরস্কের ফারাব শহরে ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে তুর্কী ছিলেন বলে 'ফারাবী-আল-তুর্কী' উপাধি ব্যবহার করতেন। ঘটনা বৈচিত্র্যে তাঁর জীবন ছিল পূর্ণ। তিনি আশি বছর বয়সে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তিনি ইসলামী দর্শনের জনক ছিলেন। তিনি দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় একশতখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের বিশ্বকোষ ও ইসলামী তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি প্লেটো ও এরিস্টটলের গ্রন্থের অনেক ভাষ্য রচনা করেন। রাষ্ট্রতত্ত্বের উপর লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিতগুলো ঃ

(ক) সিয়াসাতুল মাদানিয়া।
(খ) আরা-উ-আহলিল মাদিনাতুল ফাজিলাহ।
(গ) খাওয়ামি নিয়ামত।

'সিয়াসত' ও 'আরা' গ্রন্থেই তিনি রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেন। 'সিয়াসত' গ্রন্থে তিনি মানুষের সাথে পশুর কি প্রভেদ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ, আদর্শ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'আরা' গ্রন্থে তিনি সার্বভৌমত্ব, সাম্য, চুক্তিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ফারাবীর রাষ্ট্রতত্ত্ব
Political Philosophy of Al-Farabi

ফারাবীর মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে মানবের সমষ্টিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য। রাষ্ট্র মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই সৃষ্টি। মানব তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রূপ সমবায় গঠন করে থাকে। গ্রাম, শহর, জনপদ, রাষ্ট্র, জাতি, সকলই সমবায় ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্র এই সমবায় ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ। গ্রাম, শহর বা অন্যান্য জনপদ পূর্ণাঙ্গ নয়। তারা রাষ্ট্রের অংশ। তাঁর মতে, রাষ্ট্র সকল সমবায়ের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি বলেন, বিবর্তনের মাধ্যমে এই সমবায় ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির মধ্যে প্রযোজ্য হবে। নগর ও গ্রাম কালক্রমে জাতিতে রূপ লাভ করবে। জাতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে সাম্রাজ্য গঠন করবে। এ সাম্রাজ্য বিশ্বময় বিস্তৃতও হতে পারে।

এরিস্টটলের ন্যায় তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রীক জাতির মহিমা কীর্তন করেন নি। গ্রীক ও অ-গ্রীকদের মধ্যে এরিস্টটল যেমন পার্থক্য নির্দেশ করেন, ফারাবী তেমন চিন্তা করেন নি। তিনি বিশ্বময় এক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনাও চিন্তা করেছেন। তাই তাঁকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের চিন্তাদর্শে উদ্বুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। তবে সমগ্র বিশ্বে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায়ের কথা অস্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, জলবায়ুর বিভিন্নতা, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতির জন্য মানব প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন বিভিন্ন হতে বাধ্য। তবে এ সকল বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেক মানব সংস্থার মধ্যে এক মিলনের ও ঐক্যের যে সূত্র রয়েছে তা তিনি জোরে-সোরে প্রচার করেন।

রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলি
Qualities of the Head of the State

আল-ফারাবী রাষ্ট্রনায়কের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা সত্যই আদর্শস্থানীয়। তাঁর মতে, রাষ্ট্রনায়ক সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তিনি অন্য কোন শক্তির অধীনে থাকবেন না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মানবের হুকুম তিনি পালন করবেন না। এ দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর জন অস্টিন সার্বভৌমের যে চিত্র অংকন করেছেন, ফারাবী তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ফারাবী বলেন রাষ্ট্রনায়ক সহজাত জ্ঞানশক্তি ও অর্জিত বিদ্যা-এ উভয়ের অধিকারী হবেন। তিনি সৎ সাহসের অধিকারী হবেন ও জটিল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। তিনি সুন্দর ও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন, যাতে দৈহিক কোন দুর্বলতার জন্য তাঁর সিদ্ধান্ত খারাপ না হতে পারে। তিনি অতি-ভোজন ও পানাহার থেকে বিরত থাকবেন, কোনরূপ অন্যায় ও পাপকর্মে লিপ্ত থাকবেন না ও আমোদ-প্রমোদে বিরত থাকবেন। তিনি মিথ্যা কথা বলবেন না, শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হবেন ও সত্যানুসন্ধানী হবেন। তিনি উদারচিত্ত হবেন এবং বিনা তর্কে সব বিষয়ের কারণ নির্ণয় করার যোগ্যতার অধিকারী হবেন। ক্ষমতার প্রতি তাঁর কোন লোভ থাকবে না। তিনি স্বেচ্ছাচারকে ঘৃণা করবেন। তিনি ন্যায়নীতি অনুসরণ করবেন।

অবশ্য তিনি এ বিষয়েও সজাগ ছিলেন যে, এ সব গুণে বিভূষিত কোন ব্যক্তিকে পাওয়া খুব শক্ত। প্লেটো যেমন 'দার্শনিক রাজা' পেতে চেয়েছিলেন যিনি হবেন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক, ফারাবীও ঐ সব গুণে বিভূষিত রাষ্ট্রনায়কের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, এমন কোন লোক না পাওয়া গেলে যার মধ্যে ঐগুলোর অধিকাংশ বিদ্যমান, তাঁকে রাষ্ট্রের ভার দেয়া উচিত। যদি তেমন লোকও না পাওয়া যায়, তবে এমন একজনের হাতে শাসনভার দেয়া উচিত যিনি একজন আদর্শ নেতার সংস্পর্শে এসেছেন এবং কিছু কিছু গুণের অধিকারী হয়েছেন। এমন লোকও যদি না পাওয়া যায়, তবে দু থেকে পাঁচজন সদস্য সংবলিত শাসন পরিষদের হাতে রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত করা উচিত। এ শাসন পরিষদের প্রধান জনগণের অভাব-অভিযোগ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করবেন ও সততার সাথে কাজ করবেন।

রাষ্ট্রের সংগঠন
Organisation of the State

রাষ্ট্রের সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সম্পর্কে আল-ফারাবী এক সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানবদেহে আত্মার স্থান যেমন সর্বোচ্চ, তেমনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনায়কের স্থান সর্বোচ্চ। রাষ্ট্রনায়ক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণকার্য পরিচালনা করবেন। তাঁর অধীনে থাকবেন মন্ত্রিমণ্ডলী। মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিচালনাধীনে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ কার্যরত থাকবেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতি নিম্নপদস্থ

কর্মচারীর আনুগত্যের ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালিত হবে। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে কার্য করলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাবে। এভাবে তিনি ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির (Theory of Separation of Powers) ইঙ্গিত দেন।

সাম্রাজ্যবাদ
Imperialism

সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও কুফল সম্বন্ধেও আল-ফারাবী এক মনোজ্ঞ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতিগুলো তাদের সুখ, সম্ভোগ, নিরাপত্তা, ঐশ্বর্যের লোভে অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় ও তাদের স্বাধীনতা হরণ করে। এতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো সর্বদা তাদের ভয়ে কালাতিপাত করে ও নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিভেদ সৃষ্টি হয়। এতে অন্যান্য জাতির স্বাধীনতার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের এই নগ্নচিত্র বিংশ শতাব্দীতেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্টের জোটবন্দী হতে হবে ও অধিক শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

১। আল-ফারাবীর রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে কী জান? (What do you know of Al-Farabi's view on the state?)

২। তাঁর মতে রাষ্ট্রনায়কের কোন্ কোন্ গুণাবলী থাকা উচিত? (What qualities a head of the state should possess according to him?)

ইবনে-সিনা

IBN-SINA

২১

মুসলিম জগতে ইবনে সিনা একটি অমর নাম। সেকালে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁর লেখা **আল-সাফা** এবং **'আলফানুন ফিতত্তিক'** চিকিৎসা জগতে বাইবেলের ন্যায় সমাদৃত। রাষ্ট্রীয় দার্শনিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। তিনিই সর্বপ্রথম প্লেটোর রাষ্ট্রীয় দর্শনের সাথে ইসলামিক ভাবধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। মূলত তিনি ছিলেন গ্রীক দর্শনের একজন সৃজনশীল ইসলামী ভাষ্যকার এবং ইসলামের আলোকে গ্রীক চিন্তাধারায় সমন্বয় সাধনকারী।

তাঁর জীবনী
His Life History

ইবনে সিনা পাশ্চাত্যে 'আভে সিনা' (Ave-Sinnah) নামে পরিচিত। তিনি উজবেকিস্থানের আফসানা নামক স্থানে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল ফার্সি। বাল্যকালে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন এবং দশ বছর বয়সেই সমগ্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন। মাত্র ষোল বছর বয়সেই তিনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বেশির ভাগ রচনাই আরবী ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত।

তিনি শুধু রাষ্ট্রীয় দর্শনে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা নয়, রাষ্ট্রীয় কার্যেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালের মেকিয়েভেলির ন্যায় তিনি স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশী রাজ দরবারে সম্মান লাভ করেন। দেশের মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেন। অনেক সময় তাঁকে এ সকলের জন্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ছিলেন না। জীবনের সুখ সম্ভোগের প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা
His Political Thought

ইবনে সিনা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হন। এ ক্ষেত্রে ইবনে রুশদের সাথে তাঁর প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। প্লেটোর ন্যায় তিনি মনে করতেন যে, শান্তি ও পরিপূর্ণতা অর্জনই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং তিনি বিশ্বাস করতেন, আদর্শ রাষ্ট্র এমন এক রূপরেখায় অঙ্কিত হবে যাতে সত্য ও সুন্দর প্রতিফলিত হবে এবং সমাজ-জীবনকে সত্য ও সুন্দরের আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে। গ্রীক পণ্ডিতদের মত তিনিও মনে করতেন, মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব। মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবণতাই রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেই তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারে। অধ্যাপক রোজেন্থাল (Rosenthal) ইবনে সিনার চিন্তাধারার এই দিকটি সম্যকরূপে উন্মোচন করেন।

কিন্তু গ্রীক পণ্ডিতদের চিন্তাধারা থেকে ইবনে সিনার মতবাদ ছিল ভিন্ন। এরিস্টটল ও প্লেটোর ন্যায় চিন্তাবিদগণ সত্য ও আদর্শের পরিপূর্ণতার মধ্যেই দেখেছেন রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি। কিন্তু ইবনে সিনা দর্শনের সাথে ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন এবং বলেন, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের ঐক্যেই সমাজ-

জীবনের পরিপূর্ণতা নিহিত। এ দিক দিয়ে তাকে সেণ্ট অগাস্টিন ও টমাস একুয়নাসের সাথে তুলনা করা যায়। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তায় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখানো হয় নি। গ্রীক পণ্ডিতেরাও এই পার্থক্য লক্ষ্য করেন নি। তাঁরা দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব এই উভয় শাস্ত্রকে অধিবিদ্যা হিসেবে আলোচনা করেছেন। ইবনে সিনা কিন্তু মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করেন এবং বলেন, সত্য ও সুন্দরের জন্য তথা সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যুক্তি ও বিশ্বাস (Reason and Faith) অপরিহার্য। ইবনে সিনার শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে এই সম্মেলনের প্রচেষ্টা। অবশ্য এও বলা প্রয়োজন যে, তিনি এই ক্ষেত্রে দিশারী ছিলেন না। তাঁর পূর্বে খ্রীষ্টান তাত্ত্বিকগণ এবং আলকিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে রুশদ প্রমুখ মুসলমান চিন্তানায়ক এই ক্ষেত্রে নতুন ভাবের পসরা তুলে ধরেন। কিন্তু ইবনে সিনার দক্ষ হাতে এ প্রচেষ্টা সফল হয় এবং তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অধ্যাপক হিট্টির মতে, আল-কিন্দি, আল-ফারাবী ও ইবনে রুশদের মধ্যে যা সূচনা হয়েছিল ইবনে সিনার মধ্যে তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শাসকের গুণাবলী
Qualities of the Ruler

আল-ফারাবীর ন্যায় ইবনে সিনা শাসকের গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'ফি ইসবাত আল-নবুয়া" শীর্ষক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলী বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রনায়ককে প্রধানত দুটি গুণের অধিকারী হতে হবে। **প্রথমত,** তিনি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাবোধ প্রতিষ্ঠিত করবেন। **দ্বিতীয়ত,** ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি জনগণের পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করবেন। গুণগত দিক থেকে জননায়ক অসাধারণ গুণের অধিকারী হবেন। প্লেটোর "দি লজ" গ্রন্থটিকে তিনি দেশনায়কের গুণাবলীর প্রতিকৃতি হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, আদর্শ রাষ্ট্রের নায়ক প্লেটো বর্ণিত প্রজাতন্ত্রের 'দার্শনিক রাজার" ন্যায়। তিনি আল্লাহ প্রেরিত হোন বা দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিতই হোন, তা বড় কথা নয়। যা উল্লেখযোগ্য তা হলো জননায়কের অসাধারণ গুণাবলী যা জনগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মঙ্গল সাধনে সক্ষম। ইবনে সিনা ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা- **নীতিশাস্ত্র** (Ethics), **অর্থনীতি** (Economics) এবং **রাষ্ট্রনীতি** (Politics)। তাঁর মতে, জননায়ক এ তিন শাস্ত্রেই হবেন অভিজ্ঞ।

রাষ্ট্রীয় দর্শনে ইবনে সিনার অবদান
His Contribution

ইবনে সিনা মুসলিম জগতে একজন ক্ষণজন্মা চিকিৎসক হিসেবে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তথাপি রাষ্ট্রীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর চিরস্মরণীয় অবদান রয়েছে। তিনি প্লেটোর রাষ্ট্রীয় দর্শন ও এরিস্টটলের শাসন ব্যবস্থার সাথে ইসলামের ধর্মতত্ত্বের এক সমন্বয় সাধন। খ্রিস্টীয় জগতে সেণ্ট অগাস্টিনের যে অবদান, মুসলিম চিন্তাজগতে ইবনে সিনার অবদান প্রায় অনুরূপ। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দর্শনের সাথে ধর্মতত্ত্বের যে সম্মেলন তা চিন্তাজগতে ইবনে সিনার নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

১। ইবনে সিনার রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the political philosophy of Ibn-Sina?)

২। রাষ্ট্রীয় দর্শনে ইবনে সিনার অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the contribution of Ibn-Sina to Political thought.)

আল গাযযালী

২২

AL-GAZZALI

(১০৫৮–১১১১ খ্রিঃ)

মুসলিম চিন্তানায়কদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আল গাযযালী ইসলামের ইতিহাসে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন একজন মরমী সাধক বা সূফী হিসেবে। কিন্তু ইসলামের ব্যাখ্যাকারী তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব প্রচারক হিসেবে তাঁর নাম শীর্ষস্থানীয়। এ সকল কারণে তিনি 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের ব্যাখ্যাকারী 'মুয়াদ্দিদ' বা নব ব্যাখ্যাকারী এবং 'ইমাম' বা শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে বিভিন্ন মহলে সমাদৃত। মুসলিম জগৎ তখন এক সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে কাল কাটাচ্ছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর ইসলামিক গৌরব তখন অনেকটা ম্লান হয়ে পড়েছে। বিস্তৃত মুসলিম বিশ্ব অনেক ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানে প্রপীড়িত। তাছাড়া খ্রীস্টান জগৎ তার নতুন অধ্যাত্ম সত্তায় সঞ্জীবিত হয়েছে। যুক্তিবাদী গ্রীক দর্শন সমগ্র ইউরোপে এক নতুন প্রাণ বন্যার সঞ্চার করেছে। মুসলিম বিশ্বে প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বের এ চরম দুর্দিনে আল-গাযযালী তাঁর তীক্ষ্ণধার লেখনী ধারণ করেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক অভয়বাণী উচ্চারণ করে তৌহিদের মৌলিক ক্ষমতা ও প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাঁর জীবনী
His Life History

আল-গাযযালী ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত তুষ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। তুষ নগরীতে কোরান ও হাদিস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে নিশাপুর গমন করেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। নিশাপুরে তাঁর শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমামুল হারমাইন। তাঁর নিকট আল-গাযযালী দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা লাভ করেন এবং অতি অল্প সময়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বাগদাদের প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মূলক গাযযালীকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেন। তখন থেকে শুরু হয় আল-গাযযালীর স্বাধীন জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষণা। নিজাম উল-মূলক যখন শত্রু হস্তে নিহত হন তখন গাযযালী বাগদাদ পরিত্যাগ করে সিরিয়া, মিসর ও মক্কা পরিভ্রমণ করেন এবং মদিনাতে উপস্থিত হন। মদিনায় তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকেন। ১১০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী ফখরুল মূলকের অনুরোধে নিশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের প্রধানরূপে কাজ করেন। অবশেষে তিনি তুষ নগরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ১১১১ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

আল গাযযালীর রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা
His Political Philosophy

আল-গাযযালী তাঁর রাষ্ট্রীয় মতবাদে খ্রীস্টান চিন্তানায়ক সেণ্ট অগাস্টিনের "স্বর্গরাজ্য" দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর মতে, পার্থিব জীবন অপেক্ষা পারলৌকিক জীবন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে যেমন বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদ মূল্যবান, পারলৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে তেমনই মূল্যবান ধর্মতত্ত্ব এবং বিশ্বাস। মূলত তিনি রাষ্ট্রীয় দর্শনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদকে পরিহার করে বিশ্বাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাই পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণতা আনয়নের একমাত্র চাবিকাঠি। অবশ্য এও বলা প্রয়োজন যে, যদিও তিনি পরলোকের প্রশান্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তথাপি পার্থিব জীবনকে নিরর্থক মনে করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যে ব্যক্তি সততার সাথে পার্থিব জীবন ব্যয় করতে সক্ষম এবং ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী সৎ জীবনের অনুসারী তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আল-গাযযালীয় মূল বক্তব্য হচ্ছে ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্র এক অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় দর্শনে তাদের সার্থক সমন্বয় সাধন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় দর্শন ও ন্যায়নীতি এ উভয়ের মূল লক্ষ্য জনসাধারণের কল্যাণ সাধন আর রাষ্ট্র এ লক্ষ্য অর্জনের উপায়। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির সুষম প্রয়োগ অপরিহার্য। রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ কার্য সম্পন্ন করবে। **প্রথমত,** তা ন্যায়নীতি ও ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। **দ্বিতীয়ত,** রাষ্ট্র ধর্মতত্ত্ব ও ন্যায়-নীতির সংরক্ষণ ও অনুশীলন করবে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি
Nature of the State

আল-গায্যালী গ্রীক পণ্ডিত এরিস্টটলকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে মানুষ সর্বদা পরস্পরের সহযোগিতা কামনা করে। মানুষের এ সহজাত সহযোগিতামূলক আচরণের উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু তিনি মানুষের সহজাত সহযোগিতামূলক প্রবণতার উপর গুরুত্বদান করলেও তাদের স্বার্থপর, অসহযোগিতামূলক আচরণ ও দুষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কেও ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সচেতন। তিনি মনে করতেন মানুষের এসব প্রবণতা থেকে সমাজে উদ্ভূত হয় বিশৃঙ্খলা, ক্ষমতার প্রতি লোভ এবং এক অসুস্থ পরিবেশ। সুতরাং সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন এক সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার যা প্রয়োজন হলে জোর প্রয়োগ করেও সমাজে শান্তি বজায় রাখবে। এরিস্টটলের ন্যায় তিনিও বলেন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে সাধারণ জীবনের জন্য, কিন্তু উন্নত জীবন অর্জনের নিমিত্তে তা বিদ্যমান রয়েছে। তবে উন্নত জীবনের জন্য প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার বিধান ও ন্যায়নীতি অনুসারে শাসন পরিচালনা। তাঁর মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যদিও তর্কবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

শাসকের গুণাবলী
Qualities of a Ruler

আল-গায্যালীর মতে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শাসনের জন্য প্রয়োজন একজন ধীশক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশালী শাসকের। যোগ্যশাসক ব্যতীত সমাজে ন্যায়-নীতি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হয় এবং জনসমষ্টির জীবন, মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তবে গায্যালীর মতে, যোগ্য শাসক তিনি যিনি পরম নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর বাণী অনুসরণ করেন এবং আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি "ইকতিসাদ" শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "যোগ্য শাসক না থাকলে রাষ্ট্রে দেখা দেবে নিরবচ্ছিন্ন বিশৃংখলা, যুদ্ধের অবিরাম প্রস্তুতি, অস্ত্রের ঝনঝনানি, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী"। ফলে সমাজের বন্ধন হবে শিথিল এবং রাষ্ট্র নিমজ্জিত হবে সীমাহীন দুঃখের সাগরে। তিনি তাঁর 'তিবরুল মসবুক" নামক গ্রন্থে শাসকের

গুণাবলির এক চিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর মতে, শাসক হবেন ধর্মপ্রাণ, জ্ঞানী, সাহসী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সুবিচারক। তাঁর নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণ নিরাপত্তাবোধের আশীর্বাদ লাভ করবে। শাসক সর্বদা সৎব্যক্তি ও গুণী-জ্ঞানীদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। তিনি হজরত মোহাম্মদ (স) কে একজন আদর্শ শাসক হিসেবে বর্ণনা করেন এবং তাঁর নীতি অনুসরণ করতে শাসকদের উপদেশ দেন। তাঁর মতে, ন্যায়নিষ্ঠ শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিতুল্য এবং অন্যায়কারী শাসক শয়তানের প্রতিনিধি।

আল-গাযযালী রাষ্ট্রীয় সত্তাকে একটি জীবদেহের সাথে তুলনা করে শাসককে রাষ্ট্রের হৃদয়ের সাথে তুলনা করেছেন। মানব মনের বিভিন্ন প্রবণতার সাথে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভাগের তুলনা করেছেন। মানব মনে যেমন থাকে কামনা, ক্রোধ, বিচারবুদ্ধি ও বিবেকবোধ, রাষ্ট্রেও তেমনি থাকে শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তা, শান্তি রক্ষক, উপদেষ্টা এবং শাসক। মানব মনে বিবেক যেমন রাজত্ব করে এবং তার নিয়ন্ত্রণে থাকে কামনা, ক্রোধ ও বুদ্ধি, রাষ্ট্রেও তেমনি শাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ। বিবেকহীন মন যেমন অশান্তি ও পাপের কেন্দ্রস্থান, যোগ্য শাসকহীন রাষ্ট্রও তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতা, অশান্তি এবং নিরাপত্তাহীনতার কেন্দ্রভূমি। এভাবে তুলনার মাধ্যমে তিনি যোগ্য শাসকের এক উত্তম প্রতিচ্ছবি রচনা করেন।

আল-গাযযালীর অবদান

His Contribution

মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের মধ্যে আল-গাযযালী একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর যে মতবাদ, রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং শাসকের গুণাবলি সম্পর্কে তাঁর যে অভিমত এবং রাষ্ট্রীয় দর্শনে ধর্মতত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দান করেছেন তা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। এরিস্টটল বা প্লেটোর ন্যায় তিনি কোন মৌলিক তত্ত্ব প্রচার করেন নি সত্য, অথবা হেগেল ও মার্ক্সের মত ব্যাপক কোন ঐতিহাসিক সূত্রের আবিষ্কর্তা গাযযালী ছিলেন না। কিন্তু মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তারাজ্যে তাঁর অবদানকে কোনরূপে সেন্ট অগাস্টিন বা সেন্ট টমাস একুয়নাসের অবদান অপেক্ষা হীনপ্রভ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছেন যে, শাসক হবেন একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি। শাসকের যোগ্য শাসনে সমাজ হবে উন্নত এবং পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর মতে, পরাক্রমশালী শাসকের ক্ষমতা কোনক্রমে সীমাহীন হবে না। তাঁর ক্ষমতা সীমিত হবে আল্লাহর বিধান, শরীয়তের আইন এবং সমাজ-জীবনের মৌলিক ন্যায়-নীতি দ্বারা। তিনি আরও বলেছেন, শাসক সর্বদা জ্ঞানী ও গুণীদের পরামর্শ মত শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শাসন ব্যবস্থায় তিনি কোনরূপ স্বৈরাচারিতা বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন নি। শাসন কর্মে তিনি রাষ্ট্রীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান।

১। আল-গাযযালীর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the political thought of Al-Gazzali?)

২। তাঁর মতানুযায়ী যোগ্য শাসকের কোন্ কোন্ গুণ থাকা উচিত? (What qualities a ruler should have according to Al-Gazzali?)

৩। রাষ্ট্রচিন্তায় আল-গাযযালীর অবদান সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the contributions of Al-Gazzali to political thought?)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন

THEORIES OF THE ORIGIN OF THE STATE AND ITS EVOLUTION

২৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
Important Questions in Political Science

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হলো? কখন হলো? ইতিহাস এ সম্পর্কে নীরব এবং সুনিশ্চিতভাবে বলাও শক্ত কখন ও কীভাবে রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে। তবে আজকাল নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ধারা মোটামুটি অনুমান করা সম্ভবপর। ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের আলোচনার পূর্বে কতকগুলো মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করেছে। ঐ সব মতবাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলোর বর্ণনা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ
The Theory of Divine Origin

বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ অতীব প্রাচীন। পুরাকালের বিভিন্ন গ্রন্থে ও ভাবধারায় এই মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। এই মতবাদের মূল কথা, সৃষ্টিকর্তাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছেন তিনি। তাঁর বিনা আদেশে গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না। জীবজন্তু, পশুপাখি, তৃণগুল্ম সব কিছুই বিশ্বপিতা তাঁর সীমাহীন অনুকম্পায় সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা তাঁর মঙ্গলময় হাতের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তিনি রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করে তাঁর প্রতিনিধির হস্তে রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত করেন। সুতরাং শাসনকর্তা বা রাষ্ট্রপতি সৃষ্টিকর্তার নিকট তার কাজ-কর্ম ও পরিচালনার জন্য দায়ী থাকতেন। প্রজা পরিষদবর্গ রাষ্ট্রপতিকে বিধাতার প্রতিনিধি হিসেবে মান্য করতেন। রাষ্ট্রপতিকে অমান্য করা জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হত, কেননা তাঁকে অমান্য করার অর্থ সৃষ্টিকর্তার বিধান লংঘন করা। এ মতবাদ থেকে অবশ্য শাসকবর্গ বা রাজাদের **বিধাতা প্রদত্ত ক্ষমতা মতবাদের** (Theory of Divine Rights) জন্ম হয়েছিল, যাকে মূলধন করে পরবর্তী যুগে তাঁরা নাগরিকগণের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এ মতবাদের সমর্থনে
In Support of This Theory

খ্রিস্টানদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে বাইবেলে রাজকীয় ক্ষমতার আধার হিসেবে ধরা হয়। **সেন্ট পল** (St. Paul) বলেছেন, "প্রত্যেক আত্মাই উচ্চতর ক্ষমতার অধীন হোক। কারণ ঈশ্বরের ক্ষমতার বাইরে কোন ক্ষমতাই থাকতে পারে না। ক্ষমতা মাত্রই ঈশ্বরের দান" ("Let every soul be subject unto the higher power ; for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God.")। মধ্যযুগে খ্রিস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ের পোপ এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) সম্রাটের মধ্যে কে বড় এই প্রশ্ন নিয়ে প্রচণ্ড ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে। পোপ দাবি করতেন, তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি এবং তাঁর নিকট থেকে সম্রাট ক্ষমতা পেয়েছে। তিনি আরও বলতেন, দীনহীন ধর্মযাজকের ক্ষমতা শ্রেষ্ঠতম রাজ্যের অধিকারীর

ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে আগ্‌সবার্গের সম্মেলনে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়। জগতের সমস্ত প্রভুত্ব, শাসনপদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস দাবি করেন, তিনি রাজক্ষমতা পেয়েছেন ঈশ্বরের নিকট থেকে। সুতরাং প্রজাদের নিকট কোন কৈফিয়ৎ দিতে তিনি বাধ্য নন। প্রজাদের কোন কৈফিয়ৎ চাওয়াও মহাপাপ, কারণ তা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসের নামান্তর হবে। তৎকালীন ফরাসি লেখক তাঁর বইয়ে প্রমাণ করেন যে, ঈশ্বর রাজাদের নিজ মন্ত্রীরূপে রাষ্ট্রে প্রেরণ করেন, যেন তারা প্রজাদেরকে নিজ সন্তানরূপে শাসন করেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে **ফিলমার** (Filmer) তাঁর **পেট্রিয়ার্ক** (Patriarch) গ্রন্থে বলেন, ঈশ্বর আদি মানব আদমকে সর্বপ্রথম রাজা করেছিলেন এবং বর্তমান রাজারা আদমের সন্তান হিসেবে রাজ্যের ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন।

প্রাচীন মিসরে রাজাকে সৃষ্টিকর্তার অবতার বলে মনে করা হত। জীবিতকালে তাঁকে সূর্যপুত্র হোরাস এবং মরণের পরে ওসিরিরূপে পূজা করা হত। চীন ও মেসোপটোমিয়াতে রাজাকে একদিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, অন্যদিকে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে মনে করা হত। মহাভারতেও এই মতবাদের সমর্থনে অনেক আভাস মেলে। অরাজকতায় লোকেরা অতিষ্ট হয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলে তিনি এক বিস্তৃত বিধান-শাস্ত্র রচনা করে বিরজসকে রাজা নিযুক্ত করলেন এবং লোকে তাঁর আদেশ পালন করতে স্বীকৃত হলো। মহারাজ অশোক পর্যন্ত নিজেকে 'দেবতাদের প্রিয়' বলে বর্ণনা করেছেন। 'শতপদ' ব্রাহ্মণে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলা হয়েছে। ইসলামেও এই মতবাদের কিছু ইঙ্গিত আছে। আল্লাহর রাসূল বা নবী খেলাফতের শাসনকর্তা। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বা তাঁর ইসলামের কানুন মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করে জনকল্যাণে মনোনিবেশ করবেন। এখনও পর্যন্ত রাজা-মহারাজা বা রানীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সৃষ্টিকর্তার নামে। শুধু তাই নয়, যে কোন শুভ রাষ্ট্রীয় কর্ম আরম্ভ হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের পর। তাও দৈবী উৎপত্তিবাদের ঐতিহাসিক অবশিষ্টাংশ।

সমালোচনা
Criticisms

বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ সম্বন্ধে আজকাল কেউ তেমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন না, কেননা তা যুক্তিতর্কের মাপকাঠিতে অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে এবং ইতিহাসের ধোপেও তা টিকে নি।

প্রথমত, এই মতবাদ গণতন্ত্র বিরোধী। জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব এই মতবাদে স্বীকৃত হয় নি। কেননা তা দ্বারা দায়িত্বহীন এক ধরনের সরকার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ শাসন কর্তা ঈশ্বর ছাড়া কারো নিকট জবাবদিহি করতে পারেন না। ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার হবার সম্ভাবনা এতে অত্যধিক।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ স্বার্থান্বেষী এবং অত্যাচারী রাজা ও সম্রাটের হস্তে অত্যাচার ও অনাচারের যন্ত্র হিসেবে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য কতিপয় সম্রাট জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে কল্যাণকর এবং জনস্বার্থমূলক কর্মের মাধ্যমে ইতিহাসে আসন পাকা করে নিয়েছেন সন্দেহ নেই। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস একবার আইন পরিষদে এমনও বলেছিলেন, রাজা কখনও পাপী হতে পারেন না। যদি কোন দিন হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, ঈশ্বর জনসাধারণের পাপের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ স্বরূপ তাকে রাজত্ব অর্পণ করেছেন।

তৃতীয়ত, এই মতবাদের ফলে ইতিহাসের অনেক অধ্যায় অন্যায়ে কলঙ্কিত হয়ে রয়েছে। রাজা ও ধর্মযাজকদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে দ্বন্দ্ব ও তার ফলে যে অঘটন ঘটেছে, তার নজীর ইতিহাসে প্রচুর। ধর্মের নামে, সৃষ্টিকর্তার নামে যুগে যুগে অত্যাচারীর 'খড়গ কৃপাণ' রক্তরঞ্জিত হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রাণবন্যা যখন দেশে নতুন নতুন ভাবধারা রচনা করল, তখন এ অবিশ্বাস্য মতবাদ তাসের ঘরের মত বিধ্বস্ত হতে লাগল। গণতন্ত্রায়নের সাথে যখন বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র ধ্বংস হতে লাগল, অনেক অত্যাচারী সম্রাটের ছিন্নমস্তক যখন ভূমি স্পর্শ করল, তখন এই মতবাদে জনসাধারণের বিশ্বাস নড়ে উঠল।

এই মতবাদের প্রতি আস্থাহীনতা
No Confidence to This Theory

প্রথমত, সামাজিক চুক্তিবাদের প্রভাবের সামনে বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ তৃণের মত বেগবতী স্রোতস্বতীতে ভেসে গেল। জনসাধারণের স্বীকৃতি তখন বিধাতার সৃষ্টি মতবাদকে ধুয়ে মুছে নস্যাৎ করে ফেলল।

দ্বিতীয়ত, ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে, বিশেষ করে ইউরোপে, ধর্মের নামে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অনেক সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামে মাত্র থেকে গেলেও ধর্মযাজক পোপদের প্রতিপত্তি মারাত্মকভাবে কমে গেল এবং সমাজতন্ত্রের মুখে, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ রাজতন্ত্রের প্রচণ্ড দাপটের সামনে, এ মতবাদ হীনপ্রভ হয়ে শূন্যে বিলীন হতে লাগল।

সর্বশেষে, গণতন্ত্রের জোয়ার জনমনকে জাদুবিদ্যার ন্যায় বিমোহিত করল এবং জনসাধারণ জনমতের তুলাদণ্ডে সবকিছু পরিমাপ করে মনোভাব গড়ে তুলল। সুতরাং আজকাল বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ সাধারণ বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের বিষয়বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তাও ঐতিহাসিক সূত্র বোঝার জন্যই।

উপকারিতা (Utility) ঃ তথাপি এটা স্বীকার করতে হবে যে, এ মতবাদ এক কালে অনেক মঙ্গলজনক কার্য সাধন করেছে। **প্রথম,** আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তা কিছুটা কার্যকর ছিল। **দ্বিতীয়,** ঈশ্বরের প্রতি শাসকের দায়িত্বশীলতার বর্ণনা দিয়ে রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহারে নৈতিক সীমারেখা টেনে আনতে সমর্থ হয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের উপর স্থাপন করতে চেয়ে স্বৈরাচারী অনেক রাজা বা সম্রাটকে ন্যায়নীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিল। **সর্বশেষে,** ধর্মের বাণী দিয়ে এবং সৃষ্টিকর্তার দোহাই দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় সংহত করতে এ মতবাদ অনেক সাহায্য করেছে।[১]

বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের পরেই বলাত্মক মতবাদ হলে ভাল হয়।

সামাজিক চুক্তিবাদ
Social Contract Theory

সামাজিক চুক্তিবাদের মূল কথা, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয় নি, বরং এটি দেশের জনসাধারণের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার পর এক ধরনের চুক্তির ফলেই রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বে যখন রাষ্ট্রে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন প্রচলিত ছিল এবং মানবিক কোন আইন শৃঙ্খলায় সামাজিক জীবন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে নি, তখন জনসাধারণ বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের জন্মদান করে।

চুক্তি কি ধরনের হয়েছিল, কোন্ কোন্ পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল তা নিয়ে অনেক তর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে চুক্তিবাদী সব পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পূর্বে সমাজে কোন শাসনব্যবস্থা ছিল না। আইন প্রণয়নের কোন সংস্থা ছিল না। আইন শৃঙ্খলাও সমাজে বর্তমান ছিল না এবং মানুষের জীবন প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হত। সমাজের এই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ 'প্রকৃতির রাজ্য' বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) প্রকৃতির আইন কে বলে দেবে, ঝগড়া বিবাদ বাধলে তার মীমাংসা কে করবে, এসব প্রশ্ন জনসাধারণকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ফলে তারা প্রকৃতির রাজ্যের আনন্দ ও সুখ ত্যাগ করে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক জীবনের কামনা করল এবং চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ গঠন করল।

---

১. Gettel, *Introduction to Political Science*, p. 81

চুক্তিবাদের ইতিহাস

চুক্তিবাদ অনেক পুরাতন মতবাদ। গ্রীক চিন্তানায়ক প্লেটো এবং এরিস্টটল চুক্তিবাদ প্রসঙ্গে **সোফিস্ট** (Sophists) দার্শনিকদের মতামতকে যেভাবে সমালোচনা করেন তাতে চুক্তিবাদের কিছু আভাস দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চুক্তিবাদ জনপ্রিয় ছিল। প্লেটো এবং এরিস্টটল চুক্তিবাদ স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে, দেয়া এবং নেয়ার এমন সূক্ষ্ম বিচার থাকলে সামাজিক সংস্থার উৎপত্তি নাও হতে পারত। তবে রোমের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **পলিবিয়াস** (Polibius) চুক্তিবাদ সমর্থন করতেন। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র এক হিসেবে চুক্তিবাদের ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রে গণঅধিকারের প্রেরণায় চুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রয়াস ছিল। **মেনগোল্ড** (Menegold) এমনও বলেছেন, চুক্তিভঙ্গের অপরাধে রাজাকে পর্যন্ত অপসারণ সম্ভবপর। ত্রয়োদশ শতাব্দীর **সেন্ট টমাস একুনাস** (St. Thomas Aquinas) বিশ্বাস করতেন যে, রাজা অভিষেকের দিন প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় চুক্তিকে স্মরণ করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর **আলথুসিয়াস** (Althusius) এবং **গ্রোসিয়াস** চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের কথা বলেছেন। এমন কী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতেও এই চুক্তিবাদের কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। মহাভারতে প্রজাদের সাথে রাজার চুক্তির কথা উল্লেখ আছে। হিন্দু পণ্ডিত কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে চুক্তির কথা কৌশল করে বলে গিয়েছেন। এমনকি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থেও **মহাজন সম্মত** নামে বিজ্ঞ ধার্মিক ব্যক্তির জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে রাজা হবার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

তবে চুক্তিবাদ সপ্তদশ শতাব্দীতেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাও তিনজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের অমর গ্রন্থে—দার্শনিক হবসের 'লেভায়াথানে' *(Leviathan)*, পণ্ডিত লকের 'সিভিল গভর্নমেন্ট' *(Two Treatises of Civil Government)* এবং রুশোর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' *(Social Contract)* গ্রন্থে।

হবসের চুক্তিবাদ
Hobbes's Contract Theory

ইংল্যাণ্ডে যখন গৃহযুদ্ধের কালোমেঘ রাজনৈতিক আকাশ আচ্ছন্ন করেছিল, রাজতন্ত্রের প্রতি যখন জনগণের আস্থা শিথিল হয়ে আসছিল এবং যুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করেছিল, তখন হবস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'লেভায়াথানের' পরিকল্পনা করেন এবং রাষ্ট্রে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে রাজার হাতে সুসংবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন ১৬৫১ সালে।

তাঁর মতে, প্রকৃতির রাজ্য ছিল নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতে পরিপূর্ণ। তিনি মানুষকে ক্ষমতাপ্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর বলে চিত্রিত করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করতেই ব্যস্ত ছিল। ফলে একই বস্তু লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাদের সংঘর্ষ ও সংঘাতের পথে টেনে এনেছিল সেই প্রকৃতির রাজ্যে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শত্রু বলে গণ্য করত। তাই এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশব এবং সংক্ষিপ্ত" ("Solitary, poor, nasty, brutish and short")। এরূপ অবস্থা অসহ্য বোধ হওয়ায় মানুষ অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে এক শাসকের বশ্যতা স্বীকারের প্রয়োজন বোধ করল। তবে হবসের মতে, লোকেরা চুক্তি করতে গিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলেছিল, "আমি নিজেকে শাসন করার অধিকার ত্যাগ করে ঐ ব্যক্তি বা ঐ ব্যক্তিগণের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করলাম এই শর্তে যে, তুমিও ঐভাবে তোমার অধিকার তাকে বা তাদের হস্তে অর্পণ করে সব ক্ষমতা ত্যাগ করবে।" এভাবে হবসের মতে, চুক্তির ফলে সরকাররূপী লেভায়াথান **(দুর্দমনীয় ক্ষমতার প্রতীক-অমরত্বহীন দেবতা)** সৃষ্টি হলো। সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রই চেয়েছেন হবস। এভাবে একব্যক্তি সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন। হবসের মতে, রাজার শাসনই ছিল কাম্য।

রাজার আদেশই আইন। সকলে সে আইন মানতে বাধ্য। না মানলে যথোপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা রইল, কারণ আইনের অবাধ্য হওয়া অন্যায়। কিন্তু রাজা রইলেন চুক্তির বাইরে, কেননা চুক্তি হয় জনগণের মধ্যে। তিনি চুক্তিভঙ্গ দোষে দুষ্ট হতে পারেন না। শুধু আত্মরক্ষার অধিকার বাদ দিয়ে প্রজারা সব অধিকার রাজার হাতে তুলে দেয়। সার্বভৌম শক্তি দ্বারা ঘোষিত আইন যে সব ক্ষেত্রে নীরব, সে সব ক্ষেত্রে প্রজারা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।[১] রাজা শুধু মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেকের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবেন না।

সমালোচনা

১। সমালোচনার আলোকে দেখতে গেলে হব্‌সের চুক্তি রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন সীমারেখা টানতে অসমর্থ হয়েছে বলতে পারি। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু সরকার কেন সার্বভৌম হবে? তা যদি হয় তবে নাগরিকগণ সরকারের হাতে অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করে অধিকার ও স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতে রাজি হবে কেন?

২। তাছাড়া মানব চরিত্র সম্পর্কে তার চিত্রাঙ্কন অসম্পূর্ণ ও দুঃখবাদী। মানব চরিত্র যদি এমনি হিংসাত্মক হয় তবে পরস্পরকে বিশ্বাস করে চুক্তি করবে কি করে? কি করে জনগণ রাজার হাতে অসীম ক্ষমতা অর্পণ করবে? লেভায়াথানের চিত্র ভয়াবহ।

৩। চুক্তি এক তরফা হতে পারে না। একতরফা যা হয় তা হলো অধীনতা এবং হব্‌স চুক্তির মাধ্যমে জনগণকে রাজার অধীনে স্থাপন করেন।

৪। হব্‌সের চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক মনে হয়। কেননা নিরাপত্তার জন্য জনগণ চুক্তি করে সার্বভৌমের সাথে। যদি সার্বভৌম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কি হবে। এ সম্পর্কে হব্‌স নীরব।

৫। অধ্যাপক উইলোবি বলেন, রাষ্ট্র ও সরকার যে স্বতন্ত্র সত্তা হব্‌সের চুক্তিবাদে তা সুস্পষ্ট হয়নি।

৬। হব্‌স জনগণের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তা স্বীকৃত।

তথাপি স্বীকার করতে হবে যে, হব্‌স সর্বপ্রথম সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সরলরেখায় এ সমস্যার বিশ্লেষণ করেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি, ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়।

লকের চুক্তিবাদ
Locke's Theory of Social Contract

ইংল্যাণ্ডের গৃহ যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়ে ইংল্যাণ্ড গণতন্ত্রের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। সার্বভৌম ক্ষমতা রাজমুকুট পরিত্যাগ করে পার্লামেণ্ট অলঙ্কৃত করেছে। জন লক তখন গণতন্ত্রের ধ্বজাকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য লেখনী ধারণ করেন এবং "সিভিল গভর্নমেণ্ট" *(Two Treatises of Civil Government)* নামক গ্রন্থে চুক্তিবাদের আর এক চিত্র তুলে ধরেন।

হব্‌সের ন্যায় তিনিও আরম্ভ করেছেন 'প্রকৃতির রাজ্য' এবং 'প্রাকৃতিক আইন' থেকে। তাঁর মতে, 'প্রকৃতির রাজ্য' (State of Nature) ছিল শান্তিময়, সুন্দর এবং বাসযোগ্য। মানুষ যুক্তি ও বিবেকের মহিমায় প্রকৃতির আইন চিনত এবং মেনে চলত। প্রাকৃতিক আইন-কানুন মেনে চলে মানুষ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার উপভোগ করত। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা কিছু কিছু অসুবিধার

---

১ W. A. Dunning, *A History of Political Theories*, p. 288

সম্মুখীন হয়। **প্রথমত,** বুদ্ধি ও বিবেকের তারতম্যের ফলে তারা প্রকৃতির আইনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করে **অসুবিধায়** পড়ত। **দ্বিতীয়ত,** তারা অনুভব করে যে, কোন এক নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী ও বিধিবদ্ধ **সুপ্রতিষ্ঠিত** আইনসমূহ তাদের সে সব অসুবিধা দূর করতে পারবে। তাই সে সব অসুবিধা দূর করে **সামাজিক** জীবন গঠন করতে লোকেরা চুক্তিবদ্ধ হলো এবং রাষ্ট্র গঠন করল। এ চুক্তি সম্পাদিত হলো পরস্পরের মধ্যে। এ চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকে এ মর্মে অঙ্গীকার করে যে, দণ্ড দেবার অধিকার তাদের থাকবে না। তাদের মধ্য থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তি সর্বসম্মত আইন অনুসারে দণ্ড দান করবেন। প্রথমে এভাবে সৃষ্টি করল সমাজ (Civil Society) এবং পরে সংখ্যাধিক্যের মতে পরিচালিত হয়ে রাজনৈতিক সমাজের (Government) কাঠামো নির্ধারণ করল।

তাই লক দুটি চুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথম চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা সরকারের রূপ নির্ধারিত হয়। সরকার অছির ন্যায় কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজের ভারপ্রাপ্ত হলো। এও লক্ষণীয় যে, লকের মতে, জনসাধারণ চুক্তি করবার সময় জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে দেয় নি। বরং ঐ সব অধিকার তারা প্রকৃতির রাজ্যেও উপভোগ করেছে এবং রাষ্ট্রেও উপভোগ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো।

সমালোচনা

সমালোচকদের দৃষ্টিতে লকের মতবাদের অনেক ক্রটি প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রথম, লক জনমতকে সার্বভৌমিকতার আধার বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বৈধ সার্বভৌমিকতার স্বরূপ তার আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয়, তিনি সম্পত্তি বলতে কী বুঝেছেন, সম্পত্তির অধিকার কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে বা তার সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত, তার সঠিক বিবরণ দিতে অসমর্থ হন।

তৃতীয়, তিনি ঘোষণা করেছেন যে, শাসকগণ ও আইন পরিষদ যদি তাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন অথবা জনসাধারণ যদি তাদের অধিকার ভোগে বঞ্চিত হয় তা হলে তারা বিপ্লবের আশ্রয়ও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কথা হলো, শাসকের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কোন তুলাদণ্ডে করা হবে? একসাথে সকলে তার বিচার কীভাবে করবে, তা তিনি স্পষ্টভাবে বলেন নি।

চতুর্থ, অধ্যাপক বার্কার বলেন, সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে জন লকের ধারণা একান্ত অপরিণত।

পঞ্চম, অধ্যাপক প্লামেনাজের মতে, লকের চুক্তির ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অসঙ্গতিপূর্ণ।

ষষ্ঠ, লকের চুক্তি মতবাদ বিপ্লবের প্রেরণা যোগায়।

তথাপি জন লককে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এবং নিয়মতান্ত্রিকতার পুরোধা বলা হয়ে থাকে। তিনি জোর গলায় বলে গিয়েছেন, নিরঙ্কুশ বা দায়িত্বহীন অসীম রাজকীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। তদুপরি, তাঁর আলোচনায় তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের তফাৎ দেখিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। রাষ্ট্র জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠান। শাসকবর্গ সীমার মধ্য থেকে জনসাধারণের সম্মতি নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করবেন। ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে জন লকের অবদান অমর এবং অক্ষয়।

রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা'
General Will of Rousseau

ফরাসি দেশীয় দার্শনিক রুশো একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ভাবধারায় তাঁর প্রভাব অত্যন্ত গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক চিন্তানায়ক প্লেটোর পরে এমন বিপ্লবাত্মক ভাষায় রাষ্ট্রীয়

চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করতে রুশো ছাড়া আর কেউ সমর্থ হন নি। ব্যক্তিগত জীবনে একটা ছন্নছাড়া হলেও তাঁর চুক্তিবাদে সমাজ-জীবনের এক সুন্দর, সুস্থ এবং সজীব আলেখ্য তিনি রচনা করেন। হব্‌স ও লকের মতে, রাষ্ট্র ছিল একটা মৃত যন্ত্রের মত। কিন্তু রুশোর মতে, রাষ্ট্র একটা প্রাণবন্ত চলৎশক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। তিনি চুক্তিবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। হব্‌স যেখানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং লক যেখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের কথা বলেছেন, সেখানে রুশো বিশুদ্ধ ও পূর্ণ গণতন্ত্রের আলোকে রাষ্ট্রকে ভাস্বর করে তুলতে চেয়েছেন। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম পুরোহিত রুশো ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রধান দিশারী ছিলেন।

তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী লেখকগণের পথ অনুসরণ করে 'প্রকৃতির রাজ্য' থেকে আরম্ভ করেন। তাঁর মতে, 'প্রকৃতির রাজ্য' কল্পলোকের মত সুখশান্তি ও আনন্দে পূর্ণ ছিল। কোন বাধা-বন্ধন, হিংসা দ্বেষ বা স্বার্থপরতার কালিমায় তা কলঙ্কিত ছিল না। মানুষ সে রাজ্যে ছিল সাহসী, মুক্ত, মহান, সরল এবং আনন্দ বিহ্বল। মানব চরিত্র সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ছিল ঠিক হব্‌সের বিপরীত। মানুষ স্বভাবতই সৎ এবং নিজেকে ভালবাসে বলে অপরকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে সমাজ গঠনে উদ্যোগী ছিল। পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতির দৃঢ় বন্ধনে সকলে আবদ্ধ ছিল। অনেকদিন তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ভোগ্য বস্তুর অভাব অনুভূত হয় এবং সীমিত বস্তুকে কেন্দ্র করে সংঘাত বাধার উপক্রম হয়। সম্পত্তি অধিকারের ক্ষেত্রে এবং বর্তমান সভ্যতার প্রভাবে অনটন ও অনিশ্চয়তা আরম্ভ হয়। তখন তারা এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। রুশোর মতে, চুক্তির শর্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমরা প্রত্যেকে আমার ও তাদের সমগ্র ক্ষমতা একত্রিত করে 'সাধারণ ইচ্ছার' (General Will) চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে স্থাপন করি।" এতে কারো কোন ক্ষতি হলো না, বরং যৌথ ব্যক্তিত্বের (Collective Body) অংশ হিসেবে তারা যা দিয়েছিল তা ফিরে পেল এবং অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা আরও মজবুত করল।

সমালোচনা

রুশোর সমসাময়িক মহাপণ্ডিত ভল্টেয়ার থেকে আরম্ভ করে অনেকে তাঁর যুক্তি-তর্কের গলদ বের করেছেন। "সাধারণ ইচ্ছার" (General Will) স্বরূপ কী তা নিয়ে তর্কের তুফান উঠেছে। রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' সকলের মিলিত ইচ্ছা। 'সাধারণ ইচ্ছা' জনসাধারণের কল্যাণের ইচ্ছা এবং সকলের মঙ্গলের ইচ্ছা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরূপ মতবাদের অর্থ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই প্রকৃত ইচ্ছা। কোন্‌টি ভ্রান্ত এবং কোন্‌টি সঠিক তার মাপকাঠি যখন জনকল্যাণ, তখন ইচ্ছা ভ্রান্ত হতে পারে না। তা অভ্রান্ত। কিন্তু রুশোর বিশ্লেষণ এখানে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে এবং জড়ানো। রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছা যদি সর্বদা অভ্রান্ত হয় তা হলে সাধারণ ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্র অভ্রান্ত হয়ে ওঠে এবং ফলে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যম। তা ঠিক নয়। এ সব অসঙ্গতি লক্ষ্য করে ভল্টেয়ার রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণাকে 'বর্বর' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেন যে, এই ধারণা মানুষকে 'বন্য প্রাণীতে' পরিণত করে। জুলেমলি মেইট্রী রুশোর সামাজিক চুক্তির সাধারণ ইচ্ছাকে 'ভয়ঙ্কর' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি হব্‌সের ন্যায় একটি চুক্তির কথাই বলেছেন। সে চুক্তির ফলস্বরূপ যে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎপত্তি হয়েছে তা এক, অবিভাজ্য, সীমাহীন, চরম এবং চূড়ান্ত। তা কোন ব্যক্তি বা দলের উপর ন্যস্ত নয়। বরং তা ন্যস্ত হয়েছে 'সাধারণ ইচ্ছার' উপর, জনসাধারণের উপর। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনা করবে। কিভাবে পরিচালনা করবে, কে বা কারা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে তা পরিচালনা করবে, এমন অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও রুশোর যাদুকরী লেখনীর প্রভাবে তা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে। ফরাসি বিপ্লবের মানসিক পরিবেশ রচনায় অথবা আমেরিকান ঔপনিবেশিকগণকে স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রেরণায় রুশোর চুক্তিবাদ জীবন্ত মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। তাই আজও তিনি গণতন্ত্রের প্রধান একজন পুরোধা ও পুরোহিত হিসেবে স্বীকৃত।

হব্স, লক ও রুশোর চুক্তিবাদের তুলনামূলক আলোচনা

Comparison among Hobbes, Locke and Rousseau in their Interpretations of Social Contract Theory

হব্স, লক ও রুশোর প্রকৃতির রাজ্য, প্রাকৃতিক বিধান ও প্রাক–সামাজিক মানুষের প্রকৃতি থেকে শুরু করে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শাসন পদ্ধতি,শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জনসাধারণের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে তাদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে খুব কমই মিল রয়েছে। হব্সের মতে, চুক্তিবাদ স্বৈরাচারী শাসনের বর্মস্বরূপ। লক তাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ এবং রুশো সর্বজনীন সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে প্রকৃতির রাজ্য, মানব মনের প্রকৃতি, চুক্তির স্বরূপ ও পক্ষ, সার্বভৌম ক্ষমতা ও জনগণের অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে যে পার্থক্য, তা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১। প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) : হব্স প্রকৃতির রাজ্যের যে চিত্র অংকিত করেছেন, তা নিশ্চয়ই দুঃখবাদী এবং হতাশাব্যঞ্জক। সেখানে লোকেরা সর্বদা দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। যে যা পারত, গায়ের জোরে অথবা বুদ্ধির প্যাঁচে তাই করত। সুতরাং সকলের জীবন অনিশ্চয়তা ও দুঃখ–কষ্টের মধ্যে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। লক কিন্তু 'প্রকৃতির রাজ্য' সম্বন্ধে ততটা বিষাদময় চিত্র তুলে ধরেন নি। মানুষ ছিল শান্তিতে আর সুখে। সকলে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলত। রুশোর হাতে প্রকৃতির রাজ্য মনোরম আভায় পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে। সেখানে মানুষ ছিল মুক্ত, স্বাধীন এবং সাহসী। প্রকৃতির রাজ্য মর্তে বেহেশতের মত। মানুষ তাদের স্বভাবসিদ্ধ সততা এবং সহানুভূতির ফলে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করত। সুতরাং দ্বন্দ্বের কোন প্রশ্নই ছিল না।

২। মানব মন (Mind of Man) : হব্সের মতে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতালোভী এবং হিংসুটে। ফলে সমাজ সৃষ্টির পূর্বে তাদের জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, কদর্য, ঘৃণ্য, পাশবিক ও সংক্ষিপ্ত" ('solitary, poor, nasty, brutish and short')। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। লক বলেন, মানুষ স্বভাবত শান্ত, সহানুভূতিসম্পন্ন এবং আইনের প্রতি অনুগত, কিন্তু প্রকৃতির আইন এক একজনে এক এক রকম বুঝত বলে রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন হলো এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। রুশোর মতে, মানব মন সহজ, সরল এবং সহযোগিতার মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। তাই তিনি প্রকৃতির রাজ্যকে স্বর্গের সুষমা দ্বারা মণ্ডিত করেছিলেন। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতি এবং জনসংখ্যার চাপের ফলে উদ্ভূত অসুবিধা দূর করার জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠল।

৩। চুক্তির ধরন এবং চুক্তির পক্ষ (Nature of Contract and Parties) : হব্স ও রুশোর মতে রাষ্ট্র গঠনে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল একটি এবং তা অনন্তকালের জন্য। উভয়ের মতেই সরকার চুক্তির বাইরে ছিল, কিন্তু লকের মতে চুক্তি হয় দুটি। প্রথমটি সামাজিক চুক্তি যার দ্বারা সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক চুক্তি যার মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়েছিল। হব্স বলেন, লোকেরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে তাদের সব ক্ষমতা একজন বা এক গোষ্ঠীর হস্তে সমর্পণ করে। সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হলেন। কিন্তু লক বলেন, লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠন করে এবং পরে রাজা বা পরিষদের সাথে চুক্তি করে কিছু ক্ষমতা রাজা বা পরিষদের হাতে তুলে দিয়েছিল। রুশো কিন্তু বলেন, লোকেরা চুক্তির দ্বারা সব ক্ষমতাই সমর্পণ করে। কিন্তু হব্সের মত না হয়ে তা 'সাধারণ ইচ্ছার' উপর সমর্পিত হয় এবং জনগণ 'সাধারণ ইচ্ছার' একজন হয়ে আবার তা ফেরত পায়।

৪। ব্যক্তি স্বাধীনতা (Individual Liberty) : হব্সের মতে, চুক্তির পর কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা অবশিষ্ট থাকতে পারে না। শুধু মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতা থাকে না। রাজার

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করার কোন অধিকার থাকবে না। লকের মতে, রাজা ব্যক্তির 'জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি' কোনদিন হরণ করতে পারে না। কেননা রাজার সাথে প্রজাদের চুক্তির ফলে উক্ত তিনটি অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েই রাজা রাজত্ব করেন। রুশোর মতে, সাম্য ও স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্ম হয় 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

৫। সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty) ঃ হব্‌সের সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে অনেকটা মিল রয়েছে। উভয়ের মতে সার্বভৌম শক্তি এক, অবিভাজ্য, অসীম এবং সর্বব্যাপী। তবে হব্‌সের মতে, রাষ্ট্র ও সরকার এক। রুশোও উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ দেখেন নি। শুধু জন লক দুই-এর মধ্যে তফাৎ দেখিয়েছেন। লকের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতার আধার রাষ্ট্র। কিন্তু সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী। রুশো বলেন, জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সদাসর্বদা তা জনসাধারণই ব্যবহার করে।

চুক্তিবাদের প্রভাব
Influence of the Contract Theory

চুক্তিবাদ যদিও আজকাল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশিষ্ট মতবাদ হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে, তথাপি রাষ্ট্রীয় কর্মপদ্ধতিতে এবং সতর ও আঠার শতকের ইতিহাসে এই মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রথমত, এই মতবাদ গণতন্ত্রের প্রসারে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সত্য জনসাধারণকে অধিকার এবং স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে যুগে যুগে।

দ্বিতীয়ত, চুক্তিবাদের আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি মহান সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রাষ্ট্র যে সরকার থেকে পৃথক এবং প্রয়োজনবোধে এক সরকারকে ধ্বংস করে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌমিকতা যে এক, অবিভাজ্য এবং চিরস্থায়ী তাও পরিস্ফুট হলো এই মতবাদে।

তৃতীয়ত, এই চুক্তিবাদ কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজার যে অত্যাচার বা অনাচার করার ক্ষমতা নেই এবং তা যে ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত নয়, তাও চুক্তিবাদীরা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই চুক্তিবাদকে মূলধন করেই ফরাসি দেশীয় হিউগানোরা (Huguenots) রাজার অত্যাচার প্রতিরোধ করার প্রয়াস পান।

সর্বশেষে, এই চুক্তিবাদ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে প্রভাবিত করেছে। ইংল্যাণ্ডের ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের ভিত্তিমূলে এই মতবাদ কাজ করেছে। দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসনচ্যুত করার সময় এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি রাজা ও প্রজাদের মৌলিক চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণাস্বরূপ রুশোর বহু উক্তি তখন তাঁরা বারে বারে আওড়িয়েছেন। ফরাসি বিপ্লবের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের পেছনেও চুক্তিবাদ সাবধানে কাজ করেছে।

চুক্তিবাদের সমালোচনা
Criticisms of the Contract Theory

চুক্তিবাদের বিরুদ্ধে বহু ধারালো সমালোচনা বিভিন্ন মহল থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সত্য বলতে কী তা যুগোত্তীর্ণ হতে পারে নি।

প্রথমত, এ মতবাদকে অনৈতিহাসিক বলা হয় ঃ হঠাৎ একদিন আদিম মানবগণ 'প্রকৃতির রাজ্য' পরিত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে, একত্রে সমবেত হয়ে এবং পরস্পরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র সংগঠন করল। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও কোন জাতির ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় নি। বলা হয় যে, ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের পূর্বপুরুষেরা 'মে ফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে চড়ে আটলান্টিকের ওপারে পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করলেন। কিন্তু এ নজীর দুর্বল, কেননা তাদের সম্মুখে ছিল ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা। আরও বলা যেতে পারে, পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালকে জনসাধারণ সিংহাসনে বসিয়ে নতুনভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্য শুরু করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁরা আদিম মানব ছিলেন না। তাঁরা রাষ্ট্রীয় কর্মে পূর্ব থেকে অভ্যস্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, মতবাদটি অসত্য ঃ আধুনিক নৃ-তত্ত্ববিদগণ গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মানব জাতি কোনদিন সমাজ ছাড়া বাস করে নি। সব সময় তারা কোন না কোন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল।

তৃতীয়ত, এ মতবাদ অবাস্তব ঃ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর চিন্তাবিদ হেনরী মেইন প্রাচীন আইন অনুসন্ধান করে এবং অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য আলোচনা করে প্রমাণ করেন, সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ কুল থেকে পেশার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে (form status to contract) এবং পেশাজনিত উন্নতি বহু পরে এসেছে। সুতরাং চুক্তির মত সূক্ষ্ম ধারণা প্রাকৃতিক মানবের কখনও থাকতে পারে না।

চতুর্থত, চুক্তিবাদ অযৌক্তিক ঃ চুক্তি করতে হলে মানুষের মনে যতটুকু রাজনৈতিক চেতনা থাকা প্রয়োজন, প্রাকৃতিক মানবের ততখানি চেতনাবোধ অসম্ভব। কোন কিছুর ধারণা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না। কিন্তু এ কেমন চুক্তি যে, প্রাকৃতিক মানবগণ রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু না জেনেও চুক্তি করে রাষ্ট্র গঠন করল?

পঞ্চমত, চুক্তিবাদ কল্পিত ঃ কোন দুজন লেখক এ সম্বন্ধে এক মত হতে পারেন নি। এক জন নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক একভাবে কল্পনা করে নিজের যাত্রাপথ শুরু করেছিলেন।

ষষ্ঠত, এ মতবাদ কাল্পনিক ঃ প্রাকৃতিক অবস্থায় অধিকার বা আইনের কথা বলা নিছক কাল্পনিক, কারণ রাষ্ট্র না থাকলে আইন বা অধিকার আসবে কোথা থেকে?

সপ্তমত, চুক্তিবাদ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক ঃ চুক্তিবাদের ফলে উদ্ভূত রাষ্ট্র অনেকটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মত হতে বাধ্য। কারো খেয়াল খুশিমত তা গড়ে ওঠে নি এবং কারো খেয়ালে এর ধ্বংস বা পতনও সম্ভবপর নয়। চুক্তিবাদ অরাজকতার প্রশ্রয় দেয়।

রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক জীবনের তাগিদে এবং মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে। **বার্ক** (Burke) রাষ্ট্র সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। তাঁর মতে, 'রাষ্ট্র হল সমস্ত কলা, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত সংস্কৃতির অংশীদারী মহান মানবীয় প্রতিষ্ঠান।' রাষ্ট্র চুক্তির ফল নয়।

চুক্তিবাদ পরিহার (Relinquishment of the Theory) ঃ মতেঁস্কু (Montesquieu) তাঁর **'স্পিরিট অব দি লজ'** *(Spirit of the Laws)* গ্রন্থখানি লিখে চুক্তিবাদের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। কারণ তখন থেকে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যাবলির বিশ্লেষণে বিবর্তনবাদের এবং ঐতিহাসিক সূত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। কিন্তু **ডারউইনের** (Darwin) 'অরিজিন অব দি স্পিসিজ' *(Origin of the Species)* গ্রন্থ, সত্যি বলতে কী, চুক্তিবাদের কবর রচনা করে। এর পরে কেউ চুক্তিবাদে বিশ্বাস করেনি।

বলাত্মক উৎপত্তিবাদ
The Theory of Force

বলাত্মক মতবাদের মূল কথা হল, রাষ্ট্র গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং গায়ের জোরের সাহায্যেই সকলকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শাসকেরা শাসন করতেন। যখন কোন এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তি কোন এক গোত্র বা গোষ্ঠীকে দখল করে প্রভুত্ব স্থাপন করল, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সে গোত্র বা গোষ্ঠী অন্যদের দখলে এনে রাষ্ট্রের সীমারেখা বর্ধিত করল। তারপর রাজ্য যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমে বর্ধিত হয়ে সাম্রাজ্যের রূপ লাভ করল। এ মতবাদে এ হলো রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিস্তারের কাহিনী। শুধু তাই নয়, রাজ্য বা সাম্রাজ্য দখলে রাখার জন্য এবং এর স্থায়িত্বের জন্য গায়ের জোরের প্রয়োজন।

এই মতবাদের সমর্থক প্রাচীন যুগেও ছিল, মধ্যযুগেও ছিল, এমন কী বর্তমান যুগেও পাওয়া যায়। সমর্থকগণের মতে, মানুষ তার স্বাভাবিক ক্ষমতালোলুপতার জন্য, বুদ্ধির মারপ্যাঁচে এবং শক্তির দ্বারা অপরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। মধ্যযুগের ধর্মযাজকরা রাজশক্তিকে পাশব শক্তি বলে নিন্দা করেছেন। **সপ্তম গ্রেগোরী** (Gregory, the Seventh) বলেছেন, রাজা বা সামন্তবর্গ ক্রোধ, অন্যায়, অনাচারের সাহায্যে এবং হিংসার সহায়তায় ক্ষমতা রক্ষা করেছেন। ইতালির লেখক মেকিয়েভেলি বলেন, রাষ্ট্র সংগঠনের পর নাগরিকগণ যে দুষ্ট এবং অন্যায়কারী তা মনে রেখে আইন প্রণয়ন করতে হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক **হিউম্** (Hume) নানাভাবে এই কথা বলেছেন। বর্তমানকালের **জেরেমী টেলর** (Taylor) বলেন, একদল নেকড়ে বাঘ বরং চুপ করে থাকবে, কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ তাদেরকে জোর করে শান্ত করার জন্য কেউ না থাকলে তারা চুপ করে এবং শান্ত হয়ে থাকবে না। আধুনিককালের লেখকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জার্মান লেখক ও চিন্তাবিদ এই মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে জোরেসোরে এটি প্রচার করেছেন। **বার্ণহার্ডী** (Bernhardi) এ মতবাদের গোঁড়া সমর্থক হিসেবে ক্ষমতাকেই একমাত্র সমাধান বলে উল্লেখ করেছেন ('Might is the supreme right and the dispute as to what is right is decided by the arbitrament of war')।

অতীতেও এ মতবাদের সমর্থনকারীদের সংখ্যা কম ছিল না। **চাণক্যের** অর্থশাস্ত্রে এর সমর্থনে অনেক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। এমনকি গ্রীক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক **হেরাক্লিটাস**, এ মত প্রকাশ করেন যে, বল প্রয়োগ না করলে মানুষ ঠিকভাবে থাকতে পারে না। বর্তমানের আদর্শবাদিগণও এই মতবাদ সমর্থন করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের (Individualists) মধ্যে কেউ কেউ **ডারউইনের** (Darwin) বিবর্তনবাদের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, জীবনযুদ্ধে (Struggle for existence) শারীরিক শক্তি ও মানসিক ধূর্ততার জয় হয়। দুর্বল পরাজিত হয়ে শক্তিমানের অধীনতা স্বীকার করে অথবা ধ্বংসের মুখে বিলীন হয়ে যায়। রাষ্ট্র–কল্যাণের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অব্যাহত রাখলে ভাল হয়। রাষ্ট্র এই স্বাতন্ত্র্যকে বাধা দেয় বলে **হার্বার্ট স্পেন্সার** (Herbert Spencer) রাষ্ট্রকে 'প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান' বলে আখ্যায়িত করেন। সমাজতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত **মার্কস** এবং **এঙ্গেলসের** মতে, রাষ্ট্র অত্যাচার এবং অনাচারের মস্ত বড় এক হাতিয়ার স্বরূপ। কারণ, এক শ্রেণীকে পদানত করে আর এক শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করে রেখেছে। লেনিনের কথায়, "রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে, কারণ শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের সমাধান করা সম্ভবপর হয় নি"। জার্মানীর নাৎসীবাদ (Nazism) এবং ইতালির ফ্যাসীবাদ (Fascism) আদর্শের আবরণে এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, 'জোর যার মুলুক তার'।

তাছাড়া, রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী এবং সুশিক্ষিত, দক্ষ এবং সদাপ্রস্তুত সামরিক বাহিনী এ মতবাদের সমর্থনে জীবন্ত সাক্ষ্য হিসেবে সবার স্মরণে রয়েছে।

বলাত্মক মতবাদের সমালোচনা
Criticisms of the Theory of Force

বলাত্মক উৎপত্তিবাদের মধ্যে যে বেশ কিছুটা সত্যের অংশ আছে তা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধির প্রখরতায় এবং গায়ের জোরে যে মানুষ বড় তা অস্বীকার করবে কে? নিজের আদেশ মত সকলকে চলতে বাধ্য করে এবং একের পর এক জনপদকে নিজের অধীনে এনে রাজ্য স্থাপন করে, তা তো ইতিহাসের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেশের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার প্রয়োজন কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এটি সত্যের মাত্র একটা দিক। শুধু বলের দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে না। তার অস্তিত্বও বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাসক অপেক্ষা শাসিতের সংখ্যা বেশি। সুতরাং শাসিতের সম্মতি ছাড়া কোন রাষ্ট্রই টিকতে পারে না। একবার ট্যালিরাও নেপোলিয়নকে বলেছিলেন ঃ 'বেয়নেটের দ্বারা আপনি সবকিছু করতে পারেন, কিন্তু তাতে (বেয়নেটের) তো বসে থাকা যায় না" (You can do everything with bayonets, sir, except sit on them")। ঐতিহাসিক **গ্রীণ** (Greene) তাই বলেছেন, 'রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো সম্মতি, বল নয়'। ('Will, not force, is the basis of the state')। বর্তমানে সর্বত্র গণতন্ত্রের জয় জয়কারের দিন। গায়ের জোরকে বর্তমানে পাশবিক বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং মানসিক বল ও সম্মতি আজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্র জোর প্রয়োগ করে সত্যই, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নৈতিক বল প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য তার বলাত্মক কর্তৃত্ব ব্যবহার করে। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সকলের অধিকার রক্ষা করে।

বলাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনা উপস্থাপন করা যায়

১। এই মতবাদ মানব প্রকৃতি বিরোধী। একমাত্র বল প্রয়োগের মাধ্যমে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

২। রাষ্ট্রগঠনে বল একমাত্র উপাদান নয়। বল প্রয়োগ ব্যতীত সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি, রাজনৈতিক চেতনা, নিরাপত্তাবোধ এ সবই রাষ্ট্র গঠনে অবদান রেখেছে।

৩। এই মতবাদ ভিত্তিহীন। কোন্ কোন সময়ে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু সর্বদা বল প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়।

৪। বলাত্মক মতবাদ স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং তা গণতন্ত্র বিরোধী।

৫। এই মতবাদ মানব সমাজে এক বন্য আবহ সৃষ্টি করে এবং তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তির পরিপন্থী।

৬। এই মতবাদে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো অস্বীকার করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory) ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদই আজকাল সর্বজনস্বীকৃত। রাষ্ট্র সহসা একদিন ঈশ্বরের কৃপায় সৃষ্টি হয় নি। মানুষের চুক্তির ফলও রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। বহুযুগ এবং শতাব্দীর ক্রমিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছে। মানুষের সহজাত এবং স্বাভাবিক সমাজবোধকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র বিকাশ লাভ করেছে। **বার্জেস** (Burgess) সত্যই বলেছেন, রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমিক বিকাশের ফল। মানব সমাজের সর্বজনীন মনোভাব ও নীতি রাষ্ট্রেই বিকশিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে যেমন কোন একটি কারণকে গ্রহণ করা যায় না, ঠিক তেমনি সব রাষ্ট্র একই পথে একই প্রকারে বিবর্তিত হয়েছে তাও বলা যায় না। আলোচনার জন্য আমরা কারণগুলোকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে দেখলে সুবিধা হয়। **(১) রক্তের সম্বন্ধ, (২) ধর্মের বন্ধন, (৩) বল প্রয়োগ এবং যুদ্ধ, (৪) অর্থনৈতিক প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং (৫) রাজনৈতিক চেতনা।**

১। রক্তের সম্বন্ধ (Kinship) : রক্তের সম্বন্ধই ছিল অতীতে মানবসমাজে যোগসূত্র স্থাপনের পন্থা। এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে পরিবার (family)। হেনরী মেইন তাই বলেছেন, পুরাকালে পরিবার ছিল সমাজ জীবনের একক স্বরূপ। পরিবারে শিশুরা পরিচালনা করা ও পরিচালিত হওয়ার প্রথম পাঠ গ্রহণ করত। পরিবারের নেতৃস্থানীয় যিনি, তিনি অনেকটা রাজার মতই ছিলেন। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মাতাই নেতৃস্থানীয়। ঐতিহ্যের সূত্র মায়ের দিক থেকে টানা হত। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতা বা পিতার পিতা ছিলেন দলপতি। এভাবে পরিবার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হলে তা থেকে একাধিক পরিবার জন্ম লাভ করত এবং সব মিলে এক গোত্র এবং গোত্র পরে গোষ্ঠীতে রূপ লাভ করত। কয়েকটি গোষ্ঠী একযোগে এক শাসনকর্তার অধীনে থেকে বসবাস করে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। **হেনরী মেইন** এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেন, "পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক একক, যা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকে। কতকগুলো পরিবারের সম্মিলনই গোত্র বা বৃহত্তম পরিবার এবং গোত্রের সম্মিলনের নাম গোষ্ঠী। গোষ্ঠীগুলোর সম্মিলনই রাষ্ট্র" ("The elementary group is the family connected by common subjection to the highest male ascendant. The aggregation of families forms the base of houses. The aggregation of houses makes the tribe. The aggregation of tribes constitute the commonwealth.")। সুতরাং এভাবে পরিবারকে কেন্দ্র করে এবং রক্তের সম্বন্ধকে ভিত্তি করে গোত্র, গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীর সমবায়ে উপজাতির সৃষ্টি হয়ে এবং একই শাসনের অধীনে থেকে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় আদিম মানবের। একই ভূ-খণ্ডে বাস করতে করতে তারা একই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে রাষ্ট্র সংগঠনের সূত্রপাত করে।

২। ধর্মের বন্ধন (Religion) : ধর্ম এবং ধর্মবোধ আদিম সমাজের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন গোত্র ও গোষ্ঠী বৃহত্তম হয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে লাগল তখন রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষা ধর্মই মিলনের সূত্র হিসেবে কাজ করতে লাগল। অতীতে পূর্বপুরুষদের পূজা -অর্চনাও ধর্মের অঙ্গ ছিল। সুতরাং পূর্ব পুরুষদের থেকে পাওয়া শাসনব্যবস্থার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত তাদের নিকট পবিত্র আমানত স্বরূপ ছিল। অতীতের আইন, প্রথা এবং জীবন প্রণালীসমূহ অত্যন্ত মনোযোগ এবং ভক্তিভরে পালিত হত। শুধু তাই নয়, নতুন পরিস্থিতি এবং মোকাবেলার জন্য যে সব বিধিবিধান প্রণীত হতো, তাও পূর্ব-পুরুষদের নামেই হতো। অতীতে মানুষের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তারা অত্যন্ত বেশি ঘাবড়ে যেত। ঐন্দ্রজালিক নামে পরিচিত কিছু কিছু লোক ধর্মের দোহাই দিয়ে দেবতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে শান্ত করার ফলে লোকদের অন্তর জয় করত এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দাবি করে অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিল। তাছাড়া, একত্রে ধর্মচর্চা ও উপাসনার ফলে তাদের মধ্যে ঐক্যভাব বৃদ্ধি পেয়ে রাজনৈতিক সংস্থায় রূপ লাভ করত। কোন কোন দেশের রাজারা—যেমন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও মিসরে নিজেদেরকে চন্দ্র বা সূর্য বংশ সম্ভূত বলে ঘোষণা করত। প্রজারা ভয়ে ও ভক্তিতে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলত। এভাবে ধর্মভাব মানুষকে রাজাদের প্রতি আস্থাশীল এবং অধীন হতে শিক্ষা দিল এবং সমষ্টিগত ঐক্য বৃদ্ধি পেল। **অধ্যাপক গেটেলের** (Gettele) মতে, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংকটময় মুহূর্তে ধর্মই মানুষকে আনুগত্য শিখিয়ে অরাজকতা দমনে সাহায্য করেছিল।

৩। বল প্রয়োগ এবং যুদ্ধ (Force and War) : বল প্রয়োগ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে খুব কম প্রয়োজনীয় ছিল না। যাযাবর এবং শিকারী দস্যুদল নানা দেশে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়ে মাঝে মাঝে কৃষকগণের উপর দৈহিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোন কোন লোকালয় দখল করেছে। তারা আবার জনপদের মালিকানা প্রাপ্ত হয়ে সৈন্য সামন্ত সহযোগে পার্শ্ববর্তী

জনপদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। মাঝে মাঝে একই ধর্মাবলম্বী অন্য জনপদের সাথে সখ্যতা এবং ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশাল রাজ্য গঠন করেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যুদ্ধের সময় আদেশ মান্য করার পর শান্তিপূর্ণ সময়েও দলপতির আদেশ মেনে চলে আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত হয়েছে—এমন সব ঘটনা স্বাভাবিক। পরে দলপতি রাজা উপাধি গ্রহণ করে রাজত্ব স্থাপন করেছে। তাছাড়া, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে বাস করার ফলে অর্থ ও সম্পত্তির রক্ষার তাগিদও মানুষ অনুভব করেছে। এরূপে তারা আত্মরক্ষা এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাজার বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত প্রজা হিসেবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছে। আইন ও রীতি এবং প্রথার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন শুরু করেছে।

৪। অর্থনৈতিক প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Economic Forces) ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও একটি প্রধান কারণ। অর্থনৈতিক অধিকার ও সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার জন্য একজন বিচারকের প্রয়োজন। ফলে শাসকের, শাসনের এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির উদ্ভব রাষ্ট্র বিবর্তনের এক প্রধান অধ্যায়। ধন-সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ধনবৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শ্রেণী। ঘটে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং চৌর্যবৃত্তির উদ্ভব। ফলে শাসকের এবং বিচারকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

৫। রাজনৈতিক চেতনা (Political Consciousness) ঃ বর্তমানকালে রাষ্ট্রের ভিত্তি রাজনৈতিক চেতনা। রাজনৈতিক চেতনা বলতে আমরা মনের এমন এক অবস্থা বুঝি, যার দ্বারা মানুষ নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কালক্রমে তারা বুঝতে পারল যে, কতকগুলো বিষয়ে প্রত্যেকের স্বার্থ সমান এবং এই সর্বজনীন স্বার্থরক্ষার্থে তারা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে একযোগে কাজ করেছে। এ চেতনা এবং একযোগে কাজ করার প্রয়োজন ও প্রেরণা মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করেছে।

অভ্যন্তরে আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার মনোভাব রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মনে যে ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছে-যা ধর্ম, রক্তের সম্বন্ধ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং পরিবার থেকে শেখা আনুগত্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে-তারই বিকশিত রূপ রাষ্ট্র। অধ্যাপক বার্জেসের (Burgess) কথা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "রাষ্ট্র অপূর্ণ প্রারম্ভ থেকে সমাজ জীবনে নিয়ত ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ। রাষ্ট্র শুরু হয়েছে আদিম অপূর্ণ অবস্থা থেকে এবং ক্রমশ উন্নততর পর্যায়ে এসে মানবের পূর্ণ ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানে রূপলাভ করেছে" ("It is a gradual and continuous development of human society but of a grossly imperfect beginning through crude but improving form of manifestations towards a perfect and universal organization of mankind.")। নৃ-তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানে গবেষণার ফলে পণ্ডিতগণ এই প্রমাণ করেছেন যে মানুষের সামাজিকতাই রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল কারণ। মানুষ সামাজিক জীব। পণ্ডিত এরিস্টটল বহুপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন, মানুষ একা থাকতে পারে না। জৈব প্রেরণায় সে সঙ্গী খুঁজে। তদুপরি তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য সংঘবদ্ধ জীবন যাপন তাদের জন্যে অপরিহার্য। কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে দলপতির আদেশ মান্য করে আইন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে তাদের থাকতে হবে। **রাষ্ট্র ঈশ্বরের দানও নয়, চুক্তির ফলও নয়। বল প্রয়োগের ফলেও রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি অথবা পরিবারের বৃদ্ধি প্রাপ্তির ফল তা নয়। রাষ্ট্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল স্বরূপ।** এরিস্টটল বলেছেন, "রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন থেকে। কিন্তু রাষ্ট্র টিকে রয়েছে কেবল জীবন রক্ষার জন্য নয়, বরং মানুষের উন্নততর জীবনের জন্য"।

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের আলোচনা কর। (Discuss the divine origin theory as an explanation of the origin of the state.)

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমার মতে কোন্ মতবাদ গ্রহণযোগ্য? (What, in your opinion, is the true theory of the origin of state?)

৩। লকের চুক্তিবাদের সাথে হব্‌সের চুক্তিবাদের তুলনামূলক আলোচনা কর এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (Compare and contrast the social contract theory of Hobbes with that of Locke.)

৪। লক কর্তৃক প্রণীত সামাজিক চুক্তিবাদের আলোচনা কর। (Examine the theory of social contract as expounded by Locke.)

৫। হব্‌স কর্তৃক অঙ্কিত 'প্রাকৃতিক অবস্থার' সাথে রুশো কর্তৃক চিত্রিত 'প্রাকৃতিক অবস্থার' তুলনামূলক আলোচনা কর। (Compare and contrast Hobbes's view of the state of nature with that of Rousseau.)

৬। সামাজিক চুক্তিবাদ ও সরকারের চুক্তির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিশদ বিবরণ দাও। (Explain the differences between the social contract and the governmental contract.)

৭। 'সামাজিক চুক্তিবাদ রাষ্ট্রীয় দর্শনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান মতবাদ"-আলোচনা কর। ('The social contract theory is of great value to political philosophy'—Discuss.)

৮। "রুশোর সাধারণ ইচ্ছার মতবাদ কাল্পনিক ছাড়া কিছুই নয়"—আলোচনা কর। ("Rousseau's theory of general will is nothing but a fiction"—Discuss.)

৯। আধুনিক সরকার ও রাজনীতির উপর সামাজিক চুক্তিবাদের প্রভাব ও গুরুত্ব কী তা বর্ণনা কর। (Describe the importance of the social contract theory to modern government and politics.)

১০। "সামাজিক চুক্তিবাদ রাষ্ট্রকে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানির পর্যায়ে নামিয়ে দেয়"—এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাও এবং সামাজিক চুক্তিবাদের সমালোচনা কর। ("The social contract theory tends to reduce the state to the level of a joint-stock company." Examine the statement and criticise the theory.)

১১। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, তা মানুষের চুক্তির ফলও নয়, বলাত্মক প্রচেষ্টারও ফল রাষ্ট্র নয় অথবা পরিবারের বিস্তৃতিও তা নয়"—এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর। ("State is neither the handiwork of God, nor the result of superior force, nor the creation of conventions, nor a mere expansion of family."—Discuss the statement.)

১২। "রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্মতি, বল নয়" (Will, not force, is the basis of the state") ব্যাখ্যা কর এবং বলাত্মক মতবাদের আলোচনা কর।

১৩। সামাজিক চুক্তিবাদের উপর আলোচনা কর। (Discuss the social contract theory of the origin of state.)

১৪। প্রাকৃতিক রাজ্য সম্বন্ধে হব্‌স, লক ও রুশোর মতবাদ আলোচনা কর। (Discuss the ideas of Hobbes, Locke and Rousseau concerning the state of nature.)

১৫। হব্‌স বা লক বর্ণিত সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনা কর। (Discuss the social contract theory as stated by Hobbes or Locke.)

১৬। বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদ আলোচনা কর। (Discuss the evolutionary theory.)

[R. U. '80, 2007]

১৭। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। এই মতবাদটি কী গ্রহণযোগ্য? (Discuss the evolutionary theory of the origin of the state. Is this theory acceptable?)

[N. U. 1995]

১৮। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদটি ব্যাখ্যা কর (Explain the social contract theory of the origin of the state.) [N. U. '96, '98, 2002]

১৯। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলো কী কী ? তোমার মতো কোন মতবাদটি গ্রহণযোগ্য ? (What are the theories about the origin of state? Which do you think is acceptable?)

[N. U. 1997]

রাষ্ট্রের প্রকৃতি

NATURE OF THE STATE

২৪

সূচনা
Introduction

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, কর্মক্ষেত্র, কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ে নিচে কয়েকটি মতবাদ লিপিবদ্ধ হলো ঃ

আইনগত মতবাদ
The Juristic Theory

প্রধানত আইনজ্ঞগণের দ্বারা উপস্থাপিত এই মতবাদের মূল কথা হলো রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার বলে আইন প্রণয়ন করে, আইন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এবং আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষা করে। রাষ্ট্র আইনের মূর্ত রূপ। আইনরূপী বৃহৎ ব্যক্তির ন্যায় দয়ামায়াহীন, উৎসাহ-উদ্দীপনাবিহীন এক বৃহৎ ব্যক্তি স্বরূপ এই রাষ্ট্র। এর সাথে জনসমূহের খুব কমই সম্পর্ক রয়েছে। এ অর্থে রাষ্ট্র হলো রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ এক সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান যা সমষ্টিগত ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন। রাষ্ট্র অজয়, অমর এবং অক্ষয়। অতীতের সাথে সম্পর্কহীন এ প্রতিষ্ঠান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত। আইনগত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রে জনসাধারণ গৌণ এবং আইনসঙ্গত অধিকারহীন জনসমূহের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ মতবাদে শুধু তারাই রাষ্ট্রের আওতায় পড়ে, যারা অধিকারের প্রশ্নে জড়িত হয়ে বিচারালয় পর্যন্ত আগমন করে অথবা আইনগত অধিকারসম্পন্ন। রাষ্ট্র সম্পত্তি দখল করতে পারে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরিচালন ভার গ্রহণ করতে পারে। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী বিচারালয়ে মামলা রুজু করতে পারে অথবা অপরে মামলা দায়ের করলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের তফাৎ এই যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা মৌলিক এবং সবক্ষেত্রে ব্যাপ্ত, কিন্তু ব্যক্তির ক্ষমতা সীমিত এবং অন্য কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত।

এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, জনসাধারণের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গৌণ। জনসাধারণ এখানে রাষ্ট্র-ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু অধিকার রক্ষা অথবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, ব্যক্তি অনেকটা আত্মসর্বস্ব, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ করে সাধারণত নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জড়িত হয়ে রাষ্ট্রের সাথে জনসমূহ অচ্ছেদ্য প্রাণের টানে আবদ্ধ নয়।

জৈব মতবাদ
Organic Theory

যদিও রাষ্ট্রকে অতীতকাল থেকে জীবদেহের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীতে আইনগত মতবাদ (Juristic theory) এবং চুক্তিবাদের সাহায্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৃহত্তম পরিধি প্রচারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জৈব মতবাদ (Organic theory) সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তের ন্যায় এই জৈববাদেরও জন্মস্থান প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীকপণ্ডিত প্লেটো রাষ্ট্রকে বৃহত্তর জীবদেহের সাথে তুলনা করে মানুষের বিভিন্ন কাজের সাথে রাষ্ট্রের কার্যাবলির উপমা দান

করেন। তাঁর শিষ্য এরিস্টটল বলেন, 'দেহের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেরূপ সম্বন্ধ রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্বন্ধও সেরূপ"। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ থেকে বিচ্যুত হলে যেমন নিরর্থক হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে বিচ্যুত হলে আর ব্যক্তি থাকে না। তাছাড়া, সমগ্রের একটি ধারণা না থাকলে যেমন অংশের ধারণা সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি রাষ্ট্রের ধারণা না থাকলে তার অংশস্বরূপ ব্যক্তির সঠিক ধারণা হবে না। এ হিসেবে এরিস্টটল 'রাষ্ট্রকে ব্যক্তির পূর্ববর্তী' ('The state is prior to individual') বলেছেন। পরবর্তীকালে রুশো রাষ্ট্রকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেন। তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির সাথে মস্তকের, আইনের সাথে হৃদয়ের, শাসকের সাথে ইন্দ্রিয়ের, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির সাথে মুখ ও পেটের এবং রাজস্বের সাথে রক্তের তুলনা করেছেন।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে 'জৈববাদ' শুধু তুলনাত্মক রইল না। লেখকগণ রাষ্ট্র ও জীবদেহকে অভিন্ন প্রমাণ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এ ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert spencer), অস্ট্রিয়ার শফ্‌ল (Schaffle), পোল্যাণ্ডের গামপ্লোউইট্‌স (Gumplowitsch) ও জার্মানীর ব্লুনটসলির (Bluntschli) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জীবদেহের বিবর্তনের ক্রমবিকাশের ধারা দেখিয়ে তাদের অভিন্ন প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

জীবকোষ সহযোগে যেমন জীবদেহ গঠিত, ব্যক্তি সহযোগে তেমনি রাষ্ট্র। জীবকোষের মৃত্যুর ফলে যেমন মানুষ বেঁচে থাকে, ব্যক্তির মৃত্যুতেও তেমনি রাষ্ট্র মরে না। জীবদেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, তেমনি রাষ্ট্রেরও কাজ করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ থাকে। জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজগুলো যেমন একে অন্যের পরিপূরক, তেমন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টা একে অন্যের সম্পূরক। প্রত্যেক অঙ্গের কাজ ভালভাবে চললে যেমন জীবদেহ সুস্থ থাকে, তেমনি ব্যক্তির উন্নতমানের কাজের উপর রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে। ব্লুণ্টসলি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, রাষ্ট্র পুংলিঙ্গ-ধারী। সুতরাং নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, তিনি রাষ্ট্রকে ব্যক্তি সমষ্টির উর্ধ্বে এক ভাবময় বস্তুরূপে কল্পনা করেছেন। একখানি তৈলচিত্র যেমন শুধু তৈলবিন্দুর সমষ্টি নয়, রাষ্ট্রও তেমনি ব্যক্তি সমষ্টি নয়। এ তুলনাত্মক তত্ত্ব থেকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং তাদের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিস্বার্থকে বলি দেয়া যেতে পারে।

হার্বার্ট স্পেন্সারও জৈববাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবদেহের সাথে রাষ্ট্রের পুংখানুপুংখ সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রেরও জীবদেহের মত উদ্ভব, বিকাশ ও মৃত্যু ঘটে। জীবদেহে যেমন রক্ত চলাচলের জন্য শিরা ও ধমনী থাকে, রাষ্ট্রদেহে তেমনি যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। জীবদেহের স্নায়ুবিক শক্তির মত রাষ্ট্রদেহের সামরিক শক্তি আছে। জীবদেহের নাড়ী-ভূঁড়ির সাথে রাষ্ট্রের বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরির তুলনা করা হয়। জীবদেহের পরিপোষক (Sustaining system) ব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রের উৎপাদনকারী ব্যবস্থার অভিন্নতার প্রমাণ করা হয়।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাষ্ট্রকে জীবদেহের সাথে অভিন্ন প্রমাণ করা সম্ভবপর হয় নি। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্র দেহের অংশগুলো কতকটা স্বাধীন এবং ভিন্নভাবে অঙ্গীভূত। জীবদেহে চেতনাশক্তি একস্থানে সংহত থাকে, রাষ্ট্রদেহে কিন্তু তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। রাষ্ট্রের ভেতর প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে, কিন্তু জীবদেহে প্রত্যেক অঙ্গের সেরূপ স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই সাথে বেড়ে থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রদেহে প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি একই সাথে হয় না। জীবদেহের বিনাশ আছে, কিন্তু রাষ্ট্র অনেকটা চিরস্থায়ী। দেহের বিনাশ ঘটলে জীবকোষগুলো সাথে সাথে বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু রাষ্ট্রের পতন হলে ব্যক্তির সত্তা বিনষ্ট হয় না। তাছাড়া, এক জীবদেহ থেকে অন্য জীবদেহ সৃষ্টি হয়, কিন্তু এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি কৃচিৎ দেখা যায়। সর্বোপরি ব্যক্তির কল্যাণ ছাড়া সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা করা সম্ভবপর নয়। রাষ্ট্র ব্যক্তির সুখ-সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য, কিন্তু ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নয়।

জৈববাদিগণের ভুল হয়েছে যখন তাঁরা সাদৃশ্যকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। সাদৃশ্য প্রমাণ নয়। রাষ্ট্রের সাথে জীবদেহের সাদৃশ্যও আছে এবং গুরুতর পার্থক্যও রয়েছে। তাই অধ্যাপক হবহাউস (Hobhouse) বলেছেন, "রাষ্ট্রকে প্রাণীরূপে কল্পনা করা নিরর্থক"।

তথাপি এ মতবাদের কতকগুলো গুণ আছে যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। **প্রথমত,** এ মতবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করে উভয়ের কল্যাণ সাধন করেছে। ব্যক্তির বিকাশের উপর যেমন রাষ্ট্রের মঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের বিকাশের উপরও অনেকটা ব্যক্তির বিকাশ নির্ভর করে। **দ্বিতীয়ত,** রাষ্ট্র যে জীবদেহের মত ক্রমবিকাশের ফল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই মতবাদে। তবে রাষ্ট্রের পূর্ণ বিকাশ শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, অনেক ক্ষেত্রে সুচিন্তিত অভিমতের উপরও নির্ভর করে তাও উল্লেখযোগ্য। **সর্বশেষে,** ব্লুণ্টসলির বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র যে ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র নয়, এর যে বিশেষ সত্তা আছে, তা অস্বীকার করবে কে? সুতরাং আজকাল এ মতবাদে কেউ বিশ্বাস না করলেও এক সময় এ মতবাদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করে অনেক মঙ্গল সাধন করেছে।

আদর্শবাদ
Idealistic Theory or Metaphysical or Absolute Theory

আদর্শবাদের মূল কথা হলো রাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের প্রতীক এবং এর আদেশ নির্বিচারে পালনীয়। গ্রীক চিন্তানায়ক প্লেটোর চিন্তাধারায় এবং তাঁর যোগ্য শিষ্য এরিস্টটলের আলোচনায় এই মতবাদের গোড়াপত্তন হলেও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে তা জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) নামের সাথে জড়িত। হেগেলের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ দার্শনিক ব্রাডলে (Bradley), বোসাঙ্কে (Bosanquet) এবং ঐতিহাসিক গ্রীন (Greene) নব আদর্শবাদ (Neo-Idealism) প্রচার করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আদর্শবাদের গভীর প্রভাব তৎকালীন চিন্তাক্ষেত্রে পড়ে। একদিকে নাৎসী (Nazi) মতবাদ, অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট (Fascism) চিন্তাধারা এ ভাববাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি কার্ল মার্কস এবং লেনিনের উপরেও এই মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

হেগেল, প্লেটো এবং এরিস্টটলের মতবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন। প্লেটো বলেছেন, রাষ্ট্র নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রাষ্ট্রের আদেশ পালন করে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব এবং মনুষ্যত্ব বিকাশ করতে পারে। এরিস্টটলের মতে, রাষ্ট্র মহত্তম বলে নাগরিকগণের মহত্তম জীবন প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাণ্ট (Kant) রাষ্ট্রকে 'ঐশ্বরিক' এবং 'সর্বশক্তিমান' বলেছেন।

হেগেল তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের চিন্তার সমন্বয়ে তাঁর ভাববাদ গড়ে তোলেন। তিনি রাষ্ট্রকে 'পৃথিবীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রা' ('march of God on earth') বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, যে সার্বিক প্রজ্ঞা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, রাষ্ট্র তা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র প্রজ্ঞার প্রতীক স্বরূপ। রাষ্ট্র কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মাত্র নয়, বরং রাষ্ট্র স্বয়ং উপেয়" ("State is not a means to an end but an end in itself")। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা বাস্তব রূপ লাভ করে। সুতরাং ব্যক্তি তার পরিপূর্ণতা এবং জীবনের সার্থকতার জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো রাষ্ট্রকে মেনে চলে স্বীয় নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করা। রাষ্ট্র অভ্রান্ত। রাষ্ট্র কখনও কোন অন্যায় করতে পারে না। ন্যায় এবং নীতি–বোধের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক এবং বাহক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আদর্শের মূর্ত রূপ।

হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের বিকাশেই ব্যক্তির বিকাশ সাধন হয়। রাষ্ট্র ছাড়া মানুষের জীবন অসহায়, অবাস্তব এবং শূন্য। রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে মানব স্বাধীনতা খুঁজে পায়। স্বাধীনতা বলতে হেগেল বুঝিয়েছেন মানবের সে সব কর্মগুলোকে যা মানব প্রজ্ঞা এবং বিচারশক্তির প্রভাবে সম্পন্ন করে থাকে। মানব বুদ্ধি এবং বিবেচনার দ্বারা ঠিক পথে চলতে পারে না। ঠিক পথে শুধুমাত্র তখনই সে চলতে পারে, যখন সে রাষ্ট্রের সীমাহীন প্রজ্ঞার প্রভাবে পথ চলে। কারণ, রাষ্ট্রই একমাত্র সংস্থা যা নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞার অধিকারী। ফলে সকলের কল্যাণে রাষ্ট্র এক মাধ্যম স্বরূপ। তাই তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষের ইতিহাস চরম পরিণতি লাভ করেছে"। তিনি আরও বলেছেন, "রাষ্ট্রের সত্তার শ্রেষ্ঠ রূপ দেখা যায় যুদ্ধের সময়, কেননা ঐ সময় রাষ্ট্র নাগরিক জীবনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" তাঁর মতে, অন্য রাষ্ট্রের সাথে ব্যবহারে রাষ্ট্রকে ন্যায়-অন্যায় বোধে পীড়িত হবার কোন কারণ নেই, কারণ রাষ্ট্র অন্যায় করতে পারে না।

হেগেলের আদর্শবাদের প্রভাব ছিল তৎকালে অপরিসীম। অনেকের মতে, বিংশ শতাব্দীর প্রলয়ঙ্করী দুটি মহাযুদ্ধ জার্মানি থেকে যে আরম্ভ হয়, তাকে হেগেলের ভাববাদের পরোক্ষ ফল বলা চলে। হেগেলের ভাববাদকে বস্তুবাদে রূপান্তরিত করে কার্ল মার্কস যুগান্তকারী সাম্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। লেনিন তাকে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে ব্যবহার করে নতুন এক সামাজিক জীবনের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। কিন্তু তথাপি হেগেলীয় দর্শন সমালোচনার অতীত নয়।

সমালোচনা
Criticisms

প্রথমত, অনেকের মতে, ভাববাদ রাষ্ট্রকে দুর্দান্ত ও পরাক্রমশালী করে ব্যক্তিস্বার্থ নস্যাৎ করেছেন। এ মতবাদে রাষ্ট্র যেন জগন্নাথের রথচক্র, যা নির্মমভাবে ভক্তবৃন্দকে পদদলিত করে, নিষ্পেষিত করে।

দ্বিতীয়ত, ভাববাদের ফলে মানুষকে বিবেক-বুদ্ধিহীন, বিচারশক্তি রহিত করার একটা বৃথা চেষ্টা চলেছে। মানুষ যদি নিজের ভাল-মন্দ না বুঝল, তবে রাষ্ট্রের মত নৈর্ব্যক্তিক ভাববস্তু নাগরিকদের ভালমন্দ বুঝবে কি করে?

তৃতীয়ত, এই মতবাদে স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা পরাধীনতার নামান্তর। জার্মানীতে নাৎসীবাদের মহিমায় বিশ্বাসিগণ তা দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক এক সংস্থা হিসেবে মানলেও কালে তা দায়িত্বহীন এক প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করবে। এর দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসী দেখেছিলেন হেগেলের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ফ্রান্সে যখন রাজা চতুর্দশ লুই-"আমি রাষ্ট্র"-বলে আস্ফালন করে জনগণের স্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলী দিয়েছিলেন।

সর্বশেষে, এও বলা যেতে পারে যে, আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক যুগে, যখন মানুষের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হয়, তখন ভাববাদ যেন কালের গতিকে টেনে ধরে পশ্চাৎ অভিমুখে ঘুরিয়ে দিতে চায়। এটি অগণতান্ত্রিক মতবাদ, একনায়কতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ এবং ব্যক্তিস্বার্থের চরম পরিপন্থী।

তবে এই মতবাদে যেভাবে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা রয়েছে, তা একদিকে যেমন সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছে, তেমনি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাশীল করেছে। তাছাড়া, জীবনকে মহত্তর করতে হলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য যে অপরিহার্য তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এ মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অধিকারের প্রশ্নটিকে মহিমান্বিত করেছে।

১। "রাষ্ট্র নিষ্প্রাণ কোন সংস্থা নয়। রাষ্ট্র জীবন্ত জীবকোষের মতই"-আলোচনা কর। ("The state is not a mere lifeless organism but a living organism"—Discuss.)

২। জৈব মতবাদ কাকে বলে? এর পর্যালোচনা কর। (What is organic theory? Discuss this critically.)

৩। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিকদের অভিমত কী? বিশদভাবে বর্ণনা কর। (What do the philosophers say about the nature of state? Discuss them.)

৪। আদর্শবাদ সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর এবং এর ক্রটিসমূহ উল্লেখ কর। (Discuss critically the idealistic theory of state and bring out its defects.)

সার্বভৌমত্ব

SOVEREIGNTY

২৫

সার্বভৌমত্ব কী

What is Sovereignty

রাষ্ট্র গঠনে যে চারটি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন, সার্বভৌমত্ব তাদের অন্যতম। সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের স্পর্শ মণি বলা হয়। সার্বভৌমত্বের স্পর্শে রাষ্ট্র এমনি এক রূপ পরিগ্রহ করে, যার নিকট সমাজের অন্যান্য সংঘ স্বেচ্ছায় মাথা নুইয়ে থাকে। **অধ্যাপক গার্নার** (Garner) বলেন ঃ "অন্যান্য সংঘের সমষ্টিগত ইচ্ছা থাকতে পারে এবং তারা নীতিও নির্ধারণ করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের উপর প্রভুত্ব করে এবং তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রই সে সব বিরোধ নিষ্পত্তি করে।" Sovereignty শব্দটি 'Superanus' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সার্বভৌমত্বের অর্থ চরম ক্ষমতা। ১৫৭৬ সালে ফরাসি লেখক জঁা বোঁদা এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ থাকে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র দেহের প্রাণস্বরূপ। দেহের মধ্যে প্রাণ কোথায় অবস্থিত, তা দেখতে কত বড় এবং কি তার রং তা যেমন ঠিক করে বলা যায় না, সার্বভৌমত্ব তেমনি রাষ্ট্রের কোথায়, সরকারের মধ্যে, না আইন পরিষদের মধ্যে, না নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে, না জনসাধারণের মধ্যে অবস্থিত, তাও ঠিক করে বলা যায় না। সার্বভৌমত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার বলেন, "সার্বভৌমত্বকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের মত আকারহীন অথচ সর্বব্যাপী এক এবং পরিপূর্ণ বলে মনে করতে পারি।"

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

Definition of Sovereignty

সার্বভৌমত্বের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞার উদ্বৃতি দিয়ে সার্বভৌমত্ব কি তা বলতে চেষ্টা করব। আন্তর্জাতিক আইনের আদি গুরু গ্রোসিয়াস (Grotius) সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "সার্বভৌমত্ব তাঁর হস্তে ন্যস্ত চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, যার কোন কার্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং যার ইচ্ছা কারো মতের অপেক্ষা রাখে না।" ("The supreme political power vested in him whose acts are not subject to any other and which cannot be overriden")। এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন **উইলোবি** (Willoughby)। তাঁর মতে, "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই সার্বভৌমত্ব" (Sovereignty is the supreme will of the state")। আমেরিকার আর একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক বার্জেস (Burgess) বলেন, "সার্বভৌমত্ব হলো প্রত্যেক প্রজার ও প্রজাদের সব প্রকার সংঘের উপর মৌলিক, চরম, অসীম এবং সর্বাত্মক ক্ষমতা" ("It is the original, absolute, unlimited, universal power over the individual subjects and all associations of subjects.")।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক **ডুগে** (Duguit) সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আদেশ দেবার এবং নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের প্রত্যেক নর-নারীকে শর্তবিহীন নির্দেশ

দেবার ক্ষমতা" ("The commanding power of the state—the right to give unconditional orders to all individuals in the territory of the state")। ঠিক এভাবে জেলিনেকের (Jellineck) সংজ্ঞার মধ্যে আমরা পাই রাষ্ট্রের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য যার ফলে রাষ্ট্র প্রজাদের উপর আদেশ দেয় এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই স্বাধীন ক্ষমতাকে মান্য করে চলে। **জেলিনেক** বলেন, "সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য এর নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছার দ্বারা আইনত তাকে আবদ্ধ করা যায় না এবং নিজের শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তির দ্বারা সীমিত করা যায় না" (That characteristic of state by virtue of which it cannot be legally bound except by its own will or limited by any other power than itself")। **ব্লাকস্টোন** সার্বভৌমত্বকে "চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব বলে আখ্যায়িত করেন" ("That supreme, irresistible, absolute, uncontrolled authority")। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **পোলক** (Pollock) বলেছেন, 'সার্বভৌমত্ব সেই ক্ষমতা যা সাময়িক নয়, যা অন্য কারো নিকট থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা নয়, যা এমন কোন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় যা রাষ্ট্র বদলাতে পারে না" (Sovereignty is that power, which is neither temporary nor delegated nor subject to particular rules which it cannot alter.")।

সুতরাং *সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে আমরা রাষ্ট্রের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝি, যার বলে রাষ্ট্র অপ্রতিরোধ্য, অন্তহীন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অসীম প্রতিপত্তির অধিকারী। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এর বলেই রাষ্ট্র চরম এবং চূড়ান্তভাবে ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করে এবং বাইরের অন্যান্য রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাধীন ও এককভাবে সম্পর্ক বজায় রাখে।*

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Sovereignty

আইনগতভাবে যে সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে, তা থেকে সার্বভৌমত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এসব বৈশিষ্ট্য শুধু আইনের চোখে স্পষ্ট, কারণ বাস্তব জীবনে এদের অনেকগুলো অল্পাধিক পরিমাণে অনুপস্থিত থাকে। আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের একত্ব, অবিভাজ্যতা প্রভৃতি রূপকে একত্ববাদও (Monism) বলা হয়। বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

১। স্থায়িত্ব (Permanence) ঃ সার্বভৌমত্বের প্রথম বৈশিষ্ট্য তার স্থায়িত্ব। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে, ততদিন তার সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। রাষ্ট্রের পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে, সরকার পরিবর্তিত হতে পারে অথবা রাষ্ট্রের অভিপ্রায়ে সার্বভৌম ক্ষমতা যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, তার অবসানও হতে পারে, কিন্তু সার্বভৌমত্বের অবসান হয় না। সার্বভৌমত্ব চিরন্তন, অনাদি এবং চিরস্থায়ী। যদি কোনদিন রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব হারায়, তা হলে রাষ্ট্রের অবসান নিশ্চয়ই ঘটবে।

২। সর্বব্যাপকতা (Universality) ঃ সার্বভৌমত্বের অপর বৈশিষ্ট্য তার সর্বব্যাপকতা। রাষ্ট্রের ভেতরে প্রত্যেক নরনারীর এবং তাদের সংগঠিত প্রত্যেক সমাজ, সম্প্রদায় বা সংঘ এই সার্বভৌম শক্তির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। অবশ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতেরা রাষ্ট্রের এই সার্বভৌমত্বের আওতার বাইরে থাকে সত্য, কিন্তু তাও সংগঠিত হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশক্রমে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তাদের বিতাড়িত করতে পারে। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম শক্তি বাধাবন্ধনহীন, নিরঙ্কুশ এবং অবাধ। শুধুমাত্র স্থলেই নয়, পানিতে, সমুদ্রের উপকূলভাগে, এমনকি রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আকাশে এবং বাতাসে এই ক্ষমতার ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়।

৩। অবিভাজ্যতা এবং একত্ব (Indivisibility and Unity) ঃ সার্বভৌমত্ব এক এবং অবিভাজ্য। রাষ্ট্রের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রেই সংন্যস্ত হয়। যদি দুই বা ততোধিক ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিরোধ ঘটা অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে চরম সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবে? সেজন্য

সার্বভৌম শক্তিকে বলা হয় সম্পূর্ণ। "সার্বভৌমত্বের বিভাজনের অর্থ তার মৃত্যু" ("To divide sovereignty is to destroy it")। **অধ্যাপক গেটেলের** (Gettell) মতে, সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন সম্ভবপর হয় সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রে, কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্র এবং তার সার্বভৌম ক্ষমতা একক, সেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ন্যস্ত হতে পারে না। **ক্যালহোনও** (Calhoun) সে কথা বলেছেন। তাঁর মতে, "সার্বভৌমত্ব পূর্ণ একটি জিনিস। তাকে ধ্বংস না করে বিভক্ত করা যায় না। যেমন আমরা অর্ধ-চতুর্ভুজ বা অর্ধ-ত্রিভুজ বলতে পারি না, তেমনি অর্ধ-সার্বভৌম ক্ষমতার কথাও বলতে পারি না" ("Sovereignty is an entire thing; to divide it is to destroy it and we might just as well speak of half a square or half a triangle as half sovereignty")।

৪। মৌলিকতা, চরম ও সীমাহীনতা (Original, Absolute and Unlimited) ঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌমত্ব মৌলিক, চরম এবং সীমাহীন। রাষ্ট্রের মধ্যে এর সমকক্ষ বা তার উর্ধ্বে কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না। যদি তার মূল অন্য কোথাও থাকে, তবে তাকে চূড়ান্ত ক্ষমতার আধার বলতে হয়। সার্বভৌমত্ব যদি অন্য কোন শক্তির দ্বারা সীমিত হয়, সে শক্তিই চরম, চূড়ান্ত এবং সার্বভৌম বলে পরিগণিত হবে। আইনগতভাবে অসীম এ ক্ষমতার ব্যবহার সর্বত্র হতে পারে। আইন সার্বভৌমত্ব থেকেই উৎসারিত।

৫। হস্তান্তরের অযোগ্যতা (Inalienability) ঃ সার্বভৌম ক্ষমতার আর একটি বৈশিষ্ট্য তার হস্তান্তরিত হবার অয়োগ্যতা। মানুষ যেমন তার প্রাণ অপরকে দান করে বাঁচতে পারে না, বৃক্ষ যেমন তার পল্লব জন্মাবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করে টিকতে পারে না এবং নদী যেমন তার উচ্ছল জলরাশির গতি বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব ছেড়ে দেয়ার অর্থ তার বিলুপ্তি। রাষ্ট্র যুদ্ধ-বিগ্রহ বা সন্ধির ফলে তার কোন ভূ-খণ্ডের দখল ছেড়ে দেয়, তাকে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার পরিত্যাগ বলা যায় না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চিৎ-শক্তি।

৬। অনন্যতা ঃ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রকে অনন্য করে তুলেছে। রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সার্বভৌম নয়।

সার্বভৌমত্বের ইতিহাস
History of Sovereignty

সার্বভৌমত্ব কথাটি নতুন, কিন্তু এ ধারণা অতীতকালের। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল **"রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা"র** ("supreme power of the state") কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তানায়ক প্লেটোও আইনের কথা বলতে গিয়ে আইনকে **সর্বোচ্চ নিয়ম** বলে আখ্যায়িত করেন। রোমান আইনজ্ঞগণ যখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে **পূর্ণ ক্ষমতার** (fullness power) কথা উল্লেখ করেছেন, তখন প্রকারান্তরে তাঁরা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কথাই বলেছেন। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের বিকাশ সম্ভবপর ছিল না, কারণ সে সময়ে প্রভু ও সামন্তবর্গের সম্বন্ধ ছিল ব্যক্তিগত। তাছাড়া, ধর্মের প্রভাব মানুষকে গীর্জামুখী করে তুলেছিল। ধর্মের বিধান এবং প্রকৃতির আইন ছিল তখন প্রবল প্রত্যাপান্বিত। মধ্যযুগকে তাই অনেকে সৃষ্টির যুগ না বলে প্রস্তুতির যুগ বলে থাকেন। মানুষের স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে জাগতিক দিকটা অনেকটা গৌণ বলে ধরা হত।

সার্বভৌমত্বের আধুনিক ধারণা সর্বপ্রথম ফরাসি দেশে জন্ম লাভ করে। পরে তা ইংরাজি, ইতালি এবং জার্মান সাহিত্যে স্থান লাভ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল্যবান অধ্যায় অলংকৃত করে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে **জাঁ বোঁদা** (Jean Bodin) ফ্রান্সের তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের ধারণা দান করেন। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন তদানীন্তন ফরাসি দেশে ঐক্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বোঁদা রাজার পক্ষ সমর্থন করেন এবং বলেন, রাজা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তির বলে সমস্ত নাগরিকের উপর তাঁর প্রণীত আইন প্রয়োগ করতে পারেন। তিনি নিজের সৃষ্ট আইন দ্বারা আবদ্ধ নন।

তিনি আরও বলেন, রাজা বাইরের পোপ এবং অভ্যন্তরীণ সামন্তগণের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের অধীন নন। প্রথম তিনিই সার্বভৌম শক্তিকে অসীম, অবিভাজ্য এবং চিরস্থায়ী বলেন। তবে তাঁর মতে, সার্বভৌম শক্তি রাষ্ট্রের মৌলিক বিধান, নৈতিক অনুশাসন এবং অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির শর্তানুসারে কাজকর্ম করতে বাধ্য।

তবে এও স্বীকার্য যে, **বোঁদা ইতালির মেকিয়েভেলির** পথ অনুসরণ করে রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের যে বিশিষ্ট স্থান, সে সম্পর্কে **মেকিয়েভেলি** সর্বপ্রথম নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন এবং এই মত প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ন্যায়–অন্যায়ের ধারণার বাইরে রাষ্ট্রীয় কর্মের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাই সার্বভৌম ক্ষমতার সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম মেকিয়েভেলি এবং বোঁদার কুশলী মন থেকেই জন্ম লাভ করেছে।

১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক আইনের আদি গুরু হল্যাণ্ডের আইনবিদ **হুগো গ্রোসিয়াস** (Hugo Grotius) সার্বভৌমত্বের মতবাদকে সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি জোরের সাথে প্রচার করেন, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই সমান স্বাধীন এবং নিজ নিজ এলাকায় চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আরও বলেন, সে শক্তিই সার্বভৌম যার কোন কার্য অন্য কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং যার কার্য অন্য কারো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাকচ করে দিতে সমর্থ নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কথা তিনিই সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।

তারপর চুক্তিবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের হাতে সার্বভৌমত্বের বাণী বিশিষ্ট মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **হব্স** (Hobbes) তাঁর অমর গ্রন্থ **লেভায়াথানে** (Leviathan) এ মতবাদকে আরও বিকশিত করেন। তাঁর মতে লোকেরা 'প্রকৃতির রাজ্যের' বিভীষিকা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের সব অধিকার এক বা কয়েক ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেয়। আসলে হবস রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তাঁর মতে, রাজা চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়ে প্রজাদের সব অধিকার হস্তগত করলেন এবং আইন করার,বিচার করে দণ্ড দেবার, পুরস্কার দেবার, যুদ্ধ করার, রাজ্য রক্ষার, নাগরিকদের শিক্ষা দেবার, এমন কী কোন্ ধর্ম তারা অবলম্বন করবে, তা নির্ধারণ করার একমাত্র শক্তিধর হলেন। প্রজাদের সরকার পরিবর্তন করার কোন অধিকার রইল না। তারা কোন্ বস্তু কতটুকু ভোগ করবে তাও রাজা নির্ধারণ করবেন। ফলে রাজা একটা **'লেভায়াথান'** স্বরূপ, **মর্ত্যের অসীম ক্ষমতাশালী দেবতা স্বরূপ, যা ভয়ঙ্কর এবং অপ্রতিরোধ্য**। বাস্তবক্ষেত্রে এর ফল কী হল তা ঐতিহাসিকগণ ভাববেন। তবে তিনি সার্বভৌমত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেন যে, সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ হতে পারে না, তা বিভক্ত হতে পারে না অথবা তা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে না।

জন লক (Locke) "সার্বভৌম শক্তির" কথা উল্লেখ না করলেও সমাজের ক্ষমতা যে সর্বোচ্চ, তা পরিষ্কার করে বলেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র এবং সরকার পৃথক সত্তা। চুক্তিবাদের মাধ্যমে জনসাধারণ সমাজ সৃষ্টি করে এবং সমাজের হাতে নিজেদের শাসন করার ক্ষমতা অর্পণ করলেন। কিন্তু সরকারের সাথে তার যে চুক্তি হলো তাতে সরকারের হাতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হলো। জনসাধারণ সব প্রকারের শাসন কার্যে ক্ষমতার আদিম উৎস হিসেবে রইল। সর্বোচ্চ ক্ষমতার রূপ বর্ণনা করলে লকের মতে নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ "সর্বনিম্নে রইলেন সার্বভৌম যাকে রাজা বলা যায়। তিনি আইন পরিষদ প্রণীত বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। তার উপরে রইলেন, আইন রচয়িতাবৃন্দ বা আইন পরিষদ। এটি আইনসম্মতভাবে সর্বপ্রধান ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তার ক্ষমতা মৌলিক নয়। আইন পরিষদ ন্যাসী হিসেবে ক্ষমতাসম্পন্ন। সর্বোপরি রয়েছে জনসাধারণ, যারা রাজা এবং আইন পরিষদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। জনসাধারণই ক্ষমতার মৌলিক উৎস বা আধার।" এরূপে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রকারান্তরে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের (Political Sovereignty) সৃষ্টি করেছেন।

রুশো (Rousseau) লকের পথ অনুসরণ করে সার্বভৌমত্বের ইতিহাসে আর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করেন। তিনি জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করেন। চুক্তিবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু জনসাধারণ 'প্রকৃতির রাজ্যের' সব অধিকার 'সাধারণ ইচ্ছার' (General Will) উপরে ন্যস্ত করে এবং 'সমষ্টিগত জীবন'-এর (collective life) অংশীদার হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। তবে লকের মত তিনি সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমিত ও ত্রিভঙ্গমুরারি না করে হব্‌সের মত ঘোষণা করেন, সার্বভৌম এক, অবিভাজ্য এবং অসীম। কিন্তু হব্‌স যেমন রাজাকে সার্বভৌম বলেন, রুশো তেমনই 'সাধারণ ইচ্ছাকে' সার্বভৌম বলেছেন। আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগে সার্বভৌমত্বের বিভক্তিকরণ নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করেছেন এবং বলেছেন, তা হবে কয়েকটি কাল্পনিক দেহের মত, যেখানে একটিতে হাত, একটিতে পা, একটিতে কয়েকটি চোখ এবং আর একটিতে কান বর্তমান। রুশো, হব্‌স ও লকের মধ্যে আপন পথ রচনা করে, হব্‌সের চরম এবং অসীম সার্বভৌমত্ব এবং লকের জনসমূহের সম্মতি মিশিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা ঘোষণা করেন।

রুশোর পরে বিশ্লেষণাত্মক গোষ্ঠীভুক্ত দার্শনিকগণের হাতে সার্বভৌমত্ববাদ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। **বেন্থাম** (Bentham), **মিল** (Mill), এবং **অস্টিনের** (Austin) হাতে পরিপুষ্ট হয়ে সার্বভৌমত্ব আইনগত ব্যাখ্যার দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

সম্প্রতি আর এক গোষ্ঠীভুক্ত চিন্তাবিদ সার্বভৌমত্বের বহুত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য যুক্তির অবতারণা করেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা পরে হবে। এ ক্ষেত্রের দিকপালগণ হলেন **হ্যারল্ড জে. লাস্কি** (Harold. J. Laski), **মেটল্যান্ড** (Maitland), **ক্রাবে** (Krabbe), **ডুগে** (Duguit), **ফিগিস** (Figgis) প্রমুখ মনীষী।

অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব বা সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ
Monism or Austin's Theory of Sovereignty

ইংল্যাণ্ডের একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ **জন অস্টিন** (John Austin) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেন। তিনি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এক ব্যবহারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে (Lecture on Juris-prudence) সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা প্রদান করেন নিম্নরূপ : 'যদি কোন সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত না হন অথচ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির আনুগত্য সাধারণত লাভ করেন, তা হলে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ সমাজের সার্বভৌম শক্তি হবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষসহ ঐ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে গঠিত ও স্বাধীন সমাজ বলা হবে" ("If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society and the society, including the superior, is a society political and independent")। সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে **অস্টিনের** মতবাদকে একত্ববাদও (monism) বলা হয়। উদ্ধৃত সংজ্ঞায় আইনগত সার্বভৌমত্বের সব লক্ষণই ব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাপক **গিলক্রাইস্ট** (Gilchrist) বিষয়বস্তুকে সহজতর করার জন্য তাঁর সংজ্ঞা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো অনুমান করেছেন :

(এক) প্রত্যেক স্বাধীন এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সংহত সমাজে একজন অথবা একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন যিনি বা যাঁরা সমাজের অন্যান্য নাগরিকগণকে তাঁকে অথবা তাঁদের মানতে বাধ্য করেন।

(দুই) সেই মান্যবরই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যিনি সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ। সুতরাং 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will) বা জনসাধারণ সার্বভৌম হতে পারে না।

(তিন) আইনগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর ক্ষমতা সীমাহীন। তিনি তাঁর কাজের সীমা নিজেই নির্ধারণ করবেন। তাঁকে বিশেষ পথে কাজ করতে কেউ আদেশ করতে পারে না।

(চার) সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। এক বা একাধিক কেন্দ্রের মধ্যে এই ক্ষমতা বিভাজ্য হতে পারে না, কারণ তার ফলে একে অন্যের সীমা নির্ধারণ করবে। তাছাড়া, এও বলা যেতে পারে যে, উক্ত সমাজে আইন সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ ব্যতীত কিছুই নয়। অস্টিনের মতবাদই সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ (monistic view of sovereignty)।

কিন্তু অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। **প্রথমত,** বলা হয় যে, এ মতবাদ গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ জনগণের সার্বভৌমত্বের ঘোর বিরোধী, এমনকি বিপরীতধর্মী। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, আইনগত ব্যাখ্যায় যে সার্বভৌম শক্তি, তা অপেক্ষা রাজনৈতিক সার্বভৌম (Political Sovereignty) অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা জনসমূহের মনোভাব, আচার-ব্যবহার, মানসিক প্রস্তুতি প্রভৃতির প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, অস্টিনের এই মতবাদ আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই প্রযোজ্য নয়। যেমন, পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। ইসলামিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এখানে কোন মানবীয় কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম নয়।

তৃতীয়ত, বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অনেক সময় এমন সব কেন্দ্রে ন্যস্ত হয় যা অস্টিনের সংজ্ঞা মত সুনির্দিষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কোথায় সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে, তা সুস্পষ্ট করে বলা সম্ভবপর নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আইনগতভাবে যে সার্বভৌম শক্তি তা আইন পরিষদ, প্রেসিডেন্ট এবং বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ আদালতে ন্যস্ত। যদি আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন করে, তবে প্রেসিডেন্ট তা অসম্মতির (Veto) মাধ্যমে নাকচ করতে পারেন। এমন কী তিনি সম্মতি দান করলেও সর্বোচ্চ বিচারালয়-সুপ্রীম কোর্ট-তা বিধি-বহির্ভূত (ultra vires) বলে বাতিল করতে পারেন। সুতরাং আইনগত সার্বভৌম চিহ্নিত করা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অনেকটা অসম্ভব।

চতুর্থত, বর্তমানে সংবিধানে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার উল্লিখিত করে তা অলঙ্ঘনীয় করে তোলার রেওয়াজ চলছে। তাছাড়া, সংবিধানেও উল্লেখ থাকে কিভাবে আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে। সে ক্ষেত্রে অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব নিরর্থক এবং অচল।

পঞ্চমত, অস্টিনের মতবাদের আইন সম্পর্কীয় দিক সম্পর্কে স্যার **হেনরী মেইন** (Maine) জোর গলায় প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন যে, অস্টিনের সার্বভৌমত্ব ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তিনি রণজিৎ সিংহের মত স্বৈরাচারী রাজার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, তিনি পর্যন্ত প্রচলিত প্রথা ও নিয়মগুলো পাল্টাবার সাহস করেন নি। কারণ, তা তাঁর ক্ষমতার বাইরে ছিল। প্রচলিত প্রথাসমূহকে অনুমোদন করা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং আইনগত সার্বভৌম শক্তির একটা সীমারেখা আছে, যা অস্টিন স্বীকার করতে চান নি।

ষষ্ঠত, সম্প্রতি অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব বহুত্ববাদিগণের (Pluralists) যুক্তিতর্কের তোপের মুখে জড়সড় হয়ে পড়েছে। বহুত্ববাদিগণ বলেন, সমাজের বিভিন্ন সংঘের মধ্যে রাষ্ট্র একটি সংঘ। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সঙ্গত নয় এবং আসলেও রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের সাথে প্রতিযোগিতা করে জনসমূহের আনুগত্য লাভ করে।

যাহোক **অধ্যাপক গার্নার** ঠিকই বলেছেন, অস্টিন শুধু আইনজ্ঞের চোখে প্রশ্নটি দেখেছেন। আইনের একটি ধারণা রূপে অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বকে যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার

করলে তাঁর মতবাদকে অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করা যায়। ক্ষমতার আদিম উৎস যে জনমত, অস্টিন তাকে আমল দেন নি, অথচ আইন প্রণয়নের ভিত্তিমূল যে জনমত, তাকে অস্বীকার করবে কে? সত্যিই তাঁর মতবাদ আধুনিককালে বেসুরো মনে হয়।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন প্রকাশ
Different Forms of Sovereignty

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ প্রত্যেকের জানা উচিত। **প্রথমত, নামেমাত্র সার্বভৌম** (Titular Sovereign) এবং **প্রকৃত সার্বভৌম** (Real Sovereign) রূপে আমরা এর প্রকাশ দেখতে পাই।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা অথবা সম্রাটকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হত। বর্তমানেও ঐ অর্থে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলা হয়। তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁকে চরম ক্ষমতার আধার বলা যায় না। কারণ, পার্লামেণ্ট বা আইন পরিষদের হাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। তাই রানীকে নামেমাত্র সার্বভৌম (titular sovereign) এবং পার্লামেণ্টকে প্রকৃত সার্বভৌম (real sovereign) বলা যেতে পারে। যিনি রাষ্ট্রে আদিম ও চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, **তিনি প্রকৃত সার্বভৌম** এবং যার নামে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে যিনি এ ক্ষমতা প্রয়োগে অক্ষম, তিনি **নামেমাত্র সার্বভৌম**। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এমনি নামেমাত্র সার্বভৌম।

দ্বিতীয়ত, বাস্তব (De facto) এবং **আইনসঙ্গত** (De jure) **সার্বভৌমের** মধ্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব কিংবা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে আইনত যিনি সার্বভৌম কার্যত তাঁর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। যে ব্যক্তি বা যে গোষ্ঠী আইনের বিরুদ্ধে গায়ের জোর অথবা অন্য পদ্ধতিতে যুদ্ধ ও বিপ্লবের সময় নিজের অথবা নিজেদের ইচ্ছা সকলকে মানাতে সক্ষম হয়, তাকে **বাস্তব সার্বভৌম** (De facto) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের সার্থক বিপ্লবের পর আমেরিকা বাস্তবে সার্বভৌম হয়। অবশ্য আইনত এটি সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে যখন ইংল্যাণ্ড তাঁদের স্বাধীনতা স্বীকার করে। ক্রমওয়েল যখন পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিলেন, তখন সকলে তাঁকে সার্বভৌম বলে মেনে নিলেন, যদিও আইনসঙ্গতভাবে দ্বিতীয় চার্লস তখনও সার্বভৌম। তবে বিপ্লব বা যুদ্ধের পরে কেউ যদি আইন অনুসারে গঠিত শাসনতন্ত্রকে দূরে সরিয়ে ক্ষমতাসীন হন, তাহলে **প্রথমত,** তিনি **কার্যত সার্বভৌম** (De Facto) বলে স্বীকৃত হয়ে পরে আইনগতভাবে **আইনানুগ সার্বভৌম** (De Jure) হন। কিন্তু বিপ্লব যদি সার্থক না হয় অথবা যুদ্ধের ফল যদি শেষ পর্যন্ত তার নিজের আয়ত্তে না থাকে, তবে কার্যত সার্বভৌম আইনানুগ সার্বভৌম হতে পারে না। তখন সার্বভৌমের কথাও উঠে না। মহাচীনের শাসকগোষ্ঠী কার্যত সার্বভৌম ছিলেন, যদিও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাঁচে পড়ে কুওমিণ্টাং চীন (ফরমোজায় অবস্থিত চীনের ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠী) বহু দিন পর্যন্ত আইনানুগ সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সার্বভৌম ক্ষমতার এই পার্থক্য মৌলিক নয় অথবা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কার্যত সার্বভৌম স্বীয় ক্ষমতার বলেই হোক অথবা জনসম্মতির ফলেই হোক, আইনসঙ্গত সার্বভৌম হতে বাধ্য।

তৃতীয়ত, আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) সাথে **রাজনৈতিক সার্বভৌমের** (Political Sovereignty) পার্থক্য মাঝে মাঝে দেখান হয়। তবে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সার্বভৌমের এ দুই দিক বা রূপ দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। এ যেন ছবির দুটি দিক এবং দুই-এর সমন্বয়ই ছবিটির আসল রূপ।

আনইগত সার্বভৌম বলতে সে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আদেশ বা নির্দেশ আইনের আকারে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত আইন দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ে স্বীকৃত হয়ে কার্যকরী হয়। আইন অনুসারে সে কর্তৃপক্ষ ঐশ্বরিক আইন, নীতি শাস্ত্রের বিধান এবং জনমতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ইংল্যাণ্ডের রানীসহ পার্লামেন্ট ইচ্ছা করলে যে কোন আইন

প্রণয়ন করতে পারেন। কারণ ইংল্যাণ্ডের আইনগত সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত রয়েছে রানীসহ পার্লামেন্টে (Queen-in-parliament)। পার্লামেন্টের ক্ষমতার প্রাচুর্যের কথা স্মরণে রেখে তাই জনৈক রসিক ব্যক্তি বলেছেন, পার্লামেণ্ট শুধু পুরুষকে নারী এবং নারীকে পুরুষ করতে পারে না। তা ছাড়া পার্লামেণ্ট সব করতে পারে"।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ঠিক তা নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে **এই আইনগত সার্বভৌমের** (Legal Sovereignty) পেছনে অত্যন্ত অস্পষ্ট হলেও আর এক সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতি অনুভূত হয়। যা আইনগত সার্বভৌমকে প্রভাবিত করে তাই **রাজনৈতিক সার্বভৌম** (Political Sovereignty) বলে পরিচিত।

এই সার্বভৌমকে সুস্পষ্ট সংজ্ঞায় তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। রাজনৈতিক সার্বভৌম অত্যন্ত অনির্দিষ্ট, কিন্তু বিবিধ কার্যের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর প্রকাশ ঘটে, যেমন ভোট দানের মাধ্যমে, বিভিন্ন সংবাদপত্রের অভিমতে, বক্তৃতা মঞ্চে, বিভিন্ন জনের অভিমতে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের কথাবার্তায় এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে। কিন্তু অনির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত অসংবদ্ধ হলেও কাজের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি **উড্রো উইলসন** (Woodrow Wilson) বলেছেন, আইনের চোখে সার্বভৌমত্বের যে আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, তা আসলে অবাস্তব। কারণ, সার্বভৌম যতই প্রবল এবং পরাক্রমশালী হোক না কেন, নীতি, ধর্ম এবং জনমতকে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করতে কেউ সাহসী হবে না। তাই বলা হয়, প্রভুর উপরে মহাপ্রভু, সাক্ষাৎ জনগণ, যাদের আশা–আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতাকে বাদ দিয়ে কোন প্রভুই দাঁড়াতে পারে না। তাই **ডাইসি** (Diecy) বলেছেন, "আইনজ্ঞ যে সার্বভৌমকে স্বীকার করেন, তার পেছনে এমন এক সার্বভৌম আছেন, যাঁর চরণতলে আইনগত সার্বভৌম লুটিয়ে পড়তে বাধ্য।"

শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে আইনগত সার্বভৌম এবং রাজনৈতিক সার্বভৌম কার্যক্ষেত্রে এক হয়ে যায়, কারণ সে ক্ষেত্রে আইনের সাথে জনমত মিশে তাকে আরও জোরদার করে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে আইনকে পূর্ণভাবে কার্যকরী করতে হলে এবং জনকল্যাণকর এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে যতদূর সম্ভব আইনগত সার্বভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌমের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে।

জনগণের সার্বভৌমত্ব
Popular Sovereignty

জনগণের সার্বভৌম তত্ত্ব আধুনিক কালের কোন মতবাদ নয়। গণতন্ত্রায়ণের সাথে এ মতবাদ আবার বিভিন্নরূপে প্রচারিত এবং প্রকাশিত হয়ে সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। রোমান আইনজ্ঞদের নিকটও তা সুপরিচিত ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে এ মতবাদ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এবং কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে যখন মধ্যযুগের অবসানে জনসাধারণ মুক্তিপথ রচনায় ব্যস্ত ছিল তখন **ওকহ্যামের উইলিয়াম** এবং তাঁর সমসাময়িক **পাদুয়ার মারসিলিও** (Marsilio of Padua) অত্যন্ত জোরের সাথে ঘোষণা করেন, জনগণই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তাঁরা চুক্তিবাদের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রাজা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্মের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির ন্যাসী। ষোড়শ শতাব্দীর **আলথুসিয়াসও** অনুরূপ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জনগণই যে সব শক্তির অধিকারী তা ঘোষণা করেন। মুসলিম দার্শনিকগণ, বিশেষ করে আবুরুশদ (যাঁকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে **আভেরোজ** বলা হয়) উচ্চ কণ্ঠে জনসমূহের ক্ষমতার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি দার্শনিক রুশো এ অধ্যায়ে নতুন সুর এবং শব্দ সংযোজন করে তাকে সত্যিই গৌরবোজ্জ্বল করে তোলেন। তারপর গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী মনীষীবৃন্দ একযোগে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে পুরাতন মতবাদের খোলনৈচে বদল করে তাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে দাঁড় করাতে ব্যগ্র হলেন। ঐতিহাসিক অনেক ঘটনাবলিতে এই মতবাদের প্রবল প্রভাব পড়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় এবং ফরাসি বিপ্লবের সময় রাজাকে পদচ্যুত করার সময় জনগণের সার্বভৌমত্বকে মূলধন করা হয়েছিল।

আধুনিককালে অধ্যাপক রিচি (Ritchie) এ মতের নতুন ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাঁর মতে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, ভয় দেখিয়ে অথবা বিপ্লবের সম্ভাব্যতার দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে। আবার যদি সার্বভৌম ক্ষমতা গায়ের জোরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তা হলেও জনসাধারণেরই যে গায়ের জোর বেশি তাতে কে সন্দেহ পোষণ করবে? তাদের উত্যক্ত করলে তারা বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সুতরাং জনসাধারণ অসীম শক্তির অধিকারী। তাঁর মতে, সার্বভৌমত্বের সর্বশেষ রূপ গায়ের জোরের মধ্যে নিহিত। সুতরাং সম্ভাব্য যুদ্ধ বা বিপ্লবের সময় শেষ পর্যন্ত অসীম শক্তির আধার জনসাধারণই জয়ী হবে। অতএব শক্তির ভিত্তিমূল জনগণই সার্বভৌম শক্তির আধার।

এই মতবাদ অনেকটা আবেগ প্রসূত। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এই মতবাদ নিরর্থক হয়ে পড়ে। জনগণ সুসংবদ্ধ নয় এবং সুসংবদ্ধ না হলে তারা কোন রকমে সফল হতে পারে না। সুসংবদ্ধ কয়েক হাজার লোক লক্ষ লক্ষ জনতাকে দাবিয়ে রেখে যুগ যুগ ধরে শাসনকার্য চালাতে পারে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা আলোচনা করলেও আমরা বুঝতে পারি, রাষ্ট্র সেরূপ এক সংস্থা যা সরকারের দ্বারা সংগঠিত এবং যা আইন তৈয়ার করে এবং অপরকে তা মানতে বাধ্য করে। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা জনসমূহের মধ্যে থাকতে পারে না। জনসাধারণ যদি সংঘবদ্ধ হয়, তা হলে তাদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট কয়েকজনের হাতে সেই ক্ষমতা চলে যায়। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের গুণ। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই এর সুস্পষ্ট রূপের বিকাশ ঘটে।

সীমিত সার্বভৌমত্ব
Limited Sovereignty

সার্বভৌম শক্তি অসীম নয়, তা অনেক বিধান দ্বারা সীমিত, অনেক পণ্ডিতজনের তাই অভিমত। ফরাসি লেখক বোঁদা (Bodin) তিন প্রকার সীমারেখার উল্লেখ করে বলেন : **(এক)** অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধির দ্বারা, **(দুই)** প্রজাদের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা, এবং **(তিন)** মৌলিক বিধানের দ্বারা সার্বভৌমত্ব সীমিত। ব্লুণ্টসলি (Bluntschli) বলেন, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান নয়। এর অধিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং নিজের প্রকৃতি ও প্রজাদের দ্বারা সীমিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সার্বভৌমত্ব ধর্ম, ঈশ্বরের বিধান এবং নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা খর্বীকৃত। আবার অনেকের মতে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং সার্বভৌমত্বকে অবাধ, অসীম ও অলঙ্ঘনীয় ভাবা ঠিক নয়।

কিন্তু সমালোচনার আলোকে এই বিষয়টি দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, সার্বভৌম ক্ষমতা সীমিত হতে পারে না। সার্বভৌমত্ব চরম এবং চূড়ান্ত শক্তি। ডাঃ মজুমদার বলেছেন, "ব্রহ্মার উপর আর কোন বিধাতা নেই বলে যেমন তাকে অযোনিসম্ভব বলা হয় তেমনি সার্বভৌমত্ব স্বয়ম্ভূ।" তা মৌলিক, চরম ও সীমাহীন। **গার্নার** বলেন, ঈশ্বরের বিধান, মানবিকতার আদর্শ, যৌক্তিকতা, জনমতের মর্যাদা প্রভৃতি সার্বভৌমত্বের তথাকথিত বাধাগুলোর আইনগত কোন মূল্য নেই। রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছায় এসব মেনে নিয়ে তাদের সমর্থন করে। তাছাড়া, রাষ্ট্র সাধারণত ধর্ম ও নীতিকে মেনে চলে এবং অহেতুক উত্তেজনায় নীতি-ধর্ম উল্লঙ্ঘন করে না। আর রাষ্ট্র যখন স্বেচ্ছায় জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস মেনে নেয় তখন তাকে সার্বভৌম শক্তির স্বীকৃতিই বলা চলে। সুতরাং বর্তমান যুগের সর্বজনীন ধর্মভাব এবং আন্তর্জাতিক নীতিবোধ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না।

জনসাধারণের অধিকারের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হতে পারে না, কারণ ব্যক্তিগত অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। আইন ও শৃঙ্খলার অভাবে কোন অধিকার থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে জনসাধারণের অধিকারের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন কর্তৃক সীমিত হয় না। শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হবে, কোন্ যন্ত্র কোন্ ক্ষমতা ব্যবহার করবে, তা শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করে। কিন্তু তা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে না। কারণ, রাষ্ট্র ঐ সব বন্দোবস্ত নিজেই করে। রাষ্ট্রের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন শক্তি কোন শর্ত চাপিয়ে দেয় না। তাছাড়া, রাষ্ট্র তাদেরকে প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট প্রথা ও পথ অনুসরণ করে তা সংশোধন করতেও পারে।

আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌমত্বকে খর্ব করতে পারে না। যুদ্ধ ও শান্তির সময় কোন্ রাষ্ট্র কিরূপ আচরণ করবে, আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহ কিভাবে মিটাতে হবে এসব বিষয় আন্তর্জাতিক আইনে সন্নিবেশিত থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের মূলকথা হলো, ঐ সব আইনসমূহ রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় মেনে চলতে স্বীকৃত হয়েছে। তা অনেকটা ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি বিনিময়ের মত (Gentlemen's agreement)। ঐ সব আইনকে কোন রাষ্ট্রের দ্বারা জোর করে মানাবার মত ক্ষমতা অন্য কোন রাষ্ট্রের নেই। রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে কোন আন্তর্জাতিক আইন নাও মানতে পারে। কিন্তু কতকগুলো অসুবিধার জন্য রাষ্ট্রসমূহ স্বেচ্ছায় আইনসমূহ মানতে রাজি হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আইনত কোন বিধান বা নৈতিক অনুশাসন দ্বারা সীমিত নয়। তবে সাধারণত রাষ্ট্র স্বেচ্ছাকৃতভাবেই অনেকগুলো অনুশাসন এবং বিধান মেনে চলে।

সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয়
Location of Sovereignty

রাষ্ট্রের কোথায় সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। রাজতন্ত্রের শাসনযন্ত্রে সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ, কেননা সেখানে রাজাই সর্বশক্তিমান। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থায়, কোথায় সে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, তা বলা অত্যন্ত শক্ত। অস্টিন একবার বলেছেন, পার্লামেণ্টে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত, আর একবার বলেছেন, নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর তা ন্যস্ত। যে সব রাষ্ট্রে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেখানে সার্বভৌমত্ব পার্লামেণ্টে থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রেসিডেন্টের শাসন প্রচলিত, সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা কোথায় থাকে?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ ধরলে দেখতে পাই; যদিও প্রেসিডেণ্ট অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, তথাপি গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে হলে তাঁকে কংগ্রেসের সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করতে হয়। তাছাড়া, সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট রয়েছে, যা সবকিছু বিনাদ্বিধায় আইন বলে চালাতে রাজি নয়; কেননা আইনত সুপ্রীম কোর্টই শাসনতন্ত্রের অভিভাবক। সুতরাং কোথায় সার্বভৌমত্ব? সর্বোপরি আইন প্রণয়নের বিষয়াদিও কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে বিভক্ত। সুতরাং সুপ্রীম কোর্ট কি সর্বশক্তিমান? তাও নয়, কেননা সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধান মোতাবেক চলতে হয়। আবার অনেকের মতে, আমেরিকায় সংবিধানই সর্বশক্তিমান (supreme law of the land) এবং সার্বভৌম শক্তির আধার। কিন্তু তা তো শুধু একখানা দলিল এবং প্রয়োজন বোধে পরিবর্তনীয়ও বটে। কিন্তু যার পরিবর্তন হয়, তা তো সুনির্দিষ্ট নয়। তবে কি যাঁরা এর পরিবর্তন সাধন করেন, তাঁরাই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী? কিন্তু তা তো সুনির্দিষ্ট কোন শক্তি বা সমষ্টি দ্বারা হয় না। সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব করে কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রগুলোর আইন সভাসমূহ তা অনুমোদন করে । সুতরাং ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা এই সার্বভৌম শক্তি ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং কিভাবে নির্ণীত হবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কোথায়?

এ সব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উড্রো উইলসন বলেছেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা যে কর্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে সেই সার্বভৌম। এর অর্থ, সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হলো **প্রথমত,** যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশসমূহের আইনসভা। **দ্বিতীয়ত,** বিচারালয়, কারণ তাও আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আইন তৈয়ার করে। **তৃতীয়ত,** শাসন বিভাগের কর্ম-কর্তাগণ। **চতুর্থত,** সংবিধান পরিবর্তন

করার জন্য সভা। **পঞ্চমত,** গণউদ্যোগ ও গণভোট। কিন্তু এতগুলো সংস্থা ও ব্যক্তির পক্ষে এক মত হওয়া অসম্ভব এবং তাও সুনির্দিষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে উইলোবির বক্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেছেন, **'শাসক কর্তৃত্ব যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, শাসন সংক্রান্ত হোক বা আইন সংক্রান্ত হোক অথবা বিচার সংক্রান্ত হোক তার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়।** ("Whatever the government authority that is exercised, whether legislative, executive or judicial in character, sovereignty is manifested")। সত্যই তাই, কেননা সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের লক্ষণ, সরকারের বা শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যেন মনুষ্যদেহে প্রাণস্বরূপ। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ মানুষ। সুতরাং রাষ্ট্র থেকে যখন সার্বভৌমত্ব চলে যায়, তখন তা একটি পরাধীন দেশে পরিণত হয়। **কিন্তু প্রাণকে যেমন দেহের কোন অংশে খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং দেহের সর্ব অংশে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ বর্তমান থেকে দেহকে সচল, সজীব এবং চলমান রাখে, ঠিক তেমনি সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রদেহের সর্বাংশে বর্তমান থেকে তাকে প্রাণবন্ত রাখে।**

সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ
Pluralism

সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একত্ববাদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয়। গিয়ার্কে, মেটল্যাণ্ড, বার্কার, লাস্কি, ম্যাকাইভার প্রমুখ প্রখ্যাত লেখক সার্বভৌমত্বের একত্ববাদকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন।

বহুত্ববাদিগণ তিন দিক থেকে সার্বভৌমত্বের একত্ববাদকে আক্রমণ করেন। ক. একদল বলতে লাগলেন, রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাজের বহুবিধ সংঘের অন্যতম সংঘ মাত্র। সুতরাং অন্যান্য সংঘের স্বাতন্ত্র্য লোপ করে একমাত্র রাষ্ট্রকে সার্বভৌম করা অসঙ্গত এবং অন্যায়। খ. অন্যদল বললেন, আইনের উৎস রাষ্ট্র নয়। বরং রাষ্ট্র আইনের আওতার মধ্যে পড়ে। সুতরাং আইন যে সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশ মাত্র, তা সম্পূর্ণরূপে ভুল। গ. তৃতীয় দল বললেন, সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ রাষ্ট্র যদি স্বতন্ত্র হয় এবং বিশ্বজনীন সমাজব্যবস্থা যদি তার একত্বের ফলে ব্যাহত হয়, তা হলে মানবের জন্য তা অভিশাপ স্বরূপ হবে। সুতরাং তাদের মতানুসারে সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়, অবাস্তব, ভ্রান্ত এবং ভয়ঙ্কর। তাঁরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে একটি **'সম্মানীয় কুসংস্কার'** (venerable superstition) বলেছেন এবং আরও বলেছেন, এই কুসংস্কার সামাজিক জীবন থেকে যত শীঘ্র দূর হয়, ততই মঙ্গল। খ্যাতনামা রাষ্ট্র বিজ্ঞানী **বার্কার** (Ernest Barker) বলেন, "সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদ যতটা শুষ্ক ও অনর্থক, এমন আর অন্য কোন রাজনৈতিক ধারণা নয়" ("No political theory has become more arid and unfruitful than the doctrine of sovereign state")। হ্যারল্ড লাস্কি (Laski) বলেন, "সার্বভৌমত্বের সমগ্র ধারণাটিকে যদি পরিত্যাগ করা যায়, তা হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থায়ী উপকার হবে" ("It will be of lasting benefit to political science if the whole concept of sovereignty was surrendered")। অধ্যাপক লিণ্ডসে (Lindsay) বলেন, বাস্তব ঘটনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়েছে' ("If we look at the facts, it is clear that the theory of sovereign state has broken down")।

বহুত্ববাদের যুক্তি
Arguments

(এক) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মান আইনজ্ঞ গিয়ার্ক (Gierke) বলেন, সমাজের মধ্যে বহু সংঘ আছে এবং ক্রমাগত তা গঠিত হচ্ছে। মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রয়োজন মিটাতে এসব

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংঘ গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংঘ। **ফিগিস** (Figgis) ধর্ম সংক্রান্ত সংঘ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উক্তি করেন, একে কোনক্রমেই রাষ্ট্র থেকে উদ্ভূত বলা চলে না। এর নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র জীবন রয়েছে। তাই এর বিকাশের জন্য নিজস্ব পথ দরকার। মধ্যযুগে যে সব গিল্ড ছিল বা আধুনিক কালের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ বা সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ যে পরিবার, তার কোনটিই রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নি। রাষ্ট্র খুব জোর ঐ সব একান্ত প্রয়োজনীয় সংঘগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পারে, কিন্তু তাদের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। সর্বোপরি, রাষ্ট্র যদি ঐ সংঘগুলোর কাজে অহেতুক বাধা সৃষ্টি করে অথবা হস্তক্ষেপ করে, তা হলে সমাজজীবনের পূর্ণবিকাশ সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক সংঘের স্বাধীন কর্মক্ষেত্র এবং কর্ম পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। তাই বার্কার বলেন, "বর্তমানে আমরা ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের কথা লিখি না, বরং সংঘ বনাম রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করি" ("We no longer write man vs. state rather we write group vs. state")।

(দুই) মানুষ বিভিন্ন সংঘের সদস্যরূপে তার ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ভাবে বিকশিত করতে পারে। সুতরাং যে সংঘ বা প্রতিষ্ঠান সমাজের যতটুকু সেবা কার্য সাধন করে, তার ক্ষমতা ঠিক ততটুকু হওয়া উচিত। অতীতের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবির মত আজকাল সংঘ-স্বাতন্ত্র্যের দাবি ওঠা উচিত। মানবের সমগ্র জীবন রাষ্ট্রের আওতায় পড়ে না। ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি, আনন্দ এবং জীবনের আরও অন্যান্য দিকের বিকাশ ঘটে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সুতরাং, রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান মনে করা ভুল। রাষ্ট্র যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম, অন্যান্য সংঘ তেমনি নিজেদের কর্মক্ষেত্রে সার্বভৌম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(তিন) ফ্রান্সের দুগুই (Duguit) এবং হল্যাণ্ডের **ক্রাবে** (Krabbe) আরও এক ধাপ উপরে উঠে ঘোষণা করেছেন, রাষ্ট্রও এই আইনের অধীন। তাঁদের মতে, আইন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় নি। আইন সামাজিক জীবনের প্রয়োজনের প্রতিফলন মাত্র। তাই আইনের প্রামাণ্যতা নির্ভর করে তার দ্বারা সামাজিক সংহতির কতটা পরিপুষ্টি সাধিত হয় তার উপর, সার্বভৌমের আদেশের উপর নয়। লোক আইন মেনে চলে, কারণ আইন সামাজিক আচরণের অভিব্যক্তি, সার্বভৌমের আদেশ হিসেবে নয়। শুধু তাই নয়, আইনের উৎপত্তি হয়েছে রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে। রাষ্ট্রও আইনের অধীন। ক্রাবে (Krabbe) আরও বলেছেন, আইনই শাসনের আদিম এবং চরম উৎস। আইনের শাসন ছাড়া অন্যকিছুরই শাসন গ্রাহ্য নয়। সুতরাং রাষ্ট্রেরও আইনের শাসনের অধীনে থাকা প্রয়োজন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে, আইন সৃষ্টি করে না।

(চার) সর্বোপরি, বহুত্ববাদিগণ বলেছেন, সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করা বর্তমান কালে বিপজ্জনক। আজকের আন্তর্জাতিকতার যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অহঙ্কার অপেক্ষা সহযোগিতার মন্ত্র, বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবেদন এবং মানবতার স্বপ্নই অধিক কাম্য। সার্বভৌম রাষ্ট্রকে সেজন্য মানবের উচ্চতম আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়। শুধু তাই নয়, সার্বভৌম রাষ্ট্রকে যুদ্ধের মত বিভীষিকাময় ঘটনার জন্য দায়ীও করা হয়।

এই মতবাদের মূল্যায়ন
Evaluation of This Theory

(এক) বহুত্ববাদকে নতুনভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এটি অনস্বীকার্য যে, সবগুলো সংঘ মানুষের সাম্যজিক জীবনের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তদুপরি রাষ্ট্রীয় কর্মের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদের নিজ নিজ কার্য সমাধা করতে দেয়া না হয়, তা হলে মানবের সামাজিক জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে।

(দুই) বহুত্ববাদিগণের আলোচনা আর একটি বিষয় আমাদের নিকট তুলে ধরেছে। তা হলো, ক্ষমতায় শুধু রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্ম সম্প্রদায়, আর্থিক সংঘ, পরিবার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণ স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র প্রদান করা মঙ্গলজনক।

(তিন) বহুত্ববাদিগণ আন্তর্জাতিক জীবনের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছেন, তা সত্যই অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বহুত্ববাদের সমালোচনা

প্রথমত, বহুত্ববাদিগণ নৈরাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত করে, কেননা বহুত্ববাদের ধারণা সার্বভৌম শক্তিকে খণ্ড-ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদ সমাজে কোন চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োজন অস্বীকার করে সমাজ জীবনের মৌল প্রয়োজন অস্বীকার করে। সমাজের বিভিন্ন সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত কোন কর্তৃত্বের অস্বীকার এবং তা সমাজের মধ্যে বিদ্যমান সংঘগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং নির্দেশ দানের যে প্রয়োজনীয়তা তা অস্বীকারের নামান্তর।

তৃতীয়ত, বহুত্ববাদ আইনগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে না। সমাজের বিভিন্ন সংঘ স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করুক তা সংঘের নৈতিক অধিকার, আইনগত কোন অধিকার নয়। কিন্তু বহুত্ববাদিগণ এ দুই-এর মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দেশ করেন নি।

চতুর্থত, বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ সার্বভৌম ক্ষমতা যে একক, অবিভাজ্য, হস্তান্তরের অযোগ্য তা অস্বীকার করেছেন। ফলে রাষ্ট্রের মৌল শক্তি উৎসের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায়, সমাজের বিভিন্ন সংঘের সুষ্ঠু বিকাশ ও আন্তর্জাতিকতার সঠিক প্রকাশের জন্যও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অপরিহার্য।

সর্বশেষে, তবে এও সত্য যে, সংঘ বৃদ্ধির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় কর্মের সংকোচন হবে না বরং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে। বহুত্ববাদিগণ এখানেই ভুল করেছেন। তবে তাঁদের নীতিভিত্তিক আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধন করেছে নিঃসন্দেহে এবং চিন্তাবিদগণের চিন্তার দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে আশাপ্রদভাবে।

১। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। এর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Define sovereignty. Discuss its nature.) [C. U. '81]

২। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? তার বিবরণ দাও। (What are the characteristics of sovereignty? Describe them in brief.)

৩। সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা কর। (Survey the history of sovereignty.]

৪। সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ কাকে বলে? এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক কয়েকজন প্রতিনিধিত্বমূলক লেখকের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (What is the monistic theory of sovereignty? Discuss in this connection the contributions made by some representative thinkers of this theory.)

৫। সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব মতবাদে বোঁদার দান কতটুকু? হব্‌সের সাথে তাঁর মত পার্থক্য কোথায়? (Discuss the contributions of Bodin to the doctrine of sovereignty. Wherein does he differ from Hobbes?)

৬। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে রুশোর মতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (Give a brief narration of Rousseau's theory of sovereignty.) [D. U. 1984]

৭। সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ ও বহুত্ববাদের মধ্যে কী কী পার্থক্য তা ব্যাখ্যা কর। (Explain the differences between the monistic and pluralistic theories of sovereignty.)

৮। আইনগত সার্বভৌমত্ব নীতি সম্পর্কে বহুত্ববাদিগণের মতবাদ আলোচনা কর। (Discuss the theories of the pluralists towards the doctrine of legal sovereignty.) [D. U. 1980, 1999]

৯। অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss Austin's theory of sovereignty.) [N. U. '96, '98; R. U. '81]

১০। বহুত্ববাদিগণের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Examine Austin''s theory of sovereignty with special reference to its criticism by the pluralists.) [D. U. 1981]

১১। আধুনিক শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব কিভাবে প্রযোজ্য হবে, তা আলোচনা কর। (How can Austin's theory of sovereignty be applied to modern constitutional state?—Discuss.)

১২। টমাস হব্‌স কীভাবে সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন তার বিবরণ দাও। (Explain how Thomas Hobbes justified the absolute character of his sovereign.)

১৩। সার্বভৌমত্বের নীতি হলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাচারের অধিকার ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধ সম্পর্ক-এই সম্বন্ধে তুমি কী একমত? আলোচনা কর। ("The doctrine of sovereignty is an assertion of the right of arbitrary government inside the state and of the right of anarchy in international relations." Do you agree? Discuss.)

১৪। "অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব বিশৃঙ্খলার দাবির নামান্তর"—আলোচনা কর। ("Sovereignty in the internal sphere is nothing but the demand for anarchy"— Discuss.)

১৫। "রাষ্ট্রনৈতিক নীতিতে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কতটুকু তা বর্ণনা কর। (State the importance of the concept of sovereignty in political theory.)

১৬। আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌম, বাস্তব ও আইনগত সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Distinguish between legal and political sovereignty, Dejure and Defacto Sovereignty.)

১৭। জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (Make a brief discussion on popular sovereignty.)

১৮। সীমিত সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব বলতে কী বোঝ? এই সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও। (What do you mean by the principle of limited sovereignty? Give your opinion.)

১৯। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের কোথায় অবস্থিত থাকে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়? (Where does sovereignty lie in a state, specially in a federal state?)

২০। সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝ? (What do you understand by sovereignty?)

২১। সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদিগণের সমালোচনা সম্বন্ধে কী জান? এই প্রসঙ্গে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতামত আলোচনা কর। (What do you understand by pluralistic attacks on sovereignty? Discuss in this connection Austin's view on sovereignty.)

২২। সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ সম্পর্ক আলোচনা কর। একে একত্ববাদ বলা হয় কেন? (Discuss Austin's theory of sovereignty? Why is it characterised as monistic theory?)

২৩। কোন্ কোন্ ভিত্তিতে বহুত্ববাদীরা সার্বভৌমত্বের একত্ববাদের সমালোচনা করে থাকেন? (Discuss on what grounds the pluralists attack the monistic conception of sovereignty?)

২৪। সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর। বহুত্ববাদীদের মতবাদ থেকে অস্টিনের মতবাদ কীরূপ স্বতন্ত্র আলোচনা কর। (Discuss Austin's theory of sovereignty. How does Austin's view differ from those of the Pluralist?)

২৫। সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী মতবাদের পর্যালোচনা কর। (Examine critically the pluralistic theory of sovereignty.) [D. U. '84]

২৬। সার্বভৌমত্ব বলতে তুমি কী বোঝ? সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। (What do you understand by sovereignty? Discuss briefly various theories regarding the location of sovereignty.) [R. U. 1982]

২৭। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দাও। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের ধারণা আলোচনা কর। (Define Sovereignty. Discuss the views of the pluralistists on Sovereignty.) [N. U. 1995]

২৮। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের ধারণা আলোচনা কর। (What are the characteristics of sovereignty? Discuss the views of the pluralists on Sovereignty.) [N. U. 1997]

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
Definition and Nature of Law

আইন বলতে সাধারণত আমরা বুঝি কতকগুলো নিয়ম যা পালন করতে হয়। সমাজে বাস করতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক না চললে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কী খেলার মাঠে, কী ক্লাব ঘরে, কী সিনেমা হলে, স্কুলে বা কলেজে, মসজিদে, মন্দিরে, নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেই চলতে হয়। সাধারণভাবে এ গুলোই আইন। ইংরেজি Law শব্দটি এসেছে টিউটনিক মূল Lag থেকে। Lag-এর অর্থ যা কিছু স্থির, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং এ অর্থে আইন বলতে আমরা বুঝি ঐ সব নিয়মকানুন যা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী। আবার অনেক সময় কারণ ও করণের মধ্যে যে সম্বন্ধ (sequence between cause and effect) তাকেও আইন বলা হয়। এ অর্থে আমরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আইন বলতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিধানকে আইন বলা হয়, যেমন– সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। আবার মাঝে মাঝে মানুষের সামাজিক আচার-ব্যরহার ও আচরণের নির্দেশমূলক বিভিন্ন বিধি বা পদ্ধতিকেও আইন বলা হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের বিশেষ অর্থ রয়েছে। **মানুষের বাহ্যিক ব্যাপারে আচরণের নিয়মগুলো যা সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত হয়েছে তাকে আইন বলে।** এর সাথে নীতিবোধ বা সদাচারের কোন সম্পর্ক নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি এবং অনুমোদনই এ ক্ষেত্রে বড় কথা। এর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনজ্ঞগণ আইনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব্‌স আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন নিম্নরূপ ঃ "প্রজাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় নেতাদের আদেশই রাষ্ট্রীয় আইন" ("The civil law is the command of him, who is endowed with supreme power in the state concerning the future actions of his subject")। আইন সম্বন্ধে অস্টিনের অভিমত প্রায় অনুরূপ। তাঁর মতে, "সার্বভৌমের আদেশই আইন এবং সার্বভৌম যা অনুমোদন করেন তাও আদেশ করেন বলে ধরতে হবে" (The law is the command of the sovereign")। কিন্তু সার্বভৌম যা অনুমোদন করেন, তা না হয় আদেশই হলো, কিন্তু চিরাচরিত প্রথাকে তো আর সার্বভৌমের আদেশ বলা চলে না। অথচ প্রথার প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী যে সার্বভৌম তা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তাছাড়া, আইনকে আদেশ বললে তার পেছনে যে নৈতিক শক্তি রয়েছে তার স্বীকৃতি দেয়া হয় না। সুতরাং অস্টিনের সংজ্ঞার দোষ সংশোধন করে হল্যাণ্ড নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করেন ঃ 'বাহ্যিক' ব্যাপারে মানুষের কর্মের যে সাধারণ নিয়মগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা বলবৎ করা হয়েছে তাই আইন" ("A general rule of external human actions enforced by a sovereign political authority.")। কিন্তু আইনের এই সংজ্ঞায় শুধু বর্তমান সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়েছে। আইন যে রাষ্ট্রের ন্যায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল, তা অস্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া, আইন যে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলন, তারও কোন ইঙ্গিত দেয়া হয় নি। তাই উড্রো উইলসন সর্বদিকে লক্ষ্য রেখে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নিম্নরূপ ঃ **"সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ও অভ্যাসের যে অংশ**

সর্বজনীন নিয়মের আকারে সুস্পষ্টরূপে ও সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং যা সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করা হয় তাই আইন" (Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government.")।[১] এটি আইনের সুন্দর ব্যাখ্যা।

উল্লিখিত আইনের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি। **প্রথম,** আইন সামাজিক মানুষের জন্য। যদি কেউ সমাজের বাইরে বাস করে অথবা সমাজচ্যুত হয়ে নির্জনে বাস করার সংকল্প করে, তা হলে আইনের প্রয়োগ তার নিকট নিরর্থক। তাছাড়া, আইন মানবীয় সংস্থায় শুধু প্রযোজ্য। এমনকি পাগল বা শিশুরা পর্যন্ত আইনের আওতায় আসে না। **দ্বিতীয়,** আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য, চিন্তাধারা বা ধ্যান-ধারণার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। **তৃতীয়,** আইন সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা প্রযোজ্য। সরকারের ক্ষমতা কর্তৃক আইন বলবৎ রাখা হয়। **সর্বশেষ,** রাষ্ট্রীয় সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত জনসাধারণের অধিকারের রক্ষাকবচ হল আইন।

আইনের উৎস
Sources of Law

আইন শুধু সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ নয়। আইন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। তাই নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানিগণ অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে আইনের উৎস বের করেছেন। অধ্যাপক হল্যাণ্ডের মতে আইনের উৎস ছয়টি—**(১) চিরাচরিত প্রথা, (২) ধর্ম, (৩) বিচারকের সিদ্ধান্ত, (৪) আইনজ্ঞগণের ভাষ্য, (৫) ন্যায়নীতি, এবং (৬) আইন পরিষদ**। আইন যেন বিরাট এক স্রোতস্বিনী। বিভিন্ন ধারায় সমৃদ্ধ হয়ে এক বেগবতী নদীর ন্যায় সামাজিক জীবনের মূল্যবোধের সাথে মিলিত হয়েছে।

১। চিরাচরিত প্রথা (Customs)ঃ সব দেশের আইন ব্যবস্থার একটা বিরাট অংশ দখল করে রেখেছে চিরাচরিত প্রথা। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ আইন (Common Law) এবং হিন্দু ও মুসলমান আইন প্রথাভিত্তিক। প্রাচীন সমাজে প্রথা অনুসারেই মানুষের সাথে মানুষের এবং সংঘের সাথে সংঘের সম্বন্ধ স্থির করা হত। তাছাড়া সমাজের প্রতিপত্তিশালিগণের এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের আচার-ব্যবহার প্রথায় রূপ লাভ করে। সাধারণত ন্যায়পরায়ণতা এবং উপযোগিতার জন্য মানুষ ঐ গুলোকে যুগ যুগ ধরে মেনে এসেছে। রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যবস্থায় ঐ সব প্রাচীন প্রথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে।

২। ধর্ম (Religion)ঃ সামাজিক প্রথা ও আচার-ব্যবহার প্রাচীন কালে ধর্মের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। প্রায় সব সামাজিক আচরণের পশ্চাতে ছিল ধর্মের সমর্থন। প্রাচীন রোমের আইন-কানুন অনেকটা ধর্মীয় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানগণের ব্যক্তিগত আইন (Private Law) ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ইহুদীদের আইনকে প্রধানত ধর্মভিত্তিক বলা হয়।

---
১ Woodrow Wilson, *the State*, pp 69-70.

অতীতে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফলে প্রাকৃতিক ঘটনাবলিকে মানুষ দৈবিক ঘটনা বলে মনে করত। রাষ্ট্র পর্যন্ত তাদের নিকট ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে পরিচিত ছিল। রাজা বা দলপতি ছিলেন জনপদে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ফলে তাঁদের নির্দেশ ও আদেশ ঈশ্বরের আদেশ বলে পরিগণিত হত। ইসলামের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোরআন ও হাদীসে বহু নীতিবাক্য রয়েছে যা আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং যে কোন সমাজে ধর্মের অনুশাসন ও নির্দেশ আইন হিসেবে চলত। তা অতি সুন্দরভাবে পালিতও হত, কেননা সরকারি দণ্ড অপেক্ষা মানুষ পাপকে বেশি ভয় করত।

৩। বিচারকের রায় (Adjudication) : বিচারক বিচার করার সময় অনেক ক্ষেত্রে নতুন আইনের গোড়া পত্তন করেন। আইন অনুসারে বিচার করলেও তাঁদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। অতীতেও প্রথা অনুসারে কোন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত করার সময় বিচারকগণ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে প্রথার ব্যাখ্যা করে নিতেন। আবার বিভিন্ন সংঘের প্রথাগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তারা ঐ উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ঐ সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তীকালে অনুরূপ ঘটনাবলিতে প্রয়োগ করা হত। আজকালও আইনের ধারার মধ্যে যখন কোন মামলা নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভবপর হয় না, তখন বিচারকগণ প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন নীতি স্থাপন করেন। ঐ সব রায় ভবিষ্যতে আদালতে কার্যকরী করা হয়। এভাবে বিচারকগণ বিচার করতে করতে নতুন নতুন আইনের ধারা আইন বইতে সংযোজন করেন।

৪। আইনজ্ঞগণের ভাষ্য (Scientific Commentary) : বিখ্যাত আইনজ্ঞগণের আইন সংক্রান্ত ভাষ্য অনেক সময় আইন সৃষ্টি করে। ইসলামের শরীয়তী আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা প্রমুখ অনেক আইনবিদগণ ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। প্রাচীন রোমে প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞগণের মতামত বিচারালয়ে গৃহীত হত। আইনের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কোন জটিল শব্দের অর্থ কি হতে পারে এবং তার ফলাফল কী হয় এসব বিষয়ে তাঁরা সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ আইনবিদ কোক (Coke), ব্লাকস্টোন (Blackstone), আমেরিকার স্টোরী (Story) এবং কেন্ট (Kent) প্রমুখ বিচারকের ব্যাখ্যা বিচারকগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেন। তা অত্যন্ত প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে 'ফতওয়া-ই-আলমগিরি, এবং 'দায়ভাগ' (Dayabhaga) অত্যন্ত প্রামাণ্য নিয়মাবলি বলে সমাদৃত।

৫। ন্যায়নীতি (Equity) : সর্বদেশে এবং সর্বকালে ন্যায়নীতি (equity) আইনের বিরাট উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রাচীন রোমে প্রীটার (Praeter) ন্যায়নীতির উপর নির্ভর করে অনেক মামলার বিচার করতেন, কেননা সেখানে আইনের পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন ছিল। প্রাকৃতিক আইনকে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করা হত। ইংল্যাণ্ডেও এই নীতি গ্রহণ করে লর্ড চ্যান্সেলর ন্যায়বিচার করতেন। সাধারণত যেখানে আইনের বিধান অনুপস্থিত বা যেখানে তা অস্পষ্ট, সেখানেই ন্যায়নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপক **গিলক্রাইস্টের** (Gilchrist) মতে, 'ন্যায়নীতির অর্থ সাম্য এবং ন্যায়বিচার অথবা যেখানে আইনের বিধান ঠিকমত প্রযোজ্য হয় না, সেখানে সাধারণ বুদ্ধি বা ন্যায়বোধের উপর ভিত্তি করে বিচার করা' ['Equity is simply equality or justice or in cases where the existing law does not properly apply; judgement according to common sense and fairness']। তবে বিচারকের রায়ের সাথে এর পার্থক্য এই যে, বিচারকেরা কোন আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাকে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করেন, কিন্তু ন্যায়নীতির ভিত্তিতে যেখানে আইন তৈরি হয় সেখানে ঐরূপ আইনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই পদ্ধতিতে সামাজিক ন্যায়বোধ ও নীতিবোধের সাথে পরিবর্তিত অবস্থা ও ধারণার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

৬। আইন পরিষদ (Legislature) : বর্তমানকালে আইন পরিষদ আইনের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উৎস বলে পরিগণিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রথা, ধর্ম, বিচারকের রায়, ন্যায়নীতি প্রভৃতি উৎসই

অধিকাংশ আইন যোগাত। তখন সরকার শুধু শাসনতান্ত্রিক আইনসমূহ প্রণয়ন করত। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য আইন পরিষদ রয়েছে। আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইন প্রণয়নে হাত দেন। সুতরাং উক্ত ছয়টি উৎস প্রাচীনকাল থেকে আইন সরবরাহ করেছে। এ ছয়টি উৎসের আলোচনা করতে গিয়ে উড্রো উইলসন বলেছেন ঃ **প্রথা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ধর্ম প্রথার প্রায় সমসাময়িক এবং ধর্মই বহু আইনের উৎপাদক। প্রাচীন কাল থেকে বিচারকের সিদ্ধান্ত এবং ন্যায়নীতি হাত ধরাধরি করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় চেতনা উন্মেষের সাথে ভাষ্যকারদের অভিমত এবং আইন প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে।**

ঐ ছয়টি উৎস ব্যতীত আধুনিককালে আরো কয়েকটি উৎস থেকেও আইনের উদ্ভব ঘটে।

১। নির্বাহী ঘোষণা ঃ আধুনিককালে শাসন ব্যবস্থার জটিলতার জন্য আইন পরিষদ তার কর্তৃত্বের বেশ কিছু অংশ নির্বাহী বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছে। এই অর্পিত ক্ষমতা বলে নির্বাহী বিভাগ ঘোষণার মাধ্যমেও কিছু কিছু বিধিবিধান রচনা করে এবং তা আইন হিসেবেই চালু থাকে।

২। বৈদেশিক চুক্তি ঃ রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করলে চুক্তির শর্তাবলী আইনের মর্যাদা লাভ করে এবং সেই চুক্তি পরিবর্তন বা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তা আইন হিসেবে চালু থাকে।

৩। সংবিধান ঃ সংবিধান সকল আইনের উৎস। তাই সংবিধানকে বলা হয় "দেশের সর্বোচ্চ আইন" ("supreme law of the land")।

আইন এবং নৈতিকতা
Law and Morality

আইন এবং নৈতিকতার সম্বন্ধ নিবিড়। **প্রথমত,** উভয়ই উদ্দেশ্যের ঐক্য এবং লক্ষ্যের সমতার বন্ধনে আবদ্ধ। আইন সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সমাজ জীবনকে পূর্ণতার পথে নিয়ে চলে এবং সকলের অধিকার রক্ষার সুবন্দোবস্ত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। নৈতিকতা অনুরূপভাবে সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ সমাজজীবনে নীতিবোধের অনুপ্রেরণা দ্বারা জনগণকে আদর্শ জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে।

দ্বিতীয়ত, জন্মের দিক থেকে দেখলে উভয়কে যমজ ভ্রাতা-ভগিনির মত মনে হয়। কারণ, প্রথা ও ধর্মকে আশ্রয় করে এবং ন্যায়বোধের উপর ভিত্তি করে সামাজিক জীবনে নিয়মের অট্টালিকা নির্মাণ করেছে আইন। আইনের মূল কথা বহু পূর্বেই প্রচার করেছে ধর্ম এবং প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক হওয়ায় জনসমূহের আনুগত্য লাভে সমর্থ হয়েছে। নৈতিকতার জন্মস্থানও ধর্মভাব, প্রথা এবং সমাজে প্রচলিত নীতিবোধ বা ন্যায়পরায়ণতার মনোভাব।

তৃতীয়ত, আইন এবং নৈতিকতা উভয়েই সমাজের জীবনবোধ বা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মূল্যবান। উৎকর্ষতার মহান আদর্শ, পূর্ণতার অনুপ্রেরণা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উভয়কে সমাজ-জীবনে এত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। তাই দেখা যায়, একে অপরের পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। ভাল আইন মানুষের নৈতিকতাকে সঞ্জীবিত করে এবং নীতিবোধের সহযোগিতা না থাকলে কোন আইন সমাজে কার্যকরি হতে পারে না।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আইন নৈতিকতা থেকে ভিন্ন। বিষয়বস্তু, কার্যকারিতা এবং সুস্পষ্টতার ব্যাপারে উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, নৈতিকতার পরিধি অতি বিস্তৃত। নৈতিকতা প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সমগ্র জীবন ঘিরে কারবার করে। মানুষের চিন্তা, মতবাদ, উদ্দেশ্য এবং কর্ম নৈতিকতার আওতায় পড়ে, কিন্তু আইন শুধু মানুষের বাহ্যিক দিককে লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত এবং তাও তার সামাজিক কাজ-কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে। নীচতা,

অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নীতি বিগর্হিত, কিন্তু বে-আইনী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সবের জন্য শান্তি ভঙ্গ অথবা আইন ভঙ্গের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সুতরাং নৈতিকতার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আইন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ রাখা হয়। আইনের ভিত্তি সার্বভৌমের সমর্থন। সুতরাং আইন ভঙ্গকারী সমুচিত দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু নীতি জনগণের ন্যায়বোধ এবং বিবেকের সমর্থন লাভ করে। নীতিকে লংঘন করলে বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয় এবং সমাজে অনাদৃত হবার ভয় থাকে।

তৃতীয়ত, আইনের নির্দেশ যেমন সুস্পষ্ট, নীতির নির্দেশ ততটা পরিষ্কার নয়। আইনের সুস্পষ্টতার কারণ এই যে, আইন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তৈরী হয়েছে, কিন্তু নৈতিকতা সমাজ-জীবনের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে মানসিকতার ছাঁচে গড়ে উঠেছে। ফলে এক নৈতিক আদর্শের সাথে অন্য নৈতিক আদর্শের বিরোধ দেখা যায়। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নীতির ধারণা ভিন্ন রকমের হতে পারে। আইনও এক এক দেশে এক এক রকম। তবে আইনকে প্রয়োগ করার নির্দিষ্ট সংস্থা থাকার জন্য তা অনেক বেশি সুস্পষ্ট এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাছাড়া, আইন এবং নৈতিকতার ক্ষেত্র অনেক সময় পূর্ণরূপে ভিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক ব্যাপারে নীতিবোধ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে এবং আইন নীতির সাথে কোন সম্পর্ক না রেখেও কাজ করে চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লাইসেন্স না নিয়ে রেডিও চালানোর মধ্যে নীতি বিরুদ্ধ কিছু না থাকলেও তা বে-আইনী। রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলা বা বাম দিক দিয়ে চলার মধ্যে নীতির কিছুই নেই, কিন্তু এর ফলে অনেকে আইনের এক্তিয়ারে এসে পড়ে।

তবে উভয়ের মধ্যে মৌলিক তফাৎ এই যে, নীতি মনের ব্যাপার। নীতি বিবেকের বিচার, আন্তরিক বোধ এবং লৌকিকতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু আইন সার্বভৌম শক্তির ব্যাপার, সরকারের সমর্থনের সাথে জড়িত এবং সমাজের শাসনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

আইনের শ্রেণীবিভাগ

Classification of law

অধ্যাপক হল্যাণ্ড (Holland) আইনকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ ব্যক্তিগত আইন (private law) এবং সরকারি আইন (public Law)। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত আইনে উভয়পক্ষই সাধারণ ব্যক্তি, কিন্তু সরকারি আইনে অন্ততপক্ষে এক পক্ষ সরকার এবং অন্য পক্ষ সাধারণ ব্যক্তি।

তিনি সরকারি আইনকেও কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। **প্রথমত,** শাসনতান্ত্রিক আইন বা সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law), **দ্বিতীয়ত,** শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative Law), **তৃতীয়ত,** ফৌজদারী আইন (Criminal Law), **চতুর্থত,** ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত বিধি (Criminal Procedure), **পঞ্চমত,** রাষ্ট্র সংক্রান্ত আইন, যা রাষ্ট্রকে আধা—সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার করে (Law of the State in its quasi-private personality) এবং **ষষ্ঠত,** রাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত বিধি (Procedure of law of the State)। আবার উৎপত্তির কেন্দ্র থেকে বিচার করা হলে আইনকে নিম্নোক্ত ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। **প্রথমত,** শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law)। **দ্বিতীয়ত,** সাধারণভাবে প্রণীত আইন (Statute)। **তৃতীয়ত,** প্রথাভিত্তিক সাধারণ আইন (Common Law)। **চতুর্থত,** বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত আইন (Ordinance)। **পঞ্চমত,** শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative Law), এবং **ষষ্ঠত,** আন্তর্জাতিক আইন (International Law)।

অধ্যাপক ম্যাকআইভার আইনকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা, জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন। জাতীয় আইনকে তিনি আবার (১) সাংবিধানিক এবং (২) সাধারণ আইনে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে সাধারণ আইন (১) সরকারি ও (২) বেসরকারি এ দুভাগে বিভক্ত। সরকারি আইনকে পুনরায় তিনি (১) সাধারণ ও (২) প্রশাসনিক এ দুভাগে বিভক্ত করেন। নিচের রেখাচিত্রে তাই দেখানো হলো।
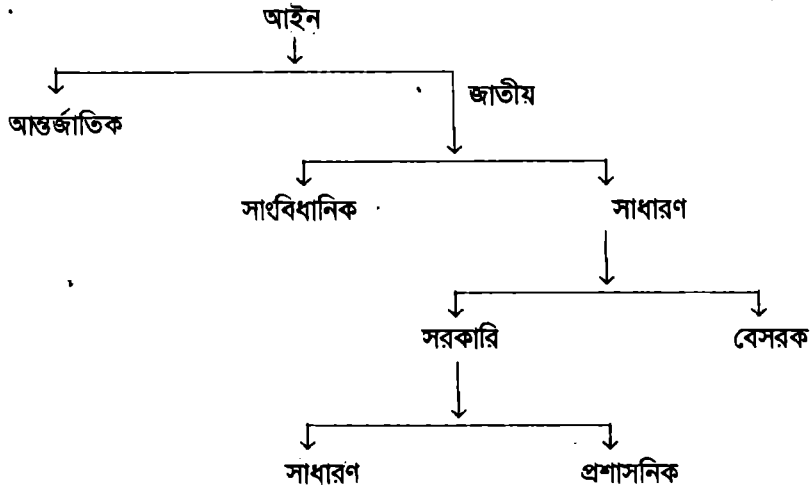
১। শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) ঃ শাসনতান্ত্রিক আইনকে মৌলিক আইনও বলা হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে, কোথায় অবস্থিত থাকে, দেশের শাসন প্রথা কিভাবে চলবে তা শাসনতান্ত্রিক আইন নিরূপণ করে। আইন পরিষদ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কিভাবে হবে তা ব্যক্ত করবে শাসনতান্ত্রিক আইন। সরকারের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক কী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সীমা কতদূর, সাধারণ আইন কিভাবে প্রণীত হয়, তা নির্ধারণ করে শাসনতান্ত্রিক আইন। শাসনতান্ত্রিক আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অত্যন্ত সাবধানতার সাথে জটিল প্রণালীতে সাধন করা হয়।

২। সাধারণভাবে প্রণীত আইন (Statute) ঃ এই আইন হল পরিষদ কর্তৃক সাধারণভাবে প্রণীত আইন। সাধারণভাবে দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আইন পরিষদ এসব আইন প্রণয়ন করে থাকে।

৩। সাধারণ আইন (Common Law) ঃ সাধারণ আইন প্রথাভিত্তিক সাধারণ নিয়মাবলি। এই আইন বিভিন্ন বিচারালয়ে স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। ন্যায়ানুগ মনোভাব এবং উপযোগিতা ভিত্তিক এই সাধারণ নিয়মাবলি সামাজিক জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান। ইংল্যাণ্ডে সাধারণ আইনসমূহ (Common Law) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত থেকে গৃহীত হয়েছে।

৪। বিভাগীয় কর্তাদের নির্দেশনামা (Ordinance) ঃ এই আইন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে নির্দেশ প্রদান করেন। তা আইনের মর্যাদা লাভ করেছে।

৫। শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative law) ঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুনসমূহ শাসন বিভাগীয় আইন। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবার সাথে সাথে এসব নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। আইন পরিষদের এমন সময় বা সামর্থ্য নেই যে, তারা

এ সব বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ করতে পারে। ফলে আইন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামোকে ঠিক রেখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ছোটখাট নিয়ম-কানুন তৈরী করেন।

৬। আন্তর্জাতিক আইন (International Law) ঃ এর বিস্তারিত বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে এই যথেষ্ট যে, আন্তর্জাতিক আইন এক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্র কিরূপ আচরণ করবে তা নির্ধারণ করে।

আইনের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন
Change and Development of Law

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সংবিধানের অনেক সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সাধারণত পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সূচিত হয়। পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদে আইনকে পরিবর্ধিত করতে হয়। তা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় ঃ

১। সংবিধান পরিবর্তনকারী সংস্থাগুলোর দ্বারা ঃ সাধারণত সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এটি সময় সাপেক্ষ এবং আইন প্রণয়নের সাধারণ পদ্ধতি অপেক্ষা জটিল। সরকারের কার্যক্রমের সৃষ্টি, এর ক্ষমতা ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ণয় এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে সংবিধানের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ পরিবর্তন সাধনের সাথে সাথে আইনও পরিবর্তিত হয়।

২। নির্বাচিত আইন পরিষদের দ্বারা ঃ গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে আইন পরিষদ গঠিত হয়। আইন পরিষদ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে মাঝে মাঝে সংখ্যাধিক্যের জোরে কিছু কিছু সাধারণ আইন (Statute) প্রণয়ন করে। আইন প্রণয়নের এই পদ্ধতিতে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষেরও কিছু কিছু অংশ থাকে বিশেষ করে নাকচ (Veto) করে দেবার অধিকারের মাধ্যমে।

৩। নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা ঃ নির্বাচকমণ্ডলী নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় না। কোন কোন দেশে তারা গণ উদ্যোগ (Initative) এবং গণভোটের (Referendum) মাধ্যমে আইন রচনায় অংশগ্রহণ করেন। আইন পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে অথবা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আইনের কোন খসড়া আইন পরিষদের নিকট পেশ করলে তারা নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করে।

৪। শাসন বিভাগ এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা ঃ শাসন বিভাগীয় নির্দেশের ফলে এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আদেশ বা সময়ে সময়ে নির্দেশের ফলে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বোর্ড বা কমিশনের ঘোষণার মাধ্যমেও আইন পরিবর্ধিত হয়।

৫। বিচারালয়ের দ্বারা ঃ সর্বদেশে এবং সর্বকালে বিচারকগণ রায় দানকালে নতুন নতুন আইনের ভিত্তি পত্তন করেন। যে বিষয়ে আইনের নির্দেশ অস্পষ্ট অথবা যে বিষয়ে আইনের বিধান অনুপস্থিত, সে সব ক্ষেত্রে বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে অথবা ন্যায়নীতির (equity) উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করেন এবং মামলার মীমাংসা করেন। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইনকে শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করে কিছু কিছু বিধি-নিষেধও বিচারকগণ আরোপ করেন।

৬। সন্ধি স্থাপন করার সংস্থাগুলো দ্বারা ঃ রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী আইন পরিষদ অথবা মন্ত্রিমণ্ডলীর সহযোগিতায় অন্য রাষ্ট্রের সাথে মাঝে মাঝে সন্ধি স্থাপন বা বিভিন্ন ব্যাপারে বিনা শর্তে অথবা শর্ত সাপেক্ষে চুক্তি করেন। আইন পরিষদ কর্তৃক তা গৃহীত হয়ে আইনের মর্যাদা লাভ করে।

আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ
Various Schools of Thought on Law

আইনের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং পরিধি সম্বন্ধে অনেক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন মতবাদে আইনকে সার্বভৌমের আদেশ ('law is the command of the sovereign') বলা হয়। কোন কোন মতবাদে বলা হয়, "রাষ্ট্রের জন্মেরও পূর্বে আইন সৃষ্টি হয়েছে" ("law is prior to state")। আবার কোন কোন মতবাদে আইনকে সমাজের 'সর্বজনীন অধ্যাত্ম সত্তা' ("law is a priori") বলেও স্বীকার করা হয়। সুতরাং আইনকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হলে বিভিন্ন মতবাদগুলোর সাথে পরিচিত হতে হবে।

১। বিশ্লেষণমূলক মতবাদ (Analytical School) : এ মতবাদে বর্তমান আইনগুলোকে তাদের প্রকাশভঙ্গি ও কার্যকারিতা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়। কীভাবে আইনগুলো সার্বভৌমের আদেশক্রমে সৃষ্টি হয়েছে এবং সার্বভৌমের সম্মতি, স্বীকৃতি ও অনুমোদনের ফলে কার্যকর হয়েছে তাই এ মতবাদের সমর্থকগণের বিচার্য বিষয়। বোঁদা (Bodin), হব্‌স (Hobbes), হল্যাণ্ড (Holland) এবং অস্টিন (Austin) প্রমুখ বিশ্লেষক এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের অভিমত এই যে, **আইন সার্বভৌমের আদেশ মাত্র।** আইন শাসক এবং শাসিতের সম্বন্ধ নির্ণয় করে মাত্র। এই আইনের ফলে সমাজের শুধুমাত্র দুটি শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। একটি শাসকগোষ্ঠী, যারা আদেশ করেন এবং অন্যটি শাসিত শ্রেণী, যারা সে আদেশ পালন করে। অধিকার বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সার্বভৌমের নিছক দান বা আজ্ঞা। এ মতবাদ অতি প্রাচীন। গ্রীসের সোফিস্ট (Sophists) নামক পণ্ডিতগণ বলতেন, শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যা দরকার, তাকে কেন্দ্র করে আইন প্রণয়ন করা হয়। শাসিতগণ কর্তব্য হিসেবে তা মানতে বাধ্য। আইনের মার্কসীয় ব্যাখ্যাও অনুরূপ। তবে বিশ্লেষণবাদিগণ আইনকে শ্রেণীর স্বার্থের বাহন হিসেবে দেখেন নি। তাঁরা দেখেছেন শুধুমাত্র শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে।

এ মতবাদে ব্যাখ্যাত আইনের অনেক ত্রুটি রয়েছে। আইন সামাজিক বিবর্তনের ফলে কালক্রমে কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। তবে এই সত্য তাঁরা খুব ভাল করে প্রকাশ করেন যে, আইনের কার্যকারিতার পশ্চাতে রয়েছে সার্বভৌমের ক্ষমতা।

২। ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical School) : ঐতিহাসিক মতবাদে আইনকে কোন সার্বভৌমের আদেশের সৃষ্টি বলে স্বীকার করা হয় না। এ মতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতরা বলেন, আইন চিরাচরিত প্রথা ও লোকাচার থেকে উদ্ভূত। আইন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করতে হলে ইতিহাসের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। জার্মান ব্যবহারশাস্ত্রবিদ **স্যাভিগ্‌নী** (Savigny) এ মতের সমর্থনে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ইংল্যাণ্ডের চিন্তাবিদ স্যার **হেনরী মেইন** (Sir Henry Maine) তা সমর্থন করে প্রাচীন সমাজের আইনের উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তির বিকাশের পূর্বে মানুষ প্রথাকে মানত। এ প্রথার উপরই সর্বপ্রথম সামাজিক জীবন বিকাশ লাভ করে। পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়, অধিকার ও কর্তব্য সম্পাদনের পদ্ধতি এবং সামাজিক জীবনের মূল্যবোধ ঐ সব প্রথা এবং লোকাচারের মাধ্যমে নিরূপিত হত। শাসক শ্রেণীর সাহস অথবা ঔদ্ধত্য ছিল না ঐ সব প্রথার কার্যকারিতা এবং মূল্যবোধ অস্বীকার করার। সুতরাং আইনকে আইন পরিষদের ধরাবাঁধা ছাঁচে ঢালাই করে চিন্তা করা অনৈতিহাসিক এবং ত্রুটিপূর্ণ। আইন রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে জন্মলাভ করেছে।

তবে এই মতবাদের বিপক্ষে এটুকু বলা যেতে পারে যে, অবিকশিত অথবা অর্ধবিকশিত সমাজে প্রথার প্রাধান্য থাকলেও বর্তমানকালের উন্নত সমাজে প্রথা প্রায় অচল। বর্তমানে জটিল অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক পরিবেশে প্রথা অনেকটা অসহায় এবং নিরর্থক। বর্তমানে জটিল অর্থনৈতিক

কাঠামো এবং রাজনৈতিক পরিবেশে রাষ্ট্র সমাজের প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে না এলে সমাজ চলার শক্তি হারাবে। তাছাড়া, আইনের পেছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সমর্থন না যোগালে আইন গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ সব ব্যাপারে ঐতিহাসিক মতবাদীরা নীরব।

৩। সমাজবিজ্ঞান মতবাদ (Sociological School) : এ মতবাদে বলা হয় যে, **'রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বে আইন সৃষ্টি হয়েছিল'** ('law is anterior to State')। বিবর্তনের ফলে সর্বজনীন কয়েকটি স্বার্থ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজ মন তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও উপযোগিতা স্বীকার করলে রাষ্ট্র তা মেনে নিয়ে সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে থাকে। রাষ্ট্র আইন সৃষ্টি করে না। ফ্রান্সের দুগুই (Duguit) এবং হল্যাণ্ডের ক্র্যাবে (Krabbe) প্রমুখ দিকপাল এ মতবাদের প্রবর্তক। তাঁদের মতে, আজকালও যে আইন প্রণীত হয়, আইন পরিষদে তার ব্যাখ্যা এভাবে করা উচিত। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ আইন পরিষদে উপস্থিত হয়ে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেন না। বরং সমাজের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানকল্পে যে সব নিয়ম-কানুন তাঁদের মনকে আন্দোলিত করে, আইন পরিষদে বসে সমষ্টিগত প্রজ্ঞার সাহায্যে সে গুলোকে আরও উন্নত করে পরিষদের কার্যধারায় তা লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং আইন সৃষ্টির সাথে রাষ্ট্রের কার্যের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই। এটা শুধু স্বীকৃত এবং অনুমোদনের সংস্থা।

লোকেরা আইন মেনে চলে কারণ তার পেছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির সমর্থন আছে বলে নয়, বরং তারা সে গুলোকে সমাজ-জীবনের জন্য পরম উপযোগী বলে মনে করে। সমাজ-জীবনে অনুপযোগী আইন সার্বভৌমের শক্তির দ্বারা সমাজে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। এ মতবাদের সমর্থকগণের বিশ্লেষণ সত্য সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজের প্রত্যেকটি বিষয়কে আলোচনা করেছেন এবং সমাজের ন্যায়বোধ সঞ্জীবিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

৪। দার্শনিক মতবাদ (Philosophical School) : এ মতবাদে 'আইনকে ন্যায়নীতি ও সমাজ-জীবনের পরম প্রজ্ঞা হিসেবে দেখা হয়' (' Law is a priori')। এ মতবাদ প্রত্যেক দার্শনিক কমবেশি স্বীকার করতেন। গ্রীক চিন্তানায়ক প্লেটো আইনকে সমাজের সর্বজনীন অধ্যাত্ম সত্তা বলে মনে করতেন। এরিস্টটলের মতে, প্রজ্ঞার বাহন আইনের দ্বারা মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে উন্নততর এবং মহত্তর জীবনের অধিকার লাভ করে। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant) বলতেন, আইন ব্যাষ্টিমনের বৈধানিক ইচ্ছার প্রকাশস্বরূপ। হেগেলের মতে, আইন সমাজের পরম প্রজ্ঞা ও সর্বোচ্চ নীতির প্রতিফলন। রাষ্ট্র তাঁর নিকট ছিল ঐশ্বরিক এবং চরম শক্তিমান। ঐশ্বরিক ভাববাদের জয়যাত্রা যে রাষ্ট্র, আইন তার অভ্রান্ত ইচ্ছা বা প্রকাশ।

জনসাধারণ আইন মানে কেন
Why Law is Obeyed

জনসাধারণ আইন মানে কেন? পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নে তর্কের ঝড় তুলেছেন। যুগে যুগে এ প্রশ্ন মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে। মানুষ আইন মানবে কেন?

ঐতিহাসিকমতবাদিগণ বলেন, প্রাচীনকালের প্রথা ছিল ধর্মভিত্তিক। তাই লোকেরা ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথা মেনে চলত, কারণ আইন না মানলে পাপ তাদের স্পর্শ করবে। এই ভয়ে আইন প্রতিপালিত হত। বিশ্লেষণবাদিগণ বলেন, লোকেরা আইন মানে কারণ শাস্তিকে তারা ভয় করে। তাঁরা মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। শাস্তির ভয়েই দুষ্ট লোক সংযত হয়ে চলাফেরা করে। হব্‌স, বেন্থাম এবং অস্টিন এ মত পোষণ করেন। আইন ভঙ্গ হলে সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি-বিধান করবে, এই ভয়ে মানুষ আইন মেনে চলে। কিন্তু তাই কী যথার্থ উত্তর? সমাজে কতজন দুষ্ট লোক আছে? সকলেই কী শাস্তি-বিধানের আশঙ্কায় আইন মেনে চলে?

আদর্শবাদিগণ বলেন, আইন সমাজের অধ্যাত্ম সত্তা ও চরম প্রজ্ঞার প্রকাশ। তাই মানুষ তার বুদ্ধি ও বিবেকের প্রেরণায় বুঝতে পারে, আইন মেনে চললে তারা মহত্তর এবং সুন্দরতম জীবনের অধিকারী হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীমতবাদে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা বলেন, মানুষ আইন মেনে চলে তার অভ্যন্তরীণ উপযোগিতা উপলব্ধি করে। আইন জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করে। আইন ব্যতীত সমাজ একটি বিরাট জঙ্গল স্বরূপ। সেখানে দুর্বল প্রবলের দ্বারা পীড়িত হয় এবং প্রবল নিজ বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে সুখ সম্ভোগ করে। অধিকার সংরক্ষিত না হলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হয় না এবং তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

চিন্তাবিদ লর্ড ব্রাইস বলেছেন যে, মানুষ আইন মেনে চলে পাঁচটি কারণে ঃ **(১) আলস্য, (২) অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, (৩) সহানুভূতি, (৪) শাস্তির ভয়ে, এবং (৫) বুদ্ধির বশে।** সমাজের সব লোক যেমন অপরাধ প্রবণ নয়, ঠিক তেমনি সব লোক আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। (এক) কিন্তু অধিকাংশ লোকই শান্তিতে জীবন-যাপন করতে চায়। আইন অমান্য না করে শান্তিতে থাকার জন্য আইনানুবর্তী হয়। (দুই) তাছাড়া, যুগ যুগ ধরে যে নীতিগুলো চলে আসছে, যে নিয়মগুলোতে পিতৃ-পিতামহদের জীবন আবদ্ধ ছিল, তা হঠাৎ ভঙ্গ করতে যাবে কে? (তিন) সর্বোপরি, আইনের উপযোগিতাও কম সাহায্য করে না আইনের প্রতি আনুগত্য আনতে। মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজে বাস করতে হলে কতকগুলো নিয়ম কানুন না মেনে বাস করা যে সম্ভবপর নয়, তাও তারা বোঝে। তাই শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে সমাজে চলার নিয়মপ্রণালীও মানুষ শিখে নেয়। (চার) সুনাগরিকতা আইন মানতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে নিশ্চয়। যে দেশে যত বেশি সুনাগরিক আছে, সে দেশে আইন তদনুপাতে প্রতিপালিত হয়। এসব বিষয় থেকে রাষ্ট্রনায়কগণও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে অধিক ব্যয় না করে জনসাধারণকে সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনেক সাফল্যজনক হবে।

আইন কি রাষ্ট্রের উর্ধ্বে
Is Law Above the State

রাষ্ট্র ও আইনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, রাষ্ট্রই আইনের পিতা। রাষ্ট্রই একমাত্র সংস্থা, যা সার্বভৌমত্বের আশীর্বাদ লাভ করেছে। সার্বভৌম ক্ষমতা যা বলবৎ করে তাই আইন। সুতরাং 'আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে নয়' ("law is not above the state")। কিন্তু ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী দুগুই (Duguit) বলেন, "আইন রাষ্ট্রের আদেশ নয় এবং কার্যকারিতার জন্য আইন রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়।"। তাঁর মতে, আইন "ব্যবহারিক জীবনের সে নিয়মাবলি যা মানুষ সামাজিক জীবনের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য স্বেচ্ছায় মেনে চলতে রাজি হয়েছে"। সুতরাং **'আইন রাষ্ট্রের গণ্ডীর বাইরে, রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক পরিধিবিশিষ্ট এবং রাষ্ট্রের উর্ধ্বে'** ("law is above the state")। আইনের আওতায় রাষ্ট্রও পড়ে। রাষ্ট্র আইন মেনে না চললে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভবপর। স্যার ফ্রেডারিক পোলক (Sir Frederick Pollock) এবং স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জোরেসোরে ঘোষণা করেছেন, আইনের জন্ম রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে হয়েছে। যখন রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হয় তখন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথাসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে মাত্র। রাষ্ট্র তা ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারে নি, বরং রাষ্ট্রই তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। নাগরিকগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাশীল। তারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বরং মুছে ফেলতে পারে, কিন্তু আইনের প্রতি আনুগত্য তাদের মজ্জাগত।

পোলক এবং হেনরী মেইনের সাথে সুর মিলিয়ে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **লাস্কিও** (Laski) বলেছেন, আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে। তিনি বলেন, "আইন শুধুমাত্র আদেশই নয়, তা আবেদনও বটে। আইন যে শাসন রচনা

করে, তার মধ্যে আমি আমার অভিজ্ঞতার সন্ধান পাই।" ("Law is not merely a command; it is also an appeal. It is a search for the embodiment of my experience in the rule it imposes.")। এ দিক দিয়ে রাষ্ট্র ঠিক ততটুকু আনুগত্য দাবি করতে পারে, যতটুকু ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ এতে প্রতিফলিত হয়। তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের কাজকর্মের দিকদর্শন রাষ্ট্রের আদেশ নয়" ("The guide to our conduct is not the voice of authority")। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের (Maciver) মতে, **"রাষ্ট্র আইনের পিতা এবং পুত্র"** ("The state is both the child and the parent of law")। তিনি সাধারণ আইনসমূহের পিতা হিসেবে রাষ্ট্রকে মনে করেন, কিন্তু মৌলিক শাসনতান্ত্রিক আইনসমূহের পুত্র হিসেবে রাষ্ট্রকে কল্পনা করেন।

বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে কার্যত রাষ্ট্রকে আইনের অধীনে মনে হয়। রাষ্ট্র আইনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, এমনকি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারে, কিন্তু আইন ব্যতীত একটি পদক্ষেপও অগ্রসর হতে পারে না। বে-আইনীভাবে সরকার কোন কিছু করলে তা গ্রাহ্য হয় না। সাধারণভাবে রাষ্ট্র আইনমাফিক কার্য করে থাকে। সুতরাং আইনের ভিত্তি যাই হোক, যেভাবেই আইন কার্যকর হোক, আইন ব্যতীত রাষ্ট্র বা সমাজ অচল, অসহায় এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক আইন
International Law

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জেরেমী বেন্থাম (Jeremy Bentham) 'আন্তর্জাতিক আইন' ('International Law') কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তার পূর্বে এটি জাতিসমূহের মধ্যে আইন (Law of Nations) বলে পরিচিত ছিল। এক রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কিরূপ আচরণ করবে, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিভাবে নির্ণীত হবে এবং কীভাবে একে অপরের সাথে শান্তিকালে অথবা যুদ্ধের সময় স্বার্থ রক্ষা করবে, আন্তর্জাতিক আইন তাই নির্ধারণ করে। বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ওপেনহাইম (Oppenheim) বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইন বলতে আমরা 'সে সব চিরাচরিত প্রথা ও সন্ধির শর্তাবলিকে বুঝি, যা রাষ্ট্রের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মে আইনত কার্যকর বলে বিবেচিত হয়" ("International Law is the name for the body of customary rules and treaties which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other")। বিশিষ্ট আইনবিদ স্যার সেসিল হার্স্ট (Sir Cecil Hurst) বলেন, "আন্তর্জাতিক আইন সেই নিয়মাবলির সমষ্টি যা এক রাষ্ট্রের নিকট থেকে অন্য রাষ্ট্রের অথবা তার অধিবাসিগণের অধিকার সংরক্ষণ করে" ("International Law is the aggregate of rules which determine the rights which a state is entitled to claim on behalf of itself or its nationals against another state")। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে এটি বলা যায় যে, **তা কতকগুলো নিয়মের সমষ্টি, যা যুদ্ধকালে অথবা শান্তির সময়ে রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে এবং এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রে কার্যান্তরে গেলে তার অধিকার রক্ষা প্রভৃতি বিষয় নির্ধারিত করে।** আন্তর্জাতিক আইন একদিনে বা এক যুগে গড়ে ওঠে নি। বহু দিনে ও বহু যুগে মনীষীদের বিচার-বিবেচনা ও বহু প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে তা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক আইন কোন উচ্চতর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্টি হয় নি অথবা কোন সার্বভৌম শক্তির সমর্থনক্রমে কার্যকর হয় নি। প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নৈতিকবোধ ও সুবিধা অনুযায়ী এ আইন মেনে চলে।

আন্তর্জাতিক আইনকে কী আইন বলা যায়
Is International Law Proper Law

আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যায় কী না, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। এই আইনের জন্মের পর থেকেই এ তর্ক আরম্ভ হয়েছে। যাঁরা বিশ্লেষণাত্মক মতবাদে বিশ্বাসী, তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক আইন নয়, কারণ এ আইন কোন আইন রচয়িতা সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত নয়। অস্টিন বলেন, একে খুব জোর "আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি" ("Positive international morality') বলা যেতে পারে। যেহেতু এর পেছনে কোন সার্বভৌম ক্ষমতার সমর্থন নেই এবং যেহেতু বিবদমান জাতিসমূহের উর্ধ্বে কোন শক্তি নেই যে এই আইনকে বলবৎ করে, সে জন্য এ আইনকে আইন বলা অসঙ্গত। অধ্যাপক হল্যাণ্ডও সে মত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "এই নিয়মাবলিকে স্বভাবত স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক কাজ-কর্মে মেনে চলে বলে নেহায়েত ভদ্রতার খাতিরে আইন বলা যায়" ("Such rules as are voluntarily though habitually observed by every state in its dealing with the rest can be called law only by courtesy")। লর্ড স্যালিসবারি (Lord Salisbury) বলেন, "একে আইন বলা বিভ্রান্তিকর"।

সাধারণত আন্তর্জাতিক আইনকে আইন হিসেবে বর্ণনা করতে তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। **প্রথমত,** এ আইনকে কোন সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে গ্রহণ করা হয় না। ফলে একে বলবৎ করার জন্য কোন শক্তি নেই। **দ্বিতীয়ত,** এ আইন প্রতিপালিত হওয়া অপেক্ষা ভঙ্গই হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কারণ রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের খেয়াল-খুশি মত পালন করে এবং ইচ্ছা হলেই ভঙ্গ করে। **তৃতীয়ত,** যদি সব রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক আইনকে বলবৎ করার জন্য কোন শক্তিকে সৃষ্টি করা হয়, তা হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যাবে এবং এক বিশ্বরাষ্ট্র সৃষ্টি হবে। তখন আন্তর্জাতিক আইন সে বিশ্বরাষ্ট্রের পৌর আইনে (Municipal Law) পরিণত হবে। এখন দেখা যাক-আন্তর্জাতিক আইন আইন কি না।

১। এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, যদি আইন ভঙ্গ হলে আইনের আইনত্ব নষ্ট হয়, তা হলে পৌর আইনকে আইন বলতেও অনেক বাধা আছে। কারণ, এমন কোন আইন নেই, যা কোন দিন লঙ্ঘন করা হয় নি। আর আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হলে কোনরূপ শাস্তি দেয়া হয় না তাও ঠিক নয়। আমরা দেখেছি অতীতে লীগ অব নেশন্‌স (League of Nations) আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের বন্দোবস্ত করেছিল। বর্তমানের জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সেনাদল গঠন করে অপরাধী রাষ্ট্রকে শাস্তি দেবার বন্দোবস্ত করছে। এর প্রয়োগ আমরা দেখেছি কোরিয়াতে। কংগো রাজ্যেও তা দেখা গিয়েছিল। সম্প্রতি কসোভোতে এর প্রয়োগ ঘটেছে। তবে এখনও ঐ সব বন্দোবস্ত তেমন সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে নি, কিন্তু বিশ্বমৈত্রী দৃঢ়তর হবার সাথে সাথে এই আন্তর্জাতিক আইন অধিকতর প্রতিপালিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

২। আন্তর্জাতিক আইনের পেছনে কোন শক্তি নেই, এই যুক্তি অনেকটা অবাস্তব। শক্তি দিয়ে আইনকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়। আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কথা মনে রেখে এবং সমাজজীবনের প্রয়োজনের প্রকাশ রূপে গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক আইনকে ব্যাখ্যা করতে হবে। সর্বজনীন ইচ্ছা থেকে যেমন পৌর আইনের উৎপত্তি, তেমনি রাষ্ট্রসমূহের সর্বজনীন ইচ্ছা থেকে আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হয়েছে। জনমত যেমন পৌর আইনের ভিত্তিস্বরূপ, বিশ্বজনমত তেমনি আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিমূল দৃঢ় করছে। বিশ্বজনমতের সমর্থনের উপরই তা অনেকটা নির্ভরশীল।

৩। অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট (Gilchrist) বলেছেন যে, **প্রথমত,** আন্তর্জাতিক আইন সত্যই আইন। কারণ, আন্তর্জাতিক আইনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ ঠিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা হয়।

দ্বিতীয়ত, এর পেছনেও শক্তির সমর্থন রয়েছে। তবে এই শক্তি সাধারণত মানবিক ও নৈতিক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সংস্থার বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান-আন্তর্জাতিক আদালত-আন্তর্জাতিক আইনকে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহে প্রয়োগ করছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের অত্যন্ত জটিল সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে। সুতরাং একে আইন বলতে কোন বাধা নেই। তবে ব্রাউনের কথায় আমরা বলতে পারি, আন্তর্জাতিক আইন এখনও গঠনমূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং আইনের পর্যায়ে আসার জন্য সংগ্রাম করছে। আন্তর্জাতিক নৈতিকতার স্তর অতিক্রম করে তা আইনের পর্যায়ভুক্ত হতে চলেছে" ("International law is the law in the making, law struggling for existence. It is struggling to make itself good in contradistinction from international morality")।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস
Sources of International Law

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সম্বন্ধে গেটেল (Gettell) বলেছেন, এ আইনের উৎস প্রধানত তিনটি— **(১) চিরাচরিত প্রথা** (Custom), (২) **যুক্তি** (Reason), (৩) **সম্মতি** (Consent)।

১। পৌর আইনের উৎস হিসেবে চিরাচরিত প্রথা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে, এ ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা তেমনি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের পারস্পরিক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে কতকগুলো প্রথা বা আচার মেনে চলে। কোন রাষ্ট্র যদি কোন ব্যাপারে বিশেষ এক আদর্শ স্থাপন করে তা হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ তা অনুসরণ করে বিশেষ প্রথার সৃষ্টি করে। এ সব প্রথা বা আচার-পদ্ধতি কালক্রমে আন্তর্জাতিক আইনরূপে স্বীকৃত হয়। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ আইন (Common Law) যেমন প্রথাভিত্তিক, তেমনি আন্তর্জাতিক আইন যুগে যুগে স্বীকৃত নিয়মাবলি ও আচার-পদ্ধতিসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ।

২। যুক্তি বা বিচার-বিবেচনাও আন্তর্জাতিক আইন গঠনে প্রভূত সাহায্য করে। সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক আইনের বিধানকে মূলধন করে রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করত। প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিও বিচার-বিবেচনা বা বিবেক প্রসূত সহানুভূতি। বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে প্রচলিত পদ্ধতিসমূহকে ভিত্তি করে এবং বিচার-বিবেচনার ফলে নতুন নতুন নিয়মাবলি রচনা করে রাষ্ট্রসমূহ তাদের আন্তর্জাতিক কর্মপথে নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে।

৩। সম্মতিই এ আইনের প্রাণস্বরূপ। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি অতিক্রম করে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে যখন সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন স্বেচ্ছায় শর্তাবলি পালন করে অন্য রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ স্থাপনের দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন নিয়মাবলির সৃষ্টি করে। তাছাড়া, সম্মতির উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক আইন আইনের মর্যাদা পেতে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন প্রামাণ্য অভিব্যক্তিও উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ উল্লেখ করতে হয়, যা প্রচলিত নিয়মাবলিকে একত্রিত করে আইনের রূপ দান করে অথবা নতুন নতুন আন্তর্জাতিক আচরণ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং মধ্যস্থগণের বিচার মীমাংসা প্রণিধানযোগ্য।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আদালতের কর্মপদ্ধতি, বিশেষ করে হেগ আদালতে বিচারের রায়সমূহ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবনযোগ্য।

চতুর্থত', রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক দফতরের আলোচনা, চিঠি-পত্র ও রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন দূতাবাসে প্রেরিত আদেশ-উপদেশমালা লক্ষণীয়।

পঞ্চমত, রোমান আইনের পর্যালোচনা, বিশেষ করে বিদেশীদের জন্য প্রণীত নিয়মাবলি অত্যন্ত মূল্যবান।

সর্বশেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-গ্রোসিয়াস, ভ্যাটাল প্রমুখ প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ এবং হল, লরেন্স ও ওপেনহাইম প্রমুখ আধুনিক মনীষীবৃন্দের রচনা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সবের মধ্যেই রয়েছে আন্তর্জাতিক আইনের মূল এবং সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

এর ইতিহাস ঃ প্রাচীন গ্রীক ও রোমে আন্তর্জাতিক আইনের সম্ভাবনা প্রথম পরিস্ফুট হয়। গ্রীসের এমফিক্টাইওনিক কাউন্সিল (Amphictyonic Council) নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তি রক্ষার প্রথম প্রয়াস পায়। ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম আন্তর্জতিক সংস্থা। রোমেও বিভিন্ন জাতির সাথে আচরণের নীতি নিয়ে 'আয়াস ফেসাইল' (Ius Facile) নামক এক প্রকার আইনের উদ্ভব হয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইনের এটাই প্রথম পদক্ষেপ। ইসলাম তার বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ স্থাপন করে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের মহান অনুপ্রেরণায় (Pan-Islamic ideals) বিশ্বজনের মনে এরূপ কানুন এবং সংস্থার প্রতি গভীর অনুরণন জাগিয়েছিল। এমনকি মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তার যুগেও 'আয়াস জেনসিয়াম' (Ius Gentium) নামক বিবেকভিত্তিক এক আইনের চেতনা সকলকে উৎসাহিত করেছিল। এরূপ আইনের জন্য। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি মন্ত্রী সালিও (Sully) এরূপ এক মহা-পরিকল্পনার সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের বিজ্ঞানসম্মতভাবে গোড়াপত্তন হয় সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক হল্যাণ্ডের হৃদয়বান পণ্ডিত হুগো গ্রোসিয়াসের হাতে। তিনি "ত্রিশ বর্ষ ব্যাপী" যুদ্ধের বিষময় ফল দেখে যুদ্ধের প্রলয়ঙ্করী রূপকে দূর করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে তাঁর অমর গ্রন্থ-**যুদ্ধ ও শান্তির আইন** *(Laws of War and Peace)* রচনা করেন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এবং সমান মর্যাদার উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান দান করেন। তাই তাঁকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু
Contents of International Law

আন্তর্জাতিক আইনের বিশিষ্ট লেখকগণ এখনও একমত নন, কোন্ কোন্ বিষয়সমূহ এ আইনের আওতায় আসতে পারে। তবে এর কার্যক্রম লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ এর আওতায় পড়ে ঃ **(১) আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ, (২) এর প্রয়োগ ক্ষেত্র, (৩) রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ, (৪) আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা, (৫) যুদ্ধকালে রাষ্ট্রসমূহের কর্তব্য এবং (৬) নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের কর্তব্য।**

১। আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্র ঃ আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত রাষ্ট্র সদস্যবৃন্দের নির্বাচন এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। সদস্য রাষ্ট্রের কি কি গুণ থাকলে তারা আন্তর্জাতিক সংস্থার সভ্য হতে পারে, আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হলে তারা কোন্ কোন্ সুযোগ ও সুবিধার অধিকারী হবে, তাদের কি কি কর্তব্য সমাধা করতে হবে, তা নির্ধারিত হয় এ আইনের বলে। কোন্ অপরাধে অপরাধী হলে তাদের বহিষ্কৃত করা হয় তাও নির্দিষ্ট হয় এ আইনের দ্বারা।

২। এর আওতা ঃ আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত হবে, কিভাবে ভূ-খণ্ডের অধিকার আসে অথবা লোপ পায়, রাষ্ট্রের অধিকারে আকাশ সীমার পরিধি কত, সমুদ্রোপকূলে রাষ্ট্রের অধিকার কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে প্রভৃতি বিষয়সমূহ।

তাছাড়া এক রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকগণের অধিকার সংরক্ষণ, যাতায়াতের নিয়মাবলি, অপরাধিগণকে বহিষ্কারকরণের পদ্ধতি, নাগরিকত্ব প্রদানের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়।

৩। রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ এ আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের দূত বিনিময়, কূটনৈতিক সম্বন্ধ, কূটনৈতিক কর্মচারিগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং অধিকার স্থিরীকরণ, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পদ্ধতি নির্বাচন এবং মৈত্রী স্থাপনের নিয়মাবলি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।

৪। শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ঃ এ আইনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বিবাদগুলো মীমাংসার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি এবং তা ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ অবস্থায় তা নির্ণীত হয় আন্তর্জাতিক আইনের বিধানে।

৫। যুদ্ধকালীন অবস্থার পর্যবেক্ষণ ঃ যুদ্ধ আরম্ভ হলে যুদ্ধরত দেশগুলোর কর্তব্য, জল, স্থল ও আকাশ পথে যুদ্ধের পদ্ধতি, কিভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি আনয়ন করা যায় প্রভৃতি বিষয়গুলো নির্ধারিত হয় এই আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা।

৬। নিরপেক্ষতার নিয়ম ঃ যুদ্ধকালে যে জাতি যুদ্ধে রত নয় তার কী দায়িত্ব, যুদ্ধমান জাতিগুলোর সাথে নিরপেক্ষ জাতি কিরূপ ব্যবহার করবে, যুদ্ধের সময় কিরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করা কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন নির্দেশ দেয়।

১। আইন বলতে কী বুঝ? এর উৎসসমূহ কী? আইন ও নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা কর। (What do you mean by law? What are its sources? Discuss the relation between law and morality.) [C. U. 1981; D. U. 1980, 2007]

২। পৌর আইন থেকে সামাজিক ও নৈতিক আইনের প্রভেদ নির্দেশ কর। (Differentiate positive law from social and moral law.)

৩। (ক) সার্বভৌমের ঘোষণাই আইন। (খ) আইনের ভিত্তি নৈতিকতা-এ দুটির মধ্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য? আলোচনা কর। [(a) Law is whatever the sovereign will dictate. (b) Law must have a moral foundation—which of these two is acceptable? Discuss.]

৪। (ক) আইন রাষ্ট্রের সৃষ্টির পূর্বে জন্মলাভ করেছে এবং আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে, (খ) আইন রাষ্ট্রের আদেশ। আইনের প্রকৃতি হিসেবে তুমি কোন্টিকে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা কর? [(a) Law is anterior to and above the state? (b) Law is the command of the state. Which of these would you accept as a proper explanation of the nature of law?]

৫। আন্তর্জাতিক আইন কী? তা কী সত্যই আইন? (What is international law? Is it law proper?)

৬। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস কী কী? (What are the sources of international law?)

৭। জনসাধারণ আইন মান্য করে চলে কেন? আলোচনা কর। (Why do the general people obey law? Discuss.)

৮। কিভাবে আইনের পরিবর্ধন সংঘটিত হয়? এর বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (How does law develop itself? Discuss its different forms.)

৯। আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ কী কী? পৌর আইন থেকে এ আইনের তফাত কী কী? (What are the sources of international law? In what respect is it different from the Municipal Law?)

১০। আইনের সংজ্ঞা দান কর এবং তার উৎসগুলোর বিবরণ দাও। (Define law and describe its sources.)

১১। পৌর আইন বলতে কী বোঝ? কীভাবে এ আইন তৈরি হয়? (What do you understand by Municipal law? How are these made?)

১২। আন্তর্জাতিক আইন ও পৌর আইনের মধ্যে তফাত কী? আন্তর্জাতিক আইন কী সত্যই আইন? (What is the distinction between Municipal law and International law? Is International Law law proper?)

১৩। আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইনের উৎসগুলো কী কী? (Define law. What are the sources of law?) [R. U. 1980; N. U. 1995; 1998, 2003]

১৪। আইন ও স্বাধীনতার সংজ্ঞা দাও। তুমি কী মনে কর আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত? [Define the law and liberty. Do you think law is the pre-condition of liberty?] [N. B. 1997]

রাষ্ট্র, জাতি এবং জাতীয়তাবাদ

STATE, NATION AND NATIONALISM

জাতি এবং জাতীয়তা
Nation and Nationality

একই ল্যাটিন শব্দ *Natio* এবং *Natus* থেকে nation এবং nationality শব্দগুলো উদ্ভূত হয়েছে। তথাপি শব্দ দুটি সমার্থক নয়। তাদের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনা নিচে প্রদত্ত হলো। এ আলোচনায় nation-কে আমরা জাতি এবং nationality-কে জাতীয়তা নামে আখ্যায়িত করব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ জাতীয়তাকে (nationality) একটি অধ্যাত্ম চেতনা মনে করেন। এক জনসমষ্টি যখন একই ভূ-খণ্ডে বাস করে এবং একই ভাষা, একই ধর্ম, একই ঐতিহ্য, একই প্রথা, আচার-ব্যবহারের বন্ধনে আবদ্ধ, একই কুল থেকে উদ্ভূত, সর্বজনীন স্বার্থ ও রাজনৈতিক ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন তাদের একই জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী বলা হয়। এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে জিম্মার্ন (Zimmern) বলেন, 'কোন নির্দিষ্ট আবাসভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট, সংঘবদ্ধভাবে বিশেষ অন্তরঙ্গ, গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাযুক্ত অনুভূতির প্রকাশই জাতীয়তাবাদ" ("Nationality is a form of corporate sentiment of peculiar intensity, intimacy and dignity related to a definite home country")। ম্যাকাইভার এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট, অধ্যাত্ম চেতনা সমর্থিত, একত্রে বাস করার সঙ্কল্প সংবলিত সম্প্রদায়গত মনোভাব, যারা উদ্বুদ্ধ নিজেদের সাধারণ সরকার স্থাপন করতে কৃতসংকল্প" ("A type of community sentiment, a sense of belonging together, created by historical circumstances and supported by common spiritual possessions of such an extent and so strong a group that those who feel it desire to have a common government particularly or exclusively of their own.")।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হায়েস (Hayes) জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, "জাতীয়তাবাদ হলো জাতীয়তা এবং দেশপ্রেমের মত পুরোনো দুই প্রত্যয়ের আধুনিক কালের আবেগপ্রবণ সংমিশ্রণে উচ্ছ্বসিত মানসিকতার অতিরঞ্জন" ("Nationalism consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very old phenomena-nationality and patriotism.")।[১] হ্যান্স কনের (Hans Kohn) মতে, "জাতীয়তাবাদ হলো প্রথম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এক মানসিক অবস্থা, এক সচেতনতা" ("Nationalism is first and foremost a state of mind, an act of consciousness.")।[২]

---

১. J. H. Hayes, *Essays on Nationalism*, p 6
২. Hans Kohn, *The Idea of Nationalism*, p10

এ প্রসঙ্গে মিলের (Mill) সংজ্ঞাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, "জনসমষ্টির একাংশে জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠে, যখন তারা অন্য মানব গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে সাধারণ সহানুভূতি ও সহজাত সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং নিজেদের দ্বারা পরিচালিত এক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে।" ("A portion of mankind may be said to constitute a nationality if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and any other, which make them cooperate with each other more willingly than with other people, desire to be under the same government and that it should be governed by themselves or a portion of themselves exclusively.")।

জাতীয়তার বা জাতীয়তাবাদের উপাদান
Elements of Nationality

যে কোন সমাজে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে দ্বিবিধ উপাদান সহযোগে-ভাবগত উপাদান ও বাহ্যিক উপাদান। ভাবগত উপাদান বলতে বুঝায় সমষ্টিগত পর্যায়ে অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণের ঐক্যবোধ এবং অভিন্ন রাজনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। বাহ্যিক উপাদান হলো পরিবেশের ঐক্য ও সমতা। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে জাতীয়তাবোধে ভাবগত উপাদানের প্রভাব বেশি। ভাবগত ও বাহ্যিক উপাদানগুলোকে সাত ভাগে বিভক্ত করা চলে।

যথা—**(১) নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস, (২) কুলগত ঐক্য, (৩) ভাষাগত একতা, (৪) ধর্মের একতা, (৫) অর্থনৈতিক ঐক্য, (৬) এক শাসন ব্যবস্থা, এবং (৭) ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য।**

১। নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস ঃ নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড জাতীয়তা গঠনের পক্ষে উপযোগী বটে, তবে বিভিন্ন দেশে বাস করেও লোকেরা একই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। জেরুজালেমে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই ইহুদিগণ বিভিন্ন দেশে বাস করেও মানসিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

২। কুলগত ঐক্য (Racial Unity) ঃ কুলগত ঐক্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। রক্তের সম্বন্ধ মানুষকে কাছে টানে, দূরকে নিকট করে এবং এক প্রকার মানসিক ঐক্য সৃষ্টি করে, যার আকর্ষণ দুর্নিবার। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্ববিদগণের গবেষণার ফলে তা কাল্পনিক সম্বন্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যেই রক্তের বিশুদ্ধতা নেই। আর কুলগত ঐক্য থাকলেই যে জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা হবে তাও সঠিক নয়। এও দেখা গিয়েছে যে, জার্মান, ডাচ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি একই কুল থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে এক জাতীয়তার বন্ধন নেই। আবার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহু কুলের লোকেরা বাস করেও এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ।

৩। ভাষাগত একতা (Unity of Language) ঃ ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রধান সেতুবন্ধন ভাষাগত একতা। ভাষাগত ঐক্যের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং অন্তরের দেয়া-নেয়া দ্বারা সত্যিকারের ঐক্য সম্ভবপর হয়। কিন্তু তথাপি তা যে একেবারে অপরিহার্য তা নয়। সুইস জনসাধারণ তিনটি ভাষায় কথা বলেও জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ। বেলজিয়ানগণ দুই ভাষায় কথা বললেও এক জাতি। আবার ইংরেজ ও আমেরিকান জনগণ এক ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেও বিভিন্ন জাতি।

৪। ধর্মের একতা (Religious Unity) ঃ ধর্মের ঐক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির এক মহান সূত্র। এর ভিত্তিতে এশিয়া ও ইউরোপে অনেক জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তবে ধর্মের ঐক্য যে একান্ত প্রয়োজনীয় তা সঠিক নয়। বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যেও জাতীয়তার বন্ধন দেখা যায়। ধর্মের একতার ভিত্তিতে পাকিস্তানের এবং ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রাইলের জন্ম হয়।

৫। অর্থনৈতিক ঐক্য (Economic Unity) ঃ অর্থনৈতিক অবস্থার সমতাও জনসাধারণকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। সকলের বৈষয়িক স্বার্থ এক হলে তারা নিজেদেরকে এক ভাবতে শেখে।

৬। এক সংবিধান (One Constitution) ঃ এক শাসনব্যবস্থার অধীনে থাকলে বা একই শক্তির অধীনে থাকলেও তারা মনে করে, একবার স্বাধীন হলে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। ফলে তাদের মনে ঐক্যভাব বৃদ্ধি পায়।

৭। ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য (Spiritual Unity) ঃ জনগণের মধ্যে এক ঐতিহ্যবোধ থাকলে অতীতের গৌরব বা যৌথ কর্মের প্রেরণা তাদের মহামিলনের সূত্রে গ্রথিত করে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, **জাতীয়তার মূল উপাদান সংহতি বোধ এবং মিলনের অসীম আনন্দ।** ফরাসি পণ্ডিত **রেনানের** (Renan) মতে, **জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক সত্তা, এক প্রকার সজীব মানসিকতা।** ভূ-খণ্ডের চার সীমা, কুল, ধর্ম, ভাষা, এমনকি ইতিহাস বা ঐতিহ্যের মধ্যেও এর সূত্র খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তবে তাদের প্রত্যেকটি উপাদান পরোক্ষভাবে মনকে মিলনের জন্য প্রস্তুত রেখে জাতীয়তাবোধ গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু সংহতি বোধ এর প্রাণস্বরূপ। কতকগুলো লোক এক জাতীয়তার সৃষ্টি করে কারণ তারা সুখ-দুঃখে একে অপরকে সাহায্য করে সহজাত সহানুভূতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বাস করতে রাজি হয়েছে। অধ্যাপক লাস্কির (Laski) কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'জাতীয়তার ভাব সাধারণভাবে মানসিকতার ব্যাপার, ('Broadly speaking, the idea of nationality is essentially spiritual in character')। এইভাব মানব মনের দু ধারায় পরিপুষ্ট-একটি প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ এবং অন্যটি পরস্পরের একত্রে বাস করার সম্মতি।

বাংলাদেশেও জাতীয়তাবোধ দু ধারায় পরিপুষ্ট হয়েছে। একদিকে বহুকাল পর্যন্ত এক সাথে অত্যাচারিত হওয়া ও পরাধীন থাকার স্মৃতি এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকারের গৌরববোধ এবং সর্বোপরি একই ঐতিহ্যে অংশীদার হবার গৌরব বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মহান জাতীয়তাবোধের ভাবধারা সৃষ্টি করেছে।

জাতি এবং জাতীয়তাবোধ
Nation and Nationality

জাতি (Nation) বলতে আমরা এক জনসমষ্টিকে বুঝি যারা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে অথবা কায়েম করতে আগ্রহী। জাতীয়তাবোধের যে সব উপাদান আছে, জাতির মধ্যে সবগুলোই বর্তমান। জাতির জনসাধারণ এক মহামিলনের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, একই আদর্শে বিশ্বাসী এবং একই পথে চলতে উন্মুখ। কিন্তু জাতীয়তা (nationality) থেকে এর পার্থক্য এই যে, জাতির জনসাধারণ এক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে অথবা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু জাতীয়তাবোধের কোন রাজনৈতিক সংগঠন নেই। এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, 'জাতীয়তা তখনই জাতির রূপ পরিগ্রহ করে যখন তার রাজনৈতিক সংগঠন সম্পূর্ণ হয় এবং যখন তা স্বাধীনতা লাভ করে বা করতে ইচ্ছুক হয়" ("A nation is a nationality when it has organized itself into a political body, either independent or desiring to be independent.")। অনুরূপভাবে হায়েস (C. J. H. Hayes) বলেছেন, "জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জাতিতে পরিণত হয় তখনই যখন তারা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এবং সার্বভৌম সংগঠন সৃষ্টি করে"

("A nationality by acquiring unity and sovereign independence becomes a nation")। সুতরাং একই মূল থেকে উদ্ভূত হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

জাতীয়তা প্রাথমিক অবস্থা কিন্তু জাতি পরিণত অবস্থা। জাতীয়তাবোধ একটি চেতনা কিন্তু জাতি একটি সুসংবদ্ধ সংগঠন। নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, কুলগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, অর্থনৈতিক একতা, ঐতিহ্যের একতা ও একই সরকারের প্রতি আনুগত্যের ফলে জনসমষ্টি জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়। জাতীয়তাবোধ তীব্র হলে সে ভিত্তিমূলে জাতি প্রাণ পায়।

জাতি ও রাষ্ট্র
Nation and State

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং জাতি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন আমরা বলি রুশ জাতি বা জার্মান জাতি, তখন সাধারণত আমরা রুশ রাষ্ট্র (Russia) অথবা জার্মান রাষ্ট্রকেই বুঝি। অথচ সাধারণভাবে বলার সময় জাতি কথাই ব্যবহার করি। জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসংঘ মনে করেই বলি। কিন্তু সাধারণভাবে বললেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ দুটির মধ্যে প্রচুর ব্যবধান আছে।

রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান। ভূ-খণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতার কাঠামোয় জনসমষ্টির সংঘবদ্ধ জীবনই রাষ্ট্র। এতে জাতীয়তার আদর্শ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্বে গঠিত সংযুক্ত 'আরব প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্রে জাতীয়তার ভাব জাগ্রত হয় নি। মিসরীয় এবং সিরীয় দু জাতির মিলনে এক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাষ্ট্র গড়ে উঠলেও তারা জাতীয়তার ভাব পরিত্যাগ করে নি।

কিন্তু জাতি কোন ভৌগোলিক সংজ্ঞা নয়। জাতি বিভিন্ন মিলনের সূত্রে আবদ্ধ এক জনসমষ্টি যা স্বাধীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে বা প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। এর সাথে সরকার বা সার্বভৌম শক্তির কোন সম্পর্ক নেই। তবে উভয়ের মধ্যে যদিও ঐক্যের বন্ধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান, তথাপি জাতি গঠনে ঐক্যসূত্র অপরিহার্য। তাছাড়া, জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক ঐক্যভাব, কিন্তু রাষ্ট্র একটি বাস্তব এবং আইনগত প্রতিষ্ঠান। জাতীয়তাবোধ অনুভব করা বা না করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক এবং অপরিহার্য। জাতীয়তাবোধ ইচ্ছা প্রণোদিত বলে তা এক ব্যাপক এবং গভীর অনুভূতি, কিন্তু রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান বলে তা শক্তিমান এবং প্রভাবশালী।

বর্তমানে প্রচলিত ভাবধারা হলো প্রত্যেকটি জাতি নিজস্ব 'রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে আত্মবিকাশ করে স্বীয় সত্তা অর্জনে অভিলাষী'। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বহু জাতি রাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ
Nationalism

জাতীয়তাবাদ আধুনিককালের রাজনীতির প্রধান পরিচালিকা শক্তি। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এবং জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব বর্তমান বিশ্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। জাতীয় স্বার্থে মানুষ সংগ্রাম করে এবং অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। বর্তমান শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল জাতি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে। এক দিন জাতীয়তাবাদ হাজার হাজার মানুষের মুক্তির মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল। আজও জাতীয়তাবাদ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জীবন্ত এক সত্যরূপে পরিস্ফুট।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা
Definition of Nationalism

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হায়েস (C. J. H. Hayes) জাতীয়তাবাদকে "জাতীয়তা এবং দেশপ্রেমের মত দুটি প্রাচীন ভাবের আধুনিক অনুভূতিপ্রবণ সংমিশ্রণ ও অতিরঞ্জন" বলে চিহ্নিত করেছেন ("A modern emotional fusion and exaggeration of two very old phenomena of nationality and patriotism")। হ্যান্স কোন্ (Hans Kohn) বলেন, 'জাতীয়তাবাদ মূলত এক মানসিক অবস্থা, চেতনার এক কার্যক্রম" ("Nationalism is first and foremost a state of mind, an act of consciousness")। অধ্যাপক লাস্কির কথায়, "জাতীয়তাবাদ সাধারণভাবে এক ধরনের মানসিকতা। এটা দু'ধারায় পরিপুষ্ট, একটি প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ এবং অন্যটি পরস্পরের একত্রে বসবাস করার সম্মতি।" অধ্যাপক স্নাইডারের (L. L. Snyder) মতে, "জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অধ্যাত্ম চেতনার ফলশ্রুতি। একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনসাধারণের মানসিকতা, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার ফল" ("Nationalism is a product of political, economic, social and intellectual factors at a certain stage in history, is a condition of mind, feeling or sentiment by a group of people living in a well-defined geographical area.")।

জাতীয়তাবাদের এ সব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয়তাবাদ একটি চেতনা, এক ধরনের মানসিকতা এবং অনুভূতি। এই চেতনা মানুষকে একত্রিত করে, মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে এবং জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর করে তোলে। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে দেখে। এ পার্থক্যবোধই জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয়তাবাদের দুটি দিক রয়েছে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক। সামাজিক দিক থেকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক বলে নিজেদের মনে করে। রাজনৈতিক দিক থেকে এ জনসমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। জাতি রাষ্ট্র গঠনই জাতীয়তাবাদের চরম সার্থকতা। দেশাত্মবোধ এবং দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদের প্রধান স্তম্ভ।

জাতীয়তাবাদের বিকাশ
The Growth of Nationalism

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক যুগের উন্নত সৃষ্টি, যদিও পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর গজাতে থাকে। প্রাচীন যুগে শুধুমাত্র গ্রীক ও হিব্রুদের মধ্যেই জাতীয়তাবাদের ধারণা জন্মলাভ করে। গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যখন সেই ধ্বংসস্তূপে রোমানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যখন সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে তখন জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। তার পরিবর্তে জন্মলাভ করে বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যের ধারণা। এ ধারণা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নিঃশেষ হলেও জাতি রাষ্ট্রের ধারণা তখনও জন্মলাভ করেনি।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ নতুনভাবে প্রাণলাভ করে। এ সময় ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হতে থাকে মাতৃভাষা। ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে রাজার হাত শক্তিশালী হতে থাকে। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র পর্যুদস্ত হয় এবং বিভিন্ন দেশে বণিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রবল হতে থাকে। দেশের প্রতিরক্ষা ও আর্থিক সুবিধার জন্য রাজার পতাকা তলে জনসাধারণ সমবেত হতে থাকে। এভাবে জাতীয়তাবাদ প্রাণ পায়। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতি রাষ্ট্র গঠনের নীতি নির্ধারণ করেন মেকিয়েভেলি। তিনিই আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রথম পুরোধা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূলত জাতীয়তাবাদ

সুদৃঢ় হয়। ১৭৭২ সালে পোল্যাণ্ডের ভাগাভাগিকে (Partition of Poland) কেন্দ্র করে জাতীয়তার চেতনা জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে। এর পূর্ব পর্যন্ত রাজা বা সম্রাট জনগণের সম্মতির কোন তোয়াক্কা না করেই জনপদ বিলিবণ্টন করতেন। পোল্যাণ্ডের ভাগাভাগির ফলে জনগণের মধ্যে এক তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। বাজারের অন্যান্য পণ্যের মত দেশের বিভিন্ন অংশ জনগণের সম্মতি ব্যতীত বিক্রি বা ভাগাভাগি হবে তা অত্যন্ত অন্যায়। এ ভাবধারা জাতীয়তাবাদের গতিকে ত্বরান্বিত করে। ফরাসি বিপ্লব (French Revolution) জাতীয়তার ভাবধারাকে আরও জোরদার করে। এ বিপ্লবের শ্লোগান ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব এবং এসব প্রচারিত হয়েছিল জনগণের সার্বভৌমিকতার নামে।

বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে যখন ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হয় এবং সে সাম্রাজ্যের পদতলে দলিত মথিত হতে থাকে অস্ট্রিয়া, জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশ তখন ঐ সব দেশের জনসাধারণ জাতীয় ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফরাসি বিপ্লবের পর ম্যাজিনী, ফিসটে প্রমুখ লেখকের রচনা জাতীয়তাবাদের ভাবধারাকে আরও সম্প্রসারিত করে। ম্যাজিনী (Mazini) প্রচার করেন, একই ঐতিহ্য ও প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ইতালীয়রা একটা জাতি। ফিসটে (Fichte) বলেন, জার্মানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। এভাবে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ইতালি ও জার্মান জাতি একত্রিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ ও বিংশ শতাব্দী জাতীয়তাবাদের গৌরবোজ্জ্বল যুগ। জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জাতি রাষ্ট্রের উপর ভিত্তি করে ইউরোপের মানচিত্র নতুন ছাঁচে ঢালাই করা হলো। চেক, পোল, স্লাভ জাতিগুলো রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ লাভ করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা এবং দূরপ্রাচ্যে জাতীয়তার ভিত্তিতে অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪৫ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র জন্মলাভ করে। ১৯৪৬ সালে ফিলিপাইন স্বাধীন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো। ষাটের দশকে আফ্রিকায় বহু সংখ্যক জাতি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মূলত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জাতীয়তার ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক শতটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ছিল অনেকটা নীহারিকা তুল্য, অস্পষ্ট এক মতবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ চিহ্নিত হয় মুক্তি পথের অগ্রদূত হিসেবে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্র-ধর্ম বলে বিবেচিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। আজও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

আত্মনির্ধারণের নীতি
Doctrine of Self-determination

জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের একটি প্রধান অধিকার তার আত্মনির্ধারণের অধিকার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে জনসম্প্রদায় নিজস্ব শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে পারলে তা জাতি রাষ্ট্রে (Nation state) পরিণত হয়। তবে জাতি রাষ্ট্রের ইতিহাস সাম্প্রতিক কালের। এক জাতীয়তায় বিশ্বাসী জনসমূহ এক রাষ্ট্রে বসবাস করবে। এ চেতনা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করে। এ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)। তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রণালীর কথা বিবেচনা করার সময় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'যেখানেই জাতীয়তার ভাব বেশ প্রবল আকার ধারণ করেছে সেখানেই এক জনসম্প্রদায়ের সব লোককে এক শাসনের ঐক্যে আবদ্ধ করা এবং তাদের জন্য এক স্বতন্ত্র সরকারের ব্যবস্থা করার মোটামুটি যুক্তি রয়েছে" ("Where the sentiment of nationality exists in any form, there is a primafacie case for uniting all members of the nationality under the same government")।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় শর্ত এই যে, "সরকারের গণ্ডী জাতীয়তার গণ্ডীর সাথে এক হবে" ("It is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of the government should coincide in the main with those of nationalities")। সংক্ষেপে এই নীতিকে নিম্নরূপেও প্রকাশ করা চলে ঃ "এক জাতি ঃ এক রাষ্ট্র"। তাঁর মতে, "গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমূহকে অন্য জাতীয়তার অধীন রাখা স্ববিরোধিতা। কারণ গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির দাবি এবং জাতীয়তাবোধ একই মূল থেকে উৎসারিত।"

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সুপণ্ডিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ভার্সাই সন্ধি সভায় যোগদান করে জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করে এ অধ্যায়ে নতুন সুর ও নতুন আবেদন যোগ করেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি বা আত্মনির্ধারণের নীতি সন্ধি সভায় গৃহীত হয়। ফলে একাধিক জাতি রাষ্ট্র–পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের জন্ম হলো। তিনি বলেছেন, "আত্মনির্ধারণের নীতি শুধুমাত্র বাক্যাংশ নয়, তা কর্মের বিশিষ্ট নীতি এবং রাষ্ট্রনায়কগণ এখন থেকে এর প্রতি বিরূপ হলে বিপদ ডেকে আনবে" ("Self-determination is not a mere phrase; it is an imperative principle of action which statesmen will henceforth ignore at their peril")। সুতরাং গণতন্ত্রের জয়যাত্রার পথে আত্মনির্ধারণের নীতি সংযুক্ত হয়ে গণদাবির মহিমাকে সমুজ্জ্বল করে তোলে।

গণতন্ত্রের দাবি ছাড়াও আত্মনির্ধারণের নীতির পক্ষে আরও অনেক যুক্তি রয়েছে।

প্রথমত, এ নীতির বাস্তবায়নে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিজেদের সরকারের পরিচালনাধীনে রক্ষা পায় এবং যথাযথরূপে স্ফূরিত হয়ে জাতীয়, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে।

দ্বিতীয়ত, আত্মনির্ধারণের নীতি এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং হৃদ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। পরস্পর মিলিত হয়ে একযোগে উন্নতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এক জাতি যদি অন্য জাতিকে জোরপূর্বক পরাধীন করে রাখে এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে পদদলিত করে, তা হলে তাদের মধ্যে হিংসা–দ্বেষ সৃষ্টি হবে, সামাজিক পরিবেশ অস্বস্তিকর হবে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কলুষিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ভারতবর্ষে প্রাক–স্বাধীনতা যুগে মুসলমান জাতি ইংরেজদের সাথে শত্রুভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর তারা ইংল্যাণ্ডের সাথে মৈত্রী বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ।

সর্বশেষে, এও বলা যায় যে, আত্মনির্ধারণের নীতি নৈতিকতার দিক দিয়েও উত্তম। শাসনব্যবস্থার মূল যদি হয় সম্মতি তা হলে এ ক্ষেত্রেও সম্মতি অপরিহার্য।

এর বিপক্ষে যুক্তি

১। আত্মনির্ধারণের নীতিকে নির্বিচারে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না এবং প্রয়োগ করা উচিতও নয়। রাষ্ট্র সৃষ্টি করলেই হয় না, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার যোগ্যতা থাকা চাই।

২। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা পূর্ণরূপে ব্যবহার করার যোগ্যতাও থাকতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এরূপ অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় নি।

৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে আত্মনির্ধারণ নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। পরমুখাপেক্ষী অর্থনীতি দাসত্বের নামান্তর। তাই আত্মনির্ভরতা ব্যতীত আত্মনির্ধারণ অবাস্তব, অসঙ্গত ও সার্থকতাবিহীন।

৪। তাছাড়া, আত্মনির্ধারণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করবে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়ে উঠলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ও বৈরী মনোভাব বৃদ্ধি পাবে এবং ছোটখাট ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(৫) সর্বোপরি বর্তমান যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো বড় রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে পারে।

তবে এও স্বীকার্য যে, যেখানে আত্মনির্ধারণের সুযোগ রয়েছে, সেখানে অহেতুক যুক্তিতর্কের বাড়াবাড়ি দ্বারা সে অধিকারকে বিনষ্ট করা বা সে অধিকারকে স্বীকৃতি না দেয়া অন্যায়। দেখা গেছে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুভ হয়েছে।

এক জাতি, এক রাষ্ট্র
One State, One Nation

১। নীতিগতভাবে–এক জাতি, এক রাষ্ট্র–অত্যন্ত মধুর। এ নীতি গণতন্ত্রের সনাতন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ শাসিতদের সম্মতি ব্যতীত কোন শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না। অনেকের মতে, এ নীতি মানুষের জন্মগত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। মানবের ইতিহাসেও এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে গণতন্ত্রের যে জয়যাত্রা শুরু হয় এবং গণতন্ত্রের পরিপূরক নীতি হিসেবে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ যেভাবে ঘটে, তার ফলে বহু উৎপীড়িত জাতি আত্মনির্ধারণ অধিকারের আশীর্বাদ লাভ করেছে। এ নীতির স্বীকৃতির ফলেই খণ্ডছিন্ন পোল্যাণ্ড এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এ নীতির আশীর্বাদেই বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হয়েছে চেক এবং স্লোভাক জাতিসমূহ। এ নীতিকে মূলধন করেই আলবেনিয়াবাসিগণ, সিরিয়ার অধিবাসীবৃন্দ, এস্তোনিয়া ও লিথুনিয়ার জনসমূহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে মর্যাদার সাথে স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই বাংলাদেশের বার কোটি জনসমষ্টি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সুতরাং এক জাতিঃ এক রাষ্ট্রের নীতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তির বাণী বহন করেছে পৃথিবীর অনেক জনসমষ্টির নিকট।

৩। এ নীতি অনুসরণ করলে বিশ্বসভ্যতা বহুগুণে সমৃদ্ধ হবে। জাতি নিজ নিজ সরকারের অধীনে থেকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র অর্জন করবে, বৈশিষ্ট্যগুলো জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ছোঁয়ায় পূর্ণরূপে বিকশিত হবে এবং বৈচিত্র্য ও অনন্যতায় বিশ্বসভ্যতা বহুগুণে সার্থক হয়ে উঠবে।

৪। মহামতি মিলের মতে, এ নীতির প্রয়োগে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর কার্যকরী হবে, সফলতা অর্জন করবে এবং একই মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের মিলনের ফলে শাসনব্যবস্থা অধিকতর জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারবে, সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, সহানুভূতির বন্ধন শক্ত হবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হবে।

৫। এ নীতিবাস্তবায়নের ফলে শান্তি ও সদ্ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষার কার্যে প্রভূত সাহায্য করবে। জনসাধারণ শাসনব্যবস্থাকে নিজের বলে গ্রহণ না করলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই অনেকটা ব্যাহত হয়। হিংসা, দ্বেষ ও প্রতিহিংসার কলুষিত মনোভাবে জাতীয় জীবন কলঙ্কিত হলে তা অপেক্ষা অধিক অপচয় অন্য কিছুতেই সাধিত হয় না।

৬। এও বলা যায় যে, ইতিহাসের ঐশীবাণী তারই ইঙ্গিত দেয়। আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য দাবি অগ্রাহ্য করে ইংল্যাণ্ড তাকে চিরদিনের জন্য হারাল। আলজিরিয়ার আত্মনির্ধারণের দাবি অস্বীকার করে ফ্রান্স তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ইতিহাসের এরূপ ঘটনাসমূহ ঐ একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এ সত্য উদ্‌ঘাটন করেছে যে, যা নৈতিকতার দ্বারা সমর্থিত নয়, যা বিবেকের দ্বারা স্বীকৃত নয়, জোর করে কেউ তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই, এমনকি রক্ষকও রক্ষা পাবে না। বাংলাদেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অবশ্য এর বিপক্ষেও যুক্তি রয়েছে প্রচুর। এক জাতি ঃ এক রাষ্ট্রের নীতি যুগে যুগে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথমত, বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে এত বেশি সংখ্যক রাষ্ট্র জন্মলাভ করবে যে, তাদের অধিকাংশই নিজেদের আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে না। ফলে পৃথিবীতে কালা, বোবা, খঞ্জ, অন্ধ ও আতুর রাষ্ট্রের প্রাদুর্ভাবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করি, যাকে হেগেল বলেছেন, 'পৃথিবীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রা' এবং প্লেটো বলেছেন, 'পূর্ণতার স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান' তা অত্যন্ত করুণভাবে নস্যাৎ করা হবে। ভার্সাই সন্ধি চুক্তির ফলে যে কয়েকটি রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছিল,তাদের কিছু কিছু বছর বিশেকের মধ্যেই আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হয়ে বিলীন হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ডানজিগের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কেন? এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুনিয়া,সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে যেমন আত্মরক্ষা অসম্ভব,তেমনি তাদের নিজেদের স্বাধীন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠন করাও অসম্ভব। তাই আর্থিক ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করতে সমর্থ হবে না এবং আত্মনির্ধারণের সার্থকতা থাকবে না।

তৃতীয়ত, আত্মনির্ধারণ নীতির প্রয়োগের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে। ফলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ মধুরতর হবে না, বরং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টির ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হবে।

চতুর্থত, এর ফলে পৃথিবীর বহু সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে এবং তা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বশান্তির পক্ষে বহু সংখ্যক কালিমারেখা স্বরূপ হয়ে উঠবে। ইউরোপে বর্তমানে ৪৮টি রাষ্ট্র রয়েছে। কিন্তু জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭২। শুধু তাই বা কেন? আরও অধিক সংখ্যক রাষ্ট্র জন্মলাভ করতে পারে। এক জাতি এক রাষ্ট্রের নীতি মানতে গেলে গ্রেট বৃটেনকে স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড-এ চারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে হয়। তেমনি সুইজারল্যাণ্ডকে তিনটি এবং বেলজিয়ামকে দুটি জাতি রাষ্ট্রে ভাগ করতে হবে। ফলে রাষ্ট্রের সংহতি নষ্ট হবে এবং বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হবে।

সর্বশেষে, এও উল্লেখযোগ্য যে, জাতি রাষ্ট্র গঠন না হলে যে রাষ্ট্রের জনসমষ্টি শান্তি ও সদ্ভাবে থাকতে পারে না, তা সত্য নয়। সুইজারল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের উদাহরণ, গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই আমরা স্পষ্টত বুঝতে পারি যে, এক জাতি—এক রাষ্ট্রের নীতি অপেক্ষা বহু জাতিক রাষ্ট্রই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তবে জাতীয়তার অধিকার যুক্তি বা বিতর্কের যূপকাষ্ঠে যেন বলি না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং একজাতিক রাষ্ট্র

Mononational and Multinational State

এক জাতি—এক রাষ্ট্রের নীতি অত্যন্ত আবেদন পূর্ণ হলেও সব ক্ষেত্রে নির্বিচারে এ নীতিকে প্রয়োগ করা যায় না। যে ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোর সংহতি নষ্ট করতে পারে, সেখানে এর

প্রয়োগ না করাই ভাল। তবে যেখানে জাতীয়তাবোধ প্রবল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এবং যেখানে তার ফলে শান্তি ও সদ্ভাবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, আত্মনির্ধারণের নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সেখানে জাতি রাষ্ট্র গঠন শুধুমাত্র উপযোগী নয়, অপরিহার্যও বটে। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অনেক জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা তখনকার ৫১ থেকে আজ পর্যন্ত ১৯২ হয়েছে। সুতরাং এক জাতিক রাষ্ট্র এবং বহুজাতিক রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা হওয়া উচিত।

১। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, বহুজাতিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা দেয়া সম্ভবপর নয়। এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত ভাবধারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। সুইট্জারল্যাণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নজীর তুলে ধরে এ যুক্তিকে খণ্ডন করা সম্ভবপর নয়। কারণ সুইট্জারল্যাণ্ড' ও আমেরিকায় ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবধারার লোকেরা একত্রে বসবাস করে সব বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে নিজদিগকে সুইস এবং আমেরিকান বলে ভাবতে শিখেছে। তাই শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী গামপ্লাউইট্স বলেন, এক-জাতিক রাষ্ট্র অপেক্ষা বহুজাতিক রাষ্ট্র অনেক সুবিধাজনক। তিনি বেলজিয়াম ও সুইট্জারল্যাণ্ডের উদাহরণ উল্লেখ করে এ কথা বলেছেন।

২। ইংল্যাণ্ডের লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তা বিষ অপেক্ষাও বিষাক্ত এবং মানব সমাজে বিভেদ সৃষ্টির জন্য জাতীয়তাবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাঁর মতে, সমাজে যেমন বহু জনের বাস সভ্যতার লক্ষণ, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের মধ্যেও অনেক জন সম্প্রদায়ের বাস সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য উপাদেয়। তিনি আরও বলেন, বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে উন্নত। উন্নত জাতির সংস্পর্শে এসে অনুন্নত জাতিরা উন্নত হয় এবং রাষ্ট্রীয় কর্মের কাফেলায় সকলে সমানভাবে সামিল হয়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে ঐসব জাতি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একের জ্ঞানগরিমা এবং শৌর্য-বীর্য অন্যের মধ্যে প্রসারিত হয়। ফলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে বিশ্ব সভায় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড অ্যাক্টন বৃটিশ সমাজের গৌরবকে আরও মহিমামণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে এ মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর এ মত শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, যেখানে বিভিন্ন জাতি স্বেচ্ছায় এক শাসনব্যবস্থার মধ্যে থাকতে রাজি হয়েছে।

৩। কিন্তু যে বহুজাতিক রাষ্ট্রে কোন কোন জাতির লোকেরা উৎপীড়িত হয় এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হয় না, সেখানে জাতি রাষ্টের আদর্শ মুক্তির আদর্শ স্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে, রাশিয়া ও তুরস্ক সাম্রাজ্যে জাতীয়তার বাণী মুক্তিবাণীর বন্যার মত প্রবাহিত হয়ে অত্যাচার, অনাচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে লোকদের মুক্ত করেছে। ঐসব সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে জাতিগুলোকে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ধারণের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই অধ্যাপক গার্নার বলেছেন "বহুজাতিক রাষ্ট্রে সুস্থ পরিবেশ খুব কম জায়গায় অবস্থিত"। যেখানে অধিক সংখ্যক লোক অসন্তুষ্ট এবং অসুখী সেখানে এক জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রই বাঞ্ছনীয়। কবি রবীন্দ্রনাথের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তার কার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসঙ্গীতে প্রত্যেকে এক একটি সুর যোগ করে দিচ্ছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তা কারও একক চেষ্টার অতীত।"

৪। তাছাড়া, বহু জাতিকে একত্রে আবদ্ধ করার আর একটি মহাপরিকল্পনা বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন তা বহুজাতিক রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জড়িত করা (Introduction of federal system in the poly-national state)। তাহলে অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহ নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি, কালচার প্রভৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারবে এবং সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেও রাষ্ট্রীয় সংঘকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে পারবে। তথাপি নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তার প্রশ্নটি নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বসভ্যতা
Perverted Nationalism and World Civilization

জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ **বিকৃত জাতীয়তাবাদ বিশ্বসভ্যতার পক্ষে ভীতিস্বরূপ** (menace to civilization)। এ বিকৃত রূপের অভিব্যক্তি দেখে আমরা আতংকিত হয়েছিলাম এবং আমরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বিশেষ করে দুটি বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায়। সুতরাং এর কুফল থেকে সাবধান হওয়া উচিত।

১। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী লেখক হেগেল এবং ইতালির মিলন মন্ত্রের উদ্‌গাতা ম্যাজিনী (Mazini) জাতি রাষ্ট্রকে 'ঐশ্বরিক গুণের মূর্ত প্রতীক' এবং 'মানবীয় সংগঠনের শ্রেষ্ঠতম ফল' বলে প্রচার করেন এবং জাতি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকারকে মৌলিক কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের উদাত্ত ঘোষণার ফলেই জাতীয়তাবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক রাষ্ট্রধর্মে রূপ পায়। ফলে একদিকে যেমন বহু সংখ্যক লোক নিজেদের মধ্যে ঐক্যভাব অনুভব করল, ঠিক অন্যদিকে তেমনি অপর জাতির লোকদের সাথে পার্থক্য অনুভব করে বিচ্ছিন্ন হলো। একদিকে স্বজাতি ও স্বজনের সাথে প্রীতি ও সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হলো, অন্যদিকে অন্যদের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসার ভাবধারা নিয়ে দূরে সরে এলো। নিজেদের শ্রেষ্ঠতম মনে করে পরে সবকিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করতে লাগল। এ মনোভাব থেকে সবকিছুকে নস্যাৎ করে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনে আগ্রহী হবার প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি আধুনিককালের যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে এই বিকৃত মনোভাব থেকে।

২। এটা শুধুমাত্র বিশ্বসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই অন্যায় মনে হয় তাই নয়, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তা আদৌ কল্যাণকর নয়। এ বিকৃত জাতীয়তাবাদ যদি একবার দানা বেঁধে ওঠে, তাহলে জাতির প্রত্যেককে এক ছাঁচে ঢেলে গড়ার প্রয়াসও দেখা যায়। কী ধর্ম ক্ষেত্রে, কী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, কি বেশভূষায়, কী আহারে-বিহারে জাতির সর্বজনকে একই রূপরেখায় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে সমাজ জীবনকে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মত গড়ে তোলার জন্য সমাজের নেতৃবৃন্দ উঠে পড়ে লাগেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান জীবনবোধগুলো বিকৃত হয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি একবার জাতিকে পেয়ে বসলে ধর্মের গোঁড়ামি অপেক্ষাও তা তীব্র হয়ে ওঠে এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। জনৈক পণ্ডিত তাই উষ্মা সহকারে প্রকাশ করেছেন, 'জাতীয়তাবাদ মনুষ্যত্ব থেকে পশুত্বে পৌঁছবার সহজ এবং সরল রাজপথ'।

৩। তাছাড়া, বিশ্বসভ্যতার কয়েকটি মূল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ সভ্যতা বিরোধী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অথবা সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে বা ধর্মীয় ব্যাপারেও আজকাল আন্তর্জাতিকতার বিপুল প্রভাব পড়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দূরকে নিকট করেছে। পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র অতিক্রম করে দূরত্বকে বিনাশ করেছে। তাই যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, আজকাল আমরা আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে শুরু করেছি। নারায়ণগঞ্জে পাটের দাম কমলে ইংল্যাণ্ডের ডাণ্ডিতে তার প্রতিক্রিয়া দেখি। সুয়েজ খালে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি আমরা সুদূর টোকিওতে, জাকার্তায়, দিল্লীতে এবং করাচীতে। শুধু কী তাই? পৃথিবীর এক প্রান্তে কোন একটি ঘটনা ঘটলে তার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে সব জায়গায়। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, কালচার আজকাল যতটা দেশজ বা যতটা জাতীয়, তা অপেক্ষা শতগুণে আন্তর্জাতিক।

৪। শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোরও অনুশাসন আজ ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। তা ভূগোলের চার সীমা পার হয়ে বিশ্বে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সাম্যগানে মানবের অন্তর্নিহিত গুণগুলোর জয় ঘোষণা করছে। ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম প্রভৃতির মূল সূত্র বিশ্বজনীন। সুতরাং জাতীয়তাবাদের বিচ্ছিন্নতাবাদ আজকাল বিশ্বে অচল, অবাস্তব এবং অবাঞ্ছনীয়।

৫। তদুপরি বিজ্ঞানের আশীর্বাদের সাথে কিছু কিছু হলাহলও এসেছে। মারণাস্ত্রের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবার সাথে আজকাল আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজন আরও বেশি পরিমাণে অনুভূত হয়েছে, যাতে কোন অশুভ বিচ্ছিন্নতাবাদের মুন্সী যেন চিন্তার সমতা হারিয়ে আবেগের আতিশয্যে মারণাস্ত্রের ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপ না করে বসে। তাই বিশ্বভ্রাতৃত্বের জয়গান হোক বিশ্বব্যাপী, বিশ্বপ্রেম সর্বজনীন কল্যাণের পথ প্রশস্ত করুক, বিকৃত জাতীয়তাবাদ ধ্বংস হোক তাই সকলের কাম্য।

আন্তর্জাতিকতা
Internationalism

জাতীয়তাবাদ (nationalism) যেমন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে মানুষের একাত্মতা ও মিলনের আহ্বান, আন্তর্জাতিকতা (internationalism) তেমনি বিশ্বের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতা ও মিলনের অনুভূতি।

সংজ্ঞা
Definition

আন্তর্জাতিকতা বলতে আমরা জনসাধারণের সে ধরনের মানসিকতা ও চেতনাকে বুঝি যা জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে বিশ্বের সব জাতি ও সম্প্রদায়ের বিশ্বজনীন স্বার্থের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। জাতীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীন না হয়ে মানুষ যখন বিশ্বমানবের সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি যত্নবান হয় তখনই আন্তর্জাতিকতার রূপ প্রকাশিত হয়।

আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তাবাদ
Internationalism And Nationalism

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার পরস্পর বিরোধী দাবিতে মানুষের মন ক্ষত-বিক্ষত। জাতীয়তাবাদ মানুষকে ঐ সব কার্যে এবং চিন্তায় আকৃষ্ট করে যার সাথে তাদের জাতির মঙ্গল, গৌরব ও সুখ জড়িত রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা শুধুমাত্র নিজ জাতি বা দেশের মঙ্গল ও গৌরব নিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকে না, সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বের সকল জাতির সুখ ও সমৃদ্ধির চিন্তায় মগ্ন।

আন্তর্জাতিকতার মূলে রয়েছে বিভিন্ন সূত্র। **প্রথম,** আধুনিক কালের জীবনযাত্রা জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্ম থেকে শুরু করে মানবের রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক স্বার্থ, সামাজিক জীবন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ফলে জাতীয়তাবাদের আবেদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্তর্জাতিকতাও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি দূরত্বকে জয় করেছে। তাই অন্য দেশে যা জানার আছে, বোঝার আছে তা জানতে ও বুঝতে মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক জানাজানির ফলে মানুষ জাতীয়তার সীমারেখা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বকে আজ ঘর বলে মনে করছে।

তৃতীয়, আণবিক শক্তি চালিত মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিকতাবোধ আজ অনেকটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কোন সম্ভাব্য আণবিক যুদ্ধে শুধুমাত্র বিজেতা এবং বিজিতই মরবে না, নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হতে পারে। এমনকি মানুষের কৃষ্টি এবং সভ্যতাও ধ্বংস হতে পারে। সুতরাং নিজ গরজেও মানুষ আজকাল আন্তর্জাতিকতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছে।

ফলে সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় জাতিসংঘের (U. N. O.) কিছু কিছু নির্দেশ মেনে চলতে রাজি হয়েছে। যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে, এমনকি ব্যাংক, আর্থিক ক্ষেত্র ও অন্যান্য স্তরে আন্তর্জাতিক সংস্থা জন্মলাভ করেছে। আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ এবং প্রসার এই ক্ষেত্রে আর এক দিক দর্শন।

জাতীয়তাবাদের সাথে আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ আছে কী?

বিকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে অতীতে কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বে ধ্বংসলীলা সংঘটন করেছেন। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ থেকেই সাম্রাজ্যবাদ জন্মলাভ করে। পরিণতিতে অনেক অনুন্নত জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উৎপীড়িত হয়।

কিন্তু সুস্থ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়। জাতীয়তাবাদের একটি বিশিষ্ট দিক রয়েছে এবং তা মানবতার সাথে জড়িত। এ দিক থেকে জাতীয়তাবাদ বিশ্বকে আপন করতে পারে এবং উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র বিশ্বে আদর্শ জীবনের ক্ষেত্র রচনা করতে পারে। জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে যারা রাষ্ট্রীয় গৌরবের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন তারা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সারা বিশ্বকে প্রাণের দরদ ও প্রীতির ছোঁয়ায় গৌরবান্বিত করতে পারেন। এই অর্থে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়, বরং তার পরিপূরক। তাই বলা হয়, আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন হতে হলে সর্বাগ্রে জাতীয়তাবাদী হতে হয়।

প্রথম, আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবাদের বিরোধী নয়। কাউকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিক হতে হবে এমন কথা নয়। আন্তর্জাতিকতার মূল কথা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সব বিবাদ-বিসংবাদ ঘটে সেগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে ফেলা।

দ্বিতীয়, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় গৌরবকে উচ্চতর আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করতে হবে। অন্য কথায়, জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হলে নৈতিকতার সাথে তাকে যুক্ত করতে হবে।

জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ
Nationalism and Imperialism

জাতীয়তাবাদ সর্বপ্রথম মৈত্রীর মন্ত্র হিসেবে উদ্ভূত হয়ে মিলন ও ঐক্যের মহা মূল্যবান সূত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে বিকশিত হবার সাথে সাথে তা স্বার্থবাদিগণের হস্তে স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করতে থাকে। পুঁজিপতিরা প্রথমে দেশের মধ্যে উগ্র স্বাদেশিকতা প্রচার করে, বিদেশী জিনিসের আমদানি বন্ধ করে অথবা বিদেশী জিনিসের বিরুদ্ধে উচ্চ টেরিফ (tariff) দেওয়াল খাড়া করে মুনাফার পাহাড় সৃষ্টি করে। বাইরের প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেশের অভ্যন্তরে সহযোগিতার মাধ্যমে শিল্প বাণিজ্যের একচেটিয়া (monopoly) অধিকার কায়েম করে। তার পর উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্তটুকু বাইরের বাজারে চালান দেবার চেষ্টা করে। ফলে বাজারের খোঁজে বের হয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইউরোপীয় জাতিসমূহের অভিযান ও সাম্রাজ্য বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কলঙ্কিত করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বহু জনপদ তাদের স্বার্থের কবলে পড়ে ছটফট করেছে। বিংশ শতাব্দীর দু মহাযুদ্ধের মূলে রয়েছে বাজার খোঁজার এ দৃঢ় সংকল্প এবং উৎসাহ। উদ্দীপনা যুগিয়েছে জাতীয়তাবাদের ভাবধারা। তাই লেনিন ক্রোধভরে বলেছিলেন। "পুঁজিবাদ নিজ নিজ দেশের জনসমূহকে জাতীয়তাবাদের মদিরা পান করিয়ে উন্মত্ত করে তোলে এবং সাম্রাজ্য রক্ষার যুদ্ধে তাদের কামানের খোরাকে পরিণত করে।"

যদিও দুর্বল জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা জাতীয়তার ভাবধারায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা, তথাপি পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রিত না করলে তা সাম্রাজ্যবাদের মোহে পড়ে অসীম অন্যায় সাধনে প্রবৃত্ত হতে পারে। তাই অধ্যাপক লাস্কি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়" ("As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism.")।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি অধিবাসী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর থেকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এক

জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং রক্তের এক নদী সাঁতরিয়ে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনে। এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালী জাতিকে যে মূল্য দিতে হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু এ দুর্জয় শক্তি ও অপ্রতিরোধ্য সাহসের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদের অনির্বাণ দীপশিখা। সুতরাং বাঙালীরা যে সুসংহত এক জাতি এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ জনের মাতৃভাষা বাংলা। ভাষার এই স্বর্ণসূত্রে জনসমষ্টি আবদ্ধ। তাছাড়া, আপামর জনসমষ্টির রীতি-নীতি, জীবন-ব্যবস্থা, প্রথা-পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। তারা এক বংশজাত না হলেও এখানে কুলগত বৈষম্য বড় একটা চোখে পড়ে না। বাঙালীদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাদের জীবন-মূলে ও সমাজ-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সুরে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধর্মের বিভিন্নতা মোটেই অনুভূত হয় না। বাংলাদেশের মুসলমানের কুটিরের পাশে হিন্দুর কুঁড়েঘর অত্যন্ত সখ্যতার সাথে চিরকাল বসবাস করে আসছে।

বাংলাদেশের প্রত্যেকে আজ জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত। ভাষা ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। জাতির সেবায় নিয়োজিত এবং জাতীয় স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তাই দেখা গিয়েছে,-চট্টগ্রাম থেকে সুদূর রংপুর পর্যন্ত সমগ্র জাতি এক বজ্র কঠোর শপথ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর একই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনে, একই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং একই অর্থনৈতিক কাঠামোর ফলে জনসমষ্টি একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আজ তাই এক ও অভিন্ন। এই জাতীয়তাবাদ দু ধারায় পরিপুষ্ট হয়েছে। একদিকে বহুকাল পর্যন্ত এক সাথে অত্যাচারিত হওয়া ও পরাধীন থাকার স্মৃতি এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ও অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকারের গৌরববোধ এবং সর্বোপরি একই ঐতিহ্যের অংশীদার হবার গৌরব সকলকে জাতীয়তার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে।

অধ্যাপক রেনান যথার্থই বলেছেন, জাতি গঠনে একই ভাষা বা একই বংশের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে এক সাথে মহৎ কার্য সাধন করা এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্য করার ইচ্ছাই জাতীয়তার আসল উপাদান। এ মতবাদের পূর্ণ ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ ঘটেছে বাংলাদেশে। এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব আর নেই। প্রত্যেকে বাঙালী হয়ে বসবাস করবে।" সুতরাং বাঙালীরা অতীতের স্মৃতি নিয়ে, জাতি গঠনের দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ভবিষ্যতে সোনার বাংলাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করার উদগ্র বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়েছে।

জাতীয়তার দ্বি-মাত্রা : নৃতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক
Two Dimensions of Nationality : Anthropological and Political

জাতীয়তার রয়েছে দুটি মাত্রা। একটি নৃতাত্ত্বিক এবং অপরটি রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক। স্বতন্ত্র নরগোষ্ঠির (ethnic) বা জাতিসত্তার (race) ব্যক্তিবর্গের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, জীবন প্রণালী, আচার-অনুষ্ঠান এবং এমন কী স্বতন্ত্র দৈহিক গড়নও। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চাকমা, মারমা বা মুরং এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাঁওতাল, হাজং বা গারোদের কথা এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায়। তাদের কেউ কেউ ধর্মে খৃষ্টান, কেউ বৌদ্ধ এবং কেউ বা হিন্দু। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে ভিন্নতা।

অন্যদিকে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বাঙ্গালী। জন্মসূত্রে বাঙ্গালী হলেও সকলের ভাষা বাংলা, কিন্তু ধর্মের দিক থেকে অধিকাংশ মুসলমান, বেশ কিছু জনগণ হিন্দু। কিছু হচ্ছেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীও। সংস্কৃতির দিক দিয়ে, আচার আচরণে, জীবন প্রণালীতে, খাদ্যাভাসে সকলেই প্রায় অভিন্ন।

জাতীয়তার নিরিখে নৃতাত্ত্বিক মাত্রায় তাই এসব বিভিন্ন নরগোষ্ঠির জনগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। দেখা যায় বিভিন্নতা। একজন সাঁওতাল বাঙ্গালী বলে পরিচিত হতে চান না। একজন মারমাও নিজের ঠিকানা বজায় রাখতে চান। একজন বাঙ্গালীও গারো বা চাকমার নিকট থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চান। তারা বাঙালি নন, কিন্তু নিজেদের বাংলাদেশী বলে পরিচিত হতে চান।

কিন্তু রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক। এ অর্থে সকলেই বাংলাদেশী। রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাস করে, একই প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়ে, একই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে সকলেই চান বাংলাদেশের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে পরিচিত হতে। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, সমভাবে বঞ্চিত হয়ে, স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের গৌরবে সমভাবে অংশীদার হয়ে, ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক উৎস সত্ত্বে সকলেই এক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের গৌরব দীপ্ত নাগরিক সকলেই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিচয়ে।

বাঙালী জাতীয়তা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তা-ইতিবাচক সমন্বয়
Bengali and Bangladeshi Nationality

আগেই আমরা বলেছি, বাংলাদেশে জাতীয়তার রয়েছে দুটি মাত্রা–একটি নৃতাত্ত্বিক এবং অপরটি রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক। এ ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু সম্প্রতি বিতর্ক শুরু হয়েছে বাঙালী এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে। কেউ বলছেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। জন্মক্ষণে এর শ্লোগান ছিল, জয় বাংলা। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকলেই বাঙালী। ভাষা-বর্ণমালা–সঙ্গীত নিয়ে এ দেশে যেসব আন্দোলন হয়েছে সকলেই তাতে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালী হিসেবেই সবাই অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ের গৌরবে সবাই হন অংশীদার বাঙালী হিসেবে। তাই তাদের মতে, বাংলাদেশে বাঙালী জাতীয়তাবাদই আসল।

অনেকে আবার বলেন, বাঙালী জাতিয়তাবাদের ধারণা সঠিক নয় এ কারণে যে, ভূখণ্ডের সকল নাগরিক নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিসত্তার নিরিখে বাঙালী নয়। এ দেশে রয়েছেন বাঙালী, চাকমা, মারমা, গারো, সাওতাল এবং আরো অনেক এথনিক (ethnic) গোষ্ঠির জনগণ। তাছাড়া, বাংলাদেশের বাইরেও রয়েছেন কয়েক কোটি বাঙালী যারা ভারতীয়। এ কারণে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারণা টেকনিক্যালি ভুল এবং রাজনৈতিক রাষ্ট্রিকভাবে অসংগত।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা ভাষা এবং সংস্কৃতির ঐক্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অনুসারীগণ ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়াও, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, রাষ্ট্রিয় ভূখণ্ড, রাষ্ট্রিক প্রতিবেশ, নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ধর্মীয় চেতনার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিতর্ক জোরদার হয়েছে এ কারণে যে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সমর্থন করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ। অপর পক্ষে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত-ই-ইসলাম সমর্থন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা। যারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেন তাদের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হলো, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রসূত যৌগিক সংস্কৃতির একাংশ পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমস্বরূপ। বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশে পাকিস্তানী মনোভাবের প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করতে চান।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক, বিতর্ক এড়িয়ে আমরা চলতে পারি। জাতিসত্তা এবং নৃতাত্ত্বিক নিরিখে আমরা বাঙালী বা চাকমা বা গারো, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক পরিচিতি বাংলাদেশী।

১। জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (Distinguish between nation and nationality.)

২। 'জাতি স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে'—আলোচনা কর। (The nation is a natural growth—Discuss.)

৩। জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? আধুনিক সভ্যতার জন্য এটা কি ভীতিস্বরূপ? (What are the main features of nationalism? Is it a menace to modern civilization?)

৪। আত্মনির্ধারণের নীতি বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের জন্মের পরিপ্রেক্ষিতে এর আলোচনা কর। (What do you mean by the doctrine of self-determination of nations? Discuss this with reference to the genesis of Bangladesh.)

৫। 'স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় শর্ত যে, সরকারের গণ্ডী জাতীয়তার গণ্ডীর সাথে এক হবে।' তুমি কী এর সাথে একমত? যুক্তি দেখাও। (It is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of institutions and government should coincide in the main with those of nationalities. Do you agree? Give reasons.)

৬। জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার সাথে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কতখানি সামঞ্জস্যহীন আলোচনা কর। (How far is nationalism compatible with internationalism and how far are these two conceptions incompatible? Discuss.)।

৭। জাতীয়তার মূল উপাদান কী কী? তোমার মতে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান? (What are the important elements for the formation of nationality? What is, in your opinion, the most important element?)

৮। জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Distinguish between a state and a nation.)

৯। (ক) রাষ্ট্র জাতি সৃষ্টি করে, (খ) জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে—এদের কোন্‌টি তুমি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর। [(a) The state creates nations; (b) The nation creates states. Which of these view do you accept?]

১০। বহুজাতিক রাষ্ট্র ও একজাতিক রাষ্ট্রের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা বিচার কর। (Examine the comparative advantages and disadvantges of the multinational state and mononational state.)

১১। সাম্রাজ্যবাদের সাথে জাতীয়তাবাদের কী সম্বন্ধ? (What is the relation between nationalism and imperialism?)

১২। জাতীয়তাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর। (Narrate a short history of nationalism.)

১৩। জাতীয়তাবাদ কী? (What is nationalism?)

১৪। জাতির সংজ্ঞা কীভাবে দিবে? বহুজাতিক ও একজাতিক রাষ্ট্রের মধ্যে তফাৎ কী? (How would you define a nation? What are the differences between a multinational state and a mononational state?)

১৫। জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য কীভাবে নির্দেশ করবে? জাতীয়তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আলোচনা কর। (How do you distinguish between a nation and a nationality? Elaborate your answer by bringing out the essential characteristics of nationality.)

১৬। বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কী জান? (What do you know about Bengali Nationalism?)

১৭। জাতীয়তাবাদের উপাদানসমূহ আলোচনা কর। (Discuss the elements of Nationalism.)

[D. U. 1993]

১৮। জাতির সংজ্ঞা দাও। জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য দেখাও। (Define Nation. Show the differences between the nation and nationality.) [N. U. 1995, 1999]

১৯। জাতীয়তাবাদ কী আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী? আলোচনা কর। (Is nationalism a menace to internationalsim? Discuss.) [N. U. 1998, 2005]

২০। জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য কী? জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলো আলোচনা কর। (What are the distinctions between a nation and nationality? Discuss elements of nationalism.) [N. U. 1997, 2004, 2006]

সূচনা
Introduction

আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা। রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করবে, ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের কী কী অধিকার থাকবে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি কী সম্বন্ধের দ্বারা আবদ্ধ, রাষ্ট্র ও সরকারের উপর ব্যক্তির কী কী অধিকার থাকা উচিত এসব প্রশ্নের শুভ সমাধানই আধুনিক রাষ্ট্রের বড় সমস্যা। এই সমস্যা আরও জটিল হয়েছে রাষ্ট্রের আওতায় নাগরিকগণের অর্থনৈতিক জীবন পূর্ণভাবে চলে আসার ফলে এবং রাষ্ট্রের দ্বারা বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কারণে। সুতরাং নাগরিকতা ও তার সুষ্ঠু পরিচালনা আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ বিচার্য বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আলোচনা তাই নাগরিকত্বের স্বরূপ ও তার পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু নাগরিকতার পূর্ণ উপলব্ধি শুধুমাত্র গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব। আধুনিক নাগরিকতা আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে না। আবার অন্যদিকে গণতন্ত্র তার সফলতার জন্য নাগরিকগণের চরিত্র, আত্মত্যাগ এবং সুশিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং গণতন্ত্রের এ যুগে নাগরিকতা ও তার প্রকৃতি অত্যন্ত সাবধানে লক্ষ্য করতে হবে।

নাগরিক কে বা কারা
Who are Citizens

শব্দগতভাবে কোন রাষ্ট্রের সদস্যকে সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এর বিশেষ অর্থ রয়েছে।

এরিস্টটল নাগরিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, **"সরকারি কার্য পরিচালনায় যে অংশগ্রহণ করে সে রাষ্ট্রের নাগরিক"।** কিন্তু তার সামনে ছিল নগর রাষ্ট্রের (city state) আদর্শ। সেরূপ নগর রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিরাট রাষ্ট্রের কোটি কোটি লোকের পক্ষে সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাছাড়া, গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে নাগরিকগণ অপেক্ষা দাস শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচালনমূলক কার্যে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, এরিস্টটলের আমলে গ্রীসের অন্যতম নগর রাষ্ট্র এথেন্সে প্রায় ১ লক্ষ লোকের মধ্যে নাগরিকগণের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০,০০০ এবং অবশিষ্ট ৬০,০০০ ছিল দাস শ্রেণীর লোক। তাদের মধ্যে থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক লোককে জুরি অথবা সরকারি কর্মচারী হিসেবে প্রতি বছর ভাগ্য নির্ধারণের (Lottery) দ্বারা নির্বাচিত করা হত। আইন প্রণয়ন অথবা শাসন বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্ম সব নাগরিক মিলে সম্পন্ন করত।

সমাজ জীবনে বহু পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের কাঠামো পাল্টে গিয়েছে। কোটি কোটি লোক অধ্যুষিত বর্তমান রাষ্ট্রে নাগরিকগণের রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। তাছাড়া, যে দাসপ্রথাকে গ্রীক দার্শনিকগণ স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় বলে সমর্থন করেছিলেন তাও আজ মানবতার জয়গানের উচ্চনাদে হারিয়ে গেছে। সুতরাং এরিস্টটল প্রদত্ত সংজ্ঞা আজকাল অচল ও অর্থহীন।

আধুনিককালে নাগরিকতা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। গভীরতার দিক থেকে না হলেও ব্যাপকতায় নাগরিকতার অর্থ এবং প্রকৃতি আমাদের বুঝতে হবে। রাষ্ট্রের সদস্য আজকাল নাগরিকতার মূল স্রোতে। তাই কেলসেন (Kelsen) বলেন, **"নাগরিকতা অথবা জাতীয়তা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদা"** ("Citizenship or nationality is the status of an individual who legally belongs to a certain state")। সুতরাং রাষ্ট্রের সদস্য পদ নাগরিকতার প্রথম লক্ষণ। কিন্তু রাষ্ট্রের সদস্য হলে তাকে কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং অধিকার ভোগেও সে অংশীদার হবে। এ দিক লক্ষ্য করে ভ্যাটেল (Vattel) নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন নিম্নরূপ ঃ **"নাগরিক সে ব্যক্তিগণ যাঁরা কতকগুলো কর্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে রাষ্ট্রের সাথে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রের আনুগত্যের মাধ্যমে এর সুবিধার ক্ষেত্রে সমভাবে অংশীদার"** ('Members of the civil society bound to this society by certain duties and equal participation in its advantages')। অধ্যাপক লাস্কির (Laski) মতে, **"নাগরিকতা সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির সুশিক্ষিত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ"** ("Citizenship is the contribution of one's instructed judgement to public good")। এটি অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা। তার মতে, নাগরিক তিনি, যিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে উপলব্ধি করেন সমাজের উচ্চতম নৈতিক কল্যাণ কী উপায়ে অর্জন সম্ভব, এবং সে নৈতিক মানের উপর দাঁড়িয়ে নিজেকে সার্থক ও বিকশিত করেন। কিন্তু তা নাগরিকত্বের সংজ্ঞা নয়, কারণ যারা বুদ্ধি বিবেচনাপূর্বক সর্বজনীন কল্যাণে অংশগ্রহণ করে না, তাদেরকে অ-নাগরিক বলবে কে? সবদিক বিবেচনা করে দেখলে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের সংজ্ঞাটিই উত্তম বলে মনে হয়। তা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ **"নাগরিকেরা রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা সে জনসমষ্টি যাঁরা রাষ্ট্র সংগঠন করেন এবং সকলে মিলে মিশে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণ করেন অথবা সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেন"** ("The citizens are members of the political community to which they belong. They are the people who compose the state and who in their associated capacity have established or subjected themselves to the dominion of a government for the protection of their individual as well as their collective rights")। সব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা নাগরিকের পরিচয় পাই নিম্নরূপ। **প্রথম,** নাগরিকগণ রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী। **দ্বিতীয়,** তাঁরা রাষ্ট্রের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। **তৃতীয়,** তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে অধিকার উপভোগ করেন। **চতুর্থ,** তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে বাধ্য। **পঞ্চম,** কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের বশ্যতা স্বীকার করেন তারা।

কিন্তু তথাপি একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কী বলা হবে? যদিও সাধারণভাবে তাদেরকে ভবিষ্যৎ নাগরিক বলা হয়, কিন্তু বর্তমানে তারা কোন্ পর্যায়ে? তাছাড়া অধিকার উপভোগে বঞ্চিত যারা যেমন—দোষী আসামী, জেলবন্দী, দেউলিয়া ব্যক্তিরা, পাগল বা অক্ষম তাদেরকে কী বলা যাবে? অনেকের মতে তাদের প্রজা (subject) বলাই সঙ্গত, কিন্তু তাতে আরও কিছু কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। গণতন্ত্রের যুগে কাউকেও প্রজা বলা কী ঠিক? তাছাড়া, প্রজা বললে যারা আইনের অধীন, তাদের সবাইকে প্রজা বলতে হয়। আবার কেউ কেউ ফরাসি ভাষায় citoyen (সিটোয়েন) ও nationeaux (ন্যাসোনাক্স)-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাঁরা বলতে চান যে, অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকদের শাসিত বা National বলা ভাল এবং পূর্ণ বয়স্কদের নাগরিক বলা উচিত। আবার কারো কারো মতে, যাদের রাজনৈতিক অধিকার নেই তাদের নাগরিক বলা ঠিক নয়। এর উত্তরে গার্নার (Garner) বলেন, "ভোটাধিকার বা অনুরূপ সুযোগ নাগরিকত্বের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নয়" ("The possession of the electoral privilege is not essential to citizenship and there is no necessary

connection between them")। কিন্তু এতগুলো বিভাগ বা ভাগ যোগের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রের প্রত্যেক সদস্যই, ছোট হোক, বড় হোক, নারী হোক বা পুরুষ হোক, সকলেই নাগরিক।

নাগরিক ও বিদেশী (Citizen and Alien) : রাষ্ট্রের মধ্যে যারা বসবাস করে তাদের সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা যায়। তাদের অধিকাংশই নাগরিক। কিছু কিছু বিদেশীও বাস করে। সে ব্যক্তি বিদেশী যে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্রে বাস করে। সে উক্ত রাষ্ট্রের অধিবাসী মাত্র, নাগরিক নয়। সে নিজের রাষ্ট্রের নাগরিক কারণ, সে তার স্বদেশের প্রতি অনুগত। বাংলাদেশে যদি মায়ানমার থেকে কেউ এসে বসবাস করতে থাকে, তা হলে সে বিদেশী। মায়ানমার-এর প্রতি সে অনুগত এবং সে মায়ানমারেরই নাগরিক। তবে বিদেশী হলেও সে বাংলাদেশের সামাজিক অধিকার ভোগ করে এবং বাংলাদেশ তার রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর রাখে। কিন্তু সে মায়ানমারের নাগরিক এবং বাংলাদেশে বসবাসকারীকে বাংলাদেশের নাগরিকের মত স্থানীয় আইন-কানুন মানতে হয় এবং সরকারকে কর দিতে হয়।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য : বিদেশী ও নাগরিকদের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য বিদ্যমান, তা নিচে বর্ণিত হলো। **প্রথমত,** একটি রাষ্ট্রের নাগরিক স্বীয় রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী, কিন্তু একজন বিদেশী যে দেশে বাস করে সে দেশের নাগরিক নয়, সে সেই দেশে বিদেশী বলে পরিচিত। বিদেশীরা সে দেশের অস্থায়ী অধিবাসী। কিন্তু নাগরিক একজন স্থায়ী অধিবাসী এবং রাষ্ট্রের সদস্য।

দ্বিতীয়ত, একজন বিদেশী যে দেশে বাস করে,সে সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে না। সে আনুগত্য স্বীকার করে তার নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। কিন্তু একজন নাগরিক স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং স্বীয় রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী। নাগরিকগণ জরুরী সময়ে সৈন্য বিভাগে যোগদানে বাধ্য, কোন বিদেশীকে সৈন্য বিভাগে যোগদানে বাধ্য করা যায় না।

তৃতীয়ত, একজন নাগরিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার অধিকারী। কিন্তু একজন বিদেশী শুধু সামাজিক অধিকার ভোগের অধিকারী হয়। সে ভোটাধিকার এবং সরকারি পদ লাভের অধিকার প্রভৃতি ভোগ করতে পারে না। কিন্তু সামাজিক অধিকার ভোগ করে।

চতুর্থত, একজন নাগরিক রাষ্ট্রের মধ্যে এবং যখন বিদেশে যায় তখনও স্বীয় রাষ্ট্রের আশ্রয় এবং সাহায্যের অধিকারী। কিন্তু একজন বিদেশী যে দেশে যায় এবং বাস করে, কেবল সে দেশের মধ্যে আশ্রয় ও সাহায্য লাভের অধিকারী। কিন্তু যখন সে অন্যদেশে গিয়ে কোন বিপদে পড়ে, তখন কেবল তার নিজস্ব রাষ্ট্রের নিকট সাহায্যের দাবি করতে পারে। যে দেশে সে অস্থায়িভাবে বাস করেছে, সে দেশের নিকট কোন সাহায্য দাবি করতে পারে না।

তাছাড়া, বিদেশীর উপর সময়ে সময়ে কোন কোন দেশে বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়; যেমন, কোন দেশে বিদেশীকে থানায় নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। আবার কোন কোন দেশে কোন স্থাবর সম্পত্তি লাভের অধিকার দেয়া হয় না, অথবা কোন দেশে কিছুদিনের মধ্যে বিদেশীদের দেশ ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়।

নাগরিকও নয়, বিদেশীও নয় এমন লোক থাকাও কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। যারা দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করতে করতে স্বীয় রাষ্ট্রের সদস্যপদ হারিয়েছে অথচ বিদেশী রাষ্ট্রেরও সদস্যপদ লাভে সমর্থ হয় নি, এ প্রকার লোক রাষ্ট্রহীন। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম এবং তা খুব কম সময়ের জন্যই সম্ভব।

নাগরিক দু প্রকারের হতে পারে। **প্রথমত, জন্মসূত্রে** (natural) **নাগরিক। দ্বিতীয়ত, অনুমোদিত** (naturalised) **নাগরিক।** সাধারণত দু প্রকার নাগরিকগণের অধিকার একই ধরনের হয়। উভয় গোষ্ঠীই

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং রাজনৈতিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে হলে তাকে জন্মসূত্রে নাগরিক হতে হবে। অনুমোদিত নাগরিকগণ সাধারণত বিভিন্ন কারণে স্বীয় রাষ্ট্র ছেড়ে অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করতে থাকে এবং সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করে। তারা রাষ্ট্রের আইন মোতাবেক নাগরিকত্ব লাভ করে।

নাগরিক হবার বিভিন্ন পদ্ধতি

Various Methods of Acquiring Citizenship

দুটি মূলনীতি দ্বারা জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। এ দুটি নীতি হলো : **(১) জন্মনীতি** (Jus Sanguinis) এবং **(২) জন্মস্থান নীতি** (Jus soli or Jus loci)।

জন্মনীতি (Jus Sanguinis) : এই জন্মনীতি অনুসরণ করে প্রাচীনকালে গ্রীক, রোমান ও জার্মানরা নাগরিকত্ব নির্ধারণ করত। বর্তমানে ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহে এ নীতি অনুসরণ করা হয়। এ নীতি অনুসারে সন্তান-সন্ততির নাগরিকতা তাদের পিতামাতার নাগরিকত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে কোন্ শিশু কোন্ রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করল তা বড় কথা নয়,সে কোন পিতামাতার সন্তান তাই বিবেচ্য। ফ্রান্সের কোন দম্পতির যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে চীন বা রাশিয়ায়, তবে এ নীতি অনুসারে সে সন্তান ফ্রান্সের নাগরিক হবার অধিকারী। জাপান স্থানগত নীতি স্বীকার করে না। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে French Nationality Code অনুসারে ফ্রান্সের এই নীতির ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয়। রক্তের সম্বন্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই নীতি অতি প্রাচীন।

জন্মস্থান নীতি (Jus soli) : আমেরিকা ও ভারতে সাধারণত জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয়। এই নীতি অনুসারে সন্তান-সন্ততির নাগরিকতা তার জন্মস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ শিশু যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, তার পিতামাতা যে রাষ্ট্রের হোক না কেন, স্থানগতভাবে শিশু নাগরিকত্ব লাভ করে। রাষ্ট্রের পতাকা সংবলিত জাহাজ রাষ্ট্রের অংশরূপে বিবেচিত হয় অর্থাৎ জন্মস্থান নীতি অনুসারে আমেরিকার পতাকাবাহী কোন জাহাজে যদি কোন দম্পতির সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে শিশু আমেরিকার নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে এই আইন কূটনৈতিক বিভাগের কোন কর্মচারীর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না। সামন্ততন্ত্রের যুগে ভূ-খণ্ডের গুরুত্ব অনুসারে এই নীতি জন্মলাভ করে। ইংল্যাণ্ড সুবিধা বুঝে দু নীতিই গ্রহণ করে।

তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হবার ফলে কখনও কখনও নাগরিকতা নির্ণয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। যদি এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় যে, কোন ফরাসি দম্পতি আমেরিকায় বেড়াতে গিয়ে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন, তাহলে দু-দেশে অনুসৃত দু-প্রকার নীতির ফলে সে বেচারা শিশুটি ফ্রান্সেরও নাগরিক হলো জন্মসূত্রে এবং আমেরিকারও নাগরিক হলো জন্মস্থান নীতির ফলে। কিন্তু কোন লোক এক সাথে ফরাসি ও আমেরিকান হতে পারে না। তাই আন্তর্জাতিক আইন এবং বিভিন্ন দেশের পৌর আইনের বিধান অনুসারে ছেলেটির বয়স আঠারো হলে তাকে নাগরিকতা নির্বাচনের স্বাধীনতা দেয়া হয়। তাছাড়া, স্বামী-স্ত্রীর নাগরিকতা বিভ্রাটও দেখা যায়। তবে সাধারণ ভাবে স্ত্রীকে স্বামীর দেশের নাগরিক বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু কোন আমেরিকান নারী বিদেশীকে বিবাহ করেও আমেরিকান নাগরিক থাকতে পারে।

অনুমোদিত নাগরিকত্ব লাভ (Naturalisation) : জন্মসূত্র বাদ দিয়েও কোন রাষ্ট্রে আইনানুমোদিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়। এ পদ্ধতিকে অনুমোদন পদ্ধতি (Naturalisation)

বলা হয়। অধ্যাপক গার্নার বলেন, "ব্যাপক অর্থে নাগরিকত্বের অনুমোদন বলতে যে কোনভাবে কোন বিদেশীর নাগরিকত্ব অর্পণকে বুঝায়" ("Naturalisation in the widest sense includes bestowal of citizenship on an alien in any manner whatsever")। এ ব্যাপক অর্থে ছয় প্রকার পদ্ধতি দ্বারা নাগরিকত্বের অনুমোদন করতে হয়; যথা—**(১) বিবাহ-স্ত্রী স্বামীর নাগরিকতা গ্রহণ করতে পারে; (২) বৈধকরণ–অবৈধ সন্তান-সন্ততি মাতা বা পিতার নাগরিকতা লাভ করতে পারে; অন্যদিকে, কেউ অবৈধভাবে কোন রাষ্ট্রে গমন করলে সেই রাষ্ট্রের অনুমতি লাভ করে বৈধভাবে সে দেশের নাগরিক হতে পারে; (৩) ইচ্ছা প্রকাশ, (৪) বাসস্থান নির্মাণ বা গ্রহণ, (৫) সরকারি কাজে নিয়োগ, এবং (৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরি দান।**

কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি দান ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। কোন বিদেশী যদি কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকতার জন্য আবেদন করে তাহলে কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ সে আবেদন মঞ্জুর করে নাগরিকতা দান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে নাগরিকতা মঞ্জুর করার পূর্বে কর্তৃপক্ষ কতকগুলো শর্ত আরোপ করতে পারেন, যথা–রাষ্ট্রের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসবাস, যেমন—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কমপক্ষে ৫ বছর বসবাস; বাংলাদেশে অন্ততঃপক্ষে আঠারো মাস বসবাস; আবেদনের সময় আনুগত্যের শপথ, উন্নতমানের নৈতিক চরিত্রের প্রমাণাদি, রাষ্ট্রে প্রচলিত ভাষাসমূহের সাথে পরিচিতির প্রমাণ ইত্যাদি শর্ত প্রতিপালিত হলে মঞ্জুরি দান করা হয়।

পুনরুদ্ধারের (Resumption) মাধ্যমে নাগরিকতা পাওয়া যায়। যদি কেউ দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারায়, তাহলে আবার কতকগুলো শর্ত পালনের পর নাগরিকতা ফেরত পেতে পারে। তাছাড়া কোন রাষ্ট্র যদি অপর কোন রাষ্ট্রের কিছু অংশ দখল করে অথবা আইনগতভাবে কিছু অংশ তার দখলে আসে, তাহলে ঐ অংশের অধিবাসীবৃন্দ উক্ত দখলকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যায়।

নাগরিকতার বিলোপ
Loss of Citizenship

যেমন কতকগুলো শর্ত পালনের পর নাগরিকতা লাভ করা যায় তেমনি কতকগুলো কারণে নাগরিকতার বিলোপ ঘটে।

প্রথমত, স্বেচ্ছায় অনেকে এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার জন্য আবেদন করে। অন্য রাষ্ট্রে সে যখন নাগরিক হয় তখন তার স্বীয় রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লোপ পায়।

দ্বিতীয়ত, সৈন্যদল থেকে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদি কেউ পলায়ন করে তাহলে তাকে রাষ্ট্রের নাগরিকতার অধিকার থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

তৃতীয়ত, কোন রাষ্ট্রে পৌর আইনের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ অপর রাষ্ট্রে চাকরি গ্রহণ করে তাহলে তাকে নাগরিকতা হারাতে হয়।

চতুর্থত, কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন—পর্তুগাল বা বলিভিয়ায়, যদি কোন নাগরিক অন্য কোন রাষ্ট্র কর্তৃক কোন উপাধি গ্রহণ করে, তাহলে তার নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়।

পঞ্চমত, কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন–জার্মানি ও ফ্রান্সে, যদি কেউ রাষ্ট্র থেকে একাদিক্রমে দশ বছর বিদেশে বাস করে, তাহলে তার নাগরিকত্ব অবলুপ্ত হতে পারে।

ষষ্ঠত, অনেক দেশেই এই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, সে দেশে কোন নারী যদি অন্য দেশের কোন পুরুষকে বিবাহ করে তবে তাকে তার স্বামীর দেশের নাগরিক হতে হবে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম রয়েছে।

তাছাড়াও কোন কোন দেশে সে দেশের পৌর আইনের বিধান মোতাবেক কেউ কেউ নাগরিকতা হারাতে পারে; যেমন—কোন ভয়ঙ্কর রকমের অন্যায় কার্য সাধন করলে অথবা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে লিপ্ত হলে।

সপ্তমত, আবার কোন রাষ্ট্রের কোন অংশ যদি অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট আইনসঙ্গতভাবে হস্তান্তর করা হয় বা জোরপূর্বক দখলকৃত হয়, তাহলে সে অংশের জনসমূহ সে রাষ্ট্রের নাগরিক হবে।

বাংলাদেশে নাগরিকতা ঃ এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপ্রধানের এক শাসনতান্ত্রিক ঘোষণায় বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত যে সব আইন প্রচলিত ছিল, তা সরকারের নির্দেশে বাতিল ঘোষিত না হয়ে থাকলে তা চালু আছে বলে ধরতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিক প্রসঙ্গেও তা প্রযোজ্য। সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের নাগরিকতার শর্তাবলি নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৫১ সালের আইন অনুযায়ী। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে বাংলাদেশের কোন নাগরিক অন্য দেশে চলে গেলেও তিনি বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবেন, যদি তিনি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে দেশ ত্যাগ না করে থাকেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানেও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী জন্মপ্রথা, উত্তরাধিকার সূত্রে আগমন, বিবাহ ও অনুমোদন সিদ্ধান্ত প্রভৃতি শর্ত পালন করে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করতে হবে।

প্রথমত, কোন ব্যক্তি বা তার মাতা-পিতা বা পিতামহ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করলে এবং সে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পরে অন্য কোন রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা না হলে সে বাংলাদেশের নাগরিক হবে।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন ব্যক্তি বা তার মাতা-পিতা বা পিতামহ এমন কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করে, যা ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যার স্থায়ী বাসস্থান বাংলাদেশে তাহলে সে বা তারা বাংলাদেশের নাগরিক হবে।

তৃতীয়ত, স্ত্রীলোকদের তাদের নিজেদের নাগরিকতা বজায় রাখার বা বাঙালীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভের স্বাধীনতা রয়েছে।

১৯৫১ সালের আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত পন্থায় অনুমোদিত নাগরিকতা অর্জন করা যায় ঃ (এক) উত্তরাধিকার সূত্রে; **(দুই)** দেশে আগমন ও স্থায়িভাবে বসবাস; **(তিন)** বিবাহ, **(চার)** শাসন বিভাগ থেকে স্বীকৃতি লাভ।

কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলাদেশে সম্পত্তি লাভ করলে এবং বাংলাদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করলে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। কোন রাষ্ট্র থেকে আগমন করে অন্ততঃপক্ষে এক বছর ছয় মাস বাস করে কেউ নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করলে সরকার তাকে নাগরিকতা দান করতে পারে। বিবাহের মাধ্যমেও অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করতে পারে।

বাংলাদেশে জন্মসূত্রে নাগরিক ও অনুমোদিত নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হয় না।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ৬নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকতা (Citizenship in a Federal State) ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যুগ্ম-নাগরিকতার প্রচলনও দেখা যায়। এক ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের এবং অংগ রাজ্যেরও নাগরিক হতে হয়। কিন্তু সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতাকেই মুখ্য বলে ধরা হয়।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডেও অধিবাসীদের প্রথমে একটি ক্যান্টনের নাগরিক হতে হয় এবং তাহলে তারা আপনা-আপনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। আমেরিকায় **প্রথমত,** কোন রাজ্যে বাস করে তারপর যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতার জন্য আবেদন করতে হয়। তবে কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে একই নাগরিকতা প্রচলিত আছে, যেমন-প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়াতে যে কোন ইউনিয়ন রিপাবলিকের নাগরিক সোভিয়েত রাশিয়ার নাগরিক হত।

সুনাগরিকের গুণাবলি (Qualities of a Good Citizen) : সুনাগরিক হতে হলে প্রত্যেককে কতকগুলো গুণের চর্চা করতে হবে। ভাল শিল্পী হতে হলে যেমন অনুশীলন এবং উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, তেমনি সুনাগরিক হতে হলে শিল্পীর মন নিয়ে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হতে হবে। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, সুনাগরিক হতে চাইলে প্রত্যেককে **বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক বিচার**-এ তিনটি গুণের অধিকারী হতে হবে। অধ্যাপক হোয়াইটও (White) বলেছেন, প্রত্যেক সুনাগরিক **সাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও কর্তব্যবোধ**-এ তিন গুণে ভূষিত ব্যক্তি। সুতরাং এ তিন প্রকারের গুণ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকের চরিত্রবল ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর। জনকল্যাণকর বহু কার্য বিফল হয়ে যায়, যদি নাগরিকগণ কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ না হয় এবং যদি তাদের নৈতিক মান উন্নত না হয়। সুতরাং সুনাগরিকের গুণাবলির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

বুদ্ধি (Intelligence) : আধুনিক রাষ্ট্রকে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়। জীবন সমস্যা ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে। কিন্তু আধুনিককালে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা সার্থক হতে পারে তখনই যখন রাষ্ট্রের অধিকাংশ সদস্য বুদ্ধিমান হয়। কারণ আইন পরিষদে উপযুক্ত লোক নির্বাচন না করলে উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন সম্ভব হবে না। ভোটাধিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে ব্যবহার করে আইন-পরিষদের মান উন্নয়ন করতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব করে তুলতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে বুদ্ধিমান হতে হবে, সরকারি কাজকর্ম ও নীতির গুণাগুণ ও সফলতা বিচারে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তাই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যত বেশি উন্নত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে পারবে, সরকার ততই সফলতা অর্জন করবে। অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহ বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার মূল কারণ নাগরিকদের নিম্নমানের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের অনুশীলন।

আত্মসংযম (Self Control) : আত্মসংযম চর্চা করা প্রত্যেক নাগরিকের বিশিষ্ট গুণ। সরকারের আনুগত্য স্বীকার ও বিভিন্ন কর্ম এবং নীতিকে মান্য করার মনোভাব ব্যতীত কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। তাছাড়া সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে দেখার মনোভাব এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা নাগরিক জীবনে অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এ সব তখনই সম্ভব যখন নাগরিকগণ আত্মসংযম আয়ত্ত করতে পারে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সংস্থাকে সফল করে তুলতে হলে সংখ্যাগুরু দলের মতকে সংযমের সাথে গ্রহণ করতে হবে। কোন অমিল দেখা দিলে তা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ করে উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু সকলের জন্য চাই আত্মসংযম। যতদিন তা দূরীকরণ সম্ভব না হয়, ততদিন তা মেনে চলতে হবে। নতুবা গণতন্ত্রের কবর রচিত হবে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু দল যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, এবং যতই নগণ্য হোক না কেন, তাদের বক্তব্যও শুনতে হবে। কথায় আছে, 'সংখ্যাগুরু দলকে মানতে হবে বই কি। কিন্তু সংখ্যালঘুদের মর্যাদাও দিতে হবে ('majority must be granted, but minority should be respected')। গণতন্ত্রের মূলকথা সহযোগিতা, মিলন এবং সহানুভূতি। কিন্তু সবকিছুই বালির বাঁধের মত ধসে যায় যদি আত্মসংযমের দ্বারা তা প্রতিহত না করা যায়।

বিবেক (Conscience) ঃ প্রত্যেক নাগরিককে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এ সব গুণ তাকে দায়িত্ববোধের এবং সমাজ-সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করবে। সততা ও সেবার মনোভাব ব্যতীত দেশের বর্তমান পর্যায়ে কোন সরকারের পক্ষে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। উল্লিখিত গুণাবলি নাগরিককে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুক, সততা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করুক এবং সেবার ব্রত গ্রহণে আগ্রহী করে তুলুক। কিন্তু সাথে সাথে আরও কয়েকটি বিষয়ে তাদের মনোযোগ হতে হবে।

প্রথমত, প্রত্যেককে শিক্ষিত হতে হবে। তাছাড়া, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যাতে মানসিক গুণগুলোর বিকাশে সহায়তা করতে সক্ষম হয় এবং জাতীয় কৃষ্টি ও নীতিবোধের প্রতিফলন করতে সক্ষম হয়, তার প্রতিও লক্ষ্য করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেককে দেশের শাসনব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে হবে এবং কিভাবে শাসন চলছে তা জানতে হবে। কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা চিহ্নিত করে সংশোধনে মনোযোগী হতে হবে।

তৃতীয়ত, যেখানে কোন অসাধু পথ, অন্যায় বা অবিচার নজরে পড়ে, সেখানে জনমত সংগঠন করে তা নির্মূল করতে উদ্যোগী হতে হবে। কারণ, সচেতনতা ও সজাগ দৃষ্টিকোণই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

সর্বোপরি, রাষ্ট্র ও সরকারের কাজকে নিজের মনে করে প্রত্যেক কাজকে সফল ও সার্থক করে তোলার মনোভাব তৈরী করতে হবে। দক্ষ ও সাধু ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করে আইন-পরিষদ ও শাসনতন্ত্রকে অধিকতর কার্যক্ষম করার প্রয়াস গ্রহণ অপরিহার্য।

সুনাগরিকতার অন্তরায়
Hindrances to Good Citizenship

সুনাগরিকতা গঠনের পথে কতকগুলো অন্তরায় রয়েছে। লর্ড ব্রাইস তিনটি প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো—(১) **অলসতা** (Indolence), (২) **স্বার্থপরতা** (Self-Interest), এবং (৩) **দলীয় মনোবৃত্তি** (Party Spirit)। এর সাথে আরও কয়েকটি উল্লেখ করা চলে। যেমন—**অজ্ঞতা, আত্মম্ভরিতা এবং সাম্প্রদায়িকতা।** নাগরিক জীবনের জন্য এ গুলো কঠিন পীড়াস্বরূপ—ক্ষয়রোগতুল্য, যা ভেতর থেকে জাতীয় জীবনকে অন্তসারশুন্য করে তোলে। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

অলসতা (Indolence) ঃ একজন নাগরিক মনে করে যে, কোটির মধ্যে সে একা। সুতরাং করার কিইবা আছে তার? অতএব, সরকারি কার্যাবলি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত এবং উদাসীন। ফলে এই আলস্যের সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ এগিয়ে আসে এবং কাজের নামে অনেক অকাজ ও কুকাজ করে জনস্বার্থের ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি করে। অথচ সুনাগরিক হতে হলে তাকে বুদ্ধিমত্তা, সতর্কতা এবং সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তারা বেশি মাথা ঘামায় না। অনেকে ভোটদান থেকে বিরত থাকে। অনেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যাপারেও উদাসীন থাকে। এর কারণ হিসেবে অবশ্য অনেক জিনিসই ভাবতে হয়। **প্রথমত,** রাষ্ট্রের আয়তন বিরাট বলে এবং জনসংখ্যা কোটি কোটি হওয়াতে প্রত্যেকে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করে। **দ্বিতীয়ত,** সরকারি কর্মচারীদের মনোভাবও অনেকটা জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রয়াস পায়। **তৃতীয়ত,** আজকাল লোকেরা কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে অধিক উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করছে। ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক কর্তব্যে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়ছে।

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, স্বাধীনতার মূল্য চির সজাগতা। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদাসীনতার ব্যাপক প্রসার ঘটলে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তদুপরি তা শাসকবর্গ ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দকে স্বেচ্ছাচারি করে তোলে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, "যখন রাজনৈতিক চেতনা সুপ্ত হয় তখন স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হয়।"

স্বার্থপরতা (Self-Interest) : স্বার্থপরতা সুনাগরিকত্বের পথে আর একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সমাজ জীবনকে দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত করে। স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য নাগরিকগণ দুর্নীতির প্রশ্রয় নেয় এবং সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে বিসর্জন দেয়। নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে ঘুষ দিয়ে, রাজ কর্মচারীরা ও মন্ত্রিরা অনেক সময় চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে সমর্থকদের উপকৃত করে, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার প্রভৃতি অন্যায় কাজের প্রশ্রয় দিয়ে সমাজ জীবনে ক্লেদ ও কলুষ ছড়িয়ে দেয়। ফলে অনেক সময় সৎ, কর্মক্ষম ও উত্তম লোকদের দাবি অগ্রাহ্য করে অসৎ অকর্মণ্য লোকদিগকে গদীনসীন করে রাষ্ট্রীয় কাজের মান অবনত করা হয়। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থের দুষ্টগ্রহ সমাজে দৌরাত্ম্য করে ফেরে। কিন্তু সুনাগরিক হতে হলে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে যেন ব্যক্তিগত ব্যাপার সামগ্রিক ব্যাপারকে স্পর্শ করতে না পারে এবং জাতীয় স্বার্থ যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের নিকট বলী না হয়।

দলীয় মনোভাব (Party Spirit) : গণতান্ত্রিক সরকারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। কিন্তু এর কুফল সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এর দুষ্টপ্রভাব রাজনৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করে দিতে পারে। রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব সময় সুস্থ থাকে না। তাছাড়া, উপদলীয় (factional) কোন্দল এবং কুচক্রী দলের (clique) সৃষ্টি এ ক্ষেত্রে বিষবৎ। তারা জাতীয় প্রশ্নগুলোকে দলীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে থাকে। এরূপ বিকৃত মনোভাব স্বাধীন এবং সুস্থ চিন্তার পরিপন্থী। শত্রুতা, তিক্ততা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় স্বার্থ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের নিকট অসহায় হয়ে পড়ে।

অজ্ঞতা (Ignorance) : অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতা সুনাগরিকের পথে আর একটি বড় প্রতিবন্ধক। অজ্ঞ লোক কোনদিন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। সে স্বীয় অধিকারও সংরক্ষণ করতে অক্ষম। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে সে অপারগ। এ সত্য অনুধাবন করে মনীষী প্লেটো গণতন্ত্রকে "অজ্ঞ ও নির্বোধগণের শাসন" ("government of the fools") বলে উল্লেখ করেন।

আত্মম্ভরিতা (Self-Conceit) : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শেষ পর্যায়ে সংখ্যাগুরুর শাসন বলা হয়। সুতরাং এর সফলতার জন্য নাগরিকগণের পক্ষ থেকে এমন ধরনের মনোভাব প্রয়োজন, যা প্রয়োজনবোধে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও সহযোগিতাই এর কার্যকারিতার প্রধান শর্ত। কিন্তু আত্মম্ভরিতা এসব গুণকে অস্বীকার করে এবং নাগরিকতা বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে পড়ে। কোন কোন সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও ক্ষমতামত্তয়ী হয়ে ওঠে।

সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) : কোন কোন রাষ্ট্রে সামাজিক পরিবেশে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক পীড়ন, জাতিভেদ প্রথা ও অসাম্য সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সুনাগরিক হতে হলে স্বাধীন চিন্তাধারা এবং স্বাধীনভাবে মতবাদ প্রকাশের সুযোগ থাকতে হবে। তা না হলে চিন্তাক্ষেত্রের দৈন্যে নাগরিকগণ পীড়িত হতে থাকবে এবং ধর্মান্ধ হয়ে মিথ্যা প্রচারে মত্ত হয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থকে নস্যাৎ করতে থাকবে।

উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীভূত করে সামাজিক পরিবেশকে এমন উন্নত করে তুলতে হবে, যেখানে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থরূপে লক্ষ্য করতে অনুপ্রাণিত হবে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে জাতীয় কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে। এর জন্য জনসমূহকে চিন্তা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এবং আত্মোপলব্ধি দ্বারা বৃহত্তর স্বার্থকে সর্বাগ্রে আসন দিতে হবে। রাষ্ট্রকেও সুচারু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং অবিলম্বে সুশিক্ষা বিস্তারের দ্বারা জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং সকলকে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনার অবকাশ দিয়ে জনকল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

১। নাগরিক কারা ? নাগরিক ও বিদেশীদের মধ্যে তফাত কী ? (Who are the citizens? Distinguish between a citizen and an alien?)

২। নাগরিকত্ব অর্জনের বিভিন্ন পন্থা কী কী? নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয় কিভাবে ? (What are the different methods for acquiring citizenship? How is it lost?)

৩। নাগরিকের কী কী গুণ থাকা দরকার? (What are the qualities that are necessary for being a good citizen?)

৪। সুনাগরিকত্বের অন্তরায় কী কী? কিভাবে তা দূরীভূত করা যায়? (What are the hindrances to good citizenship? How can these be removed?)

৫। তুমি কী একজন নাগরিক? সুনাগরিক হতে হলে তোমার কী কী গুণের দরকার? (Are you a citizen? What qualities should you have to become a good citizen?)

স্বাধীনতা কী
What is Liberty

স্বাধীনতার জয়গানে বিশ্বসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। যুগে যুগে স্বাধীনতা মানুষের কর্মে, চিন্তায় এবং ধ্যানে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং মানুষকে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু এর স্বরূপ কি ?

শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় স্ব-অধীনতা। এর অর্থ, পরের বা বাইরের কোন অধীনতা তাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণবিহীন অবাধ স্বাধীনতা যা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় না। তা সমাজে অচল এবং অবাস্তব। সমাজে বাস করতে হলে নিজে যে সুবিধা চাই, অপরেও যাতে অনুরূপ সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে তা আমাকে লক্ষ্য করতে হবে। প্রত্যেকে যদি অবাধ এবং সীমাহীন স্বাধীনতা চায়, তা হলে একের ইচ্ছার সাথে অপরের ইচ্ছার বিরোধ ঘটবে এবং জোরের নীতি অনুসৃত হবে। ফলে এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দুর্বলের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আমি আমার ধন, প্রাণ, মানসম্মান প্রভৃতি রক্ষা করতে চাইলে সমাজে যাতে হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ বা উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকে, সে দিকেও নজর দিতে হবে। সুতরাং সকলের অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রত্যেকের কাজ-কর্ম কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। কোনদিন বাধা-বন্ধনহীন বেদুঈনের স্বাধীনতা কারো জীবনাদর্শ হতে পারে না। তা কোনদিন নদীর স্রোতের মত অবাধ গতিতে প্রবাহিত হতে পারে না। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা বলতে মানুষের সে সব অবাধ কাজকর্মকে বুঝি যা অন্যের অধিকার বা তদ্রূপ স্বাধীনতাকে খর্ব না করে সম্পন্ন করা সম্ভব**। এ অর্থে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সকলের কার্যের উপরে কতকগুলো বাধানিষেধ আরোপ করা অপরিহার্য।

স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমার অধিকার ভোগ ও স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা যেমন সমাজের পাঁচ জনের কর্তব্য, তেমনি আমার কাজকর্মের মধ্যে কারো স্বাধীনতা যাতে খর্ব না হয় এবং কারো অধিকার যাতে পদদলিত না হয় তাও লক্ষ্য করা আমার কর্তব্য। স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে আমেরিকান দার্শনিক ডিইয়ে (Dewey) বলেছেন, স্বাধীনতা যদি সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান কর্তৃক সংযত না হয়, তাহলে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয় এবং দায়িত্ব পালনের সময় স্বাধীনতার কথা বিস্মৃত হলে স্বৈরাচারী শক্তির উৎপত্তি হয়।

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, স্বাধীনতাকে বাস্তবমুখী করতে হলে এবং তাকে সামাজিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করলে কোন্ কোন্ বাধা-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা সম্পর্কে মিল

স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতা জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) স্বাধীনতার উপরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা *'স্বাধীনতা প্রসঙ্গে' (On Liberty)* বলেছেন, অপরের স্বাধীনতার উপর ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে হস্তক্ষেপ করা একটি মাত্র ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য এবং তা হলো আত্মরক্ষা। "কেবল অন্যের অনিষ্ট করা থেকে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রেই কোন সুসভ্য সমাজের সদস্যকে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। তার শারীরিক বা মানসিক উপকার হবে এ অজুহাতে তাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করানো উচিত নয়" ("The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. His own good either physical or moral, is not a sufficient warrant")। তিনি আরও বলেছেন, নিজের উপরে, নিজের দেহ এবং মনের উপরে ব্যক্তি সার্বভৌম' ('Over himself, his own body and mind individual is sovereign')। তিনি মানুষের কাজকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন—**আত্ম-সম্বন্ধীয়** (self-regarding) এবং **অপর-সম্বন্ধীয়** (other-regarding)। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত কাজের জন্য ব্যক্তি কারো নিকট দায়ী নয়। সে নিজের উপর সার্বভৌম। অপর-সম্বন্ধীয় কাজের জন্যই সে সমাজের নিকট জবাবদিহি করতে পারে। তাঁর মতে, কেউ যদি মদ খায়, তা হলে সমাজের পক্ষে তাকে জোর করে প্রতিনিবৃত্ত করা উচিত নয়, কেননা তাতে সমাজের কিছু আসে যায় না।

এর উত্তরে অবশ্য অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেছেন, মিলের বিভাগ বাস্তবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ "প্রত্যেক কাজই সামাজিক কাজ, এই অর্থে যে, আমি যা করি তার প্রতিক্রিয়া আমার উপর হয় সমাজের একজন সদস্য হিসেবে" ("All conduct is a social conduct in the sense that whatever I do has results upon me as a member of society")। সুতরাং প্রত্যেক কাজের উপরেই কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই। তিনি বলেন, "যে আইন আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে নির্দেশ দেয়, সে আইনে যুক্তিসঙ্গতভাবে আমি নিয়ন্ত্রিত হই" ("I am reasonably restrained when the law ordains that I must educate my children")। সুতরাং তাঁর মতে, ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণের ফলেও স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় না। এ ক্ষেত্রে যা বড় কথা তা এই যে, নিয়ন্ত্রণগুলো মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন করে কিনা। তাই তিনি স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, **স্বাধীনতা বলতে আমি সে পরিবেশের সাগ্রহ সংরক্ষণ বুঝি, যা দ্বারা মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সত্তা উপলব্ধি করার সুযোগ পায়"** ("By liberty I mean the eager maintenance of the atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves")। তিনি আরো বলেন, বাধা-নিষেধের অপসারণ স্বাধীনতার আর একটি দিক। যে সব কার্য ও সুযোগ-সুবিধা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরিহার্য, কেবল তার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ রহিত হওয়া দরকার। লাস্কি (Laski) বলেছেন, **"স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সে সব সামাজিক অবস্থার উপর থেকে বিধিনিষেধের অপসারণ যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরিহার্য।"** কিন্তু তাঁর মতে স্বাধীনতার নেতিবাচক (negative) দিক ছাড়া সদর্থক বা ইতিবাচক (positive) দিকটাই গুরুত্বপূর্ণ।

মিলের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বার্কার (Barker) যা বলেছেন তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "মিল শূন্যগর্ভ স্বাধীনতা এবং বাস্তববর্জিত ব্যক্তির প্রচারক ছিলেন" ("Mill was the prophet of an empty liberty and an abstract individual"), কেননা সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া হবে না, এমন কর্ম মানুষ করতে পারে না। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হলেই যে স্বাধীনতা নষ্ট হবে, এমন হতে পারে না। ঐতিহাসিক র‍্যামজে মূইর (Ramsay Muir) স্বাধীনতার যে ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ "স্বাধীনতা বলতে আমি ব্যক্তিদের দ্বারা এবং জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংস্থার দ্বারা

তাদের নিজের ভাবনা নিজে ভাবার এবং সে অনুসারে কাজ করার ক্ষমতার সুনিশ্চিত উপভোগ বুঝি। তারা আইনের ছত্র-ছায়ায় বসে নিজ নিজ শক্তি নিজের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যবহার করবে এবং অন্যের অনুরূপ ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করবে না" ("By liberty I mean the secure enjoyment by individuals and by natural and spontaneous groups of individuals, such as nation, church, trade union, of the power to think of their own thoughts and to express and act upon them using their own gifts in their own way under the shelter of the law, provided they do not impair the corresponding rights of others.")।

তবে এখানে এটি উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেকটি আইন নৈতিকতার মানদণ্ডে ভাল বলে প্রমাণিত নাও হতে পারে। সেখানে কি আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব ? লাস্কির মতে, স্বাধীনতার জন্য সে ক্ষেত্রে উক্ত আইন প্রতিরোধ প্রয়োজন। তিনি বলেন, "কদাচারের প্রতিরোধের সংগঠনই স্বাধীনতা" ("Liberty is the organization of resistance to abuse.")। তিনি থোরো'র (Thoreau) সাথে একমত হয়ে বলেছেন, সময়কালে সরকার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ব্যক্তির হাতে না থাকলে স্বাধীনতা কখনই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, "শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতাকে সচেতনভাবে এবং সংগঠিতরূপে প্রতিরোধের ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না" ("Liberty is nothing if it is not the organized and conscious power to resist in the last resort.")।

সুতরাং স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, **স্বাধীনতা হলো সামাজিক জীবনের তেমন পরিবেশ, যার ফলে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের সব রকম সুযোগ তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত অনায়াসে লাভ করে এবং কোনরূপ অন্যায়ের সম্মুখে সাহসের সাথে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করার মনোবল লাভ করে। নিয়ন্ত্রণ সমাজ-জীবনে থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু নিয়ন্ত্রণসমূহ ব্যক্তির নৈতিক উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।**

স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ
Forms of Liberty

সাধারণত স্বাধীনতাকে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করে উপলব্ধি করা হয় : (১) স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty), (২) সামাজিক স্বাধীনতা (Civil Liberty, (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty), (৪) জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty), এবং (৫) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)।

১। স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) : স্বাভাবিক স্বাধীনতা বলতে আমরা সে অবাধ স্বাধীনতা বুঝি, যা মানুষ রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক অবস্থায় (State of nature) ভোগ করত বলে মনে করা হয়। এ স্বাধীনতা একরূপ অলীক ও অবাস্তব, কেননা রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি ও আইনের অভাবে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। যা থাকে তা নিছক উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারিতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ স্বাধীনতার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। এ স্বাধীনতা শুধুমাত্র চুক্তিবাদী দার্শনিকগণের আলোচনায় পাওয়া যায়।

২। সামাজিক স্বাধীনতা (Civil Liberty) : সামাজিক স্বাধীনতা বলতে মানুষ সমাজ-জীবনে যে সব স্বাধীনতা ভোগ করে তাকে বুঝায়। জীবন রক্ষার অধিকার, ধন-সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, ধর্মের অধিকার,

চলাফেরার অধিকার প্রভৃতিকে সামাজিক স্বাধীনতার পর্যায়ে ফেলা হয়। এ সব সুযোগ–সুবিধা রাষ্ট্র জনসমূহের জন্য সংরক্ষণ করে এবং আইনের শাসন প্রবর্তন করে তাদের সমৃদ্ধি সাধন করা হয়।

৩। রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) ঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতায় মানুষ রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ভোটাধিকার, সরকারি পদ পাবার অধিকার, সকলকে সমালোচনা করার অধিকার এর আওতায় পড়ে। অধ্যাপক গেটেলের কথায়, "রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অংশগ্রহণের অধিকারকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়।"

৪। জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) ঃ জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ বৈদেশিক অধীনতা থেকে কোন জাতির মুক্তি। প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই এই স্বাধীনতা ভোগ করে। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।

৫। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) ঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আর্থিক ব্যাপারে জনসমূহের স্বাধীনতা বুঝায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অধ্যাপক লাস্কি বলেন, এ স্বাধীনতা প্রতিনিয়ত বেকারত্বের এবং আগামীকালের অভাব থেকে মুক্তি বুঝায়। দৈনিক রুটি–রুজি উপার্জনের সুযোগ–সুবিধা এবং নিশ্চয়তা বুঝায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত না হলে অন্যান্য অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর, সর্বদা বেকার হবার ভয়ে সন্ত্রস্ত, জীবনের সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ এবং বঞ্চিত তার নিকট সামাজিক স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা শুধুমাত্র অবসরের কবিতার লাইন।

এই শ্রেণী বিভাগকে বাদ দিয়ে অধ্যাপক লাস্কি নিম্নরূপে স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ করেছেন ঃ **(১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা** (Private Liberty), **(২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা** (Political Liberty), এবং **(৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** (Economic Liberty)। তিনি **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা** বলতে সে সব ব্যক্তিগত কাজ–কর্ম যেমন, ধর্মীয় স্বাধীনতা অথবা আত্মরক্ষামূলক কাজগুলো বুঝিয়েছেন, যার প্রভাব সমাজের অন্যত্র গভীরভাবে পড়ে না। **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** বলতে তিনি রাজনৈতিক কর্মগুলোকেই বুঝিয়েছেন, যার মাধ্যমে যে কেউ শাসন সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তিনি **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** বলতে বেকারত্ব ও ক্ষুধা থেকে মুক্তিকে বুঝিয়েছেন। যে সমাজে ভয়, ক্ষুধা, বেকারত্ব রয়েছে সে সমাজে কোন স্বাধীনতাই অর্থপূর্ণ নয়।

স্বাধীনতা ও অধিকার
Liberty and Rights

স্বাধীনতা ও অধিকার এক বস্তু না হলেও এরা একে অপরের সাথী। স্বাধীনতা সমাজ–জীবনের এক পরিবেশ যেখানে জনগণ অধিকার উপভোগ করতে পারে। স্বাধীনতা যেন এক ফলবান বৃক্ষ যার ফলস্বরূপ সব রকম অধিকার স্বীকৃত হয়। অবশ্য অধিকারকে অন্যভাবেও দেখা যায়। অধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীনতা গড়ে ওঠে। সমাজে অধিকার বোধ না থাকলে স্বাধীনতার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না। আবার অনেকের মতে, স্বাধীনতা ও অধিকার একই বস্তু। জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H. Cole) বলেছেন, বিনা বাধায় নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবার অধিকারের নামই স্বাধীনতা। তবে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা কিছুটা নেতিবাচক, কিন্তু অধিকার সর্বদা ইতিবাচক। স্বাধীনতা সর্বদা প্রশ্ন করে, কেন তা ঘটেছে, কেন তা মেনে চলবে, কেন অত বাধা ইত্যাদি। কিন্তু অধিকার সুযোগ–সুবিধার সমষ্টিগত নাম যা ব্যতীত সামাজিক পরিবেশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

স্বাধীনতা ও আইন

Liberty and Law

আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিতর্কমূলক জটিল বিষয় হলো স্বাধীনতার সাথে আইনের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ নির্ণয়। স্বাধীনতা বলতে সংক্ষেপে আমরা বুঝি সে আবশ্যকীয় পরিবেশ, যা মানুষের সত্তার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে। আর আইন বলতে বুঝি কতকগুলো আদেশ ও বিধি নিষেধকে। সুতরাং সে সনাতন প্রশ্ন—আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্বন্ধ কি ? আইন কি স্বাধীনতাকে সাহায্য করে, না কোন ব্যাঘাত ঘটায় ?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইনের প্রকৃতিকে দু' দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এ প্রশ্নের উত্তর দুভাবে দিয়েছেন। একদল বলেছেন, আইন স্বাধীনতার সংকোচন করে এবং আইনের অবস্থিতির অর্থ স্বাধীনতার ক্ষেত্র সংকোচন। তাঁদের মতে, প্রতিটি আইনই কিছু কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে। পূর্বে যা ছিল ইচ্ছাধীন, আইন হয় তা করতে আদেশ দেয়, না হয় নিষেধ করে। তাছাড়া যেহেতু আইনের অর্থই মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা, সে জন্য আইন বৃদ্ধির অনুপাতে স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়। তাই ব্যক্তিত্ববাদের অন্যতম চিন্তানায়ক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) তাঁর এক গ্রন্থে সমাজের অন্যায় দমন ছাড়া রাষ্ট্রের সব রকম কর্মকে নিন্দা করেছেন এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় স্বাধীনতা খর্বকারী রাষ্ট্রীয় কর্মগুলোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা কী প্রমাণ করি নি যে, সরকার মূলত নৈতিকতাবিরোধী ? এটা কী সত্য নয় যে, সরকার রয়েছে কারণ সমাজে এখনও অন্যায় আছে এবং যখন অন্যায় শেষ হয়ে যাবে, তখন সরকার নিশ্চিহ্ন হবে, কারণ তখন তার কার্যাবলির কোন ক্ষেত্র রইবে না" ("Have we not shown that the government is essentially immoral? Does it not exist because crime exists and must not government cease when crimes cease for very lack of objects on which to perform its functions?")।

ডাইসির (Dicey) মত মনীষীও বলেছেন, "একটি যদি বেশি হয় তা হলে অন্যটি কমে যাবে" ("The more there is of the one, the less there is of the other")। অন্য কথায়, যদি আইনের সংখ্যা বেশি হয়, তা হলে স্বাধীনতা কমে যেতে থাকবে। তাছাড়া, নৈরাজ্যবাদী (Anarchist) চিন্তাবিদগণ বলেন যে, আইন এবং রাষ্ট্র মানুষের স্বাধীনতায় অহেতুক হস্তক্ষেপ করে মানুষের জীবনকে পুঞ্জীভূত গ্লানিতে ভরে তুলে। সুতরাং সুষ্ঠু পরিচালনা ও স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্র এবং আইনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। আবার অন্যদিকে আর একদল লেখক, বিশেষত আদর্শবাদী লেখকগণ আইনকে স্বাধীনতার উৎস, স্বাধীনতার স্বরূপ এবং স্বাধীনতার দিগন্ত বিস্তৃতকারী কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র 'পরিপূর্ণ' 'বিবেক বিচার' (perfected rationality) এবং এর মাধ্যমেই মানুষ স্বাধীনতা এবং মুক্তির মহত্তর আস্বাদ লাভ করতে পারে। আইন রাষ্ট্রের বিবেক-বুদ্ধির প্রকাশ হিসেবে এবং ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার স্বরূপ হিসেবে স্বাধীনতাকে মহীয়ান করে তোলে এবং স্বাধীনতার দিগন্তকে বিস্তৃত করে মানুষকে তার মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়। সুতরাং আইন স্বাধীনতার দীপশিখা, দিশারী এবং উজ্জ্বল জ্যোতি।

কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত হলো ঃ উভয় মতবাদের সমন্বয়ে গঠিত যে মতবাদ তাই সঠিক। আইন ও স্বাধীনতার সম্বন্ধ স্থির হয় উভয় ভাবধারার মধ্যপথে। রাষ্ট্রকর্তৃক যে আইনসমূহ প্রণীত হয় তা ব্যক্তির স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে খর্ব করে। কিন্তু অপরদিকে তা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকেও সীমিত করে। আইন স্বাধীনতাকে নিম্নলিখিত তিন উপায়ে জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করে এবং তার পরিধিও বিস্তৃত করে।

প্রথমত, আইন প্রত্যেকের অধিকারের সীমা নির্দেশ করে একে অপরের গণ্ডীতে হানা দেয়া থেকে বিরত করে। এ জন্য বার্কার (Barker) বলেছেন, 'প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার দ্বারা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়' ('The need of liberty for each is necessarilly

qualified and conditioned by the need of liberty for all')। এই সম্বন্ধে উইলোবিও (Willoughby) বলেন, নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে। নিয়ন্ত্রণকে তুলে দিলে সমাজ হব্‌সের কল্পিত 'প্রকৃতির রাজ্যের' ন্যায় হবে যেখানে শক্তিমান লোক দুর্বলকে অত্যাচারে জর্জরিত করে তার সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। অধিকার এবং স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে কী না এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও এতে কোন মতবিরোধ নেই যে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেকের অধিকার সংরক্ষিত হয়। তাই আইনকে অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষক বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, আইন নাগরিকগণের আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির সুযোগ দান করে। স্বাধীনতা ও অধিকার ব্যতীত ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা মানসিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ভোগ করতে হলে রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং সমর্থিত হতে হবে। তাই রীচি (Ritchie) বলেছেন, "আত্মবিকাশের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা স্বাধীনতার স্বরূপে প্রকাশিত হয়, তাই আইন কর্তৃক সৃষ্ট, এবং রাষ্ট্রের কার্যের বাইরে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই" ("Liberty in the sense of positive opportunity for self development is the creation of law and not something that could exist apart from the action of state")। তাছাড়া, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত, কাজের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ, সাপ্তাহিক ছুটি, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ দিক দিয়ে আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক এবং সম্পূরক।

তৃতীয়ত, সংবিধানের দ্বারা বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক আইনের বিধান অনুযায়ী নাগরিকগণ তাদের অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং সরকারের অহেতুক আক্রমণ থেকে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে। আজকাল শাসনতন্ত্রে অধিকার নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হবার ফলে তা শাসনতান্ত্রিক বিধানের মর্যাদা লাভ করে এবং সরকার তার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যদি একান্তই করে তাহলে 'হেবিয়াস করপাস' বিধান মতে আবেদন করলে সরকার তা সংরক্ষণ করতে বাধ্য হবে। সুতরাং আইন স্বাধীনতা রক্ষার প্রকৃত হাতিয়ার।

এও উল্লেখযোগ্য যে, সব আইন যে স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে বা সংরক্ষণ করে তা নয়। কতকগুলো আইন স্বাধীনতার পক্ষে প্রীতিস্বরূপ এবং স্বাধীনতা খর্ব করে। কিন্তু জনমতের উপর ভিত্তি করে যদি আইন প্রণয়ন করা হয়, তবে তা স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা নেই। তাই লাস্কি (Laski) বলেছেন, "কোন বিধি-নিষেধ যদি আরোপিত হয়, তাহলে যাদের উপর তা প্রয়োগ করা হবে তাদের মতামতের উপর হওয়াই উচিত" ("It is essential to freedom that the prohibitions should be built upon the wills of those whom they affect")।

অধিকারের অর্থ
Meaning of Right

অধিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। সমাজ-জীবনের মূল প্রশ্নই অধিকারের প্রশ্ন। মানুষ সমাজে কতটুকু অধিকার পায়, কতটুকু পাওয়া উচিত, প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের মীমাংসার উপরই সমাজের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নির্ভর করে। অধিকারের সমস্যাবলি শুধু জাতীয় সমস্যা নয়, সামাজিক এবং তদূর্ধ্বে মানবিকও বটে। তাই প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের উচিত এ অধিকারগত বিষয়গুলো সাবধানে অনুধাবন করা।

প্রচলিত অর্থে অধিকার বলতে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যের ক্ষমতা বা দাবিকে বুঝায়। কিন্তু অধিকার বলতে নিছক দাবি বা ক্ষমতা বুঝায় না। দাবির প্রশ্নটি একান্ত সামাজিক। তা সামাজিক সচেতনতা থেকে উদ্ভূত। সমাজে অনেক লোক একত্রে বাস করে। সুতরাং "অধিকারের বিষয়টি সমাজের আর পাঁচ জনের দাবি বা ক্ষমতার সাথে জড়িত যা সর্বজনীন মঙ্গল আনয়নে সমর্থ"।

তাই এর সাথে নৈতিকতার প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জার্মানীর প্রখ্যাত দার্শনিক বলেন, "মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উপযুক্ত বিকাশ মানুষের সমাজেই সম্ভব" ("Man becomes man only among men")। সমাজে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তার কারণ মানুষ একজন হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন নৈতিক প্রাণী যা অপরের সাথে সম্পর্ক রেখে বেঁচে থাকে।

ক্ষমতা ও অধিকার
Power and Right

ক্ষমতা ও অধিকার এক নয়। ক্ষমতা এক প্রকার পাশবিক শক্তি। ক্ষমতা তখনই অধিকার পদবাচ্য হয় যখন সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক তার ব্যবহার স্বীকৃত এবং অনুমোদিত হয়। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র ক্ষমতাকে তখনই স্বীকার বা অনুমোদন করে, যখন তার ব্যবহার সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য হয়। তাই লাস্কি বলেছেন, "আমাদের অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা নিরপেক্ষ নয়, তা সমাজ ভিত্তিক। আমরা অধিকারের প্রয়োজন বোধ করি নিজেদের জন্য, সমাজ রক্ষার জন্য এবং সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য। আমরা অধিকার ভোগের অধিকারী হতে পারি কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে"। সুতরাং সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল কোন কাজ করার অধিকার আমাদের নেই।

রাষ্ট্র সমাজের কল্যাণ সাধনের শ্রেষ্ঠ সংস্থা। কিন্তু সমাজকল্যাণ সাধিত হয় তখনই যখন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কল্যাণের পথ নিজেরা অনুসরণ করে সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করে। **জনসমূহের ব্যক্তিত্ব বিকাশ না ঘটলে সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাই সমাজ জনগণকে তাদের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য সুযোগ দান করে। এ সব সুযোগ সুবিধার সমষ্টিই অধিকার।** লাস্কি বলেন, "অধিকার সমাজ জীবনের সে সব অবস্থা যা ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। ("Right in fact are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best.")। অধিকারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি আরও বলেছেন, "প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিত হয় তার প্রদত্ত অধিকার দ্বারা" ('Every state is known by the rights that it maintains')। আদর্শবাদী লেখক গ্রীন বলেছেন, "অধিকার সে সব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে" ("The outer conditions essential for a man's inner development")।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে হয় অধিকার **প্রথমত,** মানুষের সামাজিক চেতনাবোধ থেকে উদ্ভূত দাবি বা ক্ষমতা যা সমাজেই প্রযোজ্য। **দ্বিতীয়ত,** উক্ত দাবি বা ক্ষমতা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। **তৃতীয়ত,** অধিকারের লক্ষ্য সার্বজনীন কল্যাণ সাধন। **সর্বশেষে,** সেই দাবি বা ক্ষমতাসমূহ ব্যক্তিগত জীবনে সুযোগ-সুবিধা হিসেবে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য অপরিহার্য।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ
Classification of Rights

অধিকারসমূহকে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—**১। সামাজিক অধিকার** (Civil rights) **২। রাজনৈতিক অধিকার** (Political rights) এবং **৩। অর্থনৈতিক অধিকার** (Economic rights)।

১। সামাজিক অধিকার (Civil Rights) ঃ সামাজিক অধিকার বলতে সে প্রকারের অধিকারকে বুঝায়, যা সামাজিক জীবন যাপনের এবং জীবন সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। জীবন রক্ষার অধিকার, সম্পত্তি অধিকার, ধর্মের অধিকার প্রভৃতিকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। এ সব অধিকার উপভোগের দ্বারা মানুষ অন্যান্য দিকের উন্নতি সাধন ছাড়াও ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে সমর্থ হয়।

২। রাজনৈতিক অধিকার (**Political Rights**) **ঃ** রাজনীতি পরিচালনায় এবং শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার, রাষ্ট্রের কর্মচারী হবার অধিকারসমূহকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়।

৩। অর্থনৈতিক অধিকার (**Economic Rights**) **ঃ** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সুবিধা ও সুযোগকে অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। ক্ষুধা থেকে মুক্তি, চাকরি গ্রহণের সুযোগ, কর্মসংস্থান প্রভৃতিকে অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রয়োগের ফলে যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব, তেমনি অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ফলেই অর্থনৈতিক অধিকার উপভোগ সম্ভবপর হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না–যেমন, মত প্রকাশের অধিকার বা দল গঠনের অধিকার। এ সব অধিকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব পর্যায়েই অনুভব করা যায়। তাছাড়া, সব প্রকারের অধিকারসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। একে অন্যের শ্রীবৃদ্ধি করে। প্রত্যেক প্রকারের অধিকারের অর্থ নাগরিকগণের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদি সমাজে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়। একনায়কতন্ত্রে বা রাজতন্ত্রে উক্ত অধিকারগুলো অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সামাজিক অধিকারসমূহ

১। বাঁচার অধিকার (**Right to Live**) **ঃ** নিজ নিজ জীবন রক্ষার অধিকার সব অধিকারের মূল। প্রাণ রক্ষার নিশ্চয়তা না থাকলে অন্যান্য অধিকারের কোন অর্থ হয় না। তাই প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সরকার ব্যক্তির জীবনধারণের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখে। এমনকি গর্ভস্থ সন্তানের জীবন রক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। তাই ভ্রূণ হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়। জীবনকে নিয়ে যথেচ্ছা খেলা করাও চলে না। কেউ আত্মহত্যা করতে চাইলেও তা আইনত পারে না। এই নীতির একমাত্র ব্যতিক্রম হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড দান। তাও জীবন রক্ষার তাগিদে এবং বৃহত্তম স্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে তা করা হয়, কেননা হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড না দিলে সমাজে হত্যাকাণ্ড ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। অবশ্য এই আইনের বিরুদ্ধেও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মনীষীগণ জনমত গড়ে তুলছেন এবং প্রাণদণ্ডকে সভ্যযুগে বর্বরোচিত প্রথা বলে নিন্দা করেছেন। জীবন রক্ষার বেলায় সকলেরই অধিকার রয়েছে। এমনকি আত্মরক্ষায় অপরকে হত্যা করাও আইনত স্বাভাবিক বলে গৃহীত হয়েছে।

২। সম্পত্তির অধিকার (**Right to Property**) **ঃ** ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ভোগের স্বাধীনতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এ অধিকারকে স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সাম্যবাদী রাষ্ট্রসমূহে একে জাতীয়করণ করে উৎখাত করা হয়েছিল। সাম্যবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে "চুরির মাল" বলা হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে একে ব্যক্তিত্ব বিকাশের মহত্তম এবং সহজতম পন্থা বলে গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্তমানকালের একটি প্রধান বিতর্কমূলক বিষয়। তবে অধ্যাপক লাস্কি উভয় মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলতে চেয়েছেন, "সার্বজনীন কল্যাণে যে সম্পত্তি নিয়োজিত হয় এবং কর্তব্যের সাথে যার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা চলে।" তিনি বলেছেন, "আমার সে সম্পত্তির উপর অধিকার আছে, যা আমার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যক। যে সম্পত্তি আমার শ্রম দ্বারা অর্জিত নয় অথবা যা সমাজের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পাদনে আবশ্যকীয় নয় সে সম্পত্তির উপর আমার কোন অধিকার নেই।" তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক কোন রাষ্ট্রই সম্পত্তির উপর অধিকার অস্বীকার করে না।

৩। গতিবিধির অধিকার (**Right to Movement**) **ঃ** গতিবিধির অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতাকেই বুঝায়। গতিবিধির স্বাধীনতা যাতে কোনক্রমে খর্ব না হয়,

তার প্রতি প্রত্যেক সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা বা গ্রেফতার করা উচিত নয়। সরকার বা সরকারি কর্মচারিগণের দ্বারা কারো গতিবিধি যেন সঙ্কুচিত বা নিয়ন্ত্রিত না হয় তা লক্ষ্য করতে হবে। যুদ্ধের সময় যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় তখন সরকার সন্দেহের বশে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেন, যদিও মৌলিক অধিকার ঘোষণার শর্তানুযায়ী তাও অন্যায়। যদি কারো বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অভিযোগ আনা হয়, তবে সে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের নিকট ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করতে পারে। যতক্ষণ না সে আদালতের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে ধরতে হবে এবং তার উপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা অন্যায়। তাছাড়া, প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার, সুনাম ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষায় আইনের সাহায্য লাভ করতে পারে। মৌলিক অধিকারের ঘোষণায় প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নর-নারীর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিবাহ করে পরিবার গঠন করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

৪। সংঘবদ্ধ হবার অধিকার (Right to Associate) : নাগরিকগণের সংঘবদ্ধ হবার অধিকার, সংঘ গঠনের এবং জনসভা করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত যাতে তারা তাদের মতামত এবং আদর্শ সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ করতে পারে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সুতরাং নাগরিকগণ যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে মতামত প্রচার করতে পারে তার পূর্ণ অধিকার স্বীকার করতে হবে যেন রাজনৈতিক জীবন সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে। তবে যদি কোন সংঘ বা জনসমষ্টি শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইন ভঙ্গের প্রেরণা যোগায় রাষ্ট্র খুব জোর তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে তা না করাই শ্রেয়। শ্রমিকেরা মিল মালিকদের নিকট থেকে যাতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবি আদায় করতে পারে, প্রয়োজন হলে অনুমোদিত উপায়ে ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েও যদি সমর্থ হয় তাও স্বীকার করা উচিত। তবে নীতি বিরুদ্ধ, রুচি বিরোধী, প্রতিষ্ঠিত আইনের বিরুদ্ধে কোন প্রচারণা চলতে থাকলে সরকার তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সংঘবদ্ধ হবার অধিকার খর্ব করতে পারে।

৫। মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Speech) : মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। মানুষ কথা বলে বা সভায় বক্তৃতা করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। প্রবন্ধ লিখে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও মত প্রকাশ করতে পারে। এসব অধিকার খর্ব হওয়া উচিত নয়। মত প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতি সাধিত হয়েছে যুগে যুগে। যিনি কোন সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি সকলের নিকট তা প্রকাশ করলে পৃথিবী ও সমাজ উন্নত হয়। তবে যুগে যুগে এ সব কারণে মানুষকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু হলে কী হবে, সত্যের গলা টিপে মারা যায় না। আজ যা মিথ্যা মনে হয়, কাল তা সত্য হতে পারে। তাই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাছাড়া, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিগত উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক। অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে মতামতের বিরোধিতা কেবল মতামত দ্বারাই সম্ভবপর"। দার্শনিক মিলও বলেছেন, "মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার কুফল এই যে, তা মানব গোষ্ঠীকে লুণ্ঠন করে"। যদি কোন নাগরিক প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাকে ক্ষতিকর মনে করে, তাহলে তার সমালোচনার পূর্ণ অধিকার নাগরিকের রয়েছে।

৬। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (Freedom of Press) : মুদ্রাযন্ত্রের তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর স্তম্ভস্বরূপ। জনসাধারণ কি অভাব-অভিযোগ অনুভব করছে, শাসন বিভাগের বিধানসমূহ সন্তোষজনক কি না, কোথাও কোন ক্ষেত্রে কর্মচারীবৃন্দ ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন কি না, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হতে তা জানতে পারা যায়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মত ও চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য পূর্ণ বাক ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে। সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের আলোচনা না হলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। সংবাদপত্রের সমালোচনা ও মতামত সরকারের পক্ষে যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন তা প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। বক্তৃতা ও লেখার উপরও কোন রকম বাধানিষেধ (censor) থাকা উচিত নয়। সরকার যদি কারো কিছু বলার অধিকার স্বীকার না করেন, তা হলে অসন্তোষ গোপনে ছড়িয়ে পড়বে এবং অবশেষে তা বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করবে। সংবাদপত্রগুলোকে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আওতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

৭। **সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার (Right to Culture and Language) ঃ** প্রত্যেক নাগরিককে এবং প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার দান করতে হবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুই হোক বা জাতীয়তাভিত্তিক সংখ্যালঘুই হোক, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে এ সব বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

৮। **ধর্মের অধিকার (Right to Worship) ঃ** ধর্মের অধিকার একটি প্রধান সামাজিক অধিকার। প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা অনুসারে যাতে নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা উচিত। সরকারের পক্ষে কারো উপর ধর্ম চাপিয়ে দেয়া বা অন্য কোন ধর্ম চর্চা করতে বাধ্য করা উচিত নয়। অবশ্য বর্তমানে ধর্মের স্বাধীনতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে, যদিও কোন কোন রাষ্ট্রে ধর্মের নামে আজও দুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়াও চুক্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি অনেক সামাজিক অধিকার আছে, যা সমাজ জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

রাজনৈতিক অধিকারসমূহ
Political Rights

১। **নির্বাচনের অধিকার (Right to Election) ঃ** নির্বাচনের অধিকার বলতে ভোট দানের ও নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার বুঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এ অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। বর্তমানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত নয়। পরোক্ষ গণতন্ত্রে নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার জন্য তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং নির্বাচন প্রার্থী হয়। ভোটদানের অধিকারের মাধ্যমে জনগণ পছন্দমত সরকার গঠন ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise) প্রবর্তিত রয়েছে।

২। **সরকারি চাকরি লাভের অধিকার (Right to Govt. Service) ঃ** সরকারি চাকরি লাভের অধিকারও একটি মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার। এর মাধ্যমেও জনগণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। তবে এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে জনগণকে নিয়োগ করা হয়। প্রাচীন গ্রীসে যেমন ভাগ্যের উপর (lot) নির্ভর করে নাগরিকগণ নিযুক্ত হতেন, বর্তমানে কিন্তু তেমন পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয় না। তবে এ অধিকারের আসল তাৎপর্য ঐ যে, নাগরিকগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হতে পারবে।

৩। **আবেদন করার অধিকার (Right to Petition) ঃ** এ অধিকার অনেকটা সামাজিক অধিকারের ন্যায়। এর মূলকথা হলো, নাগরিক প্রয়োজনবোধে স্বীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এককভাবে অথবা যুক্তভাবে আবেদন করতে পারে। প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সংবাদপত্রের সাহায্যও গ্রহণ করতে পারে।

৪। **বিদেশে নিরাপত্তার অধিকার (Right to Safety when in Foreign lands) ঃ** প্রত্যেক নাগরিকেরই বিদেশে থাকাকালীন কোনরূপ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তথাকার সরকারের নিকট থেকে সুবিচার না পেলে স্বীয় রাষ্ট্রের নিকট থেকে সাহায্যের দাবি করার অধিকার রয়েছে। বিদেশী ও নাগরিকগণের পার্থক্য নির্দেশের ক্ষেত্রে তা নাগরিকত্বের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে গৃহীত হয়।

এ সব ছাড়াও **মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও সংঘ গঠনের অধিকারকেও** রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়।

অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ
Economic Rights

পরিবার পালনের, কর্মসংস্থানের, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবার এবং উপযুক্ত অবসর লাভের দাবিসমূহকে অর্থনৈতিক অধিকারের পর্যায়ে ফেলা হয়। অর্থনৈতিক অধিকারই অন্য সব অধিকারকে পূর্ণতা দান করে, কারণ, অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান না হলে স্বাধীনতা বা অধিকার নিছক কল্পনায় রূপ লাভ করে। পেট খালি থাকলে ভোটাধিকার অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। গরিব বেচারীর পক্ষে আইন পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই। আশ্রয়হীন পথচারীর নিকট দল গঠনের অধিকার পাগলামীর নামান্তর। আবার কোন কোন দেশে নাগরিকগণ কোন না কোন কাজের পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, কেননা ঐ সব দেশের নাগরিকগণের জীবনকে রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এ দু অবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান না করতে পারলে অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাস্তব হয়ে পড়ে। বই-কেতাবে এদের মহিমা কীর্তন হয়, বাস্তবে তার প্রয়োগ হয় না। কম্যুনিষ্ট দেশসমূহে জনসাধারণ অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করেছে সত্যই, কিন্তু রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই শুভঙ্করের ফাঁকির পাল্লায় পড়ে। পশ্চিমা গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আয়ত্তে এলেও প্রায় শতকরা ৪০ জনের ঝুলি শূন্য। তাই জাতিসংঘের মৌলিক অধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে প্রত্যেকের কাজ করার, নিজের ইচ্ছামত কাজ নেবার, ন্যায্য ও সঙ্গত পারিশ্রমিক লাভ করার অধিকার থাকা উচিত। তাছাড়া আরও কয়েকটি আর্থিক বিষয়ে, যেমন— নর ও নারী সমান কাজের জন্য যেন সমান বেতন পায়, ধনসম্পত্তি যেন গুটি কয়েক মুনাফাখোরের হাতে জমায়েত না হয়, রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ যেন জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়, জাতিসংঘ রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধানে এ সব বিষয় স্বীকৃতি লাভ করে নি এবং জনসমূহ এ দু-এর দোলায় দোল খাচ্ছে অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতার মধ্যে।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ
Fundamental Human Rights as Adopted by the U. N. O.

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সার্বজনীন মানবাধিকার গৃহীত ও ঘোষিত হয়। নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবাধিকারকে লক্ষ্য করে তদানীন্তন রাষ্ট্রনায়কগণ সাধারণভাবে মানবের মৌলিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের বাস্তবায়ন নির্ভর করে রাষ্ট্রসমূহের শুভেচ্ছা এবং আদর্শের উপরে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যকে এক ও অভিন্ন বলা হয়েছে। মানব সভ্যতাও অভিন্ন। মানুষ জন্মগ্রহণ করে স্বাধীনভাবে এবং সম মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে। তাই মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় ৩০টি অনুচ্ছেদের ২১টিতে মানবের অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়, ৭টি অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের বিষয় বর্ণনা করা হয় এবং ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদে কর্তব্যের নির্দেশ দেয়া হয়।[১] যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রসমূহ তা বাস্তবায়িত করে, ততদিন তা শুধুমাত্র ঘোষণাই থাকবে। তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে তাদের কয়েকটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

---

১. গাজী সামসুর রহমান, *মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার* ১৯৯৪

১ম দফা ঃ সব মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং অধিকার ও মর্যাদায় সকলেরই বিবেক ও বিবেচনা শক্তি আছে এবং কাজ-কর্মে তারা একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করবে।

২য় দফা ঃ এ ঘোষণায় যে সব অধিকার ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে, প্রত্যেকের সেগুলো থাকবে এবং এ ব্যাপারে বংশ, বর্ণ, নারীত্ব পুরুষত্ব, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পদ, জন্ম বা অন্য কোন কারণে মর্যাদার ভেদাভেদ হবে না।

অধিকন্তু, যে যে দেশে বাস করে, সে সে দেশের রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোন তারতম্য করা হবে না। সে দেশ স্বাধীন হোক, স্বায়ত্তশাসিত বা ক্ষমতাবিহীন অথবা সার্বভৌমিকতার যত ত্রুটিই থাকুক, এ সব অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে মানুষে মানুষে কোন তফাত থাকবে না।

৩য় দফা ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিষয়ের অধিকার থাকবে।

৪র্থ দফা ঃ কাউকে দাসত্বে বা গোলামিতে আবদ্ধ করা যাবে না, সে যে কোন আকারেই হোক। দাসত্ব এবং দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ।

৫ম দফা ঃ কারো উপর উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, অমানুষিক বা মানহানিকর ব্যবহার বা শাস্তি প্রদান করা চলবে না।

৬ষ্ঠ দফা ঃ আইনের সমক্ষে সকলে সর্বত্র সমান মর্যাদা পাবে।

৭ম দফা ঃ আইন বা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত কোন মৌলিক অধিকার অপরে ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে জাতীয় বিচারালয়সমূহে ফলপ্রসূ প্রতিকার পাওয়ার অধিকার সকলেরই থাকবে।

৮ম দফা ঃ খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারভাবে কাউকে ধৃত বা আটক করা কিংবা নির্বাসন দেয়া চলবে না।

৯ম দফা ঃ কারো গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহ, যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করা যাবে না কিংবা কারো মর্যাদা ও সুনামের ক্ষতি করা যাবে না। এরূপ হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় পাবার অধিকার সকলেরই থাকবে।

অধিকারের রক্ষাকবচ
Sefeguards of Right

অধিকার ঘোষণা করা যত সহজ, তা সংরক্ষণ করা তত সহজ নয়। তাই যুগে যুগে অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষমতার উপভোগ মানুষকে আরও ক্ষমতা লোলুপ করে তোলে। অধিকার রক্ষার ভার যে সরকারের উপর তাও এর উর্ধ্বে নয়। সুতরাং বিপদ চতুর্দিক থেকে আসতে পারে। মনীষীগণ অধিকারের রক্ষা কবচ হিসেবে নিম্নলিখিত পন্থাগুলো নির্দেশ করেছেন।

১। আইন (Law) ঃ সুপরিকল্পিত এবং সুচারুরূপে প্রণীত আইন অধিকার রক্ষার সর্বপ্রধান অস্ত্র। জনসাধারণের সম্মতি ভিত্তিক আইন এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রহরী, চির জাগ্রত সান্ত্রীর মত। তাই মতেঁস্কু (Montesquieu) বলেন, "স্বাধীনতার সংরক্ষণ নির্ভর করে অধিকার ভঙ্গের ব্যাপারে আইন কতটুকু শাস্তির বন্দোবস্ত করতে পারে তার উপর।"

২। গণতন্ত্র (Democracy) ঃ অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং দায়িত্বশীল শাসনপদ্ধতি অপরিহার্য। কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্রে অথবা কোনরূপ কুলীনতন্ত্রে জনগণের অধিকার সংরক্ষিত হয় না। গণতন্ত্রে যে অধিকার সংরক্ষিত হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবে এ শাসন পদ্ধতিতে সংরক্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে অধিক। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিরোধী দলের সংগঠন,

সাংগঠনিক স্তরে সহযোগিতা ও সহানুভূতির সূত্র এবং সর্বোপরি শাসন বিভাগ যদি বিবেক বিচারসম্পন্ন লোকের দ্বারা পরিচালিত হয় তা হলে জনগণের অধিকার নস্যাৎ হয় না। ডঃ আইভর জেনিংস (Ivor Jennings) বলেন, "শাসন বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সন্ধান পাওয়া যায় নির্বাচিত কমন্স সভায়। সেখানে দলীয় ব্যবস্থা সমালোচনাকে স্পষ্ট ও কার্যকর করে তোলে।" এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলকে অধিকারের সতর্ক প্রহরীরূপে গণ্য করা হয়।

৩। মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা (Fundamental Rights) : অধিকারের অন্যতম রক্ষাকরচ শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ। অধিকারগুলো বিধিবদ্ধ হলে তাদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দেয়া হয় এবং তা খর্ব করা হলে আদালতে প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা থাকে। বিধিবদ্ধ অধিকারগুলো সাধারণ আইন থেকে পবিত্র মনে করা হয়। তাদের অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে শাসনতন্ত্রে কতকগুলো মৌলিক অধিকার উল্লেখ করার রীতি প্রবর্তিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে, ভারত এবং বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্রে বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের নিয়ম অনুসারে মৌলিক অধিকারগুলো স্বীকৃত এবং উল্লিখিত হয়েছে। সরকার যদি তা ভঙ্গ করে তবে নিরপেক্ষ বিচারে সরকারকে তার খেসারত দিতে বাধ্য করা হয়। তবে তাও লঙ্ঘন করা হয়। হিটলার ক্ষমতায় আসার পূর্বে শাসনতন্ত্রকে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে শাসনতন্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করে নেপোলিয়ান সর্বেসর্বা হয়েছিলেন। বর্তমানকালেও অনেক সামরিক বাহিনীকে এভাবে শাসনতন্ত্রের বিরোধী কাজ করতে দেখা গিয়েছে। আমাদের দেশেও এর নজীর আমরা পেয়েছি।

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Powers) : মর্তেস্কু (Montesqieu) এবং ম্যাডিসন (Madison) ও অন্যান্য মনীষীবৃন্দের প্রচারের ফলে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণকে অধিকার রক্ষার আর একটি রক্ষাকবচ বলা হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্য হলো একই ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা ন্যস্ত হলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হবে এবং জনসাধারণ অত্যাচারিত হবে। তাই প্রতিষেধক হিসেবে রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়। কিন্তু এই নীতি যে অধিকার রক্ষার জন্য অপিরিহার্য তা নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে যদিও এ নীতি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল তথাপি তার পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর হয় নি। তাছাড়া, ইংল্যাণ্ডে স্বতন্ত্রীকরণের নীতি গৃহীত না হলেও জনসাধারণের অধিকার রক্ষা সম্ভবপর হয়েছে। তবে এও সত্য যে, স্বাতন্ত্র্য এবং অধিকার রক্ষার জন্য কিছুটা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজন রয়েছে।

৫। আইনের অনুশাসন (Rule of Law) : স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ আইনের অনুশাসন। এর প্রয়োগের ফলে এবং এর প্রতি গুরুত্ব আরোপের ফলেই ইংল্যাণ্ডে অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে। আইনের অনুশাসনের মূলকথা সাধারণত দুটি : (১) আইনের পূর্ণ প্রাধান্য, এবং (২) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। আইনের পূর্ণ প্রাধান্য থাকার ফলে সরকার আইন অনুসারে কাজ করতে বাধ্য থাকে। বে-আইনীভাবে কারো অধিকার খর্ব করা বা কারো অধিকার হরণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাছাড়া আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে একই রকম অধিকার ভোগ করতে পারে। ফলে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে প্রকৃত রূপ ধারণ করতে পারে।

৬। বিচারকের স্বাধীনতা (Independence of Judiciary) : ব্যক্তি অধিকার অনেকাংশে নির্ভর করে বিচারক মণ্ডলীর নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার উপর। যেখানে বিচারকগণের চাকরির স্থায়িত্ব শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সেখানে বিচারকেরা নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারে না। সে জন্য সব সুসভ্য দেশে এখন বিচারকগণের চাকরি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ী করা হয়েছে। তাঁদের উপর কারো হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই।

৭। নাগরিকের সদাজাগ্রত সতর্কতা (Eternal Vigilance) ঃ তাছাড়া **(১) শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার, (২) অর্থনৈতিক ক্ষমতা, (৩) স্বাধীন প্রেস ও সংবাদ পত্র, (৪) সচেতন জনমত** ও আরও কিছু কিছু রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নির্ভীক, সুশিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিকের সদাজাগ্রত সতর্কতাই অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রক্ষাকবচ। যে কোন ঘোষণা বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এড়িয়ে চলার মত চালাকী সরকার বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের থাকতে পারে, কিন্তু লোকে যদি সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে আরম্ভ করে, তা হলে তাঁরা সংযত হয়ে চলতে বাধ্য হবে। অধিকার রক্ষা একটি মানসিক ব্যাপার। সুতরাং কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তেমন কার্যকরী নাও হতে পারে। তাই অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেন, 'স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এ মনোভাব যে অধিকারে হস্তক্ষেপ হলে প্রতিবাদ হতে পারে, এমনকি প্রতিরোধ হবে, তা অপেক্ষা বেশি কার্যকর কিছুই হবে না।" ("Nothing, therefore, is so likely to maintain a condition of liberty as the knowledge that the invasion of rights will result in protest and if needs be, resistance")। সুতরাং নাগরিকদের সদাজাগ্রত সতর্কতাই অধিকারের শ্রেষ্ঠতম রক্ষাকবচ। 'চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য' ("Eternal vigilance is the price of liberty)। হেনরী নেভিনশন (Henry Nevinson) সুললিত ভাষায় কবিত্ব করে বলেছেন ঃ "প্রেমের মত স্বাতন্ত্র্যকেও আমাদের প্রত্যেকদিন জয় করতে হবে। প্রত্যেক বার জয়ের পর যখন আমরা মনে করি যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সুতরাং নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি, তখন যেমন প্রেমকে হারাতে বসি, তেমনি করে স্বাধীনতাকেও আমাদের হারাতে হয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম কোন দিন শেষ হয় না এবং এর যুদ্ধক্ষেত্র কোনদিন নীরব হয় না।" ("Freedom, we know, is a thing that we have to conquer afresh for ourselves everyday like love; and we are always losing freedom just as we are always losing war because after each victory, we think, we can settle down and enjoy it without further struggle. The battle of freedom is never done and the field never quite.")।

অধিকারের প্রকৃতি
Nature of Rights

অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Concept of Right by Various Schools of Thought) ঃ অধিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। রাষ্ট্রের সাথে অধিকারের কি সম্বন্ধ তাও নির্ভর করে অধিকারের প্রকৃতির উপর। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এ সম্পর্কে সাধারণত দুটি মতবাদ আমরা দেখতে পাই। এক মতবাদে বলা হয় **'অধিকার রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বের দাবি'** ('Right are prior to the state') এবং **ফলে রাষ্ট্র কর্তৃক তা স্বীকৃত হবার অপেক্ষা রাখে না।** দ্বিতীয় মতবাদে বলা হয়, **"অধিকারসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে"** ('Rights are created by the state')। এ মতবিরোধের কারণ সম্বন্ধে অবশ্য বলা প্রয়োজন, বিভিন্ন লেখক ও চিন্তাবিদগণ অধিকারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করে থাকেন। অধিকারকে কেউ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, কেউ আইনের দৃষ্টিতে, কেউ আবার নৈতিক দৃষ্টিতে এবং কেউ কেউ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। নিচে বিভিন্ন মতবাদের ব্যাখ্যা দান করা হলো।

আইনগত ব্যাখ্যা (Explanation of the Jurists) ঃ আইনবিদগণের মতে, আইন রাষ্ট্রের ইচ্ছা। আইন যা অধিকার বলে স্বীকার করে, তা কোন ব্যক্তি অপরের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করে। দার্শনিক হব্‌স বলেছেন, অধিকার "সে সব দাবি যা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত

হয়" ("Claims are recognised by the State")। হল্যাণ্ডের মতে, অধিকার "কোন ব্যক্তির সে ক্ষমতা যা দ্বারা সে রাষ্ট্রের সম্মতি এবং সাহায্য বলে অপরের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।" ("Capacity residing in one man of controlling with the assent and assistance of the state the actions of other")। **এ মতানুসারে 'আইন অধিকার সৃষ্টি করে'**। ("Rights are the creatures of law")। এ মতবাদ অধিকারকে রাষ্ট্রের আদর্শের সাথে সংযুক্ত করে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "এটিই আমার অধিকার যা আদালতের আদেশে রাষ্ট্রের ইচ্ছা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়" ("My right is, then, that claim which force of the state will upon order of its court be used to substantiate")। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে, তাই অধিকার। অধিকার এ সব সুযোগ ও সুবিধাদি যা ব্যক্তি তার আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে। তাছাড়া, যদি বলা হয় যে, অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে তবে বুঝতে হবে যে, মানুষ রাষ্ট্রের সদস্য হয়েই অধিকার লাভ করে। কিন্তু তাই কী সব? মানুষ কি ধর্মীয় সংস্থার সদস্য হয়ে অধিকার লাভ করে না? মানুষ কি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হয়ে কিছু কিছু সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে না ? মানুষের সামাজিক জীবনের ব্যাপ্তি কী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি তার আত্মবিকাশে উদ্যোগী হয়। লাস্কির কথায়, "রাষ্ট্রের সদস্য হয়েই ব্যক্তি শুধুমাত্র অধিকার ভোগ করে না। তার ব্যক্তিত্ব আরও একশত প্রকার সংঘ ও সংস্থার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে" ("It is not merely as a member of the state that the individual has rights. His personality expresses itself in a hundred other forms of association")। সুতরাং অধিকার সৃষ্টির একচেটিয়া ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে নেই। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত এবং অনুমোদিত না হলে অধিকার কার্যকরী হতে পারে না।

আদর্শবাদী ব্যাখ্যা
Explanation of the Idealists

আদর্শবাদি বিশ্বাসীরা অধিকারকে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্বজন স্বীকৃত দাবি বলে আখ্যায়িত করেন। গ্রীনের মতে, "ব্যক্তির নিজের আদর্শ চরিতার্থ করার দাবিই অধিকার" ("Right is a claim of an individual to will his own ideal object")। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো সমাজে যে অবস্থা থাকলে মানুষ নৈতিক জীবনযাপন করতে পারবে, তা রক্ষা করা। একজনে যে অধিকার ভোগ করছে, অন্যজনেও যেন তদ্রূপ অধিকার ভোগ করতে পারে তাও লক্ষ্য করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কারণ, সে সব অধিকার বা স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করে সে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সমাজকল্যাণে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র অধিকার স্বীকার করে সমর্থন করে এবং তাদেরকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথের অন্তরায়গুলো দূর করতে পারে, কিন্তু বিকাশ ঘটাতে পারে না। তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করে না, কিন্তু বিদ্যমান অধিকারগুলোর মর্যাদা দান করে" ("The state does not create rights, but gives fuller reality to rights already existing")। **সুতরাং এদিক থেকে বলা যায়, অধিকার অনেকটা রাষ্ট্র নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে তাদের জন্ম হয়েছে'** ("rights are prior to the state")। কিন্তু এই অর্থে যে, অধিকার লক বর্ণিত "প্রাকৃতিক রাজ্যে" ছিল, গ্রহণ করা ঠিক নয়। অধিকারকে রাষ্ট্রের পূর্বের বলা হয় এ অর্থে যে, রাষ্ট্র স্বীকার করুক বা না করুক উক্ত অধিকারসমূহ থেকেই রাষ্ট্র তার যুক্তিযুক্ততা অর্জন করেছে। তবে এও সত্য যে, রাষ্ট্রীয় সংস্থার উৎপত্তির সাথে সাথে অধিকারের অর্থ আমরা বুঝেছি। কিন্তু সে সুযোগ-সুবিধাগুলো মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য প্রয়োজন এবং রাষ্ট্র তা স্বীকার করে ও সমর্থন দিয়ে নিজেকে একটি নৈতিক সংস্থা হিসেবে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছে। যদি রাষ্ট্র তা না মানে, তাহলে

বুঝতে হবে যে, তা নৈতিকতার পথ থেকে কতটুকু বিচ্যুত। তাই অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, "প্রত্যেক রাষ্ট্র এর অধিকারসমূহ দ্বারাই পরিচিত হয়।" ("Every state is known by the rights that it maintains")। **সুতরাং এ অর্থে 'অধিকারকে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের পূর্বের সুযোগ বলেও গ্রহণ করা চলে'** ("Rights are prior to the state")।

প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Right) ঃ প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ অত্যন্ত প্রাচীন। এ মত প্রাকৃতিক আইনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাচীন গ্রীসে সোফিস্টগণ (Sophists) ও ইপিকিউরিয়ানগণ (Epicureans) প্রাকৃতিক অধিকারের উল্লেখ করেছেন। রোমানদের হাতে প্রাকৃতিক অধিকার অনেকটা বাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইনে বলা হয়েছে, **মানুষ প্রাকৃতিক আইন বলে স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে**। চুক্তিবাদী দার্শনিকগণও প্রাকৃতিক অধিকারকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করেছেন। হব্‌স (Hobbes) বলেছেন, **প্রাকৃতিক অধিকার মানেই আত্মরক্ষা বা স্বার্থরক্ষার জন্য জোর প্রয়োগ**। কিন্তু জন লক (John Locke) এবং টমাস পেইন (Thomas Paine) বলেন, **জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির উপর প্রাকৃতিক অধিকার কখনই নষ্ট হয় না**। আমেরিকার ভার্জিনিয়া রাজ্যের শাসনতন্ত্রে এ মতের প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ব্লাকস্টোন (Blackstone) তাঁর বিখ্যাত আইনের টীকায় লিপিবদ্ধ করেন, **মানুষ প্রাকৃতিক অমোঘ আইনে কতকগুলো অধিকার ভোগের ক্ষমতা লাভ করেছে।** এমনকি বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ করার যে নিয়ম প্রচলিত হয়েছে তাও এই প্রাকৃতিক অধিকারের অনুপ্রেরণায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো ঘোষণা করেছে প্রাকৃতিক অধিকারের কথা স্মরণ রেখে।

এ সব অধিকারকে নৈতিক অধিকার বললে আপত্তি থাকার কথা নয়। ন্যায়বোধ ও নীতির সমর্থনে যদি এ সব অধিকারকে বিধৃত মনে করে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয় তা হলে আপত্তি করি না, কারণ প্রাকৃতিক আইনকেও আমরা শেষ পর্যায়ে বিবেক-বিচার বা ন্যায়-নীতি বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কিন্তু যদি তাদের দ্বারা প্রাক-সামাজিক যুগের অধিকার বর্ণনা করা হয়, তবে তাদের অলীক ও কল্পনা ছাড়া কিছুই বলার নেই। বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাবিদগণ যুক্তিতর্কের দ্বারা এই প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্বকে খণ্ডন করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজ সংগঠনের পূর্বে কোন অধিকার থাকতে পারে না। সমাজের বাইরেও কোন অধিকার অবস্থান করতে পারে না। সমাজের স্বীকৃতি ব্যতীত কোন অধিকার অর্থহীন, কারণ সামাজিক শক্তির অভাবে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি কাজ করে। তাছাড়া, 'প্রকৃতি' শব্দের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। প্রকৃতি বলতে কেউ কেউ ঈশ্বরকে বোঝেন, কেউ বা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও বোঝেন, আবার কারো মতে প্রকৃতি বলতে মানুষের এক্তিয়ারের বাইরে যা কিছু সবকিছুকেই বুঝায়। সুতরাং এমন অস্পষ্ট এবং আকার প্রকারহীন প্রকৃতির সাথে অধিকারের কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

বাস্তববাদ (Realism) ঃ আইনের বাস্তববাদ শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী গামপ্লাউটসের নামের সাথে জড়িত। তিনি আদর্শবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অধিকার ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং রাষ্ট্রে যে সব অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছে তারই উপর ভিত্তি করে ন্যায় বিচারের মনোভাব সমাজে গড়ে উঠেছে। তিনি সমাজের নৈতিক সত্তাকে স্বীকার করেন নি। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) বলেন, **অধিকার সমাজের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে কালক্রমে অধিকারের রূপ লাভ করেছে।** মানুষকে তিনি সামাজিক প্রাণী হিসেবে দেখেছেন এবং বলেছেন যে, মানুষ সমাজে বাস করতে করতে কালে পরমত সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। এ সহিষ্ণুতার অভ্যাস কেউ সৃষ্টি করে নি। তা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংঘের আবিষ্কারও নয়। কালক্রমে তা জন্মলাভ করেছে। তাই মানুষ এ অভ্যাসগত

সহিষ্ণুতার ফলে অপরকে সহ্য করতে এবং অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ হতে বিরত হয়েছে। এভাবে সমষ্টিগত ব্যবহারের ফলে সামাজিক সংহতির সৃষ্টি এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠিত হয়। সুতরাং তাঁর মতে, অভ্যাসগত ভাবে মানুষের সংঘ, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মানুষের নিজেরও টিকে থাকার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আইনগত নয়। তা নৈতিকতাভিত্তিকও নয়। সমাজের মূল ভিত্তি যে সামাজিকতা এবং অভ্যাস তা থেকেই উৎসারিত।

সৃজনাত্মক অধিকার তত্ত্ব (Creative Theory of Rights) ঃ অধ্যাপক লাস্কির (Laski) সৃজনাত্মক অধিকারবাদই বর্তমানে অধিকার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ, সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ বলে মনে হয়। তাঁর মতে, অধিকারের সাথে কর্তব্যের সম্বন্ধ রয়েছে। তিনি বলেন, **"আমার গ্রহণ করার কোন দাবিই নেই অন্ততঃপক্ষে যা পাই তার পরিবর্তে কোন কিছু দেবার চেষ্টা ব্যতীত। অধিকার কাজের সাথে জড়িত"** ("I have no claim to receive without the attempt at least to pay for what I receive. Function is thus implicit in right")। **"আমার অধিকার তখনই যুক্তিযুক্ত হয়, যখন আমি সে অধিকারের পরিবর্তে হয় গাণিতিক হিসেবে, না হয় শিল্পী হিসেবে, না হয় গৃহনির্মাণকারী ইস্টক বহনকারী হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করি। কাজ না করে যেমন কেউ খাবারের কোন অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তেমনি আমার দায়িত্ব পালন না করে আমি অধিকার ভোগ করতে পারি না"**।

তাঁর মতে অধিকারের উদ্দেশ্য সামাজিক কল্যাণে অংশ গ্রহণ করা। সমাজের ক্ষতিকর কিছু করার অধিকার কারো নেই। তিনি বলেন, **"আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে যাতে আমি অন্যদের সহযোগিতায় সাধারণ কল্যাণ আনতে সচেষ্ট হই। আমি অধিকার লাভ করেছি কারণ সামাজিক কল্যাণে আমার দান করার কিছু থাকে। সমাজের ক্ষতিকর কিছু করার কোন অধিকার আমার নেই।"** ("My rights are powers conferred so that I may, with others, strive for the attainment of that common end. I have them so that I may make my contribution to the social end. I have no right to act unsocially")। তাছাড়া, ব্যক্তির, সংঘের এবং সমাজের জীবনকে একই সাথে সমৃদ্ধ করা অধিকারের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রের সদস্য নয়, শুধু রাষ্ট্রের দ্বারা তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। পরিবার, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি সংঘের ব্যক্তিত্ব বিকাশে অংশ আছে এবং তাই তাদের সকলের অধিকার রয়েছে। **"আমাদের অধিকার সমাজ নিরপেক্ষ নয়, সমাজের মধ্যেই তা অন্তর্নিহিত। অধিকারের দ্বারা সমাজও রক্ষা পায়"** ("Our rights are not independent of society but inherent in it. We have them for its protection as well as for our own")।

তিনি বলেছেন, যা খুশি তা করার অধিকার কারো নেই। "সমাজের মঙ্গলের জন্য আমি কি করি তার উপর ভিত্তি করে আমার অধিকার গড়ে উঠেছে। আমার নির্দিষ্ট কর্তব্য ভালভাবে সম্পাদন করার জন্য যতখানি প্রয়োজন, কেবল ততখানি অধিকার আমি দাবি করতে পারি" ("My rights are built at always upon the relation my function has to the wellbeing of society and the claims I make, must clearly be enough that are necessary to the proper performance of my function")। সুতরাং দায়িত্ববোধ এবং সমাজের সর্বজনীন কল্যাণে অংশই অধিকারের মানদণ্ড। এ মানদণ্ডে আমরা নির্ধারণ করব কোন্ অধিকার মানুষের জন্য প্রয়োজন এবং কোন্ কোন্ অধিকার ন্যায়সঙ্গত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকেও এ মানদণ্ডে মেপে ভেবে দেখা প্রয়োজন, তা সামাজিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং অনুমোদন পেতে পারে কিনা ? সুতরাং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ অধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অধিকার ও কর্তব্য
Right and Duties

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল। তারা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একটি কথা বলা হলে অন্যটিও এসে পড়ে। এ অধিকার ও কর্তব্যকে একই বস্তুর দু' পিঠ বলা হয় অথবা একই চিত্রের দু দিকও বলা হয়। সমাজ সচেতনতা থেকে দুটির উৎপত্তি হয়েছে এবং সমাজের মধ্যে থেকেই দুটি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং তাদের পরস্পর নির্ভরশীলতার সম্পর্কের কথা জানা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রেরই উচিত। আলোচনার সুবিধার জন্য এটুকু বলতে পারি যে, কর্তব্য ও অধিকার যেন সোনালী সুতায় পাঁচ পাকে বাঁধা রয়েছে।

অধিকার উপভোগকারী হিসেবে আমি সমাজে আর পাঁচজনের উপর প্রধানত তিন প্রকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করি। **প্রথমত,** আমার বাচার অধিকার সমাজের অন্য সকলের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে যেন তারা আমার বাঁচার অধিকার খর্ব না করে অর্থাৎ আমাকে হত্যা না করে।

দ্বিতীয়ত, আমার অধিকার রাষ্ট্রের উপরেও এ কর্তব্য অর্পণ করে যেন কেউ আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এবং আমি যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমার অধিকার ভোগ করতে পারি।

তৃতীয়ত, আমি দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়ি এবং দেখতে বাধ্য যেন অপরের অনুরূপ অধিকার আমার কাজকর্মের দ্বারা খর্ব না করি, কারণ তেমনিই দায়িত্ব আমি সকলের নিকট থেকে আশা করি। সুতরাং আমার অধিকারের প্রশ্ন তিন জায়গায় কর্তব্যের সুর জাগিয়ে তুলেছে। এ যেন চড়া সুরে বাঁধা সেতার— এক জায়গায় টান মারলে বিভিন্ন স্থান থেকে সুরের ঝঙ্কার বেজে ওঠে।

ঠিক অপরদিকে এতে কর্তব্যেরও মান নির্ণীত হয়ে আছে। কর্তব্যের দিক থেকে দেখলে ব্যাপারটি এভাবে দেখি। **প্রথমত,** যাদের প্রতি কর্তব্য আরোপিত হয়েছে, তাদের কর্তব্য সম্পন্ন হয় কতকগুলো ব্যক্তির জন্য যাদেরও অধিকার রয়েছে। আমার প্রতিবেশীর প্রতি আমি যখন কোন কর্তব্য করি তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উক্ত প্রতিবেশী আমার উপর অধিকার বশেই তা দাবি করে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ ন্যায়নীতিবোধ সম্পন্ন প্রাণী বলেই সমাজের নিকট থেকে শুধু অধিকার লাভ করে না, সে সমাজের প্রতি কর্তব্যও করে। মানুষের নৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা উদ্ভূত এবং এর ফলে কর্তব্য ও অধিকার এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তৃতীয়ত, অধিকার মানুষের সামাজিকতার এবং একত্রে বাস করার মনোভাব থেকে জন্মলাভ করে। ফলে জন্মসূত্রে অধিকার অনেকগুলো কর্তব্যের সাথে জড়িত হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়। আমার অধিকার যেহেতু সমাজ থেকে এসেছে, সেজন্য সে অধিকারকে আমার এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত, যাতে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের বৃহত্তম স্বার্থ সিদ্ধ হয়। আমার লেখাপড়ার অধিকারের অর্থ এই যে, মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া শিখে আমি আত্মবিকাশ তো করবোই, তাছাড়া আমার সাধ্যের মধ্যে যা সম্ভব, সমাজের মঙ্গলও সাধন করব। তাই অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, "আমি যা পাই তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা ব্যতীত পাওয়ার দাবি নেই। অধিকারের সাথে কাজের সম্বন্ধ রয়েছে" ("I have no claim to receive without the attempt at least to pay for what I receive. Function is thus implicit in right")। সর্বোপরি, প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের অধিকারসমূহের স্বীকৃতি দান করে এবং অনুমোদন করে সকলের উপভোগের জন্য নিশ্চয়তা দান করে। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকও রাষ্ট্রের প্রতি অচ্ছেদ্য কর্তব্য সূত্রে বাঁধা রয়েছে।

নাগরিকের কর্তব্য
Duties of Citizens

প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি অনেক কর্তব্য পালন করতে হয়। তাদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার, আইন মেনে চলা, কর প্রদান করা, সততার সাথে ভোটাধিকার ব্যবহার করা ও সেবামূলক অন্যান্য কর্তব্যই প্রধান। নিচে তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

১। আনুগত্য স্বীকার ঃ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ প্রত্যেক নাগরিকের প্রাথমিক দায়িত্ব। আনুগত্য প্রকাশের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নাগরিকগণ রাষ্ট্রের স্বার্থকে স্বীয় স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করবে। অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধানে কর্মচারীদিগকে সাহায্য করবে এবং বৈদেশিক আক্রমণের সময় রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রত্যেকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে।

২। আইন মান্য করা ঃ আইন মান্য করা নাগরিকগণের আর একটি প্রধান কর্তব্য। শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য সার্বজনীন মঙ্গল কর্মের জন্যই আইন প্রণীত হয়। সুতরাং আইন মেনে চলে শাসন কর্তৃপক্ষকে মঙ্গলকর্মে নিয়োজিত হতে সুযোগ দিতে হবে। আইন যদিও খারাপ বা ক্ষতিকর হয় অথবা তা যদিও ন্যায় এবং নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তথাপি আইন অমান্য করা উচিত নয়। আইন যদি ক্ষতিকর হয় তবে তা নিরসনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। জনমত গঠন করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা আইন হিসেবে রয়েছে, ততক্ষণ তা মেনে চলতে হবে। ঔচিত্য-অনৌচিত্যের কোনরূপ অজুহাতে আইন অমান্য জঘন্য অপরাধ।

৩। কর প্রদান ঃ সরকারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেশে বহুবিধ মঙ্গলজনক কাজ সম্পন্ন করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে কর প্রদান করতে হবে।

৪। সততার সাথে ভোটদান করা ঃ ভোটাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এর মাধ্যমে নাগরিকগণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। বর্তমানের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে এ ভোটাধিকারকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। সুতরাং নাগরিকগণের কর্তব্য হলো, অত্যন্ত সাবধানতা, বিজ্ঞতা ও সততার সাথে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোট প্রদান করা। সব রকম লোভ, লালসা ও প্রলোভনের উর্ধ্বে উঠে ভোটদান করা উচিত।

৫। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র যে দায়িত্ব প্রদান করে তা পালন করাও কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় কর্মে আত্মনিয়োগ করতে স্বীয় আর্থিক ক্ষতি হতেও পারে। তথাপি বৃহত্তম মানবতার স্বার্থের দিকে নজর রেখে সবাইকে অনুপ্রাণিত হতে হবে।

৬। অন্যান্য দায়িত্ব ঃ প্রত্যেক নাগরিকের নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, গ্রামের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং বৃহত্তর মানবতার স্বার্থেও বহুবিধ কর্তব্য রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় অন্ততপক্ষে সবাইকে শিক্ষিত হয়ে কর্তব্য সাধনে উপযুক্ততা অর্জন করাও বিরাট কর্তব্য।

সুতরাং নাগরিক হিসেবে মানবের কর্তব্যের শেষ নেই। অধিকার বরং সীমাবদ্ধ, কিন্তু কর্তব্য অসীম। কর্তব্যপরায়ণ হয়ে এবং সমাজকল্যাণে অংশীদার হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি করতে না পারলে নাগরিক হিসেবে মানবের জন্ম অপূর্ণ থেকে যায়।

সাম্য
Equality

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্র মানুষকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করেছে। নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তনে সহায়তা করেছে। চিন্তাবিদ্‌গণকে নব নবরূপে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাম্যের আকর্ষণ চিরন্তন। মৈত্রীর বন্ধন বহু আকাঙ্ক্ষিত। স্বাধীনতার লিপ্সা সার্বজনীন। তাই সাম্যের আলোচনা ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা অসম্পূর্ণ।

প্রাচীনকালে গ্রীকদের নিকট সাম্য ছিল প্রাকৃতিক বিধানস্বরূপ। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম সাম্যের জয়গান করেছে এবং সব মানুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে অভূতপূর্বরূপে। রাজা, উজির, ক্রীতদাস, ধনী, নারী-পুরুষ, সাদা-কালোর মধ্যে ইসলাম সাম্যের সেতু রচনা করেছে আধুনিককালে গণতন্ত্র সাম্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান। ১৭৮৯ সালে ফরাসি জাতীয় পরিষদ অধিকার এবং সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের অধিকারের **'মহাসনদ'** রচনা করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল, "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে সমান এবং স্বাধীন থাকে।" ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার ভূমিকায়ও বলা হয়েছে যে, সব মানুষ সমান হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিককালের রুশ বিপ্লবের মহামন্ত্রও ছিল সাম্যের বাণী। মহাচীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, আফ্রিকা ও এশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নতুন আলোকের সূচনা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রেও সাম্যের জয় ঘোষণা করা হয়েছে নব নবরূপে।

অথচ বাস্তবে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যের যে প্রাচীর গড়ে উঠেছে, তা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দেয়। অনেকের ধারণায়, সাম্য প্রকৃতির নিয়ম নয়। মানুষে মানুষে কত প্রভেদ। একজন অপর জন থেকে কত স্বতন্ত্র। কী দৈহিক শক্তিতে, কী মানসিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ্যে, কী আচার-আচরণে, কী আসনে-বসনে- গঠনে, কী নৈতিকতায় মানুষে মানুষে কত ব্যবধান। এমন কী একই পরিস্থিতিতে একই পরিবেশে দু জন লালিত-পালিত হলেও উভয়ের কর্ম ক্ষমতা একই রূপ থাকে না। একই পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা ক্রিয়াকলাপে বিভিন্নভাবে বিকাশ লাভ করে। তাই সাম্যের ধারণাকে অনেকে অলীক এবং কল্পনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকের মতে, সাম্য প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাই প্রশ্ন ওঠে-সাম্য কী ভিত্তিহীন ? সাম্য কী অলীক ?

দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লক্ষ্য করা যায় যে,মানুষে মানুষে সাম্য যেমন দেখা যায়, বৈষম্যও তেমনি পরিলক্ষিত হয়। গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষ হিসেবে সকলের মধ্যে সাম্য বিদ্যমান থাকলেও একজন অপরজন থেকে স্বতন্ত্র। মানসিক দিক দিয়ে সবারই অনুভূতি রইলেও সবার অনুভূতির তীব্রতা সমান নয়। আধ্যাত্মিক বিচারে সকলেই এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হলেও সকলে সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে সমানভাবে চিন্তা করে না। নৈতিক দিক দিয়ে সবাই মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করলেও সবার নীতি এক নয়। সুতরাং সাম্য কী কোন সোনার হরিণ যার পেছনে অর্থহীন আলোচনায় সময় ক্ষেপণ করতে হবে ?

এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে সাম্যের তাৎপর্য কী তার সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সাম্য কী
What is Equality

উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক মতবাদীরা সাম্য বলতে বুঝতেন আইনের চোখে সবার সমতা, ভোট দেবার এবং নির্বাচিত হবার সমান অধিকার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ লাভের অধিকার। ইসলামে সাম্য বলতে বুঝা যায় সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আইনের চোখে সবার সমান ক্ষমতা এবং সমান সুযোগ। আধুনিককালে সমাজতন্ত্রবাদে

সাম্যের অর্থ ব্যাপকতর। এ অর্থে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সবার সমান সুযোগ ও সমান অধিকার সূচিত হয়। বাঁচার জন্য যে সব মৌলিক অধিকার প্রয়োজন, তা প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

তবে সাম্যের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে হলে দ্বিবিধ অর্থে সাম্যকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রথমত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিলোপসাধন। আভিজাত্য, বংশমর্যাদা, ধর্মীয় প্রভাব, অর্থের প্রাচুর্য, রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে কেউ যেন বিশেষ সুযোগ লাভ না করে। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেন যোগ্যতা ও শিক্ষার ভিত্তিতে সমান সুযোগ লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকে যেন স্বীয় সত্তা বিকাশের জন্য যথার্থ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "সবার সম্মুখে যথার্থ সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন" ("adequate opportunities are to be laid open to all")। নগরিকদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সবাইকে সুযোগ দেয়া হলে প্রত্যেকে স্ব.স্ব দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়, যোগ্যতার উন্নয়ন সাধনে প্রবৃত্ত হয়, বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজ নিজ ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে সক্ষম হয়।

সাম্য বলতে আচরণের সমতা বুঝায় না। বরং সাম্যে শ্রেণী হিসেবে সুবিধার বিলোপসাধনই সূচিত হয় ('absence of special privilege')। তাছাড়া সুযোগের অভাবে যে সব মানব কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হবার পূর্বেই ঝরে পড়ে, সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে সে সব কুঁড়িকে অবাধে বিকশিত হবার পরিবেশ সৃষ্টিই সাম্যের লক্ষ্য।

সাম্যের অভিব্যক্তি
Forms of Equality

সাম্যের অভিব্যক্তি মূলত ত্রিবিধ। সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য সভ্য জীবনের সূচনা করে। রাজনৈতিক পর্যায়ে সাম্য গণতন্ত্রের দিশারী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য সমাজতন্ত্রবাদের ইঙ্গিত বহন করে। নিচে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

(ক) সামাজিক সাম্য (Social Equality) ঃ সামাজিক সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশের চিত্রকে বুঝি যেখানে প্রত্যেকে সমানভাবে সামাজিক অধিকার উপভোগ করে। আইনের চোখে সবাই সমান। আইন কাউকে বিশেষ সুযোগ দান করে না। আদালতের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। বিচারক একই নীতিতে সবার বিচার কার্য সম্পন্ন করেন। একই অপরাধে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সবাই একই দণ্ড পায়। রাষ্ট্র এবং সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকগণ যে নিরাপত্তা লাভ করে তাও সমভাবে সবাই পায়। অনেক দেশে সামাজিক সাম্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তবে এখনও অনেক ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য রয়েছে যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেরিকার নিগ্রোরা শ্বেতকায়দের সমান অধিকার পায় নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণের লোক শ্বেতকায় কোন মহিলাকে বিবাহ করলে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হত। অতীতে অবশ্য ক্রীতদাস প্রথার স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু আজকাল তার অবসান ঘটেছে। সমাজতন্ত্রবাদের প্রচলন ও জনপ্রিয়তা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পদক্ষেপস্বরূপ।

(খ) রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ভোটাধিকার লাভ করে, সবাই যদি নির্বাচিত হবার অধিকার পায় এবং রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করে তা হলে রাজনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজনৈতিক সাম্য গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্যের অভিষেক হয়েছে।তাই দেখা যায়, নির্বাচনকালে আজকাল অনেক দরিদ্রও তাদের ধনী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়। সংঘ গঠনে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে, রাজনৈতিক মত প্রকাশে ধনী-দরিদ্র সবারই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

(গ) অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality) ঃ অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই আজকাল অর্থনৈতিক সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যাদের আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে, যারা সম্পদশালী, তারা শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা, দক্ষতার পার্থক্যও অনেক ক্ষেত্রে ধন-সম্পত্তির পার্থক্যজনিত। তাই অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যবধানের বিরাট প্রাচীর গড়ে উঠলে স্বাধীনতা উপভোগ অসম্ভব হয়ে ওঠে" ("The great inequalities of wealth make impossible the attainment of freedom")। নিঃস্ব ও দরিদ্রের নিকট স্বাধীনতা ও অধিকার মূল্যহীন। তাই বলা হয়, "অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন অসম্ভব" ("Political equality is never real unless it is accompanied by virtual economic equality")।

অবশ্য অর্থনৈতিক সাম্য বলতে সর্বতোভাবে সমতা বুঝায় না। দার্শনিক হিউম (Hume) বলেন, "যদি প্রত্যেককে সমান সম্পদ বণ্টন করে দেয়া হয়, তা হলে বিভিন্ন জনের শিল্পকর্মের দ্বারা, পরিশ্রমের মাধ্যমে, যত্ন ও কলাকৌশলের সাহায্যে তা পুনরায় বৈষম্যে রূপ লাভ করবে" ("Render possessions ever so equal, men's different degrees of art, care and industry will immediately break that equality")।

অধ্যাপক লাস্কিও বলেন, "ধনবৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, যদি এ বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। তাঁর মতে, "ইস্টক সাজানোর কাজে ব্যস্ত যে শ্রমিক, সে যদি কোন গাণিতিকের সমান মর্যাদা লাভ করে, তা হলে সমাজ জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে বলতে হবে, কেননা যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য মর্যাদা দেয়াই সমাজের প্রধান লক্ষ্য" ("The purpose of society would be frustrated at the outset if the nature of a mathematician meet an identical response with that of the nature of a brick-layer")।

একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বুঝি সমাজে প্রচলিত সে অবস্থা যেখানে **প্রথমত,** প্রত্যেকে বিনা প্রতিবন্ধকতায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য যথাযোগ্য সুযোগ লাভ করে। এর অর্থ এই যে, লোকেরা কাজ করতে পারে, যথেষ্ট মজুরি উপার্জন করার সুযোগ লাভ করে, কাজ করার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয় এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। **দ্বিতীয়ত,** এক নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত প্রত্যেকের কর্মসংস্থানের ও জীবিকার্জনের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকে। কারো কারো প্রাচুর্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকে। এ উভয় শর্ত পালিত হলে বুঝতে হবে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাম্য ও স্বাধীনতা
Equality and Liberty

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্বন্ধ সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত রয়েছে। **প্রথমত,** বলা হয় যে, সাম্যনীতি স্বাধীনতাকে সীমিত করে। **দ্বিতীয়ত,** অনেকের মতে বৈষম্য স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তোলে।

প্রথমোক্ত মতবাদের নেতা লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton)। তিনি বলেন, "সমতার খেয়াল স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেয়" ("Passion for equality makes vain the hope of freedom")। তিনি অবশ্য স্বাধীনতা বলতে লোকের উৎপাদনে, সম্পত্তি অর্জনে এবং উৎপন্ন সম্পদ ভোগে অবাধ অধিকার বুঝিয়েছেন।

সাম্যনীতি যদি অনুসরণ করতে হয়, তাহলে সম্পদশালীদের সম্পদের একটা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতে হয়, মূলধনের যথেচ্ছা নিয়োগ বন্ধ করতে হয় এবং ফলে সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয়। সকলের

মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও এক ধরনের মাঝারি ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং সরকারের কার্যকারিতা কমে আসে।

তবে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে এ সব যুক্তির অন্তসারশূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে সমাজব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত নয় যাতে সমাজের হাজারো জনের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হয়। অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেককে এক স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বরং তার ফলে প্রত্যেকের জন্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে স্বাধীনতার প্রহরী হিসেবে দেখা যায় এবং গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে হলে সকলের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

অপরপক্ষে এও লক্ষ্য করা দরকার যে, বৈষম্য স্বাধীনতাকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করে। **প্রথমত,** বিত্তশালী ব্যক্তিরা অতি সহজে তাদের সম্পদের প্রভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্তে আনতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** বিত্তশালী ব্যক্তিরা উন্নত ধরনের শিক্ষা-দীক্ষায় তাদের সন্তান-সন্ততিদের এমন দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারে, যাতে দরিদ্র ব্যক্তিরা চিরদিন পদদলিত থেকেই যায়। **তৃতীয়ত,** স্বার্থান্বেষী সম্পদশালী ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশের ও দশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশকে দুর্দিন, যুদ্ধ ইত্যাদির মধ্যে টেনে আনতেও পারে। **চতুর্থত,** বৈষম্য হলো উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসন্তোষের জনক এবং তা সমাজ জীবনে বিভেদ, দলাদলি এবং ক্ষোভের সৃষ্টি করে। **সর্বশেষে,** এটি উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নয়। বরং স্বাধীনতার মাধ্যমে সমাজে সুখ ও শান্তি নেমে আসে এবং তাই মানবের কামনা। স্বাধীনতা উপেয় নয়, স্বাধীনতা সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের উপায় স্বরূপ।

সুতরাং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক। আইনের চোখে সকলে সমান না হলে স্বাধীনতা নিরর্থক। স্বাধীনতাবিহীন সাম্য যেমন দাসত্ব শৃঙ্খলের সমান বোঝা বহন করার সমান অধিকার, তেমনি সাম্যবিহীন স্বাধীনতা কতিপয় ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল জীবনের লক্ষ্যচ্যুত গতিছাড়া আর কি হতে পারে ? সাম্য স্বাধীনতার প্রাণ এবং স্বাধীনতা সাম্যের গৌরব। একটি আলোক, অপরটি আলোকচ্ছটা। সাম্য স্বাধীনতার বিরোধী নয়। একে অপরের প্রাণে নতুন স্পন্দনের সূচনা করে।

১। স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ? সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখতে পাও কী? (What do you understand by liberty? Do you find any relation between liberty and equality?)

২। সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে তফাত দেখাও। (Distinguish between civil liberty, political liberty, national liberty and economic liberty.)

৩। কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যে কী সম্পর্ক বিদ্যমান এবং কি হওয়া উচিত? (What is and what should be the relation between liberty and authority?)

৪। স্বাধীনতা ও অধিকারের মধ্যে প্রভেদ কী? (What is the difference between liberty and right?)

৫। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কী কী? তুমি কি মনে কর যে, স্বাধীনতা নিরর্থক যদি না সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়? (What are the safeguards of liberty in a modern state? Do you think that liberty is never real unless government is called to account for?)

৬। আধুনিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান রক্ষাকবচ কী কী? (What are the principal safeguards of liberty in a modern state?)

৭। 'একজনের স্বাধীনতা অন্যজনের পরাধীনতারই নামান্তর'—ব্যাখ্যা কর। ('One man's liberty is another man's bondage'— Explain.)

৮। 'ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ অনেক সময় রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও হয়'—তোমার মতামত দাও। ("The liberty of the individual is also the liberty to the state'—Comment.)

৯। 'আধুনিককালে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। অধিকার ও কর্তব্যের বর্ণনা দিয়ে তা বিশ্লেষণ কর। ("The scope of the individual rights and duties has been much widened today'—Explain this while describing the rights and duties of a citizen.)

১০। জাতিসংঘ কর্তৃক মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো যেভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে, তাদের কয়েকটি উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর। (Enumerate some of the fundamental rights adopted by the U. N. O. and discuss.)

১১। "অধিকার সমাজ জীবনের সে অবস্থা, যা ব্যতীত মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে না—আলোচনা কর।" ("Rights are those conditions of social life without which no man can be at his best"—Discuss.)

১২। (ক) অধিকার রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে জন্মলাভ করেছে।, (খ) 'আইনই অধিকার সৃষ্টি করে'—এই দু মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? যুক্তি দেখাও। [(a) 'Rights are prior to the state'; (b) 'Rights are created by the state.' Which view is correct? Give reasons.]

১৩। 'আমার উপরে রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে'—আলোচনা কর। ('The state has rights upon me'—Discuss.)

১৪। 'অধিকার দায়িত্ব বুঝায়'—আলোচনা কর। ('Rights imply duties'—Discuss.)

১৫। 'স্বাধীনতা ও আইন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ'—বিশ্লেষণ কর। (Liberty and law are bound together irresistibly—Analyse.)

১৬। আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার সমস্যাসমূহ বর্ণনা কর। (Describe the problems of liberty in a modern state.)

১৭। প্রাকৃতিক অধিকার বলতে কী বুঝ? কোন্ অর্থে অধিকার প্রাকৃতিক? (What do you understand by natural right? In what sense is this natural?)

১৮। 'প্রত্যেক রাষ্ট্রই এর প্রদত্ত অধিকারসমূহের দ্বারা পরিচিতি লাভ করে'—বিশ্লেষণ কর। ('Every state is known by the rights that it maintains'—Analyse.) [N. U. 1998]

১৯। স্বাধীনতা বলতে কী বুঝায় ? আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর। (What is meant by liberty? Discuss the relation between law and liberty.)

২০। অধিকার বলতে কী বুঝা যায় ? আইনগত, নৈতিক এবং প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (What do you understand by right? Distinguish between legal, moral and natural right.)

২১। স্বাধীনতা কী ? স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা কর। (What is liberty? Discuss the relationship between liberty and authority.)

২২। প্রাকৃতিক অধিকার বলতে কী বুঝ ? প্রাকৃতিক অধিকার কিভাবে নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার থেকে স্বতন্ত্র ? (What is meant by natural right? How is it different from legal and moral rights?)

২৩। সাম্য কী ? সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক আলোচনা কর। (What is meant by equality? Discuss the relationship between equality and importance.) [N.U. 2007]

২৪। আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান, তা আলোচনা কর। আইন কী স্বাধীনতা খর্ব করে না বৃদ্ধি করে। (Discuss the relationship between law and liberty, Does law restrain or enlarge liberty?) [D. U. 1984]

২৫। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কী ? রাজনৈতিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কী কী ? (What is political liberty? What are the safeguards of political liberty?)

২৬। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ ? স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান তা আলোচনা কর। (What is meant by political liberty? Discuss the relationship between liberty and authority.)

২৭। স্বাধীনতা বলতে তুমি কী বুঝ ? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় ? (What do you mean by liberty? How can liberty be safeguarded in a democratic state? [R. U. 1981]

২৮। স্বাধীনতা কী? স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্বন্ধ কী? (What is liberty? What is the relation between liberty and equality?) [D. U. 1984]

২৯। আইনের উৎস কী কী? আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক আলোচনা কর। (What are the sources of law? Discuss the relation between Law and liberty.) [D. U. 1993]

৩০। স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ? আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো আলোচনা কর। (What do you mean by liberty? Discuss the safeguard of liberty in a modern state.) [N. U. 1996, 1999, 2004, 2006]

৩১। সাম্য কী? বিভিন্ন প্রকার সাম্যের বিবরণ দাও। (What is equality? Discribe the various types of equality.) [N. U. 1997]

৩২। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা কর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিরোধে নাগরিকের কোন অধিকার আছে কী? (Discuss the right and duties of a citizen. Do the citizens have any right to resist the powers of the state?) [N. U. 1997]

রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

৩০

ENDS AND FUNCTIONS OF THE STATE

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক বিষয়। এ সম্বন্ধে বহু মতবাদ রয়েছে। কোন কোন মতবাদে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়েছে, আবার কোন কোন মতবাদে রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রকাশ বা সমাজ জীবনের মহত্তম সংস্থা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এ সব বিতর্কমূলক মতবাদকে অত্যন্ত সাবধানে অনুধাবন করতে হবে এবং সর্বপ্রথম জানতে হবে রাষ্ট্রের আসলে কোন লক্ষ্য আছে কী না অথবা রাষ্ট্র একটি উদ্দেশ্যবিহীন সংস্থা কী না?

রাষ্ট্রের লক্ষ্য

The Ends of the State

রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য, না ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য—এই সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বড় বড় পণ্ডিতগণ প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে তর্ক করে আসছেন। তথাপি এই তর্কের অবসান হয়েছে বলে মনে হয় না। প্লেটো থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের মুসোলিনী পর্যন্ত অনেকেই রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে রাষ্ট্রের রথচক্রে ব্যক্তি স্বার্থকে উৎসর্গ করতেন চেয়েছেন। অন্যদিকে, প্রাচীন কালের মানবতাবাদী দার্শনিকগণ থেকে শুরু করে আজকের লাস্কি পর্যন্ত অনেক মনীষী মানুষকে মুখ্য জ্ঞান করে রাষ্ট্রকে জনকল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুতরাং দেখা যাক রাষ্ট্রের লক্ষ্য কী?

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণের মতে রাষ্ট্র উপেয়, কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র নয়। এরিস্টটল বলেন, রাষ্ট্র জীবন রক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু তা মহত্তম জীবনের উপলব্ধির সুযোগ দেবার জন্যই বর্তমান রয়েছে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের মাধ্যমেই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রের বাইরে যারা বাস করে, তারা সাধারণ মানুষ নয়। হয় তারা দেবতা, না হয় পশু। সুতরাং মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রাষ্ট্র। মানুষের জীবনের সামান্যতম অংশও রাষ্টের আয়ত্তের বাইরে নয়। মানুষ সব ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা লাভ করে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে।

গ্রীক চিন্তাবিদগণের চিন্তাধারা উনিশ শতকের আদর্শবাদী দার্শ্যনিকগণের চিন্তায় এবং কথায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। জার্মানির হেগেল রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানব প্রকৃতি পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে দেবত্বে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখে বিস্মিত হয়। ফ্যাসিস্ট মতবাদীদের অভিমতও অনুরূপ। তাঁরা "রাষ্ট্রের বাইরে, উর্ধ্বে ও এর আওতার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু কল্পনা করেন না" ("Nothing above the state, beyond the state or against the state")। বর্তমানে সাম্যবাদী রাষ্ট্রনেতাগণও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সে মতবাদকে বাস্তবে রূপ দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং রাষ্ট্রের বাইরে কোন ব্যক্তি স্বার্থকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন।

তবে আধুনিক চিন্তাবিদগণ সে মতকে সুষ্ঠু, সার্বজনীন এবং কার্যোপযোগী বলে মনে করেন না। তারা স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্র সত্যই মনুষ্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম অবদান তা স্বর্গীয় মহিমায় সৃষ্ট হয় নি। সে জন্য রাষ্ট্রকে মানব কল্যাণের প্রখ্যাত সংস্থা বলেই গ্রহণ করা হয় এবং সমাজের স্বার্থ রক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম রূপে মনে করা হয়। গ্রীক পণ্ডিতগণের চিন্তাধারা তাঁদের রাষ্ট্রীয় সমাজ কাঠামোর উপযোগী ছিল। তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হত না। কিন্তু বর্তমান সমাজকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে দেখা হয় এবং রাষ্ট্রকে তাই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলা হয়, উপেয় নয় ('A means to an end, not an end itself')। প্রাচীন ভারতেও রাষ্ট্রকে মনুষ্য ধর্মের ত্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ, কাম) মাধ্যম রূপেই বর্ণনা করা হত এবং বিশ্বাস করা হত যে, একমাত্র মোক্ষ (নির্বাণ) অর্জন রাষ্ট্রের ভেতরে সম্ভব নয়। তাছাড়া, রাজধর্মের মাধ্যমে সব কিছু সম্ভব। ইসলামেও রাষ্ট্র বা খেলাফত (Khilāfat) মোমেন বা বিশ্বাসিগণের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গলের উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার বাহন, ঐক্য স্থাপনের কারণ এবং সৎ জীবনের প্রতীকরূপী ইসলামী রাষ্ট্র কখনও উপেয় নয়, বিশিষ্ট লক্ষ্যে মোমেনদের কে পৌঁছে দিতে কলহ, বিবাদ-বিসংবাদ ও অনৈক্যের পৃথিবীতে উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমানে তাই প্রত্যেক চিন্তাবিদ এই সিদ্ধান্তে একমত। 'রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণ সাধনের বিশিষ্ট উপায় মাত্র ('State is a means to an end and not an end in itself')। ব্যক্তি রাষ্ট্রের স্বার্থে বলি হতে পারে না। ব্যক্তি স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধিই রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি করে।'

রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য ঃ রাষ্ট্র যদি উপায়মাত্র হয়, তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন এভাবে দেখা দেয় ঃ এর উদ্দেশ্য কী?

এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সর্বপ্রকারে সর্বাধিক আকারে সামাজিক কল্যাণ উপলব্ধি করতে সমর্থ করা। তবে রাষ্ট্রের কর্ম সীমাবদ্ধ থাকে লোকের বাহ্যিক আচরণের শোভনতা আনয়নের মধ্যে। চারুকলা, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি মানসিক এবং সৃজনশীল ব্যাপারে রাষ্ট্রের করার কিছুই নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এরিস্টটলের মতে, রাষ্ট্র এসেছে সমাজ জীবন রক্ষা করতে এবং মহত্তম জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ দিতে। জনৈক ফরাসি পণ্ডিতের মতে, রাষ্ট্র মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ, মানুষ রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মাধ্যমে দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি লাভ করবে। এই সুরে সুর মিলিয়ে অধ্যাপক রীচি (Ritchie) বলেছেন, রাষ্ট্র ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবে এবং ফলে তার মহত্তম জীবনের উপলব্ধি ঘটবে।

কিন্তু মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশকে সম্ভব করতে হলে জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা বজায় রেখে প্রত্যেককে এমন অধিকার ভোগ করতে দিতে হবে যাতে সকলে নিজ নিজ বিকাশকে সম্ভব করতে পারে। সুতরাং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রতিও দৃষ্টি থাকা উচিত। অধ্যাপক গার্নার (Garner) তা স্মরণে রেখে রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁর মতে, রাষ্ট্র প্রথমত, সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করবে, তারপর সুবিচারের মাধ্যমে এবং আইনের অনুশাসনের ফলে প্রত্যেকের অধিকারের নিরাপত্তা বিধান করবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উচিত সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা। যা একক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয় না তা সরকারের সহায়তায় অনায়াসে হতে পারে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জনকল্যাণ সাধন করে জনসংখ্যাকে জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে শান্তি, সহযোগিতা ও সহানুভূতির বন্ধন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব-মঙ্গলের পথ রচনা করতে হবে। জাতীয়তাবাদের সাথে আন্তর্জাতিকতার সামঞ্জস্য বিধান করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অধ্যাপক গার্নারের উদ্দেশ্যের কিছুটা পরিবর্তন করে আমেরিকার অধ্যাপক বার্জেস (Burgess) রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন।

তাঁর মতে, **প্রথমত,** রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য মানবতার পরম বিকাশ, বিশ্ব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন এবং সমগ্র পৃথিবীতে ন্যায় ও নীতির শাসন কায়েম করা।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রস্ফুটিত করে সকলকে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা।

তৃতীয়ত, শাসন—শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে রাষ্ট্রীয়. শাসনের সামঞ্জস্য বিধান করা। তবে তিনি এও বলেছেন যে, রাষ্ট্র যদি প্রাথমিক পর্যায়ে শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তির স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে অনায়াসে এবং বিভিন্ন জাতির বিকশিত বৈশিষ্ট্যমালায় বিশ্ব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন হতে বাধ্য, যেমন করে বাগানের বিচিত্র ফুলদলে পূর্ণ সাজি মনোরম হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

Functions of Modern State

রাষ্ট্রের কার্যাবলির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে অধ্যাপক গার্নার তাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ **প্রথমত,** মৌলিক বা একান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাবলি, যা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সম্পাদন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যে সকল কার্যাবলি অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, রাষ্ট্র এই সব কার্য সম্পাদন না-ও করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রকে তাদের প্রতি উদাসীন হলে চলবে না।

তৃতীয়ত, ঐচ্ছিক কার্যাবলি, যা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নয় এবং স্বাভাবিকও নয়। আধুনিককালে কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করা হয় না। আধুনিক লেখকগণের কেউ কেউ, বিশেষ করে অধ্যাপক গেটেল এবং অধ্যাপক উইলোবী নিম্নলিখিতভাবে রাষ্ট্রের কার্যাবলির বিভাগ করেছেন ঃ (১) মৌলিক কার্যাবলি বা মুখ্য কার্যাবলি (Essential Functions) এবং (২) ঐচ্ছিক কার্যাবলি বা গৌণ কার্যাবলি (Optional or non-essential Functions)। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কার্যাবলিকে সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক–এ দু ভাগেও বিভক্ত করা যায়।

১। মৌলিক কার্যাবলি (Essential Functions) ঃ অধ্যাপক উইলোবি (Willoughby) বলেন, এটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, রাষ্ট্রের আয়ত্তে প্রচুর ক্ষমতা থাকা উচিত যার দ্বারা রাষ্ট্র বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিহত করে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, জাতীয় জীবনকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করার সুযোগ দিতে পারে এবং জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষাসহ অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধান করতে পারে" ("It is admitted by all that the state should possess powers sufficiently extensive for the maintenance of its own continued existence against foreign interference, to provide the means whereby its national life may be preserved and developed and to maintain internal order including the protection of life, liberty and property")।

(ক) তাই প্রথম প্রয়োজন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব সংরক্ষণ। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। (খ) তারপর অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী প্রয়োজন। (গ) নাগরিকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জীবন এবং সম্পত্তির উপভোগে কোন উপদ্রব ও বিঘ্নের সম্মুখীন যেন না হয়, তা দেখাও রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। (ঘ) আইন প্রযোজ্য হয়ে নাগরিকগণের মধ্যে চুক্তিসমূহ যেন কার্যকরি হয়, দেশে অন্যায়কারী ও দুষ্কৃতিকারিগণের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান হয় এবং পূর্ণভাবে আইনের অনুশাসনে লোকেরা জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সে জন্য দেশে বিচার বিভাগ ও শাসন

বিভাগের প্রয়োজন অপরিহার্য। (ঙ) সর্বোপরি, সব কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহও রাষ্ট্রকে করতে হয়। কর আদায়ের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, ব্যয় নির্বাহের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

২। ঐচ্ছিক কার্যাবলি (Optional Functions) ঃ ঐচ্ছিক কার্যাবলিই আজকাল প্রধান। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের জন্য তা অপরিহার্য নয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও অবিচার এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নাগরিককে রক্ষা করলেই সমাজ-জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে না। সমাজ জীবনের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন সমাজকে সামগ্রিকভাবে সংগঠন ও পরিচালনা করা। তাই আধুনিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। এ সব কার্যের পরিমাণ ও পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে। এসব কার্যাবলিকে সাধারণত সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক–এ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। সমাজকল্যাণমূলক সে সব কার্যকে সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলি বলা যেতে পারে, যেগুলো জনসাধারণ বা সরকার কর্তৃক সম্পন্ন হয়। রেলপথ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈয়ারি ও মেরামত, খাল খনন, সেতু নির্মাণ, বাজার-হাট-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ, এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলি জনসাধারণের কার্যের কোন সীমা নির্ধারণ করে না; বরং বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর দ্বারাই এগুলো নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারে। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য, পরিচর্যা, জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক ব্যবস্থা ও অন্যান্য জনকল্যাণকর কার্যাবলিকে এ শ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়।

তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সহযোগিতায় অনেক জনকল্যাণকর কার্য সম্প্রতি প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সম্পন্ন হচ্ছে। শিক্ষা বিস্তার, শিল্প ও কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যাবলি এভাবে উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সন্তোষজনক ফল লাভ করছে। তদুপরি, রাষ্ট্র উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এ সব পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে নাগরিকগণের সমগ্র সমাজ জীবনই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে পড়েছে।

রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে মতবাদ
Theories Regarding the Spheres of State Activities

রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি কতটুকু বিস্তৃত হতে পারে, তা নিয়েও অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। নৈরাজ্যবাদিগণের মতে, রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং এর কার্যের সীমা নির্ধারণ অর্থহীন। আবার সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন, রাষ্ট্রের কার্যের সীমা থাকতে পারে না। মানুষের সমগ্র জীবনই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য পরিধি নির্ণয় করবে কে? তাই এ সকল মতবাদ সম্পর্কে সজ্ঞাত হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

নৈরাজ্যবাদ
Anarchism

নৈরাজ্যবাদের শব্দগত অর্থ রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি। এ মতবাদের মূল কথা হলো, মানুষ স্বভাবত সৎ, সরল এবং বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু রাষ্ট্র শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তার উপর পাশবিক বলে বলীয়ান হয়ে আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে শক্তির এই বিষক্রিয়ার প্রভাবে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়েছে, নৈতিকবোধ হারাতে বসেছে এবং একে অপরকে শত্রু জ্ঞান করে সহযোগিতার স্বর্ণসূত্র ছিন্ন করেছে। রাষ্ট্র এবং ধর্ম মানুষকে প্রতারিত করে দুর্নীতিপরায়ণ করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং মানুষকে আবার স্বীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করতে হবে। তখন মানুষ আবার পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা

করে বাসের অযোগ্য এ পৃথিবীকে সুন্দর করে আনন্দে বসবাস করবে। সুতরাং নৈরাজ্যবাদের মতে, রাষ্ট্রের একমাত্র করণীয় রয়েছে এবং তা আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? মৃত্যুর সমন নিজ হাতে স্বাক্ষর করে রাষ্ট্র চিরদিনের মত সমাধিতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। তা না হলে জনগণই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চরম পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

এ মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু এর মূল খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসের স্টোয়িক (Stoic) দার্শনিক জেনোর (Zeno) চিন্তাধারায়। তিনি বলেছেন ব্যক্তি রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে অত্যন্ত সততার সাথে আচরণ করতে সমর্থ। কিন্তু এ মতবাদ নতুন রূপ লাভ করে ইংরেজ চিন্তাবিদ উইলিয়াম গডউইনের হাতে। তিনি ফরাসি বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে মানুষের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই অত্যন্ত তীব্রভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রধান 'অস্ত্ররূপে' অভিহিত করেছেন। তাঁর জামাতা বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলীও শ্বশুরের দার্শনিক তত্ত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন কাব্য ও কবিতায়। কিন্তু গডউইন রাষ্ট্রকে লুপ্ত করতে চান নি। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি লেখক প্রুধাঁ (Proudhon) সর্বপ্রথম তাঁর 'সম্পদ কী'? *(What is Property?)* শীর্ষক গ্রন্থে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের জন্য যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করেন। তিনি রাষ্ট্রকে শ্রেণী স্বার্থের বাহন হিসেবে উল্লেখ করেন এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যাংক চালু করে রাষ্ট্রের ভিত্তি যে অর্থনৈতিক কাঠামো তাকে সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুপ্ত হলে রাষ্ট্র ধ্বংস হবে। তার স্থানে সাধারণ সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতির উদ্ভব হবে এবং মানুষ মুক্তি লাভ করবে।

রাশিয়ায় নৈরাজ্যবাদের প্রচার করেন মাইকেল বাকুনিন (Michael Bakunin) এবং প্রিন্স ক্রপটকীন (Prince Kropotkin)। বাকুনিনের মতে, সর্বপ্রকার শাসন পদ্ধতিই অমঙ্গলসূচক। রাজনৈতিক ক্ষমতা এতই অশুভ যে, তার প্রভাবে মানুষ অত্যাচারী হতে বাধ্য এবং রাষ্ট্র অত্যাচারের নিখুঁত হাতিয়ার। সুতরাং মানবগণের কল্যাণে জগতের এ অশুভ ও অমঙ্গলজনক রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংস যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। প্রিন্স ক্রপটকীন জোরালো ভাষায় বেশ যুক্তিতর্কের অবতারণা করে নৈরাজ্যবাদের ভূমিকা লেখেন। তাঁর মতে, পাশবিক শক্তির ফলস্বরূপ যে রাষ্ট্র, তার তিরোধানে মানুষ এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যাতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণীত হবে তাদের সম্মতি দ্বারা। সে সমাজে কোন শাসনকর্তা থাকবে না, কোন আইন থাকবে না। কেবল প্রথা ও অভ্যাসের বশে লোকে একত্রে বাস করবে। জীব-জগতের অতি সহজ, সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত জীবন দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, সভ্য সমাজও তেমনিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে বসবাস করতে পারবে। জবরদস্তি রহিত করলে এবং অনিচ্ছায় কাউকে কোন কিছু করা থেকে বিরত রাখলে মানুষ আরও বন্ধুভাবাপন্ন হবে এবং সহানুভূতির সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় সমাজের কাজ বণ্টন করে পালন করবে। রাশিয়ার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লুই টলস্টয়ও বলেছেন, বর্তমান শাসনব্যবস্থা খ্রিস্টীয় ধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত এবং তা মানুষকে ধর্মপ্রাণ হতে বাধা দেয়। সুতরাং ধর্মের জন্য এবং ঈশ্বরের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য তিনি রাষ্ট্রকে বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া, এ নৈরাজ্যবাদ সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে এক কালে অত্যন্ত পরিচিত হয়েছিল বিপ্লবীদের নিকট।

অধ্যাপক হাক্সলি (Huxley) নৈরাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, "এটি এমন একটি সমাজব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তির উপর তার নিজস্ব শাসনই একমাত্র সরকার এবং যেখানে একজন তার প্রতিবেশী হিসেবে স্বীকৃত রক্ষামূলক কার্যে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয় না" ("In which the rule of each individual by himself is the only government and legitimacy of which is recognised—one in which he is not concerned into cooperation for the defence of his neighbour")।

নৈরাজ্যবাদিগণ নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য যে কোন প্রকারের সরকারের বিরুদ্ধে ঃ

প্রথমত, রাষ্ট্র জবরদস্তিমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে এবং মানুষের আত্মনির্ভরতা, আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনে তা ধ্বংস করে। রাষ্ট্র তাই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পক্ষেও ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সরকার এই ক্ষমতা লোলুপতার জন্য শাসনকার্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শাসকরা অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জঘন্য। তাই নৈরাজ্যবাদিগণ বিশ্বাস করেন, যেমন করে রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর জোর প্রয়োগ করেছে, তেমনিভাবে ব্যক্তি সরকারের উপর জোর প্রয়োগ করতে পারে।

তৃতীয়ত, নৈরাজ্যবাদীরা বলেন যে, বর্তমান সরকারের অধিকাংশ কার্য সম্মতিভিত্তিক, জোর-জবরদস্তিমূলক নয়। সুতরাং জোর-জবরদস্তিমূলক অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করলে কোন ক্ষতি হবে না, বরং সমাজের অনেক লাভ হবে। প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে নৈরাজ্যবাদিগণের চিন্তাধারাকে ভেবে দেখেছেন। তিনি তাদের আদর্শকে যদিও বাস্তব বলে গ্রহণ করেন নি, তথাপি তাদের পেছনে তাঁর নৈতিক সমর্থন ছিল স্বেচ্ছামূলক কার্যাবলির আদর্শের জন্য।

সরকার সম্বন্ধে নৈরাজ্যবাদিগণের ধারণা পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ নয়। তবে এ সম্বন্ধে তারা একমত যে, যেখানে সহযোগিতামূলক সংস্থা ও সমবায় সমিতির মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকবে, তাদের ভিত্তি হবে জনগণের সম্মতি। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে, চুক্তি ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করতে হলে উক্ত সমবায় সমিতিসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেখানে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য এবং দায়িত্ববোধের চরম বিকাশ ঘটবে এবং পাশবিক বলের অধ্যায় চিরদিনের মত তিরোহিত হবে।

সমালোচনা (Criticism) ঃ প্রথমত, নৈরাজ্যবাদ বাস্তবের ধার ধারে না। এ মতবাদ মানুষের স্বভাবের সঠিক অনুধাবন করে নি। মানুষ, যে শুধু মানুষ দোষগুণে মিশ্রিত এবং ভালমন্দের সংমিশ্রণে মানুষ, নৈরাজ্যবাদিগণ তা স্বীকার করেন নি। তাঁরা মানুষকে এক লাফে দেবত্বের আসনে বসিয়েছেন। মানুষের মনে ভালমন্দের দুই তারে সমভাবে ঝংকার তুলে। এ কথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা সরকার বা শাসনের স্বরূপ সঠিকভাবে অনুধাবন করেন নি। সরকার বা দলপতির ভূমিকা যে অপরিহার্য, তা কিরূপে অস্বীকার করা যাবে? মানুষ তো দূরের কথা, কীট পতঙ্গ ও উন্নত ধরনের প্রাণীর মধ্যেও নেতৃত্বের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

তৃতীয়ত, ইতিহাসেও এমন কোন নজীর নেই, যেখানে 'মানুষ শাসন ও কর্তৃত্ব' ছাড়া পরস্পরের সহযোগিতায় শান্তি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। রাষ্ট্র বা সরকারকে ধ্বংস করলেও তার স্থলে আর এক ধরনের কর্তৃত্ব গড়ে উঠবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সর্বশেষে, এও বলা যায় যে, নৈরাজ্যবাদিগণের মতে সমবায় সমিতিসমূহ যে সহযোগিতামূলক ভূমিকা গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আর এক রকম কর্তৃপক্ষের আবির্ভাব অবশ্য প্রয়োজনীয় হবে। সুতরাং নৈরাজ্যবাদে শুধু কতকগুলো ভাবাবেগপূর্ণ কথামালা রয়েছে। যুক্তির কষ্টি পাথরে বিচার করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হয়। তবে এই মতবাদে সরকারের ব্যর্থতা ও অত্যাচারের কথা বর্ণিত হওয়াতে চিন্তার ক্ষেত্র কিছুটা প্রসারিত হয়েছে বই কি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথা ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা অত্যন্ত মূল্যবান। সামাজিক জীবনের রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তিই নায়ক, ব্যক্তিই নায়িকা, এমন কী ব্যক্তির হাতেই বিদূষকের

ভূমিকাও ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সাধিত হবে। রাষ্ট্র একটি "ক্ষতিকর অথচ অবশ্য প্রয়োজনীয় সংস্থা" ('A necessary evil')। সমাজে অন্যায় আছে। চুক্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। আরও বহুবিধ ব্যাপারে দুষ্কর্মের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রাষ্ট্রের মত ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কার্যসীমা শুধু শান্তি রক্ষামূলক ও দমনমূলক কার্যের সীমারেখার মধ্যেই নিহিত থাকা উচিত। কোন প্রকার উন্নয়নমূলক কার্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাই স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রকে শান্তিমূলক রাষ্ট্র (Police State) বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ফরাসি দেশের ফিজিওক্র্যাট (Physiocrat) পণ্ডিতগণ সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'মার্কেণ্টাইলিস্ট' পণ্ডিতগণের মতের বিরুদ্ধে আর্থিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রক্ষামূলক নিয়ন্ত্রণ বিধি হ্রাস করার ঘোষণা দেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোকের যত বেশি স্বাধীনতা থাকবে, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গলজনক, এই ছিল তাদের মত। 'ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ' যাঁকে পুঁজিবাদী সমাজের গুরু বলা হয়—এ সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রচার করেন। তিনিই 'ওয়েলথ অব নেশনস' *('Wealth of Nations')* গ্রন্থের লেখক এডাম স্মিথ (Adam Smith)। তাঁর মতে, অবাধ বাণিজ্যের সুযোগই কোন জাতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার প্রকৃষ্টতম পন্থা। তাই তিনি আর্থিক ক্ষেত্রে অবাধ নীতির (Laissez Faire or let Alone) গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদের পুরোধা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)। তিনি বলেন, কেবল অপরের অনিষ্ট করা থেকে নিবৃত্ত করা ছাড়া কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে সমাজ বাধ্য করতে পারে না। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছামত কিছু করতে পারে শুধু একটি মাত্র শর্তে যে, সে অপরের অনুরূপ স্বাধীনতায় যেন হস্তক্ষেপ না করে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের তিনটি মাত্র কাজ আছে এবং তা হলো— বিচার করা, ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা এবং বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইনের বিবর্তনবাদও এ স্বাতন্ত্র্যবাদকে আরও জনপ্রিয় করে তুলে এবং "উপযুক্ততমের বেঁচে থাকার মতবাদ" (Survival of the Fittest) এর সাথে সংযুক্ত হয়। সুতরাং এই সব চিন্তাধারার সংমিশ্রণে স্বাতন্ত্র্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত প্রভাবশালী এক মতবাদে পরিণত হয়। এ মতবাদকে সাধারণত চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে : (১) দার্শনিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ, (২) আর্থিক দিক, (৩) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ ও (৪) জীববিদ্যায় প্রচলিত বিবর্তনবাদের অভিব্যক্তিস্বরূপ।

দার্শনিক (Philosophical) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ব্যক্তিকে বিনা নিয়ন্ত্রণে কাজ করার স্বাধীনতা দান করলে সে তার জীবনকে চরিতার্থ করতে পারবে। মানুষের আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতাই তার উন্নতির সোপানস্বরূপ। কিন্তু যদি রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত বাধানিষেধ সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তার দায়িত্ববোধ জন্মে না। তাছাড়া, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা মনুষ্যত্বের অপমানজনক। ফলে তার মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয়। তাই মাইকেল বাকুনিন বলেন, "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষের যুক্তির মতবাদ। তা মানুষকে সর্বতোভাবে গড়ে তুলে এবং পূর্ণ অধিকার উপভোগে সাহায্য করে।

তথাপি এ সব যুক্তিকে খুব শক্তিশালী বলে মনে হয় না। প্রত্যেক লোকেরই যে ভালমন্দ বোঝার সমান ক্ষমতা আছে, তা নয়। তা যদি থাকত, তাহলে দায়িত্বহীনতার যে পরিচয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে পাওয়া যায় তা হত না। আত্মনির্ভরতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করার জন্য প্রথমে দুর্বলকে সাহায্য করার প্রয়োজনও রয়েছে।

আর্থিক (Economical) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আর্থিক ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করে না। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থ ভাল রকম বুঝে। ফলে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করলে, যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন গ্রহণ করলে এবং চুক্তিবদ্ধ হলে সকলের সুখ-সুবিধা বেশি হবে।

উৎপাদনের চারটি উপাদান-ভূমি, শ্রম, মূলধন ও পরিচালনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে। ফলে কম খরচে জিনিস তৈরি হয় এবং সকলে অল্প দামে জিনিসপত্র ভোগও করতে পারে। মজুরগণ স্বাধীনভাবে চুক্তি করলে অধিক মূল্যে শ্রম বিক্রয় করতে পারে। ভূমির খাজনাও বৃদ্ধি পায়। পরিচালকের লভ্যাংশ ও মূলধনের সুদ অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং চারটি উপাদানই যদি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় তবে উৎপাদনের গতি বেড়ে যায় এবং যোগান ও চাহিদার প্রতিক্রিয়ার ফলে দ্রব্যমূল্যে সমতা আসে।

কিন্তু এ সকল যুক্তি মনে হয় কারখানার মালিকগণের যুক্তি। গরীব শ্রমিকের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কোথায়? তাদের সবার স্বাধীনতা আছে সত্যই, তবে তেমন স্বাধীনতা ভোগে কে উদ্বুদ্ধ হবে? সুতরাং যে বেতন তাদের দেয়া হয়, পেটের জ্বালায় সে বেতনেই তারা কাজ করতে রাজি হয়। শ্রমিককে কম বেতন দিলে উৎপাদনের খরচ কম হয় তা এখানে স্বীকার করা হয় নি। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এ যুগে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানিকে উৎসাহ দান রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যের মধ্যে অন্যতম। ছোট শিল্পকে বড় শিল্পের হাত থেকে রক্ষা করা ও একচেটিয়া শিল্প বাণিজ্যের কবল থেকে ক্রেতাদিগকে রাষ্ট্র ছাড়া কে রক্ষা করবে? প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই অনেক সময় মঙ্গলজনক কিন্তু তা হতে হবে সমানে সমানে। একজন মজুর একজন শিল্পপতির সাথে সমান তালে প্রতিযোগিতা করতে অসমর্থ।

ঐতিহাসিক (Historical) ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আর একটি যুক্তি এই যে, কোন কাজ সরকারের হাতে ছেড়ে দিলে তা দক্ষতার সাথে নিষ্পন্ন হবার সম্ভাবনা কম। একটি প্রবাদও রয়েছে "ভাগের মা গঙ্গা পায় না"। সুতরাং সরকারি কাজে কারো মমত্ববোধ নেই। দাম ও মজুরি বেঁধে দিতে গিয়ে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু তাও ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। সরকারি কারখানায় কর্মচারিগণ অনিপুণ, ব্যক্তিগত মালিকানায় তারা নিপুণ হবে, এরূপ যুক্তি অচল। অনেক সরকারি কারখানায় দক্ষতা অসাধারণ। তাছাড়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিরা ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের বিরোধ কল্পনা করেছেন, তা কিন্তু সত্য নয়। পুঁজিবাদী অনেক রাষ্ট্র-ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে-রাষ্ট্রের কাজকর্ম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হয় নি। বরং রাষ্ট্রই দুর্বলকে রক্ষা করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশে যথাযোগ্য সাহায্য করে ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে।

জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের অস্তিত্ব রক্ষা (Survival of the Fittest) ঃ ডারউইনের জীবন সংগ্রাম ও যোগ্যতমের অস্তিত্ব রক্ষার সিদ্ধান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের নিকট একটি প্রিয় যুক্তি। ডারউইনের মতে, সরকারি সাহায্যে দুর্বলকে বাঁচিয়ে রাখা না হলে সবল ও কার্যক্ষম ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাজ পূর্ণ হয়ে গৌরবের অধিকারী হবে এবং তা না হলে জাতির উন্নতির আশাও কম। জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে, আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে যারা জয়ী হয়, তারাই সমাজে যোগ্যতম সদস্য। সুতরাং রাষ্ট্র জনহিতকর ও মঙ্গলজনক কার্য থেকে বিরত থেকে জীবন সংগ্রামের নীতিকে পূর্ণরূপে কার্যকরী হতে দিক, তাই কাম্য। ফলে সমাজ বলিষ্ঠ, কর্মদক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ হবে এবং সর্বাত্মক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এ যুক্তি একেবারেই অচল। প্রাণী জগতের এ নীতি বিবেকবান মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া ঠিক নয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপযোগিতা (Individualism of Utility) ঃ যদিও বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পেছনে যুক্তিরাজিকে অচল বলে ধরা হয় এবং নীতিকে সেকেলে বলা হয়, তথাপি এর ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। এ মতবাদের ফলে অনর্থক ও অহেতুক সরকারি হস্তক্ষেপের হাত থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। তাছাড়া, এ মতবাদ সমাজে ব্যক্তির গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্যক্তি আর

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না অথবা থাকতেও পারে না। ব্যক্তিমাত্রই বর্তমানে আর্থিক, সাংস্কৃতিক সংঘের সদস্য। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানেই বিভিন্ন সংঘের স্বাতন্ত্র্য। এ সব সংঘ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে রাষ্ট্র ব্যক্তি এবং সংঘের জীবনে নতুন এক আলোক এনে দিয়েছে যার ফলে সবাই উপকৃত হচ্ছে এবং সমাজ জীবন উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। ফরাসি লেখক লাভলে (Loveleye) সত্যই বলেন, সভ্যতার বহুমুখী বিকাশের সাথে দিন দিন মানুষ পরস্পরের প্রতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি খর্ব করতে চায়, সমাজতন্ত্রবাদ ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের কার্যসীমাকে ততটুকু বর্ধিত করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে চায়। অধ্যাপক এলির (Ely) মতে, "সমাজতান্ত্রিক সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজ জীবনকে সংঘবদ্ধ করতে চায় এবং সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা বণ্টন করে মানবতাকে উন্নত করতে চায়।" ("A socialist is one who looks to society as organised in the state for aid in bringing about a more prefect distribution of economic goods and elevation of humanity")। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিরোধান করে উৎপাদনের প্রত্যেকটি উৎসকে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করতে চায় এবং অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধাগুলো পরস্পরের মধ্যে বণ্টন ও বিনিয়োগ করে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনয়ন করতে চায়। এর মূল কথা এই যে, রাষ্ট্র একটি ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্র একটি মঙ্গলজনক এবং হিতকর প্রতিষ্ঠান এবং মানুষকে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সাহায্য করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রকে নাগরিকগণের "বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক" ('friend, philosopher and guide') বলা হয়। সুতরাং মানবের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের পরিচালনা সর্বব্যাপী হওয়া দরকার, যেন মানবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার শুভ হাতের পরশে সকলকে মহিমামণ্ডিত করতে পারে। নৈরাজ্যবাদিগণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ যেমন রাষ্ট্রকে ক্ষতিকর ও অশুভ প্রতিষ্ঠান বলে তার হাত পা বেধে তাকে যতদূর সম্ভব অকেজো করতে চান, সমাজতন্ত্রবাদিগণ তার চেয়ে জোরালো ভাষায় রাষ্ট্রকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান। রাষ্ট্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে আরম্ভ করে রোগীর সেবা, দুর্বলের সাহায্য এবং অনাথ-আতুরের রক্ষামূলক কার্যেও আত্মনিয়োগ করবে।

সমাজতন্ত্রবাদের যুক্তিসমূহ (Arguments for Socialism) : প্রথমত, বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং শ্রেণী স্বার্থের ভয়াবহ কুফল থেকে মানুষকে মুক্ত করে। রাষ্ট্র উৎকৃষ্টতর ধন বণ্টন প্রথা প্রবর্তন করে উৎপাদন ও ধন বণ্টনের উৎসগুলোর উপর সর্বজনীন ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের বিলোপসাধন করে সমাজে এক নতুন প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করে। সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত গণতন্ত্র টিকতে পারে না। তাই সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংস্করণ বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উৎসসমূহ ব্যক্তিগত দখলে থাকা ন্যায়নীতি বিরোধী। ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ প্রকৃতির দান। প্রকৃতি যেমন তার সম্পদকে মুক্ত হস্তে সকলের জন্য দান করে থাকে, তেমনি আলোবাতাসের মত প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমিকেও সকলে উপভোগ করুক তাই প্রকৃতির অভিপ্রেত বলে মনে হয়।

তৃতীয়ত, উৎপাদনের laissez faire বা অবাধ নীতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এর ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন, কম মজুরি, বেকার সমস্যা, প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন, প্রচারের প্রয়োজনীয়তা হেতু অতিরিক্ত ব্যয় প্রভৃতি সমস্যার উদ্ভব হয়—এর কোন সুফলই দেখা যায় না। সুতরাং এ উৎপাদনক্ষেত্রে এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে যাতে প্রয়োজনকে সামনে রেখে উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

চতুর্থত, এও সকল সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজে সমষ্টিগত স্বার্থের বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ জনকয়েক স্বার্থপর লোককে নিয়ে গঠিত নয়। প্রত্যেকের আশা-আকাংক্ষা ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিষয়সমূহ ভাবতে হবে। ফলে সমাজতন্ত্রবাদই সঠিক সমাধান।

সর্বোপরি, এটি বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিযোগিতার স্থলে সমাজে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে। পরীক্ষিত সত্য যে, সহযোগিতাই সমাজে গঠনমূলক কিছু করতে সমর্থ হয়েছে। ডাক বিভাগ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরকারের সাথে লোকদের সহযোগিতা আশ্চর্যজনকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

সমালোচনা ঃ সমাজতন্ত্রবাদ যুগে যুগে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথমত, সমালোচকেরা বলেন যে, উৎপাদনের উৎসগুলো রাষ্ট্রের আয়ত্তে এলে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। আমলাগণ ভুল-ভ্রান্তি করতে পারে। স্বজন-প্রীতি ও তোষণ নীতির ফলে যোগ্য ব্যক্তিগণকে দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হবে। জোটবদ্ধ হয়ে নিজেদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি বাড়িয়ে নিতে পারে। উৎপাদনের খরচ বাড়বে। ফলে ক্রেতা ও করদাতাগণ অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং আরও অনেক আনুষঙ্গিক সমস্যার উদ্ভব হবে। সুতরাং আমলাশাহীর প্রতিষ্ঠা জাতীয় জীবনকে দুর্নীতির কবলে নিক্ষেপ করবে।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক গার্ণার বলেন, 'চরম সমাজতন্ত্রীদের চিন্তাধারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃতি এবং মানব মনের বিচিত্র ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত অবাস্তব ও কাল্পনিক বলে মনে হয়' ("The idea of the extreme socialists are in many respects fantastic and would prove impracticable both on accounts of response to economic character and others which are inherent in the constitution of human nature itself")।

তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত লাভের মনোভাবকে তিরোহিত করে শিল্পে ও বাণিজ্যে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও সৃজনী মনোভাবকে দমিয়ে দেয়। ফলে উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং অযোগ্যতা ও স্থবিরতায় সমাজ জীবন কলঙ্কিত হয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ও আচরণ প্রভৃতি একমুখী হয়ে যেন জগদ্দল পাথরের ন্যায় ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তি-প্রেরণাকে পিষে ফেলে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খুব অল্পই থাকে।

চতুর্থত, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব থাকে। সে দলের অধিনায়ক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কোথাও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

পঞ্চমত, ধনতন্ত্রের সাথে যুদ্ধের এবং সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। যুদ্ধ না বাধলে পুঁজিপতিগণ অস্বাভাবিক লাভ করতে পারে না। তাই যুদ্ধের উস্কানি দিয়ে তারা সামাজিক জীবনে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরাও রাষ্ট্রের গৌরব এবং সমৃদ্ধির জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য খুব কম খরচ করে না।

পরিশেষে, এও বলা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কোনটিই আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যসীমা ও পরিধি নির্ণয় করে না। বরং উভয়ের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণই আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বেলায় প্রযোজ্য। আধুনিক রাষ্ট্র শুধুমাত্র শান্তি রক্ষামূলক রাষ্ট্রই নয়, জনকল্যাণের সকল প্রকার কাজ করে থাকে। সুতরাং উভয়ের সংমিশ্রণই সাধুপথ। একদিকে যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা সমাজ জীবনের সুষ্ঠু পরিবেশের পক্ষে অপরিহার্য, অন্যদিকে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে কিছু সমাজতান্ত্রিক পন্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ধনগত বৈষম্য কিছুটা দূরীকরণ অবশ্য প্রয়োজন। কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভবপর নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেকার সমস্যা নেই।

তদুপরি, সমাজতন্ত্র স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করে কল্যাণকর সহযোগিতা স্থাপিত করে এবং তা সমাজ উন্নয়নের জন্য একান্ত আবশ্যকীয়। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি বিশ্ব মানবের দিকে নিবদ্ধ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা নতুন এক অধ্যায় রচনা করেছে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
Welfare State

আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনকল্যাণ সাধনই বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। অতীতে শান্তি এবং শৃংখলা বিধান করাই ছিল রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা, অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা করা, অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ দমন করাই ছিল রাষ্ট্রের মৌল কার্য। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলি উল্লিখিত সীমারেখায় সীমিত থাকা উচিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill) প্রমুখ লেখক বলেন, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা বিধান, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা, অপরাধীদের শাস্তি বিধান প্রভৃতিই রাষ্ট্রের মৌল কাজ। তাছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোন কাজ নেই। এ সব কারণে রাষ্ট্রকে বলা হত পুলিশী রাষ্ট্র (Police State) এবং বিশ্বাসী করা হতো, "রাষ্ট্র একটি ক্ষতিকর অথচ প্রয়োজনীয় সংস্থা" ('a necessary evil')।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে রাষ্ট্রের কার্যসীমা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনোভাবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র প্রতিহত বা প্রতিরোধই করবে না, জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্র তার **'বন্ধু, দার্শনিক ও পরিচালক'** ('Friend, philosopher and guide') হিসেবে প্রত্যেকটি সেবামূলক এবং গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার সাধনের জন্য সচেষ্ট হবে। তখন থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (welfare state) হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা
Definition of Welfare State

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক ধরনের রাষ্ট্র যা জনগণের সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ শান্তি–শৃংখলা বজায় রাখে, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে, অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান করে, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান আনয়ন করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে। সংক্ষেপে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই হলো জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং কার্যাবলি
Functions and Characteristics of Welfare State

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমত, যেহেতু রাষ্ট্র জনকল্যাণ অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছে তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে তা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী করা, শিক্ষা ব্যয় হ্রাস করা, দরিদ্র জনসাধারণের নিকট শিক্ষাকে সহজলভ্য করা, শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনের উপযোগী করা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির কল্যাণার্থে রাষ্ট্র জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ ক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের একমাত্র মানদণ্ড হবে জনগণের কল্যাণ।

তৃতীয়ত, জনগণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য দরিদ্র ও দুঃস্থদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে বেকারদের বেকার ভাতা (unemployment allowance), কর্মহীনদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য দান, দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা (health Insurance), প্রবীণ ও বৃদ্ধ নাগরিকদের সংস্থান (welfare of the senior citizens), দুর্ঘটনা কবলিতদের জন্য ভাতা, গৃহহীনদের জন্য সর্বনিম্ন মানের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। এ লক্ষ্যে অর্থ আদায়ের জন্য সমাজের বিত্তবানদের উপর করারোপ, শিল্প-বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

চতুর্থত, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ব্যক্তি মালিকানা (private ownership) নিয়ন্ত্রিত হয়, সরকারি মালিকানার (public ownership) ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং জাতীয়করণ নীতি গৃহীত হয়। মূলত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অর্থনীতি মিশ্রিত (mixed) চরিত্রের। বিনিয়োগ সীমিত না হলেও এই ধরনের রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ আয়ের সীমারেখা নির্ধারিত হয়।

পঞ্চমত, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে রাষ্ট্র মনোযোগী হয় এবং গণ মনে নতুন চেতনা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় সমধিক।

ষষ্ঠত, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে (full employment) লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মৌল চাহিদা (basic needs) মিটানোর প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। শ্রেণী স্বার্থের পরিবর্তে এই ধরনের রাষ্ট্রে গণস্বার্থ প্রাধান্য লাভ করে।

সর্বশেষে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আর্থিক পরিকল্পনার (economic planning) উপর নির্ভর করা হয় এবং ভবিষ্যতে সমাজের রূপরেখা কেমন হবে তার দিক নির্দেশ করা হয়। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জনগণের সর্বনিম্ন জীবন মান অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গৃহীত হয়।

১। 'রাষ্ট্র উদ্দেশ্য সাধনের উপেয় মাত্র, উপায় নয়।' আলোচনা কর। ('State is a means to an end, not an end in itself.'—Discuss.)।

২। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ আলোচনা কর। (Analyse the ends and goals of the state.)

[N. U. 1998]

৩। তোমাদের মতে রাষ্ট্রের উপযুক্ত কার্যাবলি কী হওয়া উচিত? (What in your opinion should be the proper functions of the state?)

৪। শান্তি রক্ষায় ব্যাপৃত রাষ্ট্র ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? (How is the police state distinguished from the welfare state?)

৫। নৈরাজ্যবাদের পর্যালোচনা কর। কমিউনিজমের সাথে এর প্রভেদ কোথায়? (Critically examine the theory of anarchism. How does it differ from communism?)

৬। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথা কী? এর যথার্থ মূল্যায়ন কর। (What is the key note of individualism? Discuss this and bring its evaluation.)

৭। সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝ? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। (What is meant by socialism? Argue for and against it.) [N. U. 1998]

৮। নাগরিকগণের উন্নত নৈতিক জীবনের জন্য কাজ করা রাষ্ট্রের পক্ষে কতখানি সম্ভব এবং তা কতটকু করে? (How far, if it all, is it the business of the state to secure a good moral life of its citizens?)

৯। রাষ্ট্রের মৌলিক ও গৌণ কার্যাবলি কাকে বলে? প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং মুদ্রা ব্যবস্থা মৌলিক না গৌণ কার্য? (What is meant by essential and non-essential functions of the state? Whether defence, food rationing, education, public health and currency are essential or non-essential functions?)

১০। সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ। (Write an essay on socialism.)

১১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ। (Write a short essay on individualism.)

১২। সমাজতন্ত্রবাদ বলতে কী বোঝ? সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (What do you mean by socialism? Distinguish between socialism and individualism.)

১৩। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলি কী? আলোচনা কর। (What are the functions of a modern state?)

১৪। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (What is a welfare state? Discuss its characteristics.) [N. U. 1996]

১৫। আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি আলোচনা কর। তুমি কী মনে কর আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র? (Discuss the ends and functions of state. Do you think the modern state is a welfare state?) [N. U. 1997]

সমাজতন্ত্রবাদ ও ফ্যাসীবাদ

৩১

SOCIALISM AND FASCISM

সূচনা
Introduction

সমাজতন্ত্রবাদের বহু শাখা রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক শাখারই মূলকথা এই যে, উৎপাদনের উপাদান ও উৎসসমূহ রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে, উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হবে এবং রাষ্ট্র সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।তবে কিভাবে উৎপাদন রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে অথবা কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিরোহিত হবে সে সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতবাদ রয়েছে।

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা
Definition

সমাজতন্ত্র (Socialism) বলতে এমন এক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদান সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, বণ্টন এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থা সমাজ কর্তৃক পরিচালিত এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিরোহিত, না হয় নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদন, বণ্টন এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ—এ দুটি সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সর্বব্যাপক। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমাজতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি
Philosophical Bases of Socialism

সমাজতন্ত্রের কতকগুলো দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ (ক) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের আকাঙ্ক্ষা; (খ) মানব প্রকৃতি সম্পর্কে উচ্চতর ধারণা; (গ) শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া; (ঘ) পুঁজিবাদের কুফল, এবং (ঙ) সম্পত্তি সম্পর্কে নতুন ধারণা।

(ক) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের আকাঙ্ক্ষা ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার জয়গান করা হয়েছে, সমাজতন্ত্রের তেমনি মূল আবেদন হলো সাম্য। সমাজতন্ত্রীদের মতে, রাজনৈতিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগের নিশ্চয়তা যথেষ্ট নয়। শ্রেণীগত বৈষম্য ও সম্পদের ক্ষেত্রে অসমতা বজায় রেখে সাম্যের কথা বলা অর্থহীন। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, সকল প্রকার অসমতা অন্যায় এবং অস্বাভাবিক। সুতরাং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্রীরা সমাজকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে আগ্রহী।

(খ) মানব প্রকৃতি সম্পর্কে উচ্চতর ধারণা ঃ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় এবং সহযোগিতাকামী, সংঘর্ষমূলক বা প্রতিযোগী নয়। সামাজিক ডারউইনবাদীদের (Social Darwinist) "জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার" (Survival of the fittest) তত্ত্ব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়

সমাজতন্ত্রে। মানুষ যেহেতু শান্তিপ্রিয় এবং সহযোগিতাকামী, এ জন্য সমাজে সর্ব প্রকার কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা দূর করে সমাজকে পুনর্গঠন করতে সমাজতন্ত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

(গ) শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কুফল দেখা দেয়, বিশেষ করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এবং দীর্ঘকালীন শ্রমদান, কর্মস্থানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিশু ও মহিলা শ্রমিকদের উপর উৎপীড়ন, শিক্ষা ও বাসস্থানের অব্যবস্থা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের আবেদন বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) পুঁজিবাদের কুফল ঃ শিল্প বিপ্লবের পর পুঁজিবাদের যে সকল কুফল দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে সমাজে সীমাহীন অপচয় এবং অদক্ষতা উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যের জন্য বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার, জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব-এ সকল অনেক চিন্তাবিদকে ভাবিয়ে তোলে। সেন্ট সাইমন (Saint Simon) এবং চার্লস ফুরিয়ের (Charles Fourier) পুঁজিবাদের এ সব অপচয়কে অত্যন্ত জোরেসোরে আক্রমণ করেন।

(ঙ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে নতুন ধারণা ঃ সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে যে ধারণা বিদ্যমান তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভূমি ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ যেহেতু ঈশ্বরের দান, তাই এ সকল সম্পদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।তাই সমাজকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটানো বা তার নিয়ন্ত্রণ সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক শাখারই মূল কথা, উৎপাদনের উপাদান ও উৎসের উপর সমাজের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সকলের স্বার্থে রাষ্ট্রের ব্যাপক কর্তৃত্ব ও প্রভাব।তবে উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রিত হবে এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন শাখায় ভিন্নমত রয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কল্পনা বিলাসী সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism), গণতান্ত্রিক বা ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র (Fabian Socialism), খ্রিস্টিয় সমাজতন্ত্র (Christian Socialism), সংঘমূলক সমাজতন্ত্র বা সিণ্ডিক্যালিজম (Syndicalism), পেশাভিত্তিক সমাজতন্ত্র বা গিল্ড সোশ্যালিজম (Guild Socialism) এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism)।

নিচে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন শাখার আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

১। কল্পনা বিলাসী সমাজতন্ত্রবাদ বা ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজম (Utopian Socialism) ঃ সমাজতন্ত্রকে যারা কল্পনার নেত্রে দেখেছেন এবং যাঁদের চিন্তাধারার সাথে বাস্তবতার যোগসূত্র অতি অল্পই রয়েছে অথবা যাঁরা কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেন নি তাঁদের 'কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রবাদী (Utopian Socialists) বলা হয়। ইংল্যাণ্ডের টমাস ম্যুর (Thomas Moore), জেমস হ্যারিংটন (James Harrington), ফ্রান্সের লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) ও সেন্ট সাইমন (Saint Simon) প্রমুখ চিন্তাবিদ ও লেখককে এই পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে টমাস ম্যুর **'ইউটোপিয়া'** *(Utopia)* নামক একখানি গ্রন্থ লেখেন। তাঁর গ্রন্থের নাম থেকেই 'ইউটোপিয়া' (Utopia) কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। গ্রীক ভাষায় ইউটোপিয়া (Utopia) শব্দের অর্থ 'কোথাও না' বা অবাস্তব। কিন্তু তিনি ইউটোপিয়া (Utopia) গ্রন্থে যা বলেছেন, তা যুগে যুগে বহু চিন্তাবিদকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তা মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। Utopia-কে আমরা স্বর্গরাজ্য নামেই অভিহিত করব এই আলোচনায়। ম্যুরের (Moore) স্বর্গরাজ্যে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। সেখানে লোক প্রতিযোগিতা না করে সহযোগিতাই করে। কেউ প্রাচুর্যের ভারে

উচ্ছৃংখল নয়। আবার কেউ দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে নিরন্ন হয় না। প্রত্যেককে দিনে ছয় ঘণ্টা খাটতে হয়। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অনাথ, আতুরগণের বিনাশ্রমে খাবারের সুবন্দোবস্ত আছে। সরকার গঠিত হয় সাধারণ নির্বাচনে এবং নির্বাচিত সরকার জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে লেখাপড়া শিখবে। ইচ্ছামত ধর্ম চর্চা করবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে। মোটকথা, ম্যুরের সাম্যবাদের চিত্র পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু মর্ত জগতে এই স্বর্গরাজ্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোন সন্ধান এতে দেয়া হয় নি। তথাপি ভাবতে আশ্চর্য লাগে এ জন্য যে, তখন শিল্প বিপ্লব আরম্ভ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিভাবে সাম্যবাদের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছেন।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে জেমস হ্যারিংটন **"ওসিয়ানা"** *(Oceana)* গ্রন্থে সাম্যবাদের আর একদিক তুলে ধরেন। তাঁর গ্রন্থে বলা হয়েছে, মানুষকে শাসন করার অধিকার মানুষের হাতে দেয়া হয় নি। তা আইনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর মতে, যাঁদের হাতে সম্পত্তি থাকে তাঁরাই শাসন করেন। সে জন্য শাসন ক্ষমতায় সমতা রক্ষার জন্য প্রত্যেকের হাতে সমানভাবে সম্পত্তি বণ্টন করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সকল বিরোধের যে মূল তা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) ঃ লুই ব্লাঁ সাম্যবাদের মূলনীতি ঘোষণায় বলেন যে, প্রত্যেকে নিজের ক্ষমতা অনুসারে কাজ করবে। কিন্তু প্রয়োজন মত অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাবে। তাঁর মতে বিপ্লবের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়নই শ্রেয়।

সেন্ট সাইমন (Saint Simon) ঃ সেন্ট সাইমন তাঁর **নিউ ক্রিশ্চয়ানিটি** গ্রন্থে *(New Christianity)* সমাজ-জীবনকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনানুসারে পারিশ্রমিক পাবে। ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি সমতার পক্ষপাতী। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদকে অন্যায় ও বে-আইনী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড বেলর্লামি তাঁর **'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড'** *(Looking Backward)* গ্রন্থে কল্পনার ক্ষেত্রে প্রায় দেড়শত বছর পরের কথা দেখতে চেয়েছেন। তিনি কল্পনা করেছেন যে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে শিল্প পদ্ধতির এমন অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হবে যে, প্রত্যেকের জীবনের মান শতকরা দুইশত গুণ উন্নত হবে। তখন জমি, কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানসমূহ সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে। সুখ-সুবিধার উপাদানসমূহ এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে যে, মুদ্রা ও ব্যাংকবিধি রহিত হবে। তখন রাষ্ট্র বা সরকার আর প্রয়োজন হবে না। শ্রমিকগণের সংঘ বা গিল্ড (guild) মানুষের আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে। কেউ কেউ এই আদর্শবাদকে বাস্তবে রূপ দিতেও চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে।

ইংল্যাণ্ডের রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) ঃ রবার্ট ওয়েন নিউ লানার্ক (New Lanarc) নামক স্থানে শ্রমিকগণের সমবায়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কাপড়ের কলের মালিক। ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি গঠনের কথা তিনি জোরেসোরে প্রচার করে গিয়েছেন।

এ সকল কল্পনাবিলাসীগণ তাঁদের মহান কল্পনায় ছিলেন বিভোর। বাস্তবে তা কীভাবে রূপায়িত করা সম্ভব সে সম্বন্ধে তাঁরা তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সিদ্ধান্ত দানে সমর্থ হন নি। তথাপি তাঁদের অমর চিন্তাধারা ও মহান আদর্শ যুগে যুগে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। মানুষের মনে দুর্জয় আশা ও আকাংক্ষা জাগিয়ে তুলে তাদের বলিষ্ঠ আদর্শ গ্রহণে আগ্রহী করেছে।

২। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ বা ফেবিয়ান সোশ্যালিজম (Fabian Socialism) ঃ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ ইংল্যাণ্ডের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তার নাম 'ফেবিয়ান সোসাইটি'। এই সোসাইটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক বিষয়ে গবেষণার জন্য এটি একটি কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্র থেকে বহু পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষকের উপর তার অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যাণ্ডের লেবারপার্টি এই ফেবিয়ান সোশ্যালিস্টগণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডের অনেক শাসন সংস্কার প্রবর্তন করে। এর সাথে তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণের নাম জড়িত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ডশ', এইচ. জি. ওয়েল্স, শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী গ্রাহাম ওয়ালাস, শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সিডনী ওয়েব ও বিয়াঁট্রিস ওয়েব, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি. ডি. এইচ. কোল. স্বনামধন্য অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ।

ফেবিয়ান সোসাইটি রূপক নামে ছদ্মবেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রহী হয়। নামটি গ্রহণ করা হয়েছিল রোমান সেনাপতি ফেবিয়াসের নামানুসারে। যখন কার্থেজের মহাবীর হ্যানিবলের (Hannibal) সাথে রোমান জাতি সংগ্রামে রত ছিল তখন রোমান সেনাপতি ফেবিয়াস সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল এ জন্য যে, অপেক্ষা করতে করতে যখন কার্থেজের বীর সেনানী দুর্বল হয়ে পড়বে তখন সুযোগ বুঝে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দেবেন। হয়েছিলও তাই এবং হ্যানিবলের সমকক্ষ না হয়েও শেষ পর্যন্ত ফেবিয়াস জয়যুক্ত হন। সুতরাং অপেক্ষা করার নীতি গ্রহণ করার ফলে তার নাম হয়েছিল 'ফেবিয়ান সোসাইটি'।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লব চায় না। লোকজনের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেও তাদেরকে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং গণতন্ত্রের অসাধুতা বুঝিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী তাঁরা। শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমে সহযোগিতা কামনা করেন। পার্লামেণ্টারী শাসন প্রথাকে বজায় রেখে ধন উৎপাদনের উপাদানসমূহকে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করতে চান ফেবিয়ান সোশ্যালিস্টগণ। তাঁরা মানুষের সদিচ্ছা ও সুপ্রবৃত্তির উপর আস্থাশীল এবং ক্রমান্বয়ে এদেরকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝানো যাবে বলে তারা বিশ্বাস করেন। রক্তক্ষয়ী বিপ্লব তাঁদের নিকট অত্যন্ত বীভৎস। বিপ্লবকে তাঁরা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

তাঁরা বলেন, জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় সামাজিক কারণে, হয় জনসংখ্যা বাড়লে, না হয় শহর-বাজারের পত্তন হলে। সুতরাং বাড়তি লভ্যাংশ শুধুমাত্র জমির মালিকের ভোগ করা উচিত নয়। রাষ্ট্রের ঐ সকল সম্পদের উপর বেশি করে কর বসিয়ে সে আয় সকলের ভোগে লাগাবার ব্যবস্থা করা উচিত। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি থেকে যা আয় হয়, তাও সমাজের দুর্বল যারা, বেকার, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, আতুর ও অসহায়গণের জন্য ব্যয় করা উচিত। বিনাশ্রমে তেমনি যদি কেউ কোন সম্পদ উপভোগ করে, তাহলে তা মুনাফা, সুদ, খাজনা, উৎপাদনে রত শ্রমিক প্রভৃতিকে দেয়াই উচিত।

তবে বলা ভাল যে, ফেবিয়ান সোশ্যালিজম শুধুমাত্র একটি মতবাদ। যদিও যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হয়ে ফেবিয়ানদের অনেক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তথাপি এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

৩। খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism) ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শোষণমূলক ধনতন্ত্রের সংশোধন করার জন্য উৎসাহী ধর্মযাজক যীশু খ্রিস্টের জীবনী ও বাণীর অনুসরণে সমাজ জীবনের পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদী বলা হয়ে থাকে। তবে তাঁদের ভাবধারা ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতি ছিল না বললেই চলে। তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজজীবনে সমতা, ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করুক। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ লিয়ো এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে পোপ একাদশ পায়াস যে অনুশাসন প্রকাশ করেন তাতে এসব ধারণাই ব্যক্ত করা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের কোন ইঙ্গিত তাতে ছিল না। তবে তাঁরা চেয়েছিলেন যে, লোকেরা তাদের বাড়তি ধনসম্পদ সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করুক। শ্রমিক ন্যায্য বেতন পাক,

কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ কর্মে নিযুক্ত হোক। সমাজে ধন-বৈষম্য থাকবে না, কেউ বেকার বসে থাকবে না অথবা ধনবৈষম্যের সুযোগে কেউ উৎপীড়িত যেন না হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মযাজক রবার্ট দ্য লামানে খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। তাঁর মতে, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নেয়া উচিত। তাছাড়াও, চার্লস কিংসলি এবং মরিস লুডলো প্রমুখ ধর্মযাজক শ্রমিকদের শোষণ, কৃষকদের দুর্দশা, সমাজের ধনবৈষম্যের কুফল সম্পর্কে অনেক পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের একমাত্র আপত্তি ছিল, সমাজতন্ত্র মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। তাই তাঁরা খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এমনভাবে প্রচারণা করেছেন যে, তা মানুষের ধর্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনকল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। তাঁদের প্রচারের ফলে সমাজের রক্ষণশীলগণের মধ্যে সমাজতন্ত্র কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে প্রবক্তাদের মত বিভিন্নতা, সংহতির অভাব, সংগঠনের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে এ মতবাদ খুব ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে নি।

৪। সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ বা সিণ্ডিক্যালিজম (Syndicalism) ঃ ফরাসী ভাষায় 'সিণ্ডিকেট' (syndicate) শব্দের অর্থ শ্রমিকদের সংঘ। সুতরাং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের মূলকথা এই যে, উৎপাদন ও বিতরণের কর্তৃত্ব শ্রমিকদের সংঘের হাতে ন্যস্ত করা হবে। সিণ্ডিক্যালিজম রাষ্ট্রকে শোষণ ও অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে ঘৃণা করে। তাই অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শ্রমিকগণ বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করায়ত্ত করবে এবং বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংঘসমূহ সে কর্তৃত্ব পরিচালনা করবে।

ফ্রান্সে এ মতবাদ গড়ে ওঠে। সেখানে পুঁজিপতিগণ শ্রমিকদের কোন সংঘকে স্বীকার করত না এবং ট্রেড ইউনিয়নকে সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে রেখেছিল। সরকার পক্ষ থেকেও অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার দেয়া হত না। ফলে, সে সকল অত্যাচারমূলক কাজের তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। সংঘ সমূহের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, উৎপাদন ও তার উপাদানসমূহের উপর কর্তৃত্ব সংঘের উপর ন্যস্ত করা হোক। ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও এই মতবাদ বিস্তার লাভ করেছিল।

সিণ্ডিক্যালিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জর্জ সরেল (George Sorel) এ মতবাদকে জোরদার করে তোলেন।তিনি এর জন্য কয়েকটি পদ্ধতিরও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে শ্রমিকগণ ধর্মঘট, কল-কারখানা ও জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে, ক্রেতাদিগকে কোন কোন জিনিস ক্রয় থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে এবং সর্বোপরি বয়কটের মাধ্যমে সরাসরিভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারে। ধর্মঘট তাদের হাতে এক অদ্ভূত মারণাস্ত্র। এক সাথে সব রকম কল-কারখানা, যানবাহন ও সর্বপ্রকার উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট পালন করে শ্রমিকগণ জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দিতে পারে। সিণ্ডিক্যালিস্টদের মতে রাষ্ট্র ও পুঁজিপতিগণের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ শ্রমিকগণের মালিকানা কায়েম হবে। উৎপাদনকারীরা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করে উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করতে থাকবে। তার ফলস্বরূপ উৎপাদন অনেকাংশ বাড়বে। কেননা শ্রমিকগণ মনের আনন্দে কাজ করবে এবং কাজের বেলায় প্রচুর স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করতে পারবে। বিভিন্ন লোকের মধ্যে ও সংঘের মধ্যে সুখ-সুবিধা বিলি বণ্টনের জন্য সংঘসমূহ উদার নীতি গ্রহণ করে কাজ চালাতে থাকবে। রাষ্ট্র তখন অপ্রয়োজনীয় হবে, কেননা শোষণ ও শাসনের তখন কোন প্রয়োজন থাকবে না। এ সকল সংঘ পেশাগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং এক একটি শিল্প এলাকার সাথে এক একটি সংঘ সংযুক্ত থাকবে।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে অক্ষম। এ ব্যবস্থা সৈন্যসামন্ত, পুলিশ বা রক্ষীবাহিনীর প্রয়োজন অস্বীকার করে। তবে বৈদেশিক আক্রমণে বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় কিভাবে রাষ্ট্র শান্তিরক্ষা বা আত্মরক্ষা করবে তা বলা হয় নি।

এর বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, এ মতবাদ শুধুমাত্র উৎপাদক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ। প্রত্যেকে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে নিজ উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার ও বিনিময়ের ফলে জীবিকা নির্বাহ করবে। কিন্তু সমাজে বহু গোষ্ঠী বা বহু লোক রয়েছে যারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে না। এ মতবাদ তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষণ করা যাবে, তা বলতে পারে নি। ঝাড়ুদার কি রাস্তার ধুলা দ্বারা জীবিকা অর্জন করবে? শিক্ষক কি ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাদ্য গ্রহণ করবে? কর্মচারীবৃন্দ কি অফিস-আদালতের কড়ি কাঠ গুনে দিন গুজরান করবে? সুতরাং পূর্ণ সমাজের বা সমাজ ব্যবস্থার কোন ছবি এ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদে অঙ্কিত হয় নি।তাই চিন্তাবিদগণ এ মতবাদে বিশেষ উদ্বুদ্ধ হন নি। তাছাড়া, জাতীয়তাবাদের বিকাশ এ মতবাদকে জনগণের নিকট আবেদনহীন করে তুলেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে শ্রমিকরা শ্রেণীস্বার্থ তুচ্ছ জ্ঞান করে জাতীয় স্বার্থের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে বিভিন্ন দেশে এই মতবাদ জনপ্রিয়তা হারাল এবং যুদ্ধোত্তর যুগে রাশিয়ায় কমিউনিজমের অস্বাভাবিক সাফল্য দর্শনে এ মতবাদে বিশ্বাসিগণ অধিক শক্তিশালী ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তা বিস্মৃত হলো। বর্তমানে এ মতবাদ শুধুমাত্র অতীতের একটি চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫। পেশাগত সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্র বা গিল্ড সোশ্যালিজম (Guild Socialism) ঃ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত এ পেশাগত সমিতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্র, শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়নের নবদিগন্তে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল। প্রধানত, ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন খ্যাতনামা মনীষীর প্রচেষ্টায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এ মতবাদ প্রচারিত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু তার প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় নি।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদিগণ যেমন আমলাতন্ত্রকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন এবং তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করতে চেয়েছেন, গিল্ড সোশ্যালিস্টগণ তার ঠিক বিপরীত পথ অনুসরণ করতে চান। আমলাতন্ত্র এ মতবাদে ঘৃণিত এক ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র কার্যকে বিলম্বিত করে না, বহু সমস্যার সৃষ্টিও করে। সিণ্ডিক্যালিজমের মত গিল্ড সোশ্যালিজমে শ্রমিকের কর্তৃত্ব দাবি করা হয়। কিন্তু তাতে বিলম্বের কোন স্থান নেই। গিল্ড সোশ্যালিস্টগণ আইনসঙ্গত আন্দোলনের দ্বারা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পুঁজিপতিগণের মালিকানার বদলে বিভিন্ন গিল্ডের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে দৃঢ় সংকল্প। তাছাড়া গিল্ড সোশ্যালিস্টগণ রাষ্ট্রকে পূর্ণরূপে রহিত করতে চায় না। শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হ্রাস হলেই গিল্ডসমূহ কার্যকরী হতে পারে।তবে গিল্ড সোশ্যালিজমের মূল উদ্দেশ্যেই ভিন্ন এবং তা এই যে, সিণ্ডিক্যালিজমে শুধুমাত্র উৎপাদকমণ্ডলীরই স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয় এবং শ্রমিকগণ উৎপাদনের সাথে জড়িত বলে তাদের সর্বাত্মক স্বার্থের বিষয়ই এ ব্যবস্থায় রয়েছে। কিন্তু গিল্ড সোশ্যালিজমে উৎপাদকমণ্ডলী ও ভোগকারিগণেরও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। সুতরাং এটি এক প্রকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা শিল্পে শ্রমিকগণের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল গিল্ডস লীগ' প্রতিষ্ঠার সময় এ মুখবন্ধই ঘোষিত হয়েছিল।

গিল্ড সোশ্যালিজম ক্ষমতাশালী লেখক এ. জে. পেন্টীর (A. J. Penty) নামের সাথে জড়িত হয়ে রয়েছে।তিনি মধ্যযুগের গিল্ড সমিতি সমূহের কার্যকারিতা, শ্রমিকের স্বাতন্ত্র্য ও ক্রেতার সাথে শোভনীয় আচরণ ও ন্যায়নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় তার পুনরাবির্ভাব ঘটাবার জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বর্তমান কালের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিভাবে প্রাচীন গিল্ডের মত করা সম্ভব সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত অস্পষ্ট।

তাঁর পরে হবসন (Hobson) এবং ওরেজ (Orage) বর্তমানের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে প্রাচীন গিল্ডে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করতে থাকেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে নতুনভাবে ঢালাই করে সে গুলোকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করে গড়তে মনস্থ করেছিলেন। প্রত্যেক শিল্পের সাথে এক একটি গিল্ড গঠিত হবে এবং সে গিল্ডগুলো শুধু ট্রেড ইউনিয়নের কাজ যথা, বেতন বৃদ্ধি, সুযোগ-সুবিধা আদায় প্রভৃতি করেই ক্ষান্ত হবে না বরং প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালিত করবে।

গিল্ড সোশ্যালিজমে রাষ্ট্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। হব্‌সনের মতে রাষ্ট্র উৎপাদনের সংস্থাগুলোর মালিক থাকবে বটে, তবে গিল্ডসমূহ উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করবে। রাষ্ট্র যদিও শিল্পগুলোর উপর কোন কর্তৃত্ব করবে না, তথাপি বিভিন্ন গিল্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে রাষ্ট্রই। জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H. Cole) প্রথমে বলেছিলেন, রাষ্ট্র অন্যান্য গিল্ডের মত ভোগকারিগণের (Consumers) স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। কিন্তু বিভিন্ন গিল্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আর একটি গিল্ড প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাই হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আবার তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রের মৌলিক কার্যাবলি ও ক্ষমতা যখন অব্যবহারের ফলে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে তখন আপনা থেকেই রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে।

গিল্ড সোশ্যালিজমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পেশাগত প্রতিনিধি নির্বাচনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ। এ মতবাদে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব নিরর্থক এবং সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হলে তা পেশাভিত্তিক হতে হবে। গিল্ড সোশ্যালিস্টগণ জোর প্রয়োগে বিশ্বাসী নন অথবা বিপ্লবকে তাঁরা সঠিক পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে, সমবেত কাজের ঠিকা (collective contract) গ্রহণই উল্লেখযোগ্য কর্মপদ্ধতি।

তবে গিল্ড সোশ্যালিজমে বিভিন্ন শিল্পে নিজ নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করলে ক্রেতা ও ভোগকারিগণের কতটুকু সুবিধা হবে, তা বলা শক্ত। পেশাগত প্রতিনিধি নির্বাচনে জনসাধারণের কতটুকু উপকার হবে তাও বলা কঠিন। কিন্তু এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, শিল্পে শ্রমিকগণের কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমাজের উপকার করেছে এই মতবাদ।

৬। রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) ঃ Collective কথাটি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ পিগু (Pigue) কর্তৃক সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। এ মতবাদের মূলকথা, শাসনতান্ত্রিক উপায়ে জনমত গঠন করে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবস্থার আয়ত্তে উৎপাদনের উপাদানসমূহ আনতে হবে। তার সাথে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও—যেমন ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, যাতায়াতের জন্য যানবাহন প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। বিপ্লবের প্রতি এ মতবাদে বিশ্বাসিগণের কোন আস্থা নেই অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তিও তিরোহিত করতে হবে না।

বর্তমানে উৎপাদনসমূহ পুঁজিপতিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে তারা মুনাফার প্রতি দৃষ্টি রেখে কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু যদি এ সকল উপাদান বা উৎস রাষ্ট্রের আওতায় আসে তা হলে মুনাফা জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে। রাষ্ট্র নিপুণ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করলে তা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। প্রয়োজন হলে বর্তমানের শিল্পপতিগণকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে।

এ মতবাদ বাস্তবায়িত করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ই যথেষ্ট। জনমত গঠন ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হবে। তাই এ ব্যবস্থাকে অনেক সময় নিয়মতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (parliamentary socialism) বলা হয়। কম্যুনিজমের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য তিনটি।

প্রথমত, রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্রে জোর প্রয়োগ বা বিপ্লবের কোন স্থান নেই।

দ্বিতীয়ত, এতে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আয়-ব্যয়ের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয় না।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র বিলুপ্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না এ মতবাদে, বরং রাষ্ট্রের উপর অধিকতর কার্যভার অর্পণ করা হয় এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার সর্বময় কর্তা বলে স্বীকার করা হয়।

তবে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তেমন বেশি কিছু আশা করা যায় না। কারণ প্রথমত, ধনতন্ত্রকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। জনৈক লেখকের মতে, যেমন হিংস্র ব্যাঘ্র স্বেচ্ছায় তার দেহ থেকে চামড়া সরিয়ে দিতে পারে না, তেমনি ধনতন্ত্রও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজের কবর রচনা করতে পারে না। উৎপাদনের উৎস সমূহকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে পুঁজিপতিগণ সচেষ্ট হয়ে উঠবে।

যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হয়ে কতিপয় সংস্কার সাধন করে, কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় অনেক সংস্কার রহিত করা হয়। তাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে তেমন কিছু আশা করা নিরর্থক।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাণিজ্য বিষয়সমূহ সরকারি কর্মচারীবৃন্দই পরিচালনা করবে। কিন্তু তাতে তেমন কর্মক্ষমতা বা নৈপুণ্যের আশা করা বৃথা। আমলাতন্ত্রের কুফলে সমাজ-জীবন কলঙ্কিত হবার সম্ভাবনাই বেশি। তাই আজকাল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার প্রতি কারো তেমন উৎসাহ দেখা যায় না।

৭। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism or Marxism) ঃ কার্ল মার্কস বর্তমান কালের ইতিহাসে অমর এক নাম। জার্মানীর এ বিখ্যাত মনীষী আধুনিককালের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ব্যক্তি। সমাজতন্ত্রকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করে চিন্তার সীমারেখাকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন এবং কল্পনা বিলাস পরিত্যাগ করে ঐতিহাসিক কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। কিভাবে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব তার সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। তাই বর্তমানে সমাজতন্ত্রের পুরোহিত বলা হয় তাঁকে। তাঁর মত সমালোচনার সম্মুখীন হতে আধুনিককালে কাউকে দেখা যায় নি অথবা তাঁকে যেভাবে সম্মান দেখানো হয়েছে তাও কোন ব্যক্তির ভাগ্যে জুটে নি। তিনি যেন এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেছেন যা সারা কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় হৃদয় মন দিয়ে পালিত হয়েছে দীর্ঘদিন।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা
Definition of Scientific Socialism

মার্কস (Marx) কর্তৃক ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) বলা হয়, **কারণ এ মতবাদের প্রবক্তারা ভাববাদী আকাশচারী ছিলেন না। তাঁরা শিল্পায়িত সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এবং তার ভবিষ্যৎ পর্যালোচনায় অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং কোন্ সমাজে কিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার দিকনির্দেশ করেন।** তাঁর মতবাদকে আমরা নিম্নলিখিত চার পর্যায়ে বুঝতে চেষ্টা করি ঃ **(১) ঐতিহাসিক জড়বাদ, (২) শ্রেণী সংগ্রাম, (৩) উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদ এবং (৪) রাষ্ট্রের তিরোধান।**

১। ঐতিহাসিক জড়বাদ (Historical Materialism) ঃ দার্শনিক হেগেলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কার্ল মার্কস ইতিহাসকে দ্বন্দ্ববাদের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের মূলে আছে ভাবের ক্রিয়া, আর মার্কসের মতে জড়বস্তু বা আর্থিক পরিবেশ সমাজে নিরন্তর পরিবর্তন সংঘটিত করছে। সমাজের এ পরিবর্তন ধারা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালের বুকে বিলীন হচ্ছে এবং নতুন সে ভিত্তিতে ক্রমশ জয়যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু কার্ল মার্কসের মতে, এ পরিবর্তন ধারার গতি নির্ধারণ করছে আর্থিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। উৎপাদনে কে কতটুকু কর্তৃত্ব করছে এবং কে কতটুকু অংশ পাচ্ছে তাই সামাজিক ঘটনাবলীকে নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করছে। প্রত্যেক সমাজের আইন-কানুন, রাজনৈতিক অবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনের মান নির্ণীত হয় তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং শাসক গোষ্ঠীর সুখ-সুবিধা রক্ষার জন্য। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তাকে কেন্দ্র করেই সমাজে শ্রেণীবিভাগ সংগঠিত হয়। তাই প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং উৎপাদনের পদ্ধতি ও বিনিময়কে ভিত্তি করে যুগে যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো রচিত হচ্ছে। নিরন্তর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজ তাই নতুন থেকে নতুনতর পথে প্রবাহিত হচ্ছে এবং অনাগত এক ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে।

২। শ্রেণী সংগ্রাম (Class Struggle) ঃ কার্ল মার্কস বলেন, সামাজিক ইতিহাস নিছক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। যাদের হাতে উৎপাদনের উপাদান আছে, তারা অন্য শ্রেণীকে নিজেদের পদানত করেছে। ফলে ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে শুধুমাত্র শ্রেণী–সংগ্রামের অভিব্যক্তিই পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলেও এ সত্য চোখে পড়ে। গ্রীসে নাগরিকগণ দাসগণকে পদানত রেখে নিজেরা সুখ–সুবিধা ভোগ করেছে। রোমের পেট্রিয়ানগণ প্লেবিয়ানদিগকে, মধ্যযুগে সামন্তবর্গ ভূমিদাস বা সার্ফদিগকে এবং শিল্পযুগে কলকারখানায় মালিকগণ শ্রমিকদিগকে খাটিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধি সাধন করছে। কিন্তু ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনের সাথে সাথে এও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্তৃত্ব হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। বিত্তহীনেরা বেশিদিন চুপচাপ থাকে না। তারা উৎপন্ন সম্পদের অধিকতর অংশ পাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করেছে। যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে, তারা সর্বহারাদের দমিত রাখতে অনবরত চেষ্টা করেছে। ফলে শ্রেণীসংঘাত তীব্র হতে তীব্রতর হয়েছে। এও দেখা যায়, নতুন শ্রেণী অবশেষে জোর করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছে এবং পুরাতন ধনিক সম্প্রদায়কে উৎখাত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইতিহাসের এটিও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যে, বর্তমানের বিত্তহীন সম্প্রদায় ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতাবান হয়। এ শিক্ষা থেকে কার্ল মার্কস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বর্তমানের শ্রমিকগণ পুঁজিপতিগণকে নস্যাৎ করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তখন শ্রেণীসংগ্রামের অবসান হবে।

৩। উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদ (Theory of Surplus Value) ঃ ধনতন্ত্রের আশীর্বাদে জমি, কলকারখানা, পুজি, ব্যাংক, বীমা ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান পুঁজিপতিদের হাতে রয়েছে। শ্রমিকগণ একান্তই দুর্বল। তাদের শক্তি হলো একমাত্র কায়িক পরিশ্রম, কর্মক্ষমতা এবং বুদ্ধিবল। তারা কিছুই করতে পারে না। তাই পুঁজিপতিগণের নিকট তারা শ্রম বিক্রয় করে। পুঁজিপতিগণ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং তারা যা উৎপাদন করে তা অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প মজুরি দিয়ে তাদেরকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সুযোগ দান করেন। বাকিটুকু পুঁজিপতিগণ মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করেন। কার্ল মার্কস একে উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) বলেছেন। এ বাড়তি মূল্য বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে খাজনা, সুদ, মুনাফা প্রভৃতির রূপ ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এ বাড়তি মূল্যের বিলোপ সাধন করতে দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু পুঁজিপতিগণ সহজে তা করতে নারাজ। তাই এ উৎপাদন পদ্ধতিতে অন্তর্নিহিত সংকট একদিন প্রকট হয়ে উঠে সমস্ত ধনতন্ত্রকে গ্রাস করবে। কিরূপে তা সংগঠিত হবে, তা বলতে গিয়ে মার্কস মন্তব্য করেন, 'ধনতন্ত্র আপন অন্তরের বিষ প্রতিক্রিয়ায় বিষাক্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করবে।'

শ্রমিকেরা অল্প মজুরি পায় বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে। কিন্তু শিল্পপতিগণ বেশি লাভের আশায় বেশি উৎপাদন করতে থাকবে। শেষে এমন এক পর্যায় উপনীত হবে যে, উৎপন্ন দ্রব্য আর দেশে বিক্রয় করা সম্ভব হবে না। তখন উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা চলতে থাকবে এবং পুঁজিপতিগণ এক দেশের সাথে অন্য দেশের সংগ্রাম বাধাতে উদ্যত হবে। তাছাড়া, পুঁজিপতিগণ প্রথমে ছোট ছোট শিল্পপতিগণকে গ্রাস করে বড় হতে থাকবে এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবে। অন্যদিকে শ্রমিকগণের সংখ্যাও বাড়বে এবং দুঃখ–দৈন্যে তারা অতীষ্ঠ হয়ে উঠবে। বেকার সমস্যা আরও প্রকট হবে এবং শ্রেণী সংঘাতে সমাজ বিদীর্ণ হবার উপক্রম হবে। তখন শ্রেণী স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এবং দিনের পর দিন দুঃখ–দারিদ্র্য–পীড়িত হয়ে শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করবে এবং ধনতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে তারা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবে।

৪। রাষ্ট্রের তিরোধান (Withering Away of State) ঃ সে রক্তাক্ত বিপ্লবের পর সর্বহারাদের (Proletariat) একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন জমি ও পুঁজির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে আসবে। ফলে উৎপাদন হবে সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য, ব্যক্তিগত লাভ বা মুনাফার জন্য নয়। শ্রেণীবিভাগ লোপ পাবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে গড়ে ওঠা বিভেদ দূরীভূত হবে। সুতরাং রাষ্ট্র, যাকে মার্কস বলেছেন শ্রেণী

সংগ্রামের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে তা বিলুপ্ত হবে, কেননা শ্রেণী সংঘাত ও শ্রেণী সংগ্রামের বিলোপ সাধিত হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও ফুরাবে। তবে অন্তর্বর্তীকালে রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর সর্বস্ব কেড়ে নেবার জন্য এবং মুনাফার মনোভাবকে দূর করার জন্য ব্যবহৃত হবে। তারপর ব্যক্তির শাসন বিলুপ্ত হয়ে কার্যের পরিচালনা আরম্ভ হবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্যে কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। প্রত্যেকে সাধ্যমত কাজ করবে এবং প্রয়োজনমত ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করবে ("From each according to capacity and to each according to necessity")। সুতরাং অবশেষে রাষ্ট্র শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ
Communism

বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং পরিপূর্ণ বিকাশকে 'কম্যুনিজম' বা সাম্যবাদ বলা হয়। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কম্যুনিজমের শান্ত ও সুস্থ পরিবেশে পৌঁছাতে হয়। সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হয় যখন রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে বিত্তহীন শ্রমিকবর্গ শাসনযন্ত্র হস্তগত করে, কিন্তু সমাজতন্ত্র একটি অন্তবর্তীকালীন অবস্থা। তখন রাষ্ট্রও থাকবে এবং শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার পথে এক-পা দু-পা করে এগোতে থাকবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র যখন সে পর্যায়ে পৌঁছবে, যখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে না, তখন কম্যুনিজমের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সুতরাং সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র উৎপাদনের সুস্থ ব্যবস্থাই নয় অথবা বিনিময় বা সর্বজনীন মঙ্গল সাধনের সঠিক পন্থাই নয়, তা সমাজ জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার আদর্শ। সেখানে মানুষ জাতীয়তা বা দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে একে অপরের জন্য পরিশ্রম করবে এবং কল্যাণকর কার্যে ব্রতী হয়ে সমাজ জীবনে উন্নতির ও সর্বজনীন মঙ্গলের এক নব অধ্যায় রচনা করবে। কার্লমার্কস তাঁর 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' *(Communist Manifesto)* নামক গ্রন্থে কম্যুনিজম স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।তাঁর মতে, নিম্নলিখিত দশটি পদ্ধতি অবলম্বন করে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করতে হবে ঃ **(১) জমির উপর মালিকানা স্বত্ব বিলোপ করে খাজনার আয় জনকল্যাণে ব্যয় করে। (২) যার যত বেশি আয় হবে, তার নিকট থেকে তত বেশি হারে আয়কর আদায় করে। (৩) উত্তরাধিকারে সম্পত্তি অর্জন নিষিদ্ধ করে। (৪) যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে বা দেশত্যাগ করবে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। (৫) রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আনয়ন করে রাষ্ট্রের হাতে টাকা ধার দেয়ার একচেটিয়া অধিকার সমর্পণ করে। (৬) যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্ত ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে আনয়ন করে। (৭) ক্রমে ক্রমে উৎপাদনের যন্ত্র ও উৎপাদনসমূহ রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনয়ন করে। (৮) প্রত্যেককে শ্রম করতে বাধ্য করে। (৯) কৃষির সাথে শিল্পের সমন্বয় সাধন করে গ্রাম ও শহরে জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করে, এবং (১০) সাধারণ বিদ্যালয়ে সকল ছেলেমেয়েকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়ে।**

কার্ল মার্কসের মতে কম্যুনিজমের চরম লক্ষ্য এমন এক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যেখানে প্রত্যেকের নিকট থেকে সামর্থ্য অনুসারে কাজ পাওয়া যাবে এবং প্রত্যেককে তাঁর প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া সম্ভব হবে। লেনিনও বলেছেন, "তখনই সাম্যবাদী বা কমুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা গঠিত হবে, যখন জনগণ সমাজ জীবনের মৌলিক নীতিগুলো মেনে চলতে অভ্যস্ত হবে এবং শ্রম এমনভাবে কার্যকর হবে যে, সকলে স্বেচ্ছায় ও সাধ্যানুসারে কাজ করবে" ("When people have become accustomed to observe the fundamental principles of social life and their labour is so productive that they will voluntarily work according to their abilities")। কার্ল মার্কসের মতে, কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরাবে, কারণ সকলেই যদি স্বেচ্ছায় নিজ নিজ কর্তব্য করতে সমর্থ হয়, তাহলে কারো উপর জোর-জবরদস্তি করার প্রশ্ন আসে না। আর জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন শেষ হলে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন শেষ হবে। রাষ্ট্রকে তিনি জোর প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবেই দেখেছেন।তিনি এও বলেছেন, রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। পুঁজিপতিগণ বিবেক-

বুদ্ধির বশে স্বেচ্ছায় কর্তৃত্ব ছাড়তে রাজি হবে না। তবে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থায় (First International Association) তিনি বলেছেন যে, সব স্থানেই যে একই পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য সাধিত হবে এমন নয়।

মার্কসবাদের যথার্থ মূল্যায়ন ঃ বর্তমানকালে মার্কসবাদ সর্বাপেক্ষা বেশি আলোচিত হয়েছে এবং মনে হয় সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে সর্বাপেক্ষা বেশি, যদিও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক এই মতবাদকে এক সময় ধর্মবাণীর মত শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করে। তা রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তিমূল এবং গতানুগতিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। মহাকাল শুধুমাত্র এর যথার্থ মূল্যায়নে সমর্থ। ভবিষ্যতই এর মূল্য নির্ধারণ করুক। তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে বলা প্রয়োজন যে, মার্কসের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি।

প্রথম, তাঁর বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধনতন্ত্র অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। কিন্তু তা না হয়ে বরং ধনতন্ত্রও নিজেকে সংশোধন করতে সমর্থ হয়েছে এবং বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের জীবনের মান উচ্চ স্তরে পৌঁছুচ্ছে।

দ্বিতীয়, তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ড বা জার্মানীর মত অধিকতর শিল্পায়িত দেশসমূহেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে রাশিয়া ও চীনের মত কৃষিপ্রধান এবং শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তৃতীয়, তাঁর মতে বিশ্বের শ্রমিকরা জাতীয়তার মোহে না পড়ে একই স্বার্থে একত্রিত হবে। তিনি বলেছেন, "তাদের পায়ের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার ভয় নেই।" কিন্তু দুই মহাযুদ্ধে দেখা গিয়েছে, শ্রমিকরা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং শ্রমিক নিজ স্বার্থকে ভুলে যেতে সমর্থ হয়।

চতুর্থ, তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রাষ্ট্র আপনা থেকে ঝরে পড়বে শুষ্ক বিবর্ণ ফুলের মত। কারণ জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন তখন ফুরাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়েছে এবং অধিকতর কার্যাবলী রাষ্ট্রকে করতে হয়েছে। রাষ্ট্রের কার্যসীমা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বর্তমানে মানুষের প্রায় সারাজীবনই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এসে পড়েছে।

তাছাড়া, মার্কসবাদের চারটি, মৌলিক বিষয়ই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

(এক) মার্কসের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রচুর সত্য থাকলেও তা এক দেশদর্শী এবং অনেকটা আংশিক ব্যাখ্যা। যুগে যুগে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার মূলে শুধুমাত্র আর্থিক পরিবেশ বা অর্থনৈতিক অবস্থাই কাজ করে নি, সাথে সাথে ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব, ধর্মের প্রেরণা, মহাপুরুষদের কার্যাবলী ও বাণী, এমনকি আকস্মিক ঘটনাও বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং মার্কসীয় ব্যাখ্যা যথোপযুক্ত নয়।

(দুই) সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারটি একটু অতি নাটকীয় মনে হয়। ইতিহাস যে শ্রেণী-সংগ্রামেরই খতিয়ান, তা একচোখাও বটে। মানুষের ইতিহাসে শ্রেণীগত সংঘর্ষ যেমন সত্য, পরস্পরের সহযোগিতার ফলে ধর্ম, সাহিত্য, ললিত কলা প্রভৃতির বিকাশও ঠিক তেমনি সত্য। একদিকে যেমন মানুষের ঘৃণাবিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর অভিব্যক্তি আছে, অন্যদিকে তেমনি তার স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, আত্মদানের গৌরবও আছে, যা মানুষকে আদর্শস্থানীয় করেছে। সুতরাং ইতিহাস নিছক শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস নয়।

(তিন) মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ নয়। যদিও তিনি শ্রমিককেই মূল্য নিরূপণের একমাত্র কারণ বলেছেন, তথাপি শ্রমের প্রকারভেদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পন্ধে তিনি স্পষ্ট নন। বর্তমানে অর্থনীতিবিদগণ বলেন, চাহিদা ও যোগানের উপর মূল্য নির্ভর করে। তাছাড়া, বাজারের অবস্থা,

যাতায়াতের সুবিধা ও অসুবিধা, আন্তর্জাতিক অবস্থা ইত্যাদিও মূল্য নিরূপণে সাহায্য করে। সুতরাং শুধুমাত্র শ্রমকে মূল্য সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে ধরা ঠিক নয়।

(চার) মার্কসীয় মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্কোচন করে। মার্কস যেমন একদিকে সকল প্রকার উৎপাদনের উপাদান রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাও বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, রাষ্ট্র যদি আর্থিক জীবনের সর্বাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। তবে মার্কসবাদিগণ বলেন, পূর্ণ কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হলে লোকে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করবে।

তবে স্বীকার করতে কেউ কার্পণ্য করে নি যে, এ মতবাদ প্রচারের ফলে শ্রমজীবিগণের অবস্থার উন্নতি আশাতীতভাবে হয়েছে। তাছাড়া, প্রত্যেক মতবাদ, এমনকি নির্মম ধনতন্ত্র পর্যন্ত, এ মতবাদকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় সাধন করেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রও এ মতবাদকে সামনে রেখে জনকল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

রাশিয়ার কম্যুনিজম
Communism of Russia

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিক ও সৈন্যদের সহযোগিতায় রাশিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বলশেভিক নেতা লেনিন (Lenin) অল্প দিনের মধ্যেই জমি, খনিজ সম্পদ, কল-কারখানা, রেল, ব্যাংক প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করেন। শ্রমিক ও কৃষকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির উপর সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। তিনি মার্কসবাদকে প্রয়োজনানুসারে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুনভাবে ব্যাখ্যাও করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করলে স্বল্পকালের জন্য রাশিয়ায় নেতৃত্ব কোন্দল দেখা যায়। লেনিনের দুই শিষ্য স্টালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। ট্রটস্কি পরাজিত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। পরে স্টালিন দীর্ঘকালব্যাপী রাশিয়ায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে কম্যুনিজমকে সংহত করেন। স্টালিন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পথ পরিহার করে রাশিয়াতেই তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লেনিন বিশ্বে মার্কসবাদকে প্রচার করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার আহ্বান করেন। যুদ্ধোত্তর যুগে লেনিন কার্যাবলীর আর একটা দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। তা সাম্যবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি সাময়িকভাবে ধনতন্ত্রের কিছু কিছু অংশ পুনঃপ্রবর্তনও করেন, যেমন সীমাবদ্ধভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনঃপ্রবর্তন, বিনিময় নীতি গ্রহণ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমনীতি পরিহার। তবে এ পন্থা তিনি সাময়িকভাবে গ্রহণ করেন এবং সাম্যবাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতরভাবে কাজে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

সহজ কথায়, রাশিয়ায় কখনো কম্যুনিজম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। লোকের প্রয়োজন অনুসারে বেতন না দিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে তা দেয়া হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে নিম্নতম ও ঊর্ধ্বতম কর্মচারিগণের বেতনের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাত রয়েছে রাশিয়ায় তেমনটি ঘটে নি। তাছাড়া, সেখানে কেউ বেকার ছিল না। বিনা চিকিৎসায় কেহ মারা যায় নি। সাধারণ শিক্ষার সুযোগ সকলেরই ছিল এবং সকলে রাষ্ট্রীয় আদর্শে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে।

চীনের কম্যুনিজম
Communism of China

চীনে যে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা মার্কসের প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। তা জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর গড়ে উঠেছে। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদ থেকে তা অনেকাংশে আলাদা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনের শ্রেষ্ঠ নায়ক মহামতি সানাইয়াৎ সেন কনফুসিয়াসের চিন্তাধারায়

বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে জাতীয়তামূলক ত্রিনীতি ঘোষণা করেন। তাঁর মতে বিপ্লব তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হবে।

প্রথম, নতুন মতবাদের শিক্ষকেরা ক্ষমতা দখল করবে।

দ্বিতীয় স্তরে দেশে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাজীবীগণ তাঁদের শিক্ষানবিশী করবে।

সর্বশেষ, নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

চীনের সাম্যবাদে সানাইয়াৎ সেনের প্রভাব আজও পরিলক্ষিত হয়। এখানে শ্রেণী-সংগ্রামের উপর তেমন জোর দেয়া হয় নি। কৃষক ও শ্রমিকগণের একনায়কত্বের বদলে বুদ্ধিজীবীগণের নেতৃত্বের কথাই এখানে স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া, এখানে বিশ্বাস করা হয় যে, কোন প্রথা ও নীতির অন্ধ অনুকরণ সঠিক পন্থা নয়। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মতবাদ কার্যকর হতে পারে। ঐতিহাসিক কারণে চীনের মধ্যবিত্ত ও সামন্ত শ্রেণীর সহযোগিতা কামনা করা হয়। কারণ, তাঁরাই চীনের সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিতে প্রভূত সাহায্য করেছেন। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে চীনে পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করা হয় নি। এ কারণে চীনের কম্যুনিজমকে অনেকে বস্তুগত (Objective) না বলে ভাবগত (Subjective) বলে থাকেন। মহান নেতা মাও সে তুং এ নীতি সামনে রেখে পথ রচনা করেন।

তাছাড়া, উভয় দেশের সাম্যবাদের ধারা পর্যালোচনা করলে কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(এক) চীনে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি অথবা বিপ্লবে তারা নেতৃত্ব দান করে নি। বরং এখানে মধ্যবিত্ত ও সামন্ত শ্রেণীর নায়কগণই নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরে বিত্তহীনদের অধিকার স্থাপনের প্রয়াস চলেছে কৃষকদের নেতৃত্বে।

(দুই) মার্কসবাদে বলা হয়েছে যে, শিল্পায়িত হলেই সে দেশে গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু চীনে বিপ্লব সংঘটিত হবার পর থেকেই শিল্পায়নের সামগ্রিক প্রচেষ্টা চলছে।

(তিন) কম্যুনিজমে উৎপাদন প্রণালী ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার কথা রয়েছে, কিন্তু চীনে প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদ দেশে কিরূপ উৎপাদন প্রণালী হবে তা নির্বাচন করছে।

(চার) বলা যায় যে, মার্কসবাদিগণ সকলের উপর এক মত, এক পথ ও এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়ে সমাজ ব্যবস্থাকে একমুখী করতে চান, কিন্তু নব্য চীনের পুরোহিতগণ শত পথ শত মতের মধ্যেই সাম্যবাদকে প্রস্ফুটিত করতে চান।

সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা
Socialism and Individual Liberty

অনেকের ধারণা, সমাজতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে তাই প্রতীয়মান হবে যে, সমাজতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয়। সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতায় কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় তা সত্য, কিন্তু এ নিয়ন্ত্রণ সমাজের সকলের স্বাধীনতাকে পরিস্ফুট করার জন্য আরোপ করা হয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজের সকলের জীবনের মান উন্নয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের একচেটিয়া সুযোগ খর্ব করা হয় এবং সমাজে সীমাহীন আর্থিক বৈষম্য দূর করা হয়। ধনিক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয় সমাজতন্ত্রে।

তাছাড়া স্বাধীনতাও অবাধ হতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজের অল্প সংখ্যক লোকেই ভোগ করতে পারে এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বল এবং নিঃস্বদের উপর জুলুম স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের জীবনযাত্রা অন্তহীন সংগ্রামের মধ্যে নিহিত থাকে। তথাপি তারা জীবনে কোনদিন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগে সমর্থ হয় না। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে সমাজে অসংখ্য শ্রমিক-কৃষকদের নিকট ব্যক্ত স্বাধীনতার কথা নিরর্থক ও অবাস্তব।কিন্তু সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকে সর্বনিম্ন প্রয়োজন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে জীবনের নতুন সূত্র খুঁজে পায়। আর্থিক সচ্ছলতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্থহীন।

ফ্যাসীবাদ
Fascism

মূলগতভাবে 'ফ্যাসিজম' কথাটি ল্যাটিন শব্দ (fascio) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। fascio কথার অর্থ কুঠারের সাথে এক বোঝা লাঠির গুচ্ছ। প্রাচীন রোমে তাই ছিল রাজশক্তির প্রতীক। এ প্রাচীন ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বেনিতো মুসোলিনী (Benito Mussolini) রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করার জন্য ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দল (Fascist Party) গঠন করেন। এ ফ্যাসীবাদ একদিকে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে, অন্যদিকে গণতন্ত্রকে অকেজো ও স্থবির বলে ঘৃণা করে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনী রোমের শাসন ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব স্থাপন করে বর্তমান যুগের সর্বপ্রথম একনায়কত্ব কায়েম করেন। ইতালির তদানীন্তন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় জনগণ বিভ্রান্ত হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালির অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। দরিদ্র ও বেকার যুবকগণ তাই মুসোলিনীকে শ্রদ্ধাভরে জাতীয় নেতা হিসেবে বরণ করে। মুসোলিনীও খণ্ড-ছিন্ন ইতালিকে যুক্ত করে প্রাচীন রোমের ঐতিহ্য সকলের সমানে তুলে ধরেন এবং গৌরবময় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে জনমন জয় করতে সমর্থ হন। অনেক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করে তিনি জনগণের সামনে রাষ্ট্রীয় আদর্শ উপস্থাপিত করেন।

ফ্যাসীবাদের মূলনীতিসমূহ ঃ রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ফ্যাসীবাদ রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতায় ক্ষমতাবান করতে চেয়েছে, জনসমূহের উপর সর্বাত্মক প্রভুত্ব কায়েম করে তাদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে এবং রাষ্ট্রকে গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করে ব্যক্তিকে তার পদানত করেছে। অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় দর্শন তার গড়ে ওঠে নি। তবে এ মতবাদের মূল কথা, "কাজ করা", "কথা বলা নয়"। মুসোলিনী বলেছেন, 'কোন মতবাদের প্রয়োজন নেই, শৃংখলাই যথেষ্ট' ('There is no need for any dogma, discipline suffices')। ফ্যাসিস্ট দলের কর্মপদ্ধতিতে উল্লিখিত হয়েছে— "বাধ্য হও, বিশ্বাস কর এবং যুদ্ধ কর" ("obey, believe and fight")। মুসোলিনীর কথাবার্তা ও দলের কার্যাবলী এবং প্রস্তাবাবলীর মাধ্যমে যতদূর জানা যায় ফ্যাসীবাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল নয়। গণতন্ত্রের মৌলিক বাণীসমূহ; যথা, সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ফাঁকা বুলির পরিবর্তে দায়িত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ও ধাপে ধাপে উঁচু নেতৃবর্গের আদেশ পালনের উপর ফ্যাসীবাদ অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ফ্যাসীবাদে ছোট, মধ্যম, বড় এবং সর্বোচ্চ নেতা যা আদেশ করবেন, তাই রাষ্ট্রের আদেশ বলে নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। রাষ্ট্রের আজ্ঞা পরিপূর্ণরূপে পালন করলে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হবে। এ মতবাদে গণতন্ত্র শুধু কথার বেসাতি করে, কোন যথার্থ কাজ করতে সমর্থ নয়।"আইন পরিষদ শুধু কথার দোকান" ('Talking shop')। আইন পরিষদের প্রতিনিধিগণ মানুষকে ধাপ্পাবাজি দিয়ে নির্বাচিত হয় এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। তাছাড়া, যথার্থ কোন জনকল্যাণ আসে না। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অসমর্থ।

দ্বিতীয়ত, ফ্যাসীবাদ সমাজতন্ত্রকেও অবিশ্বাস করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি পারিবারিক সম্বন্ধ দৃঢ়তর করে এবং ভালভাবে যদি তাকে সংহত করা যায়, তা হলে সমাজের বৃহত্তম স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক ফল লাভ সম্ভব হয়। তাই ফ্যাসীবাদে ব্যক্তিগত সম্পদ তিরোহিত করা হয় না। এর সীমারেখা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ণীত হয়।

তৃতীয়ত, ফ্যাসীবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় না। ফ্যাসীবাদে রাষ্ট্র সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। এর মূলমন্ত্র হলো— 'সব কিছুই রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত, কোন কিছুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় এবং কোন কিছুই রাষ্ট্রের বাহিরে নয়' ("Every thing within the state, nothing against the state, nothing outside the state")। মুসোলিনীর মতে, রাষ্ট্র জনসাধারণের ঐক্য ও কল্যাণের প্রতীক। রাষ্ট্র একাধারে বাস্তব সত্তা এবং অধ্যাত্ম শক্তি। তা অতীতের গৌরব এবং ভবিষ্যৎ আশা ভরসার ন্যাসী। ধর্ম, নীতি ও মানবতা সব কিছুই রাষ্ট্রের অধীন। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থহীন। এর কোন মূল্য থাকলে তা রাষ্ট্রের অধীনে থেকেই ভোগ করা সম্ভব। রাষ্ট্র মানুষের জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সকলের কর্তব্য রাষ্ট্রের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা।

চতুর্থত, ফ্যাসীবাদ শান্তি কামনা করে না। ফ্যাসীবাদ নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। যুগে যুগে একনায়ক জনসমূহকে রাজ্য জয়ে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ অভ্যন্তরীণ শাসন সংক্রান্ত সমস্যার প্রতি তারা যেন নজর দিতে না পারে। ফ্যাসিস্টগণ লোকদিগকে যুদ্ধোন্মত্ত করার চেষ্টা করত। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র সব সময় 'যুদ্ধ সাজে' ("war footing") থাকে। এ মতবাদ চিরকালের শান্তিকে সম্ভবও মনে করে না, সুবিধাজনকও মনে করে না। মুসোলিনী বলতেন, "মহিলাদের নিকট যেমনি মাতৃত্ব, পুরুষদের নিকট তেমনি যুদ্ধবিগ্রহ" ("War is to the man what maternity is to woman")। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ উগ্র জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে।

পঞ্চমত, ফ্যাসীবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পেশা বা বৃত্তিগত প্রতিনিধি নির্বাচন। আঞ্চলিক নির্বাচনের পরিবর্তে বিভিন্ন বৃত্তিধারীরা নিজ নিজ প্রতিনিধি আইন পরিষদে পাঠাবে।

ষষ্ঠত, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। শ্রম ও পুঁজির সম্বন্ধ নির্ণয়, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় সম্পদ বণ্টন প্রভৃতির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অটুট থাকবে। শ্রমিক সমিতি সমূহের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সবকিছুই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে।

সপ্তমত, ফ্যাসীবাদে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং দলীয় নেতা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হন। একদল এবং এক নেতা সরকারের এবং সমাজের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন।

অষ্টমত, ফ্যাসীবাদে এলিট শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এলিট তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয় যে, পৃথিবীতে কিছু ব্যক্তি শাসন করতে এবং অবশিষ্ট শাসিত হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। মসকা (Mosca), মিসেলস্ (Michels) এবং প্যারেটোর (Pareto) প্রভাবে ইতালির ফ্যাসিস্ট দলে এমত সুদৃঢ় হয়।

সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব, গণতন্ত্রের বিরোধিতা, সমাজতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস ও উগ্র জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি প্রভৃতি সবকিছুই ফ্যাসীবাদের মৌলিক নীতি। এ মতবাদে রাষ্ট্রকে 'উপেয় বলা হয়, উপায় মাত্র তা নয়"। তাই ইতালির লক্ষ লক্ষ যুবক এ মতবাদের যুপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মুসোলিনীর মৃত্যুর পর ফ্যাসিবাদ ইতালি থেকে বিলুপ্ত হয়।

নাৎসীবাদ
Nazism

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীতে নাৎসী দল (National Socialist German Worker's Party) প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে মতগত ও মূলগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ ইউরোপে সাময়িক সাফল্য লাভ করে চিন্তাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং জনসমূহের বিভিন্ন সমস্যা অতি ক্ষিপ্রতার সাথে সমাধান করে মন্থর গতি সম্পন্ন গণতন্ত্রের এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রগণের এ দুই কর্ম পদ্ধতি বা মতবাদের সাথে পরিচিত হওয়া উচিত।

নাৎসিগণ রাষ্ট্রকে সর্বগ্রাসী এবং সর্বশক্তিমান মনে করত। "ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র ব্যক্তিগণের জন্য নয়"—এই ছিল তাদের মূলনীতি। তাই জার্মানীর জনসমূহ হিটলারের আদেশে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থই নয়, ধন-প্রাণ, বিচার-বুদ্ধি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বসেছিল। হেগেলীয় দর্শনের প্রভাব এবং নীট্সের আদর্শের প্রভাবে রাষ্ট্র একটি "রহস্যমূলক সর্বশক্তিমান প্রতিষ্ঠানে" পরিণত হয়েছিল। গণতন্ত্রের কোন স্থান ছিল না এতে। নেতা বা ফু'রোর আদেশই নৈর্ব্যক্তিক রাষ্ট্রের আদেশ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাৎসীদের মতবাদ অনেকটা ফ্যাসিবাদের মতই ছিল। ধর্মতন্ত্রকে পরিপোষণ করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র জ্ঞান করা হত। তবে রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরে উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সকল প্রকার শ্রমিক আন্দোলন ও গণ-আন্দোলন বে-আইনী ছিল। ফ্যাসীবাদের মতই নাৎসীবাদে যুদ্ধকে জীবনের স্পন্দন মনে করা হত। জাতিকে সর্বদা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হত। তবে নাৎসীবাদে যুদ্ধের উন্মাদনা এবং জাতি বিদ্বেষ জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাতি বিদ্বেষকে নাৎসীরা এক ধর্মবোধ মনে করত। ইহুদিগণকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য তাদের প্রতি অমানুষিক বর্বরতা সংঘটিত করা হয়েছিল। তাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, জার্মান জাতি (Nordic Race) বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করার জন্য এসেছে।তাই অন্যান্য জাতিকে পদানত করে সুসভ্য করার অনুপ্রেরণা তাদের উন্মত্ত করে তুলেছিল।

নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ মানুষের ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ ও মোহকে প্ররোচিত করে নাগরিকগণকে রাষ্ট্রের চাকার নিচে সব স্বার্থ বলি দিতে উৎসাহিত করে নেতাদিগকে যুগদ্রষ্টা ও সত্যদর্শী ঋষির আসনে বসিয়েছিল। তবে এও বলা প্রয়োজন, যে সকল মতবাদ জাতি বিদ্বেষ, যুদ্ধোন্মাদনা ও শক্তি প্রয়োগের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা কোনদিন বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব সভ্যতার পরিপূরক হয় না। ব্যক্তি ও জাতীয় কল্যাণে তাদের দান অধিক হয় না। তাই দেখেছি, নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইতালি কিভাবে জনসমূহকে যুদ্ধের নেশায় পাগল করে ধ্বংসের পথে টেনে এনেছিল এবং বিশ্বে এক বিভীষিকার রাজ্য সৃষ্টি করেছিল।

ফ্যাসীবাদ ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ ঃ তুলনামূলক আলোচনা
Fascism and Communism

'ফ্যাসীবাদ ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদকে একই রোগের দুই উপসর্গ বলা হয়' ('fascism and communism are the two symptoms of the same disease.')। উভয়েরই জন্মকাল ও জন্ম পরিস্থিতি প্রায় অনুরূপ এবং উভয়েই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দুর্বলতা, হীনবীর্যতা ও অসুস্থ অবস্থা থেকে উদ্ভূত। তাই এ উভয় মতবাদকে একই রোগের দু উপসর্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের মতে, রোগটি ছিল তৎকালীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অকৃতকার্যতা, অর্থনৈতিক সমস্যাবলির জটিলতা এবং সমাধানের

অপ্রতুলতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৈন্যের ফলে জনগণ একনায়কদের নেতৃত্ব আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। জার্মানীতে হিটলার দেবতার আসনে বসলেন। ইতালিতে মুসোলিনী নেতৃত্বের নতুন অধ্যায় রচনা করেন। যুদ্ধোত্তর রাশিয়াতে স্টালিন নতুন জীবনবোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হন। সুতরাং সাধারণভাবে ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম, উভয় ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দুর্বলতার উপর গড়ে উঠেছিল এবং উভয়েই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের দুর্বলতার উপর গড়ে ওঠে। উভয়েই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্রের ধ্বজা ধারণ করেছিল।

দ্বিতীয়, উভয় মতবাদ গণতন্ত্রকে অকেজো, খোঁড়া ও বন্ধ্যা শাসনব্যবস্থা বলে নিন্দাবাদ করেছিল।

তৃতীয়, উভয় শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। দলপতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম ও সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাঁর দ্বারাই সামগ্রিক মঙ্গল সাধিত হতে পারে।

চতুর্থ, উভয় ব্যবস্থাতেই কোন সমালোচনা সহ্য করা হয় না। কেউ যদি উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী না হয় অথবা উক্ত মতবাদে আস্থা না রাখে, তা হলে তাদের 'মুক্তি' দেয়া হয়। এখানে মুক্তির অর্থ ধ্বংস।

পঞ্চম, উভয় মতবাদেই রাষ্ট্র সর্বাত্মক (Totalitarian) ক্ষমতার অধিকারী এবং ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিক্ষা পদ্ধতি ও জনমত গঠনের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করে উভয় ব্যবস্থা জনসাধারণকে এক মত, এক পথ ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে।

ষষ্ঠ, উভয় মতবাদ মানুষকে ধর্মভাবের ন্যায় রাষ্ট্রীয় আদর্শকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং মতবাদ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ধর্মান্ধতার মত উগ্র করে তোলে।

সর্বশেষে, কোন ব্যবস্থায় জনসমূহ রাষ্ট্রের অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না। স্বাধীনতা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

তবে ফ্যাসীবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে অমিলই ছিল মৌলিক।

প্রথমত, ফ্যাসীবাদ অনেকটা সুযোগ সন্ধানী মনোভাবের রাজনৈতিক রূপ, কিন্তু সমাজতন্ত্র এক সুষ্ঠু জীবনবোধ প্রসূত রাজনৈতিক দর্শনের ফলশ্বরূপ। সমাজতন্ত্র বহু দিনের বিশ্লেষণ ও গবেষণার ফল এবং অন্তত কয়েক পুরুষের চিন্তাধারার সুষ্ঠু সমন্বয়। কিন্তু ফ্যাসীবাদ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বাছাই করা অবিন্যস্ত কথামালা। ফ্যাসীবাদ কোন নির্দিষ্ট জীবনবোধে জারিত নয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অসংখ্য শ্রমিক, কৃষক ও বিত্তহীন জন মানবের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আনয়ন, সমাজ–জীবনে তাদের বিকশিত হবার সুযোগ দান ও এক নির্দিষ্ট কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধন করা, যাতে অত্যাচার বা অনাচার দূরীভূত হয়। কিন্তু ফ্যাসীবাদের লক্ষ্য ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে শাসক গোষ্ঠীর শাসনকে কায়েম রাখা এবং জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায়, জনগণকে মত্ত করে ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা। সুতরাং ফ্যাসীবাদ উন্নত মনোভাব থেকে উদ্ভূত ছিল না।

তৃতীয়ত, ফ্যাসীবাদ আন্তর্জাতিকতা বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী এবং রাষ্ট্রের আনুগত্যের দোহাই দিয়ে ধ্বংসাত্মক কার্যের পক্ষে সুবিধাজনক এক মতবাদ। কিন্তু সমাজতন্ত্র আন্তর্জাতিক এক মতবাদ। সমাজতন্ত্র নিজেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পরিপূরক হিসেবে মনে করে। সমাজতন্ত্রের শ্লোগান ছিল, বিশ্বের কর্মীবৃন্দ এক হও এবং তা উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী।

সর্বশেষে, সমাজতন্ত্র এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে চায় এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছুতে গিয়ে প্রথমেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করে। কিন্তু ফ্যাসীবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিরোধান পছন্দ করে না, বরং যারা সে সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাদের বিভেদ সৃষ্টিকারী বলে ঘৃণা করে। শ্রেণীহীন সমাজের কোন ধারণা ফ্যাসীবাদের ছিল না।

সর্বাত্মকবাদ

Totalitarianism

রাষ্ট্রের কর্ম পরিধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সর্বাত্মকবাদ। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অষ্টম দশক পর্যন্ত সর্বাত্মকবাদ শুধু মতবাদই ছিল না, বহু সমাজে এটি ছিল বাস্তবতা। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পরে, বিশেষ করে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা, বাজার অর্থনীতির বিশ্বময় গতিশীলতা, তথ্যক্ষেত্রে বিপ্লব প্রভৃতির জন্য সর্বাত্মকবাদ নিঃশেষ হয়েছে। নিঃশেষ হয়েছে এর সহযোগী সমাজতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদী পরিবেশ।

সর্বাত্মকবাদ কী

What is Totalitarianism

সর্বাত্মকবাদ বলতে বুঝি এমন আদর্শ যার ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের এমন বিন্যাস ঘটে যে সমগ্র সমাজব্যাপী সরকারি কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়। সর্বাত্মকবাদে সরকারি কাঠামো এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, জনগণের জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিন্তাভাবনা, ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে পরিবারের ক্রিয়াকলাপ, এমন কি ধর্মচর্চার কেন্দ্র পর্যন্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসে। অধ্যাপক হিটারের (Heater) মতে, য়সর্বাত্মকবাদ হলো আদর্শবাদের চূড়ান্ত। ব্যক্তি শাসন ব্যবস্থার সাথে অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। তার জীবনের অথবা চিন্তার এক কণাও এর আদর্শ-বিরোধী হতে পারবে না। তার সমগ্র জীবন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে গ্রথিত হয়ে পড়ে।" ["Totalitarianism is an ideology par excellence. The individual must be totally committed to the regime; no particle of his life or thought can be allowed to be discordant with the ideology. The whole life is woven into the political pattern."]

সর্বাত্মকবাদের ধারণা বাস্তবায়িত হয় জার্মানীর ন্যাৎসীবাদে, ইতালীর ফ্যাসীবাদে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রে।

সর্বাত্মকবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

সর্বাত্মকবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

১। সর্বোচ্চ ক্ষমতা একনায়কের হাতে ন্যস্ত ঃ সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একনায়কের হাতে ন্যস্ত। ক্ষমতার শীর্ষে থাকেন একনায়ক। দল তার আদেশ পালন করেই ধণ্য।

২। রাষ্ট্রই সব কিছু ঃ সমাজজীবনে রাষ্ট্রই হলো মুখ্য। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, সব কিছুই রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিচালিত, সব কিছুই রাষ্ট্রের লক্ষ্যে নিবেদিত।

৩। অগণতান্ত্রিক ঃ সর্বাত্মকবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী। ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সরকারের নীতি ও কার্যক্রমে নিবেদন করতে হয়। সরকারের প্রতি ভিন্নমত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। সরকারের বিরুদ্ধাচরণের কোন পথ নেই।

৪। ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী : এ মতবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। ব্যক্তিজীবনের সকল দিক রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিসত্তা পদদলিত। সামষ্টিক স্বার্থই মুখ্য।

৫। সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। বিরোধী দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। ভিন্নমতের সকল উৎস বন্ধ করা হয় এই রাষ্ট্রে।

৬। বিশ্বমানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বিরোধী : সর্বাত্মকবাদে বিশ্বমানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের কোন স্থান নেই। রাষ্ট্রীয় গৌরব হলো সবচেয়ে মূল্যবান। প্রয়োজনবোধে নিষ্ঠুরতা, নির্মমতাও স্বীকৃত হয় রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য।

৭। শান্তির পরিপন্থী : সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র বিশ্বাস করে সম্প্রসারণে। এজন্য যুদ্ধ হয়ে ওঠে এর মাধ্যম। শান্তির কোন আবেদন নেই সর্বাত্মকবাদে। জাতীয়তাবাদ, এমন কি উগ্র জাতীয়তাবাদ হলো এর মৌল সুর।

৮। সামরিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব : সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে সামরিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। তারা বিশ্বাস করে, সামরিক প্রবৃত্তিই আসল। তাই সর্বাত্মকবাদী সমাজ সর্বদা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত থাকে। রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সামরিক প্রত্যয় দৃঢ় হয়।

৯। ভীতির এক পরিবেশ : জনসমর্থনের জন্য ভীতির এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। কেউ যেন ভিন্ন চিন্তা করতে না পারে সে জন্য চিন্তাভাবনার সকল উৎস জোরপূর্বক বন্ধ করা হয়।

১০। নিকৃষ্টতম সরকার : সরকার হিসেবে সর্বাত্মক সরকার নিকৃষ্টতম।

১১। চিন্তাক্ষেত্রে সমরূপতা : সমগ্র রাষ্ট্রে একই চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়।

১। কল্পনা বিলাসী সমাজতন্ত্রবাদী কারা? তাদের কয়েকজনের বক্তব্য স্পষ্ট করে বর্ণনা কর। (Who are the utopian socialists? Discuss the ideas of some of them.)।

২। ফেবিয়ান সোশ্যালিজম বলতে কী বোঝ? কী পদ্ধতিতে তা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়? (What is meant by Fabian Socialism? How does it want to realise socialism?)

৩। খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ। (Write an essay on Christian Socialism.)

৪। সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ বা সিণ্ডিক্যালিজম কাকে বলে? রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্রবাদ থেকে এর পার্থক্য কোথায়? (What is Syndicalism? How does it differ from State Socialism?)

৫। পেশাগত সমিতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ বা গিল্ড সোশ্যালিজম সম্বন্ধে কী জান? কীভাবে এই পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে? (What do you know of Guild Socialism? How socialism would be established according to its principles?)

৬। কার্ল মার্কসের রাজনৈতিক মতবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। (Describe the main features of political doctrines of Karl Marx.)

৭। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about Scientific Socialism or Marxism.)

৮। সমাজতন্ত্র এবং কম্যুনিজমের মধ্যে তফাত করবে কীভাবে? (How can you distinguish between Socialism and Communism?)

৯। ফ্যাসীবাদের মূলনীতিসমূহ আলোচনা কর। (Discuss the essential features of the Fascist theory of the state.)

১০। "ফ্যাসীবাদ ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদকে একই রোগের দুই উপসর্গ বলা হয়"–ব্যাখ্যা কর। (Fascism and communism are the two symptoms of the same disease"—Discuss.)

১১। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of Fascism and Nazism.)

১২। চীনের সমাজতন্ত্রবাদ ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষ কর কী? (Do you find any difference between the Chinese Communism and Russian Communism?)

১৩। সমাজতন্ত্র কী? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। (What is socialism? Give reasons for and against it.) [N. U. 1996; D. U. 1984]

১৪। সর্বাত্মকবাদ কী? উদাহরণসহ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (What is totalitarianism? Discuss its Characteristics.) [N. U. 1996]

সংবিধান

CONSTITUTION

৩২

সংজ্ঞা
Definition

সাধারণভাবে কোন রাষ্ট্রের সংবিধান বলতে আমরা সে সব লিখিত বা অলিখিত মৌলিক নিয়মাবলীকে বুঝি যা কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার ও বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে। কোন রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি কীরূপ তা সংবিধান থেকে জানা যায়। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি বলা হয়। এরিস্টটল এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁর মতে, "সংবিধান হল রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন প্রণালী" ("The way of life the state has chosen for itself")। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেলিনেকের মতে, "সংবিধান রাষ্ট্রের বিভাগসমূহ নির্ধারণ করে, তাদের গঠন-প্রণালী এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে, কার্যের সীমারেখা চিহ্নিত করে এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রের সাথে ঐসব বিভাগ বা শাখাসমূহের কি সম্বন্ধ হবে তাও স্থির করে" ('Determines the supreme organs of the state, which prescribes their modes of creation, their mutual relations, their spheres of action and finally the fundamental place of each of them in their relation to the state.")।

অধ্যাপক ফাইনার (Finer) সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ ঃ "রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ হলো সংবিধান" ("The system of fundamental political institutions is the constitution")। তার মতে, সমাজে ক্ষমতা বিষয়ক সম্বন্ধ সংবিধানে বর্ণিত হয়। তাই তিনি সংবিধানকে "ক্ষমতা-সম্পর্কের আত্মজীবনী" ('An autobiography of power relationship') বলেও বর্ণনা করেন। এ. ভি. ডাইসিও (A. V. Diecy) সে আলোকে রাষ্ট্রের সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার এবং বণ্টনের রীতিকে প্রভাবান্বিত করে তাই সংবিধান।

তবে কে. সি. হুইয়ার (K. C. Wheare) এক বিশিষ্ট আলোকে সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বিধৃত করেছেন। তাঁর মতে, যে কোন সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতার নিরূপণ এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তার প্রয়োগ ইত্যাদিও থাকে। তাই তিনি বলেছেন, "সংবিধান সে নিয়মসমূহ, যার দ্বারা কী উদ্দেশ্যে এবং কোন্ বিভাগের দ্বারা সরকারি ক্ষমতা পরিচালিত হবে তা নিয়ন্ত্রিত হবে" ("That body of rules which regulates the ends for which and the organs through which governmental power is exercised")।

আধুনিককালে প্রত্যেক সংবিধানে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলো কী হবে এবং তা রক্ষা করার উপায়সমূহ কী কী তাও বর্ণিত হয়। সুতরাং এ দিক দিয়ে বিচার করলে সি. এফ. ষ্ট্রং (C. F. Strong) কর্তৃক সংবিধানের সংজ্ঞাই উৎকৃষ্ট মনে হয়। তিনি বলেন, "সংবিধান সেই নিয়মের সমষ্টি যা সরকারের ক্ষমতা নির্ধারণ করে, শাসিতের অধিকার এবং এ দুইয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করে" ('A collection of principles according to which the powers of the government, the right of the governed are determined and the relation between the two are adjusted'.)।

সুতরাং উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো থেকে সংবিধানের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথম, সংবিধান বিবৃত করে কোন্ উদ্দেশ্য এবং কোন্ কোন্ বিভাগের দ্বারা সরকারি ক্ষমতা পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয়, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টনবিধি তা নির্ধারণ করে।

তৃতীয়, সরকারি বিভাগসমূহের মধ্যে কি সম্বন্ধ বিদ্যমান তাও সংবিধান স্থির করে।

চতুর্থ, নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বর্ণনা ও তাদের সংরক্ষণ সংবিধান করতে চায়। তাই অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহও সংবিধান বিবৃত করে।

সর্বশেষে, সংবিধান স্থায়ী কোন জিনিস নয়। সংবিধান বিবর্তনশীল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবিধানও পরিবর্তিত হয়ে অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে। তাই কী কী উপায়ে সংবিধান পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়, তাও সংবিধানে উল্লিখিত থাকে।

সাংবিধানিক সরকার বা নিয়মতান্ত্রিক সরকার
Constitutional Government

সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক সরকার বলতে আমরা সেই ধরনের সরকারকে বুঝি, যা সংবিধানে সন্নিবেশিত নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালিত হয়। এ সরকার সাংবিধানিক আইন-কানুন মোতাবেক পরিচালিত হয় বলে কোন স্বৈরাচারের স্থান এতে নেই। সংবিধান নাগরিকগণের পূর্ণ বিকাশের জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে এতে জনসমূহের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উর্বর ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়ে থাকে।

বিস্তারিতভাবে বললে সাংবিধানিক সরকার বলতে আমরা সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝি ঃ

প্রথম, সাংবিধানিক সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় আইনের দ্বারা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী ব্যক্তির আদেশ বা নির্দেশ অনুসারে সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় না। সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় আইনের কর্তৃত্বে।

দ্বিতীয়, নাগরিকগণ সংবিধান-সম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারি কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে। তা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে হতে পারে অথবা প্রত্যক্ষভাবে হতে পারে।

তৃতীয়, সাংবিধানিক সরকারে নাগরিকগণের কতকগুলো মৌলিক অধিকার স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, যা কোন ক্রমেই লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, এমনকি সরকারও যদি উক্ত মৌলিক অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করে, তা হলে আইনসঙ্গত উপায়ে তা সংরক্ষণ করা সম্ভব।

চতুর্থ, সাংবিধানিক সরকার বলতে অবশ্যই গণতান্ত্রিক সরকারকে বুঝায়, কেননা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতীত সাংবিধানিক সরকার চলতে পারে না।

পঞ্চম, সাংবিধানিক সরকারের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ সংবিধান। বিধিসম্মত উপায়ে স্বাধীন বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সংবিধানের বিরোধী কোন কার্যই চলতে পারে না। ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসন সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

ষষ্ঠ, সংবিধানে উল্লিখিত বিধি ব্যবস্থায় কর্মচারীদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলে তারাও তাদের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। অন্যদিকে নাগরিকগণও স্বীয় অধিকার রক্ষায় উৎসাহ বোধ করে। সুতরাং সংবিধান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষায় এবং তার উন্নতি বিধানের জন্য অপরিহার্য।

সপ্তম, সাংবিধানিক সরকার মূলত আইনের সরকার, ব্যক্তির সরকার নয় ('Government of laws, not of persons')। সাংবিধানিক সরকারে আইনের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়।

অষ্টম, সাংবিধানিক সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রভাবের ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থজ্ঞাপনকারী চাপ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

নবম, এ ধরনের সরকারে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভাজনের পন্থা সংবিধানে নির্দিষ্ট থাকে। সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, সরকারের দায়িত্বশীলতা নির্ধারণ ও জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট পন্থা সংবিধানে নির্দিষ্ট থাকে।

দশম, এই ধরনের সরকার পরিবর্তনশীল। সামাজিক জীবন গতিশীল। এই গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কোন ভীতিপ্রদ ব্যাপার নয়। তাই ফ্রেডারিক (Frederick) বলেন, "পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কোন ভীতিপ্রদ ব্যাপার নয়। তা আধুনিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌল বিষয় ("Change and development are not something to be feared but is of the very warp and woof of modern constitutionalism")।

একাদশ, সাংবিধানিক সরকারে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়। আইন পরিষদ এবং নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত থাকে।

দ্বাদশ, সাংবিধানিক সরকার গতিশীল এবং বিকাশমান। জনগণের প্রয়োজনের সাথে খাপ খেয়ে তা বিকাশ লাভ করে।

ত্রয়োদশ, এ সরকারে সরকারি বিষয়সমূহ প্রকাশ্যে পরিচালিত হয়, গোপনে নয়। জনগণ সরকারি কার্যক্রম সম্বন্ধে সব সময় অবহিত থাকে। তথ্যের ভাণ্ডার সকলের জন্যে উন্মুক্ত থাকে।

সর্বশেষে, এও বলা চলে যে, সাংবিধানিক সরকার সীমিত সরকার। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা সীমিত হয়ে থাকে।

সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ
Classification of Constitution

কেন শ্রেণীবিভাগ ঃ সংবিধানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির জন্য শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করতে হলে শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত সম্ভব নয়। কোন সংবিধান যদি দুষ্পরিবর্তনীয় হয় অথবা কোন সংবিধান যদি নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় হয়, তাহলে এতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যার মধ্যে তার পরিচয় লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং এজন্য সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত।

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান
Written and Unwritten

সংবিধানকে লিখিত ও অলিখিত–এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। লিখিত সংবিধান বলতে আমরা সে সংবিধানকে বুঝি, যাতে শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ একটি অথবা একাধিক দলিলে লিখিত থাকে। অধ্যাপক গার্নারের মতে, লিখিত সংবিধানে শাসন সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম–কানুন কোন বিশিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হবে এবং শাসন বিভাগসমূহ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে তা পূর্বেই নির্ধারিত হয় এবং লিখিত সংবিধানে সবকিছু নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের, ভারত ও কানাডার সংবিধানসমূহ লিখিত। বস্তুত ইংল্যাণ্ডের সংবিধান ছাড়া প্রায় সমস্ত সংবিধানই লিপিবদ্ধ। আইন পরিষদ কিভাবে গঠিত হবে, শাসন বিভাগের প্রকৃতি কীরূপ হবে, বিচার বিভাগের সাথে তাদের কি সম্বন্ধ থাকবে, নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার কী কী হবে এবং কীভাবে তা সংরক্ষিত হবে, সংবিধানে তা লিখিত থাকে।

অলিখিত সংবিধান বলতে আমরা সেরূপ সংবিধানকে বুঝি, যাতে শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ থাকে না, বরং শাসনকার্য পরিচালিত হয় সাধারণত প্রথা, রীতি–নীতি, বিচারকের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য প্রচলিত নিয়ম–কানুন অনুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যাণ্ডে কোন লিখিত সংবিধান নেই। তাই ফরাসী লেখক ডি. টকভিল লিখেন, "ইংল্যাণ্ডে সংবিধানের কোন অস্তিত্ব নেই"। ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ রয়েছে বহু দলিলের মধ্যে, রীতি–নীতি ও প্রথার মধ্যে। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারের কথা ম্যাগনাকার্টা (Magna-Carta), **পিটিশন অব রাইট্স** (Petition of Rights), **বিল অব রাইট্স** (Bill of Rights) প্রভৃতির মধ্যে এবং বিচারকের স্বাধীনতা, অ্যাক্ট অব সেটেলমেণ্টে (Act of Settlement), ভোটদানের অধিকার, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি আইনে পাওয়া যায়।

লিখিত সংবিধান নির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও অনেকটা স্বচ্ছ। নাগরিকগণ সংবিধানের দলিলটি পাঠ করে সবকিছু জানতে ও বুঝতে পারে। তবে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তা তাল মিলিয়ে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়। যেখানে অলিখিত সংবিধান প্রচলিত রয়েছে, সেখানে সাধারণ আইন–কানুন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন তফাত নেই।

লিখিত ও অলিখিত–এই দু ভাগে সংবিধানকে বিভক্ত করাটা বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বিভ্রান্তিকর, কারণ কোন রাষ্ট্রেই সম্পূর্ণরূপে লিখিত সংবিধান নেই। আবার ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের বেশ কতক অংশ লিখিত। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হলেও সেখানে রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বিষয়, প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় সাধারণত প্রথা ও রীতি–নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, ইংল্যাণ্ডে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ ও প্রতিনিধিত্বমূলক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত; যেমন– বিল অব রাইট্স, পিটিশন অব রাইটস, অ্যাক্ট অব সেটেলমেণ্ট। সুতরাং সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, লিখিত ও অলিখিত–এভাবে শ্রেণী বিভাগ মূলত শ্রেণীবিভাগ নয়, বরং একটি অন্যটি অপেক্ষা কতখানি লিখিত তা তারই পরিচায়ক (The distinction between written and unwritten constitution is a matter of degree, not of kind.)। সংবিধান লিখিত হলেই যে দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে তা নয়। ইতিহাসে এরূপ অনেক নজীর রয়েছে যে, লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তার অধিকতর পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ফ্রান্সের সংবিধান লিখিত হওয়া সত্ত্বেও ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের পরে আজ পর্যন্ত প্রায় একশত বার বদলেছে। প্রায় দুশত বছরের মধ্যে আমেরিকায় তা মাত্র ত্রিশ বার পরিবর্তিত হয়েছে।

লিখিত সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ সংবিধান লিখিত হলে সাথে সাথে কয়েকটি সংশ্লিষ্ট বিষয় জড়িত হয়ে থাকে এবং ফলে সংবিধান অধিকতর কার্যকরী হয়ে ওঠে।

প্রথমত, লিখিত সংবিধানের সাথে এক প্রকার আনুষ্ঠানিকতা বা পবিত্রতা জড়িত থাকে এবং সাধারণ আইন–কানুন থেকে তার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সাংবিধানিক আইন সাধারণ আইনের মত আইন প্রণয়নের সাধারণ উপায়ে প্রণীত হয় না অথবা পরিবর্তিতও হয় না।

দ্বিতীয়ত, লিখিত সংবিধানের মৌলিক আইনগুলো ভবিষ্যতের জন্য নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণে সহায়ক হয়। আইন পরিষদ যদি কোন সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহলে উক্ত কষ্টিপাথরে যাচাই করার পর প্রয়োজন হলে বিচারালয় তা বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে। ফলে শাসনতান্ত্রিক পন্থায় শাসনকার্য পরিচালনার পথ রচনা হয়ে থাকে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে।

তৃতীয়ত, সংবিধান লিপিবদ্ধ করা হলে তা সাধারণত দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের খেয়াল খুশির ঊর্ধ্বে থাকে তা জনসমূহের অধিকার রক্ষায় সহায়ক হয়।

সংবিধান বিশারদ বিচারক **জেমসন** (Jameson) লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে যে জনসম্প্রদায় রাজনৈতিক চেতনাবোধে সমধিক উন্নত এবং যাঁদের মধ্যে আইনের প্রতি গভীর আনুগত্যবোধ দৃষ্ট হয় তাদের জন্য অলিখিত সংবিধান অধিকতর উপযোগী। কিন্তু যাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ তেমন গড়ে ওঠেনি, যারা রাজনৈতিক ব্যাপারসমূহের প্রতি অনেকটা উদাসীন অথবা যারা সংস্কার সাধনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী, তাদের জন্য লিখিত সংবিধানই উপযোগী। বর্তমানে একমাত্র ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রে অলিখিত সংবিধান দেখা যায় না। সুতরাং ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা থেকে আমরা লিখিত সংবিধানকেই শ্রেষ্ঠ বলব।

সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান
Flexible and Rigid

সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়-এই দু ভাগে বর্তমানে বিভক্ত করা হয়। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) নিচে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যে সংবিধানকে বিনা আয়াসে এবং সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে আইন পরিষদ দ্বারা পরিবর্তন করা যায় তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান (flexible constitution) বলে। এ সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হলে কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট সাংবিধানিক আইনের পরিবর্তন সাধারণ আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তনের পদ্ধতিতেই করতে সক্ষম। যে সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হলে সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এবং সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে আইন পরিষদ কর্তৃক যা পরিবর্তিত হয় না, তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (rigid constitution) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমেরিকায় কংগ্রেস (Congress) সাধারণ আইন প্রণয়ন করলেও সংবিধান পরিবর্তনের জন্য একটি জটিল পন্থা অনুসরণ করা হয় এবং সাধারণভাবে সে পরিবর্তন সাধন করতে এককভাবে কংগ্রেস অক্ষম।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে তফাত রয়েছে মূলত চারটি।

প্রথম, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হলে কোন বিশেষ ও জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না, আইন প্রণয়নের সাধারণ উপায়ই যথেষ্ট। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে পরিবর্তিত করতে হলে সময় সাপেক্ষ এক জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সাংবিধানিক আইনকে সাধারণ আইনের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয় এবং সাংবিধানিক আইনকে মৌলিক আইন বলা হয়।

তৃতীয়, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে কোন পরিবর্তনের জন্য কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সংবিধানে তারও নির্দেশ থাকে, কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের তেমন কোন নির্দেশ থাকে না। তাছাড়া, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত হতে বাধ্য। অলিখিত সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় নাও হতে পারে।

চতুর্থ, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সর্বোচ্চ বিচারালয় কর্তৃক কোন কোন আইন বাতিল ঘোষিত হতে পারে।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা

প্রথমত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সাধারণত লিখিত হয় বলে তার নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের নির্দেশসমূহ অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ এবং অনেকটা অনির্দিষ্ট।

দ্বিতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান শাসনকার্যে নিশ্চয়তা বিধান করে। শাসনকার্যে স্থিরতা ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হলে তা কালক্রমে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকগণের হাতের পুতুল স্বরূপ হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি ব্যাহত হয়, কারণ দেশের মৌলিক আইনসমূহ হাওয়ার মত সতত বিচরণশীল হলে সৃষ্টিধর্মী মন পীড়িত হয় এবং নিরন্তর উত্তেজনায় ভরে থাকে। তাছাড়া, জনসাধারণের আনুগত্যও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়ত, সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হচ্ছে। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে জনসমূহের জীবনবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নতুনভাবে বিকাশ লাভ করছে। সুতরাং সংবিধান যদি দুষ্পরিবর্তনীয় হয়, তাহলে নাগরিকগণের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংবিধানের বিরোধ অপরিহার্য। যদি সংবিধান সত্যই অতি সহজে পরিবর্তিত না হয় তাহলে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে, কারণ বিপ্লব সংঘটিত হয় যখন জনসমূহ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংবিধান পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়। আর তা যদি না হয়, তা হলে জাতীয় জীবন ও ধীশক্তি স্থবির হতে বাধ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সুপরিবর্তণীয় সংবিধানের আশীর্বাদে জাতি মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান অত্যন্ত নমনীয়। তা বেঁকে যাবে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়বে না। এ সংবিধানের আওতায় বিপ্লব নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, সংবিধান রচয়িতাগণও ভুল করতে পারেন। তাঁরা অভ্রান্ত নন। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সে ভুলকে চিরন্তন না করলেও অনেক দিন পর্যন্ত জনসাধারণকে ভুলের মাসুল দিতে হয়। অন্যদিকে, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানকে প্রবহমান নদী-স্রোতের সাথে তুলনা করা হয় যে নদীতে মানুষ শুধুমাত্র একবারই অবগাহন করতে পারে। কোন সংবিধান সতত সঞ্চরমান গতির (perpetual flux) মত হলে তা দেশের মনোভাবকে বিভ্রান্ত করতে পারে। স্বার্থান্বেষী ও দলীয় মনোভাবে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক দল সংবিধানকে ব্যাডমিণ্টনের সাট্‌ল কর্কের মত ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং সংবিধানে দুটি বিপরীতধর্মী স্রোতকে মিলিত করতে পারলে ভাল হয়। একটি স্থিরতা ও নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি, অন্যটি সময়োপযোগী করার জন্য পরিবর্তনের সুবিধা। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার আবেদন যেভাবে বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তাতে এর প্রয়োজন আরও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অপরিহার্য। কিন্তু তাও যেন সহজে পরিবর্তিত হতে পারে তা দেখতে হবে।

তাছাড়া, এও উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানকে যেমন লিখিত ও অলিখিত এই দু ভাগে বিভক্ত করা তার যথার্থ শ্রেণীবিভাগ নয়, তেমনি তাকে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়-এই দু ভাগে বিভক্ত করে তার যথার্থ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। এই বিভাগও মৌলিক নয়, বরং তা থেকে শুধুমাত্র বোঝা যায় কোন সংবিধান কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হতে পারে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান যে অতি সহজে পরিবর্তন করা যায়, তাও ঠিক নয়। আবার দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে পরিবর্তন করা যে অত্যন্ত কঠিন, তাও ঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্রান্সের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হলেও তাকে ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের মত অতি সহজে পরিবর্তন করা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হলেও বিচারকের বিশ্লেষণের (judicial review) দ্বারা অথবা বিচারালয়ের ব্যাখ্যা (judicial interpretation) দ্বারা অতি সহজে বিগত শতাব্দীতে তা পরিবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের সংবিধান অত্যন্ত সুপরিবর্তনীয় হলেও সেখানকার লোকদের রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য তার পরিবর্তন খুব সহজে হয় না। অধ্যাপক লাস্কির মতে, ইংল্যাণ্ডে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করতে পার্লামেণ্ট গড়ে ত্রিশ বছর ধরে বিচার বিবেচনা করে থাকে।

উত্তম সংবিধানের লক্ষণসমূহ
Marks of a Good Constitution

উত্তম সংবিধানের অনেকগুলো লক্ষণ আছে। তাদের মধ্যে **সর্বপ্রথম গুণ তার সুস্পষ্টতা।** সংবিধান যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হতে হবে যেন কোন শব্দের দুই বা ততোধিক অর্থ করা সম্ভব না হয়। আর যদি সংবিধান অলিখিত হয় তাহলে তার লিখিত অংশে বিভিন্ন প্রথা বা রীতি-নীতির ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। এই দিক দিয়ে আমেরিকার সংবিধানকে অনেকে আদর্শস্থানীয় বলেন। তথাপি সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের এক এক বাক্যের এক এক যুগে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সংবিধান এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে জনসাধারণ নির্দিষ্ট দলিলটি ছবির মত সকলে বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সংক্ষিপ্ত ঃ সংবিধান উত্তম হতে হলে তা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। সংবিধানকে অতিরিক্ত ব্যাপক করা উচিত নয়। সংবিধানে শুধুমাত্র মৌলিক বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকা উচিত। কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া উচিত নয়, কেননা তা হলে **প্রথম,** মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। **দ্বিতীয়,** ব্যাখ্যার অসুবিধা হতে পারে। **তৃতীয়,** রচয়িতাগণ যতই তীক্ষ্ম ধীশক্তি সম্পন্ন হোন না কেন, ভবিষ্যৎকে বুঝতে ভুল করতে পারেন। ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ভুলের মাসুল দিতে হতে পারে। **সর্বশেষে,** সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে যেন সংবিধানের খুঁটি-নাটি বিষয়গুলো নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে না হয় এবং সময়োপযোগী ব্যাখ্যা শাসনব্যবস্থায় প্রযোজ্য হতে পারে। এই দিক দিয়ে আমেরিকার সংবিধান সত্যই আদর্শস্থানীয়। এতে সাতটি নিবন্ধে এবং চার হাজার শব্দে পূর্ণ সংবিধান বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ঃ সংবিধানে শুধুমাত্র শাসন সম্বন্ধীয় বিষয়গুলো উল্লিখিত হলেই চলে না, এ সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। তা হলে অধিকারসমূহ সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। জনসাধারণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শাসন বিভাগের দিকে নজর রাখতে পারে। শাসন বিভাগও অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করতে সাহসী হয় না।

চতুর্থত, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও মূলনীতির উল্লেখ ঃ আদর্শ সংবিধানে রাষ্ট্রের আদর্শ ও মূলনীতিসমূহ সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। ফলে সরকার স্বীয় পথে চলার সাহস পায়। জনগণও জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পন্থা নির্দেশিত ছিল।

পঞ্চমত, মধ্যপন্থার অনুসরণ ঃ আদর্শ সংবিধান মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হবে, যেন জনসাধারণ তার স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান না হয়। তা সুপরিবর্তনীয় হবে, কেননা সামাজিক অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্য বিধান করতে যেন সক্ষম হয়। তা এমন দুষ্পরিবর্তনীয় হবে না যেন বিপ্লব তাকে ধ্বংস করতে পারে। আবার তা এমন সুপরিবর্তনীয় হবে না যেন পুতুলের মত হাতে হাতে ফিরে হাত বদল করতে পারে। সংবিধান জাতীয় জীবনের সম্ভাবনার প্রতীক। সুতরাং তা এমন হবে যেন জনসাধারণ শ্রদ্ধার সাথে তাকে গ্রহণ করে।

ষষ্ঠত, যুগোপযোগী ঃ সংবিধান জনসাধারণের নৈতিকতা এবং বিচার-বিবেচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যুগের অগ্রবর্তী হলে তা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আবার যুগের পশ্চাতে থাকলে তা শুধুমাত্র "বাণীমণ্ডলী" বা 'কাগজের টুকরায়' পর্যবসিত হবে। যুগোপযোগী না হওয়ার জন্য বহু সংবিধান পদ্মায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে, সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং তার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় অংশীদার হয়ে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে পারে, তাই সংবিধানের অত্যন্ত বড় গুণ।

সপ্তমত, পরিবর্তনের পদ্ধতির সন্নিবেশ ঃ সংবিধান নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনীয় হবে। সংবিধানের বিভিন্ন বিষয়াদি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠলে তা সংবিধান নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যেন পরিবর্তিত হয় তাও দেখতে হবে।

অষ্টমত, লিখিত ঃ আদর্শ সংবিধান লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত না হলে অন্তর্ভূক্ত প্রদেশ বা ব্যক্তি কেউ স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে না।

নবমত, ভারসাম্য সংরক্ষণ ঃ সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টনে ভারসাম্যতা রক্ষাও উত্তম সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য। নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা এমন বেশি হওয়া উচিত নয় যার ফলে আইন পরিষদ দূর্বল হতে পারে, অথবা বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এত বেশি হওয়া উচিত নয় যাতে আইন পরিষদ দায়িত্বহীন হতে পারে। ক্ষমতার সুষম বণ্টন এবং ভারসাম্য রক্ষা তাই একান্ত প্রয়োজনীয়।

দশমত, জনগণের ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা ঃ সংবিধান এমনভাবে সংগঠিত হতে হবে যেন তা জনগণের ধ্যান–ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্যথায় জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং পরিবর্তন প্রথা কঠিন হলে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

সংবিধানের সৃষ্টি
Growth of Constitutions

অধ্যাপক গেটেলের (Gettell) মতে নিচে বর্ণিত চারটি উপায়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান সংগঠিত হয়েছে ঃ (১) **মঞ্জুরীর দ্বারা** (by grant)। (২) **যুক্তিবিচার এবং পরিকল্পনার দ্বারা** (deliberate creation)। (৩) **বিপ্লবের মাধ্যমে** (by revolution)। এবং (৪) **ক্রমবিবর্তনের ফলে** (gradual evolution)। কোন কোন দেশ একাধিক পদ্ধতির মিশ্রণে সংবিধান সংগঠন করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দানের মাধ্যমেও সংবিধানের জন্য হয়েছে।

(১) মঞ্জুরীর দ্বারা ঃ প্রথমে প্রায় সকল রাষ্ট্রই স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গ কর্তৃক শাসিত হত। রাজাই ছিলেন তখন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। তাঁর আদেশই ছিল আইন। তিনিই ছিলেন শাসনকর্তা। কিন্তু কালক্রমে রাজতন্ত্রের প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। শাসনতন্ত্রে তার বজ্র কঠিন হস্ত শিথিল হতে থাকে। তাই অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল লাভের আশায়, জনমতের প্রভাবে বা বিদ্রোহ সংঘটিত হতে পারে–এ আশঙ্কায় রাজা একটি নতুন সংবিধান রচনা করে জনসাধারণের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। এভাবে রাজার মঞ্জুরীর ফলে অথবা তাঁর আদেশক্রমে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান রচিত হয়েছে। যদিও এরূপ সংবিধানে রাজা তা পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তথাপি রাজা সাধারণভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রজাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন। এভাবে জাপানে সংবিধান রচিত হয়েছে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে চীন সম্রাটও এভাবে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্প্রতি নেপালের রাজা মহেন্দ্রও এ উপায়ে দেশবাসীকে সংবিধান দান করেন। আফগানিস্তানের বাদশাহ এভাবে দেশবাসীকে শাসনতন্ত্র দান করেছিলেন। সম্প্রতি ভুটানের রাজা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

(২) পরিকল্পনার মাধ্যমে ঃ বহু দেশে পরিকল্পনার সাহায্যে সংবিধান রচিত হয়েছে। কোন দেশ অন্য কোন শক্তির অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের সংবিধান তৈরী করে। সংবিধান রচনা করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংগঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরিষদ ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রে সংবিধান এভাবে গড়ে উঠেছে।

(৩) বিপ্লবের মাধ্যমে ঃ অনেক দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সংবিধান সংগঠিত হয়েছে। বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিপ্লবিগণ করায়ত্ত করে সংবিধানের খসড়া রচনা করেন এবং তা জনসাধারণের দ্বারা সমর্থিত হলে সংবিধানের রূপ লাভ করে। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সংবিধানের বিষয়টি বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত শাসনতান্ত্রিক সংস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এ উপায়ে সোভিয়েত রাশিয়া, তুরস্ক ও মিসরে সংবিধান রচিত হয়।

(৪) বিবর্তনের মাধ্যমে ঃ সংবিধান বিবর্তনের দ্বারাও গড়ে ওঠে। জীবদেহের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ নীতির ন্যায় বিবর্তনের ফলে কোন কোন সংবিধান উদ্ভূত হয়, অবশ্য যদিও অধিকাংশ সংবিধান সুনির্দিষ্ট

পরিকল্পনা অনুসারে রচিত হয়। ইংল্যাণ্ডের সংবিধান এরূপ বিবর্তনের ফলস্বরূপ। অতীতে, তা স্বেচ্ছাচারী রাজাদের দ্বারা পরিচালিত হত। কালক্রমে জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাজশক্তি পার্লামেন্টের নিকট নতি স্বীকার করেছে। পার্লমেন্ট আবার কেবিনেটের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। অথচ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলোও বিলুপ্ত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান ইংল্যাণ্ডে শাসনকার্য রাজা বা রানীর নামে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু আসলে কেবিনেটই ক্ষমতা পরিচালনা করে। সংরক্ষণশীল ইংরেজ জাতি বিবর্তনকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছে।

(৫) দানের মাধ্যমে ঃ অধীন জনপদে অথবা নির্ভরশীল উপনিবেশসমূহ কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্র সময়ে সময়ে দান-খয়রাতের মত সংবিধানও দান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পরাধীন ভারতে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক আইন দান করেছিল। কানাডায় প্রথমে দানের মাধ্যমেই সংবিধানের ভিত্তি-পত্তন হয়েছিল।

সংবিধান পরিবর্তন বিধি
Amendment of Constitutions

সংবিধান স্থিতিশীল নয়। সংবিধান গতিশীল। মানবীয় সকল প্রতিষ্ঠানের মত তাও সমাজের আলো হাওয়ার প্রভাবে দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে বৃদ্ধি পায়। অলিখিত সংবিধানই শুধু যে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় তা নয়, লিখিত সংবিধানও প্রতি পদক্ষেপে পরিবর্তিত হয়, বিস্তৃত হয়, পরিবর্ধিত হয় এবং পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে সংগঠিত হতে থাকে। আমেরিকার সংবিধান এভাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কেন্দ্র থেকে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ত্রিশবার সংশোধন (amendments), অসংখ্য সাধারণ আইন (statutes) ও শতাধিক শাসন বিভাগীয় আদেশমালা, প্রথা এবং রীতি-নীতির সংমিশ্রণে তা ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত সংবিধানকে পরিবর্তিত করেছে। আমেরিকায় কথিত আছে, আমেরিকার সংবিধান প্রত্যেক সোমবারে পরিবর্তিত হয়, কেননা উক্ত দিবসে সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রকাশ করে। তাই হ্যারল্ড ম্যাকবেল তাঁর *Living Constitutions* ও মানরো তাঁর *The Government of the United States* গ্রন্থে বলেছেন, আমেরিকার সংবিধান ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের মতই পরিবর্তনীয় ও নমনীয়।

কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমেই তা সমধিক বৃদ্ধি লাভ করে। নিচে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিকভাবে যে সংশোধন (amendment) সাধিত হয়,তার বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

বৃটেন ঃ ইংল্যাণ্ডে শাসন বিধির কোন অংশ পরিবর্তন করতে হলে সাধারণ আইন যেভাবে তিন বার এক কক্ষে গৃহীত হবার পর অন্য কক্ষে প্রেরিত হয় এবং সেখানেও তিনবার তিন রিডিং-এ গৃহীত হলে রাজা বা রানীর স্বাক্ষর লাভের পর বলবৎ হয়, সেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিবর্তন করা হয়। তবে রক্ষণশীল ইংরেজ জনগণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন করতে চাইলে সাধারণত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনগণের মতামত গ্রহণ করে। যদিও সাংবিধানিক আইনে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ভোটাধিকার আইন ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাসের ক্ষেত্রে এরূপ করা হয়েছিল।

রাশিয়া ঃ রাশিয়াতে সংবিধান সংশোধন করা অনেকটা সহজ। সেখানে সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা গৃহীত হলে সংবিধানের কোন ধারা সংশোধিত হতে পারে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশনের সুপারিশসমূহ সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হয়।

অস্ট্রেলিয়া ঃ অস্ট্রেলিয়ায় সংবিধান সংশোধন করতে হলে প্রথমে আইনসভার দুই কক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে তা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পেশ করা হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের এবং প্রদেশগুলোর অধিকাংশের ভোটে তা গৃহীত হলে সেই সংশোধনকে স্বীকার করা হয়।

সুইট্জারল্যাণ্ড ঃ সুইট্জারল্যাণ্ডে আংশিক ও সামগ্রিকভাবে সংবিধান সংশোধন করার বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি আছে। যদি আংশিক সংশোধন করতে হয়, তা হলে আইন সভার উভয় কক্ষ অথবা পঞ্চাশ হাজার ভোটারের আবেদন ক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হলে তা জনসাধারণের নিকট পেশ করা হয়। জনসাধারণের অধিকাংশ ও ক্যান্টনগুলোর অধিকাংশ যদি সম্মতি দেয় তা হলে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সামগ্রিক সংশোধনের প্রস্তাব আইন সভার এক বা উভয় কক্ষে প্রস্তাবিত হতে পারে। পঞ্চাশ হাজার ভোটারও প্রস্তাব করতে পারে। তারপর উক্ত বিষয়ে জনমত গ্রহণ করা হয়। যদি অধিকাংশের দ্বারা তা গৃহীত হয়, তা হলে আইন সভার উভয় কক্ষে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নবনির্বাচিত আইন সভা সামগ্রিক সংশোধন গ্রহণ করে। সেখানে ভোটারগণ একবার সংবিধানের মূল বিষয় বিচার করে। পরে সাধারণ নির্বাচনের সময় তা নীতিগতভাবে বিচার করা হয়।

আমেরিকা ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কোন সংশোধন গ্রহণ করা একটু শক্ত, কারণ সেখানে সংশোধনী পদ্ধতি জটিল ও দুরূহ। প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কংগ্রেসের প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলোর আইন পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের অনুরোধে এক জাতীয় সভার দ্বারা (national convention)। এই দু পদ্ধতির কোন একটির দ্বারা যদি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা হলে তা রাজ্যগুলোর তিন-চতুর্থাংশের আইন পরিষদে অথবা রাজ্যসমূহের বিশেষভাবে আহূত সভায় (convention) তিন-চতুর্থাংশের ভোটের দ্বারা সমর্থিত হতে হয় (ratified)। দু প্রকারে প্রস্তাব গ্রহণ ও দু প্রকারে সমর্থিত হবার ফলে সংশোধনের চার প্রকার পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের জন্ম

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অনলকুণ্ড থেকে বাংলাদেশের জনগণ তুলে এনেছে স্বাধীনতার পতাকা। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকবৃন্দের স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক এবং পীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের জনগণ। এই বিপ্লবের তুলনা নেই ইতিহাসে। চারদিকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করে দেশকে স্বাধীন করে এই দেশের জনসমষ্টি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। তাই এদিন বিজয় দিবস নামে চিহ্নিত।

সফল বিপ্লবের পরে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারীতে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ নিজেদের গণপরিষদে রূপান্তরিত করে সংবিধান রচনায় ব্রতী হন। ১৯৭২ সনের ১১ জানুয়ারি একটি অস্থায়ী সংবিধান জারি করা হয় এবং ১৯৭২ সালের ২০ এপ্রিলে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনেই ৩৪-সদস্যের একটি সংবিধান কমিটি গঠন করা হয় আইন ও সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে। সংবিধান কমিটি ৭১টি বৈঠকে মিলিত হয়ে সংবিধানের খসড়া তৈরি করে। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর তা গণপরিষদে পেশ করা হয় এবং ৪ নভেম্বরে এর তৃতীয় পাঠ সমাপ্ত হয়। ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বরে সদস্যদের স্বাক্ষর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করা হয়।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান যেমন একটি সফল বিপ্লবের ফল তেমনি পরিকল্পনার মাধ্যমে বিচার বুদ্ধির সজ্ঞান সৃষ্টি।

১। নিয়মতান্ত্রিক সরকার কাকে বলে এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? (What is a Constitutional Government and what are its main features?)

২। সংবিধান কী ? কীভাবে লিখিত সংবিধান গড়ে ওঠে ? আমেরিকার সংবিধান থেকে উদাহরণ দিয়ে উত্তর লিখ। (What is a constitution? How does a written constitution grow? Illustrate you answer with reference to the American Constitution.)

৩। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং আমেরিকা ও বৃটেনের সংবিধান থেকে উদাহরণ দাও। (Distinguish between a written and unwritten constitution with reference to the UK and the U. S. A.)

৪। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে তফাত দেখাও। এই পার্থক্য কী গুরুত্বপূর্ণ ? উদাহরণ দাও এবং তাদের গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ বর্ণনা কর। (Distinguish between rigid and flexible constitution. Does such distinction serve any purpose? Give examples and describe the merits and demerits of each.)

৫। সংবিধান গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কী জান ? বাংলাদেশ সংবিধান কীভাবে গড়ে উঠেছে? (What do you know about the different methods of establishing a constitution? How has the Constitution of Bangladesh been established?)

৬। সংবিধানের শ্রেণীভেদ কর। কেন শ্রেণীবিভাগ কর ? (Classify constitution. Why do you classify them?)

৭। উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (State the characteristics of a good constitution.)

৮। সংবিধানের সংশোধনের বিধিগুলো লিপিবদ্ধ কর। (State the various methods for the amendment of constitution.)

৯। সংবিধান সংগঠনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো কী কী? (What are the different methods of establishing a constitution?)

১০। সংবিধান শব্দটি দ্বারা কী বুঝ ? (ক) লিখিত ও অলিখিত, (খ) দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (What do you understand by the term constitution? Draw a clear distinction between (a) written and unwritten and (b) flexible and rigid constitution.)

১১। সংবিধানের সংজ্ঞা দাও। একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (Define constitution. Discuss the characteristics of a good constitution.) [C. U. 1993]

১২। সংবিধান কত প্রকার ও কী কী ? একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (What are the different types of Constitution? Discuss the characteristics of a good constitution.) [N. U. 1996]

১৩। সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। বাংলাদেশ সংবিধান কীভাবে গড়ে উঠেছে ? (Discuss the various methods for the growth of constitution. How has the constitution of Bangladesh grown up?) [N. U. 1997]

তুলনামূলক রাজনীতি

COMPARATIVE POLITICS

৩৩

তুলনামূলক রাজনীতি কী
What is Comparative Politics

রাজনীতির অধ্যয়ন মূলত সামাজিক কাঠামো, ঐতিহ্য, আদর্শ, সংস্কৃতি এবং পরিবেশভিত্তিক এক ব্যবস্থার (system) অধ্যয়ন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ত যে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তা সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ঘটনারাজির মধ্যে এক ঐক্যসূত্র অনুসন্ধান করা। সে ঐক্যসূত্রের সঠিক বিশ্লেষণের (analysis) মাধ্যমেই পরিবর্তনের ধারা ও গতিশীলতা অনুধাবন করা সম্ভব। উল্লেখযোগ্য ফল লাভের জন্য তাই অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানে অনুসৃত অনুশীলন পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্রমশ গৃহীত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক (Sociological), নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) ও মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) পদ্ধতিসমূহ এ ক্ষেত্রের মণিকাঞ্চন স্বরূপ। এ সব পদ্ধতি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে করেছে উর্বর ও সমৃদ্ধ। এ পদ্ধতিমালা অনুসরণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংযোজিত হয়েছে অনেক নতুন তত্ত্ব। তুলনামূলক রাজনীতি এ ক্ষেত্রের দিশারী।

বিশেষ কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থায় অধিক কার্যকর হয় বা কোন্ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতিধারা কীভাবে নির্ধারিত হয় বা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political System) কোন পরিস্থিতিতে অন্য একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়–এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে তুলনামূলক রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অথবা বৃটেনে প্রধানত দ্বি–দলীয় ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত হল কেন ? এ সমস্যা কি শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ? সামাজিক কাঠামো বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এ সমস্যার কী সম্পর্ক ? বাংলাদেশের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের সাথে কী এর কোন যোগসূত্র রয়েছে ? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অথবা বৃটেনে কী অনুরূপ কারণগুলো অনুপস্থিত ? ভারতে অথবা পাকিস্তানে অথবা অন্যান্য যে যে রাষ্ট্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে ঐ সব কারণ কীভাবে বহুদলীয় ব্যবস্থার জন্ম ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করেছে ? বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে কারণ বিশ্লেষণের আলোকে এবং তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। সুতরাং বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা এবং কোন বিশেষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কারণ নির্দেশের জন্য আমরা তুলনামূলক রাজনীতির অনুশীলন করি। **তুলনামূলক রাজনীতি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সেই রীতি-নীতি ও পদ্ধতিমালা যাদের অনুশীলন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যাবলীর সঠিক অনুধাবন সম্ভব হয়।** তুলনামূলক রাজনীতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক অথবা আইনগত বিষয় পর্যালোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না। তা সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সামাজিক ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করে আন্তঃ সাংস্কৃতিক এবং আন্তঃ জাতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণ পরিচালনা করে।

রয় ম্যাক্রিডিসের *(Roy C. Macridis)* মতে, তুলনামূলক আলোচনা দু প্রকারের হতে পারে, যথা-**স্থিতিশীল** (Static) এবং **গতিশীল** (dynamic)। স্থিতিশীল আলোচনায় কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার (political system) পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা হয়। সে ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাঠামোর (structures) বর্ণনা দেয়া হয়, বিভিন্ন কাঠামোর পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয় এবং তাদের কার্যাবলীর (functions) ভিত্তিতে কাঠামোগুলোর শ্রেণীবিভাগ করা হয়। গতিশীল তুলনামূলক আলোচনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। এ ধরনের বিশ্লেষণে শুধু যে বিভিন্ন কাঠামো ও তাদের কার্যাবলীর বিবরণ দেয়া হয় তা নয়, বিভিন্ন ব্যবস্থায় কাঠামোর বিভিন্নতার কারণও নির্দেশ করা হয়। পরিশেষে, বিকল্প কর্মপ্রচেষ্টার ফলাফলও বর্ণনা করা হয় এবং বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশও করা হয়। তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে—

প্রথমত, এক বা একাধিক সূত্রকে বিশেষ কোন প্রশ্নের আনুমানিক উত্তর (hypothesis) হিসেবে ধরা হয়।

দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের আলোকে এবং নির্দিষ্ট উপাত্তের (data) প্রেক্ষিতে সেই আনুমানিক উত্তরের চুলচেরা পর্যবেক্ষণ করে তার সত্যতা যাচাই করা হয়।

সর্বশেষে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের গুরুত্ব
Importance of the Study of Comparative Politics

তুলনামূলক রাজনীতি অতীতকাল থেকেই ছিল আকর্ষণীয় এক অনুশীলন ক্ষেত্র। অবশ্য তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে অতীতে তুলনামূলক সরকার ব্যবস্থাই ছিল মুখ্য। প্লেটো এবং এরিস্টটল গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলোর বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করেই সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। গ্রীক পণ্ডিতদের অনুকরণে রোমান লেখকগণ, বিশেষ করে পলিবিয়াস (Polybius) ও সিসেরো (Cicero) সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সরকারের রূপ যে বিভিন্ন হয় তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেকিয়াভেলি (Machiavelli) ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলোর বাস্তব পর্যালোচনা করে এবং ইতিহাস থেকে অসংখ্য উদাহরণ সংগ্রহ করে তুলনামূলক সরকারের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মতেঁস্কু (Montesquieu) তুলনামূলক সরকারের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ অগ্রসর হন। সংঘ, শ্রেণী, জনগণের শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং আদর্শের মত সামাজিক উপাদানের সাথে রাজনীতি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এ সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন সময়ে মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল (Mill), ঐতিহাসিক ফ্রিম্যান (E. A. Freeman), জেমস্ ব্রাইস (James Bryce) প্রমুখ চিন্তাবিদ তুলনামূলক সরকারের অধ্যয়ন ক্ষেত্রে অনেক তথ্য সংযোজন করেন।

কিন্তু অতীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক সরকারের ক্ষেত্রকে অত্যন্ত সীমিত করে তুলেছিলেন। রাষ্ট্রীয় দর্শন (Political Philosophy), আইন, আইন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়েই রয়েছে তাঁদের মৌলিক অবদান। তাঁদের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা রাজনীতির কলাকৌশল সম্বন্ধে তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর সাথে রাজনৈতিক সংযোগ সাধনে তাঁরা কেউই তেমন প্রয়াসী হন নি।

সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তুলনামূলক রাজনীতি এক আকর্ষণীয় অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তা তুলনামূলক সরকার (Comparative Government) থেকে তুলনামূলক রাজনীতিতে (Comparative Politics) রূপান্তরিত হয়েছে। আজ আর বিভিন্ন সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় তা সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনায় এ সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। উন্নত দেশগুলোতে

কেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অধিক কার্যকর হচ্ছে, কেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কী কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এত অনিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতার অভাব, কোন্ কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে—এসব প্রশ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্প্রতি তুলনামূলক রাজনীতিতে স্থান লাভ করেছে।

তুলনামূলক রাজনীতি সম্প্রতি বিভিন্ন কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর উপকারিতা বহুমুখী।

প্রথম, তুলনামূলক রাজনীতির অধ্যয়ন রাজনৈতিক ঘটনা বিন্যাসের সম্যক অনুধাবনে অত্যন্ত সহায়ক। কোন্ অবস্থায় কোন্ প্রতিষ্ঠান সমধিক কার্যকর হয় এ বিষয়ে তুলনামূলক রাজনীতি নতুন আলোর সন্ধান দান করে এবং অধ্যয়নকারীদের জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত করে।

দ্বিতীয়, তুলনামূলক রাজনীতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতাকে সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাবধারা ও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্মদান করেছে। ফলে আলোচনা ও বিশ্লেষণকে করেছে প্রকৃত এবং বাস্তবমুখী।

তৃতীয়, তুলনামূলক রাজনীতি উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহের সমস্যা অনুধাবনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি প্রত্যেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন ধারার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতে এবং সুসংহতভাবে সে ধারাকে পরিচালিত করতে যে মননশীলতার প্রয়োজন তুলনামূলক রাজনীতি তার সন্ধান দান করে।

রাজনীতির গতানুগতিক অধ্যয়ন রীতি
Traditional Methods

উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার নিজস্ব সত্তায় বিকশিত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যয়ন পদ্ধতি ইতিহাস, দর্শন ও আইনের অধ্যয়নের সাথেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। ঐ সময় তুলনামূলক রাজনীতির গতানুগতিক পদ্ধতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু গতানুগতিক অধ্যয়ন রীতি যুগোত্তীর্ণ হতে পারেনি তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের জন্য। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) বর্ণনা প্রধান আলেখ্য (Configurative Description) ঃ বিশেষ কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বা কোন ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কোন অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই ছিল গতানুগতিক রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। এ পদ্ধতিতে তুলনামূলক আলোচনা খুব কমই হত। এ ধরনের কোন গ্রন্থে থাকত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোর উল্লেখ, দিন-তারিখ, সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ, আইনগত দলিলগুলোর আলোচনা। ঐ রীতিতে বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করত। বিশ্লেষণের স্থান ছিল অত্যন্ত গৌণ।

(২) রীতিসিদ্ধ আইনগত দিক (Formal-Legalism) ঃ তুলনামূলক রাজনীতির গতানুগতিক পদ্ধতিতে বহুকাল পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে রাষ্ট্রে বিদ্যমান রীতিসিদ্ধ সংগঠন এবং আইনগত পদ্ধতি। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সংবিধান, কেবিনেট, আইন পরিষদ, বিচারালয় প্রভৃতির গঠন এবং কার্যাবলী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হত এই পদ্ধতিতে। ক্ষমতা কী, কিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগে কোন্ প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন আলোচনা হত না।

(৩) সংকীর্ণতা (Parochialism) ঃ অতীতে তুলনামূলক রাজনীতি ছিল এক সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমিত। ইউরোপের সরকার ব্যবস্থার আলোচনাই ছিল এর মুখ্য বিষয়বস্তু। ইউরোপের সরকারগুলোর মধ্যে আবার বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে সর্বাধিক। এশিয়া ও আফ্রিকার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অতীতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা হয় নি।

(৪) রক্ষণশীলতা (Conservatism) ঃ তুলনামূলক রাজনীতির গতানুগতিক পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল রক্ষণশীলতা। এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় উপাদানের উপর জোর দেয়া হত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তন বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আলোচনা হত না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও পরিবর্তন ধারাকে কোন দিন শ্রদ্ধার সাথে দেখা হয় নি।

(৫) তত্ত্বের প্রতি উদাসীনতা (Non-theoretical Emphases) ঃ তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের গতানুগতিক পদ্ধতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণমূলক তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য কোন সাধারণ সূত্র উদ্ভাবনের এতটুকু চেষ্টা করা হয় নি।

(৬) পদ্ধতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য (Methodological Indifference) ঃ বর্ণনামূলক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি-প্রধান গতানুগতিক পদ্ধতি তুলনামূলক রাজনীতি ক্ষেত্রে পদ্ধতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। কোন বিষয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত নির্বাচন ও সংহত করার নীতি ছিল অনেকটা অসংলগ্ন ও সামঞ্জস্যহীন। অনিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও অনির্ভরযোগ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ কার্য সম্পন্ন করা হত।

তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের নতুন পদ্ধতি
New Approaches to the Study of Comparative Politics

অতীতে তুলনামূলক সরকার অধ্যয়নের যে সব রীতি-নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তা একদিকে যেমন অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সংকীর্ণ এবং অবাস্তব বলে পরিগণিত হয়েছে। অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল এ. আলমণ্ড (Gabriel A. Almond) এবং বিংহ্যাম পাওয়েলের (Bingham Powell) মতে, তুলনামূলক সরকার অধ্যয়নের গতানুগতিক **পদ্ধতি তিনটি বিশেষ** কারণে তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অপ্রতুল হয়ে ওঠে ঃ **(এক) গতানুগতিক পদ্ধতির সংকীর্ণতা, (দুই) রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে শুধুমাত্র আলোচনা, এবং (তিন) শাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান, আইন অথবা রাজনৈতিক মতবাদের সীমিত আলোচনা।** অনুশীলন ক্ষেত্র হিসেবে তুলনামূলক সরকার প্রধানত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে ছিল গণ্ডীভূত। মাঝে মাঝে শুধুমাত্র দু একজন পণ্ডিতকে দেখা গিয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা অথবা ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে। তাছাড়া, ইউরোপের উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তাও প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণে।

কালের বিবর্তনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ওঠে আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় জন্মলাভ করে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০, কিন্তু ১৯৯৬ সালে এ সংখ্যা হয় ১৮৫। ১৯৯৯ সালে এই সংখ্যা ১৮৮। তা ছাড়া, উন্নত ও উন্নতিশীল উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রেই দেখা দেয় অভাবিতপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পট পরিবর্তন। তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাই গতানুগতিক পদ্ধতি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। অধ্যাপক আলমণ্ড ও পাওয়েলের মতে তিনটি কারণ তার মূলে কার্যকর ছিল।

প্রথম, বহুমুখী সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেক রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে এশিয়ায়, আফ্রিকায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে।

দ্বিতীয়, যুদ্ধোত্তরকালে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভুত্বের হ্রাস প্রাপ্তি এবং অতীতের উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশগুলোর ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাবলয়ে প্রবেশ লাভ।

তৃতীয়, জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার রূপায়ণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এমনি পরিবেশে যেমন বৃদ্ধি পায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতার অভাব, তেমনই বৃদ্ধি পায় সন্দেহ এবং অস্থিরতা। অতীতের আশাবাদও নিঃশেষ হয়ে আসে। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আলোর শিখা নিয়ে তুলনামূলক রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় নতুন পদ্ধতি। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অনিশ্চয়তা ও স্থিতিহীনতার মধ্যে নতুন এক শৃংখলার প্রবর্তন করা। অধ্যাপক আলমণ্ড ও পাওয়েলের কথায়, নতুন পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে চারটি ঃ **(এক) তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি বিস্তৃতকরণ** (The search for broader scope)। **(দুই) বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টিভংগি আনয়ন** (The search for realism)। **(তিন) আলোচনায় সুস্পষ্টতা** (The search for Precision) **ও বিশিষ্টতার আশীর্বাদ দান, এবং (চার) সুশৃংখল বিশ্লেষণের এক সুষম পরিবেশ গঠন** (Orderly analysis)।

(১) বিস্তৃত পরিধি (Broader Scope) ঃ তুলনামূলক রাজনীতির নতুন পদ্ধতিতে আলোচনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। অতীতে তুলনামূলক সরকারের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা। বর্তমানে আলোচনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায়। এ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের বিশ্লেষণকারিগণ আজকাল আর অসংলগ্নভাবে অনুসন্ধান কার্য না করে রাজনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ও বিশ্লেষণে রত রয়েছেন।

(২) বাস্তব দৃষ্টিভংগি (Realism) ঃ অতীতে তুলনামূলক সরকার ব্যবস্থার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল শাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান, আইন, আদর্শবাদ (ideology) প্রভৃতি। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান বা আইন আজকাল আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, বরং রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাঠামো ও তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে বাস্তবমুখী আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশের সরকারের কার্যপ্রণালী, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠী, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক যোগাযোগ পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক শিক্ষাদান প্রসংগে উত্তরোত্তর বহু আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে আধুনিক সাহিত্য। রাজনীতির এ সব বাস্তব আলোচনা তুলনামূলক রাজনীতির নতুন পদ্ধতিকে দান করেছে এক অভূতপূর্ব গভীরতা এবং ফলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতিধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়েছে।

(৩) আলোচনায় সুস্পষ্টতা (The Search for Precision) ঃ অর্থনীতি বা মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেমন আলোচনা ও বিশ্লেষণকে করেছে সুস্পষ্ট ও ঋজু, তুলনামূলক রাজনীতির নতুন পদ্ধতি ও আলোচনার ক্ষেত্রে এনেছে তেমনি এক সুস্পষ্ট এবং সরল দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট উপাত্ত (data) সংগ্রহ এবং সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় প্রযোজ্য রীতিমালা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আলোচনায় এনেছে নতুন এক আলোক।

(৪) সুশৃংখল বিশ্লেষণের এক সুষম পরিবেশ (Orderly Analysis) ঃ সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে রাজনৈতিক দল, স্বার্থ গোষ্ঠী (Pressure groups), গণসংযোগ মাধ্যমসমূহ এবং শিক্ষাব্যবস্থা। রাষ্ট্র, সংবিধান, প্রতিনিধিত্ব অথবা নাগরিকদের দায়িত্ব বা অধিকারের মত গতানুগতিক শব্দগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী অথবা গণসংযোগের মাধ্যমগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফলকে যথার্থরূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান থেকে আহরণ করা নতুন নতুন পদ সম্প্রতি তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'রাজনৈতিক কৃষ্টি" (political culture), 'রাজনৈতিক ভূমিকা' (political role), 'রাজনৈতিক দীক্ষাদান' (political socialization), 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' (political

system) প্রভৃতি নতুন পদগুলো শুধুমাত্র তুলনামূলক রাজনীতি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আলোচনা ক্ষেত্রে নেমে এসেছে সুশৃংখল এক সুষম পরিবেশ।

গতানুগতিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

গতানুগতিক পদ্ধতি শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণই নয়, তা অপর্যাপ্ত এবং অবাস্তব বলে স্বীকৃত হয়েছে। গতানুগতিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ ঃ

প্রথম, সঙ্কীর্ণতা ঃ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে যে সকল আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে প্রধানত ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরণ আমরা লাভ করেছি। তাতে আন্তঃসাংস্কৃতিক (cross- cultural) এবং আন্তঃজাতীয় (cross-national) প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক বিবরণ লাভ করা সম্ভব হয় নি।

দ্বিতীয়, স্থিতিশীলতা ঃ ঐ পদ্ধতি অনেকটা স্থিতিশীল (static), **গতিশীল** (dynamic) **ছিল না**। ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখকগণ প্রধানত রাষ্ট্রতত্ত্ব বা আইন সম্বন্ধীয় আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা হচ্ছে এবং এ পরিবর্তন সূচিত করতে যে সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো কর্মরত ঐ পদ্ধতির মাধ্যমে সে সব উপাদানের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় নি।

তৃতীয়, বর্ণনাত্মক ঃ ঐ পদ্ধতি মূলত বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক নয়। গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখকগণ প্রধানত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরণ, জন্ম, ইতিহাস, বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ঐ সব প্রতিষ্ঠান কোন্ অবস্থায় কেন কার্যকর এবং কোন্ অবস্থায় ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে সে সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে হয় নি। **নতুন পদ্ধতি প্রধানত বিশ্লেষণাত্মক** (analytical)।

চতুর্থ, বিবরণমুখী ঃ গতানুগতিক পদ্ধতি মূলত বিবরণমুখী (descriptive), তুলনামূলক (comparative) নয়। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে পণ্ডিতগণ প্রধানত কোন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁরা সে ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনায় প্রয়াসী হয় নি।

তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি
Scope of Comparative Politics

তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সম্প্রতি এর পরিধি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন পরিবেশ, তার কার্যকারিতা তুলনামূলক রাজনীতির মৌলিক বিষয়বস্তু। তাছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়বস্তু।

তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে তার ফলেও এ অধ্যয়ন ক্ষেত্রের সীমারেখা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী তুলনামূলক রাজনীতিতে অধ্যয়ন করা হয় যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং তাদের কার্যাবলির (structures and functions) বিবরণ। আবার সে সমাজের রাজনৈতিক কৃষ্টি (political culture) ও দীক্ষাদানের (political socialization) সাথে সংশ্লিষ্ট বলে তাদের বিশদ আলোচনা হয় তুলনামূলক রাজনীতিতে।

নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং আইন প্রণয়ন রীতির পরিবর্তে তুলনামূলক রাজনীতিতে বিশ্লেষণ করা হয় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি, স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকা, গণসংযোগ মাধ্যম সমূহের প্রভাব, শিক্ষাব্যবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বে প্রযোজ্য

পদ্ধতিসমূহ তুলনামূলক রাজনীতিতে প্রয়োগ করে অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের অনেক সমস্যা তুলনামূলক রাজনীতির সমস্যা। এ ক্ষেত্রে সংঘ তত্ত্বের (Group Theory) আলোচনা, শ্রেণী সমস্যার (Class Analysis) বিশ্লেষণ, এলিট গোষ্ঠীর (Elite) প্রভাব, এবং সিস্টেম তত্ত্বের (System Analysis) বিশ্লেষণ তুলনামূলক রাজনীতিকে করেছে সমৃদ্ধ।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যভিত্তিক পদ্ধতি (Functional Analysis) তুলনামূলক রাজনীতির এক নির্দিষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন আলোচিত হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো, অন্যদিকে তেমনি কাঠামোগুলোর কার্যাবলির বিবরণ দেয়া হয়। এই কার্যাবলির একদিক হলো সমর্থন বা পরিপোষণ (input) এবং অন্যদিক ফলাফল বা প্রভাবের রূপরেখা (output)। প্রথমোক্ত কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দীক্ষাদান (political socialization), নিয়োগ (recruitment), স্বার্থ জ্ঞাপন (interest articulation), স্বার্থসমষ্টিকরণ (interest aggregation) এবং রাজনৈতিক সংযোগ (political communication)। দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যাবলির মধ্যে প্রধান হলো আইন প্রণয়ন (rule making); আইন প্রয়োগ (rule application) এবং বিচার কার্য সম্পন্নকরণ (rule adjudication)। তুলনামূলক রাজনীতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার এ সকল কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়।

তাছাড়া, তুলনামূলক রাজনীতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা, কৃতিত্ব এবং সুষ্ঠু কার্যকারিতা সম্পর্কেও আলোচনা করে এবং কোন্ ব্যবস্থা কোন্ পরিস্থিতিতে অধিক কার্যকর হয় তাও দিকনির্দেশ করে। রাজনৈতিক অগ্রগতি (political development) তুলনামূলক রাজনীতির আর একটি বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয়। রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোন্ ধরনের পরিবর্তন সূচীত হয় তাও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়।

তুলনামূলক রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সকল রূপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়। অতীতে গণতন্ত্র সম্পর্কে লেখকদের এক দুর্বলতা ছিল। তুলনামূলক রাজনীতিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং কোন্ অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফলভাবে কার্যকর হয়, তার দিকনির্দেশ করা হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন সমস্যার অনুধাবন করা হয়।

তুলনামূলক রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্যভিত্তিক প্রণালী
Functional Approach to Comparative Politics

তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নে কার্যভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Functional Approach) সম্প্রতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের মুখ্য বিষয় ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কার্যত দেখা গিয়েছে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পন্ন হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা, হাজারো স্বার্থ গোষ্ঠী বা চাপ সৃষ্টিকারী সংস্থার মাধ্যমে, গণসংযোগের মাধ্যমে, যেমন রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য হাজারো সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। রাজনৈতিক কার্যকলাপের উৎস আবার প্রোথিত রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে, সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রার লক্ষ প্রণালীতে। সুতরাং রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঠিক বিশ্লেষণ এবং তার গতিধারার দিক নির্ণয়ের জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বে অনুসৃত পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করে রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর বিশ্লেষণ করা। এক কথায়, কার্যভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মূল কথা রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক কার্য সম্পাদনকারী এক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জার্মানির প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী

ম্যাক্‌স ওয়েবার (Max Weber) রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কার্যভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Functional Approach) প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে আমেরিকার দুই জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, টালকট পারসন্স (Talcott Parsons) এবং হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Lasswell) এ প্রণালীকে জনপ্রিয় করে তুলেন।

সম্প্রতি এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন গ্যাব্রিয়েল অ্যালমণ্ড (G. A. Almond), বিংহ্যাম পাওয়েল (G. Bingham Powell), ডেভিড ইস্টন (David Easton), জেমস্ কোলম্যান (James S. Coleman), লুসিয়ান পাই (L. W. Pye), সিডনী ভারবা (Sydney Verba) ও আরো অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে বলা হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political system)। চারটি মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে কোন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে অন্য ব্যবস্থার তুলনা করা। এ চারটি মানদণ্ড হলো- (ক) দক্ষতা (capabilities), (খ) সংরক্ষণ (system maintenance), (গ) অভিযোজন (Adaptation) এবং (ঘ) রূপান্তরকরণ (conversion functions)।

দক্ষতা (Capabilities) : যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকলাপের মান নির্ণীত হয় সে ব্যবস্থার দক্ষতার দ্বারা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা নির্ভর করে কীভাবে নীতি পরিচালিত হয়। দাবি-দাওয়া গ্রহণ (inputs) এবং নীতি পরিচালনা (outputs) ব্যতীত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা, বৃদ্ধি পায় গণ-সমর্থন, জনগণের সেবা, ত্যাগ এবং জনগণের আনুগত্যের দ্বারা। দক্ষতার বিচারে কোন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিত হয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে (regulative), যেমন স্বৈরতান্ত্রিক সর্বাত্মক ব্যবস্থা; আবার কোন ব্যবস্থা পরিচিত হয় দায়িত্বশীল ব্যবস্থারূপে (responsive), যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আবার কোন ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে বণ্টনমূলক (distributive) হয়ে ওঠে, যেমন— সমাজতান্ত্রিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রগুলো।

সংরক্ষণ এবং অভিযোজন (System Maintenance and Adaptation Functions) : বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনার আর দুটি মানদণ্ড হলো সংরক্ষণ এবং অভিযোজন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং অভিযোজন নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ভূমিকা যথাযথরূপে পালনের উপর, বিশেষ করে রাষ্ট্রের প্রশাসক, সামরিক কর্মকর্তা, কর আদায়কারী কর্মচারী, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা এবং তাদের সামাজিকীকরণের উপর। এ ক্ষেত্রে তুলনার প্রধান দুটি সূত্র রাজনৈতিক দীক্ষাদান (political socialization) এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিয়োগ (recruitment)।

রূপান্তরমূলক কার্যাবলি
Conversion Functions

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে আর একটি ব্যবস্থার তুলনা চলে তার রূপান্তরমূলক কার্যাবলির ভিত্তিতে। রূপান্তরমূলক কার্যাবলি আবার দু প্রকারের, যথা, **(এক)** দাবি-দাওয়া গ্রহণ (inputs) এবং **(দুই)** নীতি পরিচালনা (outputs)। দাবি-দাওয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোন্ ব্যবস্থায় কিভাবে স্বার্থ জ্ঞাপন করা হয় (interest articulation) এবং কিভাবে স্বার্থের সমষ্টিকরণ (interest aggregation) সাধিত হয়। নীতি পরিচালনা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো আইন প্রণয়ন (rule making), আইন প্রয়োগ (rule application) এবং বিচার কার্য সাধন (rule adjudication)। তাছাড়া, দাবি-দাওয়া গ্রহণ এবং নীতি পরিচালনার বিভিন্ন দিক কিভাবে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচারিত হচ্ছে (political communication) তাও রূপান্তরমূলক কার্যাবলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এভাবে রাজনৈতিক

ব্যবস্থার সাথে অন্য একটি ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা সম্পন্ন হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতে। নিচের তালিকায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত কার্যাবলি (Inputs)	নীতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Outputs)
(ক) রাজনৈতিক দীক্ষাদান ও লোক সংগ্রহ (Political Socialization and recruitment)	(ক) আইন প্রণয়ন (Rule Making)
(খ) স্বার্থজ্ঞাপন (Interest Articulation)	(খ) আইন প্রয়োগ (Rule Application)
(গ) স্বার্থ সংগ্রহণ (Interest Aggregation)	(গ) বিচার কার্য সাধন (Rule Adjudication)
(ঘ) রাজনৈতিক যোগাযোগ (Political Communication)	

[উৎস : G. A. Almond, The Politics of Developing Areas]

১। তুলনামূলক রাজনীতি কাকে বলে? তুলনামূলক রাজনীতি পাঠের গুরুত্ব কী? What is Comparative Politics? What is the importance of the Comparative Politics?)

২। তুলনামূলক রাজনীতি বলতে কী বুঝ? এর গুরুত্ব কী? (What do you mean by comparative Politics? What is the significance of the study of Comparative Politics?

৩। রাজনীতি পাঠে প্রাচীন পদ্ধতির ত্রুটিগুলো আলোচনা কর। (Discuss the demerits of the traditional methods in the study of Comparative Politics?

৪। তুলনামূলক রাজনীতি কী? এর পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (What is Comparative Politics? Discuss its scope.)

৫। তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের কার্যভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the application of Functional Approach to the study of Comparative Politics.)

৬। তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের কাঠামো-কার্যগত পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। (Explain the Structural Functional approach to the study of Comparative Politics.)

সরকারের শ্রেণীবিভাগ

৩৪
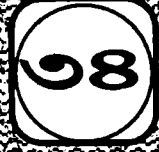
CLASSIFICATION OF GOVERNMENTS

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ
Classification of States

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন, যদিও আকৃতি অনুসারে তাকে রাজতন্ত্র (monarchy), প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (republic), গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (democracy), ঈশ্বরতন্ত্র (theocracy), স্বৈরাচারী রাষ্ট্র (despotism), ধনিকতন্ত্র (plutocracy), সামন্ততন্ত্র (feudal), দপ্তরশাহী (bureaucracy) প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। আবার কোন্ রাষ্ট্র কতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে ও কতখানি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, এ ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম (sovereign) রাষ্ট্র, আংশিক সার্বভৌম (part-sovereign) রাষ্ট্র, সার্বভৌম শক্তিবিহীন (non-sovereign) রাষ্ট্র, অধীন (vassal) রাষ্ট্র, রক্ষিত (protected) রাষ্ট্র এবং নিরপেক্ষ (neutralised) রাষ্ট্র প্রভৃতি রূপে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু আসলে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত জটিল, কারণ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের যে তফাত তা শুধুমাত্র সরকারের বৈশিষ্ট্যজনিত। মূলত সকল রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন। তার মৌলিক উপাদান ভূ-খণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমিকতা। এদের কোনটির অভাব ঘটলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। সুতরাং আংশিক সার্বভৌম বা সার্বভৌমিকতাবিহীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নিজ সার্বভৌম শক্তির সাহায্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। আবার কোন রাষ্ট্রে জনসংখ্যা বেশি বা কোনটির ভূ-খণ্ড বৃহত্তর বলে তাদের আকার এবং প্রকার বিভিন্ন হতে পারে না, যেমন কেউ স্থূলদেহ বা কেউ ক্ষীণদেহ হলে তারা ভিন্ন প্রাণী হয় না। কোন রাষ্ট্র কৃষিপ্রধান হতে পারে, কোনটি আবার শিল্পপ্রধান হতে পারে, কিন্তু মূলত সবই রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য, তা রাষ্ট্রীয় মৌলিক গুণাবলীর জন্যে নয়, তা সরকারের বিভিন্নতাজনিত অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সংরক্ষিত করার প্রয়াসজনিত। তবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব। অধ্যাপক উইলোবি একথাই বলেছেন। তাঁর মতে, "রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে না। মূলত সবই অভিন্ন এবং তাদের প্রত্যেকটি একটি সার্বভৌম শক্তির মানদণ্ডে অন্য জনপদ হতে পৃথক" ("That there can be no such thing as a classification of states. In essence, they are all alike, each and all being distinguished by the same sovereign attribute.")।

অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ধারক ও বাহকগণের সংখ্যা অনুসারে রাষ্ট্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। আবার তিনি প্রদেশসমূহের সংযুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে একক (simple) ও সংযুক্ত (composite) রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আসলে এই শ্রেণীবিভাগে সরকারের প্রকৃতি ও আকৃতির ভিত্তিতেই চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য তিনি পাদটীকায় তা উল্লেখ করেন। সুতরাং সরকারের শ্রেণীবিভাগই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত বিভাগ। পরবর্তী পৃষ্ঠায় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

এরিস্টটলকৃত সরকারের শ্রেণীবিভাগ
Aristotle's Classification of Government

এরিস্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন তফাত দেখান নি। তাই সরকারের শ্রেণীবিভাগই তাঁর মতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ছিল। তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন দুটি নীতির ভিত্তিতে। প্রথমটি ছিল সংখ্যাভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি নীতিভিত্তিক। তিনি সংখ্যাভিত্তিক তিন প্রকার সরকারের কথা উল্লেখ করেছেন। একজনের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হলে তা রাজতন্ত্র (monarchy)। কতিপয় লোকের হাতে ন্যস্ত হলে তা অভিজাততন্ত্র (aristocracy) নামে খ্যাত হয়। বহু লোকের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হলে তাকে গণতন্ত্র (polity) বলা হয়। নীতিগতভাবে তিনি প্রত্যেক সরকারকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। রাষ্ট্র যদি সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হয় তা হলে তাকে স্বাভাবিক রাষ্ট্র বলা হত (normal)। আবার যদি তা সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে শাসকবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পরিচালিত হত তা হলে তা রাষ্ট্রের বিকৃত রূপ (perverted)। সুতরাং সংখ্যা ও নীতির ভিত্তিতে তিনি সরকারকে বিভক্ত করেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি একজনের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং তা যদি স্বাভাবিক থাকে তা হলে তা রাজতন্ত্র (monarchy) এবং বিকৃত হলে তা স্বৈরতন্ত্র (tyranny)। ক্ষমতা যদি কতিপয় লোকের হাতে ন্যস্ত হয় এবং তা যদি সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা অভিজাততন্ত্র (aristocracy) এবং বিকৃত হলে তা কুলীনতন্ত্র (oligarchy)। আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি বহু লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং তা যদি সকলের মঙ্গল আনয়ন করে, তবে তাকে গণতন্ত্র (polity) বলা হত, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তা ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হত জনতাতন্ত্র (democracy)। তাঁর মতে, গণতন্ত্র উৎকৃষ্ট সরকার নয় এবং জনতাতন্ত্র (democraey) নিকৃষ্টতম সরকার, কারণ তা শুধুমাত্র বিত্তহীন ও দরিদ্রগণের স্বার্থ রক্ষা করে। রাজতন্ত্রকে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সরকার বলে অভিমত প্রকাশ করেন, তবে অভিজাততন্ত্রও রাজতন্ত্রের সমকক্ষ। তাঁর শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলে নিম্নরূপ হয় ঃ
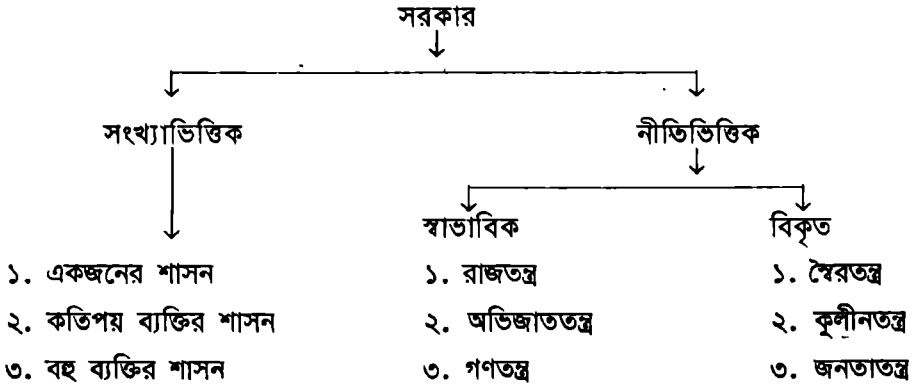
এরিস্টটল আরও বলেছেন, বিভিন্ন শাসন পদ্ধতি চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়। তাই প্রসিদ্ধ এরিস্টটলের চক্র (Aristotelian Cycle) নামে খ্যাত। এ মতানুসারে কোন বিশেষ শাসনব্যবস্থা যখন বিকৃত রূপ ধারণ করে, তখন তা অন্য পদ্ধতিতে রূপ পায়। রাজা যখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, তখন অভিজাতগণ ক্ষমতা দখল করে। অভিজাতগণ স্বার্থচিন্তায় পীড়িত হলে তা কুলীনতন্ত্রে রূপ লাভ করে। আবার তাদের

শাসনের বিরুদ্ধে জনৈক শক্তিশালী ব্যক্তি জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে ক্ষমতাসীন হয়। কালক্রমে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হয়ে তাও ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে এবং প্রথমে গণতন্ত্র, পরে তা জনতাতন্ত্রে পরিণত হয়ে পুনরায় রাজতন্ত্রের আগমনী ঘোষণা করে।

এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা ঃ এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ একদিক থেকে উৎকৃষ্টতর। তা শুধুমাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে সরকারের প্রকৃতি নির্ধারণ করে নি, নৈতিকতার ন্যায়দণ্ডে ও সর্বজনীন মঙ্গল সাধনের মাপকাঠিতে সরকারকে বিভক্ত করে স্বাভাবিক ও বিকৃতরূপে তিনি তার প্রকারভেদ করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারকে এ ন্যায়নীতির ভিত্তিতে চিহ্নিত করেননি। তবে এও সত্য যে, তাঁর শ্রেণীবিভাগ এ যুগে অচল।

প্রথমত, দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে শাসন প্রণালী পরিচালিত হয়, তাকে তিনি জনতাতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাকে নিকৃষ্টতম সরকার বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বর্তমান কালের সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য বিত্তহীনদের একনায়কত্ব স্থাপন করে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। শ্রেণীহীন সমাজের কথা এরিস্টটল ভাবতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, তিনি সর্বজনীন কল্যাণের জন্য রাজতন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট সরকার বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কালের প্রভাবে তা আজ বিলুপ্ত প্রায়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র আজ কোথাও নেই। যে সব দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে সে সব দেশে বর্তমানে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ইংল্যাণ্ডে এবং জাপানে রাজা বা রানী থাকলেও সেখানে শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক।

তৃতীয়ত, সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান হিসেবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত অস্পষ্ট ও জটিল, কেননা সেকালে অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রে কোথায় যে শাসন ক্ষমতা অবস্থিত ছিল তা বলা কঠিন। অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্য, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাছাড়া বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কোথায় যে শাসন ক্ষমতা অবস্থিত থাকে, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

চতুর্থত, এরিস্টটল দৈবতন্ত্রের (theocracy) কোন ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু মধ্যযুগে ও প্রাচীনকালে দৈবতন্ত্র বা ঈশ্বরতন্ত্রের প্রভাব যে নেহায়েত কম ছিল তা নয়।

পঞ্চমত, বলা যায় যে, তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, রাষ্ট্রের নয়। অথচ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ হিসাবেই তিনি আলোচনার সূত্রপাত করেন। সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোন তফাত তিনি মানতেন না।

ষষ্ঠত, আধুনিককালে গণতন্ত্রের যে আবেদন, তাও তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। গণতন্ত্রের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তা আধুনিক কালের আদর্শ ব্যবস্থা।

তবে তাঁর শ্রেণীবিভাগ সমালোচনা করার সময় এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল তাঁর সামনে। তিনি বর্তমান কালের বৃহৎ রাষ্ট্রের চিন্তা করতে পারেন নি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর গবেষণা ও ধ্যান-ধারণা বর্তমান কালের রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী হয় নি।

সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ
Modern Classification

এরিস্টটলের পর মেকিয়াভেলি, বোঁদা, হবস, লক, মতেস্কু, রুশো প্রমুখ চিন্তাবিদ সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন বিভিন্নভাবে। ব্লুণ্টসলি এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর সাথে ঈশ্বরতন্ত্র বা দৈবতন্ত্র (theocracy) যোগ করেন। এরিস্টটলের মত রোমক চিন্তাবিদগণও রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সিসেরো (Cicero), পলিবিয়াস (Polybius) প্রমুখ পণ্ডিতগণ রাজতন্ত্র,

অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে মিশ্ররাষ্ট্রের কথাও (mixed states) বলেছেন, কিন্তু বর্তমানে সে সব শ্রেণীবিভাগ অচল। তৎকালে তা যথার্থ হলেও পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আজকাল তা আমাদের তেমন সাহায্য করে না। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ও শাসনতান্ত্রিক ও সাংগঠনিক দিকে প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলে সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ নতুনভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, অতীতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হত না। বর্তমানে তা করা হয়। সুতরাং বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে।

প্রথমত, সংবিধানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরকারকে বিভক্ত করা হয়। ফলে কোন কোন সরকারকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধানভিত্তিক সরকার বলা হয়। কোন কোন সরকারকে আবার দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ভিত্তিক সরকার বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বণ্টনের উপর নির্ভর করে সরকারকে বিভাগ করা হয়। এ হিসেবে সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক-এ দু ভাগে বিভক্ত করা হয়।

তৃতীয়ত, আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর নির্ভর করেও সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। পার্লামেন্টারী সরকার এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার-এভাবে বর্ণনা করা হয়।

চতুর্থত, বিচার বিভাগের প্রকৃতির ভিত্তিতেও সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়-যেমন, সাধারণ আইন ভিত্তিক সরকার (Common law government) এবং শাসন বিভাগীয় সরকার (administrative law government)।

সর্বশেষে, জনমতের উপর নির্ভরশীল এবং শ্রদ্ধাশীল ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতেও আধুনিক সরকারসমূহ বিভক্ত হয়। এ ভিত্তিতে সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার এবং একনায়কতান্ত্রিক সরকার বলা হয়। অধ্যাপক ম্যারিয়ট (Marriot) ও অধ্যাপক লিক্‌ক (Leacock), বিশেষ করে অধ্যাপক লিক্‌ক যেভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

লিককের শ্রেণীবিভাগ

(১) সরকারকে প্রথমত, স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্র এ দুভাগে বিভক্ত করা হয়। যখন শাসন ব্যবস্থা একনায়ক কর্তৃক পরিচালিত হয় অথবা জনমতকে অগ্রাহ্য করে কোন ব্যক্তি বা দলের দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তখন তা একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র রূপ লাভ করে। বর্তমানে স্বৈরতন্ত্রের উদাহরণ সউদী আরবের শাসন ব্যবস্থা। যখন শাসন ক্ষমতা জনসাধারণের উপর ন্যস্ত হয় এবং জনসাধারণ তা জনমতের প্রভাব অনুসারে ব্যবহার করে তখন গণতন্ত্রের জন্ম হয়। গণতান্ত্রিক সরকারের উদাহরণ বলতে হলে প্রথমে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার শাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে হয়। গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে আবার বিভিন্ন সূত্র ধরে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানের প্রকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রকে সসীম রাজতন্ত্র (Limited Monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic)— এ দু ভাগে ভাগ করা হয়। সসীম রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণীর নামে যদিও শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তথাপি শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে। ইংল্যাণ্ডে রাজা বা রাণী থাকা

সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থা পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন-যেমন হয় আমেরিকা, ভারত, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে-তখন তাকে বলে প্রজাতন্ত্র।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে অঙ্গরাজ্যের সম্বন্ধের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকার-এ দুভাগে বিভক্ত করা হয়। যদি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা একই সরকারের হাতে ন্যস্ত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশ তা থেকে শাসন ক্ষমতা লাভ করে তাহলে উক্ত সরকারকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। ইংল্যাণ্ডের সরকার এককেন্দ্রিক। বাংলাদেশের সরকারও এককেন্দ্রিক। কিন্তু কোন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা যদি প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সংবিধানের ধারা মোতাবেক বিন্যস্ত হয় এবং উভয় প্রকার সরকারই সংবিধান অনুযায়ী শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে তবে সে সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। **আমেরিকার** সরকার এ ধরনের।

(৪) আইন পরিষদের সাথে শাসন বিভাগের সম্বন্ধের ভিত্তিতে সরকারকে আবার পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার-এ দুভাগে ভাগ করা হয়। যদি শাসন বিভাগ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে, তাহলে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় (Parliamentary) সরকার বলে। ইংল্যাণ্ডে এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু যদি শাসন বিভাগ আইন পরিষদের নিকট দায়ী না থাকে তা হলে তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential government) বলে। আমেরিকার সরকার এরূপ।

ম্যাক আইভারের শ্রেণীবিভাগ ঃ অধ্যাপক লিককের (Leacock) শ্রেণীবিভাগ অবশ্য একদিক থেকে অসম্পূর্ণ, কেননা এ শ্রেণীবিভাগে অর্থনৈতিক (Economical) ও সাম্প্রদায়িক দিকের কোন প্রতিফলন ঘটে নি। তাছাড়া, এ শ্রেণীবিভাগে অতীতের বহু ধরনের সরকারকেও অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, লিককের শ্রেণী বিভাগে প্রাচীন গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা আধুনিককালের সমাজতান্ত্রিক সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক ম্যাকআইভারের (Mac Iver) শ্রেণীবিভাগ উন্নত বলে মনে হয়। তিনি চারটি সূত্র ধরে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন; যথা **(এক)** সাংবিধানিক, **(দুই)** অর্থনৈতিক, **(তিন)** সাম্প্রদায়িক এবং **(চার)** সার্বভৌম ক্ষমতা সংক্রান্ত।

(১) সাংবিধানিক ভিত্তিতে ঃ ম্যাকআইভার সরকারকে **রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ঈশ্বরতন্ত্র, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, সীমিত রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও দ্বৈতশাসন ভিত্তিক** সরকার বলে চিহ্নিত করেন। সরকারের এ শ্রেণীবিভাগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিসের ভিত্তিতে প্রয়োগ হয়েছে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

(২) অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ঃ তিনি সরকারকে আবার **প্রাচীন সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক** বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ শ্রেণীবিভাগে তিনি দেখিয়েছেন সমাজের কোন্ শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।

(৩) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ঃ তিনি সরকারকে আখ্যায়িত করেছেন-**উপজাতীয় সরকার, নগর রাষ্ট্র, জাতীয় রাষ্ট্র এবং বিশ্বরাষ্ট্র** হিসেবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(৪) সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ঃ তিনি আবার সরকারকে **এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সাম্রাজ্য** এ তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এ শ্রেণীবিভাগে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

সর্বাধুনিক শ্রেণীবিভাগ ঃ ম্যাকআইভারের শ্রেণীবিভাগ বেশ কিছু দিন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কিন্তু এ শ্রেণীবিভাগও কালক্রমে অপ্রতুল হয়ে পড়ে। অধ্যাপক লিকক ও ম্যাকআইভার প্রমুখ লেখকের শ্রেণীবিভাগে আধুনিককালের অনেক সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে নি। বার্নার্ড ক্রিক (B. Crick), মরিস দুভারজার (Maurice Duverger) প্রমুখ লেখক সরকারের শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষা এক সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political Systems) এবং সরকারের শ্রেণীবিভাগকে অধিক শ্রেয় মনে করেন। এ্যালান বলের (Alan R. Ball) অভিমতও তাই। এল্যান বল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারের শ্রেণীবিভাগ একসাথে সম্পন্ন করে আধুনিক কালের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়েছেন। এ শ্রেণীবিভাগই সর্বাধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হল।

এ্যালান বলের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে (Political System) তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা–

(ক) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Democratic System);

(খ) সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Totalitarian System);

(গ) কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা (Autocratic System)।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–একাধিক রাজনৈতিক দলের কার্যকারিতা, অবাধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টিকারী সংঘ ও সমিতির উপস্থিতি, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। সর্বাত্মক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি ও সমাজ–জীবনের সর্বস্তরে সরকারের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ, একটি রাজনৈতিক দলের আইনগত স্বীকৃতি, কোন আদর্শের ব্যাপক প্রভাব, জনসাধারণের বিপুল সমাযোজন। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান থাকে সীমিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, কোন প্রভাবশালী আদর্শের অনুপস্থিতি, বলপ্রয়োগের প্রবণতা, কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সংঘের একচেটিয়া অধিকার। এ তিন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা শুধু যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, মূল্যবোধ ও আদর্শের ভিত্তিতেই বিভিন্ন তা নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তারা বিভিন্ন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নত, কিন্তু সর্বাত্মক ও কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা উন্নয়নশীল।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারের বিভিন্নতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপে করা হয় ঃ

প্রথমত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের রূপ **যুক্তরাষ্ট্রীয়** অথবা **এককেন্দ্রিক** হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে অঙ্গরাজ্যের সম্বন্ধের ভিত্তিতে এ শ্রেণীবিভাগ।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক–উভয় ব্যবস্থায় সরকারের রূপ হতে পারে **রাষ্ট্রপতি শাসিত** অথবা **মন্ত্রিপরিষদ শাসিত**। শাসন বিভাগ এবং আইন পরিষদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শ্রেণীবিভাগ।

তৃতীয়ত, সর্বাত্মক ব্যবস্থা বিশিষ্ট আদর্শের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে **সাম্যবাদী** ও **ফ্যাসীবাদী** এ দু' প্রকারের হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও পূর্ব ইউরোপের সরকারকে সাম্যবাদী (Communist) বলা যেতে পারে এবং হিটলারের জার্মানি, মুসোলিনীর ইতালী, ফ্রাঙ্কোর স্পেন ফ্যাসীবাদী (fascist) পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থত, কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় সরকারের রূপ হতে পারে–সনাতন (traditional) এবং আধুনিকতাপ্রবণ (modernizing)। সউদী আরব, নেপাল ও থাইল্যাণ্ডের সরকারকে সনাতন পর্যায়ভুক্ত করা যায় এবং সিরিয়া, ইরাকের সরকারকে আধুনিকতাপ্রবণ কর্তৃত্ববাদী সরকার বলা যেতে পারে।

আধুনিকতাপ্রবণ কর্তৃত্ববাদী সরকার আবার সামরিক (military) ও বেসামরিক (civilian) এ দু প্রকারের হতে পারে। ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আইয়ুবের পাকিস্তান সামরিক সরকারের

অন্তর্ভুক্ত এবং বর্তমানের ইন্দোনেশিয়া বেসামরিক সরকার পর্যায়ভুক্ত। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিচে দেয়া হলো ঃ

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ

প্রশ্নাবলি
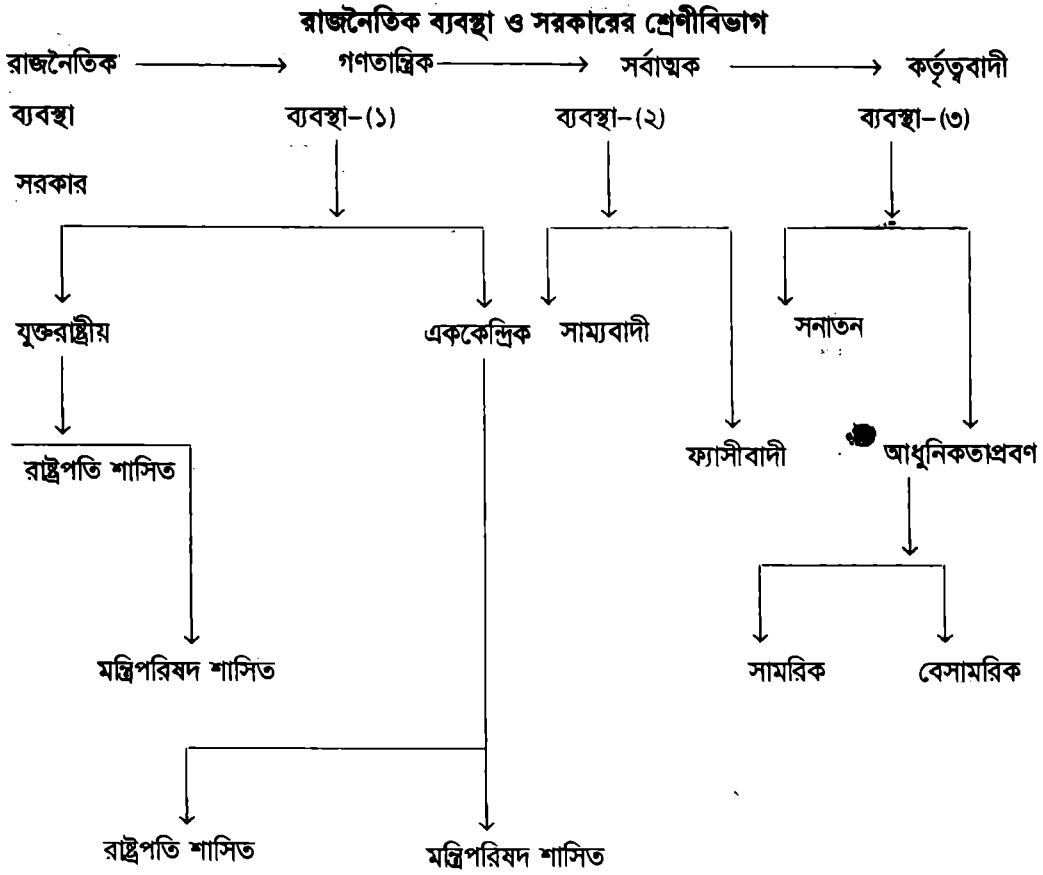
১। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ কী সম্ভব ? সম্ভব হলে কীভাবে তার শ্রেণীবিভাগ করবে ? (Is it possible to classify the states? If possible, how would you classify them?)

২। তুমি কী মনে কর না যে, এরিস্টটলকৃত শ্রেণীবিভাগ এ যুগে অচল ? যুক্তি দেখাও। (Do you not think that Aristotelian classification of government is wholly unsuited to modern age? Show reasons.)

৩। বর্তমানে সরকারের শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করা হয়? তোমার মতামত প্রকাশ কর। (How governments are classified now a days? Give your opinions.) [D.U.1972, '77; R.U. 1977]

৪। এরিস্টটল প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। তিনি কী ধরনের সরকারকে উত্তম বলেছেন ? (Discuss Aristotle's classification of government. Which type of government he considered to be the best?)

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

DEMOCRACY AND DICTATORSHIP

৩৫

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা
Definition of Democracy

শব্দার্থগতভাবে গণতন্ত্রের অর্থ জনসাধারণের শাসন। অতীত ও মধ্যযুগে গণতন্ত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে আমরা শুধুমাত্র এক ধরনের সরকারকেই বুঝি না, সাথে সাথে বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থাকেও বুঝি। সে সমাজ ব্যবস্থার অভাব যেখানে দেখা যায়,সেখানে শাসনপ্রথা গণতন্ত্র নামে পরিচিত হলেও তা পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক নয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্র বলতে আমরা এক প্রকার শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলেছেন, "গণতন্ত্র এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপর ন্যস্ত থাকে না, বরং সমাজের সদস্যগণের উপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে।" তার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ লর্ড ব্রাইসের সংজ্ঞায়। তিনি গণতন্ত্র সম্বন্ধে বলেছেন, "যে শাসন প্রথায় জনসমষ্টির অন্তত তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের অধিকাংশের মতে শাসন কার্য পরিচালিত হয়, তাই গণতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, নাগরিকদের ভোটের শক্তি যেন তাদের শারীরিক বলের সমান হয়" ("A government in which the will of the majority of the qualified citizens rules...... say, at least three-fourths so that the physical force of the citizens coincides with their voting power")।

বিয়াট্রীস ওয়েব (Beatrice Webb) ও সিডনি ওয়েব (Sidney Webb) আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীদের সংঘ যখন রাজনৈতিক আত্মশাসনের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে তখন তাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়।" স্যার ক্রিপস বলেন, "গণতন্ত্র বলতে আমরা সে শাসনব্যবস্থাকে বুঝি, যেখানে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সব বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং সকলের মধ্যে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে।"

ম্যাকাইভারের মতে, "গণতান্ত্রিক শাসনে সরকার জনগণের এজেন্ট মাত্র এবং সে হিসেবে তারা সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেন।" তবে সি. এফ. স্ট্রং-এর সংজ্ঞা নির্দেশ অত্যন্ত স্বচ্ছ। তিনি বলেন, "শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাকে গণতন্ত্র বলা যায়" ("Democracy implies that government which shall rest on the active consent of the governed")। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, যদিও তা অধিকতর অস্পষ্ট। গণতন্ত্রকে তিনি "জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা" ("Government of the people, by the people and for the people") বলেছেন।

অনেকে আবার গণতন্ত্রকে একাধারে শাসনব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা হিসেবেও বর্ণনা করেন। গণতন্ত্র বলতে অনেকে অর্থনৈতিক সাম্যের কথাও বলেন। শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র বুঝায় যে, রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর জনসমূহ সমভাবে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে, আইন পরিষদে সকল শ্রেণীর মতামত প্রতিফলিত হয় এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নিয়মিত নির্বাচন প্রতিযোগিতায়। রাজনৈতিক কার্যাবলীতে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শাসনব্যবস্থাই রাজনৈতিক গণতন্ত্র।

সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র বলতে আমরা সেরূপ সামাজিক পরিবেশকে বুঝি যেখানে তীব্র অসাম্য অনুপস্থিত এবং সমতার ভিত্তিতে সকলে জনকল্যাণকর কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করে এবং সকলে সমাজের অপরিহার্য অংশ হিসেবে সুখ-সুবিধায় অংশীদার হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র সকলকে সমান সুযোগ দান করে, কাজ করার অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত নয় এবং সর্বোপরি সকলে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব অনুভব করে না। অনেকের মতে, এই তিন ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্য মিলনই অকৃত্রিম এবং অনাবিল গণতন্ত্র। তবে অর্থনীতিতে যেমন পরিকল্পনা শব্দও যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অধুনা তেমন বিশেষ অর্থজ্ঞাপন করে না, গণতন্ত্রও তেমনি আজ তেমন অর্থবহ ধারণা নয়। একনায়কগণও গণতন্ত্রকে সঙ্গী করতে দ্বিধাবোধ করে না। কুলীনতন্ত্রেও তা নিয়মিত ব্যবহৃত এবং অনেক সামরিক শাসনেও অনেকে এর আদর্শ গ্রহণ করার কথা বলেন। সুতরাং গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ
Marks of Democracy

স্বর্ণের সুষ্ঠু পরীক্ষার জন্য যেমন কষ্টি পাথর রয়েছে তেমনি গণতন্ত্র পরীক্ষার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত ছয়টি বিশিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। কোন শাসনব্যবস্থাকে এ ছয়টি পদ্ধতির মানদণ্ডে বিচার করে বুঝতে হবে তা গণতান্ত্রিক কিনা।

প্রথমত দেখতে হবে উক্ত শাসনব্যবস্থায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে সরকার গঠিত হয় কী না। **দ্বিতীয়ত,** নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে পরিবর্তন করা যায় কী না। **তৃতীয়ত,** উক্ত ব্যবস্থায় দলগঠন, মত প্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কী না। **চতুর্থত,** জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের স্বার্থ রক্ষার সুবন্দোবস্ত রয়েছে কী না। **পঞ্চমত,** প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহ আইনগতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি না। **সর্বশেষে,** জনসাধারণ এই আশ্বাস পেয়েছে কী-না যে, সুষ্ঠু বিচার ছাড়া তাদের অহেতুক বন্দীদশা ভোগ করতে হবে না অথবা অন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহের উপস্থিতি যে কোন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করতে সমর্থ। তাছাড়া, এ বিষয়ে কতিপয় পণ্ডিতের মতামত উল্লেখযোগ্য।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সলটু (Soltau) বলেছেন যে, গণতন্ত্রের মধ্যে চার সত্য অনুধাবনযোগ্য। **প্রথমত,** এটা গ্রহণ করতেই হবে যে, মতামতের দ্বন্দ্বের মধ্যে সত্য রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্মগত অধিকার স্বীকার করা হয় গণতন্ত্রে। **দ্বিতীয়ত,** গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকে কোন অভ্রান্ত সত্যের প্রতীক বলে গ্রহণ করা হয় না। **তৃতীয়ত,** রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং আইনের চোখে সকলে সমান। **চতুর্থত,** শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সকলের মতামতের দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে গণতন্ত্রে। এ চার উপাদানের সমন্বয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা গণতান্ত্রিক। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন বলেন, "জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত তাদের শাসন করার অধিকার কারো নেই"। সুতরাং গণতন্ত্রের মৌলিক কথা হলো শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে শাসিতদের সম্মতি লাভ। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, ঐ শাসন

ব্যবস্থাই গণতান্ত্রিক যা (ক) জনসাধারণের ইচ্ছা, (খ) তাদের মঙ্গলামঙ্গল ও (গ) হিতকর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং (ঘ) যেখানে সাম্য স্বাধীনতা প্রাধান্য লাভ করে।

প্রাচীন ও আধুনিক গণতন্ত্র
Old and Modern Democracy

প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি নগর রাষ্ট্র ও রোমে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধুনিক গণতন্ত্র থেকে অনেকাংশে আলাদা। প্রাচীন এথেন্সে দাসগণের ও বিদেশীদের নাগরিক অধিকার ছিল না। ঐ নগরে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনই ছিল ক্রীতদাস। কমপক্ষে শতকরা ১৫ জন ছিল বিদেশী। নারীদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। প্রাচীন রোমে জনসাধারণের ভোটাধিকার থাকলেও তারা অভিজাতবর্গকে নির্বাচন করতেন। তাই পরে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তারে সাহায্য করেছিল। সুতরাং প্রাচীন গণতন্ত্রে নাগরিক এবং শাসন কার্যে অংশগ্রহণের অধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল। আধুনিককালের আলোকে তা শুধুমাত্র অভিজাততন্ত্রের নামান্তর। নারীদের কোন অধিকার দেয়া হত না। শ্রমজীবীগণ নাগরিকত্ব লাভে সমর্থ হয় নি। নাগরিক অধিকার বা রাজনৈতিক কার্যাবলীতে শুধুমাত্র কুলীন ব্যক্তিরাই অংশগ্রহণ করতেন।

কিন্তু বর্তমান কালের গণতন্ত্র ও প্রাচীন কালের গণতন্ত্রের **প্রথম** ও প্রধান পার্থক্য হলো প্রতিনিধি নির্বাচন করার প্রথা। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, সেকালে রাষ্ট্র ছিল নগররাষ্ট্র। ফলে জনসংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক নাগরিক এক স্থানে মিলিত হয়ে আলোচনা করতে পারত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রগুলো বৃহত্তর।

দ্বিতীয়, নাগরিকত্বের অধিকার অত্যন্ত উদারতার সাথে গৃহীত হওয়ায় কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি জনসমূহের একত্রে মিলিত হয়ে শাসনকার্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই নির্বাচন প্রথা আধুনিক গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে সর্বত্র।

তৃতীয়, প্রাচীনকালে আইন সভার গুরুত্ব তেমন ছিল না, যেমনটি আধুনিককালে দেখা যায়। প্রাচীনকালে শাসনকার্য সাধারণত চিরাচরিত প্রথা ও রীতি-নীতির অনুশাসন দ্বারাই নির্বাহ হত। আজকাল কিন্তু অধিকাংশ আইন-কানুন প্রণীত হয় আইন পরিষদের দ্বারা। তাছাড়া, আধুনিককালের সরকারের ত্রিবিধ বিভাগ-শাসন বিভাগ, আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না অতীতে।

চতুর্থ, প্রাচীন গ্রীসে নির্বাচন হত না, বরং ভাগ্যের উপর নির্ভর বা লটারীর (Lottery) মাধ্যমে কর্মচারিগণকে বাছাই করা হত। কারণ অতীতে গণতন্ত্রে প্রত্যেককে কাজের উপযোগী মনে করা হত।

পঞ্চম, অতীতে জনমত ও রাজনৈতিক দলের কোন গুরুত্ব ছিল না। রাজনৈতিক দলের জন্ম ও জনমতের প্রভাবের ইতিহাস বর্তমান কালের।

ষষ্ঠ, প্রাচীন ও আধুনিক গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য হল ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের। সেকালে ব্যক্তিকে সর্বাংশে রাষ্ট্রের অনুগত এবং অধীন করে রাখা হত। ব্যক্তির জীবনধারা রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। আধুনিক গণতান্ত্রিকেরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি ও রক্ষা করতেই রাষ্ট্রের জন্ম এবং প্রয়োজন। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করে এবং ব্যক্তি জীবনকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ।

সপ্তম, এও বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন গণতন্ত্র ছিল অধিকতর সামাজিক গণতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে শুধুমাত্র সামাজিক ব্যবস্থাকে বুঝি না, রাজনৈতিক এবং এক প্রকার শাসন ব্যবস্থাও বুঝি।

সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার বিশিষ্ট এক পরিবেশকেও বুঝি। কারণ আধুনিককালের রাজনীতি অর্থনীতি ভিত্তিক এবং সামাজিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টম, সর্বজনীনতাও আধুনিককালের গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতির বিভেদ আজকাল স্বীকৃত হয় না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র

Direct and indirect Democracy

গণতন্ত্র দু প্রকার হতে পারে ঃ (১) বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং (২) প্রতিনিধিত্বমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র।

প্রত্যক্ষ ঃ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে সে শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে নাগরিকগণ সরাসরিভাবে নীতি নির্ধারণ করে, প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করে ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে শাসকদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে। নাগরিকগণ সরাসরিভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তাদের দ্বারাই শাসন বিভাগের কর্মচারিগণ নির্বাচিত হন এবং তারা শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দেয়। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমের শাসন ব্যবস্থায় তা প্রচলিত ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র নগর-রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসংখ্যা কম হওয়ায় এবং নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সীমিতভাবে প্রদান করার ফলে জনসংখ্যার পক্ষে কোন এক জায়গায় মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল। তাছাড়া, শাসনকার্য সাধারণত প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথানুসারে চলত বলে আইন প্রণয়নে তেমন কোন জটিলতাও ছিল না। কিন্তু এ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র শুধুমাত্র ছোট রাষ্ট্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব।

আধুনিককালে কোন রাষ্ট্রেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত নেই, তবে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে কোথাও কোথাও এর প্রচলন দেখা যায়। সুইট্জারল্যাণ্ডের ৫টি ক্যাণ্টন, আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডস্থিত কয়েকটি শহরে এখনও এর প্রচলন দেখা যায়।

পরোক্ষ ঃ

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে পরোক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়, কারণ সেখানে জনসাধারণ সরাসরিভাবে শাসনকার্য বা আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে না। জনসাধারণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে। কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চল হলে ১০/১৫ হাজার ভোটার ভোট দিয়ে কোন একজনকে ৪/৫ বছরের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ তাদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন।

তুলনামূলকভাবে বিচার করলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে অধিকতর কার্যকর মনে হয়। ফরাসী পণ্ডিত রুশোও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নাগরিকগণ অনুভব করতে পারে যে, শাসন ব্যাপারে তারাই মালিক। এতে তাদের দায়িত্বজ্ঞানও বৃদ্ধি পায় কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্রে এক একজন ভোটার "নিজেকে সমুদ্র উপকূলে বালুকাস্তূপের মধ্যে মাত্র একটি বালুকণা বলে মনে করে।" কয়েক বছরের মধ্যে একবার ভোট দেবার অধিকার লাভ করে তারা রাজনৈতিক শিক্ষা যথোপযুক্তভাবে পায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ রাজনৈতিক বিষয়সমূহে সম্যক জ্ঞান লাভ করে, বিভিন্ন সমালোচনায় অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে আগ্রহান্বিত হতে পারে এবং সকলে একত্রে আলোচনা করার ফলে সমবেতভাবে কাজ করার শিক্ষা লাভ করে।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি জনকল্যাণের জন্য কাজ না করে তা হলে পুনর্বার অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সহ্য করতে হবে এবং সাথে সাথে সামগ্রিক উন্নতিও ততটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সকলেই অংশীদার। সমভাবে সকলেই কর্মঠ। একত্রে সকলে সহযোগিতা

করে কার্য উদ্ধার করে। তাই এথেন্সের মহান নেতা পেরিক্লিস (Pericles) গণতন্ত্রের গুণগান করে বলেছেন, "আমাদের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের তফাত এই যে, যে ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দূরে থাকে তাকে আমরা শান্তশিষ্ট বলি না, বরং অকর্মণ্য বলি। অন্যেরা মনে করেন, যেখানে কাজ করতে হবে সেখানে কথা শোভা পায় না। আমাদের মতে ভালভাবে আলোচনা না করে কোন কাজ করতে গেলে তা ব্যর্থ হবেই। সে জন্য আমরা সকলে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রের নীতিগত সকল প্রশ্নে বিতর্ক অনুষ্ঠান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।" পেরিক্লিস এখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করেছেন।

তবে সুন্দর হলেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আজ অচল। হাজার হাজার লোকের পক্ষে সমবেতভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কতটুক বিজ্ঞজনোচিত অথবা কতটুকু স্থিরভাবে সম্ভব তা বিচার করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে আজ। বর্তমানকালে জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে লোকসংখ্যা লক্ষ থেকে কোটির সীমায় পৌঁছেছে। বিশেষ কোন স্থানে তাদের পক্ষে একত্রে মিলিত হওয়া আজকাল অবাস্তব ও অসম্ভব। তাই কালের গতির সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র আজকাল সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীনের শত কোটি জনসাধারণের পক্ষে আর যাই কিছু কল্পনা করা হোক, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শ সেখানে নিছক কল্পনা বিলাস।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নীতি

কিন্তু তথাপি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আইন তৈরি, সংবিধান সংশোধন, সরকারি কার্যনীতির বিশেষ সমস্যা সমাধানে আজ কোন কোন রাষ্ট্রে জনসমূহের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নীতি বলে অভিহিত করা হয়। এগুলো হলো গণ-নির্দেশ (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Plebiscite) ও পদ চ্যুতি (Recall)।

গণ-নির্দেশ (Refrendum) ঃ কোন আইনের খসড়ায় অথবা সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাবে ভোটারদের মতামত প্রকাশকে গণ-নির্দেশ বুঝায়। সুইটজারল্যাণ্ডের সংবিধানে গণ-নির্দেশ এক অপরিহার্য অংশ। সেখানকার সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে গণ-নির্দেশ অবশ্যই গ্রহণীয়। সংবিধানকে যদি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হয়, তা হলে তা প্রয়োজন কী না তা গণনির্দেশের দ্বারা ঠিক করা হয়। যদি অধিকাংশ ভোটারের মতামতে তাই স্থির হয়, তা হলে আইনসভার উভয় কক্ষে পুনঃনির্বাচনে করা হয়। নবনির্বাচিত কক্ষদ্বয় পরিবর্তিত সংবিধানের খসড়া তৈরি করে এবং তা যদি গণ-নির্দেশে অধিকাংশ ভোটের এবং অধিকাংশ ক্যান্টনের দ্বারা স্বীকৃত হয় তবে তা কার্যকর হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডিয়াম (Presidium) যে কোন অঙ্গ রাজ্যের অনুরোধক্রমে যে কোন বিষয়ে গণ-নির্দেশের ব্যবস্থা করতে পারত। সুইডেনেও আইনসভা কোন কোন সময় কোন কার্যনীতি বা আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনগণের কি ইচ্ছা তা নির্ধারণ করতে গণনির্দেশ গ্রহণ করে। তবে সুইট্জারল্যাণ্ডের মত সেখানে গণ-নির্দেশ অবশ্য গ্রহণীয় নয়। ইতালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াতেও সাংবিধানিক বিভিন্ন বিষয়ে গণনির্দেশের ব্যবস্থা রয়েছে।

গণ-উদ্যোগ (Initiative) ঃ গণ-উদ্যোগ বলতে আমরা জনসাধারণের সেরূপ উদ্যোগকে বুঝি যার ফলে তারা আইনসভাকে কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে অথবা বাতিল করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে এ পদ্ধতি স্বীকৃতি হয়েছে। আমেরিকার ১৯টি অঙ্গরাজ্যে আইন পরিবর্তনের জন্য এবং রাজ্যের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য গণ-উদ্যোগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুইট্জারল্যাণ্ডের সংবিধানে এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সেখানে ক্যান্টনসমূহে সাধারণ আইন প্রণয়ন বিষয়ে গণ-উদ্যোগের এ প্রয়োগ স্বীকৃত।

পদচ্যুতি (Recall) ঃ পদচ্যুতি বলতে সে পদ্ধতিকে বুঝি যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিক কোন আইন সভার বা শাসকমণ্ডলীর নির্বাচিত সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং সেই অভিযোগ অধিকাংশ ভোটারের মতামতের ফলে গৃহীত হলে উক্ত সদস্যের পদচ্যুতি ঘটে।

গণভোট (Plebiscite) : কোন বিশেষ কার্যনীতি বা সমস্যা সম্বন্ধে যখন নাগরিকগণের মতামত গ্রহণ করা হয়, তখন তাকে গণভোট (Plebiscite) বলা হয়। এ গণভোটের প্রচলন অতীতেও ছিল। তবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণত একনায়কগণ, এই গণভোটের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছেন যুগে যুগে। নেপোলিয়ন জনগণের মত গ্রহণ করেই প্রথমে কন্সাল এবং পরে সম্রাট পদবী লাভ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নও ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে সাম্রাজ্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে গণসম্মতি লাভ করেন। হিটলার ও 'মুসোলিনিও বিভিন্ন সময়ে গণভোটের দ্বারাই নিজেদের ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্প্রতি বিভিন্ন সামরিক শাসনেও এর প্রবর্তন ঘটেছে বহুল পরিমাণে। ফ্রান্সের দ্য গল (De Gaulle) গণভোটের দ্বারাই প্রেসিডেন্ট পদের মর্যাদা বাড়াতে সমর্থ হন।

গণভোট ও গণ-নির্দেশের তফাত এই যে প্রথমটিতে সরকারের বিশেষ কার্যনীতি বা সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সাংবিধানিক আইনের নির্দেশে কোন আইন বা সংবিধানের বিশেষ ধারা সম্বন্ধে জনগণের মত গ্রহণ করা হয়। গণ-উদ্যোগে সংবিধান মোতাবেক নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারগণকে বিশেষ আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তনের জন্য আইন পরিষদের নিকট দরখাস্ত করতে হয়। তবে গণ-উদ্যোগের পরবর্তী পর্যায়ও সাধারণত গণ-নির্দেশে সমাপ্ত হয়।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুণ ও ত্রুটি

এ সকল বিভিন্ন পদ্ধতিতে জনসাধারণের প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপের বিষয়টি সমধিক আলোচিত হয়েছে।

(ক) অনেকের মতে গণ-ভোট, গণ-নির্দেশ, গণ-উদ্যোগ প্রভৃতি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। মাঝে মাঝে দেশের শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে এবং ভেবে-চিন্তে ভোটদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক শিক্ষা জনগণ নিশ্চয়ই লাভ করে।

(খ) গণ-উদ্যোগের ফলে সরকারের বুঝতে সুবিধা হয় কী ধরনের আইনের প্রয়োজন রয়েছে দেশে এবং কী ধরনের আইন অধিকতর কার্যকর হবে।

(গ) এসব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে জনসাধারণ অধিকতর দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। দেশকে আপন করে ভাবতে শিখে। অধিকতর সহযোগিতা প্রদান করে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে। ফলে সকলের মধ্যে দেশপ্রেম বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এসব পদ্ধতির বিরুদ্ধেও অনেক বক্তব্য রয়েছে।

(ক) আইনের প্রস্তাব পেশ করার ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকলে তার ফলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কারণ বিভিন্ন আইনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আধুনিককালে প্রত্যেক আইনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল বিবেচনা করতে হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু জনসাধারণ এ সব জটিল বিষয় সম্বন্ধে সবসময় সচেতন থাকতে পারে না এবং যোগ্যতাও তাদের নেই। ফলে সুফল অপেক্ষা কুফলই এতে বেশি।

(খ) জনৈক লেখকের মতে, এ সবের প্রচলন ও ব্যবহার অনেকটা এরোপ্লেনের আরোহীর দ্বারা পাইলটকে নির্দেশ দানের মতই ফল হয় তেমনি বিপজ্জনক।

(গ) তাছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক দলের পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশের ফলে ব্যক্তিমত দলমতে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তির রাজনৈতিক চেতনা, বুদ্ধি ও শিক্ষার যুক্তিও অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তবে এই সম্বন্ধে কোনরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসরণ না করে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

গণতন্ত্রের গুণাবলী
Merits of Democracy

(১) সাম্য ও স্বাধীনতার গুরুত্ব ঃ গণতন্ত্র ব্যক্তি অপেক্ষা আইনকে বড় মনে করে। সাম্য ও স্বাধীনতা এর দুই রত্নখচিত উপাদান। আইনের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক শাসনের অধীনে মানুষ পূর্ণ মর্যাদা সহকারে নিজ নিজ ধন-মানসহ কালাতিপাত করতে পারে। কেউ ছোট, কেউ বড় নয়—সকলেই সমান। সকলেই সমানভাবে জনকল্যাণে অংশীদার এবং সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হয় গণতন্ত্রে।

(২) মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখে ঃ গণতন্ত্র মানুষের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশি দেয়। এই শাসন ব্যবস্থায় ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, বাদশা-ফকির, দরবেশ-কাফের, নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা ও সমান মহিমায় মহিমান্বিত। শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমভাবে যত্নশীল। লর্ড ব্রাইসের মতে, "ব্যক্তির গৌরববোধ তার ভোটাধিকার দানের ফলে বৃদ্ধি পায় এবং তার সাথে কর্তব্যবোধ সংযুক্ত হয়ে তাকে আরও উন্নত মানে উন্নীত করে"। গণতন্ত্রে কেউ নিজেকে হীন বা অবজ্ঞার পাত্র বলে মনে করতে পারে না। রাজতন্ত্রে বা অভিজাততন্ত্রে সাধারণ মানুষ চিন্তা করে যে, তাদের জন্ম হয়েছে অপরের হুকুম তামিল করার জন্য এবং শাসক গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে শাসন করার জন্য। গণতন্ত্রে তার অবসান হয়। সকলে সমবেত প্রচেষ্টায় একত্রিত হয়ে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য মিলিত হয় এক পংক্তিতে।

(৩) শাসক ও শাসিতের বন্ধন ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে শাসক ও শাসিত পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতেই শাসকদের রম্য অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসিতগণ যখনই অনুভব করবে যে, শাসকগণ, তাদের মতানুসারে কাজ করছে না, সে মুহূর্তে তাঁরা সে সরকারের পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করতে পারে। পরবর্তী নির্বাচনে এক একটি ভোটের মাধ্যমে তারা পছন্দমত সরকারের সৃষ্টি করতে পারে। সরকার পরিবর্তন করতে হলে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। কোন রক্তপাতের দরকার থাকে না। বরং ক্রমবিকাশের দ্বারা অতি সহজে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পছন্দমত সরকারের সৃষ্টি অতি সহজে সম্পন্ন হতে পারে।

(৪) শাসিতদের সর্বাধিক মঙ্গল ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসিতদের মঙ্গল সর্বাধিক সম্পন্ন করা যায়। **(এক)** সরকারি নীতি ও কার্যাবলি শাসিতদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। **(দুই)** সরকার শাসিতদের সমর্থনের জোরে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে কাজে অনুপ্রাণিত হতে পারে। **(তিন)** ব্যক্তি স্বার্থ সংরক্ষিত করে তা ব্যাপকভাবে জনস্বার্থ বৃদ্ধি করতে সমর্থ। **(চার)** রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতায় অংশীদার হয়ে এ শাসন ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা বেশি জনকল্যাণ আনয়ন করতে সমর্থ।

(৫) জনমতের শাসন ঃ গণতন্ত্রকে জনমতের শাসন ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। তাই এর বিশেষ গুণ হলো জনসাধারণকে ধীরে-সুস্থে বুঝিয়ে বিশেষ কর্মপদ্ধতিতে আনয়ন করা সম্ভব এবং নির্বাচনে তাদেরকে বিশেষ নীতি অনুসরণ করানো সম্ভব। এখানে বুলেট ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় করে ব্যালট পত্রের মাধ্যমেই কার্যোদ্ধার সম্ভবপর। গণতন্ত্রে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে কাজ করা হয়,তথাপি এ ব্যবস্থা সংখ্যালঘুদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে না। তারাও সরকারের সমালোচনা করতে পারে। নিজেদের মতামত প্রকাশ করে অন্যকে সপক্ষে আনতে পারে। কালক্রমে সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকারের পরিচালনার ভার লাভ করতে পারে।

(৬) গণতন্ত্রে জনগণ দেশপ্রেমে সমধিক উদ্বুদ্ধ হতে পারে ঃ রাজতন্ত্রে শাসন যেভাবেই চলুক না কেন, দেশের অবস্থা যাই হোক না কেন, জনসাধারণ বিশেষ প্রভাবিত হয় না। কিন্তু গণতন্ত্রে সকলেই উপলব্ধি

করে যে, দেশ তার নিজের। সরকার তাদের দ্বারাই গঠিত। দেশের উন্নতি তাদেরই উন্নতি। তাই দেশের উন্নতির জন্য সকলেই সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফরাসী লেখক লাভলে (Loveleye) বলেছেন, "ফরাসী জাতি বিপ্লবের পর থেকেই ফ্রান্সকে ভালবাসতে শিখেছে, কারণ তখন থেকে তারা শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে তাকে গভীরভাবে ভালবাসতে পেরেছে" ("The Frenceh people never began to love France until after the Revolution when they were admitted to a share in its government since which time they have adored it.")।

(৭) বিপ্লবের আশঙ্কা কম ঃ গণতন্ত্রে বিদ্রোহ বা বিপ্লব সংঘটিত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। এরিস্টটলের আমল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অসাম্যকে বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসেবে বর্ণনা করে আসছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে অসাম্য দূর করে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আবদ্ধ করা হয়। এ জন্যই ইংল্যাণ্ড খুব অল্প বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছে।

(৮) নমনীয় শাসনব্যবস্থা ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত নমনীয়। ফলে বিপদের সামনে তা ভেঙ্গে না গিয়ে বরং একটু বেঁকে যায়। বিপদ কেটে গেলে আবার শাসন ব্যবস্থা পূর্ববৎ থাকতে পারে।

(৯) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্রকে সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলেও অভিহিত করা হয়। কারণ বিভিন্ন মতের সংঘর্ষে সত্য বের হয়ে আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই গণতন্ত্রকে সত্যের প্রতিচ্ছবি বলেও আখ্যায়িত করা যায়।

(১০) গণতন্ত্র এক শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ বলা প্রয়োজন যে, গণতন্ত্র জনগণকে রাজনৈতিক বিষয়সমূহে শিক্ষাদান করে। গণতন্ত্র সুনাগরিকত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এবং তা সমাজ জীবনে নীতিবোধ ও ব্যবহারিকবোধ শিক্ষা দিতে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। নির্বাচনের সময় জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে জ্ঞান লাভ করে এবং চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(১১) অধিকতর দায়িত্বশীল ঃ গণতন্ত্র অধিকতর দায়িত্বশীল এক ব্যবস্থা। নিয়মিত নির্বাচন সম্পন্ন হলে শাসকগণ জনগণের নিকট ফিরে আসে এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অধিকতর আগ্রহী হয়।

(১২) সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ঃ গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হলেও সংখ্যালঘুরা শাসনব্যবস্থার সমালোচনার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। সাথে সাথে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকে।

(১৩) ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ ঃ গণতন্ত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হয়, কেননা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা সীমিত। তাছাড়া, যদি তারা ক্ষমতার অপব্যবহারে উদ্যোগী হয় তা হলেও বিভিন্নভাবে তা রোধ করা সম্ভব হয়।

সুতরাং সমাজ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য যদি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মনুষ্যত্ব বিকাশ হয়, তবে গণতন্ত্র সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। গণতন্ত্র মানুষকে মহত্তর জীবনের স্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত করে। সমাজ-জীবনে সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করে সাধুজীবনের শুভ সূচনা করে। সকলকে রাষ্ট্রীয় সংস্থার মহামিলনে একত্রিত করে প্রশাসনের মান উন্নীত করে।

গণতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ
Demerits of Democracy

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। চিন্তানায়ক প্লেটোর সময় থেকে হেনরী মেইন ও লেকি পর্যন্ত অনেকেই গণতন্ত্রের বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

বলা হয় যে, গণতন্ত্রের আদর্শ কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে না। এ যেন মেঘের রাজ্যে সুদৃশ্য সূর্য রশ্মির রঙিন আভা। মর্তলোকের নিকট রামধনু রং নিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু বাস্তবে তার রূপায়ণ দুঃখের, কষ্টের এবং নিরানন্দময়। এর সফলতা নির্ভর করে জনগণের উন্নতমানের শিক্ষা-দীক্ষায়, আত্মসংযমে, স্বশাসনের জন্য চেষ্টায়, আত্মদানের আগ্রহ ও স্পৃহায়। কিন্তু জনসংখ্যার অধিকাংশই এ সকল গুণে বিভূষিত নয়। তাই ঐতিহাসিক লেকি বলেন, 'গণতন্ত্র দারিদ্য প্রপীড়িত, অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন ব্যবস্থা, কারণ তারাই রাষ্ট্রে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক' ("by the poorest, the most ignorent, the most incapable who are necessarily the most numerous")।

(১) মুর্খের শাসন ব্যবস্থা ঃ লেকির মতে, 'প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কিছু সংখ্যক লোকেরই অধিকারভুক্ত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সফলতা অর্জন করতে হলে তাঁদের হাতেই শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা উচিত' ("superiority lies with the few and not with the many and success can be attained by placing the guiding and controlling power mainly in their hands")। তাই তিনি বলেছেন, "গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠতম প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দান করে না এবং অধিকতর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে না। বাস্তবিকপক্ষে গণতন্ত্রের কয়েকটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিকই স্বাধীনতা বিরোধী" ("Democracy ensures neither better government nor greater liberty. Indeed some of the strongest democratic tendencies are adverse to liberty")।

(২) গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার মান অবনত করে ঃ বলা হয় যে, গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার মান সাংঘাতিকভাবে অবনত করে দেয়। সংখ্যার উপর জোর দিয়ে তা গুণের কদর করে না। মাথা গণনার দ্বারা এখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ন্যায় ও প্রজ্ঞার মানদণ্ড এখানে অচল। মুড়ি-মিছরি এক দরে গ্রহণ করা হয়।

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'রিপাবলিক'-এ (Republic) চিন্তাগুরু প্লেটো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ পেশ করেছেন।

(১) তিনি বলেছেন, বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ এবং অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে তা প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন।

(২) গণতন্ত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা এত বৃদ্ধি পায় যে অবশেষে কোন এক স্বেচ্ছাচারী নায়ক সকল ক্ষমতা হস্তগত করে নিতে পারে। প্লেটো দুঃখ করে বলেছেন, স্বাধীনতার মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে জনগণ ক্রমাগত আরও স্বাধীনতা চায় এবং তা না পেলে জনগণ শাসকদিগকে কুলীনতন্ত্রের বাহক বলে গালাগাল করে। টেলিরাাণ্ড (Talleyrand) গণতন্ত্রকে "শয়তানের শাসন ব্যবস্থা" বলে অভিহিত করেন ("government of the black guards")।

(৪) অক্ষমতার শাসনপ্রণালী ঃ আধুনিক লেখকদের মধ্যে এমিল ফাগুয়ে (Emile Faguet) বলেন, "গণতন্ত্র অক্ষমতার শাসন প্রণালী" ("The cult of incompetence")। বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নির্বাচনের হট্টগোলের মধ্যে যেতে নারাজ এবং দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে ভোট ভিক্ষা করতে অসমর্থ। ফলে শাসন ব্যবস্থায় তাদের কোন স্থান থাকে না। রাজনীতির মোহে ও মত্ততায় শুধুমাত্র মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী ঝাঁপ দিয়ে থাকে এবং সরকার তাদেরই সংস্থা। যারা অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে ভোলাতে পারে, আবেগ ও উদ্দীপনার সুরে লোকের মন ভোলাতে পারে, তারাই নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সমর্থ হয়। ফলে শাসনভার অজ্ঞ ও স্বার্থপরদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু শাসনকার্য এমন সহজ কোন কাজ নয়, যা কয়েক দিনের মধ্যে যে কেউ রপ্ত করতে পারে। গণতন্ত্র বিশেষভাবে সূক্ষ্মতম ব্যবস্থা এবং তা পরিচালিত করতে হলে নিপুণ হাতের প্রয়োজন।

(৫) ক্ষণভঙ্গুর ও অস্থায়ী ব্যবস্থা ঃ হেনরী মেইন ও ঐতিহাসিক লেকি (Lecky) গণতন্ত্রকে ক্ষণভঙ্গুর ও অস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা বলে নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে, ভোটারগণ খেয়ালের বশে চলে। কখন এদলকে কখনও ওদলকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব এখানে অবাস্তব। গণতন্ত্রের জন্যই সরকারের পতন ঘটে, রাজনৈতিক সাময়িক বৃষ্টি ধারায় অথবা দমকা হাওয়ায়। ফ্রান্সে কিছুদিন পূর্বে এরূপ বলা হত যে, সেখানে সরকার বদল হয় ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে। কাউকে প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তর দিত, "বিকালের খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত সঠিক বলতে পারছি না"। সুতরাং লেকির কথার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

(৬) উন্নত শিল্পকর্ম অবহেলিত হয় ঃ স্যার হেনরী মেইনের মতে, গণতন্ত্র সাহিত্য, বিজ্ঞান, সুকুমার কলার আদর করে না। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত এই শাসন ব্যবস্থা চারুকলা ও শিল্প চাতুর্যের কিছুই বোঝে না। ফলে তাদের শাসনামলে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ থাকে না।

(৭) গণতন্ত্র এক অপচয়ী ব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্রে অপচয় ঘটে অস্বাভাবিক রূপে এবং শাসকবৃন্দ অর্থ ব্যয় সম্পর্কে মোটেই যত্নবান নয়। মন্ত্রী ও কর্মচারিগণ গৌরীসেনের টাকশাল থেকে যথেচ্ছভাবে খরচ করতে পারে, কারণ মিতব্যয়ী হবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না যতদিন গৌরীসেনের কোষাগার খোলা থাকে। তাছাড়া, গণতন্ত্রে অহেতুক দলাদলিতে অনেক শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটে। একদল হিংস্র নেকড়ের মত অন্য দলের পেছনে লেগে থাকে এবং প্রতিপক্ষকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তাছাড়া, ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত থাকে। সাধু বা অসাধু যে কোন উপায়েই ক্ষমতার লোভে রাজনীতির পাশা খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে।

(৮) মন্থর গতি এক ব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্রকে অত্যন্ত মন্তরগতি ও ধীর শাসন ব্যবস্থা বলে নিন্দা করা হয়। কাজের পরিবর্তে এখানে অহেতুক আলোচনা, তর্ক–বিতর্ক ও সমালোচনাই সংঘটিত হয়। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আইন পরিষদ বা শাসন বিভাগের বহু জনের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন হয় বলে বিপদের মুহূর্তে গণতন্ত্র তৎপর হয়ে উঠতে পারে না বলে অভিযোগ করা হয়। তাই অনেকে বলেন, 'গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্র থেকে অন্তত দুই বছর পেছনে থাকে" ("two years behind dictatorship")।

(৯) দুর্নীতি পরায়ণ এক ব্যবস্থা ঃ এও বলা হয় যে, গণতন্ত্র দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় অত্যধিক পরিমাণে। এতে ধনীদের প্রভাবও খুব বেশি। নির্বাচনের সময় ধনীরা চাঁদা দিয়ে দলের নেতাগণকে হাত করে এবং শাসনযন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে কার্য করার জন্য দরিদ্রদিগকে ব্যবহার করে। আইন সভার আশেপাশে ধনী, শিল্পপতি ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ঘোরাফেরা করে এবং তাদের স্বার্থের বিরোধী কোন আইন যেন প্রণীত না হয় তার জন্য ঘুষও দেয়। প্রয়োজন বশে তারা রাষ্ট্রের বড় বড় কর্তাদের ছেলেমেয়ে, ভাইপো, জামাই প্রমুখকে চাকরি দিয়ে হাত করার প্রয়াসও পায়। জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সংবাদপত্রকে পর্যন্ত আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। তাছাড়া, ক্ষমতায় একবার অধিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন জনকে চাকরি দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করা হয়। গণতন্ত্রে এও লক্ষণীয় যে, সরকারের তোষামোদকারিগণ নির্বাচনী বৈতরণীতে সরকারের পক্ষের তরী স্বচ্ছন্দে তীরে ভিড়িয়ে সরকারি দল থেকে সর্বপ্রকার সুযোগ–সুবিধা আদায় করার জন্য জোটবন্দী হতে থাকে। ফলে ঠিকাদারী কাজ, লাইসেন্স ও পারমিট বিতরণ প্রভৃতির সাহায্যে তহবিল বণ্টনের ব্যবস্থার সুযোগ এক শ্রেণীর ভাগে পড়ে। স্বার্থের খাতিরে এ লোকগুলো ভোটারদিগকে ভয় দেখিয়ে অথবা তোষামোদ করে ভোট আদায় করে। ফলে এক প্রকার স্থায়ী স্বার্থবাদী দলের সৃষ্টি হয়।

(১০) পেশাদারী রাজনীতিকদের ব্যবস্থা : এ অভিযোগও করা হয় যে, গণতন্ত্রে জনসেবার নাম করে এক শ্রেণীর পেশাদার রাজনীতিকের উদ্ভব হয়। আসল কাজের বেলায় তাদের শুধুমাত্র শুভঙ্করের ফাঁকি, অথচ লোকে তাদের মান্য করুক বা নাই করুক তারা সর্বক্ষেত্রে মোড়লি করবেই। কী করে স্বার্থ সিদ্ধি করতে হয়, কীভাবে জনগণকে ভুলিয়ে নিজের দলে টানা যায়, কীভাবে দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ান যায় এ বিষয়ে তারা ধুরন্ধর। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের প্রভাব যেভাবে বাড়ছে তাতে পেশাদার রাজনীতিকগণের প্রভাবও বাড়ছে।

(১১) দুর্নীতির প্রশ্রয় দান করে : গণতন্ত্রে ভোটদানকারী, আইন প্রণেতা, মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তা দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হতে পারে, কেননা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে পারে।

(১২) দল প্রথার কুফল : গণতন্ত্রে দল প্রথার কুফল ভয়ঙ্করভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে শাসন ব্যবস্থায়। আন্তঃব্যক্তি এবং আন্তঃদলীয় তিক্ততা, সংঘর্ষ এবং রেষারেষি, অর্থ এবং শক্তির প্রয়োগ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস করে।

(১৩) দীর্ঘ সূত্রিতা : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি মারাত্মক ত্রুটি দীর্ঘসূত্রিতা। আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব এ ব্যবস্থায় প্রকট হয়ে উঠতে পারে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ করা হয়েছে, তার অধিকাংশই সত্য। তবে এ সকল অভিযোগ যে কোন সরকারের বিরুদ্ধেই পেশ করা যায়। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করেই সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। শাসন ব্যবস্থাও এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং মানুষ আদর্শ চরিত্র যতদিন গড়ে তুলতে না পারবে, ততদিন তাদের শাসন ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ থাকতে বাধ্য।

গণতন্ত্রের মূল্যায়ন
Evaluation of Democracy

গণতন্ত্রের যথার্থ মূল্যায়ন সত্যই অত্যন্ত কঠিন। গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য প্রলয়ঙ্করী প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার কমিউনিজম দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসে। তৃতীয় দশকে জার্মানি ও ইতালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে হিটলার ও মুসোলিনী বিশ্বময় পরিচিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। মিত্রশক্তির জয়লাভে গণতান্ত্রিক শিবির সত্যই জয়যুক্ত হয়, কিন্তু যুদ্ধের কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে।মহাচীনে সমাজতন্ত্রবাদ মহা পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠে। রাশিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নতুন জীবনবোধ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্নরূপে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইজিপ্ট থেকে আরম্ভ করে সুদান, ইরাক, পাকিস্তান এবং পূর্বদিকে বার্মা ও অন্যান্য রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি গণতন্ত্রের সুতিকাগৃহ ফ্রান্সে দ্য গলের হাতে গণতন্ত্রের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে আসে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশেও মনে হয় গণতন্ত্রের টিমটিমে দীপশিখা যে কোন মুহূর্তে নির্বাসিত হতে পারে। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র (controlled democracy), পরিচালিত গণতন্ত্র (guided democracy) ও বুনিয়াদী গণতন্ত্র (basic democracy) প্রভৃতি ভাবধারাও সাথে সাথে চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলতে শুরু করে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র দানা বাঁধতে সমর্থ হয় নি। অপরদিকে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রেও গণতন্ত্রকে অভ্রান্ত শাসন ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা হয় নি।

বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিতে সেখানেও গণতন্ত্র যেন অনেকটা সহায়হীন। সুতরাং ব্যবস্থা পরিক্রমায় গণতন্ত্র বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েছিল। জনগণের আস্থা হারিয়েছিল। সে আস্থা এখনও পূর্ণরূপে তারা ফিরে পায় নি। সুতরাং নিশ্চয় করে বলা শক্ত ইতিহাস কোন্‌ভাবে এর মূল্যায়ন

করবে এবং মহাকাল কিভাবে এর বিচারে বসবে। তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে এ শাসন ব্যবস্থা যেরূপ সমর্থ হয়, অন্য কোন ব্যবস্থা তা পারে না।

প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন সত্যই বলেছেন, " কোন মানুষকে তার সম্মতি ব্যতীত শাসন করার অধিকার কারো নেই" ("No man has a right to govern without other man's consent")। মানুষ আর যাই হোক, ভেড়ার পাল বা এক ঝাঁক পায়রা নয় যে, তাদের উপর কর্তৃত্ব করবে অন্য কোন মহামানবের দল। নৈতিক অনুশাসন মোতাবেক তাকে শাসন করতে হলে তার সম্মতি অপরিহার্য। এ দিক দিয়ে গণতন্ত্রের তুলনা হয় না। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্র যাই হোক না কেন, গণমানবের পূর্ণ মর্যাদা দিতে কোন ব্যবস্থাই সমর্থ হয় নি। এই হলো ইতিহাসের শিক্ষা। সুতরাং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ থাকলেও তার সাথে অতীতের কোন ব্যবস্থারই তুলনা হতে পারে না। গণতন্ত্র সর্বোত্তম ব্যবস্থা নাও হতে পারে, কিন্তু অতীতে যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা এর তুলনায় ছিল জঘন্য। গণতন্ত্র অপেক্ষা কোন ব্যবস্থা যদি উন্নততর, অধিকতর উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠতর থাকে তবে তা আজও প্রবর্তিত হয় নি।

গণতন্ত্রে যে সকল ত্রুটি রয়েছে সে সকল ত্রুটি প্রায় প্রত্যেক সরকারের বিরুদ্ধে পেশ করা যেতে পারে। অবশ্যই এর কতকগুলো বিশিষ্ট ত্রুটি রয়েছে, যেগুলো সংশোধিত হতে পারে অতি সহজে, যদি পরিবেশ উন্নত ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। লর্ড ব্রাইস বলেছেন, 'গণতন্ত্র ভুল-ত্রুটির কিছু নতুন খাতের সৃষ্টি করেছে সত্য, কিন্তু এও সত্য যে, সাথে সাথে পুরাতন খাতে প্রবাহিত ভুল-ত্রুটির পথ রোধও করেছে এবং মোটের উপর এ ধারার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নি" ("If democracy has opened new channels in which the familiar propensities of evils can flow, it has also stopped some of the old channels and has not increased the volume of the stream")।

স্যার হেনরী মেইনের নিন্দাবাদের উত্তরে অধ্যাপক গার্নার বলেছেন, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রে সমভাবে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও শিল্প গড়ে উঠেছে। এ সকল ললিতকলা ও চারুশিল্প যে নিয়ম-ধারায় গড়ে ওঠে তার সাথে সরকারের প্রকারভেদের তেমন বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই।

গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় আশীর্বাদ হলো এই যে, এখানে ক্ষমতার বৃথা দম্ভ নেই। ক্ষমতার ধ্বংসাত্মক এবং দুর্নীতিমূলক একটি দিক রয়েছে। অবাধ ও সীমাহীন ক্ষমতা তাই বিষ অপেক্ষাও বিষাক্ত। গণতন্ত্র এ অভিশাপ থেকে মুক্ত। কিন্তু গণতন্ত্রের গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে, আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে, আত্মবলিদানের অনুপ্রেরণায়, মানবিক মর্যাদা লাভ করে সর্বজনীন কল্যাণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হয়ে গৌরববোধের মধ্যে এবং সর্বোপরি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বর্ণালী বন্ধনের মায়ায়।

গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ ও সফলতার উপাদানসমূহ
Safeguards of Democracy and Conditions for its Success

বর্তমানকালে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট হলেও একে যথার্থরূপে বাস্তবায়িত করা সর্বাপেক্ষা জটিল। হেনরী মেইন তাই বলেছেন। তাঁর মতে, 'গণতন্ত্র সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন" ("Of all the forms of government, democracy is by far the most difficult")। সুতরাং এর বাস্তবায়ন এবং একে যথার্থরূপে উপযোগী করে তুলতে কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। তারই সঠিক আলোচনা হওয়া উচিত। নিচে শর্তগুলো আলোচিত হলো ঃ

(১) শিক্ষার প্রসার ঃ গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপকতা। শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দিতে হলে প্রত্যেকেরই লেখাপড়া জানা উচিত। তা না হলে শাসন সম্পর্কীয়

ব্যাপারসমূহ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই বলা হয়, জনসাধারণ শিক্ষিত ও সচেতন হলে গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সরকারে পরিণত হয়। কিন্তু জনসাধারণ যদি অশিক্ষিত ও দায়িত্বহীন হয়, তাহলে গণতন্ত্র এক প্রকার বুনো শাসন ব্যবস্থা বা জংলী শাসনে পরিণত হয়। শিক্ষার অভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ঘুণ ধরে। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে, "অশিক্ষিত ও সচেতনতাবিহীন জনগণের নিকট গণতন্ত্র বিভিন্নভাবে হীন কর্ম সম্পাদনের ও জঘন্য স্বেচ্ছাচার অনুষ্ঠানের বিরাট আবরণ স্বরূপ এবং অগ্নিবর্ষী বক্তাগণ জনগণের নির্বুদ্ধিতায় আবেদন জানিয়ে তাদের আবেগ উৎসারিত করে" ("among an uneducated, uncritical people the form of democracy is merely a cloak for more vulgar and unscrupulous tyranny, that of the demagogue who panders to the passions and trades on the stupidities of the multitude.")।

(২) আর্থিক ও সামাজিক সাম্য ঃ আর্থিক ও সামাজিক সমতা বিধান করতে না পারলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র হলে কতিপয় ধনীরাই নানাভাবে সরকারের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়। দরিদ্রগণ পেটের চিন্তায় অস্থির হলে সর্বজনীন মঙ্গল কার্যে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ক্ষুধার্তের নিকট অর্থহীন। দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা রুটি মাখনের পরিবর্তে যে কেউ বিসর্জন দিতে পারে।

শুধু তাই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্য গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে নাড়া দেয়। গণতন্ত্রের ওজস্বিনী ঘোষণা চতুর্দিক মুখরিত করলেও যেখানে সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষকে গৌরবময় মনুষ্যত্বের আসন দেয়া হয় না, সেখানে গণতন্ত্র নিরর্থক হতে বাধ্য। গণতন্ত্র শুধু ঐ সকল দেশেই সফল হতে পারে, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবল নয় এবং সামাজিক মিলন ও সংহতি বর্তমান। তাই দেখা যায় সুইটজারল্যাণ্ডে ও স্কাণ্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রসমূহে গণতন্ত্র এত সফল। আলডুস হাক্সলি (Aldous Huxley) বলেছেন, "নিশ্চয়তাবিহীন অর্থনৈতিক অবস্থায় গণতান্ত্রিক উপায়ে কোন জাতিরই স্বশাসনের সম্ভাবনা অধিক নয়" ("no people in a precarious economic condition has a fair chance of being able to govern itself democratically")। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে গণতন্ত্র কতিপয় সম্পদশালীর অস্ত্রে পরিগণিত হয়।

(৩) গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ঃ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এ পথের এক উপাদেয় পাথেয়। অতীতের ভিত্তিতে বর্তমান রচিত হয় এবং ভবিষ্যৎ তাই অনুসরণ করে। যে কোন জনপদেই হোক না কেন, জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে অপরের মধ্যেও আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের শ্যামল ও সজীব বৃক্ষকে পত্র–পল্লবে, শাখা–প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে ফুলে–ফলে সুশোভিত হবার জন্য উর্বর জমি সৃষ্টি করতে হবে। সর্বপ্রকার বিভেদ ও বিভিন্নতাকে গণতন্ত্রের মহামিলনের সঙ্গীতে দূর করতে হবে এবং যুক্তিবাদ ও নৈতিকতার সার্থক প্রয়োগের জন্য জনমনকে তৈরী করতে হবে।

(৪) সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ঃ সুষ্ঠুভাবে গঠিত রাজনৈতিক দল ও সাধু নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতার জন্য অপরিহার্য। গণতন্ত্র আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারাই পরিচালিত হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একনায়কতন্ত্রে রূপ লাভ করতে পারে, যদি অন্য কোন দল সংগঠিত না হয়। কিন্তু দুই বা তিনটি দল হলে দলীয় কোন্দলের নোংরা স্রোতে যেন রাজনৈতিক জীবন ভেসে না যায়। জনগণকে দলীয় রাজনীতির মর্মকথা বুঝতে হবে। দলীয় প্রচারণার মধ্য থেকে সত্যকে স্পষ্টরূপে বুঝতে হবে। দলে ভেসে না গিয়ে সত্যের আলোকে অপরকে পথ দেখাতে হবে। রাজনীতিকে এক প্রকার সুষম ক্রীড়ার ন্যায় মনে করতে হবে এবং খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়েই রাজনীতি ক্ষেত্রে নামতে হবে। দলের সঠিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। দলকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। দেখতে হবে যেন দলীয় নীতি বা পথ সিন্দবাদের বৃদ্ধের ন্যায় স্কন্ধে চড়ে না বসে।

(৫) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়। সে জন্য জনগণ পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সুন্দর ক্ষেত্র রচিত হওয়া উচিত। লোকে যাতে বিভিন্ন ধরনের সংঘ গঠন করতে পারে ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে, তারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। যে মত অধিক সংখ্যক লোক গ্রহণ করবে, তাই কার্যকর করতে হবে। যাদের মত গৃহীত হলো না, তাদেরও কর্তব্য হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মেনে চলা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরও কর্তব্য সংখ্যালঘুদের বক্তিস্বাতন্ত্র্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা। ফলে সহিষ্ণুতার প্রয়োজন গণতন্ত্রে অত্যন্ত বেশি। জনসাধারণকে সহিষ্ণু হয়ে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কথা শুনতে হবে। তা না হলে তারা শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। তাই পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক শ্রেষ্ঠ অবদান ও উপাদান। "দেয়া-নেয়ার" নীতি (give and take) এবং শর্তহীনভাবে অপরের সাথে একমত হবার মনোভাব গণতন্ত্রের সফলতার চাবিকাঠি।

(৬) আইনের শাসন ঃ আইনের শাসন ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সর্বত্র প্রয়োগবিধি গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একটি মহামূল্যবান উপাদান। প্রত্যেকটি লোক যেন মনে করতে পারে যে, সে আইনের ছত্রচ্ছায়ায় একান্ত নিরাপদে বাস করছে। কারও খেয়াল ও মর্জির খেসারত কাউকে দিতে হচ্ছে না। তাই স্থায়ী কর্মচারীদের সততার প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ এ সকল সরকারি কর্মচারীর উপরই দৈনন্দিন কাজ চালানোর ভার থাকে। তারা যদি অসৎ ও অকর্মণ্য হয় অথবা যদি তারা রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করে অথবা মন্ত্রী বা সরকারি মহলের খয়ের খাঁ হয়, তা হলে জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং সরকারের প্রতি হয় তারা উদাসীন হয়ে পড়বে, না হয় শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। এর কোনটিই গণতন্ত্রের সফলতার জন্য উপযোগী নয়।

(৭) সাধু ও সুনিপুণ নেতৃত্ব ঃ সাধু ও সুনিপুণ নেতৃত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। যে রাষ্ট্রে ঘন ঘন নেতৃত্বের পতন ঘটে ও বারে বারে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়, সে সকল রাষ্ট্রে কোন সরকারি নীতির স্থায়িত্ব থাকে না। জনগণও অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই বহুদর্শী নেতার নেতৃত্ব এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আদর্শবাদ জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ করে তুলে, উন্নতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে দেয় এবং জনসমূহকে আত্মবিশ্বাসে গরীয়ান করে। কিন্তু অসৎ নেতৃত্ব গণতন্ত্রের পতনের পথ প্রশস্ত করে, জাতীয় আদর্শে কালিমা লেপন করে এবং রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত করে।

(৮) সহিষ্ণুতা এবং আপোষধর্মী মনোভাব ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে সকলের সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেয়া হয়। তাই সংখ্যালঘুদের উচিত সংখ্যাগুরুর মতকে শ্রদ্ধাভরে মেনে চলা। অন্যদিকে সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব হলো এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা সংখ্যালঘুর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। অন্য কথায়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহযোগিতাই গণতন্ত্রের সাফল্য নিশ্চিত করে। এজন্য প্রয়োজন সহিষ্ণুতা এবং আপোষধর্মী মনোভাবের।

(৯) যোগ্য নেতৃত্ব ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। দূরদর্শী, সৎ, সাহসী এবং নিষ্ঠাবান নেতৃত্বই গণতন্ত্রের তরীকে কূলে ভিড়াতে সক্ষম। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাজনৈতিক সমুদ্রে গণতন্ত্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

(১০) দক্ষ প্রশাসন ঃ গণতন্ত্রে দক্ষ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, সৎ এবং নিরপেক্ষ, নির্ভীক এবং কল্যাণকামী প্রশাসন অপরিহার্য।রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে দক্ষ প্রশাসন রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে ধ্রুবতারার মত।

(১১) জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য ঃ জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য কোন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হলে বিভিন্ন দল এবং গোষ্ঠীর অবাধ প্রতিযোগিতায় জাতীয় কল্যাণ ব্যাহত হতে পারে এবং ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষতবিক্ষত হতে বাধ্য।

(১২) ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ঃ তাছাড়া, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সামাজিক সমস্যা এবং তাদের সমাধানের জন্য ঐকমত্য। প্রয়োজন হয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি (democratic caltave)। পারস্পকি শ্রদ্ধাবোধ, সমঝোতা ও আপোষকামিতা এই সংস্কৃতির মৌল বিষয়।

মিল (Mill) গণতন্ত্রের সফলতার কয়েকটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।তাঁর মতে,

প্রথম, জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিকে কার্যে পরিণত করার জন্য আগ্রহী হতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

দ্বিতীয়, জনগণকে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং স্ব স্ব অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে হবে। অধিকারের ক্ষেত্রে অথবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এতটুকুর জন্যও তাদের জীবন পণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে।

তৃতীয়, জনসমূহের সামাজিক কর্তব্য অতি নিখুঁতভাবে সততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

চতুর্থ, তাদের পরমত সহিষ্ণু হতে হবে এবং সহিষ্ণুতার মূলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

সর্বশেষে, অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, যেন ব্যক্তিস্বার্থ বা দলীয় এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। সব রকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে তুলে ধরতে হবে।

একনায়কতন্ত্র
Dictatorship

আধুনিককালে গণতন্ত্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী একনায়কতন্ত্র। কারণ অভিজাততন্ত্র বা রাজতন্ত্র শীতের হিমেল বাতাসে জীর্ণ পাতার ন্যায় ইতিমধ্যেই ঝরে পড়েছে। সীমিত রাজতন্ত্রের রাজা চিরতন বা হরতনের রাজার ন্যায়। আভিজাত্য বা কৌলিণ্য আজকাল আদিকালের ব্রাহ্মণের ন্যায় নিলয়প্রাপ্ত। কিন্তু অন্যদিগন্ত থেকে একনায়কতন্ত্র আগত হয়েছে। পেছন দ্বার থেকে লম্বা চওড়া গাট্টা গোট্টা চেহারার বীর পুরুষ যেন প্রবেশ করে মঞ্চ জাঁকিয়ে বসেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের জার্মানী, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি কয়েকটি দেশে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকায় গণতন্ত্র পরাজয় বরণ করেছিল এবং অনেক দেশে একনায়কতন্ত্রের জন্মলাভ ঘটেছিল। এই একনায়কতন্ত্র শুধুমাত্র ব্যক্তিগত, দলগত বা শ্রেণীগত নয়, বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে এর প্রকাশ ঘটেছে। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র (controlled democracy), পরিচালিত গণতন্ত্র (guided democracy) ও নব্য গণতন্ত্র (neo-democracy) প্রভৃতি ছদ্মাবরণে চিন্তাধারা ও আদর্শকে বিকৃত করেছে এবং একনায়কতন্ত্রের ফুলশয্যা রচনা করেছে। সুতরাং তার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
Characteristics

মুসোলিনীর কথায়, একনায়কতন্ত্রে "সবকিছুই রাষ্ট্রের জন্য, কোন কিছুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় এবং কোন কিছুই রাষ্ট্রের বাইরে নয়" ('everything for the state, nothing against the state, nothing

outside the state")। অধ্যাপক ফাইনার (Finer) তাঁর Theory and Practice of Modern Government গ্রন্থে একনায়কতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

(ক) প্রচারণার ব্যাপক প্রয়োগ (extensive use of propaganda)।

(খ) একদলীয় ব্যবস্থা (one-party system)।

(গ) নামমাত্র ও নিয়ন্ত্রিত আইনসভা (controlled legislature)।

(ঘ) ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ (extreme centralization of power)।

একনায়কতন্ত্র একজনেরই যে শাসন, তা নাও হতে পারে। দলপতির পেছনে মৌমাছি বা ভীমরুলের মত সংঘবদ্ধ সমর্থক থাকে এবং কখনও কখনও অত্যন্ত সংহত ও সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলও বর্তমান থাকে। দলের আদর্শ অত্যন্ত সীমিতও হতে পারে অথবা জনকল্যাণের কার্যাবলির সমষ্টি হতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রের সমর্থক ব্যক্তি বা দল অত্যন্ত শক্ত শৃংখলার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। ইতালিতে ফ্যাসিষ্ট দল যেমন—'বিশ্বাস কর, মান্য কর এবং যুদ্ধ কর' ('To believe, to obey, to fight') নীতিতে অটল ছিল, জার্মানীতে নাৎসী দলেও তেমনি লৌহ কঠিন শৃংখলা বর্তমান ছিল। নাৎসী দলের মূল কথা ছিল—"দায়িত্ব সচেতন নেতৃত্বের আদেশ মাথার উপর, পূর্ণ আস্থা এবং শৃংখলা পায়ের তলায়" ("authority from above as the result of leadership, conscious of its rsponsibility, confidence and discipline from below')।

সুতরাং প্রায় প্রত্যেক একনায়কতন্ত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান।

(১) "এক জাতি, এক দল ও এক নেতা" ঃ একনায়কতন্ত্র 'এক জাতি, এক দল ও এক নেতা'- এ নীতিতে বিশ্বাসী। সমস্ত ক্ষমতা নেতার হাতে। জনগণের নিকট তিনি দায়ী নন। এ শাসন প্রণালীতে জনগণের কোন অধিকার স্বীকৃত হয় না। জনগণ একনায়কের নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য।

(২) সর্বাত্মক শাসন ঃ একনায়কতন্ত্রকে সর্বাত্মক (totalitarian) শাসন বলা হয়। সবকিছুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা বাইরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই হলো একনায়কতন্ত্রের মূলকথা। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, এমন কি সংস্কৃতি ও নৈতিকতা পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শিশুদের বর্ণমালা থেকে সর্বশেষ খবরের কাগজ পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত।

(৩) রাষ্ট্রের প্রাধান্য ঃ একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রাষ্ট্রই উদ্দেশ্য, ব্যক্তি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র—এ নীতি একনায়কতন্ত্রে গৃহীত। রাষ্ট্রের বাইরে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার নেই। এতে জনসমূহের সার্বভৌমিকতার পরিবর্তে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার প্রতি জোর দেয়া হয়। ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদও সৃষ্টি হতে পারে। সামগ্রিকভাবে জাতীয় ঐক্যের উপর তা অত্যন্ত জোর দিয়ে থাকে।

(৪) একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ঃ একনায়কতন্ত্র একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। সরকারি দল ছাড়া অন্য কোন দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এবং বিরোধীদলকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। মতবিরোধ সহ্য করা হয় না। বাক-স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করে তা সামাজিক ব্যবস্থা থেকে ঝেড়ে ফেলা হয়। এ ব্যবস্থা দলীয় ডিক্টেটরশিপ। দলের সংগঠন জনমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং দলপতির নির্দেশে। নেতাই দলের নীতি নির্ধারণ করেন এবং জনগণ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে।

(৫) শক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা ঃ একনায়কতন্ত্র শান্তি চায় না। আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করে না। যুদ্ধকে গৌরবান্বিত মনে করে। একনায়কতন্ত্র শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তির ব্যবহার সতত করতে চায়। মুসোলিনীর মতে, "দীর্ঘকালীন শান্তি সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়।" জাতিকে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

থাকতে হয় এই ব্যবস্থায়। এখানে সৈনিকের জীবনই আদর্শ জীবন। যুদ্ধই আদর্শ পেশা। নেতার প্রতি পূর্ণ আস্থাই চরম নৈতিকতা। 'নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য।'

(৬) দায়িত্বহীনতা ঃ একনায়কতন্ত্রে দায়িত্বশীলতার কোন স্থান নেই। সরকার জনগণের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য দাবি করে, কিন্তু তাদের নিকট কোনভাবে দায়ী থাকে না। সরকার গঠনে অথবা সরকার অপসারণে জনগণ কোন সাংবিধানিক পন্থা খুঁজে পায় না।

(৭) ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঃ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ একনায়কতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। নির্বাহী বিভাগ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং দলীয় নেতৃবর্গ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ক্ষমতা প্রয়োগ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কোন বাধা-নিষেধ থাকে না।

একনায়কতন্ত্রের গুণাবলী ঃ একনায়কতন্ত্র কতকগুলো বিশেষ গুণে ভূষিত তা সত্য। এ ব্যবস্থা সরকারি কার্যে সুষ্ঠুতা আনয়ন করে। দ্রুতভাবে ও নিপুণতার সাথে কাজ করতে পারে। পূর্ণরূপে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। একনায়কতন্ত্র নেতৃত্বে বিশ্বাসী এবং যোগ্য নেতৃত্ব তা লাভ করে। একনায়ক স্বীয় মতানুসারে উত্তম কর্মচারী নিয়োগ ও ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অত্যন্ত কর্মক্ষম ও তৎপর করে তুলতে পারে।

এর ত্রুটি ঃ কিন্তু এর ত্রুটি গুরুতর ও ভয়ঙ্কররূপে প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে জাতীয় জীবনে নরকের ঘৃণিত ও জঘন্য পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। সাময়িকভাবে উন্নতি সাধিত হলেও তা কারবালা বা কুরুক্ষেত্রের শান্তি আনয়ন করে। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনায় এ দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র
Democracy and Dictatorship

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সংগঠন, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও শাসনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তাদের তফাৎকে আকাশ-পাতাল বললেই বুঝি ঠিক হয়।

প্রথম, গণতন্ত্র ব্যক্তির কল্যাণার্থে, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার্থে ও সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার্থে পরিচালিত। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি রাষ্ট্রের স্বার্থে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত। গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তিকল্যাণের মাধ্যম, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রই উদ্দেশ্য ব্যক্তি উপায় বা নিমিত্ত মাত্র।

দ্বিতীয়, গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। নাগরিকগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য গণতন্ত্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এ সকল নীতি অগ্রাহ্য হয় এবং তা নেতৃত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। গণতন্ত্র আইন ও নীতি ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, কিন্তু একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি বা নেতা ভিত্তিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতার প্রাচুর্যই সফলতার চাবিকাঠি। আইন ইচ্ছামত পরিবর্তিত করা সম্ভব।

তৃতীয়, গণতন্ত্র রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজকে পৃথকভাবে দেখে এবং সরকারের কাজের মাধ্যমে সামাজিক জীবনকে সুন্দর, সাধু ও শান্তিপূর্ণ করে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং রাষ্ট্রীয় কর্মের মাধ্যমে নেতা সমাজ জীবনের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

চতুর্থ, গণতন্ত্রে জনগণের শাসন এবং জনমতের প্রভাব অত্যধিক। কিন্তু একনায়কতন্ত্র একজনের বা খুব জোর একদলের শাসন। গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট থেকে সচেতনতা দাবি করে এবং অধিকার রক্ষায় ব্যগ্র, কিন্তু একনায়কতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট থেকে দাবি করে শৃঙ্খলা ও আনুগত্য এবং রাষ্ট্রীয় গৌরব আনয়নে উৎসাহী।

পঞ্চম, গণতন্ত্র শান্তির সময়ে উন্নতি লাভ করে এবং শান্তির মন্ত্রই প্রচার করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র চায় যুদ্ধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা যুদ্ধসাজেই থাকে। গণতন্ত্রে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না, ক্রমবিকাশের ধারাই যথেষ্ট। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে বিপ্লব অপরিহার্য।

ষষ্ঠ, গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যুক্তি, আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে। মতামত প্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় গণতন্ত্রে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে চিন্তা বা মতামতের স্বাধীনতাকে আবর্জনা তুল্য মনে করা হয়। সেখানে যুক্তি ও আলোচনার পরিবর্তে বল প্রয়োগ করা হয়। গণতন্ত্রে ব্যালটকে মহামূল্যবান মনে করা হয়, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে বুলেট বা শক্তিমত্তার প্রয়োজনই বেশি।

সপ্তম, গণতন্ত্রে সফলতার জন্য বিরোধী দলকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয় এবং তাদের মতকে সম্মান দেয়া হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে বিরোধী দল ও মতকে বরদাস্ত করা হয় না। সুতরাং গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র পরস্পর বিরোধী। একে অপরকে অবিশ্বাস করে এবং ভিন্নপথে সমাজজীবনকে পরিচালিত করতে চায়। গণতন্ত্র যুক্তির জোরকে (force of argument) শ্রদ্ধা করে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শ্রদ্ধা করা হয় 'জোরের যুক্তিকে' (argument of force)।

অষ্টম, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ এক সৎ রাজনৈতিক প্রাণী। তাই বিশ্বাস করা হয়, জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত দুঃখবাদী ধারণা পোষণ করা হয়। সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্মপন্থা নির্ণয়ে ব্যর্থ—এই ধারণা একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলে বারি সিঞ্চন করে।

নবম, আইনের শাসন গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য উপাদান। শাসন ব্যবস্থা আইনভিত্তিক, ব্যক্তিভিত্তিক নয়—এই বিশ্বাসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাণস্বরূপ। একনায়কতন্ত্রে কিন্তু আইনের সার্বভৌমত্ব অনুপস্থিত। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতাই শাসন ব্যবস্থার মূলস্বরূপ, আইন নয়।

দশম, গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র দায়িত্বশীলতার নীতি। একনায়কতন্ত্রে কিন্তু জোর দেয়া হয় দক্ষতা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার উপর। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতা অনুপস্থিত।

১। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দাও। (Define democracy and discuss its main features.)

২। প্রাচীন ও আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। প্রাচীন গ্রীসের উদাহরণ দিয়ে উত্তর দাও। (Distinguish between old and modern democracy. Illustrate your answer with examples from Greek democracy.)

৩। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে তফাত কী? পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা কর। (What is the difference between a direct and indirect democracy? Discuss the applicability of the methods of direct democracy in indirect democracy.)

৪। গণতন্ত্রের গুণাবলী ও ত্রুটি বর্ণনা কর। (State the merits and demerits of democracy.)

৫। গণতন্ত্র 'অনুপযুক্তদের শাসন ব্যবস্থা'—আলোচনা কর। (Democracy is 'the cult of incompetence, Discuss.)

৬। গণতন্ত্রের যথার্থ মূল্যায়ন কর। এর সফলতার উপাদান বর্ণনা কর। (Give the real evaluation of democracy. State the essential conditions for its success.)

৭। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? (What is dictatorship? What are its basic features?)

৮। গণতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্রের সাথে তুলনা কর এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Compare and contrast democracy with dictatorship and discuss about the future of democracy.)

৯। কিভাবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করবে? এর সফলতার উপাদানগুলো কী কী? (How do you define democracy? What are the conditions necessary for the success of its working?)

১০। গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Distinguish between democratic and dictatorial forms of government.)

১১। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (Describe the characteristics of dictatorship.)

১২। গণতন্ত্র কাকে বলে? এর সফলতার পূর্বশর্তগুলো কী কী? (What is democracy? What are the pre-requisities of its success?)

১৩। আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি আলোচনা কর। (Discuss the bases of the classification of modern governments.)

১৪। গণতন্ত্র কী? গণতন্ত্রের সফলতার শর্তাবলী আলোচনা কর। (What is democracy? Discuss the conditions for the success of democracy.)

১৫। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে? একনায়কতন্ত্রের দোষগুণ আলোচনা কর। (What is dictatorship? Discuss the merits and demerits of dictatorship.)

১৬। গণতন্ত্র কী? একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতার শর্তগুলো কী কী? (What is a democracy? What are the conditions for the success of a democratic system?)

একককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র

UNITARY GOVERNMENT AND FEDERAL GOVERNMENT

৩৬

সূচনা
Introduction

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংহতির ভিন্নতা লক্ষ্য করে সরকারকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংহতি লক্ষ্য করা যায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে (unitary government)। এ ব্যবস্থায় একটিমাত্র প্রাণকেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র-দেহের সর্বত্র শক্তি সঞ্চারিত হয়। তারপরই আসে যুক্তরাষ্ট্র (federal government)। এখানে একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও অঙ্গ রাজ্যগুলোর পৃথক পৃথক সরকার থাকে এবং তারা কি কার্য সমাধা করবে তা সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত হয়। অঙ্গ রাজ্যগুলোর স্বাধীন সত্তা নেই। তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাথে জড়িত। কিন্তু **রাষ্ট্র সমবায়** (confederation) কয়েকটি স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত হয় এবং তা ঐ সব রাষ্ট্রের সমক্ষে উপস্থিত সমস্যার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। **প্রকৃত বন্ধন** (real union) দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়িভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে, যদিও দুটি রাষ্ট্রই স্বাধীন সত্তা রক্ষা করে। তবে তারা একই রাজবংশের শাসনে থাকে। এ ব্যবস্থা আধুনিক কালে দেখা যায় না। **ব্যক্তিগত বন্ধন** (personal union) অত্যন্ত সাময়িক রাষ্ট্রীয় সমবায় যা সৃষ্টি হয় আকস্মিক কারণে—দুটি রাষ্ট্রে একই রাজার উত্তরাধিকার লাভের ফলে। রাজার মৃত্যু ঘটলে তা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাময়িক প্রয়োজন থেকে, বিশেষ করে সামরিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য **মৈত্রী বন্ধন** (alliance) সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজন মিটে গেলে তার সমাপ্তি ঘটতে পারে। এ সম্পর্কে আলোচনা পরে হবে। প্রথমে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র
Unitary Government

যে রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রে সংন্যস্ত থাকে তাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে। প্রাদেশিক সরকারের বা স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব থাকতেও পারে এ সকল ক্ষেত্রে, কিন্তু উক্ত স্থানীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করে। তাই তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট স্বরূপ বলা হয়। এককেন্দ্রিক সরকারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সরকার। বাংলাদেশ সরকারও এককেন্দ্রিক।

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য
Characteristics

এককেন্দ্রিক সরকারের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথম, এ সরকারে সকল ক্ষমতা একই কেন্দ্রে ন্যস্ত থাকে। অধ্যাপক গেটেলের কথায়, "এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান সকল ক্ষমতা জাতীয় সরকারের উপর অর্পণ করে" ("In a unitary government the constitution delegates all governmental powers to the national government")।

দ্বিতীয়, এ ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার থাকলেও তা ক্ষমতা লাভ করে কেন্দ্রের নিকট হতে, সংবিধানের মাধ্যমে নয়।

তৃতীয়, এ সরকারে দ্বি-নাগরিকত্বের কোন অবকাশ নেই।

চতুর্থ, এ ব্যবস্থায় সংবিধান সাধারণত সুপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। তবে সংবিধান লিখিত ও অলিখিত উভয়ই হতে পারে।

পঞ্চম, এককেন্দ্রিক সরকারে বিচার বিভাগের প্রাধান্য সাধারণত থাকে না।

নিচের রেখাচিত্রে এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারের সম্পর্ক দেখানো হলো ঃ

রেখাচিত্র ক ঃ **সাংবিধানিক ক্ষমতা ঃ কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার**
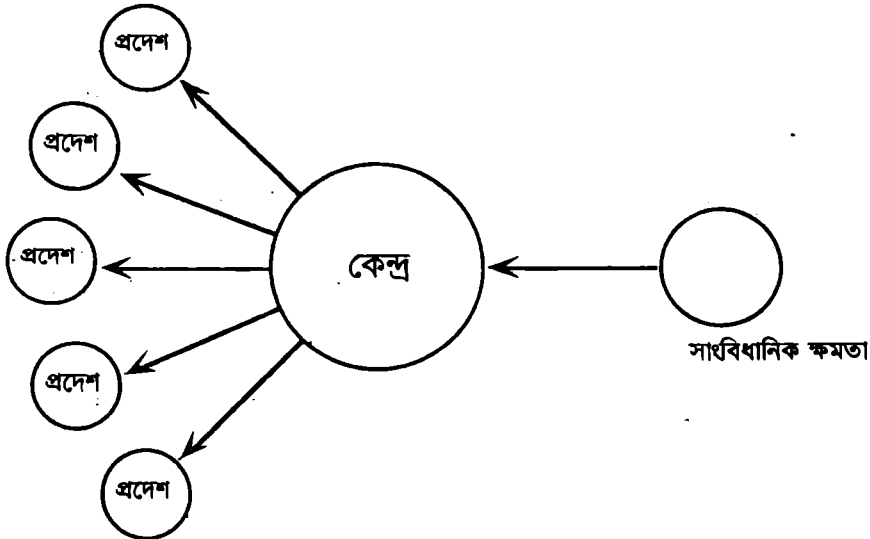
রেখাচিত্রে দেখা যায়, এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্র শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে সংবিধান থেকে এবং প্রদেশগুলো ক্ষমতা লাভ করেছে কেন্দ্র থেকে।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ
Merits and Demerits of Unitary Government

(১) সহজ ব্যবস্থা ঃ এককেন্দ্রিক সরকারের প্রথম ও প্রধান গুণ এই যে, সরকার অতি সহজে গঠিত হতে পারে। ডবলু. এফ. উইলোবীর মতে, "এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সরকারের

সংগঠন সমস্যাটি অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে" ("The whole problem of the organisation of government is enormously simplified when decision is made to establish a unitary government.")। এ ব্যবস্থায় একটি মাত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং ক্ষমতা বিভক্তিকরণ সম্পর্কে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অনেক কঠিন ও জটিল বিষয়ের সমাধান করতে হয়।

(২) নমনীয় সরকার ঃ এককেন্দ্রিক সরকার অত্যন্ত নমনীয়। তাই কোন সঙ্কটের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও এককেন্দ্রিক সরকার অতি সহজে ঝড়ের মুখে একটু মাথা নুইয়ে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন ও সাংবিধানিক নিয়মাবলী অতি দৃঢ়তার সাথে লৌহ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তাই ডাইসি (Dicey) মন্তব্য করেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু তা অনেকটা অপরিবর্তনীয়" ("A federal constitution is capable of change but for all that a federal constitution is apt to be unchangeable.")। তাই উন্নয়নশীল কোন দেশের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগী।

(৩) এ ব্যবস্থায় খন্ডিত দায়িত্ব নেই ঃ এককেন্দ্রিক সরকার অতি সহজে, অল্পায়াসে ও অল্প খরচে সরকারের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক কেন্দ্রেই অবস্থিত এবং কোন সমস্যার সমাধানে তা পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে দায়িত্বের বিভাজন হয় না। ক্ষমতার সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা নেই। শাসনকার্যে কোন দ্বিত্ব ঘটার কারণ নেই। আইনের আওতায় কোন দ্বন্দ্ব সংঘটিত হবারও কোন কারণ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার অতি সহজে ও দ্রুতবেগে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়। এখানে যে কোন নীতি গ্রহণ করা হোক বিচারকমণ্ডলীর নিকট মামলা-মকদ্দমার কোন আশঙ্কা থাকে না। সর্বত্র একই আইন চলতে পারে।

(৪) স্বল্প ব্যয় ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে খরচ কম হবে। যে কোন কার্যনীতি গ্রহণ করা সহজসাধ্য। তা কার্যকরী হচ্ছে কীনা তা পর্যবেক্ষণ করাও সহজ। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের বাহুল্য ঘটায় এবং বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক আইন পরিষদ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ কেন্দ্রে অবস্থিত থাকায় ব্যয় বাহুল্য ঘটার আশঙ্কা থাকে।

(৫) সহজে সংকট কাটিয়ে ওঠে ঃ বৈদেশিক নীতি কিংবা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন সঙ্কট দেখা দিলে এককেন্দ্রিক সরকার অতি নিপুণতা ও তৎপরতার সাথে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তা বিভিন্নভাবে কার্যকর হতে পারে। ফলে সমগ্র রাষ্ট্রের কর্ম তৎপরতার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় এবং সমগ্র রাষ্ট্রও বিপন্ন হতে পারে। জরুরী অবস্থায় এককেন্দ্রিক সরকার রা সামগ্রিক শক্তি একত্রিত করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে।

(৬) দক্ষ ব্যবস্থা ঃ আর্থিক পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং যে কোন শাসন বিষয়ক সংস্কার সাধন বা লক্ষ্যের বাস্তবায়নে অধিক সুনিপুণভাবে সক্ষম হয় এককেন্দ্রিক সরকার।

এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার ক্রটি ঃ

এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট গুণ থাকা সত্ত্বেও এর ক্রটিও রয়েছে অনেক।

(১) আঞ্চলিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয় না ঃ এতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য প্রস্ফুটিত হয় না। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে জনগণের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে এবং তার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রণালী

প্রয়োজন। কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ সমানভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং সমাধান যথার্থ হয় না।

(২) কেন্দ্রের উপর অধিক চাপ থাকে ঃ কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকে বলে স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হবার আর একটি কারণ এই যে, এককেন্দ্রিক সরকারে স্থানীয় সমস্যাগুলোরও সমাধান করে কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ তা স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারাই সুন্দরভাবে সংঘটিত হতে পারে।

(৩) স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না ঃ এ ব্যবস্থায় স্থানীয় ব্যক্তিগণ নের্তৃত্ব বিকাশ করার বেশি সুযোগ লাভ করেন না। কালক্রমে তাঁরা শাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠে। তাই জনগণের ঔদাসীন্য যে কোন রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য বিপজ্জনক।

(৪) আমলাতান্ত্রিক ঃ এককেন্দ্রিক সরকারে আমলাদের ক্ষমতা ও প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং শাসনব্যবস্থা কালক্রমে কেন্দ্রীয় আমলাশাহীর উপর ন্যস্ত হয়। বৃহৎ পরিধিবিশিষ্ট ও বৃহৎ জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্রের জন্য এ ব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়। গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে আঞ্চলিক সরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হলে সুশাসন ও স্বশাসন উভয়ই সুন্দরতর হবে এবং জনগণ স্বায়ত্তশাসনে সমর্থ হলে এবং দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হলে সামগ্রিক কল্যাণ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
Federal Government

ফেডারেশন শব্দটি ল্যাটিন *'foedus'* থেকে উদ্ভূত হয়েছে। *'foedus'*-এর অর্থ 'সন্ধি' বা 'মিলন'। সুতরাং শব্দগত অর্থে ফেডারেল সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে আমরা সে প্রকার সরকারকে বুঝি যা কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হয়েছে। ফাইনারের মতে, "যুক্তরাষ্ট্র তাকেই বলে যে ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ন্যস্ত এবং অন্যান্য অংশ ঐসব আঞ্চলিক ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সংস্থায় ন্যস্ত থাকে" ("A federal state is one in which part of the authority and power is vested in the local areas while another part is vested in a central institution deliberately constituted by an association of the local areas.")।

ডাইসি (Diecy) বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে সেরূপ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা জাতীয় সংহতির সাথে প্রাদেশিক সরকারের অধিকারের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধনে সমর্থ" ("A political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of state right.")।

ঐতিহাসিক ফ্রিম্যানের (Freeman) সংজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, "পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্বন্ধ নির্ণয়ের সময় একটি রাষ্ট্র বলে মনে হয়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তা বহু রাষ্ট্রের মতই।" ("Federation in its perfect form is one which forms a single state in its relations to other nations, but which consists of many states with regard to internal government.")।

কে. সি. হুইয়ারের (K. C. Wheare) মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যদিকে আঞ্চলিক সরকারসমূহ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র" ("By the federal principle I mean

the method of dividing powers so that the general and regional governments are each within its sphere co-ordinate and independent")।

সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় কয়েকটি জনসম্প্রদায়ের সমবায়ে যখন তারা পরস্পরের সাথে স্বার্থ সম্বন্ধে এমনভাবে ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয় যে, তারা নিজেদের সার্বভৌমত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হয়, কিন্তু প্রত্যেকে এমন বিশিষ্ট সম্পদে সমৃদ্ধ যে স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই উভয়কূল রক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে তারা রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য স্থায়িভাবে সংঘবদ্ধ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ
Characteristics of Federalism

(১) দুই প্রকারের সরকার (Dual Government) ঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়সমূহ পরিচালনা করে এবং অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে কার কতখানি ক্ষমতা থাকবে তা সংবিধান কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়। নিজস্ব ক্ষমতার সীমায় উভয় সরকারই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। সংবিধানই উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস। সুতরাং কে বড় এবং কে ছোট তা নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ হবার সম্ভাবনা নেই।

(২) সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Powers) ঃ সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বণ্টননীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্নরূপ। সাধারণত জাতীয় বিষয়সমূহ; যেমন— প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা ও ব্যাংকিং কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত হয় এবং আঞ্চলিক বিষয়সমূহ; যেমন— শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, পুলিশ, কৃষি, অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে দেয়া হয়। সংবিধানে অনুল্লিখিত বিষয়সমূহকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary powers) বলা হয়। তা কোথাও কেন্দ্রে এবং কোথাও অঙ্গরাজ্যসমূহে ন্যস্ত করা হয়।

(৩) সংবিধানের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) ঃ সংবিধানের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সংবিধানই রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্র দলিল। যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানেরই সৃষ্টি। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলো সংবিধান থেকে ক্ষমতা লাভ করে। সংবিধানের পরিপন্থী ক্ষমতা ব্যবহার কোন সরকারের এখতিয়ারে নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে আইন পরিষদ কেন্দ্রের হোক বা অঙ্গরাজ্যের হোক—কেউ সংবিধানের বিরোধী কাজ করতে সমর্থ নয়। কেন্দ্রীয় আইন সভা বা অঙ্গরাজ্যের আইন সভা সাধারণত আইন প্রণয়ন করার পদ্ধতিতে সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। তাই বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইন সভা সার্বভৌম নয়।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Judiciary) ঃ সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য স্বীকৃত ও প্রতিপালিত হচ্ছে কীনা তা দেখার জন্য সুপ্রীম কোর্টকে ভার দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে তাই সুপ্রীম কোর্ট হলো সর্বোচ্চ আদালত এবং কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলো তার আওতার ভেতরে। কোন অঙ্গরাজ্য যদি মনে করে যে, তার বা তাদের অধিকার কেন্দ্র অথবা অন্য অঙ্গরাজ্য ক্ষুণ্ন করছে তা হলে সুপ্রীম কোর্ট তার মীমাংসা করেন। তাছাড়া, কোর্ট সংবিধানের আক্ষরিক নির্দেশ অবহেলা করে তার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সংবিধান বিরোধী কোন কার্যকলাপ ঘটলে তা রোধ করেন।

(৫) লিখিত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Written and Rigid Constitution) ঃ সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখতে এবং তাকে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করতে সাধারণত সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। কারণ, প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা হলে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের

সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। উড্রো উইলসনও বলেছেন, "লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য না হলেও তা লিখিত হওয়া অনেক সুবিধাজনক", কারণ তাহলে সংবিধান স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার থাকে।

(৬) দুই কক্ষের আইন পরিষদ (Bicameral System) : যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় দ্বিতীয় কক্ষের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে এবং সর্বত্র তা বিদ্যমান। প্রথম কক্ষ রাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দ্বিতীয় কক্ষ অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনৈতিক দলের উন্নত সংগঠনের ফলে জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের আর বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন হয় না, কেননা রাজনৈতিক দলই তা করে। তথাপি প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক হিসেবে এই নীতি প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রে অনুসরণ করা হয়।

(৭) দ্বিবিধ নাগরিকতা (Dual Citizenship) : যুক্তরাষ্ট্রে দু প্রকার নাগরিকত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। **প্রথম,** নাগরিকগণ স্ব স্ব অঙ্গরাজ্যের নাগরিক, এবং **দ্বিতীয়,** যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এ দ্বিবিধ নাগরিকত্বের অবস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

রেখাচিত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের সম্পর্ক দেখানো হলো :

রেখাচিত্র খ : **সাংবিধানিক ক্ষমতা : কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার**
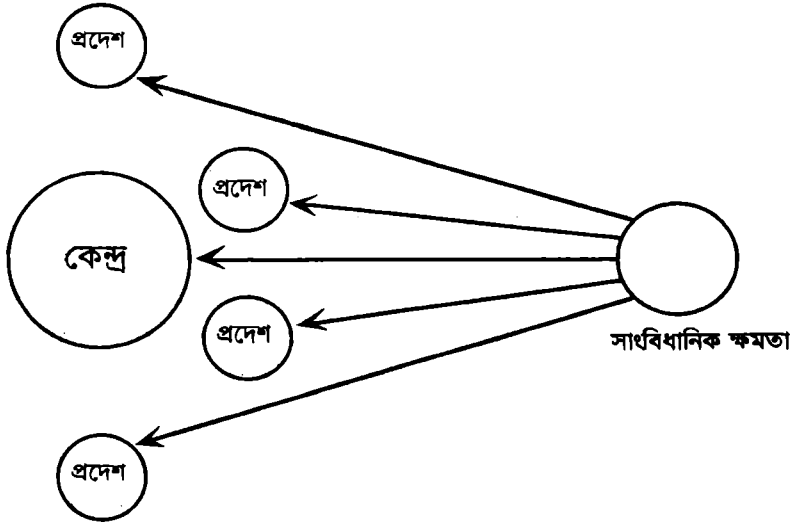
রেখাচিত্রে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলো সংবিধান থেকে ক্ষমতা লাভ করে এবং কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের তফাতসমূহ

যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। **প্রথম,** যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। কিন্তু এককেন্দ্রিক সরকারে ক্ষমতার সাংবিধানিক বণ্টন করা হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে প্রদেশ বা আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করে।

দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানকে সমধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সরকারের কোনটিই সংবিধানের উর্ধ্বে নয়। উভয় সরকারের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় হয় সংবিধান দ্বারা।

তৃতীয়, যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্য সরকারগুলো স্ব স্ব সীমায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং উক্ত আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষ। কিন্তু এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সকল আঞ্চলিক সরকার।

চতুর্থ, এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান অলিখিতও হতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়।

পঞ্চম, যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগের প্রাধান্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু এককেন্দ্রিক সরকারে বিচার বিভাগের প্রাধান্য না থাকলেও চলে। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে বিবাদ বা বিসম্বাদ থাকলে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট তা মীমাংসা করেন। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে, সংবিধান ব্যাখ্যা করার ভারও সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত হয়।

ষষ্ঠ, যুক্তরাষ্ট্রে দু প্রকার নাগরিকত্বের ধারণা প্রচলিত। নাগরিকগণ সাধারণত অঙ্গরাজ্যগুলোর নাগরিক, তারপর রাষ্ট্রের নাগরিক। সুতরাং দু প্রকার নাগরিকত্বের ভাবাদর্শ এ ব্যবস্থাকে বৈশিষ্ট্যময় করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সাফল্যের শর্তাবলী
Conditions for the Success of Federal Principles

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার চাবিকাঠি হলো নাগরিকগণের একপ্রকার মনোভাব ও ঐক্যবোধ যাকে বলা হয় **যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব** (federal sentiment)। যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হয়েও এক না হবার যে মনোভাব, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও পরস্পরের সাথে যুক্ত হবার যে নীতি বা মানসিকতা তাই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের এবং তার সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। ঐক্যবোধে অঙ্গরাজ্যগুলো যদি উদ্বুদ্ধ না হয় তা হলে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় না। আবার তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ঐক্যভাব একান্তভাবে বৃদ্ধি পায়, তা হলে যুক্তরাষ্ট্র কালক্রমে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী এ দুই নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত শক্ত হলেও যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য তা অবশ্য প্রয়োজনীয়। একত্রিত হবার নীতি ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাবের (centripetal and centrifugal) মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন প্রতিষ্ঠাই আসল কাজ।

(২) ভৌগোলিক ঐক্য সূত্র ঃ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সমুদ্র কিংবা পর্বত প্রভৃতি জটিল প্রতিবন্ধক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক নয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র যেন ভৌগোলিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে, যাতে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয় ও রাজনৈতিক নির্দেশাবলী অতি সহজে প্রচলিত হতে পারে। এক অঙ্গরাজ্য দূরবর্তী হলে কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতি উদাসীন হতে পারে অথবা অঙ্গরাজ্যটি কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে মন স্থির করতে পারে।

(৩) জাতীয়তাবোধের সুদৃঢ় বন্ধন ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ রাজ্যগুলো জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হলে রাষ্ট্রের মধ্যে সংহতি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ডাইসি (Dicey) বলেন, "রাজ্যগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, কুলগত ও অন্যান্য ঐক্য বিদ্যমান থাকতে হবে যেন প্রত্যেকে এক জাতীয়তার ঐকসূত্র অনুভব করে" ("A body of countries... so closely connected by locality, by history, by race or the like, as to be capable of bearing in the eyes of their inhabitants an impress of common nationality.")। সুতরাং অঙ্গরাজ্যগুলোর জনগণের মধ্যে এক ভাষা, এক ধর্ম, একই ধরনের ভাবধারা, ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক মিলনসূত্রের প্রয়োজন, অবশ্য তার অপরিহার্যতা নিয়েও তর্ক উঠতে

পারে। কানাডা এবং সুইট্জারল্যাণ্ডে ভাষা ও ধর্ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছে। ভৌগোলিক ঐক্য না থাকায় বৃটিশ কমনওয়েলথ এক যুক্তরাষ্ট্রে সংহত হতে পারে নি।

(৪) অঙ্গরাজ্যের সাম্য ঃ আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলো যতদূর সম্ভব সমান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোনটি যদি আয়তনে বড় হয়, অথবা কোনটির লোকসংখ্যা যদি অন্য কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের লোকসংখ্যারও বেশি হয় অথবা যদি অন্য সকল অঙ্গরাজ্যের সমষ্টিগত শক্তির অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী হয় তা হলে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বড়টির তাবেদার অথবা মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে পারে এবং বড়টি সম্বন্ধে অপরগুলোতে সন্দেহ দানা বেধে উঠতে পারে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সার্থক ও সফল নাও হতে পারে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে প্রুশিয়ার (Prussia) প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল এবং তার ফলেই কালে সেখানে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য যে সমান হবে বা সমানভাবে প্রতিপত্তিশালী হবে এমন ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই।

(৫) আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে সফল করে তুলতে হলে সকলের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি—**"আইন মানার মনোভাবের"** ("A developed sense of legalism") উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোন্‌টি সংবিধান মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে, কোনটি সংবিধান বহির্ভূত তা নির্ধারিত করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট রয়েছে। কিন্তু তার রায় মাথা পেতে নেবার মনোভাব না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন সফল হয় না। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিচারালয়ের প্রাধান্য এবং কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

(৬) সংবিধানের প্রাধান্য ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ ও পবিত্রতম আইন বলা হয় এবং সংবিধানই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্থপতি। সুতরাং সংবিধান যাতে সুস্পষ্ট হয় তার জন্য তা লিখিত হওয়াই প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, সংবিধানই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নাগরিক ও অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বার্থরক্ষার বিরাট রক্ষাকবচ। সুতরাং সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়াই প্রয়োজন। তবে এও লক্ষ্য করতে হবে যেন সংবিধান মৃতবৎ অচল হয়ে না পড়ে, জগদ্দল পাথরের মত মাটি চেপে যেন না থাকে। জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সাথে সাথে তাও যেন সচল হয়ে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়। তাই নমনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধনও প্রয়োজন।

(৭) নাগরিক সচেতনতা ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে নাগরিকগণের সচেতনতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাবধানতা ও আত্মত্যাগের মনোভাব একান্তই প্রয়োজন। নেতৃত্বের গুণে যুক্তরাষ্ট্র সফল হয়। নেতারা যদি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং যদি তাঁরা পক্ষপাতহীন বিচারে অভ্যস্ত হন তা হলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাবে, সংহতি সৃষ্টি হবে এবং জনগণ ও অঙ্গরাজ্যগুলো নিশ্চিন্ত হতে পারবে। সংগঠনের জটিলতায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন খুব বেশি। তাছাড়া, এখানেই দুই প্রকার নাগরিকত্বের ফলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার জন্য জনগণ বিভিন্নমুখীও হতে পারে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় সমঝোতা, সহিষ্ণুতা, একতা ও মিলে মিশে চলার শিক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান।

উল্লিখিত শর্তাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সফলতার জন্য যে সকল শর্তের প্রয়োজন তা অত্যন্ত জটিল। এজন্য সফল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদাহরণ খুব কম। কে. সি. হুইয়ার (K.

C. Wheare) তাঁর 'Federal Government' গ্রন্থে তাই বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কদাচিৎ দেখা যায় কেননা তার শর্তাবলী প্রচুর' ("Federal Governments are rare because its pre-requisites are many.")।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ
Problems of Federation

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেক সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হয়। সমস্যা সমূহের সুন্দর সমাধানের উপরই সফলতা ও সুষ্ঠু কার্যকারিতা নির্ভর করে। সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান হলো **(এক) সন্তোষজনক ক্ষমতাবণ্টন; (দুই) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন; (তিন) অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সমঝোতা সাধন, ও (চার) সংবিধানের সময়োচিত পরিবর্তন।**

(এক) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সন্তোষজনক ক্ষমতা বণ্টন না হলে সেখানে সর্বদা বিবাদ-বিসংবাদ, সন্দেহ ও ঔদাসীন্য প্রভৃতির আশঙ্কা থাকে। তবে সাধারণত এই নীতি অনুসরণ করা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ন্যস্ত হয় এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় বিষয় সংবলিত কার্যক্রম অঙ্গরাজ্যগুলোর উপর ন্যস্ত হয়। তবে এ নিয়ম সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে কী না তা নির্ভর করবে ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনগণের মানসিকতার উপর। এই সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণ করাই উচিত। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্রদেশকে সর্বাধিক সুযোগ দিতে হয়েছে, যাতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতার মধ্যে সকল অংশ বিকাশ লাভ করতে পারে।

(দুই) আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা বিষয়েও কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। আমেরিকায় যেমন এক অংশের কোন নব-দম্পতি দেশের অন্য অংশে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গিয়ে হয়তো অবৈধ কার্য করার দায়ে অভিযুক্ত হলেন, কারণ বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কীয় আইন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিভিন্ন। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও সমতা স্থাপন একান্তই প্রয়োজন।

(তিন) সর্বোপরি প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সমঝোতা, একতা ও সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। কোন অঙ্গরাজ্য যদি মনে করে যে, তার স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে না, অথবা এক রাজ্যের তুলনায় অন্যটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অধিক স্নেহভাজন হচ্ছে, অথবা সকল অঙ্গরাজ্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার দাপটে অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে তা হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সেখানে কার্যকর হয় না। তাই লক্ষ্য করতে হবে কোনটির স্বার্থ যেন নষ্ট না হয়।

(চার) সংবিধানের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও একটি জটিল সমস্যা। এখানে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হতে হবে, কেননা অঙ্গরাজ্যগুলো যেন মনে না করতে পারে যে, তাদের অধিকার ও স্বার্থসমূহ নিয়ত পরিবর্তিত হয়। আবার এও লক্ষ্য করতে হবে যে, সংবিধান কালের পশ্চাতে না পড়ে যায়। সুতরাং নমনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্যবিধানই একমাত্র উপায় এবং পরিবর্তনে অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাবলী
Merits of Federal States

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান গুণ এই যে, এ ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো নিজ নিজ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও এক বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনে সামিল হতে পারে। প্রত্যেকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য মালায় সমৃদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা অত্যন্ত কম। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে যা খুশি করতে পারে না, কেননা অঙ্গরাজ্যগুলোও সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদার হয়। তাই সর্বশক্তিমান হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারে না। তাছাড়া, ক্ষমতা কেন্দ্র সর্বত্র বিক্ষিপ্ত থাকে বলে রাষ্ট্রের সকল অঞ্চলই সজীব ও সচল হতে পারে।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক শাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্বভারে জর্জরিত হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসন ও সমস্যাসমূহের সমাধান সঠিক হয় না। তাছাড়া, স্থানীয় সমস্যাসমূহ স্থানীয় নেতৃত্বের দ্বারাই অধিকতর সুন্দরভাবে সমাধান হতে পারে।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রে অধিক সংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক শিক্ষার আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বতন্ত্র শাসনযন্ত্র, আইনসভা ও বিচারালয় থাকে। এতে অধিক সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের সুচিন্তা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধী-শক্তির দ্বারা শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর স্বাস্থ্যবান, সুষ্ঠু ও তৎপর করতে পারে। তাছাড়া, এতে অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ফলে গণতান্ত্রিক নীতিরও ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হয়, স্বায়ত্তশাসন পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা সম্ভব হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে বৃদ্ধি পেতে সুযোগ দেয়া হয়।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্র যেমন কেন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর প্রবৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করে। যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রবর্তন না হত তা হলে অনেক রাষ্ট্রেরই আত্মবিকাশ সম্ভব হত না। আত্মরক্ষা, অর্থনৈতিক বিকাশ ও রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি অনেক রাষ্ট্রের ভাগ্যে ঘটত না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সবদিক রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দোষ

Demerits of Federal System

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ত্রুটিহীন নয়। এটি অত্যন্ত জটিল শাসন ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে সর্বদা বিবাদ ও বিসংবাদ লেগেই থাকে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সময় সাপেক্ষ। সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে অঙ্গরাজ্যগুলোর মতামত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তাতে অনেক সময় ব্যয় হয়। সেজন্য জরুরী অবস্থায় বা যুদ্ধকালে সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়। তবে, যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা যে দুর্বল তা ভাবার কারণ নেই, কেননা বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করেছে এবং সফলতার সাথে কার্য পরিচালনা করেছে।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্য ঘটে। কারণ একই প্রকার কাজ করার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোও ভারপ্রাপ্ত হয়। এতে শাসনযন্ত্রের দ্বিত্ব ঘটে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি মাত্র কর্তৃপক্ষ থাকে। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। দুষ্কৃতকারীরা এক অঙ্গরাজ্যে অপরাধ করে অন্য অঙ্গরাজ্যে পলায়ন করে। ফলে তাদের শাস্তি বিধানের জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও কর্মপদ্ধতির সমতা রক্ষা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অঙ্গরাজ্যগুলো কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী আইন প্রণয়ন করে। ফলে এমনও দেখা যায় যে, এক রাজ্যের বিবাহ

বন্ধন অন্য রাজ্যে বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণত হয়। এক রাজ্যের অনুমোদন অন্য রাজ্যে অবৈধ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ কখনও কখনও ঘটতে দেখা গিয়েছে।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নাগরিকগণের ঔদাসীন্য বাড়তে পারে। কেননা বিরাট রাষ্ট্রের সাথে তারা তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আবার নাগরিক অনেক সময়ে অঙ্গরাজ্যের প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করে ক্ষান্ত হয় এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনে উৎসাহ বোধ করে না।

এর মূল্যায়ন ঃ তবে এটা সত্য, বর্তমান যুগে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এতই সময়োপযোগী যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত বৃহৎ রাষ্ট্রের সংগঠন করা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তন এর পক্ষে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পেরেছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ার সিদ্ধান্ত হলে হয়ত এ সকল রাষ্ট্রের প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী নাও হতে পারত।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পৃথিবীময় বৃহত্তম বিশ্বরাষ্ট্র পরিকল্পনার অগ্রদূত হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। বিশ্বরাষ্ট্র যদি কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে তা যুক্তরাষ্ট্রই হবে। কেননা জাতীয় বা সাধারণ স্বার্থের সাথে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সমস্যার সামঞ্জস্য বিধান একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানকালে এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা

Recent Tendencies towards Unitary System in Federal States

বর্তমানকালে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। তার কারণ মূলত ঃ **(১) বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি, (২) যান্ত্রিক উন্নতির ফলে উৎপাদন, বিনিময়, বাণিজ্য ও পরিবহণ প্রভৃতিতে বৈপ্লবিক অগ্রগতি, (৩) আর্থিক সঙ্কট, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও (৪) জনহিতকর কার্যের দ্রুত প্রসার।** কে. সি. হুইয়ার (K. C. Wheare) বলেন, বর্তমানে চারটি কারণ যুক্তরাষ্ট্রে এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা বৃদ্ধি করছে ঃ **(এক)** যুদ্ধ (war), **(দুই)** অর্থনৈতিক মন্দা (economic depression), **(তিন)** যোগাযোগ ও শিল্পক্ষেত্রে যান্ত্রিক বিপ্লব, এবং **(চার)** সামাজিক কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার (social services)।

(এক) বিজ্ঞান এ যুগের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। বিজ্ঞানের ধ্বংসলীলার তাণ্ডবও সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক নেতাদের মাধ্যমে। আজ বিজ্ঞানের মারণাস্ত্র মানুষের সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত। সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হলে কে জানে পরবর্তী দিনের আলোক থেকে আমরা সকলেই বঞ্চিত হতে পারি। তাছাড়া, বর্তমানকালে যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যাপক। সৈন্যদলই আজকাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় না, যুদ্ধের প্রস্তুতি হয় মাঠে, ক্ষেত্রে, কলকারখানায়, স্কুল-কলেজে এবং এমনকী সিনেমা হলেও। সুতরাং যুদ্ধকালে সবকিছু এক সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন না হলে ভয়ঙ্কর অসুবিধা হতে পারে। যুদ্ধের রসদ সরবরাহ করতে হলে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্কোচ করতে পারে, রেশনিং এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সফল করতে হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হয়।

(দুই) বর্তমানকালে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যানবাহন, সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতির এতই উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, বিস্ময়করভাবে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধান অত্যন্ত কমে গিয়েছে। ফলে কেন্দ্র থেকে অঙ্গরাজ্যগুলোকে নির্দেশ প্রেরণ বা সংবাদ গ্রহণ প্রভৃতি অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে, যা কয়েক বছর পূর্বেও কল্পনা করা যেত না। ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারই অঙ্গরাজ্যগুলোর নিকট

নির্দেশ দান করে তাদের কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতির বৈষম্য দূর করে। তাছাড়া, সকল কর্মকর্তাগণ একত্রে মিলিত হয়ে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং দিনে দিনে কেন্দ্রের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে।

(তিন) আর্থিক সঙ্কটের সময় আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে অঙ্গরাজ্যগুলোর কার্যকলাপ, কর্মপদ্ধতি ও কর্মনীতির প্রতি হস্তক্ষেপ করতে হয় ও অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কোথাও বেকার সমস্যা দেখা দিলে অথবা দুর্ভিক্ষ, মহামারীর আবির্ভাব ঘটলে তা শুধুমাত্র অঙ্গরাজ্যগুলোর দায়িত্বের উপর ছেড়ে দেয়া হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারও সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। তাছাড়া, কোন আর্থিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সর্বত্র এক সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে হয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র যুক্তি-পরামর্শই দেয় না, অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণও করে।

(চার) রাষ্ট্রে জনকল্যাণকর নীতির সার্থক রূপায়ণ করতে হলে, বেকার ও অকর্মণ্য ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করতে হলে, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগ, মহামারী প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। ফলে বর্তমানকালে যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই কমে আসছে।

তথ্যক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হবার ফলে এবং বিশ্বময় বাজার অর্থনীতির অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সংহতি সৃষ্টি হয়েছে তাও যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যকে ম্লান করে তুলেছে। বিশ্বায়নের এ কালে রাষ্ট্রীয় সীমানা যেখানে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে চলেছে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যের মধ্যে ব্যবধানও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে চলেছে।

সংবিধান অনুযায়ী আমেরিকার অঙ্গরাজ্যগুলো অনুল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা লাভ করেছিল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যার ফলে আজকাল কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, শ্রমিকদের কার্যের সময় নির্ধারণ ও আর্থিক কোন দুর্গতি নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করছে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায়ও ঐ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে Inter State Financial Agreement বা আন্তঃদেশীয় আর্থিক সম্মতির নীতি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় কেন্দ্র আজ অধিক শক্তিশালী। সুতরাং কালক্রমে যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক সরকারের ন্যায় হয়ে পড়তে পারে এ সন্দেহ অনেকে করেন, কারণ দিন দিন যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাবান হচ্ছে তাতে অঙ্গরাজ্যগুলো শুধুমাত্র নামেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, কার্যত সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছে।

রাষ্ট্র-সমবায়
Confederacy

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র সমবায় (confederation) সৃষ্টি করে। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলো প্রতিরক্ষা বা আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে তাই স্থির করে। রাষ্ট্র-সমবায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ববর্তী অবস্থা। আধুনিককালে এই পদ্ধতিতে কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে। এমনকি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম তেরটি রাজ্য রাষ্ট্র-সমবায় গঠন করেই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিল।

রাষ্ট্র সমবায়ের বৈশিষ্ট্য **প্রথমত,** এতে চুক্তিবদ্ধ কোন রাষ্ট্রই স্বাধীনতা হারায় না। চুক্তিবদ্ধ হয়েও তারা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে। **দ্বিতীয়ত,** এ চুক্তির ফলে কোন নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। **তৃতীয়ত,** এ

চুক্তির ফলে উদ্ভূত শাসন কর্তৃপক্ষ সদস্য রাষ্ট্রের উপর কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কিন্তু নাগরিকগণের উপর কোন অধিকার দাবি করে না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রখ্যাত পণ্ডিত ওপেনহাইম (Oppenheim) রাষ্ট্র-সমবায়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন ঃ "রাষ্ট্র সমবায় কয়েকটি পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সন্ধির দ্বারা সংগঠিত এমন এক সংস্থা যা সদস্য রাষ্ট্রের উপর কোন কোন বিষয়ে নির্দেশ দিতে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু ঐ রাষ্ট্রগুলো নাগরিকদের উপর কোন অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। প্রত্যেক সদস্য নিজ রাষ্ট্রের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ সমন্বয়ে রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সে সমবায়ের নিজস্ব কোন শাসনতন্ত্র বা বিচারালয় ছিল না। তেরটি রাজ্যের প্রতিনিধিগণ প্রতিরক্ষা বিষয়ে সলাপরামর্শ করতেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মান সমবায়ও গঠিত হয়েছিল। জার্মান সমবায়ের সদস্যগণ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের জন্য বৈঠকে বসতেন। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহ অন্যদের সাথে সন্ধি করতে পারতেন। কিন্তু সে রাষ্ট্র-সমবায়ে অস্ট্রিয়ারই প্রাধান্য বজায় ছিল। পরে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রুশিয়ার (Prussria) নেতৃত্বে জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং এ ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী। অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হবার জন্যই যেন তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা গঠনের প্রচেষ্টা চলেছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়
Federation and Confederation

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্র-সমবায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্যগণকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলে মনে করা হয়, যদিও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ব্যাপারে এবং আরও সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তবে ইচ্ছামত তারা সদস্যপদ ত্যাগ করে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। কতকগুলো রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হলে তারা ইচ্ছামত সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে না এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের স্বাতন্ত্র্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়। অবশ্য রাশিয়ার সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অভিন্নতার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের জন্য তারা কোনদিন দলের নির্দেশ অমান্য করে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্রব ও সান্নিধ্য ত্যাগ করে নি। সমাজতন্ত্র নিঃশেষ হলে অঙ্গরাজ্যগুলো স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠনের ফলে এক নতুন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে এবং অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের সার্বভৌমত্ব হারায়। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হলেও সদস্য রাষ্ট্র প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখে। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে তার নিজস্ব শাসনতন্ত্র, আইন পরিষদ, বিচার বিভাগ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ তৈরি হয়। কিন্তু, রাষ্ট্র সমবায়ে এসব কিছুই থাকে না। তা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর এক মিলন ক্ষেত্র যেন। কতকগুলো বিষয়ে তারা পরামর্শ করতে পারে ও নীতি নির্ধারণ করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দ্বারাই কার্যকর করে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র-সমবায় চুক্তির ফলমাত্র। যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সংবিধান কর্তৃক সৃষ্টি হয়। সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ দলিল এবং তা সাধারণত পবিত্রতম দলিল। তা দুষ্পরিবর্তনীয় এবং যে কোন পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর সম্মতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায় যে চুক্তিতে সৃষ্টি হয় তা অতি অনায়াসেই পরিবর্তিত হয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্র-সমবায়ের সাথে সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক থাকে। এক সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য সদস্য রাষ্ট্রে বিদেশী বলে গণ্য হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এক নাগরিকতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য বলার জন্য দ্বিনাগরিকত্বের কথা বলা হয়। কিন্তু আসলে তার কোন অর্থ হয় না।

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী কোন কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ভার দেয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন অঙ্গরাজ্যগুলোতেও মান্য করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ে কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার বাইরে তার কোন আইন প্রবর্তিত হয় না।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন আবেদন ও উপযোগিতা নেই। জনসমূহের প্রয়োজন, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় জীবনের মধ্যে ঐক্যতান এর পরিচায়ক। বাঙালীদের সাহিত্য, ভাষা, জীবন-ধারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, জীবনাদর্শ এক এবং অভিন্ন। এখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাও অভিন্ন এবং তাদের সমাধানের জন্য অভিন্ন পদ্ধতি ও প্রণালীর ব্যবহার প্রয়োজন। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে মৌলিক প্রয়োজন দু প্রকার মনোভাব—কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী—তা এখানে বিদ্যমান নেই। এখানে কেন্দ্রমুখী মনোভাবই বর্তমান।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়েও এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না, কেননা মাত্র প্রায় ৫৭ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বার্থ, বিভিন্ন জীবনবোধ, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র বর্তমানে নেই। এখানে প্রত্যেকে একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এবং সর্বজনীন মঙ্গলচিন্তায় অনুপ্রাণিত। কেন্দ্র এখানে দেশের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এককেন্দ্রিকতার স্রোতে তাই সকলে অবগাহন করতে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা পার্লামেণ্টারী সরকার
Cabinet form of Government or Parliamentary Government

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা পার্লামেণ্টারী সরকারে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত হয়। মন্ত্রিপরিষদ নিজেদের কার্যাবলি ও নীতি নির্ধারণের বিষয়ে আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। আইন পরিষদ থেকে মন্ত্রিপরিষদ জন্মলাভ করে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে।

নিচের রেখাচিত্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক দেখানো হলো ঃ

রেখাচিত্র গ ঃ আইন পরিষদের সাথে শাসন বিভাগের সম্পর্ক
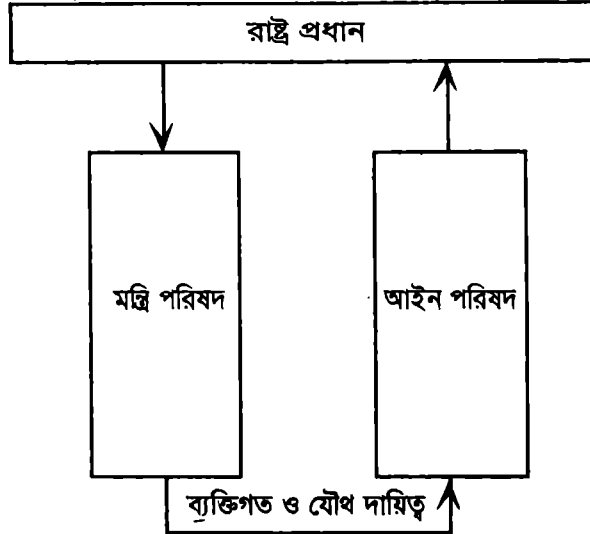
রেখাচিত্রে আইন পরিষদের সাথে শাসন বিভাগের যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা তিন–মাত্রিক।

(এক) আইন পরিষদ থেকে মন্ত্রিপরিষদের উৎপত্তি।

(দুই) মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী।

(তিন) রাষ্ট্রপ্রধান আইন পরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদের সেতুবন্ধন স্বরূপ।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য

(১) শাসনতান্ত্রিক প্রধান ঃ মন্ত্রিপরিষদের উর্ধ্বে একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান (constitutional head) বা নামমাত্র প্রধান থাকেন। শাসন কার্য তাঁরই নামে পরিচালিত হয়, কিন্তু ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতে থাকে না। ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিপরিষদের হাতে। তিনি আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন। ইংল্যাণ্ডে রাজা বা রানী শাসনতান্ত্রিক প্রধান। ফ্রান্স, ভারত, কানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক প্রধান নির্বাচিত হন। তাঁদের সাধারণত প্রেসিডেন্ট নামে অভিহিত করা হয়।

(২) মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য ঃ এ সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদে ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং তা শাসন বিভাগের সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করে। মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট সর্বতোভাবে দায়ী থাকে। মন্ত্রিপরিষদের সভ্যবৃন্দ সাধারণত আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে মনোনীত হন। যদি কেউ মন্ত্রী হবার পূর্বে আইন পরিষদের সদস্য না থাকেন, তবে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদস্য হতে হয়। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের প্রধান বৈশিষ্ট্য দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রিগণ নিজেদের নীতি ও কার্যাবলির জন্য যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আইন পরিষদের নিকট দায়ী

থাকেন। আইন পরিষদও পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রিপরিষদের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে তার পদচ্যুতি ঘটাতে পারে। এই দায়িত্বশীলতার জন্য সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার (responsible government) বলা হয়। মন্ত্রিগণ সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভ্য হয়ে থাকেন অথবা সমবেতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে যুক্ত থাকেন।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের আইন পরিষদ ঃ আইন পরিষদ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেটের অনুমোদনক্রমে তা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও বাতিল হতে পারে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তা পুনর্বার গঠিত হতে পারে।

(৪) আইন পরিষদের গুরুত্ব ঃ মন্ত্রিপরিষদ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে, যদি তা আইন পরিষদের সমর্থন লাভে কৃতকার্য হয়। আবার আইন পরিষদের অনাস্থাসূচক ভোটে (vote of no confidence) অথবা নিন্দা প্রস্তাবে (vote of censure) অথবা সরকারি কোন প্রস্তাবের ব্যর্থতায় অথবা আর্থিক মঞ্জুরির অসম্মতিতে যে কোন সময় তার পদচ্যুতি ঘটতে পারে।

(৫) রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ ঃ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান এক ব্যক্তি নন। রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক শাসক, কিন্তু সরকার প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান।

(৬) বিরোধী দলের স্বীকৃতি ঃ মন্ত্রিপরিষদ সরকারে বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেয়া হয়। স্যার আইভর জেনিংসের কথায়, "এ ব্যবস্থায় বিরোধীদলের উপস্থিতি অপরিহার্য"। কেননা সরকারের সমলোচনার জন্য এবং বিকল্প সরকার গঠনের জন্য তা প্রয়োজনীয়।

(৭) দায়িত্বশীলতা ঃ আইন পরিষদের নিকট মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতাও এ ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলী
Merits of Parliamentary Government

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বহু গুণে ভূষিত।

(১) আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের সুষম সম্পর্ক ঃ এই সরকারে আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের মধ্যে এক সুসম, সুবিন্যস্ত ও মধুর সম্বন্ধ বিরাজ করে এবং শাসন কার্যে তার শুভ প্রতিক্রিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। আইন পরিষদে জনগণের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হয়ে উঠে এবং মন্ত্রিপরিষদের সভ্যবৃন্দ আইন পরিষদের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকে জনগণের প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং কার্যক্রম দ্বারা তা পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর থাকেন। তাছাড়া, শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উৎকৃষ্ট ও সুচিন্তিত আইনের আবশ্যক এবং তা শাসন বিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী রচিত হলে সুচিন্তিত, উত্তম ও বাস্তবধর্মী হয়ে জনকল্যাণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে সর্ব ব্যাপারে এরূপ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

(২) দায়িত্বশীল সরকার ঃ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে জনপ্রতিনিধিগণের কাছে সরকারের পূর্ণ দায়িত্বের নিশ্চয়তা থাকে। তাই এ সরকার জনপ্রিয় নীতি গ্রহণ করে এবং জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন

করে। আইন পরিষদের আস্থা হারাবার ভয়ে মন্ত্রিপরিষদ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। জনমতের প্রতি তা শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং তাকে দিকদর্শন মনে করে কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

(৩) আইন পরিষদে নেতৃত্ব ঃ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ আইন পরিষদের নেতৃবর্গও বটে। তাই সময়োপযোগী ও সাধু আইন প্রণয়ন ও আইন প্রবর্তনের দায়িত্ব তাঁদের উপর সুনির্দিষ্টভাবে ন্যস্ত থাকে। শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদের এ ঘনিষ্ঠ সংযোগ আইনের মান উন্নত করতে ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অনেক সাহায্য করে।

(৪) সুপরিবর্তনীয় সরকার ঃ এ ধরনের সরকার সহজেই পরিবর্তনীয়। কোন সংকট উপস্থিত হলে বা জাতীয় জীবনে কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে তার মোকাবেলার জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণের ক্ষমতাসীন হবারও সুযোগ রয়েছে। নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়ে নতুন বল সঞ্চারেরও সুযোগ রয়েছে এতে অথবা সমবেতভাবে মন্ত্রিপরিষদও গঠিত হতে পারে। কারণ, এও পরিলক্ষিত হয় যে, শান্তিকালীন প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ পরিচালনার যোগ্যতম নাও হতে পারেন। অথবা যুদ্ধের আমলে ধুরন্ধর ব্যক্তি শান্তিকালের জন্য যোগ্যতম হতে নাও পারেন। এ ধরনের সরকারের পরিবর্তনশীলতা সংকটকালে অনেক সাহায্য করে এবং জাতিকে মুক্তির নতুন পথের সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

(৫) পরিচালনায় সহজতর ঃ এ ধরনের সরকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে, কেননা বিরোধী দল সর্বদা ওঁত পেতে দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। মন্ত্রিপরিষদকে তার প্রত্যেক নীতি ও কার্যের জন্য আইন পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। ফলে দায়িত্বশীলতা ও বিরোধী দলের উপস্থিতির জন্য সরকার সর্বদা সজাগ, সৎ ও তৎপর থাকতে বাধ্য।

(৬) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নেতৃত্ব ঃ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে জাতি ও রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সেবা লাভে সমর্থ হয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে, প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারে যে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় তাদের যোগ্যতার মান তুলনামূলকভাবে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের যোগ্যতার মান অপেক্ষা অনেক নিচু, কেননা পার্লামেন্টারী শাসনে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ বহুকাল ধরে জনকল্যাণকর কার্যে নিয়োজিত থেকে এবং পার্লামেণ্টারী শাসনের অভিজ্ঞতার ফলে অনেক বিষয়ে নিপুণতা, সতর্কতা ও বিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। তাঁদের সেবায় দেশের ও দশের মঙ্গল সাধিত হয়। ডাইসিও এ মত পোষণ করেন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থার তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডে যোগ্যতর নেতৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়।

ত্রুটিসমূহ
Demerits

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ত্রুটিশূন্য নয়। **(১) অস্থিতিশীল ঃ** এ ব্যবস্থা স্থিতিশীল নয়। এর কার্যকাল অনিশ্চিত। যে কোন সময়ে অনাস্থার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ পদচ্যুত হতে পারেন। কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সে এরূপ কথা প্রচলিত ছিল যে, প্রতি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশে নতুন সরকারের উদয় সূচিত হত। কাউকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে একটু থেমে উত্তর দিত, "প্রধানমন্ত্রীর নাম জানতে চান? তা—বৈকালিক কাগজখানা না পড়ে বলি কীভাবে, বলুন ?" সুতরাং সরকারের স্থিতিহীনতা ও অনিশ্চয়তায় সরকার কোনরূপ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারে না। কোন পরিকল্পনা গৃহীত হলেও তা তাসের ঘরের মত সাথে সাথে ভেঙ্গে যায়।

(২) কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নেতৃত্ব ঃ এ শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদ সংগঠিত হয় মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সমন্বয়ে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (separation of powers) নীতি লঙ্ঘিত হয়। অনেক সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বা প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে তা রূপ পরিগ্রহ করে। মন্ত্রিপরিষদ শুধুমাত্র শাসন বিভাগই পরিচালনা করে না, আইন প্রণয়নও তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাই সিডনী ওয়েব ও বিয়াট্রিস ওয়েব এ শাসন ব্যবস্থাকে "এক ব্যক্তি বা এক দলের একনায়কতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন, কেননা তাঁরা বা তিনি কতিপয় বিশ্বস্ত দলীয় ব্যক্তির সাহায্যে পদানত দলের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন" ("A dictatorship of one man or of a small group of men exercise power through a subservient majority or more or less tried persons.")।

(৩) দলীয় শাসন ব্যবস্থা ঃ এই শাসনব্যবস্থা দলীয় শাসনব্যবস্থা। দলীয় মনোভাব ও দলাদলির সর্বপ্রকার নোংরামি ও দূষিত কার্যকলাপ জাতীয় জীবনকে কলুষিত করে তোলে। যে কোন আইনকে দলীয় স্বার্থ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। বিরোধী দল ভাল হোক অথবা মন্দ হোক—সকল প্রকার কার্যের বিরোধিতা করে উল্লাস প্রকাশ করে। সরকারি কর্মচারীবৃন্দও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধাপে ধাপে ব্যক্তি স্বার্থ আদায়ের মাধ্যমে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে চায় এবং দলীয় স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। এ সব কোন্দল এবং স্বার্থ সংঘাতের ঘোলাটে আবহাওয়ায় জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি বেচারী শিশুর ন্যায় ছটফট করতে থাকে।

(৪) সংকটকালে ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম ঃ কোন সংকট বা জরুরী অবস্থায় এ ব্যবস্থা দ্রুত গতিতে ও তৎপরতার সাথে কার্য করতে অক্ষম, কেননা এই ব্যবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হলে তা মন্ত্রিপরিষদ ও আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে হয়। এতে অধিক সময় নষ্ট হয় এবং হয়ত ততক্ষণ বা ততদিন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

(৫) দায়িত্ব ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন ঃ এও বলা হয়ে থাকে যে, এ ব্যবস্থা সার্থকরূপে প্রয়োগ করতে হলে জনসমূহকে রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয় এবং দায়িত্বশীল ও সদাজাগ্রত থাকতে হয়। নইলে নির্বাচনে জনগণকে ভুলিয়ে এবং অন্যান্য চাতুরীর সাহায্যে অযোগ্য স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ ক্ষমতাসীন হতে পারে এবং দলের সমর্থন লাভ করে যে কোন অন্যায় কর্মও সাধন করতে পারে। জনগণ যদি সদাজাগ্রত, সতর্ক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় তা হলে তারা বিচক্ষণ, স্বার্থহীন ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করতে সমর্থ হবে। এই সকল অভিযোগ অবশ্য যে কোন সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত দলীয় ব্যবস্থা। সংকট কালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় না তাও যথার্থ নয়। ব্রিটিশ ব্যবস্থার দিকে তাকালে অনেক ভ্রান্তি দূর হয়।

প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার
Presidential Form of Government

প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার বলতে আমরা সে ব্যবস্থাকে বুঝি যেখানে প্রেসিডেন্ট আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন এবং তিনি নিজেই তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট শাসনতান্ত্রিক প্রধান নন। তিনি আসলেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারেও প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি শাসনতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। অধ্যাপক লিকক (Leacock) বলেন, "এ শাসন ব্যবস্থার নাম প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার হওয়া ঠিক নয়, কেননা এ ব্যবস্থায় অনেক সময় প্রেসিডেন্ট পদবীধারী কেউ নাও থাকতে পারেন। আবার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারেও প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন—যেমন ভারত ও ফ্রান্সের ব্যবস্থায় রয়েছে।" সি. এফ. স্ট্রং তাই প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারকে 'সুনির্দিষ্ট শাসন বিভাগ' (fixed executive) বলেছেন। এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতিকও বলা যায়।

রেখাচিত্র ঘ ঃ আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক
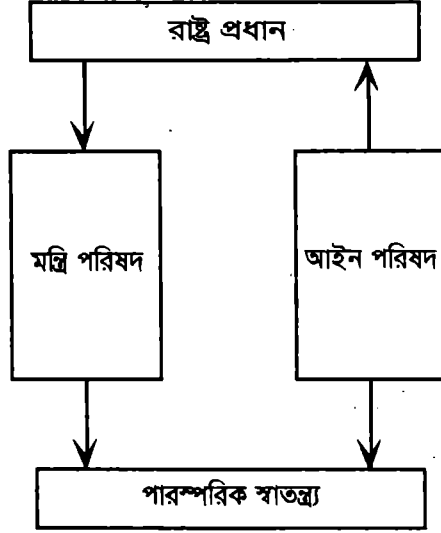
রেখাচিত্রে আইন পরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদের যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা দ্বি-মাত্রিক।

(এক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদ থেকে উদ্ভূত হয় না এবং আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন।

(দুই) রাষ্ট্র প্রধান শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে এক দিকে যেমন মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব দেন, অন্য দিকে তেমনি আইন পরিষদ থেকেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন।

এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) প্রেসিডেন্ট শাসন বিভাগের প্রধান ঃ এই ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ পরিচালনা করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক এ পদে নির্বাচিত হন এবং কোনরূপ আইনানুগ পন্থায় তাঁর অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি এই পদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে তাঁর উপর ন্যস্ত।

(২) প্রেসিডেন্ট আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন ঃ প্রেসিডেন্ট আইন পরিষদের সভ্য নন এবং এর আলোচনায় অংশগ্রহণের কোন অধিকার তাঁর নেই। তিনি আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন।

(৩) মন্ত্রিগণ প্রেসিডেন্টের নিকট দায়ী ঃ প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিপরিষদ বা সেক্রেটারীদের মাধ্যমে শাসনকার্য সম্পন্ন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বা সেক্রেটারিগণ তাঁর দ্বারা মনোনীত হন। তাঁর ইচ্ছানুসারে, তাঁর নিকট দায়ী থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁরা সাধারণত প্রেসিডেন্টের দলভুক্ত ব্যক্তি এবং আইন পরিষদে তাঁদের সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনা, তা এ ক্ষেত্রে অবান্তব। তাঁরাও আইন পরিষদের সদস্য নন। আইন পরিষদের কার্যাবলি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। তাঁরা মোটের

উপর প্রেসিডেন্টের এজেন্ট মাত্র। প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হলে বা অপসারণ ঘটলে বা অন্য কোন কারণে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে তাঁরাও পদত্যাগ করেন।

(৪) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ ঃ এ ব্যবস্থায় আইন পরিষদ হয় দ্বি–কক্ষবিশিষ্ট এবং তা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আইন পরিষদ আহূত হলেও রাষ্ট্রপ্রধান তা ভেঙ্গে দিতে পারেন না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইন পরিষদ দ্বারা প্রণীত আইন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্থগিত থাকতে পারে।

(৫) বিচার বিভাগের প্রাধান্য ঃ এ ব্যবস্থায় বিচার বিভাগকে প্রাধান্য দেয়া হয়, যেন তা বিভিন্ন কার্যক্রম লক্ষ্য করে কোন বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করল কীনা তা লক্ষ্য করতে পারে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Theory of Separation of Powers) গৃহীত হয়।

প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারের গুণাবলী
Merits

প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার বিভিন্ন গুণরাজি বিভূষিত ব্যবস্থা। বর্তমানকালে এর আবেদন অত্যন্ত বেশি। **প্রথমত,** তা শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বিধান করে এবং শাসন বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলি ও পরিকল্পনা কার্যকর করার নিশ্চয়তা দান করে। প্রেসিডেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁকে অপসারণ না করা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। অপসারণ এই ব্যবস্থায় কৃচিৎ দেখা যায়। সুতরাং শাসন কার্যের স্থায়িত্ব এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান এ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। ফলে জাতীয় জীবন উত্তরোত্তর উন্নত হয় ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, এ ব্যবস্থা আইনপরিষদ ও শাসনবিভাগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও একনায়কত্বের অবসান ঘটায়। আইন পরিষদে আইন প্রণেতাগণ স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং শাসন বিভাগ আইন পরিষদের খেয়াল–খুশির ঊর্ধ্বে থেকে আইনকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়ত, এ ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুফল লাভ সম্ভব। বিভিন্ন বিভাগ স্থায়িভাবে কার্য পরিচালনা করে স্থায়ী বিভাগসমূহের মান উন্নত করতে সমর্থ হয়। জনসাধারণও সুশাসনের সুফল লাভে সক্ষম হয় এবং অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

চতুর্থত, সংকটকালে ও জাতীয় জরুরী অবস্থায় এই ব্যবস্থা অধিকতর নৈপুণ্য ও তৎপরতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, কেননা শাসন ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত এবং প্রেসিডেন্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে তা মোকাবেলা করতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের এ সুবিধা নেই। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদকে অনেক ভেবে চিন্তে এবং আইন পরিষদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে নীতি গ্রহণ করতে হয়।

প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারের ত্রুটিসমূহ
Demerits of Presidential System of Government

প্রথমত, এই শাসন ব্যবস্থাকে অনেকে স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন ও বিপজ্জনক মনে করেন। আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সার্বিকভাবে প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট

এ ব্যবস্থায় একনায়ক ও স্বৈরাচারী হতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন বলে প্রেসিডেণ্ট তাঁর খেয়াল চরিতার্থ করতে উদগ্রীব হয়ে উঠতে পারেন, কেননা অপসারণের পদ্ধতি একটু জটিল বলে সাধারণত তা সংঘটিত হয় না। বাংলাদেশে এর তিক্ততম অভিজ্ঞতা সকলকে পীড়িত করছে।

দ্বিতীয়ত, এ ব্যবস্থাকে দায়িত্বহীন সরকার বলা হয়, কেননা প্রেসিডেণ্ট আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন। তিনি স্বীয় ধী-শক্তি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু বর্তমানকালে সরকারকে এত জটিল ও কঠিন বিষয়সমূহের সমাধান করতে হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের বিদ্যাবুদ্ধি অপ্রতুল মনে হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থায় আইন পরিষদকে সমাধান নির্ধারণে অসহায় রাখা হয়। যদি প্রেসিডেণ্ট দেশকে বিপথে পরিচালিত করতে থাকেন, তাহলে অন্তত বেশকিছু দিনের মধ্যে তাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব হয় না এবং তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক কার্যও সাধিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, এ ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এই যে, যে কোন সময়ে আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধ ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। অথচ শাসনকার্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে হলে সরকারের এ দুই বিভাগের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। প্রেসিডেণ্ট যদি এক দলের নেতা হন এবং আইন পরিষদে যদি অন্য দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তাহলে অচলাবস্থা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কারণ, এ শাসনব্যবস্থা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সর্বপ্রধান সুবিধা হলো, দুই বিভাগের সহযোগিতা স্থাপন। যদি প্রেসিডেণ্ট কোন বিশেষ ধরনের আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তবে তাঁকে আইন পরিষদের নিকট ধর্ণা দিতে হয়।

চতুর্থত, প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকার পরিবর্তনশীল নয়। জরুরী অবস্থায় বা সংকটকালে সরকার যদি নমনীয় না হয়, তা হলে তার মোকাবেলার জন্য অনেক অসুবিধা হয়। তাছাড়া, কোন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়ে কার্যক্ষেত্রে যদি অকর্মণ্য ও বিপজ্জনক প্রমাণিত হন, তা হলে তাঁকে পদচ্যুত করা অত্যন্ত শক্ত। সুতরাং আপৎকালে অনেক সময় উপযুক্ত রাষ্ট্র চালকের অভাব অনুভূত হয়।

সর্বশেষে, এ শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অভাব অনুভব করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মন্ত্রিগণ সে নেতৃত্ব দান করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হন না। লর্ড ব্রাইস তাই বলেছেন ঃ "পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রেসিডেণ্ট শাসিত ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে দৈব বা চান্সের উপর নির্ভরশীল। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের একজন মাত্র এবং তাঁর কোন অসুবিধা হলে তা পূর্ণ হয় পরিষদের অন্য সদস্যদের দ্বারা। প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকারে শাসন-ব্যবস্থা প্রেসিডেণ্টের উপযুক্ততা, সততা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে" ("The presidential system leaves more to chance than does the Parliamentary. A prime minister is only one out of many; in times of need a cabinet and his colleagues may keep him straight and supply qualities wanting in him. But everything depends on the character of the individual chosen to be the President.")।

শ্রেষ্ঠতম সরকার
The Best Form of Government

শ্রেষ্ঠতম সরকার কি—এ প্রশ্নে প্রচুর বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। সরকার কোন্ কোন্ গুণে গুণান্বিত হলে শ্রেষ্ঠতম বলে বিবেচিত হবে তা নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে বহু মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে এবং

বিভিন্নভাবে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে। জার্মান জাতির নিকট সেই সরকার সর্বশ্রেষ্ঠ যা শাসন ব্যবস্থায় তৎপরতা, মিতব্যয়িতা ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে। ইংরেজ জাতির নিকট সেই সরকার শ্রেষ্ঠ, যা পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক এবং নাগরিকগণের অধিকার রক্ষায় সমর্থ। আমেরিকানগণ সরকারকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁদের মতে, সে হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার, যা জনগণকে রাজনৈতিক কর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং যা নাগরিকগণের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী বিকশিত করতে সাহায্য করে। চীনাদের নিকট ক্ষমতার আধারই সরকার এবং শ্রেষ্ঠ সরকার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার বাহক ও শক্তিরূপ। রাশিয়ান জাতি তাঁদের ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে আদর্শ রক্ষা ও প্রচারে সক্ষম সংস্থা হিসেবেই চিন্তা করেন।

বিভিন্ন দার্শনিকগণও সরকারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন। প্লেটোর (Plato) মতে, দার্শনিক রাজার শাসনই উৎকৃষ্টতম সরকার (rule of the philosopher king)। এরিস্টটল অবশ্য অভিজাততন্ত্রকে (aristocracy) সর্বোৎকৃষ্ট সরকার বলেছেন, যদিও গণতন্ত্রকে (polity) সর্বাপেক্ষা বাস্তবভিত্তিক সরকার বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। মেকিয়াভেলির (Mechiavelli) নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম সরকার এমন এক ব্যবস্থা যা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম। টমাস হব্‌স (Hobbes) রাজতন্ত্রকে এবং জন লক (John Locke) দায়িত্বশীল সরকারকে শ্রেষ্ঠতম সরকার বলেছেন। কবি আলেকজাণ্ডার পোপ বলেন, **'সরকারের রূপ সম্পর্কে নির্বোধদের ঝগড়া করতে দাও। যে সরকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে তাই সেরা সরকার'** ('For forms of government let fools contest. That which is best administered is the best")। তাঁর মতে সরকারের রূপ এমন কিছু নয়। তাকে পরিচালনা করার মধ্যে রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব। হ্যামিলটন অবশ্য তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন, নিকৃষ্ট সরকারকে উৎকৃষ্টরূপে পরিচালনা করে তাকে উৎকৃষ্টতম রূপ দেয়া সম্ভব নয়। ফ্যাসিজমের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একে সুপরিচালিত করলেও তা শ্রেষ্ঠ রূপ লাভে সমর্থ হবে না। সাময়িক কালের জন্য তা তৎপরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হলেও কালে তা রাজনৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করে তুলতে বাধ্য।

দার্শনিক মিলের (J. S. Mill) মতে, জনগণের মধ্যে বুদ্ধি–বিবেচনা ও সততা বৃদ্ধি করাই রাজনৈতিক সংস্থার উদ্দেশ্য। সুতরাং সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যার মাধ্যমে জনগণ সততা, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতার মান উন্নয়ন করতে পারে। অধ্যাপক গার্নার বলেন, "কোন এক ধরনের সরকার সকল প্রকার পরিবেশে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। কোথায় কোন্ ধরনের সরকার সর্বাপেক্ষা উপযোগী তা বিবেচনা করতে হবে সেখানকার সামাজিক অবস্থার পর্যায়ক্রমিক উন্নতি, জনগণের বিদ্যা–বুদ্ধির মান ও রাজনৈতিক সচেতনতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কুলগত বৈশিষ্ট্য এবং আরও বিভিন্নরূপ উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে" ("In determining what is the best government for any particular society, we must take into consideration the stages of development which the society has attained, the intelligence and political capacity of the people, their history and tradition, their race, characteristics and a variety of other elements")।

তবে তাঁর মতে, এটি স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে কোথাও একনায়কতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী সরকার উপযোগী হবে। জনগণ যতই অনুন্নত হোক না কেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে। তাছাড়া আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহে সরকার শ্রেষ্ঠতর

বিবেচিত হয় যদি তা রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা জাতীয় ভাবধারাকে উত্তরোত্তর জনগণের উপলব্ধির জন্য পরিস্ফুট করতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উত্তম বলেই বিবেচিত হবে। গণতন্ত্রই হলো আধুনিককালের শ্রেষ্ঠতম সরকার।

বাংলাদেশ ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
Bangladesh and Parliamentary Government

বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার না রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সমধিক উপযোগী তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তিত ছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রবর্তন হয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের পর সর্বদলীয় নেতৃবর্গের গোলটেবিল বৈঠকে দেশে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এ পটভূমিকায় সম্পন্ন হয়। তারপর ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। রক্তের এক নদীতে সাঁতার দিয়ে বাঙালী জাতি স্বাধীনতার অমৃত লোকে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্মক্ষণ থেকেই এখানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের প্রবর্তন হয়েছিল। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। পাকিস্তানী হানাদারদের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলায় ফিরে আসেন। তখন থেকে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। দ্বাদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে আবারো সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

তবে কোনো দেশে কোন্ সরকার উপযোগী ও শ্রেষ্ঠতর, তা নির্ধারণ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয় ভেবে দেখা প্রয়োজন ঃ

(এক) জনসাধারণের প্রয়োজন ও সন্তুষ্টি বিধান, **(দুই)** ভৌগোলিক অবস্থান, এবং **(তিন)** জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস।

(১) জনসাধারণের প্রয়োজন ঃ উন্নয়নকামী রাষ্ট্রে যে সব সমস্যা থাকা স্বাভাবিক বাংলাদেশে তাদের সবই বিদ্যমান। আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ আজও হয় নি। সামাজিক জীবন আজ পর্যন্ত সবল ও সচ্ছল হয়ে ওঠে নি। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন আজও সম্ভব হয় নি। জীবনের মান এখানে অত্যন্ত অনুন্নত। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দিনেও আমরা প্রাচীনতার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য চাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, যোগ্যতম পরিচালনা, সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা এবং জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা। দায়িত্বশীল সরকার এ পটভূমিকায় হবে এক আশীর্বাদস্বরূপ। এতে স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনাও হবে চিরদিনের জন্য তিরোহিত। তাই বাংলাদেশের জন্য মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার অধিক উপযোগী।

(২) ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত সুবিধাজনক। মাত্র ৫৬ হাজার বর্গমাইল এলাকায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত সমুজ্জ্বল ও

সুসংবদ্ধ। মাত্র ছয়টি বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত এবং কোন অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ভাব বর্তমান নেই। জনগণের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনাদর্শ, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচরণ প্রায় এক ও অভিন্ন। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে সকলে উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয় ঐক্যে সকলেই সুসংহত। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এ দেশের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হলে এখানে আঞ্চলিকতার বিচ্ছিন্নতা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বৃটেনকে যে অনন্য মহিমার অধিকারী করেছে বাংলাদেশকেও অনুরূপ মহিমায় মণ্ডিত করতে পারে।

(৩) জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস ঃ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও আমরা এখানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের উপযোগিতা লক্ষ্য করি। জনসাধারণ মোটামুটিভাবে সচেতন ও দায়িত্বশীল। বিগত সংগ্রামের দিনগুলোতে জনসাধারণ যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার নিদর্শন দেখিয়েছে তা অতুলনীয়। স্ব-শাসন ও সুশাসন দু-ই এখানে কাম্য এবং অপরিহার্য। অতীতেও এ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয়েছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও তার কার্যকারিতা চমৎকার। তাছাড়া, বৃটিশ আমলে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করার কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের নেতৃবর্গের রয়েছে। সর্বোপরি, পাক-কুশাসন আমলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা দেশবাসীর রয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতেও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারকে সমধিক উপযোগী বলে চিহ্নিত করা চলে।

দায়িত্বশীল নেতৃত্বের পরশ, দায়িত্ববোধের চরম পরাকাষ্ঠা এই দেশের মাটির সাথে জড়িত, আলো-হাওয়ায় নিয়ন্ত্রিত এবং এ দেশের লোকদের মনোবীণায় তারই সুর ঝংকৃত হয় সতত। সুতরাং দায়িত্বশীল নেতৃত্বের প্রতীক মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারই এ দেশের উপযোগী সরকার।

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কী বোঝ ? এককেন্দ্রিক সরকার থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রভেদ কী তা বর্ণনা কর। (What do you mean by federal government? Differentiate it from the unitary system.) [D. U. 1984]

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থেকে এককেন্দ্রিক সরকারের তফাত কীভাবে করবে ? আমেরিকা ও বৃটেনের সংবিধান থেকে উদাহরণসহ উত্তর দাও। (How would you distinguish between federalism from unitarianism? Illustrate with reference to the constitutions of the U. S. A. and the U. K.)

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝা যায় ? যুক্তরাষ্ট্র সরকার গঠনের শর্তাবলী কী কী? (What is meant by the federal system? What are the conditions necessary for the formation of a federal state?)

৪। "যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে সেরূপ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা জাতীয় সংহতির সাথে প্রাদেশিক সরকারের অধিকারের সুসামঞ্জস্য সমন্বয় সাধনে সমর্থ"—এ উক্তি বিচার কর। ("Federation is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of state rights."—Examine the statement.)

৫। যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র সমবায়ের পার্থক্য নির্দেশ কর এবং নিম্নলিখিতগুলো কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং কেন ? (ক) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, (খ) সুইট্জারল্যাণ্ড, (গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন। (Distinguish a federation from a confederation. In what category would you put the following and why? (a) the U. S. A., (b) Switzerland, (e) the U. S. S. R.)

৬। যুক্তরাষ্ট্রের গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ কী কী ? যুক্তরাষ্ট্রের সফলতার জন্য কোন্ কোন্ শর্তাবলী প্রয়োজন ? (What are the merits and defects of a federation? What are the conditions for its successful working?)

৭। 'অবশিষ্ট ক্ষমতা' বলতে কী বোঝায় ? যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (What is meant by residuary powers? Explain the different ways in which such powers in a federation are distributed between the centre and provinces.)

৮। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এককেন্দ্রিকতার বৃদ্ধির কারণ দর্শাও। (Account for the recent tendencies towards the unitary system in a federal state.)

৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the problems of a federation.)

১০। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকারের মধ্যে কী কী প্রভেদ বিদ্যমান? উদাহরণপূর্বক উত্তর দাও। (Distinguish between the parliamentary and presidential forms of government. Illustrate your answer.)

১১। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকারের গুণাবলী ও ত্রুটি উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর। (Compare and contrast the respective merits and demerits of the cabinet and presidential system of government.)

১২। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র কাকে বলে ? "প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল এবং অনুপযুক্ত তথাপি জরুরী অবস্থায় তা যোগ্যতা প্রমাণ করে"—আলোচনা কর। (What is meant by parliamentary democracy? "Parliamentary system is by nature weak and inefficient, yet it always proves its worth in an emergency."—Discuss.)

১৩। শ্রেষ্ঠতম সরকার কোন্টি ? (What is the best form of government?)

১৪। বাংলাদেশের জন্য মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার উত্তম না প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকার উত্তম ? বর্ণনা কর। (State whether cabinet form of government is the best for Bangladesh or the presidential form of government, Elucidate.)

১৫। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ও প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকারের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ উল্লেখ করে দেখাও। (Compare and contrast the cabinet and presidential forms of government.)

১৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Evaluate the merits and demerits of the federal and unitary forms of government.) [D. U '82]

১৭। 'সরকারের রূপ সম্পর্কে নির্বোধদের ঝগড়া করতে দাও। যে সরকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে, তাই শ্রেষ্ঠ সরকার'—এ মত কী সত্য ? তা না হলে কোন্ ধরনের সরকারকে তুমি পছন্দ কর এবং কেন ? ("For forms of government let fools contest. That which is the best administered is the best." Is it a correct view? If not, what form of government would you prefer and why?)

১৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে অনেক সময় বুঝি ঐক্য ব্যতীত কয়েকটি রাষ্ট্রের মিলন—আলোচনা কর। (A federation is sometimes described as the union of several states without unity. Discuss.)

১৯। বাংলাদেশের জন্য কোন্ ধরনের সরকার উপযোগী ? (What form of government is suitable to Bangladesh?)

২০। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাকে বলে ? আইন পরিষদের সাথে শাসন বিভাগের সম্বন্ধ কী ? (What is presidential system of government? What is the relationship of the legislative with the executive?)

২১। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। এই ব্যবস্থায় আইন বিভাগ কিভাবে নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে ? (Discuss the essential features of a cabinet form of government. How does the legislature exercise control over the executive in this form of government?)

[N. U. 1996]

২২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংজ্ঞা দাও। এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। (Define a federation and discuss its characteristics.) [N. U. 1996]

ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি

THEORY OF SEPARATION OF POWERS

৩৭

ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি
Theory of Separation of Powers

ক্ষমতার পৃথকীকরণ বা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে আমরা বুঝি—প্রত্যেক শাসনব্যবস্থার যে তিনটি অপরিহার্য অঙ্গ রয়েছে তাদের পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে একটি হলো আইন পরিষদ যা আইন প্রণয়ন, আইন পরিবর্তন বা তার পরিবর্ধন করতে নিয়োজিত থাকে। আইন পরিষদই হলো সরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগ (Legislature)। দ্বিতীয় বিভাগটি আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন কার্যক্ষেত্রে প্রবর্তিত হচ্ছে কিনা এবং ফলে রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করে। এটি শাসন বিভাগ (Executive)। সর্বশেষে রয়েছে বিচার বিভাগ (Judiciary)। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও শাসকবর্গের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ ঘটলে আইন অনুসারে বিচার করে এবং অপরাধীর দণ্ড বিধান করে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের এ তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে কাজ করবে। প্রত্যেক বিভাগ স্বীয় এলাকাভুক্ত কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। একে অপরের কর্মে হস্তক্ষেপ করবে না এবং অন্যের কর্মপরিধিতে প্রবেশ করবে না। এই হলো ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির উৎপত্তি
Origin of the Theory of Separation of Powers

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অতি সুপ্রাচীন। বস্তুত তা খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে গ্রীক পণ্ডিতগণের দ্বারা আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছিল। এরিস্টটল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন; যথা—(১) আলোচনামূলক (Deliberative); (২) শাসন সম্পর্কীয় (Magisterial), এবং (৩) বিচার বিষয়ক (Judicial)। আইন প্রণয়ন, যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি স্থাপন এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান আনয়ন ছিল আলোচনামূলক বিভাগের কাজ। শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হতো শাসন বিভাগের দ্বারা এবং অপরাধীর দণ্ড বিধান, সুনাগরিককে পুরস্কার দান ও অন্যান্য বিবাদ মীমাংসার ভার ছিল বিচার বিভাগের উপর। এরিস্টটলের মতে, শাসন ব্যবস্থার এ তিন বিভাগ একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে শাসন কার্যের নিপুণতা হ্রাস পেতে বাধ্য। তাই তিনি ক্ষমতা বণ্টনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু এথেন্সে এই স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ সম্ভব হয় নি। সেখানে ইক্লেসিয়া (Ecclesia) একদিকে যেমন আইন প্রণয়ন করত, অন্যদিকে তেমনি শাসন বিভাগীয় কার্যও সম্পাদন করত। বিচার বিভাগের কাজও তা পরিচালনা করত। রোমের দুই জন খ্যাতনামা লেখক পলিবিয়াস (Polybius) ও সিসেরো (Cicero) রোমান শাসন ব্যবস্থায় তিনটি বিভাগের উল্লেখ করেন এবং বিভাগীয় কর্মে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য ক্ষমতা বণ্টনের ইঙ্গিত দান করেন। অবশ্য রোমের শাসন ব্যবস্থায় এ নীতি কার্যকর হয় নি।

মধ্যযুগেও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। পাদুয়ার চিন্তাবিদ মারসিলিও (Marsilio) শাসন বিভাগ এবং আইন পরিষদের পার্থক্য প্রদর্শন করে ক্ষমতার বিভাজনকে বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বোঁদা (Bodin) ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রথম আধুনিক প্রবক্তা। তাঁর মতে, যদি আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তা হলে তিনি বা তাঁরা নিষ্ঠুর আইন তৈরী করে নির্দয়ভাবে তা প্রয়োগ করতে পারেন। তাই তিনি বলেন, "একই সাথে বিচারক হওয়া এবং আইন প্রণেতা হওয়ার অর্থ ন্যায়বিচারের সাথে ক্ষমতার অধিকার এবং আইনের প্রতি আনুগত্যের সাথে স্বেচ্ছাচারিতার সংমিশ্রণ ঘটানো" ("To be at once a legislator and a judge is to mingle together justice and the prerogative of mercy, adherence to law and arbitrary departure from it.")। তা জনস্বার্থের জন্য ভয়ঙ্কর। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের রক্তহীন বিপ্লবের পর জন লক (Locke) 'ক্ষমতাকে আইন, শাসন ও কূটনীতি সম্বন্ধীয়—এ তিন ভাগে বিভক্ত করে তাদের বিভিন্ন হাতে বণ্টন করার জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন' ("The powers of government naturally divided themselves into those which were legislative in character, those which were executive and those which were federative, that is, diplomatic")। তাঁর মতে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজা ও পার্লামেন্টের হাতে থাকা উচিত এবং অপর দু বিভাগের ক্ষমতা রাজা ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, একই ব্যক্তি যদি আইন রচনা করেন এবং তা প্রয়োগ করেন, তা হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ও নাগরিকগণের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

কিন্তু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন মহাপণ্ডিত মন্তেস্কু (Montesquieu)। তাঁর প্রসিদ্ধ 'Spirit of Laws'-গ্রন্থে তাঁর মতবাদের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয় পৃথিবীর সর্বত্র। তিনি উক্ত গ্রন্থে বলেন, "যখন একই ব্যক্তি বা একই শাসকবর্গের হাতে আইন রচনা করার ও শাসন করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়, তখন স্বাধীনতা থাকতে পারে না, অথবা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা যদি বিচার বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র না হয়, তা হলে স্বাধীনতা থাকতে পারে না" ("When legislative and executive powers are united in the same person or in the same governing body there can be no freedom. Nor is there freedom where the power to adjudicate is not separated from legislative power and the executive power")। তা হলে স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণের কবলে পড়ে ব্যক্তিজীবন ছটফট করতে থাকবে। শাসন ক্ষমতার সাথে বিচার ক্ষমতা যুক্ত হলে ন্যায় বিচারের নামে প্রহসন হতে পারে এবং শাসকদের খেয়াল চরিতার্থ করার সুযোগ ঘটে। সুতরাং এ তিন প্রকার ক্ষমতা অবশ্যই পৃথক হতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা এমনভাবে ব্যবহৃত হতে হবে, যেন একটি অপরটির ভারসাম্য রক্ষা করে ("The three powers then must be separated, exercised by different individuals in such a way as to act as checks and balances against one another.")।

ইংল্যাণ্ডের সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্লাকস্টোন (Balckstone) তাঁর '*Commentaries on the Laws of England*' গ্রন্থে মন্তেস্কুর মত গ্রহণ করেন এবং এ মতবাদকে আরও জোরদার করেন। তিনি এই গ্রন্থে বলেন, "যেখানেই আইন তৈয়ারি করার ক্ষমতা এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত থাকে, সেখানে জনসাধারণের অধিকার থাকতে পারে না"। তিনি আরও বলেন, "বিচার করার ক্ষমতার সাথে আইন তৈয়ার করার ক্ষমতা যুক্ত হলে স্বেচ্ছাচারী বিচারকদের হাতে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি বিনষ্ট হতে পারে।"

এই নীতির প্রভাব : ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রভাব গণতন্ত্রায়নের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ও ফরাসী বিপ্লবের সময় এ মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এ নীতিকে অনেকাংশে মেনে নেয়া হয়। ম্যাডিসনের মতে, "আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার একত্র সমাবেশ এক ব্যক্তি বা কতিপয় বা বহুজনের হাতে হোক না কেন এবং তাঁরা বা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই হোন বা স্বনির্বাচিত হোন বা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন না কেন, তা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর" ("The accumulation of all powers, legislative, executive and judicial in the same body whether of one, a few or many and whether hereditary, self-appointed or elective may justly be pronounced as the very definition of tyranny.")।

ভার্জিনিয়া ও উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের সংবিধানে এটি উল্লিখিত হয় যে, আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার করার ক্ষমতা সব সময়ই পৃথক ও স্বতন্ত্র থাকা দরকার। বিপ্লবোত্তর ফরাসী দেশের প্রথম সংবিধানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানবীয় অধিকার ঘোষণায় বলা হয়, যেখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি গৃহীত না হয়, সেখানে কোন সংবিধানই থাকতে পারে না। আমেরিকায় ও ফ্রান্সে মন্ত্রিদের আইনসভায় কোন অংশ গ্রহণের অধিকার দেয়া হয় নি। ফ্রান্সে বিচারকগণকে নির্বাচনের দ্বারা নিযুক্ত করার নীতি স্বীকার করা হয়। তারপর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তা প্রয়োগ হতে থাকে।

বর্তমানকালে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির ব্যাপক ও পূর্ণ প্রয়োগ কোথাও না থাকলেও সর্বত্র তার আংশিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এবং বিশেষ করে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ ও স্বাধীনতা দান আধুনিককালের প্রত্যেক সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ নীতির প্রভাব ইউরোপ ও আমেরিকায় অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বহু রাষ্ট্র একে বিশ্বাসের মূল সূত্র ("article of faith") হিসেবে গ্রহণ করে।

সমালোচনা
Criticisms

(১) পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয় : নীতিগতভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি অনেকটা অভ্রান্ত, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগকে কতটুকু স্বাতন্ত্র্য দান করা উচিত এবং বাস্তবক্ষেত্রে কতটুকু সম্ভব তা নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে, ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকার এক অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য সত্তা এবং তাকে টুকরা টুকরা করে পৃথক করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে জীবদেহের সাথে তুলনা করা হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করলে যেমন জীবদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি সরকারের প্রত্যেক কার্যক্রম ও বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করলে এর তৎপরতা, নিপুণতা ও স্বাভাবিক কর্ম প্রচেষ্টার মৃত্যু ঘটে। ব্লুণ্টস্‌লি একটি উপমা সহযোগে বলেছেন, দেহ থেকে মস্তক, হাত, পা, সমান ও স্বতন্ত্র করার উদ্দেশ্যে যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে যেমন মানুষের প্রাণহানি না ঘটে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসমূহকে পৃথক করতে গেলে রাষ্ট্রীয় প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

(২) শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করে : ক্ষমতা পৃথকীকরণে শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিল (Mill) তাঁর *Representative Government* নামক গ্রন্থে বলেন যে,

সরকারের প্রত্যেক বিভাগ যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয়, তা হলে একে অপরের কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এবং কালে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ তা হলে প্রত্যেক বিভাগ নিজের নিজের ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে গিয়ে অপর বিভাগগুলোকে কোনরূপ সাহায্য করবে না। এতে সরকারের কর্মদক্ষতা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

(৩) পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ অবাস্তব ঃ ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি বাস্তবক্ষেত্রে কোথাও প্রবর্তিত হয় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুযায়ী যদিও এর প্রবর্তন হয়েছিল, তথাপি কার্যত তার পূর্ণপ্রয়োগ সম্ভব হয় নি। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, আইন পরিষদ সেখানে শাসন বিভাগীয় অনেক কর্ম সম্পাদন করে। আমেরিকায় প্রেসিডেন্টের মনোনয়নসমূহ সেখানকার সিনেট (Senate) অনুমোদন করে। আইন পরিষদ অনেক সময়ই বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পন্ন করে; যেমন—রাষ্ট্রপ্রধান আইন পরিষদ কর্তৃক অপসারিত (impeached) হন। বিচার বিভাগ ন্যায়নীতির ভিত্তিতে অনেক সময় আইন প্রণয়নও করেন। এমন কী আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও বিচারকগণ নতুন নতুন আইনের সৃষ্টি করেন।আমেরিকায় যদিও প্রেসিডেন্ট সরাসরিভাবে আইন রচনায় অংশ গ্রহণ করেন না—তথাপি আইন পরিষদকে প্রভাবিত করে অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন রচনায় তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিবর্তে ক্ষমতার একত্রীকরণ বা সহযোগিতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিকতর কার্যকর। বর্তমান রাজনৈতিক দলের সংগঠন যেভাবে হয়েছে, তার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে সংযোগ স্থাপন করা হয়।

(৪) স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অস্বাভাবিক ঃ ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনেকটা অস্বাভাবিক। এ নীতি মানতে হলে প্রত্যেক বিভাগকে একই পর্যায়ে ফেলতে হয়, কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। তা সর্বত্র কিছু না কিছু শাসন বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে, বিচার বিভাগ তাই কার্যে রূপদান করে। সুতরাং আইন বিভাগকে বিচার বিভাগের সাথে একই পংক্তিতে ফেলা যায় না। শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকেও সমপর্যায়ে ফেলা সঙ্গত নয়।

(৫) এ নীতি শাসন ব্যবস্থার মান অবনত করে ঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে স্বতন্ত্র ও একে অপরের নিকট থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করলে শাসনকার্যের মান অনেকাংশে অবনত হতে বাধ্য। উত্তম আইন প্রণীত না হলে উত্তম শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু জনগণের পক্ষে কোনো আইন সর্বাপেক্ষা উপযোগী তা নির্ধারিত হয় শাসন বিভাগের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। শাসন বিভাগ যদি তেমন উত্তম আইন প্রণয়নের জন্য আইন পরিষদকে কোন ইঙ্গিত দিতে সমর্থ না হয়, তা হলে তাদের পক্ষে শাসন কার্য চালানো বড় কঠিন হয়ে উঠে। অধ্যাপক ফাইনার (Finer) তাই বলেছেন, "ক্ষমতাত্রয়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করলে সরকার কখনও মূর্ছা যাবে, কখনও কখনও ধনুষ্টংকার রোগীর মত হাত-পা ছুঁড়তে থাকবে, আবার কখনও অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে"। সুতরাং ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি সরকার পরিচলনার জন্য সুস্থ নীতি নয়।

(৬) দায়িত্বশীলতা বিনাশ করে ঃ অধ্যাপক লাস্কির মতে এ তিন বিভাগ যদি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে থাকে তা হলে প্রত্যেক বিভাগেরই দায়িত্বশীলতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে। বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা পরস্পরের মধ্যে সংঘাত আনবে। সহযোগিতা বিনষ্ট করবে। ফলে শাসনকার্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে।

তাছাড়া, এ নীতির বিরুদ্ধে মৌলিক আপত্তি হলো এই যে, ক্ষমতা পৃথক করলেই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাবে এমন কোন কথা নেই। ব্যক্তি অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন নাগরিকগণের সতর্ক দৃষ্টি,

সচেতনতা ও তীক্ষ্ণ জনমত। যান্ত্রিক কোন পদ্ধতি প্রবর্তনে তা সংরক্ষিত হবে এমন ভাবা ঠিক নয়। এমন কি স্বতন্ত্র বিভাগসমূহের দ্বারাও অন্যায় সংঘটিত হতে পারে, যদি আইন পরিষদ কোন পীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করে; কারণ আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে কাজ করতে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ বাধ্য।

সুতরাং বর্তমানকালে চিন্তাবিদগণ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতিতে বিশ্বাসী নন। অবশ্য তাঁরা এও চান না যে, সকল বিভাগের ক্ষমতা এক কেন্দ্রে সংন্যস্ত হোক। তবে বর্তমানে যা প্রয়োজন, তা হলো কর্মের বিভক্তিকরণ (separation of functions), বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ নয়। শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদকে সহযোগিতার সম্বন্ধ বজায় রেখেই কাজ করতে হবে। তবে বিচার বিভাগ অন্য দু বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ

(ক) যুক্তরাজ্যে ঃ যদিও মর্তেস্কু যুক্তরাজ্যের সংবিধানের উপর গবেষণা কার্য চালিয়ে ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তথাপি মনে হয় বাস্তবে বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় যতটুকু বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তা অপেক্ষা অধিক সহযোগিতাই বিদ্যমান। তবে এটি সত্য যে, এখানে শাসন ব্যবস্থায় শাসকবর্গ স্বতন্ত্র না থাকলেও বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য বেশি পরিমাণেই রয়েছে। সরকারের তিনটি বিভাগ পৃথকভাবে কার্য পরিচালনা করে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই আইন পরিষদ বা পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত। কেবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ শাসন বিভাগ পরিচালনা করে। যদিও বিচারকগণ শাসকবর্গের দ্বারাই নিযুক্ত হন, তথাপি তাঁদের অপসারণ বা মাহিনা নির্ধারণ প্রভৃতি শাসকবর্গের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়।

এও সত্য যে, বৃটেনের সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পূর্ণরূপে পৃথক নয় এবং স্বতন্ত্রও নয়। শাসন বিভাগ আইন পরিষদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং আইন পরিষদ থেকে উৎপন্ন। আইন পরিষদের নিকট কার্যাবলি ও নীতির জন্য শাসন বিভাগ দায়ী। মন্ত্রিপরিষদ আইন সভায় আইনের প্রস্তাব পাস করার জন্য চেষ্টা করে এবং পার্লামেণ্টের কার্যবিবরণীর গতি নির্ধারণ করে। মন্ত্রিপরিষদের প্রস্তাব কদাচিত পার্লামেণ্ট কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেণ্টকে ভেঙ্গেও দিতে পারে। অন্যদিকে পার্লামেণ্টও মন্ত্রিপরিষদকে ভেঙ্গে দিতে পারে মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে বা নিন্দাসূচক প্রস্তাব জ্ঞাপন করে। মন্ত্রিপরিষদের আচরণ ও কার্যাবলিও আইন পরিষদ আলোচনা করতে পারে। শুধু তাই নয়, যদিও বিচারকগণ আইন পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত নন, তথাপি উভয় কক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে আইন পরিষদ তাদের বরখাস্তও করতে পারে। বৃটেনের আইন পরিষদের উচ্চ কক্ষ লর্ড সভা (House of Lords) সেখানে বিচার বিভাগের শিরোমণি এবং সর্বোচ্চ আদালত। আবার বিচার বিভাগের প্রধান লর্ড চ্যান্সেলর (Lord Chancellor) মন্ত্রিপরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য। সুতরাং চতুর্দিক থেকে বৃটেনের শাসন বিভাগ অন্যান্য বিভাগের সাথে জড়িত রয়েছে। সেখানকার মন্ত্রিপরিষদ যেন বিলাতী আবহাওয়ায় আইভি লতা, পাকে পাকে শাসন বিভাগ, আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগকে ঘিরে রয়েছে। কার সাধ্য তার গ্রন্থি ছাড়ায়? তাই উইলিয়াম হোল্ডসওয়ার্থ (William Holdsworth) বলেছেন ঃ 'বৃটেনের শাসন ব্যবস্থার সাথে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি কোনদিনই সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে নি" ("Has never to any great extent corresponded with the facts of English Government.")।

(খ) আমেরিকায় ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে পৃথকীকরণ নীতির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সুপ্রীম কোর্ট বহুক্ষেত্রে বলেছেন যে, ঐ নীতি শাসনব্যবস্থার এক মৌলিক উপাদান। এই নীতির ভিত্তিতে

প্রেসিডেন্টকে শাসন বিভাগের প্রধান করা হয়েছে। তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য বা তিনি আইন পরিষদ বা কংগ্রেসে আসন গ্রহণ করেন না বা কংগ্রেসের কার্যবিবরণী নির্ধারণে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কোন সদস্য বা প্রেসিডেন্টকে সাধারণভাবে অপসারিত করতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেসের অধীন নন। কিন্তু অন্যদিকে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে কোন বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়ন করতে প্রভাবিত করতে পারেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে অথবা সাময়িকভাবে কংগ্রেসের আইনকে নাকচ করে বা স্থগিত রেখে। আবার কংগ্রেসের দ্বিতীয় কক্ষ সিনেট (Senate) শাসন বিভাগের উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সন্ধি ও উচ্চ কর্মচারিদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে অনুমোদন ও সমর্থন দানের মাধ্যমে। কংগ্রেস আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শাসন বিভাগের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কিন্তু তথাপি প্রেসিডেন্ট বিচারকদের নিযুক্ত করেন এবং দণ্ড হ্রাসের সর্বশেষ ক্ষমতায় তিনি ক্ষমতাবান। সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষার্থে সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেসের কোন কোন আইনকে বিধি বহির্ভূত (ultra vires) বলে ঘোষণা করতে পারেন। তাছাড়া, আমেরিকায় পৃথকীকরণ নীতি বর্তমানে অনেকটা কেতাবী নীতিতে পরিণত হয়েছে, কেননা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলের সংগঠন আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় এক প্রকার মিলনের সূত্র হয়ে পড়েছে এবং সকল বিভাগকে তা এক মিলনের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

(গ) বাংলাদেশ ঃ বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তিত হবার ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিপালিত হয় নি, কেননা মন্ত্রিরা আইন পরিষদের সদস্য। শাসন বিভাগ এখানে আইন পরিষদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলি আইন পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, যদিও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং আইন পরিষদ বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৯৭৫ সালে প্রণীত চতুর্থ সংশোধনী আইনের ফলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়েছিল। অনেক ঘটনা প্রবাহের পর ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৭৮ সালের ৩রা জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

এরশাদ সরকারের পতনের পরে বিশেষ করে দ্বাদশ সংশোধন আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবারো মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে বাংলাদেশে এখন ক্ষমতার সম্মিলনের পর্ব শুরু হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে নির্বাহী কর্তৃত্ব। মন্ত্রিপরিষদ কিন্তু জাতীয় সংসদ থেকেই জন্ম লাভ করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেত্রী। দেশে আইনগত ভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রয়েছে। বিচার বিভাগের শীর্ষ পর্যায় অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীনও বটে। কিন্তু বিচারপতিগণ প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতি অবশ্য রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় নিয়োগ প্রাপ্ত। বিচার বিভাগের নিম্ন পর্যায়ে বিচারক ও অন্যান্য কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীনে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় এক ধরনের সম্মিলন।

২০০৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে বিচারবিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবার পরে প্রশাসনিক কাজের জন্যে নিয়োগপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ কিছু কিছু বিচার কাজ করার যে ক্ষমতা ছিল তা রহিত

হয়েছে বটে, কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ে ক্ষমতার সম্মিলন এখনো বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দান করেন। অন্যদিকে সংবিধান সম্পর্কিত বিষয়ে কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।

তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশে সরকারের তিনটি বিভাগ স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বিভাগীয় কার্যক্রম। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে যেভাবে প্রত্যেকটি বিভাগ পৃথকভাবে সংগঠিত হয় ঠিক সেইরূপ না হলেও বাংলাদেশেও রয়েছে বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য। তবে প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে এক ধরনের ঐক্যসূত্র।

প্রশ্নাবলি

১। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি বর্ণনা কর এবং এর যথার্থতা বিচার কর। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষায় এই নীতিকে একমাত্র রক্ষাকবচ? (State and examine the theory of separation of powers. Is it the only device for the safeguard of liberty of the citizens?)

২। 'ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ উচিত নয়, সম্ভব নয়'—এ উক্তির বিচার কর। ('Complete separation of powers is neither desirable nor practicable'. Examine the statement.)

৩। 'পূর্ণরূপে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি ও ভারসাম্য নীতি ভাল শাসন ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক'—ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও। ("In an extreme form both the doctrines of separation of powers and of checks and balances are dangerous to good government.'—Explain and illustrate.)

৪। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি আমেরিকার ও বৃটেনের শাসন ব্যবস্থায় কতটুকু কার্যকরী হয়েছে বর্ণনা কর। (State to what extent the theory of separation of powers does exist in the constitutions of the U. S. A. and the United Kingdom.)

৫। বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রভাব বর্ণনা কর। (State the impact of the theory of separation of powers over the different governments.)

৬। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা কর। (Critically discuss the theory of separation of powers.)

৭। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আলোচনা কর। এ নীতি কী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিমূল? (Critically discuss the theory of separation of powers. Does it form the basis of the Constitution of Bangladesh?)

৮। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বুঝ? আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় কিভাবে ভারসাম্য নীতি কার্যকর হয়েছে? (What is meant by the theory of separation of powers? How does the system of checks and balances operate in the American Government?)

৯। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বুঝ? বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ আলোচনা কর। (What is the theory of separation of powers? Discuss its application in Britain and the USA.) [N. U. 1997]

আইন পরিষদ

LEGISLATURE

৩৮

আইন পরিষদের সংজ্ঞা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন শহরের কেন্দ্রস্থলে পানিকেন্দ্র (reservoir) স্থাপন করে শহরের আনাচে-কানাচে পানি সরবরাহ করা হয়, তেমনি আইন পরিষদ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বত্র শক্তি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেয় এবং জাতীয় জীবনকে উজ্জীবিত করে তোলে। অতীতে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে আইন পরিষদের স্থান ছিল গৌণ এবং রাজতন্ত্রে তা ছিল বৈঠকি আসর সাজাবার উপকরণ মাত্র। কিন্তু জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ার পর থেকেই এর সুদিন ফিরেছে। বর্তমানে আইন পরিষদের কপালে রাজটীকা। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ঘটিত হবার ফলে আইন পরিষদকে জনমতের সংস্থাও বলা হয়।

আইন পরিষদের কার্যাবলি
Functions of the Legislature

আইন পরিষদের কার্যাবলি বহুমুখী। আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে সরকার নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত আইন পরিষদের কার্যক্রম বিস্তৃত।

(১) আইন প্রণয়ন ঃ আইন পরিষদের প্রধানতম কার্য আইন প্রণয়ন করা। আইনের প্রস্তাব আইন পরিষদে পেশ করা হয়। পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হলে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি লাভ করে তা আইনে পরিণত হয়। নতুন আইন প্রণয়ন ছাড়া পুরাতন আইনের পরিবর্তন সাধন করে আইন পরিষদ। তবে আজকাল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ জীবন এত জটিল হয়ে উঠেছে যে, সমাজ উপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হলে বিশেষ রকম শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের এরূপ যোগ্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। তাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বলেন, "প্রতিনিধিত্বমূলক সভার কাজ আজকাল যতটা আইন তৈয়ারির উদ্যোগ গ্রহণ, জনমতকে শিক্ষিত করা, প্রচার এবং পরস্পর বিরোধী মত ও স্বার্থের সমন্বয় বিধান করা তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

(২) সাংবিধানিক আইনের প্রবর্তন ও পরিবর্তন ঃ সাংবিধানিক আইনের প্রবর্তন ও পরিবর্তন করাও অনেক রাষ্ট্রে আইন পরিষদের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে। পাকিস্তানে আইন পরিষদ সংবিধান রচনার ভার গ্রহণ করেছিল এবং গণপরিষদ (Constituent Assembly) হিসেবে কাজ করে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাসনতন্ত্র রচনা করেছিল। বৃটেনে পার্লামেন্ট যে কোন ধরনের আইনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও কংগ্রেস বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধানের পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করতে পারে। ভারতে সাংবিধানিক পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে আইন পরিষদের এখতিয়ারে। বাংলাদেশেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ গণপরিষদ রূপে সংবিধান রচনা করেছে।

(৩) জাতির মুখপাত্র ও আলোচনা কেন্দ্র ঃ আইন পরিষদে শুধু আইন সংক্রান্ত বিষয় বা সাংবিধানিক ব্যাপারসমূহ আলোচিত হয়, তাই নয়, রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এখানে। ঐ সব আলোচনা থেকে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। যদি আইন পরিষদ প্রতিনিধিত্বমূলক হয়, তা হলে এর আলোচনা থেকে ঘটনার গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে তাও বুঝা যায়। তাই আইন পরিষদকে জাতির মুখপাত্র ও ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্র (National Forum) বলা হয়। এই সমস্ত আলোচনা বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে রাষ্ট্রের সর্বত্র রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। জনপ্রতিনিধিগণকেও সঠিক পন্থা সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। তাই আইন পরিষদকে দেশের "রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ও নেতৃত্বের আসর" বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

(৪) আয়-ব্যয় নির্ধারণ ঃ সরকারের আয়–ব্যয়ের উপর আইন পরিষদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। আইন পরিষদের অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন কর আদায় করতে ও ব্যয় করতে পারে না। কী উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হবে, তার প্রস্তাবও উপস্থাপন করা হয় আইন পরিষদে। কোন বিষয়ে কত খরচ হবে তার একটা হিসাব আইন পরিষদে পেশ করতে হয়। আয়-ব্যয়ের এই হিসাবে পরিষদ সদস্যগণের অধিকাংশ সমর্থন করলে তা কার্যকর হয়। আইন পরিষদ যে যে বিষয়ে খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে, সে সে বিষয়ে অর্থ ব্যয়িত হলো কিনা, তাও দেখা আইন পরিষদের কাজ। তাই আইন পরিষদকে জাতীয় অর্থের "অভিভাবক ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ভাণ্ডারের পরিচালক বলা হয়।"

(৫) সরকারি নীতি নির্ধারণ ঃ আইন পরিষদ বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে ও সরকারি নীতি নির্ধারণ করে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে (cabinet form of government) শাসন বিভাগের তথা মন্ত্রিপরিষদের উপর আইন পরিষদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের উপর আইন সভা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে ও তাদের নীতি ও কার্যাবলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আইন সভার আস্থার উপর মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল নির্ভর করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যদিও আইন পরিষদের নিকট শাসন বিভাগ দায়ী নয়, তথাপি কংগ্রেস, বিশেষ করে সিনেট (Senate), প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগগুলো অনুমোদন করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে নীতি নির্ধারণের সময়ও সিনেটের সমর্থন নিয়ে থাকেন।

(৬) বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ঃ আইন সভা কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কার্যও করে থাকে। ইংল্যাণ্ডের লর্ড সভা আপীল সম্পর্কীয় মামলার জন্য উচ্চতম আদালত। আমেরিকার সিনেট প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গুরুতর অভিযোগের বিচার করার অধিকারী। তাদের অপসারণ করা (impeachment) সর্বত্র আইন পরিষদের এখতিয়ারে। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ প্রেসিডেন্টকে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে অপসারণ করতে পারত। বাংলাদেশ সংবিধানেও এই ব্যবস্থা আছে।

(৭) নির্বাচনমূলক কার্যক্রম ঃ অধিকাংশ আইন সভার কিছু কিছু নির্বাচনমূলক কার্য করতে হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সম্মিলিত বৈঠকে। সুইটজ্যারল্যাণ্ডের আইন সভার উভয় কক্ষ সম্মিলিতভাবে শাসন পরিষদ নির্বাচন করে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনেও জাতীয় সংসদের সদস্যগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন।

(৮) তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান ঃ তাছাড়া আইন পরিষদ জাতীয় জীবনের কোন কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান করার জন্য কখনও কখনও কমিশন গঠন করে। শিক্ষা, শাসন,

কৃষি প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে জনমত অনুভব করে আইন পরিষদ শাসন বিভাগকে কার্যনীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়।

আইন পরিষদের গুরুত্ব

Importance of the Legislature

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের গুরুত্ব অত্যধিক। অতীতে আইন পরিষদের স্থান ছিল গৌণ, কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের কপালে রাজটীকা। অধ্যাপক গার্নারের (Garner) কথায়, "সরকারের সকল শাখার মধ্যে আইন পরিষদের স্থান সর্বোচ্চ" ("Of all the organs of government, the legislature occupies the paramount place")। এর কারণ অনেক। **প্রথম,** আইন পরিষদ গণপ্রতিনিধি সহযোগে গঠিত। ফলে এই বিভাগ গণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। **দ্বিতীয়,** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে আইন পরিষদের গুরুত্ব অত্যধিক, কেননা মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের সদস্য এবং আইন পরিষদের নিকট দায়ী। **তৃতীয়,** অন্যান্য সরকারেও আইন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কেননা গণপ্রতিনিধির ইচ্ছার প্রতি উদাসীন থেকে কোন সরকার কাজ করতে সক্ষম নয়। **চতুর্থ,** যে কোন স্বৈরতান্ত্রিক বা সামরিক সরকারেও আইন পরিষদের ভূমিকা উজ্জ্বল, কেননা ক্ষমতা বৈধ করার জন্য যে কোন একনায়ক বা সামরিক কর্মকর্তা আইন পরিষদের সৃষ্টি করেন। **পঞ্চম,** আইন পরিষদে জাতীয় আয়-ব্যয়ের বিষয় অনুমোদিত হয়। এই সকল কারণে অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট (Gilchrist) বলেন, "সরকারি ব্যবস্থায় আইন পরিষদই সূচনা। বিচার বিভাগ তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন এবং শাসন বিভাগ উভয়ের ফলাফল।"

আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস ঃ

বর্তমানে আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস এক উল্লেখযোগ্য প্রবণতা। আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কিন্তু শাসন বিভাগের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা এবং সামরিক শাসনের ফলে শাসন বিভাগের প্রভাব বেড়েছে। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও এমন সব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যার ফলে আইন বিভাগ তার প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয় নি। বৃটেনে "মন্ত্রিপরিষদের একনায়কত্বের" অভিযোগ শোনা যায়; যুক্তরাষ্ট্রেও "শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি" এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিচে বর্ণিত কারণগুলো এ জন্য দায়ী।

১। নির্বাচন ব্যয়বহুল হয়েছে ঃ নির্বাচন ব্যয়বহুল হবার ফলে ব্যক্তির পরিবর্তে দলের প্রভাব বেড়েছে, কেননা দলই ব্যয় করে, প্রচার করে, প্রার্থী নির্বাচন করে, এমন কী নির্বাচন পরিচালনা করে। ফলে দলের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দলীয় নেতৃত্বের নিকট ব্যক্তি-প্রতিনিধি গৌণ হয়ে উঠেছেন এবং দলীয় নেতৃবৃন্দই মন্ত্রী হিসেবে আইন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

২। দলীয় শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ দলীয় শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু দলের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় আইন পরিষদের নেতৃত্ব চলে গেছে দলের নেতাদের হাতে। আইন পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

৩। আইনের জটিলতা ও ব্যাপকতা ঃ বর্তমানকালে আইনের জটিলতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আইন পরিষদ তা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই প্রত্যর্পিত আইনের মাধ্যমে আইন বিভাগের অনেক কাজ শাসন বিভাগের হাতে চলে গেছে।

৪। সরকারের কার্যক্রমের ব্যাপক বৃদ্ধি ঃ এখন সরকারের কার্যক্রম প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শাসন বিভাগের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে আরো বেশী। দায়িত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে শাসন বিভাগের প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকগুণ বর্তমানকালের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কাঠামোয়।

৫। অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকট ঃ বর্তমানে অর্থনৈতিক সমস্যা জটিল হওয়ায় শাসন বিভাগকে উত্তরোত্তর অধিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং আইন বিভাগের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। তথাপি বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের ভূমিকা এখনও অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

আইন পরিষদের সংগঠন
Organization of Legislature

আইন পরিষদ দুভাবে সংগঠিত হতে পারে। জনপ্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত হয়ে এক-কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে অথবা দু-কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে। দুটির মধ্যে একটি সাধারণত জনপ্রতিনিধি দ্বারা এবং অন্যটি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধি দ্বারা অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষকে উচ্চ কক্ষও বলা হয়। ঐতিহাসিক কারণে ইংল্যাণ্ডে লর্ডদের প্রবল প্রভাব ছিল। রাজার সাথে তাঁরা মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।তাই তাঁদের কক্ষকে লর্ড সভা বলা হয়। বর্তমানে উচ্চ কক্ষ না বলে দ্বিতীয় কক্ষ বলাই ভাল, কারণ একটি অপরটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার নয়। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ সাধারণত অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন অথবা মনোনীত হন অথবা নির্বাচন ও মনোনয়নের দ্বারা সমষ্টিগতভাবে দ্বিতীয় কক্ষ গঠিত হয়। প্রথম কক্ষের সদস্যগণ সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

কোন পরিষদ কক্ষের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি হওয়া উচিত নয়, আবার অত্যন্ত নগণ্য হওয়াও ঠিক নয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে, কোন কক্ষের সদস্য সংখ্যা পাঁচ শতের বেশি হওয়া উচিত নয়। কেননা বেশি লোকের মধ্যে কোন বিষয় ধীরতা ও ধৈর্যের সাথে বিচার-বিবেচনা করা অত্যন্ত শক্ত হয়ে ওঠে। আবার সংখ্যা অল্প হলে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। এটা উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আইন পরিষদগুলোতে চার শত থেকে পাঁচ শতের মধ্যে সদস্য সংখ্যা রয়েছেন। প্রথম কক্ষে রাশিয়ার ৭৫০ জন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩৫ জন, বৃটেনে ৬৩০ জন, পশ্চিম জার্মানীতে ৪৫০ জন, ইতালিতে ৫৬০ জন, এবং ভারতে ৫৪৩ জন সদস্য রয়েছেন।

আইন পরিষদগুলোর দ্বিতীয় কক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশি সদস্য সংখ্যা রয়েছে বৃটেনের লর্ড সভায়। লর্ড সভা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আইন পরিষদ। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০০০ জন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করার ফলে তার দ্বিতীয় কক্ষ অঙ্গরাজ্যগুলোর সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। ৫০টি অঙ্গরাজ্যে ১০০ জন সদস্য সমন্বয়ে সিনেট গঠিত হয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় কক্ষ ৪৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক পূর্ণ ক্যাণ্টন দুই জন করে এবং অর্ধ ক্যাণ্টন একজন সদস্য পাঠিয়ে দ্বিতীয় কক্ষ সংগঠিত করেছে।

দ্বি-কক্ষের পরিষদ (Bi-cameralism) ঃ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব ও সমাজ বিবর্তনের ফলে বৃটেনে দ্বি-কক্ষের আইন পরিষদ জন্মলাভ করে। উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকবৃন্দ ও বংশানুক্রমিক অভিজাত শ্রেণী—যেমন, ব্যারন, ভাইকাউণ্ট, আর্ল প্রভৃতি একত্রে মিলিত হয়ে লর্ডসভা গঠিত করে। শহরের প্রতিনিধিগণ ও গ্রামের প্রতিনিধিগণ একত্রে বসতে রাজি হয়ে সাধারণ কক্ষ বা কমন্স সভা গঠন করেছিলেন। সুতরাং সমাজের শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় কক্ষ প্রথমে জন্মলাভ করে। ক্রমওয়েল ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হয়ে দ্বিতীয় কক্ষের বিলোপ সাধন করেন। কিন্তু রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দ্বিতীয় কক্ষ পুনরায় প্রবর্তিত হয়। ইংল্যাণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য রাষ্ট্রেও এর প্রচলন শুরু হয়েছিল। অনেক রাষ্ট্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ জয়যুক্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় এবং আরও কয়েকবার ফ্রান্সে একটি কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নেপোলিয়ন চারটি কক্ষের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কোন বন্দোবস্ত সুবিধামত না হওয়ায় সেখানে সর্বশেষে দুটি কক্ষের ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তেরটি রাষ্ট্র সমন্বয়ে যখন আমেরিকায় রাষ্ট্র সমবায় গঠিত হয়, তখন ইংল্যাণ্ডের সাথে পার্থক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে একটি মাত্র কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি গৃহীত হলে আবার সেখানে দু কক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দুটি কক্ষের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ওকালতি করেছে। অবশ্য এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদও অনেক উন্নত ও বর্ধিষ্ণু রাষ্ট্রে বর্তমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে কার্যকর হচ্ছে। সুতরাং সংবিধানের ছাত্রদের নিকট প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—এককক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ শ্রেষ্ঠ, না দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ শ্রেষ্ঠ?

দ্বি-কক্ষের পক্ষে যুক্তি
Arguments for Bi-cameralism

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো তুলে ধরা হয়।

(১) স্বৈরাচারী প্রবণতা ঃ বলা হয় যে, একটি মাত্র কক্ষ থাকলে আইন পরিষদ স্বৈরাচারী হবে এবং তার দাপটে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জনস্বার্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কক্ষ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বর্মস্বরূপ। লর্ড ব্রাইস বলেন, "দ্বি-কক্ষের প্রয়োজন এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত হয়েছে যে, আইন পরিষদের অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ ও ঘৃণিত হবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে এবং তা প্রতিরোধ করতে হলে সমান ক্ষমতার আর একটি কক্ষের প্রয়োজন হয়" ("The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly is to become hateful, tyrannical and corrupt and needs to be checked by the existence of another house of equal authority.")।

(২) নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্ধন ও সামঞ্জস্য বিধান ঃ ঐতিহাসিক লেকি (Lecky) বলেন, 'দ্বিতীয় কক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্ধন ও প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারটি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে" ("The necessity of a second chamber to exercise a controlling, modifying and retarding influence has acquired almost the position of an axiom.")। আইন পরিষদে একটি কক্ষ থাকলে তার সদস্যবৃন্দ সাময়িক উত্তেজনার বশে যা' তা' আইন পাস করে বসতে পারেন। সুতরাং দ্বিতীয় কক্ষ আলোচনার জন্য অধিক সময় এবং বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রদান করে আইনের মান উন্নয়নে সাহায্য করবে।

(৩) ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব দান ঃ বলা হয় যে, আইন পরিষদে দ্বিতীয় কক্ষ রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বার্থের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দানে সক্ষম হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ রয়েছে। পরিষদ এক কক্ষ বিশিষ্ট হলে তা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু দুগুই (Duguit) বলেন, আইন পরিষদকে সার্থকরূপে গড়ে তুলতে হলে রাষ্ট্রের জনসমূহের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভাগের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দান করতে হবে এবং তা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট না হলে সম্ভব হয় না।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য ঃ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করলেও যুক্তরাষ্ট্রে তা অবশ্য প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। কেননা যুক্তরাষ্ট্র কতকগুলো ভূতপূর্ব রাষ্ট্র সমন্বয়ে

গঠিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পূর্বে তাদের শর্ত থাকে, জনবল বা ধনবলের চিন্তা না রেখে তারা প্রত্যেকে স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে দ্বিতীয় কক্ষে সমান সংখ্যক সদস্য প্রেরণ করবে; কারণ, দ্বিতীয় কক্ষ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই রয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় এই যুক্তির গুরুত্ব প্রচুর, কারণ দ্বিতীয় কক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলো সমান সংখ্যক সদস্য প্রেরণ করে থাকে।

(৫) শাসন বিভাগের সুবিধা ঃ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ শাসন বিভাগকে অধিকতর স্বাধীনতা দান করে এবং দেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। গেটেল বলেন, "আইন পরিষদের দু কক্ষ একে অপরকে নিয়ন্ত্রিত করে শাসন বিভাগকে অধিকতর সুযোগ দান করে এবং তা পরিণামে আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগ উভয়ের জন্যই শুভ হয়" ("Two houses checking each other give greater freedom to the executive and in the long run secure the best interests of both departments.")।

(৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুষ্ঠুতা ঃ বলা হয় যে, আজকাল আইন সভার কার্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম কক্ষের পক্ষে ধীরে-সুস্থে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই প্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় কক্ষ এ সকল বিষয় আলোচনা করতে পারে এবং ধীরতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(৭) জনমতের প্রতিফলন ঃ এটি উল্লেখযোগ্য যে, আইন পরিষদে দুটি কক্ষের নির্বাচন বিভিন্ন সময়ে হলে তাতে জনমত প্রতিফলিত হয়। জনমত প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হলে জনমতের যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

দ্বি-কক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ
Arguments against Bi-Cameralism

এক কক্ষ-পরিষদের পক্ষে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাই দ্বি-কক্ষ পরিষদের বিরুদ্ধে মতবাদ। কিন্তু দ্বি-কক্ষের পক্ষে যে সকল যুক্তি খাড়া করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ অন্তঃসারশূন্য এবং আবেগপ্রবণ। সে সকলও ভেবে দেখা দরকার।

প্রথম, বলা হয় যে, এক-কক্ষ পরিষদ স্বৈরাচারী হতে পারে। কিন্তু তা ভাবা সমীচীন নয়, কারণ আজকাল আইন পরিষদ গঠিত হয় জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। দ্বিতীয় কক্ষ বরং মনোনীত সদস্য ও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সুতরাং যদি ধরে নেয়া হয় যে, এক-কক্ষ স্বৈরাচারী, তা হলে দ্বিতীয় কক্ষ তা প্রতিরোধ করবে কীভাবে? কারণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে বিজয়ী সদস্যগণই প্রথম কক্ষে আসন গ্রহণ করেন। তাছাড়া, যেখানে মনোনয়ন দেবার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেও ক্ষমতাসীন দলই মনোনয়ন দান করে; ফলে দলগতভাবেই উভয় কক্ষে ভোট দান করা হয়। তাই অনেকেই প্রশ্ন করেন, তা হলে দ্বিতীয় কক্ষের সার্থকতা কোথায়?

দ্বিতীয়, এক কক্ষ উত্তেজনার বশে যা' তা' আইন প্রণয়ন করতে পারে বলে অভিযোগ করা হয়। দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রত্যাখ্যান নাও করে, শুধুমাত্র আলোচনা করে তা হলেও বেশ কছু দিন কেটে যায়। ফলে সাময়িক উত্তেজনা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অধ্যাপক লাস্কি এ অভিযোগের উত্তরে বলেন, আইন তৈরীর যে সকল ধাপ রয়েছে, তা অতিক্রম করতে যথেষ্ট সময় লাগে। সুতরাং উত্তেজনার কোন স্থান নেই এ ক্ষেত্রে। তাছাড়া, আইন পরিষদের বাইরেও বহু চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যারা প্রবন্ধ লিখে প্রস্তাবিত আইনের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দেন। খবরের কাগজগুলোও সজাগ রয়েছে। বরং দ্বিতীয় কক্ষ থাকলে অনেক প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ আইন বিলম্বিত হয়ে জাতীয় শক্তি ও সংহতি হ্রাস করবে।

তৃতীয়, জনমত যাচাই করার জন্য দ্বিতীয়-কক্ষের প্রয়োজন নেই, কেননা মধ্যকালীন নির্বাচনে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

চতুর্থ, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় কক্ষকে অপরিহার্য বলে অনেকে মনে করেন। অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বার্থরক্ষার চাবিকাঠি বলে অনেকেরই নিকট তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উভয় কক্ষে যাঁরা সংসদের কার্যক্রম লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা আর এ জন্য ওকালতি করবেন না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাজনৈতিক দল গঠনের ফলে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোর হাতেই ন্যস্ত হয়েছে। আইন পরিষদে সদস্যগণ দলের নির্দেশ মত ভোট দেন। দ্বিতীয় কক্ষেও দলগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সদস্যদের নিকট নিজেদের নির্বাচনী এলাকার স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থই বড় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ নেহাত নিষ্প্রয়োজনীয়। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বার্থ সংরক্ষিত হয় লিখিত সংবিধানের ব্যবস্থার দ্বারা এবং নিরপেক্ষ বিচারালয়ের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে।

পরিশেষে, হীনবল দ্বিতীয় কক্ষের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। ইতঃপূর্বে ইংল্যাণ্ডে লর্ডসভা কমন্সসভার সমকক্ষ ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার সিনেট ব্যতীত কোন দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের সমতুল্য নয়। অনেক দ্বিতীয় কক্ষের আর্থিক প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করারও ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন কী?

তাছাড়া, এক কক্ষের পক্ষে অনেকগুলো মূল্যবান যুক্তি রয়েছে ঃ

প্রথম, এক কক্ষের পরিষদ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐক্যনীতি অনুসরণ করে। দ্বি-কক্ষের পরিষদে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয়, দ্বি-কক্ষের পরিষদ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। রাষ্ট্রের তহবিল থেকে সদস্যদের বেতন, ভাতা প্রভৃতির জন্য প্রচুর ব্যয় হয়, অথচ সমপরিমাণ উপকার লাভ হয় না।

তৃতীয়, দ্বিতীয় কক্ষ নেহাত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অথবা অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক কারণে প্রস্তাবিত আইনের বিলম্ব ঘটায়। উভয় কক্ষের মধ্যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অচলাবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কোন সঙ্কটকালে এরূপ প্রতিযোগিতার মনোভাব অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে।

চতুর্থ, এও পরীক্ষিত সত্য যে, দ্বিতীয় কক্ষ সাধারণত প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহযোগে গঠিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মনোনয়নের দ্বারা সে স্থান পূর্ণ করা হয় বলে তা অত্যন্ত রক্ষণশীল। উন্নয়নমূলক কর্ম পদ্ধতিকে তারা সাধারণত বাধা দান করেন। অনেক সময় দ্বিতীয় কক্ষ ধনী পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়।

পঞ্চম, অধ্যাপক গেটেলের মতে, দ্বি-কক্ষের পরিষদ এক অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। যতদিন রাষ্ট্রের মধ্যে সামগ্রিকভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হয়েছে, ততদিন দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়, কিন্তু ঐক্য এবং সমতার স্বার্থে তা বিলুপ্ত হওয়া উচিত, কেননা শ্রেণীবিভাগ ও স্বার্থবিভেদের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় কক্ষ দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং এক কক্ষ একতার পরিচায়ক।

ষষ্ঠ, দ্বি-কক্ষের পরিষদ রাজনৈতিক দলের কার্যকারিতা অনেক নষ্ট করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, কক্ষ ভিত্তিক সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি দ্বারা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। অচলাবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনাও জাতীয় জীবনকে অনেক সময় অসুস্থ পরিবেশে নিক্ষেপ করে।

সপ্তম, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, দ্বিতীয় কক্ষের গঠন প্রণালী ও সার্বিক সংগঠন অত্যন্ত জটিল। কোন্ ভিত্তিতে মনোনয়ন দান করা হবে, মনোনয়ন দান করা আদৌ হবে কিনা, প্রবীণ ব্যক্তিদের কীভাবে আকর্ষণ করা সম্ভব, তার ক্ষমতা কীরূপ হবে, প্রথম কক্ষের সাথে তার কীরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে ইত্যাদি বিষয়ের সঠিক ও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি। গণতন্ত্রের সাথে কুলীনতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান বর্তমানকালে অত্যন্ত জটিল।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলতেন, "দ্বি-কক্ষের আইন পরিষদ একটি ঘোড়ার গাড়ির মত যার দুই দিকে দুটি ঘোড়া জুড়ে দেয়া হয়েছে" ("A cart with a pair of horses hitched to each end")। তারই প্রভাবে পেনসিলভেনিয়ার আইন পরিষদকে এক কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়েছিল। ফ্রান্সের পণ্ডিত ল্যামারটাইন বলেন, দ্বি-কক্ষ পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত এক সংস্থা, যা আপনা থেকেই ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যায়। ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (Abbe Siye) একটি 'ডাইলেমা' বা জটিল প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেন দ্বিতীয় কক্ষের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "দ্বিতীয় কক্ষের কী প্রয়োজন? তা যদি প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষের সাথে একমত হয়, তা হলে তা তো নিরর্থক। আর যদি তা প্রথম কক্ষের বিরোধিতা করে, তা হলে তা হবে ক্ষতিকর" ("Of what use will a second chamber be? if it agrees with the representative house it will be superfluous; if it disagrees, mischievous.")।

অবশ্য এ 'ডাইলেমার' উত্তর এরূপে দান করা যায়—দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের সাথে একমত হয়ে বা বিরোধিতা না করেও আইনের মান উন্নয়ন করতে কতকগুলো বিষয় উপস্থাপন করতে পারে।

বেন্থামও বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে আইন পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত। সুতরাং পরিষদে একটি কক্ষই যথেষ্ট। প্রথম কক্ষ জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। যদি দ্বিতীয় কক্ষ বিশেষ কোন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, তা হলে তা "অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক এবং অকাজের চেয়েও খারাপ" ("needless, useless and worse than useless")। অধ্যাপক লাস্কির মতে, এক কক্ষই আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ এবং আজকাল এক কক্ষের প্রতি বিশেষ একরূপ টান পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ

আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন এবং অনেকের, ধারণা দ্বিতীয় কক্ষ যদি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তবে এই নড়বড়ে বিকল অঙ্গের অর্থ কী? তথাপি এ ব্যবস্থা অনেকটা বিশ্বজনীন।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখলে এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। সুসংলগ্ন এলাকা সংবলিত এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে তাই দ্বি-কক্ষীয় আইন পরিষদের কোন গুরুত্ব নেই। তাছাড়াও নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কারণে এখানে এক কক্ষ বিশিষ্ট পরিষদই যথার্থ ব্যবস্থা।

(এক) বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ নেই। ফলে এখানে স্বার্থের সংঘাত তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সে অনুপাতে হ্রাস পেয়েছে।

(দুই) বাংলাদেশ একটি বর্ধিষ্ণু নতুন রাষ্ট্র। এর বহুমুখী উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে যাতে তার উন্নতি ও প্রগতি ব্যাহত না হয়। তাই এক কক্ষের মাধ্যমে আইনের ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই উত্তম।

(তিন) দুই কক্ষের মধ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে শাসন কার্য বিভিন্নভাবে ব্যাহত হবে। পরিষদকে দু কক্ষে বিভক্ত করলে তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দ্বিধাবিভক্ত হবে এবং কালের সংঘাতে তা ধীরগতি হতে পারে।

(চার) উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যয় সঙ্কোচেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তাই দ্বিতীয় কক্ষ প্রতিষ্ঠা করে অহেতুক ব্যয়বাহুল্য ঘটাবার কোন প্রয়োজন নেই।
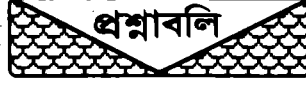
১। আইন পরিষদের গুরুত্ব ও ভূমিকা বর্ণনা কর এবং এর কার্যাবলীর বিবরণ দাও। (Describe the importance and role of legislature and state its functions.)

২। আইন পরিষদের কার্যাবলী কী কী? (What are the functions of the legislature?)

৩। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন ব্যতীত আর কী কী কার্য সম্পন্ন করে? (What functions, besides law making, are performed by the legislature in a modern democratic state?)

৪। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমার মত কী? (What is meant by bicameral system of legislature? Would you advocate bicameral system for Bangladesh?)

৫। পৃথিবীর অধিকাংশ আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষ রয়েছে। এর কারণ কী? (How do you explain the fact that most parliaments of the world have second chamber?)

৬। দ্বি-কক্ষীয় পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। (Examine the arguments for and against bi-cameralism.)

৭। "যদি পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের মতানুযায়ী না হয়, তা হলে তা ক্ষতিকর; আর যদি দুটিই একমত হয় তা হলে নিষ্প্রয়োজনীয়"—আমেরিকা ও বৃটেনের আইন পরিষদের উল্লেখ করে আলোচনা কর। ("If second chamber dissents from the first, it is michievous; if it agrees, it is superflous". Discuss it with special reference to Britain and the U. S. A.)

৮। "বাংলাদেশে দ্বি-কক্ষীয় পরিষদ উপযোগী নয়"—বিচার কর। (Examine the statement that bi-cameral legislature is not suitable to Bangladesh.)

৯। তুমি কী মনে কর বর্তমানে আইন পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে? (Do you think the influence of legislative in decreasing?) [N. U. 1997]

শাসন বিভাগ

EXECUTIVE

৩৯

শাসন বিভাগ
The Executive

শাসন বিভাগ (Executive) বলতে সাধারণত শাসন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনারত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুঝায়। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত রয়েছেন। এ অর্থে গ্রাম্য চৌকিদারকে পর্যন্ত শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, রাষ্ট্র পরিচালক বা পরিচালকবৃন্দ তো আছেনই। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শাসন বিভাগ বলতে শাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রধান কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাবৃন্দকে বুঝায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শাসন বিভাগ বলতে সর্বোচ্চ কর্মকর্তাকে বুঝায়। শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা (administrative staff) বলা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ (civil service)।

শাসন বিভাগের কার্যাবলি
Functions of the Executive

অধ্যাপক গার্নারের মতে, শাসন বিভাগের কার্যাবলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ **(এক)** অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিষয়ক (administrative), **(দুই)** পররাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও বৈদেশিক সম্বন্ধ (Diplomatic), **(তিন)** সামরিক ব্যবস্থা (military), **(চার)** বিচার বিষয়ক ক্ষমতা (Judicial) ও **(পাঁচ)** আইন বিষয়ক ক্ষমতা (legislative)।

(এক) শাসন বিভাগের **প্রধান কার্য আইনানুসারে দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করা।** সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রভৃতি আইনের লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়িত করাই শাসন বিভাগের কাজ। জনহিতকর কার্যাদি সার্থক ও সফল হয় যদি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তাই শান্তিরক্ষা ও শৃঙ্খলা বিধান করাও এ বিভাগের প্রধান কাজ। বর্তমানে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মে সরকার লিপ্ত রয়েছেন। কাজের বিভিন্নতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের নিয়োগ, গুণানুসারে তাঁদের পদোন্নতির ব্যবস্থা এবং দোষ-ত্রুটি, বিশেষ করে দুর্নীতি, বিবেচনা করে দণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা করাও এর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া, আজকাল সরকারের অধীনে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলো ঠিকমত কাজ করছে কী না, অর্থের অপচয় হচ্ছে কী না, অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ করা প্রয়োজন কী না তা লক্ষ্য করাও শাসনবিভাগের কাজ।

(দুই) বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করাও শাসন বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শাসন বিভাগ বিদেশে রাষ্ট্রদূত, কনসাল ও বিশেষ মন্ত্রীবৃন্দ নিয়োগ করে, অন্য দেশের অনুরূপ পদস্থ

ব্যক্তিগণকে বরণ করে, এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাঠায়। বিদেশের সাথে চুক্তি ও সন্ধি স্থাপন করে এবং পূর্বের চুক্তি রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী হলে তা বাতিল করে। মোটের উপর, পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যাবলি শাসন বিভাগ পরিচালনা করে।

(তিন) শাসন বিভাগের সর্বপ্রধান দায়িত্ব **রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা।** এ জন্য যথোপযুক্ত সামরিক শক্তি সংগঠন করতে হয়। এবং স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর ব্যবস্থা করতে হয়। **রাষ্ট্রপ্রধানের উপর সামরিক বাহিনীর চরম কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে।** সমরাভিজ্ঞদের মধ্য থেকে তিনি সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বর্তমান যুদ্ধ বিগ্রহ অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এর পরিচালনা ও প্রস্তুতির জন্য জনসমর্থন নিশ্চিতকরণ ও মিল ফ্যাক্টরিতে কর্ম, খাদ্য সংস্থান প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করতে হয়। শাসন বিভাগ অনেক সময় একা পেরে ওঠে না। তাই আইন পরিষদের সহযোগিতায় তার কর্ম পন্থা নির্ধারণ করতে হয়।

(চার) শাসন বিভাগকে কিছু কিছু **বিচার বিভাগীয়** কার্যও করতে হয়। প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিচারকগণ **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।** তাছাড়া, সকল রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের হাতে প্রাণদণ্ডে **দণ্ডিত আসামীকে ক্ষমা করার বা দণ্ড হ্রাস করার ক্ষমতা আছে। শাসন বিভাগ সে দণ্ড মওকুফ করতে পারেন, হ্রাসও করতে পারেন।**

(পাঁচ) আইন সংক্রান্ত কার্যেও শাসন বিভাগ কিছু কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। শাসন বিভাগ আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে, স্থগিত রাখে এবং আইন পরিষদকে বাতিলও করতে পারে। **জরুরী আইন বা অধ্যাদেশ** সাময়িকভাবে শাসন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত হয়। তাছাড়া, শাসনবিভাগ শাসন বিভাগীয় আদেশও ঘোষণা করতে পারে ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে। **আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইনের খুঁটিনাটি** বিষয়সমূহও শাসন বিভাগ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। বিচার বিভাগের দ্বারা **আইন ব্যাখ্যাত হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার কাজ** শাসনবিভাগকেই করতে হয়। সংসদীয় সরকারে শাসন বিভাগ বা **মন্ত্রিপরিষদ আইনের খসড়া** তৈরি করে, আইন পরিষদে নেতৃত্ব দিয়ে তা পাসও করিয়ে নেয়। তাছাড়া, **রাষ্ট্রপতি আইনকে স্থগিত** রাখতে পারেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নাকচও করতে পারেন। **রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতাকে** ভেটো (veto) বা নাকচ করার ক্ষমতা বলা হয়। সাধারণত আইন পরিষদ সাময়িক উত্তেজনাবশে বা সস্তা **জনপ্রিয়তা** লাভের আশায় বা ব্যক্তি কিংবা দলের সুযোগ-সুবিধার জন্য যে আইন প্রণয়ন করতে পারে তা **প্রতিরোধ** করার জন্য সর্বত্র রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে এ ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। এ ক্ষমতা চরম (absolute) হতে পারে, শর্তমূলকও (qualified) হয়, সাময়িক (suspensive) অথবা নীরবতামূলকও (pocket veto) হতে পারে। শর্তমূলকভাবে বা সাময়িকভাবে আইনের কার্যকরণ স্থগিত হলে আইন পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে তা কার্যকর করতে পারে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি সহযোগে। তাই **রাষ্ট্রপ্রধানকে** আইন পরিষদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়।

শাসন বিভাগের সংগঠন
Organization of the Executive

শাসন বিভাগ সংগঠনের কয়েকটি প্রধান গুণ থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের মতে শাসন বিভাগ কয়েকটি গুণে ভূষিত না হলে কার্য পরিচালনায় অনেক অসুবিধা হবে। গুণাবলী নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, শাসন বিভাগকে এমনভাবে সংগঠন করতে হবে যেন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন অসুবিধা না হয়। শাসন সম্বন্ধীয় অনেক কার্য জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে তা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। তা সম্ভব, যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে একজনের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দেয়া হয় অথবা কয়েকজন থাকলেও একজন সকলের উর্ধ্বে থেকে তাদের পরিচালিত করতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে কেননা, তা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হলেও সেখানে প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য রয়েছে। সুতরাং **ঐক্যবোধ** (unity) **শাসন বিভাগের একটি বড় গুণ।**

দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু শাসন বিভাগের আর একটি বড় গুণ **ক্ষমতার প্রাচুর্য।** শাসন বিভাগ শাসনকার্যের স্তম্ভ স্বরূপ এবং বিভিন্ন সময়ে শাসন বিভাগকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। শাসন বিভাগ যদি দুর্বল হয়, তবে শাসনকার্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে এবং শাসনকার্যের মান অবনত হয়। তবে এও লক্ষণীয় যে, শাসনবিভাগ যেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী না হয়। কর্মকর্তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বার্থের পরিপন্থী। কর্মকর্তাগণকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, জনসাধারণ ক্ষমতার উৎস এবং তাদের অনভিপ্রেত কাজ করলে তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হবেন। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে মন্ত্রিগণকে আইন পরিষদ ও জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। প্রেসিডেণ্টকে কয়েক বছর পর নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট ধর্ণা দিতে হয়। সুতরাং **উত্তম শাসন বিভাগে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষিত হয় দায়িত্ববোধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৎপরতার উপর নির্ভর করে।**

তৃতীয়ত, স্থায়িত্বঃ শাসন বিভাগের আর একটি গুণ হলো স্থায়িত্ব। স্থায়িত্ব ব্যতীত শাসনকার্যে শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভব হয় না এবং দক্ষতাও পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু স্থায়িত্ব বলতে আমরা চিরস্থায়ী বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থাকে বুঝি না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট দুবারের বেশি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। তাই হলো তুলনামূলকভাবে উত্তম ব্যবস্থা। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিত্ব অধিকতর পরিবর্তিত হয়। ফলে সরকারি নীতির স্থায়িত্ব বজায় থাকে না। ফ্রান্সে এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দ্য গলের (De Gaulle) ক্ষমতা লাভ ঘটেছিল এবং সেখানকার দুর্বল ব্যবস্থাকে পুনর্বার সঞ্জীবিত করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। পূর্বে জার্মানীতে রাষ্ট্রনায়ককে সাত বছরের জন্য নির্বাচিত করা হত। তা একটু দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত। **সাধারণভাবে চার বছরের কার্যকালই আদর্শ।**

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানকে এমনভাবে নির্বাচিত করা উচিত যাতে **সত্যই উপযুক্ত ও গুণী ব্যক্তি ক্ষমতায় আসীন হতে পারেন।** এও উল্লেখযোগ্য যে, যিনি ক্ষমতাসীন হবেন তিনি যেন সম্মান ও মর্যাদার সাথে কাজ করতে পারেন। তিনি হবেন একজন বিদ্বান, বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও কর্মক্ষম ব্যক্তি। তাঁকে হতে হবে সমগ্র জাতির আস্থাভাজন।

পঞ্চমত, শাসন বিভাগের আর একটি গুণ থাকা উচিত যাতে তিনি বা **তাঁরা আইন পরিষদের কিছুটা কর্তৃত্বাধীনে থাকেন।** আইন পরিষদ জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক গঠিত হয়। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, কেননা শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকারেও শাসন বিভাগ কিছুটা আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন, বিশেষ করে আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আইন পরিষদ কর্তৃত্ব করতে পারেন। আমেরিকার সিনেটও প্রেসিডেণ্টের বিভিন্ন কাজের অনুমোদন দান করে স্বীয় প্রাধান্য বজায় রাখে।

রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ পদ্ধতি

সাধারণত দু পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতাসীন হতে পারেন। **প্রথম,** বংশানুক্রমিক নীতি অনুসারে এবং **দ্বিতীয়,** নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচন আবার তিন উপায়ে পরিচালিত হতে পারে; যথা—**প্রত্যক্ষ নির্বাচন, আইন পরিষদ দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচন ও নির্বাচকমন্ডলী বা সংস্থা কর্তৃক পরোক্ষ নির্বাচন।**

(এক) বংশানুক্রমে নীতি গণতন্ত্রের সাথে অনেকটা বেসুরো, কিন্তু রাজা বা রাণী যদি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হন তা হলে শাসন ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব, কার্যক্রমে স্থিতিশীলতা এবং অভিজ্ঞতার সুফল লাভ ঘটে। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণেও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মর্যাদা লাভের সম্ভাবনা, কারণ রাজা ও রানীর ব্যক্তিগত প্রভাব কার্যকর হয়। তবে তা অতীতের ছেঁড়া পাতা ছাড়া কিছুই নয় এবং ইংল্যাণ্ড ব্যতীত আর কোন রাষ্ট্রে তা তেমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সাথে গৃহীত হয় নি। জাপানেও এ ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই কার্যকর

হচ্ছে। কিন্তু নীতিগতভাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অধ্যাপক লিক্‌ক বলেন, "বংশানুক্রমিক রাজারাণীর শাসন অবাস্তব ও হাস্যকর যেমন বংশানুক্রমিক কবি বা অঙ্কবিদের চিন্তা অবাস্তব" ("A hereditary ruler is as absurd as the hereditary mathematician or the hereditary poet"।)

(দুই) জনসাধারণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন তুলনামূলক ভাবে অনেক জনপ্রিয়। এ ব্যবস্থা দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি প্রজাতন্ত্রে প্রচলিত রয়েছে। এটি অনেকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এর ফলে রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধানও তাঁর পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন আদায় করে অনেকটা আশ্বস্ত হন ও অধিকতর দক্ষতার সাথে কাজ করেন। জনসাধারণের অনভিপ্রেত কোন কার্যে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। কারণ সর্বদা এ কথা তাঁর স্মরণে থাকে যে তিনি তাদের প্রতিনিধি। তাছাড়া, এ পদ্ধতিতে জনসাধারণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেন অধিক আগ্রহ ভরে ও তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা বৃদ্ধি পায়। এর কুফলও অনেক।

এরূপ পদ্ধতিতে সব সময়ে যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হন তা নয়। এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র সেরূপ ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারেন, যিনি রাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উল্কার মত ছুটাছুটি করে, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে, সকলকে প্রভাবিত করতে পারেন। ধীর-স্থির শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ সাধারণত নির্বাচন প্রার্থী হন না। এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণত জনপ্রিয় লোক নির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু জনপ্রিয় লোক যোগ্যতম নাও হতে পারেন। তাছাড়া, এই সকল নির্বাচনে প্রচুর খরচ তো হয়ই, এতদ্ব্যতীত সমগ্র দেশে গভীর উত্তেজনা ও উন্মাদনার সঞ্চার হয় এবং নির্বাচনের পরবর্তী কালে অশান্তি ও গোলযোগ দেখা যায়। নীতিগতভাবে অশিক্ষিত ও অসচেতন ব্যক্তিদের দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন সঠিক নয়। দলাদলি অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটে। পেরু, বলিভিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে এরূপ দুর্যোগ ঘটতে একাধিকবার দেখা গিয়েছে। তাছাড়া, নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য অথবা দলীয় প্রার্থীকে জয়লাভে সাহায্য করতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধান অনেক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে আগ্রহী হতে পারেন এবং স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হতে পারেন।

(তিন) পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর (electoral college) দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানদের নির্বাচন বহু রাষ্ট্রে প্রচলিত রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক রাষ্ট্র-আর্জেণ্টিনা, চিলি, মেক্সিকো প্রভৃতি রাষ্ট্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান এরূপ পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন। এরূপ নির্বাচনের ফলে দেশে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। উন্মাদনার প্রবল ঝড়ে সারা দেশ আক্রান্ত হয়ে উঠে না। সর্বোপরি দলাদলি ও প্রচুর খরচের হাত থেকেও দেশ রক্ষা পায়। তাছাড়া, সচেতন ও শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেন।

তবে এর প্রধান দোষ এই যে, নির্বাচকগণের সংখ্যা অল্প হলে তাদের অর্থ বা অন্যান্য জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে বশ করা যায় এবং দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ অত্যন্ত সহজ। তাছাড়া, সমাজের উচ্চস্তরে যারা বিত্তশালী এবং যাদের বিভিন্ন কর্তৃত্ব রয়েছে তাঁরাই সাধারণত নির্বাচিত হতে পারেন। তবে রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ও উন্নতির ফলে নির্বাচন অপ্রত্যক্ষ থাকে না, তা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে রূপ লাভ করে। যেখানে জনসাধারণের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা কম থাকে, সেখানে এ ব্যবস্থা শুভ ফল দান করতে পারে। তবে আর্থিক অবস্থায় বিভিন্নতা থাকলে এ পদ্ধতি ক্ষতিকর হয়ে পড়ে, কারণ শুধুমাত্র বিত্তবানগণ এর আশীর্বাদ লাভ করে।

শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি

(চার) সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে আইন পরিষদ কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন।

এ পদ্ধতি বিভিন্ন কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। **প্রথম,** এ পদ্ধতি অনুযায়ী আইন পরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করেন এবং তাঁদের নির্বাচন সাধারণ নির্বাচকদের অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হয়। **দ্বিতীয়,** এ প্রথায় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হলে আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার

ভাব বৃদ্ধি পায় এবং তা শাসনকার্যে শুভ হয়। **তৃতীয়,** এর ফলে দেশে অধিক উত্তেজনাও সৃষ্টি হয় না, দলাদলিও গুরুতর আকার ধারণ করে না।

তবে এ পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত নয়। **প্রথমত,** এতে নির্বাচকগণের সংখ্যা কম হবার ফলে তা দুর্নীতির কবলে পতিত হতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** এ ব্যবস্থা শাসন বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করে এবং রাষ্ট্রপ্রধানকে আইন পরিষদের মর্জির উপর নির্ভরশীল করে। **তৃতীয়ত,** শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থী হবার ফলে শাসনকার্যেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

তথাপি সকল পদ্ধতির দোষ-গুণ বিবেচনা করলে এ পদ্ধতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপ্রধান আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। দ্বাদশ সংশোধন আইনে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে।

(পাঁচ) মনোনয়নের মাধ্যমেও রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হতে পারেন। অবশ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বেলায় এ সকল প্রশ্ন উঠে না এবং আজকাল তা অপ্রচলিত বটে। তথাপি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটি স্মরণযোগ্য। কমনওয়েলথ-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোথাও কোথাও বৃটেনের রাজা বা রাণী মনোনয়ন দান করেন যদিও তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পূর্বে অনুমোদিত হয়।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি
Increase of the Powers of the executive

আধুনিককালে সরকার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক শাসন বিভাগের উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস। আধুনিককালে বহু রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদী সরকার এবং সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও শাসন বিভাগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। বৃটেনে "মন্ত্রিপরিষদের একনায়কত্বের" (cabinet dictatorship) অভিযোগ উঠেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির প্রবল প্রতাপের সামনে আইন পরিষদ হীনপ্রভ হয়ে ওঠে। শাসন বিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধির অনেক কারণ আছে।

(১) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : রাষ্ট্রের মধ্যে হাজারো সমস্যা সৃষ্টি হবার ফলে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়নের প্রয়োজনে শাসন বিভাগের উপর প্রচুর কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে।

(২) বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি : বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এবং যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় শাসন বিভাগ অতি সহজে নির্দেশ দান করতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তর থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে।

(৩) শাসন কার্যে জটিলতা বৃদ্ধি : শাসন কার্যে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এবং শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যোগ্য প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরোত্তর তাঁদের হাতে ক্ষমতার সমাবেশ ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন সম্প্রতি এককেন্দ্রিকতার এক প্রবণতা দেখা যায়, তেমনি প্রায় সর্বত্র শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৪) সরকারের কার্যক্রমের ব্যাপক বৃদ্ধি : সাম্প্রতিককালে সরকারের কার্যাবলির ব্যাপক প্রসারের ফলে শাসন বিভাগের হস্তে ক্রমাগত ক্ষমতা সঞ্চিত হচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্র (police state) নয়। আধুনিক রাষ্ট্র **কল্যাণমূলক রাষ্ট্র** (Welfare state)। ফলে সরকারের কার্যসীমা বিস্তৃত হচ্ছে এবং নেতৃত্বদানের প্রয়োজনে শাসন বিভাগ ক্রমশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে।

(৫) আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি : যুদ্ধ বিগ্রহ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলেও শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপ্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপক প্রসার প্রভৃতির ফলে শাসন বিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কেননা ঐ সব সংকটের সমাধান ও যুদ্ধ পরিচালনা শাসন বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

(৬) সংসদের দুর্বলতা : সংসদের দুর্বলতার জন্যও শাসন বিভাগের হস্তে ক্ষমতার সমাবেশ ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালে আইন পরিষদের সম্মান এবং প্রভাবও হ্রাস পাচ্ছে, কেননা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহকর্মীবৃন্দ নের্তৃত্ব ও প্রভাবের ফলে সকলের শীর্ষে স্থান লাভ করেছেন।

(৭) আইনের জটিলতা ও ব্যাপকতা : আইন পরিষদ বর্তমানে আইনের জটিলতা ও ব্যাপকতা নিপুণভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় শাসন বিভাগ সে শূন্যস্থান পূর্ণ করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যর্পিত আইনের (delegated legislation) ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্য কথায়, শাসন বিভাগ আইন পরিষদের কর্মক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করছে।

(৮) দলীয় শৃংখলা : বর্তমানের কঠোর দলীয় শৃংখলা আইন পরিষদের সদস্যগণকে দলের অনুগত ভৃত্যে পরিণত করেছে। স্বাধীনভাবে তারা কোন কাজ করতে সক্ষম নন। তা শাসন বিভাগকে আইন বিভাগের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছে।

(৯) অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকট : দেশের অসংখ্য অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটের মোকাবেলা করতে হয় শাসন বিভাগকে। পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে শাসন বিভাগ। ফলে শাসন বিভাগের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১০) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা : সরকারের কার্যপরিধি এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে আইন পরিষদ বা বিচার বিভাগ আর শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়।

এসব কারণে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা (trend) দেখা যায়। অধ্যাপক লিপসনের (Lipson) কথায়, "ভোটারগণ সরকারের উপর যে সব নতুন সেবামূলক কার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে এবং সরকার যে সব নতুন ক্ষমতা লাভ করেছে তার ফলশ্রুতি হলো শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি।" বার্কারও এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 'উনিশ শতকে যেমন আইন পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেছিল, বিশ শতকে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি সে গতিতে সম্পন্ন হয়েছে।'

প্রশ্নাবলি

১। শাসন বিভাগ কাকে বলে ? শাসন বিভাগের কার্যাবলির বিবরণ দাও। (What is the executive? Describe its functions.)

২। শাসন বিভাগ সংগঠনের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ কী কী ? শাসন বিভাগ সংগঠনে কোন্ নীতি গৃহীত হওয়া উচিত? (What are the various methods for the organisation of executive? What principles should be followed in organising the executive?)

৩। রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি কী কী ? কোন্ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে চাও ? (What are the various methods for selection of the head of the state? What method do you want for selection of the head of the state in Bangladesh?)

৪। আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কার্যাবলি কী কী ? (What are the functions of modern executive?)

৫। আধুনিককালে শাসন বিভাগের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ কী কী ? (What are the reasons for the increasingly growing powers of the executive?) [C.U. '93]

বিচার বিভাগ

JUDICIARY

৪০

বিচার বিভাগের গুরুত্ব

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ও সামাজিক জীবনে বিচার বিভাগের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণঅধিকার রক্ষার জন্য যদি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়ে থাকে তবে বিচার বিভাগ এর যথার্থতার মাপকাঠি। তাই লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "কোন জাতি রাজনৈতিক সভ্যতার কোন্ স্তরে আছে, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে ভাল উপায় নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে এবং সরকারি কর্মচারী ও নাগরিকদের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা কতটা ন্যায়ানুমোদিত ও আইনসঙ্গত তা বিচার করে দেখা"। তাই বলা হয়, "আইন পরিষদ না থাকলেও রাষ্ট্র চলতে পারে, কেননা আইনের উৎস পরিষদ ছাড়াও রয়েছে এবং আইন প্রথাভিত্তিকও হতে পারে। কিন্তু কোন সমাজ বিচার বিভাগ ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়। বিচার ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্র অনেকটা "মাৎস্য ন্যায়" বা জঙ্গলরাজ্যের মত যেখানে ক্ষমতাই একমাত্র আইন। তাই, আমেরিকার আইন বিশেষজ্ঞ রলে (Rawle) বলেছেন, "বিচার বিভাগ অপরিহার্য, কেননা তার দ্বারাই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যায়ের শাস্তি বিধান করা হয়। ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এবং নির্দোষ ব্যক্তিগণকে অন্যের হস্তক্ষেপ ও অন্যায় থেকে রক্ষা করা যায়" ("It is indispensable that there should be a judicial department to ascertain and decide rights, to punish crimes, to administer justice and to protect the innocent from the injury and usurpation")।

যে রাষ্ট্রে এক নাগরিক অন্য নাগরিকের উপর অত্যাচার করেও দণ্ডিত হয় না তা বালির বাঁধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে হবে। তাই বিচার বিভাগকে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বলা হয়। কারণ, এর অবর্তমানে হয় সরকার দুর্বলতায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে, না হয় সরকারের অন্য বিভাগসমূহের হাতে রাষ্ট্র অত্যাচারের একটি বিরাট মাধ্যম হয়ে উঠে। প্রাচীনকাল থেকেই তাই ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহর বিচারের পরই কাজীর উপর জনগণ নির্ভর করত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ অপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র আর কী হতে পারে ? লর্ড ব্রাইস তাই বলেছেন, "শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কীনা তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড বিচার বিভাগের দক্ষতা" ("There is no better test of the excellence of a government than the efficiency of its judicial system")।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি
Functions of Judiciary

বিচার বিভাগের প্রধানতম কার্য দেশের আইনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ করা এবং আইনের ধারামত সুবিচার করা। কোন নাগরিকের অধিকার অন্য কোন নাগরিকের দ্বারা ব্যাহত হলে বা ক্ষুণ্ন হলে বিচারালয় থেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়। শুধুমাত্র নাগরিকই নয়, সরকারও যদি কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করে তা হলেও বিচারালয় তার প্রতিবিধান করে। যদি কারো অধিকার ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা থাকে, তা হলে সে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে এবং আদালত তার নিশ্চয়তা বিধান করতে অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয়ত, বিচারালয় বিচার করতে গিয়ে নতুন আইনের জন্মদান করে। বিচারকগণ প্রচলিত আইন-কানুন মোতাবেক বিচার কার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত জটিল বিষয়াদিতে আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা নির্দেশ না পেলে তাঁর বিচারবুদ্ধি (equity and good sense) প্রয়োগ করে কোনরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে তাই সুস্পষ্ট আইনের অনুপস্থিতিতে আইন বলে গৃহীত হয়।

তৃতীয়ত, কোন কোন দেশে উচ্চতম বিচারালয় সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবেও গণ্য হয়। তখন তার কাজ হয় সংবিধানকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের সংরক্ষক ও অভিভাবক। কংগ্রেসের কোন কক্ষ যদি সংবিধান বহির্ভূত কোন আইন তৈরী করে এবং তা অঙ্গরাজ্যগুলো বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যদি ক্ষতিকর হয়, তা হলে সুপ্রীম কোর্ট সে আইনকে নাকচ করে দিতে পারে। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টও এরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের দায়িত্ব অপরিসীম। অঙ্গরাজ্যগুলো সংবিধানের নিয়ম-কানুনে আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ও আইন পরিষদ যদি সে সম্বন্ধের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায় এবং তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে বিচারালয়, বিশেষ করে সর্বোচ্চ আদালত, এগিয়ে আসে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষিত করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে বিবাদ বাধলে অথবা অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে কোন বিষয়ে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে বিচারালয় তার প্রতিকার বিধান করে।

পঞ্চমত, বিচারবিধি সংক্রান্ত সকল বিষয় বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সকল নিয়ম-পদ্ধতি কোন আইন পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয় না। কিভাবে বিচার করা হবে, কিভাবে কোন্ বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হবে বিচারালয় তা স্থির করে।

ষষ্ঠত, বিচার বিভাগ শাসন সংক্রান্ত কিছু কাজও করে থাকে। নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত করা, দেউলিয়ার নিকট থেকে পাওনা আদায় করা, কোন কোন পদে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স ও কোন কোন বিষয়ে মঞ্জুরি দান করা, বিদেশীকে নাগরিকত্ব দান করা, অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ দেয়া প্রভৃতি কাজও বিচার বিভাগকে করতে হয়।

সপ্তমত, বিচারালয় অনেক সময় সম্পত্তি পরিচালনাও করে। কোন বিবাদ মীমাংসার পূর্ব পর্যন্ত ঐ সম্পত্তি পরিচালনার ভার বিচারালয় কারো উপর ন্যস্ত করে।

অষ্টমত, বিচার বিভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি অধিকার রক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকারের অতন্দ্র প্রহরী। বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগ এ কাজ সম্পন্ন করে। 'হেবিয়াস কর্পাস' (habeas corpus), রিট (writ of mandamus) প্রভৃতি নির্দেশনামা বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণে।

সর্বশেষে, বিচার বিভাগের উপদেশও বিতরণ করতে হয় সময়ে সময়ে। শাসন বিভাগ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মাঝে মাঝে সর্বোচ্চ আদালতের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তা সুপ্রীম কোর্টের উপদেশমূলক কার্য (advisory functions)।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
Independence of Judiciary

বিচার বিভাগ যদি সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে এবং বিচারকগণ যদি আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল থাকেন ও তাঁদের মুখাপেক্ষী হন, তা হলে তাঁরা নিরপেক্ষ বিচার করতে সমর্থ হন না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত বেশি। তাই চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ এ বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু পদ্ধতি ও নিয়ম প্রণালীর

কথা উল্লেখ করেন। রাজতন্ত্রে বিচারকগণের কোন স্বাধীনতা ছিল না। রাজা বা রানী তাঁদের নিযুক্ত করতেন এবং খেয়াল-খুশিমত বরখাস্ত করতেন। তাই ইংল্যাণ্ডের মনীষী ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) বলতেন, "বিচারক সিংহের মত শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন রাজার সিংহাসন বহনকারী সিংহ"। অতীতে কাজীদের বিচারের কথা আজও প্রবাদের মত লোকদের মুখে মুখে রয়েছে। কিন্তু তাঁরাও অনেক ক্ষেত্রে বাদশাহ ও সুলতানের আজ্ঞাবাহী হয়ে পড়তেন। একনায়কতন্ত্রেও তাঁদের কোন স্বাধীনতা থাকে না। একনায়কগণের ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি হিসেবেও অনেক সময় তাঁরা কাজ করতেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে কয়েকটি শর্ত পালন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(১) বিচারকের দৃঢ়তা ঃ বিচারকগণের নিয়োগ ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রতিভাশালী, ধীশক্তিমান, দৃঢ়চেতা ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ এর প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পর্যায়ে বিচারকদের স্বাধীনতা নির্ভর করে তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের চিন্তার স্বাধীনতা ও ন্যায়নীতির উপর। অধ্যাপক গার্নারের (Garner) কথায়, "বিচারকগণ যদি জ্ঞানের অধিকারী না হন এবং তাঁদের যদি স্থৈর্য ও সিদ্ধান্ত দানের স্বাধীনতা না থাকে তবে যে মহান লক্ষ্যে বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত তা ব্যাহত হয়" ("If the judges lack wisdom, probity and freedom of decision, the high purposes for which the judiciary is established can not be secured.")।

(২) সঠিক নিয়োগ পদ্ধতি ঃ নিয়োগ পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যে, বিচারকগণের শাসন বিভাগ বা আইন পরিষদের উপর নির্ভরশীল হতে না হয় এবং অন্য কোন বিষয়েও পরমুখাপেক্ষী না হতে হয়। তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনীত হন বা নির্বাচনে নির্বাচিত হন। কিন্তু একবার বিচারক পদে সমাসীন হলে নিয়োগকারী বা নির্বাচকমণ্ডলীর খেয়াল-খুশির খেসারত যেন তাঁদের না দিতে হয়। তাই উইলোবি (Willoughby) বলেন, "তাঁরা একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে সারাজীবন বা দীর্ঘকাল পর্যন্ত উত্তম আচরণের নিশ্চয়তায় যেন ক্ষমতাসীন থাকতে পারেন। তারা শাসন বিভাগ কর্তৃক যেন বরখাস্ত না হন এবং গর্হিত আচরণের জন্য আইনানুমোদিত পন্থায় উপযুক্ত বিচারের পর তাদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়" ("Once selected they shall hold office for long term or for life or during good behaviour. They shall not be subject to dismissal by the executive but may be removed only for misconduct as established by a formal process of impeachment.")।

(৩) বিচারকদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ঃ বিচারকগণকে উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা দান করতে হবে। উচ্চতর বেতন ও অন্যান্য ভাতাদির বন্দোবস্ত করতে হবে এবং চাকরির ক্ষেত্রে তাঁদের নিশ্চিত থাকতে হবে। অবশ্য আইন সম্বন্ধে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন। এমনভাবে তাঁদের বাছাই প্রয়োজন যেন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণই শুধু এ সদ পদ অলঙ্কৃত করতে পারেন।

(৪) বিধিবিধানে বিচারকদের নেতৃত্ব ঃ এও বলা প্রয়োজন যে, আইন-কানুন ও সাংবিধানিক ব্যাপারসমূহে তাঁদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকার করতে হবে। শাসন বিভাগীয় আদেশ ও সাময়িক নির্দেশাবলীও তাঁদের দ্বারা আইনানুগ করা একান্ত প্রয়োজন। তাই বিচার বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে উক্ত আদেশ ও নির্দেশসমূহ পরীক্ষিত হওয়া উচিত। বিচার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিচার কার্যে বিচারকদের প্রচুর স্বাধীনতা থাকতে হবে। অধ্যাপক উইলোবির (W. F. Willoughby) মতে, বিচার বিভাগের কর্ম-দক্ষতার জন্য প্রয়োজন হলো তিনটি শর্ত ঃ (ক) **বিচারের জন্য অপরাধীদের আদালতে আনয়নের অধিকার, (খ) আদালতের বিষয় সকলের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ, (গ) বিচার কার্যকর করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা।**

(৫) স্থায়ী চাকরি কাল : বিচার বিভাগে পদোন্নতির পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে বিচারকদের কর্মক্ষমতা ও মনমানসিকতা ক্ষুণ্ন না হয়। অন্য কথায়, চাকরির কাল, মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হলে, এবং সমগ্র বিভাগে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুবিধার সুষম বণ্টন হলে বিচার বিভাগ অধিকতর কার্যক্ষম হয়।

(৬) জনগণ এবং নেতৃবর্গের সহযোগিতা : বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার পশ্চাতে জনসাধারণ ও নেতৃবর্গের সহযোগিতা থাকা দরকার। সর্বোপরি সুস্থ ঐতিহ্য দ্বারা তা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। কাজীর বিচারের কাহিনী এত জনপ্রিয় কারণ তা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও ন্যায়নীতির গৌরবময় ঐতিহ্য দ্বারা গৌরবান্বিত। এরূপ বহু উদাহরণের কথা শোনা যায় যেখানে সুলতান বা বাদশাহ নিজে কাজীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন।

বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতি
Appointment of the Judges

বিচারকগণ সাধারণত তিন পদ্ধতিতে পদাভিষিক্ত হন—**(এক)** জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে, **(দুই)** আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে, **(তিন)** রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে। এ তিন পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে প্রত্যেকের ওয়াকেবহাল থাকা উচিত।

(এক) জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচন পদ্ধতি গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত অসুস্থ প্রণালী। গণতন্ত্র আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হলেও সর্বত্র তার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। **দ্বিতীয়ত,** বিচারকগণের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণ তাঁদের যোগ্যতার বিচার করতে অপারগ। ফলে তাঁরা সে সকল জনপ্রিয় ব্যক্তিগণকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করবে, যাঁরা জনসাধারণের নিকট প্রিয়। কিন্তু তাঁরা নিঃসন্দেহে যে যোগ্য ব্যক্তি হবে তার নিশ্চয়তা নেই। **তৃতীয়ত,** বিচারকগণ যদি জনসাধারণের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল হন, তা হলে তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। সুতরাং নির্বাচিত বিচার বিভাগ ন্যায়বিচারের মূলে আঘাত করতে পারে।

(দুই) আইন পরিষদ কর্তৃক বিচারকগণের নির্বাচন জনসাধারণের নির্বাচন অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। কিন্তু তথাপি তা ত্রুটিমুক্ত নয়। আইন পরিষদ সর্বত্র দলীয় ভিত্তিতে বিভক্ত। সুতরাং আইন পরিষদ দ্বারা নির্বাচন মূলত দলীয় ব্যক্তির নির্বাচন। এ ব্যবস্থায় বিচারকের জ্ঞান-গরিমা ও আইনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন হয় না। তাছাড়া, আইন পরিষদ কর্তৃক পুনর্নির্বাচনের প্রশ্ন উত্থিত হলে বিচারকের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়ে যায়। নিরপেক্ষতাকে আইন পরিষদের যূপকাষ্ঠে বলী দেয়া হয়।

(তিন) সুতরাং শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। যদিও অধ্যাপক লাস্কি বলেন, বিচারকদের নিয়োগের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো বিচারক সমিতির দ্বারা সমর্থিত ও অনুমোদিত ব্যক্তিগণের শাসন বিভাগ বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত করা। এ উপায়ে একবার নিযুক্ত হয়ে গেলে বিচারকগণ যেন তাঁদের কার্যকালের জন্য শাসন বিভাগের দয়ার উপর নির্ভরশীল না হন। ইংল্যাণ্ডে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে Act of Settlement দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, বিচারকেরা যতদিন ভাল কাজ করবেন, ততদিন তাঁদের অপসারণ করা হবে না। যদি কোন বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগে তাহলে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ এনে লর্ড ও কমন্স সভায় তাঁর বিচার করা হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হলে রানী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে বিচারকগণ ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত যথাক্রমে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে কার্যরত থাকবেন। এ সময়ের মধ্যে উত্তম আচরণের নিশ্চয়তাসহ তাঁরা অনেকটা অপসারণের অযোগ্য।

১। "শাসন বিভাগের তদারক করাই বিচার বিভাগের কার্য"—আলোচনা কর। ("It is the function of the judiciary to be a taskmaster of the executive"—Discuss.)

২। আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। (Discuss the role and functions of the judiciary in a modern state.)

৩। বিচার বিভাগের গুরুত্ব বর্ণনা কর এবং বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কী করা প্রয়োজন ? (Describe the importance of judiciary in a modern state. How can the independence of judiciary be secured?)

৪। বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর। (Write an essay on the methods of appointment of the judges of the courts.)

৫। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা বলতে কী বুঝ ? কীভাবে তা সংরক্ষণ করা হয় ? (What do you mean by the independence of judiciary? How can it be secured?)

৬। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা কর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায় ? (Discuss the role of judiciary in a modern democratic state. How can the independence of judiciary be secured?)

নির্বাচকমণ্ডলী

৪১

THE ELECTORATE

সূচনা
Introduction

প্রাচীন গ্রীস বা রোমে যেভাবে সকল নাগরিকেরা এক স্থানে সম্মিলিত হয়ে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত সকল কার্য নির্বাহ করত, বর্তমানকালে বৃহৎ রাষ্ট্রে তেমনভাবে একত্রিত হয়ে জনসাধারণ শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাই প্রতিনিধিত্বের উৎপত্তি হয়েছে। **প্রতিনিধি** (representative) সেই ব্যক্তিকে বলব যিনি ভোট দানের ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণের প্রকাশিত সম্মতি নিয়ে তাদের পক্ষ থেকে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করেন। **ভোট** (vote) বলতে আমরা নাগরিকের সে সম্মতিকে বুঝি, যা নির্বাচনে আইনগতভাবে সক্ষম ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তা মৌখিকও হতে পারে, লিখিতও হতে পারে। ভোট প্রকাশ্যভাবেও গ্রহণ করা যায়। গোপনীয়তা রক্ষা করেও গৃহীত হয়। তবে বর্তমানকালে ভোট গোপনীয়তার সাথে প্রদত্ত হয়। **নির্বাচন** (election) বলতে আমরা সে সুযোগকে বুঝি যখন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকগণ বিভিন্ন প্রতিনিধিগণের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সম্মতির ফলে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তবে ভোট বা সম্মতিজ্ঞাপনের অধিকার এবং নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব প্রচলিত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকারকে সর্ব ব্যাপক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব
Importance of the Electorate

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা অনেকাংশে রঙ্গমঞ্চে নাটকের নায়কের ভূমিকার সাথে তুলনীয়। নায়ক যেমন পরিবেশের প্রভাবে গৌরবময় অথবা হীন পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেন, নির্বাচকমণ্ডলীও তেমনি রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টা পরিচালনা করে—কখনও তা হয় মৌলিক, কখনও বা ঐচ্ছিক। কিন্তু এর গুরুত্ব কোন সময় হ্রাস পায় না। তাই অনেক লেখক নির্বাচকমণ্ডলীকে (electorate) সরকারের স্বতন্ত্র একটি বিভাগ বলে আখ্যায়িত করেন। গেটেলের মতে, "নির্বাচকমণ্ডলী কার্যত সরকারের একটি স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত প্রভাবশালী শাখা, কারণ এর বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে এবং তা সরকারি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য হয়" ('Because of the wide powers, direct and indirect, exercised by the voters in the modern states, the electorate has become practically a separate and important branch of government.")। অধ্যাপক গেটেল আরও বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন্ পর্যায়ে আছে তা বোঝা যায় নির্বাচকমণ্ডলীর উপর রাষ্ট্র কতটুকু বিধি-নিষেধ আরোপ করে তা থেকে এবং নির্বাচকমণ্ডলি

সরকারের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে ও সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে তার সম্বন্ধ কীরূপ তা থেকে। আধুনিক গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছে। জনগণ ভোটের মাধ্যমেই তাদের সার্বভৌম শক্তি প্রকাশ করে। ফলে, শেষ পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং তার গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা

নির্বাচকমণ্ডলী বলতে বোঝায় দেশের আইন অনুযায়ী যারা সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার উপভোগ করেন সার্বিকভাবে তাদের সমষ্টিকে। বর্তমানের সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নরনারীর সমষ্টিই হলো নির্বাচকমণ্ডলী। বাংলাদেশে আঠার বছর বয়স্ক এবং তদুর্ধ সকল নরনারী এবং প্রচলিত আইনে যারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত নন তাদের সমষ্টি হলো নির্বাচকমণ্ডলী। তবে প্রত্যেক সমাজে বেশ কিছু সংখ্যকের ভোটাধিকার থাকে না, যেমন শিশু, পাগল, বিদেশী, আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট অভিযোগে অপরাধী। এ সব নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা

নির্বাচকমণ্ডলী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(১) নির্বাচন ঃ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধানতম কার্য নির্বাচনে সার্বভৌম আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করা এবং প্রয়োজন হলে প্রাদেশিক পরিষদ বা আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সদস্য নির্বাচন করা। অনেক রাষ্ট্রে, বিশেষ করে যে-সকল রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত রয়েছে, নির্বাচকমণ্ডলী আইন প্রণয়ন ও আইনের পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে; যেমন, সুইটজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে জনগণ একত্রিত হয়ে শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করে, প্রয়োজন হলে গণনির্দেশের মাধ্যমে আইনের খসড়া পর্যন্ত তৈরী করে।

(২) নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ ঃ তাছাড়া, গণ-উদ্যোগ (initiative), গণভোট (plebiscite) ও গণনির্দেশ (referendum) প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলী আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে। পদচ্যুতির (recall) দ্বারা অনভিপ্রেত সদস্যকে অপসারণ করে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনও করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলী কোন কোন অঙ্গরাজ্যে বিচারকগণকে নির্বাচিত করে বিচার বিভাগও নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে।

(৩) ক্ষমতার আদিম উৎস ঃ পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য থেকে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হওয়ায় এবং প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ায় নির্বাচকমণ্ডলী যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার আদিম উৎসরূপে পরিগণিত।

(৪) জনমতের প্রতিফলন ঃ পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলী জনমতের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা প্রকাশ করে তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকা, জনসভা ও সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। যাঁরা আইন প্রণয়ন করে অথবা যাঁরা নীতি নির্ধারণে ব্যস্ত, তাঁরাও জনমতের গতি ও প্রকৃতি দেখে প্রভাবিত হয়। প্রায় প্রত্যেক আইন পরিষদে জনমত যাচাই করার ব্যবস্থা রয়েছে। তার মাধ্যমেও নির্বাচকমণ্ডলী শাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

(৫) কোন আইনের প্রতিক্রিয়া যাচাই ঃ অনেক রাষ্ট্রে এও প্রচলিত রয়েছে যে, কোন আইনের খসড়া তৈরীর পূর্বে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী হবে তাও যাচাই করা হয় নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে। এ সকল কারণে নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। কোন কোন লেখক নির্বাচকমণ্ডলীকে সরকারের এক বিভাগ—**চতুর্থ বিভাগ**—বলে চিহ্নিত করেন। অধ্যাপক গার্নার (Garner) বলেন, "নির্বাচকমণ্ডলী শুধুমাত্র সরকারের প্রকৃতি নির্ধারণ এবং ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের নির্বাচন করে তাই নয়, নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের এক অংশে পরিণত হয়েছে।" গুরুত্বের দিক থেকে তা সরকারের অন্য বিভাগ থেকে কোনক্রমে হীন নয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকার
Universal Adult Suffrage

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সকল রাষ্ট্রে ভোটাধিকার খুব অল্প সংখ্যক লোকের হাতে ন্যস্ত ছিল। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহেও নারীদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না। ভৃত্য ও মজুরদের এ অধিকার ছিল না। একই পরিবারে বসবাসকারী অবিবাহিত ছেলেদের প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও ভোট দেবার কোন অধিকার ছিল না। তখন কাদের হাতে ভোটাধিকার ন্যস্ত করা যায় তা নিয়েও তর্কের তুফান উঠত। অবশ্য বর্তমানে সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্যই জনসাধারণের হাতে ভোটের অধিকার তুলে দেয়া। সুতরাং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন বাধার পাহাড় গড়ে উঠে নি। **এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারী, জাতি-ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ভোটাধিকার লাভ করে।** রাশিয়া ও বৃটেনে ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দান করা হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশেও ১৮ বছর এবং তদূর্ধ্ব সকল ব্যক্তি ভোটাধিকার লাভ করেছে। অবশ্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকলেই ভোট দিতে পারবেন। প্রত্যেক দেশেই কিছু লোককে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে; যেমন—পাগল, নির্বোধ, জেলবন্দী, দেউলিয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণ ও শিশুদের।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি ঃ প্রথমত, ভোটাধিকার জনগণের সার্বভৌম শক্তি। ভোটদানের মাধ্যমে জনগণ তা ব্যবহার করে। সুতরাং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে যদি জনসাধারণ ভোটাধিকার লাভ না করে তাহলে তা অপূর্ণ থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের আদর্শ সাম্যের আদর্শ এবং স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ। কিন্তু সাম্য, ঐক্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনসাধারণকে এক কাতারে এনে সকলের অধিকার স্বীকার করতে হবে। কাউকে বা জনসংখ্যার বিশেষ অংশকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অর্থ তাদেরকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং তা ঐক্য, সাম্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, শাসন সকলের জন্য। তা বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়। ন্যায়নীতির কথাও এই যে, যা সকলকে স্পর্শ করে তা সকলের দ্বারাই নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এই ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব যদি সকলের ভোট দেবার অধিকার স্বীকার করা হয়। যদি কাউকে, তা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সে বা তারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের সমপর্যায়ে অবনমিত হবে। তা রাষ্ট্রের ও সমাজের অমঙ্গল আনয়ন করবে।

চতুর্থত, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিনিধিত্বের জটিল প্রশ্নকে সহজতর করে তোলে। সীমাবদ্ধ প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র অবাঞ্ছিত নয়, তা অত্যন্ত জটিলও বটে। শাসন পদ্ধতিতে তা বিভিন্ন ধরনের গুরুতর প্রশ্নের সৃষ্টি করে। তাই সহজতর ও সুবিধাজনক পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর।

পঞ্চমত, মহামতি মিল বলেন, কোন শ্রেণীর জনসাধারণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে স্বভাবতই তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। ফলে তারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবহেলিত হলে রাষ্ট্র ও দেশ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ কমে আসে। তারা সব সময়ের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে এবং তাদের দেশভক্তিও জনদরদ হ্রাস পেতে থাকে।

সর্বশেষে, আরো বলা প্রয়োজন যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার সকলকে সমানভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করে এবং সকলকে 'রাজনীতি' সম্পর্কে সচেতন করে তুলে। ভোটাধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি ঃ অনেকের মতে সর্বজনীন ভোটাধিকার অবাস্তব ও অচল।

প্রথমত, তাঁরা বলেন যে, ভোটাধিকার শুধুমাত্র তাদেরই থাকা উচিত যারা তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে। শিশুর হাতে বন্দুক তুলে দেয়া যেমন বিপজ্জনক, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের হাতে ভোটাধিকার তুলে দেয়াও তেমনি মারাত্মক। ভোটাধিকার শুধুমাত্র তাদেরই প্রাপ্য যারা দেশ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য সাবধানে তার ব্যবহার করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা বলেন যে, সকলকে ভোটাধিকার দেয়ার অর্থ হবে গণতন্ত্রকে জনতাতন্ত্রে পরিণত করা, যা কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা না মেনে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের পানির মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে এবং চারদিক আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। অগ্নিবর্ষী বক্তা ও স্বার্থপর নেতাদের পেছনে জনসাধারণ ছুটে চলবে, যেমন করে হ্যামলিন শহরের শিশুরা ছুটেছিল যাদুকর বংশীবাদকের পেছনে পেছনে। নদীর অতলে ঝাঁপ দিতেও তারা দ্বিধাবোধ করবে না। সুতরাং ভোটাধিকার কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষ হওয়া উচিত এবং সর্বজনীন না হয়ে সীমাবদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ভোটাধিকারে দুটি শর্ত আরোপ করতে চেয়েছিলেন ঃ প্রথমটি শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দ্বিতীয়টি সম্পদের অধিকার। তাঁর মতে, "সর্বজনীন ভোটাধিকার দেয়ার পূর্বে সমাজে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজনীয়" ("Universal education must precede universal enfranchisement.")। তিনি তাঁর *Representative Government* গ্রন্থে আরও বলেন, "যারা কোন কর প্রদান করেন না তারা নেহাত ভোটের জোরে অপরের অর্থের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করলে মিতব্যয়ী হবে না এবং অমিতব্যয়িতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে" ("Those who pay no taxes, disposing by their votes of other people's money, have every motive to be lavish and none to economise.")। মিল (Mill) আরও বলেন, যারা লিখতে পারে না, পড়তে পারে না ও সামান্য অঙ্ক করতে পারে না, তাদের ভোটের অধিকার দেয়া নিরর্থক। যারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে নি, তাদের উপর অপরের উন্নতির ভার দেয়া যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে এটা বলা যেতে পারে, সাধারণ শিক্ষা ও রাজনৈতিক শিক্ষা এক নয়। সাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অনেকেই আছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতায় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে নিপুণ এবং তৎপর।

অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেন, শুধু লিখতে পড়তে পারলেই বিবেচনাপূর্বক ভোট দিতে পারবে এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে ভোট দেবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য যতটুকু বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, তা যে কোন দেশেরই শতকরা ৯৫ জন লোকের নেই। আর এর উপর নির্ভর করে ভোটাধিকার দিতে হলে গণতন্ত্র কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তাছাড়া, লেখাপড়া শিক্ষা দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও সমাজের। সুতরাং এ শর্তের উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ না করলে চলে। বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হবার সাথে সাথে সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি জনগণের আগ্রহ শত গুণে বেড়ে যাবে।

সম্পত্তির যোগ্যতাও আজকাল তেমন গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয় না। এ পদ্ধতিতে পরের টাকার উপর নবাবী করার মনোভাবকে যদি স্বীকার করা হয়, তা হলেও এ যুক্তিকে জোরালো মনে হয় না। অবশ্য বর্তমানে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে ভোটের অধিকার সকলকে দেয়া হলেও বড় লোকেরাই শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদে কর্তৃত্ব করে চলেছেন। সুতরাং অন্য কোন কারণে না হলেও স্বার্থরক্ষা ও আত্মরক্ষার তাগিদেও নির্ধন ব্যক্তিদের হাতে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা উচিত। দারিদ্র্য মহাপাপ নয়। এ জন্য ব্যক্তি যে পূর্ণরূপে দায়ী নয় তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে। বরং এ সম্পর্কে যোগ্যতার চিন্তা পরিত্যাগ করে বাসস্থানের যোগ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কারণ প্রতিনিধি যদি স্থান সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল না হয় তা হলে তিনি উক্ত স্থানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে সমর্থ হবেন না।

গণতন্ত্রায়ণের সাথে সাথে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে।যে সকল রাষ্ট্রে এসব সম্পর্কে আজ আলোচনা চলছে, সে সকল রাষ্ট্রেও তার প্রতি জনসমূহের আগ্রহের সীমা নেই। আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বজনীন ভোটাধিকারই প্রকৃষ্ট উত্তর।

নারীর ভোটাধিকার
Franchise for Women

নারীর ভোটাধিকার প্রশ্নটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। আজকাল অবশ্য প্রায় সকল সভ্য রাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তথাপি মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় রাষ্ট্রে আজও সে অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। ইংল্যাণ্ডে মাত্র ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নারীরা এই অধিকার লাভ করে। ফ্রান্সে মাত্র সেদিন, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অবশ্য, বাংলাদেশের জন্মের পূর্ব থেকেই নারীদের এ অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯৭১ সালে সুইটজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়।

যাঁরা এই অধিকার স্বীকার করতে নারাজ, তাঁরা **প্রথমত,** বলেন যে, মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার দিলে তাদের মেয়েলি গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের কর্মক্ষেত্র গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রান্নাঘর ও শিশুশালায় তারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে তাই হবে আসল কাজ। এর মাধ্যমেই তারা দেশসেবা করতে পারে। স্বামী-পুত্র-কন্যার সেবা-যত্ন করাই তাদের জীবনের মহান ব্রত এবং এই ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা দেখাতে পারলে জাতি উন্নত হবে।

দ্বিতীয়ত, এও বলা হয় যে, নারীরা যখন দেশ রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না, তখন তাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। অধিকার কর্তব্যের সাথে জড়িত। ভোটাধিকারও কর্তব্য ছাড়া সঙ্গত নয় অথবা অর্থপূর্ণ হয় না। কিন্তু স্ত্রী জাতি দৈহিক দুর্বলতার জন্য নাগরিকত্বের সকল দায়িত্ব পালনে অসমর্থ।

তৃতীয়ত, নারীদের ভোটাধিকার দিলে—হয় তা হবে নিরর্থক, নয়তো হবে বিপজ্জনক। অধিকাংশ নারীরা স্বামী বা পুত্রের বা পিতা-মাতার নির্দেশ মত ভোট দেবে। সুতরাং তা হলে পুরুষের ভোটই অনর্থক দ্বিগুণ হবে।তা যদি না হয় এবং মেয়েরা যদি স্বাধীনভাবে ভোট দেয়, তা হলে গৃহের শান্তি বিনষ্ট হবে। তাও অনভিপ্রেত। সুতরাং মেয়েদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়।

সর্বশেষে, এও বলা হয় যে, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে নারীদের টেনে আনলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। শিশুরা অবহেলিত হবে। দলীয় কোন্দলে তারা জড়িত হয়ে নারীর স্বভাবসুলভ কোমলতা হারিয়ে ফেলবে। পৌরুষের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যা দরকার তার অভাব ঘটবে। এবং মানব সভ্যতায় তা এক বিপদসঙ্কুল অধ্যায় সংযোজন করতে পারে।

কিন্তু একটু চিন্তা করলে এ সব যুক্তির ত্রুটি আমরা ধরতে পারি। **প্রথমত,** নারীদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র যে রান্নাঘর বা শিশুশালা তাতে অনেক তর্কের অবকাশ রয়েছে। তর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা বলতে পারি যে, কয়েক বছর পরে এক ঘণ্টার জন্য ভোট দিতে গেলে যে গৃহকর্মের ধ্বংস সাধন করা হবে তা ঠিক নয়। অধিকাংশ নারী হয়ত গৃহকর্ম পালন করবেন এবং সংসারের দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন, কিন্তু এও সত্য যে, বেশ কিছু সংখ্যক নারী শাসন বিভাগকেও অলঙ্কৃত করতে পারেন এবং শাসন ব্যবস্থায় তাদের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে তা যদি অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়, তাহলে নারীদের বেলায়ও তা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, মেয়েরা দেশ রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করতে পারে না তা সত্য নয়। বর্তমানকালে যুদ্ধ-বিগ্রহে বহু খ্যাতনামা মহিলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যুদ্ধের সময় সেবায় তাঁরা যে আদর্শ ও সৎ সাহসিকতার পরিচয় দেন, তা সত্যই আদর্শ স্থানীয়। তাছাড়া, এও সত্য, সকল রাষ্ট্রে সেবা বা সামরিক শিক্ষা সকল পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তথাপি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় না। সুতরাং মেয়েদের ভোটাধিকার স্বীকার না করা অসঙ্গত।

তৃতীয়ত, মেয়েদের ভোটাধিকার নিরর্থক হয় না। অনেক পুরুষ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নির্দেশ অনুসারে ভোট দিয়ে থাকে। আবার অনেক নারীকে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে ভোট দিতেও দেখা যায়। মিল (Mill) বলেছেন, যদি মেয়েরা পুরুষের নির্দেশমত ভোট দেয়, তাহলে কোন ক্ষতি হয় না। আর যদি কিছু কিছু নারী স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে ভোট দেয় তাহলে সমাজের মহৎ উপকার হয়। সুতরাং কোন ক্রমেই নারীদিগকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়।

চতুর্থত, দুর্বলতার অজুহাতে রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাকে ভোটের অধিকার দান না করা একান্ত অন্যায়। দুর্বল বলে স্বীকার করলেও এ জন্যই তাদের এ অধিকার দান করা উচিত, যাতে তাদের পুরুষদের দ্বারা প্রণীত আইন-কানুন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মে।

পঞ্চমত, ঘরে বসে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী একত্রে রাজনৈতিক বিষয়স আলোচনা করলে তা হয় অত্যন্ত উপদেশমূলক এবং সাধু। মিল বলেন, "মানুষ হাঁটতে না চাইলেও তাদের শৃঙ্খল খুলে দেয়া মানব জাতির জন্য মঙ্গলজনক" ("It is a benefit to human beings to take off their fetters even if they do not desire to walk.")। তাদের দুর্বল বলে মনে করলেও আত্মরক্ষার জন্য ভোটাধিকার যে প্রয়োজন, তা কে অস্বীকার করবে?

সর্বোপরি, বলা প্রয়োজন যে, রাজনীতিতে নারীদের প্রবেশাধিকার রাজনীতিকে অনেক উন্নত করবে। বর্তমানে রাজনীতিতে এত গলদ ও জঞ্জাল ঢুকেছে যে, নারীদের অংশগ্রহণ রাজনীতিকে সত্যই অনেকটা আদর্শ স্থানীয় করে তুলতে পারে। গণতন্ত্রে নর-নারীর সমান অধিকার রয়েছে। সুতরাং নারীর ভোট দেবার অধিকার গণতন্ত্রকে অধিক মর্যাদা দান করবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন
Direct and Indirect Election

সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের সাথে সাথে নির্বাচন প্রত্যক্ষ হবে না পরোক্ষ হবে তা নিয়েও দীর্ঘতর আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে।তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রগণের জানা প্রয়োজন, কোন নির্বাচন পদ্ধতি আধুনিককালের গণতন্ত্রের পক্ষে উপযোগী।

পরোক্ষ নির্বাচন ঃ

পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে সাধারণত নিম্নলিখিত তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করা যায় ঃ

প্রথমত, বলা হয় যে, এ পদ্ধতিতে জনতার উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং আবেগ ও উন্মাদনাকে সীমিত করে এক ধীর ও গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ফলে নির্বাচন ক্ষমতা অশিক্ষিত জনসাধারণ অপেক্ষা সুশিক্ষিত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত হয় ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের কুফল থেকে দেশ মুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, এ পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডলী সাধারণত সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হওয়ায় উন্নত ধরনের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন, কারণ নির্বাচকমণ্ডলী সাধারণ জনসমূহ অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বশীল। তাঁরা সুস্থ ও শান্ত পরিবেশে নির্বাচন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

তৃতীয়ত, এই পদ্ধতি দলীয় রাজনীতির দূর্নীতি থেকে নির্বাচন কার্যকে রক্ষা করতে পারে, কেননা জনসাধারণ থেকে এক ধাপ উপরের নির্বাচকমণ্ডলী দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে ওঠে উপযুক্ততম প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করেন এবং দলীয় স্বার্থের উপরে বৃহত্তম স্বার্থকে স্থাপন করে দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এ পদ্ধতির কুফল অত্যন্ত বেশি।

প্রথমত, এ প্রথায় নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনসাধারণের নিকট নিজদিগকে দায়ী মনে করেন না এবং এ দায়িত্বহীনতার ফলে জনস্বার্থ যথার্থরূপে বিবেচিত নাও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ প্রথায় নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় ঘুষ দিয়ে ভোট কেনার আশঙ্কা থাকে এবং ফলে অনেক দুর্নীতির জন্ম হয়। বিভিন্নভাবে ভোটারগণকে প্রলোভন দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রত্যেক জনসাধারণকে ঘুষ বা প্রলোভন দিয়ে ভোট আদায় করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক ভোটারগণ সর্বশেষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না বলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উদাসীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ক্রিয়াকলাপ কোন্ পর্যায়ে যাচ্ছে তা জানার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

চতুর্থত, পরোক্ষ নির্বাচনকে মিথ্যা যুক্তির উপর খাড়া করানো হয়েছে। জনসাধারণ উত্তম ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে অসমর্থ বলে পরোক্ষ নির্বাচন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা যদি সত্য হয় তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের নির্বাচকমণ্ডলী বাছাই করতে দেয়া হয় কেন? আর তারা অযোগ্য বলে যদি অযোগ্য ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত করে, তাহলে পরোক্ষ পদ্ধতিতেও কোন লাভ হয় না।

সর্বশেষে, এও বলা প্রয়োজন যে, পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধাসমূহ ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যেভাবে যাচাই করা হয়েছে, তাতে এ ব্যবস্থাকে ব্যর্থই বলা যায়। আমেরিকার সংবিধানে রচয়িতাগণ প্রেসিডেন্টের নির্বাচন ভার প্রত্যক্ষভাবে জনগণের হাতে না দিয়ে পরোক্ষভাবে তাদের দ্বারা নির্বাচিত এক নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ও তার সুষ্ঠু সংগঠন পরোক্ষ নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে রূপান্তরিত করেছে। আমেরিকার জনসাধারণ দলীয় ভিত্তিক নির্বাচক সংস্থায় (Electoral College) সদস্য নির্বাচন করতে গিয়ে দলীয় নেতাদেরকেই ভোট দান করেন। দলীয় ব্যবস্থার

ফলে সর্বত্রই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন্ দলের কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে জানলে পূর্বাহ্লেই বলা যায়, কে প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন। সুতরাং পরোক্ষ নির্বাচন আজকাল নিরর্থক।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণ ঃ

তাছাড়া প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কতকগুলো সুস্পষ্ট গুণ রয়েছে এবং সেগুলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শুভ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে।

প্রথম, প্রত্যক্ষ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়, প্রত্যক্ষভাবে জনগণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠে এবং প্রত্যেকেই রাজনৈতিক বিষয়সমূহে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে। এতে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত হয়।

তৃতীয়, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিগণ অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠেন এবং ফলে জনস্বার্থ অধিকতর সংরক্ষিত হয়।

সর্বশেষে, বলা যায় যে, এ পদ্ধতিতে নির্বাচন সুন্দর ও সৎভাবে পরিচালিত হতে পারে, কেননা প্রত্যেক জনসাধারণকে প্রলোভন দিয়ে বা ঘুষ দিয়ে কার্য উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে খরচ যে অধিক হয় বা সময় যে বেশি লাগে তা নয়। বরং দুবার ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে একবারই কার্য সমাধা করা সম্ভব। ফলে এ সকল সুযোগ ও সুবিধাদির জন্য আধুনিক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনকে সমধিক মর্যাদা দেয়া হয় এবং এইটি বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি।

গোপন ও প্রকাশ্য ভোটদান
Secret Ballot and Open Voting

প্রথমে প্রকাশ্যে ভোট দেবার রীতি ছিল। সকলে একত্রিত হয়ে যোগ্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে সমর্থন জানানো হত। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে এ প্রথা প্রবর্তিত ছিল। (ক) এর ফলে নির্বাচকগণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অধিক আগ্রহ দেখা যেত। (খ) যোগ্যতম ভোটারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকে যোগ্যতম প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারতেন। (গ) ভোটারদের মধ্যেও সাহসিকতা ও উদ্যমশীলতা বৃদ্ধি পেত।

কিন্তু পরে, বিশেষ করে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হবার সাথে সাথে, এ প্রথায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। (ক) একই নির্বাচন কেন্দ্রে হয়তো ধনী-নির্ধন, মজুর-মালিক সকলেই ভোট দিতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে দরিদ্র ও মজুর শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবতই সে অঞ্চলের ধনী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহসী হয় না। (খ) এমনকি প্রভাবশালী কর্তৃক সমর্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভোট দিতে গিয়ে অনেকে বিভিন্ন রূপ অত্যাচার ও দুদর্শার সম্মুখীন হয়েছে। (গ) আবার ভোট দিতে গিয়ে দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে এ ভয়ে অনেকেই নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হতো না, পাছে কোন বিপদে পড়তে হয়। (ঘ) তদুপরি, এই পদ্ধতিতে স্বীয় মনোভাবকে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করাও কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে এভাবে ভোট দিতে গিয়ে অনেকের ব্যক্তিগত সম্পর্কেও ভাঙ্গন ধরেছে। সুতরাং রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক মিশ্রিত হয়ে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয় এই পদ্ধতিতে।

তাই প্রায় প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আজকাল গোপন ব্যালট পত্রের (ballot paper) সাহায্যে ভোট দেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। এ প্রথায় প্রত্যেক ভোটদানকারী সকলের অলক্ষ্যে নিজের পছন্দমত প্রার্থীর

নাম চিহ্নিত করে নির্বাচন কার্য সমাধা করে এবং কোনরূপ বিপদ-আপদে পড়ার আশঙ্কামুক্ত থেকে উদ্দেশ্য সাধন করে। অনেক ক্ষেত্রে তাই দেখা যায়, মিল এলাকায় মিল মালিক সমর্থিত ব্যক্তি নির্বাচিত হতে সমর্থ হয় না। কিন্তু প্রকাশ্যে ভোটদান চললে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না।

একাধিক ভোট ব্যবস্থা
Plural Voting

কতক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নাগরিকদের একাধিক ভোটেরও অধিকার দেয়া হত এবং তা নির্ধারিত হত ভোটারের উপযুক্ততার মাপকাঠিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী একবার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হিসেবে ভোট দিতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন কেন্দ্র থাকলে তাতেও ভোট দিতেন অথবা কোন ব্যক্তি যদি বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন, তবে বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে তিনি ভোট দিতে পারতেন। অবশ্য শিক্ষার উন্নতির সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্যভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একাধিক ভোটদানের প্রথা তিরোহিত হয়েছে।

এ প্রথা অন্যরূপে এখনও বেলজিয়ামে প্রচলিত রয়েছে। সেখানে ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে একসাথে তিনটি ভোটদানের অধিকারও দেয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভোটদানও (Weighted Voting) বলা হয়ে থাকে। সেখানে কেউ যদি ৩০ বছর বয়স্ক হয়, সরকারকে ৫ ফ্রাঙ্ক কর দেয় ও একটি সন্তানের পিতা হয়, তা হলে তাকে প্রাপ্য ভোট ব্যতীত অন্য আর একটি ভোটের সুযোগ দেয়া হয়। আবার সে যদি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যা শিক্ষা করে থাকে, তাহলে আর একটি ভোটদানের সুযোগ তাকে দিতে হয়। অধ্যাপক গিলক্রাইস্টের (Gilchrist) মতে, এরূপ একাধিক ভোটদানের রীতির পেছনে এ যুক্তিই কাজ করে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যদি কারো অপেক্ষাকৃত অধিক স্বার্থ বিজড়িত থাকে অথবা কেউ যদি অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হয় তাহলে তার বা তাদের একাদিক ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত।

এ ভোটদান রীতির সপক্ষে দুটি যুক্তির অবতারণা করা হয় ঃ

প্রথম, এ প্রথায় নির্বাচন পরিচালিত হলে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে উদ্ভূত অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়। অশিক্ষিত এবং সচেতনতাহীন জনসাধারণের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এবং তাদের ভোটে নির্বাচন হলে প্রার্থীর মান উন্নত নাও হতে পারে। কিন্তু যদি তাঁর সাথে, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ভোটারদের একাধিক ভোট দেবার অধিকার থাকে, তাহলে তা কতকাংশে সংশোধিত হতে পারে। সুতরাং এ প্রথা মুড়ি-মিছরিকে একদরে বিক্রয় না করে তার যথার্থ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয়, মিল বলেছেন যে, যেমন কাউকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা অনুচিত ও অসঙ্গত, তেমনি প্রত্যেক ভোটারকে সমপর্যায়ে ফেলে এক ফিতায় মাপাও ঠিক নয়। সুতরাং যাঁরা বিশিষ্ট গুণে গুণান্বিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন তাদের অন্যভাবে এমন সুযোগ দেয়া প্রয়োজন যেন তাঁদের ভূমিকা সংখ্যাহীন জনতার উচ্চ রোলে মিশে না যায়।

তবে এর অসুবিধাও আছে অনেক। **প্রথমত,** নীতিগতভাবে এ ব্যবস্থা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। **দ্বিতীয়ত,** জাগতিক ও অন্যান্য দিকের যোগ্যতা সব সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্যতা বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। **তৃতীয়,** এ ব্যবস্থা গণতন্ত্রের নীতিবিরোধী। গণতন্ত্রে অসাম্যের ও ব্যক্তি পূজার কোন স্থান নেই। কারণ আইনের সামনে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পৃথক করে দেখা হয় না।

সর্বশেষে, যোগ্যতার বিচারেও অনেক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়। কোন গুণের জন্য কতকগুলো ভোটদানের অধিকার কাকে দিতে হবে, তা নির্ধারণ অত্যন্ত শক্ত।

এক সদস্যযুক্ত ও বহু সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র ঃ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে কতকগুলো নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। কোথাও একটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। আবার কোথাও বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্র আছে। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে বহু সদস্যযুক্ত কেন্দ্র রয়েছে। বহু সদস্যযুক্ত কেন্দ্র সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথার কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন, কেননা নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারগণ তাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মনোনয়ন দ্বারা উপযুক্ততর প্রতিনিধি নির্বাচনে সমর্থ হয়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) দ্বারা ছোট ছোট দলগুলো এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁদের সভ্য সংখ্যা অনুসারে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু এক সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে একজন মাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে ছোট দলগুলো বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন আসন লাভ করা কঠিন হয়।

তবে এক সদস্যযুক্ত কেন্দ্রের সুবিধা এই যে, এখানে ভোটারদের সাথে প্রতিনিধি ও প্রার্থীদের ব্যক্তিগত সংশ্রব ঘটে। ভোটারগণ বুঝতে পারে যে, প্রতিনিধির প্রতি তাঁদের দাবি আছে এবং প্রতিনিধিও মনে করেন যে, তিনি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের নিকট দায়িত্বশীল। আইন পরিষদে তিনি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন এবং ভোটারদের দাবি-দাওয়া তিনি তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু বহু সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতি প্রতিনিধিগণ অনেকটা ঔদাসীন্যও দেখাতে পারেন, কেননা 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' বলে প্রবাদবাক্য প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া, এক সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট গণনার নিয়মও সহজবোধ্য, ব্যবস্থা সরল এবং পরিস্থিতি স্বাস্থ্যকর।

উত্তম নির্বাচন প্রথা
A Good Electoral System

উত্তম নির্বাচন প্রথায় নিম্নলিখিত নীতি ও পন্থাগুলো অপরিহার্য। এগুলো ব্যতীত নির্বাচন প্রথা উত্তম হতে পারে না ঃ

প্রথম, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়া উচিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষদের ভোটাধিকার থাকা উচিত। তা না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকটা পঙ্গু হয়ে যায়। **দ্বিতীয়,** প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করে যাতে সাধারণ ভোটারগণ নিজেদের ভোটে সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পরোক্ষ নির্বাচনে অনেকটা জটিলতা ও দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে। **তৃতীয়,** গোপনে ভোট দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভোটারগণ যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। সুতরাং গোপন ব্যালট (secret ballot) প্রথার প্রচলন থাকতে হবে। **চতুর্থ,** রাষ্ট্রকে এরূপভাবে নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত করতে হবে, যাতে প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্র থেকে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন। বহু সদস্যযুক্ত কেন্দ্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। **পঞ্চম,** ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে নির্বাচনে কেন্দ্র গঠিত হওয়া উচিত। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব উৎকৃষ্ট পন্থা নয়।

সর্বশেষে, সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে যুক্ত নির্বাচন প্রথাই উত্তম। পৃথক নির্বাচন প্রথা পরিত্যাগ করাই ভাল।

প্রতিনিধির দায়িত্ব
Responsibilities of the Representative

নির্বাচন কেন্দ্রের সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে দুটি মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। **প্রথমটি প্রতিনিধিত্বমূলক মতবাদ** (Representative theory) এবং **দ্বিতীয়টি, মুখপাত্রমূলক মতবাদ** (Delegate theory)।

মুখপাত্রমূলক মতবাদে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচন কেন্দ্রের মুখপাত্র বলা হয়। এ মতবাদে তাঁর কার্য ও দায়িত্ব হলো নির্বাচকমণ্ডলীর মনোভাব প্রকাশ করা মাত্র। তাই প্রতিনিধিগণকে প্রভুর ইচ্ছাবরদার (His Master's Voice) বলে উপহাস করা হয়। আইন পরিষদ বা শাসন বিভাগে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত দিতে হলে এ মতবাদে প্রতিনিধিগণকে পূর্বাহ্নে নির্বাচকমণ্ডলীর মত গ্রহণ করা কর্তব্য এবং সে মতকে সততার সাথে প্রকাশ করাই তাঁদের উপযুক্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডে বৃষ্টল কেন্দ্রের ভোটারগণ মনে করতেন, প্রতিনিধি তাদের মুখপাত্র মাত্র। তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করার কোন অধিকার নেই। ভোটারগণের নির্দেশ মত তাঁরা চলতে বাধ্য। সুইটজারল্যাণ্ডেও নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করার পদ্ধতির মূলে এ মনোভাবই কাজ করে। নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারগণের নির্দেশ মত কাজ না করলে তাঁদের সদস্যপদ ত্যাগ করা উচিত। রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রতিনিধিগণও তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য ছিল এবং তা না হলে তাদের প্রত্যাহার করার (Recall) ব্যবস্থা ছিল।

প্রতিনিধিত্বমূলক মতবাদে প্রতিনিধিগণ নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচন কেন্দ্রের মুখপাত্র নন। তাঁরা নির্বাচিত হয়ে গেলে জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং নির্বাচকমণ্ডলী তথা সমগ্র জাতির নিকট দায়ী থাকবেন। নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারগণ তাঁদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। প্রত্যাহারের (Recall) প্রথা নির্বাচনের আসল উদ্দেশ্যের মূলে আঘাত করে। ইংল্যাণ্ডের বৃষ্টল কেন্দ্রের ভোটারগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এডমাণ্ড বার্ক (Burke) যে পত্র লিখেছিলেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এবং তা উত্তম এক দলিলস্বরূপ। তিনি বলেছিলেন, "প্রতিনিধিগণকে ডেলিগেট বা মুখপাত্র ভাবা অযৌক্তিক ও অবান্তর। ভোটারগণ পার্লামেণ্ট থেকে তিনশত মাইল দূরে বসে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হবার পূর্বে কোন নির্দেশ দিতে অসমর্থ। প্রতিনিধিগণ শুধুমাত্র ভোটারদিগকে সেবা করতে চান না, বরং বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা তাঁরা সমগ্র জাতির সেবা করতে চান। সুতরাং তাদের যন্ত্রে পরিণত করা ভোটারগণের উচিত নয়"।

মুখপাত্রমূলক মতবাদকে বিভিন্ন যুক্তিতে অনেকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। লিবার (Leiber) একে 'অহেতুক, অসঙ্গত ও বিধি বহির্ভূত' (unwarranted, inconsistent and unconstitutional") বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ মতবাদ সম্বন্ধে লর্ড ব্রোহাম (Lord Brougham) বলেছেন, "প্রতিনিধিগণের উপর জনসাধারণের ক্ষমতা কিছুদিনের জন্য ন্যস্ত হলে জনসাধারণের উচিত নয় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন প্রস্তাবে তাদের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত করা" ("The people's power being transferreed to representative body for a limited time, the people are bound not to exercise their influence so as to control the conduct of their representatives as a body on the several measures that come before them.")।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে অধ্যাপক লাস্কিও বলেছেন, "কোন সদস্য তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভৃত্য নন। তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকের আলোকে যা ভাল তাই

করতে নির্বাচিত হয়েছেন" ("A member is not the servant of a party in the majority in his constituency. He is elected to do the best he can in the light of his intelligence and his conscience.")। তবে এও সত্য যে, নির্বাচিত প্রতিনিধি যতদূর সম্ভব তার ভোটারদের মতামত ও অভাব-অভিযোগ তাঁর বক্তৃতা এবং কার্যাবলিতে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করবেন এবং তাদের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করে তাদের ভাবধারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন। অবশ্য জাতির বৃহত্তর স্বার্থের নিকট সবকিছুই তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন তাতে কোন দোষ নেই। সুতরাং প্রতিনিধিত্বমূলক মতবাদই শ্রেয়ঃ।

কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক মতবাদ অন্যদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানকালে দলের নিয়ম-কানুন কঠোর হওয়ার ফলে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য হয়ে উঠায় সদস্যগণের পক্ষে দলের নেতৃত্ব অস্বীকার করে নিজ নিজ মত প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না। যিনি দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন তাঁকে প্রত্যেক প্রশ্নে সে দলের নির্দেশমত ভোট দিতে হয়। ফলে পরোক্ষ তা মুখপাত্রমূলক মতবাদকে সমর্থনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে এবং সদস্যগণ ডেলিগেটে পরিণত হয়েছেন।

আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব
Territorial and Professional Representation

আধুনিক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতেই নির্বাচন কেন্দ্র গঠিত হয়। নির্বাচন কেন্দ্র বলতে আমরা সেই ভৌগোলিক অঞ্চলকেই বুঝি যেখান থেকে এক বা একাধিক সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু এক দল পণ্ডিতদের মতে এ ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট নয়। তাঁদের মতে সদস্যবৃন্দ বা সদস্য কোন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, কেননা ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নেই। বরং সদস্য উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রথম, কোন অঞ্চলের বিভিন্ন পেশার লোক একত্রিত হতে পারে। বৃত্তি বা পেশার ভিত্তিতে আইন পরিষদ গঠিত হলে তা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁর নিজের পেশার কি করে উন্নতি হয় শুধু তাই চিন্তা করবেন এবং সমগ্র রাষ্ট্রের ও সমাজের হিত চিন্তা করবেন না। কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করলে প্রতিনিধিগণ নিজেদের কোন বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধি বলে ভাববেন না।

দ্বিতীয়, বৃত্তির ভিত্তিতে আইন পরিষদ গঠিত হলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উদ্ভব হয় এবং তাদের প্রতিযোগিতা শুরু হলে পরিস্থিতি সত্যই অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।

তৃতীয়, নির্বাচনে এ নীতি অনুসরণ করলে সরকার পরিচালনায় অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন বৃত্তির প্রতিনিধিগণ অপর দু চারটি বৃত্তির প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য বৃত্তির প্রতিনিধিগণ আবার নিজেদের মধ্যে সাময়িক ঐক্য স্থাপন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে চেষ্টা করতে পারেন। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

চতুর্থ, এও বলা প্রয়োজন যে, আধুনিককালে উন্নত সংগঠন হিসেবে রাজনৈতিক দলের জন্ম হওয়ায় বৃত্তি বা পেশার স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন গৌণ হয়ে পড়ছে। প্রতিনিধিগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন এবং আইন পরিষদও দলীয় ভিত্তিতে বিভক্ত থাকে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় না।

পঞ্চম, বৃত্তিগত প্রতিনিধি সমন্বয়ে আইন পরিষদ গঠন করতে গেলে প্রশ্ন উঠবে—সমাজের অসংখ্য বৃত্তির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টি থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হবে, কোন্‌ বৃত্তিকে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে দেয়া হবে। তাছাড়া, কতকগুলো বৃত্তি রয়েছে—যেমন চিকিৎসা বিষয়ক, যার কোনরূপ প্রভাব আইন সভায় থাকতে পারে না। তাই অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "আইন পরিষদের উদ্দেশ্যের সাথে চিকিৎসা বিষয়ক অনেক বৃত্তির কোন সঙ্গতি নেই, কারণ, বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ নির্ণয়, খনি জাতীয়করণ বা ট্যারিফমুক্ত বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে চিকিৎসা বৃত্তির কোনরূপ প্রভাব থাকতে পারে না" ("Why is a function like that of medicine, for instance, properly relevant to the purpose of a legislative assembly? There is not a medical view of foreign policy or the nationalisation of mines or a free trade.")।

ষষ্ঠত, এই বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যভাব ব্যাহত করবে এবং দেশের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। গিল্ড সোশ্যালিজম এবং সিণ্ডিক্যালিজমের সমর্থকগণ এ মত পোষণ করেন। **ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দুগুই (Duguit) ও অস্ট্রিয়ার শাফ্‌ল (Shaffle) এ মতবাদ প্রচার করেন। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট ইতালিতে এর বাস্তবায়নও দেখা গিয়েছে।**

সর্বশেষ, শ্রমিক, শিল্পপতি, ডাক্তার, কেরানি, উকিল, মোক্তার, ধোপা, নাপিত **প্রভৃতি শ্রেণীর স্বার্থ এক নয় এবং এক জনের পক্ষে ঐ অঞ্চলের সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। এক জন বরং তাঁর সমব্যবসায়ীর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেন। সুতরাং তাঁদের মতে, বিভিন্ন অঞ্চলে থেকে প্রতিনিধি না নিয়ে সমাজের মধ্যে যতগুলো প্রধান প্রধান বৃত্তি বা পেশা আছে তাদেরই প্রতিনিধি সমন্বয়ে আইন পরিষদ হওয়া উচিত।**

অতীতে যদিও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব হত ও মধ্যযুগে রাজনৈতিক জীবনের মূল ছিল ভূমিতে, বর্তমান সমাজ-জীবনের জটিলতা ও বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার উৎপত্তি ও তাদের সংঘবদ্ধ সংগঠন ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বকে অপ্রতুল করে তুলেছে এবং এর গুরুত্বও অনেক হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের কিছু কিছু ত্রুটিও রয়েছে।

প্রথমত, একই অঞ্চলের ভোটারগণের স্বার্থ কখনও এক নয়। ফলে প্রতিনিধি নিজের ছাড়া অন্যদের প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব দেন না।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বে শুধুমাত্র বিভিন্ন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হয় এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া বা তাদের মতামত প্রকাশের কোন সুযোগই থাকে না। তাই বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই বুদ্ধিজীবীগণ বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বকে গুরুত্ব দেয়া আরম্ভ করেছেন।

অবশ্য অনেক পণ্ডিতের মতে এ দুই ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয় করা শ্রেয়। অধ্যাপক লাস্কিও এ মত পোষণ করতেন। তিনি বলেন যে, বোস্টনের একজন তাঁতীর সাথে বোস্টনের একজন ডাক্তার অপেক্ষা ওল্ডামের একজন তাঁতীর বেশি মিল থাকে। অধিকার আঞ্চলিক ভিত্তি এবং পেশাগতভাবে অনুধাবন করা দরকার। সুতরাং আইন পরিষদের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নির্বাচন করতে হলে বোস্টনকেও নির্বাচন কেন্দ্র হিসেবে ধরতে হবে এবং তাঁতীদের সংস্থাকেও কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas) আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, আইন পরিষদের প্রথম কক্ষ আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ দেশের বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশাসমূহকে যেন প্রতিনিধিত্ব দান করে।

সংখ্যালঘুদের নির্বাচন সমস্যা
Problems of Representation of Minorities

প্রত্যেক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের নির্বাচন সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই সংখ্যালঘু দলের সৃষ্টি হয় না। ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু ব্যতীত ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, জাতীয় ও রাজনৈতিক সংখ্যালঘু দল থাকতে পারে। সার্বভৌম আইন পরিষদে প্রত্যেক দল বা গোষ্ঠী যেন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে, তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন, কেননা গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে শাসন পরিচালনা করা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি সংখ্যালঘুদের কথা না শোনে বা তাদের স্বার্থ না লক্ষ্য করে তা হলে তাদের শাসন অত্যাচারে পরিণত হয়। যদি তাদের সংখ্যার অনুপাতে আইন পরিষদে প্রতিনিধি থাকে তবে তাদেরও মতামত প্রকাশিত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, জনসাধারণের একাংশ যদি অবশিষ্টাংশকে শাসন করে এবং নির্বাচনে ন্যায্য অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করে তা হলে সাম্যের পরিবর্তে অসাম্য দেখা দেয়। তাই সংখ্যালঘুদের নির্বাচন সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। অবশ্য সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে অন্তত কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি যেন নির্বাচিত হতে পারে তার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে— **(১) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব** (proportional representation), **সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি** (limited vote system), **(৩) পুঞ্জীভূত ভোটদান পদ্ধতি** (cumulative vote), **(৪) হস্তান্তরের অযোগ্য একমাত্র ভোট পদ্ধতি** (single non-transferable vote), **(৫) আসন সংরক্ষণ** (reservation of seat), **(৬) সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী** (communal electorate), ও **(৭) দ্বিতীয় ব্যালট** (second ballot system)। এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেয়া হলো ঃ

(১) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা (Proportional Representation) ঃ জনসংখ্যার অনুপাতে সদস্য নির্বাচন করাই এ প্রথার উদ্দেশ্য। এ প্রথা সর্বপ্রথমে টমাস হেয়ার কর্তৃক ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে উদ্ভাবিত হয়। এ প্রথায় এক কেন্দ্র থেকে কয়েকজন সদস্য নির্বাচন করা হয়। একজন ভোটার একটিমাত্র ভোট দিতে পারেন কিন্তু তিনি প্রার্থীদিগকে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করে তাঁর প্রথম পছন্দ, দ্বিতীয় পছন্দ প্রভৃতির নির্দেশ দিতে পারেন। এই প্রথায় একজন ভোটার যতগুলো ভোট দান করে, তাদের সংখ্যাকে যতগুলো আসন আছে তা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে কোটা (quota) বলে। প্রথমবারের গণনায় শুধুমাত্র প্রথম পছন্দকেই ধরা হয়। এতে এক বা একাধিক প্রার্থী যদি সে (quota) মাফিক ভোট পান তা হলে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন। কেউ যদি প্রথম পছন্দের সংখ্যা বেশি পান তা হলে দ্বিতীয় পছন্দের সারিতে তা ফেলে গণনা করা হয়। এরূপে কয়েকবার গণনার ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে গেলে ভোট গণনা শেষ করা হয়। এটি উল্লেখযোগ্য যে, এ পদ্ধতিতে ভোটারগণ একবারই ভোট দেন কিন্তু যাঁরা ভোট গণনা করেন তাদের কয়েকবার ভোটারদের প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দসমূহ গণনা করতে হয়। এটি একটু জটিল ব্যবস্থা।

(২) সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি (Limited Vote System) ঃ একটি কেন্দ্রে যতগুলো প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে, তার একটি বা দুটি কম সংখ্যক ভোট ভোটারদের দিতে হয়। যেখানে ৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন, সেখানে কোন ভোটারকেই তিনটির বেশি ভোট দিতে দেয়া হয় না। তিনটি ভোট তিনজন

পৃথক ব্যক্তিকে দিতে হবে। এ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা সম্মিলিত হলে দু একটি আসন লাভ করতে পারে। যদি চারটি ভোট দিতে হয়, তা হলে তারা একজন প্রতিনিধি পেতে পারে। এ প্রথা পর্তুগাল ও ব্রাজিলে প্রচলিত রয়েছে।

(৩) পুঞ্জীভূত ভোট পদ্ধতি (Cumulative Vote) ঃ এ পদ্ধতি অনুসারে একটি কেন্দ্র থেকে যতগুলো প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে, ততগুলো ভোট প্রত্যেক ভোটারকে দিতে হবে। তারা সব কয়টি ভোট একজনকে দিতে পারে। সব কয়টি ভোট একজনকে দেবার অধিকার থাকায় সংখ্যালগুরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে কয়েকটি আসন লাভ করতে পারে। এ প্রথা আজকাল চলে না।

(৪) হস্তান্তরের অযোগ্য একমাত্র ভোট পদ্ধতি (Single Non-transferable Vote) ঃ জাপানে নিয়ম ছিল যে, যতগুলো প্রতিনিধি একটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হোক না কেন, প্রত্যেক ভোটার একটি মাত্র ভোট দিতে পারবেন। মনে করুন, কোন কেন্দ্রে এক লক্ষ ভোটার আছেন এবং পাঁচজন প্রার্থী সেখান থেকে নির্বাচিত হবেন। তাদের মধ্যে যাঁরা কুড়ি হাজার ভোট পাবেন তাঁরাই নির্বাচিত হবেন। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা চেষ্টা করে তাঁদের একটি বা দুটি প্রার্থীকে নির্বাচিত করাতে পারেন।

(৫) সংখ্যালঘুদের জন্য শাসন সংরক্ষণ (Reservation of Seat) ঃ অতীতে এ দেশের সংখ্যালঘু জাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। এ ব্যবস্থায় তাঁরা ঐ কয়টি আসন নিশ্চয়ই লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা ন্যূনতম যোগ্যতারও অধিকারী না হতে পারেন। বর্তমানে এ প্রথা রহিত করা হয়েছে। প্রাক-বিভাগ ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট ছিল।

(৬) সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী (Communal Electorate) ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মুসলমানেরা মুসলমানদের দ্বারা ও হিন্দুরা হিন্দুদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। এতে প্রার্থীরা নিজদিগকে যতটা গোঁড়া বলে প্রমাণ করতে পারতেন তত বেশি ভোট পেতেন। এরূপ ব্যবস্থায় দু সম্প্রদায় চিরকাল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

(৭) দ্বিতীয় ব্যালট (Second Ballot) ঃ যদি দুটির বেশি দল থেকে একই কেন্দ্রে একজন মাত্র সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো হয়, তা হলে কোন প্রার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র ভোটের অধিকাংশ লাভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রথমবার ভোট গ্রহণের পর দেখা গেল একজন পনের হাজার, একজন চৌদ্দ হাজার ও একজন বার হাজার ভোট পেয়েছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যদি নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়, তা হলে ছাব্বিশ হাজার ভোটারের মতকে অগ্রাহ্য করে মাত্র পনের হাজারের মত গ্রহণ করা হলো। ঐ ব্যক্তি ৩১ হাজার ভোটের অর্ধেকের বেশি পান নি। সুতরাং দ্বিতীয়বারের ভোট গ্রহণের সময় তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা হবে এবং যাঁরা তৃতীয়কে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা প্রথম বা দ্বিতীয়কে ভোট দিবেন। এরূপে এবার একজন অধিকাংশ ভোট পাবেন। এ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুবিধা হয় না, তবে প্রথার ন্যায়পরায়ণতা কিছুটা প্রমাণিত হয়।

পৃথক ও যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী
Separate and Joint Electorate

পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। বিভাগ পূর্ব ভারতে এবং বিভাগোত্তর পাকিস্তানে এ পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলিত

ছিল। ফলে হিন্দু ভোটারগণ হিন্দু প্রতিনিধিকে ও মুসলমান ভোটারগণ মুসলমান প্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারত। কিন্তু যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের ভোটারগণ সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনে সমবেত হয়। এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(এক) যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি কিছুটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্মত এ প্রথায় যোগ্যতম প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করা সম্ভব। কেননা ভোটারগণ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিচার না করে যোগ্যতার বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

(দুই) তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অভিন্নতা ও ঐক্যভাব বৃদ্ধি পায়। সকল জাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মোহে ছুটে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থকে নস্যাৎ করে না।

(তিন) এ ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হলো সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন এবং ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় অনুন্নত জাতি বা সম্প্রদায় উন্নতদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে।

(চার) সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োগ করার মানসিকতা অর্জন সম্ভব হয় এ ব্যবস্থায়।

১। কী কী কারণে নির্বাচকমণ্ডলীকে আধুনিক রাষ্ট্রে একটি স্বতন্ত্র শাখা বলে গণ্য করা হয়? (What are the reasons for which the electorate has been regarded as a distinct branch of government in a modern state?)

২। "নির্বাচকমণ্ডলী কার্যত একটি স্বতন্ত্র ও সরকারের অত্যন্ত প্রভাবশালী শাখা, কারণ এর বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে এবং তা সরকারি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য হয়"—আলোচনা কর। ("Because of the wide powers, direct and indirect, exercised by the voters in modern states the electorate has become practically separate and important department of the government" —Discuss.)

৩। ভোট দেবার অধিকারকে অধিকার না কর্তব্য বলে বিবেচনা করা উচিত? বাধ্যতামূলক ভোটের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। (Should franchise be regarded as a right or a duty? Argue for and against the system of obligatory ballot.)

৪। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the role of the electorate in a democratic state.)

৫। সংখ্যালঘু কাকে বলে? সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন কেন? সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব দানের যে কোন দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। (What is a minority? Why should a minority be represented? Describe two methods of securing representation for the minorities.)

৬। নির্বাচনে ভোট দেবার জন্য তুমি কোন্ যোগ্যতা উত্তম বলে মনে কর? যুক্তি দেখাও। (What qualification do you suggest for the right to vote in an election? Show reasons.)

৭। সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বুঝ? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। (What do you mean by the principle of universal adult suffrage? Argue for and against it.)

৮। স্ত্রী জাতির ভোটাধিকার তুমি কী সমর্থন কর? এর বিপক্ষে কী কী যুক্তি দেখান হয়? (Do you support woman suffrage? Show arguments against it?)

৯। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের তুলনামূলক আলোচনা কর এবং বাংলাদেশের জন্য কোন্‌টি উত্তম তা বর্ণনা কর। (Make a comparative study of the direct and indirect elections, Which is suitable for Bangladesh.)

১০। উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কী কী? (What are the necessary conditions for a good electoral system?)

১১। পেশাগত প্রতিনিধিত্বের গুণাগুণ আলোচনা কর। (Examine the merits and demerits of functional representation.)

১২। পৃথক ও যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of separate and joint electorate.)

১৩। নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the responsibility of the elected representatives.)

১৪। নিম্নলিখিতগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (Write short notes on the following.)

(ক) গোপন ও প্রকাশ্য ভোট দান (secret-ballot and open voting). (খ) একাধিক ভোট ব্যবস্থা (plural voting). (গ) এক সদস্যযুক্ত ও বহু সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র (Single member constituency and many member constituency.)

১৫। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ আলোচনা কর। (Discuss the merits and demerits of direct and indirect system of election.)

১৬। সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ? কোন্ কোন্ যুক্তিতে তুমি এই ব্যবস্থা সমর্থন কর? (What do you mean by universal adult franchise? On what grounds would you support it?)

১৭। নির্বাচকমণ্ডলী কী? তুমি কিভাবে একটি দেশের নির্বাচকমণ্ডলী সংগঠিত করবে? (What is an electorate? How would you organise the electorate?)

১৮। নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝ? গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব আলোচনা কর। (What do you mean by electorate? Discuss the importance of electorate in a democratic form of government.) [D. U. 1984]

১৯। নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝ? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা আলোচনা কর (What do you mean by the electorate? Discuss the role of the electorate in a democratic state.) [N. U. 1996]

রাজনৈতিক দল ও জনমত

POLITICAL PARTY & PUBLIC OPINION

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা
Definition of a Political Party

এডমাণ্ড বার্কের (Burke) মতে, 'কতকগুলো লোক যখন তাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সর্বজনীন স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে কতকগুলো নীতি সম্বন্ধে একমত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তখন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়" ("A body of men united together for promoting by their joint endeavours the national interest upon some particular principles on which they are all agreed")। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই বার্কের মতে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য। কিন্তু যদিও প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সর্বজনীন হিত কামনা করে তথাপি কোন্ পথে তা সম্ভব, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে। সুতরাং দল বিভিন্নরূপে কার্যনীতি গ্রহণ করে, দলীয় সদস্যগণকে একত্রিত করে, সংঘবদ্ধ করে এবং ফলে অন্য দল থেকে তাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সদস্যগণ অনুসৃত নীতিকে কার্যে রূপ দেবার জন্য বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করে। তাই ম্যাকাইভার বলেন, 'রাজনৈতিক দল বলতে সেই জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা বিশিষ্ট এক কার্যনীতির ভিত্তিতে একত্রিত ও সংহত হয়েছেন এবং যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য প্রয়াসী" ("An association organized in support of some principles or policies which through constitutional means it endeavours to make the determinant of government.")। অধ্যাপক গেটেলও অনুরূপভাবে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, "রাজনৈতিক দল গঠিত হয় কতিপয় ব্যক্তি সমন্বয়ে যাঁরা রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন করতে চান ও রাষ্ট্রীয় কার্যনীতি বাস্তবায়িত করতে চান" ("A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and who by use of their voting power aim to control the government and carry out their general policies.")। অধ্যাপক বার্কার (Barker) বলেন, 'প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের বিশেষ কতকগুলো মত থাকে বলেই তা রাজনৈতিক দলরূপে পরিচিত হয়। সর্বজনীন স্বার্থকে কেন্দ্র করে ঐ মত গড়ে ওঠে। নির্বাচকমণ্ডলীকে তা গ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়। তাঁরা সমর্থন করলে ঐ রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হতে পারে এবং ঐ মতবাদকে কার্যে পরিণত করতে পারে"।

সুতরাং উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রথম, রাজনৈতিক দল এক ব্যক্তিসমষ্টি। দল ছোটও হতে পারে এবং বড়ও হতে পারে।

দ্বিতীয়, এ জনসমষ্টি মোটামুটি একইভাবে রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং জটিল রাজনৈতিক প্রশ্নে তাঁরা সকলেই একমত পোষণ করেন।

তৃতীয়, সদস্যগণের একই চিন্তাধারা ও মতবাদ তাদের সংঘবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে ঐক্যভাব সৃষ্টি করে। তাই তারা রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করতে পারেন।

চতুর্থ, রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী এবং ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁরা তাদের ঘোষিত নীতিকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হন।

পঞ্চম, রাজনৈতিক দল একটি আঞ্চলিক সংস্থা এবং এর কার্যক্রম রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। তাছাড়া, কোন রাজনৈতিক দল দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যরত থাকতে পারে না।

এ সম্বন্ধে শুধুমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি একটু স্বতন্ত্র—কারণ কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেকটা আন্তর্জাতিক। তাই অনেকের মতে তা রাজনৈতিক দল বলে পরিগণিত হয় না। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 'শ্রমিক ও মজুরদের অবস্থার উন্নতির প্রতিষ্ঠান' বলে অভিহিত করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ধনতন্ত্রকে বিনাশ করা এবং এমন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে জনসমূহ তাদের নিম্নতম প্রয়োজন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে। ধনতন্ত্র যেহেতু সারা বিশ্বময় বিস্তৃত, সেহেতু এর প্রতিক্রিয়ার ফলে যে আদর্শবাদ রূপায়িত হয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টির মাধ্যমে তাও আন্তর্জাতিক হতে বাধ্য। তবে যে সকল রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র কার্যকর হয়েছে সে সকল দেশে রাজনৈতিক দল হিসেবেই তা পরিগণিত হয়েছে। সে সকল রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টি জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার সংগঠন ও কার্যক্রমেও বিভিন্নতা দেখা যায়।

রাজনৈতিক দল এবং উপদল

রাজনৈতিক দল উপদল (coterie) বা গোষ্ঠীদল (faction) থেকে স্বতন্ত্র।

প্রথমত, উপদল বা গোষ্ঠীদল সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয় এবং জাতীয় স্বার্থ বা সর্বজনীন স্বার্থের প্রতি নজর নাও দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, উপদল ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত এবং স্বার্থান্বেষীও হতে পারে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে উপদলের তেমন আবেদন থাকে না।

সর্বোপরি, উপদলের সুপরিকল্পিত কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি নাও থাকতে পারে। তবে রাজনৈতিক দলও দলীয় কোন্দলে পতিত হয়ে উপদল বা গোষ্ঠীদলে পরিণত হতে পারে। সংগঠন দুর্বল হলে বা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হলে জনসাধারণের মধ্যে তার আবেদন থাকে না।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা
Role of Political Parties

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **(১) রাজনৈতিক দল জনশিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ সংস্থা (an educative institution)।** নির্বাচকমণ্ডলীর আলস্য ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়ে রাজনৈতিক দল জোর করে তাদের রাজনৈতিক কার্যাবলি ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে। রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করে ভোটের মূল্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে। এবং দেশের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদেরকে ভাবিয়ে তোলে। গণতন্ত্রকে যদি জনমতের শাসন ব্যবস্থা বলা হয়, তবে রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল বলা যেতে

পারে, কেননা রাজনৈতিক দলই জনমত সংগঠন করে। তাই অধ্যাপক লিকক (Leacock) বলেন, "রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা দলীয় সরকার গণতন্ত্রকে সফলতা দান করে" ("Far from being in conflict with the theory of democratic government, party government is the only thing which renders it feasible.")।

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যম ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার। রাজনৈতিক দল না থাকলে বা দলীয় শৃঙ্খলা না থাকলে কোন সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে পারে না এবং সুসংবদ্ধভাবে সদস্যগণকে একত্রিত করা সম্ভব হয় না। এ সত্য শুধুমাত্র আইন পরিষদ বা শাসন বিভাগ সম্বন্ধেই খাটে তা নয়, রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে গৃহীত নীতি সম্বন্ধেও অনেকটা বিশৃঙ্খল ভাব দেখা দেয়। রাজনৈতিক দল "ভোটের দলাদলির" মাধ্যমেই হোক আর "মতবাদের দলাদলির" মাধ্যমেই হোক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে এবং গণতন্ত্রকে কার্যকর হতে সাহায্য করে।

(৩) রাজনৈতিক দল স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কুফল থেকে শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করে ঃ স্বতন্ত্রীকরণের ফলে বিভিন্ন বিভাগ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং অহেতুক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দল সরকারের সকল বিভাগে আপন প্রভাব বিস্তার করে সকলের মধ্যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং সহযোগিতার মধ্যে সকল বিভাগকে উদ্বুদ্ধ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারত। তাই দলকে মিলনের রজ্জু (unifying rope) বলা হয়।

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্দেশক ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তাপমান যন্ত্র হিসেবে রাজনৈতিক দল তার মান নির্ণয় ও নিরূপণ করে। লোয়েল (Lowell) বলেন, "রাজনৈতিক দলের মৌলিক কার্য ও তার অস্তিত্বের যুক্তি এই যে, রাজনৈতিক দল জনমতকে একমুখী করে জনসাধারণের রায় গ্রহণ করতে পারে" (Their essential functions and the true reason for their existence are to bring public opinion to a focus and frame issues for popular verdict")। সুতরাং রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুরোহিত তুল্য।

(৫) বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন ঃ রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন (an agency for communication) হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে রাজনৈতিক দল জনমত সংগ্রহ এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করে।

(৬) দাবি-দাওয়া উত্থাপন ঃ রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও সংগ্রথণ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিকট জনগণের দাবি–দাওয়া (inputs) তুলে ধরে। তাই রাজনৈতিক দলকে স্বার্থ সংগ্রথণের মাধ্যমে (medium for interest aggregation) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর দাবি–দাওয়া রাজনৈতিক দল কর্তৃক গৃহীত হয়।

(৭) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংহতি অর্জন ঃ রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঐক্যানুভূতি ও সংহতি আনয়ন করে। তাই রাজনৈতিক দলকে সংহতি অর্জন ও একাত্মতা স্থাপনের বাহন (an agency for integration) রূপে চিহ্নিত করা হয়।

(৮) গণতন্ত্রের মাধ্যম ঃ রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতন্ত্র চলতে পারে না। দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অনেকটা অপরিহার্য।

অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেন, "প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার মানেই দলীয় সরকার" ("Representative government is the party government")। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত হয়। আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সরকারের রূপ, প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে। প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারও আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করে।

রাজনৈতিক দল না থাকলে আইন পরিষদ বা শাসন বিভাগে কোন সুশৃঙ্খল নীতি গৃহীত হতে পারে না। সদস্যগণের মধ্যে বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যপদ্ধতির অভাবে সরকারি নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক প্রকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক দলই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গতি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। তাই রাজনৈতিক দলকে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সাথে তুলনা করা হয়, কারণ তাদের গতি প্রকৃতি দেখে গণতন্ত্রের অবস্থা বুঝা যায়।

রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ

রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়ে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা জনমতকে চার ভাগে ভাগ করে থাকেন। যাঁরা অতীতের জয়গানে মুখর হয়ে ওঠেন, অতীতের মধ্যেই গৌরব খুঁজে পান এবং অতীতকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট, তাঁরা হলেন **প্রতিক্রিয়াশীল**। যাঁরা বর্তমানকে জয়তিলক পরাতে ব্যস্ত, বর্তমানকে সযত্নে রক্ষা করতে চান ও কোনরূপ পরিবর্তনের দ্বারা তাকে ধ্বংস করতে নারাজ, তাঁরা হলেন **রক্ষণশীল**। যাঁদের দৃষ্টি অতীত ও বর্তমানকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ অথচ অতীত ও বর্তমানকে অস্বীকার করতে নারাজ, কিন্তু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনে বিশ্বাসী তাঁদের **উদারনৈতিক** বলা চলে। আর যাঁরা অতীতকে অগ্রাহ্য করেন ও বর্তমানকে সমূলে উৎপাটন করে ভবিষ্যতের দিকে ঝাঁপ দিতে উদগ্রীব, তাঁরা **প্রগতিবাদী**। এ চার প্রকার মনোভাবকে ভিত্তি করে আধুনিককালে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। রাজনৈতিক দলের মূলে রয়েছে **প্রথম,** মানব প্রকৃতি, যা মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। **দ্বিতীয়,** সহজাত মিলনভাব থাকলেও মানুষ একে অপর থেকে ভিন্ন এবং তাই ভিন্ন পথে আত্মবিকাশ করতে চায়। **তৃতীয়,** যা ভাল বা যা আদর্শস্থানীয় বলে মনে করে তাকেই গ্রহণ করে ব্যক্তি জীবন ও সমষ্টি জীবনকে ফুলে ফলে সুশোভিত করে পূর্ণতার দিকে ধাবমান হয়। এ সকল মানসিকতার ভিত্তিতেই রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়।

অতীতকালে অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হত। ভাষার ভিত্তিতে এবং আঞ্চলিক স্বার্থের ভিত্তিতেও রাজনৈতিক দল গঠিত হত। মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকি ইংল্যাণ্ডেও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। অবশ্য তখন ধর্ম রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ধর্মে সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে এবং রাজনীতির ঘোলাটে স্রোত থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হবার ফলে এখন তেমনটি আর দেখা যায় না, কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এখনও ধর্মের ভিত্তিতে দল গঠিত হয়ে থাকে। পাকিস্তানেও তা ছিল এবং ভারতে আজও বর্তমান। বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক দল রয়েছে।

তাছাড়া, অর্থনৈতিক কারণও এর মূলে রয়েছে। অনেকের মতে, অর্থনৈতিক বৈষম্যই রাজনৈতিক দলের প্রধান কারণ। যাঁদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে তাঁরা তা নিরুপদ্রবে উপভোগ করতে চান, কোনরূপ পরিবর্তন বরদাস্ত করতে রাজি নন, এবং প্রগতিকে সন্দেহের চোখে দেখেন। কিন্তু যাঁদের কিছু নেই, যাঁরা

দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে সমাজের নিচুতলায় পড়ে রয়েছেন তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী এবং ভবিষ্যতের উন্নততর সমাজ ব্যবস্থায় ভরসা রাখেন। সুতরাং পরিবর্তনকে তাঁরা শুভ দিনের পদক্ষেপ মনে করেন ও সমাজকে আমূল পরিবর্তন করতে তাঁরা উদগ্রীব। লাস্কি তাই বলেছেন "সম্পত্তি সম্বন্ধে জনমতকে নিজেদের চিন্তাধারা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র হলো রাজনৈতিক দল"।

ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। **প্রথম,** হুইগ ও টোরি পার্টি জন্ম লাভ করে প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল মনোভাবকে কেন্দ্র করে। বর্তমান কালের **রক্ষণশীল দল** (conservative) **উদারনৈতিক দল** (Liberal) এবং **শ্রমিক দল** (Labour) অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তানের মত রাষ্ট্রে যদিও সর্বপ্রথম ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয়েছিল এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, তথাপি সময় পরিবর্তিত হবার সাথে সাথে সেখানে কার্যক্রম-ভিত্তিক দল গড়ে উঠতে লাগল। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন করা। কৃষক-শ্রমিক দল, জাতীয় আওয়ামী দল এই পর্যায়ে পড়ে। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গণতান্ত্রিক কর্ম পদ্ধতিকে সামনে রেখে পথ রচনা করে।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি
Functions of a Political party

আজকাল রাজনৈতিক দলকে অনেক কাজ করতে হয়। **(১) নীতি ও কর্ম পদ্ধতি নির্বাচন ঃ** প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চলমান পথে নীতি ও কর্মপদ্ধতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্য থেকে কয়েকটি কর্মপদ্ধতিকে বাছাই করা এবং তা জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কার্য। জনসাধারণ উক্ত নীতিগুলো আলাপ-আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে। বিশৃঙ্খল ক্ষেত্রকে সুশৃঙ্খল করা ও নীতিকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করে জনসাধারণের নিকট বোধগম্য করে তোলা রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ।

(২) দলীয় নীতি প্রচার ঃ রাজনৈতিক দল স্বীয় কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করে ও কার্যক্রম স্থির করে জনগণের নিকট প্রচার করতে থাকে এবং দলের শক্তি বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগী হয়। তাঁদের সম্মুখে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার রঙ্গিন স্বপ্ন থাকে এবং ক্ষমতার সমাসীন হয়ে নির্দিষ্ট কর্ম পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা করেন। তাই ক্ষমতা দখলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যে কোন রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য।

(৩) নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই ঃ সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান কার্য উপযুক্ত প্রার্থী দাঁড় করানো। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সদর দরজা সাধারণ নির্বাচন। তাই উপযুক্ত প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে দাঁড় করানো অত্যন্ত সাবধানতার সাথে সম্পন্ন করতে হয়। ভোটাবগণ দলীয় কর্মসূচীর উপর ভোট দেন। তবে প্রার্থী যদি সচ্চরিত্র, কর্মঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়, তা হলে তার পক্ষে ভোট সংগ্রহ করা কঠিন হয় না। অবশ্য নির্বাচনের কানুন মোতাবেক সব সময় চলতে হয়।

(৪) নির্বাচন পরিচালনা ঃ রাজনৈতিক দল মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করাতে উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রতি কেন্দ্রে ভোটারগণকে সুসংবদ্ধভাবে আকর্ষণ করা এবং অনুরোধ করা থেকে আরম্ভ করে কারা কারা ভোটদানের যোগ্যতাসম্পন্ন তাদের খোঁজ খবর নেয়া, তাদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কীনা তা পরীক্ষা করা, না থাকলে তাদের দ্বারা দরখাস্ত করিয়ে তাদেরকে ভোটার তালিকাভুক্ত

করা, ভোট কেন্দ্রে কীরূপে ভোট দিতে হবে তা জানিয়ে দেয়া, ভোট কেন্দ্রে তাদের দলীয় স্বার্থে উপস্থিত করানো প্রভৃতি কাজগুলো রাজনৈতিক দল করে। প্রত্যেক এলাকায় সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক সদস্য থাকে এবং তাঁরা দিনরাত খেটে দলের সফলতা আনতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

(৫) নির্বাচনী প্রচার ঃ রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচার কার্য চালায়। বিভিন্ন সভা সমিতি আহ্বান করে জনসাধারণের নিকট দেশের সমস্যাগুলো তুলে ধরে এবং সে দল ক্ষমতায় সমাসীন হলে কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে তাও দলের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও প্রচার কার্য চলে। মাঝে মাঝে শোভা যাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ফলে জনগণ ঔদাসীন্য ত্যাগ করে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং তাদের ভোটের দ্বারা ভবিষ্যৎ সরকার যে গঠিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন হয়।

(৬) জনমত সংগঠন ঃ এ সকল কার্যাবলির ফলে রাজনৈতিক দল জনমত সংগঠন করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন বক্তৃতা মঞ্চের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা থেকে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা থেকে, এমনকী রাজনৈতিক দল সমর্থিত সংবাদপত্র থেকে জনসাধারণ বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হতে পারে এবং নিজেদের মতবাদও গঠন করে তোলে। জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অবদান তুলনাহীন।

(৭) সরকার গঠন ঃ নির্বাচন শেষ হলে রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্য সরকার গঠন করা। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে অগ্রসর হয়। প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকারে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলগুলো নিজেদের কর্মসূচী নির্ধারণ করে। যখন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত দলের দলীয় সদস্য হন, তখন দল তাঁর পক্ষে জনমত সংগঠন করতে থাকে। বিরোধী দল সরকারকে সমালোচনা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং সরকারের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হন। এই সমালোচনার ভয়ে সরকারও সৎ পথে চলতে সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, কোন রাজনৈতিক দল আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ না হলে নিজেদের সংগঠন আরো মজবুত করে, পরবর্তী নির্বাচনে জয় লাভের জন্য প্রথম হতে চেষ্টা করতে থাকে এবং সরকারের ভুল-ত্রুটিকে সম্বল করে জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়। যেখানে মাত্র দুটি দল রয়েছে সেখানে বিরোধী দল বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা করে এবং যোগ্যতম প্রার্থীকে প্রথম থেকেই জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টাবান হয়।

রাজনৈতিক দলের গুণাবলী
Merits of political party

সংবিধান বিশেষজ্ঞ জেনিংস (Jennings) বলেন, "এখন কেউ যদি ইংল্যাণ্ডে কিভাবে শাসন চলে তা বর্ণনা করতে চান, তবে তাকে আদিতে ও অন্তে রাজনৈতিক দলের কথা বলতে হবে এবং মধ্যভাগেও তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে।" সুতরাং ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের ইতিহাসের সাথে রাজনৈতিক দলের ইতিহাস নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হয়েছিল সংবিধান প্রণয়নের সাত বছর পরে। কিন্তু তার ভূমিকা সেখানে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়। রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক কর্মের রঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে দল। সুতরাং রাজনৈতিক দল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্থা।

দ্বিতীয়ত, পার্লামেণ্টারী শাসনের জন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দল ব্যতীত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, কারণ সরকার কোন্ নীতি ও পদ্ধতি

অনুসরণ করবে তা জনসমক্ষে কে তুলে ধরবে ? তাছাড়া, রাজনৈতিক দল মন্ত্রিপরিষদকে স্থায়িত্ব দান করে। দলের অস্তিত্ব না থাকলে নীতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করাবার জন্য মন্ত্রিদিগকে যথেষ্ট হয়রান হতে হত। প্রতি মুহূর্তে তাদের আশংকা—এ বুঝি তাঁদের প্রস্তাব ভোটে নাকচ হয়ে যায়। তাই লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "পার্টি বা দলের অনুপস্থিতিতে সদস্যগণ স্বীয় স্বার্থের সংঘাতে মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে লেগে যে কোন মুহূর্তে তাদের পতন ঘটাতে পারে, কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলার জন্য আজ তারা মন্ত্রিপরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন" ("If there were no party voting, ministers would not know from hour to hour whether they could count or carry some provisions of the bill which might in appearance be triffling but would destroy its coherence")।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল সুশাসনের পরিচায়ক। যে সরকারের সুসংগঠিত প্রতিপক্ষ নেই, সে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করতে হলে বল প্রয়োগের দ্বারাই অপসারিত করতে হয়। তা আইন সঙ্গত উপায়ে সম্ভব হয় না। কিন্তু অন্যদল থাকলে জনসাধারণ পরবর্তী নির্বাচনে অন্য দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারে। ক্ষমতা লোককে মদমত্ত করে আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পূর্ণরূপে মদমত্ত করে তোলে। লর্ড এক্টনের (Lord Acton) এ সাবধান বাণী প্রতিপক্ষ বিহীন দলীয় সরকার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান জনমত সংগঠন করা। রাজনৈতিক দল জনগণের ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়ে তাদের আলস্য বিসর্জন দিতে বাধ্য করে। তাদের রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে। তদুপরি, নির্বাচন কালেও আইন পরিষদে তর্ক-বিতর্কের ফলে বিভিন্ন দলের কার্য বিবরণী, নীতি ও কর্ম-পদ্ধতি জনসাধারণ জানতে পারে। সংবাদপত্রসমূহও বিভিন্ন দলের সমর্থনে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করে জনসমক্ষে তুলে ধরে। ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে নিজ মতামত গ্রহণ করতে পারে এবং জনমত গড়ে উঠে। অধ্যাপক ফাইনার বলেন, 'প্রতিনিধিবর্গ নির্বাচন করা, তাদের শিক্ষা দেয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা, সমর্থন করা ও নির্বাচনের পরে তাদের পরিষদীয় কার্যাবলিতে নির্বাচকগণের ঘনিষ্ঠ ও ক্রমাগত সংসর্গে নিয়ন্ত্রিত করা দলের দ্বারাই সম্ভব হয়" ("Representatives are selected, catechized, pledged, supported and afterwards controlled in their parliamentary activities by the parties in close and continuous touch with the electorate.")।

পঞ্চমত, দলীয় সরকারের বিকল্প শাসন ব্যবস্থা হলো একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তাই অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিরোধ রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি" ("The parties are our defence against the growth of Caesarism in the country.")।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দল তাড়াহুড়া করে আইন প্রণয়নকে প্রতিরোধ করে। কারণ আইন পরিষদেই হোক বা শাসন বিভাগ কর্তৃক হোক, কোন আইন প্রণীত হবার পূর্বে রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের মতামত বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা হয়।

সপ্তমত, যে সকল রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রচলিত রয়েছে, এ সকল রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহ মিলনের মনোভাব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যের কুফল থেকে সরকারকে রক্ষা করে।

সর্বশেষে, রাজনৈতিক দল জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করে। দলসমূহ বিভিন্ন নীতি ও কর্ম পদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে। দলীয় কোন্দল ও দ্বন্দ্ব যতই হীন স্তরে পৌঁছুক না কেন, তা থেকে জনসাধারণ সচেতনতা, সাবধানতা প্রভৃতি গুণ লাভ করতে পারে।

রাজনৈতিক দলের ত্রুটিসমূহ
Demerits

কিন্তু তথাপি রাজনৈতিক দলের দোষত্রুটি সম্বন্ধে আমাদের উদাসীন হলে চলবে না। রাজনৈতিক দলের গুরুতর কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। **প্রথমত,** দল প্রথাকে অনেকে জাতি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র বলেও আখ্যায়িত করেন ('a party is an organized conspiracy against the nation')। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলের স্বার্থকে বড় করে দেখেন। কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করলে রাষ্ট্রের খরচ হয়তো বেড়ে যাবে, কিন্তু দলীয় সরকার সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে পরবর্তী নির্বাচনে যদি তাতে ভোট লাভের সুবিধা হয়, তা হলে তাই করবে। তাঁদের নিকট দেশের মঙ্গলামঙ্গল থেকে দলের জয়-পরাজয় বড় হয়ে দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল ব্যতীত যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন, তেমনি দলীয় কোন্দল এবং দ্বন্দ্বের ফলে পার্লামেণ্টারী শাসন অচল হবার উপক্রম হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনের মূল কথা হলো আলাপ-আলোচনার ফলে সত্য নির্ধারণ করা এবং শাসন ব্যবস্থায় তা অনুসরণ করা। কিন্তু দলীয় ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার জন্য সদস্যগণ দলের অনুশাসন শুধুমাত্র মেনে চলে। কোন প্রস্তাব যদি সর্বোত্তম হয় এবং দলীয় নীতির বিরুদ্ধে হয় তা হলে তা গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আবার যদি বিরোধী দল সরকারি নীতির শত ত্রুটিও বাহির করে, তথাপি সদস্যগণ দলীয় ব্যবস্থার ফলে তা অনুসরণ করে। তাই পার্লামেণ্ট বা আইন পরিষদ যেন 'কথার দোকান' (talking shop) বা নিছক বিতর্ক সভায় পরিণত হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা গৃহীত নীতিকে আইনসঙ্গত রূপ দেবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলের জন্য সদস্যগণের ব্যক্তিত্ব হ্রাস পায়। তাঁরা যেন দলের নেতাগণের হাতে পুতুলের ন্যায়। তাছাড়া, সাধারণত রাজনৈতিক দল কয়েকজন বিশিষ্ট ধনপতির হাতের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত এবং দরিদ্রের কোন স্বার্থই তার ফলে সংরক্ষিত হয় না।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দলের কার্যকারিতার ফলে আইন পরিষদ ও রাষ্ট্রের শাসন কেন্দ্র একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিরোধীদলের সদস্যগণ সব সময় দলীয় নীতির কথা মনে রেখে কাজ করেন। সরকারি দলকে বিরোধী দল ছলে বলে কৌশলে অপদস্থ করতে আগ্রহী থাকে।

পঞ্চমত, নির্বাচনী যুদ্ধে গালি-গালাজ, অপপ্রচার ও অন্যান্য অসঙ্গত পথে ভোট সংগ্রহ করার অপপ্রচেষ্টা জনমতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং জনগণকে রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত ক্ষমতালোলুপ হয়। ক্ষমতা একবার হাতে পেলে দল তা আঁকড়ে থাকে। ক্ষমতায় সমাসীন থাকার জন্য অনেক সময় দল অনেক ধরনের অন্যায় আচরণ করতে পিছপা হয় না। বড় বড় সরকারি চাকরিও নিজেদের সমর্থনকারীদের মধ্যে বণ্টন করে। অনেক সময় যোগ্যতর ব্যক্তিও উপেক্ষিত হয়। আমেরিকার চাকরির বণ্টনের প্রথা (spoils system) এর যোগ্য নিদর্শন।

সর্বশেষে, দলীয় রাজনীতির ফলে অনেক যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব শাসন বিভাগের আওতার বাইরে পড়ে থাকেন। এতে অনেক সময় জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। যারা গঠনমূলক কার্য করতে পারতেন বা যাঁদের হাতে গঠনমূলক কার্যসিদ্ধি হতে পারত, তাঁরা বাধ্য হয়ে বিরোধী দলে বসে বিরোধিতায় শক্তিক্ষয় করতে থাকেন। তবে এ কথাও সত্য যে, দলের প্রভাবে গণতন্ত্রের মহিমা কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও দলের অভাবে গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। সুতরাং রাজনৈতিক দলের ত্রুটির প্রতি তেমন মনোযোগ না দিয়ে দলকে কিভাবে অধিকতর কার্যকরী করা যায়, তাই ভেবে দেখা উচিত।

রাজনৈতিক দলের কৃতকার্যতার শর্তাবলী

Conditions for the Successful Working of Party System

রাজনৈতিক দল বর্তমানে গণতন্ত্রের সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। তাই উভয়ের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা একই সূত্রে গ্রথিত। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের এ দিকে নজর দিতে হবে এবং রাজনৈতিক দলকে জনমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রতিপালিত হলে রাজনৈতিক দল তার ত্রুটি-বিচ্যুতি জয় করতে সমর্থ হবে বলে মনে হয়।

(১) পরমত সহিষ্ণুতা ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। কোন দল কোন জায়গায় সভা আহ্বান করলে তা ভেঙ্গে দেবার প্রচেষ্টা না করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তা হলে অন্যদলও একই নীতি অবলম্বন করতে উদ্যোগী হবে। আর যদি মারামারি এবং গুণ্ডামির পথ কোন দল অবলম্বন করে, তা হলে এ সকল নোংরামির শেষ কোনদিন হবে না। গণতন্ত্র সহিষ্ণুতার ভিত্তিতেই স্বীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত সংস্থাসমূহে এগুলো পূর্ণমাত্রায় থাকতে হবে।

(২) জাতীয় কল্যাণ ঃ কোন রাজনৈতিক দল সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সুবিধাজনক নয়। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বশীভূত হওয়া কোনক্রমে উচিত নয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সমগ্র জাতির কল্যাণকে সম্মুখে রেখে কার্যনীতি নির্ধারিত করবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

(৩) রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা ঃ রাজনৈতিক দলগুলো যাতে স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দের উচিত সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলো ঊর্ধ্বতন কর্মচারীবৃন্দকে দলে টানতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যদি তারা কোন দলের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টি রাখে, তা হলে অন্য কোন দলই তাঁদের প্রতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারবে না। আজ শাসনভার এ দলের উপর থাকলেও কাল ঐ দলের উপর যে ন্যস্ত হবে না তা নয়। সুতরাং কর্মচারিবৃন্দের সেবা ও পরামর্শ নৈর্ব্যক্তিক ও পক্ষপাতশূন্য হওয়া উচিত।

(৪) আদর্শের আহ্বান ঃ কোন রাজনৈতিক দলের যেন সামরিক শক্তি না থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন দল যদি সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়, তা হলে উক্ত দলের সদস্যগণ অন্য দলের সদস্যগণকে ভীতি প্রদর্শন করে বা নাগরিকগণকে জোরপূর্বক সে দলের নীতি সমর্থন করতে বাধ্য করতে পারে। তা সমর্থন না করলে পরে তাদের নির্যাতন করতে পারে। ইতালির ফ্যাসিস্ট দল, জার্মানীর নাৎসী দল এ পথেই ক্ষমতা লাভ করেছিল এবং একনায়কতন্ত্রের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিল।

(৫) প্রাণবন্ত দলীয় নেতৃত্ব ঃ দলের নেতৃত্ব হওয়া উচিত সচল, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। দলের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত যেন সখ্যতার ও প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকে তাও দেখা প্রয়োজন।

একদলীয় ব্যবস্থা
Single Party System

আধুনিককালে তিন প্রকার দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। **প্রথম,** একদলীয় ব্যবস্থা, **দ্বিতীয়,** দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ও **তৃতীয়,** বহুদলীয় ব্যবস্থা।

একনায়ক শাসিত সরকারে সাধারণত একদলীয় ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। ইতালিতে ফ্যাসিস্ট দল, জার্মানীতে নাৎসী দল এ ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাশিয়াতেও শ্রমজীবীদের একাধিপত্য স্থাপনের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়। এ সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে একটি দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং অন্য কোন দলের কার্যক্রমকে নৃশংসভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও ঐ একটি মাত্র দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সকলকে দলের সভ্য হিসেবে গ্রহণ করাও হয় না। এ সকল দলকে ক্লাবের সাথেও তুলনা করা চলে, কারণ বিশেষ বিশেষ লোকদের দ্বারাই দলগুলো কার্যকর হয়। শুধুমাত্র সামাজিক অবস্থায় ভাগ্যবানদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। তাছাড়া এ ধরনের দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতার দু ধারা একত্রিত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান যিনি তিনিই একাধারে সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং দলের নেতাও। এভাবে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত দল রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করে ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের উপর ন্যস্ত হলেও তা দলের নেতাদের দ্বারাই প্রয়োগ করা হয়। একদলীয় ব্যবস্থায় বিচারকগণ থেকে আরম্ভ করে সেনাবাহিনী, এমনকি পুলিশ বাহিনীকেও দলের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যন্ত দলের নির্দেশমত চলে।

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অবশ্য এর যৌক্তিকতা অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদিগণের মতে আর্থিক পরিবেশই দল গঠনের উৎস। আর্থিক বিভিন্নতার উপর বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আর্থিক পরিবেশ শুধুমাত্র দল গঠনের উৎস নয়। তা সামাজিক জীবনকে ঘিরে যে সকল সংস্থা গড়ে ওঠে, তাদের সকলেরই সূতিকাগৃহ। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদে এক ও অভিন্ন আর্থিক পরিবেশ বর্তমান থাকায় এ সকল ক্ষেত্রে একটির অধিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারে না, উঠলে তা স্বাভাবিক হবে না। সুতরাং জনসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঐ একক রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়াই স্বাভাবিক।

এক দলীয় ব্যবস্থায় কিছু কিছু গুণও রয়েছে। **প্রথম,** একটি মাত্র দল রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা করে এবং উচ্চতম নেতৃবৃন্দের মধ্যে অহেতুক মনোমালিন্য, দলাদলি ও বিভেদ-দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করে। **দ্বিতীয়,** এ ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অত্যন্ত সচল, কর্মঠ ও তৎপর হয়ে উঠতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন বিলম্ব ঘটে না। মোটের উপর, একনায়কতন্ত্রের সকল গুণই একদলীয় ব্যবস্থায় আছে। **তৃতীয়,** এ ব্যবস্থায় দলের নেতাদের সাথে জনগণের সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে।

কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। **প্রথমত,** এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক। রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের মতভেদ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং জনসাধারণের বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গণতন্ত্র জনসাধারণকে ভিন্ন মত প্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদান করে। কিন্তু এক দলীয় ব্যবস্থা জনসাধারণকে এ সকল সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে এক প্রকার সমতা আনয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং তা রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্ধনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। **দ্বিতীয়ত,** এর ফলে জনগণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উদাসীন হয়ে পড়ে। অধ্যাপক ডুভারজার (Duverger) যদিও একদলীয় ব্যবস্থাকে 'বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উদ্ভাবন ("the great political innovation of the twentieth century") বলে চিহ্নিত করেছেন, তথাপি অনেক লেখক এ ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেন। অধ্যাপক ফাইনার (Finer) তার *Theory and*

Practice of Modern Government গ্রন্থে এক দলীয় ব্যবস্থাকে একনায়কের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও একনায়কতন্ত্রের মাধ্যম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ ব্যবস্থা নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় না, বরং নেতৃত্ব দখল করার সহায়ক হয় ("do not spread and encourgage leadership but monopolise it.")।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা
Dual party System

দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে একদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে ও অন্যদল বিরোধিতা করে। পার্লামেন্টারী সরকারে এরূপ বন্দোবস্ত সম্ভব। প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারে একদল সরকারকে সমর্থন করে ও অন্য দল আইন পরিষদে সরকারের বিরোধিতা করতে ব্যস্ত থাকে।

অনেকের মতে, দেশে দুটি দলের অস্তিত্বই স্বাভাবিক। একদল অতীতের জয়গান করতে ব্যস্ত, অন্য দল বর্তমানকে পিছে ফেলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনায় ব্যস্ত থাকে। তাই গণতান্ত্রিক দেশসমূহে সর্বপ্রথম মাত্র দুটি দলেরই উদ্ভব হয়। ইংল্যাণ্ডের টোরি ও হুইগ দল, আমেরিকার রিপাবলিক্যান ও ডেমোক্র্যাটিক দল এভাবে গড়ে উঠেছিল। ফ্রান্সেও সর্বপ্রথম দুটি রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হয়। অবশ্য ক্রমে সর্বত্র দুটির বেশি দলের উদ্ভব হতে লাগল। ইংল্যাণ্ডে রক্ষণশীল দল, উদারনৈতিক দল, সমাজতান্ত্রিক দল ও শ্রমিক দলের উদ্ভব হল। ফ্রান্সে কালক্রমে কয়েক ডজন রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করল। কিন্তু বেশ কিছুদিন আমেরিকায় দুটি দলই রাজনৈতিক অংগন আলোকিত করে রয়েছে। মাঝে অবশ্য কম্যুনিস্ট দল জন্মগ্রহণ করলেও তা জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে দুটি দলই আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতে কমপক্ষে ছোট বড় ৮০টি দল রয়েছে। বাংলাদেশে দলের সংখ্যা প্রায় ৫০টি।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণাবলী ও ত্রুটি
Merits and Demerits of Dual-Party System

প্রথমত, দেশে দুটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে সরকার গঠনের পক্ষে সুবিধা হয়। যে দল নির্বাচন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন অথবা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকারি দলের বিরোধিতা করে। ফলে সম্মিলিত সরকার (coalition government) গঠন করার প্রয়োজন হয় না। ফলে সরকার অন্য দলের সাথে বোঝাপড়া ব্যতীত নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। জনসাধারণ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারে সরকারের গুণাবলী ও ত্রুটি সম্বন্ধে। ফলে পরবর্তী নির্বাচনে তারা অন্য দলের পক্ষে ভোট দান করে সে দলকে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দলের নিয়মানুবর্তিতার ফলে সরকার এক নির্বাচন থেকে অন্য নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব লাভ করতে পারে। কোয়ালিশন সরকার সাধারণত হয় অস্থায়ী এবং বিভিন্ন চুক্তি ও বোঝাপড়ার ফলে তার কার্যক্রম তত দক্ষ হয় না। বরং ধামাচাপার মাধ্যমে কোনরূপে চলতে থাকে। কিন্তু স্থায়িত্ব এবং সুশাসনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ স্বল্পকাল স্থায়ী হলে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা কার্যে রূপ লাভ করতে পারে না। তাছাড়া এর ফলে সরকারের অভিজ্ঞতার ফলও দেশবাসী গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার সাধারণত স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে।

তৃতীয়ত, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় জনসাধারণ নির্বাচন কালে অতি সহজেই তাদের পছন্দসই দলকে ভোট দিতে পারে। তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্ত হয় না। কিন্তু বহু দলের মধ্যে বাছাই করতে তাদের মুস্কিলে পড়তে হয়।

চতুর্থত, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় জনগণের বিভিন্ন মতামতকে কতকগুলো সহজ বিকল্পে রূপান্তরিত করে এবং নির্বাচন জনগণের পছন্দকে সহজতর করতে পারে।

পঞ্চমত, এ ব্যবস্থায় সরকারি কার্যক্রম নিপুণভাবে সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা বেশি দেখা যায়। তথাপি এ ব্যবস্থা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। **প্রথম,** অধ্যাপক রামজে ম্যুইর (Ramsay Muir) বলেন, "দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা আইন পরিষদের সম্মান হানি করে এবং তা মন্ত্রিপরিষদের একনায়কত্বের সৃষ্টি করতে পারে।" তিনি আরও বলেন, "যেহেতু বিরোধী দল সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট করতে সর্বদা উদ্যোগী, সে জন্য সরকারি দল অনেক সময়ই বিবেক বর্জিত হয়ে সরকারের ত্রুটিসমূহ গোপন করতে থাকে এবং সুসময় ব্যতীত মুক্ত মনে ও খোলাখুলিভাবে সরকারের ত্রুটিসমূহ প্রকাশ করতে রাজি হয় না" ("Because the opposition will seize every possible opportunity of discrediting the government, party must swallow all its scruples and support the government in all it does, abdicating the duty of frank and candid criticism except when it is not likely to have any serious result.")।

ষষ্ঠত, এও বলা যেতে পারে যে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ভোটদানের ব্যাপারে ভোটারদের পছন্দ অনেকটা সীমিত করে তুলে। দেশের প্রচুর সংখ্যক ভোটার দু দলের কোন একটির প্রতি আকৃষ্ট নাও হতে পারে এবং দু দলের কোন একটিও জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব দান নাও করতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের মতামতের প্রতীক অনেক সময় কোন দলই হয় না এবং বিশ্ব সমস্যাগুলোর সম্বন্ধে সেখানকার পত্র-পত্রিকার আলোচনা থেকে মাঝে মাঝে তা প্রকট হয়ে ওঠে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হলকমের (Holcombe) উক্তি অতি সতর্কতার সাথে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা মোটামুটি সুখী জনসাধারণের জন্য সন্তোষজনক বন্দোবস্ত। কিন্তু যে সকল স্থানে বহুধাবিভক্ত মত প্রচলিত রয়েছে এবং যে সকল স্থানে বিশ্বাসের গভীরতা প্রবল, সে সকল স্থানে তা জনমত প্রকাশের জন্য উপযোগী নয়" ("The dual-party system is doubtless a convenient system for contented people, but it is not an efficient system for the expression of public opinion when the variety of opinion and the intensity of conviction are great.")।

বহুদলীয় ব্যবস্থা
Multiple party System

এ ব্যবস্থায় অনেকগুলো দল বর্তমান থাকে। ফ্রান্স, জার্মান ও ইতালিতে কোন কোন সময় কয়েক ডজন দলও দেখা যায়। এ দেশেও বেশ কয়েকটি দল আসরে নেমেছিল। ভারতেও বহু দলের ধারাবিবরণী অনেক সময় কানে তালা লাগায়।

বহু দলীয় ব্যবস্থার কিছু কিছু সুবিধা রয়েছে। **প্রথম,** বহুদলীয় ব্যবস্থা জনসাধারণকে পছন্দের বিস্তৃত ক্ষেত্র দিতে সমর্থ হয়। এক দল বা দুই দলের কর্মপদ্ধতি ভাল না লাগলে অন্য দলের নীতিকে আদর্শ মনে করে তারা ভোট দিতে পারে।

দ্বিতীয়, বহুদলীয় ব্যবস্থায় জনমতের বিভিন্ন আকার-প্রকার ও বিভিন্ন ধারাও প্রতিনিধিত্ব লাভে সমর্থ হয়। এতে কোন অংশ সুপ্ত থাকে না, কোন অংশ অপ্রকাশিত থাকে না।

তৃতীয়, এ ব্যবস্থায় দলীয় একনায়কত্ব গড়ে ওঠে না। কারণ তখন কোন দলেরই একচেটিয়া ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে জনমতের পূর্ণ মর্যাদা এ ব্যবস্থায় দেয়া সম্ভব হয়।

চতুর্থ, সরকার যুক্তভাবে গঠিত হওয়ায় তা কোনরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দোষে দুষ্ট হয় না ও অন্যায় আচরণে সাহসী হয় না। বোঝা-পড়া ও সমঝোতার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক নীতিও অনেকাংশে কার্যকরী হয়।

তবে এর গুণের চেয়ে ত্রুটিই বেশি লক্ষ্য করা যায়। **প্রথম,** মন্ত্রিপরিষদের স্থায়িত্ব না থাকলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অথচ বহু দলীয় ব্যবস্থায় কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয় না। আর যদি হয়, তা হলে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অন্য কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং উপদলের উপর নিপীড়নও চালাতে পারে। ভারতে কংগ্রেসের কার্যক্রম অনেকটা এরূপ। সুতরাং বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সম্মিলিত সরকার (coalition government) গঠিত হতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়, এ ব্যবস্থায় সরকারের নীতিগত ও নেতৃত্বগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। বরং তা ভুল বোঝাবুঝি, বিবাদ-বিসংবাদ, মন কষাকষি প্রভৃতির ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন একটি অঙ্গ দল সহযোগিতা পরিহার করলেই সরকারের পতন ঘটে। সুতরাং সরকার নির্ভর করে অনেক ছোট দলের তুষ্টি সাধনের উপর।

তৃতীয়, বহুদলীয় সরকার সংকটকালেও তৎপর হয়ে উঠতে পারে না।

সুতরাং বহুদলীয় ব্যবস্থা থেকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাই অধিকতর কার্যকর, কার্যক্ষম ও উত্তম বলে গণ্য হয়েছে। অধ্যাপক গেটেল বলেছেন, "যেখানে দুটি সুসংহত, পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল রয়েছে, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে বলে সাধারণত বিশ্বাস করা হয়" ("It is usually believed that the best political conditions exist where there are but two well organised and opposing political parties.")।

তবে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, জোর করে কোন কিছু কোন দেশে চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে যা জন্মলাভ করবে তাকেই সভ্যতার উত্তম ফসল বলে গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে এক বা দুটি রাজনৈতিক দল জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দান করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ, কেননা গণতান্ত্রিক ভিত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক পরিস্থিতি বাদ দিয়েও শুধুমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল গঠিত হতে পারে। ফলে বহুদলীয় ব্যবস্থা অসুবিধাজনক হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

জনমত
Public Opinion

জনমত বলতে জনগণ বা পাবলিক ও তাদের মত এ দুই জিনিসকে বুঝায়। লর্ড ব্রাইস বলেন, "জনমত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি" ("The aggregate of the views men hold regarding matters that affect the interest of the community")। জনগণের বাণী বা অভিমতকে ঈশ্বরের বাণী রূপেও কল্পনা করা হয় (*vox pupuli vox dei or voice of the people is the*

voice of god)। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনমতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই গণতান্ত্রিক শাসনকে জনমতের শাসন নামেও অনেক সময় অভিহিত করা হয় এবং জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু (life blood) বলা হয়।

জনমত যে সব সময় যুক্তিতর্কের ধার ধারে তা নয়। জনমত অনেক সময় ভাবাবেগেও চালিত হয়। রবার্ট পীলের (Robert peele) মতে, জনমত হচ্ছে, "বোকামি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, ভুল বোঝা, ঠিক বোঝা, একগুয়েমি ও খবরের কাগজের মতামতের এক বিরাট সংমিশ্রণ" ("The great compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, obstinacy and newspaper paragraphs")। টমাস বেইলি বলেন, "জনমত এতই উদাসীন এবং অন্য কাজে এত ব্যস্ত, এত পরিবর্তনশীল ও ভাব-প্রবণ, এত কম খরর ও ভাল খবর রাখে যে সমালোচকেরা তার ক্ষমতা সম্পর্কে ঠাট্টা করে থাকেন। তথাপি যে কোন অজ্ঞ ও অস্থির মতি দৈত্যের মত তা শক্তিতে প্রচণ্ড এবং সে শক্তি সে ভয়ঙ্করভাবে প্রয়োগ করতে পারে" .("Public opinion is so apathetic and pre-occupied, so changeful and impulsive, so well informed and misinformed that critics are apt to sneer at its power. It is a giant, who is fickle and ignorant, still has a giant's strength and may use it with frightful effect.")।

জনমত অত্যন্ত জীবন্ত ও গতিশীল। **প্রথম,** জনসাধারণের মত তখনই জনমতে রূপলাভ করে, যখন তা সর্বজনীন কল্যাণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক বিষয়াবলী সম্বন্ধেই সাধারণত জনমত গঠিত হয়।

দ্বিতীয়, নেতৃবৃন্দের মতামতই জনমত হয় না যদি না তা জনসাধারণের উপলব্ধি দ্বারা নিজস্ব ঢং-এ প্রকাশিত হয়। জনমত অন্ধ নয় এবং লক্ষ্যহীনও নয়।

তৃতীয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামতকেই জনমত বলা যায় না। অনেক সংখ্যালঘুদের মতও জনমতে রূপান্তরিত হতে পারে, যদি তা বিশ্বাসের গুরুত্বে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

লোয়েল (Lowell) তাই বলেছেন, "জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট নয় অথবা একমত হবারও প্রয়োজন হয় না, বরং সংখ্যালঘু অংশীদার না হয়েও বিশ্বাসের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নির্ভয়ে গ্রহণ করে" ("A majority is not enough and unanimity is not required, but the opinion must be such that while the minority may not share it they feel bound by conviction and not by fear, to accept")। তাই জনমতের 'জন' অস্পষ্ট হয়ে এবং 'মত' ধোঁয়াটে ও আবছা হয়েও জনমত গঠন করতে পারে। যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অসংবদ্ধ ধারণা, বিশ্বাস, কুসংস্কার ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে বোঝায়, তথাপি এ বিভিন্নতা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে কোন কোন সমস্যা মাথা তুলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সংহত ও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পদ্ধতির মধ্যে বিশোধিত হয়ে সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করে ও বহুসংখ্যক জনসাধারণের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখনই তা জনমতের মর্যাদা লাভ করে ও শাসন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার ক্ষমতা অর্জন করে। জনমত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতামত নয়। জনমত সর্বদা জনসাধারণের হিতাহিত সম্পর্কিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে যদিও অস্পষ্ট, ঘোলাটে বা ধোঁয়াটে হয়, তথাপি কালে তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হলে শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। তবে কার্যক্ষেত্রে জনমত সংখ্যাধিক্যের মতামতই বুঝায়।

জনমতের গুরুত্ব
Significance of Public Opinion

জনমত ধোঁয়াটে এবং ঘোলাটে হলেও তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। জনমতই গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল। জনমতের প্রভাবে আইন প্রবর্তিত হয়। জনমতের দাবিতে আইনের নতুন নতুন ধারা সংযোজিত হয়। শাসন ব্যবস্থাও জনমতের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। জনমতকে উপেক্ষা করে কোন শাসন নীতি প্রণীত হতে পারে না—হলেও তা টিকে থাকে না।

আধুনিক কালে যে সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাদের বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন জনমতের উপর নির্ভরশীল। তাই বলা হয়, "সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জনমত গণতন্ত্রের প্রথম উপাদান" ("An alert and intelligent public opinion is the first essential to democracy")।

শুধু গণতন্ত্র কেন, সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থায় জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী ও ইতালিতে যে ফ্যাসিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল সেখানেও জনমত সেভাবে গড়ে উঠেছিল। গণতন্ত্রের ব্যর্থতায় উত্যক্ত হয়ে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে এবং জাতীয় ঐক্যের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাই ছিল জার্মানীতে নাৎসী শাসনের মূল। অধুনা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেও জনমত অনুরূপভাবে গড়ে উঠে। সুতরাং এও দেখা যায় যে, "যেভাবে জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়, তার মাত্রার উপরেই সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে" ("Successful administration in modern state depends largely upon the way in which public opinion is formed and expressed")।

সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পর্যালোচন' করলেও এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 'সমগ্র বিশ্বই জনমত কর্তৃক শাসিত হচ্ছে, ("public opinion rules the world")। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও তাদের কার্যাবলির মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক জনমত। সুতরাং জনমত আধুনিক কালের শাসন সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জনমত সংগঠন রঙ্গমঞ্চে নায়কের আসনেই প্রায় সমাসীন।

জনমত সংগঠন

জনমত সংগঠিত হতে পারে বিভিন্ন কেন্দ্র, সংস্থা ও উপাদানের সাহায্যে। এক বিখ্যাত আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, জনমত সংগঠনের জন্য চারটি পদ্ধতি সাধারণত অবলম্বন করা হয়। **প্রথম,** জনকল্যাণকর কোন বিষয়ে জনসাধারণের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা গঠিত হয়। **দ্বিতীয়,** জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসাধারণ আলাপ-আলোচনা করে একমত না হলেও নতুন আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং জনমত দানা বাঁধতে থাকে। **তৃতীয়,** নেতৃবর্গের নীতি নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে প্রচারণার মাধ্যমে যখন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয় কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের দ্বারা। **সর্বশেষে,** জনসাধারণ যদি কোন নতুন বিষয় উত্থাপন করে এবং তা যদি জনগণ কর্তৃক সমর্থিত হয় তা হলেও জনমত সংগঠিত হয়।

জনমত সংগঠনের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। **জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকার দ্বারা, রেডিও ও টেলিভিশনের দ্বারা, আইন পরিষদ কর্তৃক ও রাজনৈতিক দলের দ্বারা** জনমত সুসংহত হয়, সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে ও উপযুক্তভাবে সংগঠিত হয়। লর্ড ব্রাইস বলেন, কোন বিষয়ে জনমত যাচাই করতে হলে আমাদের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখতে হবে কোন্ সংবাদে তাদের উপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে অথবা দিনে দিনে তা কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে।

জনমত আবার প্রচারকার্য, আবেদন ও নিবেদন দ্বারাও সংগঠিত হয়। রাজনৈতিক দল তার কার্যক্রম প্রচার করে কোন বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করে এবং তার পরে জনমত সংগ্রহ করতে পারে। জনসভায় ও বক্তৃতামঞ্চে তা প্রত্যক্ষভাবে সুসংহত হয় এবং একমুখী হয়ে আসুরিক শক্তিতে আপন প্রভাব বিস্তার করতে অগ্রসর হয়। জনমত বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের পানির মত এবং অবাধ গতিতে সম্মুখের বাধা বিপত্তিকে ভাসিয়ে দিতে পারে।

১। রাজনৈতিক দল কী? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য তা কী অপরিহার্য? (What is party system? Is it essential to democratic government?) [R. U. '82]

২। দলীয় ব্যবস্থার গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ বর্ণনা কর। রাজনৈতিক দলের ত্রুটি দূর করার জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে? (Discuss the advantages and disadvantages of the party system. How would you remedy its defects?)

৩। রাজনৈতিক দল কাকে বলে? আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি কী? (What is a political party? What are the functions of a political party in a modern state?)

৪। রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বর্ণনা কর। (Describe role of a political party.)

৫। রাজনৈতিক দলের গুণাবলী ও ত্রুটি বর্ণনা কর। রাজনৈতিক দলের ত্রুটি দূর করার জন্য সংবিধানে কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার? (Describe the uses and abuses of a political party. What safeguards should be provided in the constitution to mitigate its evils?)

৬। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও একনায়কতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার ভূমিকা বর্ণনা কর। (Discuss the role of the party system in a democratic and authoritarian state.)

৭। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থার উৎপত্তির কারণ দর্শাও। (Account for the rise of the single party system in the modern state.)

৮। রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে কেন? (Why do political parties grow?)

৯। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে? এর গুণাগুণ বর্ণনা কর। (What is a dual party system? Describe its merits and demerits.)

১০। দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of the dual-party system and multiple party system.)

১১। বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে? এর যৌক্তিকতা কী? (What is multiple-party system? What is its Justification?)

১২। জনমত বলতে কী বুঝ? জনমত সংগঠনের মাধ্যমসমূহ কী? (What do you mean by public opinion? What are the agencies for its formulation?)

১৩। আধুনিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রভাব ও ভূমিকা কী? (What are the influences of public opinion?)

১৪। রাজনৈতিক দল কাকে বলে? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বর্ণনা কর। (What is a political party? Discuss the role of a political party in a democratic state.)

[N. U. 1997]

রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা

CIVIL SERVICE

৪৩

সংজ্ঞা
Definition

সিভিল সার্ভিস বা স্থায়ী কর্মকর্তাদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেন, "রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দ বলতে বুঝি সেই সুদক্ষ কর্মচারীবৃন্দ, যাঁদের কার্যকাল স্থায়ী, যাঁরা নির্ধারিত হারে বেতন গ্রহণ করেন ও যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত" ("It is a professional body of officials, permanent, paid and skilled")। অগ্ (Ogg) বলেন, "রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দ হলে সুদক্ষ, পেশাদারী, অধীনস্থ কর্মকর্তা যাঁরা স্থায়িভাবে চাকরি করেন এবং রাজনীতির সাথে যাঁদের কোন সংশ্রব নেই" ("The body of the civil servants is an expert, professional, non-political, permanent and subordinate staff.")। অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট বলেন, স্থায়ী কর্মকর্তাবৃন্দের দলে বিচারকগণকে, সৈন্যবিভাগ, নৌ-বিভাগ প্রভৃতির কর্মকর্তাগণকে এবং আইন প্রণয়নকারিগণকে ফেলা হয় না, যদিও রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে যাদের বেতন দেয়া হয় তাদেরকে সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বা সিভিল সার্ভিসের দলে ফেলা হয়। সিভিল সার্ভিসের লোক বলতে আমরা সে সকল বিশেষ কর্মকর্তাদের বুঝি, যাঁরা বিশেষ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত হন এবং যাঁদের চাকরির শর্ত বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। **বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস বলতে আমরা কেন্দ্রীয় নিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে যাঁরা নিযুক্ত হন, সুনির্দিষ্ট কর্মের জন্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। স্থায়ীভাবে কর্ম করেন এবং বিশেষ কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন তাদেরকে বুঝি।**

শাসনকার্যে তাঁরাই স্থায়ী উপাদান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ স্থায়িভাবে শাসনযন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তাছাড়া, স্থায়ী কর্মকর্তাবৃন্দ রাজনীতির সাথে কোন সংশ্রব রাখতে পারেন না। নিয়োগের সময় তা লক্ষ্য করা হয়। কোন নির্বাচনে তাঁরা নির্বাচিত হতে পারেন না। রাজনৈতিক কোন বক্তৃতা করতে পারেন না। কোন সদস্যের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণা চালাতে পারেন না অথবা কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে পারেন না। অবশ্য ভোটদানের অধিকার তাঁদের রয়েছে। রাজনৈতিক অবস্থার জোয়ার-ভাঁটা তাঁরা নিশ্চেষ্টভাবে লক্ষ্য করেন, উপভোগ করেন, কিন্তু তাতে হস্ত প্রক্ষালন তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের কিছুই করার নেই। মন্ত্রিপরিষদ বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত নীতির বাস্তবায়ন তাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চরম কার্য। তাছাড়া এতটুকু কমও সম্ভব নয়, এতটুকু বেশিও প্রয়োজন নেই। তাই নদীর স্রোতের মত সরকার পরিবর্তিত হলেও বা সময়ের তালে তালে মন্ত্রিপরিষদ নাচতে থাকলেও সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সততার সাথে এবং আনুগত্যের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কোন্ দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল বা কোন্ দল ছিটকে গোল আলুর মত মাটিতে পুনরায় ঠাঁই পেল, তা লক্ষ্য করার সময় এ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নেই। তাদের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। মন্ত্রিগণ বা আইন প্রণেতাগণ শুধুমাত্র জননেতা ও নীতি নির্ধারক। তাঁরা শাসন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও নবাগত। সখের শাসক বললেও তাদের সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা হয় না। রামজে ম্যুরের (Muir)

মতে, "মন্ত্রিগণ শাসন বিভাগের ক খ গ না জেনেও আসর জমিয়ে বসতে পারেন।" সুতরাং শাসন বিভাগের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে জানতে হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রী বেচারাদের কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কর্মকর্তাদের পেশাদারী দক্ষতা, স্থায়ী কার্যকাল ও আনুগত্যের শপথ শাসন বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।

রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের কার্যাবলি
Functions of Civil Service

শাসনব্যবস্থায় স্থায়ী কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল রাষ্ট্রের যে সকল জটিল বিষয় পরিচালনা করতে হয় তা তাদের সাহায্য ব্যতীত কোন দিন আলো দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। সাধারণত সরকারের এক এক বিভাগ এক একজন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু মন্ত্রিগণ ও পার্লামেন্টের সদস্যগণ শাসন বিভাগীয় কার্যাবলিতে অপটু, দক্ষতাবিহীন ও সাধারণ। তাছাড়া রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁরা এত ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁদের সময় থাকে না শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে দেখার। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ কতকগুলো সাধারণ নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হন। কিন্তু এ সকল নিয়ম-প্রণালী বাস্তবায়ন করার জন্য ও সর্বজনীন কল্যাণ সাধনের জন্য রয়েছেন সে সকল দক্ষ, স্থায়ী ও বেতনভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। সুতরাং শাসন বিভাগের বাস্তবরূপ দান করতে হয় কর্মকর্তাদের।

এখানে আর একটি বিষয়ও অনুধাবনযোগ্য। নীতি নির্ধারণ মন্ত্রিগণের দ্বারা হলেও তা কর্মকর্তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বিভাগীয় কর্মজ্ঞানের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। কারণ, তাঁরাই জানেন বাস্তবক্ষেত্রে কোন্ নীতি কোন্ পথে কার্যকর হবে। সুতরাং কর্মকর্তাদের বহু ধরনের কাজ করতে হয় ঃ

প্রথম, নীতি নির্ধারণের সময় তাঁরা মন্ত্রিগণকে বা পার্লামেন্টের সদস্যগণকে নীতি বা কর্মপদ্ধতি বাস্তবমুখী করতে সাহায্য করেন।

দ্বিতীয়, প্রণীত নীতিকে বাস্তবায়িত করা তাঁদের কাজ। তাই তাঁদের কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে বলা যায় যে, মন্ত্রিগণ ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু কর্মকর্তাদের কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত রাষ্ট্র একদিনও চলতে পারে না। সম্প্রতি এক ইংরেজ লেখক বলেছেন, "শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রেই মন্ত্রিগণ কর্মকর্তাদের অভিমত গ্রহণ করেন এবং তাদেরই নির্দেশ মত চিহ্নিত স্থানে স্বাক্ষর দান করেন" ("In ninety nine cases out of one hundred the minister simply accepts their views and sign his name on the dotted line.")।

বর্তমানে এর গুরুত্ব আরো বেড়েছে

বর্তমানে রাষ্ট্র জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অতীতে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের কার্যপরিধি নির্দিষ্ট থাকত, বর্তমানকালে তা প্রসারিত হয়েছে। ফলে কর্মকর্তাবৃন্দের কার্যক্রমের সীমা সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা দরিদ্রের সাহায্য বিতরণ থেকে আরম্ভ করে সৌখিন প্রেক্ষাগৃহের অঙ্গসজ্জা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের জটিলতা থেকে আরম্ভ করে রাস্তার বাঁক সোজা করা পর্যন্ত বিভিন্নরূপ কার্যে ব্রতী রয়েছেন। তবে তাদের হাজারো কাজের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম, আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন করলে কর্মকর্তারা তার কার্যকারিতার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। তাকে 'ভারাপিত আইন' (delegated legislation) নামেও অভিহিত করা

হয়। আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ রীতি-নীতি তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। তা বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভব বলেই তাঁদের উপরই ন্যস্ত করা হয়।

দ্বিতীয়, তারা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণ করেন। জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। তাঁদের দাবি দাওয়া সম্বন্ধেও বিভাগীয় কর্মকর্তাকে জ্ঞাত করেন। তিনি মন্ত্রীর নজরে এনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নে সাহায্য করেন এবং জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য অগ্রসর হন। তাই বলা হয় এবং "কর্মকর্তাদের ব্যাপক প্রভাব ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত সরকার কতকগুলো নিয়ামবলীর সমষ্টিতে পরিণত হয়, তা জনগণের মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত হতে পারে না" ("There can be no denying that without the all-pervading and unremitting work of the civil servants, government would be only a jumble of rules and regulations, suspended in mid-air without any force and effect upon the people.")।

তৃতীয়, এও সত্য যে, যখন আইন পরিষদে মন্ত্রিগণ বক্তৃতা দেন তখন তাঁর পেছনে থেকে কর্মকর্তারাই কথা বলেন, কেননা প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই ঠিক করেন। প্রত্যেক কাজের প্রস্তুতি তাঁরাই গ্রহণ করেন এবং সমালোচকগণের উত্তরের জন্য যা প্রয়োজন তা কর্মকর্তাগণই ঠিক করে রাখেন। তাঁদের বক্তৃতাও তাঁরা লিখে দেন, এমনকি কোন্ সভায় নীরব থাকতে হবে, কোন্ সভায় উচ্চ স্বরে কথা বলতে হবে তাও ঠিক করে দেন কমকর্তারা।

চতুর্থ, কর্মকর্তারা সরকারি নীতিকে কার্যে পরিণত করেন এবং আইনকে কার্যকর করেন। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে তারা যেন সংযোগ চিহ্ন (hyphen)। সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূলে রয়েছে তাদের অবদান। তাঁদের আন্তরিকতা, সততা ও তৎপরতার উপর নির্ভর করে সরকারের উপযুক্ততা ও যোগ্যতা। তাঁরা যদি ইচ্ছাপূর্বক কোন সরকারকে ধ্বংসের পথে টেনে আনেন, তা হলে কারো সাধ্য নেই সে ধ্বংসের পথ রোধ করা।

সর্বশেষে, সরকারি-কর্মচারিবৃন্দ জাতীয় নীতি নির্ধারণেও সাহায্য করেন। আইন পরিষদের অনেক আইনের রচয়িতা এ কর্মকর্তারা। কারণ তাদের জনসংযোগের ফলেই জানা সহজ হয়ে ওঠে কোন্ ধরনের আইন দেশের জন্য প্রণীত হওয়া উচিত। তাঁদেরকে শাসন বিভাগের খুঁটি (Pivot) বলে আখ্যায়িত করা হয়। জনকল্যাণের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ বা আলোর মত তাঁরা। তাঁদের ভূমিকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর উত্তম সংগঠনের দিকে সকলের দৃষ্টি থাকা উচিত.

সরকারি কর্মকর্তার উপযুক্ত সংগঠন
Organisation of the Civil Service

কর্মকর্তাদের সংগঠন সম্পর্কে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সব পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তাদের উল্লেখ প্রয়োজন। তা হলো, তাদের নিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়ম-কানুন, কার্যকাল, পেনসন ও পদোন্নতির পদ্ধতিসমূহ, তাদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী এবং দায়িত্বশীলতার বিধানাদি।

প্রথম, এটি অবশ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, রাজনৈতিক নেতাদের—যেমন মন্ত্রী বা গভর্নর বা অনুরূপ পদাধিকারিগণের কর্মকর্তা নিয়োগ ব্যাপারে কোনরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। কর্মকর্তাগণ সাধারণত নিযুক্ত হন কর্ম কমিশনের দ্বারা। কর্ম কমিশন অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়োগের বেলায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে এবং বস্তুত তাই করা হয়। ফলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী, তৎপর, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই এই গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারেন। এ পদ্ধতিতে নিযুক্ত না হলে বা রাজনৈতিক নেতা কর্তৃক তাদের নিয়োগ করা হলে স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও অন্যান্য ত্রুটি ঢুকে পড়তে পারে। অভিজ্ঞতার শিক্ষাও তাই। এককালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের spoils system-এ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের জন্য চাকরি সংরক্ষিত থাকত। ইংল্যাণ্ডের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেছেন, "রাষ্ট্রের বহিঃবিভাগ (foreign office) অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত থেকে ইংরেজ অভিজাতগণের জন্য সাহায্য বিভাগে পরিণত হয়েছিল' ("Out door relief department of the English aristocracy")। তাছাড়া মন্ত্রিগণের দ্বারা তাঁরা নিযুক্ত হলে মন্ত্রিগণ অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করতে পারেন, যাতে তাঁরা মন্ত্রিগণের বাধ্য থাকতে পারে। ফলে কর্মচারিগণের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মান অনেকটা অবনত হতে পারে। সুতরাং তাদের নিয়োগ রাজনৈতিক কর্মকর্তাগণের দ্বারা হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়, কর্মকর্তাদের কার্যকাল ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম পদ্ধতি ইতোমধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সকল নিয়ম-কানুন প্রচলিত রয়েছে, তাতে কর্মকর্তাদের কার্যকাল সরকারের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। সিভিল সার্ভিসের নিয়মানুসারে তাঁদের চাকরির কার্যকাল স্থায়ী হয়। সরকারের পরিবর্তনের সাথে তাদের পরিবর্তনের কোন সম্বন্ধ নেই। যে কেউ একবার এ গোষ্ঠীভুক্ত হলে তিনি চাকরি সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত হতে পারেন। তাঁদের চাকরির উন্নতি যদিও দক্ষতা, যোগ্যতা, উত্তম আচরণের উপর নির্ভরশীল, তথাপি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়সকাল পর্যন্ত মোটামুটি তাঁরা চাকরি সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারেন। তাঁদের পদোন্নতি সম্বন্ধে সাধারণত চাকরি ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা (Seniority) ও সাধারণ যোগ্যতার মানকে মনে রাখা হয়। যদিও সকল বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, তথাপি সাধারণত উপরোক্ত মানের উপরই পদোন্নতি দেয়া হয়। কারো বেলায় অসাধারণ যোগ্যতা লক্ষ্য করা হলে উন্নত পদমর্যাদা দ্বারা তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

তৃতীয়, এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, সরকারি কর্মকর্তারা স্থায়ী কার্যকাল নিয়ে নিশ্চিত হয়ে পড়লে দায়িত্বহীনও হয়ে পড়তে পারে। তাদের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তার সদ্ব্যবহারের কিছু কিছু নিশ্চয়তা বিধানও দরকার। তা সম্ভব হয় যদি কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন যে, বিশেষ বিশেষ কারণে তাঁরা বরখাস্তও হতে পারেন। অশোভন আচরণ, অযোগ্যতা, দুর্নীতিপরায়ণতা ও অন্যান্য অন্যায়ের জন্য তাদের শাস্তির বিধান থাকা উচিত। তবে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ন্যস্ত না হয়ে এ ক্ষমতা যদি হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের হাতে ন্যস্ত হয় তা হলে উত্তম হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেন তাদের সাবধান করে দিতে পারেন, তারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ কর্মকর্তাদের নিকট থেকে কাজ আদায় করতে হলে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুগত করে রাখতে হবে।

চতুর্থ, কর্মকর্তাদের সংগঠন সম্বন্ধে আরো বলা প্রয়োজন যে, তাদের সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে। সরকারের প্রকৃতি ও রূপ যাই হোক না কেন—আইনের গণ্ডীর মধ্যে থেকে তাদের অনুগতভাবে কাজ করে যেতে হবে। গোপনীয়তা রক্ষা করে পরস্পর বিরোধী দলীয় সরকারেও যেন তারা কাজ করে যেতে পারেন, এমন শিক্ষা ও মনোবল তাঁদের থাকা উচিত। ইংল্যাণ্ডের রাজকর্মচারিগণের কাজকর্ম এ দিক থেকে আদর্শ স্থানীয়।

সর্বশেষে, আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা যেন নির্ভয়ে কাজ করতে পারেন এজন্য মন্ত্রিগণের উচিত বিভাগীয় কাজের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা। তা না হলে তাঁরা অনেকটা অসহায় অবস্থায় পড়তে পারেন এবং সুষ্ঠুভাবে কর্ম পরিচালনা ব্যাহত হতে পারে।

কী উপায়ে কর্মকর্তাদের নিকট থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ আদায় করা যায়
How to Make the best Use of the Civil Service

যদিও শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সুদক্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ অপরিহার্য এবং যদিও তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি সর্বত্র এর মান তেমন সন্তোষজনক নয়। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে কুলীন ও লৌহ বর্মে ঢালাই করা আই. সি. এস. (ICS) কর্মকর্তারা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের মত রাষ্ট্রেও যেখানে কর্মকর্তাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, সেখানেও তা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। পাকিস্তানে আই. সি. এস:-দের উত্তর পুরুষ সি. এস. পি. (CSP) কর্মকর্তাগণ তীব্র সমালোচনার মুখোমুখী হয়েছেন অনেকবার। কোথাও তাদের অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততার দোষে দোষী করা হয়। কোথাও তাদের আমলাতন্ত্রের দোষে দুষ্ট মনে করা হয়। কোথাওবা তাঁরা 'বলগা হারা ঘোড়ার মত দায়িত্বহীন' বলে নিন্দাবাদ শ্রবণ করেন। আবার কোথাও কোথাও তাঁদের হাতে অবাধ ক্ষমতা ন্যস্ত করার ফলে শাসনব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। অধ্যাপক লাস্কির (Laski) মতে কর্মকর্তাদের মধ্যে দুটি দোষ দেখা দিতে পারে যা অত্যন্ত দুঃখজনক হয়। **প্রথম,** রুটিন মাফিক কাজের ধরাবাঁধা নিয়মে শাসন বিভাগীয় কাজে তারা আবদ্ধ হতে পারেন। **দ্বিতীয়,** তাঁরা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন এবং লালফিতার দৌরাত্ম্যে জাতীয় জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সমস্যাগুলো চাপা পড়ে যেতে পারে। সুতরাং এর সংগঠন এমন হওয়া উচিত যাতে তারা সর্বদা কার্যক্ষম থাকতে পারেন এবং জনগণের আস্থাভাজন হয়ে সর্বজনীন কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে পারেন দস্তুরমতো। অধ্যাপক লাস্কি তাঁর বিখ্যাত *A Grammar of Politics*-গ্রন্থে এ সকল ত্রুটির মূলে আঘাত করে কর্মকর্তাদের অধিকতর কার্যক্ষম ও জাতীয় জীবনের জন্য অধিকতর উপযোগী করে তুলতে তিনটি পন্থার উল্লেখ করেন।

প্রথমত, কর্মকর্তাদের কার্যাবলি তাঁদের নিকট অত্যন্ত আনন্দের ও আগ্রহের কার্যাবলিতে রূপান্তরিত হতে হবে। "তিনি যা চান তা হলো, মনের স্ফূর্তি ও নতুনত্ব, নতুন নতুন সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা ও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মানসিকতা" ("What he needs, above all, is freshness of mind, the ability to make new contacts and to assimilate new experience")। তাঁরা যদি বছরের পর বছর ধরে একই স্থানে একই ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে থাকেন তা হলে মনের সজীবতা হারিয়ে ফেলতে পারেন। তাই কার্যক্ষেত্রের পরিবর্তন তাঁদের নিকট টনিকের মত কাজ করবে। কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যদি তাঁরা নতুন নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন, তা হলে নতুন মনোবল নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে পারবেন এবং নতুন কাজের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য শুধুমাত্র মনের ডালা তারা পূর্ণ করবেন তা নয়, দৈহিক বল ও উদ্যমের দ্বারা কাজটি সার্থক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এমন পরিবেশ তাঁদের কার্যক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে হবে, যেন তাঁরা একঘেঁয়ে বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়েন। তাছাড়া, বিভিন্ন সংস্থা বা সংঘের সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা উচিত, কারণ, তাতে তাঁরা জনসাধারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারেন এবং মতামত বিনিময় করে মনকে সতেজ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁদের নিবিড়তম সংযোগ রক্ষা করা আবশ্যক। অধ্যাপক লাস্কি বিভিন্ন দেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এর ফলে দুটি লাভ হতে পারে। **প্রথম,** কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর যথাযথ অধ্যয়ন সমাপ্ত করতে পারেন। **দ্বিতীয়,** তাঁরা মনের মত পরিবেশে বিভিন্ন কাল্পনিক সমস্যাকে দাঁড় করিয়ে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে চুলচেরা বিশ্লেষণে সম্যক উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তাদের উত্তম শিক্ষা ও অনুশীলন সম্ভব হতে পারে। অন্যত্র তাঁরা উপরওয়ালার হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় হয়ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আনয়নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাও চালাতে পারেন। কিন্তু এখানে তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে তা পারেন। ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান The Institute of Public Administration, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের The Institute of Government Research অত্যন্ত উত্তমরূপে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যে সহায়তা করছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইলিয়াম বিভারেজের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "তিনি সিভিল সার্ভিসকে একটি জ্ঞানী-গুণীদের পেশায় পরিণত করতে চান যদিও তা একটি সাধারণ পেশা" ("The Civil Service is a profession and I should like it to become and realise itself as a learned profession")। পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কর্মকর্তাদের শাসন সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন নিবন্ধ পাঠ করা উচিত এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ লেখা উচিত। তাছাড়া বিভাগীয় আওতায় আলোচনার উপযোগিতা না থাকলেও সহযোগিতা ও পরামর্শের সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত।

চতুর্থত, সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যকাল অধিক দিন স্থায়ী হওয়া উচিত নয়। এ বিভাগের প্রধানতম বিপদই হলো চাকরির স্থায়িত্ব যা তার বৈশিষ্ট্য। ফলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বেলায় পুরাতনের এমন এক আস্তরণ পড়ে যেতে পারে, যার ফলে নতুনত্বের আমদানি সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়। অথচ পরিবর্তিত অবস্থার মুখোমুখি হতে হলে অনেক সময়ই নতুন নতুন পদ্ধতিতে সমস্যার মোকাবেলা করার প্রয়োজন হতে পারে। যেহেতু মন্ত্রিগণের ভুলের ঝুঁকি তারা বহন করেন, সেহেতু কর্মকর্তারা সাধারণত কম বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। "দক্ষ মন্ত্রী কর্মকর্তাদের সেকেলে ভাবধারার প্রতি পক্ষপাতকে দূর করতে পারেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি জোর দিয়ে, যদিও কর্মকর্তা ভুলই হয়ত করলেন এবং মন্ত্রিমহোদয় তাই সমর্থন করলেন। সকল মন্ত্রী সুদক্ষ হতে নাও পারেন" ("A skilful minister can doubtless remedy this passion for the orthodox by insisting on experiment and defending his department even when it has obviously blundered; not all ministers are skillful")।

অধ্যাপক লাস্কি আরও বলেন যে, এ অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি তিনটি উপায়ে ঃ

(১) আট কী দশ বছর চাকরি করে তাঁরা যদি বুঝতে পারেন যে, তাঁরা উক্ত কাজের জন্য যোগ্য নন বা তাঁরা বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিতে চান তাঁদের পদত্যাগপত্র সহজে গ্রহণ করে।

(২) কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে কিছু কিছু লোককে অন্য কোন বিভাগে নিয়োগ করে এবং বিভাগে নতুন নতুন লোকের আগমনের সুযোগ দান করে।

(৩) অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা অত্যন্ত উর্ধ্বে না রেখে। তাঁর মতে, কোন দায়িত্বশীল পদে কারো ৫৫ বছরের উর্ধ্বে কাজ করা উচিত নয়। তাঁর পূর্বে তাঁর অবসর গ্রহণ করা উচিত।

নিম্নতম কর্মকর্তাদের জন্যও তিনি কিছু কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের মধ্যেও যে প্রতিভাশালী কর্মকর্তা বা সম্ভাবনাময় ব্যক্তি নেই তা স্বীকার করা ঠিক নয়। তাই তাঁদের মধ্যে কেউ যদি যোগ্যতার মাপকাঠিতে যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয় তা হলে তাকেও উপরে উঠার সুযোগ দেয়া উচিত। বিশেষ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে প্রমোশনের সুযোগ দান করলে তাদের মধ্যেও কর্ম চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যাবে এবং ফলে অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সেবায় পাওয়া সহজ হবে।

কর্মকর্তাদের অধিকতর দেশসেবা ও জনকল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করতে হলে তাঁদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যেন তাঁরা দেশের প্রয়োজন কী তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারেন এবং দেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের কর্মকর্তাদের শিক্ষা ও ট্রেনিং দান করা হত ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায়। ট্রেনিং গ্রহণের পর তাঁরা দেশের জনসাধারণ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন এবং দেশকে শাসন করার মনোভাব লাভ করতেন। আহারে, বিহারে, চলাফেরায়, কথাবার্তায় তাদের মধ্যে এমন কতকগুলো লক্ষণ প্রকাশ পেত, যা বিজাতীয় কর্মকর্তা আই. সি. এস–দের মধ্যে দেখা যেত। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধেই তাঁরা যেন সচেতন থাকতেন। ফলে শাসন কার্যের মান উন্নত হলেও হতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের কাজকে নিজেদের বলে গ্রহণ করতে পারে না। তাই জনহিতকর কর্মে বা সার্বজনীন কল্যাণে তারা পদে পদে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাই তাদের জাতীয় পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেয়া উত্তম।

১। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং তাদের কার্যাবলি কী কী? (Define civil service and what functions does it perform?)

২। গণতন্ত্রে স্থায়ী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দের ভূমিকা বর্ণনা কর। (Describe the role of the parmanent civil servants in a democracy.)

৩। "রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দের সংগঠনের বিপদ হলো রুটিন মাফিক কাজের জড়তা ও আমলাশাহী"— এ সম্বন্ধে তোমার মত কী? এ বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য তুমি কী পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী? ("The chief dangers of the civil service are rigidity of routine and growth of a bureaucratic spirit". —Do you agree with this view? What methods would you suggest to remove these dangers?)

৪। আদর্শ রাষ্ট্রীয় কর্মবিভাগের সংগঠন সংস্কার করতে হলে কীভাবে তা সম্ভব? (How can you organise an ideal civil service so that it may work properly?)

৫। রাষ্ট্রীয় কর্মবিভাগ সংগঠন ত্রুটিমুক্ত করতে হলে কী কী পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন? (What methods are necessary to keep civil service free from defects?)

৬। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বাছাই করার পদ্ধতি কী হওয়া উচিত? তাদের কী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেয়া যায়? (What should be the method of selecting civil servants? Should they be allowed to take part in politics?)

জাতিসংঘের জন্ম
Birth of the U. N. O.

বিংশ শতাব্দীর পক্ষে বহু ওকালতি করেও তাকে দু দুটি বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হবার দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার জয়ভেরী, মানুষের সার্বিক কল্যাণের মুক্ত ধারা এবং আকাশ-বাতাস জয়ের নব নব উদ্যম বিংশ শতাব্দীকে গৌরবময় করে তুলেছে। মানুষ পৃথিবীতে বাস করে আর ক্ষান্ত হতে চায় না। চন্দ্র ইতিমধ্যে বিজিত হয়েছে। মঙ্গল এবং বুধে তার অভিযান শুরু হয়েছে। কোন শুভ প্রভাতে মানুষের সে আকাঙ্ক্ষাও পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু দুটি ধ্বংসলীলার সূতিকাগৃহ ও দানবীয় তাণ্ডবলীলার ক্ষেত্র হিসেবে কে তাকে গৌরবময় ভূমিকায় দেখে খুশি হবে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোটিখানেক নর-নারী ও শিশু কীটপতঙ্গের ন্যায় মারণাস্ত্রের মুখে প্রাণ দিয়েছে। কে এ কলঙ্ক থেকে একে মুক্তি দেবে?

মানুষ আশাবাদী। তাই ধ্বংসস্তূপে বসে সে স্বর্গ রচনায় অগ্রসর হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে তাই বিশ্বের নেতৃবর্গ একত্রিত হয়ে জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন তাঁর একাগ্রতায় এ পথে অগ্রসর হয়ে সফলতা অর্জন করেন। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর জন্ম হয় জাতিপুঞ্জের (League of Nations)। তার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করা। কিন্তু জাতিপুঞ্জ সে লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ হয় নি। জাতিপুঞ্জ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আক্রমণ রোধ করতে ব্যর্থ হয়। আবিসিনিয়ায় ইতালির ক্ষুধার্ত হাত নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয় নি। জার্মানির রাইনল্যাণ্ডের দখলকেও প্রতিরোধ করতে পারল না। দেখাদেখি রাশিয়াও ফিনল্যাণ্ড গ্রাস করল। সর্বোপরি ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল তখনই জাতিপুঞ্জের সমাধি রচিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন পৃথিবীর মানব মনে যুদ্ধের বিভীষিকা পীড়া দিচ্ছিল এবং সকলে শান্তির জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় সুদিনের অপেক্ষা করছিল, তখন বিজয়ী পক্ষের ক্লান্ত নায়কবৃন্দ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সংঘ বা সংস্থা স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিলেন যা যুদ্ধের বিভীষিকা চিরতরে পৃথিবী থেকে দূর করতে সক্ষম হবে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং মানুষকে ধাপে ধাপে শান্তির হিমাচলে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর ওয়াশিংটনের ডাম্‌বারটন ওক্‌স (Dumberton Oaks) নামক প্রাসাদে গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিবৃন্দ মিলিত হয়ে একটি সুসংহত সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ডাম্‌বারট্রন ওক্‌স প্রস্তাবের উপর ইয়ালটায় (Yalta) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেলট (Roosevelt), ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল (Churchill) ও রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন (Stalin) এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং পরে ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সে সংস্থার নিয়মাবলী রচনার উদ্দেশ্যে আমেরিকার সানফ্রানসিসকোতে মিলিত

হবার বন্দোবস্ত করেন। তদনুসারে সানফ্রানসিসকোতে ৫০ জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ মিলিত হয়ে জতিসংঘের চার্টার বা মৌলিক নীতিগুলো নির্ধারণ করেন। এ মৌলিক নীতিগুলোর ভিত্তিতে পৃথিবীতে স্থায়িভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর সম্মতি ও ঐকান্তিক আগ্রহকে কেন্দ্র করে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ২৪ অক্টোবর তারিখে জাতিসংঘ (U. N. O.) জন্ম লাভ করে।

জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Aims and Objective of the U. N. O.

জাতিসংঘের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

প্রথম, জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তার নিশ্চয়তা বিধান করা। শান্তির লক্ষ্যে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তা সম্মিলিতভাবে অভিযান চালিয়ে যাবে। তা আক্রমণাত্মক কোন কাজ বা শান্তিভঙ্গের কারণগুলো প্রতিরোধ করবে ("Acts of aggression or other breaches of peace")।

দ্বিতীয়, জাতিসংঘ জোর প্রয়োগের কোন নীতি অবলম্বন করবে না। আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহের মীমাংসা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য সচেষ্ট হবে। ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে চলবে।

তৃতীয়, সমান অধিকারের নীতিতে ও আত্মনির্ধারণের ভাবাদর্শে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করাও জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ("To develop friendly relations among nations, based on respect for the principle of equal right and the principle of self-determination of peoples.")।

চতুর্থ, সৌভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ কাজ করে যেতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

পঞ্চম, বিশ্বে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অধিকারগুলো সুদৃঢ় করা এবং পৃথিবীর সর্বজনের ও সর্বজাতির মধ্যে তার ব্যাপক প্রয়োগের জন্যও জাতিসংঘ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সনদ তৈরি করা হয়।

ষষ্ঠ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবীয় বহুবিধ আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্যও জাতিসংঘ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে যাবে।

সর্বশেষে, উল্লিখিত বিষয়সমূহে বিভিন্ন জাতির কর্মনিচয়কে সংঘবদ্ধভাবে সার্থক করে তোলার জন্যও জাতিসংঘ পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছিতে সচেষ্ট হবে।

তাই জাতিসংঘের সনদের মুখবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে, "জাতিসংঘের জনসমূহ আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কারণ আমাদের জীবদ্দশায় দু বার সংগঠিত হয়ে মানবের উপর অকথ্য ও অবর্ণনীয় যে দুঃখের স্রোত এনেছিল তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমরা মানবের মৌলিক অধিকারের প্রতি পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সামাজিক উন্নতি ও জনসাধারণের উন্নত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য দৃঢ় সংকল্প রয়েছি। এজন্য আমরা সহিষ্ণুতা ও শান্তিতে একত্রে বসবাস করতে প্রস্তুত রয়েছি ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের জন্য মিলিতভাবে কাজ করতে রাজি আছি" ("We, the peoples of the United Nations, are determined to save the succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life time has brought untold sorrow to mankind and to reafirm faith in fundamental human rights, promote

social progress and better standard of life, in larger freedom and for these ends to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours and to unite our strength to maintain international peace and security.")।

জাতিসংঘের নীতিসমূহ
Principles of the U. N. O

জাতিসংঘ সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমান অধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছে। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব কোনক্রমে ব্যাহত হয় নি। তাই জাতিসংঘকে কোনক্রমে বিশ্বরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক যুক্তরাষ্ট্র নামে অভিহিত করা সঙ্গত নয়। জাতিসংঘ সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রসমূহ যে অধিকারের দাবিদার হবেন তা পালন করা হবে। তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ এমনভাবে সমাধান করবে, যাতে তাদের কার্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বোধ কোনক্রমে বিঘ্নিত না হয় এবং কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের বৈদেশিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি এমনভাবে প্রয়োগ করবে যাতে অন্য কোন রাষ্ট্রের সংহতি, নিরাপত্তা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা কোন রূপে ক্ষুণ্ন না হয়। জাতিসংঘ এমনভাবে কার্যক্রম নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে যেন অসদস্য রাষ্ট্রগুলোও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে কার্য করতে পারে। তাছাড়া, তা সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। জাতিসংঘের সদস্যপদ যে কোন শান্তিকামী রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত। তবে শুধুমাত্র তারাই সদস্যপদ লাভ করবে, যারা দায়িত্ব পালনে স্বীকৃত হবে। কোন রাষ্ট্র যদি পদে পদে জাতিসংঘের নীতিগুলো পদদলিত করে চলতে থাকে, তবে তার সদস্যপদ নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বাতিল করা হবে।

জাতিসংঘের প্রধান বিভাগসমূহ
Main Organs of the U. N. O

জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান বিভাগ রয়েছে,ঃ (১) সাধারণ পরিষদ (The General Assembly), (২) নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council), (৩) অছি পরিষদ (The Trusteeship Council), (৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council), (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice) এবং (৬) শাসন বিভাগীয় সংস্থা (The Secretariat)।

(১) সাধারণ পরিষদ (The General Assembly) ঃ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। বর্তমানে সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৯২-এ উন্নীত হয়েছে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র সর্বাধিক ৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে কিন্তু ভোট দেবার প্রয়োজন হলে প্রত্যেকে একটি করে ভোট দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্রের আয়তন ধর্তব্যের মধ্যে নেয়া হয় না। সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন বছরে একবার বসে এবং সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখের পর প্রথম মঙ্গলবারে অধিবেশন শুরু হয়। তবে সংখ্যাধিক্যের মতানুসারে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনক্রমে জাতিসংঘের সাধারণ সম্পাদক বা সেক্রেটারী জেনারেল বিশেষ অধিবেশন আহবান করতে পারেন। প্রত্যেক অধিবেশনে সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন, সভার কাজ পরিচালনা করেন এবং কার্যবিবরণীর ধারাবাহিকতা নিয়ন্ত্রণ করেন। জাতিসংঘের মৌলিক নীতিভুক্ত যে কোন বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে।

বিশ্বে শান্তিভঙ্গ হতে পারে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কোন বিষয় থাকলে সাধারণ পরিষদের কোন কিছুই করার থাকে না। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যগণকেও সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত করে এবং জাতিসংঘের অন্যান্য বিভাগের সদস্যগণকে নির্বাচিত করার দায়িত্ব সাধারণ পরিষদের। তাছাড়া, সাধারণ পরিষদ বিভিন্ন কমিশন ও সংস্থাসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য তা সচেষ্ট হয় এবং সে উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সংস্থা সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অনুসন্ধান কার্য চালাতে পারে। জাতিসংঘের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও ব্যয় বরাদ্দও সাধারণ পরিষদ সম্পন্ন করে এবং কোন সদস্যকে বাৎসরিক কত পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে হবে তা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরস্ত্রীকরণের বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। আইনগতভাবে সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিত ছয়টি কমিটি গঠন করতে পারে ঃ (১) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা কমিটি, (২) আর্থিক ও অর্থনৈতিক কমিটি, (৩) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণকর কমিটি, (৪) অছি কমিটি, (৫) শাসন বিভাগীয় ও ব্যয় সংক্রান্ত কমিটি এবং (৬) আইন সম্বন্ধীয় কমিটি।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) ঃ সরকারের যেমন আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগ, তেমনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ। যদিও সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন, তথাপি নিরাপত্তা পরিষদই অধিকতর কার্যকর। প্রধানত এর উপর বিশ্বশান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের ভার ন্যস্ত।

এ পরিষদ বর্তমানে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্যগণ নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ ঃ (১) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, (২) ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য, (৩) রাশিয়া, (৪) ফ্রান্স ও (৫) চীন। অন্য দশজন সদস্য সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে অঞ্চল ভিত্তিতে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সদ্য অবসর প্রাপ্ত সদস্য পরবর্তী নির্বাচনে পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন না। প্রত্যেক মাসে সভ্যবৃন্দের মধ্য থেকে ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। সদস্যগণের একটি মাত্র ভোট রয়েছে। পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে অন্ততঃপক্ষে স্থায়ী সদস্যসহ যে কোন নয় জনের সমর্থন এবং অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

এই পরিষদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ৫ জন স্থায়ী সদস্যের হাতে এক বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তাঁদের যে কেউ 'ভেটো' (veto) প্রদান করে যে কোন প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারেন। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যেহেতু তাঁরাই দায়ী থাকেন, সেজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো যেন নেহায়েত ভোটের জোরে তাদের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে আবার বিশ্বে কোন জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারেন, তার জন্য এ সাবধানতা। অবশ্য এ ভেটো প্রদান ক্ষমতার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ-প্রয়োগ ঘটেছে। বিশ্বের সুবিধার জন্য না হয়ে সাধারণত তা রাষ্ট্রসমূহের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে বড় পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রভুত্বই জাতিসংঘে কায়েম হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কাজ বিশ্বের শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকরণ। নিরাপত্তা পরিষদ যেন জাতিসংঘের নির্বাহী বিভাগ। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক জাতিসংঘের প্রায় সকল কার্যই সাধিত হয়। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদের সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিরাপত্তা পরিষদ একদিকে শান্তি রক্ষক অন্যদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা। শান্তি রক্ষক হিসেবে তা বিশ্বের শান্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তা বিশ্বের গোলযোগ ও

বিবাদ বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বন্দোবস্ত করে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিবাদ বাধলে তা মিটাবার বন্দোবস্ত করে। এই পদ্ধতিকে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান পদ্ধতি (conciliation) বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শুভেচ্ছার দ্বারা (good offices), মধ্যস্থতার মাধ্যমে (Mediation) এবং তৃতীয় ব্যক্তির সিদ্ধান্ত দ্বারাও (arbitration) গোলযোগের মীমাংসা করতে নিরাপত্তা পরিষদ সাহায্য করে।

কিন্তু এ সকল পদ্ধতি ব্যর্থ হলে এবং নিরাপত্তা পরিষদ যদি অনুভব করে যে, গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করতে পারে, তখন তা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সৈন্য সামন্ত চলাচল শুরু হলে নিরস্ত্রীকরণেরও প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। যদি তাও কার্যকর না হয় এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র যদি শান্তির পক্ষে কাজ না করে, তবে তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে জাতিসংঘের সদস্যগণের সহযোগিতায় নিরাপত্তা পরিষদ অধিকতর কঠিন ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সাথে অন্য সকল রাষ্ট্রের জল পথ, আকাশ পথ, স্থল পথ, এমনকি বেতারের সম্পর্কও ছিন্ন করা যেতে পারে। তাও কার্যকর না হলে এবং নিরাপত্তা পরিষদ যদি অনুভব করে যে, বেসামরিক পদ্ধতিসমূহ যথেষ্ট নয়, তখন তা সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। তবে যেহেতু জাতিসংঘের কোন সামরিক বাহিনী নেই, তাই এ পদ্ধতি রাষ্ট্রসমূহের আন্তরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। কঙ্গোতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাবার জন্য সামরিক বাহিনী পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদ। ১৯৯২ সালে কুয়েত মুক্ত করার জন্যে ইরাকের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

এছাড়াও নিরাপত্তা পরিষদ অছি রাষ্ট্রসমূহের দেখাশুনা করে এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ দানে, বহিষ্কারে বা সাময়িক স্থগিতকরণে মতামত ব্যক্ত করে।

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council) ঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের ন্যায় শক্তিশালী না হলেও জাতিসংঘের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ৫৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যগণ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন, তবে তাদের এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যেক তিন বছর পর পর অবসর গ্রহণ করেন। এই পরিষদ বছরে অন্ততঃপক্ষে তিনবার অধিবেশন করে। তাছাড়া সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরোধে বা জাতিসংঘের কোন সদস্যের অনুরোধক্রমে বিশেষ অধিবেশনও (special session) বসতে পারে। উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ পরিষদের কার্যাবলি অত্যন্ত ব্যাপক। জনকল্যাণকর যে কোন কাজই এর আওতায় আসে। আন্তর্জাতিক কোন অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে এ পরিষদ অনুসন্ধান কার্য চালাতে পারে অথবা বিশ্লেষণ করে জনহিতকর কার্যাবলিকে ত্বরান্বিত ও অধিকতর কার্যকর করতে পারে। সাহায্য ও পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আর্থিক বিষয় সম্বন্ধীয়, কৃষি ও খাদ্যনীতি, আন্তর্জাতিক যাতায়াত, শ্রম-কল্যাণমূলক যে কোন কাজ এ পরিষদ হাতে নিতে পারে। তা ব্যতীত, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও স্বাধীনতার নিরাপত্তা বিষয়ক যে কোন ব্যাপারেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণ পরিষদকে অবহিত করতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তঃসরকারি যে কোন সংস্থার সাথে সহযোগিতা করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে সকল বেসরকারি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্মব্যস্ত রয়েছে, তাদের সাথেও সহযোগিতা করে। পরিষদের অধিবেশনেও বিশিষ্ট সংস্থাসমূহকে আহ্বান করা হয় অংশগ্রহণের জন্য।

সুতরাং এ সকল বহু বিস্তৃত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য এ পরিষদকে বহু কমিশন, বিশিষ্ট ও পারদর্শী সংস্থাসমূহ গঠন করতে হয় এবং তাদের সদস্য নির্বাচিত করতে হয়। এ সব কমিশন ও কমিটির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য—(১) মানবাধিকার কমিশন, (২) সামাজিক কমিশন, (৩) অর্থনৈতিক কমিশন, (৪) পরিসংখ্যান পরিষদ, (৫) যাতায়াত ও যানবাহন কমিটি, (৬) আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতা, (৭) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, (৮) বিশ্ব শিশু সংস্থা, (৯) ইউনেসকো বা জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান সংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ শিক্ষা, সংস্কৃতি, খাদ্য, কৃষি, শ্রম, শিল্প, যানবাহন প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বময় অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করে বিশ্লেষণের পরে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করে সমগ্র বিশ্বের জনসাধারণের নিকট এক মহান সওগাত বহন করে এনেছে। এর ভূমিকা ও কার্যক্রম বিশ্বের স্থায়ি মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জাতিসংঘের একমাত্র বিভাগ যা সারা বিশ্বে আস্থা ও আশার সঞ্চার করেছে সর্বাধিক।

(৪) অছি পরিষদ (The Trusteeship Council) ঃ অছি পরিষদ জাতিসংঘের একমাত্র বিভাগ, যার সদস্য সংখ্যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয় নি। এর সদস্যগণকে দুভাগে ভাগ করা হয় ঃ স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্য তারাই হবেন যারা অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশের উপর অছিগিরি করেন ও নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচজন সদস্য। অস্থায়ী সদস্যগণ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে অস্থায়ী সদস্যগণ স্থায়ী সদস্যগণের অপেক্ষায় সংখ্যায় কম হবেন। পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট রয়েছে। পরিষদ পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী গ্রহণ করেন এবং সভাপতি নির্বাচন করেন। উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তা সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করে।

অছিগিরি রাষ্ট্র বা পর্যবেক্ষণকারী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিবৃতি ও অবস্থার আনুপূর্বিক তথ্যাদি শ্রবণ করে এই পরিষদ। অছি দেশের দেখাশুনা করা ছাড়াও তা সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করে, ঘটনার বিশ্লেষণ দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে এবং দেশের জনগণের স্বায়ত্তশাসন যোগ্য করে তুলতে যত্নবান হয় যাতে জনসাধারণ উত্তরোত্তর সচেতন, শিক্ষা ও যোগ্যতা লাভ করে কালক্রমে স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন রাজনৈতিক জীবনের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়।

তিন প্রকার জনদপকে অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে ঃ

প্রথম, যে সব দেশ পূর্বে ম্যানডেট পদ্ধতির (Mandate) অন্তর্ভুক্ত ছিল। **দ্বিতীয়,** যে সব দেশ পরাজিত রাষ্ট্রসমূহের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। **তৃতীয়,** যে সমস্ত দেশ বা স্থান স্বেচ্ছায় এ অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এ সব দেশের অগ্রগতি সাধন, সুশাসন ও বিবিধ উন্নয়নের জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) ঃ আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত হয় ১৫ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক সমন্বয়ে। বিচারকগণ যুগ্মভাবে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁরা পুনরায় নির্বাচিত হতেও পারেন। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সভাপতি ও সহ-সভাপতি বিচারকগণের মধ্য থেকে তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। পূর্ণ নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে যে, কোন এক রাষ্ট্র থেকে দুজন বিচারক নির্বাচিত হতে পারেন না।

হেগ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রধান কেন্দ্র। তবে পৃথিবীর যে কোন স্থানে এর সম্মেলন বসতে পারে। ৯ জন বিচারপতি সমন্বয়ে কোরাম (quoram) গঠিত হয়। এর শাসন বিভাগীয় কাজগুলো সম্পন্ন হয় বিচারালয় কর্তৃক নির্বাচিত একজন রেজিস্ট্রারের দ্বারা।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক আইনের এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করে। আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধীয় কোন জটিল প্রশ্নেও এই আদালত রায় প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক দায়িত্বশীলতার কোন প্রশ্ন যেখানে বিশ্বে শান্তি ভঙ্গ হবার আশঙ্কা রয়েছে সেখানে তার সুচিন্তিত অভিমতের দ্বারা বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর চেতনা সঞ্চারে প্রয়াসী হন। সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক আদালত তাদের অনুরোধক্রমে পরামর্শ দান করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice) বিশ্বসভ্যতা ও আইন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে মানবের অতুলনীয় ও অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। সর্বজনীন কৃষ্টি ও কালচারের পথে এটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

(৬) শাসন বিভাগীয় সংস্থা (Secretariat) ঃ এ বিভাগ সেক্রেটারী জেনারেল ও তার সুষ্ঠু সংগঠনের জন্য যে কয়েকজন কর্মচারী প্রয়োজন তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনিই এ সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা। বস্তুত তিনিই শাসন বিষয়ক কার্যাবলির কর্ণধার। পাঁচ বছরের জন্য তিনি নিযুক্ত হন। আন্তর্জাতিক সকল প্রকার সংস্থার মধ্যে তিনি সংযোগ রক্ষা করেন। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন কোন্ কোন্ বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হতে পারে এবং তিনিই অন্যান্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাই তাঁকেই বিশ্বশান্তির অভিভাবক (guardian of world peace) বলা হয়।

এ সংস্থা ৮টি ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি ভাগই সেক্রেটারী জেনারেলের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিভাগ একজন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক পরিচালিত হয়। তারা অবশ্য কয়েকজন পরিচালকের (Director) সাহায্য গ্রহণ করেন। তারা সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন। যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং সততা, কর্মতৎপরতার উন্নত মানের উপর নির্ভর করে তারা নিযুক্ত হন এবং আকর্ষণীয় মাহিনার অধিকারী হন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

বিশ্ব রাষ্ট্রের সম্ভাবনা (Possibility of a World State) ঃ বিশ্ব রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ যদিও এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি, তথাপি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ, মানব মনের উর্ধ্বমুখী গতিপ্রকৃতি ও মানব সভ্যতার বিবর্তন দৃষ্টে মনে হয়, বিশ্ব রাষ্ট্র অলীক নয়। কল্পনার ডানা ঝাপটানোতেই এর সমাপ্তি ঘটবে তা নয়, বিশ্বরাষ্ট্র একদিন হয়ত মানবের সামাজিক জীবনকে জড়িয়ে বাস্তবায়িত হবে। এর ইঙ্গিতগুলো যদিও এখনও পরিস্ফুট হয় নি, তথাপি ঘোলাটে ও ধোঁয়াটে পরিবেশের মধ্যে বিশ্বরাষ্ট্রের সংগঠন যেন বিশ্বমানবকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছে। ইতিহাসের গতি বৈচিত্র্যও এর সপক্ষে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নব নব শাসন পদ্ধতি একে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে আসছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এর আগমনী গানে যে কোন শুভ প্রভাতকে মুখরিত করতে পারে।

ইঙ্গিতগুলো নিচে উল্লিখিত হলো ঃ

(১) ঐতিহাসিক ঃ ইতিহাসের গতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদকে সংঘবদ্ধ করে এক বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের পরিচয় বহন করছে। অতীতকাল থেকে রাজা মহারাজাগণ বা সম্রাটগণ অস্ত্রের সাহায্যে বৃহত্তম সংস্থা সংগঠনে আগ্রহী ছিলেন। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার থেকে শুরু করলেও সাম্প্রতিক কালের হিটলারে তা শেষ হয় নি। রোমান সাম্রাজ্য থেকে সে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও তা সম্পন্ন হয় নি। সুতরাং শুভ মনের শুভ যাত্রা কে জানে সেদিন বিশ্বময় শুভ জয়ধ্বনিতে উদ্বেল হয়ে উঠবে না? পরিবারকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছে এবং বিবর্তনের এ সকল পথ অব্যাহত থাকলে একদিন তা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হতে পারে।

(২) সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ঃ অতীতে ও মধ্যযুগের ধর্ম মানুষকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সামাজিক জীবনের অনুশাসনও ছিল একদেশদর্শী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। রাজনৈতিক জীবন রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের অন্ধকার কুঠরীতে বন্দিনী রাজকন্যার মত হা-হুতাশে দিন গুনছিল। কিন্তু বর্তমানে ঘটনার পট পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত লয়ে। ধর্মের গোঁড়ামি দূর হয়েছে। সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা সঙ্কীর্ণতাকে জয় করেছে। সামাজিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা আজকাল অপাংক্তেয়। কী শিক্ষা গ্রহণে, কী বিদেশ ভ্রমণে, কী একে অপরের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণে আজকাল নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে। বাহির যেন ঘরে পরিণত হয়েছে। ঘর আজ পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে আগত বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনেও মুক্তির আলোক লেগেছে। গণতন্ত্রের মহিমায় গণশাসন সকল বিভেদ, সঙ্কীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাকে বিতাড়িত করেছে এবং করছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্বরাষ্ট্র অসম্ভব নয়।

(৩) অর্থনৈতিক ও নৈতিক ঃ সকলের অর্থনৈতিক জীবন আজ এক সুরে বাঁধা পড়েছে। বিশ্বময় যেন এ মন্ত্র পরিব্যাপ্ত। কোথায় একটু মোচড় পড়লে সুরের রেশ জাগায় হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে। ধনতন্ত্রই বলি বা সমাজতন্ত্রই বলি, সকল 'তন্ত্রই' আন্তর্জাতিক ও সর্বজনীন। বাংলার পাট জগতে সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। জাপানী ছোট একটি খেলনা বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে ওঠে পড়ে লেগেছে। নৈতিক মানও আজ বিশ্বগ্রাসী। আজকের বিশ্বময় বাজার অর্থনীতি এবং সংবাদ প্রবাহের সুপার হাইওয়ে যেন সেই সুপ্রভাতের আগমনী গানের প্রথম কলি।

(৪) বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ঃ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ দূরকে নিকট করেছে। কাছের জিনিসকে দূরে ছড়িয়েছে। জনকল্যাণমূলক কার্যে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সকলে আজকাল বিশ্বের সামগ্রিক সুরে বাঁধা। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানের মৃত্যুভয়াল ও কুটিল পথযাত্রা বিশ্বমানবকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। আজকাল বিজ্ঞানের ব্যবহার রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত বিষয় নয়। তা সমগ্র বিশ্বজনের মঙ্গল ও অমঙ্গলকে মনে রেখে ব্যবহার করা হয় এবং তাই করা উচিত। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রাও বিশ্বরাষ্ট্রের পক্ষে।

(৫) সাংগঠনিক ও আইন সম্বন্ধীয় ঃ সাংগঠনিক ও আইন সম্বন্ধীয় বিষয়গুলো জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনের রূপ লাভ করেছে। তা ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি (Federal principle) এ পথের নতুন দিশারী হতে পারে। স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখেও বিশ্বকে মানবের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা খুব কঠিন নয়। মৈত্রীবন্ধন ও চুক্তিসমূহ এ পথকে মসৃণ করেছে। সুতরাং বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সুদূর নয়। অবশ্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকশত বছরের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা এ পথকে আরও সহজ করে তুলুক। দেশ জয়ের দ্বারা তা সম্ভব

হয় নি, কিন্তু মৈত্রীবন্ধনের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। অধ্যাপক নিউম্যান বলেন, "বিশ্বরাষ্ট্র একদিন হয় জয়ের দ্বারা, না হয় মৈত্রীবন্ধনের দ্বারা সম্ভব হতে পারে" ("The World State may be a reality one day either by conquest or by concord")।

১। জাতিসংঘের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ। (Write an essay on the aims and objectives of the United Nations Organization.)

২। জাতিসংঘের বিভাগগুলোর গঠন ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Describe the composition and functions of the different organs of the U. N. O.)।

৩। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। (Describe the composition, powers and functions of the General Assembly of the U. N. O.)

৪। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালী, ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। নিরাপত্তা পরিষদকে অধিকতর কার্যক্ষম করতে হলে কী কী করা উচিত? (Describe the composition, powers and functions of the Security Council. What improvement you can suggest to make it more effective?)

৫। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের গঠন ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। এ আদালতকে কী জাতিসংঘের বিচার বিভাগ বলা হয়? (Describe the composition and functions of the International Court of Justice. Can it be termed the judiciary of the U. N. O.?)

৬। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা এবং শাসন বিভাগীয় সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Write short notes on the Economic and Social Council and Secretariat of the U. N. O.)

৭। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের কার্যধারা ও ভোটদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the modes of voting and procedure in the General Assembly and the Security Council of the U. N. O.)

৮। জাতিসংঘ কী বেঁচে থাকবে ? তুমি কী মনে কর যে, জাতিসংঘ ভবিষ্যতে বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত হবে, না তা অদূর ভবিষ্যতে ভেঙ্গে পড়বে? (Can the U. N. O. last? Do you think it is going to be a World State or is likely to collapse in the near future?)

৯। বিশ্বরাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তোমার মত কী? আলোচনা কর। (What is your idea about the possibility of a World State? Discuss.)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

LOCAL SELF-GOVERNMENT

সূচনা
Introduction

আধুনিক কালের বৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হলেও দূরবর্তী নগর, শহর, গ্রাম ও জনপদের বিচিত্র সমস্যা সমাধানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর কিছু কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত করে থাকে। ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্ম হয়। স্থানীয় সংস্থাসমূহ আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর সঠিক অনুধাবন করে, তাদের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে এবং সমস্যাবলীর সমাধানের ব্যবস্থা করে। বর্তমানের বিশেষত্বশীলতার (specialisation) যুগে তাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন
Central Government and Local Self-Government

রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসন বিভিন্ন কার্যভারে ভারাক্রান্ত। শাসনযন্ত্রের যদিও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তথাপি প্রত্যেকটির উপর ন্যস্ত রয়েছে বিচিত্র কর্মভার। এ বিচিত্র কর্ম সম্পাদন করা এককভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় না। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সহজও নয়। কেন্দ্রীয় সরকার শাসন সম্বন্ধীয় নীতি প্রণয়ন করে এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র, পরিকল্পনামূলক কার্যাবলি রাজধানী অঙ্গন থেকে সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু শহর, নগর ও দূরবর্তী গ্রাম জনপদের সমস্যাবলী নিখুঁতভাবে অনুধাবন করে তাদের সমাধান আনয়ন করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আধুনিককালের আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর জটিলতা, পরিকল্পনা ও আর্থিক নীতির বাস্তবায়নের জটিলতা প্রভৃতির জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ক্রমশ অধিক পরিমাণে দায়িত্ব অর্পণ করে কেন্দ্রের ভার লাঘব করার চেষ্টা করা হয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকেই লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন বিরাট মহীরুহ এবং স্থানীয় শাসন সংস্থাসমূহ তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। শাখা-প্রশাখা যেমন মূল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সজীব ও সতেজ থাকে, তেমনি স্থানীয় শাসন সংস্থাসমূহ মূল থেকে ক্ষমতা লাভ করে কর্মক্ষম হয়। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন সময়ে স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিকট থেকে ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারে।

সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান। এ সম্বন্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক লীকক (Lea-cock) বলেন, "স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাতন্ত্র্য

আংশিকভাবে নির্ভর করে তাদের নিজ নিজ সাংগঠনিক অবস্থার ওপরে এবং আংশিকভাবে তাদের স্ব স্ব কর্তব্য সীমার ওপরে।" অধ্যাপক লীককের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দুটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে। **প্রথম,** কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানের মাধ্যমে স্থানীয় শাসন সংস্থাসমূহ ক্ষমতা লাভ করে থাকে। ফলে স্থানীয় সংস্থাসমূহের কোন মৌলিক ক্ষমতা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালিত হয়ে থাকে।

তাছাড়া, কোন কোন রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমেও স্থানীয় সংস্থাসমূহ ক্ষমতা লাভ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বৃটেন, ফ্রান্স, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং অস্ট্রেলিয়ার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এ ক্ষমতা চূড়ান্ত নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৫৯ এবং ৬৯ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

দ্বিতীয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলি ও স্থানীয় সমস্যাসমূহের কার্যাবলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থে সাধারণ কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে; যেমন— দেশরক্ষামূলক কার্যাবলি, বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণ, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যোগাযোগ। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হয় আঞ্চলিক সমস্যাবলীর সমাধান ও স্থানীয় উন্নয়নমূলক কার্যাবলি— রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় সংগ্রহ, আলোর বন্দোবস্ত, স্বাস্থ্য রক্ষামূলক কার্যাবলি। আঞ্চলিক সমস্যাবলীর সমাধান করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারকে রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকে অব্যাহতি দান করে।

স্থানীয় শাসন সংস্থাসমূহের কার্যাবলির বৈশিষ্ট্য

Nature of Functions of the Local Self-Governing Institutions

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাসমূহের কার্যাবলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ঃ (১) এসব কার্যক্রম কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলি থেকে স্বতন্ত্র, কেননা কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থ সম্বলিত সাধারণ কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে; যেমন—দেশরক্ষামূলক কার্যাবলি, বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণ, মুদ্রানীতির বাস্তবায়ন, দেশে আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক বা স্থানীয় সমস্যাসমূহের সমাধান করে থাকে; যেমন— শহরে পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও মেরামত।

(২) এ ধরনের কার্যক্রম প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলি থেকে স্বতন্ত্র। কেননা, প্রাদেশিক সরকার সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করে থাকে এবং সে ক্ষমতায় এক প্রকার মৌলিকত্ব রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলেই তার ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে না। অবশ্য সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু স্থানীয় সংস্থাগুলোর ক্ষমতার কোন মৌলিকত্ব নেই। কেন্দ্রীয় সরকার, এমনকি প্রাদেশিক সরকারও ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে, তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তাদের উপর অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত করতেও পারে।

(৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ সর্বত্র এক ও অভিন্ন নয়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলি সকল স্থানে একই ধরনের এবং সর্বত্র তাদের প্রণালী অভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত দেশরক্ষা ব্যবস্থা বা মুদ্রা ব্যবস্থা দেশের সর্বত্র অভিন্ন, কিন্তু গ্রামের একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের সমস্যাবলী যে কোন শহরের সমস্যাবলীর মত নয়, অথবা শহরের সমস্যাবলী নগরের সমস্যা থেকেও স্বতন্ত্র। তাই তাদের সমাধান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, জনবসতির তারতম্য হেতু স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি বিভিন্ন হয়ে থাকে। গ্রামের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা শহরের ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এবং শহরের ব্যবস্থাবলী নগরের গৃহীত পন্থা

থেকে পৃথক। দেশের উত্তরাঞ্চলে যে ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে, দক্ষিণাঞ্চলে সে ব্যবস্থা সমভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। বৃক্ষবিরল অঞ্চলের সমস্যা বৃক্ষ রোপন এবং জমিকে কর্ষণের উপযোগী করা, কিন্তু ঘন বনাচ্ছাদিত অঞ্চলের সমস্যা বন পরিষ্কার করে কৃষিক্ষেত্র তৈরি করা। তাছাড়া, মানুষের শিক্ষা, রুচি, কর্মক্ষমতা বিচার করেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের তারতম্য ঘটতে পারে।

মোটকথা, স্থানীয় সমস্যাবলী সমাধান করাই স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। শহর, নগর, গ্রাম ও জনপদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যা কেন্দ্রীয় সরকার সময় স্বল্পতাহেতু ও বিভিন্ন জাতীয় কার্যাবলির চাপে সম্পন্ন করতে পারে না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ সকল সমস্যার সমাধান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তাঘাটের মেরামত, পানীয় জলের সরবরাহ, খাল-বিলের সংস্কার সাধন, জল নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী রচনা করা, তার তত্ত্বাবধান করা, জন-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ, অশিক্ষা দূরীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি।

এ সকল কার্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা সুসম্পন্ন হতে পারে, কেননা স্থানীয় সংস্থার কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় সমস্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এ সকল কার্যের জন্য স্থানীয় সংস্থাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য লাভ করে থাকে। দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের নিজস্ব তহবিল থাকে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে কর আদায় করে এ তহবিল গঠন করা হয়।

তাছাড়া, স্থানীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ যথাযথ নির্দেশও লাভ করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট থেকে।

এটি সর্বত্র স্বীকৃত যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা সার্বিক কল্যাণ আনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ দায়িত্ব পালন করলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোটখাট সমস্যাবলীর সমাধানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা মুখ্য। বর্তমানে পৃথিবীর সদ্য স্বাধীনতা লাভকারী অনুন্নত ও উন্নতিকামী রাষ্ট্রসমূহকে কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসন সংস্থাসমূহের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করছে। তাই দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্রগতির ধারা সমানভাবে ও সুসংহতভাবে প্রবাহিত করতে এবং দেশের সকল অঞ্চলকে সমানভাবে সগৌরবে তুলে ধরার সুমহান দায়িত্ব স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হয়েছে।

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের সংগঠন
Organization of the Local Self-Governing Institutions

(১) পৃথিবীর সর্বত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন একরূপ নয়, কেননা স্বায়ত্তশাসনের ধারা সর্বত্র এক ও অভিন্ন নয়। হওয়া সঙ্গতও নয়, সমীচীনও নয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারা নির্ধারিত হয় প্রধানত জনগণের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান ও সচেতনতার মান কর্তৃক। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-দীক্ষার মান, শিল্প-বাণিজ্যের মান ও জনগণের সচেতনতার মান বিভিন্ন। তাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন এক ও অভিন্ন হতে পারে না।

(২) অধিকতর উন্নত রাষ্ট্রসমূহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নতকামী রাষ্ট্রসমূহে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উপর ব্যাপকতর ক্ষমতা অর্পণ করা অসুবিধাজনক হতে পারে, কেননা এ সকল রাষ্ট্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রের

ব্যাপকতর প্রভাবের প্রয়োজন। সুতরাং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে এমন ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত নয় যার ফলে কেন্দ্রের খবরদারী হ্রাস পেতে পারে।

(৩) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে এ সকল সংস্থার হাতে ব্যাপকতর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স ও বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে ও কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে তার কার্য পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এ সকল সংস্থা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার এ সকল সংস্থার উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করতে প্রস্তুত নয়। এখন প্রশ্ন হলো—সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কোন্ পদ্ধতি অধিকতর সুবিধাজনক ?

প্রথম, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উপর ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত হলে সংস্থাটি অধিক কার্যক্ষম হয়ে ওঠে এবং কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়, এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্যের গুরুভার কিছুটা লাঘব হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় এবং সাধারণ বিষয়সমূহে অধিকতর মনোযোগী হতে পারে।

তৃতীয়, এর ফলে আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান সহজতর হয়ে পড়ে।

কিন্তু অপর পক্ষে এও বলা চলে যে, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের উপর ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হলে তা কেন্দ্র বা প্রদেশে সমান্তরাল শাসনসংস্থা হিসেবে পরিগণিত হতেও পারে এবং তা সত্যই অকল্পনীয়। কেন্দ্র বা প্রদেশের কোন অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়েও উঠতে পারে।

তাই সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকার স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের উপর কমবেশি বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহ যাতে শাসনব্যবস্থায় কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না করতে পারে, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখে।

সুতরাং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা ও নির্দেশকে কার্যকর করে মাত্র। তবে এ সংস্থাগুলোকে অধিকতর দায়িত্বশীল করতে হলে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় জনমত প্রতিফলিত হতে হবে। সদস্যদিগকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। নির্বাচিত সদস্যগণ যাতে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণ যাতে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

স্বায়ত্তশাসনের সুফল
Merits of Local Self-Government

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুফল বহুমুখী। কথায় বলে, charity begins at home— অর্থাৎ মহৎ এবং বিরাট হবার শিক্ষা গৃহের পরিবেশেই শুরু হয়। রাষ্ট্রনীতিতে এ কথা সম্পূর্ণরূপে খাটে। রাষ্ট্রের অনাগত কর্ণধারগণ আপন আপন অঞ্চলে জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরোয়া পরিবেশ থেকে গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। গণতান্ত্রিক মন বলতে আমরা যা বুঝি, তারও উন্মেষ ঘটে এ সকল গ্রাম্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

সম্পাদনের মাধ্যমে। এ গণতন্ত্রের যুগে গণচেতনা জাগ্রত করার উৎকৃষ্ট পন্থা সকল জনসাধারণকে আঞ্চলিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট করা।। তাছাড়া, স্বায়ত্তশাসনের নিম্নলিখিত সুফলগুলোও উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথম, স্বায়ত্তশাসন দায়িত্ব এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। শাসনব্যবস্থার দেশ জোড়া বৃহৎ পরিমণ্ডলে মানুষ সহজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে পারে না। অথচ বিরাট দায়িত্ব বহনের বিরাট প্রতিভা একদিনে অর্জিত হয় না। আঞ্চলিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে এবং স্বায়ত্তশাসন সংস্থাসমূহে অংশীদার হয়েও তাদের সুবিধার সাথে নিজদিগকে জড়িত করে মানুষ দায়িত্ব সচেতন হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে দেশের বৃহৎ কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে।

দ্বিতীয়, স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। স্বায়ত্তশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণচেতনা বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিক উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করলে ঐ অঞ্চলের মানুষের সাথে শুধু পরিচয় ঘটে না, তার ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার এক সুর জাগ্রত হয়ে ওঠে। তাছাড়া, স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ ধারণা জন্মে যে, সকল স্তরের মানুষের সমবেত কল্যাণ প্রচেষ্টার মধ্যেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং স্বায়ত্তশাসন রাষ্ট্রচেতনার ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ক্ষেত্র।

তৃতীয়, স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। স্থানীয় লোকেরা নিজেদের সমস্যাবলীর সমাধান নিজেরাই করে এবং এ জন্য যে ব্যয় হয় তাও স্থানীয় তহবিল থেকে সংগৃহীত হয়। সুতরাং এর ফলে শুধু যে কেন্দ্রের ব্যয় সংকোচন ঘটে তাই নয়, স্থানীয় লোকেরা নিজেদের অর্থ অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ব্যয় করতে শেখে। কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় তহবিল বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োজিত করতে পারে।

চতুর্থ, কর্তব্যপরায়নতার সূচনা হয়। স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার মনোভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে। অটল ধৈর্যে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলে আপন কৃতকর্ম মানুষকে মহত্তর কর্মের উদ্দীপনা দান করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার সদস্যবর্গ কোন মহৎকর্মে কৃতকার্য হলে তাঁরা এর জন্য গর্ববোধ করেন এবং নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ব্রাইস তাই বলেন, "যদি কোন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কোন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ট্রামলাইন প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে সংস্থার সদস্যগণ সকলেই এতে গর্ববোধ করেন এবং অতিরিক্ত সাফল্যের জন্য তৎপর হয়ে উঠেন।

পঞ্চম, সুনাগরিকতার প্রথম পাঠ শুরু হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জনসাধারণের মনে সুনাগরিকতার গুণাবলী সঞ্চার করে এবং যারা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, পরম সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা বিকশিত হয়। লর্ড ব্রাইসের মতে, "তা নাগরিকদের মনে এমন এক চেতনার সঞ্চার করে যা জনসাধারণের স্বার্থের সাথে জড়িত এবং তারা এ গুলো সুষ্ঠুভাবে নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্তব্য বলে মনে করে।"

সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় সরকারকে সহায়তা করে। এও বলা যায় যে, স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকারকে দূরবর্তী অঞ্চলের খুঁটিনাটি সমস্যার চিন্তা থেকে অব্যাহতি দান করে এবং ফলে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্র কল্যাণে বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

১। কেন্দ্র ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the relation between the centre and the local self-governing institutions.)

২। "আধুনিক রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসনের ভূমিকা গৌরবজনক"—বিশ্লেষণ কর। ("The role of local self-government in a modern state is significant"—Analyse.)

৩। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর সংগঠন সম্পর্কে তোমার অভিমত বর্ণনা কর। (Give out your opinion regarding the organization of the self-governing institutions.)

৪। "আধুনিক রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসন একরূপ অপরিহার্য"—এই উক্তির আলোকে স্বায়ত্তশাসনের সুফলগুলোর বিবরণ দাও। ("Local self-government is almost indispensable in modern states." Discuss the statement and describe in this connection the merits of local self-government.)

৫। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কার্যাবলির বৈশিষ্ট্য কী কী? ধারণা দাও। (What are the characteristics of the functions of the local self-governing institutions? Give an idea of the functions performed by them.)

সর্বাত্মকবাদ

TOTALITARIANISM

৪৬

সর্বাত্মকবাদের সংজ্ঞা
Definition

যে শাসনব্যবস্থায় নাগরিকের সামগ্রিক জীবন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয় তাই সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Totalitarian System)। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং অবাধ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। এ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী ও বিকল্প। মানুষের জীবনের সকল দিক—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, আত্মিক ও বৈষয়িক—রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন স্থান নেই। রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান। রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে ছেলেমেয়েরা কোন্ কোন্ বই পড়বে, কোন্ খেলাধুলা শিখবে, কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করবে, এমন কী কোন্ ধর্মমত গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বলে এ ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক (totalitarian) বলা হয়। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হিটলারের জার্মানী, মুসোলিনীর ইতালি এবং স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া সর্বাত্মকবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সর্বাত্মকবাদের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Totalitarianism

সর্বাত্মকবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে তা বর্ণিত হলো ঃ

(১) এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে উপেয় হিসেবে গ্রহণ করা হয় ঃ সর্বাত্মক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে উপায় (means) হিসেবে গ্রহণ না করে উপেয় (end) হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রকে এ ব্যবস্থায় প্রজ্ঞার চরম অভিব্যক্তি মনে করা হয়। জনগণ রাষ্ট্রের অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়।

(২) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রাধান্য ঃ এই শাসনব্যবস্থায় **রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রাধান্য** স্বীকৃত। ব্যক্তিজীবনের চতুর্দিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রকাশিত। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম ও সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৩) সর্বাত্মকবাদ গণতন্ত্র বিরোধী ঃ গণতন্ত্রের মৌল আদর্শ জনগণের সার্বভৌমত্ব। তাই গণতন্ত্রে ব্যক্তির বাক্ স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, চলাচল ও সংগঠনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, কিন্তু সর্বাত্মকবাদে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থান লাভ করে। তাছাড়া, গণতন্ত্রে যুক্তির জোরের উপর (force of argument) গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু সর্বাত্মকবাদে জোরের যুক্তিকে (argument of force) প্রাধান্য দেয়া হয়।

(৪) কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঃ সর্বাত্মকবাদে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজে নেতৃত্বের সমাবেশ ঘটে এক নেতা এবং এক নেতার নেতৃত্বাধীনে একদলে। দলীয় নেতা সর্বজনগ্রাহ্য নেতা। তিনি একাধারে দলের প্রধান কর্মকর্তা, অন্যদিকে সরকার ও সমাজের প্রধান। সামরিক বাহিনী তার নির্দেশে পরিচালিত। জার্মানীতে হিটলারের কর্তৃত্বের দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

(৫) একদলীয় শাসন ঃ সর্বাত্মকবাদে একটি দলের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কোন স্থান নেই। প্রয়োজনবোধে সংবিধানে একটি দলের স্বীকৃতি দেয়া হয়। স্ট্যালিনের (Stalin) রাশিয়ায় সংবিধানে মাত্র একটি দলের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল।

(৬) একনেতা : সর্বাত্মক শাসন ব্যবস্থায় একদলীয় শাসনের শীর্ষে থাকে এক নেতার নির্দেশ এবং অনুশাসন। নেতাকে অতিমানবরূপে চিহ্নিত করা হয় এবং সর্বস্তরে তার নির্দেশ কার্যকর করা হয়। জার্মানীতে হিটলারকে ফুয়েরার (Fuehrar) বলা হতো। এর অর্থ, তিনিই সবকিছুর চূড়ান্ত নিয়ামক।

(৭) উগ্র জাতীয়তাবাদ : এ ব্যবস্থায় উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে, কোথাও বা আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে এবং সর্বত্রই এর রূপ হয় উগ্র। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়, কোথাওবা নিজ আদর্শ বিশ্বময় প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

(৮) আন্তর্জাতিকতা বিরোধী : উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে সর্বাত্মকবাদ আন্তর্জাতিকতা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং যুদ্ধসাজে সমাজকে প্রস্তুত রাখে। মুসোলিনী বলতেন, 'নারীর ক্ষেত্রে মাতৃত্ব যেমন স্বাভাবিক, পুরুষের ক্ষেত্রে তেমনি যুদ্ধ"। ফলে সর্বাত্মক শাসনব্যবস্থা আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতিবন্ধক।

(৯) ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ধারণা : সর্বাত্মকবাদে সমাজকে **ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ** (unified and monistic) এক প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করা হয়। ফলে বহুত্ববাদের (pluralism) কোন স্থান নেই এ মতবাদে। সমাজ এক ও অভিন্ন। প্রতিযোগিতায় রত একাধিক দল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রবণতা, শিক্ষা ও ধর্মক্ষেত্রে ভিন্নমুখী চিন্তা-ভাবনা এ ব্যবস্থায় কল্পনা করা যায় না।

(১০) শৃঙ্খলা ও আনুগত্য : এই ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা এবং আনুগত্য মহামূল্যবান মণিকাঞ্চনরূপে চিহ্নিত হয়েছে। নেতা অতিমানবীয় গুণে ভূষিত এক ব্যক্তিত্ব। তিনি সমাজকে এক নির্দিষ্ট খাতে পরিচালিত করেন সমাজের সকলের জন্য। তিনি সকলের নিকট শ্রদ্ধেয়।

মূলকথা, সর্বাত্মক ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্য ও সৌকর্য অপেক্ষা শৃঙ্খলা, ঐক্য ও আনুগত্যের বন্ধনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রচার ও যোগাযোগের মাধ্যমগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত থাকে। এ সকল প্রচার মাধ্যমের দ্বারা সমাজের সর্বস্তরে দলের এবং নেতার কর্তৃত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্বাত্মকবাদের দিন ফুরিয়েছে বলে মনে হয়। নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ এরই মধ্যে ইতিহাস হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রের রবি প্রায় অস্তমিত। যে দুই চারটি ক্ষেত্রে এখনো তা কোন রকমে টিকে রয়েছে সে সব জায়গায় গণতন্ত্রের সাথে সমঝোতা করেই তাকে টিকে থাকতে হয়েছে। কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শৃঙ্খলা ও আনুগত্য সমাজজীবনে মহামূল্যবান বটে, কিন্তু কোন সময় তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের বিকল্প হতে পারে না। এক নেতা, এক দল এবং এক আদর্শের জনপ্রিয়তা সাময়িক। গণতন্ত্রের আবেদন কিন্তু চিরন্তন। জনস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের তীর ঘেঁসে জন্মলাভ করেছে রাজনীতি এবং সার্থক রাজনীতির ক্ষেত্র উর্বর হয় শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক পরিবেশে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ যে সমাজে বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে সর্বাত্মকবাদের কোন স্থান নেই।
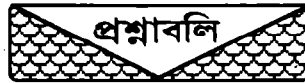
১। সর্বাত্মকবাদ সম্পর্কে কী জান? এর সংজ্ঞা দাও। (What do you know of totalitarianism? Define it.)

২। সর্বাত্মকবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? (What are the characteristics of totalitarianism?)

সূচনা
Introduction

উদারবাদ বা লিবারালিজ্ম (Liberalism) শব্দটির সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী ক্যাসল্রি (Castlereigh) কর্তৃক। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এর ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। ইংরেজ কবি শেলী, বায়রন ও লি হাণ্ট 'দি লিবারেল' নামক পত্রিকা ১৮২২ সালে প্রকাশ করেন। উদারবাদের প্রথম প্রকাশ ঘটে সপ্তদশ শতকের ইউরোপ, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে উদারবাদ এক তত্ত্ব (theory) ও আন্দোলনে (movement) রূপলাভ করে। গিলবার্ট মারের (Gilbert Murray) মত লেখকরা অবশ্য বলেন, গ্রীকগণই উদারবাদের মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তত্ত্ব হিসেবে উদারবাদ উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে সমধিক প্রসিধি লাভ করে।

উদারবাদের সংজ্ঞা
Definition

উদারবাদ (Liberalism) বলতে এমন এক মতবাদকে বুঝায় যে মতবাদে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণকে মহামূল্যবান মনে করা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকাশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে অশুভ বলে গণ্য করা হয় এবং সমাজ জীবনে ব্যক্তির সীমাহীন নেতৃত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব দান করা হয়।

উদারবাদের উৎপত্তি
Growth of Liberalism

ইংরেজি মূল liberty এবং liberality থেকে উদারবাদের (liberalism) জন্ম। এর মূল প্রোথিত রয়েছে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে সূচিত উদারনৈতিক ধর্মীয় ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনে এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির যুগে। যে যুগে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিল সীমাহীন এবং সমাজের বিধিবিধান ছিল কর্তৃত্বব্যঞ্জক এবং সর্বব্যাপক, তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদারবাদের জন্ম। উদারবাদের মূলকথা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বাণী, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত হাজারো বন্ধন থেকে ব্যক্তির মুক্তি এবং অগ্রগতি সাধনে ব্যক্তির সীমাহীন নেতৃত্বের সম্ভাবনার মতবাদ।

উদারবাদের মৌল সূত্র
Fundamental Principles of Liberalism

উদারবাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি মূলত চারটি ঃ

(১) মধ্যবিত্তের দর্শন (a Middle-Class Philosophy) ঃ উদারবাদ মধ্যবিত্তের এক দর্শন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুটি বিশিষ্ট গুণ রয়েছে। এদের একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং অন্যটি আত্মপ্রত্যয়। অভিজাতদের ন্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজের পদ মর্যাদার আড়ালে প্রচেষ্টা এবং উদ্যমকে লুকাতে পারে না। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর ন্যায় হাজারের হাটেও মিশে যেতে পারে না। অথচ মধ্যবিত্তের রয়েছে এক ধরনের আত্মসচেতন ভাব এবং নিজের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস। উদারবাদে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মবিশ্বাস ও সচেতন কর্ম উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে।

(২) ব্যক্তি সম্পর্কে উচ্চধারণা (Belief in the Creativity of Man) ঃ উদারবাদে মানুষকে স্বভাবত সৎ এবং সুন্দর বলে গণ্য করা হয়। মানুষের স্বাভাবিক সততা এবং কর্মক্ষমতা চাপা পড়ে জাতীয়তা এবং সামাজিক পদমর্যাদার আড়ালে। এ সকল প্রতিবন্ধক দূর হলে এবং ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সকল সুযোগ লাভ করলে অতি সহজে তার ভাগ্য রচনা করতে সক্ষম। অন্য দিকে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান। সমান সুযোগ লাভ করলে প্রত্যেকেই অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হবে। এ কারণে উদারবাদে এমন এক সরকারের জয় ঘোষণা করা হয়েছে যা গণতান্ত্রিক এবং যে সরকারে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

(৩) অগ্রগতি সম্পর্কে উদারনৈতিক ধারণা (Liberal Image of Progress) ঃ উদারবাদে ভবিষ্যতকে চিহ্নিত করা হয়েছে পরিপূর্ণতার কাল হিসেবে। মানবজাতির ইতিহাস হলো অপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিপূর্ণতায় উত্তরণের ইতিহাস। যা কিছু ঘটবে উদারবাদে তাকে মঙ্গলজনক বলে গ্রহণ করা হয় এবং এ আশা ব্যক্ত করা হয় যে, ভবিষ্যৎ পূর্ণতা আনয়ন করবে।

(৪) যুক্তির উপর গুরুত্ব (Importance of Reason) ঃ উদারবাদে ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ তার যুক্তি (reason)। যুক্তিই মানুষকে তার নিজের অবস্থান এবং সামাজিক ও বাহ্যিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সাহায্য করে এবং নিজের লক্ষ্য অর্জনে যা প্রয়োজন তা সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়। যেহেতু মানুষ যুক্তিবাদী, এ জন্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করে মানুষের স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন।

উদারবাদের অভিব্যক্তি
Manifestations of Liberalism

উদারবাদের অভিব্যক্তি সাধারণত চারটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হয় ঃ (ক) ধর্মের ক্ষেত্রে, (খ) অর্থনীতিতে, (গ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এবং (ঘ) সমাজে।

(ক) ধর্মের ক্ষেত্রে উদারবাদ ঃ ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারবাদের প্রত্যক্ষ ফল সহনশীলতা (toleration)। রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যে উদারবাদী আন্দোলন শুরু হয় তার ফলে ক্যালভিন গ্রুপ, হিউগোনট ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতাবলম্বীদের দাবি স্বীকৃত হয়। এ আন্দোলনের ফলে একদিকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দূরীভূত হয়।

(খ) অর্থনীতি ক্ষেত্রে উদারবাদ ঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদারবাদের অভিব্যক্তি ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অবাধ নীতি (laissez faire) এরই ফলশ্রুতি। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ও রিচার্ড কবডেন (Richard Cobden) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর তা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ উদারবাদের মাধ্যমে সামন্তদের বিরুদ্ধে জয় যুক্ত হন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটেনের উদারনৈতিক চিন্তাবিদগণ কৃষিক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতিরও মুলেচ্ছেদ করেন। ১৮৪৬ সালে শস্য আইনসমূহ (Corn Laws) এরই পরিচায়ক।

(গ) রাজনীতি ক্ষেত্রে উদারবাদ ঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে উদারবাদের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। সপ্তদশ শতাব্দীতে এরই প্রভাবে বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় সরকার এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তৈরি হয় লিখিত সংবিধান। এ আন্দোলনের ফলে নিয়মিত নির্বাচন, নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং মহিলাদের ভোটাধিকার প্রভৃতি স্বীকৃত হয়।

(ঘ) সামাজিক ক্ষেত্রে উদারবাদ ঃ সামাজিক ক্ষেত্রেও উদারবাদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুল, আভিজাত্য, বর্ণ ও নারী–পুরুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ সে সকল বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে উদারবাদের ভূমিকা মুখ্য। কর্তৃত্ববাদী পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে শিশুদের মুক্তি এবং অত্যাচারী স্বামীর কবল থেকে স্ত্রীর মুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বহু খ্যাতনামা চিন্তাবিদের নাম জড়িয়ে আছে উদারবাদের সাথে। জেমস্ মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, গ্রাহাম সামনার, অ্যাডাম স্মিথ, রিচার্ড কবডেন, জন কেইন্স্ প্রমুখ খ্যাতনামা লেখক ও চিন্তাবিদ উদারবাদের সমর্থক ছিলেন।

উদারবাদের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Liberalism

উদারবাদের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে তা বিবৃত হলো ঃ

(১) ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার গুরুত্ব ঃ উদারবাদে ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে যে সকল প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতি এই সকলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উদারবাদ তাদের অবসান কামনা করে।

(২) মৌলিক অধিকারের উপর গুরুত্ব ঃ জীবন রক্ষা, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি কতকগুলো অধিকারকে উদারবাদে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয় এবং তাদের সংরক্ষণ রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য।

(৩) সমান সুযোগে বিশ্বাসী ঃ উদারবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ–সুবিধা দান অবশ্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যের স্থান নেই।

(৪) আইনের শাসন ঃ উদারবাদে আইনের শাসনকে মহামূল্যবান মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, আইন রচনা করবেন জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

(৫) গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ঃ গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা উদারবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজে বিভিন্ন দল এবং গোষ্ঠীর অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্র চালু থাকবে।

(৬) ন্যূনতম সরকার ঃ উদারবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, সেই সরকার সর্বাপেক্ষা উত্তম যা সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে। অন্য কথায়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদই উদারবাদের ভিত্তি। সরকারের কার্যক্রম হবে সর্বনিম্ন পর্যায়ের।

(৭) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ ঃ এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ সামাজিক কল্যাণ আনয়ন করবে।

(৮) স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন ইচ্ছা ঃ ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন ইচ্ছা উদারবাদে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, ব্যক্তিই সামাজিক সৌধের ভিত্তি স্বরূপ। ফলে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশে সমাজ এবং রাষ্ট্রের গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে।

(৯) সামাজিক পরিবর্তন ঃ দ্রুতগতিতে সামাজিক পরিবর্তন এ মতবাদে কামনা করা হয়। উৎপীড়ন, স্বেচ্ছাচার এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে উদার মতবাদ সুদৃঢ় হলে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়।

(১০) সামাজিক নিরাপত্তা ঃ বেকার বীমা, ন্যূনতম মজুরি, বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য বীমা, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর ন্যায় জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী উদারবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

উদারবাদের সমালোচনা
Criticisms

উদারবাদের কতকগুলো সমালোচনা উল্লেখযোগ্য ঃ প্রথম, উদারবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ আসন দেয়া হয়, কিন্তু সমাজে বৈষম্য দূরীকরণের পন্থা নির্ণয়ের কোন প্রচেষ্টা এতে নেই। তাই কার্ল মার্কস (Karl Marx) বলেন, যে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান এবং যেখানে উৎপাদনের উৎসসমূহ বেসরকারি হাতে ন্যস্ত সে সমাজে দরিদ্র ও দুর্বলদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ। **দ্বিতীয়,** উদারবাদে ব্যক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সমাজ জীবনে ব্যক্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। **তৃতীয়,** উদারবাদ শুধুমাত্র সক্ষম ও ক্ষমতাশালীর স্বাধীনতার জয়গান করা হয়েছে। সমাজের দুর্বল ও দরিদ্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় নি।

উপযোগবাদ
Utilitarianism

উপযোগবাদ বলতে আমরা সে মতবাদকে বুঝি যা রাষ্ট্র, সরকার, নৈতিকতা, আইন প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে উপযোগিতার নীতিকে (Principle of Utility) একমাত্র সূচক হিসেবে গ্রহণ করে। উপযোগবাদের দুজন খ্যাতনামা প্রবক্তা হলেন জেরেমী বেন্থাম (Jeremy Bentham) জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)। এ মতবাদে উপযোগিতাই বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রক নিয়ামক।

উপযোগবাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেন্থাম বলেছেন, "প্রকৃতি মানব জাতিকে আনন্দ ও বেদনা এই দু সার্বভৌম প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছেন। আমাদের কী করা উচিত এবং আমরা কী করব তা স্থির করে দেয় এই দুই প্রভু। এ দুই প্রভুর সিংহাসনের সাথেই বাঁধা রয়েছে একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের পতাকা আর অন্যদিকে বাঁধা রয়েছে কার্যকারণের দাসত্ব শৃঙ্খল। আমাদের সকল কাজে ও চিন্তায় তারাই আমাদের পরিচালিত করে।"

বেন্থামের মতে, উপযোগিতার নীতি হলো সে নীতি যা ব্যক্তির সুখ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা অনুযায়ী অনুমোদন বা অনীহা জ্ঞাপন করে। মোটকথা, আনন্দ বা সুখের অন্বেষণই ব্যক্তির

মৌল বাসনা। যা তার এ বাসনার অনুকূল তা সে করতে চায় আর যা অনুকূল নয় তা থেকে সে বিরত থাকে। মৌল বাসনার প্রতি অনুকূলতার এ নীতিকে তিনি উপযোগিতার নীতি বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের যে কোন কাজের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা উপযোগিতার এ নীতির উপর নির্ভরশীল।

উপযোগবাদের মূল প্রস্তাবনা
Propositions

বেন্থাম উপযোগবাদকে নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি মূল প্রস্তাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন ঃ **(এক)** আনন্দই একমাত্র জিনিস যা ভাল এবং বেদনা মন্দ। **(দুই)** আনন্দ এবং বেদনার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব। **(তিন)** প্রত্যেক ব্যক্তি বাস্তবে আনন্দ অন্বেষণ করে এবং বেদনা পরিহার করে। **(চার)** ব্যক্তি যদিও প্রধানত আনন্দ লাভ করতে চায় এবং বেদনা পরিহার করতে চায়, তথাপি ব্যক্তির উচিত সার্বিকভাবে আনন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। **(পাঁচ)** অনুমোদন বা বৈধতা প্রদানের মাধ্যমেও আইন পরিষদ আনন্দ বৃদ্ধির এবং বেদনা হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উপযোগবাদকে নির্ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আনন্দ ও বেদনার পরিমাপ
Measurement

বেন্থাম তাঁর উপযোগবাদে আনন্দ ও বেদনা পরিমাপের জন্য সাতটি নীতির কথাও উল্লেখ করেছেন। এ সকল নীতির মধ্যে চারটি প্রত্যক্ষ এবং অন্য তিনটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নীতিগুলো হলো ঃ (ক) তীব্রতা (intensity), (খ) স্থিতিকাল (duration), (গ) নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা (certainty or uncertainty) এবং (ঘ) নৈকট্য বা দূরত্ব (nearness or remoteness)। পরোক্ষ নীতিগুলো হলো ঃ (ঙ) উর্বরতা (fecundity), (চ) বিশুদ্ধতা (purity) এবং (ছ) ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি (extent)।

এভাবে বেন্থাম তাঁর উপযোগবাদে আনন্দ অর্জন এবং বেদনা পরিহার নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের দিক নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, ঐ ধরনের কার্যকলাপই সর্বশ্রেষ্ঠ যা **"সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখ"** ("greatest happiness of the greatest number") আনয়ন করে।

উপযোগবাদের সমালোচনা
Criticisms

উপযোগবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সমালোচিত হয়েছে। **প্রথম,** অধ্যাপক জোন্সের (W. T. Jones) মতে উপযোগবাদ দ্ব্যর্থবোধক, অপ্রতুল এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের অযোগ্য। যদিও উপযোগবাদে "সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখের" কথা বলা হয়েছে তথাপি তা দ্ব্যর্থবোধক। সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি ও সর্বাধিক সুখ দুটি স্বতন্ত্র বস্তু এবং এ দুই-এর সম্মিলন প্রায়ই দেখা যায় না। **দ্বিতীয়,** আনন্দ ও বেদনা-এ দুটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত উপযোগবাদ তত্ত্ব অপ্রচুর বলে অনেকের নিকট মনে হয়। **তৃতীয়,** আনন্দ ও বেদনা পরিমাপের জন্য যে "নৈতিক পরিমাপের" (moral calculus) ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য নয়। **চতুর্থ,** আনন্দ ও বেদনার পরিমাণগত দিকটি উপযোগবাদে গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু

আনন্দ ও বেদনার গুণগত দিক অস্বীকৃত হয়েছে। ফলে উপযোগবাদকে অনেকে **"পশুসুলভ আনন্দবাদ"** বলে আখ্যায়িত ক রেন।

উদারবাদের মত উপযোগবাদও ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক দর্শন। বিভিন্ন দিক থেকে এ মতবাদ সমালোচিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটেনে এ মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর ভিত্তিতে সরকার ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন ও সরকারের বিভিন্ন শাখায় অনেক সংস্কার সাধিত হয়।

১। উদারবাদ বলতে কী বোঝ? উদারবাদের মৌল সূত্রগুলো কী কী? (What do you mean by liberalism? What are the fundamental principles of liberalism?) [D. U. 1985]

২। উপযোগবাদ কাকে বলে? উপযোগবাদের মূল্য প্রস্তাবনা কী কী? (What is utilitarianism? What are the basic propositions of utilitarianism?) [D. U. 1984]

৩। উদারতাবাদ কী? উদারতাবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (What is liberalism? Discuss its characteristics.) [N. U. 1996, 1998]

পুঁজিবাদ

CAPITALISM

৪৮

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র
Capitalism

পুঁজিবাদ বলতে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায় যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান এবং উৎসসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত, মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংগঠিত। মুনাফার মনোভাব (profit motive) এবং প্রতিযোগিতা (competition) পুঁজিবাদের প্রাণস্বরূপ। ব্যক্তিগত মালিকানা এর অন্তকরণ এবং অবাধ বাজার নীতি (free market policy) এর মুখ্য নির্দেশক। পুঁজিবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করে অধ্যাপক রাইট (D. M. Wright) বলেন, "পুঁজিবাদ এমন এক ব্যবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অধিকাংশ, বিশেষ করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত হয় এবং তা অবাধ প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়" ("A system in which, on average, much of the greater portion of economic life and particularly of new investment is carried on by private units under conditions of active and substantially free competition and avowedly at least under incentive of a hope for profit.")।

তত্ত্বগতভাবে পুঁজিবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উদারবাদের প্রধান সহযোগী। বেসরকারি শিল্পপতিগণ উৎপাদনের উপকরণের মালিক। তারা উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যয়, মূল্য এবং বাজার নির্ধারণ করেন। মুনাফা অর্জনকে মুখ্য জ্ঞান করেন। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন কলা-কৌশল আরও উন্নত করেন এবং অধিক মুনাফা সঞ্চয় করে বিত্তশালী হন। পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় অবাধ বাজারনীতি এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ছিল বহু বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে উদারবাদ যে আন্দোলন শুরু করে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পুঁজিবাদ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী পুঁজিবাদের বিজয় অব্যাহত থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনা সঞ্চিত হতে থাকে এবং সমাজতন্ত্রের আবেদন বৃদ্ধি পায়। আশির দশকের শেষ প্রান্ত থেকে পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতির দিন আবার ফিরেছে। বর্তমানে পুঁজিবাদের ক্ষেত্র বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে অবাধ অর্থনীতির প্রভাবে এবং বিশ্বায়নের প্রবল আকর্ষণে।

পুঁজিবাদের দার্শনিক ভিত্তি
Philosophical Basis

পুঁজিবাদের দার্শনিক ভিত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এ মত অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থ ভাল বোঝে। ফলে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করলে এবং চুক্তিবদ্ধ হলে সকলের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি

পাবে। উৎপাদনের চারটি উপাদান-ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপনা-অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ব্যবহৃত হবে। ফলে কম খরচে দ্রব্য তৈরী হবে প্রচুর পরিমাণ এবং উপভোগকারিগণ অল্প মূল্যে পণ্য উপভোগ করতে পারবে। মজুর স্বাধীনভাবে চুক্তি করতে পারলে অধিক মূল্যে শ্রম বিক্রয় করতে পারবে। ভূমির খাজনাও বৃদ্ধি পাবে। ব্যবস্থাপক বা পরিচালকের লভ্যাংশ এবং মূলধনের সুদ অনেক বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং উৎপাদনের চারটি উপাদানই যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি পায়। চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে দ্রব্যমূল্যে সমতা আসে।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Capitalism

পুঁজিবাদের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। **প্রথম, শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী সংঘর্ষ** ঃ সমাজে পুঁজিবাদ অব্যাহত থাকলে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দেখা দেয় এবং শ্রেণী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পুঁজিপতি ও শ্রমিক বা মার্কসীয় ধারণায় সমাজে বুর্জোয়া (bourgeoisie) ও সর্বহারা (proletariat) শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়, অবাধ প্রতিযোগিতা ঃ পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা (open competition)। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বৃহৎ পুঁজিপতি বৃহত্তর আকার ধারণ করেন। শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

তৃতীয়, ব্যক্তি মালিকানা ঃ পুঁজিবাদে ব্যক্তি মালিকানা (private ownership) বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অনুপস্থিত। ব্যক্তিগত সম্পদকে (private property) পবিত্র জ্ঞান করা হয়।

চতুর্থ, পুঁজিবাদের চরিত্র আন্তর্জাতিক ঃ পুঁজিবাদ শুধুমাত্র একটি সমাজে সীমিত থাকে না, বরং বহুজাতিক সংস্থার (multinational corporations) মাধ্যমে তা বিশ্বময় বিস্তৃত হতে পারে।

পঞ্চম, পুঁজিবাদের প্রাণ অবাধ বাজারনীতি (free market policy) ঃ দ্রব্যমূল্য অথবা উৎপাদনের পরিমাণের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বাণিজ্য নির্ধারিত হয় বাজারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।

ষষ্ঠ, পুঁজিবাদের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি বুর্জোয়া গণতন্ত্র (bourgeois democracy) ঃ এ ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা পুঁজিপতিগণ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং পুঁজির বিকাশ সাধনে অধিক তৎপর হয়ে ওঠেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রকারান্তরে পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

সপ্তম, মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ঃ এ ব্যবস্থায় মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

অষ্টম, ক্রেতার স্বাধীনতা ঃ পুঁজিবাদে "ক্রেতাই রাজা" ('Consumers are sovereign')। এ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে ক্রেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে সরকারের কোন ভূমিকা নেই।

নবম, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের অনুকূলে থাকে।

দশম, উদ্যোগের স্বাধীনতা ঃ পুঁজিবাদে শ্রম ও পুঁজির রয়েছে অবাধ গতিশীলতা। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ব্যক্তির অর্থনৈতিক উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ করে না। ব্যক্তিই নির্দিষ্ট করে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হবে এবং তার পরিমাণ কত হবে।

পুঁজিবাদের পক্ষে যুক্তি
Merits of Capitalism

বিশ্বের প্রভাবশালী পুঁজিপতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে বিশ্বময়। এই ব্যবস্থার কয়েকটি সুফল লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম, এ ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকায় উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত হয়, দ্রব্যমূল্যও হ্রাস পেতে পারে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় বহুগুণ।

দ্বিতীয়, প্রতিযোগিতার ফলে এ ব্যবস্থায় উন্নততর প্রযুক্তির (technology) উদ্ভাবন হয় এবং উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়, যেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত, এ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের কুফল দূর হয় এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ, এ ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের গতি নিম্নমুখী হয়, কেননা অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় ও উৎপাদন ব্যয় কমে আসে এবং সমাজ লাভবান হয়।

পঞ্চম, এ ব্যবস্থা ক্রেতাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা ইচ্ছামত জিনিসপত্র লাভ করে, রুচিমাফিক ক্রয় করে এবং সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করে।

ষষ্ঠ, পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপে এবং অন্যান্য স্থানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের ফলে যে অগ্রগতি সূচিত হয়েছে তার গতি–প্রকৃতি লক্ষ্য করলে তা অনুধাবন করা যায়।

পুঁজিবাদের বিপক্ষে যুক্তি

পুঁজিবাদ যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথম, প্রতিযোগিতা অনেক সময় মঙ্গলজনক, কিন্তু প্রতিযোগিতা হতে হবে সমানে সমানে। একজন মজুর একজন শিল্পপতির সাথে সমান তালে প্রতিযোগিতা করতে অসমর্থ। দরিদ্র মজুরদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কোথায়?

দ্বিতীয়, পুঁজিবাদে অবাধ প্রতিযোগিতা স্বীকৃত হলে ছোট শিল্পকে বড় শিল্পের হাত থেকে রক্ষা করবে কে?

তৃতীয়, একচেটিয়া (monopoly) শিল্প বাণিজ্যের অশুভ প্রভাব থেকে ক্রেতা বা উপভোগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করবে কে?

চতুর্থ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এ যুগে আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানির প্রসার রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা রাষ্ট্র সমাজের স্বার্থে করে থাকে। পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস পায়।

পঞ্চম, পুঁজিবাদের আর একটি অশুভ ফল হলো সম্পদের বিপুল অপচয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অদক্ষতা।

ষষ্ঠ, এ ব্যবস্থা অধিকদিন কার্যকর থাকলে সমাজে সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং সংঘর্ষমূলক এক প্রবণতা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতীত এ ব্যবস্থায় মজুর ও অন্যান্যের জীবনমান উন্নত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

সপ্তম, পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিরপেক্ষ থাকে না। রাষ্ট্রযন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। ফলে সমাজের দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

অষ্টম, এ ব্যবস্থায় শ্রমিক এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে অবিরত ধারায় দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ফলে সমাজ দ্বন্দ্ব ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নবম, বিশ্বময় প্রতিযোগিতার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। আন্তঃরাষ্ট্র দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধবিগ্রহ এই ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় মুনাফার লোভেও বুর্জোয়া শ্রেণী যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে।

দশম, এ ব্যবস্থায় ক্রেতার স্বাধীনতাও খর্ব হতে পারে যদি অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া অধিকার কোন উৎপাদক সৃষ্টি করতে পারে। ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে।

তবে এই সব সমালোচনারও উত্তর রয়েছে। পুঁজিবাদী ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপানের দিকে দৃষ্টি দিলে এই সব সমালোচনা যে অনেকটা অর্থহীন, অতিরঞ্জিত এবং শুধুমাত্র তাত্ত্বিক তা বোঝা যায়।

১। **পুঁজিবাদের সংজ্ঞা দাও। এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?** (Define capitalism. What are its characteristics?)

২। **পুঁজিবাদের সুফল ও ত্রুটি সম্পর্কে কী জান?** (What do you know of the merits and demerits of capitalism?) [D. U. 1985]

৩। **পুজিবাদ কী? পুজিবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।** (What is capitalism? Argue for and against capitalism.)। [N. U. 1997, 2001]

সামাজিক ও রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি

৪৯

BASIS OF SOCIAL AND POLITICAL OBLIGATION

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি
State and Individual

রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান। ব্যক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের কল্পনা অলীক এবং রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তিজীবন অসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু এরিস্টটল তাই বলেছেন, 'মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে ব্যক্তি সমাজের সভ্য নয়, সে হয় দেবতা, না হয় পশু"। ("Man is by nature a social and political animal and a man, who is not member of a society, is either a god or a beast.")।

ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তিই রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। পরিবারে যে প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে যা বিকশিত হয়, রাষ্ট্রে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাই সমাজ জীবনকে সুশোভিত করে তোলে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রই সমাজ জীবনকে সুশৃঙ্খল করে, শান্তি ও শৃঙ্খলার নিরাপত্তা দান করে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনকে দিকে দিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে সার্থকতা দান করে। রাষ্ট্রের আইন-কানুন, প্রথা-বিধান, শাসন প্রণালী ব্যক্তি জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়, প্রচলিত থাকে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

ব্যক্তি জীবনও রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আইন শৃঙ্খলার ভিত্তিতে বিকশিত হয়। ফলে বৃহত্তর মানব সভ্যতা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

সুতরাং রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পরস্পরের সাথে এক অচ্ছেদ্য স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ। একটি অপরটি দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং একটি অন্যটির মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আনুগত্যের ভিত্তি
Basis of Obedience

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ব্যক্তি স্বীকার করে কেন? কেন আমরা রাষ্ট্রের আধিপত্য স্বীকার করে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করি ?

প্রশ্নটি কঠিন সন্দেহ নেই। এর উত্তর দেয়াও সহজ নয়। যুগে যুগে চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হিমশিম খেয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। বিভিন্ন চিন্তাবিদ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। নিচে কারণগুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) ধর্মভয় ঃ প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলে লোকেরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত ধর্মের ভয়ে। রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন ধর্মযাজক এবং ধর্মীয় নেতা। সুতরাং বলা হয়, অতীতে রাষ্ট্রের আনুগত্য ছিল অনেকটা ধর্মের প্রতি আনুগত্য। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়, মোক্ষ ব্যতীত অন্য

ত্রিবর্গ–ধর্ম, অর্থ, কাম রাষ্ট্রের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। ইসলামেও বিভিন্নভাবে বলা হয়, খেলাফতের মাধ্যমেই ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে মঙ্গলের সন্ধান লাভ করে। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ছিল অনেকটা ধর্মীয় অনুশাসন।

(২) আত্মরক্ষার লক্ষ্যে ঃ যাঁরা মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করেন না, তাঁরা, বিশেষ করে হবসের ন্যায় দার্শনিক এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, মানুষ অপরের হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের ন্যায় বিরাট দানবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। হব্‌সের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল "সঙ্গীহীন, দীন, ঘৃণ্য, পাশব ও সংক্ষিপ্ত"। সুতরাং স্বাভাবিক সমাজ জীবনের আশীর্বাদ লাভের জন্য মানুষ রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে।

(৩) সহজাত প্রবৃত্তির বশে ঃ অনেকের মতে, মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির বশে ও সুকুমার বৃত্তি সমূহের প্রেরণায় রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণও এ মত পোষণ করতেন। এরিস্টটলের মতে, সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই মানুষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করে যেমন পরিবারের প্রধান মাতা–পিতার কর্তৃত্ব স্বীকার করে শিশু।

মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। সর্বযুগে সর্বকালের মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির বশে সকলের সাথে বসবাস করে এসেছে। মানব মনের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের এই যে প্রবণতা—তা থেকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই প্রবৃত্তির বশেই মানুষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সমাজ জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠু হইয়া উঠে এবং তাই রাষ্ট্রের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাশীল।

(৪) অভ্যাস বশে ঃ অনেকে আবার বলেন, মানুষ অভ্যাস বশেই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে। হেনরী মেইন (Maine) **এ মতের অনুসারী।** অভ্যাসের বশে যেমন ছোট শিশু তার ভাই–বোন, মাতা–পিতার আদেশ–উপদেশ মেনে চলে, তেমনি ব্যক্তি অভ্যাসের দাস বলেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত। আলস্যও তাকে প্ররোচিত করে। অনুকরণ স্পৃহাও তাকে সাহায্য করে।

(৫) সর্বাধিক উপযোগ ঃ বেন্থাম, মিল প্রমুখ হিতবাদী দার্শনিকের অভিমত এই যে, রাষ্ট্র সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল আনয়নের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ("greatest good to the greatest number")। সুতরাং সর্বাধিক উপযোগই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মানদণ্ড। এ উপযোগের জন্যই মানুষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকে।

(৬) প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঃ আদর্শবাদীরা বলেন, রাষ্ট্র হলো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার প্রতীক। হেগেলের মতে, "রাষ্ট্র পৃথিবীতে ভগবানের জয়যাত্রার প্রতীক" ("March of God on earth")। সুতরাং এই প্রজ্ঞাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্যই মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।

(৭) সহজাত প্রবৃত্তি ঃ সব দিক বিচার করে এ প্রসঙ্গে এটা বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র সত্যই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তা সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করে সুশাসনের আশীর্বাদ আনয়ন করে ব্যক্তি জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য যেভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে এবং মানব সভ্যতাকে যেভাবে সমৃদ্ধশালী করে তোলার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সে জন্য মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। আনুগত্যের ভিত্তি তাই রাষ্ট্রের কার্যাবলির মধ্যে নিহিত।

উপসংহার ঃ চূড়ান্তভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে।

রাজনৈতিক এবং নৈতিক কর্তব্য
Political and Moral Obligations

রাষ্ট্র কল্যাণকর এক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়। রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধানতম লক্ষ্য নাগরিকদের সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধনে সাহায্য করা ও সকলের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত করতে সহায়তা করা। বিভিন্ন আদর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র স্ব স্ব লক্ষ্যে উপনীত হয়। ব্যক্তি-জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে সমষ্টিগত জীবনে সংহতি ও ঐক্য আনয়ন করে এবং সর্বোপরি বৃহত্তর মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধশালী করে রাষ্ট্র এ লক্ষ্য অর্জন করে।

কিন্তু রাষ্ট্রের কার্যাবলি ও ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নাগরিকদের কার্যাবলি ও ইচ্ছার মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তাই নাগরিকদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক এবং কিছু কিছু নৈতিক। নিচে তার আলোচনা করা হলো ঃ

রাজনৈতিক কর্তব্য (Political Obligations) ঃ রাজনৈতিক কর্তব্যগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো ঃ (ক) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, (খ) রাষ্ট্রের আইন-কানুন মান্য করা, (গ) রাষ্ট্রের ধার্য করা কর নিয়মিতভাবে প্রদান করা, (ঘ) সততার সাথে ভোট দান করা, (ঙ) রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সততার সাথে পালন করা, (চ) সরকারি কর্মচারী হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করা, (ছ) কর্মচারীদিগকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা, (জ) আইন-কানুন যাতে সকলে মান্য করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা (ঝ) জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করা এবং (ঞ) সর্বোপরি বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

নৈতিক কর্তব্য (Moral Obligations) ঃ রাজনৈতিক কর্তব্য ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিককে অনেক নৈতিক কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি হয় ব্যক্তির প্রশংসনীয় কার্যাবলির দ্বারা। ব্যক্তির চরিত্র, উদ্যম, শিক্ষা ও দক্ষতা শুধুমাত্র ব্যক্তির গৌরব বৃদ্ধি করে না, রাষ্ট্রেরও গৌরব বৃদ্ধি করে। তাই প্রত্যেক নাগরিককে স্বীয় দায়িত্ব সততা ও দক্ষতার সাথে পালন করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, প্রত্যেককে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে মনোযোগী হতে হবে। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার ন্যায় সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বিকশিত করার জন্য প্রয়াসী হতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিকেও মনোযোগী হতে হবে। সংস্কৃতি, শিল্পকলা, চারুশিল্প প্রভৃতির বিকাশের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

রাজনৈতিক কর্তব্য ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান, তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথম, রাজনৈতিক কর্তব্য স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট, কিন্তু নৈতিক কর্তব্য কিছুটা অস্পষ্ট।

দ্বিতীয়, রাজনৈতিক কর্তব্যের সীমারেখা আইন কর্তৃক নির্ধারিত। কিন্তু নৈতিক কর্তব্যের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। নৈতিক কর্তব্যের প্রকাশ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন যুগে, এমন কী বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটও তা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্তব্য সর্বত্র প্রায় এক ও অনুরূপ।

তৃতীয়, রাজনৈতিক কর্তব্যের উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। কিন্তু নৈতিক কর্তব্যের উপর রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তি তা পালন করে চলে।

সর্বশেষে, এও বলা চলে যে, নৈতিক কর্তব্যের ধারণা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন। রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে এর কোন মান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নৈতিক কর্তব্যবোধ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু রাজনৈতিক কর্তব্যবোধ রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। বাহ্যিক আচার-আচরণে, কর্মে, চালচলনে ও কার্যাবলিতে তাঁর প্রকাশ। কিন্তু নৈতিক কর্তব্যবোধের ক্ষেত্র হলো মানব মন। মানব মনেই এর প্রকাশ ও বিকাশ।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিরোধ করা উচিত কী
Is Resistance to State Morally Justified

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিরোধ করা উচিত কীনা, এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং থাকতেও পারে না। তবে সময় বিশেষে বিপ্লবকে আবাহন করা চলে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "যে রাষ্ট্রে আমার নৈতিকতার পূর্ণ বিকাশ সাধনে পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে, শুধুমাত্র সে রাষ্ট্রের আমি আনুগত্য স্বীকার করি" ("The only state to which I owe allegiance is the state in which I discover moral adequacy")। যে রাষ্ট্র জনকল্যাণের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে এবং যা জনগণের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে সহায়ক নয়, সে রাষ্ট্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করার অধিকার জনগণের রয়েছে।

দার্শনিক টি. এইচ. গ্রীন (T. H. Green) বলেন, যখন শাশ্বত নীতির সাথে আইনের অসঙ্গতি দেখা যায়, তখন আইনকে অগ্রাহ্য করে শাশ্বত নীতিকে মেনে চলাই কর্তব্য, কেননা তা না হলে মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হয় না এবং মানুষ মহত্তর জীবনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

সুতরাং রাষ্ট্র যখন আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে, যখন তা জনকল্যাণের কার্য থেকে বিরত থাকে, তখন সে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা প্রত্যেকটি আত্মসচেতন নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।

অবশ্য এরিস্টটল বলেছেন, খারাপ রাষ্ট্রও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য শিখাবার অধিকারী। সুতরাং জনসাধারণ রাষ্ট্রকে মেনে চলবে, তাই স্বাভাবিক। তবে কিছুসংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শিক্ষার উর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রকে অমান্য করতে পারেন।

অধ্যাপক লাস্কির কথায় বলতে হয় যে, রাষ্ট্র যখন সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, যখন তা সনাতন, চিরঞ্জীব সত্য ও নৈতিকতার পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তখন একজনও অবশিষ্ট সকলের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার অধিকারী। আইনের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। কিন্তু সত্য সর্বকালের এবং সর্বযুগের। এ সত্যের জন্য বহু জ্ঞানী ও গুণী আত্মদান করেছেন অথচ সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

তাই প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিরোধ করা যেতে পারে। তবে প্রতিরোধের বিষয়টি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বিবেচনা করে দেখা উচিত। যাকে ভাল বলে বিবেচনা করা হচ্ছে তা আদৌ ভাল কি না তা সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে।

তাছাড়া, প্রতিরোধ সর্বপ্রথম শাসনতান্ত্রিক উপায়ে গড়ে তোলা উচিত। যদি তা সফল হয় তা হলে আইন বহির্ভূত উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। যদি তা ব্যর্থ হয়, তাহলে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হতে পারে। এড্‌মাণ্ড বার্ক (Burke) বলেন, রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করাটা ঔষধের ন্যায়। রাষ্ট্রদেহ যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তিক্ত ঔষধ খাওয়ানোর ন্যায় তাকে প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োগ ঃ রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম সংস্থা। মানবীয় অন্যান্য সংস্থা থেকে রাষ্ট্র স্বতন্ত্র, কেননা সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেই অর্পিত হয়েছে। তাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। মানুষ মাতৃক্রোড় থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে স্বীয় সত্তা বিকাশ করতে থাকে। পরিবার, সম্প্রদায়, খেলাধুলার সংঘ, আলোচনা চক্র, রাষ্ট্র, এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থা-প্রভৃতির নিকট মানুষ বিভিন্নভাবে ঋণী। প্রত্যেকটি সংঘ বা সংস্থা মানুষের জীবনকে কল্যাণের পথে প্রবাহিত করে। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সংঘের কোন সার্বভৌম ক্ষমতা নেই।

সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অত্যধিক। তাই রাষ্ট্রকে কর্তৃত্ব প্রয়োগে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দেখতে হবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চাকার নিচে মানবিক স্বার্থ যেন বিনষ্ট না হয় এবং রাষ্ট্রের অপ্রতিহত গতির দাপটে জনসাধারণের স্বার্থ যেন বলি না যায়।

অনেক দার্শনিক অবশ্য বলেছেন, রাষ্ট্র মানবের চরম প্রজ্ঞার ফলস্বরূপ। সুতরাং রাষ্ট্র অভ্রান্ত (infallible)। তাই রাষ্ট্রের কোন কার্য বা নীতি ভ্রান্ত হতে পারে না।

কিন্তু আসলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রযোজ্য হয় ভ্রান্ত মানুষ কর্তৃক। সুতরাং কোন নীতি নির্ধারণ করতে হলে শতবার ভেবে দেখে করতে হয়। ইতিহাসের শিক্ষায় দীক্ষা গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নে মনোযোগী হতে হয় এবং সর্বক্ষণ জনকল্যাণ ও জনস্বার্থের প্রতি মনোযোগী হতে হয়। যদি একশ্রেণীর প্রজ্ঞাবান বা জ্ঞানী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে প্রতিরোধ করতে দৃঢ় সংকল্প হয়ে ওঠেন, তা হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব দৃঢ় হওয়া উচিত নয়। তাদেরও ভেবে দেখা উচিত যে, হয়ত তাদের নির্ধারিত নীতি বা কার্যক্রম অভ্রান্ত নয়।

সুতরাং উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল স্বরূপ। রাষ্ট্রকে দীর্ঘতম পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে এবং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবদান অসীম। তাই রাষ্ট্রের প্রবর্তিত কার্যাবলির মধ্যে মানবের মুক্তি নিহিত রয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্র আদর্শচ্যুত হয় না তা নয়। এ সকল ক্ষেত্রে নাগরিকগণ অত্যন্ত সচেতনভাবে সাবধানতার সময় স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণ করবে তাই কাম্য। তা না হলে বিপ্লব শুধুমাত্র নাগরিকগণেরও সার্বিক অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে।

১। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যুক্তিসঙ্গত কারণ কী? (what is the justification of political authority?)

২। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যুক্তিসংগত কারণ কী? রাজনৈতিক দায়িত্ব ও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the justification of political authority? Distinguish between political and moral obligations.)

৩। রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্যসমূহের বিবরণ দাও। (Describe the political and moral obligations.)

৪। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিরোধ করা কী যুক্তিসংগত? যদি যুক্তিসংগত মনে হয় তা হলে তা কোন্ অবস্থায় করা উচিত? (Is resistance to state authority justified? If yes, under what circumstances?)

৫। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে কী সম্বন্ধ বিদ্যমান? রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োগ কীভাবে হওয়া উচিত? (What relationship exists between the state and individual? How can the state authority be applied?)

৬। আমরা রাষ্ট্রকে মান্য করি কেন? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিহত করা যায়? (Why do we obey the state? On what grounds resistance to the state is justified?)

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

POLITICAL POWER AND POLITICAL - AUTHORITY

সূচনা
Introduction

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম মৌল বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা (power) এবং কর্তৃত্ব (authority) এবং কীভাবে ক্ষমতা কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয় তার বিশ্লেষণ। কোন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং ক্ষমতা নির্ভর করে ঐ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগকারীর প্রকৃতির উপর। সুতরাং এ ধারণাগুলোর (concept) সঠিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

রাজনৈতিক ক্ষমতার সংজ্ঞা
Definition of Political Power

রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাকে বুঝায়। ক্ষমতার অর্থ প্রভাব। একজনের কার্যধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রভাব অথবা একজনকে তার নিজস্ব গতিধারা থেকে সরিয়ে দেবার প্রভাবই ক্ষমতা। অধ্যাপক গ্রেজিয়া (Alfred de Grazia) সত্যই বলেছেন, "মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করার দক্ষতাই ক্ষমতা" ("Power is the ability to make decision influencing the behaviour of man.")। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা (political power) রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা। ডি র‍্যাফেল (De Raffel) ক্ষমতাকে তিন দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

(ক) সাধারণ অর্থে, ক্ষমতা হলো দক্ষতা বা শক্তি। (খ) দ্বিতীয় অর্থে, ক্ষমতা এমন দক্ষতা যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অন্যের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। (গ) তৃতীয় অর্থে, রাষ্ট্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট কাজ করতে বাধ্য করে।

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা করলে রাজনৈতিক ক্ষমতার নিম্নে বর্ণিত প্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

(এক) রাজনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা।

(দুই) রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে নাগরিকদের বিশেষ দিকে ধাবিত করা হয় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(তিন) রাজনৈতিক ক্ষমতা এক ধরনের সমষ্টিগত ক্ষমতা এবং সমষ্টির কার্যক্রম উদ্বুদ্ধ কল্পে অথবা সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে তা ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তিগত ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে অধ্যাপক ব্রেক্ট (Arnold Brecht) বলেছেন, প্রধানত, চারটি উৎস থেকে ক্ষমতা উদ্ভূত হয় ঃ **(ক) পাশবিক বা দৈহিক জোর ও তার প্রয়োগের ভীতি, (খ) মর্যাদা, (গ) সম্পদ, (ঘ) ব্যক্তিগত আকর্ষণ বা প্রভাব।** রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল প্রোথিত রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে। সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ক্ষমতাশালী। এ অর্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাখ্যা করেছেন মেরিয়াম (Charles Merrium), জর্জ ক্যাটলিন (George Catlin). ল্যাসওয়েল (H. lasswell), রাশেল (B. Russel) ও মরগেনথাও (Morgenthau) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

সার্বভৌমত্বভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ হয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্র বা পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগই রাজনৈতিক ক্ষমতা।

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সংজ্ঞা
Definition of Political Authority

রাজনৈতিক ক্ষমতা (Political power) এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (Political authority) এক বস্তু নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা এক ধরনের শক্তি বা বল, কিন্তু রাজনৈতিক কর্তৃত্বে অনুমোদন বা বৈধতার একটি সূত্র নিহিত। শুধুমাত্র বৈধতার স্পর্শেই ক্ষমতা অধিকারে রূপান্তরিত হয়।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব
Political Authority

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হলো এমন ক্ষমতা যা বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মাক্স ওয়েবার (Max Weber) কর্তৃত্বের শ্রেণীবিভাগ করে বলেছেন, "সেই ক্ষমতাই রাজনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত যখন তা বৈধ বলে স্বীকৃতি লাভ করে" ("Power becomes transformed into political authority when legitimized.")।

রাজনৈতিক ক্ষমতা যেহেতু প্রযুক্ত হয় সমাজে তাই শুধুমাত্র সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিক কর্তৃত্বে রূপলাভ করে। **সামাজিক অনুমোদনই ক্ষমতাকে বৈধতা দান করে এবং বৈধ ক্ষমতাই কর্তৃত্ব।** অধ্যাপক ম্যাক আইভরের (Mac Iver) মতে, "শুধুমাত্র ক্ষমতায় কোন বৈধতা নেই, নেই তার কোন নির্দেশ অথবা পদ" ("Power alone has no legitimacy, no mandate, no office")। সামাজিক অনুমোদন লাভ করলে তা কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়। রবার্ট ডল (Robert Dahl) বলেন, "রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বৈধতার সম্মিলনই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।"

রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্নভাবে অর্জিত হতে পারে। গায়ের বা অস্ত্রের জোরে, অপরের সাহায্যে বা অন্যান্য পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হলেও তা রাজনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয় যখন তা বৈধতার (legitimacy) স্পর্শ লাভ করে।

ক্ষমতা বৈধকরণের বিভিন্ন স্বীকৃত পন্থাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। **প্রথম,** গণসমর্থন ঃ গণসমর্থনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৈধ বলে স্বীকৃত হয়। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ গণভোট (referendum) অনুষ্ঠান করে তা বৈধ করতে উদ্যোগী হন।

দ্বিতীয়, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা যেভাবেই হস্তগত হোক না কেন, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করে এবং গণ দাবি মিটাতে সক্ষম হয়ে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হয়।

তৃতীয়, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঃ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমেও ক্ষমতা কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়।

মূলকথা, শাসন করার অধিকারের স্বীকৃতিই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত করে।

১। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সংজ্ঞা দাও। কীভাবে ক্ষমতা কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়? (Define political power and political authority. How power becomes transformed into authority?)

দ্বিতীয় খণ্ড

* ব্রিটিশ সংবিধান
* আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান
* ব্রিটিশ ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা

ব্রিটেনের সংবিধান

THE CONSTITUTION OF GREAT BRITAIN

সূচনা
Introduction

অধ্যাপক মনরো *(Munro)* বলেন, "সভ্য মানুষ ধর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করেছে প্রাচ্যদেশ থেকে, অক্ষর জ্ঞান লাভ করেছে মিসর থেকে, এলজেব্রার জ্ঞান আহরণ করেছে মুসলমানদের নিকট থেকে, ভাস্কর্যের জ্ঞান লাভ করেছে গ্রীকদের নিকট থেকে এবং আইনের সম্যক ধারণা পেয়েছে রোমানদের নিকট থেকে। কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য মানুষ ব্রিটিশ মডেল চিন্তাধারার নিকট চিরঋণী" ("Civilized man has drawn his religious inspiration from the East, his alphabet from Egypt, his algebra from the Moors, his sculpture from Greece and his laws from Rome. But for his political organization he owes mostly to English models')।[১] তাঁর মতে, 'ব্রিটেনের সংবিধান সকল সংবিধানের জননীর মত এবং ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সকল পার্লামেন্টের জন্মদাত্রী" ("The British Constitution is the mother of all constitutions; the British Parliament is the mother of all parliaments.")। তাই রূপালী দ্বীপটির সংবিধান এত গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল দেশের ছাত্রদের নিকট তা এত গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতায় যে কয়টি জাতি স্থায়ী অবদানে তাকে সুশোভিত করেছেন এবং বিশ্ব সভ্যতায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থায়ী সূত্রপাত্র করেছেন, এ্যাংলো-নরম্যান জাতি তাঁদের অন্যতম। হাজার বছর ধরে শাসনব্যবস্থার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ব্রিটেনের অধিবাসীবৃন্দ যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়বস্তু।

এ ক্ষেত্রে ইতিহাস যেন উর্ণনাভের ন্যায় নিজের চারিদিকে ঘটনার জাল বুনে সংবিধানের গতি ও প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে। স্যার ইলবার্টের *(Sir Ilbert)* মতে, "ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অতীতের মৃত্তিকায় এমনভাবে প্রোথিত যে, তার কার্যক্রম বুঝতে হলে ইতিহাসের দিকে নজর দেয়া দরকা[illegible] ("The British Parliament strikes its roots so deep into the past that scarcely a single fe[illegible] of its proceedings can be made intelligible without reference to history.")। সুতর[illegible] সবকিছু মিলিয়ে স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের ছায়াপাতে, অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায়, পার্লামেন্টারী প্রথার সৃজনে, বহুবিধ কলাকৌশলের সমৃদ্ধিতে ও সর্বোপরি বিশ্বময় অভাবিত প্রভাবে ব্রিটিশ সংবিধান সত্যই অতুলনীয়।

১। William Bennet Munro, *The Governments of Europe,* Newyork, Macmillan, 1947, P12.

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of the Constitution

ব্রিটেনের সংবিধান বিভিন্ন দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার।

(১) ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত ঃ ব্রিটিশ সংবিধান প্রধানত অলিখিত এবং এর উপাদানসমূহ প্রথা, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। তাই টমাস পেইন *(Thomas Paine)* একে সংবিধান বলতে নারাজ। তাঁর মতে, যা দ্রষ্টব্য নয়, যা উপস্থাপিত করা যায় না, তাকে সংবিধান কখনও বলা যায় না। ফরাসী ঐতিহাসিক টকভিল *(Tocqueville)* বলেন, "ব্রিটিশ সংবিধানের কোন অস্তিত্বই নেই" ("In England, the constitution, there is no such thing")। অবশ্য পৃথিবীর কোন সংবিধানই সম্পূর্ণ লিখিত দলিল নয়। লিখিত ও অলিখিত অধ্যায়ের সমন্বয়েই সংবিধান গঠিত হয়। এখানেও কিছু কিছু লিখিত উপাদান রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ১২১৫ খ্রিস্টাব্দের ম্যাগনা কার্টা (Magna Charta), ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের পিটিশন অব রাইট্‌স (Petition of Rights), ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের বিল অব রাইট্‌স (Bill of Rights), ১৭০১ খ্রিস্টাব্দের অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট (Act of Settlement) ও পরবর্তী সময়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের আইনসমূহ ব্রিটিশ সংবিধানের স্তম্ভস্বরূপ।

(২) ব্রিটিশ সংবিধান নমনীয় ঃ এ সংবিধানটি অত্যন্ত নমনীয়। প্রয়োজনানুসারে আইন প্রবর্তনের পদ্ধতিতেই তাকে পরিবর্তিত করা চলে। এতে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে মতবাদের দিক দিয়ে ব্রিটেনের সংবিধানকে নমনীয় বললে কার্যত ইংরেজদের রক্ষণশীলতার জন্য তা তেমন সুপরিবর্তনীয় নয়। অধ্যাপক লাস্কি দেখিয়েছেন, এ দেশে আইনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে হলে অন্তত পঁচিশ বছর সময় লাগে।

(৩) এ সংবিধান এককেন্দ্রিক ঃ এ সংবিধান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বা কানাডার ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের সমুদয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। রাজা ও পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। স্বায়ত্তশাসিত কাউন্টি বা বরো (Borough) প্রভৃতির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। অবশ্য অধ্যাপক হুইয়ার *(Wheare)* বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলোয় এককেন্দ্রিক কাঠামো গড়ে উঠছে, কেননা আর্থিক পরিকল্পনা ও অন্যান্য কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে।

(৪) ধারাবাহিকতায় এ সংবিধান অনন্য ঃ বিবর্তনশীল ঃ এ সংবিধান একদিনে বা এক নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি হয় নি অথবা কোন মতবাদ থেকেও উৎপত্তি হয় নি। যুগ যুগ ধরে স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর বর্তমান রূপ সুস্পষ্ট হয়েছে। ক্রমিক ধারাবাহিকতায় এ সংবিধান অনন্য। তাই অধ্যাপক মনরো *(Munro)* একে "ধারাবাহিক সৃষ্টি" ("A Process of growth") বলে আখ্যায়িত করছেন। তিনি আরও বলেন, "এটি সুযোগ ও বুদ্ধির ফসল এবং এই সংবিধানের গতি নির্ধারিত হয়েছে কখনো আকস্মিকভাবে, কখনো সুচিন্তিত পথে" ("It is a child of wisdom and chance, whose course has sometimes been guided by accident and sometimes by high design")। ডাইসির মতে 'ব্রিটেনের সংবিধানকে কেউ তৈরি করে নি, বরং তা গড়ে উঠেছে' ('The English Constitution has not been made; it has grown')। অখণ্ড ধারাবাহিকতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জেনিংসও *(Jennings)* সে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, "ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি করা হয় নি, ধীরে ধীরে তা জন্মলাভ করেছে।" এটি বিবর্তনের উত্তম ফসল।

(৫) মূল বক্তব্য ও প্রয়োগে বৈসাদৃশ্য ঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতায় ব্যবধান ঃ এ সংবিধানের মূল বক্তব্য ও তার প্রয়োগের মধ্যে আশ্চর্য রকম বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই বেজহট *(Bagehot)* বলেন, "এখানে যা মনে হয় তা যথার্থ নয় এবং যা যথার্থ তা কখনো মনে হয় না" ("Nothing is what it seems to be or seems what it is not")। দৃশ্যত সংবিধানের ধারা মোতাবেক ব্রিটেনের শাসন বিভাগের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রয়েছে রাজার উপর, কিন্তু কার্যত তা কেবিনেট প্রয়োগ করে। আবার আইনের চোখে কেবিনেটের (cabinet) কোন অস্তিত্ব নেই। সংবিধান মোতাবেক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যত ব্রিটিশ কেবিনেট সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এ সব লক্ষ্য করে অধ্যাপক অ্যানসন *(Anson)* বলেন, ব্রিটিশ সংবিধানের প্রাসাদ এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, এর ছাদ, দেওয়াল, স্তম্ভ যেন পরিকল্পনাহীনভাবে সংযোজিত। সংবিধানের এ অবাস্তবতা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(৬) ক্ষমতার সমাবেশ ঃ ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি, যদিও সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কিছু কিছু ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে এখানে সহযোগিতার মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে। শাসন পদ্ধতির বিবর্তন ধারা সহযোগিতার পক্ষেই রায় দিয়েছে। পার্লামেণ্ট এবং কেবিনেট এক সূত্রে গাঁথা।

(৭) সরকারের দায়িত্বশীলতা ঃ ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সরকারের দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থেকে শাসন কার্য নির্বাহ করে। আবার মন্ত্রিপরিষদ জনসাধারণের নিকট দায়ী রয়েছে। রাজার নিকটও মন্ত্রিপরিষদ দায়ী। সুতরাং দায়িত্বশীলতা ব্যতীত তা অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন।

(৮) পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব ঃ এ শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব। প্রয়োজনানুসারে যে কোন আইন প্রবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্তন পার্লামেণ্ট করতে পারে, যদিও সমস্ত ক্ষমতার প্রতীক রাজা বা রাণী। তাই এ দেশের শাসনব্যবস্থাকে 'রাজকীয় প্রজাতন্ত্র' নামেও অভিহিত করা যায়। সুতরাং এ 'রাজকীয় প্রজাতন্ত্রে' ('Crowned Republic') পার্লামেণ্টই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে কাজ করে। কোন এক রসিক ব্যক্তি বলেছেন, "নারীকে পুরুষে এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ব্যতীত সকল কার্যই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্পুন্ন করতে পারে।" আদালতগুলো পার্লামেণ্টের কোন কার্যে বৈধতার প্রশ্ন তুলতে সক্ষম নয়।

(৯) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঃ বলা প্রয়োজন যে, ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সমাসীন রয়েছে। রাজা এখানে নামে মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। অধ্যাপক অগ্ *(Ogg)* বলেন, "ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থা আইনত অবাধ রাজতন্ত্র, তবে তা কার্যত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়" ("The Government of the U.K. is in ultimate theory an absolute monarchy, but in actual character a democratic republic.")।

(১০) প্রথার প্রাধান্য ঃ ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রথার (Convention) প্রভাব। বিভিন্ন পর্যায়ে হাজারো প্রথা ব্রিটিশ সংবিধানকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথার প্রভাবের ফলে এ সংবিধান মূলত অলিখিত সংবিধানে রূপান্তরিত হয়েছে।

(১১) আইনের শাসন ঃ আইনের শাসন (Rule of law) ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে মহীয়ান করে তুলেছে। সুতরাং আইনের শাসন ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়।

(১২) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার : ব্রিটিশ সরকার যথার্থই মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ ব্রিটেনের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। কমন্স সভার আস্থাভাজন হয়ে তা ক্ষমতা প্রয়োগ করে। পার্লামেন্টের আস্থা হারালে মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতাচ্যুত হয়। অন্যদিকে, মন্ত্রিপরিষদ জনগণ এবং রাজা বা রাণীর নিকটও দায়ী থাকে। তবে পার্লামেন্টের নিকট, বিশেষ করে কমন্স সভার নিকট, এর দায়িত্বশীলতা মৌলিক। জেনিংসের মতে, ব্রিটিশ সংবিধানের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে-**প্রথম,** এ সংবিধান গণতান্ত্রিক (democratic)। **দ্বিতীয়,** এই সংবিধান সংসদীয় (parliamentary)। **তৃতীয়,** এ সংবিধানে রাজতন্ত্রের (monarchical) লক্ষণ রয়েছে। **চতুর্থ,** সংবিধানে কেবিনেটের প্রাধান্য রয়েছে (predominance of cabinet)।

সংবিধানের উৎস
Sources of the Constitution

ব্রিটিশ সংবিধানের অধিকাংশ উপাদান কোন লিখিত দলিলে নেই। এ সংবিধান ঐতিহাসিক রীতিনীতি, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও প্রথাগুলোর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। যেহেতু এই সংবিধান তৈরি করা হয় নি, তাই যুগে যুগে বিবর্তনের ফলে তা গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক মন্‌রো *(Munro)* বলেছেন, এই সংবিধান রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জটিল সংমিশ্রণ। এটি সনদ ও চুক্তিপত্রের এবং আইন ও বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত ও ঐতিহ্যের সমন্বয়। সংবিধান একটি দলিল নয় বরং হাজারো দলিলের সম্মিলিত রূপ। তা একটি উৎস থেকে উৎসারিত হয় নি বরং বহু উৎসের ফলস্বরূপ" ("It is a complex amalgam of institutions, principles and practices; it is a composite of charters and statutes, decisions and common law; of judicial precedents, usages and tradition. It is not one document but thousands of them. It is not derived from one source but from several")। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মূল সন্ধান করতে গিয়ে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "এর মূল কোন সভা সমিতি বা দলিলের মধ্যে নিহিত নেই। বরং তা ব্রিটেনের আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, পুরাতন গীর্জার চূড়ায় ও ভাঙ্গা দুর্গের প্রাচীরে, গ্রামে, শহরের রাস্তা-ঘাটে এবং রাজ প্রসাদের আনাচে-কানাচে খুঁজে বের করতে হবে।"

এ উৎসগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়; প্রথম *আইনমূলক* ও **দ্বিতীয়,** প্রথামূলক। আইনমূলক উৎসগুলোর মধ্যে সনদ, পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিচারকের সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। প্রথামূলক উৎসের মধ্যে রয়েছে চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথাসমূহ।

(১) সনদ ও চুক্তি (Charter and Landmarks) : যে সকল ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র ব্রিটেনের সংবিধানের উৎসরূপে পরিগণিত হয়, তাদের মধ্যে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে মহাসনদ (Magna Charta), ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের অধিকার আবেদনপত্র (Petition of Rights), ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের অধিকার বিল (Bill of Rights), ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দের বন্দোবস্তের আইন (Act of Settlement) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ সকল ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক আইনের নগণ্য অংশমাত্র।

(২) সাধারণ বিধি (Statutes) : পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহও অনেক ক্ষেত্রে সংবিধানের উৎস বলে স্বীকৃত হয়। সরকারের ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা ব্যাপারে সময় সময় পার্লামেন্ট কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয়। ভোটাধিকার, নির্বাচন পদ্ধতি, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতা ও

কার্যাবলি, ব্যক্তিগত অধিকার ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য পার্লামেণ্ট এ আইনগুলো মাঝে মাঝে প্রণয়ন করেছে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংস্কারমূলক আইনগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিচারক প্রণীত আইন (Judicial Decisions) : প্রচলিত বিধি, পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন ও রাজ সনদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিচার বিভাগ অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তা অনেকাংশে সংবিধানকে প্রভাবান্বিত করেছে। মোটকথা, যখনই সরকারের সাথে জনসাধারণের কোন বিরোধ উপস্থিত হয়েছে সে বিরোধের মীমাংসা করতে গিয়ে বিচার বিভাগ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ব্রিটেনের ব্যক্তি অধিকারগুলো তারই প্রত্যক্ষ ফল। ডাইসির *(Dicey)* মতে, ইংল্যাণ্ডের সংবিধান বিচারকের তৈরি সংবিধান। অন্যান্য দেশের সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নীতি থেকেই সংবিধানের উদ্ভব হয়েছে।

(৪) চিরাচরিত রীতিনীতি (Common Law) : ব্রিটেনের চিরাচরিত রীতিনীতির ভিত্তিতে অলিখিত **সাধারণ আইন** (Common Law) গড়ে উঠেছে। এ সব রীতিনীতি সংবিধানের একটি বড় উৎস। সাধারণ আইন স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। ঐ সমস্ত বিধি পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত অথচ ঐ বিধিগুলো শাসন ব্যবস্থার সর্বত্র গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, সমবেত হবার স্বাধীনতা, জুরির বিচার, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধানের আইনসমূহ এ সাধারণ আইন থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মনরোর *(Munro)* মতে, "সাধারণ আইনগুলো (Common Law) পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের মত বিচারকের সিদ্ধান্ত সহযোগে ক্রমবর্ধমান রয়েছে" ("The Common Laws like statutory laws are continually in the process of development by judicial decisions.")। অধ্যাপক অগের *(Ogg)* মতে, "এ সকল রীতিনীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচলিত থেকে অলঙ্ঘনীয়, সুচারু এবং স্থায়ী হয়ে উঠেছে" ("A vast body of legal precepts and usages which through the centuries have acquired binding and almost immutable character.")।

(৫) প্রথা (Convention) : রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রথা, অভ্যাস, আচার-আচরণ, দেশাচার, প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিসমূহকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ডাইসি প্রথা (convention) বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও বিচারের ক্ষেত্রে এ সব প্রথা প্রয়োগ করা হয় না, তথাপি ব্রিটেনের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনেক অংশই প্রথার উপর নির্ভরশীল। যদিও এ সকল প্রথা আইন নয়, তথাপি আইনের মতই প্রতিপালিত হয়। রাজা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত কাজ করেন, বছরে একবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসতে হবে, মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে- এ সকল প্রথা মাত্র।

সুতরাং, ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র দেশাচার, প্রচলিত বিধি-বিধান, বিচারালয়ে সিদ্ধান্ত ও অতীতের ঐতিহ্য সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। স্রোতধারায় ঢেউ-এর দোলায় যেমন পলে পলে বেলাভূমি গড়ে উঠে এবং কালক্রমে সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত মখমলের আস্তরণ সৃষ্টি করে এবং বসতি স্থাপনের উপযোগী হয়ে ওঠে, তেমনি ব্রিটেনের সংবিধান কালস্রোতে ও ইতিহাসের প্রভাবে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে।

প্রথা কী
What are the Conventions

প্রথা (Convention) : প্রথা (Convention) আইন নয়, কিন্তু আইনের মতই তা মান্য করা হয়। আদালত কর্তৃক তা প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু যারা শাসন পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনা করেন অথবা যারা সরকারের বিরোধিতা করেন, তারা সকলেই প্রথাগুলোকে মেনে চলেন। ব্রিটেনের রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সকল সাধারণ নিয়ম। কে. সি. হুইয়ার *(K.C. Wheare)* চিরাচরিত রীতির সাথে প্রথার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "প্রথা মান্য করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু চিরাচরিত রীতি (usage) এখনও বাধ্যতামূলক নয়" ("By convention is meant an obligatory rule; by usage, a rule which is no more than the description of usual practice and which has not yet obtained obligatory force")। জন স্টুয়ার্ট মিল *(John Stuart Mill)* প্রথাসমূহকে "সংবিধানের অলিখিত নীতি" ('unwritten maxims of the constitution') বলে আখ্যায়িত করেছেন। উইলিয়াম অ্যানসন *(William Anson)* প্রথাকে 'সংবিধানের রীতি' ('customs of the constitution') বলে চিহ্নিত করেছিলেন।) মার্শাল ও মুডি *(Marshall and Moodie)* প্রথার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "প্রথা হলো শাসনতন্ত্রের সকল বিধান যা শাসনব্যবস্থার পরিচালকগণকে অবশ্য মান্য করতে হয়, কিন্তু তা বিচারালয়ে প্রয়োগ করা হয় না, যদিও বিচারালয় তাদের স্বীকৃতি দান করে" ("By the convention of the constitution, then we mean certain rules of constitutional behaviour, which are considered to be binding upon those who operate the constitution, but which are not enforced by the law courts although the courts may recognise their existence.")।

প্রথার প্রকারভেদ

ব্রিটেনে চার প্রকারের শাসনতান্ত্রিক প্রথা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম, রাজার বিশেষ ক্ষমতা (Prerogative) সম্বন্ধীয় প্রথা।

দ্বিতীয়, পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধীয় প্রথা ও দুই কক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কীয় প্রথা।

তৃতীয়, ইংল্যাণ্ড ও কমনওয়েলথ্‌ভুক্ত দেশগুলো সম্বন্ধীয় প্রথা।

চতুর্থ, মন্ত্রিপরিষদ সম্বন্ধীয় প্রথা।

রাজা ও মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত প্রথা

(এক) রাজা ও মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত প্রথাসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রধানত নিম্নলিখিতগুলোঃ

(ক) রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাজা অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ দান করেন।

(গ) কোন না কোন মন্ত্রীর পরামর্শমত রাজা বা রানী কার্য পরিচালনা করেন।

(ঘ) রাজা তার ভেটো ক্ষমতা কখনও প্রয়োগ করেন না।

(ঙ) রাজা ব্রিটেনের সকল কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারেন। তবে তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন শুধুমাত্র অক্ষমতা ও মন্দ আচরণের ক্ষেত্রে।

পার্লামেণ্ট সম্পর্কীয় প্রথা

(দুই) পার্লামেণ্ট সম্বন্ধীয় প্রথাগুলোর মধ্যে নিচে উল্লিখিতগুলো প্রধান ঃ

(ক) অর্থ সংক্রান্ত বিল কমন্স সভায় পেশ করা হবে।

(খ) বছরে একবার অন্তত পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসবে।

(গ) লর্ড সভা ও কমন্স সভার মধ্যে কোন সংঘাত দেখা দিলে লর্ড সভা নতি স্বীকার করবে।

(ঘ) ব্রিটেনের লর্ড সভা আপীলের সর্বোচ্চ আদালত। লর্ড সভা যখন আপীল আদালত হিসেবে কার্যরত থাকবে তখন শুধুমাত্র আইন বিশারদ লর্ডগণ উপস্থিত থাকবেন।

(ঙ) কোন আইন প্রণীত হলে তা পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে প্রণীত হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনটি পাঠের (reading) প্রয়োজন হবে।

(চ) পার্লামেণ্টে সরকারি পক্ষের বক্তৃতা ও বিরোধী বক্তৃতা পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে।

ডোমিনিয়ন সংক্রান্ত প্রথা

(তিন) ইংল্যাণ্ড ও ডোমিনিয়ন সংক্রান্ত প্রথাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(ক) ডোমিনিয়নগুলোর অনুরোধ ব্যতীত ডোমিনিয়নের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোনরূপ আইন প্রবর্তন করে না।

(খ) ডোমিনিয়নের মন্ত্রিসভার উপদেশ ব্যতীত রাজা বা রানী ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন না।

মন্ত্রিপরিষদ সম্বন্ধীয় প্রথা

(চার) মন্ত্রিপরিষদ সম্বন্ধীয় প্রথা নিম্নরূপ ঃ

(ক) মন্ত্রিপরিষদের প্রধান প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রথাগতভাবে কমন্স সভার সদস্য হবেন।

(খ) মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকবেন এবং পার্লামেণ্টে আস্থা হারালে পদত্যাগ করবেন।

(গ) কোন মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেণ্টের আস্থা হারালে রাজা বিরোধী দলের নেতার সাথে পরামর্শ করবেন।

(ঘ) প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে আস্থা হারাবার সময় পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রথাসমূহ ব্রিটেনের সংবিধানের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত হয়ে রয়েছে। তাই অধ্যাপক জেনিংস *(Jennings)* বলেন, "শাসনতান্ত্রিক প্রথাসমূহের যৌক্তিকতা এই যে, তারা আইনের

শুষ্ক অস্থিপঞ্জরগুলোতে মাংসের যোগান দিয়েছে। তারাই শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করেছে" ("The short explanation of constitutional conventions is that they provide flesh which clothes the dry bones of law; they make the legal constitution work")। ডাইসির মতে, "প্রথা সে সকল নিয়ম যা রাজার আদিম ক্ষমতা ও মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণ করে" ("Rules for determining the mode in which the discretionary powers of the crown ought to be exercised".)।

আইন ও প্রথা

আইন ও প্রথার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথম, আইন কোর্টে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু প্রথা আদালতে প্রযোজ্য হয় না।

দ্বিতীয়, আইনের স্বীকৃতি দেয়া হয় রাষ্ট্রের দ্বারা, কিন্তু প্রথাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় জনসাধারণের দ্বারা, যদিও প্রথা ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গের সামিল হয়।

তৃতীয়, আইনগুলো তৈরি করা হয় আইন পরিষদ কর্তৃক, কিন্তু প্রথা আপনিই গড়ে উঠেছে।

চতুর্থ, আইন স্থিতিশীল (static), কিন্তু প্রথা গতিশীল (dynamic)। প্রথা গতিশীল এ অর্থে যে শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য প্রথা সহজলভ্য এবং বিচার বুদ্ধি প্রসূত।

পঞ্চম, আইন প্রথা অপেক্ষা অনেক বেশি সুস্পষ্ট, প্রভাবশালী এবং মর্যাদাসম্পন্ন। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন প্রথার অবসান ঘটাতে সক্ষম, যদিও প্রথা আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে সমর্থ হয় না।

ষষ্ঠ, পরিশেষে, আইন ও প্রথার মধ্যে বাস্তব পার্থক্যের চেয়ে রূপগত পার্থক্যই লক্ষণীয়, কেননা আইন এবং প্রথা উভয়ই মান্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উভয়ের কার্যকারিতা সুস্পষ্ট। আইন ও প্রথা পরস্পরের সম্পূরক।

তবে এ ক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, আইন ও প্রথা পরস্পরের সহযোগী। অধ্যাপক জেনিংস *(Jennings)* তাই বলেন, "যদিও প্রথা আইনানুগ মনোভাব থেকে উত্থিত, তথাপি কালক্রমে প্রথার উপর ভিত্তি করেই আইন জন্মলাভ করে।"

প্রথার অনুমোদন (Sanctions behind Conventions) ঃ প্রথাগুলো মেনে চলা হয় কেন? এ প্রশ্ন অনেকের নিকট বড় হয়ে দেখা দেয়। বিচারালয়ে যদি তা প্রয়োগই না হলো, তবে তা মান্য করার প্রয়োজন কী?

ডাইসি *(Diecy)* এর উত্তরে বলেছেন, প্রথাগত বিধান ভঙ্গ করলে শেষ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক আইন অকেজো হয়ে উঠবে এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর বুনিয়াদ শিথিল হয়ে যাবে। তাঁর মতে, প্রথা ভঙ্গকারীর মনে এ কথাই জাগে যে, সে দেশের আইন ভঙ্গ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথা ভঙ্গকারীকে আইনের সাথে সংঘাতে আসতে বাধ্য করে। উদাহরণ দ্বারা ডাইসি বলেন, পার্লামেন্টের অধিবেশন যদি এক বছরের মধ্যে আহ্বান করা না হয়, তা হলে সৈন্য সংক্রান্ত আইন এবং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিল গৃহীত হবে না এবং তা রাজার অনুমোদন লাভ করতে পারবে না। তিনি বলেন, প্রথা ভঙ্গ করলে যদিও ভঙ্গকারীর কোন শাস্তি বিধান কোন আদালত করে না, তথাপি "প্রথা ভঙ্গকারীকে আইন ও বিচারালয়ের সাথে সংঘাতের মধ্যে নিয়ে আসে" ("It will almost immediately bring the offender in conflict with the courts and the law of the land")। কিন্তু ডাইসির এই বিশ্লেষণ সব প্রথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। তাই বর্তমানে অনেকেই ডাইসির উত্তরে সন্তুষ্ট হন না। আইন ভঙ্গ হবে বলে প্রথা মেনে চলতে হয় তা ঠিক নয়, বরং রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রথা মেনে চলা হয়।

(১) প্রথার প্রয়োজনীয়তা ঃ ওয়েড ও ফিলিপের মতে, 'এই প্রথাগুলো মেনে চলা হয়, কারণ রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে জনগণ প্রথাকে প্রয়োজনীয় মনে করে' ('The question why conventions are observed is political and psychological')।

(২) জনমতের প্রভাব ঃ প্রথা মেনে চলার প্রধান কারণ জনমতের প্রভাব। প্রথার শক্তির উৎস জনমত। জনমত মানতে চায় বলে প্রথাগুলো মেনে চলা হয়। অধ্যাপক জেনিংস *(Jennings)* সত্যই বলেছেন, প্রথা মানা না মানা নির্ভর করে জনসাধারণের মতের উপর এবং ব্রিটেনের সাধারণ মানুষ প্রথাগত বিধানসমূহকে যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশি সম্মান প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেবিনেটের কোন সদস্য একবার প্রথা ভঙ্গ করেন, তা হলে তিনি জনসাধারণের বিশ্বাস কখনও অর্জনে সক্ষম হবেন না। তাছাড়া, প্রথা ভঙ্গ হলে শাসনব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কোন দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনীতিবিদ্ সচেতনভাবে এ জটিলতার দিকে দেশকে টেনে নিতে রাজি হন না। তাই প্রথাগুলোকে তাঁরা উপেক্ষা করেন না। ওয়েড ও ফিলিপের মতে *(Wade and Philips)* **"প্রথাগুলোর প্রতি উদাসীনতা দেখালে এবং প্রথা অমান্য করা হলে অপরাধী বিচারালয়ে পর্যুদস্ত না হলে জনমতের নিকট আস্থা হারাতে বাধ্য"** ("breach of conventions in any case is far more likely to lead to political action than to proceedings in the court being brought against the offender.")।

(৩) উপযোগিতা ঃ এটি সত্য যে, গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা ব্রিটেনের শাসন পদ্ধতিতে জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে কোন পরিকল্পনা গ্রহণে কোন নেতা সাহসী হবেন না। উপযোগিতা না থাকলে, যুক্তি তার পশ্চাতে না থাকলে, প্রথাগুলো এত জনপ্রিয়তা লাভ করত না।

(৪) সম্মতি ঃ প্রথা সম্পর্কে সকল শ্রেণীর জনমনে এক ধরনের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে প্রথাকে মান্য করা জনগণের এক ধরনের নৈতিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই প্রথা ভঙ্গ করতে কেউ সাহসী হয় না।

(৫) আইনে পরিণত হবার সম্ভাবনা ঃ প্রথাকে অমান্য করলে তা আইনে পরিণত হতে পারে এ ভয়ও কোন কোন মহলে আছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৯ সালে লর্ড সভা কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত রাজস্ব বিলকে অগ্রাহ্য করে। তার পরেই ১৯১১ সালে লর্ড সভার রাজস্ব বিল গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত করে কমন্স সভা আইন প্রণয়ন করে।

(৬) ঐতিহ্যের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ঃ ব্রিটিশ জনগণ ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। তারা কোনক্রমেই অতীত ঐতিহ্যের অবমাননা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। প্রথা সে ঐতিহ্যের অংশ। তাই রাজনৈতিক নেতৃবর্গ জনগণের এই মনমানসিকতার পরিপন্থী কোন কিছু করতে সাহসী হন না। স্রোতের বিপরীতে কে যাবে? ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতিই প্রথা পালনের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

প্রথাগুলোর গুরুত্ব (Importance of Conventions) ঃ প্রথম, প্রয়োজন অনুসারে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধন ও সংশোধন আনয়নের জন্য প্রথাগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দ্বিতীয়, প্রথাগুলো বর্তমান থেকে শাসনতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, কারণ শাসকবর্গ প্রথা অনুসরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সচরাচর ঐতিহ্য মণ্ডিত অতীতকে অস্বীকার করে নতুন কোন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি করতে কেউ রাজি হয় না। প্রথাগুলো অমান্য করলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হবে।

তৃতীয়, "প্রথাগুলো শেষ পর্যায়ে জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলীর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে" ("Conventions are intended to secure the ultimate supremacy of the electorate as the true political sovereign of the state")। সুতরাং এগুলো ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কতকগুলো মৌলিক নীতি হয়ে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে।

আইনের অনুশাসন
Rule of Law

আইনের অনুশাসন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, আইনের চক্ষে শ্রেণীগত বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আইনের অনুশাসন এক জীবন্ত প্রতিবাদস্বরূপ। ডাইসির *(Diecy)* মতে, আইনের অনুশাসন বলতে তিনটি ধারণাকে বুঝায় ঃ

(এক) "কোন ব্যক্তিকে আইনসঙ্গতভাবে আর্থিক বা দৈহিক কোন প্রকার দণ্ড দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশের সাধারণ আদালতের সামনে সাধারণ আইন অনুসারে প্রমাণ করা যায় যে, সে কোন আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী" ("No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or good except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts")। এর অর্থ শাসন বিভাগ কাউকে যথেচ্ছভাবে শাস্তি দিতে পারে না। কোর্টে নিয়মাফিক বিচার না করে কাউকে কারাগারে অথবা হাজতে রাখা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আইনের অনুশাসন শাসনবিভাগের যথেচ্ছা ক্ষমতা এবং প্রভাবকে প্রাধান্য না দিয়ে স্বাভাবিক আইনকেই উপরে স্থান দেয়া হয়েছে।

(দুই) কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। তাঁর সামাজিক মর্যাদা যাই থাক না কেন বা তিনি যত বড় পদে অধিষ্ঠিত হোন না কেন, তিনি দেশের সাধারণ আইন মানতে বাধ্য এবং সাধারণ আদালতের আওতাভুক্ত। সকলের জন্য একই আইন। আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান। প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ একজন কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই আইনের চোখে সমান।

(তিন) ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বিচারকগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব রায় দিয়েছেন তা থেকেই ইংল্যাণ্ডের সংবিধান উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য দেশের সংবিধানে ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই ডাইসি বলেন, সংবিধানের মূলনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিধানাদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জনসাধারণের অধিকার, বিচারকদের সিদ্ধান্ত থেকে জন্মলাভ করেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে সংবিধানের ফলে এ সকল জন্মলাভ করে। সুতরাং ব্যক্তির অধিকার এখানে মৌলিক।

'ডাইসির বিশ্লেষণ এখন আর তেমন গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয় না। কারণ তিনি আইনের অনুশাসনের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং এর গুণাবলিকে অতিরঞ্জিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ জেনিংসের কথাগুলো উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, ডাইসি উনবিংশ শতাব্দীর হুইগ দলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আইনের অনুশাসন ব্যাখ্যা করেছেন। এখন রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক। সুতরাং জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য বর্তমানে অনেক ব্যক্তিগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। এই জটিলতার মধ্যে শাসন বিভাগীয় আদালতসমূহের দ্বারাও বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়া অধিকতর মঙ্গলজনক। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সমাধানের জন্য ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে Public Authorities Protection Act প্রণয়ন করা হয় এবং সরকারি কর্মচারীবৃন্দকে আরও বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে এক ধরনের শাসনবিভাগীয় বিচার ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাসন বিভাগীয় বোর্ড নিজেদের মধ্যে গোলযোগ নিষ্পত্তি করে। এসব বোর্ডের বিরুদ্ধে খুব কমই আপীল হয় উর্ধ্বতন বিচারালয়ে।

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র
Monarchy in British Political System

একদিন ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর ছিল। শাসন কার্য পরিচালনার ব্যাপারে ও আইন প্রণয়নে রাজা তখন যথেচ্ছাচার করতে পারতেন। রাজা তখন শাসন ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে সংগঠিত রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়েছে। তাই বর্তমানে রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে গ্লাডস্টোন বলেছেন, "ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে, তবে রাজা (King) ও রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের (Crown) মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ" (There are many subtle distinctions in the vernacular of British Government, but none is more vital than the distinction between the king and the Crown")। এ পার্থক্য নির্দেশের জন্য আরও বহু উপবচন প্রচলিত রয়েছে, যেমন– "রাজার মৃত্যু হয়েছে, রাজা দীর্ঘজীবী হোন" ('King is dead; Long live the king'); অথবা "রাজা থাকতে নাও পারেন, কিন্তু রাজতন্ত্র চিরদিন থাকবে" ('King may not stay but Crown will remain for ever')। সুতরাং এ দুই–এর পার্থক্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া উচিত।

রাজা ও রাজতন্ত্র
The King and the Crown

দুই এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম, রাজার একটি বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু রাজতন্ত্র (Crown) একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (concrete), কিন্তু অন্যটি বিমূর্ত (abstract) একটি ধারণা।

দ্বিতীয়, রাজা একজন ব্যক্তি বিশেষ। তিনি রাজমুকুট পরিহিত। শাসনদণ্ড ধারণ করে রয়েছেন। কিন্তু রাজতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান (office)। তাই রাজার অস্তিত্ব সাময়িক হতে পারে এবং রাজা জীবন–মৃত্যুর যে আইন রয়েছে তার অধীন, কিন্তু রাজতন্ত্র চিরন্তন, অক্ষয়, অমর ও অব্যয়। তবে এ সম্পর্কে এও মনে রাখতে হবে, অতীতে রাজা যে সব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, বর্তমান ব্রিটেনে রাজতন্ত্র সে সব ক্ষমতা লাভ করেছে। তাই ব্রিটেনকে অনেক চিন্তাবিদ 'রাজকীয় প্রজাতন্ত্র' (Crowned Republic') নামেও অভিহিত করেন। নৈর্ব্যক্তিক রাজতন্ত্রকে ("Crown") সিডনী লো "কাজ চালানো সুবিধাজনক একটি ধারণা" ('a convenient working hypothesis") বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক মনরো (Munro) রাজাকে 'একটি কৃত্রিম বা আইনী ব্যক্তিত্ব" ("an artificial or Juristic person") বলেছেন।

'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না, (The king can do no wrong") ঃ

এ উক্তির মূলকথা হলো, ব্যক্তিগতভাবে রাজাকে রাজকার্যের জন্য দায়ী করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে রাজা কোন আদালতে বিচার্য হবেন না। এর মূলগত অর্থ তিনটি ঃ

(এক) রাজা এখন শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তির প্রতীক নন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। ক্রমে ক্রমে রাজার হাত থেকে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দায়িত্বশীল মন্ত্রিদের হাতে এসে পড়েছে। রাজা বর্তমানে সকল প্রকার রাজনৈতিক দলাদলি ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

(দুই) এ উক্তির অর্থ, শাসনকার্যের জন্য মন্ত্রিসভার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব রয়েছে। রাজা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত স্তর। যদি তিনি নিজে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করেন, তবে তাঁর দ্বারা অন্যায় কার্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু আসলে তাঁর প্রত্যেকটি কার্য কোন না কোন মন্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হয়

এবং ঐ কার্যের আদেশপত্র সে মন্ত্রীর স্বাক্ষর থাকে। তাই রাজা ঐ সকল কার্যের জন্য দায়ী নন। তাঁকে কেউ গ্রেফতার করতে পারে না। তিনি কোন আদালতের আওতার মধ্যে পড়েন না, কেননা তিনি আদালতের মালিক।

(তিন) তিনি কোন অন্যায় কার্য করতে অসমর্থ। শুধু তাই নয়, তিনি কাউকে অন্যায় করতে আদেশ দিতে পারেন না। ফলে রাজার নামে কেউ অন্যায় করে রেহাই পেতে পারে না।

তবে এও উল্লেখযোগ্য, রাজার ব্যক্তিগত কাজের জন্য মন্ত্রিরা দায়ী নন। যদিও ডাইসি বলেন যে, "রাজা যদি রাগারাগি করে তাঁর প্রধনমন্ত্রীকে গুলী করে বসেন, তবুও বিচারালয়ে তাঁর বিচার হবে না।" এসব নিছক রসিকতাপূর্ণ উক্তি। তবে রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপারে খুব অল্প স্বাধীনতা রয়েছে।

'রাজার মৃত্যু নেই' (The King never dies) ঃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজশক্তি বা রাজতন্ত্র (Crown) অমর। ব্লাকস্টোন (*Blackstone*) যেমন বলেছেন, ব্যক্তি হিসেবে হেনরী, এডওয়ার্ড প্রমুখের মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু রাজতন্ত্র অবিনশ্বর। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানই রাজশক্তির নিয়ামক। এক রাজা পরলোক গমন করলে অন্য রাজা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

'রাজা শিশু নন, (The king is never an infant) ঃ রাজা কোনদিনই শিশু বা বৃদ্ধ নন, তিনি সকল সময়ই রাজা। যদি কোন শিশু সিংহাসনে আরোহণ করেন, তথাপি রাজকার্য পরিচালনার সময় তিনি শিশু বলে পরিগণিত হবেন না। পার্লামেন্টের বিল অনুমোদন থেকে আরম্ভ করে সকল কার্য সম্পাদনের যোগ্য বলে তিনি বিবেচিত হন। তবে যদি তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন, তা হলে রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। শারীরিক অসুস্থতা বা মানসিক দুর্বলতার জন্য যদি তিনি অপারগ হন তবে রাজ-প্রতিনিধি তাঁর পক্ষে শাসনকার্য চালাতে পারবেন। বর্তমানে রাজতন্ত্রের নিয়ন্তা বা রাজবংশের উত্তরাধিকারী পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। তা সংক্ষেপে রাজা ও রাণীর প্রথম সন্তান রাজমুকুট ধারণের অধিকারী (Principle of primogeniture)। প্রতি বছর একটি বড় রকমের ভাতা নির্ধারিত হয় রাজপরিবারের জন্য।

রাজার ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the Crown

যুগে যুগে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজ ক্ষমতায় যদিও অনেক রদবদল এবং ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়েছে, তথাপি যা আছে তাও একেবারে নিরর্থক নয়। বরং একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে, তাঁর ক্ষমতা নতুন আইন প্রণীত হবার সাথে সাথে ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে। রাজার ক্ষমতার উৎস প্রধানত দুটি ঃ প্রথমটি বংশানুক্রমিক পরমাধিকার (Prerogative) এবং দ্বিতীয়টি সাধারণ বিধিভিত্তিক (Common law)। ডাইসি বংশানুক্রমিক পরমাধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন নিম্নরূপ ঃ "বংশানুক্রমিক রাজা বা রাণীর ঐ সকল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যা আইনগতভাবে রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে রয়ে গিয়েছে" ("The residue of discretionary or arbitrary authority which at any given time is legally left in the hands of the crown.")। ঐ সকল ক্ষমতা রাজার হাতে রয়েছে না বলে, রাজশক্তির হাতে (Crown) আছে বলাই সুবিধাজনক, কারণ সেগুলো প্রথা অনুযায়ী রাজা মন্ত্রিদের পরামর্শ অনুসারে ব্যবহার করেন।

বেজহট (*Begehot*) তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "রাণী ভিক্টোরিয়া সমস্ত স্থলবাহিনীকে বিদায় দিতে পারবেন, নৌ-বাহিনী বরখাস্ত করতে পারেন, ফ্রান্সের বৃটানী প্রদেশ জয় করার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারেন, কর্ণওয়াল ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি করতে পারেন, প্রত্যেক প্রজাকে লর্ড উপাধি দান

করতে পারেন, সমস্ত দোষীকে ছেড়ে দিতে পারেন এবং আরও অনেক কাজ করতে পারেন যা কল্পনা করতেও ভয় হয়।" রাণী ভিক্টোরিয়া এ অংশ দেখে বলেছিলেন ঃ "ভদ্রলোক আচ্ছা দুষ্টু তো। এমন গল্পও বানাতে পারেন। নিশ্চয়ই আমার প্রজারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে না।"

রাজার কার্যাবলি ও ক্ষমতার বিবরণ নিচে বর্ণিত হলো ঃ

(১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ শাসন বিভাগীয় সকল কার্য ইংল্যাণ্ডের রাজার নামে পরিচালিত হয়। শাসন বিভাগীয় সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে নিয়োগ করা হয় তাঁর নামে। বিচারক ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক কর্মচারীকে তিনি পদচ্যুত করতে পারেন। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা তাঁর হস্তে ন্যস্ত। তিনি বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণকে গ্রহণ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। উপনিবেশগুলোর শাসনকর্তা, গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলদেরও নিয়োগ করা হত তাঁর নামে। কমনওয়েলথের প্রধান হিসেবে তিনি এ সকল ক্ষমতা ব্যবহার করতেন।

(২) আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ রাজা পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে কমন্সসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। রাজার অনুমোদন ব্যতিরেকে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। রাজার আদেশে পার্লামেণ্ট পুনর্গঠিত হতে পারে। রাজা স্বপারিষদ-রাজাজ্ঞার মাধ্যমে (Orders-in-Council) আইনও প্রণয়ন করতে পারেন। পূর্বে তিনি অধ্যাদেশ (Ordinance) প্রণয়ন করতে পারতেন। বর্তমানে তা বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন পার্লামেণ্টকে তিনি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বর্তমানে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিক থেকে। পার্লামেণ্ট সাধারণত প্রধান প্রধান নীতিগুলো নির্ধারণ করে। তাদের পূর্ণাঙ্গের জন্য রাজার হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা (delegated legislation) হস্তান্তরিত করা হয়।

(৩) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ঃ রাজাকে ন্যায় বিচারের উৎস বলা হয় ('Fountain of Justice')। তিনি উচ্চ আদালতে বিচারকগণকে নিযুক্ত করেন। ঔপনিবেশিক এলাকার আপীল সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করলেও প্রাণদণ্ড মওকুফ করার তাঁর চরম অধিকার রয়েছে। কমনওয়েলথভুক্ত ডোমিনিয়নগুলো থেকে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হত, রাজা তার রায় প্রদান করতেন। নতুন আদালত সৃষ্টি করার চরমাধিকারও তাঁর রয়েছে।

(৪) তিনি সম্মানের উৎসও বটে ('Fountain of Honour') ঃ তিনি যোগ্য ব্যক্তিগণকে লর্ডসভার সভ্য হবার মর্যাদা ও সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিগণকে ভূষিত করেন।

(৫) রাজা ইংল্যান্ডের গীর্জার প্রধান অধিকর্তা ঃ তিনি সকল বিশপ ও আর্চবিশপকে নিয়োগ দান করেন। ধর্মীয় শৃঙ্খলার ব্যাপারেও তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ধর্মীয় সভাও তিনি আহ্বান করেন।

(৬) ঐতিহ্যগত প্রভাব ঃ রাজা সর্বশ্রেষ্ঠ সামন্ত হিসেবে সাধারণ ও অসাধারণ উপায়ে রাজস্ব আদায় করতে পারেন। এটিও তাঁর চরমাধিকার। তাই রাজাকে গুপ্তধনের অধিপতি ('treasure trove') বলা হয়। শান্তিকালীন কোন উন্নয়নমূলক কর্মে বা বিপদকালে তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

(৭) রাজা ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঃ তাঁর নিকট থেকে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সকল কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। সামরিক বাহিনী তাঁর নামে পরিচালিত হয়। তাঁর নামে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করা হয়। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো তাঁর নির্দেশে সংগঠিত হয়।

(৮) রাষ্ট্রপ্রধান ঃ রাজা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যে কোন ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালেও তিনি তা করতে পারেন। কোন ব্রিটিশ নাগরিককে বিদেশ থেকে স্বদেশে আনয়ন করতে পারেন।

(৯) প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ঃ রাজা বা রাণী প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ দান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কারো পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য নন। তবে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করতে হয়, তাই এ ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনার তেমন সুযোগ নেই। তবে যদি কোন সময় দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে তবে রাজা বা রাণী নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এমন অবস্থা অবশ্য দেখা যায় না।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া ঃ আইনগতভাবে রাজা বা রাণী প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। কোন কোন লেখকের মতে মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকলেও যদি রাজা মনে করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ জনগণের আস্থা হারিয়েছে তা হলেও তিনি মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মত তিনি কমন্স সভা ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন।

(১১) প্রতীকধর্মী ক্ষমতা ঃ রাজা বা রাণী জাতীয় এবং দেশপ্রেমের প্রতীক। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও প্রতীক।

(১২) বিবিধ ঃ রাজা বা রাণী ব্রিটেনের যে কোন নাগরিককে বিদেশ গমন থেকে বিরত করতে পারেন। তিনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় করতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদকে তিনি উপদেশ দিতে পারেন।

কিন্তু এসব বলা সত্ত্বেও এটি উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনে রাজার ক্ষমতাসমূহ শুধুমাত্র কাগজে-কলমেই রয়েছে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা অনেকটা শূন্য।

রাজা সর্বাধিনায়ক শুধুমাত্র নামে। সকল ক্ষমতাই মন্ত্রিসভা কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয় "ইংল্যাণ্ডে রাজা রাজত্ব করেন, শাসন করেন না" ("He reigns but does not govern")। এ ক্ষেত্রে লর্ড ইশারের *(Esher)* অভিমতও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতার শাসনতান্ত্রিক কোন মূল্য থাকলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, পার্লামেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রিপরিষদ যদি রাজার মৃত্যুর সমনও তাঁর স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপিত করে, তা হলে তিনি তাতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হবেন। আর যদি তিনি এ মৌলিক নীতি মানতে রাজি না হন, তা হলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘনিয়ে আসবে" ("If the constitutional doctrine of ministerial responsibility means anything at all the king would have to sign his own death warrant if it is presented to him for signature by a ministry commanding a majority in the parliament; if there is any tampering with this fundamental principle the end of monarchy is in sight")। কিন্তু যদিও মন্ত্রিসভার যে কোন সিদ্ধান্তকে রাজা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য, তথাপি রাজার ইচ্ছা ও প্রভাবকে মন্ত্রিসভা সম্মান দিয়ে থাকে।

রাজার তিনটি অধিকার ঃ

ওয়ালটার বেজহট *(Walter Bagehot)* যথার্থই বলেছেন, রাজার তিনটি বিশেষ অধিকার রয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে রাজার প্রভাব সমাজ জীবনে অত্যন্ত গভীর হতে পারে। অধিকার তিনটি হলো ঃ **(এক)** আলোচনার মাধ্যমে পরামর্শদানের অধিকার (right to be consulted), **(দুই)** উৎসাহদানের অধিকার (right to encourage), ও **(তিন)** সাবধান করার অধিকার (right to warn)। প্রায় প্রত্যেকটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ রাজা বা রাণীর সাথে পরামর্শ করেন এবং পরামর্শদানের মাধ্যমে রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেন। রাজা বা রাণী রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে, জাতীয় স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে, বিশিষ্ট অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ও সর্বোপরি সর্বক্ষেত্রে নিরপক্ষতা বজায় রেখে, পরামর্শদান ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। অন্যদিকে রাজা নিজ অধিকার বলে মন্ত্রিপরিষদকে উৎসাহিত করতে পারেন। অতীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী ভিক্টোরিয়া জাতীয় দুর্যোগের দিনে মন্ত্রিপরিষদকে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে বহুবার উৎসাহিত করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ কোন ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করলে রাজা বা রাণী মন্ত্রিপরিষদকে সাবধান করতে পারেন।

অধ্যাপক জেনিংস *(Jennings)* বলেন, রাজা মন্ত্রিপরিষদের সকল কাগজপত্র দেখেন। মন্ত্রিপরিষদের সভার কর্মসূচি লাভ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রতিরক্ষা বিভাগের রিপোর্টও দেখেন ও কমনওয়েলথ সম্পর্কিত বিভাগের কার্যাবলির কার্যবিবরণী সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তাঁর মতে, "ব্রিটেনের রাজনীতিতে রাজার প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ এক ভ্রান্ত ধারণা"। **বর্তমানে ব্রিটিশ রাজনীতির যে গতি-প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয় তাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজা সম্পর্কে হুইগদের (whig) যে ধারণা ছিল এবং বেজহট যা বর্ণনা করেছেন তার সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। রাজা নিশ্চয়ই সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। কিন্তু এও সত্য যে, এ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রে রাজার প্রভাব অত্যন্ত গভীর।**

ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যৌক্তিকতা ও তাঁর তাৎপর্য
Justification and Significance of Monarchy in Great Britain

ইংল্যাণ্ডের রাজা নামে মাত্র রাজা। তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন। প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন মন্ত্রিপরিষদ। রাজা ও রাজ পরিবারের জন্য প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। সুতরাং স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে, রাজার যদি কোন কার্য ক্ষমতা নাই থাকে তবে এত অর্থ ব্যয় করে রাজতন্ত্রকে সংরক্ষণ করে লাভ কী?

এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। অনেক কারণে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে রয়েছে।

প্রথম, রক্ষণশীল মনোভাব ঃ অনেকের মতে রাজতন্ত্রকে সংরক্ষণ করার পেছনে এক প্রকার রক্ষণশীল মনোভাব কাজ করছে। ইংরেজগণ প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি পরিত্যাগ করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা পুরাতনকে বর্জন না করে তাকে কালোপযোগী করে নিতে প্রস্তুত। এ স্বভাব বশে রাজপদকে তাঁরা শ্রদ্ধার সাথে দেখে থাকেন।

দ্বিতীয়, প্রথার প্রভাব ঃ প্রথা এখানকার সামাজিক জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মূল-সূত্রগুলো প্রথাভিত্তিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীনকালে লণ্ডনের পথে কম আলো থাকত এবং গুণ্ডাদের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। তাই কমন্স সভার অধিবেশন শেষ হলে প্রহরীরা হাঁকত, "কে বাড়ি যাবে"? সদস্যগণ দলবদ্ধ হয়ে পুলিশের প্রহরাধীনে বাড়ি ফিরতেন। এখন লণ্ডনে আলোর ঝলমলানি চোখ ঝলসে দেয় এবং গুণ্ডাদের কোন সন্ধান নেই। তথাপি আজও প্রহরী হাঁকে- "কে বাড়ি যাবে?" কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু ইংরেজগণের নিকট প্রথা যে জীবনের মূল সূত্র। সকল রাষ্ট্রে তাই জাতীয় সংগীত দেশের গৌরব গাথায় পূর্ণ, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন"। সুতরাং রক্ষণশীলতা ও প্রথার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাজতন্ত্রের মূলে বারি সিঞ্চন করেছে।

কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। রাজতন্ত্রের কতকগুলো ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে, যাদের মূল্য রাষ্ট্রীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা হয়, "আবেগই রাজতন্ত্রের অবস্থিতির একমাত্র কারণ নয়" ("But the sentiment is not the only thing that keeps monarchy on the saddle")। ব্রিটিশ জাতির রক্ষণশীল প্রকৃতি ও প্রথার প্রভাব ছাড়াও রয়েছে কতকগুলো ব্যবহারিক উপযোগিতা। সেই কারণে রাজতন্ত্র এখনও টিকে রয়েছে।

(১) নিয়মতান্ত্রিক প্রধান ঃ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হলে সাথে সাথে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন কতকগুলো শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি হবে যার সমাধান সহজসাধ্য নয়। ব্রিটেনে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এবং এ শাসনব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (constitutional head) প্রয়োজন। তা ব্যতীত, সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য সম্পন্ন হতে পারে না। রাজা এই ক্ষমতার অধিকারী। যদি রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে তা হলে একজন প্রেসিডেন্ট তাঁর স্থলে নির্বাচিত করতে হবে। তখন অনেক প্রশ্নের এবং জটিলতার সম্মুখীন হবে ব্রিটিশ রাজনৈতিক জীবন। তিনি কী প্রত্যক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, না পরোক্ষভাবে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হবেন? তিনি কী কী ক্ষমতার অধিকারী হবেন? যদি তিনি ফরাসী প্রেসিডেণ্টের মত হন, তা হলে রাজতন্ত্রের দোষ কী? অবশ্য বর্তমানে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। আর যদি তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের মত ক্ষমতাবান হন এবং দেশের প্রকৃত শাসনব্যবস্থার নিয়ন্তা হন তবে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার প্রাধান্যের অবসান ঘটবে। পার্লামেণ্টের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু ইংরেজগণ এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য বিলুপ্তি করতে নারাজ। সুতরাং রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ব্রিটেনের রাজনৈতিক আকাশে অনেক অশুভ মেঘের সূচনা করবে।

(২) জাতীয় মর্যাদার প্রতীক ঃ রাজার ক্ষমতা সঙ্কোচনের অর্থ এই নয় যে, তিনি কোনরূপ প্রয়োজনীয় কাজ করেন না। তাঁকে 'রাবার স্ট্যাম্প' বললে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের কঠোর পরিশ্রমী উপদেষ্টা পরিষদের একজন রাজা অথবা রানী। অবশ্য তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব রাজার ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্যের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে এবং আন্তরিকতা দ্বারা ইংল্যাণ্ডের সম্মান বহুভাবে বৃদ্ধি করেছেন। আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের সময় এবং প্রথম মহাযুদ্ধে রাজা ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

(৩) ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্যকারী ঃ কোন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও অপর মন্ত্রিসভার অভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক তিনি। পার্লামেণ্টারী শাসন কায়েম রাখতে ও তার যথার্থতা আনয়ন করতে তিনি দৃঢ় সংকল্প। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করে ও পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করে তিনি শাসনব্যবস্থাকে চালু রাখতে সাহায্য করেন।

(৪) কমনওয়েলথের প্রধান ঃ কিছুকাল পূর্বেও রাজা কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের নিদর্শনস্বরূপ ছিলেন। আজও কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র পতাকা, স্বতন্ত্র সংবিধান, স্বতন্ত্র বিধি-বিধান ও পদ্ধতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও রাজার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে তাঁরা এক প্রকার ঐক্য অনুভব করেন। রাজা বা রাণীই কমনওয়েলথের প্রধান। সুতরাং তাঁর প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করেই দেশগুলোর মিলনকেন্দ্র প্রস্তুত হয়। বর্তমানে অবশ্য অনেকগুলো দেশ প্রজাতন্ত্রের স্বরূপে রাজার প্রাধান্যের আওতা বহির্ভূত রয়েছে। তথাপি কমনওয়েলথ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য সংখ্যা ৫৪।

(৫) নিরপেক্ষ বিচারক ঃ রাজা দলীয় ব্যবস্থার উর্ধ্বে থাকায় সমগ্র জাতির আনুগত্য লাভে সমর্থ হন। তাই দেশপ্রেম ও আনুগত্য জাগ্রত করার জন্য রাজতন্ত্রের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। রাজনীতির খেলা নিয়মমাফিক চলছে কিনা, তিনি তার একমাত্র বিচারক। তাঁর বিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহযোগিতা, সমঝোতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে

প্রয়োজনবোধে দেশবাসীর নিকট আপীল করতে পারেন–যদিও এ ধরনের ঝুঁকি তিনি সাধারণত গ্রহণ করেন না। রাজা কূটনৈতিক কার্যকলাপ দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসও এরূপ বহু উদাহরণে পূর্ণ। সপ্তম এডওয়ার্ড যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইউরোপে ব্রিটেন ছিল বন্ধুহীন। তিনি কয়েক বছরের মধ্যে নিজের দক্ষতার ফলে ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন।

(৬) মর্যাদার প্রতীক ঃ প্রত্যেক দেশে সাধারণত সমাজে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। ব্রিটেনে সামাজিক মর্যাদা অনেকটা কুল, জন্ম তথা বংশমর্যাদার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সমাজে নেতৃত্ব দেবার ভার রাজ পরিবারের উপরই পড়বে। রাজ পরিবার সমাজ জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। তাঁদের ঘিরে যত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও আনন্দ উৎসব ঘটে। তাঁরাই সামাজিক মর্যাদার মান নির্ধারণ করেন। সর্বোপরি ধর্ম, নৈতিকতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, শিল্প-কলা, বিজ্ঞান, সমস্ত ব্যাপারেই তাদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষণীয়। জনসাধারণের উপর ইতিহাস যাদুকরী রাজকীয় প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ফলে অধিকাংশ মানুষই নতজানু হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়।

(৭) নিরাপত্তার প্রতীক ঃ রাজতন্ত্র ইংল্যাণ্ডের নাগরিকদিগের মনে এক নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়, "বাকিংহাম রাজপ্রসাদে রাজা যতক্ষণ রয়েছেন, জনগণ ততক্ষণ নিরাপদে ঘুমাতে পারে" ("With the King in Buckingham Palace, people sleep more quietly in their beds")। ইংল্যাণ্ডের রাজার জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। রাশিয়ার রাজা বা ফ্রান্সের রাজার ন্যায় ইংল্যাণ্ডের রাজা ভয়াবহ জীব বলে পরিগণিত হন নি কোন দিন। তাই ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজতন্ত্র ইংরেজ জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

(৮) গণতন্ত্রের সহায়ক ঃ ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের সাফল্য ও স্থিতির আর একটা বড় কারণ এই যে, ইংল্যাণ্ডে কোন অবস্থাতেই রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের সাথে সংঘাতে প্রবৃত্ত হয় নি। গণতান্ত্রিক বিবর্তনকে কোনক্রমেই রাজতন্ত্র প্রতিহত করে নি। যদি তা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা করত, তবে বহু পূর্বেই এর বিলুপ্তি ঘটত। কিন্তু তাতে ব্রিটেন বর্তমানে যতখানি গণতান্ত্রিক তা অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক হতে পারত না। বর্তমানে শাসন বিভাগের প্রত্যেক অংশে জনসাধারণের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে।

(৯) ধর্মীয় প্রধান ঃ রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন ঘটে। "তা হলে ইংল্যাণ্ডে চার্চের প্রাধান্য থাকত না। কমনওয়েলথের ঐক্যবন্ধন বিনষ্ট হত। ইংরাজ জনসাধারণের আনুগত্যের সুস্পষ্ট প্রতীক নষ্ট হয়ে নেহায়েত এক অস্পষ্টভাবে রূপান্তরিত হতে পারত" ("It would leave the Church of England without a titular head. It would severe the strongest formal tie that binds the dominions to the mother country. It would substitute an abstraction for a visible as the basis of British allegiance")। সুতরাং ব্রিটেনে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হলে কোন লাভ হত না।

(১০) ব্যয়ের তুলনায় সুফলদায়ক ঃ ব্রিটেনে রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য যতটুকু ব্যয় হয় রাজা বা রাণীর নিরপেক্ষ অবস্থান, সরকারি কর্মে ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ, গণতান্ত্রিক ধারার অবাধ প্রবাহ এবং জাতীয় ঐক্য ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে তিনি যা করেন তা অনেক বেশি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ।

(১১) মূল্যবান পরামর্শ দান : রাজা বা রাণী সংকটকালে মন্ত্রিপরিষদকে পরামর্শ দান করেন। প্রধানমন্ত্রীকে উৎসাহ দেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদকে সতর্ক করে দেন। ফলে মন্ত্রিপরিষদ সীমা লংঘনে সক্ষম হয় না।

(১২) জাতীয় ঐক্যের প্রতীক : রাজা বা রাণী ব্রিটিশ জাতির ঐক্যের, সংহতির এবং দেশপ্রেমের প্রতীক। তিনি রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের, ঐতিহ্যের এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত তেমন কোন তীব্র সমালোচনা উপস্থাপিত হয় নি। অধ্যাপক হার্ভের *(Harvey)* মতে, "শাসক শ্রেণীর নিকট রাজতন্ত্রের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে তার নিরপেক্ষতা ও জাতীয় ঐক্যের আবরণে" ("The great value of the monarchy to the ruling class has been its facade of neutrality and its pretence of representing the whole nation.")।

সর্বশেষে, এও বলা প্রয়োজন যে, ইংরাজ সমাজে রাজপরিবার সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়। কয়েক যুগ পূর্বে অবশ্য জনসাধারণের এরূপ মনোভাব বিদ্যমান ছিল না। রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে এই রাজপ্রীতি অনেকখানি বেড়েছে। তখন থেকে এ মনোভাব ক্রমেই বর্ধিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার সংস্কার সাধনের জন্য, এমনকি লর্ডস সভা তুলে দেবার প্রস্তাব এসেছে। কমন্স সভারও ক্ষমতা সংকোচনের কথা উঠেছে। কিন্তু সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য অংশ থেকে রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের কোন প্রস্তাব এখনো আসে নি। শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দও স্বীকার করেছেন যে, রাজতন্ত্র বর্তমান রূপেই অক্ষুণ্ন থাকবে। লোয়েল *(Lowell)* যথার্থই বলেছেন, "যদিও রাজা রাষ্ট্রের চলৎশক্তি বর্তমানে সরবরাহ করেন না, তথাপি তা যেন সে কাঠামো, যার সাহায্যে জাহাজে পাল খাটানো সম্ভবপর এবং এদিক থেকে রাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় পোতের শুধু প্রয়োজনীয় অংশ বললেই চলবে না, তার অপরিহার্য অংশও বটে" ("If the King is no longer the motive power of state, it is the spur on which the sail is bent and as such it is not only useful but an essential part of the vessel")। বস্তুত রাজা ব্রিটেনের ঐক্যের, মিলনের, মর্যাদার, ঐতিহ্যের ও স্থায়িত্বের মূর্ত প্রতীক।

অধ্যাপক বেজহট ব্রিটিশ রাজতন্ত্র সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে ব্রিটেনের রাজতন্ত্র টিকে থাকা উচিত, কেননা, **প্রথম,** রাজতন্ত্র একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। **দ্বিতীয়,** রাজতন্ত্র জ্ঞানীদের সরকার। **তৃতীয়,** রাজার অবর্তমানে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রধানকে চার পাঁচ বছর পর পর পরিবর্তন করতে হবে। **চতুর্থ,** ব্রিটিশ জনগণ রাজতন্ত্রকে তাদের নৈতিকতার প্রতীক বলে গ্রহণ করে। **পঞ্চম,** ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের নামান্তর।

বেজহট (Bagehot) বর্ণিত রাজার তিনটি অধিকারের-(১) আলোচনা করার অধিকার (Right to be consulted) (২) উৎসাহ দেবার অধিকার (Right to encourage), (৩) সাবধান করে দেবার অধিকারের (Right to warn) গুরুত্বও কম নয়। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রাজার প্রভাব এ তিনটি অধিকারের মাধ্যমেও অত্যন্ত ব্যাপক হতে পারে এবং জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নে, নৈতিকতার দ্বারা জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধিতে, বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয়ে, সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন অধ্যায় সংযোজনে ও সুষ্ঠু জীবনবোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে রাজা উদ্যোগী হলে যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ হবে। ইংল্যাণ্ডের রাজা তাই এত জনপ্রিয়।

ব্রিটিশ কেবিনেট
British Cabinet

ব্রিটিশ কেবিনেট শাসনবিভাগের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। কমন্স সভার সম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের অন্যান্য সদস্যকে মনোনীত করেন এবং রাজা তাদের কেবিনেটের সদস্যপদে নিযুক্ত করেন। ব্রিটেনে শাসন বিভাগের চলৎশক্তি (motive power) কেবিনেট। অনেকে 'কেবিনেটকে আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগ সংযুক্তকারী হাইফেন চিহ্নের' সাথে তুলনা করেন ("It is a hyphen that joins the buckle which fastens the legislature and the executive of the state")।

ব্রিটেনে এই কেবিনেট ব্যবস্থার ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘদিনের। বিবর্তনের ফলে কেবিনেট বর্তমান রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এর জনক প্রিভি কাউন্সিল। প্রিভি কাউন্সিল নরম্যান আমলের কিউরিয়া রেজিস (Curia Regis) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এক কালে এ প্রিভি কাউন্সিল রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করত। টিউডর ও স্টুয়ার্ট আমলে প্রিভি কাউন্সিল এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর সদস্যগণ শাসনকার্যের জন্য রাজার নিকট দায়ী থাকতেন। পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ব তখনও সৃষ্টি হয় নি। তবে পার্লামেণ্ট প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যগণকে কোন অভিযোগের জন্য অভিযুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু রাজা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে পারতেন, সেহেতু পার্লামেন্টের অভিযোগ ফলপ্রসূ হত না। কালক্রমে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে উপদেষ্টা কাউন্সিল হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়। ফলে রাজা কোন বিষয়ে পরামর্শ চাইলে তাদের কিছু সংখ্যক সদস্যকে ডেকে পরামর্শ করতেন। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে ক্যাবাল (Cabal) নামে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এই হলো কেবিনেটের প্রথম পদক্ষেপ এবং কালক্রমে এটি প্রিভি কাউন্সিলের স্থান দখল করে।

প্রথমে কিন্তু এ ব্যবস্থা কমন্স সভার মনঃপুত ছিল না। কেবিনেট এক স্বৈরাচারী সরকার গঠনের চেষ্টা করছে– এই ছিল কমন্স সভার অভিযোগ। ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে কমন্স সভা ঘোষণা করেন, কেউ যদি রাজাকে পরামর্শ দেয় এবং তার ফল যদি খারাপ কিছু হয় তা হলে তার জন্য দায়ি থাকবে সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ। এ ঘটনার পর কমন্স সভা টমাস অস্‌বর্ণকে *(Thomas Osborn)* রাজার পক্ষপাত সত্ত্বেও অভিযুক্ত করে এবং কমন্স সভা দাবি করে যে, "রাজার উপদেষ্টা হতে হলে প্রথমে তাকে বা তাদের কমন্স সভার আস্থাভাজন হতে হবে" ("The King ought to employ such councillors only as parliament may have cause to confide in.") এবং তারা যতদিন কমন্স সভার আস্থাভাজন থাকবে, ততদিন তারা এ কার্য করতে সক্ষম হবেন। রাজা উইলিয়াম ও রাণী মেরী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তারা এ নীতিকে পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দান করেন। মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতার সূত্রপাত তখন থেকে শুরু হলো।

প্রথমে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু হুইগ ও টোরী *(Whig and Tory)* দলের উৎপত্তির পর থেকে উভয় দল থেকেই উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের বাছাই করা হত। কিন্তু দল থেকে আগত মন্ত্রিদের দ্বারা একমত হয়ে কাজ করা শক্ত হয়ে উঠল। ফলে কালক্রমে মন্ত্রিসভায় কোন্দলের সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য স্থির হয় যে, কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল থেকে উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের বাছাই করা হবে। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জর্জের সময় কেবিনেট পদ্ধতির আরো উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ইংরেজী ভাষা বলতে বা বুঝতে পারতেন না। তাছাড়া, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিস্তারিত নীতি ও বিধি–বিধান তাঁকে কোনভাবেই আকৃষ্ট করতে পারে নি। তাই তিনি মন্ত্রিপরিষদে

সভাপতিত্ব করার কাজ থেকে বিরত থাকতেন এবং মন্ত্রিপরিষদের বিশিষ্ট সদস্য রবার্ট ওয়ালপোলের উপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সুতরাং আধুনিক অর্থে ওয়ালপোলই (Walpole) ইংল্যাণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন যে, রাজা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর উপর অন্যান্য মন্ত্রীর নিয়োগের ভার থাকবে। রাজা এবং মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সংবাদ আদান–প্রদানের একমাত্র বাহন হবেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। তিনি আরও নির্ধারণ করেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলের অবিভক্ত সমর্থন লাভ করবেন এবং তা না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। এমনিভাবে রবার্ট ওয়ালপোল (Robert Walpole) তাঁর সুদীর্ঘ শাসনামলে কেবিনেট পদ্ধতির যথার্থ রূপ সৃষ্টি করেন এবং আজ পর্যন্ত তা অটুট রয়েছে। বর্তমানকালের যুদ্ধ–বিগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে উন্নয়নমূলক কর্মের জন্য কেবিনেটের কাজ অত্যন্ত বেড়েছে এবং সেজন্য এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সেক্রেটারিয়েট পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ ও কেবিনেট
Ministry and the cabinet

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ ও কেবিনেটের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্য গঠন প্রণালী ও দায়িত্ববোধের মধ্যে সুস্পষ্ট।

পার্লামেন্টের সভ্য এবং পার্লামেন্টের নিকট দায়ি অর্থাৎ পার্লামেন্ট অনাস্থাসূচক ভোট দিলে যাঁরা পদত্যাগে বাধ্য এমন সকল কর্মচারী, সচিব ও মন্ত্রিগণের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এটর্নী জেনারেল, মিলিটারী সেক্রেটারী, পার্লামেন্টের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, রাজ–পরিবারের অন্তর্ভূক্ত কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সত্তর আশিজনের কম নয়, কিন্তু কেবিনেটের সদস্য বিশ বাইশ জনের অধিক নয়।

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে থেকে কেবিনেটের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। তাই কেবিনেটকে 'চক্রের ভেতর চক্র' বললেও অভিহিত করা হয় ("A wheel within a wheel")। কেবিনেটের সকল সদস্য মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য কেবিনেটের সদস্য নন। মন্ত্রিপরিষদকে যদি দেহের সাথে তুলনা করা হয় তা হলে কেবিনেটকে মস্তক বলা যেতে পারে। কার্যপদ্ধতি ও নীতির ক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

কেবিনেটের প্রধান এবং **প্রথম** কার্য শাসন পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করা, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের এ সম্পর্কে কোন ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয়, কেবিনেটের অধিবেশনের যে নিয়মিত ধারা রয়েছে, মন্ত্রিপরিষদের সেরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

তৃতীয়, কেবিনেট যে ধরনের যৌথ রাজনৈতিক ও আইনগত দায়িত্বের দ্বারা আবদ্ধ, মন্ত্রিপরিষদের সেরূপ কোন বন্ধন নেই। তবে উভয়ে সমভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী।

চতুর্থ, মন্ত্রিপরিষদ একটি আইনসম্মত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু কেবিনেট প্রথাভিত্তিক এবং আইন বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান (extra-legal development)।

সর্বশেষে, এও উল্লেখযোগ্য যে, কেবিনেট আইনসভায় নেতৃত্ব দান করেন, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শুধুমাত্র রুটিন মাফিক কাজ করে চলে।

কেবিনেটের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Cabinet System) ঃ ব্রিটিশ কেবিনেট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো একদিনে প্রবর্তিত হয় নি। যুগ যুগ ধরে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ফলে এবং প্রথা ও ঐতিহ্যমণ্ডিত রীতিনীতির মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো গড়ে উঠেছে। কেবিনেটের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথম, কেবিনেটের বৈশিষ্ট্য ঐক্য ও সমজাতীয়তা (Unity and homogeneity)। রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের মধ্য থেকে কেবিনেট গঠিত হয়। ফলে কর্মপন্থা ও রাজনৈতিক আদর্শের সূত্রে তারা আবদ্ধ থাকেন। যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে তারা একমত পোষণ করেন। নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটলেও পার্লামেণ্টে কিংবা প্রকাশ্যে তা প্রকাশ করতে পারেন না। বিভিন্ন দলের সদস্য সমন্বয়ে যখন কেবিনেট গঠিত হয়, তখন কেবিনেট সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমস্যা সমাধানে একমত হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়, কেবিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। কেবিনেটের সদস্যগণ সরকারের সকল কাজ ও নীতির জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। ব্যক্তিগত দায়িত্বে সদস্যগণ নিজ নিজ দপ্তরের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকেই "রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না" ("The King can do no wrong")— এ নীতি সার্থকতা লাভ করে, কারণ রাজার প্রত্যেক কাজের জন্য কোন না কোন মন্ত্রীকে দায়ী করা হবে। কেবিনেট সদস্যগণের ব্যক্তিগত দায়িত্ব দু প্রকার ঃ **(১) আইনগত ও (২) রাজনৈতিক**। আইনগত দায়িত্বশীলতা বলতে সদস্যগণের সে দায়িত্বকে বুঝায়, যার ফলে মন্ত্রিগণের দ্বারা কোন আদেশ দান করা হলে এবং তার ফলে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, মন্ত্রিগণ উক্ত আদেশের জন্য দায়ী হবেন এবং প্রয়োজন হলে ক্ষতিপূরণও দেবেন। রাজনৈতিক দায়িত্বের অর্থ হলো মন্ত্রী তার দপ্তরের সকল প্রকার কাজের জন্য এবং যা করা উচিত ছিল তা না করার জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। তাঁর দপ্তরের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হয়।

তৃতীয়, পার্লামেণ্ট, বিশেষ করে **কমন্স সভার সাথে কেবিনেটের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়।** তাদের প্রত্যককে হয় লর্ডস্ সভা, না হয় কমন্স সভার সদস্য হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বাইরের কোন লোককেও সদস্যপদ দান করতে পারেন, কিন্তু হয় তাকে লর্ডস সভার সদস্য হতে হবে লর্ড উপাধি লাভ করে, না হয় ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে কমন্স সভার সদস্য পদ লাভ করতে হবে। সদস্যগণ যদি পার্লামেণ্টের সদস্য পদ লাভ না করেন, তা হলে পার্লামেণ্টে তার বক্তব্য পেশ করার কোন অধিকার থাকে না।

চতুর্থ, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বও কেবিনেট পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রধানমন্ত্রীকে তাই কেবিনেট বৃত্তের 'প্রধান বিন্দু' বা কেবিনেট খিলানের প্রধান মর্মর বলা হয়' ("He is the keystone of the cabinet arch")। তিনি মন্ত্রিপরিষদের প্রধান এবং শাসন বিভাগেরও নেতৃস্থানীয়। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিত্ব করেন তিনি। নির্দেশ দেন তিনি। কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণও করেন তিনি।

পঞ্চম, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে আহ্বান করা হয়। তাই কেবিনেটের সদস্যগণ পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। রাজা তৃতীয় জর্জের আমল থেকে এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কেবিনেটের সদস্য হিসেবে যিনি নিযুক্ত হবেন, তিনি কমন্স সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভে সমর্থ হবেন।

ষষ্ঠ, কেবিনেট সভায় আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। রাজার গোপন পরামর্শদাতা হিসেবে ও বিরোধী দলের সাথে এঁটে উঠার জন্য কেবিনেটের আলোচনা ও নীতি বিশেষ গোপন রাখা হয়।

সর্বশেষে, কেবিনেট নীতি নির্ধারণ, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও পরিচালনা বিষয়ক এক সংস্থা, যার প্রভাব ব্রিটেনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত ব্যাপক। তাই কেবিনেটকে তুলনা করা হয় এমন এক কেন্দ্রবিন্দুর সাথে যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতি বিবর্তিত হচ্ছে। স্যার জন ম্যারিয়ট (*Sir John Marriot*) কেবিনেটকে এমন এক খুঁটির সাথে তুলনা করেছেন "যার চতুর্দিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ আবর্তিত হচ্ছে" ('Pivot round which political machinery revolves")।

কেবিনেটের কার্যাবলি ও গুরুত্ব
Functions of the Cabinet and its Importance

ব্রিটেনের **কেবিনেটকে ব্রিটিশ রাজনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র** বলা হয়। তাকে রাজনৈতিক **'স্থাপত্যের প্রধানতম প্রস্তর খণ্ড'** বলা হয়। 'রাষ্ট্রীয় জাহাজের স্টীয়ারিং হুইলও' বলা হয় ('steering wheel of the Ship of the State')। এর কার্যপরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শাসন-বিভাগীয় ও আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় প্রায় সকল প্রকার কার্যই কেবিনেটকে করতে হচ্ছে। কেবিনেটের কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হলো।

(১) শাসন বিভাগীয় ঃ শাসন বিভাগীয় প্রতিটি কাজ সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রী দায়ী থাকবেন। শাসন সংক্রান্ত মূলনীতিগুলো কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং সমস্ত শাসন বিভাগকে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এ শাসন নীতিগুলো পার্লামেন্টের সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হয়। সেখানে গৃহীত হয়ে গেলে কেবিনেট কর্তৃক তা কার্যকর হয়। সামরিক, বৈদেশিক ও বিচার বিভাগীয় দপ্তরের সমস্ত নিয়োগ ব্যবস্থা কেবিনেট কর্তৃক পরিচালিত এবং রাজার নামে ঐ নিয়োগ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

(২) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ঃ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণও কেবিনেটের অন্যতম প্রধান কার্য। যুদ্ধ ঘোষণায় বা শান্তি স্থাপনে কেবিনেট রাজাকে পরামর্শ দান করে। আন্তর্জাতিক চুক্তি স্থাপন বা রাজার পরমাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব কেবিনেট গ্রহণ করে।

(৩) সমন্বয় সাধন ঃ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগকে ঐক্যবদ্ধ করা, সংঘবদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন কেবিনেটের প্রধান দায়িত্ব। শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করাও কেবিনেটের প্রধান এক কাজ। শাসন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হলে বা কোন অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে কেবিনেট সেদিকে নজর দেয় ও সমধানে প্রয়াসী হয়।

(৪) আইন পরিষদে নেতৃত্ব দান ঃ আইন প্রণয়ন ও আইন পরিষদে নেতৃত্ব দানও কেবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শাসনের মূলনীতি তৈরি করার জন্য, পার্লামেন্টের প্রত্যেক বৈঠকের কর্মসূচী প্রস্তুত করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কেবিনেটকে করতে হয়। ঐ কার্যসূচির প্রত্যেকটি ধারাই সরকারি নীতি বলে পরিচিত। এ নীতিগুলো কেবিনেট অধিবেশনে ও কমন্স সভায় বিশ্লেষণ করা হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেবিনেটের হাতে।

(৫) রাজার পরমাধিকার সংরক্ষণ ঃ রাজার বংশানুক্রমিক পরমাধিকারগুলো সংরক্ষিত হলো কিনা বা ঐতিহ্যবাহী কাজগুলো সম্পন্ন হলো কিনা তাও কেবিনেট লক্ষ্য করে।

(৬) পার্লামেন্ট সংক্রান্ত ঃ কেবিনেটের পরামর্শেই পার্লামেন্টের সভা ডাকা হয়, স্থগিত রাখা হয় অথবা ভেঙ্গে দেয়া হয়। অধিবেশনের শুরুতেই কেবিনেট রাজার বক্তৃতা তৈরি করে দেয়।

(৭) বাজেট তৈরি ঃ জাতীয় বাজেট তৈরি করার দায়িত্বও কেবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের একজনের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের অন্যান্য সদস্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। কেবিনেটই দেশের আয়-ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকে।

(৮) রাজনীতি সংক্রান্ত ঃ কেবিনেটকে রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক কাজ করতে হয়। পার্লামেন্টে কেবিনেটের অবস্থান সুদৃঢ় করা, পরবর্তী নির্বাচনে দলের নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ, জনগণের নিকট সরকারের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা ইত্যাদি কাজ কেবিনেটকে করতে হয়।

১৯১৮ সালে অনুষ্ঠিত এক কমিটি রিপোর্টে ('Committee on the machinery of British Government') ব্রিটিশ কেবিনেটের কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয় যে, কেবিনেট প্রধানত নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করে ঃ

(এক) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকারি নীতি নির্ধারণ।

(দুই) পার্লামেন্টে নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতি বাস্তবায়ন।

(তিন) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, এবং

(চার) সরকারি কার্যক্রমে জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতিফলন।

কেবিনেটের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি কেবিনেট সচিবালয় রয়েছে। সপ্তাহে কেবিনেটের অন্তত দুটি বৈঠক বসে।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কেবিনেটই দেশের শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী ও নিয়ামক। কেবিনেটের বহুমুখী কার্যকারিতা ও সম্প্রসারণশীলতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গ্লাডস্টোন বলেছিলেন, **"আধুনিককালে রাজনৈতিক কার্যাবলির জগতে এটি এক অদ্ভুত সৃষ্টি। তবে তা তার মর্যাদার জন্য নয়, বরং সূক্ষ্ম কার্যকারিতার জন্য, নমনীয়তার জন্য এবং সর্বোপরি তার বহুমুখী ও বিচিত্রমুখী ক্ষমতার জন্য"** ('It is perhaps the most curious formation in the political world of modern times, not for its dignity but for its subtlety, its elasticity and its many sided diversity of power")। **শাসনব্যবস্থার একনায়ক** (dictator) বলেও কেবিনেটকে আখ্যায়িত করা হয়। বলা হয় যে, কমন্স সভার আস্থাভাজন কেবিনেট সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী।

অধ্যাপক ফাইনারের *(S.E. Finer)* মতে **"কেবিনেট সমগ্র ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিকেন্দ্র"** ("the powerhouse of the entire British Constitutional System")। ব্রিটিশ কেবিনেট প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী, কেননা এর সদস্যবর্গ ত্রিবিধ মর্যাদার অধিকারী। আমেরিকার কেবিনেটের ন্যায় ব্রিটিশ কেবিনেট সরকারের নির্বাহী ক্ষমতার ভারপ্রাপ্ত। ব্রিটিশ কেবিনেট আইন প্রণয়নের দায়িত্বেও অধিষ্ঠিত। সর্বোপরি ব্রিটিশ কেবিনেটে সংখ্যাগুরু দলের নেতৃবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। ফলে কেবিনেট সরকারে নির্বাহী ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব এবং দলীয় নেতৃত্বের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে কেবিনেটে। তাই অধ্যাপক জেনিংস *(Jennings)* বলেন, **"কেবিনেট ব্রিটিশ সংবিধানের সারবস্তু"** ("Cabinet is the core of the British Constitution")।

কেবিনেটের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
Limitations of Power of the Cabinet

প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা।

প্রথম, কেবিনেট তার প্রতিটি কাজের জন্য কমন্স সভার নিকট জবাবদিহি করে। কমন্স সভার অনাস্থা প্রস্তাবে কেবিনেট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়, কেবিনেটের সদস্যগণ রাজাকে যে সকল পরামর্শ দেন তার জন্য আদালতে আইনগতভাবে দায়ী থাকেন।

তৃতীয়, স্বাভাবিকভাবে কেবিনেট তার প্রতিটি কাজের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী তথা জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। তবে আধুনিক যুগে আইন সভার আস্থা হারিয়ে কেবিনেট পদত্যাগ করেন না। সব সময়ই কেবিনেট রাজাকে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে এবং নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়াও, কেবিনেটের কার্যক্রমের কিছু কিছু সীমারেখা এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম, রাজা বা রানীর পরমাধিকার (prerogative) সম্পর্কে কোন আলোচনা কেবিনেটে হয় না। **দ্বিতীয়,** কেবিনেটের সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় এবং কেবিনেট সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সম্পর্কেও কেবিনেটে কোন আলোচনা হয় না। **তৃতীয়,** রাজা বা রানী কর্তৃক কোন নাগরিককে সম্মানে ভূষিত করার বিষয়ও কেবিনেটে আলোচিত হয় না।

মন্ত্রিসভা ভঙ্গ করার পদ্ধতি
How a Ministry Can be Ousted

নানা পদ্ধতির মাধ্যমে কমন্স সভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়। **প্রথম,** কেবিনেট সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন বিল যদি কমন্স সভার অনুমাদন লাভ না করে, তা হলে একযোগে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। **দ্বিতীয়,** সরকারি দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিরোধী দল কর্তৃক আনীত কোন বিল যদি গৃহীত হয়, তা হলেও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ পায়। **তৃতীয়,** কেবিনেট কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কমন্স সভার দ্বারা সাধারণভাবে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। **চতুর্থ,** কোন বিশেষ মন্ত্রির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলেও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। **পঞ্চম,** মন্ত্রিপরিষদ বাজেট প্রণয়নে অসমর্থ হলে অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

মন্ত্রিপরিষদের যৌথ দায়িত্ব
Ministerial Responsibility

দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মন্ত্রিপরিষদের সম্মিলিত দায়িত্ব বা যৌথ দায়িত্বের উৎপত্তি হয়েছে। দায়িত্বশীল সরকারে মন্ত্রিগণ শাসন কার্য পরিচালনার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধি আইন পরিষদের সদস্যগণের নিকট প্রত্যক্ষভাবে ও নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পরোক্ষভাবে দায়ী থাকেন। **যৌথ দায়িত্ব বলতে আমরা এটি বুঝি যে, কেবিনেটকে সরকারি নীতি ও কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকতে হয়।**

বাস্তবক্ষেত্রে এ দায়িত্ব চতুর্বিধ ঃ

প্রথম, যেহেতু শাসনকার্য পরিচালিত হয় রাজার নামে এবং যেহেতু 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না'– ফলে তা মন্ত্রিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। রাজাকে কোন ত্রুটিপূর্ণ পরামর্শ দানের দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হয়। সুতরাং আইনগতভাবে মন্ত্রিগণ রাজার নিকট দায়িত্ব বহন করেন।

দ্বিতীয়, কেবিনেট সম্মিলিতভাবে তার সকল প্রকার নীতি ও কার্যাবলির জন্য প্রত্যক্ষভাবে আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। আইন পরিষদ বলতে আসলে কমন্স সভাকেই বুঝায়। কমন্স সভা মন্ত্রিপরিষদকে বিভিন্ন কার্যের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, খবরাখবর নিতে পারে, এমনকী সোজাসুজি অনাস্থাসূচক ভোটদান করে বা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক উথাপিত বিলকে সমর্থন না করে মন্ত্রিপরিষদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। আসলে মন্ত্রিপরিষদের মৌলিক দায়িত্ব কমন্স সভার নিকট।

তৃতীয়, মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্য একে অপরের নিকট নিজ নিজ কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সংহতি রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। মণ্টেগু ((*Montague*) তাঁর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন বলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

চতুর্থ, মন্ত্রিপরিষদ পরোক্ষভাবে হলেও নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকেন। বর্তমানকালে কমন্স সভার অনাস্থা ভোটে কোন মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে দেখা যায় না। বরং জনমতের চাপে ও নির্বাচক মণ্ডলীর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলেই মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটে। পত্র–পত্রিকাগুলো জনমত প্রকাশ করে জনসাধারণের অভিমত মন্ত্রিপরিষদের গোচরীভূত করে। ইডেন ((*Anthony Eden)* মন্ত্রিসভার পতন এভাবেই সংঘটিত হয়।

সুতরাং মন্ত্রিপরিষদে দায়িত্বশীলতার চতুর্বর্গ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী
PrimeMinister of Britain

প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ কেবিনেট ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাঁকে **'কেবিনেট স্থাপত্যের প্রধান প্রস্তর'** ('Keystone of the cabinet arch') নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেবিনেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র এবং প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের কেন্দ্র। কেবিনেটের উথান, পতন, জীবন ও ও মৃত্যু প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। কমন্স সভার **সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে, কেবিনেটের সভাপতি হিসেবে, সমকক্ষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হিসেবে** *(Primus Inter Pares or first among equals)* **এবং ব্রিটেনের প্রধান নাগরিক হিসেবে** (First citizen of the U.K.) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে, 'পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী যা করতে পারেন, তা জার্মান সম্রাটের পক্ষে সম্ভবপর হত না, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তা করতে পারেন না এবং সকল কমিটির সভাপতিগণও তা সম্পন্ন করতে পারেন না। কেননা, তিনি আইন পরিবর্তন করতে পারেন, কর নির্ধারণ করতে পারেন, করভার রহিত করতে পারেন এবং রাষ্ট্রের সকল বিভাগের সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করতে পারেন" ("An English Prime Minister with his majority secure in Parliament can do what the German Emperor could not and the American President and all the chairmen of the committees can not do, for, he can alter the laws; he can impose taxes; he can abolish old taxes and he can direct all the forces of the state")।

সুতরাং বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করলে তাঁর পক্ষে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করা অত্যন্ত সহজ। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ কয় জন রয়েছেন? তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে ডঃ জেনিংস (*Jennings*) বলেন, **'তিনি যেন একটি সূর্য, যাঁর চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহসমূহ আবর্তিত হয়"** ("He is rather a sun round which planets revolve")। তাঁর ক্ষমতা প্রচুর। বলা হয় যে, **"ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এমন ক্ষমতায় ভূষিত যে, পৃথিবীর কোন শাসনতান্ত্রিক শাসক, এমন কী আমেরিকার প্রেসিডেন্টও, এত ক্ষমতার অধিকারী নন।"**

প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নির্বাচিত হন :

রাজা কাগজে-কলমে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। কিন্তু ব্যবহরিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের স্বাধীনতা রাজনৈতিক দল ও প্রচলিত রীতি দ্বারা অনেকখানি সীমিত। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত রাজাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোন কোন সময় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পরও অনিশ্চিত থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কোন্ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করতে ইচ্ছুক। এ অবস্থায় রাজা প্রার্থীদের নিকট থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। তাঁর এ বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে কারো প্রশ্ন করার কিছুই নেই। কিন্তু তাঁর এ বিশেষ অধিকার (Discretionary Power) রাজনৈতিক দল ও জনমতের প্রতি আস্থাশীল।

নিয়মানুযায়ী পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কেবিনেট গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান। এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ হয়। প্রধানমন্ত্রীর পদটির প্রথম উল্লেখ করা হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বরে। তা আইনের দ্বারা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বপ্রথম এ কথাটি ব্যবহৃত হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন চুক্তির প্রস্তাবনায়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব বিভাগের প্রথম লর্ড হিসেবে এ পদের সাথে মাহিনা যুক্ত হয়। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন স্থির করা হয়। অবসর গ্রহণকালে তিনি পেনসনের সুযোগ লাভ করেন। তিনি বাৎসরিক ২৫,০০০ পাউণ্ড বেতন পান এবং ৫,০০০ পাউণ্ড পেনসন লাভ করেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর বেতন এবং পেনসনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বেশ কয়েক গুণ। তাঁর পদমর্যাদা সম্বন্ধে বলা হয়, "একজন ভিখারীও জানে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে" কে বাস করেন।

রাজা প্রধানমন্ত্রীকে কেবিনেট গঠনের আমন্ত্রণ জানালে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁর মনোনয়ন নানাদিক থেকে সীমিত। তাঁকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয় তাঁর দলের প্রভাবশালী ও যোগ্য ব্যক্তিগণ কেবিনেটের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন কীনা, লর্ডগণ কিভাবে প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষিত হলো কীনা।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the Prime Minister

প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রম বহুমুখী।

প্রথম, প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের নেতা। "তাঁকে কেন্দ্র করেই কেবিনেট গঠিত হয়। তাঁকে কেন্দ্র করেই কেবিনেট কার্য পরিচালনা করে। এর পতন হলে তাঁকে কেন্দ্র করেই হয়" ("He is central to its formation, central to its life and central to its death")। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি সমকক্ষদের মধ্যে প্রধান, কিন্তু স্বৈরাচারী নন ("He is more than *Primus Inter Pares*, but less than an autocrat")

দ্বিতীয়, প্রধানমন্ত্রী সমগ্র শাসন ব্যবস্থার খুঁটিস্বরূপ। **তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, কমন্স সভার নেতা, কেবিনেটের প্রধান এবং শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক।** রাজার নামে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধন ও তাদের মধ্যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কাজ। রাজার অনুমতি সাপেক্ষে তিনি তাঁর যে কেন সহকর্মীর পদত্যাগের আদেশ দিতে পারেন। রাজার প্রত্যেকটি নিয়োগে তাঁর মতামত প্রতিফলিত। শাসনব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা তাঁর কাজ। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করাও তাঁর প্রধান দায়িত্ব। অন্যান্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর নিকট আপীল করা চলে। কমন্স সভায় তাঁর কথা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়। **"তিনি কেবিনেট ও রাজার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রধানতম সেতু"** ("He is the greatest bridge between the King and the Cabinet")।

তৃতীয়, কেবিনেটের কর্মসূচী তিনিই নির্ধারণ করেন। কমনওয়েলথের দেশগুলোর মধ্যে তাঁর কথার বেশ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

চতুর্থ, দলীয় নেতা হিসেবে তাঁর স্থান অদ্বিতীয়। তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রাজনৈতিক দলটি কর্মক্ষেত্র রচনা করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের অর্থ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন। কিন্তু এও নিশ্চিত যে, "যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদাভিষিক্ত হন, তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর এ পদের গুরুত্ব নির্ভর করে" ("The office of the Prime Minister varies enormously with the character of the man who holds it")। ব্যক্তিত্ব তাঁর ক্ষমতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে– এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি কোন প্রধানমন্ত্রী অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহত শক্তিধর শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তা হলে তা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের জন্যই সম্ভবপর। তাই বলা হয়, **"প্রধানমন্ত্রীর পদটি ঠিক সে রকমই হবে, এর অধিকারী তাকে যেমনটি করতে চান"** ("The office of the Prime Minister is what its holder chooses to make it")। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গ্রাডস্টোনের সহকর্মিগণ কোনদিন তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নি, কিন্তু লর্ড রোজবেরী (Lord Rosebury) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তাঁর মন্ত্রিগণকে আদৌ শৃংখলার সাথে পরিচালিত করতে পারতেন না। ডিজরেলী তাঁর নিজ মতকেই প্রাধান্য দিতেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এ পদের গুরুদায়িত্ব বহন করা, সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার করা, কেবিনেটকে পরিচালিত করা, কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করা, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দান করা ও সর্বোপরি নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার প্রতিফলন করা সাধারণ কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। **বিশেষ ক্ষমতা, অপূর্ব কর্মদক্ষতা, মানুষকে পরিচালিত করার যোগ্যতা, সর্বোপরি বিশ্বাস অর্জনের ক্ষমতা, ন্যায়-বিচার ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নিপুণতা**–এ সমস্ত গুণ একজন প্রধানমন্ত্রীর অবশ্যই থাকতে হবে। তবে তিনি স্বেচ্ছাচারী নন এবং হতেও পারেন না। তাঁর পদমর্যাদা এবং প্রভাব গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই বলা হয় যে, "আইনগতভাবে নির্ধারিত ক্ষমতার দ্বারা নয়, বরং দলীয় কাঠামোর তাঁর প্রভাবই তাঁর ক্ষমতা নির্ধারণ করে" ("His authority is a matter of influence in the context of party structure, if not in the defined powers legally conferred")।

পঞ্চম, প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই রাজা বা রানীর সাথে মন্ত্রিদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই সাধারণভাবে সরকারের নীতি ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণের পৃথক পৃথক দপ্তরের কার্যাবলি রাজার নিকট ব্যাখ্যা করেন। তাঁরই উপদেশ মত নানা ব্যক্তি ও গুণীজনকে রাজা সম্মানসূচক উপাধি দান করেন। রাজার ক্ষমা প্রদর্শনের চরমাধিকার প্রধানমন্ত্রীই প্রয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সীমাহীন আধিপত্যের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের নিকট আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। তাই রাজাকে সর্বাধিক সম্মান ও

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হলেও ব্রিটেনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য নর–নারীও বেশ ভাল করে জানে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের তাৎপর্য কী? রামজে ম্যুইর *(Ramsay Muir)* প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেছেন, **"আইনের চোখে না হলেও কার্যত তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান এবং তিনি এত ক্ষমতার অধিকারী যে, পৃথিবীতে নিয়মতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্র প্রধান, এমন কি আমেরিকার প্রেসিডেণ্টও তা প্রয়োগ করতে সমর্থ নন"** ("He is, in fact, though not in law, the working head of the state cndowed with such a plentitude of power as no other consititutional ruler in the world possesses, not even the President of the U.S.A.")।

ষষ্ঠ, প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাঁর সম্মতি ব্যতীত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় না। বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি প্রধানমন্ত্রীই দিয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যদিকে তিনি প্রতিরক্ষা কমিটির সভাপতি এবং কোন সংকট কালে সমগ্র দপ্তরের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয়।

সপ্তম, জরুরী অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রায় অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। সে অবস্থায় তিনি জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকল্পে কেবিনেটকে পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে পারেন।

শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। **প্রথম,** ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। **দ্বিতীয়,** মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। **তৃতীয়,** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

কেবিনেট একনায়কত্ব
Cabinet Dictatorship

শাসনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী কেবিনেট ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট তার নীতি এবং কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকে। কমন্স সভার আস্থাভাজন হয়ে কেবিনেট ক্ষমতাসীন থাকে এবং কমন্স সভার আস্থা হারালে কেবিনেটকে পদত্যাগ করতে হয়। শাসনতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী পার্লামেণ্টই কেবিনেট নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং কেবিনেটের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এমনভাব বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অধুনা কেবিনেটই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই রামজে ম্যুইর ব্রিটেনে **"কেবিনেটের একনায়কত্বের"** (Cabinet Dictatorship) আশঙ্কা প্রকাশ করেন বহু পূর্বেই।

পার্লামেণ্ট বর্তমানে একটি 'উপদেষ্টা সংস্থায়' (Advisory Body) পরিণত হয়েছে। বর্তমানে কেবিনেটই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। পার্লামেণ্ট কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে না। দেশে আইন সংক্রান্ত কিংবা অর্থ সংক্রান্ত কোন বিষয়ের পরিবর্তন কেবিনেটের সম্মতি ব্যতীত পার্লামেণ্ট করতে সাহস পায় না। কেবিনেট আজকাল আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার লাভ করে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের নিশ্চয়তা লাভ করে এবং সর্বোপরি পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেবার ভয় দেখিয়ে পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। পার্লামেণ্টও কেবিনেটের ইচ্ছাকে নরমভাবে সমর্থন করে থাকে। ১৮৯৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন কেবিনেট কমন্স সভার আস্থা হারিয়ে পদত্যাগ করে নি।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা হ্রাসের প্রধানত দুটি কারণ উল্লেখযোগ্য : **প্রথম,** পরিষদের বাইরে জনমতের প্রভাব, এবং **দ্বিতীয়,** দলীয় ঐক্য।

(১) জনমতের প্রভাব ঃ জনমতের প্রভাব বৃদ্ধি হয়েছে বহু কারণে। **প্রথম,** নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি। **দ্বিতীয়,** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা। **তৃতীয়,** সংবাদপত্রের মানোন্নয়ন। **চতুর্থ,** রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতির সাহায্যে জনমত সংগঠন প্রভৃতি। এর ফলে প্রত্যেকে মোটামুটিভাবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন।

(২) দলীয় শৃংখলা ঃ রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু বিবর্তন হবার ফলে দলীয় ঐক্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দলীয় অনুশাসন কড়াকড়ি ভাবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। দল আজকাল সদস্যগণের নির্বাচনের খরচ বহন করে, তাদের জন্য ভোট সংগ্রহ করে দেয় এবং জনসাধারণ ব্যক্তিকে ভোট না দিয়ে দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে ভোটদান করে। দলের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত খুব কম সদস্য আজকাল নির্বাচিত হতে পারেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ঃ প্রধানমন্ত্রীর প্রভূত ক্ষমতার নিকট পার্লামেণ্ট নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সরকারের মুখপাত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনিই সরকার। দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেবিনেটের সদস্য। কেবিনেটই দলকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে পার্লামেণ্ট কেবিনেটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে উদ্যত হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করতে পারেন। সুতরাং নতুন নির্বাচনের ঝামেলায় পড়ার ভয়ে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ পদ হারাবার ভয়ে সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর মতে মত দিয়ে থাকেন।

(৪) বেসরকারি সদস্যদের গুরুত্ব হ্রাস ঃ বর্তমানে প্রাইভেট সদস্যদের গুরুত্ব সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দলীয় রাজনীতিতে দল ব্যতীত কোন আইন প্রণয়ন সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, কেবিনেট ইচ্ছা করলে প্রাইভেট সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা রহিত করেও আইন প্রণয়ন করতে পারে। কেবিনেট ব্যতীত তাই কোন সদস্য কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না।

(৫) অর্পিত আইন (Delegated Legislation) ঃ ভারার্পিত আইনের ফলে মন্ত্রিদের ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আইনে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়নের ভার মন্ত্রিদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। স্ব-পারিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) ও তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। কেবিনেট আইন প্রণয়ন করে, ব্যয়-বরাদ্ধ করে, কর ধার্য করে এবং পরিষদের সময়সূচী নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং পার্লামেণ্ট শুধু প্রভুর আজ্ঞাই পালন করে।

(৬) যৌথ দায়িত্ব ঃ মন্ত্রিদের যৌথ দায়িত্ব (Collective Responsibility) কেবিনেট একনায়কত্বের অন্যতম কারণ। একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র কেবিনেটের পরাজয় আনয়ন করে। ফলে মন্ত্রিরা সমষ্টিগতভাবে কাজ করে। এই ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেবিনেটের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হয়েছে।

(৭) কমন্স সভা ভেঙ্গে দেবার হুমকি ঃ কমন্স সভাকে ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতাও কেবিনেটের হাতকে আরও শক্তিশালী করেছে। প্রথা অনুযায়ী কোন মন্ত্রিপরিষদ কেবিনেটের কমন্স সভার আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাজা বা রানীকে অনুরোধ করতে পারেন। রাজা বা রানী কমন্স সভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেবেন। **প্রথম,** নতুন নির্বাচনে কমন্স সভার অনেক সদস্য পুনর্বার নির্বাচিত নাও হতে পারেন। **দ্বিতীয়,** নির্বাচিত হবার জন্য সদস্যদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। **তৃতীয়,** তা ছাড়াও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হবেন সদস্যরা। ফলে কমন্স সভা ভেঙ্গে দেয়াকে অনেক সদস্যাই পছন্দ করেন না। এভাবে কেবিনেটের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হয়।

(৮) শাসন সংক্রান্ত ন্যায়-নীতি ঃ শাসন সংক্রান্ত ন্যায়বিচারের নীতিও কেবিনেটের একনায়কত্বকে সুদৃঢ় করেছে। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদের বিভিন্ন বিভাগীয় বিবাদ ও গোলমাল মিটাবার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে মন্ত্রিপরিষদের উপর। অতীতে এ সব বিবাদের মীমাংসা হত আদালতে। বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদে এরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধি কেবিনেটকে আরও শক্তিশালী করেছে।

(৯) কেবিনেটের কার্যপরিধির বিস্তৃতি ঃ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাবার ফলে কেবিনেটের কার্যাবলিও বৃদ্ধি পেয়েছে অভূতপূর্ব রূপে। বর্তমানে রাষ্ট্র শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও চুক্তি কার্যকর করেই ক্ষান্ত নয়, অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজও রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। কেবিনেটের এ কার্যকলাপ বৃদ্ধির ফলে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবিনেট গঠনে কমন্স সভার তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই কেবিনেট গঠন করে। ফলে কেবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়।

কেবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে অনেকে একনায়কত্ব বলতে প্রস্তুত নয়, কেননা কেবিনেটের ক্ষমতা অভূতপূর্ব রূপে বৃদ্ধি পেলেও প্রতি পদক্ষেপে কেবিনেটকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, প্রতি মুহূর্তে কেবিনেটকে অনাস্থার ঝুঁকি বহন করতে হয়, জনমতের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রিত হতে হয় ও আগামী নির্বাচনের কথা স্মরণ রাখতে হয়। তবে সাম্প্রতিক কালে কেবিনেটের ক্ষমতা যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

(১০) দেশ শাসনের দায়িত্ব ঃ বর্তমানে কেবিনেটই দেশ শাসনের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রের কর্ম পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় কেবিনেটের প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর পরিমাণে। ফলে কেবিনেট কমন্স সভার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

(১১) পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা দান ঃ কেবিনেটের সদস্যগণ কমন্স সভার সদস্যগণের সাথে সুযোগ-সুবিধা আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগসূত্র এবং স্বার্থবন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। পারস্পরিক স্বার্থের মাধ্যমে কেবিনেট নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

সংক্ষেপে, কেবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে **প্রথম,** রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু সংগঠন। **দ্বিতীয়,** পরিষদের বাইরে জন জাগরণ ও নির্বাচকমণ্ডলীর সম্প্রসারণ। **তৃতীয়,** কেবিনেটের সুদৃঢ় ঐক্য ও সংহতি। **চতুর্থ,** অর্পিত আইনের ও স্ব-পারিষদ রাজাজ্ঞার ব্যাপক বৃদ্ধি। **পঞ্চম,** শাসন সংক্রান্ত ন্যায়বিচার নীতির উদ্ভব। **ষষ্ঠ,** বেসরকারি সদস্যদের মর্যাদা হ্রাস। **সপ্তম,** প্রধানমন্ত্রীর প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং শাসনসংক্রান্ত নীতি। **অষ্টম,** কেবিনেটের কার্যক্রম বৃদ্ধি।

তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, কেবিনেটের একানায়কত্ব স্বৈরাচারী নয়। কেবিনেট জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও জনকল্যাণকামী।

ব্রিটেনের পার্লামেন্ট

The Parliment of the U.K.

রাজা বা রানী, লর্ডস সভা এবং কমন্স সভা সমন্বয়ে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট গঠিত। এর পূরো নাম 'হাইকোর্ট অব দি পার্লামেন্ট' (High Court of the Parliament)। প্রথমে পার্লামেন্ট প্রজাদের অভিযোগের প্রতিকার করত, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে এর বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। অনেকের মতে, পার্লামেন্টারী

প্রথার উদ্ভব হয় এ্যাংলো-সেক্সন যুগের উইটান (Witan) কাউন্সিল থেকে। উইটান কাউন্সিল নর্মান বিজয়ের পর 'ম্যাগনাম কনসিলিয়ামে' রূপ লাভ করে। রাজাকে উপদেশ দান করার জন্য 'কুরিয়া রেজিস' (Curia Regis) নামে এক ক্ষুদ্র কাউন্সিল ছিল বলেও অনেকে মনে করেন। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে 'কুরিয়া রেজিস' (Curia Regis) স্থায়ী কাউন্সিলে পরিণত হয়। তা থেকেই কালক্রমে প্রিভি কাউন্সিল গড়ে ওঠে।

পার্লামেন্টের ভিত্তি পত্তন হয় সর্বপ্রথম ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে। তখন রাজা জন (John) প্রত্যেক কাউন্টি থেকে চারজন করে নাইটদের আহ্বান করে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু পার্লামেন্টের বর্তমান রূপ দান করতে আগ্রহী হন সাইমন ডি মণ্টফোর্ড। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাইটদের সমন্বয়ে এক পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। তাঁরই নীতি অনুসরণ করে ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা এডওয়ার্ড **আদর্শ পার্লামেণ্ট** (Model Parliament) স্থাপন করেন। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে পার্লামেণ্ট দুটি পরিষদে বিভক্ত হয়। তখন থেকেই তা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। এভাবে পার্লামেন্টের জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে অধিকারের আবেদন (Petition of Rights) রচিত হয়। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে ক্রমওয়েল 'লর্ড প্রোটেক্টর' (Lord Protector) রূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তারপর ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের পর পার্লামেণ্ট সত্যই ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে রাজা পার্লামেন্টের শক্তিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। টেমস্ নদীর ধারে ওয়েস্টমিনিস্টারের মনোরম পরিবেশে পার্লামেণ্ট ভবন অবস্থিত। সাধারণ নির্বাচনের পর এর অধিবেশন শুরু হয় এবং বছরে প্রায় ছয় মাস অধিবেশন চলতে থাকে।

পার্লামেন্টের প্রাধান্য
Supremacy of Parliament

পার্লামেন্টের প্রাধান্য ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রাধান্যের মূলে রয়েছে বিভিন্ন কারণ। **প্রথম,** আইন প্রণয়ন ছাড়াও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। পার্লামেন্টের ব্যাপক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ জেনিংস বলেছেন, 'পার্লামেণ্ট ব্রিটিশ সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে। নিজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যায়কে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে। চুক্তির উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি দখল করার আদেশ দিতে পারে। সরকারের কার্যব্যবস্থা ডিক্টেটরের হাতে ন্যস্ত করতে পারে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথকে ভেঙ্গে দিতে পারে। কম্যুনিজম, সমাজতন্ত্রবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ফ্যাসিবাদ ইচ্ছামত প্রবর্তন করতে পারে—কারণ আইনের দিক দিয়ে এসব বিষয়ে কোন বাধা উঠতে পারে না।"

দ্বিতীয়, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং যে কোন আইন নাকচ করতে পারে। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা কোন প্রতিষ্ঠানের নেই, যেমন, আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা সংবিধান বহির্ভূত আইন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। তাই ডি লোমী *(De Lomie)* বলেছেন, **"পার্লামেন্টের ক্ষমতা এতই অধিক যে স্ত্রীকে পুরুষ ও পুরুষকে স্ত্রীতে রূপান্তরিত করা ভিন্ন পার্লামেণ্ট অপর সকল কার্যই করতে পারে"**। ডাইসি বলেন, সাধারণ বিধি-বিধান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তাই পার্লামেন্টের প্রাধান্য অনেকটা অবাধ, সীমাহীন এবং বাধাবন্ধনহীন।

তৃতীয়, ব্রিটেনের শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদের ভিত্তিমূল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
Limitations to the Power of Parliament

তথাপি পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব সন্দেহাতীত হলেও কার্যক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বিভিন্নভাবে সীমিত।

প্রথম, কমন্স সভার সংখ্যগরিষ্ঠ দলের দ্বারা পার্লামেণ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ কেবিনেট গঠিত হয় তাদের মধ্য থেকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন লাভ করে কেবিনেট পার্লামেণ্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। রামজে ম্যুইর *(Muir)* সত্যই বলেছেন, 'আজকাল কমন্স সভা কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রিত করে না, বরং কেবিনেটই কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে" ("Today it is not the House of Commons which controls the cabinet but the cabinet controls the House")।

দ্বিতীয়, যদিও আইনগতভাবে নীতি বা প্রথা পার্লামেণ্টের প্রাধান্য ক্ষুণ্ন করতে পারে না, তথাপি জনমতের প্রভাব বা চাপের মুখে কোনদিন পার্লামেণ্ট নীতিবর্জিত বা প্রথাবিরোধী আইন প্রণয়নে সাহসী হয় না।

তৃতীয়, ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্রিটিশ সংবিধানের কার্যকারিতা ঐতিহ্যকে কোনদিন অশ্রদ্ধা করে না। তাই ঐতিহ্যের মহিমা ও ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাও পার্লামেণ্টকে যথেচ্ছাচার করতে সাহসী করে না। উদাহরণস্বরূপ, পার্লামেণ্ট যদিও ডোমিনিয়নগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম, তথাপি বাস্তবে তা কোনদিন করে নি।

সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা পার্লামেণ্টের ক্ষমতার সীমা অনেকটা সঙ্কুচিত করা হয়েছে, কারণ পার্লামেণ্ট আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল এবং আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করে না।

কমন্স সভা
House of Commons

কমন্স সভার গঠন ঃ

কমন্স সভা পার্লামেণ্টের নিম্ন কক্ষ। বর্তমানে কমন্স সভা ৬৫০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।[১] কমন্স সভার ৬৫০টি আসন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্য নিম্নরূপ বণ্টন করা হয়।

(ক) ইংল্যাণ্ড	৫২৩
(খ) ওয়েলস্	৩৮
(গ) স্কটল্যাণ্ড	৭২
(ঘ) উত্তর আয়ারল্যাণ্ড	১৭
সর্বমোট =	৬৫০

১। এই হিসাব ১৯৯৮ সালের। ইংল্যান্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ার ল্যান্ডের নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যেক সদস্য গড়ে ৬৯,৭০০ জন, ৫৭,৪০০ জন, ৫৫,১০০ জন এবং ৬৫,২০০ জন ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আইন দ্বারা ভোটারদের বয়ঃসীমা একুশ বছর থেকে নামিয়ে আঠার বছরে আনা হয়েছে। পার্লামেন্টের কার্যকাল ৫ বছর। তবে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে রাজা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পূর্বে পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ দিতে পারেন। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে তিনটায় কমন্স সভার অধিবেশন শুরু হয়। শুক্রবার বেলা এগারটায়ও বসতে পারে। সদস্যগণ স্পীকার নির্বাচন করার পর সভার কার্যাবলি আরম্ভ করেন। চল্লিশ জন সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হয়। কমন্স সভার অনেকগুলো কমিটি রয়েছে এবং সকল কমিটি পার্লামেণ্টের অনেক দায়িত্ব পালন করে থাকে। অতীতের প্রথামত লর্ড চ্যান্সেলর (Lord Chancellor) রাজার নামে নির্দেশ দেবার পর স্পীকার নির্বাচন করা হয়। এর পর রাজা বা রানী সদস্যদের সমীপে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেন। রাজা বা রানীর বক্তৃতার পর তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সদস্যগণ আইন প্রণয়নের কাজে ব্যাপৃত হন। সদস্যগণের সকলেই যে অংশগ্রহণ করেন তা নয়। কমন্স সভায় সর্বমোট ৪৫০ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ ৬৫০ জনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েও কমন্স সভা কোনদিন স্থানাভাব অনুভাব করেনি।

১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইন প্রণীত হবার পূর্বে কমন্স সভার কার্যকাল ছিল ৭ বছর। ঐ আইনে পার্লামেণ্টের কার্যকাল নির্ধারিত হয়েছে ৫ বছর। ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কমন্স সভায় ৫৩৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব হলে ব্রিটেনের স্থায়ী অধিবাসীর ভোট দিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালের **"কমন্স সভার অযোগ্যতা আইনের"** (House of Commons Disqualifications Act) মাধ্যমে স্থির করা হয় যে, বিচার বিভাগের কর্মকর্তা, বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, কোন কমিশনে, বোর্ড বা প্রশাসনিক আদালতের কর্মকর্তা ও লর্ডগণ কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হবেন না। অন্যদিকে দেউলিয়া, উন্মাদ ও কঠিন অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণ ভোট দানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। ১৯৪৯ সালের কমন্স সভার আসন সংখ্যার পুনর্বণ্টন আইনে এ সভার জন্য চারটি স্থায়ী সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করা হয়। এগুলো হলো— ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করে কমিশন কমন্স সভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করে থাকে।

পার্লামেণ্টের কার্যাবলি এবং গুরুত্ব
Its Functions and Importance

কমন্স সভার কার্যাবলি বিচিত্র এবং বহুমুখী।

প্রথম, কমন্স সভার প্রথম কাজ স্পীকার নির্বাচন করা। তিনি কমন্স সভার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। তিনি সভায় শৃঙ্খলা বিধান করেন, সভাপতিত্ব করেন, কার্য পরিচালনা করেন এবং সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ করেন।

দ্বিতীয়, কমন্স সভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল বিষয়ের উপর প্রযোজ্য। কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত বিল লর্ড সভা খুব জোর এক বছর ঠেকিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু নাকচ করে দিতে পারে না। রাজার সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। তবে সাধারণত রাজা কমন্স সভা কর্তৃক প্রণীত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন না।

তৃতীয়, অর্থসংক্রান্ত বিল প্রথম কমন্স সভায় উথাপিত হয় এবং বস্তুত আর্থিক ব্যাপারসমূহে কমন্স সভাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয় নির্ধারিত করা, নতুন কর ধার্য করা, খরচের খাত নির্ধারণ করা কমন্স সভাকেই করতে হয়। লর্ডস সভা এই ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।

চতুর্থ, কেবিনেটের শাসননীতি ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করাও কমন্স সভার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেবিনেটের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকেন তাঁদের কার্যাবলির জন্য এবং শাসন নীতির জন্য। সদস্যগণকে প্রশ্ন করে, তাঁদের সমর্থিত বিলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বা নিন্দাসূচক প্রস্তাবের মাধ্যমে অথবা সোজাসুজি অনাস্থা ভোটের দ্বারা কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কমন্স সভা।

পঞ্চম, কমন্স সভা অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সমাধান আনয়ন করেন। বহু রাজকীয় কমিশন, কমিটি ও সংস্থার সাহায্যে কমন্স সভা বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে।

ষষ্ঠ, কমন্স সভা জনমত গঠনের এক বিরাট সংস্থাও বটে। কমন্স সভায় যে সকল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তা ব্রিটেনের জনগণের পর্যালোচনার বিষয়বস্তু। এ সকল আলোচনা-পর্যালোচনা জনমত গঠনে সহায়তা করে।

সপ্তম, কমন্স সভা জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার অন্যতম বাহনরূপে বিশেষভাবে পরিচিত। সভায় যে সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলতে থাকে, তাতে বহু নাগরিকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও চেতনা বৃদ্ধি পায়।

সর্বশেষে, বলা প্রয়োজন যে, ব্রিটেনের কমন্স সভা পৃথিবীর শক্তিশালী নিম্ন কক্ষগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উইনস্টোন চার্চিল বলেছেন, "কমন্স সভা যন্ত্র অপেক্ষাও অনেকাংশে অধিকতর কার্যকর। কমন্স সভা যুগ যুগ ধরে ব্রিটিশ জাতির শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে" ("The House of Commons is much more than a machine; it has earned through long generations the imagination and respect of the British nation.")।

অধ্যাপক ফাইনারের ((*Finer*) মতে, কমন্স সভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ত্রিবিধ ঃ **(এক)** কমন্স সভা সাধারণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করে ও আইন প্রণয়ন করে। **(দুই)** কমন্স সভা সরকারের সমালোচনা করে। **(তিন)** কমন্স সভা জাতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য কমন্স সভার কার্যবিবরণীতে আরও তিনটি সুস্পষ্ট দিকের প্রকাশ ঘটেঃ (ক) বিরোধী দলের বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। (খ) কমন্স সভার সদস্যগণের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। (গ) আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। এডমাণ্ড বার্ক (*Edmund Burke*) সত্যই বলেছেন, "কমন্স সভার মৌল গুণ ও উৎকর্ষ হলো জাতীয় জীবনের সঠিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা" ("The virtue, spirit and essence of the House of Commons consists in its being the express image of the nation.')।

কমন্স সভার বিশেষ সুযোগ ঃ কমন্স সভার কতকগুলো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। **(এক)** কমন্স সভা নিজস্ব কার্যাদি পরিচালনার রীতিনীতি নির্ধারণে সক্ষম। **(দুই)** অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করারও এর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। **(তিন)** এ সভায় সদস্যগণের পূর্ণ বাকস্বাধীনতা এবং যে কোন প্রস্তাব পেশ করার স্বাধীনতা স্বীকৃত। **(চার)** সভার অধিবেশন চলাকালীন কোন সদস্যকে গ্রেফতার করা যাবে না। **(পাঁচ)** সভার বিষয় সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপারে সভায় সদস্যগণের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। স্পীকারের আদেশ ও অনুরোধ এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আইন।

লর্ড সভা
House of Lord

লর্ড সভা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ। উত্তরাধিকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এটিই পৃথিবীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৯৪৫ জন সদস্য সমন্বয়ে লর্ড সভা গঠিত। লর্ড সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য আছেন। **প্রথম,** রাজবংশের রাজকুমারগণ লর্ডস সভার সদস্য, কিন্তু তাঁরা সাধারণত সভার কার্যে অংশগ্রহণ করেন না। **দ্বিতীয়,** ২৬ জন চার্চের লর্ড আছেন। তাঁদের মধ্যে ক্যান্টারবারী ও ইয়র্কের আর্চবিশপ আছেন। **তৃতীয়,** অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যতীত যুক্তরাজ্যের সকল লর্ড বংশানুক্রমিক পীয়র হিসেবে লর্ড সভার সদস্য। **চতুর্থ,** স্কটল্যাণ্ডের পীয়রগণ সমবেতভাবে প্রতি পার্লামেন্টের জন্য ১৬ জন বংশানুক্রমিক পীয়র নির্বাচন করেন। **পঞ্চম,** কয়েকজন যাবজ্জীবন পীয়র আছেন, যাঁরা লর্ড সভার সদস্যপদ অলংকৃত করেন। তাঁদের ১৫ জন আপীলের লর্ড (Lords of Appeal)। সম্প্রতি ১০ জন নারীকেও লর্ড সভার সদস্যপদ দান করা হয় এবং তা হয়েছে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজত্বকালে। লর্ড সভায় সর্বমোট ৪৭ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। তবে এ সভার সদস্য সংখ্যা বেশি হলেও উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একশত জনের কম উপস্থিত থাকেন। ৩ জনে কোরাম গঠিত হয়। অনেক লর্ড আছেন যাঁরা সভাগৃহের অভ্যন্তর থেকে একা পথ চিনে বাহির হয়ে আসতে পারেন না।

নিচে ১৯৯২ সালের লর্ড সভার সদস্যদের সংখ্যা দেয়া হলো ঃ

(ক) যুক্তরাজ্যের লর্ড	৮৪৯ জন
(খ) স্কটল্যাণ্ডের লর্ড প্রতিনিধি	১৬ জন
(গ) আয়ারল্যাণ্ডের লর্ড প্রতিনিধি	৪ জন
(ঘ) আপীল আদালতের লর্ড	১৫ জন
(ঙ) যাবজ্জীবন পীয়র	২৬ জন
(চ) সম্মান সূচক লর্ড	৩৫ জন
	সর্বমোট = ৯৪৫ জন

'উলস্যাক' (Woolsack) নামক আসনে বসে লর্ড চ্যান্সেলর এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ব্রিটিশ কেবিনেটে যে তিনজন লর্ড সভার সদস্য থাকেন তিনি তাঁদের অন্যতম। লর্ড চ্যান্সেলর প্রস্তাব পেশ করেন বটে, কিন্তু সভার নিয়ম-শৃংখলা বা রীতিনীতি প্রবর্তনে সক্ষম হন না। সাধারণত প্রতি মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার সভার অধিবেশন শুরু হয়, তবে সভার কার্য ঘন্টাখানেকের বেশি চলে না। কোন বিল পাস করতে হলে এ সভায় অন্তত ৩০ জনের উপস্থিতি দরকার হয়। লর্ড সভার অধিবেশন তাঁর নিজস্ব কক্ষে—ওয়েস্টমিনিস্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

লর্ড সভার কার্যাবলি
Its Functions

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত লর্ড সভার ক্ষমতা কমন্স সভার সমানই ছিল। কোন কোন বিষয়ে বেশিও ছিল। কিন্তু কালক্রমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে বংশানুক্রমিক রীতিতে গঠিত লর্ড সভার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনক হ্রাস পায়।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের পার্লামেণ্টারী আইন দ্বারা লর্ড সভার আইন বিষয়ক ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ সংকুচিত করা হয়েছে। অর্থ সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল লর্ড সভায় গৃহীত হতে পারে। কিন্তু রীতি হিসেবে বাস্তবে খুব কম বিলই এ সভায় প্রথম পেশ করা হয়। প্রায় সকল সরকারি বিল কমন্স সভায় প্রথম উত্থাপিত হয়। লর্ড সভার সম্মতি আইনে প্রয়োজন হয়। সুতরাং সম্মতিদানের অছিলায় লর্ড সভা কিছুদিন স্থগিত রাখতে পারে। কিন্তু লর্ড সভার বিরোধিতা সত্ত্বেও কমন্স সভা কোন বিল পর পর তিনবার গ্রহণ করে রাজার সম্মতি লাভ করতে পারে। এক বছরের পর লর্ড সভার বিরোধিতা কোন কাজে লাগে না।

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়েও লর্ড সভার ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়েছে ১৯১১ সালের পার্লামেণ্টারী আইনে। কমন্স সভা কোন অর্থ সংক্রান্ত বিল পাস করলে এক মাসের মধ্যে লর্ড সভার অনুমোদন ব্যতীত তা কার্যকর হবে। কোন বিল অর্থ বিষয়ক কিনা তাও নির্ধারিত হয় কমন্স সভা কর্তৃক।

কিন্তু লর্ড সভার বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে প্রচুর। লর্ড সভাকে **ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাইকোর্টরূপে** অভিহিত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে লর্ড সভা সুপ্রতিষ্ঠিত। দেওয়ানী-ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ড সভা সর্বোচ্চ আপীল আদালতের দায়িত্ব সম্পাদন করে। আদালতরূপে কার্য পরিচালনকালে লর্ড চ্যান্সেলরসহ নয় জন আইনজ্ঞ লর্ড ও বিচার সংক্রান্ত অভিজ্ঞ লর্ড উপস্থিত থাকেন। তাছাড়া, কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কর্মচারিগণেরও বিচার লর্ড সভা করে।

অধিকাংশ লর্ডগণ রক্ষণশীল। তাই লর্ড সভাকে **'রক্ষণশীলতার ঘাঁটি'** বলে অভিহিত করা হয়। লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্য জন্মসূত্রে সদস্যপদ লাভ করেছেন। ফলে কালের গতির সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে পারে নি এ সভা এবং যথার্থরূপে প্রতিনিধিত্বমূলক হিসেবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে। তাই বলা হয় যে, **"লর্ড সভা নিজের ছাড়া অন্য কারো প্রতিনধিত্ব করে না, শুধুমাত্র লর্ড সভা তার সদস্যগণের বিশ্বাসভাজন"** ('The House of Lords represents nobody but itself and it enjoys the full confidence of its constituents')।

লর্ড সভার প্রয়োজনীয়তা
Its Necessity

লর্ড সভার উপকারিতা অবশ্য একেবারে লোপ পায় নি। **প্রথম,** বর্তমানকালে কমন্স সভার কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং কমন্স সভায় সকল বিলের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হবার সুযোগ খুব কম। লর্ড সভা ধীরস্থিরভাবে শান্ত পরিবেশে সে সকল বিলের আলোচনা করে অনেক উপকার সাধন করতে পারে।

দ্বিতীয়, যে সকল বিল সম্বন্ধে মতভেদের সুযোগ রয়েছে অত্যন্ত কম, সেগুলো লর্ড সভায় উত্থাপিত হয়ে তাদের বিশদ আলোচনা হয়ে গেলে কমন্স সভা কর্তৃক গ্রহণ করা সহজ হয়ে ওঠে।

তৃতীয়, কমন্স সভায় অনুমোদিত বিলগুলো পুনর্বিবেচনার জন্য লর্ড সভা বিশেষভাবে উপযোগী। লর্ড সভা কোন বিল প্রত্যাহার করতে অপারগ হলেও অন্তত এক বছরের জন্য তা স্থগিত রাখতে পারে। ফলে এ সময়ের মধ্যে বিলের ত্রুটিগুলো ধরা পড়তে পারে। এ সম্বন্ধে সত্যই বলা হয়েছে "সময়ই ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করে, নতুন বিষয়াদি মাথা উঁচু করে, অভিযোগ পরিবর্তিত হয় এবং জনসাধারণের চাওয়া-পাওয়ার গুরুত্ব অনেকটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করা সম্ভবপর হয়" ("Time reveals defects, new points of view develop, grievances change and people may want more or less drastic

provisions.")। সুতরাং লর্ড সভা যে কোন বিলে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বদলে যুক্তির প্রাধান্য সৃষ্টি করার পরিবেশ গড়ে তুলতে সমর্থ।

চতুর্থ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্র নীতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো বিষয়ের সুষ্ঠু এবং সুন্দর আলোচনা লর্ড সভায় করা সম্ভবপর, কেননা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা আলোচনায় সুফল ফলে এবং ভবিষ্যতেও কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা চলতে পারে।

পঞ্চম, লর্ড সভাকে 'অভিজ্ঞতার এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার রক্ষণাগার' (Reservoir) বলা হয়। প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত লর্ড সভার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা যে কোন আইন পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠ, লর্ড সভার মাধমে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের যে কোন অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে লর্ড উপাধি দান করে মন্ত্রিসভায় আসন দান করতে পারেন। ফলে লর্ড সভা শাসন ব্যবস্থার তৎপরতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়।

সর্বশেষে, লর্ড সভা দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হিসেবে কার্য করে। পার্লামেন্টের বিচার বিষয়ক ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই সভা এবং এ সভা ঐতিহাসিক উদাহরণ, ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতার পক্ষে।

তবে অধিকতর কার্যকর করতে হলে লর্ড সভাকে সংস্কার করে কালের উপযোগী করতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে এর সমন্বয় সাধন করতে হবে। লর্ড সভাকে সার্থক করে তুলতে হলে কিছু কিছু বাস্তব ক্ষমতাও তার থাকতে হবে। তাই বলা হয় যে, হয় লর্ড সভার বিলোপ সাধন হওয়া উচিত, না হয় সংস্কার করে তাকে শাসন ব্যবস্থার এক কার্যকর সংস্থায় পরিণত করা উচিত।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস এবং কেবিনেটের একনায়কত্ব
Decline of the Parliament and Cabinet Dictatorship

কেবিনেটের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে অনুপাতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে— এ অভিযোগের মূলে অনেক সত্য রয়েছে। এককালে পার্লামেন্ট ছিল অনেকটা একনায়কের মত। সার্বভৌম ক্ষমতার দেমাগে তা যা খুশি তাই করতে পারত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের জটিলতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবার ফলে এবং আইন বিষয়ক জটিলতা ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করার ফলে পার্লামেন্টের সেদিন আর নেই। আইনত যদিও পার্লামেন্ট কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে, তথাপি বস্তুত কেবিনেটই আজকাল পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্যই এটা ভুল বুঝলে অন্যায় হবে যে, আসলে পার্লামেন্টই সরকারের প্রভাব প্রতিপত্তির উৎস। কিন্তু তথাপি পার্লামেন্ট যেন বিভিন্ন অনুশাসনের জটিলতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে। নিচে কারণগুলো বিবৃত হলো।

(১) দলীয় অনুশাসন ঃ দলীয় অনুশাসন আজকাল দলীয় সদস্যগণের নিকট বাইবেলের বাণীর মত। দল সদস্যগণের নির্বাচনের খরচ বহন করে এবং তাদের জন্য ভোট সংগ্রহ করে দেয়। জনসাধারণও ব্যক্তিকে ভোট না দিয়ে দলীয় নীতি এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতেই ভোট দান করে। ফলে দলই আজকাল রাজনীতির পুরোহিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং দলের আদেশ কোন সদস্য অমান্য করে না। এ দলগত আনুগত্যের ফলে আজকাল কেবিনেট আইন ও আর্থিক বিষয়ে যে প্রস্তাব করে, তা অনায়াসে পার্লামেন্টে গৃহীত হয়ে যায়। তাই অনেকের মতে, বর্তমানে, পার্লামেন্ট এক ধরনের পোস্ট অফিসে পরিণত হয়েছে। কেবিনেট যা বলে পার্লামেন্ট তাই সমর্থন করে।

(২) প্রধানমন্ত্রীর প্রতিপত্তি ঃ প্রধানমন্ত্রীর প্রভূত ক্ষমতার নিকট পার্লামেণ্ট নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সরকারের মুখপাত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনিই সরকার। যদি পার্লামেণ্ট কেবিনেটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে উদ্যত হয়, তা হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করতে পারেন এবং রাজা তাঁর কথামত তা ভেঙ্গে দেবেন। সুতরাং নতুন নির্বাচনের ঝামেলায় পড়ার ভয়ে ও সদস্যপদ হারাবার ভয়ে সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর মতে মত দিতে অনেক সময় তৈরি থাকেন যেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর হাতের মৃত্যুবাণ প্রয়োগ না করেন।

(৩) বেসরকারি সদস্যদের গুরুত্ব হ্রাস ঃ বর্তমানে বেসরকারি সদস্যগণের গুরুত্ব সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অতীতে বেসরকারি সদস্যগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করাতে সমর্থ হয়েছেন, কিন্তু বর্তমানের দলীয় রাজনীতিতে দলীয় মত ব্যতীত অনুরূপ কার্য করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, কেবিনেট ইচ্ছা করলে প্রাইভেট সদস্যগণের সুযাগ-সুবিধাদি রহিত করে প্রস্তাব গ্রহণ করতেও পারে। তাই আইন প্রণয়নে কেবিনেট ব্যতীত কেউ সমর্থ হয় না।

(৪) অর্পিত আইন ঃ কেবিনেট শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হয় না, আইন প্রণয়ন করার সময় তার মধ্যে এমন সব ধারা ঢুকিয়ে দেয়া হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী বা কর্মচারিগণ ঐ আইনকে প্রয়োগ করার মত প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে পারেন। এ বিধি-বিধানকে অর্পিত আইন (Delegated Legislation) বলা হয়। ফলে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় ব্যাহত হয়।

(৫) আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব ঃ আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে কেবিনেটের নেতৃত্ব কেবিনেটকে অনেক প্রভাবশালী করে তুলেছে। পার্লামেণ্টে পেশকৃত সকল আইনের প্রস্তাব কেবিনেট করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন থেকে আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দান করে।

(৬) কমন্স সভা ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা ঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেবিনেট কমন্স সভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাজা বা রানীকে অনুরোধ করতে প্যারে। ফলে নতুন নির্বাচনের ভয়েও পার্লামেণ্ট কেবিনেটের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হয় না।

(৭) কেবিনেটের যৌথ দায়িত্ব ঃ কেবিনেটের যৌথ দায়িত্ব কেবিনেটকে অনেক বেশি সংহত ও প্রভাবশালী করেছে।

(৮) আর্থিক দায়িত্ব ঃ দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে কেবিনেটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, বাজেট প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ইত্যাদির ফলে কেবিনেটের হাত অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে।

(৯) দেশ শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব ঃ দেশ শাসনের সার্বিক দায়িত্ব কেবিনেটের উপর ন্যস্ত এবং ফলে কেবিনেটের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে অভাবিতরূপে।

(১০) মন্ত্রিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ মন্ত্রিদের সংখ্যা বৃদ্ধি কেবিনেটের প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, কেননা দলের প্রায় সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিই কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত।

(১১) কমন্স সভার সংক্ষিপ্ত অধিবেশনকাল ঃ কমন্স সভার অধিবেশনকাল সংক্ষিপ্ত হবার ফলেও তা কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় না। যখন কমন্স সভার অধিবেশন থাকে না তখন কেবিনেটই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং দেখা যায় যে, আজকাল উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য পার্লামেণ্ট মন্ত্রিদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে উঠেছে। তাঁদের সুরেই পার্লামেণ্ট ধুয়া গেয়ে চলে এবং তাঁদের হাতের সখের লাঠি হিসেবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্পীকার
Speaker

১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে কমন্স সভায় স্যার টমাস হাঙ্গারফোর্ড সর্বপ্রথম স্পীকার পদে সমাসীন হন। স্পীকার পদ অতীব মর্যাদার এবং সম্মানের। তবে বর্তমানকালে স্পীকারের আইন সভায় কথা বলার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং পদটির নামকরণের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহে জাগে। তবে যারা লণ্ডনের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে পরিচিত, তারা জানেন যে, ঐতিহাসিক কারণেই এ পদটির নামকরণ হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানী প্রত্যক্ষ ভাবে লর্ডদের সাথে বাক্য বিনিময় করতেন, তাদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের (commoners) ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটত না। যদি তাদের কোন অভাব-অভিযোগ থাকত, তা হলে সকলে রাজার সাথে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ করতে সক্ষম হত না। প্রথমে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে প্রবীণ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিটিকে বেছে বের করতে হত। তিনি হতেন জনসাধারণের মুখপাত্র (spokesman) এবং তিনিই জনসাধারণের কথাগুলো বা অভাব-অভিযোগ রাজার নিকট পেশ করতেন। তাই তাকে বলা হত বক্তা বা স্পীকার (speaker)। কমন্স সভা সংগঠিত হলে তার কার্য পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করার জন্য স্পীকার নির্বাচন করার পদ্ধতি থেকে গেল।

শান্ত, ধীর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যোগ্য, চৌকস ব্যক্তিকে সাধারণত স্পীকার পদে নির্বাচিত করা হয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পীকার আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হেতু পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে স্পীকারের এলাকায় অপর কোন প্রার্থী দাঁড় করানো হয় না। পূর্ববর্তী স্পীকার যদি নিজ পদে বহাল থাকতে চান, তবে তাঁকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়। মনোনয়নের পর মুহূর্তে স্পীকার রাজনৈতিক দলের সাথে সকল সম্পর্ক শূন্য হন। তাঁকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিরূপে ধার্য করা হয়। সকল দলাদলি ও দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তিনি থাকেন। ওয়েস্টমিনিস্টার প্রাসাদে এক সরকারি গৃহে অবস্থান করেন তিনি। পদমর্যাদা অনুসারে তিনি উপযুক্ত বেতন লাভ করেন। দলীয় প্রথার সম্প্রসারণ হেতু পার্লামেণ্টের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পাদনকল্পে স্পীকারের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পদটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্পীকার ব্রাউনের কথাগুলো এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ **"স্পীকার হিসেবে আমি সরকারের লোক নই, বিরোধী দলের নই। আমি কমন্স সভার লোক এবং বিশ্বাস করি যে, পিছন বেঞ্চের লোকদের জন্য আমি রয়েছি"** ("As speaker I am not government's man, not the opposition's man. I am the House of Common's man and I believe above all back-bencher's man")। তিনি দলীয় সভা-সমিতিতে যোগদান করেন না এবং কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা দান করেন না। **"তিনি সত্যই নিরপেক্ষ রাজনৈতিক জীবনের প্রতীক শুভ্র ফুল"**।

স্পীকারের কার্যাবলি ঃ প্রথমত, কমন্স সভার সভাপতিত্বকালে স্পীকার সভায় নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন, সভার আলোচনা ও বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কে কখন বক্তৃতা করবেন, তা নির্ধারণ করেন।

দ্বিতীয়ত, স্পীকার সভার মর্যাদা রক্ষা করেন এবং সদস্যগণের অধিকার রক্ষা করেন। সভায় গোলযোগ উপস্থিত হলে অথবা নিয়ম-শৃঙ্খলা অচল হলে তিনি সভার কার্য স্থগিত রাখতে পারেন এবং কোন সদস্যকে বহিষ্কার করতে পারেন।

তৃতীয়ত, স্পীকার নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করেন এবং বৈধতার প্রশ্নগুলো সমাধান করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত সাধারণত পূর্ব ঘটনা ও ঐতিহ্য ভিত্তিক হয়ে থাকে।

চতুর্থত, আলোচনা দ্বারা যে সকল বিষয়ের সমাধান সম্ভবপর হয় না সে সকল বিষয়ে স্পীকার ভোট গ্রহণ করে সংখ্যাধিক্যের জোরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হলে তিনি তাঁর নির্ণয়ার্থক (Casting) ভোট দ্বারা তা সমাধান করেন।

পঞ্চমত, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের পার্লামেন্টারী আইন অনুযায়ী কোন বিল অর্থ বিল তা নির্ধারণ করতে স্পীকারই শুধু সমর্থ। তিনি রাজা ও কমন্স সভার মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কাজ করেন।

সর্বশেষে, মূলতবী প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দিবার অধিকার স্পীকারের রয়েছে। প্রশ্নোত্তরের সময় নির্দিষ্টকরণ ও অবাস্তব প্রশ্ন বাতিলকরণ প্রভৃতিও স্পীকার করে থাকেন। অবসর গ্রহণকালে তিনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন।

কমন্স সভার কমিটি ব্যবস্থা
Committee System

পার্লামেন্টের বৃহৎ পরিসরে ধীর-স্থির ও সুদক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয় বলে এর কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় সকল কার্যই কমিটির দ্বারা সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে চার্চিল বলেন, **"অস্ট্রেলিয়ায় যেমন শশকের উপদ্রব রয়েছে, ইংল্যাণ্ডে তেমনি কমিটির উপদ্রব রয়েছে।"** কে. সি. হুইয়ার বলেন, **'কমিটি এমন অনেক কাজ করে, যা কমন্স সভা করতে পারে না।"** প্রায় সকল কাজের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। অনুসন্ধান করার জন্য, উপদেশ দেবার জন্য, আইন করার জন্য, আপোষ-আলোচনার জন্য, শাসনকার্যের জন্য, এমন কী নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালে ছয় প্রকারের কমিটি স্থাপিত হয়, কিন্তু ১৯২৬ সালে কমিটির সংখ্যা হয় পাঁচ। বর্তমানে ঐ নিয়ম চালু রয়েছে।

কমন্স সভার পাঁচ প্রকার কমিটি রয়েছে; যথা— (১) **সমগ্র সভার কমিটি,** (২) **স্থায়ী কমিটি,** (৩) **সিলেক্ট কমিটি,** (৪) **সাময়িক কমিটি** ও (৫) **প্রাইভেট বিল কমিটি।**

(১) সমগ্র সভার কমিটি ঃ যখন স্পীকার তাঁর আসন ত্যাগ করেন, তখন সমগ্র সভার কমিটি বা অধিবেশন বসে এবং এর সভাপতি সভাপতিত্ব করেন। পার্লামেণ্ট কর্তৃক এ সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। সমগ্র সভা কমিটি যখন আয় সম্বন্ধে আলোচনা করে, তখন এর নাম হয় সম্বন্ধীয় কমিটি (Committee of Ways and Means)। যখন তা ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনা করে তখন তার নাম হয় সরবরাহ কমিটি (Committee of Supply)। স্পীকার আসন গ্রহণ করার পরই এর কার্যকাল শেষ হয়ে যায়।

(২) স্থায়ী কমিটি ঃ স্থায়ী কমিটিগুলো পাঁচজন সদস্য সমবায়ে গঠিত হয়। প্রত্যেক সেসনের পূর্বে এ কমিটিগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কমিটি ক, খ, গ, ঘ নামে পরিচিত। এগুলো বিশিষ্ট কোন ব্যাপারে বা নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না, তবে স্পীকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এ সব কমিটি আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় বা শাসন বিভাগীয় বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করে এবং স্পীকারের নিকট রিপোর্ট দান করে।

(৩) সিলেক্ট কমিটি ঃ এ কমিটি পনের জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো নির্দিষ্ট বিষয়াদির উপর অনুসন্ধান করতে, জনমতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে অথবা যে বিষয়ে আইন প্রণয়ন স্থগিত রয়েছে, সে সকল ব্যাপারে রিপোর্ট দানের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। কাজ শেষ হলে তাদের কার্যকাল ও শেষ হয়ে যায়।

(৪) সাময়িক কমিটি ঃ এ কমিটি প্রত্যেক অধিবেশনে গঠিত হয়। এসব কমিটি সভার দ্বারা নির্দেশিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। এসব কমিটি স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগ করে এবং প্রাইভেট বিল কমিটির সদস্য মনোনীত করে।

(৫) প্রাইভেট বিল কমিটি ঃ চারজন সদস্য সমন্বয়ে এ সব কমিটি গঠিত হয়। এদের সদস্যগণের নির্বাচন কমিট (Committee of Selection) দ্বারা মনোনীত করা হয়। এসব কমিটির কাজ প্রাইভেট বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা।

অর্থের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার স্বরূপ
Nature of Parliamentary Control over Money

জাতীয় অর্থের উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব অপরিসীম। পার্লামেন্ট জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন কর ধার্য হয় না এবং কোন ব্যয়ও সম্ভবপর নয়। জাতীয় অর্থের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে কমন্স সভাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেন্ট এ ক্ষমতার মাধ্যমে কেবিনেটের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বজায় রাখে।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে কেবিনেটের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় অর্থ সম্পর্কে কেবিনেট যে প্রস্তাব গ্রহণ করে পার্লামেন্টে তার পরিবর্তন হয় না। যদি কোন পরিবর্তন হয় তা হলে সরকারের ইচ্ছানুসারেই তা হয়। কমন্স সভায় সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় কেবিনেট যে প্রস্তাব করে, সরকারি দলের সদস্যগণ সরকারি প্রস্তাবের কোন সমালোচনা না করে শুধু অনুমোদন দান করে।

সুতরাং রাজনৈতিক দলের ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাওয়ায় "স্বাধীন সংসদের মতামতের মূল্য হ্রাস পেয়েছে গভীরভাবে"। পিছন বেঞ্চের বিপ্লব অর্থহীন হয় পড়েছে। বর্তমানে তাই পার্লামেন্টের পরিবর্তে কেবিনেটই জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক।

জাতীয় অর্থের ব্যবস্থাপনায় বিরোধীদলের ভূমিকাও নেহাত গৌণ হয়ে পড়েছে। বিরোধী দল বাজেটের চুলচেরা সমালোচনা করলেও কেবিনেট ভীত হয় না, কেননা তারা জানে যে, সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বাজেটকে পার্লামেন্টে গৃহীত হতে সাহায্য করে। বিংশ দিবসে তাই দেখা যায় যে, সকল মঞ্জুরির দাবি গিলোটিনের সকল বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের অর্ধেক কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই একদিনে পাস হয়ে যায়। অধ্যাপক মানরোর কথায় তাই বলতে পারি ঃ **"কেবিনেট অনুমোদনের পর ব্রিটিশ বাজেটকে পরিষদে না পাঠিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর করলেও চূড়ান্ত অংকের সংখ্যাতে কোন পরিবর্তন হয় না"** ("If the British Budget were put directly into effect as soon

as it had been approved by the cabinet without going to the house at all its final figures would not be appreciably different.")।

ব্যয়ের উপর অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটি যদিও গঠন করা হয়, তথাপি এর ফলে তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। এ কমিটি কোন ব্যয়কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এ কমিটি শুধুমাত্র উপদেষ্টামূলক সংস্থা। সুতরাং দেখা যায় যে, সরকারি আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং কেবিনেটের সার্বিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস
British Civil Service

স্থায়ী কর্মচারীদের ওপরই ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার মান অনেকাংশে নির্ভরশীল। ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় স্থায়ী কর্মচারীদের গুরুত্ব অপরিসীম। মন্ত্রিরা বা আইন প্রণেতাগণ শুধুমাত্র জননেতা ও নীতি নির্ধারক। সাধারণ শাসন বিষয়ে তাঁরা অনভিজ্ঞ ও নবাগত। রামজে ম্যুইর তাই বলেন, **মন্ত্রিগণ শাসন বিভাগের 'ক খ গ' না জেনেও আসর জমিয়ে বসতে পারেন**।" সুতরাং স্থায়ী কর্মচারীদের পেশাদারী দক্ষতা, স্থায়ী কার্যকাল ও আনুগত্যের শপথ শাসন বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।

১৮৫৫ সালে ব্রিটেনে সর্বপ্রথম সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা নীতি স্বীকৃত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ প্রথা ১৮৭০ সাল থেকে চালু হয়। ধীরে ধীরে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা বর্তমান আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার জন্য একটি **সিভিল সার্ভিস কমিশন** রয়েছে। এ কমিশন রাজা বা রানী কর্তৃক নিযুক্ত তিন জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ কমিশনের প্রধান কাজ পরীক্ষা গ্রহণ এবং মেধার ভিত্তিতে চাকরির জন্য প্রার্থীদের সুপারিশ করা।

কর্মকর্তাদের প্রকারভেদ ঃ স্থায়ী কর্মচারীদের নিম্নলিখিত ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) প্রশাসক, (খ) কারিগরি শ্রেণী, (গ) কেরানী গোষ্ঠী, (ঘ) টাইপিস্ট, (ঙ) বিশেষজ্ঞ, ও (চ) চাপরাশি ও দারোয়ান শ্রেণী। কিন্তু স্থায়ী কর্মচারী বলতে সাধারণত প্রশাসনিক শ্রেণীকে বুঝায়। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

কার্যকাল ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর স্থায়ী কর্মচারিগণ নিযুক্তির পর সদাচরণ সাপেক্ষে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকেন। অবসর গ্রহণকালে তাঁরা পেনসন পেয়ে থাকেন।

অযোগ্যতা বা অসদাচরণ ব্যতীত কেউ চাকরি থেকে বরখাস্ত হন না। অর্থ দফতর বা ট্রেজারি সিভিল সার্ভিস শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। প্রত্যেকে চাকরিতে নিরাপত্তা বোধ করেন। চাকরিতে কার্যকালের জ্যেষ্ঠতা (Seniority), দক্ষতা প্রভৃতির ভিত্তিতে তাঁদের পদোন্নতি ঘটে। কর্মচারীদের চাকরির শর্ত, পদোন্নতি, বেতন, ভাতা সবকিছু অর্থ দফতর বা ট্রেজারি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য ঃ নিরপেক্ষতা ও পেশাদারী দক্ষতাই ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নিরপেক্ষতা স্থায়ী কর্মচারীদের প্রধানতম গুণ। যে দলই ক্ষমতায় সমাসীন হোক না কেন, স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ নিরপেক্ষভাবে মন্ত্রিদের সাথে সহযোগিতা করে থাকেন। তাঁরা সকল সময় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হন না।

স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ দক্ষ এবং পারদর্শী। বিভাগীয় প্রধান বা মন্ত্রিগণ অ-বিশেষজ্ঞ (amateurs) এবং বিভাগীয় উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ অভিজ্ঞ, পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ (specialists)। সুতরাং বিভাগীয় বিশেষজ্ঞরাই শাসন বিভাগের সকল খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করেন ও সুদক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ অনেক সময়ই তাঁদের প্রভু মন্ত্রিদের অপেক্ষা অধিকতর বিভাগীয় খবর রাখেন। তাই বলা হয় ঃ "তাঁরা সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তাঁদের প্রভু মন্ত্রিদের অপেক্ষা অধিকতর বিভাগীয় জ্ঞানসম্পন্ন। ফলে আমলাতন্ত্র বা নব্য স্বৈরাচারের সমস্যা প্রায় সকল দেশেই অনুভূত হয়" ("They are generally skilled and experienced men who possess far more knowledge than their masters; the result is the growth of bureaucracy and the new despotism is one of the outstanding problems of modern government")।

মন্ত্রিগণ রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপরিচিত জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁরা শুধু নীতি নির্ধারণ করে ক্ষান্ত হন। কিন্তু স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ বিভাগীয় নীতি বাস্তবায়িত করেন এবং সুচারুরূপে বিভাগের কার্য পরিচালনা করে থাকেন। স্থায়ী কর্মচারীদের বাদ দিয়ে মন্ত্রিগণের পক্ষে শাসন কার্য পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। জনসাধারণের প্রয়োজন জেনে প্রধানমন্ত্রী বাস্তব কার্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে স্থায়ী কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দান করেন। শাসনকার্যে মন্ত্রিগণকে সর্বদা স্থায়ী কর্মচারীদের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা অর্জন করতে হয়।

আমলাতন্ত্রের প্রভাব ঃ সিডনী ওয়েব *(Sidney Webb)* মন্তব্য করেন, ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক শাসিত হয়ে থাকে। ব্রিটেনে আমলাতন্ত্রের প্রভাবকে অনেকে তীব্রভাবে সমালোচনাও করেছেন। সাধারণত নিম্নবর্ণিত সমালোচনাগুলো ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ঃ

(এক) স্থায়ী কর্মচারিগণ অতিরিক্ত নিয়ম নিষ্ঠায় বিশ্বাসী। তারা শুধুমাত্র রুটিন মাফিক কাজ করতে চান, যা অনেক সময়ই গঠনমূলক কাজের পরিপন্থী।

(দুই) স্থায়ী কর্মচারিগণ কোন নতুন কাজে ব্রতী হতে চান না এবং তা প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

(তিন) তারা নিয়ম এবং রুটিনের দাস এবং অনেক সময় তাদের নিয়ম-নিষ্ঠা প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিপন্থী।

(চার) আমলাতন্ত্রের লাল ফিতা জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি করে এবং অনেক নতুন চিন্তাধারার কবর রচনা করে।

(পাঁচ) স্থায়ী কর্মচারিগণ চাকরির নিরাপত্তা ও পদমর্যাদার গর্বে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

কিন্তু তা যাই হোক, ব্রিটেনের আমলাতন্ত্র বহু বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ১৮৩২ সালের পূর্বে ব্রিটেনের শাসনকার্য ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রকৃতির। কিন্তু অগ্রগতির সাথে সাথে শাসনকার্য জটিল আকার ধারণ করে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের সূক্ষ্ম

বৃদ্ধি, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। ১৮৫৫ সালে সর্বপ্রথম ব্রিটেনে সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় এবং কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এর দুটি ফলাফল উল্লেখযোগ্য ঃ

(এক) এ ব্যবস্থায় দেশের মেধাবী যুবকবৃন্দ চাকরির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অনেক প্রতিভাশালী যুবক চাকরি গ্রহণ করে।

(দুই) কর্মচারিগণ চাকরির নিরাপত্তা লাভ করেন এবং চাকরির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট পরিমাণে।

তদুপরি, কর্মচারিগণ স্ব-স্ব ক্ষমতা প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে স্থায়ী কর্মচারীদের দক্ষতা ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ সালের পর ব্রিটেনে বহু জনকল্যাণমূলক আইন প্রণীত হয়। বৃদ্ধকালীন পেনসন, জাতীয় বীমা প্রভৃতি বহু আইন প্রণীত হবার ফলে শুধুমাত্র মন্ত্রিগণ এঁটে উঠতে না পারায় কর্মচারীদের উপরও দায়িত্ব পড়ে আইনগুলোর বাস্তব দিক পরীক্ষা করার। কালক্রমে স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের আসন পাকা করে নিয়েছেন। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলেই বিভাগীয় কাজ-কর্ম কিভাবে পরিচালনা করা যায়, মন্ত্রী অপেক্ষা তারাই ভাল বুঝেন। শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ বিধি বা পরিষদীয় নির্দেশ স্থায়ী কর্মচারীরা গ্রহণ করে থাকেন। এ সকল আদেশ-নির্দেশ অবশ্য মন্ত্রিগণ পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করতে পারেন। সুতরাং ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় স্থায়ী কর্মচারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্পিত আইন
Delegated Legislation

পার্লামেণ্ট অনেক সময় এমন আইন প্রণয়ন করেন এবং যে আইনে এমন ধারা থাকে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী বা স্থায়ী কর্মচারিগণ ঐ আইনকে প্রয়োগ করার মত প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে পারেন। এ বিধি-বিধানকে অর্পিত আইন (Delegated Legislation) বলা হয়।

প্রধানত দু কারণে এর উদ্ভব হয়েছে ঃ (ক) স্থায়ী কর্মচারীদের ক্ষমতার বিস্তৃতি, এবং (খ) শাসনতান্ত্রিক ন্যায়নীতির প্রয়োজন।

পার্লামেণ্ট সাম্প্রতিককালে অনেক জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করে। শিক্ষা সংক্রান্ত, স্বাস্থ্য বিষয়ক, বেকারের সাহায্য, বৃদ্ধদের পেনসন, জাতীয় বীমা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু আইনকে প্রয়োগ করার সময় যে সকল খুঁটিনাটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তা পার্লামেণ্ট করতে পারে না। এর কারণ **প্রথম**, অনেক সময় পার্লামেণ্টের সদস্যদের সুদক্ষ জ্ঞানের অভাব। **দ্বিতীয়**, বিস্তারিত সকল দিক পরীক্ষার জন্য তাদের সময়ের স্বল্পতা। **তৃতীয়**, বস্তব দিক থেকে সমস্যাবলি দেখার জন্য যে প্রয়াস তা অনেকক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের সদস্যদের থাকে না। তাই পার্লামেণ্ট আইনের মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করে থাকে এবং বিশদ বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী বা কর্মচারীদের উপর ভার দেয়া হয়। তাই এগুলোকে অর্পিত আইন বলা হয়।

এর প্রকারভেদ ঃ অর্পিত আইন সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে; যথা— **(ক) সাময়িক আদেশ, (খ) নির্দেশ,** এবং **(গ) নির্দেশাবলী।**

(ক) সাময়িক আদেশ (Provisional Order) ঃ সামরিক আদেশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক পরবর্তীকালে অনুমোদিত হতে হয়।

(খ) নির্দেশ (Order) : নির্দেশ হলো সংশ্লিষ্ট আইনের সাথে সংযুক্ত ধারা। এদের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

(গ) নির্দেশাবলী : নির্দেশাবলী মন্ত্রিদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়।

অর্পিত আইন সম্পর্কে এটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পার্লামেণ্ট এগুলোকে অনুমোদন করতে পারে, নাকচও করতে পারে। তবে যেহেতু কেবিনেটের পৃষ্ঠপোষকতায় এ আইনগুলো রচিত হয়, সে জন্য এদের নাকচের প্রশ্ন উঠে না।

অর্পিত আইন কোনক্রমে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে না। এ ধরনের আইন অনেক সময়ই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শাসন ব্যবস্থার জটিলতাহেতু বিভাগীয় দক্ষ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রণীত এ বিধি-বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক অনেক কার্যই সুসম্পন্ন হতে পারে না।

তবে বিভিন্ন দিক থেকে অর্পিত আইন সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছে। বিচারপতি হিউয়ার্ট (Lord Hewart) এ সকল শাসন বিভাগীয় বিধি-বিধানকে 'নব্য স্বৈরাচারী' (New Despotism) বলে আখ্যায়িত করেন। রামজে ম্যুইরও এ সকল বিধি-বিধানকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দান করেন।

এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, বিভাগীয় আদেশ-নির্দেশসমূহ বিভাগীয় উপদেষ্টা কমিটির দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জারি করা হয়। উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক বা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে এ সকল আদেশ-নির্দেশ কার্যকর হয় না। সুতরাং অর্পিত আইন কোন ক্রমেই অগণতান্ত্রিক নয়। সাধারণত এ আইন জনকল্যাণ ভিত্তিক হয়ে থাকে।

ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থা
British Judicial System

ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার **প্রধানতম বৈশিষ্ট্য দ্রুত বিচার ব্যবস্থা।** বিচারকগণ ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ আইন সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকায় এ দ্রুত গতিসম্পন্ন বিচার কার্য পরিচালনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভবপর হয়েছে। দীর্ঘসূত্রিতা এবং অহেতুক বিলম্বের কেন স্থান নাই এখানে। সলিসিটর ও ব্যারিস্টার এ দুই শ্রেণীর ব্যবহারজীবীগণ বিচার কার্য পরিচালনায় সাহায্য করেন।

দ্বিতীয়ত, এখানে বিচারকগণ প্রত্যেকেই **বিচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা** ভোগ করেন। অপসারণের ভয় না থাকায় ও চাকরির স্থায়িত্ব বিদ্যমান থাকায় বিচারকগণ নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনায় সক্ষম হন। আইন পরিষদ, শাসন বিভাগ, এমন কী রাজার সাথে সম্পর্ক না রেখেও বিচারকগণ কার্য চালাতে পারেন। যদিও বিচারকগণকে ধনিক শ্রেণী থেকে অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়, তথাপি ঐতিহ্যবাহী বিচার বিভাগ শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে থেকে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আদর্শ স্থানীয়। লর্ড চ্যান্সেলারের সুপারিশক্রমে রাজা বিচারকগণকে নিয়োগ করেন। ভাল কাজ ও উত্তম আচরণের নিশ্চয়তায় তারা স্বীয় পদে বহাল থাকেন। একমাত্র রাজাই তাদের বরখাস্ত করতে পারেন। তবে সাধারণত উভয় পরিষদের মতামত নিয়েই রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তৃতীয়ত, জুরির সাহায্যে বিচার : ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য জুরির সাহায্যে বিচার। বিচারক যাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করেন, যেন সঠিকভাবে বিচার কার্য সম্পন্ন হয় এবং প্রথা ও রীতি-নীতির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন সম্ভবপর হয়, এ জন্য জুরি প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে। জুরি প্রথার

মৌলিকত্ব ও অপরিহার্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে লর্ড ক্যামডন (Camdon) বলেন, "আমাদের মুক্ত স্বাধীন সংবিধানের ভিত্তিই জুরি প্রথা। একে সরিয়ে দাও, দেখবে বিচার ব্যবস্থার প্রাসাদ ধূলিতে পরিণত হয়েছে" ("Trial by jury is indeed the foundation of our free constitution; take that away and the whole fabric will soon mould into dust")।

চতুর্থত, আইন ব্যবসায়িগণের মান অত্যন্ত উঁচু। অভিজ্ঞ আইন-বিশারদ ও ন্যায়পরায়ণ আইন ব্যাবসায়িগণ ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার প্রধান রক্ষাকবচ।

পঞ্চমত, আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) ফলে ইংল্যাণ্ডের বিচারালয়ে সাধারণ নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। রাজা ব্যতীত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এ আইনের আওতায় পড়ে। ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে শাসন বিভাগীয় আইন প্রচলিত রয়েছে ইংল্যাণ্ডে তার প্রভাব খুব নগণ্য।

ষষ্ঠত, এখানকার বিচার ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, ধীর স্থিরভাবে মামলাগুলোর শুনানি হয় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আইন ব্যবসায়িকগণের যুক্তি-তর্কের উপর বিচারকগণ রায় দেন এবং সাধারণ বিচার সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ হয়।

বিচার ব্যবস্থার সংগঠন
Organization

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইংল্যাণ্ডের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। অসংখ্য ট্রাইব্যুনাল, তাদের বিচিত্র ধরনের কর্মপদ্ধতি ও গঠনকৌশল সবগুলো মিলিয়ে এক ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি করে। বিচারালয়ের অবস্থাও সন্তোষজনক ছিল না। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিচার সংক্রান্ত আইনের (Judicature Act)-এর দ্বারা বিচার ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করা হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানী এ দুই ভাগে বিভক্ত করে এর আলোচনা করা যাক।

ফৌজদারী আদালত
Criminal Courts

(ক) ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য সর্বনিম্ন আদালত **সংক্ষিপ্ত আদালত** (Court of Summary Jurisdiction)। ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচালনাধীনে ছোট ছোট মামলার বিচার হয় এ সকল আদালতে। (খ) **ত্রৈমাসিক আদালত** (Quarter Sessions) হলো পরবর্তী উচ্চ বিচারালয়। এ আদালত কাউণ্টি আদালতের (County Courts) সমপর্যায়ভুক্ত। নিম্ন আদালত থেকে আনীত আপীলের শুনানি ও জুরি প্রথা ভিত্তিতে এ আদালতের বিচার চলে। (গ) গুরুতর অপরাধের মামলার বিচারের শুনানি পরবর্তী উচ্চ আদালত **ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ে** (Assizes) সম্পন্ন হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এ আদালতের অধিবেশন বসে। জুরির সাহায্যে প্রধান বিচারালয়ে জনৈক বিচারপতি এ সকল বিচার মীমাংসা করেন। (ঘ) **ফৌজদারী আপীল আদালত** (Court of Criminal Appeal) ফৌজদারী বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত। ইংল্যাণ্ডের লর্ড জাস্টিস ও উচ্চ বিচারালয় বা রাজার বিচার বিভাগের একাধিক বিচারপতি সমন্বয়ে এ আদালত গঠিত হয়। (ঙ) জটিল আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রায়দানের সর্বশেষ ক্ষমতা লর্ড সভার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, এ্যাটর্নী জেনারেলের সম্মতিক্রমে গুরুত্বপূর্ণ মামলার আপীল লর্ড সভায় গৃহীত হয়।

দেওয়ানী আদালত
Civil Court

(ক) ছোটখাটো দেওয়ানী মামলার বিচার হয় সংক্ষিপ্ত আদালতে (Court of Summary Jurisdiction)। (খ) **কাউন্টি ও বরো আদালতগুলো** ক্ষুদ্রতম দেওয়ানী আদালত। এ সকল আদালতে অল্প দাবির মামলা বা সাধারণ দাবি-দাওয়া নিয়ে মামলা অনুষ্ঠিত হয়। লণ্ডনের সিটি আদালতই লণ্ডনের কাউণ্টি আদালত। বৃহত্তম স্বার্থের দাবি-দাওয়া নিয়ে নিম্ন আদালত থেকে আনীত আপীলের বিচার, অধিক অর্থ সম্বন্ধীয় সকল মামলা **উচ্চ বিচারালয়** (The High Court of Justice) কর্তৃক গৃহীত হয়। উচ্চ বিচারালয়ের কয়েকটি প্রধান বিভাগ রয়েছে— (১) রাজার বিচার বিভাগ (King's Bench), (২) চ্যানসারী বিভাগ (The Court of Chancery), (৩) ইচ্ছাপত্র (Probate), (৪) বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce), ও (৫) নৌ-বাহিনী (Admiralty) বিভাগ। (গ) রাজার বিচার বিভাগে প্রথাগত আইনের (Common law) সকল ক্ষমতা ও চরমাধিকার প্রয়োগের রয়েছে। চ্যানসারী বিভাগ তাঁর আদিম ক্ষমতা কিছু হারালেও যৌথ ব্যবস্থা, বন্ধকী ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নৌ-বিভাগ সংক্রান্ত সকল বিষয় সমাধান হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বিচারালয়ে। লর্ড চ্যান্সেলারের অনুমোদনক্রমে রাজা কর্তৃক উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতিগণ মনোনীত হন। (ঘ) উচ্চ বিচারালয় থেকে আপীল আদালতে আপীল চলে। (ঙ) লর্ড সভা সর্বশেষ স্তরের আপীল আদালত। জটিল আইনের প্রশ্নে লর্ড সভায় শুনানি হয়। লর্ড চ্যান্সেলরসহ দশজন আইনজ্ঞ লর্ড আপীলের বক্তব্য শ্রবণ করেন ও রায়দান করেন। (চ) ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশ থেকে আনীত আপীল **প্রিভি কাউন্সিলের** বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালে হয়। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল পরিষদ রাজা বা রানীকে অনুজ্ঞা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। (ছ) সর্বোপরি রাজা বা রানী তাঁর চরমাধিকার বলে আপীল শুনতেও সক্ষম।

প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) ঃ আইনগতভাবে রাজার শাসন সংক্রান্ত যে পরমাধিকার রয়েছে তা প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। তবে রাজার ক্ষমতা যেমন লুপ্ত প্রায়, তেমনি প্রিভি কাউন্সিলের অধিকার বাস্তবক্ষেত্রে অন্তর্হিত হবার উপক্রম হয়েছে। কেবিনেট আজ উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতা ব্যবহার করেন। কেবিনেট ছিল প্রিভি কাউন্সিলের একটি ছোট কমিটি।

অতীতে রাজার একটি পরিষদ ছিল। এ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে তার নাম ছিল উইটেনেগেমট'। এই পরিষদ থেকে প্রিভি কাউন্সিলের উদ্ভব হয়। অতীতে এবং বর্তমানকালে কেবিনেটের সকল সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। তাছাড়া রাজপুত্রগণ, ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ, কমন্স সভার সভাপতি, আপীল শোনার জন্য লর্ডগণ, প্রধান বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারকগণ প্রিভি কাউন্সিলের সভ্যরূপে নিযুক্ত হন। এর সভ্যপদ এখনও একটি বিশেষ সম্মানরূপে গণ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী কার্যত সভ্যদিগকে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক সদস্য নিজের নামের প্রথমে Right Honourable ও নামের শেষে P.C. (প্রিভি-কাউন্সিলার) লেখার অধিকার পান। লর্ডদের পরেই তাদের স্থান। প্রিভি কাউন্সিলের প্রধান কাজ কেবিনেট দ্বারা নির্বাচিত কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি দান (formal recognition to cabinet plans)।

ব্রিটেনের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান (Local Self-Government) ঃ অতীতকাল থেকে ব্রিটেনের অধিবাসীরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় তারা নির্জস্ব উদ্যোগে সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রয়াস পান। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গুরুত্ব শতগুণে বেড়েছে এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যভার অনেক বেড়েছে।

ব্রিটেনের ছয় স্তরে বা ছয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর রয়েছে।

প্রথম, প্যারিস পর্যায়ে (The Parish)। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৭৩০০ প্যারিস কাউন্সিল রয়েছে।

দ্বিতীয়, গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্য জেলা পরিষদগুলো রয়েছে (Rural District Council)। এদের সংখ্যা অন্যূন ৫০০ শত।

তৃতীয়, বরো (Borough)। এদের সংখ্যা কয়েক শত।

চতুর্থ, শহর অঞ্চলের জেলা পরিষদসমূহ। প্রায় ৭০টি শহর অঞ্চলে জেলা পরিষদ রয়েছে।

পঞ্চম, জেলা পরিষদ। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে ৬১টি জেলা পরিষদ আছে।

সর্বশেষ, বৃহৎ জেলা পরিষদগুলো কাউন্টি–বরো নামে পরিচিত (County-Borough)। এদের সংখ্যা প্রায় ৯০টি। তাছাড়া, বড় বড় নগরে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের মত কিছু কিছু নগরীয় কাউন্সিল (Metropolitan Borough Councils) রয়েছে।

এ সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বরো (Borough) সর্বাধিক প্রাচীন। ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক এ সকল অঞ্চলে বিচার কার্য সমাধা হয়। বরো কাউন্সিলের সভাপতিকে মেয়র বলা হয়। লণ্ডনের বৃহৎ বরোর মেয়র হলেন লর্ড মেয়র। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতিকে সাধারণত চেয়ারম্যান বলা হয়।

কাউণ্টি কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হয়। এর সভ্যগণ তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সাধারণত ৫৬ হতে ১৪০ জন সভ্য সংখ্যার মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমিত থাকে। কাউণ্টির চেয়ারম্যান সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কাউন্সিলের এলাকায় শিক্ষা বিস্তার, শান্তি রক্ষা, বাসস্থানের বন্দোবস্ত করাই সাধারণত এ কাউন্সিল গুলোর কাজ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরো, জেলা কাউন্সিল ও প্যারিসগুলোর কার্যব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণও তাদের কার্যাবলির মধ্যে পড়ে।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে শহরের জেলা কাউন্সিল ও গ্রামাঞ্চলের কাউন্সিলগুলোর জন্ম হয়। আইনগতভাবে এ সকল কাউন্সিল বা পরিষদগুলো শহর ও গ্রামের জনস্বাস্থ্য রক্ষা, পানি সরবরাহ, রাস্তাঘাট মেরামত ও নির্মাণ, বাসগৃহের যথাযোগ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পন্ন করে। কিছু কিছু কর্মচারী, যেমন—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পরিদর্শক প্রমুখ চেয়ারম্যানদের অধীনে কাজ করে।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্বায়ত্তশাসন আইনের দ্বারা প্যারিস কাউন্সিলগুলোর সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলে এগুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এদের কাজ হলো পরিষদগুলোর সম্পত্তি রক্ষা করা, কারখানার সুবন্দোবস্ত করা, সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করা এবং জনসাধারণের চলাফেরার সুব্যবস্থা ও শিশুদের জন্য ঘোরাফেরা ও আনন্দস্ফুর্তির জন্য পার্ক নির্মাণ করা।

তবে ইংল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে কাজ করে। কারণ এখানে রাষ্ট্র এককেন্দ্রিক নীতি অনুসারেই পরিচালিত। কিন্তু বর্তমানে এদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে এবং অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা যায় যে, তা শুভই হয়েছে।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের প্রধান উৎস কর। কোন জমি বা কোন বাড়ির উপর কত কর নির্ধারিত হবে, তা স্থির করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের কর নিয়ামক বিভাগ। আদায় করার ভার দেয়া হয়েছে জেলা কাউন্সিল ও বরো কাউন্সিলগুলোর উপর। ব্যবসায় ও বিবিধ উৎস থেকেও কিছু কিছু আয় হয়। প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ আসে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য থেকে। তাছাড়া, কোন কাউন্সিল বা

বরোতে স্থায়ী উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে সরকারের অনুমতি নিয়ে ঋণ গ্রহণ করাও হয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে দেড়শত কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ করতে পারে।

লণ্ডনের শাসনব্যবস্থা
The Administration of London

লণ্ডনের শাসনব্যবস্থা আজও সনাতন পদ্ধতিতে চলে আসছে। এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। প্রাচীন পৌরশাসন আজও এখানে প্রচলিত। লণ্ডন নগরী লর্ড মেয়র ও তিনটি কাউন্সিল কর্তৃক শাসিত হয়। কাউন্সিল তিনটি হলো কোর্ট অব অল্ডারম্যান, কোর্ট অব কমন কাউন্সিল এবং কোর্ট অব কমন ল। অলডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ করদাতা ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন যথাক্রমে দুই বছর ও তিন বছরের জন্য। অন্যান্য কাউন্সিলের ন্যায় এ কাউন্সিল সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক কার্য সমাধা করে থাকে। তবে এই সকল কাউন্সিলে নিয়োজিত পুলিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এ কাউন্টি ২৮টি মিউনিসিপ্যাল ব্যুরোতে বিভক্ত এবং এদের প্রত্যেকটিতে মেয়র, অলডারম্যান ও কাউন্সিলার থাকেন।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল
Political Parties

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রাজনৈতিক দলগুলোই নায়ক ও প্রতি-নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কার্যাবলি সম্বন্ধে নীতি গ্রহণ করে। ভোটারদের সম্মতি নিয়ে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তারা সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাথে একটা নীরব আপোষ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজনীতি পরিচালনা করলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সমালোচনা করার প্রচুর সুযোগ লাভ করে এবং নিজেদের মতে জনগণকে আনার জন্য প্রয়াসী হয়। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে প্রধান চারটি রাজনৈতিক দল রয়েছে ঃ (১) **রক্ষণশীল দল** (Conservative Party)। (২) **উদারনৈতিক দল** (Liberal Party)। (৩) **শ্রমিক দল** (Labour Party)। এবং (৪) **কম্যুনিস্ট দল** (Communist Party)। কম্যুনিষ্ট দল এখনও নগণ্য এবং পার্লামেণ্টে এখনও তা কোন পদ লাভে সমর্থ হয় নি।

দলের ইতিহাস ও সংগঠন ঃ ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। মহারানী প্রথম এলিজাবেথের শাসনকালে দলীয় রাজনীতির সূত্রপাত হয়। পিউরিটানগণ মহারানীর আমলে শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষুণ্ন হয়ে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ লাভ করে শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে উঠে পড়ে লেখে যান। তবে স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলেই দল ব্যবস্থা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন রাজার সাথে পার্লামেণ্টের প্রবল বিরোধ শুরু হয় তখন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পুরাদমে শুরু হয়। পার্লামেণ্টের সমর্থকগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পিউরিটান। তারা মাথার চুল ছোট করে ছাটতেন বলে তাদের নাম দেয়া হয়েছিল রাউণ্ড হেড (round head)। আর রাজার সমর্থকগণকে বলা হত ক্যাভেলিয়র (cavalier)। তাদের বিবাদ যুক্তিতর্কের দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভবপর হয় নি। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে রাজার সমর্থকগণ পরাস্ত হন। রাজা প্রথম চার্লসকে চরম মূল্য দিতে হয়। ক্রমওয়েল লর্ড প্রোটেক্টররূপে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দলের শৈশব অবস্থা তখন কেটে গিয়েছে।

ইংল্যাণ্ডে একনায়কতন্ত্র চলতে পারে নি। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর রাজা দ্বিতীয় চার্লস আবার শাসনভার গ্রহণ করেন। তারই রাজত্বকালে এক দল লোক আবেদন করেন যে, রাজার ভাই যেহেতু ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী, সে জন্য তাকে যেন উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইতিহাসে তারাই হলেন আবেদনকারী (Petitioners)। রাজার অনুগামিগণ এরূপ দরখাস্তে বিরক্তিবোধ করেন বলে তারা ঘৃণাকারী (Abhorers) নামে পরিচিত। তারা আবেদনকারীদেরকে হুইগ (Whig) বা গোঁড়া বলে গালি দিতেন। আবেদনকারিগণ পাল্টা আক্রমণে তাদের টোরী (Tory) বা ক্যাথলিক বিদ্রোহী বলে গালাগালি করতেন। প্রতিষ্ঠানসমূহে সদস্য প্রেরণে রাজনৈতিক দলগুলো মেতে উঠে স্বীয় কর্মসূচী ও নীতির ভিত্তিতে।

এভাবে ইংল্যাণ্ডে জন্ম হলো হুইগ এবং টোরী দলের। কালক্রমে এ দুটি দলই রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দলরূপে আসন জমিয়ে বসতে সক্ষম হয়। টোরী দল সব কিছুকে, বিশেষ করে পুরাতনকে, আকড়ে থাকার জন্য রক্ষণশীল দলে রূপ লাভ করে। উদার নীতির জন্য হুইগ (Whig) দল Liberal Party বা উদারনৈতিক দলে রূপলাভ করে শাসন ব্যবস্থায় নূতনত্বের স্বাদ আনয়নে সমর্থ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের প্রত্যেকটি কো-অপারেটিভ সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক দল, সংস্থা ও অনুরূপ কমিটিগুলোর সহযোগে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিক দলের (Labour Party) জন্ম হয় এবং পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন সংগ্রামে লেগে পড়ে।

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম
Activities of the Political Party

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনে ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সদস্য প্রেরণে রাজনৈতিক দলগুলো মেতে উঠে স্বীয় কর্মসূচী ও নীতির ভিত্তিতে।

প্রথম, তারা প্রাথমিকভাবে দলের সদস্য নির্বাচন করে।

দ্বিতীয়, নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এবং দলীয় নীতি প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে।

তৃতীয়, সাধারণ নির্বাচনের সময় দলীয় সদস্যগণের পক্ষে জনমত নিয়ন্ত্রণ করে।

সর্বশেষ, বিভিন্ন জায়গায় সভা আহ্বান করে, খবরের কাগজে বা নিজস্ব পত্র-পত্রিকায় দলীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রচার করে সাধারণ নির্বাচনে দলের জয় সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এই কার্যাবলি সম্পন্ন হয় প্রত্যেক দলের ত্রিবিধ পর্যায়ের মাধ্যমে।

প্রথম, দলের প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় কমিটি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সদস্যগণের সহায়তায় প্রস্তুতি চালায় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে ও সহযোগিতায় কাজ করে।

দ্বিতীয়, পার্লামেন্টের কর্মরত সদস্যগণের দ্বারা কার্য নির্বাহী কমিটি পর্যায়ে দলীয় নীতি নির্ধারিত হয় এবং কর্মসূচী প্রণীত হয়। নির্বাচিত নেতার নেতৃত্বাধীনে সকল সদস্য সংঘবদ্ধ হয় এবং সংঘবদ্ধভাবে দলের শৃঙ্খলা বজায় রেখে দলের নীতির প্রচার কার্যের সুব্যবস্থা করা হয়। সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ঐক্যভাব বৃদ্ধি করা হয় এবং দলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য জনগণ এবং পত্র পত্রিকার সাহায্যে প্রচার কার্য চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। চাঁদা আদায় করে দলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ

রচনা করা হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণকে নির্দেশ দান করা হয়। সরকারের সাথে তাদের কীরূপ সম্বন্ধ হবে তাও নির্ণয় করা হয় এ পর্যায়ে।

তৃতীয়, এ পর্যায়ে রাজনৈতিক দল জাতীয় সংঘে রূপ লাভ করে এবং জাতীয় নীতির সাথে সমন্বয় সাধন করা এবং সরকার গঠনে সক্ষম হলে কোন্ নীতি অনুসরণ করা হবে তাও নির্ধারিত হয় এ পর্যায়ে। এ পর্যায়ের উদারনৈতিক দলকে (Liberal party) জাতীয় উদারনৈতিক সংস্থা (National Liberal Federation) বলা হয়। রক্ষণশীল দলকে "জাতীয় সংরক্ষণ ও সংযুক্তবাদী সংঘের মিলিত সংস্থা" ("National Union of Conservatives and Unionist Associations") বলা হয়।

রাজনৈতিক দল
Political Party

(ক) রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ঃ রক্ষণশীল দল হচ্ছে 'টোরি' দলের উত্তরাধিকারী। এ দলে প্রধানত অভিজাত শ্রেণীর বড় বড় অভিজাত রয়েছেন। বিখ্যাত শিল্পপতি, ব্যাংক মালিক, জমিদার, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ধর্মযাজক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি সমৃদ্ধ এই দল। ব্রিটেনের খ্যাতনামা প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীল টোরি দলকে সর্বপ্রথম 'রক্ষণশীল' দল নামে আখ্যায়িত করেন। বহুবার এই দল ক্ষমতাসীন হয়ে ব্রিটেনের গৌরব বৃদ্ধি করে। ডিজরেলি, চার্চিল প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ এ দলের নেতৃত্ব দান করেন।

রক্ষণশীল দল সমাজতন্ত্রবাদ ও শিল্প জাতীয়করণ নীতির বিরোধী। এ দল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণ, সমাজের অতীত ঐতিহ্য রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বদ্ধপরিকর। সমাজের দোষ-ত্রুটি দূর করতে এ দল পিছপা নয়, তবে সমাজের সনাতন কাঠামোকে পরিবর্তন করতে রাজি নয়। রক্ষণশীল দল 'টেরিফের' উচ্চ দেওয়াল তুলে এবং দেশের শিল্প সংরক্ষণ করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রক্ষণশীলতায় এ দলে রাজা বা রানী, লর্ড সভা এবং ইংল্যাণ্ডের চার্চ এর সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় তা দৃঢ় সংকল্প ছিল।

বর্তমানে এ দলের কর্মসূচীতে অনেক প্রগতিশীল ব্যবস্থাও স্থান পেয়েছে। একমাত্র লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ছাড়া তা অন্যান্য শিল্পের জাতীয়করণে আর আপত্তি করে না। অতীত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী থাকলেও অধুনা আফ্রিকার অনেক উপনিবেশকে এ দলের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। পররাষ্ট্র নীতিতে এ দল সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছে। এই দল জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার নীতিতে বিশ্বাসী।

(খ) উদারনৈতিক দল (Liberal Party) ঃ উদারনৈতিক দল হুইগদলের উত্তরাধিকারী। উদারনৈতিক দল সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী, কিন্তু তা বিপ্লবাত্মক সংস্কার বিরোধী। বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের নেতৃত্বে উদারনৈতিক দল বহু সংস্কার সাধন করেছে। এর দিন কিন্তু গিয়েছে। ১৯২২ সালের পর থেকে এর প্রাধান্য ও প্রভাব বিনষ্ট হয়েছে।

নীতিগত দিক থেকে এ দল রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের মাঝামাঝি। উদারনৈতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবাধ নীতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সকলের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান প্রভৃতি নীতিতে বিশ্বাসী। পররাষ্ট্র নীতিতে এ দল বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

(গ) শ্রমিক দল (Labour Party) ঃ ১৮৯৯ সালে শ্রমিক দলের জন্ম হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের প্রত্যেকটি কো-অপারেটিভ সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক

সংস্থা ও অনুরূপ কমিটিগুলোর সহযোগে এ দলের জন্ম হয়। জন্মের পর থেকে এ দল ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। বর্তমানে এটি অন্যতম প্রভাবশালী দল। ১৯০৬ সালে পার্লামেন্টে শ্রমিক দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪। ১৯১০ সালে ছিল ৪২ জন এবং ১৯১৮ সালে ইহা ৫৮-তে উন্নীত হয়। ১৯২৩ সালে এ দল সর্বপ্রথম সরকার গঠন করে এবং পার্লামেন্টে ১৯১টি আসন দখল করে। ১৯২৮ সালে রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বারে ক্ষমতাসীন হয় এবং পার্লামেন্টে ২৮৯টি আসন দখল করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ক্লিমেন্ট এ্যাটলির নেতৃত্বে এ দল সরকার গঠন করে। এ দল ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে হেরল্ড উইলসনের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হয়েছিল।

শ্রমিক দলের প্রধান ঘাঁটি লণ্ডন ও শহরতলী , ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের খনি ও শিল্প এলাকাসমূহ। এ দলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, উচ্চ বিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ সামিল হয়েছিল।

শ্রমিক দল সমাজকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ঢেলে গড়তে চাই এবং সমাজে সমানভাবে সম্পদ বিনিময়ের ভিত্তিতে পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক। সমাজে পরিবর্তন আনয়নের জন্য এ দল বিপ্লবের আশ্রয় নিতেও প্রস্তুত। এ দলের নীতি প্রণীত হয়েছে মজুরদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়ার ভিত্তিতে, প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থানের, শিক্ষা বিস্তারের, বেকারত্বের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও বৃদ্ধদের পেনসন প্রভৃতি দেয়ার ভিত্তিতে। জনহিতকর সংস্থাসমূহকে এ দল জাতীয়করণের নীতিতে বিশ্বাসী। পররাষ্ট্র নীতিতে এ দল সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনসহ আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। উপনিবেশগুলোকে এ দল স্বাধীনতা দানে আগ্রহী এবং তাদের মধ্যে স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। শ্রমিক দল জাতিসংঘের এক বলিষ্ঠ সমর্থক।

বিরোধী দলের ভূমিকা
Her Majesty's Opposition

ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবময়। সেখানে সরকারকে বলা হয় 'মহামান্য রানীর সরকার' বা 'মহামান্য রাজার সরকার' (Her Majesty's Government or His Majesty's Government) এবং বিরোধী দলকে বলা হয় 'মহামান্য রানীর বিরোধী দল' বা 'মহামান্য রাজার বিরোধী দল' ('Her Majesty's Opposition' or 'His Majesty's Opposition')। ১৯৩৭ সাল থেকে বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই বিরোধী দলকেও সরকারের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়। 'পার্লামেন্টের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ কমন্স সভার বিরোধী দল। পার্লামেন্টের কর্তব্য শাসন করা নয়, সমালোচনা করা' ("The most important part of Parliament is the opposition in the House of Commons. The function of Parliament is not to govern but to criticise")।

বিরোধী দলের কার্যাবলি
Functions of the Opposition Party

বিরোধীদলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

প্রথম, বিরোধী দল সরকারি দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে সর্বদা সজাগ রাখে। ব্রিটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠনের যেমন দায়িত্ব গ্রহণ করে, তেমনি বিরোধী দল সরকারি দলকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে।

দ্বিতীয়, বিরোধী দল সরকারি দলের একনায়কতন্ত্রের প্রতিরোধ করে। বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনা করে। জনকল্যাণকর প্রস্তাব দ্বারা এবং দুর্নীতি ও কুশাসনকে জনসমক্ষে তুলে ধরে সুষ্ঠু গণতন্ত্র কায়েম করতে প্রয়াসী হয়। বিরোধী দল সরকারি দলকে পর্যুদস্ত করার জন্যই শুধুমাত্র সরকারি নীতির বিরোধিতা করে না, বরং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে মহীয়ান করে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে।

তৃতীয়, বিরোধী দল স্বীয় দলের নীতি নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট তুলে ধরে ও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে সরকারি নীতির ত্রুটি প্রমাণ করে থাকে ও পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের পথকে সুগম করে। নির্বাচনে বিরোধী দল জয়লাভ করলে সরকার গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আধুনিককালে কোন সরকারের পতন পার্লামেন্টের আস্থা হারিয়ে হয় নি। ১৯৭৯ সালে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে। তখন শ্রমিক দল আস্থা ভোটে ব্যর্থ হয় এবং নির্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৮৮৫ সাল থেকে ব্রিটেনের কোন মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের আস্থা হারিয়ে পদত্যাগ করে নি। বরং বিরোধী দলের আক্রমণের মুখে পদত্যাগ করেছে। কেননা বর্তমানে দলের ঐক্যবন্ধন ও সংগঠন অত্যন্ত সুদৃঢ়।

চতুর্থ, কোন জটিল সমস্যা মোকাবেলার জন্য সরকারি দল বিরোধী দলের পরামর্শ গ্রহণ করে। ব্রিটেনে সাধারণত বিরোধী দলকে সাথে রেখেই বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা হয়। রাজকীয় প্রতিরক্ষা কমিটিতে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করা হয়। জাতীয় কল্যাণমূলক কর্মসূচীতে অনেক সময় বিরোধী দলের সহযোগিতা লাভ করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সুষ্ঠু রূপায়ণের মূলে আছে রানীর বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

পার্লামেন্টের স্পীকারও ব্রিটেনের এ ঐতিহ্য রক্ষা করে থাকেন। সরকারি দলের পতন ঘটানই বিরোধী দলের প্রধান লক্ষ্য নয়। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে স্পীকার তাঁর কাস্টিং বা নির্ণায়ক ভোট (casting vote) দ্বারা উইলসন মন্ত্রিসভাকে সুনিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন।

১। ব্রিটিশ কেবিনেটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। (Describe the salient features of the British Cabinet System.)

২। ইংল্যাণ্ড কেবিনেট ও মন্ত্রিসভার মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। সেখানে মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব বলতে কী বোঝ? (Explain the differences between the cabinet and ministry in England. What is meant by ministerial responsibility there?)

৩। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the position and powers of the British Prime Minister.) [N. U. 1999, 2002]

৪। 'ব্রিটিশ কেবিনেট গঠনে ও তার কার্য পরিচালনায়, এমনকী এর পতনের জন্যও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মূল ব্যক্তি'—আলোচনা কর। ('The British Prime Minister is central to the formation of the British Cabinet, central to its life and central to its death' —Discuss.)

৫। কীভাবে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার পতন হয়? (How is the ministry in Britain ousted?)

৬। যুক্তরাজ্য 'কেবিনেটের একনায়কত্ব' ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস' বলতে কী বোঝা যায়? (What is meant by the 'Decline of Parliament' and 'Cabinet Dictatorship' in the U.K?)

৭। রাজার তিনটি অধিকার রয়েছে— 'আলোচনা করার অধিকার, উৎসাহ দেবার অধিকার এবং সাবধান করে দেবার অধিকার'—এ অধিকারসমূহের অভ্যন্তরীণ মর্মকথা বর্ণনা কর। ("The King [in England] has three rights—'the right to be consulted, the right to warn and the right to encourage."—Discuss the implications of these rights) [N.U. 1997]।

৮। 'রাজার মৃত্যু হয়েছে ঃ রাজা দীর্ঘজীবী হোন।' 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না।' উল্লিখিত উপবচন গুলোর মর্মকথা বিশ্লেষণ কর। ('The king is dead : Long live the king." The king can do no wrong.' Bring out the implications of the above dictums.)

৯। আইনের অনুশাসন বলতে কী বোঝ? (What is meant by Rule of Law?)

১০। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় প্রথাসমূহ কী? এ প্রথাগুলোর মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর। (What are the conventions of the constitution in the British political system? Name three such conventions.) [N. U. 1987, 2000] [D.U. '84]

১১। যুক্তরাজ্যে সংবিধানের প্রথাগুলো কী কী? তাদের পশ্চাতে অনুমোদন কী? (What are the conventions of the constitution in the United Kingdom? What are the sanctions behind them?) [D. U. '84]

১২। ব্রিটেনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কী ? (What are the salient features of the British Constitution?) [N.U. 1996, 2005, 2007]

১৩। ব্রিটেনে সংবিধানের উৎসগুলো বর্ণনা কর। (Describe the sources of the British Constitution?) [N. U. 1988]

১৪। ব্রিটেনের রাজার ক্ষমতার বিবরণ দাও। "ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে রাজা একটি মস্তবড় শূন্য'— এ কথা কতটুকু সত্য? (Describe the powers of the British Crown. How far is it correct to state that the Monarch in the British Constitution is a magnificent cipher?)

১৫। 'আবেগই রাজতন্ত্রের অবস্থিতির একমাত্র কারণ নয়'।— ব্রিটেনের রাজতন্ত্র সম্পর্কে এ উক্তি ব্যাখ্যা কর। ('But sentiment is not the only thing that keeps monarchy on the saddle'. Discuss the statement with special reference to British Monarchy.)

১৬। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the committee system of the British Parliament.) [N. U. 2006]

১৭। ব্রিটেনের কমন্স সভার গঠন প্রণালী ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the composition and functions of the British House of Commons.) [N. U. 2000]

১৮। ব্রিটেনের লর্ড সভার গঠন ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। এটা সত্যই কী অপ্রয়োজনীয়? (Discuss the composition and functions of the House of Lords. Is it really unnecessary and unuseful?)

১৯। ব্রিটেনের সংসদীয় প্রাধান্যই সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যাখ্যা কর। (Parliamentary supremacy is the main characteristic of the Constitution. Discuss.)

২০। ব্রিটেনের বিচার ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? (What are the chief characteristics of the Judicial system in Great Britain?)

২১। ব্রিটেনের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ। (Write an essay on the local self-government system in Great Britain.)

২২। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের গুরুত্ব আলোচনা কর। (Discuss the importance of monarchy in the British political system.) [D.U. 1984]

২৩। ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের কারণগুলো কী কী? (What are the reasons for the successful working of the party system in Britain?)

২৪। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের সংগঠন সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the organizations of the political parties in Britain.)

২৫। ব্রিটেনের কমন্স সভার স্পীকার নির্বাচন, তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the powers, position and election of the Speaker of the British House of Commons.)

২৬। ব্রিটেনের রাজতন্ত্রের স্থিতির গরুত্ব ও যৌক্তিকতা বর্ণনা কর। (Describe the significance and justification of the continuance of the British Monarchy.) [N. U. 2003, 2006]

২৭। যুক্তরাজ্যের সংবিধানের প্রথাসমূহ কী? (What are conventions of the Constitution of the United Kingdom?)

২৮। ব্রিটেনের রাজার ক্ষমতা, কার্যাবলি ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the power, functions and position of the Crown in England.)

২৯। "ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয় নি, গড়ে উঠেছে।" উক্তিটি পর্যালোচনা কর। ("The British Constitution has not been made; it has grown". Examine the statement.)

[R.U. 1983; N.U. 1995, 2001, 2003]

৩০। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের গুরুত্ব আলোচনা কর। (Evaluate the importance of monarchy in the British political system.) [R.U. 1984]

৩১। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝ? ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতা গুলো আলোচনা কর। (What is meant by Parliamentary Sovereignty? Discuss the limitations in Parliamentary Sovereignty Great Britain.) [N.U. 1996, 1998, 2001]

৩২। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় প্রথাগুলো কী কী? সেখানে প্রথা কেন মান্য করা হয়? (What are the Conventions in the British political system? Why are they obeyed?) [N.U. 1997]

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা

২

THE CONSTITUTION OF U.S.A.

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান
The Constitution of the U.S.A.

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) ঐশ্বর্যে, সমৃদ্ধিতে, প্রতাপে ও বৈচিত্র্যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দুটি মহাযুদ্ধ যদিও পৃথিবীতে তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করেছিল এবং বিশেষ করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিধ্বস্ত করেছিল, তথাপি আমেরিকার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। বরং তা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বে এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

সূচনা
Introduction

দুইশত বছর পূর্বে কিন্তু আমেরিকার অবস্থা এরূপ ছিল না। আমেরিকা যখন ইতিহাসের আলোকে আসে এবং যখন থেকে তা স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব সভায় সম্মানের আসন গ্রহণের জন্য উদগ্রীব হয়, তখনও দেখা যায় আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ ঐক্য ও সংহতির অভাবে আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে ঔপনিবেশিকতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের *(Benjamin Franklin)* একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে উপনিবেশগুলো সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এক রূপক চিত্রের মাধ্যমে। তিনি একটি কাষ্ঠখণ্ডকে আটটি ভাগে বিভক্ত একটি বিষধর সর্পের চিত্র অঙ্কিত করে উপনিবেশগুলোর মধ্যে অনৈক্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ খণ্ড-ছিন্ন বহুধাবিভক্ত ও অনৈক্যের কেন্দ্র উপনিবেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং স্বাধীনতা মন্ত্রে সকলকে উজ্জীবিত করার জন্য দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে টমাস জেফারসন, জর্জ ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, প্যাট্রিক হেনরী, অ্যাডামস্, হ্যামিলটন প্রমুখের প্রয়াস অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ অতুলনীয় বাগ্মিতায়, কেউ ওজস্বিনী লেখনী ধারণে, কেউ বা অভূতপূর্ব বীরত্বের ব্যঞ্জনায়। তারা আমেরিকাবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার আগ্রহ এমনভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন যে, ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে তেরটি উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বছর খানেকের আলোচনার ফলে তাঁরা ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে এক রাষ্ট্র সমবায় (confederation) গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তা কার্যকর হয়। কিন্তু তা সফল হয় নি। তাই ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঐ সংবিধান কার্যে পরিণত হয়। বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হয়েছে ৫০টি।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of the Constitution of the U.S.A.

এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য।

(১) প্রজাতান্ত্রিক সরকার : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য—এর প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ও জনগণের সার্বভৌমিকতার চিরঞ্জীব অনুপ্রেরণা। সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট ভাষায় জনগণের সার্বভৌমত্ব বিঘোষিত হয়েছে। "ঐক্য, ন্যায়, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং আমাদের ও আমাদের বংশধরদের স্বাধীনতার আশীর্বাদের জন্য আমরা আমেরিকাবাসিগণ সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করেছি" ("We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America")। ফরাসী বিপ্লবকালীন শাসনতন্ত্রের পর জনগণের এমন জয়গান আর কোন সংবিধানে শোনা যায় নি।

(২) লিখিত সংবিধান : এ সংবিধান লিখিত। কিন্তু লিখিত বলে তা সম্পূর্ণরূপে প্রথা ও প্রচলিত রীতি-নীতি বর্জিত নয়। প্রেসিডেন্টের নির্বাচন বর্তমান কালে প্রথার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন দু বারের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না বলে যে নজির স্থাপন করেন, তাও অনেকটা আইনের মত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক তা ভঙ্গ হয়। অবশ্য পরে সে সম্বন্ধে আইন প্রণীত হয়ে গিয়েছে। আমেরিকার সংবিধানে প্রথার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আমেরিকার মন্ত্রিপরিষদ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তা কার্যকর রয়েছে, কিন্তু সংবিধানে এর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এ সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলো লিখিত।

(৩) ক্ষুদ্রতম সংবিধান : এ সংবিধান ক্ষুদ্রতম লিখিত সংবিধান। সংবিধানটি মাত্র সাতটি ধারায় ও আট হাজারের কম শব্দে রচিত হয়েছিল। শাসনব্যবস্থার মূল বক্তব্যগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এতে। যদি প্রথা ও রীতি-নীতি কার্যকর না হত, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব যদি না হত এবং সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার যদি শক্তিশালী না হত, তবে শাসনকার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠত। এ সংবিধান পাঠ করতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান : এ সংবিধানের প্রাধানতম বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দু প্রকার সরকার রয়েছে : (১) জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার, এবং (২) অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকার। সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিগুলো কার্যকর করতে সকল সমাধানের সন্ধান দিয়েছে। সংবিধানের প্রাধান্য, কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাধান্য প্রভৃতির দ্বারা এ ব্যবস্থা অপরিহার্য শর্তগুলো পালন করেছে।

(৫) ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ : এ সংবিধানের মূলমন্ত্র ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ (separation of powers)। সংবিধান রচয়িতাগণ চেয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের তিনটি অঙ্গ পরস্পরকে প্রতিরোধ করে ঠিক পথে থাকুক। তারা ভেবেছিলেন যে, এক হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হলে স্বাধীনতা লুপ্ত হবে। শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের হাতে অর্পণ করে, আইন প্রণয়নের জন্য কংগ্রেসকে ক্ষমতাবান করে এবং বিচার বিভাগকে উভয় শাখা থেকে স্বতন্ত্র রেখে ক্ষমতার পৃথকীকরণ সংগঠিত করেন। অন্যদিকে সিনেট কর্তৃক প্রেসিডেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিয়ে এবং সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসকে সংযত করে শাসনব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফলে

একদিকে যেমন ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Theory of separation of powers), অন্যদিকে তেমনি নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার নীতি (check and balance) আমেরিকার সংবিধানের এক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

(৬) মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ঃ সংবিধানে অধিকারের বিল সন্নিবেশিত হওয়ায় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে এবং এর যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে যে প্রথম দশটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা একত্রিত করে অধিকারের সনদ সৃষ্টি হয়। নাগরিকদের মিলিত হবার, আবেদন করার, অস্ত্র ধারণ করার, গতিবিধির স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ ও বাক-স্বাধীনতা, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণের অধিকার, জুরির সাহায্যে ফৌজদারী মামলার বিচার, যথাবিহিত আইনের পদ্ধতিতে বিচার পাবার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া, এ বিলে উল্লিখিত অধিকারগুলোর সীমারেখা চিহ্নিত করা হয় নি।

(৭) প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট শাসিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। দায়িত্বশীলতার পরিবর্তে এখানে তৎপরতা ও কার্যক্ষমতার উপরই জোর দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন। তিনি চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(৮) অ-নমনীয় ঃ এ সংবিধান নমনীয় নয়। এটি দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের সংশোধন করতে হলে বিশেষ পদ্ধতি ও নিয়ম-প্রণালী অনুসরণ করতে হয়। সাধারণ আইনের নিয়মে সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় না। এ অনমনীয়তার জন্য গত পৌণে দুইশত বছরে মাত্র ৩০টি সংশোধন সংযোজিত হয়েছে।

(৯) দ্বৈত নাগরিকতার স্বীকৃতি ঃ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বৈত নাগরিকতার প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিক প্রথমত নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যগুলোর নাগরিক এবং তারপর সামগ্রিকভাবে আমেরিকার নাগরিকরূপে পরিগণিত হয়। এ দ্বৈত নাগরিকত্ব এখানে উত্তম ভাবে সমন্বিত হয়েছে।

(১০) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এক গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যদিও এর ফলে শাসনব্যবস্থায় ক্রমশ বিচারকগণের প্রভাব অধিক পরিমাণে অনুভব করা হচ্ছে, তথাপি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সার্থকতার জন্য বিচার বিভাগের প্রাধান্য একান্ত প্রয়োজন এবং তা স্বীকার করা হয়েছে। কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সুপ্রীম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে থাকে। বিচার বিভাগের এ ক্ষমতার জন্য বিচার বিভাগকে 'সংবিধানের অভিভাবক' ('guardian of constitution') বলা হয়।

(১১) সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা (Constitutional Limitations)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও সরকারের কোন অংশের অহেতুক প্রাধান্য রোধ করার জন্য এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সংযোজিত হয়। এমন কতকগুলো কার্য আছে যা জাতীয় সরকার করতে পারে না। আবার কতকগুলো কাজ রয়েছে যা জাতীয় সরকার করতে পারে, কোন অঙ্গরাজ্যের সরকার করতে পারে না। কাগজী মুদ্রা জারি করার ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে শুধুমাত্র জাতীয় সরকারের উপর। অন্যদিকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের খেতাব মঞ্জুর করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা বহির্ভূত।

(১২) সমঝোতা নীতি ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সমঝোতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান পণয়নের সময় একদিকে যেমন ছিল বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ঈর্ষা, অন্যদিকে তেমনি ছিল অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ঈর্ষা। কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যার ভিত্তিতে ও নিম্নপরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তা ছিল সমঝোতার ফলস্বরূপ।

আমেরিকার সংবিধানের উৎসসমূহ
Sources of the Constitution of the U.S.A.

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি। এ সংবিধান বিশেষ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। তবে সময়ের সাথে তাল মিলাতে, যুগের সাথে খাপ খাওয়াতে ও জনগণের দাবির প্রয়োজনে তা পরিবর্তিত হয়ে মৌলিক সংবিধান থেকে অনেকাংশে পৃথক হয়ে পড়েছে। নিচে তার উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথম, মৌলিক দলিল এর ভিত্তিমূল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ফিলাডেলফিয়াতে রাষ্ট্র সমবায়ের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করার জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সংবিধানের মৌলিক ধারাগুলো দলিল হিসেবে লিখিত হয়। সেগুলোই আমেরিকার শাসনতন্ত্রের মৌলিক ধারা।

দ্বিতীয়, সাধারণ আইন (statutes) এ সংবিধানকে সময়ের সাথে তাল মিলাতে সাহায্য করেছে। গত দুইশত বছরের মধ্যে এ সমস্ত সাধারণ আইনের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্ধিত হয়েছে বিপুলভাবে। প্রকৃতপক্ষে কেবল প্রাচীন ও মৌলিক দলিল পাঠ করে আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করতে পারি না। রাজনীতির ছাত্র হিসেবে যতটুকু জানা প্রয়োজন তার জন্য এটা যথেষ্ট নয়। কংগ্রেসে সদস্যগণের মনোনয়ন দান, নির্বাচকমণ্ডলীর যোগ্যতা সম্বন্ধীয় বিধি-বিধান, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের অপসারণ, পদত্যাগের পর সে পদে সমাসীনের নিয়ম-কানুন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি বিচারালয়গুলোর সংগঠন সাধারণ আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অধ্যাপক উইলসন সত্যই বলেছেন "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রাণশক্তির মত। শাসনব্যবস্থা মৌলিক নীতি থেকে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন নীতির সংযোজনের ফলে বিপুলায়তন হয়ে উঠেছে" ("The Constitution of the U.S.A. is only a sapcentre of the system. Government is vastly larger than the stock from which it has branched.")।

তৃতীয়, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা সংবিধান অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ফলে সুপ্রীম কোর্ট এমন অনেক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে, যা মৌলিক দলিলে ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সংবিধানে উক্ত হয়েছে, কংগ্রেস ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবে (Congress shall regulate commerce)। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, commerce বলতে কী কী বোঝা যাবে। সুপ্রীম কোর্ট তার ব্যাখ্যা যা করেছে তার ভিত্তিতে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন কোম্পানি, বিমান চলাচল প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। তাই বলা হয় যে, প্রতি সোমবারে সুপ্রীম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ফলে সংবিধানে পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ঠিকই থাকে, শুধু নতুন সমস্যা মোকাবেলার জন্য তা পরিবর্ধিত হয়।

চতুর্থ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংবিধানকে সংশোধন করা হয়েছে। বিগত দুই শত বছরে ৩০ বার সংশোধন হয়ে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সমস্ত পরিবর্তনের ফলে আসল সংবিধানে অনেক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এর সংশোধন পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে জটিল ও দুরূহ হলেও একান্তভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। অনেকের মতে, আমেরিকার সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধান অপেক্ষা অধিক অনমনীয় নয়, কেননা শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কোন আইন প্রণয়ন করতে হলে ব্রিটেনে অন্ততপক্ষে বিশ কী পঁচিশ বছরের আন্দোলন প্রয়োজন হয়। অধ্যাপক লাস্কিরও তাই অভিমত। তবে এ সংবিধান নমনীয় নয়। প্রায় দুই শত বছরে ৩০ বার সংশোধন এর প্রমাণ।

পঞ্চম, প্রাচীন রীতি-নীতি, প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য আমেরিকার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংগঠনে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর পরিবর্তনে, পরিবর্ধনে ও সংশোধনে প্রাচীন রীতি-নীতির অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। তই বলা হয়, "আমেরিকার লিখিত সংবিধানের উপর ভিত্তি করে পিরামিডের ন্যায় রাশি রাশি রীতি-নীতি ও প্রথা গড়ে উঠেছে, যাদের মূল শুধুমাত্র অভ্যাসের মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং আইন বা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষা রাখে না।" ("Like a pyramid reared upon the written consititution, there has been built up in America a body of political customs and usages which have their bases neither on laws nor in judicial decisions but are merely the result of long continued habit")। অধ্যাপক মান্রো *(Munro)* বলেছেন, এ সকল প্রচুর পরিমাণে অলিখিত সংবিধানের সুফল দান করেছে। প্রেসিডেণ্টের নির্বাচন এরূপ রীতি-নীতি ভিত্তিক। তখন সংবিধান প্রণেতাগণ চেয়েছিলেন প্রেসিডেণ্টের নির্বাচন পরোক্ষভাবে হোক। কিন্তু বর্তমানকালে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠায় প্রেসিডেণ্টের নির্বাচন আসলে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রচলিত প্রথানুসারে কংগ্রেসের কোন কক্ষে বক্তৃতা দান করতে পারেন না বা উপস্থিত থাকতে পারেন না। সিনেটের অনুমোদনক্রমে প্রেসিডেণ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ দান করেন। অধ্যাপক হলওয়েল *(Halwell)* তাই বলেন, "এসব প্রথা ও রীতি-নীতিসমূহ যা দিনে দিনে গড়ে উঠেছে, তা সরকার ও শাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করতে সাহায্য করেছে এবং সংবিধানানুযায়ী তা যতটুকু গণতান্ত্রিক হতে পারত তা অপেক্ষা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়েছে" ("The general tendency of the body of usages that has grown up has been in the direction of a greater and more direct popular control of the government to make the American political system more democatic than it was in the beginning")।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি
Federal System

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথম, সংবিধানের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution)।

দ্বিতীয়, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সুষম ক্ষমতা বণ্টন (Equitable distribution of powers)।

তৃতীয়, বিচার বিভাগের প্রাধান্য (Supremacy of Judiciary)।

চতুর্থ, সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা (rigidity of the constitution)। সংবিধানের মাধ্যমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো রচিত হয়। তাই এর স্থায়িত্বের জন্য শাসনতন্ত্রকে দুষ্পরিবর্তনীয় করা হয়। ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রেও নতুন নীতি অনুসৃত হয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দান করে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) অঙ্গরাজ্যগুলোর হস্তে ন্যস্ত করা হয়।

পঞ্চম, আইন বিভাগ বা কংগ্রেস দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পরিষদ। উচ্চ পরিষদ সেনেট প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১০০ জন এবং অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ৫০। কিন্তু প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত।

ষষ্ঠ, সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকার শাসনতন্ত্রের অভিভাবক এবং ব্যাখ্যাদানকারী। শাসনতন্ত্রের ধারা বহির্ভূত যে কোন আইনকে বিচার বিভাগ অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। বিচার বিভাগ প্রত্যেক সরকারকে স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে সাহায্য করে।

সপ্তম, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অবশ্য সাম্প্রতিককালে এককেন্দ্রিক প্রবণতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তা ছাড়াও নিচে বর্ণিত কারণে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর পরিমাণে ঃ

(এক) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক আনুগত্য হ্রাস পেয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে।

(দুই) রাষ্ট্রে সমাজকল্যাণমূলক কাজের পরিমাণ ও পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। ফলে কেন্দ্রের ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছে।

(তিন) পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকা আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

(চার) যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতিও কেন্দ্রকে অধিক শক্তিশালী করেছে।

আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি
Checks and Balances

যদিও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, তথাপি সেখানে শাসনকার্যের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় বিধানের জন্য এবং শাসন বিভাগকে সংযত করার জন্য **'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি'** (checks and balances) প্রবর্তিত হয়। নিচে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ হলো ঃ

প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসের দায়িত্ব আইন প্রণয়ন। কিন্তু আইন প্রণয়নেই কংগ্রেসের কার্য সীমাবদ্ধ নয়। কংগ্রেসকে কতকগুলো বিচার সংক্রান্ত কার্যও করতে হয়, যেমন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা, শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিশংসন পরিচালনা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক কমিশন, কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিশন প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থার কার্যাবলিও কংগ্রেস তদারক করে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় কক্ষ সিনেট প্রেসিডেন্টের নিয়োগের অনুমোদন দান করে থাকে। প্রেসিডেন্ট কোন রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি স্থাপন করলে তাও সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।

প্রেসিডেন্ট মূলত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দায়ী। কিন্তু তথাপি আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি সামান্য নয়। তিনি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তিনি 'নাকচ করার ক্ষমতা' (veto power) প্রয়োগ করে আইনকে বাতিলও করতে পারেন। কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব অপ্রতিহত হয়ে উঠতে পারে।

সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগের মধ্যমণি। কিন্তু তা শুধুমাত্র বিচার কার্যই সম্পন্ন করে না। বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান করে থাকে। বিচার বিভাগ আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর কার্যাবলি পর্যালোচনা করে থাকে এবং শাসনতন্ত্রের বিধি বহির্ভূত ধারাগুলোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এভাবে বিচার বিভাগ আমেরিকায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করে।

সুতরাং আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির' প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট
The President of USA

প্রেসিডেন্ট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত সকল কর্তৃত্ব তাঁরই হস্তে ন্যস্ত হয়েছে। রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ। তাঁর নামে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত। তাঁর কার্যকাল চার বছর। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সম্পর্কে অতীতে মতানৈক্য ছিল। হ্যামিলটনের *(Hamilton)* মত কেউ কেউ রাষ্ট্রপতির যাবজ্জীবনের কার্যকাল সমর্থন করতেন। কেউ কেউ দুই থেকে বার বছরের কার্যকালের কথাও বলেছিলেন। অনেক আলোচনার পর অবশ্য কার্যকাল স্থির হয় সাত বছর এবং শেষে হয় চার বছর।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। (ক) প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর বয়স অন্যূন ৩৫ বছর হতে হবে। (খ) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পূর্বে তাঁকে চৌদ্দ বছর কাল আমেরিকায় বাস করতে হবে। (গ) তাছাড়া, তাঁকে জন্মসূত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। আমেরিকার জন্মসূত্রে বা জন্মস্থান সূত্রে যারা নাগরিক নন, তাঁরা এ পদ অলংকৃত করতে অসমর্থ। দ্বাবিংশ সংশোধনী অনুসারে কেউ তৃতীয় বারের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না।

প্রেসিডেন্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর স্ত্রীকে যথাবিহিত সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয় এবং তাঁকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রথম' মহিলা' (First Lady) বলা হয়। প্রেসিডেন্ট বাৎসরিক দুই লক্ষ ডলার পারিশ্রমিক পান এবং সরকারি বাসভবন 'হোয়াইট হাউসে' (White House) অবস্থান করেন। ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ ও তার অন্যান্য খরচের জন্য আরো ৫০ হাজার ডলার বাৎসরিক বরাদ্দ থাকে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের মাহিনা ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্বাচিত হবার পর প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ করতে হয়। প্রেসিডেন্টের কার্য তিনি বিশ্বস্ত ভাবেই পালন করবেন এবং সেখানকার সংবিধানকে যথাযোগ্য সংরক্ষণ করবেন—এ মর্মে তাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয় ('To preserve, protect and defend the Constitution of the United States')। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

প্রেসিডেন্টের নির্বাচন
Presidential Election

সংবিধানের রচিয়তাগণ জনসাধারণের বিদ্যাবুদ্ধি ও সুবিবেচনার উপর আস্থাশীল ছিলেন না। তাছাড়া, তাঁরা চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের সাথে দলীয় প্রথার কোন সম্বন্ধ যেন না থাকে। তাই প্রেসিডেন্টের নির্বাচন প্রত্যক্ষ করা হয় নি। আইন পরিষদ কর্তৃকও তা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা ছিল না। প্রেসিডেন্ট পরোক্ষভাবে এক নির্বাচন সংস্থার (electoral college) দ্বারা নির্বাচিত হবেন—তা স্থির করা হয়। এ নির্বাচক সংস্থা এমনভাবে গঠিত হয় যে, অঙ্গরাজ্য থেকে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে যত সদস্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে ঠিক তত জন সদস্যের দ্বারা তা গঠিত। অন্য কথায়, নির্বাচন সংস্থার সদস্য সংখ্যা কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার সমান। শুধু ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে দুজন অতিরিক্ত সদস্য নির্বাচন সংস্থায় যোগদান করেন। সুতরাং দেখা যায়, নির্বাচন সংস্থার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১০০ + ৪৩৫ + ২ = ৫৩৭ জন। প্রতি চার বছর পর নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্ব হতে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। এই নির্বাচনী প্রচারকে **"পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক লড়াই"** বলে গণ্য করা হয়। জানুয়ারি মাসের ছয় তারিখে কংগ্রেসের উভয় পরিষদ মিলিত হয়ে ভোট গণনার কার্য শুরু করে এবং যদি কোন প্রার্থী নির্বাচন সংস্থার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভে সমর্থ হন, তা হলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। ভাইস প্রেসিডেন্টও অনুরূপ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন এবং চার বছরের জন্য ঐ পদে সমাসীন থাকেন। ২০শে জানুয়ারি তিনি শপথ গ্রহণ করে স্বপদে অধিষ্ঠিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন কিন্তু দলীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিবর্তনের ফলে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শুধু আমেরিকা কেন, সমগ্র বিশ্বে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ নির্বাচনে হোয়াইট হাউসে বসবাসকারী প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের নগণ্য ব্যক্তি পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হন এবং এই আলোড়নে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট চার বছরের জন্য ক্ষমতাসীন হন। এ চার বছরের পূর্বে তাঁকে আইনত অপসারণ করা সম্ভবপর নয়। তবে যদি তিনি দেশদ্রোহিতা, সংবিধান বিরোধী ক্রিয়াকলাপ ও অন্যায় আচরণের জন্য প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অভিযুক্ত হন তা হলে সিনেটের বিচারে তাঁকে অপসারণ করা যেতে পারে। এ অপসারণ পদ্ধতিতে প্রতিনিধি সভা প্রথমত প্রস্তাব পেশ করবেন এবং সিনেট তাঁর বিচারকার্য সম্পাদন করেন। সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রেসিডেন্ট অভিযুক্ত হলে তিনি অপসারিত (impeached) হবেন। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সিনেট যখন অভিশংসনের বিল আলোচনা করেন তখন সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি সেক্রেটারী অব দি স্টেটস্‌কে বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Activities of the President

অধ্যাপক স্ট্রং (Strong) বলেন, "বর্তমানকালে পৃথিবীতে কোন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তা দেখা যায় না" ("In no other constitutional state in the world today does there exist an officer with such vast powers as those of the President of the American Union")। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক সীমারেখার এক অপরূপ

ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বিশ্বজনের নিকট পরিচিত। তিনি আপন মহিমায় মহিমান্বিত ও আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নলিখিত চার পর্যায়ে আলোচনা করাই শ্রেয় ঃ **(১) তাঁর শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ও কার্যাবলি, (২) তাঁর আইন প্রণয়ন বিষয়ক কার্যাবলি ও প্রভাব, (৩) তাঁর বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি ও (৪) বিবিধ।**

(১) তাঁর শাসন বিষয়ক ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Constitutional Powers and Activities of the President) ঃ সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট শাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের হাতে শাসন বিভাগীয় সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে" ("The executive power shall be vested in the President of the United States")। তাই কংগ্রেস প্রণীত আইনগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য। এ্যাটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে তিনি আইনসমূহকে কার্যকর করতে প্রয়াস পান। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধান ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ, রাষ্ট্রদূত সমূহ, বিভাগীয় মন্ত্রিগণ ও অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কর্মকর্তা নিয়োগ তাঁকেই করতে হয়। এই সকল নিয়োগের ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টকে সিনেটের পরামর্শ ও অনুমোদন লাভ করতে হয়। তবে সিনেটের সৌজন্যমূলক আচরণ ও ব্যবস্থার ফলে (senatorial courtesy) প্রেসিডেণ্টের মনোনয়নে সিনেট সাধারণ আপত্তি জানায় না এবং প্রেসিডেণ্ট যে অংগরাজ্য থেকে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন, সেখানকার সিনেটরদের পরামর্শ গ্রহণ করে সৌজন্য প্রকাশ করেন। সিনেটের সৌজন্যমূলক আচরণ (senatorial courtesy) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যে অংগরাজ্যের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন শুধুমাত্র সে অংগরাজ্যের সিনেটরদের সাথে পরামর্শ করেন ও তাদের অনুমোদন লাভ করেন। অন্যথায় রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন হয় সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট। সিনেটের অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে নিজ ক্ষমতাবলে প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে পারেন। তাকে অবকাশকালীন নিয়োগ ব্যবস্থা (recess appointment) বলা হয়।

সিনেটের অধিবেশন শুরু হলে তার জন্য অনুমোদন লাভ করা হয়। তবে সিনেটের বিনা অনুমতিতে বা পরামর্শ ব্যতীত প্রেসিডেণ্ট যে কোন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করতে পারেন। অবশ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বোর্ডের সদস্য ও অন্যান্য বেসামরিক কর্মচারী ও সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণকে তিনি সরাসরি পদচ্যুত করতে সক্ষম নন। প্রেসিডেণ্ট সমগ্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছে যে, "প্রেসিডেণ্ট হবেন যুক্তরাষ্ট্রের ও অন্যান্য অংগরাজ্যের সৈন্য বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান পরিচালক" ("The President shall be the Commander-in-Chief of the Army and Navy of the United States and the militia of several states")। সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি নৌ-বাহিনী ও স্থলবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করতে পারেন এবং যুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম। যুদ্ধের পর তিনি তাঁদের পদচ্যুত করতে পারেন। যুদ্ধের সময় বিজিত এলাকায় তিনি একনায়কের ন্যায় শাসন পরিচালনা করতে পারেন। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। তিনি বিদেশের রাষ্ট্রদূতগণকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দূতগণকে বিদেশে প্রেরণ করেন। তিনি ইচ্ছামত যে কোন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে বা সন্ধি স্থাপন করতে পারবেন। চুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন লাভ করতে হবে। অবশ্য সিনেট যে সব সময় এ সকল সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদন করে তা নয়। ১৯১৯ সালে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) সম্পর্কিত চুক্তি সিনেট অনুমোদন করে নি। ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য হয় নি। সবগুলো মিলিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ন্যায় অন্য কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানকে এত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নি।

(২) প্রেসিডেন্টের আইন বিষয়ক ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Legislative Powers and Activities) ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে এবং প্রেসিডেণ্টকে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার ফলে তাঁর আইন বিষয়ক ক্ষমতা স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকারই কথা। তিনি কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হন না। কংগ্রেসকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করতে পারেন না। স্বীয় উদ্যোগে কোন বিল উত্থাপন করার ক্ষমতাও তাঁর নেই অথবা কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করতে তিনি সক্ষম নন। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় তিনি আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে বা আইন সভা ভেঙ্গে দিতেও অসমর্থ। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাবে, তাঁর আইন বিষয়ক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু বস্তুত আইন তৈরির ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রচুর।

প্রথম, প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন এবং আইন প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

দ্বিতীয়, তিনি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করতে পারেন অথবা বাণী পাঠ করতে পারেন। সুযোগ্য প্রেসিডেণ্টগণ, যেমন—জর্জ ওয়াশিংটন, অ্যাডাম্‌স, জেফারসন, উইলসন বাণী পাঠ করে এবং বাণী প্রেরণ করে কংগ্রেসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতেন। রুজভেল্ট এমন সুবক্তা ছিলেন যে, তার বাণী শুনে কংগ্রেস প্রায়ই তার মতে সায় দিত। তার বাণীতে তিনি সরকারি নীতির বিষয় ও যে সকল আইন দেশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি মন্‌রো (Monroe) কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করে যে বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন তাই মন্‌রো তত্ত্ব (Monroe Doctrine) নামে পরিচিত। কংগ্রেস এতে বড় কম প্রভাবিত হয় না।

তৃতীয়, তিনি তাঁর দলের অনুগত সদস্যগণের সাহায্যে নতুন আইন প্রণয়ন করার জন্য নতুন কোন প্রস্তাব পেশ করাতে পারেন। রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু সংগঠনের ফলে এবং এর সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রেসিডেণ্টের পেছনে তার দলের সমর্থন বর্তমান থাকে। কংগ্রেসে তারা প্রেসিডেণ্টের মত ও নীতি অনুসরণ করে তার ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেন। সুতরাং বর্তমানে প্রেসিডেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই এ কথা বলা "তত্ত্বকথা বলারই সামিল, সত্য কথা বলা নয়" ("To talk of philosophy, not of facts")।

চতুর্থ, তিনি পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও উপদলকে বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা দান করে তাদের সমর্থন আদায় করতে পারেন।

পঞ্চম, কোন বিলকে নাকচ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রেসিডেণ্ট আইন তৈরির ব্যাপারে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে বা সরাসরিভাবে ভেটো প্রয়োগ করে অনেক বিলকে খতম করতে পারেন। যদিও তাঁর নাকচ করার ক্ষমতা বা ভেটোদান ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তা কংগ্রেস পুনর্বার পাস করাতে সমর্থ, তথাপি কার্যত তা অত সহজ নয়। এ ভেটো প্রয়োগ করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একাই ৬৩১টি বিল নাকচ করেছেন। ১৭৮৯ হতে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট প্রায় ১০০০ বার ভেটো প্রয়োগ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলগুলোর মৃত্যু ঘটে। শুধু ৪৬ বার ভেটো অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস পুনরায় বিল পাস করে। সুতরাং প্রেসিডেণ্টের ভেটোর ভয়ে কংগ্রেসও সহসা তাঁর মতামতকে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয় না।

ষষ্ঠ, প্রেসিডেন্ট জনগণের নিকট রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে বক্তৃতা করে আইন তৈরির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন। কংগ্রেসের মাথার উপর দিয়ে জনমত সংগঠন করে প্রেসিডেন্ট উইলসন এভাবে বহু নীতি প্রণয়ন করেন এবং আইন প্রণয়ন ক্ষেত্র রচনা করেন। কংগ্রেসও তাই অনেকখানি প্রেসিডেন্টের মতামতের উপর নির্ভরশীল।

সপ্তম, প্রেসিডেন্ট শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে কতকগুলো আদেশ (executive orders) জারি করতে পারেন। কংগ্রেসও অর্পিত আইনের (delegated legislation) মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে এবং অন্যান্য শাসনবিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দকে আইনের অনুসরণ করে নিয়ম-কানুন তৈরি করার অধিকার দিয়ে থাকেন। সুতরাং আইনের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব অসামান্য। তাই জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, আমরা প্রেসিডেন্টকে আইন প্রণয়নের নেতা হিসেবে নির্বাচন করি। কংগ্রেসের সাহায্যে কোন্ আইন তিনি পাস করাতে পারলেন এবং কোন্ আইন পাস করা থেকে কংগ্রেসকে নিবৃত্ত করলেন, তা থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নীতি গ্রহণের দক্ষতা সম্বন্ধে জানা যায়।

অষ্টম, প্রেসিডেন্ট কোন আইনের প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কংগ্রেসের সদস্যগণের সাথে বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারেন। এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত হয়েছে।

নবম, প্রেসিডেন্ট তাঁর আইনের প্রস্তাবকে কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য করার জন্য আগামী নির্বাচনে তাদের প্রতি সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে অথবা বিরোধিতা ও হুমকির মাধ্যমেও তাদের প্রভাবিত করতে পারেন।

দশম, প্রেসিডেন্ট তার দলের নেতাও বটে। তিনি তাঁর দলীয় নেতাদের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন।

ফলে যদি প্রেসিডেন্ট কোন আইন প্রণয়ন করতে চান তা হলে হাজারো পন্থায় তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম।

(৩) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ বা আইন অবমাননার দায় থেকে তিনি অভিযুক্তদের মুক্তি দিতে পারেন। অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় প্রেসিডেন্ট যে কোন দণ্ড মার্জনা করতে, স্থগিত রাখতে বা দণ্ড হ্রাস করার ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। তবে অপসারণের ক্ষেত্রে (Impeachment) তিনি কিছুই করতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে তিনি নিয়োগ করেন এবং আইনের ব্যাখ্যায় তিনি বিচারপতিগণ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। বিয়ার্ড (Beard) বলেন, 'প্রথম দিকে ওয়াশিংটনের সংবিধান ব্যাখ্যা, লিঙ্কনের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, থিওডোর রুজভেল্টের সাদাসিধে মতামত এবং ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের তীক্ষ্ণধী সংবিধানের পরিবর্তনে যতটুকু সাহায্যে করেছে, বিচারপতিগণের মতামতগুলো সামগ্রিকভাবে ধরলেও তার সাথে তুলনীয় হয় না"।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রদর্শনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। জেফারসন (Jefferson) ১৭৮৯ সালের রাজদ্রোহ আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন। রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন (Washington) নয় জন অপরাধীকে ক্ষমা করেন। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রপতি ট্রুমান (Truman) ও ফোর্ড (Ford) অনেক সামরিক কর্মকর্তাদের ক্ষমা করেন।

(৪) বিবিধ (Miscellaneous) ঃ (এক) বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি পরিচালনা করার মহান দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যস্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট আমেরিকার সরকারি মুখপাত্র। তিনি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন এবং অপর রাষ্ট্র থেকে আগত রাষ্ট্রদূতগণকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি গোপন

কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদনও করতে পারেন।

(দুই) প্রেসিডেন্ট প্রশাসনিক প্রত্যেক বিভাগের প্রধানদিগকে ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তারা সকলে তা নির্বিচারে মানতে বাধ্য। সংবিধানের ধারাসমূহ, আইন-কানুন ও সন্ধির শর্তাবলি ও বিচারালয়ের আদেশ প্রতিপালিত হচ্ছে কীনা, তা দেখাও তাঁর কর্তব্য এবং অধিকার।

(তিন) তাছাড়া, তিনি কেবিনেটের প্রভু। কেবিনেটের সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁর নিকট দায়ী থাকেন। ব্রিটেনের কেবিনেটের মত মন্ত্রিরা রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নন। এখানে মন্ত্রিগণ প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা ও অনেকটা আজ্ঞাবহ।

(চার) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাও অত্যন্ত ব্যাপক। বাজেট সম্পর্কে নীতি-নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট সংস্থা না থাকায় রাষ্ট্রপতির অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২১ সালের বাজেট ও হিসাব রক্ষণ আইন (Budget and Accounting Act) বাজেট পরিচালকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির হাতকে সুদৃঢ় করেছে। এ ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতির প্রতি কংগ্রেসের নিকট আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট পেশ করেন।

(পাঁচ) যুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমা থাকে না। শান্তিকালে কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্ট কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করতে সমর্থ হলেও যুদ্ধকালে তিনি হন অবাধ ও অসীম শক্তিধর। তিনি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। তাই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তিনি "হেবিয়াস করপাস" আইন অনুসারে নাগরিকগণের অধিকার সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে পারেন। গৃহযুদ্ধের সময় লিঙ্কনের ক্ষমতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উইলসনের প্রভাব ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে রুজভেল্টের প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। প্রেসিডেন্ট একাধারে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, আনুষ্ঠানিক প্রধান, দলের নায়ক, শাসন বিভাগের মধ্যমণি, সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেন, "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা অপেক্ষা প্রভাবশালী, কোন ক্ষেত্রে প্রভাবহীন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা ক্ষমতাশালী, কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন। অত্যন্ত সাবধানে এ পদটির পর্যালোচনা করলে তার অন্যান্য দিকগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে" ("The President of the United States is more and less than a king; he is also both more and less than a prime minister. The more carefully his office is studied, the more does its unique character appear.")।

প্রেসিডেন্টের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণসমূহ
The Causes of Increase of the President's Powers

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বর্তমানে সেখানকার অদ্বিতীয় জন নায়করূপে পরিগণিত, যদিও সংবিধান অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাঁরই নির্দেশে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তাঁরই নির্দেশে এবং নেতৃত্বে কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত হয়। সুপ্রীম কোর্টেও তার প্রভাব অপ্রতিহত। সুতরাং তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কারণ অন্বেষণ করা অনেকেই প্রয়োজনীয় মনে করেন।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রথম এবং প্রধান কারণ দলীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠু সংগঠন ও ব্যাপকতা। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্র হলেও দলীয় ব্যবস্থা তিনটি বিভাগকে একত্রিত করেছে এবং প্রেসিডেন্ট শাসন বিভাগ ও কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, সরকারের কার্যাবলির এত প্রসার হয়েছে যে, কংগ্রেস তার সর্বদিকে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হয় না। তা ছাড়া প্রশাসনিক ব্যাপারসমূহে এত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যে, কংগ্রেসের পক্ষে তার মর্মভেদ করাও সহজ নয়। এসব অনেকটা বিশেষজ্ঞগণের কাজে পরিণত হয়েছে। তাই কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করার সময় আইনকে প্রয়োগ করতে ও কার্যকর করতে যে সকল বিধি-বিধান প্রয়োজন তা প্রণয়ন করতে প্রেসিডেন্টকে ভার দিয়ে থাকেন। ফলে ব্রিটেনে যেমন অর্পিত আইন (delegated legislation) কেবিনেটের হাত শক্ত করেছে এখানে তা প্রেসিডেন্টকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলছে।

তৃতীয়ত, শাসন বিভাগের ব্যাপকতার ফলে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দান করে এবং বিভিন্নভাবে বহুজনকে কর্মস্থান দান করে নিজের ক্ষমতা ও প্রভাবকে বাড়াতে পেরেছেন।

চতুর্থত, রেডিও ও টেলিভিশনের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট প্রত্যক্ষভাবে জনমতকে প্রভাবিত করতে পারেন। ফলে সুপ্রীম কোর্ট বা কংগ্রেস কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহসী হয় না। তিনি একজন জাতীয় নেতায় (national leader) রূপান্তরিত হয়েছেন।

পঞ্চমত, যুদ্ধ ও পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা প্রেসিডেন্টের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে কেননা তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধকালে প্রেসিডেন্টই চূড়ান্ত দায়িত্বের অধিকারী। যুদ্ধকালে অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে প্রেসিডেন্টই সক্ষম।

ষষ্ঠত, বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার যে মর্যাদা এ কারণেও প্রেসিডেন্টের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে প্রচুর পরিমাণে। ন্যাটোর (NATO) মত সামরিক জোট ও অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্র প্রতিরক্ষার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্র নীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও শান্তির জন্য মূলত দায়ী, তাই তাঁর বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষে, বিশ্বের জটিল পরিস্থিতি তথা বিশ্বে আমেরিকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থার জন্যও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণে।

প্রেসিডেন্টের কেবিনেট

The Cabinet of President

প্রশাসনিক দশটি বিভাগের প্রধানদের সমন্বয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর কেবিনেট গঠন করেন। আমেরিকার শাসন পদ্ধতিতে যদিও কেবিনেট শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তথাপি তা ব্রিটেনের কেবিনেট থেকে স্বতন্ত্র। এ্যাটর্নি জেনারেল ও পোস্ট-মাস্টার জেনারেল ব্যতীত আর সকলের উপাধি সেক্রেটারী। জর্জ ওয়াশিংটনের কেবিনেটের সদস্য সংখ্যা ছিল চার। পরে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এর সদস্য সংখ্যা হয় দশ জন। প্রত্যেক বিভাগের কয়েকজন করে সহকারি সেক্রেটারী (Assistant Secretary) ও অধীনস্থ সেক্রেটারী (Under Secretary) থাকেন। তারা কেউ বিভাগীয় কার্যে বিশেষজ্ঞ নন। প্রত্যেকেই রাজনৈতিক ব্যক্তি। তাঁরা কেউ কংগ্রেসের সদস্য নন অথবা এর কার্যক্রম নির্ধারণেও সক্ষম নন।

আমেরিকার কেবিনেটকে 'প্রেসিডেন্টের পরিবার' বলে আখ্যায়িত করা হয়, ('The cabinet in America has been called the 'President's family')। তাঁরা সকলেই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং প্রেসিডেন্টের নিকট দায়ী থাকেন। তাই বলা হয়েছে, "কেবিনেট প্রেসিডেন্টের ইচ্ছারই সৃষ্টি। কেবিনেট একটি সংবিধান-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান। প্রথার উপর ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠেছে" ("The

cabinet is a mere creation of the President's will. It is an extra-statutory and extra-constitutional body. It exists only by custom")। কেবিনেটের অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেবিনেটের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে। কেবিনেট সভায় সাধারণত ভোট গ্রহণ করা হয় না। হলেও প্রেসিডেন্ট তা গ্রাহ্যের মধ্যে নাও আনতে পারেন।

কেবিনেটের সদস্যগণ সাপ্তাহিক সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপদেশ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করতে পারেন। কেবিনেটের সকল সদস্য রাষ্ট্রপতির আদেশ কার্যকর করেন। কেউ রাষ্ট্রপতির সাথে একমত না হলে তাকে পদত্যাগ করতে হয়। কেবিনেট সভায় যা আলোচিত হয় রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে তা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয় না।

কংগ্রেস
Congress

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার নাম কংগ্রেস। দুটি কক্ষের সমন্বয়ে কংগ্রেস গঠিত হয়েছে। প্রথম কক্ষের নাম হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) এবং দ্বিতীয় কক্ষের নাম সিনেট (Senate)। সংবিধান মোতাবেক কংগ্রেস আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সংবিধানে বলা হয়েছে, "যুক্তরাষ্ট্রের সকল আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কংগ্রেসের হস্তে অর্পিত হয়েছে" ("All legislative powers herein granted shall be vested in the Congress of the United States")। দুই কক্ষের সদস্যবৃন্দ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নভেম্বর মাসে প্রথম সোমবারের পর প্রথম মঙ্গলবারে নির্বাচিত হন। ৩ জানুয়ারি থেকে প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। কংগ্রেসে সকল সদস্যকে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে এবং আপন কার্য বিশ্বস্তভাবে পরিচালনার জন্য শপথ গ্রহণ করতে হয়। কংগ্রেসের সদস্যগণ অনেকগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। বিশ্বাসঘাতকতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত গুরুতর অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য কার্যের জন্য কংগ্রেস সদস্যগণকে অধিবেশন চলাকালে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। পরিষদে বক্তৃতা করার জন্য সদস্যগণের কোনরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না।

হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স বা প্রতিনিধি পরিষদ
House of Representatives

দুই বছরের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন হয়। প্রতি সত্তর হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সর্বপ্রথমে প্রতিনিধি সভা ৬৫ জন সদস্য সমন্বয়ে সংগঠিত হয়। ১৯২৯ সালের আইনে প্রতিনিধি সভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৪৩৫ জন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ জন। ভোট গ্রহণের ব্যাপারে সকল অঙ্গরাজ্যে একই রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয় না। ২০টি রাজ্যে এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, যারা লিখতে পড়তে জানে না, বিশেষ করে সংবিধান পড়তে ও তার অর্থ বুঝতে পারে না, তাদের ভোটাধিকার দেয়া হয় না। তবে আজকাল এমন লোক সাধারণত পাওয়া যায় না।

এ পরিষদের সদস্য হতে হলে প্রার্থীকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে এবং নির্বাচনের পূর্বে অন্তত সাত বছর ঐ অঙ্গরাজ্যে বাস করতে হবে। ১৯৭১ সালে গৃহীত সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী আইনে স্থির হয়েছে যে, ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রত্যেক নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করবে। এ সকল ভোটার প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করবেন। সভার কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা ২১৮ জন।

পরিষদের কার্যাবলি (Its Functions) ঃ (১) আইন প্রণয়ন ঃ আইন তৈরি করার জন্য পরিষদ গঠিত হলেও আইন প্রণয়ন এর একমাত্র কাজ নয়। পরিষদকে অনেক কাজ করতে হয়। সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে প্রতিনিধি পরিষদ সিনেটের সমতুল্য ক্ষমতা উপভোগ করে।

(২) অর্থ সংক্রান্ত ঃ অর্থ সংক্রান্ত সকল বিল প্রতিনিধি পরিষদে উদ্ভূত হয়। জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম, এর কর ধার্য করার ও **দ্বিতীয়,** জাতির আয় থেকে ব্যয় বরাদ্দ করার ক্ষমতা রয়েছে।

(৩) বিচার বিভাগীয় ঃ প্রতিনিধি পরিষদ নিজ কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাদি প্রণয়ন করে, নির্বাচন সম্পর্কিত মামলার বিচার করে এবং পরিষদকে অবমাননা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষত্রুটি বিচার করে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করে।

(৪) শাসন বিভাগীয় ঃ প্রতিনিধি পরিষদ আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থেকে শাসন বিভাগকে নানাবিধ উপায়ে পর্যবেক্ষণ করে থাকে এবং নানাবিধ কমিশন ও বোর্ড বসিয়ে অনুসন্ধানও করতে পারে।

(৫) অভিশংসন সংক্রান্ত ঃ প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের বিচার পরিচালনার কার্যেও পরিষদ অংশগ্রহণ করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনার ক্ষমতা একক ভাবে উপভোগ করে।

(৬) নির্বাচনমূলক ঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোন প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে অক্ষম হলে প্রতিনিধি পরিষদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। দুই বছরের জন্য পরিষদ পরিষদে স্পীকার নির্বাচনও করে।

(৭) জনমতের দর্পণ ঃ প্রতিনিধি পরিষদ জনমতের দর্পণ স্বরূপ। ফলে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা দ্বারা জনসাধারণকে পথ প্রদর্শন করে থাকে।

প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্সের দুর্বলতার কারণ (Causes of Weakness of the House of Representatives) ঃ পৃথিবীর অন্যান্য নিম্ন পরিষদ গুলোর কার্য ও ক্ষমতার সাথে তুলনা করলে প্রতিনিধি পরিষদকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে মনে হয়। ব্রিটেনের কমন্স সভার সাথে এ পরিষদ তুলনীয় নয়। এর অবশ্য অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

প্রথম, ক্ষমতায় স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে এখানে আইন বিভাগের সাথে শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় নি এবং প্রথম কক্ষের নিকট শাসনবিভাগকে দায়ী রাখা হয় নি। ফলে এর মর্যাদার যথেষ্ট হানি হয়েছে।

দ্বিতীয়, প্রতিনিধি পরিষদের কোন সর্বজনস্বীকৃত নেতা নেই। কিন্তু পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে প্রথম কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই হন প্রধানমন্ত্রী। তিনিই নীতি নির্ধারণ করেন ও আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে অনুরূপ ব্যবস্থা নেই।

তৃতীয়, এ কক্ষে দলীয় সংহতি ও ঐক্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে এ পরিষদ অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ, এ সভার কার্যকাল স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় এর গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

পঞ্চম, প্রতিনিধি পরিষদ অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেও সর্বোচ্চ প্রভাবশালী নয়, কিন্তু ব্রিটেনের কমন্স সভা সেখানে কর্তৃত্ব করে। এখানে সিনেট প্রতিনিধি পরিষদ কর্তৃক উথাপিত বিলকে সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করতে পারে।

ষষ্ঠ, সিনেট সভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ায় প্রতিনিধি পরিষদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশ হ্রাস পেয়েছে।

সর্বশেষে, ঐতিহাসিক কারণেও সিনেটের প্রতিপত্তি অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে প্রতিনিধি পরিষদ অনেকটা ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে।

সিনেট
Senate

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষের নাম সিনেট (Senate)। সিনেটের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১০০ জন। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন করে সিনেটর জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সিনেটকে অত্যন্ত শক্তিশালী করার জন্য রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ খুব সচেষ্ট ছিলেন। ক্ষুদ্র এ কক্ষকে কেবল আইন সভায় রূপান্তরিত না করে প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টা পরিষদ হিসেবেও নিযুক্ত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। সদস্যগণের কার্যকাল ৬ বছর এবং প্রতি দু বছর পর এর অন্তত এক–তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করেন। সিনেটের সদস্যপদ লাভ করতে হলে প্রার্থীকে অন্যূন ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে, ৯ বছরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে ও যে রাজ্য থেকে তিনি নির্বাচিত হবেন তার নাগরিক অধিকার লাভ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট সিনেটে সভাপতিত্ব করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ব্যতীত সিনেটে আরও একজন কর্মকর্তা রয়েছেন। তিনি অস্থায়ী সভাপতি (President pro-tempore) নামে পরিচিত। তিনি সিনেটের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন।

সিনেটের কার্যাবলি (Functions) ঃ সিনিটের কার্যক্রম ও ক্ষমতা পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে, এই সংস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী। নিম্নে তার পর্যালোচনা রয়েছে।

১। পৃথিবীর বিভিন্ন আইন পরিষদগুলোর দ্বিতীয় কক্ষসমূহের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ সিনেট সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী। সিনেট আইন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

২। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সিনেট প্রতিনিধি পরিষদের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী, যদিও আর্থিক বিল প্রতিনিধি পরিষদে উদ্ভূত হতে হবে। সংশোধনী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সিনেট খুশিমত সে বিলকেও পরিবর্তিত করে নতুন আলোকে প্রকাশিত করতে পারে।

৩। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সিনেট এমন কতকগুলো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে যা পৃথিবীর যে কোন আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষ, এমন কী আমেরিকার কংগ্রেসের প্রথম কক্ষও, কল্পনা করতে পারে না।

প্রথম, সিনেট প্রেসিডেণ্টের সমস্ত নিয়োগ অনুমোদন করে এ গুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বহুবিধ নিয়োগ দান করেন। এ সকল নিয়োগ সিনেট অনুমোদন করে থাকে। প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যখন কোন অঙ্গরাজ্যে নিয়োগদান করেন তখন সে অঙ্গরাজ্যের সিনেটরদের সাথে পরামর্শ করেন। ঐ সকল সিনেটর সম্মত হলে সমগ্র সিনেট তা অনুমোদন করে। এ প্রক্রিয়া সিনেটের সৌজন্যমূলক আচরণ (Senatorial Courtesy) বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কোন সন্ধি বা চুক্তি সম্পন্ন হলে সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন না করলে সে সন্ধি বা চুক্তি কার্যকর হবে না। সিনেটের বিনা অনুমোদনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা কার্যকর করতে প্রেসিডেন্টকে বেগ পেতে হয়। প্রেসিডেন্ট উইলসন জাতিপুঞ্জ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়ায় সিনেট তা অনুমোদন করতে অস্বীকার করে।

তৃতীয়, সরকারি কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্তও সিনেট কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

৪। বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারেও সিনেট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টকে অপসারিত করার (Impeachment) ব্যাপারে সিনেট প্রধান কার্যকারক, যদিও প্রতিনিধি পরিষদ প্রস্তাব আনয়ন করে। তা ছাড়াও সিনেট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করতে পারে। অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দরকার হয়। এভাবে সিনেট কর্মচারিদিগকে অপসারিতও করতে পারে।

সিনেটের ক্ষমতা ও বিভিন্নমুখী কার্যাবলির জন্য একে পৃথিবীর 'সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয়' ('The most powerful second chamber in the world.')।

সিনেটের প্রতিপত্তির কারণ
The Causes of its Powers and Influence

প্রথম, সিনেট ঐতিহাসিক কারণেই অনেকখানি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ সিনেটকে এরূপ শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন এবং তাকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়, সিনেট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, কারণ সিনেটরগণ শুধুমাত্র অঙ্গরাজ্যগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করেন না, তাঁরা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হন এবং ক্ষুদ্র বা স্থানীয় সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিকভাবে জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করেন। তাই তাঁরা জনসাধারণের নিকট আস্থাশীল ও দায়িত্বশীল বলে পরিগণিত। সাধারণত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণই এ কক্ষে নির্বাচিত হন। তাদের নেতৃত্বে জনসাধারণে পূর্ণরূপে আস্থাশীল।

তৃতীয়, সিনেটরগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। ফলে তাঁরা জনমত প্রতিফলনে সমর্থ হন।

চতুর্থ, সিনেট এক চিরস্থায়ী পরিষদ, কেননা প্রত্যেক দুই বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং সব সময় তা কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান থাকে। ফলে শাসন-ব্যবস্থার সাথে নিবিড় যোগসূত্র রক্ষা করা সিনেটের পক্ষে সম্ভবপর।

পঞ্চম, সিনেটের গঠনও একে প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন হতে সাহায্য করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হওয়ায়, এমন কী প্রতিনিধি পরিষদের চেয়েও ক্ষুদ্রতর হওয়ায়, এখানে সকল বিষয় আলোচনা করা সম্ভবপর হয়। এখানে সিনেটরগণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আলোচনা করেন, মর্যাদার সাথে ভাবের ও ভাষার আদান-প্রদান করেন। টকভিলের মতে, "ওয়াশিংটনের প্রতিনিধি পরিষদে প্রবেশ করে যে কেউ এ বিরাট পরিষদের অশোভন আচরণে মর্মাহত হতে পারেন, কিন্তু সিনেট সুললিত বক্তা, মর্যাদাসম্পন্ন পরিচালক, জ্ঞানী শাসনকর্তা ও বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়কগণ সমন্বয়ে গঠিত এবং তাদের আলাপ-আলোচনা ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারী বক্তৃতার প্রেক্ষিতেও সম্মানের সাথে উল্লেখযোগ্য হতে পারে" ("On entering the House of Representatives in Washington, one is struck with the vulgur demeanour of that great assembly. The Senate is composed of eloquent advocates, distinguished generals, wise magistrates and statesmen of note, whose language would at all times do honour to the most remarkable parliamentary debates of England.")।

ষষ্ঠ, সিনেটই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। সিনেটকে আস্থায় না রেখে তিনি বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। চুক্তি বা সন্ধির ক্ষেত্রে একমাত্র সিনেটই প্রেসিডেন্টের কার্য অনুমোদন করে। সুতরাং এ দিক দিয়েও সিনেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তম, আমেরিকার জননায়কগণ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যপদ অপেক্ষা সিনেটের পদকে অধিকতর কাম্য ও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

সর্বশেষে, এও বলা যেতে পারে, সিনেটের পরিচালনা ব্যবস্থা সহজতর এবং বক্তাগণ অবাধ স্বাধীনতা লাভ করেন। ফলে সিনেট বর্তমান পর্যায়ে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন হতে পেরেছে।

কংগ্রেসের কমিটি ব্যবস্থা
Committee System

আমেরিকার সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের কমিটিগুলোর মত গুরুত্বপূর্ণ কার্য আর কোন দেশের কমিটি করে না। ব্রিটেনের অধিকাংশ বিল পেশ করা হয় কেবিনেট কর্তৃক, কিন্তু আমেরিকার যে কোন সদস্য যে কোন বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট উইলসন বলেন, "কমন্স সভার কমিটি আছে, স্থায়ী কমিটিও আছে, কিন্তু সেগুলো সেকেলে ধরনের। তারা অনুসন্ধান করে এবং রিপোর্ট দেয়, আমেরিকার কমিটির মত আইন তৈরি ও পরিচালনা করে না" ("The House of Commons has its committees, even its standing committees, but they are of the old fashioned sort, which merely investigate and report, not of the American type which originate and conduct legislation.")। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সিনেটে ৩৩টি এবং প্রতিনিধি পরিষদে ৪৮টি কমিটি ছিল। কিন্তু এতগুলো কমিটি কাজ করলে অসুবিধা হতে পারে বলে তাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। বর্তমানে সিনেটে ১৫টি কমিটি রয়েছে এবং প্রতিনিধি পরিষদে রয়েছে ২০টি কমিটি। এ কমিটিগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

কমিটির নাম	সিনেটে কমিটির সদস্য সংখ্যা	প্রতিনিধি পরিষদে কমিটির সদস্য সংখ্যা
১। খরচ মঞ্জুরি কমিটি	২৭	৫০
২। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্পর্কিত কমিটি	১৭	৩৮
৩। বৈদেশিক নীতি কমিটি	১৭	৩৩
৪। আন্তরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য কমিটি	১৭	৩৩
৫। বিচার বিভাগীয় কমিটি	১৫	৩৫
৬। ব্যাংক ও মুদ্রা কমিটি	১৫	৩০
৭। নিয়ম ও ব্যবস্থা কমিটি	৯	১৫

১৭ জন সদস্য নিয়ে সিনেটে রাজস্ব কমিটি গঠিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদে অনুরূপ কমিটির নাম "ওয়েজ এ্যাণ্ড মিন্স কমিটি" বা ব্যবস্থাপনা কমিটি। এর সদস্য সংখ্যা ২৫ জন।

দুই বছর পর নির্বাচনের পরে নতুন কংগ্রেস বসে। কমিটিগুলো সে সময় গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলো গঠিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ–এ উভয় দলের সমন্বয়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রবীণতম সদস্য এ কমিটিগুলোতে সভাপতিত্ব করেন। আমেরিকায় কমিটি গঠনের সময় দলীয় ও আঞ্চলিক বিষয়কে স্মরণে রাখা হয়। কমিটিগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ কমিটি ও উপায় নির্ধারণী কমিটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণকে কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে পর্যালোচনা করার জন্য স্পীকার নিয়োগ করেন। নীতি নির্ধারণী কমিটি কংগ্রেসের অধিবেশন বসার পূর্বে রীতি–নীতি নির্ধারণ করে।

কমিটির সদস্যগণ এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, এ কমিটিগুলোর দ্বারাই আইন তৈরির শতকরা ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ
Judiciary of the U.S.A.

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় কার্য সুপ্রীম কোর্ট ও অধীনস্থ অন্যান্য আদালতের উপর ন্যস্ত হবে" ("The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish.")। সুতরাং সুপ্রীম কোর্টকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি আদলতের সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে একাধিক জেলা আদালতও স্থাপিত হয়। এ জেলা আদালতগুলো ১ থেকে ৩ জন বিচারক কর্তৃক পরিচালিত। এ আদালতসমূহে মৌলিক মামলার (original) বিচার করা হয়।

তার উপর রয়েছে সার্কিট আদালতসমূহ (circuit courts)। এ আদালতসমূহে জেলা আদালত থেকে আনীত আপীলের শুনানি হয়। এদের মৌলিক এখ্‌তিয়ার (Original Jurisdiction) নেই। এ সব আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায় অনেক ক্ষেত্রে চরম বলে গৃহীত হয়। সার্কিট আদালতের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে।

সুপ্রীম কোর্ট
Supreme Court

বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৮ জন সহকারী বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত। এ বিচারকগণ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তায় চাকরিতে বহাল থাকেন। ১৭৮৯ সালের বিচার বিভাগীয় আইনে সর্বপ্রথম সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৬ জন। পরে এ সংখ্যা উন্নীত হয় ৯ জনে। তাঁদের একজন বিচারপতি ও অন্য ৮ জন সহকারী বিচারপতি।

আপত্তিকর আচরণের জন্য অথবা দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অনুরূপ অন্যায়ের জন্য তাঁদের অপসারণ করা যেতে পারে। তবে অপসারণের এ প্রস্তাবাবলি প্রতিনিধি পরিষদে উথাপিত হয় এবং

সিনেটে তার বিচার হয়। কংগ্রেস কর্তৃক তাদের মাহিনা নির্ধারিত হয় এবং চাকরিকালে তা হ্রাস করা সম্ভবপর নয়। সুপ্রীম কোর্ট নিজের নিয়মকানুন নির্ধারিত করে। ৬ জন বিচারপতি নিয়ে কোরাম (Quoram) গঠিত হয়। এর প্রধান কেন্দ্র ওয়াশিংটন, ডি. সি. (Washington, D. C.)।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the Supreme Court

সুপ্রীম কোর্ট দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকারের মামলা পরিচালনা করে। সুপ্রিম কোর্টের মৌলিক এখ্‌তিয়ারও রয়েছে। আবার আপীলের শুনানিও গ্রহণ করে। সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক এখ্‌তিয়ারে শুধুমাত্র সে সকল মামলার বিচার করে, যে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থাকেন অথবা যে সকল ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলো বা যুক্তরাষ্ট্র জড়িত থাকে। আপীলের শুনানীতে সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারালয় থেকে অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলোর অধস্তন পর্যায়ের বিচারালয় থেকে গৃহীত মামলাগুলোর বিচার পরিচালনা করে। আইনের জটিল প্রশ্নগুলোর সমাধান আনয়ন অথবা সংবিধানের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদানই এর প্রধানতম কার্যাবলি।

কংগ্রেস এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর পরিষদ দ্বারা প্রণীত আইন সম্পর্কে কোন মামলা উঠলে তা বিচার করে সুপ্রীম কোর্ট আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। তাকে বলে বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণ (Judicial Review) এটা হলো সুপ্রীম কোর্টের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। সুপ্রীম কোর্টের সামনে কেউ বিচার প্রার্থী হয়ে যদি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধান বিরোধী এবং সে অবৈধ আইনের ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা হলে বিচারকেরা সে আইনের বৈধতা বিচার করেন। তারা কোন মামলার রায়ে যদি বলেন যে, সে আইন অবৈধ তা অন্য সব মামলায় অবৈধ বলে গণ্য করা হবে।

সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্ব
Significance of the Supreme Court

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক স্বরূপ। আমেরিকার সংবিধানকে পরিবর্তিত ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তা যতটুকু সাহায্য করেছে, তেমন আর কোন প্রতিষ্ঠান করে নি। সংবিধানের ক্রমবিকাশের পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত বেশি সাহায্য করেছে। তাই বলা হয়, সুপ্রীম কোর্টকে কেন্দ্র করে সংবিধান আবর্তিত হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক লিখেছেন, "আমেরিকার শাসন পদ্ধতিতে কতকগুলো মামলাই ক্ষমতার প্রধান অস্ত্র। ইউরোপে ক্ষমতার বিবাদ মীমাংসার জন্য সৈন্যদল ডাকার প্রয়োজন হয়, আমেরিকায় কিন্তু সে ক্ষেত্রে উকিলদের ডাকা হয়" ("These law suits are chief instruments of power in our system. Struggles over power in Europe call out regiments of troops, in America but regiments of lawyers.")।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনের মানোন্নয়নে এবং তাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে নিচে বর্ণিত উপায়ে সাহায্য করেছে।

প্রথমত, সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলোর অধিকার সংরক্ষণে সমর্থ হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নাগরিকগণের অধিকার রক্ষায়ও রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে। বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান বহির্ভূত যে কোন আইনকে নাকচ করে দিতে পারে, তা সে আইন কংগ্রেসই প্রণয়ন করুক বা অঙ্গরাজ্যগুলোর আইন

পরিষদই করুক বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শাসন বিভাগীয় নির্দেশেই হোক। এ পদ্ধতির ফলে সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস বা প্রেসিডেন্টকে তাদের নির্ধারিত আওতায় থাকতে বাধ্য করে এবং সীমা অতিক্রম না করতে বাধ্য করে। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট এ সংঘর্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে সতর্ক প্রহরীর ন্যায় প্রহরায় রত থাকে। তাই সুপ্রীম কোর্টকে "সমন্বয় সাধনের চক্র" (balancing wheel) নামে অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে সময়ের সাথে তাল রেখে চলতে সাহায্য করেছে এবং অনুমানসিদ্ধ ক্ষমতার (implied powers) মাধ্যমে তাকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে ও সময়োচিত পরিবর্ধনে সাহায্য করেছে। মৌলিক সংবিধানে এমন অনেক বিষয় ছিল যাদের উপর কেন্দ্রের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, কিন্তু অনুমানসিদ্ধ ক্ষমতার (implied powers) মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের হাত শক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। "ব্যবসা বাণিজ্য" (commerce) কথাটির ব্যাখ্যা প্রদান করে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের উপর অর্থাৎ বড় সড়ক, সেতু, খাল খনন রেলপথ ও ট্রামপথ নির্মাণের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। সুতরাং সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানকে কার্যকর হতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

তৃতীয়ত, আমেরিকান শাসনব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট 'ভারসাম্যের যন্ত্র' বলে পরিগণিত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানের যে কোন অনুচ্ছেদের অর্থ সহজ ও সরল করে দিতে পারে এবং সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা কিছুটা লাঘব করতে পারে।

সুতরাং সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্থা হিসেবে রূপ লাভ করেছে। প্রধান বিচারপতি হিউজেস (Hughes) বলেছেন, "আমরা সংবিধানের অধীন রয়েছি, কিন্তু সংবিধান হলো সেরূপ কিছু যা বিচারকগণের সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়" ("We are under a constitution, but the constitution is what the Judges say it is")। তাই বলা হয় পার্লামেন্টের প্রাধান্যের ফলে যেমন ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক নেতাগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তেমনি বিচারবিভাগীয় প্রাধান্যের জন্য আমেরিকায় আইনজ্ঞগণ শাসন পরিচালনা করেন। ইংল্যাণ্ডে যেমন আইনের প্রশাসন বিদ্যমান, আমেরিকায় তেমনি আইনবিদগণের প্রশাসন প্রবর্তিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে যেমন পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশের রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, আমেরিকায় তেমনি সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকগণ রাজনৈতিক জীবনের চাবিকাঠি ধারণ করে। জনৈক বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাই আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টকে যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের তৃতীয় কক্ষ বলেছেন যা অন্যান্য কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্যের সমালোচনা
Criticism against Supreme Court's Supremacy

সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। **প্রথমত,** বলা হয় যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্যের ফলে অন্যায়ও সংঘটিত হতে পারে, কেননা সুপ্রীম কোর্টের ৯ জন বিচারপতির মধ্যে যদি ৫ জন এক পক্ষে রায় দান করেন এবং অন্য ৪ জন বিরোধিতা করেন, তা হলে ৫ জনের রায়ের ফলে কংগ্রেস ও প্রেসিডেন্টের কার্যাবলি নীতি বহির্ভূত বলে ঘোষিত হতে পারে। সুতরাং মাত্র কয়েকজনের সিদ্ধান্তের ফলে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ওলোট পালট সংঘটন আর যাই হোক শুভ নয়।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক জটিল প্রশ্নের সমাধানকল্পে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অনেক সময় উন্নতি, প্রগতি এবং গঠনমূলক কাজের গতিরোধ করেছে। অনেক স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট যেমন জেফারসন, জ্যাকসন, লিঙ্কন ও রুজভেল্ট এ অভিযোগ করেছেন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে প্রতিক্রিয়াশীল ও অনড় বলে নিন্দাবাদ করেছেন।

তৃতীয়ত, অনেকে সুপ্রীম কোর্টকে আইন পরিষদের তৃতীয় কক্ষ বলে আখ্যায়িত করেন এবং তার প্রভাবের সামনে অন্য কক্ষসমূহ দুর্বল ও দায়িত্বহীন হয়ে পড়তে পারে এ অভিযোগও করা হয়।

তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার জাতীয় জীবনে বিচার বিভাগের ভূমিকা খুব মূল্যবান। সুপ্রীম কোর্ট সাংবিধানিক জটিলতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে পথ রচনা করেছে এবং যেভাবে গণ অধিকার সংরক্ষণ করে এসেছে তা অতুলনীয়। তাই জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, "এর অবর্তমানে আমেরিকার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পঞ্চাশটি সার্বভৌম বিরুদ্ধভাবাপন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এক অসংখ্য-মস্তক-বিশিষ্ট দানবে পরিণত হতে পারত" ("The American constitutional system would have become a hydra-headed monstrosity of fifty rival sovereign entities")।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা
Judicial Review

সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস ও অঙ্গরাজ্যগুলোর আইন পরিষদে প্রণীত সংবিধানের শর্তবিরোধী আইনকে বিধি বহির্ভূত বা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এই হলো সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং এটি সুপ্রীম কোর্টের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। সুপ্রীম কোর্টের সামনে কেউ বিচারপ্রার্থী হয়ে যদি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইনটি সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ, এবং সে অবৈধ আইনের ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা হলে বিচারকেরা সে আইনের বৈধতা বিচার করেন। তাঁরা কোন মামলার রায়ে যদি বলেন যে, সে আইন অবৈধ, তা হলে অন্যান্য মামলায় তা অবৈধ বলে গণ্য করা হবে।

আমেরিকায় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) বলতে সে প্রক্রিয়াকে বুঝায়, **যার মাধ্যমে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট তার নিকট উপস্থাপিত আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন, নির্বাহী বিভাগ বা প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত বিধিবিধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঐ সব আইন বা বিধিবিধান সংবিধান কর্তৃক সমর্থিত কী-না তা ঘোষণা করে।**

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন দিক থেকে মঙ্গলজনক। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের ধারা বহির্ভূত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করে শাসনব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে অঙ্গরাজ্য গুলোর স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখে এবং সর্বোপরি কংগ্রেসের পীড়নমূলক আইনের হাত থেকে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করে। এই ব্যবস্থা অঙ্গরাজ্য গুলোর অনধিকার চর্চা থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে রক্ষা করে। সুতরাং সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার দ্বারা কংগ্রেসের যাবতীয় আইনের বৈধতা পরীক্ষিত হয়ে থাকে। এভাবে সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সুদৃঢ় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান খুঁটি হিসেবে কার্য করেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি। তবে সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টের এ ক্ষমতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, সংবিধানের সাথে যে সকল আইন সামঞ্জস্যপূর্ণ, শুধু সে সকল আইন মৌলিক আইন বলে বিবেচিত হবে। হ্যামিল্টন (Hamilton) ও বিচারপতি মার্শাল (Marshall) এভাবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার কথা বিশ্লেষণ করেন। এ ক্ষমতার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮০৩ সালের মারবেরী বনাম ম্যাডিসন (Marbury vs. Madison) মামলার রায়ে।

এ মামলার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ ১৮০১ সালের ৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি এড্যামস্ (Adams) মারবেরীকে (Marbury) কলাম্বিয়ার বিচারপতি পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু উক্ত নিয়োগের নির্দেশ জারির পূর্বেই রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। নতুন রাষ্ট্রপতি মারবেরীকে এ নিয়োগনামা দিতে অস্বীকার করেন। তাই মারবেরী সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করেন। সুপ্রীম কোর্ট এ আবেদন নাকচ করেন, কেননা সুপ্রীম কোর্টের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা সংবিধান বিরোধী। ফলে মারবেরীর আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

মারবেরী বনাম ম্যাডিসন মামলা ছাড়াও ১৮১৮ সালের আর একটি মামলা সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা দৃঢ়তর করে। তা ম্যাককুলোক বনাম মেরিল্যান্ড (Macculloch vs. Maryland) মামলা নামে খ্যাত। এ মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট মেরিল্যাণ্ড অঙ্গরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়।

সুপ্রীম কোর্টের এ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। **প্রথম,** বলা হয় যে, সাংবিধানিক জটিল প্রশ্নের সমাধানকল্পে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই উন্নতি, প্রগতি ও গঠনমূলক কাজের গতিরোধ করেছে। এ কারণে জেফারসন, জ্যাকসন, লিঙ্কন ও রুজভেল্টের ন্যায় খ্যাতনামা প্রেসিডেন্টগণ এ ব্যবস্থাকে না-পছন্দ করেছেন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং অনড় বলে নিন্দাবাদ করেছেন। **দ্বিতীয়,** বিচার বিভাগের এ প্রাধান্যকে অনেকে **'বিচার বিভাগীয় একনায়কত্ব'** বলেও আখ্যায়িত করেন। **তৃতীয়,** বলা হয় যে, যেহেতু সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেসের যে কোন আইনকে বিধি-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে পারে, তাই এর প্রভাবের সামনে কংগ্রেস দুর্বল ও দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে।

তবে নিঃসন্দেহে এটি বলা যায় যে, আমেরিকার জাতীয় জীবনে বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য এনেছে স্থিতিশীলতার আশীর্বাদ ও কার্যকারিতার শুভ সওগাত।

সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি
Process of Amendment

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে সংশোধন করার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। তাই প্রায় দুইশো বছরের মধ্যে মাত্র ৩০টি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সংশোধন প্রস্তাব আনয়নের দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম, সংশোধনের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উভয় কক্ষের প্রত্যেকটির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে আনা যায়।

দ্বিতীয়, অঙ্গরাজ্যগুলো আইন পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের আবেদনক্রমে কংগ্রেস সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করতে পারে।

কিন্তু এ সংশোধন প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে তা অনুমোদিত হতে হবে। অনুমোদিত হবার দুটি পন্থা রয়েছে। **প্রথম,** এ প্রস্তাব অঙ্গরাজ্যের আইন পরিষদগুলোর তিন–চতুর্থাংশ কর্তৃক অনুমোদিত হতে পারে। **দ্বিতীয়,** তা প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে এ উদ্দেশ্যে যে সভা আহুত হয় তা তিন–চতুর্থাংশের দ্বারা সমর্থিত ও অনুমোদিত হতে পারে। সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হলে তখন ঐ প্রস্তাব সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে কংগ্রেসের দুই–তৃতীয়াংশের ভোটে প্রস্তাব আনয়ন করা হয় এবং অঙ্গরাজ্যে আহুত অধিবেশনে তিন–চতুর্থাংশের দ্বারা সমর্থিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণসমূহ

সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে উল্লিখিত করা (enumerated) হয়েছিল। যে সকল ক্ষমতা উল্লেখ করা হয় নি তাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) বলা হয়। সেগুলো অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে দেয়া হয়েছিল। সংবিধান নির্মাতাগণ চেয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলো পরস্পর নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন থাকবে। একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। উভয়ে সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে।

কিন্তু বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সংবিধান মোতাবেক কার্য চলতে থাকলে ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হতে পারত। এ সত্য প্রথমে হ্যামিলটন ও প্রধান বিচারপতি মার্শাল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রথম থেকেই তারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ওকালতি করতে শুরু করেন। মার্শাল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রায় দিয়ে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। বিশেষ করে উক্ত মতবাদে বিশ্বাস করে অর্থাৎ 'যা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নি তা অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হবে'–এ মনোভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ম্যাককিউলোক বনাম মেরিল্যাণ্ড (Macculoch vs. Maryland) মামলায় রায়দান করে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার উপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার আইন (National Industrial Recovery Act) এ ক্ষেত্রে আর একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এর ফলে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও জনকল্যাণের নামে প্রেসিডেণ্টকে বিবিধ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিচারক স্টোরী তাঁর ভাষ্যে বলেন যে, জনকল্যাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে কোন আইন প্রণয়ন করতেই শুধু পারে না—করও বসাতে পারে। ফলে জনসাধারণের কল্যাণার্থে যুক্তরাষ্ট্র কর বসাবার অধিকারী হয়েছে। তাছাড়া, অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেকখানি বেড়েছে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তা আইন (Social Security Act) প্রণয়ন করে দুঃস্থ, বেকার ও অন্যান্য আতুরদের সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে অঙ্গরাজ্যগুলোকে সাহায্য করতে লাগল। সুতরাং প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকলেও কালক্রমে আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনে এবং ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধিকল্পে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে লাগল এবং অনুমানসিদ্ধ ক্ষমতার নীতি (Doctrine of Implied Powers), আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি (Regulation of Interstate Commerce), জনকল্যাণার্থে কর স্থাপন নীতির প্রয়োগে ও আর্থিক সাহায্য দানের (grant-in-aid) মাধ্যমে এর ক্ষমতা অন্ততপক্ষে শতগুণ বেড়েছে। তাছাড়া, সিনেটের প্রভাব বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ও বিভিন্ন কারণে প্রেসিডেণ্টের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকার সরকার বলতে বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বোঝায়। বিগত দুই মহাযুদ্ধের ফলে ক্ষমতার একত্রীকরণেরও প্রয়োজন হয়েছিল এবং আজকাল আণবিক শক্তির

গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ প্রয়োজন হয়েছে। তাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আমেরিকার জাতীয় জীবনের প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হতে পেরেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থা
Party System in the United States

আমেরিকার সংবিধান রচয়িতাগণ (The founding-fathers) রাজনৈতিক দলের প্রতি মোটেই আস্থাশীল ছিলেন না এবং আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington) জনগণকে দলীয় নীতি পরিহার করার উপদেশ দেন। প্রেসিডেণ্ট জেফারসনের (Jefferson) আমল থেকে দলীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব
Importance

বর্তমানে দলীয় ব্যবস্থার ব্যাপকতা আমেরিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। রাজনৈতিক দলই আজকাল আমেরিকার শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ফলে দেখা যায়, সংবিধান রচয়িতাগণ যাকে বিভেদের যন্ত্র হিসেবে গণ্য করেছিলেন তাই আজ মিলনের সেতুবন্ধন রচনা করেছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দল ব্যতীত আমেরিকার শাসনব্যবস্থা প্রায় অচল। তাই বলা হয়, "যে প্রস্তরখণ্ডকে নির্মাতাগণ প্রত্যাখান করেছিলো তাই আজ প্রধান প্রস্তরখণ্ডে রূপলাভ করেছে" ("The stone which the builders rejected has today become the chief cornerstone")।

আমেরিকার দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা
Dual Party System in the U.S.A.

আমেরিকায় প্রধানত দুটি প্রধান দল রয়েছে। প্রথম থেকেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এ প্রবণতা দেখা যায়। অতীতে ফেডারালিস্ট (Federalist) বা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী—এবং এণ্টি-ফেডারালিস্ট (Anti-Federalist) বা অঙ্গরাজ্যর পক্ষ্যপাতি—এভাবে আমেরিকায় দলীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। ফেডারালিস্ট দলের লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকে শক্তিশালী করা, কিন্তু এণ্টি-ফেডারালিস্টরা চাইতেন অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বতন্ত্র ও অধিকার সংরক্ষণ করতে। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ছিলেন ফেডারালিস্ট দলের নেতা এবং এণ্টি-ফেডারালিস্ট দলের নেতৃত্ব দিতেন টমাস জেফারসন।

পরবর্তীকালে আমেরিকায় রিপাবলিকান (Republican) ও ডেমোক্র্যাটিক (Democratic) দলের অভ্যুদয় ঘটে। রিপাবলিকান দলের মৌল লক্ষ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটিক দল অধিকতর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার রক্ষায় আগ্রহী।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দল বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ সমন্বয়ে গঠিত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মানরো (Munro) আমেরিকার দলীয় ব্যবস্থার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দলগুলো সত্যই বিচিত্র। সেখানে নানা ধর্ম, নানা জাতি, নানা গোষ্ঠী, বিভিন্ন অঞ্চল, তাদের বিভিন্ন আদর্শ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্নতা সত্ত্বেও নিজ নিজ স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুটি বৃহৎ জাতীয় দলে সংঘবদ্ধ হয়েছে।"

আমেরিকার দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
Characteristics

আমেরিকার দলীয় ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ঃ **প্রথম,** আমেরিকায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। কোন কোন সময় যে তৃতীয় দলের জন্ম হয় নি তা নয়, কিন্তু কালক্রমে তা জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় লক্ষ্যে আবার যে কোন একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে। **দ্বিতীয়,** সংগঠনের দিক দিয়ে আমেরিকার দলগুলো প্রায় অভিন্ন। প্রত্যেক দলের আছে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠন এবং প্রত্যেক পর্যায়ে দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। **তৃতীয়,** আমেরিকার দলগুলো অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। ফলে উভয়ের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য তেমন বেশি নেই। তবে প্রত্যেক দলেই বামপন্থী, ডানপন্থী ও মধ্যপন্থীদের অবস্থান রয়েছে। **চতুর্থ,** জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে প্রত্যেক দলই সচেতন, বিশেষ করে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল উদ্বুদ্ধ।

১। আমেরিকার সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? তুমি কী মনে কর যে, আমেরিকার সংবিধানে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে? (What are the salient features of the Constitution of the U.S.A.? Do you agree with the view that the Constitution of U.S.A. is based on checks and balances?) [N. U. 2006]

২। আমেরিকার সংবিধানের উৎসগুলো কী কী? আমেরিকার কী কোন প্রথাভিত্তিক আইন আছে? (What are the sources of the American Constitution? Is there any Common Law in America?)

৩। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the prerequisites of a federal system of government with reference to the American system.)

৪। কংগ্রেস সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। (Discuss the powers and functions of the American President with special relations to the Congress.) [N. U. 2004]

৫। আমেরিকার সিনেট ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা পর্যালোচনা কর। (Examine the relationship between the Senate and the President in the U.S.A.)

৬। আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের শাসনবিভাগীয় কর্মকর্তা এবং আইন বিষয়ে তাঁর কোন ক্ষমতা নেই—এ সব কথা বলা নীতিবাক্য বলারই সামিল, বাস্তবে কিন্তু অন্য রকম"—আলোচনা কর। ("To say that the President in an executive officer and hence has nothing to do with lawmaking is to talk of philosophy and not of facts"—Discuss.)

৭। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর কেবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে কী সম্পর্ক বিদ্যমান? (What relationships exist between the President and his cabinet?)

৮। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জাতীয় নেতৃত্ব দানে কতটুকু সক্ষম হন? (To what extent does the President of the U.S.A. fulfil the role of national leadership?)

৯। প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতার উৎস কী কী? তাঁর আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা কী কী? (What are the sources of power of the President? What are the legislative powers of the President?)

১০। প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ কী? (What are the reasons for the increase of powers of the President?)

১১। আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন কীভাবে সংঘটিত হয়? প্রতিনিধি পরিষদ গঠন প্রণালী ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (How is the House of Representatives of the U. S. A. elected? Describe its powers and composition.)

১২। প্রতিনিধি পরিষদের দুর্বলতার কারণগুলো কী কী? (What are the reasons for the weakness of the House of Representatives?)

১৩। সিনেটের গঠনপ্রণালী, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the composition, powers and functions of the Senate.)

১৪। 'সিনেট হলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দ্বিতীয় কক্ষ'—বিশ্লেষণ কর এবং এর প্রভাবের কারণগুলো বর্ণনা কর। (The Senate of the United States is the most powerful second chamber in the world'—Analyse and show reasons for its influence.)

[N. U. 1997 ; D. U. '84, 2005]

১৫। আমেরিকার কংগ্রেসের কমিটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the commitee system of the American Congress.)

১৬। "যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে"—আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার উল্লেখপূর্বক এ সত্যের আলোচনা কর। ("The Judiciary occupies an important position in the Federal Government"—Discuss it with reference to the jurisdiction of the American Supreme Court.)

১৭। 'সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকার শাসন বিভাগের তদারক করে।' ব্যাখ্যা কর। (The Supreme Court is the task master of the executive in the U.S.A.—Explain.)

১৮। সুপ্রীম কোর্টের গঠনপ্রণালী, ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the composition, powers and functions of the Supreme Court in the U.S.A.)

১৯। সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্যের সমালোচনা কর। (Critically evaluate the supremacy of the Supreme Court in the U.S.A.)

২০। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণসমূহ কী কী? (What are the reasons for the growth of powers of the central government in the U.S.A.?)

২১। আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন কীভাবে করা হয়? (How is the American Constitution amended?)

২২। 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শাসক'—তুমি কী এর সাথে একমত? (The President of the U.S.A. is the most powerful executive in the world— Do you agree ?)

[D.U. '80]

২৩। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কী বোঝ ? আমেরিকার শাসনব্যবস্থা থেকে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও। (What do you mean by judicial review? Illustrate your answer with reference to the American practices.) [R. U.'80 ; N. U. 1997]

২৪। আমেরিকার কংগ্রেসে সদস্য হবার সুযোগ পেলে তুমি কী সিনেটের প্রতিনিধি বা পরিষদের সদস্য হবে? যুক্তি দেখাও। (If you were offered a seat in the American Congress, would you prefer the Senate or the House of Representatives?—Show reasons.)

২৫। আমেরিকার সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of the powers and functions of the American Senate with those of the House of Representatives.)

২৬। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা, মর্যাদা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। (Discuss the powers, position and functions of the President of America)

[N.U. 1996 ; R. U. 1993, 1998, 2000, 2006]

২৭। আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির সাথে ব্রিটেনের কমন্স সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা কর। (Compare the powers and functions of the American House of Representative with those of the House of Commons in Great Britain.)

[D. U. 1984]

২৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা কর। (Discuss the role of Political Parties in the U. S. A.) [N. U. 1996]

ব্রিটিশ ও আমেরিকার শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

COMPARATIVE STUDY

(এক) ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ব্রিটেন এবং আমেরিকার সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বে দুটি বিশিষ্ট ধারা যা শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে দুটি দিকের উন্মোচন করেছে। কে জানত আটলান্টিকের দু পারের দু ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর নিকট দুটি গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা রূপে প্রতিভাত হবে? এ দু শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিচে আলোচিত হলো ঃ

সাদৃশ্য

(এক) ব্রিটেন ও আমেরিকার শাসনব্যবস্থা উভয়ই দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সার্থক প্রচেষ্টা স্বরূপ। কোন ব্যবস্থাতে স্বৈরাচারী শাসকের স্থান নেই। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কোন সংস্থা তৈরি হয় নি। জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র কোন সংস্থার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় নি কোনটিতে।

(দুই) উভয় সংবিধানই মানুষের সৃজনশীল প্রতিভা এবং বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। একটি যেমন লিখিত দলিল সহযোগে গড়ে উঠেছে, অন্যটি তেমনি প্রথাগত বিধান, বিচারকের রায় প্রভৃতির সাহায্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

(তিন) উভয় শাসনব্যবস্থা শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যুগোত্তীর্ণ হয়েছে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এদের প্রচলন দেখা যায়।

(চার) উভয় ব্যবস্থায় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা সংবিধানের শক্তিকেন্দ্র স্বরূপ এবং জন প্রতিনিধিবর্গ শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

(পাঁচ) উভয় ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক দল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং জনগণের নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে।

(ছয়) উভয় শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক জীবনবোধ সংবিধানের প্রাণস্পন্দন রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার জন্য যথাযোগ্য বিধান সংযোজন করা হয়েছে উভয় ক্ষেত্রে।

বৈসাদৃশ্য

কিন্তু এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেন এবং আমেরিকার শাসনব্যবস্থা দুটি ভিন্ন জগৎ। স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছে।

(এক) ব্রিটেনের সংবিধান এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা (unitary) প্রবর্তন করেছে, কিন্তু আমেরিকার সংবিধান এক যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে।

(দুই) ব্রিটেনে প্রচলিত রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চালু হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা (Presidential form of government)।

(তিন) ব্রিটেনের সংবিধান মূলত অলিখিত, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রধান প্রধান ধারাগুলো বিভিন্ন দলিলে লিপিবদ্ধ।

(চার) ব্রিটেনের সংবিধান মোটামুটিভাবে নমনীয়, কেননা সেখানে সাধারণ বিল এবং শাসনতান্ত্রিক বিলের মধ্যে পার্থক্য নেই, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনমনীয়। সেখানে সংবিধান পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

(পাঁচ) ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধান একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি আইন পরিষদে দায়িত্বশীল এক মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতায় নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(ছয়) ব্রিটেনে প্রবর্তিত রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রজাতন্ত্র। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।

(সাত) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় আইন পরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হয়েছে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য। সংবিধানও এখানে এক ধরনের প্রাধান্য লাভ করেছে।

(আট) ব্রিটেনে আইনগত দিক থেকে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কোন প্রয়োগ নেই, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র রচয়িতাবৃন্দ ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ করেন শাসন ব্যবস্থায়।

(নয়) ব্রিটেনে আইনের অনুশাসন কর্তৃক ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান রক্ষাকবচ ঃ

(দুই) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী

বর্তমান কালের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের দুই দিকপাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। তাঁরা শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং তাঁদের কার্যাবলি, ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদার তুলনামূলক আলোচনা সংবিধানের ছাত্রগণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিচে তাই বিবৃত হলো ঃ

প্রথম, প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন লিখিত সংবিধান থেকে, কতকাংশে প্রণীত আইন-কানুন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত থেকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাবের উৎস প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথাসমূহ।

দ্বিতীয়, প্রেসিডেন্ট আইন পরিষদের সদস্যও নন এবং আইন পরিষদের নিকট দায়ীও থাকেন না তাঁর কোন কার্য ও নীতির জন্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আইন পরিষদের সর্বজন স্বীকৃত নেতা এবং তিনি তাঁর নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইন পরিষদের নিকট সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

তৃতীয়, প্রেসিডেন্ট পদটি বিভিন্ন শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁকে জন্মসূত্রে বা জন্মস্থানসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হতে হবে। আমেরিকায় অন্ততপক্ষে ১৪ বছর বসবাস করতে হবে। অন্ততপক্ষে ৩৫ বছর বয়স

হতে হবে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পদ কোন শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ভোটার হবার যোগ্যতা থাকলেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন।

চতুর্থ, ৪ বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন বা "ইমপিচমেণ্টের" মাধ্যম ছাড়া অপসারণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে কমন্স সভা যে কোন মুহূর্তে তার অনাস্থা প্রস্তাব দ্বারা অপসারিত করতে পারে।

পঞ্চম, পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুর ফলে প্রেসিডেন্ট অনুপস্থিত হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং শাসন ব্যবস্থায় তেমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সমগ্র কেবিনেটের পতন ঘটে এবং নতুন করে কেবিনেট গঠনের প্রয়োজন হয়।

ষষ্ঠ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রাজা অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন, তবে কোন কোন বিষয়ে দুর্বলতর। তিনি প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতাবান ও কোন কোন বিষয়ে স্বল্প ক্ষমতা বিশিষ্ট" ("The President of the U. S. A. is both more or less than a king ; he is also both more or less than a Prime Minister.")। সত্যই পদমর্যাদার দিক দিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা উন্নত বলে বিবেচিত হন, কারণ তিনি কেবল শাসকই নন, তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও বটে। কেবিনেটের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী, কিন্তু তাঁরা প্রেসিডেন্টের অধীনস্থ কর্মকর্তা মাত্র।

সপ্তম, প্রেসিডেন্ট স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। তিনি বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করেন এবং কনসাল ও রাষ্ট্রদূতগণকে নিয়োগ করেন। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন, সন্ধি স্থাপন করতে পারেন ও চুক্তিবদ্ধ হয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নীতি নির্ধারণে প্রয়াসী হতে পারেন। অবশ্যই এ সব ক্ষমতা প্রয়োগের সময় তিনি সিনেটের অনুমোদন লাভ করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এ সব কার্য আইনত রাজা বা রানীর নামে হলেও প্রধানমন্ত্রীই করেন। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন। অগ (Ogg) বলেন, "তিনি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী শাসক" ("He is the foremost ruler in the world")। যুদ্ধের সময় তিনি অনেকটা একনায়কের মতই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন।

অষ্টম, প্রধানমন্ত্রী আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন এবং আসলে প্রায় সকল আইন কেবিনেটের পরিচালনাধীনে প্রণীত হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি বাণী প্রেরণ করে বা যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করে বা পরোক্ষভাবে দলীয় নেতাদের দ্বারা আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। অবশ্য আসলে আইনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব খুব অল্প নয়। প্রেসিডেন্টের ভেটো প্রয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর তেমন কোন ক্ষমতা নেই।

নবম, প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীন, কেননা তিনি কংগ্রেসের নিকট কোনরূপ দায়ী নন। বিপদকালে তিনি একনায়কের মত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যাবলি ও নীতির জন্য সর্বতোভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন। বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকতর দায়িত্বশীল। তাই বলা হয়, "সার্বভৌমকে, কেবিনেটকে, কমন্স সভা ও রাজনৈতিক দলকে পরিচালনা করা এবং তা নির্বাচকমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্য বলে প্রধানমন্ত্রীকে সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর গুণের সমাবেশে ভূষিত হতে হয়" ("To manage the sovereign, the cabinet, the House of Commons and the party—all of them with a view to managing the electorate, the Prime Minister requires quality which no ordinary man is likely is to possess.")। অনেকে

বলেন যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উপযুক্ততর ও বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি।

দশম, পার্লামেণ্টারী প্রথা ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের বিরুদ্ধে কাজ করতে অক্ষম, যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলের নির্দেশকে উপেক্ষা করতে পারেন। আবার দলের জন্যই প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। কমন্স সভার অধিকাংশের সমর্থন যতদিন প্রধানমন্ত্রী লাভ করতে সক্ষম হন, ততদিন তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করতে পারেন, যা প্রেসিডেন্ট কল্পনাও করতে পারেন না। রামজে ম্যুইর (Ramsay Muir) বলেন, 'তিনি আগে ভাগেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, এমন ধরনের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত হবে, এরূপ আইন প্রণীত হবে এবং এত পরিমাণ অর্থ পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হবে" ("He can give a pledge beforehand that such a treaty will be signed and ratified and that such a law shall be passed or that such amount of money shall be voted by the parliament.")। এ দলীয় ব্যবস্থার জন্যই ইংল্যাণ্ডে 'কেবিনেটের একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

একাদশ, প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসে বাজেট পেশ করতে পারেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা পারেন না। ইংল্যাণ্ডে বাজেট পেশ হয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক। কিন্তু কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের বাজেট প্রত্যাখ্যান করা হয় না।

যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উভয়ই পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত এবং যদিও তারা শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন, তথাপি তাঁদের ক্ষমতা, কার্যাবলি ও প্রভাব প্রতিপত্তির পার্থক্য রয়েছে, কারণ তারা ভিন্ন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

(তিন) আমেরিকার কেবিনেট ও ব্রিটিশ কেবিনেট

আমেরিকার কেবিনেটে ও ব্রিটিশ কেবিনেটের মধ্যে কিছু কিছু মিল রয়েছে।

প্রথম, কোনটিরই আইনগত অস্তিত্ব নেই। প্রথা, রীতি-নীতি ও সুযোগ-সুবিধা থেকে উভয়ে জন্মলাভ করেছে। উভয় রাষ্ট্রে কেবিনেট ব্যবস্থা সংবিধানের বাহিরে জন্মলাভ করেছে। ব্রিটিশ কেবিনেট সম্বন্ধে বলা হয় যে, "তা শুধুমাত্র বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই কাজ করে ও বেঁচে থাকে" ("The cabinet lives and acts simply by understanding")। আমেরিকার কেবিনেট সম্বন্ধেও তা খাটে। "লিখিত সংবিধানে কেবিনেটের কোন উল্লেখ নেই" ("In the written constitution, there is no mention of a cabinet")।

দ্বিতীয়, উভয় রাষ্ট্রে কেবিনেট সংস্থা ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বে সংহতি লাভ করে। ব্রিটেনে তা প্রধানমন্ত্রী এবং আমেরিকায় প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত হয়, কার্যকারিতা লাভ করে এবং সচল সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

তৃতীয়, উভয় বিশিষ্ট ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। কেবিনেটের আলোচনা গোপন থাকে এবং তাদের দ্বারা নীতি নির্ধারিত হয়। তবে কিছু কিছু মিল থাকলেও তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত, ব্রিটেনে কেবিনেট শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি বলে পরিগণিত, কিন্তু আমেরিকায় তা সহকারি, কেননা প্রেসিডেন্ট শাসন বিভাগের অধিকর্তা। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা কেবিনেট ব্যতীত অচল, কিন্তু কেবিনেট বাদ দিলে আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হলেও তা অচল হয়ে পড়ে না।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ কেবিনেটের সদস্যগণ আইন পরিষদের সদস্য এবং আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন, কিন্তু আমেরিকার কেবিনেটের সদস্যগণ কংগ্রেসের সদস্য হতে অসমর্থ। কংগ্রেসের নিকট তাঁরা দায়ীও থাকেন না।

তৃতীয়ত, ইংল্যাণ্ডের রাজা কেবিনেটের পরামর্শমত শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং তাঁরা যতদিন পর্যন্ত কমন্স সভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদিন তিনি তাদের অপসারণ করেন না। কিন্তু আমেরিকার কেবিনেটের সদস্য প্রেসিডেন্টের অধীনস্থ কর্মকর্তার ন্যায়। তিনি তাঁদের পরামর্শমত কাজ করতে বাধ্য নন এবং যে কোন সময় তিনি তাদের বরখাস্ত করতে পারেন।

চতুর্থত, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সদস্যগণকে সাধারণত তাঁর দল থেকে মনোনীত করেন যদিও সম্মিলিত মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দল থেকেও তিনি সদস্য গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট স্বীয় দল থেকে, এমনকী দল নিরপেক্ষ সদস্যকেও কেবিনেটে গ্রহণ করতে পারেন।

পঞ্চমত, ব্রিটিশ কেবিনেটের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন হয়, কিন্তু আমেরিকার কেবিনেট তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর। এখানে মাত্র দশজন বিভাগীয় কর্মকর্তা সহযোগে কেবিনেট গঠিত হয়।

ষষ্ঠত, ব্রিটিশ কেবিনেট কমন্স সভার নিকট যৌথভাবে সকল কার্যের জন্য দায়ী, কিন্তু আমেরিকার শাসন সংক্রান্ত সকল কার্যের জন্য প্রেসিডেন্ট দায়ী। আমেরিকার কেবিনেট মূলত প্রেসিডেন্টের নিকট দায়ী।

সপ্তমত, ব্রিটিশ কেবিনেট কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। রাজার প্রত্যেক কার্যে ও আদেশে কেবিনেটের কোন না কোন সদস্যের স্বাক্ষর থাকে এবং উক্ত কার্যের জন্য তিনি দায়ী থাকেন। কিন্তু আমেরিকার কেবিনেট শাসনব্যবস্থা নেহায়েত গৌণ।

অষ্টমত, ব্রিটিশ কেবিনেটের নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ও সভার কার্যবিবরণী রয়েছে। তা লিখিত হয় এবং সংরক্ষিত হয়। কিন্তু আমেরিকার অনুরূপ কোন কার্যবিবরণী বা কার্যধারা নেই। কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে প্রেসিডেন্ট তা নিজের সিদ্ধান্ত বলে প্রচার ও প্রকাশ করেন।

নবমত, আমেরিকার কেবিনেট সরকারি নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম নয় এবং আইন প্রণয়নে সদস্যগণের কোন ক্ষমতা থাকে না। কংগ্রেসের কার্যাবলিতে তাঁরা অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম নন। কিন্তু ব্রিটিশ কেবিনেট পার্লামেন্টের নেতৃত্ব দান করেন এবং সরকারি নীতি নির্ধারণ করেন। আইন প্রণয়নে কেবিনেটের নেতৃত্বই মূল কথা।

দশমত, কমন্স সভার সাথে মতবিরোধ হলে ব্রিটিশ কেবিনেট জনগণের নিকট চরম আবেদন করতে পারেন এবং পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে কমন্স সভা সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু আমেরিকার কেবিনেটের অনুরূপ ক্ষমতা নেই।

সর্বশেষে, অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "ব্রিটিশ কেবিনেটের সদস্যবৃন্দ ঝানু রাজনীতিজ্ঞ ও ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়ক", কিন্তু আমেরিকার কেবিনেটের সদস্যবৃন্দ সে তুলনায় অনেকটা অখ্যাত ও অজ্ঞাত। ক্ষমতায়, প্রতিপত্তিতে, প্রভাবে এবং অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশ কেবিনেট আমেরিকার কেবিনেট অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয় ও কার্যকর।

(চার) কমন্স সভা ও প্রতিনিধি পরিষদ
The House of Commons and House of Representatives

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম কক্ষ কমন্স সভা আমেরিকার কংগ্রেসের প্রথম কক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের বা প্রতিনিধি পরিষদের মত হলেও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে ঃ

প্রথমত, কমন্স সভার আয়ুষ্কাল ৫ বছর, কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদের আয়ুষ্কাল ২ বছর। কমন্স সভা প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে রাজা বা রানী কর্তৃক ৫ বছরের পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদের আয়ু ২ বছর।

দ্বিতীয়ত, কমন্স সভা ৬৫০ জন সদস্য সহযোগে বর্তমানে সংগঠিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদে ৪৩৫ জন সদস্য রয়েছেন। সুতরাং তুলনামূলকভাবে কমন্স সভা বৃহত্তর কক্ষ।

তৃতীয়ত, প্রতিনিধি পরিষদের পদ লাভ করতে হলে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হয়, কমন্স সভায় নিম্নতর বয়ঃসীমা ১৮ বছর।

চতুর্থত, কমন্স সভার সভাপতি বা স্পীকার (Speaker) নির্দলীয় ব্যক্তি। তিনি স্পীকার নির্বাচিত হলে দলের সাথে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন, কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার দলীয় নেতা। তিনি দলের পক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দলকে সংহত করতে উদ্যোগী হন।

পঞ্চমত, প্রতিনিধি পরিষদে আইনের খসড়া বেসরকারি সদস্য কর্তৃকও উত্থাপিত হয় এবং প্রেসিডেণ্ট বা তাঁর কেবিনেটের সদস্যগণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কোন নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু কমন্স সভায় আইন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে কেবিনেট নেতৃত্ব দান করেন। এখানে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভার নেতা।

ষষ্ঠত, কমন্স সভা ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কারণ কেবিনেট তার কার্যাবলি ও নীতির জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদের অনুরূপ কোন ক্ষমতা নেই।

সপ্তমত, ব্রিটেনের কমন্স সভা ও লর্ড সভার অধিবেশন একই সময়েই শুরু হয়, কিন্তু আমেরিকার সিনেটের অধিবেশন শুরু হলেও প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন শুরু নাও হতে পারে।

সর্বশেষে, দ্বিতীয় কক্ষের তুলনায় প্রতিনিধি পরিষদ অনেকটা দুর্বল, কিন্তু কমন্স সভা প্রকৃত পক্ষে ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট। লর্ড সভার তুলনায় তা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও প্রবল। লর্ড সভা খুব জোর কমন্স সভার কার্যাবলিকে কিছুদিন দেরি করাতে পারে, কিন্তু সিনেটের ন্যায় তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

(পাঁচ) আমেরিকার সিনেট ও ব্রিটিশ লর্ড সভা

ব্রিটেনের লর্ড সভা আমেরিকার সিনেট উভয়ই উচ্চ পরিষদ। কিন্তু দুটি উচ্চ পরিষদের মধ্যে গঠন ও কার্যাবলির দিক থেকে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, সিনেটের সদস্যবৃন্দ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং নিম্ন পরিষদের সমতুল্য বা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতা উপভোগ করেন। লর্ড সভার সদস্যবৃন্দ জন্মসূত্রে সদস্যপদ অর্জন করেন এবং তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

দ্বিতীয়ত, সিনেটের গঠন ও লর্ড সভার গঠনে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সিনেট গঠিত হয়েছে। সিনেটের সদস্য সংখ্যা ১০০ জন। কিন্তু লর্ড সভার সদস্যগণ পদ ও বংশমর্যাদার ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে বিভক্ত এবং তার সদস্য সংখ্যা নয় শতের উপর।

তৃতীয়ত, সিনেটের সভাপতি আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং, কিন্তু লর্ড সভার সভাপতি লর্ড চ্যান্সেলার। ভাইস প্রেসিডেণ্ট সিনেটের একজন শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, কিন্তু লর্ড চ্যান্সেলার সভাপতিত্ব ও ভোট গ্রহণ ছাড়া প্রায় কিছুই করেন না।

চতুর্থত, গুরুত্ব ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে বিচার করলে সিনেট লর্ড সভা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর কক্ষ বলে পরিগণিত। সিনেট কেবল আইন পরিষদই নয়, শাসন বিভাগীয় পরিষদও বটে। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে সিনেট প্রতিনিধি পরিষদের সমতুল্য ক্ষমতা উপভোগ করেন। কিন্তু লর্ড সভার আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং কমন্স সভার তুলনায় নেহায়েত নগণ্য।

পঞ্চমত, সিনেটের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা তাকে অনেক মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছে। প্রেসিডেণ্টের নিয়োগ ব্যবস্থার চূড়ান্ত অনুমোদন, প্রেসিডেণ্টের সন্ধি বা চুক্তির অনুমোদন, এমনকী প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অভিশংসন (Impeachment) পরিচালনা করার অধিকারী সিনেট। লর্ড সভার অনুরূপ কোন শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা নেই। তবে বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ড সভা সিনেট সমতুল্য ক্ষমতা অর্জন করেছে, এমনকি বেশিও বলা যেতে পারে, কেননা লর্ড সভা ইংল্যাণ্ডে সর্বোচ্চ আপীল আদালত। তাই অধ্যাপক ফাইনার (Finer) বলেছেন, "সিনেটের ক্ষমতা প্রভূত। সম্ভবত বর্তমান পৃথিবীতে এমন প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করতে কোন দ্বিতীয় কক্ষ সিনেটের সাথে তুলনীয় নয়" ("The powers of the Senate are very great. Probably no second chamber in the world today has an influence so real and direct.")।

ষষ্ঠত, লর্ড সভায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপিত হয় না। আর্থিক বিল সম্বন্ধে লর্ড সভার কোন ক্ষমতা নেই। লর্ড সভা একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্রিটেনের ইতিহাসের সাথে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিনেট লর্ড সভা অপেক্ষা অনেক বেশি তৎপর, কার্যকর ও প্রভাবশালী পরিষদ।

(ছয়) কমন্স সভার স্পীকার এবং প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার

আটলাণ্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে মহান আইন পরিষদের সভাপতি বা স্পীকারের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান ঃ

প্রথমত, কমন্স সভার স্পীকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ভিত্তিমূল চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতি যা যুগ যুগ ধরে ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকারের ক্ষমতা ও প্রভাবের মূল লিখিত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কমন্স সভার স্পীকার নির্বাচিত হন যদিও পরিষদ কর্তৃক তথাপি তিনি মূলত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর কেবিনেটের সহকর্মিগণের দ্বারাই মনোনীত হন। আইনগত দিক থেকে কমন্স সভা কর্তৃক তিনি নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 'ককাস' (Caucus) কর্তৃক আসলে তিনি মনোনীত।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনের স্পীকার সর্বতোভাবে নির্দলীয় ব্যক্তি। আমেরিকার স্পীকার দলীয় নেতাই বটে। কমন্স সভার স্পীকার পরবর্তীকালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে থাকেন, কিন্তু আমেরিকার

স্পীকারের দল পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে তাঁর স্পীকার হবার আশা তিরোহিত হয়। ব্রিটেনে স্পীকারের নির্বাচন কেন্দ্রে বিরোধী দল প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করায় না।

চতুর্থত, ব্রিটেনের স্পীকার অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বছরের পর বছর ধরে পরিষদ পরিচালনা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা আমেরিকার স্পীকারের তুলনায় অত্যন্ত অধিক। আমেরিকার স্পীকার সুযোগ ও সুবিধা মত একবার বা দু বার পদাভিষিক্ত হয়ে অভিজ্ঞতার দোরগোড়ায় হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেও পারেন যদি তাঁর দল পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়।

পঞ্চমত, ব্রিটেনের স্পীকার আমেরিকার স্পীকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী, কারণ তিনি পরিষদের সসদস্যগণকে বিধি-ভঙ্গের জন্য বা অন্য কোন আচরণের জন্য শাস্তি দিতে পারেন। তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারেন। এমনকী তাঁদের সদস্য পদ স্থগিত করতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন উর্ধ্বতন ব্যক্তির নিকট আপীল করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমেরিকার স্পীকারের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। তিনি কোন সদস্যকে শাস্তি দিতে পারেন না বা তাঁদের সদস্য পদ স্থগিত (suspend) করতেও পারেন না।

(সাত) আমেরিকা ও ব্রিটেনের আইন পরিষদের কমিটি ব্যবস্থা

প্রথমত, আমেরিকার আইন প্রণয়নের কমিটি ব্যবস্থার যে গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়, ব্রিটেনে তুলনামূলকভাবে তা অনেক কম।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকার তুলনায় ব্রিটেনের স্থায়ী কমিটির সংখ্যা অত্যন্ত কম। ব্রিটেনে প্রত্যেকটি কমিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করে এবং তুলনামূলকভাবে তারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনের তুলনায় আমেরিকার কমিটির সদস্য সংখ্যা অনেক কম। ব্রিটেনে কমিটিগুলো সাধারণত ৪০ হতে ৬০ জন সদস্য সহযোগে গঠিত হয়। অপরপক্ষে আমেরিকায় তাদের সংখ্যা সাধারণত হয় ২ থেকে ৩৫ জন পর্যন্ত।

চতুর্থত, আমেরিকার কমিটি গঠনে বয়স ও অভিজ্ঞতার মর্যাদা দেয়া হয়। দলের নেতৃস্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সাধারণত কমিটিগুলোর সভাপতি নির্বাচিত হন। ব্রিটেনে কমিটি গঠনে বয়ঃসীমা বা অভিজ্ঞতার তেমন মূল্যবোধ স্বীকৃত হয় না।

পঞ্চমত, আমেরিকার কমিটি ব্যবস্থায় দলীয় প্রভাবগুলো অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেনে নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে কমিটিসমূহের সভাপতি নিযুক্ত হন।

ষষ্ঠত, আমেরিকার কমিটিগুলো অধিকতর শক্তিশালী। পরিষদে পেশ করার পূর্বে সেখানে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার বিল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। ব্রিটেনের কমিটিগুলোর ক্ষমতা সীমিত। সর্বপ্রকার বিল এখানে কমিটি কর্তৃক আলোচিত হয় না। সাধারণত প্রথম রিডিং-এর পরে ব্রিটেনে বিলগুলো কমিটির হাত দেয়া হয়, যাতে কোন ত্রুটি থাকলে দূর করা যেতে পারে। আমেরিকার কোন বিল পরিষদে আলোচিত হবার পূর্বেই কমিটি তা পর্যালোচনা করে। পরিষদে উত্থাপিত হতে পারে কীনা তাও বিচার করা হয়।

সপ্তমত, ব্রিটেনে কোন বিলকে ফাইলের তলায় চাপা দিয়ে নষ্ট করতে সক্ষম হয় না। পরিষদের নিকট তার রিপোর্ট করতে কমিটি বাধ্য থাকে। কিন্তু আমেরিকার কমিটি ইচ্ছা করলে বা কোন বিল ত্রুটিপূর্ণ হলে তা সমূলে বিনাশ করতে পারে এবং পরিষদে আলোচনা করার জন্য পেশ নাও করতে পারে।

(আট) আমেরিকার দলীয় ব্যবস্থা ও ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার তুলনা

আমেরিকার সংবিধান রচয়িতাগণ রাজনৈতিক দলের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি, কারণ দলীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁরা আস্থাশীল ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট জেফারসনের আমল থেকে দলীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি হয় আমেরিকায়। বর্তমানে দলীয় ব্যবস্থার ব্যাপকতা আমেরিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। রাজনৈতিক দল আজকাল আমেরিকান বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করছে এবং পথ রচনা করছে। রাজনৈতিক দল ব্যতীত আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা প্রায় অচল। তাই সত্যই বলা হয়ে থাকে, "যে প্রস্তরখণ্ড নির্মাতাগণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই আজ প্রধান প্রস্তরখণ্ডে রূপলাভ করেছে" ("The stone which the builders rejected has today become the chief corner stone")।

(এক) ব্রিটেনের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ন্যায় আমেরিকাতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে আমেরিকায় রিপাবলিকান (Republican) ও ডেমোক্র্যাটিক (Democratic) এ দুটি প্রধান দল রয়েছে। ব্রিটেনেও উদারনৈতিক দল ব্যতীত রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল রয়েছে। উদারনৈতিক দল (Liberal party) শাসন ব্যবস্থায় প্রায় অনুভূত হয় না।

(দুই) উভয় দেশেই সংগঠনের দিক থেকে দলীয় ব্যবস্থায় বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। দলীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। দলসমূহের বিভিন্ন কমিটি, ইউনিয়ন এবং সংস্থা রয়েছে এবং সংগঠন কার্যের সুবিধার জন্য দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু উভয় দেশে দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর।

প্রথমত, ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং সরকারি নীতি ও কার্যের মধ্যে দিয়ে দল তার আদর্শ ও নীতি প্রচারে উদ্যোগী হন। কিন্তু আমেরিকার দলীয় ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। তবে দলগুলো শাসন বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর ন্যায় আমেরিকার রাজনৈতিক দলগুলো অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে নি এবং তাদের আদর্শগত পার্থক্য তেমন স্পষ্ট নয়। ব্রিটেনের রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে যেরূপ তীব্র মতপার্থক্য রয়েছে, আমেরিকার দলগুলোর মধ্যে তেমন স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে না। গণতান্ত্রিক দল (Democratic Party) অধিকতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী এবং রিপাবলিকান দল (Republican Party) অধিকতর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। তাদের মধ্যে নীতি ও আদর্শের তেমন পার্থক্য লক্ষণীয় নয়।

তৃতীয়ত, দলীয় সমর্থনের প্রয়োজন ব্রিটেনে যেমন অনুভব করা হয়, আমেরিকায় তেমনভাবে অনুভব করা হয় না। প্রেসিডেণ্ট সাধারণত কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, কিন্তু যদি তিনি কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভে সক্ষম না হন, তা হলেও শাসনকার্য কোনরূপে চালিয়ে যেতে পারেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী দলের অনুশাসন উপেক্ষা করতে অক্ষম, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট জাতীয় স্বার্থে দলকে উপেক্ষাও প্রদর্শন করতে পারেন।

চতুর্থত, ব্রিটেনের সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সহযোগিতার মনোভাব বিদ্যমান আমেরিকায় তা নেই।

পঞ্চমত, আমেরিকায় রাজনৈতিক দলগুলো ব্রিটেনের চেয়ে অধিকতর সুসংবদ্ধ, সুসংহত ও সুপরিচালিত। ঘন ঘন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার ফলে আমেরিকায় দলীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত নিপুণ হয়ে উঠেছে।

১। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা কর। (Compare and contrast the powers and functions of the American President with those of the British Prime Minister.)

২। আমেরিকার কেবিনেট ব্যবস্থার সাথে ব্রিটেনের কেবিনেট ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দেশ কর। (Bring out the points of similarity and difference between the British Cabinet and the American Cabinet system.)

৩। ক্ষমতা, কার্যাবলি ও প্রভাবের দিক থেকে হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ও হাউজ অব কমন্সের তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of the House of Representatives and the House of Commons in points of their powers, functions and influence.) [D. U. '84]

৪। হাউজ অব লর্ডসের সাথে আমেরিকার সিনেটের তুলনা করে তাদের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা কর। (Compare the British House of Lords with the American Senate in terms of composition and functions.) [N. U. 1996]

৫। ব্রিটেনের হাউজ অব কমন্সের স্পীকার ও আমেরিকার হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পীকারের অবস্থা, মর্যাদা ও কার্যাবলি তুলনা করে আলোচনা কর। (Compare the position and functions of the Speaker of the British House of Commons with those of the Speaker of the American House of Representatives.)

৬। আমেরিকার কংগ্রেস ও ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখে আলোচনা কর। (Compare and contrast the Committee system in British Parliament and American Congress.)

৭। আমেরিকার দলীয় ব্যবস্থা ও ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of the party systems in Great Britain and America.) [D. U.. '84]

৮। আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির সাথে গ্রেট ব্রিটেনের হাউজ অব কমন্সের ক্ষমতা ও কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা কর। (Compare the powers and functions of American House of Representatives with those of House of Commons in Great Britain.) [D. U. 1984]

৯। "আমেরিকার সিনেট সভা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ।" উক্তিটি পর্যালোচনা কর। ("The Senate of the U. S. A. is the most powerful second chamber in the world." Examine the Statement.) [D. U. 1984 ; R. U. 1983]

১০। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা কর। ("Make a comparative study of the Political systems of the U.S.A and the U. K.] [N. U. 1997]

সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন পদ্ধতি

৪

THE CONSTITUTION OF SWITZERLAND

সূচনা
Introduction

জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি ও ফ্রান্সের মাঝামাঝি অবস্থিত প্রকৃতির লীলানিকেতন ও সৌন্দর্যের রানী সুইট্জারল্যাণ্ড। এ রাষ্ট্রে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক বাস করে। সুইট্জারল্যাণ্ড ১৯টি ক্যান্টন ও ৬টি অর্ধ ক্যান্টন সমন্বয়ে গঠিত। এখানে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের কোন নিদর্শন নেই। বিভিন্ন ভষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে অথচ এত অনৈক্যের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণ কোন জটিলতা সৃষ্টি করে নি। তাই সংবিধানের ছাত্রদের সুইট্জারল্যাণ্ডের সংবিধান আলোচনা করা কর্তব্য।

সুইস সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of the Swiss Constitution

সুইট্জারল্যাণ্ডের সংবিধান পাঠ করলে সর্বপ্রথম যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার পূর্ণ অনুশীলন ও প্রয়োগবিধি। গণউদ্যোগ (Initiative) ও গণভোট (Referendum) পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বনে নির্বাচকমণ্ডলী শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করেন তা নয়, আইন প্রণয়ন, সন্ধি স্থাপন, এমন কী সংবিধানের সংশোধনেও অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়, সুইট্জারল্যাণ্ডে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ১৯টি ক্যান্টন ও ৬টি অর্ধক্যান্টন রয়েছে। প্রত্যেক ক্যান্টন ও অর্ধক্যাণ্টনের নিজস্ব সরকার রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যাণ্টনগুলোর সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন নির্দিষ্টভাবে নিরূপিত হয়েছে। সামরিক ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যানবাহন, ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা ক্যাণ্টনগুলোর হাতে ন্যস্ত। এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের দ্বারা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের সমাধান করা হয়।

তৃতীয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে এখানে সংবিধান হয়েছে লিখিত। সংবিধানে বিশদভাবে শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অবশ্য যুগে যুগে নানা প্রথা ও রীতিনীতি সংযোজিত হয়ে তা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ, সুইট্জারল্যাণ্ডের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের যে কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করতে পারেন। কিন্তু সে প্রস্তাব আইন পরিষদের উভয় কক্ষে গৃহীত হলে তা জনমত দ্বারা সমর্থিত হবার জন্য গণভোট গ্রহণ করা হয়। তা জনসাধারণের অধিকাংশ কর্তৃক সমর্থিত হলে চলবে না, ক্যাণ্টনগুলোর অধিকাংশ কর্তৃকও সমর্থিত হতে হবে। তাছাড়া ৫০ হাজার নির্বাচকমণ্ডলী

যদি সংশোধনী দাবি করে তা হলে গণ–উদ্যোগের মাধ্যমে বিলের আকারে তা প্রস্তাবিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদে তা সমর্থিত হলে গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। গণভোটে যদি জনসংখ্যা ও ক্যান্টনগুলোর অধিকাংশ তা সমর্থন করে তা হলে সংশোধন কার্যকর হয়।

পঞ্চম, নাগরিকদের স্বাধীনতা সেখানে বিভিন্নভাবে সংরক্ষিত হয়। যদিও মৌলিক অধিকারের কোন অধ্যায় সংবিধানে সংযোজিত হয় নি, তথাপি বিভিন্ন অধ্যায় নাগরিকগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা সম্বলিত বিধিবিধান রয়েছে।

ষষ্ঠ, সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন ক্ষমতা সম্মিলিতভাবে কয়েকজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত প্রথার অনুরূপ নয়। প্রেসিডেন্ট শাসন ব্যবস্থার মতও নয়, যদিও মন্ত্রিপরিষদ এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির অনেক অংশই এখানে বিদ্যমান। এখানকার শাসন বিভাগকে সম্মিলিত বা যৌথ ব্যবস্থা (Collegiate) বলা হয়। এর তুলনা কোথাও মিলে না।

সপ্তম, সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় আইন পরিষদের গুরুত্ব অধিক হওয়ায় এখানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় নি।

সর্বশেষে, সংবিধানগতভাবে এটি একটি রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) বলে পরিচিত হলেও প্রকৃতভাবে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

সুইট্জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা
Nature of Swiss Federation

(এক) সুইট্জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুরূপ। উভয় রাষ্ট্রের কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য গুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতার বণ্টন সংগঠিত হয়েছে। ক্ষমতার বণ্টন বিধিও অনেকটা একই ধরনের। যতদূর পর্যন্ত সংবিধান ক্যান্টনগুলোর সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে নি ততদূর পর্যন্ত তারা সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন। বর্তমানে যেমন ৫০টি অঙ্গরাজ্য সমন্বয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত, তেমনি ১৯টি ক্যাণ্টন ও ৬টি অর্ধ–ক্যাণ্টন সমন্বয়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

(দুই) তত্ত্বগতভাবে আমেরিকার ন্যায় সুইট্জারল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সেখানেও সংবিধান কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলোর সকল ক্ষমতার উৎস।

(তিন) আমেরিকার ন্যায় সুইট্জারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় সরকার সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেছে। এখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র সমবায় অনেক ক্ষেত্রেই ক্যাণ্টনগুলোর পরিদর্শক ও শিক্ষাগুরুতে পরিণত হয়েছে" ("It really turns the confederation into a tutor and inspector of the cantons")। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে সুইট্জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রভূত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

প্রথম, আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট যেমন কংগ্রেস প্রণীত আইনগুলো সংবিধান সম্মত কিনা তা বিচার করে দেখেন এবং বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করেন, সুইট্জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তেমনভাবে দেখতে পারেন না, কেননা তার ক্ষমতা এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সীমিত। এখানে বরং ব্রিটেনের পার্লামেন্টের প্রাধান্যের ন্যায় আইন পরিষদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়, সুইট্জারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে এটিও লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের অধিকার ক্যাণ্টন গুলোর উপর অর্পণ করা হয়েছে। আমেরিকায় তা পরিদৃষ্ট হয় না। তা ছাড়া, এখানে শাসন ব্যবস্থায় ক্যাণ্টনগুলোর যতটুকু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রভাব ততটুকু নেই। তাই ক্যাণ্টনগুলো সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "ক্যাণ্টন ও অর্ধক্যাণ্টন গুলো বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ন্যায়। অনাদিকাল থেকে তারা পরম আগ্রহে তাদের রাজনৈতিক সংগঠনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে উঠে পড়ে লেগেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নততর করতে দৃঢ় সংকল্প রয়েছে" ("The cantons and the half-cantons are all so many small nations, animated by a ceaseless desire to perfect their political organisations and to develop their democratic institutions")।

সর্বশেষে, সুইট্জারল্যাণ্ডের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি আমেরিকার ন্যায় দৃঢ়ভাবে ও স্পষ্টরূপে অনুসরণ করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা উপভোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। এখানে ব্রিটেনের মত আইন পরিষদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাই ডাইসি বলেছেন, "সুইট্জারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হয় যার লক্ষ্য এককেন্দ্রিকতা অর্জন" ("Under a form of democratic federalism which tends towards unitarianism")।

সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থার এক বিশিষ্ট দিক হলো গণভোট ও গণ-উদ্যোগের অপূর্ব প্রয়োগ বিধি ও তাদের সুষ্ঠু কার্যকারিতা। এদের সাফল্য পৃথিবীর শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। লর্ড ব্রাইস বলেন, "গণতন্ত্রের ছাত্রের নিকট সুইট্জারল্যাণ্ডের এ অভূতপূর্ব ব্যবস্থার ন্যায় বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় বস্তু আর কিছুই নেই। তা জনগণের মনের বাতায়ন মুক্ত করে দেয়" ("Nothing in the Swiss arrangement is more instructive to the students of democracy than this ; for it opens a window into the soul of the multitude")।

গণভোট (Referendum) ও গণ-উদ্যোগ (Initiative) ব্যতীত সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের মতামত প্রকাশের জন্য গণসমাবেশ (Popular Assembly) অনুষ্ঠিত হয়। গণ সমাবেশ সাধারণত মুক্ত অঙ্গনে একজন নির্বাচিত সভাপতির সভাপতিত্বে পরিচালিত হয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকই এত অংশগ্রহণ করতে পারে। এ সকল গণসমাবেশে বিবিধ প্রস্তাব আনয়ন করা হয় এবং আইন প্রণয়নও করা হয়। অর্থ সংক্রান্ত বা সরকার সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা করা ও জনমতের প্রতিফলনে সরকারি নীতিও নির্ধারিত হয়। এ ধরনের গণ অধিবেশন সত্যই অনন্য। এ সম্বন্ধে ব্রুক্স (Brooks) বলেন, "এটি সুইট্জারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, এমন কী সমস্ত বিশ্বে, সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও বিচিত্র" ("It is the most picturesque and fascinating of all political institutions in Switzerland and perhaps in the world.")। আইন পরিষদ প্রণীত কোন আইনকে কার্যকর বা বাতিল করার জন্য আইনকে গণভোটে দেয়ার প্রচলন সুইট্জারল্যাণ্ডে এক অনবদ্য ব্যবস্থা। গণভোট দু প্রকারের হতে পারে, বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক।

আইন পরিষদে সমর্থিত হয়ে সকল আইনকে বাধ্যতামূলকভাবে গণভোটে দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকের উদ্যোগে যখন কোন আইনকে গণভোটে দেয়ার দাবি করা হয় তখন তা ঐচ্ছিক গণভোটরূপে পরিচিত হয়। শাসনতন্ত্রের সকল সংশোধনী প্রস্তাব বাধ্যতামূলক গণভোটের আওতায় পড়ে। সাধারণ

আইনসমূহ ঐচ্ছিক গণভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুইট্জারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সংশোধনে গণ-উদ্যোগ ও গণ-সমাবেশ প্রযুক্ত হয়। কোন কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী বিলের খসড়া পেশ করে। আইন পরিষদে তা প্রত্যাখ্যান করা হলে গণভোটে প্রদান করা হয়।

এখানে প্রচলিত গণভোট, গণ-উদ্যোগ ও গণ-সমাবেশের প্রচলন বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ সকল পদ্ধতির মাধ্যমে আইন পরিষদের ত্রুটিপূর্ণ, স্বৈরাচারী ও জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়েছে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে যে প্রতিনিধিদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পদ্ধতিসমূহ তা রোধ করে। তাছাড়া, সুইট্জারল্যাণ্ডের দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে নমনীয় হয়ে উঠেছে। আইনসভা নিষ্ক্রিয়তা অপসারণ করে শিক্ষামূলক ও নৈতিক মান বৃদ্ধি করে এবং জনগণকে প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তা সত্যই সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থাকে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের কারণ ঃ সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রধানতম কারণ সুইস জনগণের শিক্ষা ও সচেতনতা। জনগণের উপরই গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে এবং সুইস জনসাধারণ তাদের ভূমিকা অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করে। তাই এখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হলো দেশের মাটির স্বাভাবিক ফসল। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "এটি মাটির স্বাভাবিক সৃষ্টি এবং এখানকার পার্বত্য ভূমিতে এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়ায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে" ("A natural growth of the soil which like plants flowering only on their own hillside and under their own sunshine.")।

দ্বিতীয়, সুইট্জারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সুইস নাগরিকদের জীবন থেকে আন্তর্জাতিক সকল জটিলতা দূর করে দিতে সমর্থ হয়েছে। ফলে সকলে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হতে পেরেছে।

তৃতীয়, আর্থিক বৈষম্যের কলঙ্কে সুইস সমাজ জীবন তেমনভাবে কলঙ্কিত হয় নি। সকলেই কর্মঠ এবং সকলেই কঠোর পরিশ্রমী। সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনে সকলেই অভ্যস্ত।

চতুর্থ, রাজনৈতিক দলের প্রভাব সেখানে অত্যন্ত অল্প। পেশাদারী রাজনীতি নেই বললেই চলে। ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সকলে আগ্রহী সমানভাবে। দলগত উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা এখানে নেই।

সর্বশেষ, সুইট্জারল্যাণ্ড অতি অল্পসংখ্যক অধিবাসী সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র বলেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত হতে পেরেছে। এর সফলতার মূলে রয়েছে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রায়তন এবং ক্ষুদ্র জনসংখ্যা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ
Federal Council

সুইট্জারল্যাণ্ডে শাসন বিভাগীয় সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Federal Council) উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ পরিষদের মাধ্যমে যে সম্মিলিত শাসনব্যবস্থা (Colegiate Executive) পরিচালিত হয় তা শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে অনন্য (A class by itself)। এখানে একজনের পরিবর্তে সাতজন সদস্যের হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এ সাতজন সদস্য সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট। পরিষদের সভাপতি সুইট্জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নামে পরিচিত। পৃথিবীর এ একটি মাত্র দেশে যৌথ শাসন বিভাগ (Plural Executive) বর্তমান।

এখানে ব্রিটেনের দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা ও আমেরিকার শাসন বিভাগীয় দায়িত্বের মধুর সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রশ্নের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু আইন পরিষদের অনাস্থাসূচক ভোটে শাসন পরিষদ ইংল্যাণ্ডের কেবিনেটের মত পদত্যাগ করেন না।

এ ব্যাপারে বিনা দ্বিধায় খোলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে পরিষদের সদস্যগণ আইন পরিষদের নির্দেশ মেনে চলেন এবং চার বছর পর্যন্ত, ডাইসীর কথায়, 'এক যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের' ('Joint stock company') ন্যায় অপ্রতিহতভাবে ক্ষমতায় আসীন থাকেন।

এখানকার শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। পার্লামেণ্টারী নীতি অনুযায়ী আইন পরিষদ থেকে শাসন পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। তাঁরা আইন পরিষদে উপস্থিত থাকতে এবং প্রয়োজন হলে বিলও উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির ন্যায় শাসন পরিষদে নির্বাচিত হলেও তাদের আইন পরিষদে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া, তাঁরা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন এবং আইন পরিষদ তাদের অপসারিত করতে অক্ষম।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। এখানে দলীয় ব্যবস্থার তেমন গুরুত্ব না থাকায় কেবিনেটের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ সংহতি পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে দেখা যায় না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা পৃথকভাবে ও পারস্পরিক বিরোধিতার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাই লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বিশেষ আলোচনার বস্তু"। সত্যই বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক সংস্থা যা নাগরিকগণের নিকট দায়িত্বশীল থেকেও শুধুমাত্র শাসন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারেন তা নয়, তা দল নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিবদমান দল সমূহের মধ্যে তা শান্তি স্থাপন ও সমঝোতা সৃষ্টিও করতে পারেন।

পরিষদের সাতজন সদস্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সদস্যগণ পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের পুনর্গঠনের সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পুনর্গঠন সাধিত হয়। সাধারণত একই ক্যাণ্টনের সদস্যগণের মধ্যে থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের একাধিক সদস্য নির্বাচন করা হয় না। প্রতি বছর আইন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করে এবং শাসন পরিষদের সভাপতি সমগ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে পরিচিত হয়। সাধারণত এ পরিষদের জার্মান ভাষাভাষী ক্যাণ্টনগুলো থেকে দুজন প্রতিনিধি এবং ফরাসী ও ইতালী ভাষাভাষী ক্যাণ্টনগুলো থেকে একজন করে সদস্য প্রতিবারই নির্বাচন করা হয়।

পরিষদের কার্যাবলি (Functions) : যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ শাসন বিভাগীয়, আইনসম্বন্ধীয় ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

(এক) শাসন বিভাগের পরিচালক ও নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে এ পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনগুলোর যথার্থ প্রয়োগ ব্যবস্থার তদারক করেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা, ক্যাণ্টনগুলোর সংবিধান সংরক্ষণ করা, ক্যাণ্টনগুলোর বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করা, দেশের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা প্রভৃতি এর কার্যাবলি। তাছাড়া, এ পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারিগণের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন এবং আইন পরিষদের নিকট দেশের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র ব্যবস্থার রিপোর্টও প্রদান করেন। দেশের সুশাসনের জন্য এর সদস্যগণ মূলত দায়ী থাকেন।

(দুই) এ পরিষদ আইন সম্বন্ধীয় অনেক ক্ষমতা উপভোগ করে। সকল গুরুত্বপূর্ণ আইনের খসড়া পরিষদই পেশ করেন আইন পরিষদে। এ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বাজেট প্রণয়ন করে আইন সভায় পেশ করে এবং আইন পরিষদের নিকট কার্যের বিবরণ দান করেন। পরিষদের সদস্যগণ আইন পরিষদে উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু কোন ভোট প্রদান করতে অসমর্থ।

(তিন) যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতান্ত্রিক আইনে বিচার পরিষদ পরিচালনা করেন। ক্যান্টনগুলোতে নির্বাচন প্রভৃতি অভিযোগের আপীলও পরিষদ শুনেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ (Federal Legislature) ঃ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ আমেরিকার কংগ্রেসের মতই দ্বি–কক্ষ বিশিষ্ট। প্রথম কক্ষের নাম জাতীয় পরিষদ (National Council) ও দ্বিতীয় কক্ষের নাম রাজ্য পরিষদ (Council of States)। রাজ্য পরিষদ ৪৪ জন সদস্য সমন্বয়ে সংগঠিত। আমেরিকার সিনেটের ন্যায় রাজ্য পরিষদেও প্রত্যেকটি ক্যান্টন থেকে দুজন করে এবং অর্ধ–ক্যান্টন থেকে একজন করে সদস্য নির্বাচিত হন। সদস্যগণের যোগ্যতা ও নির্বাচনের নিয়মকানুন ক্যান্টন কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

জাতীয় পরিষদ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। বর্তমানে জাতীয় পরিষদ ২০০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। সদস্যগণ চার বছরের জন্য আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। তবে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বহুদিন পর্যন্ত নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নি। মাত্র ১৯৭১ সালে এ অধিকার স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক ২৪,০০০ নাগরিক একজন সদস্য নির্বাচন করেন এবং প্রত্যেক ক্যাণ্টনের সদস্য জাতীয় পরিষদে রয়েছে। ক্যাণ্টনগুলো সদস্যগণকে পদত্যাগ করতেও বাধ্য করে অপসারণ (Recall) পদ্ধতির দ্বারা। ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের যোগ্যতা স্বীকৃত হয়।

রাজ্য পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পরিষদ সভাপতি ও সহ–সভাপতি নির্বাচিত করে। জাতীয় পরিষদের সভাপতি ও সহ–সভাপতি নির্বাচিত হন সদস্যগণের মধ্য থেকে। ব্রিটেনের ও আমেরিকার আইন পরিষদের স্পীকারের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের সভাপতির ক্ষমতা অনেকটা সীমিত।

আইন পরিষদের কার্যাবলি (Functions) ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের হস্তে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত শাসন বিভাগীয় ও বিচার সম্পর্কিত ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য পরিষদে ও জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা সমান হলেও কার্যত রাজ্য পরিষদের ক্ষমতা অনেকটা সীমিত এবং এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ। তবে সদস্যদের নিয়মানুবর্তিতার জন্য দু কক্ষের মধ্যে সংঘাত বাধতে সাধারণত দেখা যায় না। যতদিন পর্যন্ত আইন পরিষদ জনগণের আস্থা উপভোগ করে ততদিন পর্যন্ত তা সর্বশক্তিমান, কেননা আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন বা বিধিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত নাকচ করতে অসমর্থ।

আইন পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক বছরে বাজেট প্রণয়ন, কর ধার্য করা ও ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণ করা, তার অন্যতম প্রধান কার্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের তদারক করা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের তত্ত্বাবধান করা, বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সন্ধি, চুক্তি ও মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করার অনুমোদন দান প্রভৃতি আইন পরিষদকে করতে হয়। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি

স্থাপনের প্রস্তাবে এ পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন। তাছাড়া, আইন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন করে এবং দেশের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। গণভোটের দ্বারা সংবিধানের সংশোধন সম্পন্ন করে আইন পরিষদ। এ দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ও সহ-সভাপতিও নির্বাচিত হন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকগণ নির্বাচিত হন।

সুইট্জারল্যাণ্ডের আইন পরিষদ সম্বন্ধে লর্ড ব্রাইসের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিষদ সদস্য সম্বন্ধে বলেন, "তিনি বুদ্ধিমান, স্থির এবং আবেগবিহীন আইন প্রণেতা। তাই সুইট্জারল্যাণ্ডের জাতীয় পরিষদ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কার্যকর আইন পরিষদ" ("He is solid, shrewd, unemotional or at any rate indisposed to reveal his emotions ; as a result of these qualities of the Swiss legislators the National Assembly has been the most business like legislative body in the world. There are few set debates and still fewer set speeches")।

তবে এ আইন পরিষদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সকলের চোখে পড়ে।

প্রথমত, ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট বা আমেরিকার কংগ্রেসের ন্যায় সুইট্জারল্যাণ্ডের আইন পরিষদে কোন কমিটি ব্যবস্থা নেই। শাসন পরিষদই গণভোট বা গণ-উদ্যোগের প্রভাবে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আইনের খসড়া প্রণয়ন করে ও আইন পরিষদে পেশ করে অথবা আইন পরিষদের যে কোন কক্ষ শাসন পরিষদকে বিল উথাপিত করতে অনুরোধ করে।

দ্বিতীয়ত, সুইট্জারল্যাণ্ডের আইন পরিষদ কর্তৃক কোন আইনকে বৈধতার প্রশ্ন তুলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত নাকচ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, আইন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে কোন সংঘাত সৃষ্টি হলে তার সমাধান আনয়ন করতে পারে।

তবে আইন পরিষদের ক্ষমতা বেশ কিছুটা সীমিত হয়েছে।

প্রথম, আইন পরিষদ শাসনবিভাগের উপর তেমন কোন কর্তৃত্ব করতে পারে না বা অনাস্থাসূচক ভোটে শাসন পরিষদের সদস্যগণ বরখাস্ত করতে পারে না।

দ্বিতীয়, আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও আইন পরিষদ চূড়ান্ত কথা বলতে অক্ষম।

তৃতীয়, আইন পরিষদকে পাশ কাটিয়ে জনসাধারণ আইনের খসড়া গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে উথাপিত করতে পারে এবং তা আইন পরিষদ বিবেচনা করতে বাধ্য।

এ সকল ভেবে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বলেছেন, এথেন্সের ন্যায় "এখানে প্রকৃত গণতন্ত্র চালু রয়েছে এবং দেশে গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে বহু রকম জনসংস্থা বিদ্যমান রয়েছে যা অন্যান্য দেশে দেখা যায় না।" ("It is a real democracy in operation and the country presents a greater variety of institutions based on democratic principles than any other country.")।

১। সুইস্ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? (What are the salient features of the Swiss Constitution?)

২। সুইট্জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। তা কী বাংলাদেশের পক্ষে প্রযোজ্য? (Discuss the salient features of the Swiss Federal Executive. It is applicable to Bangladesh?)

৩। সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগের গুণাবলি বর্ণনা কর। (Describe the merits of the Swiss Executive.)

৪। সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগ আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ কর। (The Swiss Executive System forms a class by itself. Examine this statement.)

৫। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের মধ্যে সুইস শাসন বিভাগ এক অনন্য ব্যবস্থা। ব্যাখ্যা কর। (Swiss Executive is unique among the executives of the modern states, Explain.)

৬। সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসনবিভাগকে আমেরিকা ও ব্রিটেনের শাসনবিভাগের সাথে তুলনা কর। (Compare the Swiss Executive with that of the U.S.A. and Great Britain.)

৭। সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Give a critical estimate of the working of the direct democratic devices in Switzerland.)

৮। গণভোট ও গণ-নির্দেশের মাধ্যমে সুইট্জারল্যাণ্ডের যেভাবে আইন প্রণীত হয় তার বিবরণ দাও। (Discuss the different modes of making laws in Switzerland with special reference to Initiative and Referendum.)

৯। যৌথ দায়িত্ব ব্যতীত কেবিনেট পদ্ধতি কী চলতে পারে? সুইট্জারল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করে উত্তর দাও। (Can the cabinet system work without collective responsibility? Answer this with reference to the Swiss system.)

তৃতীয় খণ্ড

ভারত বিভাগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

SOCIO-ECONOMICAL-POLITICAL BACKGROUND OF THE PARTITION OF INDIA

১

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ আন্দোলনের যথার্থ তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে। নিচে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

ভারত বিভাগের পটভূমি

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ সম্পর্কে নিচে বর্ণিত পাঁচটি মৌলিক বিষয় অনুধাবনযোগ্য, যথা—**(ক) ব্রিটিশ সরকারের বিভাগ করে শাসন করার নীতি (divide and rule)। (খ) উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। (গ) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের প্রতি বৈরীভাব ও দমন নীতি। (ঘ) মধ্যবিত্ত রাজনীতির ফলশ্রুতি হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ। এবং (ঙ) ধর্মভিত্তিক আদর্শ ও ভারতবর্ষের বিশালত্ব।**

বিভাগ করে শাসনের নীতি ঃ 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য যথার্থ। যথার্থই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মানদণ্ড মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে রাজদণ্ডে রূপ লাভ করল। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর মাত্র পাঁচ দশকে ভারতবর্ষের সর্বত্র কোম্পানির প্রভুত্ব অপ্রতিহত হয়ে উঠল। জনগণ পরাধীনতার গ্লানিময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের নিকট থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে এবং পরে বিচার করার দায়িত্বও অর্জন করে। তাই ভারতে কোম্পানির শাসনকার্যের প্রথম পর্ব। কিন্তু একটি বেনিয়া কোম্পানির পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা সঙ্গতও ছিল না, সম্ভবও ছিল না। ফলে শাসনের নামে শুরু হয় শোষণ এবং ন্যায়নীতির নামে শুরু হয় দমন নীতি। শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার এবং দমনই ছিল কোম্পানির হাতে যোগ্য হাতিয়ার।

১৭০৪ সালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসেবে ভারতের মুসলমানরা শাসনকার্যের আওতার বাইরে এসে পড়ে। সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো বৃটেনের অধিবাসীদের জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রাখা হতো। ফার্সি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী প্রবর্তনের ফলে তাঁদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়ে। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী হাওয়ার গতিবেগ লক্ষ্য করে নতুন অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে থাকে এবং ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এ প্রথম প্রায় ৭০০ বছরের মধ্যে হিন্দুরা নিজেদেরকে মুসলমানদের সাথে এক সারিতে দেখতে পেলেন অবহেলিত, শাসন কার্যের আওতা বহির্ভূত এবং শাসিত জনসাধারণ রূপে।

মুসলমানেরা হতাশ হয়ে প্রথমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে ঘৃণা করতে লাগলেন। মুসলিম আইনের পরিবর্তে ইংরেজি আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে মুসলমান আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা অকেজো হয়ে পড়েন। সামরিক ক্ষেত্র থেকে তারা সরে গেলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হতেও তারা দূরে সরে গিয়ে এক অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় ইংরেজদের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। তাছাড়া, ১৮৫৭ সালে 'জাতীয় বিপ্লবে'ও দেখা যায় যে, মুসলমানের শৌর্য-বীর্য একেবারেই নিঃশেষ হয় নি। তাই ব্রিটিশ রাজ শক্তি সুপরিকল্পিত উপায়ে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। বাংলা, বিহার ও আসাম প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমান জমিদারকে উৎখাত করা হয়। তার পরিবর্তে হিন্দু জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। এরূপে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির সকল ক্ষেত্র থেকে মুসলমানরা মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নিমজ্জিত হয় এক দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে। ১৮৭১ সালে ইংরেজ লেখক **ডব্লিউ হান্টার** (W. Hunter) তাঁর **ভারতীয় মুসলমান** (*The Indian Musalman*) শীর্ষক গ্রন্থে মুসলমানদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : 'মাঝে মাঝে মুসলমানরা তীক্ষ্ণ জাতীয়তার মনোভাব ও যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রচণ্ড দক্ষতা প্রদর্শন করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে" (At intervals Muslim exhibited their old intense feelings of nationality and capability of warlike enterprises but in all other respects they are a race ruined under British rule")। এ সময়ে মুসলমানদের অধঃপতনের কথা বলতে গিয়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগে এইচ. সি ব্রাউন (H. C. Brown) বলেন, হিন্দুরা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, দুইশত চল্লিশ জন দেশীয় আইনজীবীর মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান। ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষার প্রতি তাঁদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাঁদের অধঃপতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল।

বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে মুসলমান জমিদারদের পরিবর্তে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর জন্ম হয় এবং তারা ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেন। সর্বোপরি ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিপ্লবের পর তাদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়ে। কোম্পানি সে বিপ্লবের জন্য মূলত মুসলমানদের দায়ী করে এবং তাদের চূড়ান্তরূপে পর্যুদস্ত করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের ইতিহাসে এক সংঘাতময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। আঠার শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের সর্বত্র যেখানে সামন্তবাদ বিধ্বস্ত হয়ে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়েছে, ভারতে সে ক্ষেত্রে নতুন করে সামন্তবাদের জন্ম হয় এবং ঐতিহাসিক ধারায় ভারতের এই নব্য সামন্ত প্রভুদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, কেননা ইংরেজ শক্তি মুসলমানদের হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্য দখল করে এবং শাসন ব্যবস্থায় সুদৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট থাকার জন্য 'বিভাগ করে শাসন চালু রাখো (divide and rule) নীতি অনুসরণ করে এক নতুন সামন্তবাদের সৃষ্টি করে। প্রথমে হিন্দুদের আস্থাভাজন হয়ে মুসলমানদের শক্তিকেন্দ্র ধ্বংস করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম লীগের সাথে সহযোগিতা করে হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের মোকাবেলা করার পথ অনুসরণ করে। ভারতে ব্রিটিশ রাজের এ নীতি কার্যকরভাবে চালু ছিল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। তাই দেখা যায়, ভারতের অতীত ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তেমন গুরুতর আকার কোন দিনই ধারণ করে নি। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে তা এক বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ : ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলে আরও একটি সূত্র কাজ করেছে এবং তা উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। ভারতে যুগে যুগে বহু জাতি বিজয়ীর

বেশে আগমন করেছে এবং মুসলমান জাতি ও ইসলাম ধর্ম ব্যতীত প্রায় সকলেই 'মহাভারতের সাগরতীরে' বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এমনকী ভারতে উদ্ভূত ও প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম পর্যন্ত ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ভারতের ঐতিহ্য এমনি বিচ্ছিন্নতাবাদী। আট শতকের প্রথম দিকে মুসলমানদের ভারত আগমন ইতিহাসের এক বিরাট ঘটনা। ভারতে আগমনের পূর্বে মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই তাদের ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সকল জনপদে। ইরান, তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়ার ইতিহাস এমনই। কিন্তু ভারতে হিন্দু ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও সুস্পষ্ট আদর্শের ফলে তা ইসলামে বিলীন হয় নি, বরং দু ধর্ম ও দু সম্প্রদায় সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পাশাপাশি 'তেল পানির' আকারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবস্থান করেছে। এখানকার ইতিহাসের ধারাই এমনি। তাই দেখা যায়, সার্থক ও অভিজ্ঞ শাসক কোন দিনই এ দুই-এর সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত করতে চান নি। সম্রাট আকবরের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তাই।

ইংরেজ আমলে এ সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হতে থাকে, কেননা প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুসলমানরা এক দরিদ্র এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। তখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের জয়গান শুরু হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব প্রায় সমাপ্ত। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রাণ পেয়েছে। উত্তর আমেরিকায় 'জনগণের জয়গান' সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ভারতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু চিন্তাবিদগণ এমনি পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে তাই নতুন স্বপ্নে বিভোর ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রাণ সঞ্চারে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ ঃ **(এক)** হিন্দু জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা, এবং **(দুই)** হিন্দু ধর্মের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সকল কুসংস্কার ছিল তা দূর করা। বলা বাহুল্য, এ জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামান্তর। বাংলায় রাজা রামমোহন রায়, কেদার রায় প্রমুখ মনীষীর প্রচার, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম এ উভয় ক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন করেছে। পাঞ্জাবের লালা রাজপুত রায় ও দক্ষিণ ভারতের বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদান হিন্দু জাতীয়তাবাদের গতিকে প্রাণবন্ত করেছে। এ সকল চিন্তাবিদ্‌দের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে হিন্দু জাতি সর্বপ্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেছে। এ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা মুসলমানদের দেখেছেন প্রতিবন্ধকরূপে। তাই ইংরেজ অপেক্ষা মুসলমানরাই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য। তখনকার দিনের প্রতিনিধিত্বমূলক বাংলা গ্রন্থ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠের' প্রতি ছত্রে এ জাতীয়তাবাদের জয়গান ও মুসলিম বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে।

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনেও এর প্রকাশ ঘটেছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থনেই তা ১৯১১ সালে রদ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে আলীগড় আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন না হয়েও আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম পুনর্জাগরণের (Muslim Renaissance) স্বপ্নে বিভোর। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রতিষ্ঠা করে কালের গতির সাথে তাদের সুসংহত করতে তিনি কৃতসংকল্প। সৈয়দ আমীর আলীর লেখনী, নওয়াব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টা, সৈয়দ আলতাফ হোসেন হালীর সাহিত্য সৃষ্টি এ আন্দোলনেরই অনুরণন মাত্র।

এ সকলের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা গেল, ১৮৮৫ সালে **সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** প্রতিষ্ঠিত হলেও তা মুসলমানদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়নি। কংগ্রেসকে প্রতিহত করার জন্যও ব্রিটিশ

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকায় ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারপর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতি **লক্ষ্যের দিক থেকে ছিল স্বরাজ বা স্বাধীনতার রাজনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক দিক থেকে ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থ আদায়ের রাজনীতি।**

অবশ্য এটি উল্লেখযোগ্য যে, তখনকার দিনের রাজনীতি ছিল মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর রাজনীতি। সে রাজনীতিতে জনসাধাণের কোন ভূমিকা ছিল না। সর্বজনীন ভোটাধিকার তখনও স্বীকৃতি লাভ করে নি। সামন্ত প্রভু, জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী, জায়গীরদার প্রভৃতি ব্যক্তিরাই ছিলেন তখনকার দিনের রাজনীতির নায়ক-নায়িকা। বলা বাহুল্য, তাঁদের কার্যক্রম ও নীতির মধ্যে এতটুকু গণমুখী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে নি। ধর্মীয় নীতিকে কেন্দ্র করে এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে পুঁজি করে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নীতি ও কার্যক্রম স্থির করতেন। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনেও তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সামন্ত প্রভুরা নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযান শুরু করেছিলেন। অপরদিকে কলকাতার ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদী মহল তা প্রতিরোধের আন্দোলন গড়ে তোলেন।

বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ এ দিকে পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল অন্য রূপ। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম বাংলাদেশই ইংরেজ কবলিত হয়। এ বাংলাদেশকে পশ্চাদভূমিরূপে ব্যবহার করে কোম্পানি তথা ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রভুত্ব কায়েম করতে থাকে। কোম্পানির কুশাসন ও অত্যাচারের অধিকাংশই বাংলাদেশকে সহ্য করতে হয়। যদিও কলকাতা বহু বছর ভারতের রাজধানী রূপে ব্যবহৃত হয়, তথাপি এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলেও সৃজনমূলক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। পূর্ব বাংলা কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে বরাবরই ছিল অবহেলিত। তা ছিল কলকাতাভিত্তিক শিল্পক্ষেত্রের চারণ ভূমি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, রাস্তা-ঘাট ও রেলপথের অপ্রতুলতা, কলকারখানার অনুপস্থিতি হেতু পূর্ব বাংলা কোন উন্নয়নমুখী কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। এখানকার কাঁচা পাট ও কৃষি দ্রব্য কলকাতার কারখানায় ব্যবহৃত হত এবং কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে চালান যেত। এককালে ঢাকার মসলিন ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। এ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে তাঁত শিল্প ও চারু শিল্প ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে কারখানায় প্রস্তুত কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রীর বাজার বিস্তৃত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন করে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ভূমিব্যবস্থার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ অঞ্চলে ভূমির মালিকানা অর্পিত হয় প্রধানত হিন্দু জমিদারদের উপর। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জনের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কলকাতা বা অন্যান্য শহরে জমিদারদের অবস্থানের ফলে গ্রাম্য মহাজন ও জমিদার ভৃত্যদের দৌরাত্ম্যে জনগণ ছিল অত্যাচারিত। তাই দেখা যায়—বিশ শতকের তৃতীয় দশকে পূর্ববাংলার মুসলমান কৃষকদের ঋণের বোঝা আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে।

এ সকল কারণে তদানীন্তন উচ্চ শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিতে বাঙালী মুসলমানদের অবদান ছিল নেহায়েত সামান্য। পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের নব জাগরণের সূচনা হয় এ শতাব্দীর তিন দশক থেকে এবং এর জন্য বাংলার জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হকের অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, তিনি ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণের বোঝা খানিকটা হালকা করেন এবং তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। তখন থেকে বাংলার

মুসলমানরা শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। বাংলার শত নদী বিধৌত পলিমাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প কোন দিনই তার বিষক্রিয়া বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু দরিদ্র মুসলমান কৃষকেরা দারিদ্র্যের কঠোর চাপে জর্জরিত হয়ে প্রতিমুহূর্তে মুক্তির প্রহর গুনেছে। হিন্দু জমিদার, হিন্দু মহাজন, হিন্দু ব্যবসায়ীরা বাংলায় ছিলেন কংগ্রেসের প্রতীক এবং অত্যাচারের মাধ্যম স্বরূপ। বাংলায় মুসলমানদের নিকট কোন দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি এবং মুসলিম লীগের আহ্বানেই তাই তারা এত বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে ও ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাই ভারতের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বাংলায় মুসলিম লীগের বিজয় হয়েছিল এত চমকপ্রদ। এ বিজয়ের পেছনে ছিল বাংলার মুসলমানদের দারিদ্র্য এবং এ অভিশাপ থেকে মুক্তির উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী এবং মুসলিম লীগ দল বাঙালী মুসলমানদের এ অবস্থা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বাংলার নেতা শেখ মুজিবের সাফল্যের মূলে তাই কাজ করেছে অদ্ভুতভাবে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ঃ ইতিহাসের গতি অতি বিচিত্র। ইতিহাসের এ অধ্যায়ে ভারতের কোন নেতা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। বাংলার নেতা ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়াদী প্রমুখ নেতৃবর্গ অবশ্য কোনদিন সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তাঁদের ভূমিকা তেমন গরুত্বপূর্ণ ছিল না। গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক ও বল্লভ ভাই প্যাটেলের মত কংগ্রেস নেতা ইংরেজ রাজত্বের পরবর্তী পর্যায়ে 'রামরাজ্য' স্থাপনের স্বপ্নে ছিলেন বিভোর, অন্যদিকে আল্লামা ইকবাল ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ প্রমুখ নেতা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। মাওলানা আজাদ সত্যিই বলেছেন, **"সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ চিন্তামুক্ত খুব কম নেতা ভারতে ছিলেন"**। তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং বাঙালী মুসলমানেরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সাথে একাত্মতা অনুভব করে তার গতিকে ত্বরান্বিত করে। বাংলায় মুসলিম লীগের অভূতপূর্ব বিজয় পাকিস্তান দাবিকে অপ্রতিহত করে তোলে। সুতরাং বলা যায় যে, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও ব্রিটিশ রাজের ভেদবুদ্ধি যেমন ভারত বিভাগের জন্য দায়ী, পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের শাসক চক্রের সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতা, অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং বাঙালীদের সীমাহীন বঞ্চনা পাকিস্তান বিভাগের জন্য দায়ী। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ারূপে মুসলিম পুনর্জাগরণ যেমন এ উপমহাদেশে দ্বি-জাতি তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল, পাকিস্তানের শোষণ ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ তেমনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। দ্বি-জাতি তত্ত্ব যেমন ১৯৪০ সালে জন্ম লাভ করে দুর্বার বেগে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আদর্শকে বাস্তবায়িত করে, তেমনি বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামে প্রবল বন্যার আকারে চারিদিক ছাপিয়ে বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। যে লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলার নেতৃবর্গ ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও জয়যুক্ত হন বাংলার নেতৃবর্গ।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ধর্মভিত্তিক নয়। এ জাতীয়তাবাদ অর্থনীতি, সামাজিক সমতা, ঐতিহাসিক একাত্মবোধ এবং মুক্তবুদ্ধি ভিত্তিক মতাদর্শ। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে সাম্প্রদায়িক হিন্দু জাতীয়তাবাদ যেমন সত্য, তেমনি সত্য সংকীর্ণ দ্বি-জাতি তত্ত্ব। কারণ এ পথ দিয়েই জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের এবং সর্বশেষে এসেছে বাংলাদেশ। তাই উভয়ের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়—জাতীয়তাবাদ, সহনশীলতা, গণতন্ত্র এবং শাষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি।

ভারতে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা

GROWTH OF CONSTITUTIONAL SYSTEM IN INDIA

২

ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা

সূচনা
Introduction

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা আধুনিক কালের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশ বিজয়ের বিচিত্র আলেখ্য ইতিহাসকে করেছে বৈচিত্র্যময়। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এক বিরাট দেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ন্যায় এক বেনিয়া প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হলো এবং তাও প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে—এটি সত্যই বিচিত্রতর এক কাহিনী।

ভারতবর্ষের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কথা রূপকথার ন্যায় বিশ্বময় পরিচিত ছিল। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ বহু বিজয়ীর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। শক, হুন, পাঠান, মোগল, মগ প্রভৃতি বহু জাতি তাই যুগে যুগে ভারতের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্য থেকে পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজরাও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেছিল। সর্বশেষে আগমন করে ইংরেজরা।

ব্রিটেনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সাথে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের নিকট থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে সনদ লাভ করে ভারতে আগমন করে। কালক্রমে সুরাট, মুসলিপট্টম প্রভৃতি স্থানে তারা কুঠি স্থাপন করে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, হুগলী প্রভৃতি স্থানও তাদের কুক্ষিগত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তাদের দখলে আসে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 'দেওয়ানী' এবং কর আদায়ের ও দেওয়ানী বিচারকার্য সম্পন্ন করার অধিকার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর মহীসুর রাজ্যও তাদের দখলে আসে। মারাঠাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাদের অন্তসারশূন্য রাজ্যগুলোও একে একে ইংরেজদের পদানত হয়। ফলে 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে'। ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো সমগ্র ভারতবর্ষে।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসকে চার পর্যায়ে আলোচনা করা সমীচীন। প্রথম পর্যায় শুরু হয় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় ব্রিটেনের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যাবলিই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলুপ্তি ঘটে। এ সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক সংস্থায় রূপ লাভ

করে। এ সময়ে ব্রিটিশ ভারতে শাসন সংক্রান্ত ও আইন প্রণয়নমূলক পদ্ধতিসমূহ প্রণীত হতে শুরু হয়। তখন কোম্পানির উপর কর আদায়ের ও দেওয়ানী বিচারকার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। ব্রিটিশ ভারতে এ সময়ে 'কুশাসন, অনাচার ও অবিচারের আমল' বলে কুখ্যাত।

তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পরে যে সকল শাসন সংস্কারমূলক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং শেষ হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় কাউন্সিল আইন' প্রবর্তনের সাথে সাথে।

চতুর্থ পর্যায় শুরু হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রবর্তনের সাথে সাথে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান আলোকোজ্জ্বল পথ পরিক্রমা শুরু হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩
Regulation Act, 1773

১৭৭৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে ও ভারতের শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নি। কিন্তু কোম্পানির কুশাসনে দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে। দুর্নীতি তীব্রভাবে বিস্তার লাভ করে। দেশে দুর্ভিক্ষের অভিশাপ দেখা দেয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পরিত্যাগ করে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন। এ হলো ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এ আইনের দ্বারা। এ আইনের ধারাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম, এ আইন দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিকে স্বীকার করে এবং কোম্পানি দেশীয় রাজন্যবর্গের সাথে সন্ধি স্থাপন ও বিদ্রোহ দমন করার অধিকার লাভ করে।

দ্বিতীয়, বাংলাদেশের গভর্নরকে এ আইনে ভারতের গভর্নর জেনারেল বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। এ আইনে বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরের শাসনব্যবস্থা বাংলার শাসনব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম গভর্নর জেনারেল।

তৃতীয়, এ আইনে চার সদস্য বিশিষ্ট এক 'শাসন পরিষদ' (Executive Council) গঠন করা হয়। এ শাসন পরিষদ শাসনকার্য পরিচালনায় গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য করত। শাসন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও জরুরী শাসন বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা শাসন পরিষদ ও গভর্নর জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

সর্বশেষে, এ আইনে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়। কলকাতায় প্রথম সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও চারজন বিচারপতি সহযোগে তা গঠিত হয়। এলিজা ইম্পে ছিলেন প্রথম প্রধান বিচারপতি।

এ আইন কিন্তু শাসনকার্যে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং অনতিবিলম্বে এর দোষ-ত্রুটি প্রকট হয়ে উঠল। গভর্নর জেনারেলের সাথে শাসন পরিষদের তীব্র মতবিরোধ ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে তার মতানৈক্য শাসনব্যবস্থায় এক প্রকার অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিল। ফলে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আরও একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাই বিখ্যাত 'পিটের ভারতীয় আইন' (Pitt's India Act) নামে পরিচিত। ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পিটের নামানুযায়ী এ আইনটি প্রণীত হয়।

পিটের ভারতীয় আইন, ১৭৮৪
Pitt's India Act, 1784

এ আইনে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করা হয়। এ আইনের ফলে **(এক)** ইংল্যাণ্ডে একটি নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (Board of Control') গঠন করা হয়। ভারত শাসন সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ছিল এ সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারত সরকারের আইন-কানুন প্রণয়ন ও বিধি-বিধান নিয়ন্ত্রণ করতেন এ সংস্থা। এতে চারজন প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। **(দুই)** এ আইনে ভারতীয় 'শাসন পরিষদের' সদস্য সংখ্যা চারজনের স্থলে তিনজন করা হয়। তন্মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন অন্যতম। **(তিন)** বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ এ আইনে মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে 'শাসন পরিষদ' গঠন করা হয়।

এ আইনের ফলে ভারতে একরূপ দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির কার্যাবলির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন
The Charter Act, 1793

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের ফলে প্রাচ্য দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় কুড়ি বছরের জন্য। এ আইনের দ্বারা ভারতের শাসনব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন সূচিত হয়। **প্রথম,** এর মাধ্যমে ডাইরেক্টরগণ একটি 'গুপ্ত সংস্থা' (Secret Committee) গঠন করে। এ সংস্থা যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে (Board of Control) নির্দেশ দিতে পারত। **দ্বিতীয়,** এর ফলে বাংলাদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের শাসন পরিষদ নতুনভাবে সংগঠিত হয়। **তৃতীয়,** এ আইনে গভর্নর জেনারেল ও সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগের ভার সংস্থার ডাইরেক্টর বোর্ডের (Board of Directors) উপর ন্যস্ত হয়। তবে তা ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মতামত সাপেক্ষে হত। **চতুর্থ,** এ আইনে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি এ আইনের বলে শাসন পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করতে পারতেন। **সর্বশেষে,** গভর্ণর জেনারেল যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি স্থাপনের ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্নরদের তত্ত্বাবধান করতে পারতেন।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন
The Charter Act, 1813

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের শর্তাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ প্রথম, এ আইনের দ্বারা ভারতীয় এলাকায় ব্রিটেনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হয়। **দ্বিতীয়,** এর দ্বারা আরও বিশ বছরের জন্য চীন দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের চা ব্যতীত অন্য দ্রব্যের বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয়। ব্রিটেনের অধিবাসীরা এ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। **সর্বশেষে** এ আইনে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন
The Charter Act, 1833

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের দ্বারা আরও বিশ বছরের জন্য কোম্পানির অধিকার দান করা হয়। ১৮৩৩ সালের সনদের উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ **প্রথম,** এ আইনের দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

চীন দেশে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয়। **দ্বিতীয়,** এ আইনেও বাংলাদেশের গভর্নর জেনারেলকে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল স্বীকৃতি দেয়া হয়। **তৃতীয়,** গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ, তিনজনের স্থলে সদস্য সংখ্যা হয় চারজন। চতুর্থ সদস্য আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্নর জেনারেলকে উপদেশ দিতেন। লর্ড মেকলেকে (Lord Macaulay) প্রথম আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। **চতুর্থ,** এ আইনের বলে গভর্নর জেনারেল তাঁর শাসন পরিষদের সাথে মিলিত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। **পঞ্চম,** এ আইনে ভারতে এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করা হয়। **ষষ্ঠ,** এ আইনে ভারতবর্ষের জন্য আইন প্রণয়নের নিমিত্ত একটি আইন সংক্রান্ত কমিশন গঠন করা হয়।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন
The Charter Act, 1853

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের ফলে শাসন বিষয়ে আরও পরিবর্তন সাধিত হয়। **প্রথমত,** এ আইনে আইন প্রণয়ন করার জন্য ছয়জন সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এটি ছিল শাসন পরিষদের চারজন সদস্যের অতিরিক্ত। **দ্বিতীয়ত,** ভারতীয় আইনের সংস্কার সাধনের নিমিত্ত যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তা বিবেচনা করার জন্য একটি আইন বিষয়ক কমিশন গঠিত হয়। **তৃতীয়ত,** এ আইনে চাকুরি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় ও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

১৮৫৭ সালের 'জাতীয় বিপ্লব' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুশাসনের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসিগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়েন ১৮৫৭ সালে। বিপ্লব অবশ্য সফলকাম হয় নি। সার্থক সংগঠনের অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ব্রিটিশ সরকারের উপর। গভর্নর জেনারেল ভারতের রাণীর প্রতিনিধি (Viceroy) হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। এ সময় ভারত সচিবের পদটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়। তাঁর উপর 'ডাইরেক্টরদের সংস্থা' ও ''নিয়ন্ত্রণ সংস্থার' সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়। তাঁর কার্যালয় স্থাপিত হয় ইংল্যাণ্ডে। তিনি ব্রিটেনের মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম সদস্য। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের ন্যায় তিনিও তাঁর কার্যাবলি ও নীতির জন্য বৃটেনের পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকতেন। গভর্নর জেনারেল তাঁর পরামর্শ মত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন
Indian Council Act, 1861

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Council Act of 1861) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৮ সালের পর থেকে বিশেষ কতকগুলো পদ্ধতি অনুসারণ করা হতে থাকে, যার ফলে শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়গণ অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে।

এ কাউন্সিল আইনের বিশেষ শর্তাবলী উল্লিখিত হলো ঃ **প্রথমত,** গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তন্মধ্যে অন্তত তিনজন অন্যূন দশ বছর ভারতে কার্য করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতেন।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়। তবে শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গভর্নর জেনারেল পরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতেন। **তৃতীয়ত,** শাসনব্যবস্থায় বিভাগীয় পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং এই পরিষদের একজন সদস্য মূলত এক বা একাধিক বিভাগের জন্য দায়ী থাকতেন। ফলে শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। **চতুর্থত,** এ আইনে আইন প্রণয়ন কাউন্সিলের বা ব্যবস্থাপক (Legislative Council) সদস্য সংখ্যা ছয় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ জন হয় এবং তাদের অর্ধেক ছিলেন বেসরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যদের মনোনীত করতেন গভর্নর জেনারেল। সাধারনত ভারতবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের মনোনীত করা হত। **পঞ্চমত,** এ আইনের দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক সরকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। তা ব্যতীত, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠিত হয়। অবশ্য এ সকল আইন পরিষদের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৬১ সাল থেকে শুরু করে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত ভারতের আইন প্রণয়ন কাউন্সিলে যে সকল ভারতীয় মনোনীত হন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন ভারতের উচ্চ শ্রেণীগুলোর প্রতিনিধি—জমিদার; বিরাট ব্যবসায়ী বা অবসর প্রপ্ত সরকারি কর্মচারী। ফলে কাউন্সিলে যে সকল আলোচনা অনুষ্ঠিত হত তাতে কোনক্রমে জনস্বার্থ প্রতিফলিত হত না। অধিকাংশ বিল কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই গৃহীত হত। ১৮৭৮ সালের মাতৃভাষা সংবাদপত্র বিলটি (The Vernacular Press Bill) কাউন্সিলের একটি মাত্র অধিবেশনেই গৃহীত হয়। এ বিলটি সমগ্র ভারতে কালাকানুন (Black Act) বলে পরিচিত হলেও কোন একজন ভারতীয় সদস্য তার প্রতিবাদ করেন নি। বাৎসরিক বাজেটেও ভারতীয় সদস্যদের আলোচনা হত অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে। কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিলে গভর্নর জেনারেল ভেটো প্রদান করতে পারতেন। ভারতীয় সদস্যগণ কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদানে উৎসাহ বোধ করতেন না। ১৮৬৮ সালে কাউন্সিলের কার্য বিবরণী সম্পর্কে স্যার হেনরী মেইন লিখেছিলেন যে, বেসরকারি পর্যায়ে ভারতীয়দের যে আসন দেয়া হত আইন প্রণয়ন কাউন্সিলে তা অনেক সময় ভারতীয় সদস্যরা গ্রহণ করতেন না। অধিকাংশ ভারতীয় সদস্য কাউন্সিলের অধিবেশনে আগ্রহী ছিলেন না এবং অধিবেশনে যোগদান করলেও অতি অল্প সময়ের জন্য তাঁরা উপস্থিত থাকতেন।

এর পরে অবশ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৮৬১ সালের পর থেকে যাতায়াত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা গঠন করা হয়। এ সকল সংস্থা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করত ও স্থানীয় সমস্যাসমূহের সমাধানের ব্যবস্থা করত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতির জন্য লর্ড মেয়ো (Lord Mayo) বহু সুযোগ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে লর্ড রিপন (Lord Ripon) সে ধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং রাজনৈতিক ও জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য আরও এক ধাপ অগ্রসর হন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, রাজনৈতিক দলের সংগঠন ও রাজনৈতিক চেতনাবিকাশের ফলে ভারতের শিক্ষিত জনগণ শাসনকার্যে ও আইন প্রণয়নে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য তুমুল বিক্ষোভ শুরু করে। ১৮৮৫ সালে **সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** জন্ম লাভ করে। ১৯০৬ সালে **সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের** জন্ম হয়। ভারতের ইংরেজ শাসকগণ অনুভব করলেন, ভারতবাসীদেরকে শাসন ও আইন প্রণয়ন থেকে অধিক দূরে রাখা সম্ভব নয়। ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Council Act. 1892) তারই ফলস্বরূপ।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন

The Indian Council Act, 1892

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো নিম্নরূপ। **প্রথম,** এর ফলে ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। **দ্বিতীয়,** নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তিত না হলেও প্রকারান্তরে নির্বাচন শুরু হয় এ আইনের বলে। মিউনিসিপ্যালিটি, বণিক সভা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থার সুপারিশকৃত ব্যক্তিদিগকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হত। গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের বেসরকারি সদস্যদের কয়েকজন অনুরূপভাবে মনোনীত হতেন। **তৃতীয়,** আইন পরিষদগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল এ আইনের বলে। প্রাদেশিক পরিষদে সরকারি নীতি সম্বন্ধে প্রশ্নও করা চলত। এমনকি বাজেট আলোচনা করার অধিকারও পরিষদগুলোর ছিল। তবে ভোটদানের ক্ষমতা তাদের ছিল না।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল আইনের গুরুত্ব ঃ ভারত উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন ক্ষেত্রে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইনের গুরুত্ব অত্যধিক। এ আইনে সর্বপ্রথম নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ আইনের ফলে আইন প্রণয়ন কাউন্সিলে অতিরিক্ত ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হন। এ দশজনের মধ্যে চারজন চারটি প্রাদেশিক আইন সভার বেসরকারি সদস্যদের দ্বারা, একজন কলকাতা বণিক সমিতির দ্বারা ও অন্য পাঁচজন সদস্য পৌরসভা, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। আসলে অবশ্য এসব সদস্য নির্বাচন ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তথাপি বলা যায় যে, ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইন ছিল ১৮৬১ সালের আইন অপেক্ষা উন্নততর।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের আইনও বেসরকারি ভারতীয় সদস্যদের জন্য অত্যন্ত সীমিত সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। **প্রথম,** বেসরকারি সদস্যদের স্থায়ী সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয় এবং তারা সরকারি সদস্যদের মতামতের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। **দ্বিতীয়,** ভারতীয় বেসরকারি সদস্যগণ রাজনৈতিক বিষয়কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের মধ্যে কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্যদের পক্ষ থেকে ১৩টি প্রশ্ন উথাপন করা হয়েছিল, কিন্তু কোনটিই রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত ছিল না। **তৃতীয়,** এ সকল কাউন্সিল অধিবেশনে ভারতে ব্রিটিশ রাজের স্বার্থই আলোচিত হত।

বঙ্গ ভঙ্গ—১৯০৫

১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পন্ন হয় এবং পূর্ব বাংলা ও আসাম সমন্বয়ে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। নতুন প্রদেশটির রাজধানী হয় প্রাচীন শহর ঢাকা। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন বুঝেছিলেন যে, সাত কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত বাংলাদেশকে একটি কেন্দ্র থেকে কার্যকর ভাবে শাসন করা সম্ভবপর নয়। প্রশাসকরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সজাগ ছিলেন এবং বহুদিন ধরে নথিপত্রে এই ধরনের আলাপ-আলোচনা চলছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার (Bampfyld Fuller) এবং স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার (Andrew Fraser) প্রমুখ প্রশাসকবৃন্দ। তাঁরা বিভিন্নভাবে এ ধারণা দিয়েছেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ ছিল নিছক শাসন সংক্রান্ত এক ব্যবস্থা।

বঙ্গ ভঙ্গের কারণ ঃ ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড কার্জন ভারতসচিবকে প্রদেশের সীমানা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁর মতে ২,০০,০০০ বর্গমাইল এলাকাভুক্ত বিশাল বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কোন একজন শাসকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি

সাড়ে আঠার লক্ষ। অপরদিকে প্রতিবেশী প্রদেশ আসাম ছিল শাসনব্যবস্থার জন্য নেহায়েত অপ্রতুল। তাই বাংলাদেশকে বিভক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী করে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ আসামকে নিয়ে **'পূর্ব বাংলা ও আসাম'** প্রদেশ গঠন করা হয়। এ প্রদেশের আয়তন হয় ১,০৬,৬৫০ বর্গমাইল এবং এর লোকসংখ্যা হয় তিন কোটি দশ লক্ষ। মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ছিল এক কোটি আশি লক্ষ। হিন্দুদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ।

প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণও বঙ্গ-ভঙ্গের মূলে ছিল। **প্রথম,** এ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলে এ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এ সকল আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। বাংলাকে বিভক্ত করে এবং আসাম ও পূর্ব বঙ্গকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে ইংরেজ সরকার চেয়েছিল এ আন্দোলনের গতিধারাকে স্তিমিত করতে। **দ্বিতীয়,** গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মুসলমান সামন্তরা মুসলমানদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকারও মুসলমানদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে। বিরাট মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ব বঙ্গের মুসলিম জনসাধারণের দাবি ছিল এই বঙ্গভঙ্গ। **তৃতীয়,** অর্থনৈতিক কারণও একটি প্রধান কারণ ছিল। তখনকার দিনে ভারতের পূর্বাঞ্চলে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। এখানেই কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গ শুধু কাঁচামাল সরবরাহ করত। ফলে পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গ হলে এ অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হবে। তাই বঙ্গভঙ্গের দাবি মুসলমান জনগণের নিকট এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের একজন আগ্রহী সমর্থক এবং উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রধানত তিনিই এ বিষয়ে আগ্রহের সাথে কতকগুলো যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং ভারত সরকার এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র প্রধান যুক্তি ছিল নিম্নরূপ : (১) বঙ্গভঙ্গ হলে এবং পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মুসলমানদের সুবিধা হবে প্রচুর। (২) শিল্প ও যাতায়াত ক্ষেত্রে পূর্ব বঙ্গের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হবে। (৩) রাজনীতি ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মুসলমানদের প্রভাব সুদৃঢ় হবে। (৪) এ অঞ্চলের হিন্দু জমিদারের প্রভাব হ্রাস পাবে। (৫) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। (৬) এ অঞ্চলের মুসলমানগণ তাঁদের জীবনাদর্শ ভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে। (৭) এ প্রদেশের শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হবে।

বঙ্গ ভঙ্গের প্রভাব : ঢাকা হাইকোর্ট, আইন পরিষদ ভবন, সেক্রেটারীয়েট ও আরও অনেক সুরম্য অট্টালিকা এ সময় নির্মিত হয়। লর্ড কার্জন ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন যে, ঢাকা হবে নতুন এক শাসন বিভাগীয় এককের বেন্দ্রবিন্দু। এ অঞ্চলে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান থাকায় ও তাদের উন্নত ধরনের কৃষ্টির ফলে নতুন প্রদেশটিতে তারা যোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন এবং অতীতে মুসলিম শাসন ও বাদ্‌শাহদের আমলে তাদের মধ্যে যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল তার পুনর্জন্ম ঘটবে। নতুন প্রদেশের প্রদেশপাল হলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।

এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন : বঙ্গভঙ্গ রদ

কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা এ পরিকল্পনাকে বিভেদ সৃষ্টির এক ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করলেন। তাঁরা দাবি করলেন, বাঙালিরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং বঙ্গ-বিভাগ অযৌক্তিক ও অন্যায়। কলকাতার

বুদ্ধিজীবী মহল জোরেসোরে প্রচার করতে লাগলেন যে, এ বিভাগে মাতৃভূমি কলঙ্কিত হয়েছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত জননেতা এ পরিকল্পনাকে অযৌক্তিক, অহেতুক, অন্যায় ও অপমানকর বলে আখ্যায়িত করেন। ফলে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রচার অভিযান শুরু হয় এবং ফলে তা দুর্বার এক আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

আন্দোলনকারীদের হাতে দ্বিবিধ অস্ত্র ঝিলমিলিয়ে ওঠে ঃ **(এক)** 'স্বদেশী আন্দোলন' ও বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং **(দুই)** হত্যাকাণ্ড ও ভীতির ভয়ঙ্কর এক পরিবেশ সৃষ্টি। বিলাতী দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে ব্রিটেনের মিল মালিকদের উপর এক চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছিল যাতে তারা ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। শত-সহস্র সভা মঞ্চ থেকে প্রচার শুরু হয় এবং সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উত্তেজনাপূর্ণ ও অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রথম, জাতীয়তাবাদের মহিমা কীর্তন করা হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হিন্দু যুদ্ধংদেহী জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করে এবং মুসলমান ও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ভারত মাতাকে কালীরূপে চিত্রিত করা হয় ঃ 'রক্ত পিপাসায় কাতর কালীমাতা, কাপালিক, এলোকেশী, নগ্নদেহী, ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ মূর্তি, গলায় তার সদ্যছিন্ন নরমুণ্ডের মালা, যা থেকে এখনও ঝরেছে, বিদেশী পদানত এই হলো ভারত মাতা।" ১৯০৮ সালের ৩০শে মে কলকাতার যুগান্তর পত্রিকায় এরূপ এক চিত্র অংকিত হয়েছিল।

আন্দোলনের তীব্রতা এবং বঙ্গভঙ্গ রদ ঃ এভাবে সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। বাংলার গভর্নরকে হত্যার জন্য অন্যূন চারবার প্রচেষ্টা করা হয়। আহমদাবাদে ভাগ্যক্রমে লর্ড মিণ্টোর প্রাণ রক্ষা পায়। ভারতসচিব লর্ড মর্লের রাজনৈতিক সেক্রেটারী লণ্ডনে গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। জেলা প্রশাসককে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হলে তিনি রক্ষা পান, কিন্তু একজন ইংরেজ মহিলা নিহত হন। ক্ষুদিরাম বসু এমনি কয়েকটি ঘটনার সথে জড়িত থাকার অপরাধে অভিযুক্ত হন ও শেষ পর্যন্ত তাঁর ফাঁসি হয়। সমগ্র দেশে তিনি বরণ্যে ও শহীদ বলে চিহ্নিত হন।

প্রথম থেকেই হিন্দু নেতৃবর্গ বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যমূলক উস্কানি বলে আখ্যায়িত করেন। অনেকের মতে এটি ছিল ব্রিটিশ সরকারের দ্বিধাবিভক্ত করে শাসন করার ফন্দি' বিশেষ (Divide and Rule)। উদারচেতা গোখেলও বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে সায় দেন।

এর মূল্যায়ন ঃ বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা খুব কঠিন, যদিও তা অনেকাংশে ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিভাগ করে শাসন করার ফন্দিফিকির স্বরূপ। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করার মত মুসলমানদের তখন মানসিক প্রস্তুতি বা সংহতি বা শিক্ষা কোনটাই ছিল না। বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে ডাঃ আম্বেদকরের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "বাংলার হিন্দুরা তাঁদের চারণক্ষেত্ররূপে পেয়েছিলেন—বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, এমন কী উত্তর প্রদেশকেও। ঐ সকল প্রদেশে প্রায় সকল রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ছিলেন হিন্দু। বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে এ অঞ্চলে তাদের চারণক্ষেত্র 'সংকুচিত হবার আশংকা দেখা দেয়।" বাঙালি হিন্দুরা বঙ্গ-ভঙ্গের অবসান চেয়ে ছিলেন শুধুমাত্র এ কারণে।

কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীরাই বঙ্গ-ভঙ্গ রদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহী ছিলেন। এর কারণ ছিল ঃ (১) বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে ঢাকার নব জন্মলাভ ঘটবে এবং শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র

হিসেবে কলকাতার যে গুরুত্ব ছিল তা কিছু পরিমাণে হ্রাস পাবে। (২) কলকাতায় যে সকল মাল আমদানি-রপ্তানি হত, তার কিছু পরিমাণ চট্টগ্রামে আসতে থাকবে। (৩) কলকাতার ব্যবহারজীবীগণও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তাঁদের আইন ব্যবসাতেও মন্দাভাব নেমে আসবে। জাতীয় আন্দোলনের ছত্রছায়ায় তাই সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতায় ব্রিটিশ সরকার হতচকিত হয়ে পড়ে এবং ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত দিল্লী দরবারে সম্রাটের এক ঘোষণাপত্রে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হয়।

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ঃ বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং তার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কলকাতায় বা ভারতের অন্যত্র রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে হিন্দুদের সাথে এঁটে উঠতে তারা পারছিলেন না। তাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে তারা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এসব কারণে বঙ্গ-বিভাগে ছিলেন উৎসাহী। ব্রিটিশ সরকার যেন এ বিভাগ বানচাল না করেন, তার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ গঠনের উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা
Establishment of the Muslim League

১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের (All India Muslim League) জন্ম হয়। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলেও তা ভারতের মুসলমানদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়, কেননা মুসলমানদের স্বার্থ কংগ্রেসের কর্মসূচীতে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয় নি। আলীগড় আন্দোলনের নেতা ও বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে এবং মুসলমানদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে ও নতুন জীবনবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে এক নতুন পথের দিকনির্দেশ করলেন। এ দিকের সফল অভিব্যক্তি হলো সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম।

১৯০৬ সালে মহামান্য আগা খানের (Aga Khan) নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ে মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ সিমলায় ভারতের গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন (Separate Election) দাবি করেন। গভর্নর জেনারেল তাঁদের এ দাবি অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ একটি মুসলিম সংগঠন প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের (All India Muslim Education Conference) অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং একটি সুষ্ঠু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়।

সম্মেলন শেষে নবাব ভিকারুল মূল্‌কের (Viquarul Mulk) সভাপতিত্বে একটি রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এভাবে ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

মুসলিম লীগের লক্ষ্য
Objectives of the Muslim League

জন্মক্ষণে মুসলিম লীগের প্রধানত তিনটি লক্ষ্য ছিল ঃ

(এক) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো।

(দুই) মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকারসমূহ যথাযথভাব আদায় করা এবং সরকারের নিকট সঠিকভাবে তা উপস্থাপন করা।

(তিন) উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা।

সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা অধিবেশন এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে **সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের** জন্ম ঢাকায় সম্পন্ন হয়েছিল। ঢাকা তখন বঙ্গ-ভঙ্গের পর নতুন প্রদেশের রাজধানী হয়েছে। ঢাকায় ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আর একটি কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের নিকট নতুন প্রদেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম লীগের লক্ষ্য বিস্তৃত হয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে নিয়োগ, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতে মুসলমান বিচারপতি নিয়োগ, বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানদের স্বার্থ আদায়ের দাবিতে কালক্রমে মুসলিম লীগ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার
Morley-Minto Reforms, 1909

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার এক দৃঢ় পদক্ষেপ। অনেক দিক দিয়ে তা ছিল ঐতিহাসিক। লর্ড মিণ্টো ছিলেন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। লর্ড মর্লে ছিলেন ভারতসচিব (Secretary of State for India)। লর্ড মিণ্টোর আগ্রহে এবং লর্ড মর্লের সহায়তায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে **ভারত শাসন আইন** প্রণীত হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো নিচে বর্ণিত হলো ঃ

প্রথমত, এ আইনে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথা চালু হয় (Separate Electorate)। এই আইন যখন বিবেচনাধীন ছিল তখন মুসলমান জাতি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মুসলমানদের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আইন পরিষদে অধিক সংখ্যক আসন দাবি করেন। যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি তাদের কোন সমর্থন ছিল না। মুসলমানদের এ দাবির প্রশ্চাতে ছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনে তাদের ব্যাপক হতাশা এবং সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। এ আইনে মুসলমানদের এ দাবি গৃহীত হয় এবং সর্বপ্রথম পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়ত, এ আইনের ফলে প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে সর্ব প্রথম বেসরকারি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং সরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিলুপ্ত হয়।

তৃতীয়ত, এ আইনের দ্বারা ভারতীয় আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি পায়। আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৮। অবশ্য ভারতীয় আইন পরিষদে (Imperial Legislative Council) সরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বহাল থাকে। কিন্তু বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গভর্নর জেনারেল তাঁর

উপদেষ্টামণ্ডলীর ৭ জন সদস্য, ২৮ জন সরকারি সদস্য এবং ২৭ জন বেসরকারি সদস্য সমন্বয়ে ভারতীয় আইন পরিষদ (Imperial Legislative Council) গঠন করেন।

চতুর্থত, এ আইনে সর্বপ্রথম নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও ভারতীয় আইন পরিষদে নির্বাচনের মাধ্যমে বেসরকারি সদস্য নির্বাচিত হয়।

পঞ্চমত, এ আইনের ফলে প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের আয়তন বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জন। শুধুমাত্র পাঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশের আইন পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন। আইন পরিষদসমূহে বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় জনসাধারনের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত হয়।

ষষ্ঠত, এ আইনের দ্বারা আইন পরিষদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হয়। আইন পরিষদ সরকারের নিকট সুপারিশ হিসেবে আইনের প্রস্তাব পাঠাতে পারত। বাজেটের উপর এবং জনকল্যাণমূলক কার্যের উপর প্রস্তাবও পরিষদ সরকারের নিকট পাঠাতে পারত।

সপ্তমত, এ আইনের ফলে নির্বাচন ব্যবস্থা অঞ্চল ভিত্তিক (Territorial) রইল না। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারত মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়, লোকালবোর্ড ও জেলা বোর্ডসমূহ, বণিক সমিতি, জমিদার শ্রেণীর সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য গোষ্ঠী।

অষ্টমত, এ আইনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদে (Executive Council) ভারতবাসীর অন্তর্ভুক্তি। মিঃ সিংহ (যিনি পরে লর্ড উপাধি লাভ করেন) সর্বপ্রথম গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন।

তবে এ আইনে শাসন বিভাগকে আইন পরিষদের নিকট দায়ি করা হয় নি। যদিও এটি অতীতের সকল আইন ও বিধিসমূহ থেকে উন্নততর ছিল, তথাপি তা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় নি। ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য তারা প্রস্তুত হতে থাকে।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তি
Lucknow Pact, 1916

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতবাসীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এ আইনে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ভারতীয় আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এ আইনে সিমলা অধিবেশনে স্বীকৃত মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাও (Separate Electorate) অনুমোদিত হয়, কিন্তু এ আইন ভারতের কোন মহলকেই সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় নি। ভারতের রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধি, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও দায়িত্বশীল সরকারের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকার ব্যবস্থায় ভারতবাসিগণ অধিক সুযোগের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে নতুনভাবে দাবি উত্থাপন করতে উদ্যত হন। এটি উল্লেখযোগ্য যে, সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ যদিও এতদিন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি বিপুল আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, সাম্প্রতিকালের দুটি ঘটনা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের বিরূপ করে তোলে। **প্রথম,** ভারত সরকারের শর্তহীন ঘোষণা সত্ত্বেও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয়। এ ঘটনা সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারত সরকারের নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। **দ্বিতীয়,** বলকান যুদ্ধে

তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে ধর্মীয় অনুভূতির জন্য, তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতি বিশ্বের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। সে আমলে প্রখ্যাত মুসলমান নেতৃবর্গ, বিশেষ করে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলি তুরস্কে ব্রিটিশ কার্যকলাপকে অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণ্য বলে আখ্যায়িত করেন ও ব্রিটিশ সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

এ অবস্থায় ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তার উপর মুসলমানেরা আস্থা রাখতে পারছিল না। অন্যদিকে, তাদের এ ধারণা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে যে, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদেরকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে দৃষ্টিভংগির এ পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান নেতৃবর্গ তাই সর্বপ্রথম কংগ্রেস নেতৃবর্গের সাথে এক সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হলো লক্ষ্ণৌ চুক্তি। এ ক্ষেত্রে জিন্নাহ্‌র ভূমিকা ছিল অনন্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস এক বার্ষিক অধবেশনে মিলিত হয় ও বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির শর্তাবলী
Terms of the Lucknow Pact

লক্ষ্ণৌ চুক্তির প্রধান শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

(এক) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস মিলিতভাবে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগ্রাম করবে।

(দুই) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত আসন সমূহের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানরা লাভ করবেন।

(তিন) প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয় কংগ্রেস স্বীকার করেন এবং ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক আসন সংখ্যা প্রদানে সম্মত হয়।

(চার) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক আসনের অর্থ এই হয় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক আইন পরিষদ সমূহে যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সে ক্ষেত্রে তাদের জন্য সংখ্যার অনুপাতে অধিক আসন দেয়া হবে। অন্যপক্ষে, যে সকল প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে যে সকল প্রদেশ তাদের আসন সংখ্যার অনুপাতে কম হবে।

(পাঁচ) যদি কোন আইন পরিষদে কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য বিরোধিতা করে তা হলে তাদের বিরোধিতার মুখে সে সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের কোন আইনে প্রণীত হবে না।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলাফল
Effects

লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলাফল ঃ ভারতের ইতিহাসে এ চুক্তিটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ চুক্তির ফলে মুসলিম লীগ তথা মুসলমান সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে এক

লাইনে দাঁড়ায় ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুসলিম লীগ দলীয় পর্যায়ে সংগঠনের কাঠামো ও কার্যাবলিতে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। **দ্বিতীয়ত,** সর্বপ্রথম এ চুক্তির ফলে মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। **তৃতীয়ত,** সাময়িকভাবে হলেও এ চুক্তির ফলে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার
Montagu-Chelmsford Reforms, 1919

সূচনা (Introduction) : ১৯১৯ সালের মহাযুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে জনশক্তি ও সম্পদ দিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ব্রিটিশ সরকারের দুর্দিনে ভারতে হিন্দু–মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলিতভাবে ঘোষণা করে যে, 'আমাদের ঘুষের প্রয়োজন নেই' ('We need no bribes')। কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধি নিজেই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে **'লক্ষ্ণৌ চুক্তি'** (Lucknow Pact) সম্পাদিত হয়। মিলিত হিন্দু–মুসলমানদের দাবি ছিল ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা। সকলে আশা করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর দাবি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন।

১৯১৭ সালে ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু (Edwin Montagu) বৃটেনের কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ রাজ ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবেন এবং এ লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। তাঁর ঘোষণা ছিল নিম্নরূপ, "ভারত সরকারের সাথে একমত হয়ে ব্রিটিশ সরকার এ নীতিতে বিশ্বাসী যে, শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগে ক্রমাগত ভারতবাসীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে। তাই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের প্রতি জোর দেয়া হবে।" ("The Policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire")। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মুখবন্ধে এ নীতি বিঘোষিত হয়। এর বাস্তবায়নের জন্য ভারতসচিব মন্টেগু ভারতে আগমন করেন এবং তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল চেমসফোর্ডের সাথে আলোচনা করে ১৯১৮ সালে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়।

এ রিপোর্টের মৌলিক নীতি ছিল চারটি। **প্রথম,** স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে অধিকতর গণ শাসন প্রয়োগ ও বাহিরের হস্তক্ষেপ থেকে তাদের মুক্তি। **দ্বিতীয়,** প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ। **তৃতীয়,** ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট ভারত সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব। **চতুর্থ,** উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর আশু বাস্তবায়ন এবং ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ভারতসচিবের নিয়ন্ত্রণের লাঘবকরণ।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

Salient Features of Government of India Act, 1919

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমত, ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ আইনে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আইন পরিষদের নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্বশীলতার নীতি সর্বপ্রথম গৃহীত হয় এ আইনে। অবশ্য সরকারের দায়িত্বশীলতা অত্যন্ত সীমিত ছিল। তথাপি এই আইনের মাধ্যমেই তা সূচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এ আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সূচনা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিষয় সমূহের বিভাগ করা হয়। যে সকল বিষয় সমগ্র ভারতবর্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, সে গুলো পরিচালিত হত গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ কর্তৃক। উদাহরণস্বরূপ, দেশরক্ষা, মুদ্রা, রেলপথ, তার ও ডাক বিভাগ, ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুলিশ, কৃষি প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত ছিল।

তৃতীয়ত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল প্রদেশে **দ্বৈত শাসনের** (Dyarchy) প্রবর্তন। প্রাদেশিক বিষয়সমূহকে (১) **সংরক্ষিত** (Reserved) ও (২) **হস্তান্তরিত** (Transferred)-এ দু ভাগে বিভক্ত করা হয়। সংরক্ষিত বিষয়সমূহ প্রাদেশিক গভর্নর ও তাঁর শাসন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হত। পুলিশ, জেল, বিচার বিভাগ, জলসেচ, রাজস্ব প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষিকার্য, বন বিভাগ প্রভৃতি বিষয় ছিল হস্তান্তরিত। এ সকল বিষয় গভর্নর ও মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হত। মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকত।

চতুর্থত, এ আইনে সরকারের আয়েরও শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং কতকগুলো আয়ের উৎস প্রদেশের জন্য এবং কতকগুলো কেন্দ্রের জন্য স্থির করা হয়। ভূমি রাজস্ব, মাদক দ্রব্যের উপর অবগারি শুল্ক প্রভৃতি প্রদেশের জন্য এবং আয়কর ও বাণিজ্য শুল্ক কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত হয়।

পঞ্চমত, এ আইনে নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। এ আইনে উল্লেখ থাকে যে, প্রাদেশিক আইন পরিষদের অন্ততপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ সদস্য নির্বাচিত হবেন এবং শতকরা ২০ ভাগের উর্ধ্বে সরকারি সদস্য থাকবেন না। অবশ্য ভোটাধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন পরিষদে তিন প্রকারের সদস্য ছিলেন ঃ (১) নির্বাচিত সদস্য, (২) সরকারি সদস্য, এবং (৩) মনোনীত সদস্য।

ষষ্ঠত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী পদ্ধতি বহাল থাকে। শুধু তাই নয়, এ ব্যবস্থা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। পাঞ্জাবের শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, ইউরোপীয় অধিবাসীদের জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসৃত হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকা গঠনেরও ব্যবস্থা হয়।

সপ্তমত, এ আইনে অধিকতর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ সংগঠিত হয়। আইন পরিষদ ছিল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চ পরিষদ বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম ছিল 'রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of States) এবং নিম্ন পরিষদ বা প্রথম কক্ষের নাম 'ব্যবস্থাপক পরিষদ' (Legislative Assembly)। প্রথম কক্ষের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৫ জন ও দ্বিতীয় কক্ষের সদস্য সংখ্যা ৬০ জন। উভয় পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রচলিত হয়, অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে। কেন্দ্রীয় বাজেটের কিয়দংশ আইন পরিষদের মতামত সাপেক্ষে হত। আইন পরিষদ সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনাও করতে পারত।

অষ্টমত, এ আইনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় হাই কমিশনার (High Commissioner of India) পদের সৃষ্টি হয়। তিনি ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের স্বার্থ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। পাঁচ বছরের জন্য তিনি ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং ইংল্যাণ্ডে তিনি স্বপরিষদ গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

নবমত, এ আইনে ব্রিটিশ রাজের (Crown) ক্ষমতা বর্ধিত হয়। ভারতবর্ষ সম্রাট বাহাদুরের নামে (By His Majesty, the Emperor of India) শাসিত হতে লাগল। তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে নাকচ করতে পারতেন।

দশমত, এ আইনের দ্বারা ভারতসচিবের (Secretary of State of India) ক্ষমতাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভারতের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি ব্রিটিশ রাজের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ভারতে শাসন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। গভর্নর জেনারেল ও তাঁর শাসন পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাঁর নির্দেশমত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তবে যে সকল প্রাদেশিক বিষয় সমূহের ভার মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকত, সে সকল বিষয়ে ভারতসচিবের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকত না। তাঁর প্রভূত ক্ষমতার জন্য তাঁকে বলা হত 'হোয়াইট হলের মহাপরাক্রমশালী মোগল সম্রাট, (Great Moghul of the White Hall)। ভারতসচিবের কার্যালয় ছিল বৃটেনের হোয়াইট হলে। ভারতসচিবকে সাহায্য করার জন্য এ আইনে ভারতীয় কাউন্সিল (Council of India) গঠন করা হয়। কাউন্সিলের সদস্যগণ ভারতসচিব কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতবর্ষের শাসন ভার ন্যস্ত হয় গভর্নর জেনারেলের উপর।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সমালোচনা
Criticism of the Government of India Act, 1919

(এক) ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনসাধারণের নিকট ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ আইনে ভারতবাসীদের রাজনীতিতে অধিকতর সুযোগ দেয়া হয় সত্যই, কিন্তু ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আশা ও আকঙ্ক্ষা এ আইনে বাস্তবায়িত হয় নি। এন. সি. রায় (N. C. Roy) তাঁর Constitutional History of India গ্রন্থে বলেন যে, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনকে এ দেশবাসী কখনও সাদরে গ্রহণ করে নি। ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এ আইনকে "অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক এবং নৈরাশ্যজনক" বলে ঘোষণা করে।

(দুই) যদিও এই আইনে দায়িত্বশীল সরকারের সূচনা করা হয়, তথাপি সরকারের দায়িত্বশীলতা ছিল নাম মাত্র। এই আইনে ভোটাধিকার নীতি সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু ভোটাধিকার প্রদান করা হয় সমাজের মাত্র শতকরা ৮ ভাগ ব্যক্তিকে। প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করা হয় সত্যই, কিন্তু শাসন, আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে আইন পরিষদের ক্ষমতা ছিল অত্যান্ত সীমিত। প্রাদেশিক গভর্নরের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে আইন পরিষদ ছিল অসহায় ও দুর্বল এক সংস্থা।

(তিন) তাছাড়া, এ আইনে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ফলে শাসন ক্ষেত্রে অনেক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। মন্ত্রিপরিষদ ও শাসন পরিষদের মধ্যে অহেতুক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। শাসন সংক্রান্ত বিষয় সমূহের অবাস্তব বিভক্তিকরণ অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কৃষির উন্নতি

সাধনের ভার ন্যস্ত ছিল মন্ত্রিপরিষদের উপর; কিন্তু পানিসেচ বিভাগ ছিল গভর্নরের শাসন পরিষদের উপর। পানিসেচ ব্যতীত কৃষির উন্নতি অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল না।

(চার) তদুপরি, গভর্নরের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত, কিন্তু তিনি আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন না। সুতরাং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন কোন মহলকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হয় নি।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা
The Dyarchy

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রদেশসমূহে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) প্রবর্তিত হয়। এই দ্বৈতশাসন ছিল এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারের বিভিন্ন বিষয়সমূহের বিভাজন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক সরকারের বিষয় সমূহকে দু ভাগে বিভক্ত করা হয় : **(এক) সংরক্ষিত বিষয়** (Reserved Subjects) এবং **(দুই) হস্তান্তরিত বিষয়** (Transfered Subjects)। সংরক্ষিত বিষয়গুলো প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর শাসন পরিষদের (Executive Conucil) সহায়তায় ও পরামর্শক্রমে পরিচালনা করতেন। এ বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পুলিশ, জেল, পানিসেচ, অর্থ ও বিচার বিভাগ।

অন্যদিকে, হস্তান্তরিত বিষয়গুলো প্রাদেশিক মন্ত্রিদের সহায়তায় ও পরামর্শক্রমে প্রাদেশিক গভর্নর পরিচালনা করতেন। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা
Working of the Dyarchy

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা তেমন সার্থক হয় নি এবং বাস্তবে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা জটিলতার সৃষ্টি করে। **প্রথমত,** সরকার একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা। এর বিভিন্ন বিভাগ এক দৃঢ় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ। একটি বিভাগকে অন্য বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবও নয়, সংগতও নয়। বিচ্ছিন্ন করলে তার স্বাভাবিক গতিধারা ও কার্যকারিতা ব্যাহত হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সংরক্ষিত (Reserved) ও হস্তান্তরিত (Transfered) এ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এ দু ভাগের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দুটি স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের উপর ন্যস্ত হয়। ফলে পরিচালনা ক্ষেত্রে না ছিল কোন সুষ্ঠু যোগাযোগ অথবা কোন সহযোগিতার ভাব। ফলে শাসন ব্যবস্থায় আলগা এক ভাবের সৃষ্টি।

দ্বিতীয়ত, সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত সরকারের উভয় ক্ষেত্রেই গভর্নরের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল। ফলে যে উদ্দেশ্যে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয় তা অর্জিত হয়নি। সংরক্ষিত বিষয়সমূহে গভর্নরের ইচ্ছা ও তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। সংরক্ষিত বিষয়ের উপর আইন পরিষদ কোন আইন প্রণয়ন না করলে গভর্নর তার জরুরী আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা তা করতে পারতেন। ঐ সকল বিষয়ে ব্যয় বরাদ্দে কোন অসুবিধা হলে গভর্নর নিজ দায়িত্বে তা সম্পন্ন করতেন।

তৃতীয়ত, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও কোন দায়িত্বশীল ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি, যদিও এ ব্যবস্থায় প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি ছিল। গভর্নর মন্ত্রীদের

কার্যে যথেচ্ছাভাবে হস্তক্ষেপ করতেন, অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তকে অগ্রহ্য করতেন এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

চতুর্থত, আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে গভর্নরের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আইন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোন বিলে গভর্নর ভেটো প্রদান করতে পারতেন। প্রয়োজনবোধে যে কোন বিলকে তিনি স্থায়ী বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারতেন। আইন পরিষদকে তিনি ভেঙ্গেও দিতে পারতেন এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে আইন পরিষদের সদস্যদের প্রভাবিত করতেন।

পঞ্চমত, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা গভর্নরের খুশীমত স্বপদে বহাল থাকতেন। আইন পরিষদের নিকট তাদের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত। আইন পরিষদে কোন সুসংগঠিত দল বিদ্যমান না থাকায় মন্ত্রিসভায় কোন ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ষষ্ঠত, প্রদেশগুলোর আর্থিক অসচ্ছলতাও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করে তোলে। ১৯১৯ সালের পরবর্তী পর্যায়ে বহু প্রদেশই এ অসচ্ছলতার শিকারে পরিণত হয় ও ঘাটতি বাজেটের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে রাজস্ব এবং অর্থ মন্ত্রিসভার আওতাভুক্ত ছিল না। এ বিষয়গুলো পরিচালিত হত গভর্নরের শাসন পরিষদ কর্তৃক। ফলে মন্ত্রি সভায় গৃহীত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী শেষ পর্যন্ত গভর্নর ও গভর্নরের শাসন পরিষদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। এতে মন্ত্রিসভা জনপ্রিয়তা হারাতে বাধ্য হত।

এই কথা বলা অবশ্য প্রয়োজন যে, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল সরকারের সূচনা হয় এবং দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এর পরিচায়ক। এ ব্যবস্থা কোনক্রমেই এক উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল না, তথাপি তা ছিল এক শুভ সূচনা, যদিও ওটি ছিল অত্যন্ত ত্রটিপূর্ণ। এ সকল কারণে বিভিন্ন লেখক ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। অধ্যাপক এন. সি. রায় (N. C. Roy) বলেছেন ঃ "১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনকে এদেশ বাসী কখনও সাদরে গ্রহণ করেন নি। ভারতের সকল রাজনৈতিক দল তাকে "অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক এবং নৈরাশ্যজনক" বলে ঘোষণা করেছেন। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড (Coupland) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (India : A Re-Statement) লিখেছেন ঃ "নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (১৯১৯ সালের আইন) তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সংসদীয় দায়িত্বশীল সরকার প্রসঙ্গে কোন প্রশিক্ষণ দিতে তা ব্যর্থ হয়েছে।"

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নের পরবর্তী ঘটনাবলী
Subsequent Events

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে নতুন এক অধ্যায় সংযোজন করে। খেলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মনে নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ফলে সাময়িকভাবে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনকে ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে। কংগ্রেস নতুন আইন পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে। পরবর্তী সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে "স্বরাজ পার্টি" অভ্যন্তর থেকে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস সাধনের নিমিত্তে আইন পরিষদে অংশগ্রহণ করে। আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা মোহাম্মদ আলী কংগ্রেসের নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন। জিন্নাহ্ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে শুধুমাত্র মুসলমান সদস্য নিয়ে এক স্বাধীন গোষ্ঠী গঠন করেন এবং মুসলমানদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন।

এ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। দিল্লী, এলাহাবাদ, গুলবাগ, লক্ষ্ণৌ, জব্বলপুর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের এমন তাণ্ডব লীলা শুরু

করে যার ফলে সুধী ব্যক্তিরা গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং শাসনতান্ত্রিক এমন এক নীতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানো হয়, যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি।

১৯২৪ সালে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ ছয়টি মৌলিক নীতি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমত, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা। **দ্বিতীয়ত,** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, যেখানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকবে। কংগ্রেস কিন্তু এ নীতিসমূহকে উপেক্ষা করে চলে।

১৯২৭ সালের শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে স্যার সাইমনের সভাপতিত্বে একটি শাসনতান্ত্রিক কমিশন গঠন করেন। তা **সাইমন কমিশন** (Simon Commission) নামে পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ কমিশনকে সাদা কমিশনও বলা হয়। এ কমিশনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাই ভারতীয় কংগ্রেস একে বর্জন করে। মুসলমানদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তবে স্যার মোহাম্মদ শফির নেতৃত্বে একদল মুসলমান নেতা এ কমিশনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং লাহোরে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। অন্যদিকে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে আর একদল মুসলমান নেতা কলকাতায় মিলিত হয়ে সাইমন কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কংগ্রেস কিন্তু সকল দলের সমন্বয়ে এক সংস্থা গঠন করে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এ সংস্থা গঠিত হয়। ১৯২৮ সালে এ সংস্থা যে রিপোর্ট প্রদান করে তাই **বিখ্যাত নেহেরু রিপোর্ট** (Nehru Report) নামে পরিচিত।

নেহেরু রিপোর্ট
Nehru Report

ব্রিটিশ ভারতে সাংবিধানিক বিকাশের ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ দলিলে কয়েকটি বিষয়ের সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটে। **প্রথম,** ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের চিন্তাধারা ছিল ভিন্নমুখী। **দ্বিতীয়,** কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের ভাবধারায় ছিল উদ্বুদ্ধ। **তৃতীয়,** তখনও ভারতের নেতৃবর্গ স্বাধীন ভারতের কথা ভাবতে পারেন নি। **চতুর্থ,** মুসলিম লীগ মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার পর্যায়ে উপনীত হয় নি।

নেহেরু কমিটি গঠিত হয় ১৯২৮ সালের মে মাসে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সহযোগে এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন স্যার আলী ইমাম ও শোয়েব কোরেশী (মুসলমান). এম. এম. এনি. ও এম. আর. জয়ারকার (হিন্দু মহাসভা). জি. আর. প্রধান (অ-ব্রাহ্মণ). সরদার মঙ্গল সিংহ (শিখ). স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু (উদার পন্থী) এবং এন. এম. জোসি (শ্রমিক)। এ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর যোগ্যপুত্র জওহরলাল নেহেরু।

কমিটির দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সংবিধানের মূল নীতি নির্ধারণ। সংবিধানের ভিত্তি হবার কথা ছিল ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ন মর্যাদা। ১৯২৮ সালে কমিটি একটি রিপোর্ট প্রদান করে। এটি **নেহেরু রিপোর্ট** নামে পরিচিত। এ রিপোর্টের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

(এক) কমিটি ভারতের জন্য এক সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করে, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

(দুই) প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে তদানীন্তন ভারতের করদ ও মিত্র রাজ্যগুলোর মর্যাদা সম্পর্কেও কমিটি সুপারিশ করে, যার ফলে ঐ সকল রাজ্য কালক্রমে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গে রূপান্তরিত হতে পারে।

(তিন) কমিটি প্রস্তাব করে যে, ভারতীয় সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা প্রয়োজন, বিশেষ করে বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার ঘোষণা অপরিহার্য।

(চার) ১৯০৯ সালের মর্লি–মিণ্টো সংস্কার আইন ও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ঘোষিত পৃথক নির্বাচন সম্পর্কে কমিটি ভিন্নমত পোষণ করে ঘোষণা করে যে, ভারতে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা কাম্য, কেননা তা জনগণের মনে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করবে।

(পাঁচ) লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে স্বীকৃত কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের অধিকতর প্রতিনিধিত্বের দাবি এ কমিটি অস্বীকার করে। তার পরিবর্তে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করে।

(ছয়) এ কমিটি উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে একটি প্রদেশে রূপান্তর এবং সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ করে।

নেহেরু রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বিবেচনার জন্য ১৯২৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় এক সর্ব দলীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়। মুসলিম লীগ জিন্নাহর নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটিও শেরওয়ানী সাহেবের নেতৃত্বে এ সম্মেলনে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মুসলিম লীগ ও খেলাফত কমিটির দাবি বিবেচনার জন্য সর্বদলীয় অধিবেশনে একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এ সাব কমিটির সদস্য ছিলেন—মহাত্মা গান্ধী, ডঃ আনসারী, মাওলানা আজাদ, তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও জয়ারকার।

নেহেরু রিপোর্টের সংশোধনী হিসেবে মুসলিম লীগ চারটি সংশোধনী আনয়ন করে ঃ **(এক)** কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব হতে হবে এক–তৃতীয়াংশ। **(দুই)** প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত বাংলা ও পাঞ্জাবে জনসংখ্যা অনুপাতে আইন পরিষদে আসন সংরক্ষণ। **(তিন)** প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) প্রদেশের হস্তে ন্যস্তকরণ। **(চার)** অবিলম্বে সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে স্বতন্ত্রকরণ এবং উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে প্রদেশের মর্যাদা দান।

মুসলিম লীগের এ সব দাবি অগ্রাহ্য হয়। ফলে নেহেরু রিপোর্ট মুসলমানদের নিকট আর গ্রহণযোগ্য হয় নি।

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা
Jinnah's Fourteen Points

নেহেরু রিপোর্টে মুসলিম লীগের দাবি স্থান না পাওয়ায় ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি আগা খানের নেতৃত্বে দিল্লীতে সর্ব ভারতীয় মুসলিম অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ঐ অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের দাবি সংবলিত এক ইশতেহার রচিত হয়। এ দাবিনামা **জিন্নাহর চৌদ্দ দফা** (Jinnah's Fourteen Points) নামে সমধিক পরিচিত। দফাগুলো নিচে বর্ণিত হলো ঃ

(এক) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) প্রদেশের হাতে ন্যস্তকরণ।

(দুই) সকল প্রদেশে সম পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন।

(তিন) সকল আইন পরিষদ ও নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের যোগ্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা।

(চার) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ।

(পাঁচ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা।

(ছয়) বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখা।

(সাত) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করা।

(আট) সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ হতে পৃথক করে স্বতন্ত্র প্রদশের মর্যাদা দান।

(নয়) সংবিধানে সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি।

(দশ) কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের আপত্তিতে ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কিত কোন আইন পরিষদে গ্রহণ না করা।

(এগার) যোগ্যতার ভিত্তিতে মুসলমান প্রার্থীদের সংখ্যানুপাতে সরকারি ও অন্যান্য সংস্থায় নিয়োগ দানের ব্যবস্থা।

(বার) মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা ও আইন সংরক্ষণের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ।

(তের) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান সদস্যের আসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চৌদ্দ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশ সমূহের সম্মতি ব্যতীত সংবিধানে কোন সংশোধন না ঘটানো।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, নেহেরু রিপোর্ট এবং চৌদ্দ দফার মধ্যে কোন মৌলিক মিল ছিল না।

নেহেরু রিপোর্ট যেমন অখণ্ড ভারতের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে, চৌদ্দ দফা তেমনি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে উজ্জ্বল। চৌদ্দ দফার মূল সুর কালক্রমে পাকিস্তানের দার্শনিক ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সাইমন কমিশন
Simon Commission

১৯৩০ সালে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, কিন্তু তা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কোন রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হয় নি। রিপোর্টের মূল কথাগুলো নিচে বর্ণিত হলো ঃ

প্রথমত, ভারতের চূড়ান্ত সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ সমন্বয়ে। **দ্বিতীয়ত,** প্রদেশসমূহে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সুষ্ঠু সংগঠনের ফলেই যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত হবে। **তৃতীয়ত,** প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। **চতুর্থত,** কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠিত হবে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এক দিক থেকে ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলস্বরূপ। তবে ভারতের আশু স্বাধীনতার কথা এ রিপোর্টে ছিল না।

১৯২৯ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল ঘোষণা করেন যে, **ডোমিনিয়নের মর্যাদা দানই** (Dominion Status) ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির লক্ষ্য। ভারতীয় গণমন এতেও শান্ত হয় নি। কংগ্রেস কর বর্জন ও আইন অমান্য আন্দোলন (Non-Payment of Taxes and Civil Disobedience) শুরু করে। এ সময়ে ইংল্যাণ্ডে পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক বসে এবং বৃটেনের পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির যুক্ত অধিবেশন বসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার প্রস্তুতি হিসেবে।

গোলটেবিল বৈঠক
Round Table Conference

১৯৩০ সালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসে। এ বৈঠকে কংগ্রেস ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ও দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ যোগদান করেন। এ বৈঠকে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। **প্রথমত,** এটা স্থিরীকৃত হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)। **দ্বিতীয়ত,** ভারতের সকল প্রতিনিধি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status)। পাওয়া দরকার। **তৃতীয়ত,** এও স্থির হয় যে, ভারতের সরকার হবে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত। **চতুর্থত,** স্বীকৃত হয় যে, কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে দ্বৈত শাসনের নীতি (Dyarchy) প্রতিপালিত হবে।

১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। এ বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বৈঠকে অত্যন্ত জোরেসোরে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পেশ করেন। মিঃ গান্ধী বলেন, কংগ্রেসই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে দ্বৈত শাসনের নীতি প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানে এ বৈঠক ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড **সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ** (Communal Award) ১৯৩০ সালে ঘোষণা করেন। এ নীতি অনুযায়ী হিন্দু, মুসলমান, হরিজন, এমনকি ভারতে ব্রিটেনের অধিবাসীদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়।

অবশ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ নীতির কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন। হিন্দুরা এ নীতিকে মুসলমান ঘেঁষা বলে আখ্যায়িত করে। শিখরাও এর বিরূপ সমালোচনা করে। মহাত্মা গান্ধী হরিজনদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁর অনশন ভারতে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত হরিজনরা তাদের দাবি পরিত্যাগ করতে সম্মত হয় এবং পুনায় (Poona) এক নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়। স্থির হয় যে, হরিজনদের জন্য কিছু আসন নির্দিষ্ট থাকবে, কিন্তু তারা সাধারণ হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত হবে। তা **পুনা চুক্তি** (Poona Pact) নামে খ্যাত।

১৯৩২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। ভারতে তখন আইন অমান্য আন্দোলন পুরাদমে চলছে। এ বৈঠকে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নি। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির যুক্ত অধিবেশনের পর ১৯৩৪ সালে শাসনতন্ত্রের এক খসড়া (White Paper) প্রকাশিত হয়। এর ভিত্তিতেই ১৯৩৫ সালের ঐতিহাসিক ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়।

১। ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (Discuss in brief the history of the growth of constitutional government in India.)

২। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা কর। কেন বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয়েছিল? (Discuss about the Partition of Bengal in 1905. Why was it annuled?) [N. U. 1997, 2006]

৩। মলি-মিণ্টো শাসন সংস্কারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ কর। (Give a brief discussion of the Morley-Minto Reforms of 1909.)

৪। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (Describe the main features of the Government of India Act of 1919.) [N. U. 1997; D. U. 1994, 1999]

৫। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the nature of Dyarchy under the Act of 1919.)

৬। দ্বৈত শাসনের ব্যর্থতার কারণগুলো বর্ণনা কর। (Describe the causes of the failure of Dyarchy.)

৭। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন কতটুকু দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনে সক্ষম হয়? (How far successful was the Govt. of India Act, 1919 in introducing self-government in India?)

৮। দ্বৈত শাসনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে সংক্ষেপে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (Briefly discuss the salient features of Government of India Act. 1919 with special reference to its dyarchical pattern.) [R. D. 1983, '81; D. U. 1983]

৯। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের কারণগুলো আলোচনা কর। তা কেন বাতিল করা হয়েছিল? (Discuss the causes of the Partition of Bengal in 1905. Why was it annuled?) [C. U. 1984]

১০। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। (Discuss the causes and consequences of the Partition of Bengal in 1905.)

১১। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা কর। ব্রিটিশ ভারতে এর ভূমিকা আলোচনা কর। (Discuss the objectives of the establishment of the Muslim League in 1906. Discuss its role in British India.) [N. U 1996, 1998, 2000, 2006]

১২। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রতিষ্ঠিত দ্বৈত শাসনের প্রকৃতি ও কার্যকারিতা আলোচনা কর। (Discuss the nature and workings of the dyarchy introduced by the Indian Act of 1919.) [N. U. 1996]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1935

৩

সূচনা
Introduction

ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এ আইনকে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়। ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, দেশাত্মবোধের ক্রমবিকাশ ও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার 'শ্বেতপত্র' (White Paper) নামক একটি খসড়া দলিলে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। পরিকল্পনাভুক্ত এই প্রস্তাবগুলো যথাযথরূপে আলোচনা করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি যুক্ত কমিটি (Joint Select Committee) গঠন করেন। যুক্ত কমিটি বিস্তারিত আলোচনা করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এনে ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর এ প্রসঙ্গে রিপোর্ট প্রদান করেন। এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে **'ভারতবর্ষের বিল'** প্রণীত হয়। ১৯৩৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এর প্রথম পাঠ সমাপ্ত হয়। পরে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে তা আলোচিত হয় এবং কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব সহযোগে ১৯৩৫ সালের ২ আগষ্ট তারিখে ১৯৩৫ সালের **ভারত শাসন আইন** (Government of India Act) রূপে রাজকীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতবাসীর মনে ব্যাপক অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ ধূমায়িত অসন্তোষ গণ আন্দোলনের আকারে বিষ্ফোরিত হয়। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন, মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি এর লক্ষণ স্বরূপ। সাইমন কমিশনের ব্যর্থতাও এ পটভূমিতে উল্লেখযোগ্য। তাই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ভারতবাসীদের আস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of the Government of India Act, 1935

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণিত হলো ঃ

প্রথম, এ আইনে ভারতে সর্বপ্রথম একটি সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (All India Federation) **গঠনের প্রস্তাব করা হয়।** এতদিন পর্যন্ত ভারতে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদিও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রের আভাস প্রদান করা হয়েছিল তথাপি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এ আইনে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং করদ মিত্র দেশীয় রাজ্যগুলো সমন্বয়ে এক সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে।

দ্বিতীয়, এ আইন প্রদেশসমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ'। এ আইনে প্রদেশে দ্বৈত শাসন রহিত হয় এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হয়। প্রদেশসমূহে নির্ধারিত ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসে। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। এতদিন প্রাদেশিক গভর্নর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু এ আইনে প্রাদেশিক গভর্নরকে ব্রিটিশ রাজের (Crown) প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি করা হয়।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিভিন্নভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। প্রদেশিক গভর্নর তাঁর **বিশেষ দায়িত্ব** (Special Responsibilities), **ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি** (Individual Judgement) এবং **ইচ্ছাধীন ক্ষমতা** (Discretionary powers) প্রয়োগ করে মন্ত্রিপরিষদ ও আইন পরিষদের যে কোন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তকে বানচাল করতে পারতেন। গভর্নর আইন পরিষদের নিকট দায়ী না থাকায় স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন অজুহাতে প্রাদেশিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে পারত।

তৃতীয়, এ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে দ্বৈত শাসন (Dyarchy) প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে দ্বৈত শাসন রহিত হলেও কেন্দ্রে তা প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়সমূহ (ক) **সংরক্ষিত** (Reserved) এবং (খ) **হস্তান্তরিত** (Transferred) এ দু ভাগে বিভক্ত ছিল। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্মীয় বিষয়, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শাসনকার্য সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। গভর্নর জেনারেল এ সকল বিষয় তাঁর ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে পরিচালনা করতেন। তবে তাঁকে পরামর্শ দানের জন্য ও সাহায্য করার জন্য তিনি তিনজন উপদেষ্টা (Councillor) নিয়োগ করতে পারতেন।

হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ, যেমন আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করতেন। মন্ত্রিপরিষদ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকতেন। এর পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের উপর আইন পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহকে আইন পরিষদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা হয়।

চতুর্থ, এ আইনে কেন্দ্রে শাসন বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন গভর্নর জেনারেল। তাঁর হস্তে সীমাহীন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি। শাসন সংক্রান্ত বিষয়, অর্থ, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং আইন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং অসীম প্রভাব। প্রদেশেও তার প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নরকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী করা হয়েছিল।

পঞ্চম, এ আইনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট রাখা হয়। প্রথম কক্ষের নাম ছিল **ব্যবস্থাপক সভা** (Federal Assembly) এবং দ্বিতীয় কক্ষের নাম **রাষ্ট্রীয় সভা** (Council of States)। উভয় পরিষদই ছিল সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট।

ষষ্ঠ, এ আইনের মাধ্যমে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে উত্থিত বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করতে পারতেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি আপিলের চূড়ান্ত আদালত হিসেবে রয়ে যায়।

সপ্তম, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো তিনভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) **কেন্দ্রীয় বিষয়** (Federal Subjects), (খ) **প্রাদেশিক বিষয়** (Provincial Subjects) এবং (গ) **যুগ্ম বিষয়** (Concurrent Subjects)।

সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত ছিল। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। দেশ রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা, ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলো; যেমন আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, জেলখানা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হয়। কিন্তু যুগ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারত। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাথে সঙ্গতিহীন প্রাদেশিক আইন পরিষদের আইনগুলো বাতিল বলে ঘোষিত হত। তবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের কোন আইন গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ করলে তা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইনের উপর বলবৎ থাকত। ফৌজদারী আইন ও বিচার প্রণালী, বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিধি, উইল, চুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলো যুগ্ম বিষয়ক তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অষ্টম, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কোন ধারা সংশোধিত হতে হলে তা একমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই সম্ভব হত। ভারত শাসন সংক্রান্ত কোন কোন ব্যাপারে ভারত সচিবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকলেও তাঁর তত্ত্বাবধানের, নির্দেশ দানের এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার কোন উল্লেখ এ আইনে রইলো না।

নবম, এ আইনে ঐতিহাসিক ভারতীয় উপদেষ্টামণ্ডলী বা ভারত সচিবের কাউন্সিল (India Council) রহিত হয়। তার স্থলে অধিকতর কার্যক্ষম এবং স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন **উপদেষ্টা সংস্থা** (Advisory Board) প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশম, এ আইন রাজ প্রতিনিধির পদ (Crown Representative) সৃষ্টি হয়। দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য এ আইনের মাধ্যমে 'রাজ প্রতিনিধি' (Viceroy) নামক এক নতুন পদ সৃষ্টি হয়। অবশ্য গভর্নর জেনারেল ভাইসরয়ের দায়িত্ব পালন করে তিনিই হলেন একের ভেতর দুই। প্রদেশ সম্পর্কে দায়িত্বপালনকালে তিনি হতেন গভর্নর জেনারেল। দেশীয় রাজ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ কল্পে তিনি হতেন ভাইসরয়।

একাদশ, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ কমনওয়েলথে ভারতের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দান করে নি।

দ্বাদশ, এ আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

সর্বশেষে, এ আইনের মাধ্যমে **উড়িষ্যা** ও **সিন্ধু** নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ
Nature of the All India Federation under the Government of India Act 1935

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যে সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল, যেমন—লিখিত শাসনতন্ত্র, শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার বণ্টন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের স্বতন্ত্র কার্যক্রম, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কতকগুলো কারণে সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠে নি। তাই একে এক **"অপূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ"** ব্যবস্থা নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ ব্যবস্থা ছিল **'কোন রকমে কাজ চালানো'** গোছের এক অভিনব বন্দোবস্ত। এ ব্যবস্থা অবশ্য বাস্তবায়িত হয় নি। তাই ত্রুটিগুলো প্রকট হয়ে উঠে নি। নিচে সে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত হলো ঃ

প্রথম, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিভক্তিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় যখন কতকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। একত্রীকরণের মাধ্যমেই তা সাধারণত রূপলাভ করে থাকে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়। এ ক্ষেত্রে একত্রীকরণ নীতি অনুসৃত না হয়ে বিভক্তিকরণ নীতি প্রযোজ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী যে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত হয় তা না ছিল সমঝোতার ফলস্বরূপ, না ছিল ঐক্যের প্রতীক। বরং তা ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক আরোপিত এক পরিকল্পনা মাত্র। অথচ সর্ব ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে অঙ্গরাজ্যসমূহের সমঝোতা ও ঐক্যের ফলে। তাদের সাধারণ স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

তৃতীয়, যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকার এবং শাসনব্যবস্থা একই রূপ হয় এবং তাদের সমমর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৯৩৫ সালের আইনে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত হয়, তা গঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে। দেশীয় রাজ্যগুলো শাসিত হত স্বৈরাচারী শাসক কর্তৃক। কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলোতে কিছুটা দায়িত্বশীল সরকার গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ আইন পরিষদে সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলোর সদস্যগণ শাসকদের দ্বারা মনোনীত হতেন।

চতুর্থ, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সমান ছিল না। প্রদেশ সমূহের উপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে **যোগদানের দলিল** (Instrument of Accession) দ্বারা স্থির হত। এক এক দেশীয় রাজ্য যোগদানের সময় স্বতন্ত্রভাবে যোগদানের দলিল প্রস্তুত করতে পারত। ফলে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রের কর্তৃত্বের রূপ বিভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

পঞ্চম, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষে অঙ্গরাজ্যসমূহ সাধারণভাবে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে। কিন্তু নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রে এ নীতি অনুসৃত হয় নি। আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের উভয় কক্ষে দেশীয় রাজ্য সমূহ আনুপাতিক হারের অধিক সংখ্যক সদস্য প্রেরণ করতে পারত।

ষষ্ঠ, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের **প্রথম কক্ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং দ্বিতীয় কক্ষে পরোক্ষ নির্বাচনের** মাধ্যমে সদস্যগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কিন্তু নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রে বিপরীত পন্থা অনুসৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের প্রথম কক্ষে পরোক্ষ এবং দ্বিতীয় কক্ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

সপ্তম, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় গভর্নর জেনারেলের হস্তে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এ ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে অংগরাজ্য গুলোর হস্তে এবং কানাডায় তা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উভয় পন্থার কোনটিই অনুসরণ করা হয় নি। গভর্নর জেনারেল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।

অষ্টম, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এ দু সরকার নিজস্ব আওতায় অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগীয় কর্তৃত্ব প্রাধান্য লাভ করায় গভর্নর জেনারেল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের উপর প্রচুর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল সুরই ব্যাহত হয়েছিল।

নবম, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালত সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল আদালত চূড়ান্ত ছিল না। এর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটির নিকট আপীল করা চলত।

এ সকল কারণে সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন মহলের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে নি এবং কেউ এ সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন দল কর্তৃক সমর্থিত হয় নি। অবশ্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই তখন ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কামনা করত।

এর অসম্পূর্ণতার কারণ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র নিম্ন বর্ণিত কারণে কোন মহলকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি।

প্রথম, ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশসমূহের সাথে দেশীয় রাজ্যগুলোর সমবায়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র এক অদ্ভুত ব্যবস্থা বলে মনে হয়েছিল। একই যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু অঙ্গরাজ্যে আইন পরিষদের সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং কিছু কিছু অংগরাজ্যে তাঁরা শাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হবেন—তা ছিল অত্যন্ত অসংগত।

দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিভিন্ন অংগরাজ্যে বিভিন্ন হওয়ায় তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়েছিল।

তৃতীয়, দেশীয় রাজ্যগুলো যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার সময় যে 'যোগদানের দলিল' দান করত, তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হওয়ায় কোনটির সাথে কোনটির মিল ছিল না।

চতুর্থ, দেশীয় রাজ্যসমূহকে আনুপাতিক হারের বেশি আসন দেওয়ার ফলে এক তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম, শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, যেমন—দেশ রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের আওতা বহির্ভূত হবার ফলে এ ব্যবস্থার প্রতি কারো সহানুভূতি ছিল না।

ষষ্ঠ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যয়ের এক বৃহৎ অংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত থাকার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

সপ্তম, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের প্রথম কক্ষে বা নিম্ন কক্ষে যে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাও ছিল প্রগতি বিরোধী।

অষ্টম, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান কর্মকর্তা গভর্নর জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্বের আওতা বহু দূর বিস্তৃত হওয়ায় মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্ব আরও সীমিত হয়ে উঠে। ফলে কোন গণতন্ত্রকামী এ ব্যবস্থাকে বরদাস্ত করে নি।

নবম, এ ব্যবস্থায় ভারতের স্বাধীনতার আশু কোন প্রতিশ্রুতি না থাকায় রাজনৈতিক মহলে হতাশার সৃষ্টি হয়।

দশম, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধনের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদে না থাকায় এ ব্যবস্থাকে বাস্তব পন্থা বলে স্বীকার করা হয় নি।

একাদশ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক আরোপিত এক ব্যবস্থা হওয়ায় কেউ একে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে নি।

দ্বাদশ, মুসলিম লীগ এ ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয় নি। কারণ মুসলিম লীগ ভয় করেছিল যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে মুসলমানগণ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করত, যুক্তরাষ্ট্রে কায়েম হলে তা নস্যাৎ হয়ে যাবে। মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধিতার ফলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা চিরতরে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৯৩৯ সালের ভারতের গভর্নর জেনারেল লিনলিথগো (Linlithgo) নতুনভাবে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দান করেন। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে মৃত আখ্যায়িত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—গভর্নর জেনারেল (Federal Executive—The Governor General) ঃ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগ গভর্নর জেনারেল, তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী ও মন্ত্রিপরিষদ সহযোগে গঠিত হত। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সকল কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম বিষয়সমূহের উপর বিস্তৃত ছিল। জরুরী অবস্থায় তা প্রাদেশিক বিষয়ের উপর বিস্তৃত হতে পারত।

গভর্নর জেনারেল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান শাসক ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। শাসন বিভাগের সকল কার্য তাঁর নামে পরিচালিত হতো। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং ভারত সচিবের সুপারিশক্রমে গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন। কোন ভারতীয় আদালতে তাঁর বিচার হত না। রাজার নিকট থেকে প্রাপ্ত 'নির্দেশনামা' (Instrument of Instructions) অনুযায়ী তিনি শাসনকার্য নির্বাহ করতেন।

গভর্নর জেনারেল তিন প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন ঃ

(ক) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Power), (খ) **ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধিমূলক ক্ষমতা** (Individual Judgement), এবং (গ) **মন্ত্রীদের সাহায্যে ও পরামর্শে ব্যবহৃত ক্ষমতা**। যে সকল ক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন, সে সকল ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শ করতেন না। যে সকল ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারতেন, সে ক্ষেত্রে তাঁকে মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শ করতে হত, তবে তিনি তাঁদের পরামর্শ নাকচ করে স্বীয় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। অন্য সকল ক্ষেত্রে তাঁকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত চলতে হত।

গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয় ঃ (ক) **প্রশাসনিক ক্ষমতা** (Executive), (খ) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত** (Legislative), ও (গ) **অর্থসংক্রান্ত** (Financial)।

প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য গভর্নর জেনারেলের নামে পরিচালিত হত। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্মীয় এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার শাসন—এ সংরক্ষিত বিষয়গুলো গভর্নর জেনারেল তাঁর তিনজন উপদেষ্টার সহায়তায় পরিচালিত করতেন। উপদেষ্টামণ্ডলীকে তিনি নিযুক্ত করতেন এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিকট দায়ী না থেকে গভর্নর জেনারেলের নিকট দায়ী থাকতেন।

হস্তান্তরিত বিষয়গুলো গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত শাসন করতেন। মন্ত্রিপরিষদ কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকতেন। গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিদিগকে নিযুক্ত করতে ও বরখাস্ত করতে পারতেন এবং তিনি পরিষদের সভায় সভাপতিত্বও করতেন।

গভর্নর জেনারেল স্বীয় ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, এ্যাডভোকেট জেনারেল, যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবাধ্যক্ষ, হাইকোর্টের বিচারপতি, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতেন। ইচ্ছাধীন ক্ষমতায় তিনি ভারতের হাই কমিশনার, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের এবং ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করতেন।

গভর্নর জেনারেল ভারতের সামরিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। প্রধান সেনাপতি অবশ্য নিযুক্ত হতেন 'ব্রিটিশ রাজ' কর্তৃক।

তা ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে তাঁর **'বিশেষ দায়িত্ব'** ছিল। বিশেষ দায়িত্ব' সম্পর্কিত বিষয়ে শাসনকার্য নির্বাহ করার সময় তিনি **ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি** (Individual Jugement) প্রয়োগ করতেন। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে তাঁর বিশেষ দায়িত্ব ছিল ঃ

(ক) ভারতবর্ষ বা তার যে কোন অংশে শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের যে কোন হুমকি প্রতিরোধ করা।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা।

(গ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

(ঘ) সরকারি কর্মচারীদের ও তাদের অধীনস্থদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

(ঙ) বিভেদ সৃষ্টিমূলক আইন প্রণয়ন বন্ধ করা।

(চ) ব্রিটেন ও ব্রহ্মদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কোন শাস্তিমূলক কর আরোপ বন্ধ করা।

(ছ) ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করা ও দেশীয় রাজ্যের রাজাদের স্বার্থ ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা।

(জ) তার ইচ্ছাধীন ও স্বীয় 'ব্যক্তিগত বুদ্ধিমূলক' ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগের পথে সকল বাধা দূর করা।

এ 'বিশেষ দায়িত্বসমূহ' পরিচালনায় গভর্নর জেনারেল স্বীয় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতেন। তাকে মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শ করতে হত সত্য, কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারতেন। তাছাড়া, এ বিশেষ দায়িত্বসমূহ এত ব্যাপক ও অস্পষ্ট ছিল যে, গভর্নর জেনারেল এর নামে যে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা উপস্থিত হলে গভর্নর জেনারেল বিশেষ ঘোষণা বলে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ব্যতীত সকল ব্যাপার স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারতেন।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের যে কোন কক্ষের সভা আহ্বান করতে, মূলতবি রাখতে এবং পরিষদের প্রথম কক্ষ ভেঙ্গেও দিতে পারতেন। তিনি আইন পরিষদে বক্তৃতা দিতে কিংবা বাণী পাঠাতে পারতেন। তার অনুমোদন ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হত না। আইন পরিষদে কোন বিল গৃহীত হলে তা গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হত। তিনি রাজার নামে বিলে সম্মতি দিতে পারতেন, সম্মতি স্থগিত রাখতে পারতেন বা পুনর্বিবেচনার জন্য পরিষদে ফেরত পাঠাতে পারতেন অথবা রাজকীয় অনুমোদনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারতেন।

গভর্নর জেনারেল যদি মনে করতেন যে, ভারতবর্ষ বা তার কোন অংশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাঁর বিশেষ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটতে পারে, তা হলে তিনি তার ইচ্ছাধীন ক্ষমতায় কোন বিল বা বিলের কোন ধারা বা সংশোধনীর আলোচনা বন্ধ করে দিতে পারতেন। পুলিশ বাহিনী সংক্রান্ত কোন বিল, গভর্নর জেনারেলের আইন বা গভর্নরের আইন অথবা গভর্নর জেনারেল বা গভর্নর কর্তৃক প্রণীত কোন

'জরুরী আইন' (Ordinance) অথবা ভারতে প্রযোজ্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন আইনের আলোচনা অথবা তাদের কোন সংশোধনী সম্বন্ধে কোন আলোচনা গভর্নর জেনারেলের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সংঘটিত হতে পারত না।

তা ব্যতীত, জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তিনি **'জরুরী আইন'** (Ordinance) প্রণয়ন করতে পারতেন। এ জরুরী আইন ৬ (ছয়) মাস কাল কার্যকর থাকত। এর মেয়াদ আরও ৬ (ছয়) মাস কাল বর্ধিত করা যেত। তাছাড়া, তার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি এক প্রকার আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। এ আইনকে **গভর্নর জেনারেলের আইন** (Governor General's Act) বলা হত।

শাসনতান্ত্রিক কোন অচলাবস্থা দেখা দিলে তিনি **জরুরী অবস্থা ঘোষণা** (state of emergency) করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ব্যতীত সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করতে পারতেন। এ জরুরী অবস্থা ছয় মাস কাল কার্যকর থাকত। কিন্তু প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এর মেয়াদকাল তিন বছর পর্যন্ত বাড়াতে পারতেন। গভর্নর জেনারেলের এ জরুরী অবস্থার বিষয় ভারত সচিবের গোচরীভূত করতে হত। সুতরাং দেখা যায় যে, আইন প্রণয়ন বিষয়েও গভর্নর জেনারেলের প্রভূত ক্ষমতা ছিল।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা : গভর্নর জেনারেলের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বার্ষিক হিসাব দেখিয়ে 'বার্ষিক আর্থিক বিবরণী' বা বাজেট (Annual Financial Statement) উভয় পরিষদে পেশ করার ব্যবস্থা করতেন গভর্নর জেনারেল। এ আর্থিক বিবরণীতে ভোটযোগ্য (Votable) এবং ভোট-বহির্ভূত (Non-Votable) বিষয়গুলো পৃথকভাবে দেখানো হতো। ভোট বহির্ভূত বিষয়গুলোর অন্তর্ভূক্ত ছিল গভর্নর জেনারেলের মাহিনা ও ভাতা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের, বিচারকবৃন্দের, এডভোকেট জেনারেল, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রমুখ রাজ কর্মচারীর মাহিনা ও ভাতা, দেশরক্ষা খাতের ব্যয়-বরাদ্দ প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ের ব্যয় বরাদ্দ তিনিই করতেন। এরূপ ব্যয় মোট ব্যয়ের প্রায় ৮০ ভাগের মত হত। ভোটযোগ্য বিষয়গুলোর **বরাদ্দ দাবি** (demand for grant) রূপে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পেশ করা হত। গভর্নর জেনারেলের সুপারিশ ব্যতীত কোন বরাদ্দ দাবি বা মঞ্জুরি দাবি পেশ করা যেত না। পরিষদ দাবি অগ্রাহ্যও করতে পারত, কিন্তু গভর্নর জেনারেল ইচ্ছা করলে 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের অজুহাতে পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্যকৃত দাবিও পুনঃস্থাপন করতে পারতেন।

বিবিধ (Miscellaneous) : গভর্নর জেনারেল প্রদেশসমূহের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। **(এক)** প্রাদেশিক গভর্নর কার্যত তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন। **(দুই)** শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তিনি প্রাদেশিক সরকারের উপর যে কোন আদেশ জারি করতে পারতেন। প্রাদেশিক গভর্নর যখন তার ইচ্ছাধিন ও ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতেন, তখন তিনি গভর্নর জেনারেলের নিকট দায়ী থাকতেন।

সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে দেখলে গভর্নর জেনারেলকে আমরা মহাপরাক্রমশালী এক শাসকরূপে দেখতে পাই। রাজতন্ত্রে রাজার যেরূপ সীমাহীন ক্ষমতা থাকে অথবা আধুনিককালে ডিক্টেটরদের হাতে যেভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, গভর্নর জেনারেল অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ (Federal Council of Ministers) : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেলকে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের পরিচালনায় সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদের ব্যবস্থা ছিল। মন্ত্রিদের সংখ্যা ছিল দশজন। গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিদের নিয়োগ করতেন

এবং তার সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রিদের কার্যকাল নির্ভর করত। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কর্তৃক তাঁদের মাহিনা নির্ধারিত হত। অবশ্য পরিষদ কর্তৃক মাহিনা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলই তা নির্ধারণ করতেন।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেল প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করতেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করা হত। তবে মন্ত্রিপরিষদে প্রধান প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকতে হত। সাধারণভাবে আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রিদের নিয়োগ করা হত। কোন মন্ত্রী নিয়োগকালে আইন পরিষদের সদস্য না থাকলে তাকে ছয় মাসের মধ্যে আইন পরিষদের সদস্য হতে হত।

মন্ত্রিপরিষদের সভার গভর্নর জেনারেল সভাপতিত্ব করতেন। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করে দায়িত্ব বণ্টন করতেন। মন্ত্রিপরিষদ তাদের নীতি ও কার্যকলাপের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকতেন। আইন পরিষদ অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রিদেরকে পদত্যাগ করতে হত। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব শুধুমাত্র আইন পরিষদের নিকটই ছিল না। গভর্নর জেনারেলের নিকটও তারা দায়ী থাকতেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সুস্পষ্ট বিধান ছিল যে, প্রত্যেক বিভাগের মন্ত্রী ও সেক্রেটারিগণ তাদের স্ব-স্ব বিভাগের কার্য সম্বন্ধে সকল তথ্য গভর্নর জেনারেলের নিকট উপস্থিত করতে বাধ্য থাকবেন। ফলে দেখা যায়, মন্ত্রিদের দুই প্রভুর সেবা করতে হত। আইন পরিষদের অনাস্থা আনয়ন করলে তাদের পদত্যাগ করতে হত। গভর্নর জেনারেল অসন্তুষ্ট হলে তাদের বরখাস্ত হতে হত।

সংরক্ষিত বিষয়সমূহের উপর মন্ত্রিপরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাছাড়া, গর্ভনর জেনারেল যখন তাঁর **ইচ্ছাধীন ক্ষমতা** প্রয়োগ করতেন, তখনও মন্ত্রিদের সাহায্য ও পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন ছিল। অন্য সকল বিষয়ে অর্থাৎ হস্তান্তরিত বিষয়সমূহে মন্ত্রিপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে পরামর্শ দিতে পারতেন ও সাহায্য করতেন। তবে গভর্নর জেনারেল তার 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের অজুহাতে মন্ত্রিদের পরামর্শও অগ্রাহ্য করতে পারতেন।

গভর্নর জেনারেলের অপরিসীম ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিদের তেমন কিছুই করার ছিল না এবং শাসনকার্যে তাদের প্রভাব অত্যন্ত গৌণ ছিল। সেক্রেটারিদের উপর মন্ত্রিদের নিয়ন্ত্রণ ছিল নামমাত্র, কেননা সেক্রেটারি মন্ত্রীকে বাদ দিয়েও গভর্নর জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ শাসন ক্ষেত্রে একটি গৌণ সূত্র ছিল মাত্র। নিজেদের নিকটও তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা সামঞ্জস্যহীন। গভর্নর জেনারেলের নিকট তারা ছিলেন অপ্রভাবশালী উপদেষ্টা। আইন পরিষদের নিকট ছিলেন শুধুমাত্র "বোঝা বহনকারীর দল"।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Federal Legislature) ঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ও দু-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ বা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠিত হত। প্রথম কক্ষ বা নিম্ন পরিষদের নাম ছিল ব্যবস্থাপক পরিষদ (Legislative Assembly) এবং দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চ পরিষদের নাম ছিল রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of States)।

ব্যবস্থাপক পরিষদ (Legislative Assembly) ঃ ব্যবস্থাপক পরিষদ ৩৭৫ জন সদস্য সহযোগে গঠিত হত। ব্যবস্থাপক পরিষদে সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। ২৪৬ জন সদস্য প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন এবং ১২৫ জন সদস্য দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবৃন্দ কর্তৃক মনোনীত হতেন। অবশিষ্ট চারজন সদস্য নির্বাচিত হতেন ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম সংস্থাগুলোর দ্বারা (তিনজন শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা ও একজন শ্রম সংস্থার দ্বারা)। ব্যবস্থাপক

পরিষদের ২৪৬টি আসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা হয়েছিল ঃ মাদ্রাজ, বঙ্গ প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের প্রত্যেকটিতে ৩৭টি আসন; বোম্বাই, বিহার ও পাঞ্জাব প্রদেশের প্রত্যেকটিতে ৩০টি আসন; মধ্য প্রদেশ ও বেরার প্রদেশে ১৫টি' আসন; আসাম প্রদেশে ১০টি আসন; সিন্ধু, উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রত্যেকটিতে ৫টি আসন; দিল্লীতে ২টি আসন; বেলুচিস্তান, আজমীর ও মারওয়ার এবং কুর্গের প্রত্যেকটিতে ১টি আসন। এ পরিষদের মেয়াদকাল ছিল ৫ বছর। তবে গভর্নর জেনারেল তার পূর্বেও এ পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন। পরিষদ সদস্যগণের মধ্য থেকে একজন স্পীকার নির্বাচিত হতেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of States) ঃ রাষ্ট্রীয় পরিষদ ২৬০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হত। এর সদস্যবৃন্দের কিছু সংখ্যক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন এবং কিছু সংখ্যক মনোনীত হতেন। ১৫৬ জন সদস্য ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ হতে নির্বাচিত হতেন, ১০৪ জন সদস্য দেশীয় রাজ্যের রাজা, মহারাজা বা নবাবদের দ্বারা মনোনীত হতেন। ১৫৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জন পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ হতে নির্বাচিত হতেন এবং ৬ জন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হতেন। অন্য ১০ জন সদস্য ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় এ্যাংলো-ভারতীয় এবং ভারতীয় খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হতেন। এ পরিষদ একটি স্থায়ী সংস্থা ছিল। এ পরিষদ কখনও ভেঙ্গে দেয়া যেত না, তবে তিন বছর পর পর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে বিদায় গ্রহণ করতে হত। প্রত্যেক সদস্য ৯ বছরকাল এ পদে বহাল থাকতেন। সদস্যদের মধ্য হতে একজন সভাপতি নির্বাচিত হতেন।

পরিষদের মোট সদস্যের এক-ষষ্ঠাংশ সদস্য নিয়ে কোরাম হত। উভয় কক্ষের ক্ষমতা ছিল প্রায় সমান। রাষ্ট্রীয় পরিষদের ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল। তবে ব্যয় বরাদ্দের বা মঞ্জুরির দাবি প্রথমে ব্যবস্থাপক পরিষদে উপস্থাপিত হতে হত।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কার্যাবলি ও ক্ষমতা (Functions and Powers of the Federal Legislature) ঃ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কার্যাবলি ও ক্ষমতা নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে ঃ (ক) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি** (Legislative), (খ) **শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি** (Administrative) এবং (গ) **অর্থ সংক্রান্ত** (Financial)।

(ক) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর উপর কেন্দ্রীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। গভর্নর জেনারেল জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে অথবা প্রাদেশিক আইন পরিষদের অনুরোধক্রমে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। তবে সার্বভৌম রাজা ও রাজকীয় পরিবারের কিংবা সামরিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কোন আইন প্রণয়ন করতে পারতেন না।

তা ব্যতীত, ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন আইন গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের আইন বা জরুরী আইন, গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা, বিচার বুদ্ধিমূলক ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিল কিংবা ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের স্বার্থ সংক্রান্ত কোন বিল বা আইনের কোন সংশোধনী সম্বন্ধে গভর্নর জেনারেলের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কোন আলোচনা হতে পারত না। ভারতবর্ষের শান্তি-শৃংখলা ব্যাহত হতে পারে, এরূপ যে কোন বিল বা তার সংশোধনী সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদে যে কোন আলোচনাকে গভর্নর জেনারেল যে কোন সময় বন্ধ করে দিতে পারতেন। তাছাড়া গভর্নর জেনারেল যে কোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য **জরুরী আইন**

(Ordinance) **জারি** করতে পারতেন এবং **গভর্নর জেনারেলের আইন** নামক আইনও প্রণয়ন করতে পারতেন। তা সাধারণ আইনের ন্যায় বলবৎ থাকত। তার অনুমোদন ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গভর্নর জেনারেলের ব্যাপক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বিভিন্নভাবে সীমিত হয়েছিল। যে কোন প্রথম শ্রেণীর আইন পরিষদের সাথে এর কোন তুলনাই চলে না। এই আইন পরিষদকে অনেকটা গভর্নর জেনারেলের মর্জি মাফিক কাজ করতে হত। অপরপক্ষে, গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রীয় পরিষদকে উপেক্ষা করেও শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন।

(খ) শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিকট কিছু কিছু শাসন ক্ষমতা ছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিকট তার নীতি ও কার্যাবলির জন্য দায়ী থাকতেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আস্থাভাজন হলে মন্ত্রিপরিষদ বহাল থাকতে পারত। মন্ত্রিপরিষদের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মূলতবী প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং সরাসরি অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ মন্ত্রিপরিষদকে নাজেহাল করতে পারতেন।

(গ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ মজুরি দাবি হিসেবে ভোটযোগ্য বিষয়গুলো আইন পরিষদে পেশ করা হত। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কোন দাবিকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন সত্যই, কিন্তু গভর্নর জেনারেল তার 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্য করা দাবিগুলোকেও পুনরায় বহাল করতেন। তাছাড়া, গভর্নর জেনারেলের সুপারিশ ব্যতীত কোন বরাদ্দ দাবি পরিষদে পেশ করা চলত না। সুতরাং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ভোটের বহির্ভূত বিষয়গুলোর উপর আইন পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ সমস্ত খাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ হত। এ সকল ব্যয় গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হত। ভোটযোগ্য বিষয়গুলোর উপর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ছিল নামমাত্র।

সুতরাং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত গৌণ। গভর্নর জেনারেলের ব্যাপক ক্ষমতার নিকট তা ছিল দুর্বল ও পঙ্গু।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতের উপর ব্রিটেনের কর্তৃত্ব

ভারতের শাসনব্যবস্থায় ব্রিটেনের কর্তৃত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত ভারত ছিল ব্রিটেনের অধীন এক উপনিবেশ। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব ছিল চূড়ান্ত। ব্রিটেনের রাজা বা রানী, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং ভারত সচিবের মাধ্যমে ব্রিটেন ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করত।

রাজা বা রানী (Crown) ঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটেনের রাজাকে **ভারত সম্রাট** (Emperor) বলে ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের রাজা কর্তৃক এবং রাজার নামে শাসিত হত। ভারতের শাসন ব্যবস্থার শিরোমণি ছিলেন ব্রিটেনের রাজা। ভারতের উপর সকল অধিকার ও কর্তৃত্ব তার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। যে সকল ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে কেন্দ্রে অথবা অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয় নি, সে সকল ক্ষমতা রাজাই গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের মাধ্যমে ব্যবহার করতেন। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একজন রাজ প্রতিনিধি (Crown Representative) নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনিই ভাইসরয়।

ভারতের উপর রাজার কর্তৃত্ব ছিল সর্বময় এবং সীমাহীন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত ছিল যে, সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র রাজার ঘোষণার মাধ্যমে প্রবর্তিত হত। অবশ্য রাজা এ ঘোষণা তখনই করতেন যখন দেশীয় রাজ্যসমূহের অর্ধেক জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলের

রাজন্যবর্গ যুক্তরাষ্ট্রে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন এবং সে সকল অঞ্চল থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষে অন্তত অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হত। ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, যথা— গভর্নর জেনারেল, রাজপ্রতিনিধি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ও ভারতের প্রধান সেনাপতি রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

তাছাড়া রাজাই সম্মান দান, পদবী ও উপাধি দান, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন, শাস্তি মওকুফ ইত্যাদি চরমাধিকার প্রয়োগ করতেন। অবশ্য রাজা তার এ সকল চরম অধিকার ভারত সচিবের মাধ্যমে প্রয়োগ করতেন।

রাজার এ সকল ক্ষমতার উৎস ছিল প্রধানত দুটি—(ক) আইন (Statutes) এবং (খ) প্রথা (Conventions)।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট (British Parliament) : ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লমেন্টের প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ পার্লামেন্টই ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উৎস। শুধুমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই এ আইন সংশোধিত হতে পারত। **রাজা ও পার্লামেন্ট** (King in Parliament) ছিলেন ভারতবর্ষের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট স্বেচ্ছায় প্রাদেশিক সরকারের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হ্রাস করে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হয়। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত বিষয়গুলো সম্বন্ধেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হ্রাস করা হয় এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হয়। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত বিষয়গুলো সম্বন্ধেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখনই প্রাদেশিক গভর্নরগণ অথবা গভর্নর জেনারেল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, তখনই তাদের ভারত সচিবের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হত। গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাথে একমত হয়ে ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হস্তক্ষেপ করত না।

তা ব্যতীত, গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল-এর প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট **অনুমোদিত উপদেশাবলী** (Instrument of Instructions) এবং **সংসদীয় আদেশ** (Orders-in-Council) প্রদান করত। এই সকল উপদেশ ও আদেশের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় শাসন ক্ষেত্রে প্রচুর হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ হত।

প্রাদেশিক গভর্নর এবং গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রণীত 'জরুরী আইনসমূহ' ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হত। সুতরাং দেখা যায়, ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেট বা ভারত সচিব
Secretary of State for India

ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেট বা ভারত সচিব ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেল, গভর্নর, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যকারিতার সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছিল সত্যই, কিন্তু ভারত সচিব তাদের সকলের ঊর্ধ্বে থেকে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের বোতাম টিপতেন এবং লণ্ডনে বসে পরাধীন ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করতেন। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় তার পদমর্যাদা ছিল অনেকটা মহাপরাক্রমশালী মোগল সম্রাটের ন্যায়, যার ইঙ্গিতে অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত কর্তার চাকরি যে কোন মুহূর্তে খসে পড়ত।

ঐতিহাসিক কারণে এ পদটির সৃষ্টি হয়। ১৮৫৮ সালের ভারতীয় বিপ্লবের পরে ব্রিটেনের অধিপতি ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ইতিহাস-খ্যাত ঘোষণার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে ভারতের শাসনভার ব্রিটেনের রাণী স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং কোম্পানির ডাইরেক্টর বোর্ড এবং নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অবসান ঘোষণা করে **সেক্রেটারী অব স্টেট বা ভারত সচিবের** পদ সৃষ্টি করেন। ভারত সচিব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য। ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ রাজের উপদেষ্টা এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট তিনি দায়ী থাকতেন।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মত তিনি ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং যতদিন ব্রিটেনের মন্ত্রিপরিষদ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকত ততদিন তিনি স্বীয়পদে বহাল থাকতেন। তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন রাজা ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতীক স্বরূপ। ব্রিটেনের রাজা ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাঁর মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারত সচিবের **'পরিদর্শন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের'** ('superindence, direction and control') ক্ষমতা ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যতক্ষণ গভর্নর তার মন্ত্রিপরিষদের সাথে একমত থাকতেন, ততক্ষণ তার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কিছুই থাকত না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উপর ভারত সচিবের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যতক্ষণ গভর্নর জেনারেল তার মন্ত্রিপরিষদের সাথে একমত থাকতেন। কিন্তু যখনই গভর্নর জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নর তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অথবা 'বিচার-বুদ্ধিজনিত' ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, তখন তাদের ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে হত। মূলত গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরের ব্যাপক স্বেচ্ছাধীন ও 'বিচার-বুদ্ধিজনিত' ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং মাত্র কয়েকটি বিষয় ব্যতীত ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারত সচিবের ক্ষমতা ও প্রভাব অপ্রতিহত হয়ে উঠে। ভারত সরকারের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন—দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, রিজার্ভ ব্যাংক, কেন্দ্রীয় রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ ভারত সচিব নিয়ন্ত্রণ করতেন। এগুলো গভর্নর জেনারেল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে পরিচালনা করতেন। তার পরামর্শ মত ব্রিটেনের রাজা গভর্নর জেনারেলের নিকট উপদেশাবলী ও সংসদীয় নির্দেশাবলী (Instrument of Instructions and Orders-in-Council) প্রেরণ করতেন। ভারত সচিব ব্রিটেনের রাজাকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের পরামর্শ দিতেন এবং কার্যত ভারতের গভর্নর জেনারেল রাজ প্রতিনিধি, প্রাদেশিক গভর্নর, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচাপতিগণ, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, তার পরামর্শমতই নিযুক্ত হতেন। কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন নাকচ করা হবে কিনা অথবা কোন আইনে রাজা ভেটো প্রয়োগ করবেন কিনা, সে সকল বিষয়ে ভারত সচিব ব্রিটেনের রাজাকে পরামর্শ দান করতেন। গভর্নর জেনারেল ও গভর্নর কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ ভারত সচিবের পরামর্শ মতই প্রণীত হত।

তা ব্যতীত, সর্ব ভারতীয় চাকরির ক্ষেত্রে, যেমন—আই. সি. এস, এবং আই. পি. এস ইত্যাদি কর্মকর্তার বিষয়ে ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল প্রভূত। তিনি এ সকল চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগকারী ছিলেন। তাদের বেতন নির্ধারণ করা, তাদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করা, পেন্‌সনের বিষয় নির্ধারণ প্রভৃতি কাজ ভারত সচিবকে করতে হত। এ সকল কর্মচারী ছিলেন ভারতে শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। ভারত সচিব তাদের নিয়ন্ত্রণ করে শাসন ব্যবস্থায় অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। তাছাড়াও তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের ভোটের অযোগ্য (Non-Votable) ব্যয় বরাদ্দ খাতে অনুমোদন দান করতেন।

তাই বলা হয়, ভারত সচিবের কার্যালয়—**"লণ্ডনের হোয়াইট হল"**—ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। "সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতীয় নীতি দিল্লী অথবা সিমলায় নির্ধারিত না হয়ে হোয়াইট হলে হত"—এ উক্তি অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
Provincial Autonomy

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাণকেন্দ্র ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এন. সি. রায়-এর মতে, 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' ছিল ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ, ("Provincial Autonomy was regarded as the cornerstone of the new Constitution of India"—N. C. Roy.)।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হল প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রাদেশিক সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মুক্তি।

প্রথম, প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ অবস্থায় প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে।

দ্বিতীয়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, শাসন সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। তা না হলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিরর্থক হয়ে পড়ে।

পরাধীন ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রয়োজন বহু পূর্ব থেকে অনুভূত হয়। ১৯১৭ সালের মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্টে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য, যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের প্রদেশগুলোতে শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উপর আংশিক স্বায়ত্তশাসন অনুমোদনও করা হয়। ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও প্রদেশগুলোতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। তবে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। এ আইন অনুসারে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কেন্দ্রীয় বিষয়কে প্রাদেশিক বিষয় থেকে স্বতন্ত্র করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর সাধারণত কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না তা স্থির করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়সমূহ মন্ত্রিদের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩১ সালে ঘোষণা করেন, গভর্নর শাসিত প্রদেশসমূহে বাহিরের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যুক্ত কমিটির রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয় যে, প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকার কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ করবে না। সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে মৌলিক নীতিগুলো আলোচনা করলে এবং সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ১৯৩৫ সালের আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ণাঙ্গ ছিল না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(১) প্রাদেশিক গভর্নরের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ঃ গভর্নর প্রদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রধান ছিলেন না। কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্নর তার 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' ও 'বিচার বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা' প্রয়োগ করতে পারতেন। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে

প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন। তাছাড়া, কতকগুলো বিষয়ে তার বিশেষ দায়িত্ব ছিল এবং সে সকল ক্ষেত্রে তিনি একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

(২) প্রাদেশিক গভর্নরের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ঃ গভর্নর যে শুধুমাত্র শাসন বিভাগের প্রধান ছিলেন তা নয়, আইন পরিষদের উপরও তার প্রভুত্ব ছিল। তিনি গভর্নরের আইন এবং জরুরী আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করতে পারতেন। আর্থিকক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। আইন পরিষদ কর্তৃক বাতিল করা অর্থ মঞ্জুরিকে তিনি পুনর্বহাল করতে পারতেন।

(৩) গভর্নরের নিয়োগ ঃ তার নিয়োগ পদ্ধতিও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিল। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রদেশের শাসন বিভাগের শিরোমণি ছিলেন। ভারতের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতার উৎস ছিলেন ব্রিটেনের রাজা। রাজার নিকট থেকে গভর্নর ক্ষমতা লাভ করতেন।

(৪) প্রদেশ বহির্ভূত ক্ষমতা ঃ যখন গভর্নর তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, তখন তাকে গভর্নর জেনারেল ও ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে তা প্রয়োগ করতে হত। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে প্রদেশ বহির্ভূত তৃতীয় পক্ষের প্রভাব প্রাদেশিক শাসনে চলে আসত।

(৫) গভর্নরের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ঃ গভর্নরের এমন প্রভুত্বব্যঞ্জক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে উঠতে পারে নি। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ সরকারের প্রধান একটি অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয় নি। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময়ই অগ্রাহ্য করা হত এবং যে কোন অজুহাতে প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হত। উদাহরণস্বরূপ, প্রাদেশিক পরিষদে আস্থাভাজন থাকা সত্ত্বেও তদানীন্তন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা জনাব এ. কে. ফজলুল হক গভর্নরের নিকট পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। খান বাহাদুর পদবী বর্জন করায় সিন্ধুর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব আল্লাবক্স গভর্নর কর্তৃক পদচ্যুত হন, যদিও প্রাদেশিক আইন পরিষদে তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় ছিল।

(৬) গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট ঃ প্রাদেশিক গভর্নরকে অনেক ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে হত এবং কেন্দ্রের নির্দেশ তাকে মেনে চলতে হত। ভারতের যেকোন অংশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গভর্নর জেনারেল গভর্নরকে নির্দেশ দিতে পারতেন। এমনকি কতকগুলো বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্বে গভর্নর জেনারেলের সম্মতি গ্রহণ করতেন।

(৭) গভর্নর জেনারেলের অপরিসীম ক্ষমতা ঃ গভর্নর জেনারেলের একনায়কসুলভ অপরিসীম ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন হয়ে পড়ে। গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ বা প্রাদেশিক আইন পরিষদকে তিন তালিকার বহির্ভূত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দিতে পারতেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ প্রাদেশিক বিষয়গুলোর উপরও আইন প্রণয়ন করতে পারত।

(৮) কর্মকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রণহীনতা ঃ আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একান্ত অবাস্তব ছিল। পুলিশের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ সকল বিষয় গভর্নরের এক্তিয়ারে ছিল।

(৯) প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আই. সি. এস. এবং আই. পি. এস. কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন ভারত সচিব। তিনি তাদের চাকরির

শর্তাবলী নির্ধারণ করতেন। মূলত এ কর্মচারিগণই ছিলেন শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের উপর প্রাদেশিক সরকারের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

(১০) গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ ঃ গভর্নর তার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য গভর্নর জেনারেলের নিকট থেকে উপদেশাবলী (Instrument of Instructions) লাভ করতেন এবং সে মোতাবেক তিনি কার্য নির্বাহ করতেন।

(১১) আইন সভার সীমিত ক্ষমতা ঃ প্রাদেশিক আইন পরিষদ **আইন প্রণয়নকারী সার্বভৌম সংস্থা** হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নি। পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে গভর্নর ভেটো প্রয়োগ করে বাতিল করে দিতে পারতেন অথবা গভর্নর জেনারেলের বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারতেন। গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বিলকে ব্রিটেনের রাজা ১২ মাসের মধ্যে নাকচ করেও দিতে পারতেন। তা ব্যতীত গভর্নর 'গভর্নরের আইন' (Governor's Act) ও অধ্যাদেশ (Ordinance) প্রণয়ন করতে পারতেন। এমনকি পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্যকৃত ব্যয় বরাদ্দকে গভর্নর পুনর্বহাল করতে পারতেন। আসলে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের হিসেবের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় বরাদ্দের উপর প্রাদেশিক আইন পরিষদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

তাই দেখা যায়, প্রাদেশিক গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের ন্যায় অপরিসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী কর্তার কর্তৃত্বের মুখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। তাদের কর্তৃত্বকে দু অজগরের সাথে তুলনা করা চলে। তাই বলা হয় যে, যদিও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়, তথাপি বাস্তবে তা ছিল **"অপূর্ণ, অর্থহীন ও হাস্যকর স্বায়ত্তশাসন।"** এন. সি. রায় তাই বলেন, "যদিও ১৯৩৫ সালে নীতিগতভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়, তথাপি আই. সি. এস. এবং আই. পি. এস. কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকারের মুখে এবং গভর্নরের বিশেষ দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তা অবাস্তব হয়ে পড়ে" ('In theory the provinces enjoyed under the Government of India Act, 1935 autonomy over a large sphere of public administration; it is considerably undermined in practice by the exercise of special responsibilities of the Governor and by the enjoyment of special privileges and rights on the part of I. C. S and I. P. S')। এ প্রসংগে মি. জিন্নাহ্ যে উক্তি করেন তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "এ আইনে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মাত্র দুই ভাগ ছিল স্বায়ত্তশাসন এবং অবশিষ্ট ৯৮ ভাগ ছিল নিরাপত্তার ব্যবস্থা" ("It was two percent of autonomy and ninety eight percent of safeguards")।

তাই মনে হয় ১৯৩৫ সালের প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল একটি **আড়ম্বরপূর্ণ প্রহসন মাত্র**। পূর্ণ ও প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের নামগন্ধও ছিল না এতে। তবে স্বায়ত্তশাসনের সূচনা এখান থেকেই।

প্রাদেশিক গভর্নর
Provincial Governor

প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা। তিনি ৫ বছরের জন্য ব্রিটেনের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। কিভাবে শাসনকার্য নির্বাহ করতে হবে এ সম্বন্ধে তিনি উপদেশাবলী (Instrument of instructions) লাভ করতেন। 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' ও 'বিচারবুদ্ধি সংক্রান্ত' ক্ষমতা প্রয়োগের সময় তিনি গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ লাভ করতেন। অন্যান্য বিষয়ে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ মত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। গভর্নর জেনারেলের ন্যায় তিনি কোন ভারতীয় আদালতের এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

প্রাদেশিক গভর্নর তিন প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। **প্রথম,** তিনি তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগকালে প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শ করতেন না। **দ্বিতীয়,** বিচার-বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা প্রয়োগকালে যদিও তাকে প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের সাথে পরামর্শ করতে হত, তথাপি পরামর্শ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। **তৃতীয়,** মন্ত্রিদের সাহায্য ও পরামর্শ মত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

প্রাদেশিক গভর্নরের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্ন লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয় : **প্রথমত, শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি, দ্বিতীয়ত, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং তৃতীয়ত, অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি ।**

১। শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি (Executive Functions) : গভর্নর ছিলেন প্রদেশের প্রধান শাসক। প্রাদেশিক সমস্ত বিষয়ের উপর তার ক্ষমতা ছিল এবং শাসন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি তার নামে সম্পন্ন হত। তিনি তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় প্রাদেশিক মন্ত্রিদের নিয়োগ করতেন এবং বরখাস্ত করতেন। মন্ত্রিপরিষদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতেন এবং প্রাদেশিক সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করতেন। তিনি জেলা আদালতের বিচারক, প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, প্রদেশের এডভোকেট জেনারেল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে নিযুক্ত করতেন এবং তাদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করতেন। পুলিশ বাহিনী সংক্রান্ত আইন-কানুন তিনি তৈরি করতেন এবং প্রয়োজনবোধে তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রভৃতি করতেন। বিশেষ দায়িত্ব পালনে তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারতেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে গভর্নরের **বিশেষ দায়িত্ব** (Special Responsibilities) ছিল।

(ক) কোন প্রদেশ বা তার কোন অংশের শান্তি ও শৃঙ্খলার হুমকি প্রতিরোধ করা।
(খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথার্থ স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
(গ) সরকারি কর্মচারীদের যথার্থ স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
(ঘ) ব্যবসায় বাণিজ্যে যে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি প্রতিরোধ করা।
(ঙ) আংশিক বহির্ভূত এলাকায় শান্তি ও সুশাসন নিশ্চিত করা।
(চ) ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বার্থ, সেখানকার শাসকদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা।
(ছ) গভর্নর জেনারেলের আদেশ ও নির্দেশ পালন করা।

উল্লিখিত "বিশেষ দায়িত্বগুলো" পালনের সময় গভর্নর স্বীয় বিচারবুদ্ধিজনিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।

২। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি (Legislative Functions) : গভর্নর প্রাদেশিক আইন পরিষদের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন। তিনি তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে ও মূলতবি রাখতে পারতেন এবং নিম্ন কক্ষ ভেঙ্গে দিতে পারতেন। তিনি পরিষদে বক্তৃতা দিতে এবং বাণী প্রেরণ করতে পারতেন। পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিল তার অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হত। তিনি তার সম্মতি স্থগিত রাখতে অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য পরিষদে ফেরত পাঠাতে অথবা গভর্নর জেনারেলের বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারতেন। কোন কোন বিল তিনি সরাসরি নাকচও করতে পারতেন।

পুলিশ বাহিনী সংক্রান্ত কোন আইন এবং কোন জরুরী আইন অথবা গভর্নরের আইনের বিরোধী কোন বিল তার পূর্ব সম্মতি ব্যতীত পরিষদে উত্থাপিত হতে পারত না।

যখন পরিষদের কোন অধিবেশন চলত না, তখন প্রয়োজনবোধে তিনি জরুরী আইন বা অধ্যাদেশ জারি করতে পারতেন। পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনের ছয় সপ্তাহ পর তা রহিত হত। তিনি 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগের জন্যও জরুরী আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। এ সকল আইন প্রথম ছয় মাসের জন্য চালু থাকত এবং তার মেয়াদ আর ছয় মাস বর্ধিত করা যেত। "বিশেষ দায়িত্ব" পালনের জন্য তিনি 'গভর্নরের আইন' নামে বিধি প্রণয়ন করতে পারতেন। গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে তিনি এ সকল আইনকে ভারত সচিবের নিকট পাঠাতেন এবং তিনি পার্লামেণ্টে তা পেশ করতেন। তা ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে গভর্নর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে প্রাদেশিক সরকারের সকল ক্ষমতা স্বীয় হস্তে তুলেও নিতে পারতেন।

৩। **অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি (Financial Functions)ঃ** অর্থসংক্রান্ত বিষয়েও তার প্রচুর ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে তিনি সারা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট পরিষদে পেশ করতেন। ভোটের অযোগ্য ব্যয় বরাদ্দগুলো পরিষদের ভোটে দেয়া হত না। ভোটযোগ্য বিষয়গুলো পরিষদ অনুমোদন করতে, অগ্রাহ্য করতে বা হ্রাস করতে পারতেন। তবে গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটতে পারে মনে করলে গভর্নর আইন পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ্য বা হ্রাসকৃত দাবিকে পূর্বের পরিমাণে পুনঃস্থির করতে পারতেন। গভর্নরের সুপারিশ ব্যতীত কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবি আইন পরিষদে পেশ করা যেত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গভর্নরের প্রভাব এবং কর্তৃত্ব ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী ছিল।

প্রাদেশিক আইন পরিষদ
Provincial Legislature

গভর্নর এবং প্রাদেশিক পরিষদ সমন্বয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক আইন পরিষদ ছিল এক-কক্ষ বিশিষ্ট। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বঙ্গদেশ, বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই—এ ছয়টি প্রদেশে প্রাদেশিক আইন পরিষদ ছিল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট এবং বাকি পাঁচটি প্রদেশে আইন পরিষদ ছিল এক-কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চ পরিষদের নাম ছিল **আইন সভা** (Legislative Council) এবং নিম্ন পরিষদের নাম ছিল **ব্যবস্থাপক সভা** (Legislative Assembly)।

আইন সভা
Legislative Council

বিভিন্ন প্রদেশে আইন সভার সদস্য সংখ্যা ছিল বিভিন্ন রূপ। বঙ্গদেশেই ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য। বঙ্গদেশের আইন সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৫ জন। আসামে ছিল সর্বনিম্ন সংখ্যক ২০ জন। আইন সভা ছিল একটি স্থায়ী সংস্থা। আইনসভাকে কখনও ভেঙ্গে দেয়া যেত না। প্রত্যেক তিন বছর পর পর এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করতে হত। প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল ছিল ৯ বছর। আইন সভার কিছু সংখ্যক সদস্য ছিলেন গভর্নর কর্তৃক মনোনীত এবং কিছু সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হতেন। সদস্যগণের মধ্য থেকে আইন সভার সভাপতি নির্বাচিত হতেন।

ব্যবস্থাপক সভা
Legislative Assembly

ব্যবস্থাপক সভা বা নিম্ন পরিষদ গঠিত হত প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদসগণের দ্বারা। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত পৃথক নির্বাচনের (Separate Electorate) ভিত্তিতে। পূর্বাহ্নে গভর্নর ব্যবস্থাপক সভাকে ভেঙ্গে না দিলে তার কার্যকাল ৫ বছর চলত। বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। বঙ্গদেশে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিল ২৫০ জন। সর্বনিম্ন সংখ্যক সদস্য ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, মাত্র ৫০ জন। সদস্যগণের মধ্য থেকে স্পীকার নির্বাচিত হতেন।

গভর্নর আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতেন, মূলতবি রাখতে পারতেন এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপক সভা ভেঙ্গে দিতে পারতেন। তিনি আইন পরিষদে বক্তৃতা দিতে ও বাণী প্রেরণ করতে পারতেন।

আইন পরিষদের কার্যাবলি নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়—(১) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত**, (২) **শাসন সংক্রান্ত**, (৩) **অর্থ সংক্রান্ত।**

১। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি (Legislative Functions) : পরিষদের দ্বিতীয় কক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারত না। প্রাদেশিক তালিকাভূক্ত বিষয়সমূহের উপর আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রাদেশিক পরিষদের ছিল। কিন্তু যুগ্ম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে যদি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কার্যবিধিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হত তা হলে প্রাদেশিক পরিষদের আইনটি বাতিল হয়ে যেত।

উভয় কক্ষের মধ্যে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে গভর্নর একটি যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করতেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই প্রশ্নের মীমাংসা হত। অর্থ বিল নিম্ন কক্ষে উত্থাপিত হত। অন্য সকল বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারত।

২। শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি (Administrative Functions) : প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিল। আইন পরিষদের আস্থাভাজন থেকেই মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন। আইন পরিষদ মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে মূলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদকে পর্যুদস্ত করতে পারত। অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকত।

৩। অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি (Financial Functions) : আইন পরিষদে প্রত্যেক আর্থিক বছরে বাজেট বা আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব পেশ করা হত। ভোটযোগ্য বিষয়গুলো বরাদ্দ দাবি হিসেবে পরিষদে পেশ করা হত। পরিষদ যে কোন বরাদ্দ দাবিকে গ্রহণ করতে, অগ্রাহ্য করতে অথবা হ্রাস করতে পারত।

মোটামুটি ঐ সকলই ছিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের কার্যাবলি। কিন্তু এও উল্লেখযোগ্য যে, প্রাদেশিক আইন পরিষদ কোন সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ছিল না। বহু বিপত্তিতে প্রাদেশিক আইন পরিষদের পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ।

প্রথম, গভর্নরের সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হত না।

দ্বিতীয়, আইন পরিষদের অনুমোদন না থাকলেও গভর্নর আইন প্রণয়ন করতে পারতেন।

তৃতীয়, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অথবা গভর্নর জেনারেলের কোন আইন বা আদেশের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আইন পরিষদে কোন বিল উত্থাপন করতে হলে গভর্নর জেনারেলের পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হত।

চতুর্থ, গভর্নরের আইন বা গভর্নর কর্তৃক প্রণীত কোন জরুরী আইন অথবা পুলিশ বাহিনী সংক্রান্ত কোন বিধির বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আইন পরিষদে কোন বিল উথাপন করতে হলেও গভর্নরের পূর্ব অনুমোদন দরকার হত।

পঞ্চম, প্রাদেশিক আয়ের উপর পরিষদের কর্তৃত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ভোটের অযোগ্য বিষয়গুলোর প্রতি পরিষদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এগুলো প্রাদেশিক আয়ের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ছিল।

ষষ্ঠ, বিশেষ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে গভর্নর আইন পরিষদ কর্তৃক নামঞ্জুর করা ব্যয়ের দাবিও মঞ্জুর করতে পারতেন।

সর্বশেষ, গভর্নরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন অর্থবিলই পরিষদে উথাপিত হতে পারত না।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের তুলনামূলক আলোচনা

Comparative Study of the Government of India Act, 1935 with the Government of India Act, 1919

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অপেক্ষা কতটুকু প্রগতিশীল—এর উত্তর পেতে হলে উভয় আইনের তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। নিচে এ আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

প্রথমত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এক সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সূচনা করা হয় সত্যই, কিন্তু তার বিকাশ দেখা যায় ১৯৩৫ সালের আইনে। এ আইন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতাকে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে শাসনসংক্রান্ত ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় (Central), প্রাদেশিক (Provincial) এবং যুগ্ম (Concurrent)—এ ত্রিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের আইন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

তৃতীয়ত, ১৯১৯ সালের আইনে প্রদেশে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করা হয় এবং তা শাসন ব্যবস্থায় বহু জটিলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের আইনে প্রদেশে দ্বৈত শাসন রহিত করা হয়, যদিও কেন্দ্রে তার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

চতুর্থত, ১৯৩৫ সালে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হয়। এ আইনে মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকত এবং আইন পরিষদ অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত করতে পারত।

পঞ্চমত, সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থেকে কার্য পরিচালনা করত। প্রাদেশিক ব্যাপারে ভারত সচিবের প্রভাবও এ আইনে অনেকাংশ দূর হয়। প্রাদেশিক গভর্নর ও মন্ত্রিপরিষদ ঐকমত্য পোষণ করে কার্য করলে ভারত সচিব কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না।

ষষ্ঠত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশসমূহে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালের আইনে ভারতের ছয়টি প্রদেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সপ্তমত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতীয়দের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং অধিকতর শাসন ক্ষমতা ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করা হয়।

অষ্টমত, এ আইনে ভোটাধিকার কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়।

নবমত, ১৯৩৫ সালের আইনে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের অথবা প্রদেশসমূহের মধ্যে কোন বিবাদ বাধলে তা মীমাংসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ফলে দেখা যায় যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অপেক্ষা উন্নততর ও অধিক প্রগতিশীল। তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, কোন আইনই ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয় নি। উভয় আইনই ভারতের জনমতে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা, ১৯৩৭—১৯৪৭
Working of Provincial Autonomy, 1937—1947

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক শাসন সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো শুধুমাত্র কার্যকর হয়। এ আইনের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস—এ দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

লক্ষ্ণৌ চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে মুসলিম লীগ নির্বাচনী কার্যক্রম প্রস্তুত করে এবং কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং অন্য দুটি প্রদেশে শক্তিশালী দল হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদসমূহের প্রথম কক্ষের ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১১টি আসনে জয়লাভ করে। মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উত্তীর্ণ হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'লালকোর্তা' দলের মুসলিম সদস্যগণ কংগ্রেসের সাথে হাত মিলায়। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেস পরাজিত হয়।

প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের সময় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নের সময় এও আলোচিত হয় যে, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যগণও অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রতি অনুরূপ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনকালে প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করতে লাগলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল দুই-একজন মুসলমানকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেও নেতৃবর্গ এ মত প্রকাশ করেন যে, তাদের কংগ্রেসের সদস্য হতে হবে। কংগ্রেস মুসলিম লীগের সাথে একত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব মেনে নেয় নি। মুসলমান নেতৃবৃন্দ বুঝলেন, প্রদেশ অথবা কেন্দ্রে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে চিরদিন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষমতা থেকে দূরে থাকবে। মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তখন মুসলিম লীগকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংগঠনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি অবসানের জন্য এবং মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এবং পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য তিনি জনসংযোগ (Mass Contact) অভিযানে অবতীর্ন হলেন। বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করে, বোর্ড স্থাপন করে, সদস্যভুক্তির চাঁদার পরিমাণ কমিয়ে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম

লীগের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, "ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়" ("The Muslim League stands for full national democratic self-government for India.")।

তিনি আরও ঘোষণা করেন, "ক্ষুদ্র দায়িত্ব ও স্বল্প ক্ষমতা প্রয়োগের যে সীমিত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় স্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণ করেছে যে, হিন্দুস্থান হিন্দুদের জন্য। কংগ্রেস সরকারের অধীনে মুসলিমরা ন্যায়নীতি বা সততার কোনটিই আশা করতে পারে না" ('On the very threshold of what little power and responsibility is given, the majority community have clearly shown that Hindustan is for the Hindus. The Muslims can expect neither justice nor fairplay under a Congress Government.')।

তিনি মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমি চাই মুসলমানেরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং স্বহস্তে তারা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলুক।" সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাথে কোন সমঝোতা সম্ভব নয়। মুসলিম লীগ পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম সদস্যদের মুসলিম লীগে যোগদানের আহ্বান করেন এবং জাতীয় পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ প্রচেষ্টা অত্যন্ত ফলবতী হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক তার দলবলসহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খানও স্বীয় সমর্থকসহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহও মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এভাবে মুসলিম লীগ ভারতব্যাপী প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় এবং মুসলিম লীগের জয়যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাদের অধিকাংশই মুসলিম লীগের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৩৭ সাল হতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মুসলিম সদস্যদের আসনে অন্যূন ৬১টি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে ৪৭টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী জয়লাভ করে, ১০টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ৪টি ক্ষেত্রে কংগ্রেস সদস্য জয় যুক্ত হয়। এর পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলিম লীগের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ মত পোষণ করতেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক শাসন সংশ্লিষ্ট বিষয়টুকু গ্রহণযোগ্য। কিন্তু দু বছরের কংগ্রেস শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করে তিনি তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কংগ্রেসের অত্যাচারে মুসলমান জনগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠে। দু বছর পর যখন কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলো প্রতিবাদ হিসেবে পদত্যাগ করে, তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ **'নাযাত দিবস'** (Day of Deliverance) পালনের জন্য আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধেও তার ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এটি স্মরণযোগ্য যে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন। শুধু তিনি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকারিতায় অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার। কিন্তু ১৯৩৭ সালে তিনি মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তাতে মুসলমানদের কোন লাভ হবে না তা তিনি বুঝতে পারলেন এবং তা কংগ্রেস রাজে পরিণত হতে বাধ্য। নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মুসলমানগণ স্থায়ী সংখ্যালঘু দলে পরিণত হবে। পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অধিকতর সুবিধা আদায় অথবা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলিত সরকার (Coalition Government) মুসলমানদের কাম্য সুবিধা

আদায়ে সক্ষম হবে না। তাই ১৯৩৯ সালে তিনি চিরদিনের ন্যায় ১৯৩৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেন এবং এমন এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন যার ফলে মুসলমানগণ স্বীয় সংস্কৃতি এবং জীবনধারাকে অব্যাহত রেখে ভারতবর্ষের বুকে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে সক্ষম হবেন।

১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাব বা লাহোর প্রস্তাব
Lahore Resolution of 1940

১৯৩৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৩৫ সালের সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে চিরদিনের ন্যায় অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেন এবং এমন এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন যার ফলে ভারতীয় মুসলমানগণ স্বীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে অব্যাহত রেখে ভারতবর্ষের বুকে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে সক্ষম হবেন। তার এ দৃঢ় সংকল্পের মূলে ছিল ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং কংগ্রেসের অসহিষ্ণু মনোভাব। সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের মুখপাত্র জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন, ভারতে মাত্র দুটি দল আছে—ব্রিটিশ ও কংগ্রেস। অন্যান্য দলগুলো কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করে জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন, "না, ভারতে তৃতীয় আর একটি দল আছে। তা মুসলিম লীগ, মুসলমানদের দল। আমরা কারো 'তল্পীবাহক' হব না।"

এ প্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস জয়ী হয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে এবং ঐ সকল প্রদেশে "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করে। ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবন বিভিন্নভাবে ব্যাহত হতে থাকে। তাই ভারতীয় মুসলিম চিন্তাবিদগণ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তায় সচকিত হয়ে উঠেন। তাই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দাবি উত্থিত হতে থাকে—"মুসলমানেরা কোন এক সম্প্রদায় নয়, ভারতবর্ষে তারা এক স্বতন্ত্র জাতি।" আন্তর্জাতিক সমাজে প্রত্যেক জাতির যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে, ভারতে মুসলমানদেরও সে অধিকার রয়েছে। সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কালচারের ক্ষেত্রেই যে মুসলমানগণ স্বতন্ত্র তাই নয়, বাসভূমির দিক থেকেও তাদের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় এবং পূর্ব-ভারতের কিছু অংশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ সকল এলাকার সমন্বয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক এক রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে।

১৯৩৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ একটি সাব-কমিটি গঠন করে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক বিষয় পর্যালোচনার ভার দেয়া হয় তার উপর। এ সাব-কমিটি কয়েকটি প্রস্তাব আলোচনা করে। **প্রথমত,** স্যার সিকান্দার হায়াত খানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যার ফলে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব-ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হবে, যদিও কেন্দ্রের উপর কয়েকটি বিষয়ের শাসনভার অর্পণ করা হবে। **দ্বিতীয়ত,** চৌধুরী রহমত আলীর উত্তর-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি প্রদেশ সমন্বয়ে স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনাটিও এ সাব-কমিটি আলোচনা করে। কিন্তু কমিটির নিকট কোনটিই গ্রহণযোগ্য হয় নি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করে যে, ভারতের জন্য কোনরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মুসলিম লীগ গ্রহণ করবে না ("Irrevocably opposed to federal objective")।

১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ একটি ইংরেজি পত্রিকায় ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যে মন্তব্য করেন, তা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "ভারতে দুটি জাতি রয়েছে এবং মাতৃভূমির শাসন ব্যবস্থায় উভয় জাতির অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।" ("There are in India two nations who both must share the government of their common motherland.")।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে যে মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সে অধিবেশনে ঐতিহাসিক **"পাকিস্তান প্রস্তাব"** গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি নিম্নলিখিতভাবে গৃহীত হয় ঃ "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির ভিত্তিতে গৃহীত না হলে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এই দেশে কার্যকর হবে না অথবা তা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না এবং প্রয়োজনবোধে সীমানার পুনর্বিন্যাস সাধন করে ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর সমন্বয় সাধন করে, যেমন—উত্তর ও পশ্চিম-পূর্ব ভারতকে স্বাধীন 'রাষ্ট্রসমূহে' পরিণত করা হোক, যার অঙ্গরাজ্যগুলো সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত হবে" ("Resolved that it is the considered view of this session of the all India Muslim League that no constitutional plan would be workable in the country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principles viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the north western and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent `states" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign")।

এ প্রস্তাবে আরও বলা হয়, সকল অঙ্গরাজ্যে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকারসমূহ রক্ষাকল্পে রক্ষাকবচের নির্দিষ্ট পন্থাসমূহ শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত থাকতে হবে। তাছাড়া, ভারতের যে সকল অংশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু তাদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন ও অন্যান্য অধিকারসমূহ সংরক্ষণের নির্দিষ্ট পন্থাসমূহের উল্লেখ শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।

এ ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি অধিবেশনে পেশ করেন বাংলার কৃতী সন্তান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

এ প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, **প্রথম** ভৌগোলিক দিক দিয়ে পাশাপাশি অবস্থিত এলাকাগুলোর সমন্বয়ে ভারতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সমূহের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। **দ্বিতীয়,** উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের যে সকল এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের সমন্বয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। **তৃতীয়,** এ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্বশাসিত হবে। **চতুর্থ,** সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা সার্বিক ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবে বাংলাদেশের বীজ

লাহোর প্রস্তাবকে আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, এ প্রস্তাবের মধ্যেই বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের ভিত্তিতে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই পূর্ব বাংলার জনগণ সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে

প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। স্বায়ত্তশাসন দাবি কালক্রমে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের অংগরাজ্যগুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে। ১৯৪০ সালের প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসন দাবিকে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল যে, পাকিস্তানের অংগরাজ্যগুলোকে বহুবচনে বর্ণনা করা হয়। "রাষ্ট্র" (state) কথা ব্যবহার না করে "রাষ্ট্রসমূহ" (states) শব্দের প্রয়োগ করা হয়। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ সদস্যদের এক অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য 'রাষ্ট্রসমূহ' কথার পরিবর্তে "রাষ্ট্র" শব্দ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কোন ভাবে ছোট করে দেখা হয় নি। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে তা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের সকল আন্দোলনে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের দিক নির্দেশনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের ২১ দফা কর্মসূচী ও ১৯৬৬ সালের ৬দফা কর্মসূচীতে লাহোর প্রস্তাবের সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। তাই বলা হয়, লাহোর প্রস্তাবে বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।

অন্যদিক থেকেও বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মমূলে লাহোর প্রস্তাবের ভূমিকা রয়েছে। লাহোর প্রস্তাব স্বায়ত্তশাসনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

তবে লাহোর প্রস্তাবে বাংলাদেশের বীজ নিহিত থাকলেও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, বাঙালীদের সীমাহীন বঞ্চনা, ইসলামের নামে বাঙালীদের উপর অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া প্রভৃতি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তারই ইঙ্গিত দেয়া হয় ১৯৩০ সালে। স্যার মোহাম্মদ ইকবাল ১৯৩০ সালে তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, ভারতের জলবায়ু, জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং সমাজ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটি অতি স্পষ্ট যে, ভারতের স্বীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য একমাত্র সম্ভাব্য পন্থাই হলো ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, ইতিহাস ও অর্থনৈতিক অবস্থার সমতার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র গঠন করা।

তিনি আরও বলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে আমি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে সমন্বয় সাধন করতে চাই।"

এ জন্য স্যার মোহাম্মদ ইকবালকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয়।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব
The Two-Nation Theory

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে একটি ইংরেজি পত্রিকায় তার অভিমত প্রকাশ করেন দ্বি-জাতি তত্ত্ব সম্বন্ধে। তিনি বলেন, "ভারতে দুটি জাতি রয়েছে এবং মাতৃভূমির শাসন ব্যবস্থায় উভয় জাতির অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে" ("There are in India two nations who both must share the government of their common motherland.")। তার দ্বি-জাতি তত্ত্ব আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 'এক জাতির এক রাষ্ট্র'—এ নীতির উপর ভিত্তি করে তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। পাক-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। ১৯৪০ সালে লাহোরে যে "পাকিস্তান প্রস্তাব" গৃহীত হয় তা দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরের মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "হিন্দু-মুসলিমদের ধর্মীয় দর্শন,

সামাজিক রীতি–নীতি ও সাহিত্য পৃথক ও স্বতন্ত্র। তারা পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয় না অথবা একত্রে আহার্য গ্রহণ করে না। মূলত তাদের সভ্যতা স্বতন্ত্র ও ভিন্নমুখী। তাদের জীবন–দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, হিন্দু ও মুসলমানগণ ইতিহাসের স্বতন্ত্র উৎস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে। তাদের মহাকাব্য ভিন্ন, তাদের বীর সেনানিগণ স্বতন্ত্র এবং যে কোন প্রসঙ্গও ভিন্ন। প্রায়ই একজনের বীর সেনানী অন্য জনের শত্রু এবং তাদের জয়–পরাজয় এবং অনুরূপ বিষয়ও পরস্পর বিরোধী"।

তিনি বলেন, "ভুল বশত প্রায়ই বলা হয় যে, মুসলমানরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু আসলে তা নয়। যে কোন সূত্রেই তারা একটি জাতি। ভারতবর্ষ একটি জাতি বা দেশ নয়। বহু জাতীয় জনসমাজ সহযোগে এ উপমহাদেশ গঠিত—তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম দুটি বৃহৎ জাতি।"

এই দ্বি–জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিও তুলে ধরেন। এ দাবি সর্বজনীন। এই দাবি জাতির মরা–বাঁচার। এই দাবি গণতন্ত্রের তথা বিংশ শতাব্দীর। পাক–ভারতের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ভারতে কোন স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে তা জাতীয়তাভিত্তিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, "একই রাষ্ট্রে দুটি জাতিকে বেঁধে রাখলে এবং সে জাতিদ্বয়ের মধ্যে যদি একটি সংখ্যালঘু এবং অপরটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তা হলে কালক্রমে তা থেকে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে এবং শাসনব্যবস্থা একদিন ভেঙ্গে পড়বে"। তাই তিনি ঘোষণা করেন, 'জাতির যে কোন সংজ্ঞা আনুসারে মুসলমানরা এক জাতি এবং মুসলমান জাতির নিজস্ব বাসভূমি, ভূখণ্ড এবং রাষ্ট্র থাকতে হবে"। তিনি আরও ঘোষণা করেন, "আমরা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিবেশীর সাথে সুখে–শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছা করি।"

ক্রীপস্ প্রস্তাব
Cripps Mission

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কংগ্রেসের কার্যকর সংস্থা ঘোষণা করে, "ভারত স্বাধীন না হয়ে স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করতে পারে না। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটি ভারতীয় জনসাধারণ কর্তৃক মীমাংসা হতে হবে" ("India could not fight for it unless she herself was free. The issue of war and peace must be decided by the Indian people.")।

১৯৪০ সালের ৭ অক্টোবর ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো ঘোষণা করেন যে, ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা (dominion status) দান করা হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্রিটেনের সমান মর্যাদা দান করা হবে। কংগ্রেস কিন্তু তাঁর এ ঘোষণায় সন্তুষ্ট না হয়ে প্রদেশসমূহে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলোকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দান করে। অক্টোবরে মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর–পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলো পদত্যাগ করে। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৩৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগের কার্যকর সংস্থা নাৎসী আক্রমণের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে মত প্রকাশ করে। মুসলিম লীগ কয়েকটি শর্ত সাপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথাও ঘোষণা করে।

শর্তগুলোর **প্রথমটি** ছিল—মুসলমানদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে মুসলিম লীগের সমর্থন ও সম্মতি ব্যতীত কোন কিছুই করা যাবে না।

দ্বিতীয়, মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক একমাত্র প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ।

তৃতীয়, ভারতের মুসলিম সৈন্যদিগকে অন্য কোন দেশের মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা চলবে না।

চতুর্থ, প্যালেস্টাইনে আরবদের প্রতি সৎ আচরণের আশ্বাস দাবি করা হয়।

মালয়ের পতনের পর প্রাচ্য দেশে যখন যুদ্ধ ক্রমশ বিস্তার লাভ করছিল তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক অবস্থার উন্নতি সাধনে পুনরায় মনোনিবেশ করেন। রেঙ্গুনের পতনের পর ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্ (Sir Stafford Cripps) ব্রিটিশ সরকারের স্পল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আগমন করেন। স্বল্পকালীন প্রস্তাবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ (ক) ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতার প্রকাশ, এবং (খ) যুদ্ধে ভারতীয়দের নিকট থেকে সর্বাত্মক সাহায্য কামনা। (গ) যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন।

তাঁর দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, ভারতের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এক সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Indian Union) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দান করার প্রস্তাব করা হয় এবং প্রয়োজনবোধে এ যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও পারবে।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সরকার এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অন্যভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রথম কক্ষগুলো দ্বারা নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত গণপরিষদ যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ভারতের সংবিধান রচনা করবে।

তৃতীয়ত, মাত্র দুটি শর্ত সাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান গ্রহণ করবে। **(এক),** যদি কোন প্রদেশ নতুন সংবিধানে খুশী না হয়, তা হলে সে প্রদেশ নতুন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে। **(দুই),** সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকার ও গণপরিষদ একমত হবেন।

চতুর্থত, সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভারতের প্রধান প্রধান দলগুলোর নেতৃবর্গের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। তবে এ প্রস্তাবে এও উল্লেখ করা হয় যে, দেশরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

পঞ্চমত, প্রদেশগুলো ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে পারবে এবং ব্রিটিশ সরকারের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।

ক্রীপ্স মিশন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোন দলই এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করে নি। **প্রথম,** কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এজন্য যে, এ ব্যবস্থায় প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়। **দ্বিতীয়,** গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলো থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক মনোনীত সদস্যের যে ব্যবস্থা রাখা হয়, তা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। তাছাড়া, কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী ছিল। প্রদেশগুলোর বিচ্ছিন্নতার সুযোগ অখণ্ড

ভারতের প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। **তৃতীয়,** কংগ্রেস দেশরক্ষা বিভাগে কোন ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকায় তীব্র আশঙ্কা প্রকাশ করে। **চতুর্থ,** কংগ্রেসের দাবি ছিল ভারতের আশু স্বাধীনতা এবং ভারতের সংবিধান রচনার জন্য অবিলম্বে গণপরিষদ গঠনের দাবি।

ক্রীপ্‌স প্রস্তাবে এ সকল উপাদানের অনুপস্থিতির জন্য কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "ব্রিটিশ পরিকল্পনাটি এত হাস্যকর যে, কোথাও তা গৃহীত হতে পারে না" ("The British plan was on the face of it too ridiculous to find acceptance any where")।

মুসলিম লীগ এ ব্যবস্থায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কোন শুভ সূচনা লক্ষ্য করে নি। তাই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়।

ক্রীপ্‌সের দৌত্য ব্যর্থতায় পরিণত হলে ভারতে **'আগস্ট বিপ্লব'** শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারও কঠোর হস্তে তা দমন করতে উদ্যত হয়। পাইকারী হারে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কারারুদ্ধ করা হয়।

জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা
Jinah-Gandhi Talks

জাপানী সৈন্য যখন ভারতের দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত এবং ক্রীপ্‌সের দৌত্যকর্ম যখন ব্যর্থ তখন শাসন ব্যবস্থায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অচলাবস্থা দূর করার উদ্দেশ্য প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা রাজা গোপালাচারী ভারতের দু নেতা মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মধ্যে এক আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে রাজা গোপালাচারী এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ছিল ঃ

প্রথম, মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করবে এবং সে যুগ-সন্ধিক্ষণে কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠনে সহায়তা করবে।

দ্বিতীয়, যুদ্ধের অবসান হলে একটি কমিশন গঠন করা হবে। সে কমিশন উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে যে সকল প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান, সে সকল স্থানে গণভোট পরিচালনা করে স্থির করবে সে সকল স্থানের জনসাধারণ হিন্দুস্থানে বাস করতে চায়, না তারা হিন্দুস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়।

তৃতীয়, বিচ্ছিন্ন হতেই চাইলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, যাতায়াত এবং অন্যান্য অপরিহার্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে চুক্তি স্থাপন করা হবে।

সর্বশেষে, ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করলে এ সকল শর্তাবলী কার্যকর হবে। "গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনা ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাও ব্যর্থ হয়ে যায়, কেননা গান্ধীর অভিমত ছিল অখণ্ড ভারতের পক্ষে। তিনি কোনক্রমেই স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না যে মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। লাহোর প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি বলেন, "বাস্তবে যখনই আমি লাহোর প্রস্তাব সম্বন্ধে কল্পনা করি, তখন শুধু সমগ্র ভারতের ধ্বংসই দেখতে পাই" ("As I imagine the Lahore Resolution in practice, I see nothing but ruin for the whole of India")। জিন্নাহ তাঁর বক্তব্যে অটল রইলেন। "মুসলমানগণ যে স্বতন্ত্র এক জাতি"—তাই ছিল তার বক্তব্য। ফলে এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি।

সিমলা অধিবেশন
Simla Conference

১৯৪৪ সালে জার্মানীর পতন ঘটে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রেও শীতল বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। প্রায় সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়। এ সময় গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল সিমলায় ভারতের নেতৃবৃন্দের এক অধিবেশন আহ্বান করেন এবং ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করেন।

প্রথমত, প্রস্তাবিত হয় যে, শাসন পরিষদ এমনভাবে পূনর্গঠিত হবে, যার ফলে জেনারেল ও সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ব্যতীত সকল সদস্যই হবেন ভারতীয়। বৈদেশিক বিষয়ের কর্মসূচীও পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের হস্তে ন্যস্ত করা হবে। **দ্বিতীয়ত,** গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদে বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা সমান থাকবে। **তৃতীয়ত,** গভর্নর জেনারেল প্রত্যেক দলকে দলীয় প্রার্থী মনোনীত করার নির্দেশ দেন। **চতুর্থত,** জাপানের সাথে যুদ্ধের অবসান হলে সংবিধান রচিত হবে। **সর্বশেষে,** শাসন পরিষদের সদস্যগণকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে।

সিমলা অধিবেশনও ব্যর্থতায় পরিণত হয়, কেননা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ মত প্রকাশ করেন যে, মুসলিম লীগ শাসন পরিষদের মুসলমান সদস্যগণকে মনোনীত করবে। কংগ্রেস এ মতের বিরোধিতা করে। গভর্নর জেনারেল ও পাঞ্জাব প্রদেশের ক্ষেত্রে নিজস্ব মত পোষণ করতে থাকেন।

সাধারণ নির্বাচন—১৯৪৬
General Election-1946

১৯৪৫ সালে ব্রিটেনের লেবার পার্টি (Labour party) ক্ষমতাসীন হয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের নির্বাচনের নির্দেশ দান করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের আন্তরিক ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবিকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে নির্বাচনে অবতীর্ন হয়। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের শতকরা একশতটি আসন লাভ করে জনপ্রিয়তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে মুসলিম লীগ ৪৯৫টি আসনের মধ্যে ৪৪৬টি আসন লাভ করে। পাকিস্তান অর্জনের পথে আর কোন দুরূহ প্রতিবন্ধক তা রইল না।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা
Cabinet Mission Plan

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হলে ব্রিটেনেও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়ী হলে ব্রিটিশ সরকারের ভারত নীতিরও পরিবর্তন হয়। ১৯৪৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স (Lord Pethick Lawrence) ব্রিটেনের লর্ড সভায় ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারত সম্পর্কে অনুসৃত নীতি পরিবর্তনে আগ্রহী। এ উদ্দেশ্য ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক ঘোষণা দেয়া হয় যে, ব্রিটিশ সরকার তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন ভারতে প্রেরণ করবে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁরা হলেন (ক) স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপ্‌স, (খ) লর্ড পেথিক লরেন্স, এবং (গ) এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। ভারতে

স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু-মুসলমান ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল মন্ত্রিমিশনের লক্ষ্য। মন্ত্রিমিশন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ মে তারিখ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা পেশ করে। এই হলো বিখ্যাত মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা।

এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

প্রথমত, এ পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো সমন্বয়ে ভারত ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ বিষয়সমূহ ভারত ইউনিয়নের আওতাভুক্ত থাকবে।

দ্বিতীয়ত, শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় ও অনুল্লিখিত বিষয়গুলো প্রদেশের হস্তে ন্যস্ত থাকবে। দেশীয় রাজ্যগুলোও কেন্দ্রীয় বিষয় বহির্ভূত সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

তৃতীয়ত, ভারত ইউনিয়নের একটি শাসন বিভাগ ও একটি আইন পরিষদ থাকবে। আইন পরিষদ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি সহযোগে গঠিত হবে।

চতুর্থত, ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে, যথা—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগ বা গ্রুপ। প্রথম ভাগে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছয়টি প্রদেশ; যথা—বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ। দ্বিতীয় ভাগে থাকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ তিনটি প্রদেশ, যথা—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। তৃতীয় ভাগে থাকবে পূর্ব ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি প্রদেশ, যথা—বাংলা ও আসাম। প্রত্যেক ভাগে প্রদেশসমূহ নিজস্ব সংবিধান রচনা করতে পারবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারবে।

পঞ্চমত, প্রত্যেক ভাগের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে সর্ব ভারতীয় গণপরিষদ গঠিত হবে এবং গণ পরিষদ ভারত ইউনিয়নের সংবিধান রচনা করবে।

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক গ্রুপের সংবিধানে এমন শর্ত থাকতে হবে যেন দশ বছর পর যে কোন প্রদেশ সংবিধানের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

সপ্তমত, সংবিধান রচিত হবার পর যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে গ্রুপ থেকে বের হতে পারবে।

সংবিধান রচনার পূর্ব পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এই সরকারে থাকবে ভারতের প্রধান প্রধান দলগুলোর প্রতিনিধি।

এর প্রতিক্রিয়া এবং ব্যর্থতা

(এক) প্রদেশসমূহের বিভক্তিকরণে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে মনে করে মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায় সন্তোষ প্রকাশ করে এবং ১৯৪৬ সালের ৬ জুন তারিখে মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গভর্নর জেনারেল এ আশ্বাস দেন যে, যে কোন দল যোগদান করলেই তা কার্যকর করা হবে। এ শর্তে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনেও সম্মত হয়। ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন সংবিধান রচনার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তা কংগ্রেস স্বীকার করে, কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মত হয় নি। লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে হিন্দু-মুসলিম সমতা রক্ষার্থে ৫ জন হিন্দু, ৫ জন মুসলমান সদস্যদের আসনের প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস কিন্তু এই সমতা মেনে নিতে পারে নি।

(দুই) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কংগ্রেসের অসম্মতির ফলে গভর্নর জেনারেল মুসলিম লীগের নিকট প্রদত্ত স্বীয় প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে সরকার গঠনের প্রস্তাব সাময়িকভাবে বাতিল করে। মুসলিম লীগ একে "প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ" বলে আখ্যায়িত করে। কংগ্রেসের সভাপতি নেহেরু মত প্রকাশ করেন, প্রদেশসমূহের বিভক্তিকরণ (grouping) বাধ্যতামূলক নয়। এ পরিস্থিতিতে বোম্বাই-এ মুসলিম লীগের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(তিন) দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এ সময়ে মুসলিম লীগ গ্রহণ করে। প্রথমটি ছিল মুসলমানদের সর্ব প্রকার ব্রিটিশ উপাধি বর্জনের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়টি বর্তমানের ব্রিটিশ দাসত্ব এবং ভবিষ্যতের হিন্দু দাসত্বের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) পালনের সিদ্ধান্ত। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করা হয়। ফলে কলকাতা, বিহার, বাংলার নোয়াখালী ও অন্যান্য স্থানে গুরুতর আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং হাজার হাজার নাগরিক প্রাণ হারায়। পরে অবশ্য কংগ্রেস 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠনে সম্মত হয় এবং কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গভর্নর জেনারেল তার শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করেন। মুসলিম লীগকেও অবশ্য আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু লীগ তা গ্রহণ করে নি গভর্নর জেনারেলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য। পণ্ডিত নেহেরু শাসন পরিষদের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন ১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর। মুসলিম লীগ এ অবস্থায় সে দিনটিকে অশুভ দিন (Black Day) হিসেবে উদযাপন করে। চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র দেশ এক ভীতির রাজ্যে পরিণত হয়। গভর্নর জেনারেল তখন পণ্ডিত নেহেরুর সাথে জিন্নাহ সাহেবের আলোচনার ব্যবস্থা করেন। মুসলিম স্বার্থরক্ষার জন্য তখন মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ১২ অক্টোবর নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে পাঁচজন সদস্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করেন। কিন্তু লীগ কংগ্রেসের সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তা কোনরূপ কার্যকর পন্থা গ্রহণে অথবা কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সক্ষম হয় নি। কার্যত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এভাবে মন্ত্রিমিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কংগ্রেস প্রদেশসমূহে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনায় এ পরিকল্পনা অগ্রহণযোগ্য মনে করে। মুসলিম লীগ প্রথমে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পরে কংগ্রেসি ব্যাখ্যায় ভীত হয়। সারাদেশে অবিশ্বাস, ভীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র ভারত এক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবর্গের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মাউন্টব্যাটেনের ৩রা জুন পরিকল্পনা—১৯৪৭
Mountbaten's 3rd June Plan—1947

ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত অবশেষে গ্রহণ করেন। কিন্তু লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তারাও মহা সমস্যায় পড়লেন—কোন্ দলের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড এট্‌লী *(Lord Attlee)* ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করবেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের নতুন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। তিনিই ভারতের শেষ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল। তিনি দেখলেন, ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত প্রভাবের কবলে পতিত। ব্রিটিশ সরকারের

সাথে পরামর্শ করে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তাই বিখ্যাত ৩রা জুন পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় পাকিস্তান প্রস্তাব নীতিগতভাবে গৃহীত হয়। ভারত বিভক্তিকরণের (Partition) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত—এ দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লিখিত হলো ঃ

প্রথমত, যে সকল প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন—বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এ সকল প্রদেশে আইন পরিষদের সদস্যগণ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তারা ভারতে যোগদান করবেন অথবা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের মুসলমান অধ্যুষিত জেলাসমূহের সদস্যগণ ভোটের মাধ্যমে স্থির করবেন সে সকল জেলা ভারত না পাকিস্তানে যোগদান করবে।

তৃতীয়ত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিলুচিস্তান এবং আসামের সিলেট জেলা ভারতের না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে,তা নির্ধারিত হবে গণভোটের মাধ্যমে। সিন্দু প্রদেশের আইন পরিষদ সামগ্রিকভাবে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আসলে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভক্ত হলো। সিলেটের অধিকাংশ পাকিস্তানে যোগদান করল। বেলুচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো।

চতুর্থত, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন করা হলো। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ (Sir Ceril Radcliff) এ কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন।

পঞ্চমত, পাকিস্তান ও ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন প্রণীত হয়।

ষষ্ঠত, বর্তমান গণপরিষদ কার্য পরিচালনা করে চলতে থাকবে। তবে যে সকল অঞ্চল এ সংবিধান গ্রহণে রাজি হবে না, তাদের প্রতি তা প্রযোজ্য হবে না।

সর্বশেষে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের জন্য সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠন করতে পারবেন।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন
Indian Independence Act, 1947

১৯৪৬ সালের ৩ জুন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীনতা আইন (Indián Independence Act) প্রণয়ন করেন। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো নিচে বর্ণিত হলো ঃ

প্রথমত, এ আইনের ফলে ভারতবর্ষে প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটল এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে **ভারত ইউনিয়ন** ও **পাকিস্তান** এ দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো। পূর্ব-বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য

পাকিস্তানে যোগদান করে —তাদের সমন্বয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ সহযোগে **'ভারত ইউনিয়ন'** গঠিত হয়। পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন ডোমিনিয়ন পর্যায়ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, এ আইনে দুটি ডোমিনিয়নের জন্য দুটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। প্রত্যেক গণপরিষদ নিজ নিজ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে সংবিধান রচনা করবে এবং সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত তা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদরূপে কার্য নির্বাহ করবে।

তৃতীয়ত, পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভূক্ত থাকবে কিনা, তাও তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। সার্বভৌম গণপরিষদই তা নির্ধারণ করার অধিকারী হলো।

চতুর্থত, এ আইনের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর হতে ইংল্যাণ্ডের রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার (Paramountcy of the Crown)অবসান ঘটে। দেশীয় রাজ্যগুলো স্বীয় ইচ্ছামত যে কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করতে পারবে অথবা স্বাধীনভাবেও থাকতে পারবে। এ আইনের ফলে দেশীয় রাজ্যগুলোর সাথে ইংল্যাণ্ডের রাজার সকল সন্ধি বা চুক্তির বিলুপ্তি ঘটে।

পঞ্চমত, এ আইনে ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাজার আইন নাকচ করার ক্ষমতা (veto power) এবং তার অনুমোদনের জন্য আইন সংরক্ষণ করার ক্ষমতার অবসান ঘটে। গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনে গভর্নর জেনারেল অনুমোদন দান করতে পারবেন।

ষষ্ঠত, এ আইনের ফলে রাজকীয় মর্যাদা ও উপাধি হতে ভারত সম্রাট (Emperor of India) উপাধি বিলুপ্ত হয় এবং ভারতের শাসন সংক্রান্ত বিষয় থেকে ব্রিটিশ সরকারকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

সপ্তমত, এ আইনে ভারত সচিবের (Secretary of State for India) পদের অবসান ঘটে। ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের সাথে সংযোগ রক্ষা করার জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারীর উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

অষ্টমত, পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নের জন্য নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার নিম্নলিখিত পরিবর্তন ও সংশোধনের পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(ক) গভর্নর জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন (discretionary) ক্ষমতা, বিচার বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা (power of individual judgement) এবং বিশেষ দায়িত্ব (special responsibility) প্রভৃতির অবসান ঘটবে এবং এখন থেকে তারা স্ব স্ব মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত সকল অবস্থায় কার্য পরিচালনা করবেন।

(খ) মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত এখন থেকে প্রত্যেক ডোমিনিয়নে গভর্নর জেনারেল ইংল্যাণ্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(গ) মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক গভর্নরকে নিযুক্ত করবেন।

(ঘ) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এ অজুহাতে আইন পরিষদের কোন আইন অচল এবং অপ্রচলিত হবে না।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং ভারত ইউনিয়নের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন লিয়াকত আলী খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহেরু।

১। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। (Discuss the main features of the Government of India Act. 1935.) [N. U. 1935, 2004, 2006]

২। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কী? ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে তা কতটুকু প্রযোজ্য? (What is provincial autonomy? How far was it introduced under the Government of India Act of 1935?) [D. U. 84]

৩। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেলের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the role of Governor General of India under the Act of 1935.) [R. U. '84]

৪। '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল শুধু নামমাত্র'—বিশ্লেষণ কর। ('Under the Government of India Act, 1935 federation was in form not in practice'—Elucidate.) [R. U. '87]

৫। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the nature of all India Federation under the Govt. of India 1935.)

৬। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the special responsibilities of the Governor General under the Act of 1935.)

৭।১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the composition and functions of the federal legislature under the Govt. of India Act. 1935.)

৮। ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the position of the princely states in British India.)

৯। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক গভর্নরের ভূমিকা ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Discuss the role and functions of a provincial governor under the Govt. of India Act, 1935.)

১০। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অপেক্ষা কতটুকু প্রগতিশীল ও উন্নত ছিল তা পরীক্ষা করে দেখাও। (Examine how far the Government of India Act, 1935 was an improvement upon the Government of India Act, 1919.)

১১। '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'—বিশ্লেষণ কর। ('Provincial autonomy was the salient feature of the Government of India Act, 1935. Elucidate.)

১২। ভারত সচিবের কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the functions of the Secretary of State for India under 1935 Act.)

১৩। ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ভারতের গভর্নর জেনারেলের কার্যাবলি বর্ণনা কর। (Describe the functions of the Governor General of India under the Act, of 1935.)

১৪। নিম্নলিখিতগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(ক) ভারত সচিব।

(খ) দ্বৈত শাসন।

(গ) যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের দলিল।

[(Write short notes on the followings) :
(a) Secretary of State for India.
(b) Dyarchy.
(c) Instrument of Accession.]

১৫। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলো কী স্বায়ত্তশাসিত ছিল? (What do you mean by provincial autonomy? Were the provinces really autonomous under the Government of India Act. 1935?)
[N. U. 1997, 1999, 2001, 2003]

১৬। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Enumerate the differences between the Act, of 1935 and the Indian Independence Act. of 1947.)

১৭। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe powers and functions of the Governor General of India under the Act of 1935.) [D. U. 1984]

১৮। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মৌলিক ধারাগুলোর বিবরণ দাও। (Describe the salient features of the Govt. of India Act, 1935.)

১৯। ১৯৩৫ সাল হতে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a short account of the constitutional development in Indo-Pakistan sub-continent from the Govt. of India Act, 1935 to the Independence Act, 1947.)

২০। 'লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তানের ভিত্তিস্বরূপ'—আলোচনা কর। ('Lahore Resolution was the basis of Pakistan'—Discuss.)

২১। পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের আলোচনা কর। (Discuss the Two-Nation theory in relation to the Pakistan Movement.)

২২। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব সম্বন্ধে কী জান? তা ব্যর্থ হয়েছিল কেন? (What do you know about the Cripps Proposal? Why did it fail?) [D. U. '84)

২৩। সিমলা অধিবেশন সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the Simla Conference.)

২৪। ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the main features of the Cabinet Mission Plan of 1946.) [D. U. '84; N. U. 1995, 2003]

২৫। মাউন্ট ব্যাটেনের ৩রা জুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the Mountbaten's 3rd June Plan.)

২৬। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the main Provisions of the Indian Independence Act. 1947.)

[N. U. 1996; D. U. '84, 1998, 2000, 2005]

২৭। নিম্নলিখিতগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (Write short notes on the following) ঃ

(ক) জিন্নাহ্-গান্ধী আলোচনা (jinnah-Gandhi talks)

(খ) দ্বি-জাতি তত্ত্ব (Two-Nation Theory)

(গ) মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan)

(ঘ) মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা (Mountbaten' Plan)

২৮। মন্ত্রিমিশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল কেন? (What are the main features of the Cabinet Mission Plan? Why did it ultimately fail?)

[N. U. 1997]

২৯। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির আলোচনা কর। (Discuss the nature of all India Federation as Proposed under the Government of India Act. 1935.) [D. U. 1983]

৩০। নিম্নলিখিতগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (Write short notes on the following.) ঃ

(ক) সাইমন কমিশন (Simon Commission)।

(খ) কায়েদে আযমের চৌদ্দ দফা (Fourteen points of Quaid-i-Azam)।

(গ) ক্রীপ্স প্রস্তাব (Cripps Mission Plan)। [D. U. 1984]

৩১। নিম্নলিখিতগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (Write short notes on)।

(ক) দ্বৈত শাসন (Dyarchy)।

(খ) গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conferences)।

(গ) মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan)।

৩২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা কর। (Explain the nature and working of the federal system under the India Act. of 1935.) [N. U 1996]

৩৩। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে কী স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল? আলোচনা কর। (Did Lahore Resolution.contain the seeds of Independent Bangladesh? Discuss.)

[N. U. 1996, 1998, 2000, 2005, 2007]

১৯৪৭ সালের পর থেকে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT SINCE 1947

সূচনা
Introduction

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ৮ ধারা মতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাকিস্তানের শাসনকার্য পরিচালিত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী। অবশ্য সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। গণপরিষদের উপর দ্বিবিধ দায়িত্ব দেয়া হয়। **প্রথম,** নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত তা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কার্য পরিচালনা করবে। **দ্বিতীয়,** গণপরিষদ পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করবে।

প্রথম গণপরিষদ
The First Constituent Assembly

১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট করাচীতে প্রথম গণপরিষদের প্রথম বৈঠক বসে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর স্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। সর্বপ্রথমে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৯ জন। পরবর্তীকালে অবশ্য এর সদস্য সংখ্যা হয় ৭৯ জন।

প্রথম গণপরিষদের সদস্য	
পূর্ব-বাংলা	৪৪
পশ্চিম পাঞ্জাব	২২
সিন্ধু	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩
বেলুচিস্তান	১
বেলুচিস্তান দেশীয় রাজ্য	১
বাহাওয়ালপুর	১
খয়েরপুর	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশীয় রাজ্য	১
	সর্বমোট—৭৯

প্রথম গণপরিষদের উপর দ্বিবিধ দায়িত্ব অর্পিত হয়। **প্রথম,** গণপরিষদ পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব লাভ করে। **দ্বিতীয়,** নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত তা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবে কার্য পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে।

পাকিস্তানে প্রথম গণপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন আইনের আশীর্বাদ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিল, তবে এর ধারণা নিহিত ছিল ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৭ সালের ৩ জুন পরিকল্পনা ও ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মধ্যে। গণপরিষদের সদস্যগণ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ সুদীর্ঘ সাত বছরের মধ্যেও কোন সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হয় নি, যদিও প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত মাত্র আড়াই বছরের মধে সংবিধান রচনা করেছিল।

প্রথম গণপরিষদের ব্যর্থতার কারণ
Reasons for the Failure of the First Constituent Assembly

প্রথম গণপরিষদ শুধুমাত্র আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত সার্থক কোন কিছুই সম্পন্ন করেনি এবং দীর্ঘ সাত বছরের ইতিহাসে একটি আদর্শ প্রস্তাব প্রণয়ন করা ছিল বিরাট এক ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতার অবশ্য অনেকগুলো কারণ ছিল। **প্রথমত,** গণপরিষদের সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অতি অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি ১৯৫১ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ দু'জন খ্যাতনামা নেতার মৃত্যু গণপরিষদের ব্যর্থতার এক বিরাট কারণ ছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই গণপরিষদের অধিবেশন হয় অত্যন্ত স্বল্পকালীন। দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে গণপরিষদের অধিবেশন বসে মাত্র ১১৬ দিন এবং এ সব অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন মাত্র ৩৫ থেকে ৫৫ জন সদস্য। ফলে সংবিধান রচনার কাজে তেমন অগ্রগতি সাধিত হয় নি।

তৃতীয়ত, প্রথম দিকে গণপরিষদের কার্যক্রমে তেমন উৎসাহজনক কোন কিছু সম্পন্ন হয় নি। প্রথম আঠারো মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভা, গভর্নর জেনারেল প্রমুখের বেতন নির্ধারণ ও ছোট-খাট দু-একটি সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই সম্পন্ন হয় নি।

চতুর্থত, গণপরিষদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ মন্ত্রী ও গভর্নরদের পদে অধিষ্ঠিত হবার ফলেও এর কার্যধারায় তেমন অগ্রগতি সাধিত হয় নি।

সর্বশেষে, এও বলা যায় যে, গণপরিষদের সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হবার ফলে কোন কিছুই করার সাহস পেতেন না। তাছাড়া, পাকিস্তানে সংবিধান রচনার কতকগুলো মৌলিক সমস্যাও ছিল যে গুলোর সমাধান করা সহজ ছিল না।

পাকিস্তানে সংবিধান রচনার সমস্যা
Problems of Constitution Making in Pakistan

পাকিস্তানে সংবিধান রচনার কতকগুলো মৌলিক সমস্যা ছিল যার সমাধান যে কোন গণপরিষদের পক্ষে অত্যন্ত জটিল। এ সমস্যাগুলোকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ **(এক)** আদর্শভিত্তিক সমস্যা, **(দুই)** আঞ্চলিক সমস্যা, **(তিন)** রাজনৈতিক সমস্যা।

পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্ব। পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা যে একটি স্বতন্ত্র জাতি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম নেতৃবর্গ পাকিস্তান আন্দোলনকে দুর্বার করে তোলে। ফলে পাকিস্তানের বিরাট এক জনসমষ্টি প্রথম থেকেই দাবি উত্থাপন করেন যে, পাকিস্তান হবে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন, "পাকিস্তান হবে এমন এক রাষ্ট্র যেখানে ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে কোন সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু থাকবে না—থাকবে শুধু মানবিক মর্যাদা ও মানবিক সাম্য" ("A state where the brotherhood of Islam will prevail, where there is no minority or majority and where human dignity and human equality will prevail.")। অন্যদিকে, উদারনৈতিক নেতৃবর্গ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা ছিল অনেকটা সেকেলে। ১৯৪৯ সালে যখন আদর্শ প্রস্তাব গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় তখনও গণপরিষদে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংবিধান রচয়িতাদের এক বিরাট অংশ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। হিন্দু সদস্যদের নিকট ইসলামী ব্যবস্থা অগ্রহণযোগ্য। কিছু কিছু মুসলিম সদস্যও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। সুতরাং পাকিস্তানের সংবিধান রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে আদর্শগত সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক সমস্যা পাকিস্তানের শুরু থেকেই ফণা উদ্যত করে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের দু অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল এক হাজার মাইলেরও বেশি। উভয় অঞ্চলের ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনব্যবস্থা, এমনকি মানসিক গঠনও ছিল স্বতন্ত্র। উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, এমনকি গায়ের রংও ছিল বিভিন্ন। ফলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক বেশি। অন্যদিকে, উভয় অঞ্চলের সামাজিক গঠন, শ্রেণীবিন্যাস ও উভয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ছিল ভিন্ন। এমনি পরিস্থিতিতে সংবিধান রচয়িতাদের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল তা সত্যই জটিল। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা পাকিস্তানের জন্য ছিল একান্ত অনুপযোগী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমেও পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারত। অন্যপক্ষে, অর্থনৈতিক বিভিন্নতা এবং উন্নয়নমুখী প্রক্রিয়াও উভয় অঞ্চলের মধ্যে গড়ে তুলেছিল বৈষম্যের এক পাহাড়। পাকিস্তানে আঞ্চলিক সমস্যা ও তার সমাধান অনেককে বিভ্রান্ত করেছিল।

তৃতীয়ত, রিচার্ড এস. হুইলার (*Richard S. Wheeler*) বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই পাকিস্তানে দুটি প্রধান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। **প্রথম,** পাকিস্তান কি ইসলামিক রাষ্ট্র হবে, না ধর্মনিরপেক্ষ হবে। **দ্বিতীয়,** পাকিস্তানের সরকার এককেন্দ্রিক হবে, না যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে। পাকিস্তানে আদর্শগত সমস্যার কালক্রমে সমাধান হলেও আঞ্চলিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। **তৃতীয়,** রাজনৈতিক সমস্যাও পাকিস্তানে জটিল আকার ধারণ করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বেসামরিক কর্মকর্তা পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। উচ্চতর পর্যায়ে, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের কোন ভূমিকা ছিল না। পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় এবং উভয় অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য পূর্ব পাকিস্তান বরাবর বিচ্ছিন্ন ছিল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা উভয় অঞ্চলে ভিন্নমুখী অর্থনীতি তথা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এ সব মিলে সংবিধান রচনা পর্যায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ শুধুমাত্র ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এবং কোনরূপ সৃজনশীল সমাধান আনয়নে সক্ষম হন নি।

আদর্শ প্রস্তাব
Objective Resolution

সংবিধান রচনার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে গণপরিষদ কতগুলো নীতি নির্ধারণী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ সকল প্রস্তাব সমষ্টিগতভাবে **আদর্শ প্রস্তাব** (Objective Resolution) নামে পরিচিত। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করেন।

আদর্শ প্রস্তাবের গুরুত্ব (Its Importance) ঃ প্রথম গণপরিষদ কর্তৃক আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি দৃঢ় পদক্ষেপস্বরূপ। আদর্শ প্রস্তাবে জাতীয় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ও সংবিধানের রূপরেখা অঙ্কিত হয়। কিছু রদবদলের পর এ প্রস্তাবগুলো ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নীতি নির্দেশক হিসেবে গৃহীত হয়। আদর্শ প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন, "গণপরিষদ কর্তৃক আদর্শ প্রস্তাব প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব শুধুমাত্র স্বাধীনতা অর্জনের সাথে তুলনীয় হতে পারে।"

এর বৈশিষ্ট্য (Its Features) ঃ আদর্শ প্রস্তাবের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য।

(এক) এ প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তানের জনগণের আস্থাভাজন গণপরিষদ সার্বভৌম স্বাধীন পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

(দুই) পাকিস্তানে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তার শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

(তিন) পাকিস্তানে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(চার) পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং ইসলাম নির্দেশিত সাম্য, স্বাধীনতা, সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রতিপালিত হবে।

(পাঁচ) এ রাষ্ট্রে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম আচরণ করবেন ও স্ব স্ব কৃষ্টি পালনের সকল সুবিধা লাভ করবেন।

(ছয়) পাকিস্তানের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং সকলের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

(সাত) সংবিধানে সংখ্যালঘু ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীগুলোর জীবন মান ও ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষার জন্য যথেষ্ট রক্ষাকবচ থাকবে।

(আট) সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে এবং বিচার বিভাগকে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত রাখা হবে।

(নয়) পাকিস্তান বিশ্বময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে ব্রতী থাকবে।

(দশ) এখানকার জনসাধারণ যাতে উন্নত জীবনের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণকালে গণপরিষদে এক তুমুল বিতর্কের সূচনা হয়। হিন্দু প্রতিনিধিদের মতে, পাকিস্তানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা তথা রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থের পরিপন্থী। এ প্রসংগে বি. কে. দাস ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত জোরেসোরে প্রতিবাদ করেন। তাছাড়া, আজাদ পাকিস্তান দলের নেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন পাকিস্তানে

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান অবশ্য উত্তরে বলেন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটি উত্তম ব্যবস্থা। এর ফলে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে। শেষ পর্যন্ত আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা অঙ্কিত হয়।

প্রস্তাবসমূহ শুরু হয়েছিল 'পরম করুণাময় আল্লাহর' নামে ('In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful')। জাতীয় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক। মৌলিক অধিকারসমূহ হবে অলঙ্ঘনীয়। ন্যায়নীতি হবে রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক মুসলমানগণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সর্বপ্রকার সুযোগ পাবে। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে এ নীতি নির্ধারক প্রস্তাবসমূহ কিছু সংশোধনের পর গৃহীত হয়।

মৌলিক নীতি সংস্থার রিপোর্ট
Report of the Basic Principles Committee

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গণপরিষদ **"মৌলিক নীতি সংস্থা"** (Basic principles Committee) গঠন করে। এর সদস্যা সংখ্যা ২৫। আরও কয়েকজন সদস্যকে (১০-এর অনূর্ধ্ব) মনোনীত করা যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ তমিজুদ্দীন খান। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ছিলেন এর সহ-সভাপতি। **মৌলিক নীতি সংস্থার** তিনটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়;—**প্রথম, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সম্বন্ধীয় সাব-কমিটি; দ্বিতীয়, নির্বাচন সম্বন্ধীয় সাব-কমিটি এবং তৃতীয়, বিচার বিভাগীয় সাব-কমিটি।**

১৯৫০ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সম্বন্ধীয় সাব-কমিটি তার আলোচনা সমাপ্ত করে এবং ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করে। এটি অনেকটা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুরূপ ছিল। পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা এতে ছিল। উচ্চ পরিষদে সমান সংখ্যক সদস্য রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে মনোনীত করা হয়েছিল।

পূর্ব-পাকিস্তানে এ অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার কোন স্বীকৃতি ছিল না। তাছাড়া, সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বপাকিস্তানের জন্য আইন পরিষদে যে সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিল, তাতে সংখ্যালঘু হবার আশংকাও দেখা গিয়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়।

লিয়াকত আলী খান এতে বিব্রত বোধ করেন এবং জনসাধারণের যে কোন সুপারিশ বিবেচনা করা হবে—এ মর্মে তিনি এক বিবৃতি দেন।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হস্তে নিহত হন। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৫০ ও ১৯৫২ সালের মধ্যে **'মৌলিক নীতি সংস্থা'** মাত্র একটি বৈঠকে মিলিত হন। ইতিমধ্যে বিচার বিভাগ সম্বন্ধীয় সাব কমিটি ও নির্বাচন সম্বন্ধীয় সাব কমিটিও তাদের রিপোর্ট পেশ করে। বিভিন্ন রিপোর্ট সম্পাদনার পর ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর গণপরিষদ এর আলোচনায় নিয়োজিত হয়।

পূর্ববর্তী খসড়া অপেক্ষা বর্তমান খসড়ার কম সমালোচনা হয়। এর মূলকথা ছিল ঃ (ক) পাকিস্তানের উভয় অংশকে খুশী করার জন্য এ খসড়ায় **'সমতার নীতি'** (principle of parity) গৃহীত হয়। (খ) এই খসড়ায় দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পরিকল্পনা করা হয়। উচ্চ পরিষদে ও নিম্ন পরিষদে যথাক্রমে ১২০ এবং ৪০০ জন সদস্যের প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬০ জন সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সমাধান করা হয়নি। তাই একদিকে পশ্চিম পাঞ্জাবে ও অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সমালোচনার ঝড় উঠল এবং কোন মহলই তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করল না।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ।

মোহাম্মদ আলী ফর্মূলা
Mohammad Ali Formula

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে মোহাম্মদ আলী ফর্মূলার গুরুত্ব অত্যধিক। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে অপসারিত করেন এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তখন মোহাম্মদ আলী আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দেশে ফিরে এসে সংবিধান রচনায় মনোযোগ দেন এবং বহু প্রচেষ্টার পর তিনি এক সিদ্ধান্তে পৌছেন। তাঁর পরিকল্পনা "মোহাম্মদ আলী ফর্মূলা" ("Mohammad Ali Formula") নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, আইন পরিষদের নিম্ন কক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে না। তবে যুক্ত অধিবেশনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা হবে।

দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, যেমন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, আস্থাসূচক বা অনাস্থাসূচক ভোটদান বা অন্য কোন জটিল বিষয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে নির্ধারিত হবে, তবে উক্ত পরিষদসমূহের যে কোন প্রস্তাবে উভয় পরিষদের অন্যূন শতকরা ৩০ জন সদস্যের সম্মতি থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, পরিষদের উচ্চ কক্ষের সদস্যসংখ্যা থাকবে ৫০ জন ও নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যা থাকবে ৩০০ জন।

এর গুরুত্ব
Its Importance

মোহাম্মদ আলী ফর্মূলার গুরুত্ব কোনক্রমে গৌণ নয়। এ ফর্মূলায় ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, পাকিস্তানের উভয় অংশকে সমস্বার্থের স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ না করলে দেশের শাসনব্যবস্থা সুন্দরভাবে কার্যকর হবে না। তাই এ ফর্মূলায় সমতার নীতির (Principle of parity) উপর অধিক জোর দেয়া হয়। তাছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জন্য নিম্ন কক্ষে অধিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে উচ্চ কক্ষে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য সংখ্যালঘুর স্থান নির্ধারণ করা ছিল অত্যন্ত অবাস্তব। অবশ্য মোহাম্মদ আলী ফর্মূলা কার্যকরী হতে পারে নি। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে এর বাস্তবায়নকে নস্যাৎ করেন।

এর পরে মৌলিক নীতি সংস্থার রিপোর্ট আলোচিত হয় এবং ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলোও পর্যালোচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, কায়েদে আযমের জন্মদিনে, ১৯৫৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর, সংবিধান ঘোষণা করা যেতে পারবে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নিকট পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নবনির্বাচিত সদস্যবর্গ গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যগণকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ জানান এবং বলেন যে, তাদের দ্বারা গঠিত সংবিধান পূর্ব পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য হবে না। গণপরিষদও ইতিমধ্যে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল।

১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। গণপরিষদকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। এখানে প্রথম গণপরিষদের কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় গণপরিষদ
Second Constituent Assembly

গভর্নর জেনারেল কর্তৃক গণপরিষদ বাতিল ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। গণপরিষদের সাবেক সভাপতি মৌলভী তমিজুদ্দিন খান সিন্ধু আদালতে গভর্নর জেনারেলের ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেন। সিন্দু আদালতে গভর্নর জেনারেলের ঘোষণাকে অবৈধ বলে রায় দেন। কিন্তু পরে পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গভর্নর জেনারেলকে নতুন গণপরিষদ গঠনের পরামর্শ দেন।

১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠনের আদেশ জারি করা হয়। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৮০ জন। তন্মধ্যে ৪০ জন পূর্ব পাকিস্তান ও ৪০ জন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হন।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অবসর গ্রহণ করলে ইস্কান্দার মীর্জা অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং বহু অনিশ্চয়তার মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

১৯৫৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর **পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা** আইনটি গণপরিষদে প্রণীত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও উপজাতীয় এলাকা সহযোগে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠিত হয়।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং আইনমন্ত্রী আই. আই. চুন্দ্রিগড় তা গণপরিষদে পেশ করেন। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি এ খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। সুদীর্ঘ নয় বছর পর অবশেষে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচিত হলো। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ এ সংবিধান কার্যকর হয়।

পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। তিনি মুসলীম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট দলের সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের প্রধান ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন তাঁর প্রধান সমর্থক। সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১৯৫৬ সালের পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ২৩ মার্চ কার্যকর হয় এবং তা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত চালু থাকে। দীর্ঘ নয় বছর পর এ সংবিধান দ্বিতীয় গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হয়। কিন্তু মাত্র আড়াই বছর পরে এ সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন (Martial Law) জারি করা হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণিত হলো ঃ

প্রথম, ১৯৫৬ সালের এই সংবিধান ছিল পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম সংবিধান। ১০৫ পৃষ্ঠার এ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা (Preamble). ১৩টি অংশ (Part). ২৩৪টি বিধি (Articles) এবং ৬টি তালিকা (Schedule) ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ধারাসমূহ বর্ণনা করা ছাড়াও প্রদেশের শাসনব্যবস্থার বিবরণও এতে দেয়া ছিল। এই সংবিধানে তপসীলী সম্প্রদায়, অনুন্নত শ্রেণী, দেশীয় রাজ্য ও তাদের শাসনকর্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জরুরী অবস্থা এবং অন্যান্য সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যও সংবিধানে নানাবিধ পন্থার উল্লেখ করা হয়। তাই এ সংবিধান এত দীর্ঘ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়, এই সংবিধানের ইসলামিক বিধানসমূহ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে এ সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র (Islamic Republic of Pakistan) নামে ভূষিত করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা শুরু করা হয় পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। প্রস্তাবনায় বলা হয়, ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য, সাম্য, সহনশীলতা ও সামাজিক সুবিচার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র উপর, যেহেতু ইসলামিক বিধান মতে সমগ্র দুনিয়ার সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত।

তা ব্যতীত এ সংবিধানে আরও সন্নিবেশিত হয় যে, পাকিস্তানে প্রেসিডেণ্ট হিসেবে কেবল মুসলমানই নির্বাচিত হবার যোগ্য বিবেচিত হবেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন আইন পরিষদে ইসলামের নির্দেশ ও অনুজ্ঞা বিরোধী কোন আইন প্রণীত হবে না এবং প্রচলিত আইনসমূহকে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী নীতির সাথে সুসামঞ্জস্য করে তোলা হবে। ইসলামিক ন্যায়পরায়ণতার উপর রাষ্ট্রীয় আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে একটি **ইসলামিক গবেষণাগার এবং উপদেষ্টা পরিষদের** ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য ইসলামী নীতিভিত্তিক বিধানসমূহ অমুসলমান নাগরিকদের ধর্মে ও সংস্কৃতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। বরং এ সংবিধানে অমুসলমান সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করা হয়।

তৃতীয়, এ সংবিধানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জনগণই সংবিধানের উৎস। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত ১৯৫৬ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিম্নরূপ ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ "অতএব আমরা পাকিস্তানের জনগণ ১৯৫৬ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে আমাদের গণপরিষদে আমরা এ সংবিধান রচনা" করি।

এ সংবিধানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র উপর। পবিত্র আমানত হিসেবে জনগণ এ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। সংবিধানের প্রস্তাবনায় তাই বলা হয় যে, "রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের মাধ্যমে প্রযোজ্য হবে।" ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ, যথা—স্বাতন্ত্র্য, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হবে।

তা ব্যতীত, এ সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি সন্নিবেশিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক

ভোটের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচিত করতে পারত। এ সংবিধানে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনার সর্বপ্রকার ক্ষমতা জনগণের উপর ন্যস্ত করা হয়।

চতুর্থ, এটি একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানের খসড়া ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের গণপরিষদে পেশ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসের ২৯ তারিখে তা গৃহীত হয়। ২ মার্চ তারিখে প্রেসিডেণ্ট এতে সম্মতি দান করেন। পাকিস্তানের দূরবর্তী দুই অংশের মধ্যে অনৈক্য, দ্বন্দ্ব বা কোন জটিলতার সম্ভাবনা অবসানের জন্য প্রায় সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে পরবর্তীকালে অনেক অলিখিত বিষয়ও সংবিধানে স্থান পায়।

পঞ্চম, এ সংবিধান একটি প্রজাতন্ত্র ধরনের সংবিধান। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেণ্ট নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন নামমাত্র প্রধান (Nominal)। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হতেন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের সদস্যগণ কর্তৃক। তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত শাসনকার্য নির্বাহ করতেন। কেবল মুসলমানগণই এ পদে নির্বাচিত হতে পারতেন।

ষষ্ঠ, এ সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুরূপ এ সংবিধানে আইন পরিষদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রে প্রেসিডেণ্ট ও প্রদেশে গভর্নর ছিলেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন। আইন পরিষদে কোন অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হত। প্রেসিডেণ্ট কয়েকটি বিষয়ে তাঁর 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' (discretionary power) প্রয়োগ করতে পারতেন সত্যই, তবে প্রায় সকল বিষয়েই তাকে মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ মত চলতে হত।

সপ্তম, এ সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই এই সংবিধানে স্থান লাভ করেছিল, যথা—(ক) কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, (খ) সংবিধানের প্রাধান্য, (গ) বিচার বিভাগের প্রাধান্য, (ঘ) সর্বোচ্চ আদালতকে সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাদানকারী বলে স্বীকৃতি দান।

সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—কেন্দ্রীয় বিষয় (Federal), প্রাদেশিক বিষয় (Provincial) এবং যুগ্ম বিষয় (Concurrent)। সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হয় এবং এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রদেশদ্বয়ের হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান ও জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

অষ্টম, ১৯৫৬ সালের সংবিধান ছিল দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid)। সংবিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হত এবং এ পদ্ধতি ছিল সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু মূলত তা ছিল সুপরিবর্তনীয়। কেননা, কোন সংশোধনী বিল উত্থাপনের জন্য জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনই শুধু প্রয়োজন হত এবং তা গৃহীত হতে দরকার হত জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন। উন্নয়নকামী দেশের জন্য তা ছিল উত্তম।

নবম, এ সংবিধানে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বহু সমস্যার সমাধান কল্পে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের জন্য এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ (Unicameral Legislature) গঠনের ব্যবস্থা হয়, যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে উঠে।

দশম, এ সংবিধানে **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** এবং প্রাধান্যের স্বীকৃতি দান করা হয়। বিচার বিভাগই ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার উল্লেখযোগ্য রক্ষাকবচ। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য এবং তাকে শাসন ও আইন বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য বিচার বিভাগের এ স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হয়।

একাদশ, এ সংবিধানে সমতার নীতি (principle of parity) গৃহীত হয়। উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এ নীতি গৃহীত হয়। উভয় প্রদেশের মধ্যে যেন কোনরূপ অনৈক্য বা বৈষম্য দেখা না দেয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল।

দ্বাদশ, পাকিস্তানের দুটি আঞ্চলিক ভাষা—**উর্দু ও বাংলাকে**—এ সংবিধানে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করা হয়। তবে ইংরেজি ভাষাকে সাময়িকভাবে চালু রাখারও ব্যবস্থা করা হয়। ভাষা সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং জনমতকে শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ত্রয়োদশ, এ সংবিধানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। আইন প্রণয়ন, অর্থ সংক্রান্ত বিষয় ও শাসন কার্যে কেন্দ্র কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করত না। প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলেন। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় ঐক্য এবং জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্র সাময়িকভাবে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করতে পারত।

চতুর্দশ, অধিকাংশ আধুনিক শাসনতন্ত্রের ন্যায় ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়। নাগরিকদের যাতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত থাকে এবং যাতে শাসন কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে, তাই মৌলিক অধিকারের এই নিশ্চয়তা বিধান। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সাথে মৌলিক অধিকারের সুষ্ঠু সংগতি বিধান করা হয় এবং জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য তা সাময়িকভাবে বাতিল করার অধিকার সরকারের ছিল। বাক স্বাধীনতার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, সাম্যের অধিকার ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চদশ, ভারত ও আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কয়েকটি রাষ্ট্রীয় নির্দেশক নীতি (Directive Principles of State Policy) গৃহীত হয়। এগুলো কোন আদালতে কার্যকর হত না, তথাপি রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে তা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে কর্মে অনুপ্রাণিত করত। বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নীতি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষ, ইসলামী আদর্শ গৃহীত হলেও এ সংবিধানে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল প্রকার অধিকার, মর্যাদা, ধর্মীয় আচার -অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রভৃতি সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
Nature of Federal Government

১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সকল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, যথা—(১) সংবিধানের প্রাধান্য, (২) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, (৩) দ্বৈত সরকার, (৪) কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, (৫) দ্বৈত নাগরিকতা এবং (৬) বিচার বিভাগের প্রাধান্য। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

(১) সংবিধানের প্রাধান্য (Supermacy of the Constitution) সংবিধানই ছিল রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ সংবিধানের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হত। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক উভয় সরকারই সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং এর আওতার মধ্যে কার্যকর হত।

(২) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Written and Rigid Constitution) : ১৯৫৬ সালের সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলিল। এতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলি, ক্ষমতা, গঠনপ্রণালী স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন কোন অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তার কোন অবকাশ না থাকে। তাছাড়া এ সংবিধান সংশোধনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হত যাতে তা কোন রাজনৈতিক দলের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হতে না পারে।

(৩) দ্বৈত সরকার (Dual Government) : অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পাকিস্তানেও দু প্রকারের সরকার গঠিত হয়েছিল, যথা—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার। সংবিধানের দ্বারা উভয় প্রকার সরকারের আওতা ও সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল।

(৪) কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Powers) : ১৯৫৬ সালের সংবিধানের শাসন ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক এবং সংযুক্ত বিষয়। জাতীয় স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় স্থান লাভ করে, যথা, দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা। আঞ্চলিক বিষয়গুলো প্রাদেশিক তালিকায় স্থান পায়, যেমন—আইন শৃঙ্খলা, ভূমিরাজস্ব। এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় বিষয় সম্পর্কিত বিষয়গুলো সংযুক্ত তালিকায় (Concurrent List) স্থান পায়।

(৫) দ্বৈত নাগরিকতা (Double Citizenship): যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণকে দু প্রকারের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হত।

প্রথম, প্রত্যেক নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও আইন মানতে হত, এবং

দ্বিতীয়, তাকে প্রাদেশিক সরকারের শাসন ও আইন মান্য করে চলতে হত। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে এ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

(৬) বিচার বিভাগের প্রাধান্য (Supremacy of the Judiciary) : নতুন সংবিধানে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা দান ও তার অভিভাবকত্ব করার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কোন আইন পরিষদ কর্তৃক যদি সংবিধান বহির্ভূত কোন আইন প্রণীত হয় তা হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে সংবিধান বহির্ভূত (Ultra vires) বলে ঘোষণা করতে পারতেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলেও পাকিস্তানের কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। নিচে তার বিবরণ দেয়া হলো।

প্রথম, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য যে অঙ্গরাজ্যগুলো সম্মিলিত হয় তাদের ভৌগোলিক সংলগ্নতা থাকা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু পাকিস্তানে তা ছিল না। এক বৈদেশিক রাষ্ট্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন প্রায় এক হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশ সমবায়ে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ভৌগোলিক অসংলগ্নতা থাকা সত্ত্বেও যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হতে পারে, পাকিস্তান তারই এক দৃষ্টান্তস্বরূপ।

দ্বিতীয়, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রকে অধিকতর শক্তিশালী করে এক প্রকার এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তা অবশ্য জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি প্রাদেশিক গভর্নরদের নিয়োগ করতেন। প্রয়োজনবোধে ১৯৩ ধারা জারি করে কেন্দ্র প্রদেশের শাসনভারও স্বহস্তে তুলে নিতে পারতেন।

তৃতীয়, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সেই নজীর পরিহার করে কেন্দ্রে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করে।

চতুর্থ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পার্থক্য করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সমতার নীতি (principle of parity) প্রবর্তন করা হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসন ব্যবস্থা
Federal Government under the Constitution of 1956

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালিত হত প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক। তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত কার্য পরিচালনা করতেন। কেন্দ্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটেনের ন্যায় পাকিস্তানেও দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে শুধুমাত্র তফাত এই ছিল যে, ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হতেন।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট
President of Pakistan under 1956 Constitution

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেণ্ট। তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানের মত **শাসনতান্ত্রিক প্রধান** (Constitutional Head)। ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানকে যেমন প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতাবলম্বী হতে হয়, পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টকে তেমনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হতে হত। তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হতেন এবং অন্যূন ৪০ বছর বয়স্ক ব্যক্তি হতেন।

প্রেসিডেণ্ট পাকিস্তানের কোন মাহিনাযুক্ত লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন না। তবে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারত এবং তিনি তাঁর সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারতেন। তিনি জাতীয় পরিষদের বা কোন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদে বহাল থাকতে পারতেন না। যদি কোন পরিষদ সদস্য প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হতেন, তা হলে সে পদ শূন্য হয়ে যেত।

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন
Election to the President

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ন্যায় পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট এক নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। সে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হত জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও উভয় প্রদেশের আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দের দ্বারা। গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন হত। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর।

কোন ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হতে হলে তাঁর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হত—**প্রথম,** তাঁকে একজন মুসলমান হতে হত। **দ্বিতীয়,** তাঁর বয়স অন্যূন ৪০ বছর হতে হত। **তৃতীয়,** তাঁকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা সম্পণ্ন হতে হত। **চতুর্থ,** তিনি প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে পূর্বে কোনদিন অভিযুক্ত হয়ে অপসারিত হন নি এমন ব্যক্তি হতে হত, এবং **সর্বোপরি** তাঁকে পাকিস্তানের নাগরিক হতে হত।

প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল পাঁচ বছর, তবে কোন ব্যক্তি দুবার প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। অর্থাৎ সর্বমোট দশ বছরের জন্য তিনি এ পদে বহাল থাকতেন।

প্রেসিডেণ্টের অপসারণ
Impeachment of the President

১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদের স্পীকারের নিকট স্বহস্তে লিখিত লিপির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারতেন। তাছাড়া, সংবিধানের কোন বিধি লংঘনের জন্য অথবা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে প্রেসিডেণ্টকে অভিযুক্ত করা যেত। জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্পীকারের নিকট অভিযোগের প্রস্তাব উত্থাপনের দরখাস্ত করলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগ বিবেচনার জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হত। জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যের অন্যূন তিন-চতুর্থাংশের ভোটে সে প্রস্তাব গৃহীত হলে, প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ করতেন এবং যেদিন থেকে প্রস্তাব গৃহীত হত সেদিন তাঁকে পদত্যাগ করতে হত। অবশ্য তাঁকে ১৪ দিনের মধ্যে প্রস্তাবের নোটিশ দিতে হত, যাতে তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে পারতেন অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করে স্বপক্ষ সমর্থন করতে পারতেন। প্রেসিডেণ্টের মৃত্যু ঘটলে অথবা তিনি অপসারিত হলে অথবা তাঁর কার্যকাল শেষ হলে সংবিধানের ধারা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে প্রেসিডেণ্ট পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত।

প্রেসিডেণ্ট অসুস্থ হলে অথবা কোন কার্যোপলক্ষে বিদেশ যাত্রা করলে বা অনুপস্থিত থাকলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করতেন। সে সময় তিনি প্রেসিডেণ্টের অনুরূপ পারিতোষিকসহ যাবতীয় সুবিধা ভোগ করতে পারতেন। তবে জাতীয় পরিষদে স্পীকাররূপে কার্য পরিচালনা করতে পারতেন না।

প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the President

প্রেসিডেণ্ট ছিলেন বহুবিধ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত কতিপয় ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায় ঃ (ক) **শাসনমূলক,** (খ) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত,** (গ) **আর্থিক,** (ঘ) **বিচার বিভাগীয়,** (ঙ) **জরুরী** এবং (চ) **বিবিধ।**

(ক) শাসনমূলক কার্যাবলি (Executive) ঃ প্রেসিডেণ্টই ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকার্য তাঁর নামে সম্পাদিত হত। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ বণ্টন ও কার্যনির্বাহ সম্পর্কিত বিধি তিনি প্রণয়ন করতেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে বা অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে শাসনকার্য নির্বাহ করতেন।

সশস্ত্র বাহিনীগুলোর উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল সর্বাধিক। পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনী গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ, দেশরক্ষা বাহিনীর বিভাগীয় প্রধানের নিয়োগ, অফিসারের কমিশন দান, তাঁদের বেতন ও ভাতার হার নির্ধারণ প্রভৃতি ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

প্রেসিডেণ্ট তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে (In his discretion) জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিদের নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের বরখাস্ত করতেন। তিনি পাকিস্তানের এটর্নি জেনারেল, অডিটর জেনারেল, প্রাদেশিক গভর্নর, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, সীমানা নির্ধারণ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, সুপ্রীম কের্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি, প্রাদেশিক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ করতেন। তিনি পাকিস্তানের হাই কমিশনার, রাষ্ট্রদূত ও কন্‌সালগণকে নিয়োগ করতেন এবং পাকিস্তানে আগত রাষ্ট্রদূত বা হাই কমিশনারদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজধানীর (Federal Capital) শাসনভার প্রেসিডেণ্টের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি রাজধানীর সুশাসন পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করতেন।

কোন বিশেষ এলাকা (Special Area) তার নির্দেশক্রমে **বিশেষ এলাকা** বলে আর পরিগণিত হত না, আবার কোন বহির্ভূত এলাকার (Excluded Area) সীমানা পরিবর্তিত হতে পারত। অবশ্য প্রেসিডেণ্টের এরূপ নির্দেশ জারি করার পূর্বে তিনি তথাকার জনগণের ইচ্ছা যাচাই করে দেখতেন।

(খ) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Power) ঃ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন পাকিস্তানের পার্লামেণ্টের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রেসিডেণ্ট ও জাতীয় পরিষদ সহযোগে পাকিস্তানের পার্লামেণ্ট গঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদে বক্তৃতা দিতে অথবা বাণী প্রেরণ করতে পারতেন। তিনি জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করতে, মূলতবী রাখতে বা বাতিল করে দিতে পারতেন। তাঁর পূর্ব সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় পরিষদে কতিপয় বিল উত্থাপন করা যেত না।

তাঁর সম্মতি (assent) ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারত না। জাতীয় পরিষদে কোন বিল গৃহীত হলে তা প্রেসিডেণ্টের সম্পত্তির জন্য তার নিকট পেশ করা হত। প্রেসিডেণ্ট ৯০ দিনের মধ্যে সে বিলে সম্মতি দান করতেন অথবা সম্মতি দান স্থগিত রাখতে পারতেন অথবা অর্থ বিল ব্যতীত যে কোন বিল পুনর্বিবেচনার জন্য পুনরায় জাতীয় পরিষদে ফেরত পাঠাতে পারতেন।

প্রেসিডেণ্ট কোন বিলে সম্মতি দান স্থগিত রাখলে জাতীয় পরিষদ বিলটি পুনরায় বিবেচনা করতে পারতেন এবং বিলটি যদি জাতীয় পরিষদের উপস্থিত সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পুনরায় গৃহীত হয় তা হলে প্রেসিডেণ্ট তাতে সম্মতি দিতেন। কোন বিল প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদে ফেরত পাঠান হলে পরিষদ তা পুনরায় বিবেচনা করতে পারতেন এবং তা যদি মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়, তা হলে প্রেসিডেণ্ট সে বিলে সম্মতি দিতেন।

যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন থাকত না, তখন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রেসিডেণ্ট অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারতেন। অবশ্য সকল অধ্যাদেশ জাতীয় পরিষদে পেশ করতে হত পরবর্তী অধিবেশনে। যদি তা জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হত অথবা পরিষদের বৈঠক থেকে ছয় সপ্তাহ গত হলে তা বাতিল হয়ে যেত।

(গ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Power) ঃ প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ব্যতীত কোন অর্থবিল বা মঞ্জুরি দাবি (demand for grant) উত্থাপিত হতে পারত না। তিনি প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয় দেখিয়ে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (Annual Financial Statement) উত্থাপন করতেন। ব্যয় মঞ্জুরির ক্ষমতাও তাঁর ছিল। মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট না হলে তিনি একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবরণী বা বাজেট পেশ করাতেও পারতেন।

(ঘ) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Power) ঃ প্রেসিডেন্ট সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টসমূহের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ করতে পারতেন। তা ব্যতীত, রাষ্ট্রপ্রধানের চরমাধিকার (Prerogative) তিনি প্রয়োগ করতেন। এরূপে তিনি কোন অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে বা মৃত্যুদণ্ড মওকুফ বা দণ্ড স্থগিত রাখতে অথবা দণ্ড হ্রাস করতে পারতেন।

(ঙ) জরুরী ক্ষমতা (Emergency Power) ঃ জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রেসিডেন্টের হাতে কতকগুলো ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। যুদ্ধ, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন পাকিস্তানের বা তার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবনের উপর কোন সংকট দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এ অবস্থায় আইন প্রণয়ন ও শাসনমূলক সকল ক্ষমতা তাঁর হস্তে কেন্দ্রীভূত হত।

কোন প্রদেশের শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ১৯৩ ধারা জারি করে হাইকোর্ট ব্যতীত সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারতেন অথবা গভর্নরকে তাঁর পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতেন। অবশ্য এ ধরনের ঘোষণা ছয় মাসের অধিক কার্যকর হত না।

পাকিস্তান বা তার যে কোন অংশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হলে বা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্নরের সাথে আলোচনা করে ১৯৪ ধারা অনুযায়ী আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারতেন। এরূপ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আর্থিক বিষয়ে প্রদেশকে নির্দেশ দিতে পারতেন এবং প্রয়োজন হলে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করতে পারতেন। এরূপ ঘোষণাকেও জাতীয় পরিষদে পেশ করতে হত এবং তা ছয় মাসের অধিক বলবৎ থাকত না।

(চ) বিবিধ ক্ষমতা (Miscellaneous Power) ঃ জনহিতকর ও সামরিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রেসিডেন্ট কাউকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করতে পারতেন। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ন্যায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সকল উপাধি এবং সম্মানের উৎস। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত পাকিস্তানের কোন নাগরিক বিদেশী প্রদত্ত কোন উপাধি বা পদবী বা সম্মান গ্রহণ করতে পারতেন না।

পাকিস্তানের সার্বিক মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের কমিশন এবং বিভিন্ন সংস্থা গঠন করতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— (ক) জাতীয় অর্থ কমিশন ও আন্তঃপ্রাদেশিক কাউন্সিল, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সীমানা নির্ধারণ কমিশন, (ঘ) ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন, (ঙ) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ, (চ) ইসলামিক গবেষণা ও উপদেষ্টা সংস্থা।

প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা
Position of the President

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং আদর্শের প্রতীকস্বরূপ। সমগ্র জাতির মর্যাদা তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রকাশ পেত।

তিনি ছিলেন পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান (Constitutional Head)। কোন দলের বা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব তিনি করতেন না। তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary power) কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য সকল বিষয়ে তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমত কাজ করতেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের যাবতীয় কার্য ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করতেন।

অন্তবর্তীকালীন সময়ে যখন কোন মন্ত্রিপরিষদ থাকত না, তখন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সাময়িকভাবে তাঁর হস্তে কেন্দ্রীভূত হত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদের গঠনপ্রণালী
Formation of the Federal Cabinet

১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৩৭ ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে (in his discretion) জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতেন। প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের আস্থাভাজন হতে হত। সাধারণত তিনি হতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা অথবা সংযুক্ত কয়েকটি দলের স্বীকৃত নেতা।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শের পর প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য, প্রতিমন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রিদিগকে নিযুক্ত করতেন। মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্য যদি নিয়োগের সময় জাতীয় পরিষদের সদস্য না থাকতেন তা হলে ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে হত। নতুবা মন্ত্রিপরিষদের সদস্য পদ তাঁর বাতিল হয়ে যেত। প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিদিগকে জাতীয় পরিষদের সদস্য হতে হত।

মন্ত্রিদের শ্রেণীবিভাগ
Classification of Ministers

১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী তিন শ্রেণীর মন্ত্রী ছিলেন ঃ

প্রথম, কেবিনেট মন্ত্রীরা ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতেন, সরকারের নীতি প্রণয়ন করতেন এবং মন্ত্রিপরিষদের গোপনীয়তা রক্ষা করতেন।

দ্বিতীয়, প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার দিক থেকে কেবিনেট মন্ত্রিদের নিচে ছিলেন। বিশেষ প্রয়োজনে আমন্ত্রিত না হয়ে তাঁরা মন্ত্রিপরিষদের সভায় যোগদান করতেন না।

তৃতীয়, ডেপুটি মন্ত্রী পদমর্যাদায় আরও নিচে ছিলেন। কার্যত তাঁরা মন্ত্রিদের সহকারি।

মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলি
Functions of the Cabinet

মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্টকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সাহায্য করাই ছিল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কর্তব্য। প্রেসিডেন্ট তাঁর দায়িত্ব সম্পন্নকালে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমত কাজ করতে বাধ্য। তিনি কেবলমাত্র তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সময় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন না, কিন্তু তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং শাসনকার্য প্রেসিডেন্টের নামে পরিচালিত হলেও সকল সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলি প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

প্রথমত, মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। প্রেসিডেন্ট ছিলেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। সুতরাং শাসনকার্য সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন, উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগকালে পরামর্শ দান এবং স্থায়ী রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দকে পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে শাসনকার্য নির্বাহ করতেন।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেন তথা জাতির জন্য নীতি প্রণয়ন করতেন। যদিও মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে সমস্ত বিল উত্থাপিত হত না, তথাপি কার্যকর সকল আইনই মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে প্রণীত হত। মন্ত্রিপরিষদ বিলের খসড়া করতেন, প্রচার এবং ব্যাখ্যা করতেন এবং জাতীয় পরিষদে কার্যক্রম নির্ধারণ করে আইনে রূপান্তরিত করতেন।

তৃতীয়ত, অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট প্রণয়ন করতেন। প্রেসিডেন্টের অনুমোদনক্রমে সমস্ত অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা জাতীয় পরিষদে পেশ করা হত এবং তা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হত।

চতুর্থত, মন্ত্রিপরিষদ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেন, সহযোগিতা স্থাপন করতেন এবং রাষ্ট্রের দুই প্রধান বিভাগের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে সুন্দরতর ও দৃঢ়তর শাসন ব্যবস্থার এক সুষম পরিবেশ সৃষ্টি করতেন।

মোটের উপর, মন্ত্রিপরিষদ বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী সংগঠন, বাণিজ্য শিল্পের প্রসার থেকে শুরু করে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি সকল কার্যের দিকে দৃষ্টি দিতেন। শাসন ব্যবস্থার চাবিকাঠিই ছিল মন্ত্রিপরিষদ। রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল মন্ত্রিপরিষদে নিহিত। জাতীয় পরিষদের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রিপরিষদের চতুর্দিকে রাষ্ট্রের শাসনমূলক চক্র আবর্তিত হত।

মন্ত্রিপরিষদ ও প্রেসিডেন্ট
Cabinet and President

(এক) প্রেসিডেন্ট তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করতেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য, প্রতিমন্ত্রী এবং ডেপুটি মন্ত্রিদের নিযুক্ত করতেন। তাঁদের তিনি বরখাস্তও করতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী যদি জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের আস্থাভাজন থাকতেন তবে প্রেসিডেন্ট তাঁকে বরখাস্ত করতে পারতেন না।

(দুই) প্রেসিডেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন কিন্তু কার্যত মন্ত্রিপরিষদই শাসনকার্য নির্বাহ করতেন যদিও শাসনকার্য প্রেসিডেণ্টের নামে পরিচালিত হত।

(তিন) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। তিনি প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৪২ ধারা অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সকল বিষয় প্রেসিডেণ্টকে অবগত করানো এবং তাঁকে সর্বদা অবহিত রাখা প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য ছিল। তা ব্যতীত প্রেসিডেণ্ট কোন বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীকে তা জানাতে হত। প্রেসিডেণ্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন মন্ত্রির সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদে পেশ করতে হয়।

(চার) প্রেসিডেণ্ট মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কার্যাবলি ও দফতর বণ্টনের ব্যবস্থা করতেন। ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রেসিডেণ্ট কার্যত তিনটি অধিকার উপভোগ করতেন, যথা—**(ক) উপদেশ দানের অধিকার, (খ) সাহস দানের অধিকার,** এবং **(গ) মন্ত্রিপরিষদকে সতর্ক করার অধিকার।**

(পাঁচ) সর্বশেষে এও উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেণ্টের পদমর্যাদা এবং ভূমিকা অনেকাংশ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক মূলত তাঁদের স্ব স্ব যোগ্যতা ও ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেসিডেণ্টের ভূমিকা ম্লান হতে বাধ্য।

মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় পরিষদ
Cabinet and National Assembly

জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রেসিডেণ্ট তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করতেন। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিদের নিয়োগ করা হত। মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্য জাতীয় পরিষদের সদস্য না থাকলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে হত, নতুবা পরিষদে তাঁর পদটি শূন্য হয়ে যেত।

ব্রিটেনের ন্যায় পাকিস্তানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয় নি। বরং শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঝোতা ও সমন্বয়ের ভাব বিদ্যমান ছিল। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ছিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্য।

মন্ত্রিপরিষদ তার নীতি ও কার্যাবলির জন্য জাতীয় পরিষদের নিকট পূর্ণরূপে দায়ী থাকতেন। প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকতেন। জাতীয় পরিষদ মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে যেত। অর্থবিল বা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক আনীত যে কোন বিল জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত না হলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হত। মন্ত্রিপরিষদের কার্যকাল নির্ভর করত জাতীয় পরিষদের উপর।

আইনত প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিপরিষদ কার্য করতেন প্রেসিডেন্টের খেয়াল খুশিমত। কিন্তু আসলে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় পরিষদের আস্থাভাজন থাকলে প্রেসিডেন্ট তাঁকে পদচ্যুত করতে পারতেন না।

অন্যপক্ষে, মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, তার কার্য পরিচালনা করতেন এবং নীতি নির্ধারণ করতেন। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনে কার্যসূচীর আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেন মন্ত্রিপরিষদ। অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে অর্থবিল জাতীয় পরিষদে পেশ করা হত। সুতরাং আইনগতভাবে অবস্থা যাই হোক না কেন মন্ত্রিপরিষদই জাতীয় পরিষদের কার্যনিয়ন্ত্রণ করত।

মন্ত্রিপরিষদ ও অন্যান্য মন্ত্রী
Cabinet and Ministry

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে যেমন কেবিনেট ও মন্ত্রিবর্গের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্দিষ্ট করা হয়, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যেও তেমনি এক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য ও অন্যান্য প্রতিমন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রী সকলেই জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ পদচ্যুত হলে প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিদের পদত্যাগ করতে হত। যে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সকলকেই পদত্যাগ করতে হত। সকল প্রকারের মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের অধীন থাকতেন, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যে তফাত ছিল।

প্রথমত, সকল শ্রেণীর মন্ত্রী, যেমন—প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রী—মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ছিলেন না, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ অন্য সকলে মন্ত্রী নামে অভিহিত হতেন।

দ্বিতীয়, প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিগণ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ছিলেন না। মন্ত্রিপরিষদের সভায় তাঁরা যোগদান করতে পারতেন না। বিশেষ প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তাঁরা আমন্ত্রিত হলে মন্ত্রিপরিষদের সভায় তাঁরা যোগদান করতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকত না।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনের যেমন কেবিনেট সংখ্যা ২০ থেকে ২৪ জন, কিন্তু মন্ত্রিবর্গের সংখ্যা অন্যূন ৬০ জন, তেমনই পাকিস্তানের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু প্রতিমন্ত্রী বা ডেপুটি মন্ত্রিদের সংখ্যা ছিল অধিক। শাসন বিভাগের সিদ্ধান্তের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা সাধারণত কম থাকত।

চতুর্থত, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল অধিক, কিন্তু প্রতিমন্ত্রী বা ডেপুটি মন্ত্রিরা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সহায়তা করতেন মাত্র।

সর্বশেষে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল নির্দিষ্ট, কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা
Role of the Prime Minister under the Constitution of 1956

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। তিনি ছিলেন শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ।

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের মধ্যমণি। মন্ত্রিপরিষদ গঠনের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। প্রেসিডেন্ট তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে জাতীয় পরিষদে

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করতেন। তাঁর পরামর্শক্রমে মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যকে নিযুক্ত করা হত। প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিদিগকেও তাঁর পরামর্শক্রমে মনোনীত করা হত।

তিনি প্রেসিডেণ্টের খুশিমত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। কিন্তু তিনি জাতীয় পরিষদের আস্থাভাজন থাকলে প্রেসিডেণ্ট তাঁকে পদচ্যুত করতে পারতেন না। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের প্রভু ছিলেন না। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় তিনি ছিলেন তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে প্রধান (*Primus inter pares* or first among the equals)।

মন্ত্রিপরিষদের জন্ম–মৃত্যুর কেন্দ্রস্থলে ছিলেন তিনি। তিনি পদত্যাগ করলে অথবা পদচ্যুত হলে সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে যেত। তিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকলে মন্ত্রিপরিষদ টিকে থাকত।

প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের চূড়ান্ত নিয়ন্তা। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তিনি দফতর বণ্টন করে দিতেন এবং তাঁদের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতেন, তাঁদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করতেন এবং তাঁদের কর্মপন্থাকে নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করতেন। মন্ত্রিপরিষদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতেন এবং সুশাসন ও সুষ্ঠু কার্যপ্রণালীর জন্য সমষ্টিগতভাবে সকলকে উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। পরিষদ সদস্য ও অন্যান্য মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রিদের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি তা দূর করে সকলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হতেন এবং সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।

মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্য পরিষদ–সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতেন। নিজেদের মধ্যে যতই মতানৈক্য থাকুক না কেন জাতীয় পরিষদে ও জাতির সম্মুখে মন্ত্রিপরিষদ ছিল একটি 'ঐক্যবদ্ধ ও সংহত সংস্থা''।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট
Prime-Minister and President

প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ ও প্রেসিডেণ্টের সেতুস্বরূপ। প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে ঃ

প্রথম, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্টকে অবহিত করবেন।

দ্বিতীয়, প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় শাসন ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

তৃতীয়, প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করলে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করতে পারতেন। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। কার্যত শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করত প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা, দক্ষতা এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার উপর। জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেসিডেণ্টের প্রভাব ছিল সর্বদা গৌণ।

প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদ
Prime Minister and National Assembly

(এক) শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সেতু রচনা করতেন প্রধানমন্ত্রী। তাই বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী সংযোগকারী হাইফেন চিহ্নের ন্যায় এবং দৃঢ়ভাবে আবদ্ধকারীর ন্যায়' ('The Prime Minister is like the hyphen that joins the buckles')। মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবে যেমন একদিকে তিনি ছিলেন শাসন বিভাগের চূড়ান্ত নিয়ন্তা, তেমনি জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন আইন বিভাগের প্রধান।

(দুই) জাতীয় পরিষদে তাঁর কথা ছিল চূড়ান্ত। তিনি সরকারি নীতি প্রণয়ন করতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি জাতীয় পরিষদে বক্তৃতা দান করতেন। আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও তাঁর রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হত। মূলত তাঁরই নির্দেশে জাতীয় পরিষদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণীত হত।

(তিন) জাতীয় পরিষদের যৌথ দায়িত্ব তাঁরই মাধ্যমে সংরক্ষিত হত, কেননা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটত।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট
Parliament of Pakistan under the Constitution of 1956

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ সমন্বয়ে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছিল। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের নাম ছিল 'জাতীয় পরিষদ (National Assembly)। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তন করা হলেও আইন পরিষদ ছিল এককক্ষ বিশিষ্ট।

পাকিস্তানের দু প্রদেশের মধ্যে বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান, উভয় অংশের অসমান জনসংখ্যা, দুই প্রদেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সংবিধান রচয়িতাগণ এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করেন। তা ব্যতীত, এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের গঠনপ্রণালী সহজতর। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভাগাভাগি এতে থাকে না। তাই এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গৃহীত হয়।

জাতীয় পরিষদের গঠনপ্রণালী
Composition of the National Assembly

জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল তিন শত জন (৩০০) সদস্য সহযোগে। সদস্যদের মধ্যে একশত পঞ্চাশ জন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হতেন। তা ব্যতীত, সংবিধানের দিন থেকে দশ বছরের জন্য আরও দশটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজন পূর্ব পাকিস্তান ও পাঁচ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হতেন। পাকিস্তান পার্লামেন্ট দু প্রদেশের মধ্যে প্রতিনিধিদের সংখ্যা সমান রেখে সমগ্র আসন সংখ্যা বাড়াতে পারত।

জাতীয় পরিষদের সদস্য পদের যোগ্যতা
Qualifications of Members of the Assembly

জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীর নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ দরকার ছিল ঃ

প্রথম, তাঁকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক পাকিস্তানের নাগরিক হতে হত।

দ্বিতীয়, তাঁকে নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হবার যোগ্য হতে হত।

তৃতীয়, তিনি কোনক্রমেই সংবিধান বা পার্লামেণ্ট কর্তৃক সদস্য পদের অযোগ্য বলে ঘোষিত যদি না হতেন।

নিম্নলিখিত কারণে কোন ব্যক্তি জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হবার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

প্রথমত, যদি কারো কোনরূপ মানসিক বিকারত্ব দেখা দিত।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন আদালত কর্তৃক সদস্য পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

তৃতীয়ত, যদি কোন ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হতেন।

চতুর্থত, যদি পাকিস্তানের কোন লাভজনক চাকরিতে বহাল থাকতেন।

পঞ্চমত, যদি কেউ অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত হয়ে সুপ্রীম কোর্ট কিংবা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে পাকিস্তানে চাকরি থেকে বরখাস্ত হতেন।

সর্বশেষে, যদি কেউ স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করতেন অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন।

কেউ একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সদস্য পদে নির্বাচিত হতে পারতেন না। কেউ দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হলে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁকে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্তের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের স্পীকারকে জানিয়ে দিতে হত তিনি কোন্ পদটি বহাল রাখতে ইচ্ছুক। কেউ একই সময়ে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকতে পারতেন না। যদি কেউ উভয় পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত হতেন তা হলে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁকে একটি আসন থেকে পদত্যাগ করতে হত। তা না হলে ৩০ দিন পর তাঁর প্রাদেশিক পরিষদের আসনটি শূন্য হয়ে যেত।

জাতীয় পরিষদের যে কোন সদস্য পরিষদের স্পীকারের নিকট দরখাস্তের মাধ্যমে সদস্য পদে ইস্তফা দিতে পারতেন। যদি কেউ নির্বাচনের পর ছয় মাসের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করতেন তা হলেও তাঁর আসনটি শূন্য হয়ে যেত অথবা কেউ যদি একাদিক্রমে ৬০টি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকতেন তা হলেও তাঁর আসনটি শূন্য হয়ে যেত।

জাতীয় পরিষদের কার্য পদ্ধতি
Procedure of the National Assembly

জাতীয় পরিষদের কার্যকাল ছিল পাঁচ বছর। যদি পূর্বাহ্নে প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক ভেঙ্গে দেয়া না হত তা হলে পাঁচ বছর পর তা ভেঙ্গে যেত। প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করতে, সভা স্থগিত রাখতে অথবা ভেঙ্গে দিতে পারতেন। বছরে অন্তত দুবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসত। এর মধ্যে ৬ মাস উত্তীর্ণ হতে পারত না। বছরে অন্তত জাতীয় পরিষদের একটি অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হত।

পরিষদের কার্যক্রম ও নিয়মাবলি জাতীয় পরিষদ নিজেই নির্ধারণ করতেন। পরিষদে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। পরিষদে ৪০ জন সদস্য নিয়ে কোরাম (quoram) গঠিত হত। নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হতেন।

জাতীয় পরিষদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কোন আদালতে গৃহীত হত না। পরিষদে বা অন্য কোন কমিটিতে কিছু বলার জন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোনরূপ মামলা রুজু করা যেত না। সদস্যের সুযোগ-সুবিধা পার্লামেন্টে আইন দ্বারা নির্ধারণ করতেন।

জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of National Assembly

জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে চারভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমন—(ক) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, (খ) অর্থ সংক্রান্ত, (গ) শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, এবং (ঘ) বিবিধ।

(ক) আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Legislative Power and Functions) ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় বর্ণিত যে কোন বিষয়ের উপর পাকিস্তান অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের ছিল। যুক্ত তালিকায় বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর জাতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করতে পারত। প্রাদেশিক পরিষদের অনুরোধক্রমে জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহের উপরও আইন প্রণয়ন করতে পারত। পাকিস্তান ও অন্য কোন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি বা সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধেও আইন প্রণয়ন করতে পারত। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্নরের সাথে পরামর্শ করার পর জাতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজধানী এলাকার সকল বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতেন জাতীয় পরিষদ। তা ব্যতীত জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন ও প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইনের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে প্রাদেশিক পরিষদের আইনটি কার্যকর করা হত না। তবে প্রাদেশিক পরিষদের আইনটি যদি প্রেসিডেন্টের সম্মতি লাভ করে থাকে তা হলে তা সেই প্রদেশে প্রচলিত থাকতে পারত। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদ সে আইনকে সংশোধন করে নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারতেন।

(খ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Financial Power and Functions) ঃ জাতীয় পরিষদ ছিল জাতীয় অর্থ তহবিলের রক্ষক ও নিয়ন্ত্রণকারী। পার্লামেন্টের মাধ্যমেই কর ধার্য হত এবং ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রেও তার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে জাতীয় আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব বা বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করা বাধ্যতামূলক ছিল। প্রত্যেক অর্থবিল জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হত।

বাজেটের অভোটযোগ্য (not-votable) তালিকাসহ জাতীয় পরিষদে আলোচনা করা চলত, কিন্তু তার উপরে কোন ভোট গ্রহণ করা চলত না। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রেসিডেন্টের বেতন ও ভাতা, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকবৃন্দ, স্পীকার ও ডেপুটি স্বীকারের বেতন ও ভাতাদি, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, হিসাবাধ্যক্ষ, নির্বাচন কমিশনার, এটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, সুদসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সকল ঋণ লাভের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল ইত্যাদি।

প্রতিটি ভোটযোগ্য ব্যয়ের তালিকা মঞ্জুরি দাবি (demand for grant) হিসেবে জাতীয় পরিষদে পেশ করতে হত এবং জাতীয় পরিষদ এর পরিমাণ হ্রাস করতে অথবা দাবিগুলো প্রত্যাখ্যান করতে পারত। মোটের উপর বলা চলে, ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং জাতীয় অর্থের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

(গ) শাসন বিভাগের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (Control over Executive) : জাতীয় পরিষদ শাসন বিভাগকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, কেননা ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ তার নীতি ও কার্যাবলির জন্য জাতীয় পরিষদের নিকট সম্পূর্ণ দায়ী থাকতেন। জাতীয় পরিষদ মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে পদচ্যুত করতে পারতেন। জাতীয় পরিষদের আস্থাভাজন থেকে মন্ত্রিপরিষদ স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। তা ব্যতীত মূলতবী প্রস্তাবের মাধ্যমে, নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে অথবা নানারূপ প্রশ্ন করে, বাজেটের উপর বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। তাছাড়া, জাতীয় অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করেও জাতীয় পরিষদ সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত, কেননা যে কোন সরকারি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ ব্যয় বরাদ্দের জন্য জাতীয় পরিষদের উপর নির্ভর করত।

বিবিধ
Miscellaneous

(ক) পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন। (খ) সংবিধানের ধারা লংঘন বা মারাত্মক অসদাচরণের জন্য প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অপসারিত (impeached) হতে পারতেন। (গ) জাতীয় পরিষদ সংবিধানের সংশোধন করতে পারতেন। (ঘ) প্রেসিডেণ্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে জাতীয় পরিষদ তার 'বাতিলকরণ ক্ষমতা' (power of revocation) প্রয়োগ করে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটাতে পারতেন।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
Provincial Autonomy under the Constitution of 1956

১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, কেননা পাকিস্তানের এ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ শাসন, আইন ও আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রাদেশিক সরকারের মুক্তি। প্রাদেশিক বিষয়সমূহে কেন্দ্রের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না এবং প্রাদেশিক সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুধু প্রাদেশিক সরকারের মুক্তি বুঝায় না, প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠাও বুঝায়। এ দেশে সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। সংবিধানের ৫ম তালিকায় ১০৬নং ধারায় রাষ্ট্রের শাসনমূলক বিষয়গুলোকে তিনটি তালিকায় বিভক্ত করা হয় ঃ যথা—(ক) **যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা,** (খ) **প্রাদেশিক তালিকা,** এবং (গ) **সংযুক্ত তালিকা**। জাতির সামগ্রিক স্বার্থ জড়িত বিষয়সমূহ, যেমন—বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা, যাতায়াত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত হয়।

আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, যেমন—জনশৃঙ্খলা, পুলিশ, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত হয়।

সংবিধানের মাধ্যমে এরূপ শাসন ক্ষমতার বিভাগকরণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হত। তাছাড়া, প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত শাসনকার্য নির্বাহ করতেন এবং মন্ত্রিপরিষদের মতামত ও সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করতে পারতেন না।

সর্বজনীন ভোটাধিকার পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।

তবে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং সুশাসন সংরক্ষণ করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের উপর সীমারেখা টানা হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমত, পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষা, সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রতি হুমকি প্রতিরোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের প্রতি নির্দেশ দান করতে পারতেন।

দ্বিতীয়ত, কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারত।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ১৯৩ ধারা মোতাবেক প্রদেশে শাসনতান্ত্রিক সংকট এড়াবার জন্য অথবা ১৯৪ ধারা মোতাবেক জাতীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করার জন্য অথবা যুদ্ধাশঙ্কা দেখা দিলে প্রেসিডেণ্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে শুধুমাত্র হাইকোর্টের ক্ষমতা ব্যতীত প্রাদেশিক সরকারের সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করতে অথবা প্রাদেশিক গভর্নরকে তাঁর পক্ষে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতে পারতেন।

চতুর্থত, প্রাদেশিক গভর্নরকে নিয়োগ করতেন প্রেসিডেণ্ট এবং গভর্নর প্রেসিডেণ্টের খুশিমত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। কিন্তু কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে; যেমন–আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, গভর্নর জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

পঞ্চমত, প্রাদেশিক পরিষদ সংযুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করলেও যদি সে আইন জাতীয় পরিষদের আইনের বিরোধী হত, তা হলে সে আইন বাতিল হয়ে যেত।

ষষ্ঠত, প্রাদেশিক গভর্নর প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন বিলকে প্রেসিডেণ্টের বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারতেন। প্রেসিডেণ্ট সে বিলকে নাকচ করেও দিতে পারতেন।

সপ্তমত, সংবিধান মোতাবেক গভর্নর তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতেন এবং ইচ্ছা করলে তাঁকে বরখাস্ত করতে পারতেন।

এভাবে প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রের একরূপ এজেণ্টে পরিণত করা হয় এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল।

তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বহুলাংশে নির্ভর করত কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রয়োগ পদ্ধতির উপর। জাতীয় স্বার্থের সাথে প্রদেশের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত করার জন্য প্রদেশের স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও তা যুক্তিযুক্ত ছিল।

বাস্তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে আমরা দেখেছি নানাভাবে বিপর্যস্ত হতে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থার অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার বহুভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং অনেক সময়ে এক হাস্যকর, হাল্কা, এক উপহাসের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক
Relation Between Centre and Provinces

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের আওতাধীনে আনয়ন করা হয়ে থাকে। ফলে ক্ষমতা বণ্টন নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের ক্ষমতাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলোকে অঙ্গ রাজ্যের হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছে। কানাডার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ—উভয়েরই ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের সকল ক্ষমতাকে তিন তালিকায় বিভক্ত করা হয় ঃ যথা—(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয়, (খ) প্রাদেশিক, এবং (গ) সংযুক্ত তালিকা। তাছাড়া, অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশের হস্তে অর্পিত হয়।

সংবিধানের ১০৬ ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রীয় তালিকায় বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর আইন প্রণয়নের একক ক্ষমতার অধিকারী ছিল জাতীয় পরিষদ। প্রাদেশিক পরিষদ ছিল প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর আইন প্রণয়নের অধিকারী। সংযুক্ত বিষয়সমূহের উপর জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ—উভয়ই আইন প্রণয়ন করতে পারত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা
Federal List

৩০টি বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত ছিল। বৈদেশিক সম্পর্ক, যুদ্ধ, শান্তি ও সন্ধি চুক্তি, কূটনৈতিক কার্যাবলি ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব, মুদ্রা, মুদ্রাঙ্কন ও বিহিত মুদ্রা, পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক, ব্যাংকিং, বীমা, নাগরিকতা, বিদেশ যাত্রা ও বিদেশ থেকে আগমন, আদমশুমারি, পোস্ট, টেলিগ্রাম ও টেলিভিশন, গ্রন্থস্বত্ব, সনদ, ডিজাইন আবিষ্কার, ট্রেডমার্ক ও বাণিজ্যিক প্রতীক, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য, শুল্ক, সীমান্ত এলাকার আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় সরকারি ঋণ, বৈদেশিক ঋণ, মাপ ও ওজনের মান নির্ণয়, নৌ ও জাহাজ চলাচল, শিল্প, জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক বিষয় ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও পেনসন, বিমান চলাচল, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাদেশিক তালিকা
Provincial List

প্রাদেশিক তালিকায় ৯৪টি বিষয় উল্লেখ করা হয়। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ জনশৃঙ্খলা, পুলিশ, জেল ও কারাগার, ন্যায়নীতি সংরক্ষণ, ভূমি রাজস্ব, সম্পত্তি দখল, কৃষি শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, রেখপথ, শিল্প, জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রি, আমোদ-প্রমোদ, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রাদেশিক ঋণ, বিদ্যুৎ, বন, বাজার ও মেলা, লাইব্রেরী ও যাদুঘর, পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, পানি

সেচ ব্যবস্থা ও বাঁধ সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন, যাকাত, মৎস্য, ভেজাল দ্রব্য, স্ট্যাম্প, কর, ওয়াকফ ও মসজিদ, এতিমখানা, প্রাদেশিক পেনসন, প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন, গ্যাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়, বাজী ও জুয়াখেলা, লটারি, আফিম চাষ ও বিক্রয়, গোরস্থান, খোয়াড় ও গবাদি পশুর অত্যাচার নিরোধ, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা, প্রাদেশিক মন্ত্রী ও এডভোকেট জেনারেলের বেতন ও ভাতা, ভূমি ও দালান কর, বিলাস দ্রব্যের উপর কর, প্রাণী ও নৌ-যানের উপর কর, প্রচার কর, ব্যক্তিগত কর, পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর।

সংযুক্ত তালিকা
Co-current List

এ তালিকায় ১৯টি বিষয় লিপিবদ্ধ হয়। নিচে এর বিবরণ দেয়া হলো ঃ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা, বিষ ও বিপদজনক মাদক দ্রব্য, সংবাদপত্র মুদ্রণ, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান, দ্রব্যমূল্য, রিলিফ ও পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, লৌহ, ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ দ্রব্য, সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, বিবাহ, তালাক, দলিলপত্র রেজিষ্ট্রি করা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসনমূলক সম্পর্ক
Administrative Relation between the Centre and Provinces

১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-এ দু ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্ত সুদৃঢ় করা হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান, সহযোগিতা স্থাপন এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার সমজাতীয় দায়িত্বের স্বর্ণবন্ধনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। শাসনমূলক ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল নিচে তা বর্ণনা করা হলোঃ

প্রথমত, প্রদেশের শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক প্রদেশকে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তব্য ছিল।

তৃতীয়ত, প্রদেশের শাসনব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন ছিল যাতে তা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও আইন-কানুনের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়।

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ও সামরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দিতে পারত।

পঞ্চমত, পাকিস্তান বা তার যে-কোন অংশে শান্তি, সংহতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দিতে পারত।

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের ভূমি দখল করতে পারত।

সপ্তমত, কেন্দ্রীয় সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার স্বীয় কার্য সম্পন্ন ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে দায়িত্ব দিতে পারত। এ সমস্ত কার্যাবলির জন্য প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের নিকট থেকে সমস্ত ব্যয়ভার আদায় করতেও পারত।

অষ্টমত, সুপ্রীম কোর্টের আওতাবহির্ভূত কোন বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশ অথবা দুই প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কোন বিবাদ বাধলে তা পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করা চলত এবং তিনি বিশেষ বিচারালয় গঠন করে তা মীমাংসা করতে পারতেন।

নবমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা স্থাপন, ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সংহতি দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট প্রাদেশিক গভর্নরদের সাথে আলোচনা করে একটি "আন্তঃ-প্রাদেশিক কাউন্সিল" (Inter-Provincial Council for Coordination) গঠন করতে পারতেন এবং প্রদেশের শাসনব্যবস্থাকে জাতীয় স্বার্থে দেশের সুশাসনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতেন।

দশমত, বেতার বার্তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আওতাধীন হলেও প্রদেশের মধ্যে বেতার বার্তা চালু করার উদ্দেশ্যে সরকার বেতার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারতেন।

একাদশতম, প্রদেশের গভর্নর প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তাঁর খুশিমত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। **সর্বশেষে** প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের যে 'নির্বাচকমণ্ডলী' (Elecctoral College) গঠিত হত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দও তার সদস্য ছিলেন।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রদেশের সম্পর্ক
Relation between the Centre and Provinces in Legislative Affairs

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর উপর আইন প্রণয়নের একক ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের এবং প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। সংযুক্ত বিষয়গুলোর উপর আইন প্রণয়ন করতে পারত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ উভয়ই। তবে সংযুক্ত বিষয়ে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাদেশিক পরিষদের আইন বাতিল বলে গণ্য হত। সাধারণভাবে জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক বিষয়গুলোর সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করত না, কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য এবং জরুরী অবস্থার মোকাবেলার জন্য প্রাদেশিক বিষয়গুলোর উপর জাতীয় পরিষদ কোন কোন সময় আইন প্রণয়ন করতে পারত। নিচে সে পরিস্থিতিগুলোর উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমত, প্রাদেশিক পরিষদের অনুরোধক্রমে প্রাদেশিক তালিকাভূক্ত বিষয়গুলোর উপর জাতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করতে পারত। তবে সে আইনকে প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করতে বা সংশোধন করতে পারত।

দ্বিতীয়ত, কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, সন্ধি বা কনভেনশনকে কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সমগ্র পাকিস্তান বা তার যে কোন অংশ বা প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারত। কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য জাতীয় পরিষদ যে কোন তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারত। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গভর্নরের সাথে আলোচনা করার পর আইন প্রণয়ন করা যেত।

তৃতীয়ত, প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন জাতীয় পরিষদের আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু বাতিল হয়ে যেত।

চতুর্থত, যুদ্ধাশঙ্কা দেখা দিলে অথবা বৈদেশিক আক্রমণের কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে অথবা পাকিস্তানের অর্থনীতি মারাত্মকরূপে পর্যুদস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ১৯১ ধারা মোতাবেক 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা জারি করতে পারতেন। এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হতেন।

পঞ্চমত, প্রদেশে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে সংবিধানের ১৯৩ ধারা মোতাবেক হাইকোর্টের ক্ষমতা ব্যতীত সকল ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারতেন অথবা গভর্নরকে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতেন। এ অবস্থায় জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।

অবশ্য এও উল্লেখযোগ্য যে, প্রাদেশিক পরিষদ সংযুক্ত বিষয়গুলোর উপর আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। তবে সংযুক্ত বিষয়ের উপর প্রণীত প্রাদেশিক পরিষদের আইন জাতীয় পরিষদের আইনের বিরোধী হলে জাতীয় পরিষদের আইনই কার্যকর হত। কিন্তু সংযুক্ত বিষয়ের উপর প্রাদেশিক পরিষদের কোন আইনে প্রেসিডেন্টের সম্মতি থাকলে তা প্রদেশে কার্যকর হতে পারত। কিন্তু সে আইনকে জাতীয় পরিষদ বাতিল করতে অথবা সংশোধন করতে পারত।

সর্বশেষে, উল্লেখযোগ্য যে, যে সকল বিষয় কোন তালিকায় উল্লিখিত হয় নি, সে সকল বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের অধিকার প্রাদেশিক পরিষদের ছিল।

পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ
Causes of Failure of the Parliamentary System in Pakistan

১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, কিন্তু ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাত্রিতে এ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এর সাফল্য নিশ্চিত করতে কোন্ কোন্ উপাদানের প্রয়োজন ছিল? এ সকল প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন মহলে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। কোন কোন সমালোচকের মতে পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করার সার্থক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নি। কারো কারো মতে, এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপ ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১১ সদস্য বিশিষ্ট যে **'সংবিধান সংস্থা'** ('Constitution Commission') নিয়োগ করেন বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে, সে সংস্থাও পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার নিখুঁত এক ছবি অঙ্কন করেন। সংবিধান সংস্থা এক প্রশ্নমালা রচনা করেন। জনগণের নিকট থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সংবিধান সংস্থা পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করেন। এ সংস্থার মতানুসারে চার ধরনের কারণ ছিল এর মূলে। **প্রথম,** সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মারাত্মক ত্রুটিসমূহ। **দ্বিতীয়,** মন্ত্রিপরিষদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর উপর

রাষ্ট্রপ্রধানের অহেতুক হস্তক্ষেপ এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্রিয়াকলাপে কেন্দ্রের অযথা হস্তক্ষেপ। **তৃতীয়,** যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, যার ফলে দেশে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল কোনদিন গড়ে উঠতে পারে নি। **চতুর্থ,** রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মারাত্মক চারিত্রিক দুর্বলতা ও শাসন ব্যবস্থায় তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

এ কারণগুলোকে অনেকে যথার্থ বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মতে, পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় নি, কেননা কোন সময়ে এ ব্যবস্থা পাকিস্তানে চালু ছিল না। কিন্তু তথাপি বলতে হবে—চালু থাকলেও কী এ ব্যবস্থা টিকত? সম্ভবত টিকত না। এর কারণ অনেক।

প্রথমত, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে হস্তক্ষেপ দেখা দিয়েছিল তা সংসদীয় ব্যবস্থায় সাফল্যের জন্য কোনক্রমেই উপযোগী ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রণ্ট দলের বিজয়ের ফলে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, কিন্তু মাত্র ৫৬ দিন পরেই বিভিন্ন অজুহাতে সে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ এক শুভ সূচনাকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, সংসদীয় ব্যবস্থায় সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান। পাকিস্তানে কিন্তু নির্বাচন সম্পর্কে বরাবরই এক অনীহা দেখা গিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় গণপরিষদ পরোক্ষ নির্বাচনের ফলস্বরূপ। ১৯৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর হলেও সে সংবিধান অনুযায়ী কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্বেই সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। দেশে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবার ফলে দেশে সুসংহত ও রাজনৈতিক কর্মসূচী ভিত্তিক কোন সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের জন্ম হয় নি। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পতন হলে পূর্ব বাংলায় যে কয়েকটি দলের জন্ম হয় সেগুলোকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অবস্থায় দেখতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত ছিলেন না। দেশে সুসংহত রাজনৈতিক দলের অভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়েছে।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক স্বার্থ তথা অঞ্চল ভিত্তিক রাজনীতিও দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা আনয়ন করেছে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দকে তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং তা পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

চতুর্থত, ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার মূলে আর একটি কারণ এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এবং তা পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনধিকার প্রভাব বিস্তার। এ সকল কর্মকর্তা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কর্মরত রইলেও তারা ছিলেন কেন্দ্রের এজেন্টস্বরূপ এবং প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। তাঁদের অশুভ প্রভাব সংসদীয় ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে।

পঞ্চমত, পাকিস্তানের সংসদীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠু ঐতিহ্য কোনদিন গড়ে ওঠেনি। তাই প্রথম থেকে এ দেশে একনায়কতন্ত্রের প্রবণতা দেখা গিয়েছে।
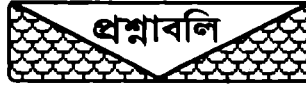
১। কীভাবে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়? এর কার্যাবলি কী কী? কীভাবে এই পরিষদ বাতিল হয়? (How was the Constituent Assembly of Pakistan founded? What were its functions? How was it dissolved?)

২। প্রথম গণপরিষদের ভূমিকা এবং তার কার্যাবলি আলোচনা কর। (Discuss the role and functions of the first Constituent Assembly.)

৩। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the salient features of the Constitution of Pakistan, 1956, 2001)

[N. U. 1997 ; R. U. '83 ; D. U. '84]

৪। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর এবং দেখাও তা কতটুকু ইসলামিক ছিল। (Discuss the main features of the 1956 constitution and show to what extent it was islamic in character.)

৫। ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the position and powers of the President of Pakistan under the 1956 constitution.)

৬। 'প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এক কেন্দ্রবিন্দু যার চতুর্দিকে শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হত"—১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা প্রসঙ্গে এই উক্তিটির ব্যাখ্যা দান কর। ("The Prime Minister is the pivot around which the whole administration revolve"—Explain the statement with reference to the role of the Prime Minister played under the 1956 constitution.)

৭। প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আলোচনা কর। (Discuss the relation between the President and the cabinet.)

৮। প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আলোচনা কর। (Discuss the relation between the President and the National Assembly.)

৯। জাতীয় পরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে কী সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল আলোচনা কর। (What relationship did exist between the National Assembly and the Cabinet? Discuss.)

১০। ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ও পরিষদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা আলোচনা কর। (Discuss the relation between the Prime Minister and the President and between the Prime Minister and the National Assembly under the 1956 Constitution.)

১১। ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদের গঠনপ্রণালী ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss composition and functions of the Cabinet under the Constitution of 1956.)

১২। ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তান মন্ত্রিপরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (Describe the features of Pakistan Cabinet under the Constitution of 1956.)

১৩। ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তান পার্লামেন্টের গঠন প্রণালী ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the composition and functions of Parliament of Pakistan under 1956 Constitution.) [D. U. '84]

১৪। নিম্নলিখিতগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর ঃ

(ক) প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, (খ) জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা। (Write short notes on the following ঃ (a) Election of the President, (b) Privileges of the members of the National Assembly.)

১৫। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা কর। (Analyse the federal characteristics of the 1956 Constitution.)

১৬। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে? ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কী পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছিল? (What is provincial autonomy? How far was it introduced in the Constitution of Pakistan, 1956? [N. U. 1999, 2001]

১৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তার আলোচনা লিপিবদ্ধ কর। (Discuss the relations between the federal and provincial government under the Constitution of 1956.)

১৮। শাসনমূলক ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তার বর্ণনা দাও। (Describe the relations between the center and provinces in the administrative field.)

১৯। কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারত? (Under what circumstances the National Assembly could legislate on subjects included in the provincial list?)

২০। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার বিবরণ দাও। (Describe the relations that existed between the center and the provinces under the Constitution of 1956.)

২১। ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণগুলো বর্ণনা কর। (Describe the reasons that were responsible for failure of the parliamentary system as introduced in the Constitution of 1956.)

২২। মোহাম্মদ আলী ফরমূলা কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। (What was Mohammad Ali Formula? Discuss its main features.)

২৩। সংবিধান প্রণেতাগণ ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়নে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার বিবরণ দাও। (Describe the problems that were encountered by the members of the Constituent Assembly while framing the 1956 constitution in Pakistan.)

২৪। কী কী কারণে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয় তা আলোচনা কর। (Discuss the reasons that led to the dissolution of the first Constituent Assembly in Pakistan.)

২৫। পাকিস্তানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ব্যর্থতার কারণগুলো বর্ণনা কর। (Describe the causes for the failure of the parliamentary democracy in Pakistan.)

২৬। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার স্বরূপ ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। (Evaluate the nature and working of the parliamentary system introduced under the 1956 Constitution in Pakistan.) [D. U. 1984, 2004]

২৭। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণগুলো বর্ণনা কর। (Narrate the causes of the failure of parliamentary system introduced in the Constitution of 1956.) [N. U. 1996]
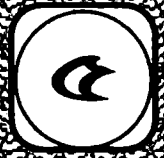
সূচনা
Introduction

সুদীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু মাত্র দুই বছর পরেই তার সমাধি রচিত হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ৭ অক্টোবর রাত্রি থেকে পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসন চালু করা হয়। প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণায় ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানকে বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলোকে বরখাস্ত করেন, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙ্গে দেন এবং সকল রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী যে শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার চিহ্ন মাত্র রইলো না।

১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর তারিখে প্রধান সামিরক আইন প্রশাসক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান বেতারের মাধ্যমে জাতির নিকট প্রতিশ্রুতি দেন যে, গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দান করেন। জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন।

১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' (Basic Damocracies Order) জারি করেন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কাউন্সিল পর্যন্ত পাঁচ স্তরবিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্র সংগঠন করেন।

মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন সমাপ্ত হলে উভয় প্রদেশের ইউনিয়ন কাউন্সিল, ইউনিয়ন কমিটি এবং টাউন কমিটি থেকে নির্বাচিত আশি হাজার (৮০,০০০) মৌলিক গণতন্ত্রী ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী জাতির পক্ষে প্রেসিডেন্টের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন। এ আস্থাসূচক ভোটে (vote of confidence) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শতকরা ৯৫·৬২ ভোট লাভ করেন। পাকিস্তানের জন্য সংবিধান রচনার নির্দেশ এভাবে তিনি লাভ করেন।

সংবিধান সংস্থা
The Constitution Commission

১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খান ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট এক সংবিধান সংস্থা নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচাপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ছিলেন এই সংস্থার চেয়ারম্যান। সংবিধান সংস্থা এক প্রশ্নমালা রচনা করেন। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার 'উত্তর' পর্যালোচনা করে এবং পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের প্রায় সাড়ে পাঁচশত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ও তাদের মতামত গ্রহণ করে ১৯৬১ সালের ৬ মে সংবিধান সংস্থা প্রেসিডেণ্টের নিকট বিবরণী পেশ করেন।

সংবিধান সংস্থার বিবরণী মন্ত্রিপরিষদের বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয় এবং সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক আলোচিত হয়। গভর্নরের বৈঠকেও তা পরীক্ষা করে দেখা হয়। ১৯৬০ সালের ৩১ অক্টোবর গভর্নরের বৈঠকে একটি খসড়া কমিটি (Drafting Committee) গঠিত হয়। সংবিধানের খসড়া রচনায় প্রায় চার মাস সময় লাগে। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন।

সংবিধান সংস্থার বিবরণী
Report of the Constitution Commission

সংবিধান সংস্থা প্রায় দেড় বছর কাল শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে এবং দেশের সকল শ্রেণীর জনপ্রতিনিধির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে অবশেষে ১৯৬১ সালের মে মাসে প্রেসিডেণ্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। এ রিপোর্টের প্রথম পর্বে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ব্যর্থতার কারণগুলো বর্ণনা করা হয়। উপসংহারে পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো পেশ করেন।

পাকিস্তানের মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ প্রসঙ্গে সংবিধান সংস্থা প্রকাশ করেন যে, যদিও ১৯৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর হয় নি, তথাপি পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই পাকিস্তানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয় এবং কোনকালেই তা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয় নি। নিচে বর্ণিত কারণগুলো এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল ঃ

প্রথম, সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব ও বাতিলকৃত সংবিধানের গুরুতর ত্রুটি।

দ্বিতীয়, মন্ত্রিপরিষদ ও রাজনৈতিক দলের উপর রাষ্ট্রপ্রধানের অহেতুক হস্তক্ষেপ এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্রিয়াকলাপে কেন্দ্রের অযথা হস্তক্ষেপ।

তৃতীয়, যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, যার ফলে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল কোন দিন গঠিত হতে পারে নি।

চতুর্থ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মারাত্মক চারিত্রিক দুর্বলতা ও শাসন ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

নতুন সংবিধান সংস্থা নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো লিপিবদ্ধ করে ঃ

(এক) সরকারের স্থিতিশীলতা এবং দৃঢ়তার জন্য রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রবর্তন করা উচিত।

(দুই) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ, ৪৮-সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পরিষদ বা সিনেট এবং জনপ্রতিনিধি সংবলিত লোকসভা।

(তিন) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তন।

(চার) পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাব, নিরক্ষরতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার' (Restricted Franchise) প্রবর্তন।

(পাঁচ) প্রেসিডেণ্ট এবং আইন পরিষদ সমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমন্বয়ে নির্বাচনী সংস্থা (Electoral College) গঠন।

(ছয়) গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি।

(সাত) ইসলামী আদর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(আট) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ।

(নয়) মৌলিক অধিকার প্রবর্তন ও সংরক্ষণ।

১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে জনপ্রতিনিধিবৃন্দের প্রদত্ত আস্থা ও কর্তৃত্বের বলে এরূপে ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রেসিডেণ্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন।

১৯৬২ সালের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য
Salient Features of the Constitution of Pakistan, 1962

১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথম, এটি ছিল এক লিখিত দলিল (A Written Constitution)। শাসন ব্যবস্থার সকল ধারা এ দলিলে লিপিবদ্ধ ছিল। এ সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর দলিল। ১২টি অংশে, ৩টি তালিকায় এবং ২৫০টি ধাবায় তা সম্পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়, এ সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি প্রজাতন্ত্র (Republic) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের নামকরণ করা হয় 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের সংবিধান'। রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) কর্তৃক প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হতেন।

তৃতীয়, এই সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা ছিল। প্রস্তাবনার (Preamble) মাধ্যমে সংবিধানের সূচনা। পাকিস্তানের আদর্শ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রস্তাবনার মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছিল। প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত এবং জনসাধারণের উপর ন্যস্ত শাসন ক্ষমতা এক পবিত্র আমানতস্বরূপ।

চতুর্থ, পাকিস্তানের এই সংবিধানে প্রথম কোন মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয় নি। এর পরিবর্তে সংবিধানে ১৬টি আইন প্রণয়নের মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। এগুলোকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।

পরে অবশ্য ১৯৬৪ সালের ১৫ জানুয়ারি এ সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ অধিকারগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব আদালতের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।

পঞ্চম, ১৯৫৬ সালের সংবিধানের নির্দেশক নীতির ন্যায় ১৯৬২ সালের সংবিধানে **২১টি নীতি নির্ধারক মূলনীতি** সন্নিবেশিত ছিল। রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে এ নীতিগুলো অনুসৃত হত, তবে তাদের কোন আইনগত বৈধতা স্বীকৃত হয় নি। ইসলামী জীবন ধারা, জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি, সংখ্যালঘুদের প্রতি

ন্যায়সঙ্গত আচরণ, জনকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা, মুসলিম বিশ্বের সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন এ নীতিগুলোর লক্ষ্য।

ষষ্ঠ, ১৯৬২ সালের **এই সংবিধানে ইসলামী নীতির উপর রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।** ইসলামী ব্যবস্থাসমূহ এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সংবিধানে একটি ইসলামী আদর্শ সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিষদ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পাকিস্তানের মুসলিম জনগণকে ইসলামী শিক্ষা ও নীতিকে জীবনে রূপায়িত করতে সাহায্য করত এবং উৎসাহ দান করত। ইসলামীনীতি বিরোধী কোন আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত হত না। ইসলামী জীবনাদর্শ ও নীতি সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহ দানের জন্য এ সংবিধানে একটি **ইসলামী গবেষণা সংস্থা** গঠনের ব্যবস্থা ছিল।

সপ্তম, এই সংবিধানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল **রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার** (Presidential Form of Government)। প্রেসিডেণ্ট মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা গঠিত 'নির্বাচকমণ্ডলী' (Electoral College) কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। তিনি কোন আইন পরিষদের সদস্য থাকতেন না অথবা কোন পরিষদের নিকট দায়ী থাকতেন না। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন প্রকৃত শাসক। তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাঁরই নিকট দায়ী ছিল। তিনিই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতেন। অপসারণ (Impeachment) ব্যতীত তিনি অন্য কোনভাবে পদচ্যুত হতেন না।

অষ্টম, এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এ দু প্রদেশের সমন্বয়ে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়—এ দু প্রকার সরকার গঠিত হয়। এই সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন সম্পন্ন হয়। সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হলেও তা সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হত।

নবম, এই সংবিধানে **শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়।** সংবিধানের তৃতীয় তালিকায় আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত ৪৯টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি কেন্দ্রীয় তালিকারূপে পরিগণিত। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত নয় এমন সকল বিষয় বা অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary power) প্রদেশের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

দশম, ১৯৬২ সালের সংবিধানে **গণভোট পদ্ধতির** প্রবর্তন করা হয়। এটিও সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেণ্ট ও জাতীয় পরিষদের মধ্যে কোন সময়ে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে বিষয়টিকে গণভোটে পেশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তার ফলাফল উভয়ে মানতে বাধ্য থাকতেন।

একাদশ, এই সংবিধানে **অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা** প্রবর্তিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করে। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী দ্বারা গঠিত 'নির্বাচক-মণ্ডলী' কর্তৃক প্রেসিডেণ্ট, জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতেন। আইন প্রণয়নের মূলনীতিগুলোর মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পরে অবশ্য প্রথম সংশোধনীতে মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। তা ব্যতীত, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষারও যথার্থ ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বাদশ, ১৯৬২ সালের সংবিধানটি সুপরিবর্তনীয়। সংবিধান সংশোধনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। কোন সংশোধনী প্রস্তাব যদি জাতীয় পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক গৃহীত হত, তা হলে তা প্রেসিডেণ্টের সম্মতি লাভ করে সংশোধিত হত। প্রেসিডেণ্ট অবশ্য উক্ত প্রস্তাবে ভেটো দিতে

পারতেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট গণভোটে তা প্রেরণ না করলে অথবা জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নিজে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে জাতীয় পরিষদের তিন-চতুর্থাংশের ভোটে প্রেসিডেন্টের ভেটো অগ্রাহ্য হয়ে যেত।

ত্রয়োদশ, এই সংবিধানে **বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন করার ব্যবস্থা করা হয়।** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষারও যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

চতুর্দশ, কেন্দ্র ও প্রদেশে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ এই সংবিধানেও বজায় ছিল।

পঞ্চদশ, এই সংবিধানে ঘোষণা করা হয় যে, **ঢাকা রাজধানী এলাকা হবে জাতীয় পরিষদের প্রধান কেন্দ্র এবং ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কেন্দ্র।**

ষোড়শ, বাংলা ও উর্দুকে এই সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা হয়।

সর্বশেষে, এই সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশের মধ্যে **'সমতা নীতি'** (Principle of Parity) চালু থাকবে।

১৯৫৬ সালের মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের আইন প্রণয়নের মূলনীতি সম্বন্ধে এও বলা প্রয়োজন যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল আইনের এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু নতুন সংবিধানে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি আইন পরিষদের সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছার উপর ছিল নির্ভরশীল। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ব্যতিক্রম ঘটলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। কিন্তু নতুন সংবিধানে এ ক্ষেত্রে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলত না।

১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি
Nature of the Federal System in Pakistan under the Constitution of 1962

১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং এ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান—এ দু প্রদেশের সমন্বয়ে। এ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কি একটি আদর্শ ব্যবস্থা ছিল? এর স্বরূপ কি? যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে সকল উপাদান থাকা আবশ্যক ১৯৬২ সালের সংবিধানে তা ছিল কী?

একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলো অপরিহার্য ঃ

(ক) কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সুষম ক্ষমতা বণ্টন, (খ) সংবিধানের প্রাধান্য, (গ) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, (ঘ) ভৌগোলিক সংলগ্নতা, (ঙ) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ, (চ) বিচার বিভাগের প্রাধান্য ও (ছ) দ্বৈত নাগরিকতার ধারণা। ১৯৬২ সালের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কিছু কিছু উপাদান বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু সুষ্ঠু ও কার্যকর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্ট হয় নি। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা বণ্টন ক্ষেত্রে সুষমনীতি অনুসৃত হয় নি। কেন্দ্রের হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করা হয়। এ ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নি। বরং সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। সংবিধানিক আইনকে কার্যকর করার তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬২ সালের সংবিধানে মৌলিক অধিকার ছিল সাংবিধানিক আইন পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু তথাপি জনগণের মৌলিক অধিকার কোন ক্রমেই সংরক্ষিত হয় নি। এই সংবিধান অবশ্যই লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ছিল এবং সংবিধানের অধিকাংশ বিধিবিধান ছিল সুস্পষ্ট।

সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংবিধান পরিবর্তিত হত না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের। কিন্তু সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হলে কি হবে? সংবিধান সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল ছিল না অথবা জনপ্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক তা গৃহীত হয় নি। এ সংবিধান ছিল প্রেসিডেণ্ট আইয়ুবের দান স্বরূপ।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান, কেননা নিম্ন কক্ষে জনপ্রতিনিধিদের স্থান হলেও উচ্চকক্ষে প্রদেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পাকিস্তানে কিন্তু এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ বিদ্যমান ছিল। বিচার বিভাগের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৬২ সালের সংবিধানে আইনগত দিক থেকে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধান ব্যাখ্যা করার অধিকার দেয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচাপতিদের নিয়োগ পদ্ধতি, বিচার বিভাগীয় বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পাকিস্তানের বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

পাকিস্তানের দুই প্রদেশের অসংলগ্নতা, উভয় প্রদেশের মধ্যে প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধান এবং উভয় প্রদেশের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্য অর্জনে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তছাড়া, পাকিস্তানের দ্বি-নাগরিকত্বের যে ধারণা তাও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য উপযোগী ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকগণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকগণ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিই ছিলেন অধিক অনুগত এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য সে পরিমাণে কমে এসেছিল।

সবদিক মিলেয়ে পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ছিল না, যদিও কাঠামোগত দিক থেকে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

১৯৬২ সালের সংবিধানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ঃ ১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা (Federation) এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়। রাষ্টপতিশাসিত সরকারে প্রেসিডেণ্ট শাসন বিভাগের প্রধান। তিনি আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে জনগণের নিকট হতে প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব লাভ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রেসিডেণ্ট ও জাতীয় পরিষদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হয়।

প্রেসিডেণ্ট
President

১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। পাকিস্তানের শাসনকার্য শুধুমাত্র যে তার নামে পরিচালিত হত তাই নয়, কার্যত তিনি ছিলেন শাসন বিভাগের প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রেসিডেণ্টের যোগ্যতা
Qualifications of President

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হত ঃ

প্রথম, তাঁকে একজন মুসলমান হতে হত।

দ্বিতীয়, তাঁর বয়স অন্যূন ৩৫ বছর হতে হত।

তৃতীয়, তাঁকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হত।

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন
Election of the President

পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেণ্ট এ পদে নির্বাচিত হতেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচিত ৮০,০০০ (আশি হাজার) সদস্য সহযোগে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর (Electoral College) অধিকাংশ সদস্যের ভোটে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হতেন। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যগণ উভয় প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যায় প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে আট বছরের বেশি প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকলে সাধারণভাবে তিনি পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। তবে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহের যুগ্ম অধিবেশনে অনুমোদিত হলে প্রেসিডেণ্ট দু মেয়াদের বেশিও এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন।

প্রেসিডেণ্ট পাকিস্তানের অন্য কোন লাভজনক চাকরিতে বহাল থাকতে পারতেন না অথবা জাতীয় পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদে বহাল থাকতে পারতেন না।

প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছাড়া তিন জনের অধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। প্রার্থীদের সংখ্যা অধিক হলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের যুক্ত বৈঠক আহ্বান করতেন এবং গোপন ভোটে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেণ্ট ব্যতীত তিনজন প্রার্থী মনোনীত করতেন। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

প্রেসিডেণ্টের অপসারণ
Impeachment of President

জাতীয় পরিষদের স্পীকারের নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ করতে পারতেন। প্রেসিডেণ্টের পদ শূন্য হলে অথবা তিনি বিদেশ গমন করলে অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় পদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট হিসেবে কাজ করতেন।

তাঁর কার্যকালে অভিযুক্ত হলে প্রেসিডেণ্ট অপসারিত হতেন। স্বেচ্ছায় সংবিধানের কোন ধারা লঙ্ঘন করলে কিংবা গুরুতর অসদাচরণের দায়ে অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার অভিযোগ আনয়ন করে তাঁকে প্রেসিডেণ্টের পদ থেকে অপসারিত করা যেতে পারত। সংবিধানের ১৩ ধারা অনুযায়ী সংবিধানের কোন ধারা লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের দায়ে জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত আবেদন স্পীকারের নিকট পেশ করে প্রেসিডেণ্টকে অপসারণের প্রস্তাব আনয়ন করতে পারতেন। স্পীকারের নিকট আবেদন করার ১৪দিন পূর্বে অথবা ৩০ দিন পরে প্রস্তাবটি জাতীয় পরিষদে উথাপিত হতে পারত না। তবে যথা সময়ে তা যাতে জাতীয় পরিষদে আলোচিত হয় সেজন্য স্পীকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতেন। জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ করতেন। অভিযোগটি বিবেচনার সময় প্রেসিডেণ্ট নিজে উপস্থিত থেকে অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতেন। অভিযুক্ত হলে তিনি দশ বছরের জন্য কোন প্রকার সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের অপসারণ প্রস্তাব যদি জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য কর্তৃক সমর্থিত না হত, তা হলে প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ সদস্যপদ হারাতেন।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে সংবিধানের ১৪ ধারায় বর্ণিত দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার জন্য প্রেসিডেণ্টকে অপসারিত করা যেত। তবে প্রেসিডেণ্ট মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হলে মেডিকেল বোর্ডের মতামত জাতীয় পরিষদের নিকট পেশ না করা পর্যন্ত প্রস্তাবে ভোট গ্রহণ করা চলত না। জাতীয় পরিষদের তিন–চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থনে প্রেসিডেণ্টকে পদত্যাগ করতে হত।

প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the President

প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিচে বর্ণিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(ক) শাসনমূলক, (খ) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ; (গ) অর্থসংক্রান্ত ; (ঘ) বিচার বিভাগীয় এবং (ঙ) জরুরী।

(ক) শাসনমূলক (Executive) ঃ প্রেসিডেণ্টের উপর পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনার বিধিবিধান তিনি প্রণয়ন করতেন এবং সরকারের কার্যাবলির শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন করতেন।

তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতেন। মন্ত্রিপরিষদ তার কার্যাবলির জন্য তাঁর নিকট দায়ী থাকতেন। পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদেরও তিনি নিয়োগ করতেন। তা ব্যতীত, তিনি দু প্রদেশের গভর্নরদের, পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেল, অডিটর জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টদ্বয়ের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করতেন। তিনি ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারতেন। তাঁরই অনুমোদনক্রমে প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতেন।

প্রেসিডেণ্ট ছিলেন পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি দেশরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগ করতেন, দেশরক্ষা বাহিনীর অফিসারদের কমিশন দান, তাঁদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ, চাকরির শর্তাদি নির্ধারণ ইত্যাদি সম্পন্ন করতেন। যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি নীতি নির্ধারণ করতেন এবং বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতেন। তাছাড়া, তিনি জাতীয় উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্ম সম্পন্ন করতেন। জাতীয় অর্থনৈতিক কমিশন, জাতীয় রাজস্ব কমিশন তিনি গঠন করতেন এবং ইসলামিক উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন ও তার সদস্যদের নিয়োগ করতেন।

(খ) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Legislative Power and Functions) ঃ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন পার্লামেণ্টের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংবিধানের ১৯ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেণ্ট এবং এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ সমন্বয়ে পাকিস্তানের পার্লামেণ্ট গঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে এবং ভেঙ্গে দিতে পারতেন। তবে জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিলে প্রেসিডেণ্টও পদত্যাগ করতেন। জাতীয় পরিষদ যদি প্রেসিডেণ্টের অপসারণ প্রস্তাব বিবেচনা করতেন অথবা যদি জাতীয় পরিষদের মেয়াদকালের অসমাপ্ত অংশ ১২০ দিনের কম থাকত, তা হলে প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন না। প্রেসিডেণ্ট ও জাতীয় পরিষদের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য দেখা দিলে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের নিকট প্রশ্নটি পেশ করতেন এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যগণ 'হা' বা 'না' সূচক উত্তরদান করে তা সমাধানের ব্যবস্থা করতেন।

জাতীয় পরিষদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হত। প্রেসিডেন্ট বিলে সম্মতি দান করতেন অথবা সম্মতি দান অস্বীকার করতেন অথবা বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদে তাঁর মতামত অথবা সংশোধনী প্রস্তাবসহ ফেরত পাঠাতেন। ৩০ দিনের মধ্যে যদি তিনি কোনটাই না করতেন, তা হলে বিলে সম্মতি দান করেছেন বলে ধরে নেয়া হত। প্রেসিডেন্ট কোন বিলে সম্মতিদান স্থগিত রাখতেও পারতেন।

প্রেসিডেন্ট কোন বিল সম্মতিদান স্থগিত রাখলে জাতীয় পরিষদ যদি সে বিল মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পুনরায় গ্রহণ করত, তা হলে প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য তা পুনরায় প্রেরিত হত। কোন বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে ফেরত দিলে তা যদি প্রেসিডেন্টের সংশোধনী প্রস্তাবসহ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হত অথবা যদি সংশোধনীসহ প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে জাতীয় পরিষদ তিন-চতুর্থাংশের ভোটে পুনরায় গ্রহণ করত তা হলে তা পুনরায় প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য প্রেরিত হত।

বিলটি দ্বিতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য প্রেরিত হলে প্রেসিডেন্ট হয় ১০ দিনের মধ্যে বিলে সম্মতিদান করতেন, না হয় বিলটি অনুমোদন করা যায় কীনা; তা বিবেচনার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের নিকট গণভোটে প্রেরণ করতেন। এর কোনটি না করলে বিলটি ১০ দিন পরে আইনে পরিণত হত। গণভোটে যদি বিলটি অধিকাংশ সদস্যের ভোট লাভ করত, তা হলে তা প্রেসিডেন্টের সম্মতি লাভ করেছে বলে ধরে নেয়া হত। প্রেসিডেন্টের সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হত না।

জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন বিলে প্রেসিডেন্ট ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন। কোন কোন বিল প্রেসিডেন্টের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করা চলত না। উদাহরণস্বরূপ, বিবর্তনমূলক আটক আইনের বিল উল্লেখযোগ্য।

প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারতেন এবং তা আইনের ন্যায় কার্যকর হত। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না চলাকালে প্রেসিডেন্ট যদি মনে করতেন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, জরুরী আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তখন তিনি অধ্যাদেশ জারি করতে পারতেন। এরূপ অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সম্ভব জাতীয় পরিষদে পেশ করতে হত। যদি পরিষদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধ্যাদেশ অনুমোদন করত, তা হলে তা আইনে পরিণত হত। অন্যথায় তা বাতিল হয়ে যেত। নির্দিষ্ট সময় বলতে জাতীয় পরিষদের বৈঠকের ১০ দিনের মধ্যে অথবা অধ্যাদেশটি জারির ১৮০ দিনের মধ্যে যা সংক্ষিপ্ততর তাই বুঝাত।

তা ব্যতীত পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা বিদ্যমান থাকলে অথবা কোনরূপ যুদ্ধাশঙ্কা দেখা দিলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালেও প্রেসিডেন্ট অধ্যাদেশ জারি করতে পারতেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হলেও প্রেসিডেন্টের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(গ) প্রেসিডেন্টের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers of the President) ঃ অর্থ সংক্রান্ত বিষয়েও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ব্যতীত কোন 'অর্থ বিল' বা

'ব্যয় বরাদ্দ' দাবি পরিষদে পেশ করা যেত না। প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে প্রেসিডেণ্ট বার্ষিক আর্থিক বিবরণী বা বাজেট জাতীয় পরিষদে পেশ করাতেন। আর্থিক বিবরণীতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়কে চলতি ব্যয় (Recurring Expenditure) ও স্থায়ী ব্যয় বা সংযুক্ত তহবিলের উপর ধার্যকৃত ব্যয়কে (Non-recurring or Expenditure on Consolidated Fund) পৃথকভাবে দেখাতে হত। স্থায়ী ব্যয় সম্বন্ধে জাতীয় পরিষদ আলোচনা করতে বা মতামত প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। কিন্তু চলতি ব্যয় সম্বন্ধে জাতীয় পরিষদ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত। নতুন ব্যয় ও কর ধার্য সম্বন্ধে জাতীয় পরিষদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল।

কোন সময় মঞ্জুরিকৃত বরাদ্দ অপ্রতুল হলে প্রেসিডেণ্ট 'অতিরিক্ত আর্থিক বিবরণী' পেশ করতে পারতেন।

(ঘ) প্রেসিডেণ্টের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers of the President) ঃ প্রেসিডেণ্ট সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলোর প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি বিচার বিভাগীয় চরমাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন এবং কোন অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করতে, হ্রাস করতে, দণ্ড মওকুফ করতে বা স্থগিত রাখতে পারতেন।

(ঙ) প্রেসিডেণ্টের জরুরী ক্ষমতা (Emergency power of the President) ঃ দেশে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে প্রেসিডেণ্ট প্রভূত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। বৈদেশিক আক্রমণ হেতু যুদ্ধাশঙ্কা দেখা দিলে অথবা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাতে সমগ্র পাকিস্তান অথবা তার কোন অংশে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন গুরুতররূপে বিপন্ন হত, তা হলে প্রেসিডেণ্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারতেন (Proclamation of Emergency)। এ জরুরী অবস্থা ঘোষণা জাতীয় পরিষদে যত শীঘ্র সম্ভব উত্থাপন করতে হত। তা জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে কেন্দ্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করত।

যে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল, তা অপসারিত হয়েছে—প্রেসিডেণ্ট মনে করলে ঘোষণাটি বাতিল করতে পারতেন। জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ছিল অত্যধিক। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালেও তিনি তাঁর 'বিশেষ আইন প্রণয়নমূলক ক্ষমতা' (Extraordinary Power of Legislation) প্রয়োগ করে প্রয়োজনানুসারে পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করতে পারতেন। এরূপ অর্ডিন্যান্সকে জাতীয় পরিষদ অনুমোদন করতে পারত না।

জরুরী অবস্থায় প্রদেশের শাসন ব্যবস্থায় কোনরূপ অচলাবস্থার সৃষ্টি হত না, কারণ ১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের হাতে ন্যস্ত ছিল। মোটের উপর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

প্রথম, তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি নির্ধারণ করতেন।

দ্বিতীয়, শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন।

তৃতীয়, তিনি দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করতেন।

চতুর্থ, তিনি বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করতেন এবং দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতেন।

পঞ্চম, আইন প্রণয়ন বিষয়ে তিনি নেতৃত্বদান করতে পারতেন।

সর্বশেষে, শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সমস্যা সমাধান করতে পারতেন। প্রেসিডেণ্টের পদ শূন্য হলে অথবা কোন কার্যোপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট বিদেশ গমন করলে অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে

তিনি কার্য করতে অসমর্থ হলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। তবে অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিতে অথবা প্রাদেশিক গভর্নর বা মন্ত্রিপরিষদকে ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদের পদচ্যুত করতে পারতেন না।

১৯৬২ সালের সংবিধানে জাতীয় পরিষদ
National Assembly under the Constitution of 1962

১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নামকরণ হয় 'জাতীয় পরিষদ' (National Assembly of Pakistan)। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট পূর্বাহ্নে ভেঙ্গে না দিলে এর কার্যকাল ছিল ৫ বছর। জাতীয় পরিষদ ছিল এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ।

এর গঠন
Composition

জাতীয় পরিষদ ১৫৬ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হত। সদস্যদের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাকি অর্ধেক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হতেন। ১৫৬টি আসনের মধ্যে ৬টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্যবৃন্দের তিনজন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ ও অন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাসাম্য বজায় রেখে জাতীয় পরিষদ তার সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারত।

পরিষদের সদস্য পদের যোগ্যতা
Qualifications of Members of the National Assembly

জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হত ঃ

প্রথম, তাঁকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হত।

দ্বিতীয়, তাঁর নাম 'নির্বাচকমণ্ডলীর' নির্বাচন তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হত।

তৃতীয়, তাঁকে পাকিস্তানের নাগরিক হতে হত।

কোন প্রার্থী জাতীয় পরিষদের সদস্য পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন যদি—

(এক) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হতেন।

(দুই) সংবিধান বা আইন কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত হতেন।

(তিন) পূর্ববর্তী ৫ বছরের মধ্যে কোন অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আদালত কর্তৃক ২ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতেন।

(চার) সরকারি চাকুরিতে বহাল থাকতেন।

(পাঁচ) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।

কেউ যুগপৎ জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারতেন না। উভয় পরিষদে কেউ নির্বাচিত হলে অবশ্যই তাঁকে একটি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে হত। কোন প্রার্থী জাতীয় পরিষদের একাধিক আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। পরিষদের অনুমতি ব্যতীত কোন সদস্য একাদিক্রমে ৩০টি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্য পদ বিলুপ্ত হত।

জাতীয় পরিষদের প্রধান কার্যালয় ছিল ঢাকায়। সংবিধান মোতাবেক পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হতেন। পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হতে একজন স্পীকার ও দুইজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হতেন। পরিষদের সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারগণ অপসারিত হতেন। জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে গেলে এবং নবনির্বাচিত পরিষদের প্রথম বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারগণ পদত্যাগ করতেন না। পরিষদের ৪০ জন সদস্য নিয়ে কোরাম হত।

বছরে অন্তত দুবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত এবং দুটি অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাস বা ১৮০ দিন উত্তীর্ণ হতে পারত না। এর কার্য পদ্ধতি পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হত। এর কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন করা চলত না। সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন প্রেসিডেণ্টের অপসারণ, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি বিষয় সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সমাধান হত না।

প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মূলতবী ঘোষণা করতেন এবং তা ভেঙ্গেও দিতে পারতেন। তবে জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিলে ১২০ দিনের মধ্যে নতুন পরিষদ গঠন করতে হত। সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের অনুরোধে স্পীকারও পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মূলতবী ঘোষণা করতে পারতেন।

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ ও এটর্নী জেনারেল জাতীয় পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ শুধুমাত্র পরিষদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারতেন।

জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the National Assembly

জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—**(ক) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত; (খ) শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ** এবং **(গ) অর্থ সংক্রান্ত।**

(ক) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত (Legislative) ঃ কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করার একক ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। তা ব্যতীত পাকিস্তানের নিরাপত্তা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, উভয় প্রদেশের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য কারণেও জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারত। প্রাদেশিক পরিষদের অনুরোধক্রমে জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারত। কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, পাকিস্তানের এমন অংশের জন্য এবং ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকা ও ঢাকা রাজধানী এলাকা সম্পর্কেও জাতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করত। প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইনের পরিপন্থী হলে জাতীয় পরিষদের আইনই কার্যকরী হত এবং জাতীয় পরিষদের সাথে অসংগতিপূর্ণ প্রাদেশিক পরিষদের আইন বাতিল হয়ে যেত।

কোন বিল জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হলে তা প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পাঠান হত। প্রেসিডেন্ট ৩০ দিনের মধ্যে বিলে সম্মতি দিতেন অথবা সম্মতিদান স্থগিত রাখতেন বা তা পুনর্বিবেচনার জন্য পরিষদের নিকট ফেরত পাঠাতে পারতেন। প্রেসিডেন্টের সম্মতিদান ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হত না। বিলে প্রেসিডেন্ট সম্মতিদান স্থগিত রাখলে জাতীয় পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে তা পুনরায় গ্রহণ করে প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য পাঠাত। কোন বিল পুনর্বিবেচনার জন্য পরিষদে ফেরত পাঠান হলে জাতীয় পরিষদ তার মোট সদস্যের অধিকাংশের ভোটে তা পুনরায় গ্রহণ করে প্রেসিডেন্টের নিকট পাঠালে তিনি সম্মতিদান স্থগিত রাখতেন অথবা সম্মতি দিবেন কি না তা জানার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট গণভোটে পাঠাতেন। ১০ দিনের মধ্যে তিনি যদি কোনটির একটিও না করতেন, তা হলে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরা হত।

(খ) শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over Executive) : (১) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সাধারণত শাসন বিভাগের উপর আইন পরিষদের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হবার ফলে শাসন বিভাগের উপর আইন পরিষদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছিল, তথাপি জাতীয় পরিষদ বিভিন্নভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। জাতীয় পরিষদ বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে, মূলতবী প্রস্তাব গ্রহণ করে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিকট নানাবিধ প্রশ্ন করে, বাৎসরিক আর্থিক বিবরণ বা বাজেট আলোচনা করার সময় ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহণ করে, শাসন বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গহণ করে এবং সর্বোপরি অনাস্থাসূচক প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের উপর কর্তৃত্ব বলবৎ রাখতে পারত এবং শাসন বিভাগকে স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন রাখত।

(২) সংবিধানের কোন বিধি ভঙ্গের অপরাধের জন্য অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য জাতীয় পরিষদ প্রেসিডেন্টকে অভিযুক্ত করতে পারত এবং তাঁকে নির্দিষ্ট কোন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করতে পারত।

তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬২ সালের সংবিধানে জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্ব অনেকটা হ্রাস করা হয়।

(গ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Financial Powers and Functions) : জাতীয় পরিষদের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে কর ধার্য ও ব্যয় অনুমোদন সম্ভব হত। জাতীয় পরিষদের আইনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য কর ধার্য করা হত। প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে প্রেসিডেন্ট বার্ষিক আর্থিক বিবরণী বা বাজেট জাতীয় পরিষদে পেশ করাতেন। বার্ষিক বাজেটে কেন্দ্রীয় সংযুক্ত তহবিল (central consolidated fund) ব্যয়ের পরিমাণ, অন্যান্য পৌনঃপুনিক ব্যয়ের পরিমাণ, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের মাহিনা, নির্বাচনী কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারদের মাহিনা, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের মাহিনা, নির্বাচন কমিশন, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মাহিনা ছিল কেন্দ্রীয় সংযুক্ত তহবিলের দেয়। তা জাতীয় পরিষদে আলোচিত হত, কিন্তু পরিষদে এ সম্বন্ধে কোন ভোট গ্রহণ চলত না। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ব্যয়কে দুভাগে বিভক্ত করে পরিষদে পেশ করা হত, যথা—(ক) পূর্ব অনুমোদিত ব্যয় (expenditure previously approved) এবং (খ) নতুন ব্যয় (new expenditure)। পূর্ব অনুমোদিত ব্যয়ের উপর জাতীয় পরিষদ আলোচনা করতে পারত কিন্তু প্রেসিডেন্টের সম্মতি ব্যতীত তার উপর পরিষদে ভোট গ্রহণ চলত না। কিন্তু নতুন ব্যয় সম্বন্ধে জাতীয় পরিষদ ছিল সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। তার অনুমোদন, বাতিলকরণ বা সংশোধন সব কিছুই জাতীয় পরিষদের এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্টের সম্মতি ব্যতীত কোন 'বরাদ্দ দাবি' (demand grant) পরিষদে পেশ করা চলত না।

১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তিত হয় কিন্তু ১৯৫৬ সালের যেমন পাকিস্তানে দ্বি-কক্ষীয় আইন পরিষদ প্রবর্তন না করে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ প্রবর্তিত হয়, তেমনি ১৯৬২ সালের সংবিধানেও এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ প্রবর্তিত হয়। এর মূলে ছিল অনেক কারণ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : **(এক)** পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, **(দুই)** সমতা প্রতিষ্ঠা, **(তিন)** উন্নয়নকামী ও অগ্রগতিশীল অবস্থায় আইন পরিষদের সহজ আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, **(চার)** এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের সহজ-সরল ও সুষ্ঠু কার্যকারিতা, **(পাঁচ)** আর্থিক সুবিধা।

১৯৬২ সালের সংবিধান প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে সম্বন্ধ
Relation between the Provinces and the Centre under 1962 Constitution

১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এ দু প্রকারের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ দু প্রকার সরকারের নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারিত ছিল। সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়েছিল।

কেন্দ্রের আওতা
Jurisdiction of the Central Government

১৯৬২ সালের সংবিধানে সরকারের শাসনমূলক বিষয়গুলোর মাত্র একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এ সংবিধানে প্রাদেশিক তালিকা বা যুগ্মতালিকা বলে কোন তালিকা প্রণয়ন করা হয় নি। সংবিধানের তৃতীয় তালিকায় (Third Schedule) জাতীয় স্বার্থমূলক বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়। এটি 'কেন্দ্রীয় তালিকা' নামে পরিচিত। তৃতীয় তালিকায় যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয় নি তা প্রাদেশিক সরকারের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ আইন অনুসারে বলা হয় যে, অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলো (Residuary Powers) প্রদেশের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় তালিকায় বা তৃতীয় তালিকায় (Third Schedule) নিম্নলিখিত জাতীয় স্বার্থমূলক ৪৯টি বিষয় বিধিবদ্ধ হয় :

পাকিস্তান ও তার প্রত্যেক অংশের রক্ষাব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক, পাকিস্তানে বহিরাগত ব্যক্তিদের আগমন ও নির্গমন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, নাগরিকত্ব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তার সমন্বয় সাধন, মুদ্রা ও মুদ্রাঙ্কন, বিহিত মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ঋণ, বীমা, গ্রন্থস্বত্ব, নৌ ও জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ডাক, তারবার্তা, টেলিভিশন, আণবিক শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ তেল, জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদুঘর ও আদমশুমারি, সুপ্রীম কোর্ট, পর্যটন, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দেশরক্ষা বাহিনীর পরিচালনা।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ
Centre and Province in Law-making

(ক) সংবিধানের ১৩১ ধারা অনুযায়ী তৃতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়ের উপর পাকিস্তানের বা তার যে কোন অংশের জন্য (রাষ্ট্রের বাইরে প্রযোজ্য আইন সহ) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত হয় জাতীয় পরিষদের উপর ১৩২ ধারায় বর্ণিত হয়েছিল যে, প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রদেশের বা তার কোন অংশের জন্য তৃতীয় তালিকা বহির্ভূত যে কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

(খ) তবে সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদ তৃতীয় তালিকা বহির্ভূত যে কোন বিষয়ের উপরও আইন প্রণয়ন করতে পারত যদি বিষয়টি **প্রথম,** পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। **দ্বিতীয়,** জাতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বা তার সমন্বয় সাধনের সাথে যুক্ত হলে। **তৃতীয়,** পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত থাকলে।

(গ) পাকিস্তানের কোন প্রদেশের সাথে সংযুক্ত নয় এমন কোন জায়গা সম্বন্ধেও জাতীয় পরিষদ যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত।

(ঘ) ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকা ও ঢাকা রাজধানী এলাকা সম্বন্ধে জাতীয় পরিষদ যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত।

(ঙ) কোন প্রদেশের আইন পরিষদ যদি এ মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, তৃতীয় তালিকা বহির্ভূত কোন বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হলে জাতীয় পরিষদ সে বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারত। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন পরিষদ ইচ্ছা করলে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের যে কোন সংশোধন করতে পারত অথবা তা বাতিল করতে পারত।

(চ) অবশেষে এও উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানের ১৩৪ ধারা অনুযায়ী যদি কোন প্রাদেশিক পরিষদের আইন জাতীয় পরিষদের আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ হয় তা হলে জাতীয় পরিষদের আইন বলবৎ থাকত এবং প্রাদেশিক পরিষদের আইন যতটুকু অংসগতিপূর্ণ ছিল ততটুকু বাতিল হয়ে যেত।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে শাসন ও অর্থসংক্রান্ত সম্পর্ক

Relation between the Centre and Provinces in the field of Administration and Finance

(ক) যে সকল বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের পূর্ণ ও একক ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের ছিল, সেই সকল বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রযোজ্য হত এবং যে সকল বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের পূর্ণ ও একক ক্ষমতা প্রাদেশিক পরিষদের ছিল সেই সকল বিষয়ের উপর প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রযোজ্য হত।

(খ) কিন্তু প্রদেশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি বা আয়ের উপর প্রাদেশিক পরিষদ কোনরূপ কর ধার্য করতে পারত না। অন্য পক্ষে প্রাদেশিক সরকারের কোন সম্পত্তি বা আয়ের উপর জাতীয় পরিষদ বা অন্য প্রদেশের আইন পরিষদ কোনরূপ কর ধার্য করতে পারত না।

(গ) কোন প্রাদেশিক সরকারের অর্থ সাহায্য প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করতে পারত। তবে কেন্দ্রের অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রদেশ বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করতে পারত না।

(ঘ) জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে প্রাদেশিক আইন প্রদেশে কর্মরত ব্যক্তিদের উপর, ব্যবসা–বাণিজ্যের উপর এবং পেশার উপর কর ধার্য করতে পারত এবং এরূপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনের দ্বারা যে কর ধার্য করা হয় তা মনে করা হত না।

(ঙ) কোন প্রদেশে অবস্থিত মালিকহীন কোন সম্পত্তি থাকলে তা প্রাদেশিক সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হত।

(চ) কোন প্রাদেশিক আইন প্রদেশ দুটির মধ্যে মাল চলাচলে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারত না অথবা কোন প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর পক্ষপাতিত্বমূলক কোনরূপ করধার্য করতে পারত না।

(ছ) তবে প্রেসিডেন্ট যেহেতু প্রাদেশিক গভর্নরকে নিয়োগ করতেন এবং যেহেতু গভর্নর প্রেসিডেন্টের খুশিমত স্বীয়পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, সে জন্য কেন্দ্রের প্রভাব প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হত।

(জ) সংবিধানের বিধিবিধান সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রাদেশিক সরকারের সম্মতি নিয়ে বিনা শর্তে অথবা শর্তসাপেক্ষে প্রাদেশিক সরকারকে অথবা কোন কর্মচারী বা কোন কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পালনে নির্দেশ দান করতে পারতেন।

(ঝ) প্রাদেশিক আইন পরিষদের আওতা বহির্ভূত কোন বিষয়ে জাতীয় পরিষদের কোন আইন প্রাদেশিক সরকার বা তার কর্মচারীকে বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারত, তবে এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষতি সাধন হলে কেন্দ্রীয় সরকার তা পূরণ করত।

(ঞ) পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং উভয় প্রদেশের মধ্যে সকল প্রকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণার্থে প্রেসিডেন্ট **'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ'** গঠন করতে পারতেন।

(ট) কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে আয়কর, কর্পোরেশন কর, বিক্রয় কর, রপ্তানিকৃত পাট ও তুলার উপর কর এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেশসমূহের জন্য সাহায্য বণ্টনের জন্য প্রেসিডেন্ট **'জাতীয় অর্থ কমিশন'** গঠন করতেন। এ কমিশন প্রেসিডেন্টের নিকট সুপারিশ করত।

১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ

Causes of Failure of the System Introduced under the 1962 Constitution

১৯৬২ সালের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকেই অচল হয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে যে গণ-অভ্যুত্থান পাকিস্তানের উভয় অংশে দেখা দেয় তাই চূড়ান্তভাবে ১৯৬২ সালে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গকে এক গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন এবং তিনি তাঁর রচিত ১৯৬২ সালের সংবিধানের বিভিন্ন ত্রুটিরাজি বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। ঐ গোলটেবিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান রচিত হওয়া প্রয়োজন, পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের দাবি মেনে নেয়া প্রয়োজন।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। এই প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা দরকার কোন্ কোন্ কারণে ১৯৬২ সালে প্রবর্তিত ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার অনেক কারণ রয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে লিপিবদ্ধ হলো ঃ

(১) পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থতা ঃ ১৯৬২ সালে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানের যথার্থ স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নি। সেই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমাবেশ ঘটে রাষ্ট্রপতির হাতে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন জেনারেল এবং তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। জেনারেল হিসেবে তিনি সামরিক বাহিনীর সাথে ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। অপর পক্ষে সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক কর্মকর্তা পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে থাকায় সে ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা সম্ভব হয় নি।

(২) মৌলিক গণতন্ত্র ঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিক গণতন্ত্র কার্যকর হবার ফলে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হয়। তাদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নি। অন্যদিকে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা হ্রাস পায় এবং প্রতিনিধিত্বের সুযোগ লাভ করে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি। এতে দেশের সচেতন জনসমষ্টি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব ঃ ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রের যে হস্তক্ষেপ শুরু হয় এবং কেন্দ্রের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যে সমাবেশ ঘটে তাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক সরকারের রূপান্তরিত হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে।

(৪) উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ এই আমলে উভয় প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের এক পাহাড় রচিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান সামগ্রিকভাবে অবহেলিত এক উপনিবেশে পরিণত হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আরও জোরদার হয়ে উঠে। ছয়-দফা আন্দোলন এরই প্রতিফলন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ছয়-দফা দাবির প্রচারক ও সমর্থকদের সুনজরে দেখেন নি, বরং বিভিন্নভাবে তাদের উৎপীড়িত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আরও জোরদার হয়ে উঠে।

(৫) পাক-ভারত যুদ্ধ ঃ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধও এ ব্যবস্থার পতনের অন্যতম কারণ। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনমত এতে বিক্ষুব্ধ হয় এবং যুদ্ধের পর পরই ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

(৬) অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঃ এই ব্যবস্থায় অগণতান্ত্রিক বিধিবিধানসমূহ তার পতনকে ত্বরান্বিত করে। প্রেসিডেণ্ট, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচন, প্রেসিডেণ্টের একনায়কতন্ত্রসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ—এ ব্যবস্থাকে জনগণের নিকট অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলে ১৯৬৮ সালের দিকে পাকিস্তানের উভয় অংশে যে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয় তাতে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়ে যায়।

১। ১৯৬২ সালের সংবিধান রচনার ইতিহাস বর্ণনা কর। (Describe the history of making of the 1962 constitution.)

২। সংবিধান সংস্থা সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the Constitution Commission.)

৩। ১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (Describe the salient features of the Constitution of 1962.)

৪। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the position, powers and functions of the President of Pakistan under the Constitution of 1962.)

৫। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট কীভাবে নির্বাচিত হন এবং কীভাবে অপসারিত হন? (How was the President of Pakistan elected and impeached under the Constitution of 1962?)

৬। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের শাসনমূলক এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বিবরণ দাও।(Describe the executive and legislative powers of the President of Pakistan under the Constitution of 1962.)

৭। ১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রেসিডেণ্টের উপর যে জরুরী ক্ষমতা ন্যস্ত হয়, তা আলোচনা কর। (Discuss the emergency powers of the President under the Constitution of 1962.)

৮। ১৯৬২ সালের সংবিধান মোতাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the composition and functions of the National Assembly of Pakistan under the Constitution of 1962.)

৯। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের অর্থসংক্রান্ত ও আইন-প্রণয়নমূলক ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the financial and legislative powers and functions of the National Assembly under the Constitution of 1962.)

১০। '১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন প্রধান কেন্দ্রবিন্দু'—আলোচনা কর। ('The President was the main focus of the 1962 Constitution'—Discuss.)

১১। পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের পর্যালোচনা কর। (Analyse the relations between the centre and provinces under the 1962 Constitution.)

১২। ১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ কর। (Enumerate the causes of failure of the political system introduced in the Constitution of 1962.)

১৩। 'পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদ ছিল মুখ্য'—বিশ্লেষণ কর। ('The Presidency was the main focus of the Constitution of Pakistan 1962'. Elucidate.)

[R. U. 1982]

পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যার সূচনা ঃ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের কারণ

CONFLICT BETWEEN EAST PAKISTAN AND WEST PAKISTAN : ITS BASIC CAUSES—SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC

সূচনা ঃ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যেকে আশা করেছিল, অচিরেই স্বাধীনতার উত্তম ফসল সকলের জীবনকে করবে সার্থক। এই অঞ্চলে ভারতীয় কংগ্রেস কোন দিনই তেমন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি, কেননা এই অঞ্চলের কলকাতামুখী হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে কোন দিনই তেমন জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হন নি এবং কার্যত তাঁরাই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপ। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের অভূতপূর্ব বিজয় তারই পরিচায়ক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের জনগণ আশা করেছিল, পাকিস্তানে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসবে সার্থকতার উজ্জ্বল আলোক। কিন্তু কয়েকটি জটিল কারণের জন্য তা সফল হয় নি। এ কারণগুলো অনুধাবন একান্তভাবে প্রয়োজন। নিচে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

পাকিস্তানের মৌলিক সমস্যা

পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই ছিল সমস্যায় জর্জরিত এবং পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য, সুদীর্ঘ ২৩ বছরের মধ্যে কোন একটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয় নি।

আদর্শগত

পাকিস্তান যাত্রা শুরু করেছিল তার বিভিন্ন অংশের, বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান মাথায় নিয়ে। ভাষায়-সাহিত্যে, পোশাকে-পরিচ্ছেদে, আহার-বিহারে, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে, শিল্প-ঐতিহ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে মিল ছিল খুবই কম। উভয়ের মধ্যে মিলনের একমাত্র সেতু ছিল ধর্ম—ইসলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকলেই মুসলমান এবং পূর্ব-বাংলার শতকরা ৮০ জন ব্যক্তিই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সুতরাং যাত্রা শুরু কালেই পাকিস্তান ব্যবধান ও বিভেদের প্রাচীরে বারে বারে ধাক্কা খেয়েছে। এ ব্যবধানের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায় ভৌগোলিক কারণে। কেননা উভয় অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল এক হাজার মাইল আর দুই অংশের মধ্যে ছিল ভারতবর্ষের বিশাল ভূ-খণ্ড এবং ভারত প্রথম থেকেই ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৈরীভাবাপন্ন।

স্বাভাবিক কারণেই তাই পাকিস্তান হয়ে উঠে এক ইসলামী রাষ্ট্র। কেননা ইসলামই ছিল উভয়ের মধ্যে একমাত্র সেতুবন্ধন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই ঐক্যবোধ কোনক্রমেই সুদৃঢ় হতে পারে নি। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ ঃ **(এক)** পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

বাংলাদেশের মুসলমানদের বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে এ ধারণায় যে, বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দু-বাংলার সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট, হিন্দু রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, নিজস্ব জীবনবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল এবং "মুসলিমদের ভাষা উর্দু অপেক্ষা বাংলা ভাষার প্রতি সর্বাধিক অনুরক্ত"। **(দুই)** পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতা। উভয় অংশের মধ্যে একাত্মতা স্থাপনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। বরং জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার মনোভাব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভারত বিদ্বেষী মনোভাব জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করছে সব সময়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে তাই প্রথম থেকে বাংলাদেশে এক বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিজেই ঘোষণা করেন—একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, যদিও তা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। কেননা সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৮জন লোক উর্দু ভাষায় কথা বলে, অথচ বাংলাভাষী ছিল শতকরা ৫৬ জন। তাই দেখা যায়, ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৮ সাল ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ স্বরূপ। আন্দোলনের তীব্রতায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হতচকিত হয়ে ওঠে এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আন্দোলন করে দাবি আদায়ের এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। এর ফল হয় সুদূর প্রসারী। এর ফলে বাংলার জনগণ আন্দোলনমুখী হয়ে উঠে এবং সর্ব প্রথম রক্তদান করে দাবি আদায়ের আনন্দ অনুভব করে। ভাষা আন্দোলনের মৌলিক তাৎপর্য এইটাই। কার্যত দেখা যায়, ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃবর্গই কালক্রমে ১৯৭১ সালে বাঙালী জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দান করেন।

বাঙালীরা 'পুরাপুরি মুসলমান নয়, এ মনোভাবের ফলে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শে বাঙালীরা কোনদিন একাত্মতা অনুভব করেন নি। বাঙালীরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালবাসে। বাঙালীরা ধর্মকে ভালবাসে। কিন্তু ২৩ বছরের 'ইতিহাসে বাঙালীরা কোন দিন 'প্রকৃত বাঙালী' হয়ে প্রকৃত 'পাকিস্তানী' হবার সুযোগ লাভ করে নি' (In the whole range of history of Pakistan, East Pakistanis did not get any opportunity to be loyal Pakistanis and true Bengalis which they wanted to become"—*Tepper*)। এমন কী ১৯৭১ সালের সংগ্রামী দিনগুলোতেও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের মুসলমানদের হত্যা করে 'বিধর্মী' হত্যার অপার আনন্দ অনুভব করেছিল। সুতরাং আদর্শের কাঠামোয় উভয় অংশের অধিবাসীরা কোন দিনই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি।

পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষের কারণ অনেকটা ঐতিহাসিক। ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টি কোন দিনই ভারতের কাম্য ছিল না। কিন্তু ভারত-বিদ্বেষ পাকিস্তানের এক চূড়ান্ত নীতিতে পরিণত হয়ে উঠে এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব বিশিষ্ট হয়ে উঠে। ভারত-বিদ্বেষ নীতি পশ্চিম পাকিস্তানে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল বটে, কিন্তু বাংলাদেশে তা এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক হয়ে উঠে। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশে যখনই পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ চরমে উঠেছে এবং শোষণের বিরুদ্ধে যখনই প্রতিবাদ উঠেছে তখনই তাকে 'ভারতের চক্রান্ত' বা 'ভারতের চরদের কলাকৌশল' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তারা, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিকেরা, স্বায়ত্তশাসনের আহ্বায়করা, আওয়ামীলীগের ছয়-দফা, এমন কী শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকরা পর্যন্ত 'ভারতের চর' এবং 'চক্রান্তকারী' বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

সুতরাং দেখা যায়, পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের অপ্রতুলতা, ইসলামের একদেশদর্শী ব্যাখ্যা ও জাতীয় জীবনে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে তার প্রয়োগ, ভারত-বিদ্বেষ নীতি প্রভৃতি পাকিস্তানের চরম বিপর্যয়ের কারণ। পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের প্রধান ধারা থেকে বাংলাদেশের অধিবাসীরা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন থেকে যায়।

রাজনৈতিক কারণ ঃ

দ্বিতীয় মৌলিক কারণটি হলো পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবাস্তব পরিকল্পনা।—পাকিস্তানে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ও কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে দৃঢ় সংকল্প পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী (ruling elites) প্রথম থেকে চেষ্টা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রের অধীনে সংন্যস্ত করতে এবং কেন্দ্রে এক প্রকার একনায়কসুলভ শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে। তা একদিকে যেমন ছিল ইতিহাসের গতিধারা বিরোধী, অন্যদিকে তেমন ভৌগোলিক অবস্থানের সঠিক অনুধাবনহীনতা। পাকিস্তানের এই গতি-প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয় প্রথম থেকেই।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং প্রধানমন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ একাধারে ছিলেন গভর্নর জেনারেল, মুসলিম লীগের সভাপতি, জাতির পিতা, সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা কায়েদে আযম। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বে পাকিস্তানে সর্বময় ক্ষমতার সমাবেশ ঘটে। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা তাঁর নিকট নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্নর জেনারেল হলে পাকিস্তানের সর্বপ্রথম মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হন এবং গভর্নর জেনারেল হন গোলাম মোহাম্মদ। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতা লিপ্‌সু এবং ষড়যন্ত্রপ্রিয়। তাঁরই আমলে পাকিস্তানে 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' শুরু হয় এবং সীমিত রাজনীতির পথ প্রশস্ত হয়। আইন পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তিনি খাজা নাজিমুদ্দীনকে পদচ্যুত করেন। তিনি গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন। এভাবে প্রথম পর্যায়ে আইনের শাসনের যে সূচনা দেখা যাচ্ছিল তিনি তার কণ্ঠরোধ করেন এবং পরোক্ষভাবে ইস্কান্দার মীর্জা ও আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পথ রচনা করেন।

অবশ্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্যের ও জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা হ্রাসের সূচনা হয় স্বয়ং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র আমলেই। তিনি গভর্নর জেনারেল হয়েও মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বিভাগীয় সচিবগণ বিভাগীয় মন্ত্রিদের পাশ কাটিয়ে স্বয়ং গভর্নর জেনারেলের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারতেন। এর ফল হয় দ্বিবিধ ঃ **(এক)** মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য হ্রাস এবং **(দুই)** সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

এর পরোক্ষ ফল বাংলাদেশের জন্য-মারাত্মক হয়ে উঠে এবং ভবিষ্যৎ সংকটের বীজ এখানেই উপ্ত হয়। **প্রথমত,** কেন্দ্রীয় সরকারে বাংলাদেশ থেকে সমান সংখ্যক মন্ত্রী নিযুক্ত হলেও এবং গণপরিষদে বাংলাদেশ থেকে অধিক সংখ্যক সদস্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হন, কেননা, তাঁদের ক্ষমতা ছিল সীমিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে তাঁদের কোন ভূমিকা ছিল না। **দ্বিতীয়ত,** স্থায়ী কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বাংলাদেশের সমূহ ক্ষতি হলো কেননা বাংলাদেশ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন দিনই কোন বাঙালী কর্মকর্তা সুযোগ লাভ করেন নি।

এ দিকে ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। এই ব্যবস্থায় প্রদেশগুলো নিজস্ব এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারত। বাংলাদেশ থেকে সকল দাবি-দাওয়া অত্যন্ত জোরেসোরে প্রচারিত হয়েছে বহুবার। ১৯৫০ সালে সংবিধানের **মৌলিক নীতি নির্ধারক কমিটির** (B. P. C.) ঘোষণা প্রকাশিত হলে বাংলাদেশ থেকে এসব দাবি জোরালো কণ্ঠে প্রচারিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দাবি ছিল শাসনক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দাবি, স্বায়ত্তশাসনের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাসের দাবি। ২১-দফা কর্মসূচীতে মাত্র তিনটি ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করার কথা ছিল, যথা—দেশরক্ষা, অর্থ ও বৈদেশিক বিষয়। এই সকল দাবি যে যথার্থ ছিল, তা প্রমাণিত হয় যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্যে। যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে, কিন্তু ক্ষমতাদর্পী কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেয় নি। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দাবির অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি।

১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর বাংলার জনপ্রিয় নেতা এ. কে ফজলুল হক গণপরিষদে যে বক্তৃতা দেন, তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "কেন্দ্রের নির্দেশমত পূর্ব-বাংলা শাসিত হবে তা অসম্ভব ও অসহ্য। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সেখানকার সুবিধা তারাই উপভোগ করছে। এ অবস্থায় আমি একটি সুপারিশ করতে চাই এবং তা হলো কার্যত আমাদের স্বশাসন দিতে হবে। পূর্ব বাংলাকে তার ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দিতে হবে।"

১৯৫৮ সালে সমগ্র দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসন কাঠামোয় বাংলাদেশে সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও অন্তত দাবি-দাওয়া উত্থাপন করার পথ ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পর সে পথও রুদ্ধ হলো। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাগ্যে যা এসেছে তা শূন্যের নামান্তর।

১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান ছিল 'প্রেসিডেন্টের, প্রবর্তিত হয় প্রেসিডেন্টের দ্বারা এবং প্রেসিডেন্টের জন্য' ('A government by the president of the president and for the president.')। শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং শাসনকার্য পরিচালিত হত সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের দ্বারা। এর ফল হয় অত্যন্ত বিষময়। অচিরেই তা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হলো— কোন শাসনব্যবস্থা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধিক দিন কার্যক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতে অক্ষম। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তা অনুভব করেন নি।

তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে এক যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হন, যা অল্প সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল এক ব্যবস্থায় রূপ লাভ করে এবং গণবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে উঠে। মৌলিক গণতন্ত্রে না ছিল কোন মৌলিকত্ব, না ছিল গণতন্ত্রের নামগন্ধ। তার লক্ষ্য সামরিক কর্তৃপক্ষ ও সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হাতে ক্ষমতার সমাবেশ ঘটানো।

১৯৬২ সালের সংবিধানে এই মৌলিক গণতন্ত্রকে শাসনব্যবস্থার ভিত্তিরূপে দাঁড় করানো হয়। আইন পরিষদ সংগঠিত হলেও তা হয়ে উঠে অক্ষম এবং বিকলাঙ্গ। ফলে প্রেসিডেন্ট হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট ('omnipotent president') অসহায় ও বিকলাঙ্গ আইন পরিষদ ('impotent legislature') এবং অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান মৌলিক গণতন্ত্র ('quixotic') কিছুদিন

কোন রকমে টিকে থাকলেও অচিরে তার ভিত্তি নড়ে উঠে। যার লক্ষ্য জনকল্যাণ নয়, তা ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মত উড়ে যেতে বাধ্য। আসলে হয়েছিল তাই। **শক্তিশালী কেন্দ্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবির অস্বীকৃতি, বিশেষ করে শাসনব্যবস্থায় বাংলাদেশের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব দানে অস্বীকৃতি এবং সর্বোপরি দেশে রাজনৈতিক কর্মধারাকে জোর করে স্তব্ধ করার মানসিকতা**—সব কিছু মিলিয়ে পাকিস্তানকে সংকটের দিকে টেনে আনে।

শেষ পর্যায়ে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া বাংলার যোগ্য প্রতিনিধিত্ব দানের দাবির প্রচণ্ডতায় 'এক ব্যক্তি ঃ এক ভোট'—এ নীতি গ্রহণে বাধ্য হন। তিনি অনুভব করেন যে, দেশের সংকট দূর করার একমাত্র পথ হলো—গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন। তাই তিনি পাকিস্তানের ২০ বছরের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে অগ্রসর হন। এর ফল ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়।

কার্যত আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি ছিল পাকিস্তানকে রক্ষা করার সর্বশেষ ব্যবস্থা। এই ছয় দফা দাবিতে পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে চাওয়া হয় নি বরং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমন্বয়ে এক "রাষ্ট্র সমবায়" (confederation) গঠন করতে চাওয়া হয়েছিল এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বৃহত্তম এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী এতে স্বার্থ ভঙ্গের সমূহ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে, বিশেষ করে নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব বাংলার সার্বিক নেতৃত্বের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে, বিভিন্ন চক্রান্তজালে নির্বাচনের ফলাফলকে বানচাল করতে উদ্যত হয়। তারই ফলশ্রুতি স্বাধীন বাংলাদেশ।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ

তৃতীয় ও সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য ও পূর্ব বাংলার অসহনীয় বঞ্চনা। শেখ মুজিবুর রহমানের কথায়, "আসলে পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস বাঙালীদের জন্য বঞ্চনার সুদীর্ঘ ইতিহাস" ('The twenty three years' history of Pakistan is in fact a long history of exploitation of the Bengalis.')। এই ইতিহাসের শুরু হয় পাকিস্তানের সূচনা থেকেই। তার কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

(এক) পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে (প্রথমে করাচী, পরে ইসলামাবাদ) অবস্থিত থাকায় বিভিন্ন লাভজনক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী মহল লাইসেন্স ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

(দুই) পূর্ব বাংলা প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং উভয় অংশের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা জটিলতা ও ব্যয়বাহুল্যের জন্য এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহল সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

(তিন) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বেশির ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে ভাষা, আঞ্চলিকতা ও অন্যান্য কারণে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অধিকাংশই লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানীরা।

(চার) সরকারের শিল্প নীতিও এ জন্য দায়ী। সরকার বেসরকারি খাতের মাধ্যমে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে দেশকে শিল্পায়িত করতে চেয়েছিল। ফলে পিআইডিসি (PIDC) প্রভৃতি বিরাট সংস্থা গড়ে উঠে। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সেখানকার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাই অধিকাংশ সুযোগ লাভ করতে থাকে।

(পাঁচ) পশ্চিম পাকিস্তানের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধানত ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত বণিক সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিল বেশি। সরকার প্রথমে উদার আমদানি নীতি গ্রহণ করায় তারা প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ লাভ করে এবং ১৯৫০-এর দিকে কোরিয়া যুদ্ধের সময়ে সরকার মুদ্রামান হ্রাস না করায় পাট ও তুলা রপ্তানি করে তারা মুনাফার পাহাড় সৃষ্টি করে। শেষ পর্যায়ে শিল্প খাতে তা ব্যয় করতে থাকে। শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের ফলে তাদের সুযোগ-সুবিধা আরও বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

এ সকল কারণে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

(ছয়) শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সুযোগ ছিল সীমিত। এই অঞ্চল থেকে লাইসেন্স ও অন্যান্য সুযোগের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত তেমন সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে এ অঞ্চলের কোন প্রতিনিধি না থাকায় এ অঞ্চল ছিল বরাবরই উপেক্ষিত। পাপানেকের (Gustav Papanek) মতে, পূর্ব বাংলায় শিল্প বাণিজ্যের তেমন সুযোগ না থাকলেও কৃষিক্ষেত্রে এর ছিল প্রচুর সম্ভাবনা এবং পানি সেচ ব্যবস্থায় বিস্তৃত ও ব্যয়বহুল পরিকল্পনা ছাড়াও এখানে সাধারণভাবে পানি সরবরাহ করেই উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ করা যেতে পারত। কিন্তু সরকারের উদাসীনতার জন্য তা সম্ভব হয় নি।

(সাত) পাপানেকের মতে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের হার ছিল বেশি। এখানে রাজনৈতিক সংগঠন ছিল উন্নততর এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় অংশই ছিল মোটামুটিভাবে সমান। কিন্তু মাত্র দশ বছরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠে উন্নততর পরিবহণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বিরাট বিরাট কল কারখানা এবং উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পূর্ব বাংলা রয়ে গেল অনুন্নত কৃষি প্রধান এলাকা।

(আট) উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায় সরকারের বিনিয়োগ নীতির ফলে। ১৯৫৫ সাল হতে ১৯৭০ সালের মধ্যে যে তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তার ফলে এই ব্যবধান বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলার ভাগে পড়ে (সরকারি ও বেসরকারি খাতে) সমগ্র বিনিয়োগের মাত্র শতকরা ২৬ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে তা হয় শতকরা মাত্র ৩২ ভাগ ও তৃতীয় পরিকল্পনা কালে হয় শতকরা মাত্র ৩৬ ভাগ, যদিও এ অঞ্চলে সমগ্র দেশের শতকরা ৫৬ জন লোক বসবাস করত। তাই দেখা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনা কালে উন্নয়ন ও সাধারণ ব্যয় খাতে মাথাপিছু ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে যথাক্রমে ৫২৫·৫ টাকা ও ৩৯০.৩৫ টাকা এবং পূর্ব বাংলায় হয় মাত্র ২৪০ টাকা ও ৭০·২৯ টাকা।[১]

এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় ১৯৫০-এর প্রথম দিক থেকেই। ১৯৬২ সালের সংবিধানে এই বৈষম্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং তা নিরসনের ঘোষণা পর্যন্ত ছিল এই সংবিধানে। কিন্তু এই বৈষম্য দূর করার কোন বাস্তবপন্থা কোন দিন গৃহীত হয় নি বরং কেন্দ্রীয় সরকার এই দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে আরও অগ্রগতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মাহবুব-উল হকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, পাকিস্তানের মত উন্নতকামী দেশের পক্ষে কল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করার বিলাসিতা সাজে না। এখানে যা প্রয়োজন,

---

১। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী

তা হলো, অধিক উৎপাদন, তা যতই বৈষম্য সৃষ্টি করুক না কেন"।[১] তা থেকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে। ফলে "সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে যে অর্থনীতির জন্ম হলো, তা সৃষ্টি করলো বিস্ফোরণমূলক রাজনীতি"।

পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের ছয়-দফা দাবির মূল নিহিত রয়েছে এখানে। পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের লক্ষ্য ও গতি-প্রকৃতির উপরই ছয়-দফা দাবির মূল লক্ষ্য ছিল—অর্থ, কর ধার্য, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন, কারণ এ সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা সর্বাধিক আঘাত পেয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ১৯৪৭-৪৮ সাল ও ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলা ২২৪০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, কিন্তু ঐ সময়ে পূর্ব বাংলায় আমদানি করা হয়েছিল ১৬৩০ কোটি টাকার সামগ্রী। ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান অর্জন করে ১৭৫৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা, কিন্তু সেই সময়ে তার আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭৯৯ কোটি টাকা। সুতরাং ঐ কয় বছরে পূর্ব বাংলার উদ্বৃত্ত ৬১০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হয় আর বাকিটুকু আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে।

বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলা একইভাবে বঞ্চিত হয়েছে। পাকিস্তান যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছে তার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং এক-তৃতীয়াংশ পূর্ব বাংলায়।

পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় বাঙালীদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় বাঙালী কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

শ্রেণী	মোট	বাংলা	শতকরা ভাগ
প্রথম শ্রেণী	২,৮১৬	৭৩২	২৩%
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫,৯৬১	১,২৪০	২৬%
তৃতীয় শ্রেণী	৭০,০০০	১৯,৩০০	২৭%
চতুর্থ শ্রেণী	২৬,০০০	৮,০০০	৩০%

১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত বেসামরিক খাতে পাকিস্তানে মোট ব্যয় হয়েছিল ৭৯৮ কোটি টাকা, কিন্তু পূর্ব বাংলার ভাগে পড়ে মাত্র ১৮৪ কোটি টাকা। সামরিক ও বেসামরিক খাতে ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ৩১৬৯ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে বাঙালীদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ৪২৪ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ২৭৩৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য। সুতরাং এই পর্বত প্রমাণ বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার জনমত বিক্ষুব্ধ হবে তাই তো স্বাভাবিক।

মূলকথা—পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের মূল প্রবাহে বাঙালী গণজীবন সংযোজিত হয় নি। রাষ্ট্রীয় জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অংশীদাররূপে একাত্মতা অনুভব করতে পারে নি। ১৯৬৩ সালে উইলকক্স (Wilcox) সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, "পাকিস্তানকে

১। মাহবুব-উল হক, পরিকল্পনা কমিশনারের প্রধান অর্থনীতিবিদ।

জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে যোগ্য নেতৃত্বাধীনে বহু বছরের সাধারণ ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার আশীর্বাদ লাভ করতে হবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব হয় নি।

১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি করে অতীত ইতিহাসের ধারাকে পাল্টাতে চেয়েছিলেন হয়ত এবং তিনি যে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন তার ফলাফলকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতে পারলে পাকিস্তানের ইতিহাস সম্ভবত অন্যভাবে লিখিত হত। কেননা আওয়ামী লীগের ছয়-দফায় এক 'আলাদা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' বা 'রাষ্ট্র সমবায়ের রূপরেখা' অঙ্কিত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানকে 'হত্যা' করা হয় এবং তার জন্য দায়ী মূলত পাকিস্তানের সংকীর্ণ (ভৌগোলিক ও সামাজিক উভয় অর্থে) শাসকগোষ্ঠী (ruling elites)। সেই পর্যায়ে ইয়াহিয়া খানের নিকট একটিমাত্র পথই খোলা ছিল এবং তাই তিনি করেছিলেন—পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া। ফলে যা কয়েক বছরে ঘটতে পারত, তা ঘটল মাত্র দশ মাসে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে মূল সমস্যাকে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানে প্রথম থেকেই মুক্ত ও অবাধ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় নি এবং পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সাথে একাত্মতা অনুভব (integrated) করার সুযোগ দেয়া হয় নি। জাতীয় জীবনে কোনদিন সুস্থতা আসে নি এবং সর্বোপরি বাঙালীকে পাকিস্তানী হবার সুযোগ লাভ করে নি। ফলে দীর্ঘ ২৩ বছরেও পাকিস্তান জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। অন্যদিকে বাঙালীরা সীমাহীন বঞ্চনার বেদনায় একদিকে যেমন হয়েছে সুসংহত, অন্যদিকে একই সাংস্কৃতিক জীবনের আশীর্বাদে জাতীয়তার মূলমন্ত্রে পেয়েছে দীক্ষা। ফলে, প্রথমে বাঙালীরা পরিণত হয়েছে একটা জাতিতে, পরে বাংলাদেশে রাষ্ট্রে রূপ লাভ করেছে।

১। পশ্চিম পাকিস্তানের আদর্শের সাথে বাঙালী জাতির আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the ideological conflicts that grew up between the West Pakistanis and Bengalis.)

২। কী কী কারণে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব বিঘ্নিত হয়? (State the reasons why the representation of East Bengal could not have been effective in the Central Govt. in Pakistan.)

৩। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ। (Write an essay on the economic disparity between West Pakistan and East Bengal stating its consequences.) [D. U. 1984]

৪। পাকিস্তানের বিপর্যয়ের কারণগুলো কী কী? (What are the reasons for the disintegration of Pakistan?) [D. U. 1981, '84]

বাংলাদেশের পটভূমি ও প্রধান প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী

BACKGROUND OF BANGLADESH AND PRINCIPAL SOCIAL AND POLITICAL EVENTS

বাংলাদেশ ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম নবীন রাষ্ট্র। এক রক্ত-সমুদ্রের তীর ঘেঁষে উঠেছে এখানে স্বাধীনতার সূর্য। এই স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে বাংলার লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশু-যুবক বুকের তাজা রক্ত বাংলাদেশের মাটিকে করেছে সিক্ত ও উর্বর'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সত্যই বলেছিল **"স্বাধীনতার জন্য কোন জাতি এত রক্ত কোন দিন দেয় নাই। ইতিহাসে ইহার কোন নজীর নাই।"** স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতি বাঁকে জমেছে রক্তের অসংখ্য স্রোতধারা। বাংলাদেশে এমন একটি পরিবার নেই, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে যার কোন ভূমিকা নেই। সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে, এই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের অন্ততপক্ষে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ বলি হয়েছে এবং সমাজের এমন কোন স্তর নেই, যেখানে দেশবরেণ্য শহীদস্মৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠে নি। শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাকরিজীবী, অখ্যাত পল্লীর সাধারণ মানুষ, নর-নারী, বৃদ্ধ-যুবক সকলেই এর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। অসংখ্য নারী হারিয়েছেন স্বামী-পুত্র-কন্যাকে, সংখ্যাহীন পিতা হারিয়েছেন তাঁদের বুকের দুলালকে, লক্ষ লক্ষ শিশু হারিয়েছে আশ্রয়ের শেষ ভরসাস্থলটুকু। অর্থ, মান-সম্ভ্রম, এমনকি প্রাণকে বাজী রেখে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এবং ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার লাল গোলাপকে। তাঁদের রক্তে রঙিন হয়েই স্বাধীনতার সূর্য আজ এত উজ্জ্বল।

বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশ মুক্ত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালীর জীবনে এক স্বপ্ন-রঙিন দিন। এই দিন পশ্চিম পাকিস্তানের পাশব শক্তি বাংলা বাহিনী-ও মিত্র-বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানে বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। সেদিন থেকে বাংলাদেশের দুর্জয় সূর্যরঙিন পতাকা উজ্জ্বল হয়ে চারিদিক আলো করে রেখেছে।

বাংলাদেশের পটভূমি ঃ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের পশুশক্তি বাংলাদেশে এক অশুভ ও অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। বাংলার মানুষ নয় মাস ধরে তার যোগ্যতম প্রত্যুত্তর দিয়েছে এবং তারই পরিণতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানের পরাজয় আর স্বাধীনতার জয়গানে মুখরিত বাংলাদেশ। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশের জন্মকাহিনী এত সংক্ষিপ্ত নয়। বাংলাদেশের ইতিহাস অনুধাবন করতে হলে তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে আমাদের অনেকখানি পিছিয়ে যেতে হবে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানিতে যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের জনগণের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। কিন্তু বাঙালীদের জন্য তা ছিল আরও বেদনাদায়ক। পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের ইংরেজ শক্তির দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে এবং প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতে ইংরেজ শক্তি হয়ে ওঠে অপ্রতিহত। ভারতে ইংরেজগণ শক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করত। তাই তাদের দাবিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। মুসলমানরা ইংরেজি ভাষা শিখতে ঘৃণা বোধ করত। নতুন সরকার নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করল। ফলে মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ হয়ে পড়ল মাত্র কয়েক বছরে। অপরদিকে হিন্দুগণ ইংরেজি ভাষা শিখে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। তাদের অনেকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠল এবং নতুন পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের ইংরেজ সরকারের সাথে সংযুক্ত করল।

তাই দেখা গেল, মুসলমানগণ জাতি হিসেবে ইংরেজ অপেক্ষাও ছিল শ্রেষ্ঠতর, চিত্তের দৃঢ়তা ও বাহু বলে ছিল উন্নততর। তার স্বীকৃতি মিলে হাণ্টারের "ভারতীয় মুসলমান" গ্রন্থের প্রতি ছত্রে। সেই জাতি ব্রিটিশ শাসনের স্বল্প কালের মধ্যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের জন্য ইংরেজরা মুসলমানদেরকে দায়ী করে এবং তাদের উপর দমননীতি চালানো হয়।

এভাবে ভারতের ইতিহাসে এক সংঘাতময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে সামন্তবাদ বিধ্বস্ত হয়ে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করেছে, ভারতে সে ক্ষেত্রে নতুন করে সামন্তবাদের জন্ম হলো এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ঐতিহাসিক ধারায় ভারতের সামন্ত প্রভুদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ইংরেজরা মুসলিমদের হাত থেকেই ভারত সাম্রাজ্য কবলিত করে, আর শাসন ব্যবস্থায় সুদৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট থাকার জন্য বিভক্ত করে শাসন চালু রাখার নীতি অনুসরণ করতে লাগল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ছাড়া ভারতের অতীত ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তেমন গুরুতর আকার কোন দিনই ধারণ করে নি। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে তা বিরাট আকার ধারণ করে। দেখা যায় ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তা মুসলমানদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। প্রধানত কংগ্রেসের প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্যই স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌচুক্তিতে মুসলিম লীগকে সর্বভারতীয় অন্যতম রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস স্বীকৃতি দেয়। তারপর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতি লক্ষ্যের দিক থেকে ছিল স্বরাজ বা স্বাধীনতার রাজনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক দিক হতে তা ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থ আদায়ের রাজনীতি।

অবশ্য এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য এবং তা হলো—তখনকার রাজনীতিতে জনসাধারণের ভূমিকা ছিল নেহায়েত নগণ্য। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ জনের বেশি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে শতকরা ১১ জনের ভোটাধিকার ছিল। সামন্ত প্রভু. জমিদার, জায়গীরদার, বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন তখনকার দিনের রাজনীতির নায়ক-নায়িকা। সুতরাং তাদের কার্যক্রমে এতটুকু গণমুখী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে নি। ধর্মীয় নীতিকে কেন্দ্র করে এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে পুঁজি করে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নীতি ও কার্যক্রম স্থির করতেন। ভারতের কোন নেতা সাম্প্রদায়িতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। যদিও দুই একজনকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা যায়, তথাপি তাদের রাজনৈতিক জীবন এত

স্বল্পস্থায়ী ছিল যে, তাঁরা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেন নি, যেমন বাংলার নেতা এ. কে. ফজলুল হক. চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাসচন্দ্র বসু প্রমুখ। ভবিতব্যের নির্মম বিধানের মত ভারতের রাজনীতির ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। বালগঙ্গাধর তিলক ও বল্লভ ভাই প্যাটেলের মত কংগ্রেস নেতা ইংরেজ শাসনের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে যেমন রামরাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তেমনি আল্লামা ইকবাল, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মত মুসলিম নেতা মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর *India Wins Freedom* শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে তাই অভিযোগ করেছেন, **'সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ চিন্তামুক্ত খুব কম নেতা ভারতে ছিলেন।'** তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। সুতরাং বলা যায় যে, পাকিস্তানের জন্মমূলে ছিল যেমন হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র জীবন ধারা ও সংস্কৃতি, তেমনি ছিল ব্রিটিশ রাজের বিভাগ করণের নীতি আর ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতৃবর্গের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনোবৃত্তি।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ঃ

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস জয়যুক্ত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৩৮ সালে সিন্ধু ও আসাম প্রদেশে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর অধীনে সর্ব দলীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় নি।

মন্ত্রিসভা গঠন করে কংগ্রেসী মন্ত্রিপরিষদ সরকারি অফিস-আদালতে কংগ্রেসী পতাকা উড্ডীন করতে আদেশ দেয়, আইন পরিষদ ও স্কুলে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাইবার ব্যবস্থা করে এবং জাতীয় ভাষারূপে হিন্দির প্রচলন করে। হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম করে 'বিদ্যামন্দির শিক্ষা পদ্ধতি' প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়। কংগ্রেস সরকারের এই ধরনের কার্যকলাপ হিন্দুদের মধ্যে প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করে এবং তারাও প্রচার শুরু করে যে, অবশেষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

ফলে হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলোতে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং অনেক স্থানে মুসলমানদের অবস্থা ও নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এমনি রাজনৈতিক পরিবেশে ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের আবেদন হয় বিরাট এবং মুসলিম ভারত তা অভিনন্দিত করে। পাকিস্তানের বীজ এখানে রোপিত হলো। কিন্তু বাঙালীরা এই প্রস্তাব গ্রহণের সময়েও তাদের স্বার্থ ভুলে নি। তাই প্রস্তাবে বলা হয়, প্রয়োজনবোধে সীমানার "পুনর্বিন্যাস সাধন করে, ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর সমন্বয় সাধন করে ভারতে স্বাধীন 'রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করা হবে। এর অঙ্গরাজ্যগুলো হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্ত শাসিত"। এ প্রস্তাবটি পেশ করেন বাংলার কৃতী সন্তান শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগ আইন প্রণেতাদের অধিবেশনে অবশ্য 'রাষ্ট্রসমূহ' কথাটি বাদ দিয়ে 'রাষ্ট্র' শব্দটি সংযোজন করা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল। কেননা বাঙালী নেতৃবর্গ তার পিছনে তাঁদের স্বার্থহানির সমূহ সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বাঙালী নেতৃবর্গের এই মনোভাব ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও কলকাতায় রয়ে গিয়েছিলেন বেশ কিছু দিন বাংলার স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন হয়ে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ঃ পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সাধারণভাবে প্রায় প্রত্যেকটি বাঙালী অতীতের সবকিছু ভুলে পাকিস্তানকে সাদরে গ্রহণ করতে চাইলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, মাহমুদ হোসেন প্রমুখ পাঁচ জন নেতা বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন পূর্ব বাংলা থেকে । এতে কোন বাঙালী প্রতিবাদ করেন নি। সকলে আশা করেছিলেন, পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে দেশে সকল অংশের আশা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে **বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থে, বিশেষ এলাকার প্রয়োজন অনুসারে এবং বিশেষ এক লক্ষ্যকে সামনে রেখে।** চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে প্রথম থেকেই এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেন। এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল কতকগুলো কারণ ঃ

(এক) প্রথম থেকেই পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবর্গ ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের।

(দুই) সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল নগণ্যতম।

(তিন) দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ যে অঞ্চলে বসবাস করে রাজধানী সে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে হয়েছিল করাচীতে। ফলে নীতি নির্ধারণ ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলার প্রতিনিধিরা সব সময়ই খুব গৌণ ভূমিকা পালন করেছে।

তাই পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার সাথে বাঙালীরা কোন দিনই একাত্মতা অনুভব করে নি। করাচী, লাহোর বা পাকিস্তানের যে কোন শহর বাঙালীদের নিকট ছিল বিদেশ তুল্য।

পাঞ্জাবের ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথম থেকেই বাংলার জনসমষ্টিকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে এবং পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীকে প্রথম থেকেই সন্দিহান হতে প্ররোচনা দিয়েছে। তাই দেখা যায়, পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় বিরাট এক জনসভায় ঘোষণা করেন, **"পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু।"** ("Urdu and Urdu shall be the only state language of Pakistan")। তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদে মৃদু গুঞ্জরণ উঠেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি মানুষের আশাভঙ্গ তখনও শুরু হয় নি। ১৯৪৮ সালে ১৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় জিন্নাহ্ সাহেবের অনুরূপ উক্তির প্রতিবাদে কয়েকজন ছাত্র সভা থেকে বের হয়ে যান।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করা হয়েছিল, তার কয়েকটি অত্যন্ত পরিচিত বাণী ছিল। **প্রথম,** বাঙালীরা পুরোপুরি মুসলমান নয়। **দ্বিতীয়,** বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আদৌ ইসলামিক নয়। **তৃতীয়,** বাংলাদেশে হিন্দু বাংলা তথা ভারতের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। **চতুর্থ,** কাশ্মীর সম্পর্কে বাঙালীদের কোন আগ্রহ নেই।

এই চারটি বিশ্বাসকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান দিতে চেয়েছিলেন। এ সব ধারণা তাঁদের মনে এমনভাবে বদ্ধমূল ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিশ্বাস এতটুকু নষ্ট হয় নি। ১৯৭১ সালের বর্বর হামলায় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈনিকদের এই প্রেরণাই তাঁরা দিয়েছিলেন যে, বাঙালীকে হত্যা করা কাফেরকে (বিধর্মী) হত্যা করার সামিল। বাঙালীরা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক সকলেই কাফের।

সুতরাং সমস্যা একবার অনুধাবন করে তাঁরা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন **ঃ প্রথম,** বাঙালীদের পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে পাক্কা মুসলমান বানাতে। **দ্বিতীয়,** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে বাঙালীদের হিন্দু সংস্কৃতির মূল উচ্ছেদ করতে। **তৃতীয়,** বাংলা ভাষাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে হিন্দু প্রভাব দূর করতে। **চতুর্থ,** কাশ্মীর প্রশ্নে বাঙালীদের আগ্রহী করে তুলতে তথা তাদের হিন্দু-বিদ্বেষী তথা ভারত-বিদ্বেষী করে তুলতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে অনুধাবন করতে হবে।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

বাঙালী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির মূলে ভাষা আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষক এবং তাঁদের তল্পিবাহকদের বিরুদ্ধে বাঙালী মনের বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হয় এবং ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। এই আন্দোলন থেকে সর্ব প্রথম বাঙালী যুবকরা রক্তদানের তাৎপর্য অনুধাবন করে এবং দাবি আদায়ের যে পরম আনন্দ তা উপভোগ করে। তাই এই আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের শুভ সূচনা বলে অনেকে মনে করেন। ২১ ফ্রেব্রুয়ারি তাই বাঙালীর গণজীবনে এক মহান দিন। বাংলার কয়েকজন দামাল ছেলে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ঢাকার রাজপথে রক্তের আল্পনা এঁকে দান করেছেন সার্থক সংগ্রামের আস্বাদ। ঢাকার শহীদ মিনার তাই বাংলাদেশের জনগণের এক তীর্থস্থান।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঃ আগেই বলা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলা ভাষাকে কোনদিন সুনজরে দেখে নি। বাংলা হিন্দুর ভাষা, হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারণা। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নাহ্ ঢাকায় ঘোষণা করেন, "উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তখন প্রতিবাদের মৃদু গুঞ্জরণ উঠেছিল তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে। ১৯৪৮ সালের ১৮ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভা থেকেও কয়েকজন ছাত্র নেতা বের হয়ে আসেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে এই আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে একটি 'মূলনীতি কমিটি' গঠন করেন এবং পাকিস্তানের সংবিধান রচনার মৌল বিষয়বস্তু নির্ধারণের ভার এই কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৫০ সালে 'মূলনীতি কমিটির' রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে পূর্ব বাংলার জনমন বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ এতদিন যা দাবি করে এসেছে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন—তার কোনটি তাতে স্থান পায় নি। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হস্তে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। তিনি ঢাকায় এসে ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে ভাষার প্রশ্নটি আবার উথাপন করেন এবং পল্টন ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উক্তিটি আবার ঘোষণা করেন—"একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" এবার কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় তুমুল আকার ধারণ করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক পরিষদের আসন্ন অধিবেশনকে সামনে রেখে দেশব্যাপী আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেন। ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্বে কয়েকটি পথসভা এবং পতাকা দিবস পালিত হয়েছে এবং সর্বত্রই জনগণের উদ্দীপনা প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা জনগণের ভাষার এই মৌলিক দাবিটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তা ব্যাপক ভিত্তিক এক আন্দোলনের পত্তন করেন।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এই আন্দোলনকে চেয়েছিলেন বানচাল করতে যদিও আন্দোলনের যৌক্তিকতা ছিল সন্দেহাতীত। পাকিস্তানের শতকরা আটজন লোক উর্দুতে কথা বলে, অথচ তা হবে রাষ্ট্রভাষা এবং যে ভাষায় দেশের শতকরা ৫৬ জন লোক কথা বলে তা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করবে না—এই যুক্তি একমাত্র নির্বোধ ছাড়া সকলেই বোঝে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ছিল বলদর্পী ও ক্ষমতালোলুপ। তাই একুশে ফেব্রুয়ারির হরতালকে বানচাল করার জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সরকারের এই নির্দেশ ভঙ্গ হলো এবং পুলিশ গুলি চালালে কয়েকজন অমৃতের সন্তান অকালে ঢলে পড়লে ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হলো— এবং সব কিছুই শুধুমাত্র মাতৃভাষার দাবিতে।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য (Its Significance)

ইতিহাস গড়ে উঠে। ইতিহাস রচিত হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ইতিহাস এমনিভাবে প্রাণ পেয়েছে যদিও তার প্রতি বাঁকে রয়েছে নির্মল রক্ত কণিকার মণিমুক্তা। বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করল ১৯৫৬ সালের সংবিধানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। **প্রথম,** ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বপ্রথম অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানীরা যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং তাদের দাবি যে স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হতে পারে এই শিক্ষা ভাষা আন্দোলন থেকে আহরিত হয়। **দ্বিতীয়,** ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণকে সর্বপ্রথম সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। সংগ্রাম ব্যতীত কোন দাবি আদায় যে সম্ভব নয় এবং স্বৈরাচারী সরকার শুধু যে সংগ্রামের ভাষা অনুধাবন করে তা এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি। তাই দেখা যায় ভাষা আন্দোলনের নেতৃবর্গই কালক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীতে রূপান্তরিত হন। **তৃতীয়,** এই আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ—কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, বুদ্ধিজীবী এক পংক্তিতে দণ্ডায়মান হন এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের (Linguistic Nationalism) জন্ম হয়। এই জাতীয়তাবাদই বহু চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে একাত্তরের রক্ত ঝরা দিনগুলোতে পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদে রূপলাভ করে। **সর্বশেষে,** এও বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রভাবশালী ভূমিকার সূচনা করে। অতীতে এই অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর মাধ্যমেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হত। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। এই পথ ধরেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি পত্তন হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদের আর এক প্রকাশ ঘটে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৮ সালের ২৮শে মার্চ জিন্নাহ্ সাহেব বলেছিলেন, "নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অগ্রগতি ও প্রগতির জন্য চাই ঐক্য ও সংহতি। ঐক্য ও সংহতি ব্যতীত পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে"। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকবর্গ কোন দিন আন্তরিকভাবে এ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নি। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাঙালীরা সব কিছু সহ্য করেছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে এবং নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য মুখর হয়ে উঠেছে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রণ্ট নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের সমাধি রচিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি। তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ ছাত্রের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন।

যুক্তফ্রন্ট ২১-দফা দাবিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং বিরাট সাফল্য লাভ করে। এই ২১-দফা দাবি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাঙালী গণমন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কতখানি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার সাথে অর্থনৈতিক দাবিও সংযুক্ত হয়। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাঙালী মন

বিদ্রোহ করেছিল, কেননা এই অঞ্চলের স্বার্থ আদায়ে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। রাজধানী করাচীতে যে প্রাসাদ চক্রান্ত চলছিল সে সম্পর্কেও তারা অবহিত ছিল না। এই আমলের দুই একটি হিসাব তুলে ধরলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৪৭-৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় ব্যয় করেছিল ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হয় ৭১০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে রপ্তানি হয় ৬৭৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার সামগ্রী এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রপ্তানি হয় ৪৫৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী। যদিও ঐ সময়ে পূর্ব বাংলায় আমদানির পরিমাণ হয় ৩২৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানির পরিমাণ হয় ৪৬৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার। ফলে ৩৫০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়। পূর্ব বাংলায় এর ফল হয় ভয়ঙ্কর। মুদ্রামান হ্রাস পায়। দেশে এক দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠে। গণপরিষদ সদস্য জনাব আতাউর রহমান খান এই প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালের ১৬ জানুয়ারি গণপরিষদে যা বলেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষা, সাহিত্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মুসলিম লীগের কুচক্রী দল যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমরা পূর্ব বাংলাকে সমমর্যাদার অংশীদার হিসেবে গণ্য করতে চাই, কিন্তু মুসলিম লীগ বাঙালীদের মনে এক অধীন জনপদ এবং তারা বিজয়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার সমস্যাকে দেখতে চায়।"

যুক্তফ্রন্টের নেতা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের ২৩ অক্টোবর গণপরিষদে যে ভাষণ দিয়েছেন তাও উল্লেখযোগ্য ঃ তিনি বলেন ঃ "কেন্দ্রের নির্দেশ মতো পূর্ব বাংলা শাসিত হবে, তা অসম্ভব ও অসহ্য। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সেখানকার সুবিধা তারা উপভোগ করেছে"। তিনি আরও বলেন ঃ "আমি একটি মাত্র সুপারিশ করতে চাই—এবং তা হলো কার্যত আমাদের স্বশাসনের অধিকার দিতে হবে। পূর্ব বাংলাকে তার ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দিতে হবে"। তিনি নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং পূর্ব বাংলার দাবি জোরেসোরে তুলে ধরেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে তাঁর মন্ত্রিসভাকে চক্রান্ত করে ভেঙ্গে দেয়া হয়। পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী অবাঙালীদের লজ্জাজনক ভূমিকা সেদিনও স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন
Downfall of the Muslim League in the 1954 Elections

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একুশ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নিজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল। একুশ দফা ভিত্তিক নির্বাচনী ইস্তাহার রচনা করেন জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ। একুশ দফার উল্লেখযোগ্য ঘোষণা ছিল, বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দান, সমবায় ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন, দেশে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা, পানিসেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে দেশ থেকে দুর্ভিক্ষের অভিশাপ দূরীকরণ, এক বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, সকল প্রকার সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কালাকানুন-

বাতিল করে তাদের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস বলে ঘোষণা ও সে দিনকে সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন দান এবং পররাষ্ট্র, অর্থ ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়কে প্রদেশের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা।

যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি
21-Point Programme of the United Front

(এক) বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা।

(দুই) ক্ষতিপূরণ ব্যতীত জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন এবং ভূমির খাজনা হ্রাস।

(তিন) পাটশিল্পকে জাতীয়করণ এবং পাট উৎপাদনকারীদের জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ।

(চার) সমবায়ের মাধ্যমে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার।

(পাঁচ) লবণ শিল্পে পূর্ব বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছয়) সর্বপ্রকার উদ্বাস্তু ও শিল্প শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

(সাত) বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(আট) পূর্ব বঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন ও শিল্প শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান।

(নয়) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা প্রবর্তন।

(দশ) শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থার ব্যবধান দূরীকরণ এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান।

(এগার) ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কালাকানুন বাতিল করা।

(বার) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন এবং উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাহিনায় সমতা বিধান। উল্লেখ্য যে, ঘোষণা করা হয়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিগণ ১০০০ টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করবেন না।

(তের) সর্বপ্রকার দুর্নীতির অবসান, আত্মীয় পোষণ ও উৎকোচ গ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ১৯৪৭ সালের পরবর্তী পর্যায়ে কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ।

(চৌদ্দ) নিরাপত্তা আইনে সকল বন্দীদের মুক্তিদান এবং সভাসমিতি, প্রেস ও বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

(পনের) প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ।

(ষোল) বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে রূপান্তরিতকরণ।

(সতের) ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দান ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দান।

(আঠার) শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাঁদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ দান।

(উনিশ) ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দান এবং এই লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় প্রদেশের হস্তে ন্যস্তকরণ। প্রতিরক্ষা কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে থাকলে নৌ-বাহিনী কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা এবং অস্ত্র নির্মাণে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এখানে অস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা।

(বিশ) যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রিসভা কোন কারণে আইন পরিষদ বা মন্ত্রিসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করবে না এবং পক্ষপাতিত্বহীন নির্বাচনের জন্য দুমাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।

(একুশ) আইন পরিষদে সদস্যদের পদ শুন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র মনোনীত প্রার্থী পর পর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হলে যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।

একুশ দফা নির্বাচন ইস্তেহার পূর্ব বাংলায় এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় এবং যুক্তফ্রন্ট এই নির্বাচনের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে ২৩৭টি মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। সর্বমোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৭২টি আসন ছিল অমুসলমানদের জন্য নির্ধারিত। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে লাভ করে শুধুমাত্র ৯টি আসন। ৪টি আসন লাভ করে খেলাফতে রাব্বানী পার্টি। নূরুল আমীনের মত মুসলীম লীগ নেতা একজন তরুণ ছাত্রের নিকট পরাজয় বরণ করেন।

অমুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফসীল ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রার্থী ২টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪টি, নির্দলীয় সদস্য ১টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনের পর ২ এপ্রিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু মুসলিম লীগের চক্রান্তে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ বেশিদিন ক্ষমতাসীন থাকতে পারেনি। আদমজী জুট মিল ও চন্দ্রঘোনা কাগজের কারখানায় শ্রমিক দাঙ্গা ও কলকাতায় ফজলুল হকের কিছু উক্তিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদকে বরখাস্ত করে। মাত্র ৫৬ দিন পর ১৯৫৪ সালের মে মাসে পূর্ব বাংলায় ৯২ (ক) ধারা জারি করা হয়।

মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। এর কারণ ছিল বহুবিধ।

প্রথম, মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আদর্শগত কোন্দল ঃ ১৯৪৬ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্বের প্রতিশ্রুতি পূর্ববাংলার জনগণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু নির্বাচনের কিছুদিন পরেই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভাঙ্গন ধরে। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল মুসলিম লীগের নেতৃবর্গের এক সম্মেলনে (Muslim League Legislators' Convention) লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধন করা হয় এবং সংশোধনীতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্বের ধারাটি বিলুপ্ত হয়। ঐ সময় থেকে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাসিম সেই সম্মেলনে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মুসলীম লীগ থেকে দূরে সরে আসেন। ১৯৪৯ সালে তাঁরই নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। মওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতার মুসলিম লীগ ত্যাগ দলীয় সংগঠনকে দূর্বল করে ফেলে।

দ্বিতীয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। হিন্দু কর্মকর্তা ও বুদ্ধিজীবীদের ভারত গমন, হিন্দু জমিদারদের পাকিস্তান ত্যাগ, স্বাধীন পাকিস্তানে বিভিন্ন রকম সুযোগ–সুবিধার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী অল্পদিনের মধ্যে এক প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি ছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার মাধ্যম। এই শ্রেণীর নিকট বাংলা ভাষার আবেদন, বাংলায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা, বাঙালী সংস্কৃতি সব কিছুই ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

তৃতীয়, এই কয় বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ বাঙালীদের স্বার্থরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যর্থতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। এই দল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালীদের স্বার্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং বাঙালীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫০ সালের মৌলিক নীতি সংস্থার রিপোর্টে বাঙালী জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাঙালী গণমন বিদ্রোহ করে ওঠে। কিন্তু মুসলিম লীগ সবকিছু অনুভব করেও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের প্রতি ছিল অনুগত। তাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালী জনগণ মুসলিম লীগকে মুছে দিতে চেয়েছিল।

চতুর্থ, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ যখন অনুধাবন করে যে, তার পতন অবশ্যম্ভাবী তখন দলীয় নেতৃবর্গ বিরোধী দলের কর্মী ও নেতাদের ওপর নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিল। তা মুসলিম লীগের পতনকে নিশ্চিত করে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তাও পরোক্ষভাবে জনগণকে বিরোধী দলের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ঃ

পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় প্রথম থেকেই স্বৈরাচারী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে স্বৈরাচারী গভর্নর জেনারেল যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলীকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৯৫৫ সালের ৮ নভেম্বর তিনি সার্বভৌম গণপরিষদকেও বাতিল ঘোষণা করেন এবং নির্দেশনামা হিসেবে দেশে সংবিধান জারি করতে মনস্থ করেন। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা সম্ভব না হওয়ায় অগত্যা দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করতে তিনি বাধ্য হন। কিন্তু এবারে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোকাবেলার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সব কয়টি প্রদেশকে সংযুক্ত করে এক ইউনিট গঠন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ নতুন সংবিধান দেশে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরের মধ্য রাত্রিতে সমগ্র দেশে সামরিক শাসন জারি করে দেশের সংবিধান বাতিল করেন। আইন পরিষদ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোকে অচল ঘোষণা করেন। ১৯৫৮ সালের পর থেকে পাকিস্তানের শাসনভার সামরিক চক্র ও আমলাদের উপর ন্যস্ত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আশা করা গিয়েছিল, একদিন পূর্ব বাংলার সমস্যার একটা সন্তোষজনক সুরাহা হবে। কিন্তু গণতন্ত্র নির্বাসিত হবার পর আর কোন আশা রইলো না।

বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও তার প্রভাব ঃ

প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলাকে একটা উপনিবেশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং বাংলার দাবি-দাওয়াকে কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় নি। ১৯৫৬ সালের সংবিধান ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে যদিও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংখ্যা সাম্যনীতি (Principle of parity) প্রবর্তন করা হয়, তথাপি তা কোনদিন কার্যকর করা হয় নি। শেষ পর্যায়ে তাই দেখা যায়, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন রূপ লাভ করেছে এক 'মুক্তির আন্দোলনে'। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন দান করা হয় নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি প্রবর্তন করে বাংলার দাবি কোনদিন মিটান হয় নি। তাই জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন; "তেইশ বছরের ইতিহাস আমাদের বঞ্চনার ইতিহাস।"

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবধানের মাত্রা ছিল খুবই কম। চা উৎপাদন এবং বস্ত্র উৎপাদনে পূর্ব পাকিস্তান সামান্য এগিয়ে ছিল, যদিও চিনি এবং ধাতব দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু বেশি সুবিধা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ পরিকল্পনা ছিল উন্নততর, যদিও ব্যাংক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ ছিল সামান্য বেশি। মোটের উপর, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশ মোটামুটিভাবে একই পর্যায়ে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে অবশ্য মাথাপিছু আয় ছিল সামান্য বেশি। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারি বিনিয়োগ নীতির ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের এক পাহাড় গড়ে ওঠে। ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৮ টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৬৭ টাকা এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩৩ টাকায়। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৭ টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে তা নেমে আসে ২৭৭ টাকায় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা হয় ৩৩১ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা ছিল শতকরা ১৯ ভাগ। ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২ ভাগ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে এই পরিমাণ হয় শতকরা ৬২ ভাগ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মূলত উভয় প্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় বৈষম্যমূলক নীতির জন্য। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯·৪ ভাগ ছিল শিল্পজাত দ্রব্য। ১৯৬৯-৭০ সালে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ২০ ভাগের মত। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৪·৭ ভাগ ছিল শিল্পজাত দ্রব্য। ১৯৬৯-৭০ সালে তা হয় সেখানকার মোট উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

দেশের উভয় অংশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য গড়ে ওঠে তার মূলে ছিল সরকারের বিনিয়োগ নীতি। প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় সম্পদের বিনিয়োগে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে বাস করতেন পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনসংখ্যা, অথচ এই অঞ্চলে ব্যয়িত হয় উন্নয়ন ও রাজস্ব এই উভয় খাতে শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ২১ থেকে ২৩ ভাগ। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে তা ছিল শতকরা ৩২ থেকে ৩৬ ভাগ। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমগ্র পাকিস্তানে বিনিয়োগ করা হয় সর্বমোট ১১৬০ কোটি টাকা। এই অর্থের মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা ছিল সরকারি খাতে এবং ৩৬০ কোটি টাকা ছিল বেসরকারি খাতে। সরকারি খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ হয় তার শতকরা ৩৬ ভাগ আসে পূর্ব পাকিস্তানে এবং শতকরা ৬৪ ভাগ যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। বেসরকারি খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ হয় তার শতকরা ২০ ভাগ আসে পূর্ব পাকিস্তানে এবং শতকরা ৮০ ভাগ নিয়োজিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সময়ে রাজস্ব খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় মাত্র ২৫৪ কোটি টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৯৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পূর্ব প্যাকিস্তানে

সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দ হয় যথাক্রমে শতকরা ৩২ এবং ৩০ ভাগ, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৮ এবং ৭০ ভাগ। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ। দেশের উভয় অংশে উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে বিনিয়োগ ও ব্যয়ের বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তার কিছুটা আভাস মিলে যদি বিনিয়োগ ও ব্যয়ের অঙ্ককে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তুলনা করা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২ এবং ৩৭ টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর পরিমাণ ছিল ১০৮ এবং ২০১ টাকা। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে মাথাপিছু ব্যয় হয়েছিল যথাক্রমে ২৪০ এবং ৭০ টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল যথাক্রমে ৫১২ এবং ৩৯০ টাকা।

বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশেই একইরূপ বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সর্বমোট ৫৪২·১৪ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান লাভ করে মাত্র ৯৩·৮৯ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৪৪৮·২৫ কোটি টাকা লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তান। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সাহায্য ও ঋণ বাবদ লাভ করে সর্বমোট ৭০৩ কোটি ডলার। এই সাহায্য ও ঋণের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান প্রায় ৯৪৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান অর্জন করে ৬৮২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু উক্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি করা হয়েছিল প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার সামগ্রী এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানি করা হয় ১২৭০ কোটি টাকার সামগ্রী। সুতরাং দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ২৬৫ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানি তো হয়েছে, তদুপরি বৈদেশিক সাহায্য ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছে। এভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তি হস্তান্তর ঘটে। পরিকল্পনা কমিশনের এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে হস্তান্তর হয়ে আনুমানিক ৩১১২ কোটি টাকার সম্পদ (প্রতি বছরে ১৫৫·৬ কোটি টাকার মত)।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীতে তাদের সংখ্যা শতকরা ১০-এর বেশি হয় নি। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছিল সর্বমোট ২৪৪৪ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে বাংলার ভাগে পড়েছিল মাত্র ২৪৪ কোটি টাকা।

পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় পূর্ববাংলার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কর্মচারীর সংখ্যাটি তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় পূর্ববাংলার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

কর্মচারী	মোট সংখ্যা	বাংলাদেশের	শতকরা ভাগ
প্রথম শ্রেণীর	২৮১৬ জন	৭৩২ জন	২৩%
দ্বিতীয় শ্রেণীর	৫৯১৬ "	১,২৪০ "	২৬%
তৃতীয় শ্রেণীর	৭০,০০০ "	১৯,৩০০ "	২৭%
চতুর্থ শ্রেণীর	২৬,০০০ "	৮,০০০ "	৩০%

১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত বেসামরিক খাতে পাকিস্তানের মোট ব্যয় হয় ৭১৮ কোটি টাকা আর বাংলাদেশের ভাগে পড়েছিল মোট ব্যয়ের শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ। সামরিক ও বেসামরিক উভয় খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩১৫৯ কোটি টাকা এবং তার মধ্যে মাত্র ৪২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় পূর্ব বাংলার জন্য। অবশিষ্ট ২৭৩৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

সুতরাং এই পর্বত প্রমাণ বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আইয়ুবী দশক ঃ

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের কুখ্যাত দশকে বাঙালী মন গুমরে মরছে ত্রিবিধ পীড়নের যাঁতাকলে। **প্রথম,** সামরিক কর্তৃপক্ষের চণ্ডনীতি। **দ্বিতীয়,** আমলাতন্ত্রের প্রাণহীন শাসন ব্যবস্থা। **তৃতীয়,** ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে সৃষ্ট আইয়ুবের দূরভিসন্ধিমূলক সৃষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাভোগী মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি। এই দশকে একদিকে যেমন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক দালালদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলার মাটিতে মীরজাফর সৃষ্টি করে তাদের সহায়তায় পূর্ব বাংলার জনগণকে পদানত রাখার চেষ্টা হয়েছে, তা ছলে বলে কৌশলে—যে ভাবেই হোক না কেন। পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনেম খান তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার স্বার্থ বিরোধী চক্রের শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠেন। আপাতদৃষ্টিতে এই আমলকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বন্ধ্যা মনে হলেও পরবর্তীকালের প্রগতির জন্য এই আমলের অবদান ছিল অত্যন্ত বেশি। সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব ১৯৬২ সালের সংবিধান জারি করেন। এই সংবিধানের লক্ষণীয় বিষয় ছিল শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টের প্রভাবের চিরস্থায়িত্ব। ১৯৬৪ সালের মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে দেশে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত বিরোধী দল পরাজিত হয়। আইয়ুব খান অধিকতর জৌলুস সহকারে একনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। একনায়কতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ঃ

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের বিরাট একটি শিক্ষা হলো পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনী শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ভারতের সাথে যে কোন সম্ভাব্য সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা অরক্ষিত। পাকিস্তানের সমর যন্ত্রটিকে সুঠাম রাখতে পূর্ব বাংলা এতদিন পর্যন্ত যোগান দিয়েছে তার দরিদ্র কৃষক ও মেহনতি মানুষের সঞ্চয়। পূর্ব বাংলার পাট দিয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান। পূর্ব বাংলা বিরাট এক ঔপনিবেশিক বাজার হিসেবে লায়ালপুর ও করাচীর কলকারখানা রেখেছে চালু। কিন্তু যে কোন হামলার সূত্রপাত হলে পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় অবোধ বালকের মত ছটফট করতে থাকে। অথচ প্রথম থেকেই দাবি করা হয়েছে—প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার দাবি মিটাতে বিমানবাহিনী ও নৌ-বাহিনী, বিশেষ করে নৌ-বাহিনীর প্রধান কার্যালয় পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সমর বিশারদরা বলে এসেছিল, পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের বাহিনীর উপর। কোন দিন যদি ভারত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে তবে পাকিস্তান দিল্লী অধিকার করে বাংলাকে মুক্ত করবে। এমন সব আজগুবি ও হাস্যসম্পদ যুক্তির অবসান হলো এই যুদ্ধে। পূর্ব বাংলা রইলো অরক্ষিত

এবং যুদ্ধের পর এ জাতি নতুন জীবনের স্বপ্নে হলো বিভোর। অঙ্কন করল সে স্বপ্নকে ছিনিয়ে আনার জন্য সংগ্রামের রূপরেখা। প্রস্তুত হলো ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা কর্মসূচি। জাতীয় দল হিসেবে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো আওয়ামী লীগ। জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঝড়ের বেগে দেশবাসীকে শোনালেন অভয় বাণী আর সবাইকে বললেন উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে। ১৯৬৬ সালের জুন মাস থেকে এই অভিযাত্রী দল পথ পরিক্রমা শুরু করে। এবারে আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি হলো ইসলামের পথ ঘেঁষে নয়, বরং বাস্তব ভিত্তিক ছয়-দফার ভিত্তিতে। জন্ম হলো "জয় বাংলা" শ্লোগানের। বাঙালী জাতীয়তাবাদ মূর্ত হয়ে উঠল।

ছয়-দফার আর্থ রাজনৈতিক পটভূমি
Politico-Economic Background of the Six Point

ছয়-দফার আর্থ-সামাজিক—রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, ছয়-দফা দাবি বাঙালীদের কেন এত উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যায়। কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে, এ দেশকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে এবং রাজনৈতিক কর্মধারাকে জোর করে স্তব্ধ করার প্রবণতাই ছিল পাকিস্তান রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। তাই ছয়—দফার প্রথম দফায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়।

পাকিস্তানের উভয় অংশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য গড়ে উঠে তার মূলে ছিল উভয় প্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার বৈষম্যমূলক নীতি, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বণ্টন ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি। এই নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ হস্তান্তরিত হয়। দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে সম্পদ পাচার বন্ধের লক্ষ্যে ছয় দফায় বিহিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংস্থা, ব্যাংক ও বীমা পশ্চিম পাকিস্তানীরা নিয়ন্ত্রণ করত এবং দেশের সম্পদ মাত্র কিছু সংখ্যক পরিবারের হাতে সঞ্চিত হতে থাকে। ছয়-দফা এই অবস্থার প্রতিফলন।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীতে তাদের সংখ্যা শতকরা ১০-এর বেশি হয় নি। ছয়-দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। প্রাদেশিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠন এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিতকরণ এই দাবির অন্তর্ভুক্ত।

ছয়-দফার কর্মসূচি
Six-Point Programme

স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে ছয়-দফার ভূমিকা অনন্য ও অসাধারণ। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন 'অধিকার বিল', ফরাসী বিপ্লবের মৌল ভিত্তি যেমন 'মৌলিক অধিকার', বাংলাদেশে আন্দোলনের ভিত্তি ছিল তেমনি 'ছয়দফা'। ছয়-দফাতে পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে চাওয়া হয় নি, চাওয়া হয়েছিল বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই ছয় দফার জ্ঞান থাকা প্রত্যেকের প্রয়োজন। এই ছয় দফা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। পাকিস্তানের সরকার হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয়। কেন্দ্রীয় আইন সভার এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইউনিটগুলোর আইন সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতিনিধি হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

২। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে থাকবে কেবলমাত্র দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয় এবং তৃতীয় দফায় বর্ণিত শর্তাধীনে মুদ্রা।

৩। দেশের দুটি অংশের জন্য দুটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে দু অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। একটি আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। এই ব্যাংকগুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর এবং মূলধন পাচার বন্ধ করবে।

৪। রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং কর ধার্যের ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলোর হাতে থাকবে। দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে। সংবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারে উক্ত রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হবে। কর নীতির উপর অংগরাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা সংবিধানে থাকবে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংগরাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অংগরাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং চুক্তির ক্ষমতা সংবিধানে দেয়া হবে।

৬। কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলোকে প্যারামিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী সংগঠনের ক্ষমতা দেয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শাখায় ও কেন্দ্রীয় সার্ভিসে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের জন্য সংবিধানে বিধান থাকবে। স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল অঞ্চলগুলো, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্ধিত হারে লোক নিয়োগের মাধ্যমে যত সত্বর সম্ভব বর্তমানের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের অবসান করা হবে। প্রাথমিক সংশোধনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে করাচীতে অবস্থিত নৌবাহিনীর সদর দফতর ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণহীন এক ন্যায়নিষ্ঠ ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন ছিল অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য।

ছয়-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ এক ব্যাপক আন্দোলনের রূপরেখা অঙ্কন করে এবং এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও আসে এক বিপুল সাড়া।[১] কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল আইয়ুব সরকার নিশ্চেষ্ট রইল না। আইয়ুব খান স্বয়ং এই আন্দোলকে দমন করার জন্য 'অস্ত্রের ভাষা" প্রয়োগ করার হুমকি দেন এবং কার্যত পীড়নের সীমাহীন প্রচণ্ডতায় এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা এবং আন্দোলনের 'প্রচারক' দার্শনিক ও সংগঠক' শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বিশ্বস্ত দলবলসহ হাজারো অভিযোগের নিগড়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। এতেও খুশি না হয়ে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্রের সাজানো মামলায় দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেখ মুজিবকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। গভর্নর

১। শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, "ছয় দফা ঃ আমাদের বাঁচার দাবি" ১৯৬৬ সাল।

মোনেম খান ঔদ্ধত্যভরে ঘোষণা করেন, "শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির আলোক দেখার সুযোগ দেয়া হবে না"। মনে হয়েছিল অত্যাচারীর 'খড়গ কৃপাণ' গণশক্তিকে চিরতরে নির্মূল করবে।

ছয়-দফা পাকিস্তানীদের নিকট কেন গ্রহণযোগ্য হয় নি?

ছয়-দফা দাবি পাকিস্তানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি বিভিন্ন কারণে। **প্রথম,** কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে মুদ্রা ন্যস্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। **দ্বিতীয়,** প্রদেশের হাতে কর ধার্যের ক্ষমতা ন্যস্ত হলে কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের ভিত্তিতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তার গতি রুদ্ধ হবে। **তৃতীয়,** প্রাদেশিক সরকারের হাতে মিলিশিয়া গঠনের ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে উঠেন। **চতুর্থ,** প্রদেশের হাতে ঋণ গ্রহণ, বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ ও পরিচালনা প্রভৃতির ক্ষমতা ন্যস্ত হলে কেন্দ্রের প্রভাব ও ক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পাবে। কালক্রমে পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হবে।

ছয়-দফা আন্দোলনের গুরুত্ব
Significance of the Six Point Movement

ঐতিহাসিক ছয়-দফা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। ছয়-দফা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক স্বরূপ। তাই এই আন্দোলনের পশ্চাতে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, সরকারি কর্মকর্তা, ছাত্র-জনতার সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ছয়-দফা কর্মসূচির গুরুত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিব নিজে যা বলেছেন তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন , "ছয়-দফা কর্মসূচি বাংলার কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ এবং বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ। ছয়-দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার স্বরূপ। ছয়-দফা মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধদের সমন্বয়ে গঠিত বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশের এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি।"

ছয়-দফা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ। **প্রথম,** রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই কর্মসূচী পাকিস্তানে এক রাষ্ট্র-সমবায় (Confederal System) গঠনে প্রয়াসী ছিল। **দ্বিতীয়,** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা বাংলার সম্পদ বাঙালী নেতৃবর্গের হাতে ন্যস্ত করতে উদ্যত হয়। **তৃতীয়,** সামরিক ক্ষেত্রে এই কর্মসূচী পূর্ববাংলাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল। ছয়-দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং এরই মাধ্যমে বাংলাদেশ এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে।

ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta), ফরাসী বিপ্লবের মৌল ভিত্তি যেমন ছিল অধিকার বিল (Bill of Rights), আমেরিকার স্বাধীনতা ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার অবদান (Individual Freedom) এবং রুশ বিপ্লবের ভিত্তিতে যেমন ছিল শ্রেণীহীন সমাজের ধারণা (Classless Society) বাংলাদেশের স্বাধীনতার মৌল ভিত্তি তেমনি ছিল ছয়-দফা কর্মসূচি।

ছয়-দফা কর্মসূচি তথা ছয়-দফা আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি ছিল ভিন্ন। যখন পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের পাহাড় রচিত হচ্ছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

যখন পূর্ব বাংলা একটি উপনিবেশ তুল্য হয়ে পড়েছে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যখন পূর্ব বাংলা উৎপীড়ন ও বঞ্চনার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় তখন ছয়-দফা কর্মসূচি বাংলার প্রভাবশালী শ্রেণীগুলোকে ন্যায় বিচার ও সাম্যের আশীর্বাদ দিতে এগিয়ে আসে। এই কর্মসূচিকে ভিত্তি করেই বাঙালী জাতি স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে এবং এক রক্তের নদী সাঁতরে স্বাধীনতার রক্তগোলাপ ছিনিয়ে এনেছে।

ছাত্রদের ১১-দফা দাবি

ছয় দফার সাথে ১৯৬৯ সালের ৬ই জানুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন

১। প্রথম দফায় শিক্ষা ও শিল্প সমস্যার আশু সমাধান দাবি করে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হয় ঃ

(ক) সম্প্রতি প্রাদেশিকীকরণ কলেজগুলোকে (জগন্নাথ কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজসহ) পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া।

(খ) স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

(গ) সরকারি কলেজগুলোতে নৈশ বিভাগ চালুর ব্যবস্থা করা

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা।

(ঙ) ছাত্রাবাসগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারি সাহায্য প্রদান করা।

(চ) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ও সকল অফিসে বাংলা ভাষার প্রচলন করা।

(ছ) শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা।

(ঝ) চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।

(ঞ) বহুমুখী কারিগরি শিক্ষা এবং ছাত্রদের হ্রাসকৃত পাঠ্যক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনের সুযোগ দান করা।

(ট) অল্প ভাড়ায় ট্রেন ও বাসে ভ্রমণের সুযোগ দান করা।

(ঠ) চাকরির সুযোগের নিশ্চয়তা দান করা।

(ড) ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান করা।

(ঢ) জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও হামুদুর রহমান রিপোর্ট সমূহের পুনর্বিন্যাস করা।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

৩। স্বায়ত্তশাসনের দাবি। সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো মোটামুটিভাবে আওয়ামী লীগের ২নং দফা থেকে ৬নং দফার দাবিগুলোর অনুরূপ।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশসহ সমস্ত প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন। ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিদ্যমান থাকায় দাবিটি উত্থাপিত হয়।

৫। ব্যাংক, বীমা, ইন্‌সিউরেন্স ও পাট ব্যবসায়সহ সকল বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।

৬। কৃষকদের উপর কর ও খাজনা হ্রাস, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য প্রতি মণ ৪০ টাকা ও চাউলের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী কালা-কানুন প্রত্যাহার ও শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নতির ব্যবস্থা।

৯। নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার।

১০। সিয়াটো, সেন্টোসহ ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলকরণ এবং জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ।

১১। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সমস্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার।

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের ২নং থেকে ৬নং দফা, অঙ্গরাজ্যগুলোর অধিকার, অখণ্ডতা ও সংগঠন, সেনাদল সংগঠন, জোট নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ, অবাধ বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রা প্রচলন, বৈদেশিক মুদ্রার মালিকানা প্রভৃতি বিষয়ে যে সব কথা বলা হয়েছে, ছাত্রদের এগার দফার কাঠামো মোটামুটিভাবে সেরূপ।

এগার দফার গুরুত্ব ঃ

ঐতিহাসিক এগার দফা কর্মসূচির গুরুত্ব সীমাহীন। ছয় দফা কর্মসূচি বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলিত করেছে, কিন্তু এগার দফা কর্মসূচি বাংলার কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থ আদায়ের ম্যাগনাকার্টা। ছয় দফা কর্মসূচিতে বাংলার ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মকর্তা প্রমুখ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দাবি প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু এগার দফা কর্মসূচিতে বাংলার অবহেলিত কৃষক ও বঞ্চিত শ্রমিকদের দাবি মূর্ত হয়ে উঠে। কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন, কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিকদের উচ্চহারে মজুরি, জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ প্রভৃতিই এগার দফা কর্মসূচির মূল কথা।

ছয়-দফা ও এগার দফা-কর্মসূচি ভিত্তিক যে আন্দোলন পূর্ব বাংলায় শুরু হয় তা দুর্বার হয়ে এবং ছাত্র-জনতা কৃষক-শ্রমিকের সম্মিলিত দাবি ভিত্তিক আন্দোলন পাকিস্তানের ভিত্তি শিথিল করে দেয়। সেই আন্দোলন ১৯৬৯ সালে গণবিপ্লবের আকার ধারণ করে এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কোন উপায়ান্তর না দেখে শেখ মুজিবসহ দেশের অন্যান্য নেতৃবর্গের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ইতিহাসের অতল তলে তলিয়ে যান।

১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন
Mass Upsurge of 1969

ইতিহাসের অমোঘ বিধান দেরিতে হলেও আত্মপ্রকাশ করে ঝড়ের বেগে এবং নির্মমভাবে। যখন আইয়ুব খান তাঁর শাসন দশকের মহিমা কীর্তনের জন্য মধ্যযুগীয় জাঁক-জমকের চোখ ঝলসানো আলোর ডালা সাজিয়েছেন ঠিক তখনই—১৯৬৮ সালের শেষ ছক থেকে শুরু হলো কালবৈশাখীর তাণ্ডব নৃত্য—বংলাদেশের গণশক্তির প্রচণ্ডতম অভ্যুত্থান। তা চারিদিক ভাসিয়ে দিয়ে গেল। আইয়ুবী স্বপ্ন সাধ ধূলিসাৎ হলো। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ ঢেউ আছাড় খেলো। সারা পাকিস্তানব্যাপী গণঅভ্যুত্থান আইয়ুব শাহীর ক্ষমতা-ভিত্তি প্লাবিত করে গেল।

বাংলাদেশে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ (১) গণতন্ত্রের আদর্শ, (২) স্বায়ত্তশাসনের অলঙ্ঘনীয় দাবি; (৩) বৈষম্যের পর্বত ভাঙ্গার সংকল্প। (৪) গণ-বিরোধী অশুভ শক্তির মুল উৎপাটন এবং (৫) আমলাশাহী সামরিক চক্রের কর্তৃত্ব লোপ।

গণ অভ্যুত্থানের প্রচণ্ড বেগে দেশের শাসন ব্যবস্থা তৃণের ন্যায় উড়ে গেল। আমলাশাহী ব্যর্থ হলো। কয়েকবার সান্ধ্য আইন জারি করে দেখা গেল সামরিক কর্তৃত্ব অচল হয়েছে, কেননা এতদিনে মানুষ মরতে শিখেছে। আইন-শৃঙ্খলা নিঃশেষ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেয়ার স্বপ্ন সাধ ভেঙ্গে গেল। আইয়ুব-মোনেমের সাজানো ষড়যন্ত্রের মামলা সাধের সাজানো বাগানের মত শুকিয়ে গেল। যাকে দেশদ্রোহী বলে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাকে মুক্তি দিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেন। সর্বদলীয় নেতাদের নিয়ে দেশের এই অচলাবস্থা দূর করার পন্থা খুঁজতে লাগলেন। সেই গোলটেবিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ঃ (১) পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণপ্রতিনিধিরা দেশের সংবিধান রচনা করবেন। (২) দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তিত হবে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। (৩) দেশের শাসন ব্যবস্থা হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির, এবং (৪) পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া হবে।

এভাবে পাকিস্তানের এক কালের 'লৌহ মানব' আইয়ুবের পতন হলো। তিনি সাময়িকভাবে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে শাসনভার অর্পন করে ইতিহাসের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন। এইভাবে তাঁর পূর্বসুরী ইস্কান্দার মীর্জা হারিয়ে গিয়েছিলেন।

ইয়াহিয়া অধ্যায়
Yahya Chapter

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ রাত ৭-১৫ মিনিটে ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি করে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করে প্রধাম সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। তার পর দিন তিনি ঘোষণা করেন, সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তিনি নাগরিকদের জানমাল ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবেন এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। কয়েকদিন পর তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, "আমার রাজনৈতিক কোন উচ্চাভিলাষ নেই"। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সুষ্ঠু ও সৎ প্রশাসন ব্যবস্থা একটা পূর্বশর্ত।

১৯৬৯ সালের ৪ এপ্রিল তিনি একটি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ জারি করেন এবং ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ 'এক ব্যক্তি—এক ভোট' (one man : one vote) নীতিতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক

পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত করেন। ৫ অক্টোবর ও ২২ অক্টোবর যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলায় নজীরবিহীন বন্যা পরিস্থিতির জন্য ১৯৭০ সালের ১৫ আগষ্ট তিনি নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ঘোষণা করলেন, ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ও ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন সমাপ্ত হবে।

ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের জন্য তিনি এক **আইনগত কাঠামো** (Legal Framework) প্রদান করেন। আইনগত কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩১৩ জন। তার মধ্যে ১৬৯ জন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত হবেন এবং অবশিষ্ট হবেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩০০ জন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণীত হবে। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না করলে এবং ১২০ দিনের মধ্যে তা সমাপ্ত না হলে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হবে। বলা বাহুল্য, ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশে আবার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন
1970 Election

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অক্টোবরের বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য কয়েকটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

এর গুরুত্ব ঃ

এ নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই নির্বাচনে প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান একমাত্র ব্যক্তি যিনি পূর্ব বাংলার পক্ষে কথা বলতে পারেন। এই নির্বাচনের গুরুত্ব অন্যদিক থেকেও অনুধাবন করতে হবে। এটি ছিল দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বপ্রথম সুযোগ পেয়েছিল স্ব-শাসন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি আদায় করতে। ছয়-দফার মাধ্যমে বাংলার জনগণ চেয়েছিল নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে। তাই একে নির্বাচন না বলে বলা হয় গণভোট। এই নির্বাচনের পর বাংলার জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলার "মুকুটহীন রাজা"। মুক্তি সনদ ছয়-দফার দার্শনিক, প্রচারক ও সংগঠক হিসেবে তিনি হলেন বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা। ১৯৬৯ সালে ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেয়া হলে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) তিনি যখন ভাষণ দেন, তখন তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অন্যদিক থেকেও অনুধাবনযোগ্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে পাকিস্তানে এক বৈধতার সংকট দেখা দেয়। এই নির্বাচন

অনুষ্ঠানের পূর্বে আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু সেই আন্দোলন তেমন জোরদার হয় নি, কেননা প্রতিনিধিত্বমূলক কোন ব্যক্তি বা দল তখন স্বীকৃত হয় নি। এই নির্বাচনের পর আন্দোলনকারিগণ যে জনপ্রতিনিধি এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের পক্ষে তাদের যে কথা বলার অধিকার রয়েছে তার প্রভাব দেশে ও বিদেশে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে এই আন্দোলন কার্যত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। এ জন্য বলা যেতে পারে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রত্যক্ষ কারণ।

নির্বাচনোত্তর পর্যায়
Post Election Phase

নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এতদিনে স্পষ্টরূপে অনুধাবন করলেন, বাংলাদেশকে আর উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ, বিশেষ করে পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের শেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন ধার্য করেন। অধিবেশন বসার তারিখ ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ধার্য হয়। এই অধিবেশন ঢাকায় বসার কথা ছিল।

এদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি বলেন, 'ছয় দফার' ভিত্তিতে জনগণ রায় দিয়েছেন'। ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করা হবে'। তিনি আরও বলেন, যে কোন বিরোধী দল বা পরিষদের কোন সদস্য গঠনমূলক কোন ভাল প্রস্তাব দিলে তা তাঁর দল গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে।

পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো ঘোলা পানিতে অনেক বেশি খেলতে চান। তিনি প্রস্তাব করেন, পাকিস্তানের দু অংশের দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের অধিকার আছে। তবে একটি রাষ্ট্রে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কিভাবে হতে পারে, তা সকলের নিকট অবোধ্য রইল। ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ এ শেষবারের মত ঘটল। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন, আওয়ামী লীগের নিকট পারস্পরিক আদান-প্রদানের আশ্বাস না পেলে তাঁর দল অধিবেশনে যোগদান করবে না। তিনি আরও বললেন, "এর মধ্যে আওয়ামী লীগ সংবিধান রচনা করে ফেলেছে এবং সে সংবিধান কোথাও এক চুল পরিমাণ রদ-বদল করা চলবে না। সে সংবিধানকে মেনে নেবার জন্য যদি আমাদের ঢাকায় যেতে বলা হয় তা হলে আপনারা আমাদের ঢাকায় দেখবেন না।"

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সংবিধানের খসড়া তৈরির অধিকার আওয়ামী লীগের ছিল। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সকলকে আশ্বাস দেন যে, প্রত্যেকের গঠনমূলক প্রস্তাব মেনে নেয়া হবে। তথাপি ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বললেন, "এই অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা যোগদান করবে তাদের জীবন্ত রাখা হবে না"।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এমনটি চেয়েছিলেন। তিনি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার কারণ দেখিয়ে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সাথে কোন পরামর্শ না করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।

সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়

প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কয়েকদিন আগে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। কিছুদিন পরে তাঁর সাথে কোন পরামর্শ ব্যতীত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করেন। সকলেই এই ঘোষণায় অশুভ সংকেত ধ্বনি পেলেন। ১ মার্চের বিকাল থেকে সমস্ত জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্ররা বের হয়ে এলো শিক্ষা অঙ্গন থেকে। আইনবিদরা বের হয়ে এলেন আদালত থেকে। ব্যবসা কেন্দ্র বন্ধ হলো। নতুন দাবি উত্থিত হলো- "আর ছয় দফা নয়, এবারে এক দফা—স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করে সব ষড়যন্ত্রের অবসান করা"। বাংলার ইতিহাসে এমন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আর একবার হয়েছিল— ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে।

শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন নির্দেশ জারি করে বাংলাদেশের গণ-আন্দোলনকে সফল করে তুলতে উদ্যোগী হলেন। যে কোন কর প্রদান বন্ধেরও ঘোষণা হলো। প্রতিক্রিয়াশীল সরকার বল পূর্বক এই আন্দোলনকে দমন করার প্রচেষ্টা করেছিল এবং সান্ধ্য আইন জারি করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনিতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু মানুষ যখন একবার মরতে শিখেছে, তখন দমন নীতি আর ফলপ্রসূ হয় না।

প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্রের আর এক সূত্রে জাতীয় পার্লামেণ্টারী দলের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আমন্ত্রণ জানালেন— যেন শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর হয়। শেখ মজিবুর রহমান এবারেও দৃপ্ত কণ্ঠে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, বাঙালির রক্তে ভেজা রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে তিনি কোন সম্মেলনে যোগ দিবেন না। অবশেষে ইয়াহিয়া কোন গত্যন্তর না দেখে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন।

স্বাধীনতার আহ্বান

এ দিকে বাংলার গণ-মানস সংগ্রামী চেতনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়েছে একটি শ্লোগানে—'জয় বাংলা'। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক সভায় বঙ্গবন্ধু চার দফা দাবি পেশ করেন এবং এই চার দফা দাবি ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে আরোপ করেন। চার দফা দাবি ছিল ঃ

(১) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার।

(২) অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া।

(৩) সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণহানির তদন্ত।

(৪) জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর।

জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন দশ লক্ষাধিক জনতার সামনে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এ সংগ্রামের জন্য তিনি সকলকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, "বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল— যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়াবো—ইনশাল্লাহ"।

কয়েক দিনের মধ্যে বাংলার মাটি থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন উঠে গেল। আওয়ামী লীগের নির্দেশে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বহাল থাকে। ওদিকে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া এ আন্দোলনকে দমন করার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্রের শেষ গ্রন্থিগুলো নাড়াচাড়া করছিলেন। কিছু দিন আগে পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে পাঠিয়েছেন টিক্কা খাঁকে। বাংলার সেই বিপ্লবী পরিবেশে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করেন।

ইয়াহিয়া খান আর এক দফা শাসনতান্ত্রিক আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন ১৫ মার্চ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে তিনি আলোচনা চালিয়ে যান আট দিন। তাঁর সাথে আলোচনায় যোগ দেন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবর্গ। কিন্তু আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আন্তরিকতার সাথে আলোচনা শুরু করেন নি। তিনি বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ২৫ মার্চ যে বর্বর হামলা শুরু করার নির্দেশ দেন, তার প্রস্তুতি পর্বের জন্য শুধু চেয়েছিলেন কিছু সময়। প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে সমগ্র বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম আক্রমণ শুরু হয় ২৫ মার্চ রাত্রি ১১টা থেকে। তাই এই আলোচনাকে সাংবাদিক ম্যাসক্যারেনহাস *(Mascarenhas)* **'বিশ শতকের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্যতম প্রবঞ্চনা'** বলে আখ্যায়িত করেন।

পঁচিশে মার্চের কালরাত্রি ঃ পঁচিশে মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক তমসাচ্ছন্ন দিন। ঐদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নীরবে ঢাকা পরিত্যাগ করেন এবং মধ্য রাত্রির কিছু আগে সেনাবাহিনীকে ঘুমন্ত নর-নারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে লেলিয়া দেন। সে রাত্রিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। দেশের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র নেতাদের নির্মূল করার অভিযান শুরু হয়। একমাত্র ঢাকাতে ঐ রাত্রিতে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার নর-নারীর জীবনান্ত ঘটে। ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা
Proclamation of Independence of Bangladesh

২৫শে মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক তমসাচ্ছন্ন দিন। ঐদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন নিঃশব্দে। রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে সেনাবাহিনীকে ঘুমন্ত নর নারী ও শিশুদের হত্যা করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, দেশের নেতৃবর্গ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, যুবক হবে নির্মূল আর বাঙালি জাতি এক ক্রীতদাসের জাতিতে পরিণত হবে। একমাত্র ঢাকাতেই সে রাত্রিতে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার নর নারীর প্রাণান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে শতাব্দীর নিকৃষ্টতম গণহত্যা শুরু করে তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হবার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একটি সূত্রে জানা যায়, রাত্রি ১২ টার পরপরই অর্থাৎ ২৬ মার্চে তিনি টিএন্ডটি এবং ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেন। সেই ঘোষণায় তিনি বলেন ঃ "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিলখানায় ইপিআর ঘাঁটি এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং নগরের জনগণকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করেছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির নিকট আমি সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের সাহসী যোদ্ধারা মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে বীরদর্পে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের নিকট আমার আবেদন ও আদেশ-দেশকে স্বাধীন করার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে যুদ্ধ করার জন্যে পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারের সাহায্য চান। কোন আপোষ নেই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে দৃঢ়সংকল্প হোন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, সকল দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আমাদের সহায়ক হোন জয় বাংলা"।[১]

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণার সেই বার্তাটি ২৫ মার্চের রাত্রিতেই চট্টগ্রাম ওয়্যারলেস জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট পৌঁছে দেয়। তিনি এবং চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এম. এ. হান্নান সেই রাত্রিতেই বঙ্গবন্ধুর সেই বার্তা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন বলেও জানা যায়।

---

১. যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ মুজিবনগরে মিলিত হয়ে যে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সনদ রচনা করেন সেখানেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার অনুমোদন দান করেন, ('Declare and constitute Bangladesh to be a sovereign people's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman.')[২] স্বাধীনতার সনদে ঘোষণা করা হয়েছে, বন্দী হবার পূর্বে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করে সশস্ত্র প্রতিরোধের নির্দেশ জারি করেন।

২০০৯ সালের ২১ জুনে বিচারপতি খায়রুল হক এবং বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমদের সমন্বয়ে সংগঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রায়ে ঘোষণা করেছেন যে, "বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষক"।[৩] আপীল বিভাগ তা অনুমোদন করে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে চট্টগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান সদলবলে বিদ্রোহ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। ২৭ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে। সে কালরাত্রির পর থেকে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন। সার্থকতা আসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এ সংগ্রামে বন্ধু রাষ্ট্র ভারত যে সাহায্য করেছে তা অতুলনীয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর নিকট পাক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এভাবে রক্তের এক নদী সাঁতার দিয়ে বাঙালি জাতি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। জন্ম হয় স্বাধীনতার পুণ্যক্ষেত্র সার্বভৌম বাংলাদেশের।

স্বাধীনতার সনদ

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ নিজেদের এক গণপরিষদে রূপান্তরিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ রচনা করেন। পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের সাম্য। **মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার** নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা দেন। এই হল ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সনদ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে তা কার্যকর বলে পরিগণিত হয়।

"যেহেতু একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর হতে শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং যেহেতু এসব নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনেই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেছে, এবং

যেহেতু জেনারেল, ইয়াহিয়া খাঁ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভা ডেকেছিলেন এবং

যেহেতু এভাবে আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বৈরাচারী পন্থায় ও অবৈধভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী রাখা হয়েছে, এবং

যেহেতু নিজেদের ওয়াদা পূরণের পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা অব্যাহত থাকা কালে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ এক অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, এবং

যেহেতু এহেন বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণজনিত বাস্তবতা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের বৈধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যথাযথভাবে পূরণের জন্য বাংলাদেশের সাতকোটি জনতার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় বাংলাদেশের সংহতি ও স্বাধীনতার যথাযথ ঘোষণা প্রদান করেছেন, এবং

---

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা : ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৯১

৩. ইত্তেফাক (ঢাকা ২১ জুন) ২০০৯

যেহেতু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর তথা অন্যান্যের উপর নির্মম ও বর্বরোচিত যুদ্ধের আঘাত হেনেছে এবং এখনও তুলনাবিহীন নির্যাতন আর ব্যাপক গণহত্যা অব্যাহত রেখেছে, এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার এক অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে, নির্বিকার গণহত্যা সংঘটিত করে, অন্যান্য নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে পরিষদে মিলিত হওয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা এবং জনগণকে তাদেরই এক সরকার প্রদান করা অসম্ভব করে তুলেছে, এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, শৌর্যবীর্য ও বিপ্লবী চেতনার দ্বারা বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে—সেহেতু জনগণের ইচ্ছাকেই সর্বাগ্রগণ্য জানিয়ে এবং বাংলাদেশের জনগণ আমাদের যে যে ম্যাণ্ডেট প্রদান করেছে তা পালনে বাধ্য বিধায়, আমরা বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের একটি গণপরিষদ রূপে পরিগণিত করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের **সাম্য, মানবিক মর্যাদা** ও **সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার** নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি"।

অস্থায়ী সরকার গঠন

স্বাধীনতা সনদে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাষ্ট্রপ্রধানের হস্তে ন্যস্ত হয় সশস্ত্র বাহিনীর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণসহ বাংলাদেশ গণ প্রজাতন্ত্রের সমগ্র আইনগত নির্বাহী ক্ষমতা। কিন্তু শেখ মুজিব তখন পাকিস্তানের বন্দীশালায় দিন যাপন করছেন।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও মুক্তি সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী সরকার সংগঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় ছিল মুজিব নগরে। মুজিব নগর বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর শহরের অদূরে। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা মুজিব নগর থেকে পরিচালিত হয়। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানরূপে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভার প্রধান ছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ। এই মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম. কামরুজ্জামান। স্বাধীন দেশের শাসন ব্যবস্থায় এই অস্থায়ী সরকারের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এই সরকারের সাথে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত স্থায়ী কর্মকর্তাবৃন্দ। নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের অধিকাংশ এই সরকারের শক্তির উৎস রূপে কাজ করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে সরকারি কার্যালয় মুজিব নগর থেকে মুক্ত ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় ২২ ডিসেম্বর।

স্বাধীনতা সংগ্রাম
Liberation War

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তুলনা ইতিহাসে বিরল। সুসংগঠিত পাকবাহিনীর সাথে অসম সংগ্রামে বাংলার দামাল ছেলেরা শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্য পুষ্ট হয়ে বাংলাদেশকে পশু শক্তির কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই নয় মাসে বাংলাদেশে হাজারো ধারায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মদান করেছেন অন্যান্য ত্রিশ লক্ষ নর-নারী, সম্ভ্রম হারিয়েছেন অন্যূন পঞ্চাশ হাজার মহীয়সী মাতা ও ভগ্নী, গৃহহারা হয়েছেন অন্ততপক্ষে এক কোটি বাঙালি এবং ছিন্নমূল ও

সর্বহারা হয়েছেন অসংখ্য মানব সন্তান। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সূর্য উদিত হয়েছে তাদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে। এই সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ—**(এক)** রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও **(দুই)** অর্থনৈতিক মুক্তি।

মুজিবনগরের অস্থায়ী সরকার মুক্তি সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এই সংগ্রামী অধ্যায়ে অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। **প্রথম,** এ সরকার হাজারো স্থানে যুব শক্তিকে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই প্রসঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়। বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, ই.পি. আর এবং পুলিশ বাহিনীর দক্ষ প্রশিক্ষণ দানকারীদের নিয়োগ করে দেশের যুবকদের অস্ত্রশিক্ষা দান করতে থাকে। **দ্বিতীয়,** দেশের বিভিন্ন অংশে গেরিলা বাহিনী সংগঠন করে ও তাদের কর্ম প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করে জনগণকে সংগ্রামমুখী করে তোলে। **তৃতীয়,** মন্ত্রিসভার সদস্যগণ বিভিন্ন মুক্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করে জাতিকে প্রাণবন্ত করে রাখেন এবং সীমাহীন সাহস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। **চতুর্থ,** স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার প্রতিষ্ঠা করে দেশের সর্বত্র মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য প্রচার করে দেশে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করেন জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল প্রধানত দুই ধরনের ঃ **(এক)** সামরিক নেতৃত্ব, ও **(দুই)** রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বাংলাদেশের প্রবাসী (Government-in-Exile) সরকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করে এবং মুক্তি বাহিনী সামরিক নেতৃত্ব দান করে। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। দক্ষ মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমগ্র দেশকে চারজন দক্ষ সৈনিকের নেতৃত্বে চারটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় ঃ

(ক) চট্টগ্রাম সেক্টর —মেজর জিয়া (পরে রাষ্ট্রপতি)।

(খ) কুমিল্লা সেক্টর—মেজর খালেদ মোশাররফ।

(গ) সিলেট সেক্টর—মেজর সফিউল্লাহ।

(ঘ) কুষ্টিয়া সেক্টর— মেজর ওসমান চৌধুরী।

১৯৭১ সালের ১১—১৭ জুলাই তারিখে সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত কর্মকর্তাদের এক অধিবেশনে মেজর জেনারেল আব্দুর রব এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে খন্দকারকে মুক্তি বাহিনীর স্টাফ প্রধান ও সহকারী স্টাফ প্রধানের পদে নিয়োগ দান করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি সেক্টরকে কতকগুলো উপ-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এই অধিবেশনে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জেড. ফোর্স (Z-Force), এস. ফোর্স (S-Force) এবং কে-ফোর্স (K-Force) নামে তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হবে। এই তিন ব্রিগেডের প্রধান ছিলেন যথাক্রমে লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান, লেঃ কর্নেল সফিউল্লাহ এবং লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফ।

এগারটি সেক্টর ও সেক্টর প্রধান

১। চট্টগ্রাম—১৯৭১-এর জুন পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমান। পরে রফিকুল ইসলাম।

২। নোয়াখালি ও কুমিল্লার অংশ—১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেজর খালেদ মোশাররফ। পরে মেজর এ. টি. এম. হায়দার।

৩। কুমিল্লা ও সিলেটের অংশ ১৯৭১-এর মে পর্যন্ত মেজর সফিউল্লা। পর মেজর এ. এন. এম. নুরুজ্জামান।

৪। সিলেটের পূর্ব প্রান্ত—মেজর সি. আর. দত্ত।

৫। সিলেটের পশ্চিম প্রান্ত—মেজর মীর শওকত আলী।

৬। রংপুর ও দিনাজপুর—উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার।

৭। রাজশাহী, পাবনা , বগুড়া—মেজর কাজী নুরুজ্জামান।

৮। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের অংশ— মেজর ওসমান চৌধুরী।

৯। খুলনার দক্ষিণাংশ, বরিশাল, পটুয়াখালি— মেজর এম. এ. জলিল।

১০। উপকূল ভাগ ও অভ্যন্তরীণ জল পথ—।

১১। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল — মেজর আবু তাহের।

মুক্তিযুদ্ধের কৌশল হিসেবে তিনটি নীতি গৃহীত হয়। **প্রথম,** গেরিলা পদ্ধতি। এই উদ্দেশ্যে এক বিরাট গেরিলা বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। **দ্বিতীয়,** নিয়মিত বাহিনী গঠন। নিয়মিত বাহিনী গঠন করে গেরিলা যুদ্ধের বিস্তৃতি ছিল এর লক্ষ্য। **তৃতীয়,** শেষ পর্যায়ে সম্মুখ সমর।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ শিবিরে আনুমানিক দেড় লক্ষ (কারো মতে তা দুই লক্ষেরও অধিক) বাঙালি যুবক-যুবতী অস্ত্রশিক্ষা লাভ করে এবং বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে অতর্কিতে আক্রমণ পরিচালনা করে তারা পাক বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তাছাড়া, সম্মুখ সমরে সাধারণত অবতীর্ণ না হয়ে অতর্কিত গেরিলা পন্থা অবলম্বন করে পাক-বাহিনীর চলাফেরা একরূপ অসম্ভব করে তোলে। রাস্তা-ঘাট ধ্বংস করে, সেতু বিনষ্ট করে, রেলপথ অচল করে তারা পাক-বাহিনীর ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বেই টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুরের বেশ কিছু অংশ মুক্তি বাহিনীর দ্বারা মুক্ত হয়।

এই মুক্তি সংগ্রামের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল,—বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় কর্মসূচী নির্বিশেষে সম্মিলিত হয় এবং অস্থায়ী সরকারের সাথে একাত্মতা স্থাপন করে। কম্যুনিস্ট পার্টির বিভিন্ন উপদল, জাতীয় আওয়ামী পার্টির দুই অংশ এবং দেশের প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন এতে আত্মনিয়োগ করে। তবে কায়েমী স্বার্থপুষ্ট সম্প্রদায়ভিত্তিক কিছু ব্যক্তি এই মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নি বরং বিভিন্নভাবে হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমন্বিত করার জন্য ১৯৭১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর একটি পরামর্শদানকারী কমিটি (Consultative Committee) গঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হলেও এই কমিটি প্রবাসী সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দান করত। এই কমিটির সদস্য ছিলেন—মওলানা ভাসানী, মনিসিংহ, মোজাফফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন তাজুদ্দিন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদ।

এই পরামর্শদান কমিটি যুদ্ধ পরিচালনায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন দান ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ

(এক) মস্কো ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সমর্থন আদায়ের উদ্যোগ।

(দুই) স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সংগ্রহ করা।

(তিন) বিভিন্ন দলের মধ্যে স্বাধীনতা চেতনার বিস্তৃতি ঘটানো।

এই পরামর্শদানকারী কমিটি ছাড়াও পিকিংপন্থী দলগুলোও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রধান ছিলেন মওলানা ভাসানী এবং দলগুলো ছিল ঃ বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি (দেবেন-বাসার), পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী) এবং অমল সেনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট সংহতি।

তাছাড়াও, দেশের অভ্যন্তরে থেকে কয়েকটি রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এই দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি, মতিন-আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি, সিরাজ সিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি।

অস্থায়ী সরকার জাতির সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতার সংগ্রামকে সংহত করতে সচেষ্ট হয়। এই সংগ্রাম শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, এ সংগ্রাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত সংগ্রহ ও বিশ্বমতকে

বাংলাদেশের ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতি সচেতন হতেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। অস্থায়ী সরকার বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে, এমন কি জাতিসংঘে প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা, ভারত ও অন্যান্য দেশে প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলাদেশের লক্ষ্য ও ন্যায়পরায়ণতার বাণী সর্বত্র প্রচার করতে থাকে। ফলে দেখা যায়, কিছু দিনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্র পাকিস্তানের বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। বিশ্বের নামকরা অধিকাংশ সাংবাদিক ও সংবাদপত্র বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে **"ন্যায়ের সংগ্রাম"** বলে আখ্যায়িত করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র অকৃপণভাব সাহায্য করে। সাহায্যকারী দেশগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ভারত। ভারত মুক্তি সংগ্রামীদের অস্ত্র দ্বারা, প্রশিক্ষণ দ্বারা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সার্থক হতে সাহায্য করেছে। এবং তা ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর উদার সহায়তা উল্লেখযোগ্য। পূর্ব জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র অকৃপণভাবে সাহায্য করেছে। বৃটেন ও ফ্রান্স প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করলেও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য সকলেই পেশ করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে মাত্র চীন, ও আমেরিকা ব্যতীত সকলে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছিল। আমেরিকা সরকার মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করলেও সেখানকার জনমত ও সংবাদপত্রসমূহ বাংলার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা ও ভূটানের অবদানও উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ

১৯৭১ সালের জুলাই মাস থেকে মুক্তি সংগ্রামীরা তাদের আক্রমণ জোরদার করতে থাকে এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এ সময় তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের উর্ধ্বে উঠেছিল। পাক-বাহিনী মোটামুটিভাবে শহরাঞ্চলে প্রভাব রক্ষা করলেও গ্রামাঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব ছিল না বললেই চলে। সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে শহরাঞ্চলেও মুক্তি সংগ্রামীরা ত্বড়িৎ আক্রমণ পরিচালনা করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন প্রভৃতি ছিন্ন-ভিন্ন করতে থাকে। এতে পাক-বাহিনী সুসংহত হবার সুযোগ পায় নি।

ভারতের উপর দিয়ে বিমান পথ বন্ধ হওয়ায় পাকিস্তান থেকে রসদ ও নতুনভাবে সংখ্যাবৃদ্ধিতেও অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। যুদ্ধের জন্য তখন পাকিস্তানের বাহিনী প্রতি দিন প্রায় এক কোটি টাকার মত ব্যয় করছিল। এই দিকে পাক-বাহিনী ক্রমে ক্রমে মুক্তি বাহিনীর নিকট বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত, বিশেষ করে অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত হচ্ছিল এবং পাক-বাহিনীতে মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পাক-বাহিনীর অন্যূন ৪,৫০০ সৈনিক মুক্তি বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করে।

অন্য দিকে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট (U Thant) পর্যন্ত পাকিস্তানের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন। বিশ্বজনমত পাকিস্তানের বর্বরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

এমনি অবস্থায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে মুক্তি-বাহিনীর আক্রমণে বিব্রত পাক বাহিনী আন্তর্জাতিক অবস্থার অনিশ্চয়তায় ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিম অংশে আক্রমণ পরিচালনা করে এবং অতর্কিতে কয়েকটি ভারতীয় বিমান ক্ষেত্রে আক্রমণ রচনা করে। পাকিস্তান আশা করেছিল যুদ্ধ শুরু হলে জাতিসংঘ অথবা চীন, আমেরিকার প্রভাবে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী পাক-ভারত সমস্যায় হস্তক্ষেপ করবে এবং পাকিস্তানের মুখ রক্ষা পাবে।

কিন্তু তা হলো না। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের ঔদাসীন্যে পাকিস্তানের শেষ রক্ষা হলো না। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় চারিদিক থেকে আক্রমণ রচনা করে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়। অবশ্য ময়মনসিংহের জামালপুর, দিনাজপুরের

হিলি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়ায় কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হানাদার বাহিনী কি করতে পারে?

অবশেষে যা হবার তাই হলো। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজী ঢাকায় শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে সদলবলে আত্মসমর্পণ করে ভারতীয় ও মুক্তি বাহিনীর যৌথ কমাণ্ডের নিকট। প্রায় নব্বই হাজার সৈনিকসহ তিনি বন্দী হলেন।

মুক্ত বাংলাদেশ
Independent Bangladesh

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণে বাংলা হলো স্বাধীন, লক্ষ শহীদের রক্তে সিক্ত স্বাধীনতার তীর্থ স্থান। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দান করে। ক্রমে ক্রমে তা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের নিকট থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তার স্ফুরণ হয়েছিল বহু পূর্বেই, কিন্তু তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ হলো ১৬ ডিসেম্বর। তাই এই দিন বাঙালি জাতির নিকট **'বিজয় দিবস'**।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা
Role of the Awami League in the Liberation War

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের চেতনা বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (Founder-President) ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সর্ব প্রথম এটি প্রাদেশিক দল হিসেবে জন্ম লাভ করে এবং পরে পাকিস্তানের সর্বত্র প্রসারিত হয়। পাকিস্তান পর্যায়ে আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। প্রতিষ্ঠার সময় আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান এবং আবুল মনসুর আহমদ। সামসুল হক ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান, রফিকুল আহসান ও খন্দকার মোশতাক ছিলেন দলের যুগ্ম সম্পাদক।

প্রথমে মুসলিম লীগের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বের বিরোধিতা করাই ছিল আওয়ামী লীগের প্রধান লক্ষ্য। আদর্শগত দিক থেকে এই দল ধর্মনিরপেক্ষও ছিল না। তাই এর নামকরণ করা হয় প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ (The Awami Muslim League)। আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতৃবর্গের দাবিতে 'মুসলিম" শব্দটি তুলে দেয়া হয় ১৯৫৫ সালের ২৩ অক্টোবর।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হলে দলীয় কার্যক্রম বেআইনী ঘোষিত হয় এবং তার পর আওয়ামী লীগের দলীয় নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর পূর্বে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সরকার গঠন করে এবং পাকিস্তানব্যাপী তার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। আইয়ুব আমলে দলীয় ব্যবস্থার পুনরায় অভ্যুদয় ঘটলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পুনর্জন্ম ঘটে।

আওয়ামী লীগ মূলত একটি জাতীয়তাবাদী দল। ১৯৬০-এর দশকে আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে আওয়ামী লীগের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাঙালিদের স্বার্থ আদায়। ১৯৫৬ সালের সংবিধান যখন গৃহীত হয় তখন আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন প্রবর্তিত হলে আওয়ামী লীগের বহুসংখ্যক নেতা কারারুদ্ধ হন। ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তিত হলে এবং দেশের দলীয় রাজনীতি নতুনভাবে শুরু হলে আওয়ামী লীগ নতুনভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে। ৬

আওয়ামী লীগের ছয়-দফা দাবি

ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের ছয়-দফা এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বিখ্যাত ছয়-দফা কর্মসূচী (Six-Point Programme) উত্থাপন করেন। ছয়-দফা দাবির মূল বক্তব্য ছিল প্রধানত তিনটি ঃ **(এক)** পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা। **(দুই)** পূর্ব বাংলার সম্পদ এবং তার যথাযথ ব্যবহারের কর্তৃত্ব পূর্ব বাংলার গণ প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত করা। **(তিন)** সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

এই ছয়-দফা দাবি পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন শ্রেণী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। উঠতি পুঁজিপতি ও ব্যবসায়িবৃন্দ ছয়-দফায় নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান লাভ করে। উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এই কর্মসূচীতে সীমাহীন সুযোগের স্বপ্নে বিভোর হন। শ্রমিক এবং কৃষকেরাও বিরাট পরিবর্তন তথা এই পরিবর্তনে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের শুভ সূচনা মনে করেন।

আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের ভীতির সঞ্চার করে। এর কারণ ছিল প্রধানত তিনটি ঃ **(এক)** এই কর্মসূচীতে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্র সমবায় (confederation) গঠনের সম্ভাবনায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবর্গ আতঙ্কিত হয়ে উঠে। **(দুই)** কর ধার্য, বৈদেশিক বণিজ্য ও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা ছয়-দফায় প্রদেশের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে যেভাবে এতদিন ব্যবহার করেছে তার সমাপ্তির আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠে। **(তিন)** প্রদেশের হাতে সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতায় কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক বাহিনীর আধিপত্য হ্রাসের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে।

ফলে ছয়-দফা কর্মসূচী ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী উৎপীড়নের সকল পন্থা অনুসরণ করে শেষ পর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় (Agartala Conspiracy Case) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু ইতিহাসের পথ নির্দেশ ভিন্ন। তাই ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে ছয়-দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ দখল করে। এভাবে ছয়-দফার ভিত্তিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ (Bengali Nationalism) ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠে।

মুক্তি সংগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার (government-in-exile) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় এবং এই সরকারকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী সকল রাষ্ট্র বৈধ সরকার বলে স্বীকার করে। ভারত আওয়ামী লীগের সরকারের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যাবলীর প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতা দান করে।

আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগিতাকারী মস্কোপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ও আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং পরামর্শদানকারী সংস্থার (Consultative Committee) মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। তবে চীন পন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা স্বাধীনতা সংগ্রামে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (B.C.P.) পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি—দেবেন বাশার, পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি লেনিনবাদী, মার্কসবাদী এবং কম্যুনিস্ট সংহতি কেন্দ্র (অমল সেন) একটি মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় কমিটি (Co-ordination Committee) গঠন করে মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কিছু সংখ্যক চীন পন্থী দল দেশের অভ্যন্তরে থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-চেতনা বিকাশে এবং মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক। প্রধানত এই দলের নেতৃত্বে বাংলার জনগণ ছয়-দফা কর্মসূচী, গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম লাভে সহায়তা করেছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Bangalee Nationalism

'এক জাতি—এক রাষ্ট্র'—এই নীতি উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে রাজনীতি ক্ষেত্রে জীবন্ত সত্যে রূপ লাভ করতে থাকে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে বহু রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছে। বিখ্যাত দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল এই নীতির অন্যতম উদ্যোক্তা। কালক্রমে তা অলঙ্ঘনীয় এক সত্যে রূপান্তরিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন 'এক জাতি—এক রাষ্ট্র'—নীতির সমর্থনে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, **'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার শুধুমাত্র কথা নয়, এটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য এক নীতি। রাষ্ট্রনায়কগণ তা উপেক্ষা করলে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে'**। এই নীতির ভিত্তিতে ইউরোপে বহু রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে জাতীয়তার ভিত্তিতে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশও জন্মগ্রহণ করেছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সংহতিবোধ ও মিলনের অসীম আনন্দ। ফরাসী পণ্ডিত রেনান *(Renan)* বলেছেন, "জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক সত্তা—এক প্রকার সজীব মানসিকতা'। ভূ-খণ্ডের চারিসীমা, কূল, ধর্ম, এমন কি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যেও এর মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবে তাদের প্রত্যেকটি উপাদান পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মনকে মিলনের জন্য প্রস্তুত রেখে জাতীয়তাবাদ গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু সংহতিবোধই এর প্রাণ স্বরূপ।

বাংলাদেশে জাতীয়তার বাহ্যিক উপাদানগুলোও বর্তমান। যে সকল উপাদান জাতীয়তা গঠনে সাহায্য করে বাংলাদেশে তাদের অধিকাংশই বর্তমান। বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক থেকে সুসংলগ্ন। এখানকার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে কুলগত ঐক্যও বিদ্যমান। সম-ঐতিহ্য ও ভাবগত ঐক্যের দৃঢ় বন্ধনেও বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ। একই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে এবং একই অর্থনীতিতে জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করে এই দেশের গণমন এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ১০০ জনই বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করে এবং ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত। এখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অভিন্ন এবং সংগ্রামের রক্তঝরা দিনগুলোতে প্রত্যেকটি বাঙালি অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্য-কাহিনী থেকে। এখানকার জীবনবোধ এবং জীবন যাত্রাও অভিন্ন এবং তাই যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাঙালি সব সময়ই উদার মনোভাবের অধিকারী। তাই প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের মানসিকতা ধর্মনিরপেক্ষ। প্রমত্ত নদী-উপনদী বিধৌত পলিমাটি দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের অধিবাসীরা আবেগ প্রবণ এবং স্বভাব কবি। তাই প্রত্যেকের নিকট স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য এত প্রিয়। ভৌগোলিক দিক থেকেও বাঙালি জাতি স্বতন্ত্র। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ কোন কিছুর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নয়। এটি হলো বাঙালির অধ্যাত্ম সত্তা। বাঙালির অধ্যাত্ম সত্তা দুই ধারায় পরিপুষ্ট হয়েছে—একটি প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ এবং অন্যটি পরস্পর একত্রে বাস করার সম্মতি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এমন এক সময় এসেছিল, যখন তাদের এই সত্তা বিলুপ্ত হতে বসেছিল। কিন্তু পাকিস্তানী নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্র এবং বিমাতাসুলভ কার্যক্রম বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সঞ্জীবিত করেছে প্রতি বাঁকে বাঁকে।

কেউ কেউ বলেন, বাংলাদেশের উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃশাসন এবং উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়ারূপে। এই ধারণা ভ্রান্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপীড়ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চনা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অভাব এবং ইসলামের নামে পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশে রূপান্তরিত করা বাংলাদেশের জন্মক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের জন্ম নিহিত রয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদে। এই জাতীয়তাবাদ প্রাণ পেয়েছে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ও জাতীয় সংকটের মধ্য দিয়ে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সর্বপ্রথম বাঙালিদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবিত হয়। তারা যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে স্বতন্ত্র এই শিক্ষা বাঙালিরা লাভ করে ভাষা আন্দোলনে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সর্বপ্রথম তাদের রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ হয়। এই শক্তি ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা আন্দোলনে আত্মবিশ্বাস লাভ করে এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে তা দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার দৃঢ় প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় চেতনা দুকূল ছাপিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠে।

অধ্যাপক লাস্কির কথাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, জাতীয়তার ভাব সাধারণভাবে মানসিকতার ব্যাপার। এক একটি মানুষ সুখে-দুঃখে একে অপরকে সাহায্য করে এবং সহজাত অনুভূতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক জাতীয়তার সৃষ্টি করে"। বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই সত্য পরম সত্য। প্রত্যেকে সমভাবে অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, এক সাথে সংগ্রাম করে, লক্ষ্য অর্জনের পরম আনন্দ উপভোগ করে এবং সর্বোপরি একই সুরে চিন্তা করে, নেতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, বাংলাদেশের সজীব এক জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। তাই যে সময়ে বাঙালির স্বার্থ কণ্টকিত হবার উপক্রম হয়েছে, যে সময়ে তাদের উপর আঘাত উদ্যত হয়েছে, সেই সময়ে সবাই দাঁড়িয়েছে এক কাতারে। ১৯৫২ সালের আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের জাতীয় আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, বিশেষ করে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রাম এই অনুভূতি ও মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের স্বরূপ সম্পর্কে অবশ্য একটি বিতর্ক চলছে এ দেশে। এই বিতর্কের মূলে রয়েছে জাতীয়তার একাধিক মাত্রার প্রভাব। বর্তমানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সমর্থন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। অপর পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ বেশ কয়েকটি দল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থক।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের মতে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। জন্ম ক্ষনে এর শ্লোগানে ছিল 'জয় বাংলা'। ভাষা-বর্ণমালা-সঙ্গীত নিয়ে এ দেশে যে সব আন্দোলন হয়েছে সকল বাঙালি তাতে অংশ গ্রহণ করেছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সকলে বাঙালি। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি হয়েই সবাই অংশ গ্রহণ করেন এবং বিজয়ের গৌরবে সবাই হলো অংশীদার। স্বাধীন বাংলাদেশে যখন সংবিধান রচিত হলো তখনও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাতীয় জীবনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

অনেকে আবার বলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা সঠিক নয়। জাতীয়তার রয়েছে দু'টি মাত্রা- একটি নৃতাত্ত্বিক এবং অপরটি রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক। জাতীয়তার এই নিরিখে বাংলাদেশের জনসমষ্টির সকলে বাঙালি নয়। বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও রয়েছেন অন্তত পক্ষে ৫৭টি স্বতন্ত্র নরগোষ্ঠির (ethnic)

বা জাতিসত্তার ব্যক্তিবর্গ। তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র জীবন প্রণালী, ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, এমন কি দৈহিক গড়নও। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাঁওতাল, হাজং বা গারো জনগণ বাঙালি নয়। তেমনি স্বতন্ত্র দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চাকমা, মারমা এবং মুরং জনগোষ্ঠি। তাছাড়া, বাংলাদেশের বাইরেও রয়েছেন কয়েক কোটি বাঙালি যারা ভারতের নাগরিক এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাই 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালি জাতির ধারণা সঠিক নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা টেকনিক্যালি ভুল এবং রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিকভাবে অসংগত।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা ভাষা ও সংস্কৃতিকে জাতীয়তার মুখ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তরা ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়াও ভূখণ্ড, রাজনৈতিক আকাঙ্খা, রাষ্ট্রিক প্রতিবেশ, নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি, জাতিসত্তা এবং ধর্মীয় চেতনার উপরও গুরুত্ব দেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাগণ দুটি স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে চান।

(এক) 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট' জনসমষ্টি হলো বাঙালি।

(দুই) বাঙালি জনসমষ্টির ঐক্যবোধ এবং সচেতনার ফল হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

এই স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হলে বাংলাদেশের যে সকল জনগোষ্ঠি নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিসত্তার নিরিখে বাঙালি নয় তাদের স্থান কোথায় ? তারা নিজেরাও বাঙালি বলে পরিচয় দেয় না। তারা তাহলে কে ? বাঙালি জাতীয়তাবাদে তাদের কোন স্থান নেই। এ জন্য কি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অ-উপজাতীয় বলা হলো? মানবেন্দ্র নারায়ণ চাকমা জাতীয় সংসদে ১৯৭২ সালে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের বাঙালি হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। লারমা বলেছিলেন। "আমি একজন চাকমা। একজন মারমা একজন চাকমা হতে পারে না। একজন চাকমাও একজন বাঙালি হতে পারে না। আমি বাঙালি নই। আমি বাংলাদেশের নাগরিক। আমি বাংলাদেশী।" বাঙালি প্রবক্তাদের মুখে তখন কোন কথা আসে নি।

এই বিতর্কের সমাধান এ ভাবে হতে পারে। জাতীয়তার রয়েছে বিভিন্ন মাত্রা। তা স্বীকার করতে হবে। এই নিরিখে বলা যায়, বাংলাদেশের জনগণ জাতিসত্তা ও নৃতাত্ত্বিক মানদণ্ডে কেউ বাঙালি, কেউ চাকমা, কেউ সাঁওতাল বা গারো, কিন্তু রাষ্ট্রিক মানদণ্ডে সকলেই বাংলাদেশী। বিভিন্ন জাতিসত্তা ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভারতের জনগণ যেমন ভারতীয়, আমেরিকার জনগণ যেমন আমেরিকান, বাংলাদেশের জনগনও তেমনি বাংলাদেশী।

১। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a brief outline of the historical and political background of Bangladesh.)

২। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Briefly discuss the growth of Bengali Nationalism.)

৩। "বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র"— এই উক্তির সার্থকতা বর্ণনা কর। (Justify the statement—Bangladesh is a Nation state.)

৪। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কী জান? (What do you know about the Language Movement in Bangladesh?)

৫। পাকিস্তান আমলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যমান বৈষম্যের বিবরণ দাও। (Describe the extent of disparity between West Pakistan and East Pakistan during Pak regime.)
[D.U. 1984]

৬। ঐতিহাসিক ছয়-দফা সম্পর্কে কী জান? (What do you know about the historical Six-Point Programme?) [D.U. 1981]

৭। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব কী? কীভাবে তা বাংলার মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে? (What is the significance of the election of 1970? How did it pave the way for Liberation War?) [D. U. '81]

৮। স্বাধীনতা সনদ সম্পর্কে কী জান? (What do you know about the Charter of Independence?)

৯। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ভূমিকার বিবরণ দাও। (Describe the role of the Provisional Government of Bangladesh in the War of Independence.)

১০। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কী জান? (What do you know about the characteristics of Bengali Nationalism?)

১১। আওয়ামী লীগের ছয়-দফা দাবির প্রত্যক্ষ ও আনুষংগিক কারণ কী? আওয়ামী লীগের ছয়-দফা ও তৎসহ পাশাপাশি ছাত্রদের ১১ দফার উল্লেখ কর। দেখাও যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফা ছাত্রদের ১১-দফা দাবির অন্তর্ভুক্ত। (What are the immediate and related causes of the formulation of Awami League's Six-Point? Write down Awami League's Six-Point and 11-point of the student Community side by side. Show that the 11-point Programme includes the Six-Point also.)

১২। এগার দফা আন্দোলন সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the Eleven-Point Movement?)

১৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। (Write a brief essay on the Liberation War in Bangladesh.) [D.U. 1984]

১৪। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা কর এবং এর সুদূর প্রসারী প্রভাব আলোচনা কর। (Discuss the results of the Elections of 1954 and discuss its far reaching consequences.) [N.U. 1996.]

১৫। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে আওয়ামী লীগের ছয়-দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (Explain the importance of Six-Point Movement of Awami League in the evolution of Bengali Nationalism.) [N.U. 1996]

১৬। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (Discuss the results and importance of 1970 Elections.) [N.U. 1997]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

৮

THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

সূচনা
Introduction

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি নবীন রাষ্ট্র। রক্তসিক্ত পথে বাঙালি জাতি পৌঁছেছে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে। স্বাধীনতার জন্য এই জাতির ত্রিশ লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে পড়েছে। তাই এর প্রতি বাঁকে জমেছে রক্তের অসংখ্য স্রোতধারা। বাংলাদেশের এমন একটি পরিবার নেই, স্বাধীনতা সংগ্রামে যার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই। তাই বাংলাদেশ স্বাধীনতার তীর্থক্ষেত্র। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাঙালি জাতি আবার প্রমাণ করেছে যে, তারা সংগ্রামে যেমন নির্ভীক ও অচঞ্চল, মননশীলতা ও সৃষ্টিধর্মী কাজেও তেমনি দক্ষ এবং অসাধারণ। মাত্র দশ মাসের মধ্যে সীমাহীন প্রতিবন্ধকতা ও দুরবস্থার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা সমাপ্ত হয়েছে। এটি এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ইতিহাসের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করে তারা প্রমাণ করল যে, এ জাতি মরতে শিখে বাঁচার মন্ত্র আবিষ্কার করেছে। আড়াই দশকেও পাকিস্তান জাতীয়তার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু মাত্র দশমাসে বাংলাদেশ হয়েছে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র, আর বাঙালিরা হয়েছে জাতীয়তার স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ (Within the last 24 years Pakistan remained an administered state, but Bangladesh became a state and a nation within only 10 months.)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের একটি স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দুর্বিনীত ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যে অন্যায় ও অবৈধ যুদ্ধ শান্তিপ্রিয় বাঙালি জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছিল তারই ফলশ্রুতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই অন্যায়, অবৈধ ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর হতে শুরু করে ৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশের অবাধ নির্বাচনে নিবাচিত প্রতিনিধিবর্গ ১০ই এপ্রিল মুজিব নগরে মিলিত হয়ে নিজেদের একটি গণপরিষদে পরিণত করেন এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে **বাংলাদেশের জনগণের জন্য বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করেন। এই হলো ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সনদ।** ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে তা কার্যকর বলে পরিগণিত হয়।

শাসন পরিষদ

স্বাধীনতা সনদে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।** রাষ্ট্রপ্রধানের হস্তে ন্যস্ত হয় সশস্ত্র বাহিনীর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণসহ বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা। উপ-রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মনোনীত হন সৈয়দ **নজরুল ইসলাম।** শেখ মুজিব তখন পাক-হানাদারদের বন্দীশালায় দিন যাপন করছেন। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তখন উপ-রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী প্রধানরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রিপরিষদের প্রধান ছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ। অন্যান্য মন্ত্রিরা ছিলেন মুস্তাক আহমেদ, মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। তারা বাংলাদেশের সব সম্পদ ও ক্ষমতাকে সুসংহত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আত্মনিয়োগ করেন।

অস্থায়ী সংবিধান

১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এই অস্থায়ী সংবিধানের ভূমিকায় বলা হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতা সনদ গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের জন্য ছিল এক অস্থায়ী ব্যবস্থা। এই ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি ছিলেন সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। যেহেতু এই ঘোষণায় বর্ণিত অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধের অবসান হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণ সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করতে উদগ্রীব, তাই অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন করা হয়েছিল।

এর বৈশিষ্ট্য

অস্থায়ী সংবিধানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

(এক) ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে।

(দুই) বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হবে। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমত কার্য পরিচালনা করবেন।

(তিন) গণপরিষদের অধিক সংখ্যক সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিদের নিয়োগ করবেন।

(চার) গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচিত হবার পূর্বে কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে সংবিধান অনুযায়ী অন্য কোন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের একজন নাগরিককে মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতিরূপে নিয়োগ করবেন।

(পাঁচ) বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকবে। এই আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য কয়েকজন বিচারপতি থাকবেন।

(ছয়) বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

গণপরিষদ

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ রাষ্ট্রপ্রধানের **গণপরিষদ আদেশ জারি।** এই আদেশ জারি করা হয় ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ। এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে ধরা হয়।

এই আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সকল প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। অবশ্য অন্য কোন কারণে বা আইনে অযোগ্য ঘোষিত প্রতিনিধিরা এর সদস্য হবেন না। গণপরিষদের কোন সদস্য তার রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ করলে বা বহিষ্কৃত হলে তার পরিষদ সদস্যপদ বাতিল হবে।

গণপরিষদের অধিবেশন

১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পীকার ছিলেন শাহ্ আবদুল হামিদ। তার মৃত্যুতে স্পীকার নির্বাচিত হন জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ্। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। এই অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিটি গঠন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আইন ও সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন। সংবিধান কমিটি গঠিত হয় ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে। ১০ জুনের মধ্যে সংবিধানের প্রস্তাব আকারে পেশ করার জন্য কমিটিকে বলা হয়।

সংবিধান রচনা
Framing of the Bangladesh Constitution

বাংলাদেশ সংবিধান রচনার জন্য যে সংবিধান কমিটি (Constitution Committee) গঠিত হয় তার চেয়ারম্যান ছিলেন আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন। এই কমিটিতে আরও চারজন মন্ত্রী ছিলেন– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমদ, খন্দকার মুস্তাক আহমেদ এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। এই কমিটিতে সাত জন মহিলা সংসদ সদস্যার একজন ছিলেন।

এই কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এই বৈঠকে সংবিধান সম্পর্কে কোন প্রস্তাব থাকলে তা সংবিধান কমিটির নিকট ১৯৭২ সালের ১৮ মে তারিখে পৌঁছাবার নির্দেশ দেয়া হয়। কমিটি বিভিন্ন মহল থেকে ৯৮টি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল সংবিধান কমিটি সংবিধানের মুখবন্ধ (Preamble) রচনা করেন। দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা আলোচনার পর এই কমিটি জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় ফুল সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর সংবিধান কমিটির শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে কমিটি ৭৪টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্রায় ৩০০ ঘন্টা আলোচনার পর সংবিধানের খসড়া রচনা করেন।

সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও গ্রুপের মতামত

খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গ্রুপ বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অধিকাংশ বিরোধী প্রস্তাব আসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) থেকে। এই দল ২৪টি সুপারিশ পেশ করে এবং খসড়া প্রস্তাবের ১৪টি ধারাকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করে। এ দলের সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ (১) খসড়া প্রস্তাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমারেখা নির্ধারিত হয় নি। (৩) রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহে জনগণের মৌল প্রয়োজন–খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। (৪) জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ বছরের পরিবর্তে হওয়া প্রয়োজন ৪ বছর।

বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলে খসড়া সংবিধানকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে। জাতীয় আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) সভাপতি মওলানা ভাসানী বলেন, **"এই সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নি।"** বাংলাদেশ ছাত্র লীগের নেতা আ. স. ম. আব্দুর রব বলেন, "এই সংবিধান অগ্রহণযোগ্য , তবে সংবিধানের অনুপস্থিতিতে একটি মন্দ সংবিধানও গ্রহণযোগ্য।"

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দলের একমাত্র নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত খসড়া সংবিধানের ৬টি অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "খসড়া সংবিধানে উৎপাদনের সকল উপাদান জাতীয়করণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু জনগণের মৌল প্রয়োজন মিটাবার কোন ব্যবস্থা এতে নেই।" তিনি আরও বলেন, **"জনগণ এই সংবিধান প্রত্যাখ্যান করবে।"**

সংবিধানের খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গ্রহণ

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ঐদিন বেলা ১১-৪৫ মিনিটে ৭৩ পৃষ্ঠার খসড়া সংবিধান অধিবেশনে পেশ করেন আইন ও সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী। তখন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৩০ জন। স্পীকার ছিলেন জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতীতের স্মৃতিচারণ করে এই প্রসংগে যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, **"বাংলাদেশ গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করেছে তা বাংলাদেশের জনগণের তাজা রক্তে লেখা হয়েছে।"** আইন মন্ত্রী বলেন, **"স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সংবিধান বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক বিরাট দিগদর্শন।"** মুক্ত নাগরিক হিসেবে সম্মানজনক জীবনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের ফলশ্রুতি এ সংবিধান। সত্যই এই সংবিধান বাঙালি জাতিকে দান করেছে এক গৌরবময় সংগ্রামের উর্বর ফসল এবং জাতীয় জীবনে সংযোজিত হয়েছে ঐতিহাসিক এক অধ্যায়। সংবিধান কমিটি রচিত খসড়ায় অন্যূন ৬৫টি সংশোধনী সংযুক্ত হয়ে এবং নেতৃবর্গের বিভিন্ন আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনে (Supreme Law) রূপ লাভ করেছে। ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর হস্ত লিখিত সংবিধানে স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
Salient Features of the Bangladesh Constitution

বাংলাদেশের সংবিধান বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শুধুমাত্র দশ মাসের মধ্যে একটি সংগ্রামী স্বাধীন জাতি এই সংবিধানের মাধ্যমে যুগোত্তীর্ণ হতে পেরেছে তাই নয়, এর মূল সুরও সমগ্র জাতিকে দিয়েছে এক অপূর্ব প্রেরণা। তাই এ সংবিধান বিভিন্ন কারণে হয়েছে মহিমামণ্ডিত।

১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয় এবং বিভিন্ন সংশোধনী আইনে পরিবর্তিত হয়ে তা বর্তমানে যে আকারে বিদ্যমান তার বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

(১) বাংলাদেশ সংবিধান একটি লিখিত দলিল ঃ দেশের সর্বোচ্চ আইন ৮২ পৃষ্ঠার এই সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা (Preamble) এগারটি ভাগ (Part), ১৫৩টি বিধি (Article) এবং ৪টি তফসিল (Schedule) সন্নিবেশিত হয়েছিল। এই সংবিধান দীর্ঘ, তবে দীর্ঘতর নয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন

আইনের অনুসরণে শাসন ব্যবস্থার ধারাগুলো বর্ণনা ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তার কার্যধারা বর্ণনার জন্য তা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। তবে ভারত বা পাকিস্তানের সংবিধানের মত এটি দীর্ঘতম নয়। প্রতি ছত্রে এর রয়েছে সৃষ্টিধর্মী সুর। চৌদ্দটি সংশোধনী আইনে এই সংবিধান বিপুলভাবে পরিবর্তিত হলে তার কলেবরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) এ সংবিধান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা করে : এই সংবিধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সুদৃঢ়ভাবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত এই সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয় : "আমরা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছি। এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে অদ্য তেরশত উনআশি বঙ্গাব্দের ১৮ কার্তিক তারিখে আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সমবেতভাবে গ্রহণ করলাম।" সংবিধানের প্রথম অংশে (৭ অনুচ্ছেদে) বর্ণনা করা হয়েছে, **"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।"**

তা ব্যতীত, এই সংবিধানে 'সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি' গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ আঠার ও তদূর্ধ্ব বয়স্কের প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই এই অধিকারের মালিক। এই সংবিধান আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্য পরিচালনার সর্বপ্রকার ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত করেছে। শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেক পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ কার্য পরিচালনা করবেন।

(৩) এটি একটি প্রজাতন্ত্র ধরনের সংবিধান : বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হবেন। কিন্তু তিনি শাসনতান্ত্রিক প্রধান এবং মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত শাসনকার্য নির্বাহ করবেন। তাঁর পদমর্যাদা ভারতের রাষ্ট্রপতি বা বৃটেনের মহামান্য রানীর সাথে তুলনীয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে অবশ্য নির্ধারিত হয় যে, রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত। তিনি ছিলেন শাসন ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক। দ্বাদশ সংশোধন আইনে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনপ্রবর্তিত হলে রাষ্ট্রপতি আবার হয়েছেন বাংলাদেশের শাসন-তান্ত্রিক প্রধান।

(৪) এই সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয় : ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনুরূপ এই সংবিধানে আইন পরিষদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। কিন্তু কার্যত শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র মন্ত্রিপরিষদ এবং মন্ত্রিপরিষদের প্রধান শাসনব্যবস্থার শীর্ষমণি। সংবিধানে বর্ণিত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত কাজ করবেন।

চতুর্থ সংশোধনীতে সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় **রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার**। রাষ্ট্রপতি তখন হন শাসন ব্যবস্থার শীর্ষমণি। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইনে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনপ্রবর্তিত হয়েছে। এখন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

(৫) এই সংবিধানে এক কক্ষ-বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয় : বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে এককক্ষ-বিশিষ্ট আইন পরিষদই এখানে উত্তম। আইন পরিষদের নাম **জাতীয় সংসদ** (House of the Nation)। সংসদের আসন রাজধানী ঢাকায়।

(৬) এই সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ঃ সংবিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। তবে এ সংবিধান অংশত সুপরিবর্তনীয়, কেননা সংশোধনী বিল উত্থাপনের জন্য বিশেষ কোন জটিল ব্যবস্থার দরকার নেই। সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে তা সংশোধিত হবে। তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণের পরেও প্রয়োজন হবে গণভোটের।

(৭) এই সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা রয়েছে যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী অংগসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। বিচার বিভাগই নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের প্রকৃষ্ট রক্ষাকবচ এবং বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে তা রক্ষা করবে। গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচারের এটাই প্রকৃত মানদণ্ড।

(৮) ভারত ও আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ বাংলাদেশের সংবিধানে কয়েকটি **রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নির্দেশক নীতি গৃহীত হয়েছে। এগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি** (Fundamental Principles of State Policy) নামে পরিচিত। এই মূলনীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে—বাংলাদেশে রাষ্ট্রনীতির চারটি মূল সূত্র—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গৃহীত হবে এবং আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তা প্রয়োগ করবে কিন্তু আদালতের মাধ্যমে তা কার্যকর হবে না।

১৯৭৭ সালের সংবিধান (সংশোধন) আদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংবিধানে সংযোজিত হয় **আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা।** সংবিধান শুরু হয়েছে আল্লাহর নামে—'বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম' দিয়ে। তা ছাড়া অষ্টম সংশোধনী আইনে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে নতুনভাবে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী **সমাজতন্ত্র হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার।**

(৯) বাংলাদেশের সংবিধানের গৌরবময় দিক হলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ঃ নাগরিকদের যাতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয় এবং শাসনকর্তৃপক্ষ যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে, তাই মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা অন্যান্য শর্তাধীনে এগুলো আবদ্ধ হলেও স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে তাদের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়েছে। মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

(১০) এই সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়া হয় ঃ সমাজতন্ত্রকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয়, উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক জনগণ। গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি গৃহীত হয়েছে এবং জনকল্যাণের সার্বিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তবে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। পঞ্চম সংশোধনী আইনে এই ধারা সংশোধিত হয়েছে। এই সংশোধন আইনে সমাজতন্ত্র হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার।

(১১) সংবিধানের প্রাধান্যও এর একটি বৈশিষ্ট্য ঃ সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত আইন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য কোন আইন এই সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। বলা হয়েছে যে, জনগণ এই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।

(১২) এ সংবিধানে শাসন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ রয়েছে ঃ এই সংবিধানে শাসন ব্যবস্থার কাঠামো, বিভিন্ন পদের শপথ, নির্বাচন পদ্ধতি, রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা" কবিতার প্রথম দশ চরণ। জাতীয় পতাকার প্রতীক হলো "সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্ত বর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত"। জাতীয় প্রতীক হয়েছে—উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান শাপলা ফুল—শীর্ষস্থানে পাট গাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পাতা আর উভয় পার্শ্বে দুটি করে তারকা"। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।

(১৩) এককেন্দ্রিক সরকার ঃ এই সংবিধানে বৃটেনের মত বাংলাদেশে **এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার** প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র আয়তন এবং সামাজিক ঐক্যের ফলশ্রুতি এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা।

(১৪) রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ঃ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বছর। তিনি অন্যূন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক হবেন এবং জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন।

(১৫) সংবিধানে গণভোট ঃ জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলে তা সংশোধিত হবে। তবে পঞ্চম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে, সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সম্পর্কে কোন সংশোধনী প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হলে তিনি এক গণভোটের আয়োজন করবেন। ঐ গণভোটের প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে।

(১৬) জাতীয় সংসদের বিশেষ বিধি ঃ কোন রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ও রাজনৈতিক দলের সমর্থনে কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে জাতীয় সংসদে তার আসন শূন্য হবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে এর বিবরণ রয়েছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা
The Preamble

সংবিধানের প্রস্তাবনা এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রস্তাবনা সংবিধানের উৎসের সন্ধান দেয় এবং সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো উন্মোচন করে। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করলে সংবিধানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় ঃ

(১) জাতীয়তাবাদ ঃ সংবিধানের প্রস্তাবনা জাতীয়তাবাদের প্রাণস্পর্শী অনুরণন জাগায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন ক্ষমতায় মদমত্ত পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বাঙালি জাতির উপর অবৈধ ও অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তখন জাতীয় মুক্তির জন্য বাংলার আপামর জনসাধারণ প্রতিরোধের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলে এবং অপূর্ব আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার সাথে সংগ্রাম করে রক্তের রেখায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করে। প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদ তারই ইঙ্গিত বহন করে।

(২) মুক্তিযুদ্ধ ঃ বাঙালি জাতি সেই ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছিল মহান আদর্শের প্রেরণায় এবং সে আদর্শ হলো—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ—যা প্রত্যেক বাঙালির আপন সম্পদ। তাই সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, সে সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে।

(৩) জাতীয় আদর্শ ঃ প্রস্তাবনা বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শের কথাও সগৌরবে ঘোষণা করছে। তা একদিকে যেমন গণতন্ত্রের জয়গান করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সুখ-স্বপ্নে বিভোর, অন্যদিকে তেমনি ন্যায় ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারও সংকল্প ঘোষণা করেছে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার যেমন পরম কাম্য, তেমনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যও মহামূল্যবান মণিমুক্তা। সাম্য, স্বাধীনতা এবং সুবিচার প্রত্যেক সুসভ্য সমাজের ভিত্তিমূল স্বরূপ। প্রস্তাবনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদে এসব রাষ্ট্রীয় আদর্শের অনুরণন প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

(৪) বৈদেশিক নীতির স্বরূপ ঃ চতুর্থ অনুচ্ছেদে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভূমিকার চিত্র। 'স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি' লাভ করার ক্ষেত্র রচনার জন্য বাঙালি জাতি রক্ত দান করেছে এবং রক্তের আল্পনায় অঙ্কিত করেছে তাদের সাধের স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা, প্রগতি ও সুবিচার তাই আমাদের কাছে এত প্রিয়। তাই বাংলাদেশ উৎপীড়ন, অত্যাচার ও পাশব শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা তার ক্ষীণ কণ্ঠে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে কৃতসঙ্কল্প। 'মানব জাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংহতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শক্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বাংলাদেশ সদা সচেষ্ট, তা তার প্রয়াস যতই অপ্রতুল হোক না কেন। জাতীয়তাবাদ আমাদের মহামন্ত্র, কিন্তু জাতীয়তাবাদের মহান তীর্থক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিকতারও মূল সুর শুনতে পাই। এই দু নীতি একে অপরের প্রতিবন্ধক নয়, বরং তারা পরস্পরের সম্পূরক।

(৫) সংবিধানের মূল উৎস ঃ এই প্রস্তাবনায় সংবিধানের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। "আমরা আমাদের এই গণপরিষদে—এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সমবেতভাবে গ্রহণ করলাম"। জনগণই যে সংবিধানের উৎস, জনগণই যে সকল ক্ষমতার মালিক—তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। তা আমেরিকার সংবিধানের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানেও সংবিধানের সূচনা হয়েছে "আমরা" শব্দের প্রয়োগে। কিন্তু ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানে দেখা যায় অন্য এক চিত্র—ক্ষমতাগর্বী প্রেসিডেন্ট জনগণের অধিকারকে সযত্নে নস্যাৎ করে একবচনে ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'আমি এই সংবিধান বিধিবদ্ধ করিতেছি।' এর পরিণামও আমরা দেখেছি। জনতার অধিকার এবং দাবির হুঙ্কারে তার ক্ষমতার প্রাসাদ তাসের ঘরের মত অচিরেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল।

(৬) সংবিধানের প্রাধান্য ঃ এই প্রস্তাবনা সংবিধানের প্রাধান্য ঘোষণা করেছে। যেহেতু এ সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ—তাই এর প্রাধান্য অনস্বীকার্য এবং এই প্রস্তাবনার সমাপ্তি ঘটেছে কর্তব্যবোধের এক আনুষ্ঠানিক আহ্বানে। "সত্যিই এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য", কেননা এ সংবিধানই বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের সর্ব্বোচ্চ দলিল এবং "দেশের সর্বোচ্চ আইন" (Supreme Law of the Land)। এটাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, জাতীয় গৌরবের প্রতিশ্রুতি—আলোর নিশানা।

(৭) মৌল পরিবর্তন ঃ এই ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত সংবিধান (সংশোধন) আদেশ অনুযায়ী সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা। সংবিধান শুরু হয়েছে আল্লাহর নামে। তাছাড়া ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে অষ্টম সংশোধন আইনে। ১৯৭৭ সালের সংশোধন আদেশে সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী **সমাজতন্ত্র হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার।**

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
Fundamental Principles of State Policy

আইরিশ ফ্রি স্টেট ও ভারতের সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশ সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির এক দীর্ঘ তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত এই মূলনীতিগুলো সন্নিবেশিত।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বৈশিষ্ট্য

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রভৃতি নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে। এই নীতিগুলোর কোন আইনগত মর্যাদা নেই। কোন আদালতে তা মৌলিক অধিকারের ন্যায় গ্রহণযোগ্য হবে না। এই নীতিসমূহ রাষ্ট্রীয় আদর্শস্বরূপ। তারা বাংলাদেশে শাসন পরিচালনার মূল সূত্র হবে এবং আইন প্রণয়ন কালে রাষ্ট্র তা প্রয়োগ করবে। তাছাড়া এ সংবিধান এবং বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাকালে এই নীতিসমূহ নির্দেশক হবে। সর্বোপরি এগুলো রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কাজের ভিত্তিস্বরূপ হবে। বাংলাদেশ এগুলো বাস্তবায়িত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে এবং রাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে তারা হবে দিশারীস্বরূপ।

উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ

(১) জাতীয়তাবাদ ঃ ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যের সঞ্জীবনী রসে সিক্ত জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিঝরা দিনগুলো অতিক্রম করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে এবং ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক সেই ঐক্যই হবে আমাদের জাতীয়তার প্রাণধারা।

(২) সমাজতন্ত্র ঃ এক শোষণমুক্ত সমাজ তথা সাম্যবাদী ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেশে এক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা হবে। সংবিধানের সংশোধনী অনুযায়ী সমাজতন্ত্রকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার।

(৩) গণতন্ত্র ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে, মানবিক মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন কাজ পরিচালিত হয়ে শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ দেশে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ করে, কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান থেকে বিরত থেকে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার প্রতিরোধ করে এবং কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন হতে বিরত থেকে রাষ্ট্র নিরপেক্ষতার এক নিষ্কলুষ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত সংবিধান সংশোধনী আইনে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা। তাছাড়া অষ্টম সংশোধনী আইনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশে অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদের ধর্মচর্চার কোন বাধা দেওয়া হবে না।

(৫) শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ঃ সমাজের উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রক হবে জনগণ এবং এর ফলে দেশে শোষণের যন্ত্রটি হবে বিকল ও অর্থহীন। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ (ক) অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও গতিশীল **রাষ্ট্রায়ত্ত** খাত সৃষ্টি করে রাষ্ট্র

জনগণের পক্ষে মালিকানা গ্রহণ করবে। (খ) নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে **সমবায় ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠা করে সমবায়ী মালিকানা চালু হবে এবং (গ) নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে **ব্যক্তিগত মালিকানাও** প্রচলিত থাকবে।

(৬) কৃষক-শ্রমিকদের মুক্তি ঃ চিরকাল ধরে যে মেহনতি মানুষেরা শোষণের প্রচণ্ড চাপে নিষ্পেষিত হয়েছে, সেই কৃষক ও শ্রমিকদের মুক্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

(৭) মৌলিক প্রয়োজনের সন্তুষ্টি বিধান ঃ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে জনগণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ। সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশের উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন করে জনগণের জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করতে হবে, যাতে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণগুলো সকলে উপভোগ করতে পারে, যেমন—অন্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা। তাছাড়া, কর্মের অধিকার, উপযুক্ততা অনুযায়ী যোগ্য মজুরির অধিকার, যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করতে পারবে।

(৮) গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ ঃ দেশের সর্বাংশে প্রাণ সঞ্চালনের জন্য গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান দূর করা হবে। উভয় অংশের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের ব্যবধান ক্রমাগতভাবে দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণ, কুটির ও অন্যান্য শিল্পের প্রসার সাধন, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ও কৃষি বিপ্লব প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৯) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত দেশের সকল বালক-বালিকার মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য দেশে এক গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করে দেশে যোগ্য সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া, এক নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপকে দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১০) জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতার মান উন্নয়ন ঃ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মাদক দ্রব্য ও মাদক পানীয় ও অন্যান্য পদার্থের নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে এবং জুয়াখেলা ও গণিকাবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা করবে।

(১১) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণ ঃ মানুষে মানুষে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করার ও দেশের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সুষম সুযোগ-সুবিধার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হবে এবং সকলের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে।

(১২) শ্রমের মর্যাদা ঃ রাষ্ট্র এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে, যেখানে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগে সমর্থ হবে না। এখানে কর্ম হবে প্রত্যেকের নিকট কর্তব্য ও সম্মানের ব্যাপার এবং যেখানে বুদ্ধিমূলক ও কায়িক—সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসে রূপান্তরিত হবে।

(১৩) কর্তব্যবোধের উন্মেষ ঃ সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। তাছাড়া, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর কর্তব্য জনগণের সেবা করা।

(১৪) বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ হতে স্বতন্ত্র হবে।

(১৫) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ঃ রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে। বিশেষ বিশেষ স্মৃতি চিহ্ন বা ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহকে সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।

(১৬) পররাষ্ট্র নীতি ঃ মূলনীতির শেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদের প্রতি শ্রদ্ধা। এই সকল নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিহার করবে। নিরস্ত্রীকরণের জন্য সচেষ্ট হবে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে এবং যে কোন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পথ ও মত অনুযায়ী স্বতন্ত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিকে সমর্থন করবে।

(১৭) পঞ্চম সংশোধনী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ক্ষেত্রে নবম ও দশম অনুচ্ছেদে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তিত অনুচ্ছেদে বলা হয়, রাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১৮) এই আইন মূলনীতির পঁচিশতম অনুচ্ছেদকে পরিবর্তিত করে ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংহত ও সংরক্ষণ করবে।

মূলনীতির গুরুত্ব

নির্দেশক মূলনীতিসমূহ শাসনতান্ত্রিক আইনরূপে বিচারালয়ে প্রযোজ্য না হলেও বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের যে পরিকল্পনা এসব মূলনীতির মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং আদর্শ স্থানীয়। মূলনীতিগুলোকে সাধারণভাবে মহাপরিকল্পনা বলে আখ্যায়িত করা যায়, কেননা বিগত দিনগুলোতে বাংলার জনজীবন যে যে অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল, এই মূলনীতিগুলোতে সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে এক সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের রঙিন স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। যে কোন সরকারের সামর্থ্য ও সদিচ্ছা এই মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নের মানদণ্ডে অনুধাবনযোগ্য। বাংলার গণজীবন মৌলিক প্রয়োজনের চাপে নিষ্পিষ্ট, শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, ব্যাধি ও বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত। তাই কর্তব্যবোধে তার এত অনীহা, দায়িত্ববোধে এত শিথিলতা এবং কর্মপ্রেরণায় এত অচল। এ দেশের জনগণ চায় জীবনের আলো এবং আরও আলো। এই মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়ন তাই জাতীয় জীবনের এক সুনির্দিষ্ট দিগ্‌দর্শন।

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার
Fundamental Rights

মৌলিক অধিকার কী? মৌলিক অধিকার বলতে আমরা সেই সকল সুযোগ–সুবিধা বুঝি, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিমূল এই মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ, তাদের প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ এবং নাগরিক জীবনের যথাযোগ্য প্রকাশ সম্ভব হয়। সংবিধান মৌলিক অধিকারসমূহের উল্লেখের ফলে তারা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

সর্বপ্রথমে বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত হয়। পরবর্তীকালে আমেরিকার সংবিধানে তা স্থান লাভ করে। কালক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধানে এই অধিকারগুলো উল্লিখিত হয়। বৃটেনে মৌলিক অধিকারের ভিত্তি সংবিধান নয়, বরং মৌলিক অধিকারই সেখানে সংবিধানের ভিত্তি।

সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ সংবিধান মৌলিক অধিকারসমূহের উল্লেখের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথমত, সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা থাকলে এসব অধিকারের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়ে উঠে। ফলে মৌলিক অধিকার শাসনতান্ত্রিক আইনে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকারের ঘোষণা রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও আলোকপাত করে। রাষ্ট্র যে ব্যক্তির জন্য, ব্যক্তি রাষ্ট্রের স্বার্থে যে বলি হতে পারে না—এ সত্য স্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব—তা যথার্থরূপে প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত, কার্যত গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যবস্থা। যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করতে পারে অথবা যাতে নাগরিকদের অধিকার কোনক্রমে সরকারের হাতে পর্যুদস্ত না হয়, সে জন্য অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। তার ফলে কোন মহল হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না।

চতুর্থত, মৌলিক অধিকার ঘোষণার ফলে সরকার স্বৈরাচারী হতে সাহসী হয় না এবং নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার সাহস পায় না।

সর্বশেষে, এও বলা প্রয়োজন যে, মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে উল্লেখ করা হলে নাগরিকগণ স্বীয় অধিকারের সংরক্ষণে এবং কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত হয়। এই সব কারণে বাংলাদেশ সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো উল্লিখিত হয়েছে। সংবিধানের ২৬নং অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বৃহৎ পরিসরে এদের উল্লেখ রয়েছে।

মৌলিক অধিকারের স্বরূপ

বাংলাদেশ সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার প্রযোজ্য হবে। মৌলিক অধিকারের কয়েকটি আবার ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হবে। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এ সকল অধিকার ব্যতীত জনজীবন সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন আইন প্রণয়ন করবে না। তা প্রণীত হলে এ সব বিধানের সাথে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। অতীতের কোন আইন যদি এই ভাগের বিধানাবলীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়, তা হলে তা ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উপর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কোন অধিকার ভঙ্গের মামলা সুপ্রীম কোর্ট বা আইনানুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন আদালতে দায়ের করা হলে সুপ্রীম কোর্ট বা আদালত তখন অধিকারের সপক্ষে রায় প্রদান করবেন।

তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, কতকগুলো মৌলিক অধিকার 'গণস্বার্থ' 'জাতীয় নিরাপত্তা', 'শৃঙ্খলা' ও 'শালীনতার' নামে সীমিত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তা নির্দোষ, কিন্তু সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

তাছাড়া সংবিধানের ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারকে কিঞ্চিৎ সীমিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) ৪৫ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার ও শৃঙ্খলামূলক বিধি-বিধানের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, "কোন সুশৃংখল বাহিনীর সদস্য সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্য পালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত বলে এসব বিধি-বিধানে এই ভাগের কোন কিছু প্রযোজ্য হবে না।"

(খ) ৪৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজন বা কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন কার্য করে থাকলে এবং তা মৌলিক অধিকার বিরোধী হলেও সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দায়মুক্ত করতে পারবেন।

(গ) রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংযুক্তকরণ, কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, জাতীয় সম্পদ আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে প্রণীত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহকে কার্যকর করার জন্য সংসদ কোন বিধিবিধান প্রণয়ন করলে তা যদি অনুরূপ কোন অধিকার খর্ব বা গ্রহণ করে তথাপি তা অচল বা অবৈধ বলে গণ্য হবে না। তাছাড়া, প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ এবং তার সংশোধনীগুলো পূর্ণভাবে বলবৎ থাকবে যদিও সেগুলো মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত হতে পারে। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও সংসদ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবে। তবে ৪৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তা কার্যকর হবে।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক কারণে এসব দায়মুক্তির বিধান বা কতিপয় আইনের সংরক্ষণ করা হয়েছে, কেননা মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের পদক্ষেপ কোন অধিকারের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল না অথবা পরবর্তী পর্যায়ে দেশ শাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সময় এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধীদের মোকাবেলার সময় এমন অনেক কিছু করতে হয়েছে— যা করা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে এমন কতকগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় যা ছিল অচিন্তনীয়। তাই সংবিধানে এসব বিধান সহযোগে ঐ সব প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা নতুনও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। ঐতিহাসিক কারণে এগুলো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, মৌলিক অধিকার কোন প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র জরুরি অবস্থায় করা হয়ে থাকে এবং জরুরি অবস্থা জাতীয় জীবনে ব্যতিক্রম মাত্র, স্বাভাবিকও নয়, সুস্থও নয়। বিভিন্ন শর্তে আবদ্ধ মৌলিক অধিকারের যে ছবি সংবিধানে অংকন করা হয়েছে, তা জরুরি অবস্থার ছবি।

জাতীয় জীবনে যে সকল ব্যাধি রয়েছে, তা নিরোধকল্পে প্রয়োজন সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা, সফল অর্থনৈতিক পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি দেশপ্রেমের আবেগময় আবহাওয়া। শর্ত আরোপ করে বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে জাতির জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবও নয়, সঠিকও নয়।

মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিস্তারিত। নিচে তাদের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

(১) আইনের দৃষ্টিতে সমতা ঃ আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান এবং সমানভাবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে আইন কোন দীনহীন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর সুযোগদান করবে না।

(২) ধর্ম এবং বিশ্বাস প্রভৃতি কারণে বৈষম্য দূরীকরণ : ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না। এই সব কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না। রাষ্ট্র ও গণ-জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। তবে নারী ও শিশুদের অনুকূলে বা কোন অনগ্রসর এলাকার অগ্রগতির জন্য সেই এলাকার নাগরিকদের বিশেষ সুবিধা দেয়া যেতে পারবে।

(৩) সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা : রাষ্ট্রের কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম-গোষ্ঠী-বর্ণ-লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক এ ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা উপভোগ করবে। তবে অনগ্রসর অংশের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য বা কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে তাদের যথার্থ নিয়োগ সংরক্ষণের জন্য বা বিশেষ কোন কর্মের প্রকৃতির জন্য নারী বা পুরুষের পক্ষে তা অনুপযোগী এবং এজন্য ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারবে।

(৪) রাষ্ট্র কোন উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করবে না এবং রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোন উপাধি বা সম্মান লাভ করতে পারবেন না। অবশ্য সাহসিকতার ক্ষেত্রে যদি কোন পুরস্কার বা উপাধি দেয় তার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

(৫) আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার : বাংলাদেশের যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভ ও আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার অবিচ্ছেদ্য। "কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে"- এমন বিষয়ে আইনের বিধান ব্যতীত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। আইনের বিধান ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(৬) গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ : কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং তাকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেয়া হবে। "গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাকে তার বেশি সময় আটক রাখা যাবে না। এই বিধান কিন্তু কোন বিদেশী ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

(৭) জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ : সর্বপ্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধের জন্য আইন প্রদত্ত দণ্ড ভোগকালে বাধ্যতামূলক শ্রম করলে বা জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তা দূষণীয় হবে না।

(৮) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ : প্রচলিত আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ আইনে যে দণ্ড দেয়া যেতে পারত, তার অধিক দণ্ড তাকে দেয়া হবে না। এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের সুযোগ লাভ করবে।

তা ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবেনা বা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর কোন দণ্ড দেয়া যাবে না। তবে আইনের দ্বারা সেই সব শাস্তি প্রবর্তিত হলে তা অন্য কথা।

(৯) চলাফেরার স্বাধীনতা ঃ "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার" এবং যে কোন বসতি স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

(১০) সমাবেশের স্বাধীনতা ঃ জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে যে কোন নাগরিক শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হতে পারবে এবং যে কোন জনসভা বা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(১১) সংগঠনের স্বাধীনতা ঃ জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। তবে কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্প্রদায়িক সমিতি বা ধর্মভিত্তিক কোন সমিতি গঠন করতে পারবে না বা সদস্য হয়ে তৎপর হতে পারবে না। তা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বিরোধী।

(১২) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা ঃ প্রত্যেক নাগরিক চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা লাভ করবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা মানহানি বা আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে আইন আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সে সব অধিকার যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।

(১৩) পেশা-বৃত্তির স্বাধীনতা ঃ রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যে কোন আইনানুগ পেশা অবলম্বন ও আইনসংগতভাবে কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবেন।

(১৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ আইন, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা সাপেক্ষে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক স্বীয় ধর্মমত পোষণ করতে পারবেন, স্বীয় ধর্মচর্চা, উপাসনা, অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারবেন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কাউকে তার ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে বা অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বাধ্য করা যাবে না।

(১৫) সম্পত্তির অধিকার ঃ আইনানুগভাবে প্রত্যেক নাগরিক তার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং হস্তান্তর করতে পারবে এবং আইনের নির্দেশ ব্যতীত কোন নাগরিককে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(১৬) গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষণ ঃ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা জনসাধারণের নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত শর্তসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক প্রবেশ, তল্লাশি থেকে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার ভোগ করবে এবং চিঠিপত্র এবং যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার লাভ করবে।

(১৭) সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের অধিকার ঃ কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা যাবে বা আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আদালতেও আবেদন করা যাবে।

(১৮) ১৯৭৭ সালের সংবিধানে (সংশোধন আদেশ অনুযায়ী) মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে বিয়াল্লিশতম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিধি-বিধান

Democratic and Socialistic Principles

বাংলাদেশের জন্ম কাহিনী আলোচনা করলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও পীড়নমূলক ব্যবস্থা বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথকে করেছিল প্রশস্ত এবং সংগ্রামের সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলোকে দিয়েছিল ঝড়ের বেগ। তাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাঙালির পরম সম্পদ– অনেকটা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার এবং যা মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে। সুতরাং এই সংবিধান যে গণতান্ত্রিক হবে তা স্বাভাবিক। নিচে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

(ক) সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতির যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তাতে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে গণতন্ত্র এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানে অঙ্গীকার করা হয়েছে–"আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য এবং সুবিচার নিশ্চিত হবে।" সুতরাং দেখা যায় সংবিধানে গণতন্ত্রের জয়গান করা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়েছে। আইনের প্রশাসন, মৌলিক অধিকার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি সগৌরবে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার জয়গানে মুখর।

(খ) সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে এর আরও প্রকাশ দেখা যায়। এখানে বলা হয়েছে–"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।" আরও বলা হয়েছে–"জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন।"

(গ) **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতেও** গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে–প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা এবং মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে।" এই ক্ষেত্রে আরও বলা হয়েছে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

(ঘ) গণতন্ত্রের সাথে জড়িয়ে আছে প্রতিনিধিত্বের মূলসূত্র। এই সংবিধান সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রথা গ্রহণ করে, বিশেষ করে বয়স সীমা ২১ থেকে ১৮ বছরে নামিয়ে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ দান করা হয়েছে। তাছাড়া, একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তাও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে মহীয়ান করেছে।

(ঙ) **মৌলিক অধিকার** অধ্যায়ে আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান ও সকলে আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী–এই ঘোষণার দ্বারা এই মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করে এবং সুপ্রীম কোর্টকে মৌলিক অধিকারের অভিভাবকরূপে চিহ্নিত করে এই ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রেও 'মৌলিক গণতন্ত্র' বা 'পরিচালিত গণতন্ত্রের' মত বর্ণচোরা কোন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নি, বরং বলা হয়েছে, "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক ভার প্রদান করা হবে।"

(ছ) সংসদের শ্রেষ্ঠত্বও এই সংবিধানের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এই সংবিধান গণতান্ত্রিক।

তবে সংবিধান দেশের মানচিত্রের মত। সংবিধান দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায় না। অনেক গণতান্ত্রিক সংবিধানকেও পরিচালনা এবং কার্যকারিতার দোষে দুষ্ট হয়ে অগণতান্ত্রিক পর্যায়ে অবনমিত হতে হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের নেতৃবর্গ এ সংবিধানকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে তার গৌরব বৃদ্ধি করেন, না হ্রাস করেন, তাই লক্ষণীয়।

১৯৭৫ সালে গৃহীত চতুর্থ সংশোধনীতে অবশ্য এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন, রাষ্ট্রপতির হাতে অভূতপূর্ণ ক্ষমতার সমাবেশ, জাতীয় সংসদের ক্ষমতা হ্রাস, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের উপর নির্ভরশীলকরণ, সর্বোপরি জাতীয় দল সংগঠনের মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র সংকোচন প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গণতন্ত্রের জন্য ছিল ভয়ঙ্কর মারাত্মক। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও পরবর্তী পর্যায়ে সামরিক শাসন প্রভৃতি সবই ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ভয়ঙ্কর। এই পর্যায়ে সমগ্র দেশে বিরাজমান ছিল সামরিক শাসন, মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা ছিল স্থগিত এবং নির্বাচন ব্যবস্থা ও দলীয় কার্যক্রম হয়েছিল নির্বাসিত। ১৯৭৮ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা তথা দলীয় কার্যক্রমের উপর থেকে সকল বাধানিষেধ অপসারিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২ জুন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল অবশেষে তিন বছর সাত মাস একুশ দিন পরে সামরিক শাসনের অবসান হয়। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ ছিল অত্যন্ত কন্টকাকীর্ণ, তথাপি অত্যন্ত ধীর পদে বাংলাদেশ আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অগ্রসর হয়, কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ আবার দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। অবশেষে ১৯৯১ সালে প্রণীত দ্বাদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবারো প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক দিক ঃ গণতন্ত্রের মত সমাজতন্ত্রও বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং জনগণের মনে গণতন্ত্র যেমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করে, সমাজতন্ত্রও তেমনি এক মোহময় রেশ সৃষ্টি করে। সংবিধান প্রস্তুত হবার পর তাকে অনেকে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান বলেও আখ্যায়িত করেন। এখন দেখা যাক–তা কতটুকু সমাজতান্ত্রিক।

(ক) সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছিল, সমাজতন্ত্র এই সংবিধানের মূলনীতি হবে। এভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, "এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা" করা হবে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা অঙ্গীকৃত।

(খ) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে আরও জোরে-সোরে ঘোষণা করা হয়েছিল, "মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।"

(গ) সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংবিধানে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল, ত্রিবিধ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার, যার ফলে কালক্রমে জনগণ উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক বা নিয়ন্ত্রক হতে পারে। অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ক্ষেত্র নিয়ে সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত

সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের মালিকানা সৃষ্টি করা হবে এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়সমূহের মালিকানা সৃষ্টি করা হবে। তাছাড়া, ব্যক্তিগত মালিকানাও সীমিত হবে এক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে।

(ঘ) কৃষক ও শ্রমিকের মত মেহনতি মানুষের মুক্তি এবং প্রত্যেকের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, যেমন অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের এক মৌলিক দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো সংবিধানে রচিত হয়েছিল। মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকের কর্মের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। "কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য সম্মানের বিষয় এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী–এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে।"

(ঙ) অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতগুলোর পুনর্বিন্যাস সাধন করে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেন প্রবর্তিত না হয়, তাই তৃতীয় ভাগের ৪৭ অনুচ্ছেদে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগের ২৫ অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছিল, বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

তবে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানে সমাজতন্ত্র কায়েম করার পন্থা নির্ধারিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ফলে এর গতি ছিল ধীর ও মন্থর এবং বিভিন্নভাবে তা প্রতিহত হয়েছে। জনকল্যাণমূলক লক্ষ্য অর্জন করাই বাংলাদেশের লক্ষ্য এবং তা পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা থেকে কিছুটা ভিন্ন।

সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য যা প্রয়োজন তা সামাজিক জীবনে এক বিপ্লব এবং বিভেদ ও শ্রেণী বিভাগের মূলোৎপাটন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল গণমুখী শাসন ব্যবস্থা, গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ এবং শর্তহীনভাবে সম্পদের উৎসসমূহের জাতীয়করণ।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। এর কোন আইনগত মর্যাদা নেই। মৌলিক অধিকারের মত তা কোন আদালতে কার্যকর হবে না। সুতরাং সমগ্র ব্যাপারটা অনেকটা সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এক ভাবগম্ভীর আদর্শে পরিণত হয়। ১৯৭৭ সালের সংবিধান (সংশোধন) আদেশে অবশ্য সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে এবং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার। এই আদেশে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিয়াল্লিশতম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং এই সংশোধনী আদেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। অন্য কথায়, এই আদেশের ফলে সংবিধান হতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিশ্চিহ্ন হয়।

অন্যদিকে, ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও নতুনভাবে সংগঠন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে এক মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) প্রতিষ্ঠার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতকে অধিকতর প্রাণবন্ত করা, বেশ কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে পূর্বের মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা, বেসরকারি পর্যায়ে শিল্প ও কৃষির অগ্রগতি সাধন প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অবস্থায় সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিঃশেষ হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বময় প্রচলিত মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশ সংযুক্ত হবার ফলে বাংলাদেশ থেকে সমাজতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেছে।

১। বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান সম্পর্কে কী জান? (What do you know about the Provisional Constitution of Bangladesh?)

২। গণপরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? সংবিধান সম্পর্কে কী জান? (How was the Constituent Assembly formed? What do you know about the Constitution Committee?)

৩। বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (Describe the salient features of the Bangladesh Constitution.) [N. U. 2000]

৪। সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য কী? (What is the significance of the Preamble of the Constitution?)

৫। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে কী জান? তার গুরুত্ব কী? (What do you know about the Fundamental Principles of the State Policy? What are the significance of these?) [N.U. 1996, 2001]

৬। মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝ? সংবিধানে মৌলিক অধিকার উল্লেখের গুরুত্ব কী? (What do you understand by a fundamental right? What is the importance of enumeration of these rights in the constitution?)

৭। বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বরূপ কী? কয়েকটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ করে আলোচনা কর। (What is the nature of Fundamental Right in the Bangladesh Constitution? Discuss some of them.) [D. U. 1981, 2007]

৮। বাংলাদেশ সংবিধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the democratic procedures enunciated in the Bangladesh Constitution.)

৯। বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the socialistic principles incorporated in the Bangladesh Constitution.)

১০। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের সন্নিবেশিত মূল নীতিসমূহ আলোচনা কর। পরবর্তীতে উক্ত মূলনীতিসমূহে কী কী পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল তা উল্লেখ কর। (Discuss the Fundamental Principles of the State Policy incorporated into the 1972 Constitution of Bangladesh. Point out the subsequent changes which were brought about in those fundamental principles.) [D. U. 1983, '84, 2004]

নির্বাহী বিভাগ
The Executive

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর নামে বাংলাদেশের শাসন পরিচালিত হতো। বৃটেনের রানী বা ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনি ছিলেন একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। আসলে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থেকে কার্য নির্বাহ করতেন।

১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধন আইন, ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট, ৮ নভেম্বর ও ২৯ নভেম্বরে রাষ্ট্রপতির ঘোষণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন।

১৯৯১ সালের ৬ আগস্টে প্রণীত এবং ১৫ সেপ্টেম্বরের গণভোটে অনুমোদিত দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী দীর্ঘ ষোল বছর পরে বাংলাদেশে আবারো প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান বটে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী ও সরকার প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। বৃটেনের রাজা বা রানীর মতো রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান।

রাষ্ট্রপতি
The President

রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। তাঁর নামে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হবে। তিনি কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছরের মেয়াদে এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ১৯৮৯ সালে গৃহীত নবম সংশোধন আইনে বলা হয়েছে, একাদিক্রমে দুই মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা
Qualifications for the Post of the President

কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হলে তাঁর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে ঃ

প্রথম, অন্ততপক্ষে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক হবেন।

দ্বিতীয়, তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন।

তৃতীয়, কখনো এই সংবিধানের অধীনে অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তিনি অপসারিত হননি।

রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
President's Immunity

রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করলে সে জন্য কোন আদালতে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না। তাঁর কার্যকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা চলবে না। তাঁর গ্রেফতারের জন্য কোন আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করা যাবে না। তবে তাঁর কার্যের ফলে কোন ব্যক্তির স্বার্থ নষ্ট হলে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা চলবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (Election of the President)

সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক প্রকাশ্য ভোটে। পাঁচ বছরের মেয়াদে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। সংসদের কোন সদস্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন
Impeachment of the President

এ সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে। চতুর্থ সংশোধন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দু'-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিস স্পীকারের নিকট দিতে হতো। এ অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশের ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেদিন থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হতো।

দ্বাদশ সংশোধন আইনে বলা হয়েছে, সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিস স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হবে। স্পীকারের নিকট নোটিস প্রদানের দিন থেকে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না। এ নোটিস পেয়ে স্পীকার সংসদ অধিবেশনে রত না থাকলে অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।

অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকতে অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন। অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে যথার্থ বলে সংসদ প্রস্তাব গ্রহণ করলে সে তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

শারীরিক এবং মানসিক অসামর্থ্যের কারণেও রাষ্ট্রপতি অপসারিত হতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অভিযোগ আনয়ন করতে হবে। তখন স্পীকার একটি চিকিৎসা পর্ষদ গঠনের ব্যবস্থা করবেন। শেষ পর্যায়ে সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পর্ষদের রিপোর্ট গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

চতুর্থ সংশোধন আইনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের জন্য প্রস্তাব করতে প্রয়োজন হতো সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষর এবং প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হতো মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোট। দ্বাদশ সংশোধন আইনে তাই রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে স্পীকারের কর্তব্য (Speaker's Duty During Absence of the President.)

রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the President

রাষ্ট্রপতির কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত সাত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ; যথা—(১) শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা, (২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৪) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা, (৫) সম্মানের উৎস, (৬) রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা, (৭) অন্যান্য কার্যক্রম।

(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Executive) : বর্তমানে রাষ্ট্রপতি একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head)। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সব ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করেন। তিনি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধি প্রণয়ন করবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দান করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিদের নিয়োগ দান করবেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি সাধারণত মন্ত্রিদের নিয়োগ করবেন। তবে রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তিদেরকেও মন্ত্রিরূপে নিয়োগ করতে পারবেন যাঁরা সংসদ সদস্য নন কিন্তু সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। এভাবে নিযুক্ত মন্ত্রিদের সংখ্যা মোট সংখ্যার এক-দশমাংশের বেশি হবে না।

সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ দান করবেন। যদি সংবিধানে উল্লিখিত শর্তে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে রাষ্ট্রপতি নিজেই সে দায়িত্ব পালন করবেন। উপদেষ্টা পরিষদ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে সংবিধানের ৫৮খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।
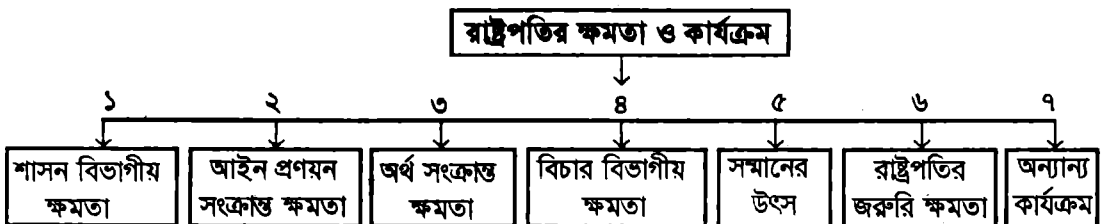
বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেল, মহা–হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তিনি বাংলাদেশের হাইকমিশনার, রাষ্ট্রদূত, কন্সাল ও অন্যান্য কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করবেন। বাংলাদেশে আগত হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন। তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত।

সর্বশেষে এও বলা প্রয়োজন, সংবিধানের ৫৬ (৩) এবং ৯৫ অনুচ্ছেদের মর্ম অনুযায়ী কেবল প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। রাষ্ট্রপতির নামে ব্যবস্থা গৃহীত হয় বটে, কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী। শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী।

(২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative) ঃ রাষ্ট্রপতি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত এবং ভঙ্গ করবেন। সংসদ আহ্বান কালে তিনি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিল পরিষদের পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে। অন্যদিকে তাঁর ফেরত পাঠানো বিলটি সংসদ পুনর্বিবেচনার পর পুনরায় গ্রহণ করলে পুনরায় তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হবে এবং ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে ৭ দিন পর তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

যখন সংসদের অধিবেশন থাকে না তখন আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করলে তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। তা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। তবে অধ্যাদেশ জারি হবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তা উপস্থাপিত হবে। ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে তা ৩০ দিন অতিবাহিত হলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে অনুমোদিত হলে বাতিল হবে।

(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers) ঃ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন অর্থবিল সংসদে উত্থাপন করা যাবে না এবং কোন মঞ্জুরি দাবি পেশ করা যাবে না। সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয় সংসদের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিবিধান দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হবে। তিনি প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে সরকারের আয় ও ব্যয় দেখিয়ে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী উত্থাপন করাবেন। মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট না হলে তিনি অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ সংবলিত একটি সম্পূরক আর্থিক বিবরণী বা অতিরিক্ত আর্থিক বিবরণী সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে, রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের ৮৯ এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীনে মঞ্জুরিদান না করা হলে এবং আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ বছরের ৬০ দিন মেয়াদ পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারবেন। পঞ্চম সংশোধন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ১২০ দিনের অর্থ মঞ্জুরি দানের ক্ষমতা রহিত হয় দ্বাদশ সংশোধন আইনে।

(৪) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers) ঃ রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগদান করবেন। তাছাড়া, তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের চরমাধিকার প্রয়োগ করবেন। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে।

(৫) সম্মানের উৎস ঃ রাষ্ট্রপতি বৃটেনের রাজা বা রানীর মতো সম্মানের উৎস (fountain of honour)। রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশের কোন নাগরিক অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কোন উপাধি বা পদবী বা সম্মান গ্রহণ করতে পারবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা (Powers of the President During Emergency) ঃ ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। দ্বাদশ সংশোধন আইনে পরিবর্তন সাপেক্ষে তা বলবৎ থাকে। যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানে বিধিবদ্ধ কতকগুলো মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। ঐ সকল মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করার অধিকার নির্ধারিত স্বল্প কালের জন্য স্থগিত থাকবে। সমগ্র বাংলাদেশ বা তার কোন অংশে জরুরি অবস্থায় গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রযোজ্য হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি অবস্থার ঘোষণা (ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাবে, (খ) সংসদে উপস্থাপিত হতে হবে, (গ) একশত কুড়ি দিন অতিবাহিত হবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হলে উক্ত সময়ের অবসানে তা কার্যকর থাকবে না।

(৭) অন্যান্য কার্যক্রম ঃ তাছাড়াও রাষ্ট্রপতির অন্যান্য ক্ষমতা রয়েছে—

(ক) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল ও আকাশপথে প্রকৃত বা আসন্ন আক্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের ব্যবস্থাপনা সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি বিধি প্রণয়ন করে তা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(গ) তিনি বৃটেনের রাজা বা রানীর ন্যায় সকল প্রকার সম্মানের উৎস। জনহিতকর ও সামরিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রপতি যে কাউকেই উচ্চ সম্মানে ভূষিত করতে পারবেন।

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পাদিত চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে সম্পাদিত হবে।

(ঙ) যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হবে। বিদেশী কূটনীতিকদের তিনি গ্রহণ করবেন।

(চ) তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

(ছ) তিনি সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা
Position of the President

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা অত্যন্ত গৌরবময়। তিনি জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় আদর্শের প্রতীকস্বরূপ।

চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণীত হবার পূর্বে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান।

দ্বাদশ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতি আবারো হয়েছেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তাঁর পদমর্যাদা অনেকটা বৃটেনের রাজা বা রানীর মতো। প্রচুর সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী হলেও তাঁর ক্ষমতা সীমিত। শুধু আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। কেবল প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে অবশ্য রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টাদের তিনিই নিয়োগদান করবেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকবেন। এ সময়ে রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বিভাগের উপরও নিয়ন্ত্রণ রাখবেন।

রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা
Ordinance-Making Power of the President

রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিবিধ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন।

প্রথম, যখন সংসদের অধিবেশন থাকে না তখন যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে তখন সেই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন।

দ্বিতীয়, সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন এবং সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ সংসদ আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু তিনি নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পালন করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। তিনি অধ্যাদেশে এমন বিধান করবেন না—

(ক) যা সংবিধানের অধীনে সংসদের আইনের দ্বারা করা সম্ভব নয়।

(খ) যা সংবিধানের কোন বিধানকে সংশোধন করে বা রহিত করে।

(গ) যা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশকে অব্যাহত রাখতে পারে।

কোন অধ্যাদেশ জারি হলে তা সংসদের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে উপস্থাপনের ৩০ দিন পর তা বাতিল হয়ে যাবে।

মন্ত্রিপরিষদ
Cabinet

সংবিধানের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী যেরূপ স্থির করবেন সেরূপ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।" দ্বাদশ সংশোধন আইনে মন্ত্রিপরিষদের কাঠামো, কার্যক্রম এবং বৈশিষ্ট্যে মৌল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। চতুর্থ সংশোধন আইনে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্বহীন হয়ে ওঠে। নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ সংস্থায় তা রূপান্তরিত হয়। দ্বাদশ সংশোধন আইনে মন্ত্রিপরিষদ আবারো তার পূর্ব গৌরব ফিরে পায়। প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদ প্রয়োগ করবে।

মন্ত্রিপরিষদের গঠন
Composition

বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিদের সমন্বয়ে। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন বলে যে সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করবেন। মন্ত্রিগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন, তবে সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন অথচ সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিদেরকেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারবেন। এভাবে নিযুক্ত মন্ত্রিদের সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যদের এক-দশমাংশের অধিক হবে না। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করতে পারবেন।

মন্ত্রিপরিষদের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Cabinet

দ্বাদশ সংশোধন আইনে যে মন্ত্রিপরিষদের সৃষ্টি হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানে বলা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।"

(২) মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

(৩) সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হলেও নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংগঠিত মন্ত্রিপরিষদ।

(৪) মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ব্যক্তিত্বেই মন্ত্রিপরিষদে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত।

(৫) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রিদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময় কোন মন্ত্রিকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করতে পারেন। সেই মন্ত্রী পদত্যাগ না করলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারবেন।

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যক্রম
Powers and Functions of the Cabinet

চতুর্থ সংশোধন আইনে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিক সরকার প্রচলিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি হন রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদ ছিল রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ এক সংস্থা। মন্ত্রিগণ দায়ী থাকতেন রাষ্ট্রপতির নিকট। রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী তাঁরা এ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও প্রভাবের নিকট মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল নিষ্প্রভ।

দ্বাদশ সংশোধন আইনে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলে মন্ত্রিপরিষদের দিন ফিরেছে। ফিরে এসেছে তাদের পূর্বগৌরব এবং ক্ষমতা। শাসন-কাঠামোয় মন্ত্রিপরিষদই এখন মৌল সূত্র, সকল নির্বাহী ক্ষমতার চাবিকাঠি। দ্বাদশ সংশোধন আইনে বলা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে" [অনুচ্ছেদ ৫৫ (২)]। চতুর্থ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতি নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। দ্বাদশ সংশোধন আইনে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তা ন্যস্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ এখন শাসন-প্রশাসনে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। শাসন ব্যবস্থার চারদিক ঘিরে রয়েছে তাদের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ। নিচে তার আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো।

(১) নীতি নির্ধারণ (Policy-Making) ঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা ও নৈপুণ্য আনয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ করে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মোটকথা নীতি নির্ধারণ মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(২) সমন্বয় সাধন (Coordination) ঃ রাষ্ট্রের সকল বিভাগ সংহত করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাজ। নির্বাহী বিভাগ ও সংসদের মধ্যে সহযোগিতার সূত্র রচনাও একটি প্রধান কাজ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের শীর্ষে রয়েছেন মন্ত্রিগণ। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁরা কার্য পরিচালনা করে থাকেন। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীনে তাঁরা শাসনসংক্রান্ত মূলনীতিও নির্ধারণ করেন। সে অনুযায়ী শাসনবিভাগ পরিচালিত হয়।

(৩) আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দান (Law-Making and Leadership in the Sangsad) ঃ আইন প্রণয়ন ও আইন পরিষদে নেতৃত্ব দান মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ। সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের কর্মসূচি প্রণয়ন করা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ নীতিগুলো সরকারি নীতি বলে পরিচিত। মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য সংসদের সদস্য নাও হতে পারেন, কিন্তু সকলে সংসদে বক্তৃতা করতে এবং সংসদের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে তিনি সদস্য না হলে সংসদে ভোটদান করতে পারবেন না।

(৪) বাজেট প্রণয়ন (Budget Making) ঃ জাতীয় বাজেট তৈরি করার দায়িত্ব মূলত মন্ত্রিপরিষদের। অর্থমন্ত্রী এ দায়িত্ব পালন করেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের সহযোগিতা লাভ করেন। বাজেট প্রণয়ন করে সংসদ কর্তৃক তার অনুমোদন লাভ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সংসদের অনুমোদন লাভের ব্যবস্থা করেন।

(৫) প্রতিরক্ষামূলক (Defence) ঃ দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রধানত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের সমষ্টিগত প্রজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। দেশের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধান তাই মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম গুরু দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ মন্ত্রিপরিষদের সম্পন্ন করতে হয়।

(৬) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ (Foreign Policy Determination) : প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ, বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা লাভ করে, জাতীয় স্বার্থ (national interest) সমুন্নত রেখে মন্ত্রিপরিষদ এ ভূমিকা পালন করে।
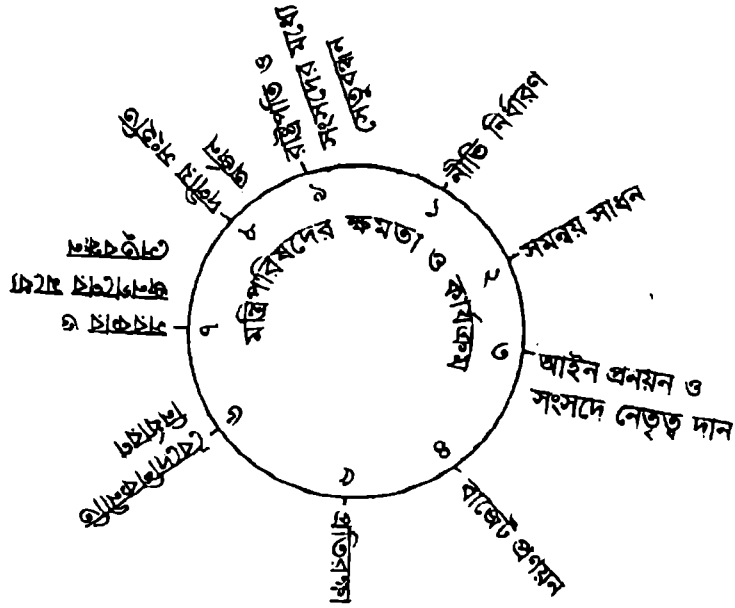
(৭) সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন (Link between the People and Government): মন্ত্রিপরিষদ সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সরকারি নীতি জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং ঐ সব নীতির পেছনে জন সমর্থন লাভ করে মন্ত্রিপরিষদ।

(৮) দলীয় সংহতি অর্জন (Consolidation of Party) : মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ দলীয় নেতা। দলীয় নেতা হিসেবে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ দলের সংহতি বৃদ্ধি করেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা অর্জন করেন। জনগণের নিকট দলের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন।

(৯) রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের মধ্যে সেতুবন্ধন (Link between President and Sangsad) : মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদ এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ। জাতীয় সংসদের চিন্তা-ভাবনার সাথে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখেন। পররাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে সজ্ঞাত করেন।

মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদ
The Cabinet and the Parliament

চতুর্থ সংশোধন আইন ও অন্যান্য আদেশ কার্যকরী হবার পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতেন। অন্যান্য মন্ত্রিরাও সংসদের সদস্য ছিলেন। সংসদ মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করলে অথবা অর্থবিল বা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক আনীত যে কোন বিল সংসদে গৃহীত না হলে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে যেত। অপরদিকে মন্ত্রিপরিষদ সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করত, তার কার্য পরিচালনা করত ও প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাষ্ট্রপতি সংসদকে ভেঙ্গে দিতে পারতেন।

চতুর্থ সংশোধন আইনে মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদের সম্পর্কে গভীর পরিবর্তন সাধিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির সন্তোষজনক সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকত। সংসদের নিকট মন্ত্রিপরিষদের কোন যৌথ দায়িত্ব ছিল না। সংসদ মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে যেত না অথবা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক আনীত কোন বিল সংসদ প্রত্যাখ্যান করলেও তার কোন ক্ষতি হতো না।

দ্বাদশ সংশোধন আইনে বাংলাদেশে আবারো প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। সংবিধানের ৫৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।" প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হবে মন্ত্রিপরিষদ। প্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। মন্ত্রিপরিষদের নয়-দশমাংশ সদস্যই সংসদের সদস্য। শুধু এক-দশমাংশ সদস্য সংসদের বাইরে থেকে আসতে পারেন।

সংসদের অনাস্থা ভোটে মন্ত্রিপরিষদ অপসারিত হবে। শুধু তাই নয়, সংসদ বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে, মন্ত্রিপরিষদের কোন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, বাজেট অনুমোদন না করে অথবা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করতে পারেন। তবে তিনি সংসদ সদস্য না হলে ভোট দিতে পারবেন না। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সংসদের প্রভাবশালী সদস্য। তাঁরাই সংসদের কার্য পরিচালনা করেন এবং নীতি নির্ধারণ করেন। সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের কর্মসূচি ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ। অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে অর্থবিল সংসদে পেশ করা হবে। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদ সংসদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদের সম্পর্ক এখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

মোটকথা, তত্ত্বগত দিক থেকে মন্ত্রিপরিষদের আয়ু নির্ভর করছে সংসদের আস্থার উপর। বাস্তবে কিন্তু সংসদ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক।

মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি
Cabinet and President

চতুর্থ সংশোধন আইনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নামে প্রজাতন্ত্রের সকল কার্য পরিচালিত হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসনব্যবস্থার চাবিকাঠি ছিল মন্ত্রিপরিষদ। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়োগ করতেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কার্যনির্বাহ করতেন।

চতুর্থ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতির হাতে প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। রাষ্ট্রপতি সেই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রয়োগ করতেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী, এক বা একাধিক উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করতেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির সন্তোষজনক সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতেন। মন্ত্রিগণ ছিলেন অনেকটা রাষ্ট্রপতির পরিবারের অনুগত সদস্যের মতো।

দ্বাদশ সংশোধন আইন প্রবর্তিত হলে রাষ্ট্রপতি আবারো হয়েছেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। রাষ্ট্রপতির নামে সকল নির্বাহী ব্যবস্থা পরিচালিত হলেও শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ। রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করবেন বটে, কিন্তু মৌল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ দান করবেন। মন্ত্রিপরিষদ কিন্তু দায়ী সংসদের নিকট, রাষ্ট্রপতির নিকট নয়। মূলত প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্রপতি তাঁর সকল কার্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো সম্পন্ন করবেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য রাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন।

প্রধানমন্ত্রী
The Prime Minister

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদের মধ্যমণি। তাঁকে মন্ত্রিপরিষদ **'স্থাপত্যের প্রধান প্রস্তর'** বলা যেতে পারে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে এবং বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবে তাঁর গুরুত্ব ও পদমর্যাদা অনন্য। চতুর্থ সংশোধন আইন ও অন্যান্য সংশোধন আদেশের ফলে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা অনেকটা অবনত হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধন আইনের পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ ছিল বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রভূমি এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু। মন্ত্রিপরিষদের উত্থান, পতন, জীবন, মৃত্যু প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল ছিল।

দ্বাদশ সংশোধন আইনে বাংলাদেশে আবারো প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। সূচিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের নতুন অধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীই প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৫৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে।" ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়, "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।" প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সংসদের নিকট, রাষ্ট্রপতির নিকট নয়।

সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী থাকবেন অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদের নয়-দশমাংশ সদস্য সংসদ সদস্যগণের মধ্য থেকে নিয়োগ লাভ করবেন। এক-দশমাংশ নিয়োগ লাভ করতে পারেন সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ছিল ৪১ সদস্যের এক মন্ত্রিপরিষদ। এ পরিষদে ছিলেন ২২ জন মন্ত্রী, ১৬ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৩ জন উপমন্ত্রী। দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী "কেবিনেট স্থাপত্যের প্রধান প্রস্তর" ('Keystone of the cabinet arch')। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছিল ৪৬ সদস্যের এক মন্ত্রিপরিষদ। পরবর্তী সরকারের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে।

কেবিনেটের উত্থান এবং পতন, জীবন এবং মৃত্যু প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। তিনি পদত্যাগ করলে মন্ত্রিপরিষদ বিলুপ্ত হবে। **জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে, কেবিনেটের সভাপতি হিসেবে, সমকক্ষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হিসেবে (*primus inter pares*) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী।**

ডঃ জেনিংস (*Jennings*) বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যা বলেছেন তা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন, **"প্রধানমন্ত্রী যেন একটি সূর্য। তাঁর চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহসমূহ আবর্তিত হয়"** ("He is rather a sun around which political planets revolve")।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলি এবং ক্ষমতা
Functions and Powers of the Prime Minister

প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলি ও ক্ষমতা নয় ভাগে বিভক্ত করে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সার্বিক আস্থা ঃ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করলেও এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির তেমন স্বাধীনতা নেই। যে সংসদ সদস্যকে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতি মনে করবেন তাকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। সাধারণ নির্বাচনে জনগণই প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন করেন। রাষ্ট্রপতি শুধু আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন। সংসদ সদস্য না থাকলে বা পদত্যাগ করলে অথবা সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করলে প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, অন্য কোন পন্থায় নয় (সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ)। সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মত লিখিতভাবে তিনি রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দেবেন। অন্য কেউ সংসদের আস্থাভাজন নেই মনে করলে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেবেন।

(২) প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের নেতা ঃ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই কেবিনেট গঠিত হয়। "তাঁকে কেন্দ্র করেই কেবিনেট কার্য পরিচালনা করে এবং তাঁর পতন ঘটলে তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘটে" ("He is central to its (cabinet) formation, central to its life and central to its death.")। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য অন্যান্য মন্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন না। 'তিনি সমকক্ষদের মধ্যে প্রধান কিন্তু স্বৈরাচারী নন' (He is more than *primus inter pares,* but less than an autocrat)।

(৩) প্রধানমন্ত্রী সমগ্র শাসন ব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ ঃ প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, কেবিনেটের প্রধান এবং শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক। রাষ্ট্রপতির নামে শাসন পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় তিনিই করেন। সকল বিভাগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা তাঁকেই করতে হয়। রাষ্ট্রপতির প্রত্যেকটি নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর মতামত প্রতিফলিত হয়। যে কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর নিকট আপীল করা চলে। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যই চূড়ান্ত।

(৪) প্রধানমন্ত্রী এক সেতুবন্ধন স্বরূপ ঃ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন স্বরূপ। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মত রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিদের নিয়োগ দান করেন। তার পরামর্শ মত তিনি মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। সংবিধানের ৪৮ (৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখেন। রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যে কোন বিষয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা ঃ দলীয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্থান অদ্বিতীয়। তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে দলটি কর্মক্ষেত্র রচনা করে। আধুনিক গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনের অর্থ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন। এও অবশ্য সত্য, ব্যক্তিত্বই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। বলা হয়, "যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরই নির্ভর করে এই পদের গুরুত্ব" ("The office of the prime minister varies

enormously with the personality of the person who holds it")। তাঁর পদমর্যাদা এবং প্রভাব গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা হয়, "আইনগতভাবে নির্ধারিত ক্ষমতার দ্বারা নয়, বরং দলীয় কাঠামোয় তাঁর প্রভাবই নির্ধারণ করে তাঁর ক্ষমতা" ("His authority is a matter of influence in the context of party structure and not in defined powers legally conferred")।

(৬) প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র নীতির প্রধান নির্ধারক : প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর সম্মতি ব্যতীত কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৭) জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক : প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সংকটকালে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে আসে।

(৮) জরুরি অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী : দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। সেই অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদকে পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে পারেন।

(৯) প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নেতা : আন্তর্জাতিকতার এ যুগে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের মুখপাত্র, রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং জাতীয় নেতা।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী
The President and the Prime Minister

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি তাঁর নেতৃত্বে নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করবে প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার উপর। **জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হবেন বাংলাদেশের কর্ণধার—জনগণমন অধিনায়ক।**

রাষ্ট্রপতি একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা এবং দলের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে দলটি কার্যক্রম নির্ধারণ করে। তাঁর ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে সেতুবন্ধনস্বরূপ।

রাষ্ট্রপতি যা করেন তাতে প্রধানমন্ত্রীর মতামতই প্রতিফলিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতির চরমাধিকার প্রয়োগ করেন।

শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির নামে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলেও প্রয়োগ করেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তি। রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যের বণ্টন করেন তত্ত্বগতভাবে, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই তা করেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য সংসদে যা ঘটছে সে সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখেন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা

সংসদ ভেঙ্গে দেবার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হবার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংগঠিত হবে (সংবিধানের ৫৮ খ অনুচ্ছেদ)। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দ্বারা এবং তাঁর কর্তৃত্বে এই মেয়াদে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।

প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা ও অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ লাভ করবেন। তিনি অসমর্থ হলে বা অস্বীকৃতি জানালে তার অব্যবহিত পূর্বে অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। তিনি অসমর্থ হলে আপীল বিভাগের বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে, তিনিও যদি অসমর্থ হন তাহলে তার অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে, তিনিও যদি অস্বীকৃতি জানান তাহলে প্রধান উপদেষ্টা হবার যোগ্য কোন নাগরিককে, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হবেন।

প্রধান উপদেষ্টার কতকগুলো যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে। তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হবেন না। আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং বাহাত্তর বছরের অধিক বয়স্ক নন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন সে তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান ঘটবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সহায়তায় সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করবেন। এই সরকার কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ সহায়তা দান। এ সময়ে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ মতো কাজ করবেন না এবং কোন পর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষা করবেন না। প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ ও ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ

বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ ও ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে কিছু পার্থক্য। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো। এদের মধ্যে কিছু কিছু মিল রয়েছে। **প্রথম,** উভয় ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বে সংহতি লাভ করে এবং সচল এক রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে কার্যকর থাকে। **দ্বিতীয়,** উভয় মন্ত্রিপরিষদই বিশিষ্ট ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। উভয় ক্ষেত্রেই মন্ত্রিপরিষদ নীতি নির্ধারণ করে এবং পরিষদের আলোচনা গোপন থাকে। **তৃতীয়,** উভয় ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ লাভ করেন রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক। **চতুর্থ,** উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন ব্যক্তি।

দুই-এর মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও অমিলও রয়েছে প্রচুর। **(এক)** বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ সংবিধানের সৃষ্টি, কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ প্রথা ভিত্তিক (based on convention)। **(দুই)** বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ একটি সুসংহত সংস্থা। বৃটেনে কিন্তু কেবিনেট এবং মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বৃটেনে কেবিনেটের সদস্যপদ গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নেতৃবৃন্দ। আকারেও তা ছোট। মন্ত্রিপরিষদ কিন্তু বৃহৎ এক সংস্থা। বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরাও এর সদস্য। **(তিন)** বৃটেনের মন্ত্রিপরিষদের রয়েছে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি। তার কার্যক্রম হয় লিখিত এবং তা সংরক্ষিতও হয়। বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মধারা নেই। যা আছে সে সম্পর্কে আদালত কোনরূপ অনুসন্ধান করতে পারবে না। **(চার)** ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য নির্বাচিত, কিন্তু বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদের এক-দশমাংশ নির্বাচিত না হলেও চলে।

১। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হবেন? (How is the President of Bangladesh elected?) [ঢা. বো. ১৯৮৬, '৯০]

২। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কীভাবে অভিশংসিত হবেন? (How is the President of Bangladesh impeached?)

৩। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। (Discuss the powers and functions of the President according to the Constitution.)

৪। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং অপসারণ সম্বন্ধে কী জান? (What do you know about the election and impeachment of the President in Bangladesh?)

৫। বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির বিচার বিভাগীয় এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the judicial and legislative activities of the President in Bangladesh.)

৬। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও। (Describe the powers and functions of the Prime Minister in Bangladesh.) [N. U. 2003]

৭। বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the position of the Prime Minister in Bangladesh.) [N. U. 2003] [ঢা. বি. ১৯৮৪]

৮। বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার কার্যাবলি কী কী? (What are the functions of the Bangladesh Cabinet?)

৯। বাংলাদেশ সংসদ ও মন্ত্রিসভার মধ্যে কী সম্পর্ক বিদ্যমান? (What relations do exist between the Cabinet and the Parliament in Bangladesh?)

১০। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে কী সম্পর্ক বিদ্যমান? (What relation does exist between the Prime Minister and President in Bangladesh?)

১১। বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। (Discuss the features of the constitution of Bangladesh.) [N. U. 1995, 2000]

জাতীয় সংসদ

PARLIAMENT

১০

বাংলাদেশ সংবিধানে এক-কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইন পরিষদের বিধান রয়েছে। এর নাম 'জাতীয় সংসদ' (House of the Nation)। বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা জাতীয় সংসদে ন্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এখানে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের গঠনপ্রণালী সহজতর। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভাগাভাগি এতে নেই। আর্থিক দিক দিয়েও তা শ্রেয়। জাতীয় সংসদের প্রধান কেন্দ্র ঢাকা।

জাতীয় সংসদের গঠন প্রণালী
Composition of the House of the Nation

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ তিনশত (৩০০) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। তাছাড়া, সংবিধান কার্যকর হবার দিন থেকে দশ বছরের জন্য আরও ১৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। রাষ্ট্রপতি ১৯৭৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে জারিকৃত সংবিধানের **দ্বিতীয় ঘোষণা (পনরতম সংশোধনী)** আদেশ বলে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসনের পরিবর্তে ৩০টি আসন নির্ধারণ করেছেন এবং তা কার্যকর হবার দিন থেকে দশ বছরের পরিবর্তে পনের বছর চালু থাকবে। অন্যকথায় বর্তমানে সংরক্ষিত আসনসহ জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা হলো ৩৩০। সংসদের ৩০০ জন সদস্য এক সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে নির্বাচিত হবেন। সংরক্ষিত আসন ছাড়াও মহিলারা অন্যান্য আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। পূর্বাহ্নে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক তা ভেঙ্গে দেয়া না হলে সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তা ভেঙ্গে যাবে। কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য হবেন না। যদি কেউ একাধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন তাহলে তিনি ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে চান তা জ্ঞাপন করে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্তের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দেবেন। তখন অন্য এলাকার আসন শূন্য হবে। যদি তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ হন, তা হলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই সকল আসন শূন্য হবে এবং তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।

সংসদ সদস্যপদের যোগ্যতা
Qualifications of Members of the House of the Nation

সংসদের সদস্য নির্বাচিত হতে হলে কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে ঃ

(এক) তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(দুই) তার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে হবে।

নিম্নলিখিত কারণে কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য পদের অযোগ্য হবেন ঃ

(এক) যদি কোন যোগ্য আদালত তাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করে।

(দুই) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর যদি দায় থেকে অব্যাহতি না পেয়ে থাকেন।

(তিন) যদি তিনি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে থাকেন বা বিদেশী কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে থাকেন।

(চার) তিনি যদি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকেন এবং তার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে না থাকে।

(পাঁচ) যদি কোন প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

(ছয়) যদি কোন প্রজাতন্ত্রের আইন দ্বারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হয়ে থাকেন। অবশ্য উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি "কেবল মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।" কোন সংসদ সদস্য তার নির্বাচনের পর উল্লিখিত কোন অযোগ্যতার অধীন হয়েছেন কিনা- সে সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সংসদের আসন শূন্য হওয়া সম্পর্কেও সংবিধানে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোন সংসদ সদস্য স্পীকারের নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। তাছাড়া নিম্নলিখিত কারণেও সদস্যদের আসন শূন্য হবে।

(এক) যদি তার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে তিনি নির্ধারিত শপথ গ্রহণ করতে বা শপথ পত্রে স্বাক্ষর দানে অসমর্থ হন। অবশ্য স্পীকার যথার্থ কারণে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(দুই) যদি সংসদের অনুমতি ব্যতীত একাদিক্রমে নব্বই (৯০) বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।

(তিন) যদি সংসদ ভেঙ্গে যায়।

(চার) যদি তিনি সংবিধানের কোন ধারা মতে অযোগ্য ঘোষিত হন।

(পাঁচ) যদি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়ে নির্বাচনের পর উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন বা সংসদে সেই দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে থাকেন।

পরিষদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি
Privileges and Immunities of The Sangsad and Its Members

জাতীয় সংসদ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নের সংস্থা এবং জাতীয় সমস্যা আলোচনার পীঠস্থান। সংসদের দায়িত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি তা কতকগুলো বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। সংসদ ও সংসদ-সদস্যদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

(এক) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। সংসদ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা।

(দুই) সংসদে যে সদস্য বা কর্মকর্তার উপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত, তিনি এ সব বিষয়ে কোন আদালতের এখতিয়ারে আসবেন না।

(তিন) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কোন কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।

(চার) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্ব কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

(পাঁচ) সংসদ আইনের দ্বারা সংসদের কমিটিসমূহের বা সংসদ-সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করবেন।

(ছয়) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে এবং সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(সাত) সংসদ সদস্যগণের বেতন, ভাতা ও বিশেষ অধিকার সংসদের আইনের ধারা নির্ধারিত হবে।

সংসদের অধিবেশন
Sessions of the Sangsad

সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান করবেন, সংসদের কার্যধারা স্থগিত করবেন ও সংসদ ভঙ্গ করবেন। এই বিষয়ে একটি শর্ত রয়েছে এবং তা হলো সংসদের দুটি অধিবেশনের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি বিরতি থাকবে না। কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভোট গ্রহণের তারিখ হতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে সংসদের প্রথম বৈঠক আহ্বান করা হবে।

সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর, কিন্তু প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে সংসদ আইন দ্বারা তার মেয়াদ এককালে এক বছর বর্ধিত করতে পারবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হলে বর্ধিত মেয়াদ ছয় মাসের বেশি হবে না।

সংসদ ভঙ্গ হবার পর রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, যুদ্ধাবস্থায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন রয়েছে, তবে তিনি ভেঙ্গে দেয়া সংসদ পুনরায় আহ্বান করবেন। সংসদের অন্যূন ষাট (৬০) সদস্য সমন্বয়ে কোরাম গঠিত হবে।

সংসদের কার্য পদ্ধতি
Procedure of the Sangsad

সংসদ কর্তৃক কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হবে। ষাট (৬০) জন সদস্য উপস্থিত না থাকলে সংসদের বৈঠক মুলতবী হবে বা স্পীকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখবেন।

উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উভয় পক্ষে কোন সময় সমান সংখ্যক ভোট হলে সংসদের স্পীকার তার নির্ণয়ার্থক ভোট (casting vote) দ্বারা তার সমাধান করবেন। তাছাড়া, স্পীকার নিরপেক্ষ থাকবেন। সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রয়েছে—এ কারণে সংসদের কোন কার্য অবৈধ হবে না।

রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে এবং প্রত্যেক বছর অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করবেন।

কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হবেন। এই দুই পদের যে কোন একটি শূন্য হলে সাত দিনের মধ্যে অথবা সংসদের পরবর্তী প্রথম বৈঠকে একজনকে নির্বাচিত করবেন।

সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ
Standing Committees of the Sangsad

সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যগণের মধ্য থেকে সদস্য সহযোগে সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন ঃ

(এক) সরকারি হিসাব কমিটি।

(দুই) বিশেষ অধিকার কমিটি।

(তিন) অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

তাছাড়া, প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত কমিটি নিয়োগ করবে। সংসদের কার্যপ্রণালী পরিচালনায় কমিটিগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং প্রত্যেকটি জরুরি কাজের সাথে কমিটি কোন না কোনভাবে জড়িত। সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো সাধারণত নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করবে ঃ

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত দিকের পরীক্ষা।

(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা ও সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দান।

(গ) গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সম্পর্কে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান পরিচালনা।

(ঘ) সংসদ কর্তৃক ন্যস্ত যে কোন দায়িত্ব পালন।

এই সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিটিগুলো বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ বা প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের ও দলিল-পত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা তাদের থাকবে। বাংলাদেশের সংসদে বর্তমানে ৩৭টি সংসদীয় কমিটি রয়েছে।

ন্যায়পাল
Ombudsman

বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা এক অভিনব পদক্ষেপ। সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা করবেন। আইন পরিষদের কাজ শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন নয়, প্রণীত আইন কিভাবে কার্যকর হচ্ছে, নির্বাহী বিভাগে তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, নির্বাহী কার্যাবলিতে জনগণের স্বার্থ কিভাবে এবং কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তারা কিভাবে জনস্বার্থ স্বীয় কর্মে তুলে ধরছেন তা পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও তদন্ত করার জন্য ন্যায়পালের সৃষ্টি।

ন্যায়পালের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হবে সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনের দ্বারা। সংসদ ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য তদন্ত করতে যেরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে, ন্যায়পাল সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং দায়িত্ব পালন করবেন।

ন্যায়পাল তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন এবং তা সংসদে উপস্থাপিত হবে। সংসদে তার উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কোন ন্যায়পাল নিযুক্ত হননি।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the Jatiya Sangsad

১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল সংসদীয় সরকার। তখন জাতীয় সংসদ ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্র। চতুর্থ সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হলে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পায়। ১৯৯১ সালে প্রণীত দ্বাদশ সংশোধন আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবারো প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। ফলে জাতীয় সংসদের ভাবমূর্তি হয়েছে উজ্জ্বল। সংসদের ক্ষমতা ও প্রভাব ক্ষেত্রেও সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : **(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, (২) অর্থ সংক্রান্ত, (৩) নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ, (৪) নির্বাচন সংক্রান্ত, (৫) বিচার বিভাগীয়, (৬) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত** এবং **(৭) বিবিধ**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো :
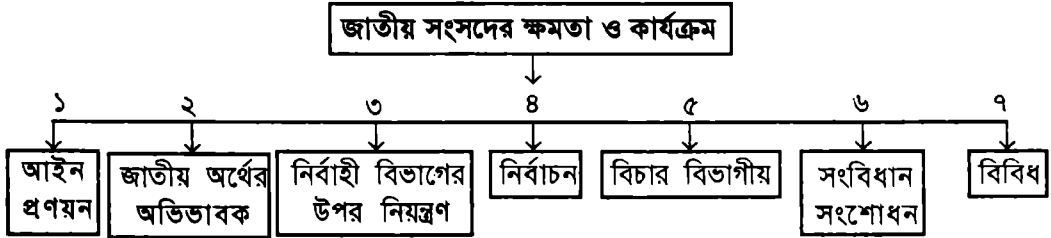
(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Power) : বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। সংসদ আইনের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ বিধি, প্রতি-বিধান বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন। এক অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে ষাট দিনের বেশি বিরতি থাকবে না। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হবে। সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে হয় তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন, না হয় বিলটি বা তার কোন অংশ পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে ১৫ দিন পরে তিনি বিলে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতির ফেরত পাঠানো বিল সংসদ পুনর্বিবেচনা পূর্বক তা পুনরায় গ্রহণ করে সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাবেন। ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে ৭ দিন পর সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে এবং তা আইনে পরিণত হবে। এ দিক থেকে বলা যায়, **আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ সার্বভৌম**।

(২) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Power) : জাতীয় সংসদ জাতীয় অর্থের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রণকারী। সংসদের মাধ্যমেই কর ধার্য হবে। ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রেও সংসদের ক্ষমতা সর্বাধিক। সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা কর সংগ্রহ করা যাবে না। প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে জাতীয় আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব বা বার্ষিক আর্থিক বিবরণী সংসদে পেশ

করা বাধ্যতামূলক। তা সংসদ কর্তৃক গৃহীত হবে। বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে ঃ (ক) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং (খ) অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় হবে রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁর দপ্তর পরিচালনার ব্যয়, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নির্বাচন কমিশনারগণ, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দেয় পারিশ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো পরিচালনার ব্যয়, প্রজাতন্ত্রের গৃহীত ঋণ পরিশোধ, সুদ পরিশোধ ও অন্যান্য ব্যয়। বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর এ অংশ সংসদে আলোচিত হবে, তবে তাঁর উপর ভোট গ্রহণ চলবে না। আর্থিক বিবরণীর অন্যান্য অংশ মঞ্জুরি দাবি আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে। এ ক্ষেত্রে সংসদের কর্তৃত্ব চূড়ান্ত। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরি দাবি করা যাবে না। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ সংবিধানে জাতীয় সংসদ হলো জাতীয় অর্থের অভিভাবক, নিয়ন্ত্রণকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। চলতি অর্থ মঞ্জুরি অপর্যাপ্ত হলে অতিরিক্ত আর্থিক বিবরণী বা সম্পূরক আর্থিক বিবৃতির মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হবে।

পঞ্চম সংশোধন আইনে ৯২(ক) ধারা মতে রাষ্ট্রপতি যেভাবে ১২০ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংযুক্ত তহবিল থেকে তোলার আদেশ দিতে পারতেন তার অবসান হয়েছে দ্বাদশ সংশোধন আইনে। এ দিক থেকেও সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over Executive) ঃ বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগের উপর জাতীয় সংসদের কর্তৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ সংশোধন আইন ও রাষ্ট্রপতির অন্যান্য সংশোধন আদেশের ফলে বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়। প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হয়। মন্ত্রিপরিষদ তার কার্যক্রম ও নীতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট ছিল দায়ী, সংসদের নিকট দায়ী নয়। ফলে নির্বাহী বিভাগের উপর সংসদের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়।

দ্বাদশ সংশোধন আইনে মন্ত্রিপরিষদ পূর্ণরূপে দায়ী হয়েছে সংসদের নিকট। সংসদের অনাস্থায় মন্ত্রিপরিষদ অপসারিত হবে। তাছাড়াও, মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব এবং সমালোচনার মাধ্যমেও সংসদ নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এক কথায়, জাতীয় সংসদ হয়েছে **জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস**।

(৪) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Electoral Powers) ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করবেন। সংসদের স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং সংসদের বিভিন্ন কমিটি সংসদ সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে মহিলা সদস্যগণ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। চতুর্দশ সংশোধন আইনে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা হয়েছে ৪৫। তারাও জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক।

(৫) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers) ঃ জাতীয় সংসদের কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধানের কোন ধারা লংঘন বা গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কোন অভিযোগে জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারবেন দু'-তৃতীয়াংশের ভোটে। সংসদ ন্যায়পালকেও অপসারিত করতে পারবেন।

(৬) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Amending Powers) ঃ সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে জাতীয় সংসদ সংবিধানের সংশোধন করতে পারেন। সংশোধনের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দু'-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন হবে। শুধু জাতীয় সংসদের ভোটে অবশ্য সংবিধানের প্রস্তাবনা,

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংশোধিত হবে না। এর জন্য প্রয়োজন হবে এক গণভোট।

(৭) বিবিধ (Miscellaneous) : জাতীয় সংসদের অন্যান্য ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য :

প্রথম, সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না বা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয়, যুদ্ধ কিংবা আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সংসদ যে কোন বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

তৃতীয়, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি এবং শৃঙ্খলামূলক অন্যান্য ব্যবস্থা সংসদ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

চতুর্থ, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা জাতীয় সংসদ আইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

পঞ্চম, এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের গঠন এবং তাদের কার্যক্রম ও ক্ষমতা সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ষষ্ঠ, জাতীয় সংসদ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি জাতীয় সংসদ অনুমোদন করবেন।

সপ্তম, রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা দেখা দিলে নবম সংশোধন আইন অনুযায়ী সংসদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অধিবেশনে বসবে এবং যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অষ্টম, সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করবেন।

সংসদের স্পীকার
Speaker

সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদের প্রথম বৈঠকে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হবেন। পরবর্তী সংসদের অধিবেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত স্পীকার স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কার্য পরিচালনা করবেন। বৃটেনের কমন্সসভার স্পীকারের ন্যায় বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের স্পীকার একজন দল নিরপেক্ষ ব্যক্তি। উভয় পক্ষে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত তিনি ভোটদান করবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে নির্ণায়ক (casting vote) ভোট প্রদান করবেন। সংসদের অধিকাংশ সদস্যদের ভোটে তিনি পদচ্যুত হবেন।

তাঁর কার্যাবলি (His Functions) : স্পীকার সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সংসদের কার্যবিবরণীতে অংশগ্রহণ করবেন না। সংসদে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তিনি রুলিং (ruling) দান করবেন। উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হলে তিনি নির্ণায়ক ভোট দেবেন। তিনি সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করবেন। বৈধতার সকল প্রশ্ন সমাধান করবেন। কোন বিল অর্থবিল কিনা তার চূড়ান্ত সমাধান তিনি দেবেন।

রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকলে বা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে কার্য করতে অক্ষম হলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। স্পীকার জাতীয় সংসদের নেতার সাথে পরামর্শ করে সংসদের কার্যপ্রণালী স্থির করেন। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তিনি সংসদের বৈঠক স্থগিত করেন, প্রয়োজনবোধে তিনি সাময়িকভাবে সংসদের বৈঠক বন্ধ রাখতে পারেন। সংসদে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তিনি সদস্যদেরকে সতর্ক করতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সদস্যদেরকে বহিষ্কার করতেও পারেন। তিনি সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান।

অর্থের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার স্বরূপ
Nature of Parliamentary Control over Money

জাতীয় অর্থের উপর সংসদের কর্তৃত্ব অপরিসীম। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোন কর ধার্য হয় না এবং কোন ব্যয়ও সম্ভব হয় না। জাতীয় অর্থের ব্যাপারে সংসদই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। সংসদ তার এই ক্ষমতার মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের উপরও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সংবিধানের ৮৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্র মত সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসেবে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয় সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। রাষ্ট্রপতির পনরতম সংশোধনী আদেশে অবশ্য সংসদের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। সংবিধানের ৯২ (ক) ধারায় বলা হয়, সংসদ যদি কোন আর্থিক বছরে কোন বিষয় মঞ্জুরি দাবী গ্রহণে ব্যর্থ হয় কিংবা অসম্মত হয় বা নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করে তবে রাষ্ট্রপতি অনধিক ১২০ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংযুক্ত তহবিল থেকে তোলার আদেশ দিতে পারবেন। দ্বাদশ সংশোধনী আইনে তার অবসান ঘটে।

অর্থ বিল
Money Bill

অর্থ বিল বলতে আমরা সেই সকল বিলকে বুঝি যাতে কর ধার্য, কর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন, ঋণ গ্রহণ বা ঋণ পরিশোধ, ব্যয়ের মঞ্জুরি প্রভৃতি আলোচিত হয়। কোন বিল অর্থবিল কিনা তা নির্ধারণ করেন সংসদের স্পীকার। এই বিষয়ে তার মতামত চূড়ান্ত।

বাংলাদেশ সংবিধানে অর্থ বিল বলতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বা যে কোন একটি সম্পর্কে বিলকে বুঝাবে ঃ

(ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ।

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা সরকারের আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন প্রবর্তন বা সংশোধন।

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলের অর্থ প্রদান বা তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাহার।

(ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ বা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ।

(ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থ প্রাপ্তি বা অনুরূপ অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, সরকারের হিসাব নিরীক্ষা।

(চ) উল্লিখিত বিষয়ে নির্ধারিত কোন বিষয়ের অধীন কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়। কোন জরিমানা বা অর্থ দণ্ড আরোপ বা রদবদল বা লাইসেন্স ফী বা অন্য কাজের জন্য ফী আরোপ বা প্রদান বা কোন স্থানীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কর আরোপ বা নিয়ন্ত্রণের বিধান করা হয়েছে—এই কারণে কোন বিল অর্থ বিল বলে গণ্য হবে না।

কোন অর্থবিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে পেশ করা যাবে না। রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তার নিকট পেশ করার সময়ে প্রত্যেক বিলে স্পীকারের এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে তা অর্থ বিল।

সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা কর সংগ্রহ করা যাবে না।

সংযুক্ত তহবিল ও সরকারি হিসাব
Consolidated Fund and the Public Account

সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণ পরিশোধ থেকে সরকারের পাওনা সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হবে এবং তা সংযুক্ত তহবিল (Consolidated Fund) নামে অভিহিত হবে।

সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল অর্থ সরকারি হিসেবে জমা হবে। সরকারি হিসেবে আরও জমা হবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট জমা সকল অর্থ এবং কোন মকদ্দমা বা হিসাব বাবদ যে কোন আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত সব অর্থ।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট
Annual Financial Statement

প্রত্যেক অর্থ বছরের প্রারম্ভে উক্ত বছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপিত হবে। এটি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় করা যাবে—এই ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অন্যান্য ব্যয় থেকে রাজস্ব খাতে ব্যয় পৃথক করে দেখাতে হবে। নিম্নলিখিতগুলো সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় হবে ঃ

(এক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তার দপ্তর পরিচালনার জন্য ব্যয়।

(দুই) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং তাদের কার্যালয় পরিচালনার ব্যয়।

(তিন) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ এবং কার্যালয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ।

(চার) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং তার দফতর পরিচালনার ব্যয়।

(পাঁচ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ এবং কার্যালয় পরিচালনার ব্যয়।

(ছয়) সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যগণকে দেয় পারিশ্রমিক এবং তাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তর পরিচালনার ব্যয়।

(সাত) সুদ পরিশোধ তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তার ঋণ পরিশোধ এবং ঋণ সংগ্রহের জন্য অন্যান্য ব্যয় ও সরকারের ঋণ সংক্রান্ত সকল দেনার দায়।

(আট) কোন আদালত বা ন্যায়পীঠ কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

(নয়) সংবিধান বা সংসদে আইন দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলে ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

বার্ষিক আর্থিক তহবিলের যে অংশে সংযুক্ত তহবিলের দায় সম্পর্কিত অংশ রয়েছে, তা সংসদে আলোচিত হবে। কিন্তু তা ভোটের আওতাভুক্ত হবে না।

অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরি দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং সেই মঞ্জুরি দাবিতে সম্মতিদান বা সম্মতি দানে অস্বীকৃতির ক্ষমতা সংসদের রয়েছে।

সংসদ মঞ্জুরি দান করলে সংযুক্ত তহবিল থেকে নিম্নলিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ নির্দিষ্টকরণের জন্য সংসদে একটি বিল উত্থাপিত করা হবে। এটি হলো নির্দিষ্টকরণ আইন (Appropriation Act)। এই নির্দিষ্টকরণ আইনে থাকবে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরির অনুরূপ পরিমাণ এবং সংযুক্ত তহবিলের নির্দিষ্ট দায়। নির্দিষ্টকরণ আইনের মাধ্যম ছাড়া সংযুক্ত তহবিল থেকে কোন অর্থ প্রত্যাহার করা যাবে না।

সম্পূরক বা অতিরিক্ত মঞ্জুরি
Supplementary or Excess Grants

কোন অর্থ বছরে যদি দেখা যায় যে, কোন কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত হয়েছে বা তা আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত হয়নি বা মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক ব্যয়িত হলে রাষ্ট্রপতি একটি সম্পূরক আর্থিক বা অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ সম্বলিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতিও সংসদে উপস্থাপিত করাবেন।

তাছাড়া, কোন অর্থ বছরের কোন অংশের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরি দানের ক্ষমতা সংসদের রয়েছে। কোন কাজের বিশালতার জন্য আর্থিক বিবৃতিতে ব্যয় নির্ধারিত করা সম্ভব না হলে অনুরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য মঞ্জুরি দানের ক্ষমতা সংসদের থাকবে। কোন অর্থ বছরের চলতি ব্যয়ের অংশ নয় এরূপ ব্যতিক্রমী মঞ্জুরি দানের ক্ষমতাও সংসদের থাকবে। মঞ্জুরি দানের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাহারের ক্ষমতাও সংসদের থাকবে।

অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা
Ordinance Making Power

বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। সাধারণভাবে সংসদ তা পালন করবে। তা কোন শর্তাধীনে আবদ্ধ নয় বা কোনভাবে সীমিত নয়। তথাপি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রপতির উপর অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা (Ordinance-making power) ন্যস্ত করা হয়েছে। কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, তার বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

(এক) যখন সংসদের অধিবেশন থাকে না, তখন আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হলে তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। তা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা চলবে না, যা সংবিধান মোতাবেক সংসদের আইন দ্বারা আইন সঙ্গতভাবে করা যায় না বা যাতে সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হয়ে যায় বা যা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।

কোন অধ্যাদেশ জারি হলে তা সংসদের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে উপস্থাপনের পর ত্রিশ (৩০) দিন অতিবাহিত হলে বা এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে সংসদে অনুমোদিত না হলে তা সেই দিন থেকে বাতিল হয়ে যাবে।

(দুই) সংসদ ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্রপতির নিকট কোন সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে মনে হলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন, যাতে সংযুক্ত তহবিলকে ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে। এই ধরনের অধ্যাদেশও সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

এভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সংবিধানের ধারা অনুযায়ী পালিত হবে।

জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতি

দ্বাদশ সংশোধন আইনের পরে জাতীয় সংসদের সাথে রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। চতুর্থ সংশোধন আইনের ফলে দেশে যে সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে। চতুর্থ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতির অপসারণের (Impeachment) জন্য প্রয়োজন হতো জাতীয় সংসদের তিন-চতুর্থাংশের ভোটে সমর্থিত প্রস্তাব। বর্তমানে প্রয়োজন হয় সংসদ সদস্যের দু'-তৃতীয়াংশের ভোটে সমর্থিত প্রস্তাব। চতুর্থ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতির অপসারণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যে প্রয়োজন হতো সংসদ সদস্যদের দু'তৃতীয়াংশের সমর্থন। বর্তমানে প্রয়োজন হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট। বর্তমানে সংসদই রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে। সংসদই অপসারণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের সমাপ্তি ঘটায়। তাই দেখা যায়, বর্তমানে রাষ্ট্রপতির উত্থান পতনে জাতীয় সংসদই মূল।

রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন, মুলতবি ঘোষণা করেন, এমন কি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে জাতীয় সংসদকে ভেঙ্গে দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করবেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়।

সংবিধানের কোন ধারা লংঘন বা কোন গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণ বা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার অভিযোগে জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারবেন।

দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান। বৃটেনের রাজা বা রানীর মতো তিনি আলঙ্কারিক প্রধান। সংবিধানের ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী তিনি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়োগ দান করবেন।

জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ

চতুর্থ সংশোধন আইনে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হলে মন্ত্রিপরিষদের সাথে জাতীয় সংসদের সম্পর্ক অনেকটা পরোক্ষ হয়ে ওঠে। তখন মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট তার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য যৌথভাবে দায়ী ছিল না যদিও মন্ত্রিপরিষদের চার-পঞ্চমাংশ সদস্য জাতীয় সংসদের সদস্য। মন্ত্রিপরিষদ তখন ছিল রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী, জাতীয় সংসদের নিকট নয়। রাষ্ট্রপতির খুশিমত তাঁরা স্বপদে বহাল থাকতেন। জাতীয় সংসদ মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করলেও তাঁদের পদত্যাগ করতে হতো না। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ অবশ্য সংসদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং আইন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারতেন।

দ্বাদশ সংশোধন আইন প্রবর্তিত হবার পর জাতীয় সংসদের সাথে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট তার নীতি এবং কার্যক্রমের জন্য সর্বতোভাবে দায়ী। মন্ত্রিপরিষদের নয়-দশমাংশ জাতীয় সংসদের

সদস্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দান করেন। বাজেট পাস করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন নীতির ব্যাখ্যা দান করেন সংসদে। সংসদ সদস্যগণের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং জাতীয় সংসদের কার্য পরিচালনা করেন। জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন হয়েই তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। জাতীয় সংসদে মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতাচ্যুত হয়।

তাছাড়া, জাতীয় সংসদ মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে বা মুলতবি প্রস্তাবের মাধ্যমে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আলোচনা করে বা বাজেট বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করে মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

মোটকথা, সংসদীয় ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদই মন্ত্রিপরিষদের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই মন্ত্রিপরিষদের জন্ম হয়। এখানেই মন্ত্রিপরিষদের দক্ষতা প্রদর্শিত হয়। সংসদের অনাস্থায় মন্ত্রিপরিষদের আয়ু শেষ হয়।

জাতীয় সংসদ এবং প্রধানমন্ত্রী

দ্বাদশ সংশোধন আইনের ফলে জাতীয় সংসদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত সংসদ নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে, মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবে এবং সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্থান সংসদে অদ্বিতীয়। তাঁর কথাই চূড়ান্ত। তাঁর উপদেশই শেষ উপদেশ।

তত্ত্বগত দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাঁদের নীতি ও কার্যক্রমের জন্য সংসদের নিকট সর্বতোভাবে দায়ী। সংসদের অনাস্থা প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগে বাধ্য হন। কার্যত কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

মন্ত্রিপরিষদ গঠনে প্রধানমন্ত্রী সংসদের উপর নির্ভরশীল। সংসদ থেকে তাঁকে মন্ত্রিপরিষদের নয়-দশমাংশ সদস্য বাছাই করতে হয়। অতীতে এ সংখ্যা ছিল চার-পঞ্চমাংশ।

সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী সংসদে আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দেন। বাজেট অনুমোদনে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সরকারের বিভিন্ন নীতির ব্যাখ্যা দিতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে।

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন পদ্ধতির ন্যায়। এর নিম্নলিখিত পর্যায়গুলো উল্লেখযোগ্য ঃ (এক) বিল উত্থাপন, (দুই) প্রথম পাঠ, (তিন) দ্বিতীয় পাঠ, (চার) তৃতীয় পাঠ এবং (পাঁচ) রাষ্ট্রপতির সম্মতি।

আইন প্রণয়নের সূচনা হয় বিল উত্থাপনের মাধ্যমে। সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়াকে বিল বলা হয়। বিল দু'প্রকারের ঃ (ক) সরকারি বিল—এ সকল বিল মন্ত্রিগণ উথাপন করেন। (খ) বেসরকারি বিল—এ সকল বিল সংসদের সাধারণ সদস্যগণ উত্থাপন করেন। সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয় ৭ দিনের সময়, কিন্তু বেসরকারি বিলের জন্য প্রয়োজন ১৫ দিনের নোটিস।

বিল উত্থাপনের পর বিলের প্রথম পাঠ শুরু হয়। এ পর্যায়ে বিলটি নীতিগতভাবে গৃহীত হলে সংসদে বিবেচিত হতে পারে অথবা স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরিত হতে পারে। বিলটি বাছাই কমিটির নিকট প্রেরিত হতে পারে অথবা জনমত যাচাই-এর জন্য প্রচার করাও যেতে পারে। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের বিভিন্ন

ধারা ও উপ-ধারা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কোন সংশোধনীও এ পর্যায়ে সংযোজিত হতে পারে। তৃতীয় পাঠের সময় বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হলে স্পীকার তা সত্যায়িত করেন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে তা আইনে পরিণত হয়।
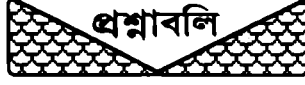
১। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের গঠন সম্বন্ধে কী জান? (What do you know about the composition of the Jatiya Sangsad according to the Bangladesh Constitution?)

২। সংসদের সদস্য পদের যোগ্যতা কী কী? কী কী কারণে প্রার্থী সংসদের সদস্য পদের অযোগ্য হবে? (What are the qualifications of the members of the Jatiya Sangsad. Under what circumstances a candidate can be disqualified for membership?)

৩। সংসদের কার্য পদ্ধতি ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে কী জান? (What do you know about the procedures of Parliament and what are the privileges and immunities of the members of the Sangsad?)

৪। ন্যায়পাল সম্পর্কে কী জান? তার কার্যাবলির বিবরণ দাও। (What do you know about the Ombudsman? Describe his functions.)

৫। সংসদের কমিটি ব্যবস্থা লইয়া আলোচনা কর। (Discuss the Committee System of the Jatiya Sangsad.)

৬। সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Discuss the powers and functions of the Jatiya Sangsad.)

৭। জাতীয় অর্থের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the nature of parliamentary control over national finance.)

৮। জাতীয় সংসদের স্পীকারের নির্বাচন ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the method of election of the speaker in the Jatiya Sangsad and his functions.)

৯। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা সম্বন্ধে কী জান? (What do you know about the ordinance making power of the President?)

বিচার বিভাগ

THE JUDICIARY

১১

সূচনা
Introduction

"বিচার বিভাগের দক্ষতাই সরকারের শাসন ক্ষমতার দক্ষতা এবং যোগ্যতার মানদণ্ড"—লর্ড ব্রাইসের এই উক্তি যথার্থ। বাংলাদেশ সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান বহির্ভূত কোন বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে শাসনতন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হতে সাহায্য করবে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে ও আইনের অনুশাসনকে অক্ষুন্ন রেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সজীব করে রাখবে। তাই বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতাও এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সুপ্রীম কোর্ট
The Supreme Court

সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং বিচার বিভাগের শীর্ষমণি। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ সমন্বয়ে তা গঠিত হবে।

প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক সহযোগে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি বিচারকদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপীল বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন এবং অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্টে আসন গ্রহণ করবেন। সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ বিচার কার্য ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।

বিচারকগণের যোগ্যতা
Qualifications of the Judges

প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে ঃ

(এক) তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(দুই) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বছর কাল অ্যাডভোকেট থাকতে হ বে। অথবা,

(তিন) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কাল কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে বা দশ বছর কাল অ্যাডভোকেট থাকতে হবে বা অন্যূন তিন বছর কাল জেলা বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ করতে হবে।

বিচারকদের কার্যকাল
Tenure of the Judges

সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। চতুর্থ সংশোধন আইনের পূর্বে সংবিধানে বিধান ছিল যে, প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই–তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত জাতীয় সংসদের প্রস্তাব ক্রমে রাষ্ট্রপতির আদেশে কোন বিচারককে অপসারিত করা যাবে। চতুর্থ সংশোধন আইনে জাতীয় সংসদের ভূমিকা ছিল না। রাষ্ট্রপতির আদেশে কোন বিচারক তার পদ থেকে অপসারিত হবেন। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিলে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির সংশোধনী আদেশে অবশ্য বলা হয়েছে, বাংলাদেশে একটি বিচার পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদ সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করবেন। কোন বিচারক রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত পদত্যাগপত্র পেশ করেও পদত্যাগ করতে পারবেন। অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারক বা অপসারিত বিচারক কোন আদালতে ওকালতি করবেন না বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হলে বা অনুপস্থিত কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে প্রবীণতম ব্যক্তিকে অনুরূপ কার্যভার দান করবেন। সাময়িকভাবে বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অনধিক দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক পদে নিযুক্ত করবেন।

সুপ্রীম কোর্টের আসন
Seat of the Supreme Court

রাজধানী ঢাকায় সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি অন্য যে কোন স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতে পারবেন।

এরশাদ সরকার ১৯৮২ সালে এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা ছাড়া রংপুর, যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপিত হয়। ১৯৮৮ সালের ৭ জুনে গৃহীত অষ্টম সংশোধন আইনে সংবিধানের ১০০ ধারাটি সংশোধন করে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বরে সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে অষ্টম সংশোধন আইনের ২নং বিধি অর্থাৎ ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী এবং ফলে তা বাতিল বলে গণ্য করেন।

বিচারকদের মাহিনা
Salary of the Judges

সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের মাহিনা, ভাতা ও অন্যান্য শর্তাবলি সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মাসিক মাহিনা ব্যতীত তারা আবাসিক, যাতায়াত সংক্রান্ত ও আয়কর থেকে মুক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
Powers and Functions of the Supreme Court

আলোচনার সুবিধার জন্য সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার ও কার্যাবলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো ঃ যথা—(১) হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার ও কার্যাবলি এবং (২) আপীল বিভাগের এখতিয়ার ও কার্যাবলি।

১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার (Jurisdiction of the High Court Division)

(ক) সংবিধান ও অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের মৌলিক, আপীল সংক্রান্ত ও অন্যান্য এখতিয়ার থাকবে।

(খ) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করার জন্য যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশ বা আদেশ দান করতে পারবে।

(গ) হাইকোর্ট বিভাগ যথাযথ বিবেচনার পর যদি মনে করেন যে, আইনের দ্বারা উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি—তা হলে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিকে অনুমোদিত কার্য থেকে বিরত থাকতে বা অনুমোদিত কার্য করতে নির্দেশ দিবেন অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির কার্য বা নীতি আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতীত গৃহীত হয়েছে এবং তার কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে পারেন।

তাছাড়া, হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করেন, আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয়েছে তা হলে উক্ত সরকারি পদে আসীন ব্যক্তি কোন কর্তৃত্ব বলে অনুরূপ পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করছেন তা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে আদেশ দান করতে পারবেন।

চতুর্থ সংশোধন আইনে হাইকোর্ট বিভাগের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের এখতিয়ার কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৭৬ সালের ২৮ মে তারিখের রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় এবং সর্বশেষ দ্বাদশ সংশোধন আইনে তা সংরক্ষিত হয়।

(ঘ) বাংলাদেশে সকল আদালত ও ন্যায়পীঠের উপর হাইকোর্ট বিভাগ তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) যদি হাইকোর্ট বিভাগ মনে করেন যে, অধীনস্থ কোন আদালতের মকদ্দমায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত আইনের জটিল প্রশ্ন বা গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থমূলক প্রশ্ন রয়েছে, তবে হাইকোর্ট বিভাগ মকদ্দমাটি তুলে এনে স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারবেন এবং নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন অথবা আইনের প্রশ্ন সমাধান করে সেই সমাধানসহ পুনঃ উক্ত আদালতে ফেরৎ পাঠাতে পারবেন বা অন্য কোন আদালতে হস্তান্তরিত করতে পারবেন।

২। আপীল বিভাগের এখতিয়ার (Jurisdiction of the Appellate Division)

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের এখতিয়ার রয়েছে ঃ

(এক) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানি ও নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আপীল বিভাগের রয়েছে।

(দুই) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সে ক্ষেত্রে আপীল করা যাবে যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ ঃ

(ক) এ মর্মে সার্টিফিকেট দান করবেন যে, মামলাটির সাথে সংবিধান সম্বলিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে আইনের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন জড়িত আছে।

(খ) অথবা হাইকোর্ট বিভাগ কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করেছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

(গ) অথবা হাইকোর্ট বিভাগ আদালত অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করেছেন।

(ঘ) অথবা সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।

(তিন) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে উল্লিখিত কারণে কোন আপীল না চললেও আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতি দান করতে পারবেন।

(চার) কোন ব্যক্তির হাজিরা বা কোন দলিলপত্র উদ্‌ঘাটন বা দাখিল করার আদেশ-নির্দেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীনে যেকোন মামলা বিষয়ে ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট (Writ) আপীল বিভাগ জারি করতে পারবেন।

(পাঁচ) সংসদের আইন সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে আপীল বিভাগ নিজস্ব ঘোষিত যে কোন রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন।

(ছয়) কোন সময় যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, আইনের এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা উত্থাপিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা এমন গুরুত্বপূর্ণ যে সুপ্রীম কোর্টের মতামত প্রয়োজন, তখন রাষ্ট্রপতি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের নিকট প্রেরণ করবেন এবং আপীল বিভাগ উপযুক্ত বিবেচনার পর স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন।

সুপ্রীম কোর্টের এই দুই বিভাগের কার্যধারা ব্যতীত সামগ্রিকভাবে সুপ্রীম কোর্টের নিম্নলিখিত কার্যাবলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) কার্যপ্রণালী নির্ধারণ ঃ সংসদের বিধান সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির মতানুযায়ী এর প্রত্যেক বিভাগের অধীনস্থ সকল আদালতের জন্য কার্যপ্রণালী নির্ধারিত করবেন।

(২) তদারকি ক্ষমতা ঃ সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিধি ও বিধান সকল অধীনস্থ আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অবশ্য পালনীয় হবে।

(৩) নিয়োগ সংক্রান্ত ঃ প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের নিযুক্ত করবেন।

(৪) কোর্ট অব রেকর্ড ঃ সুপ্রীম কোর্ট একটি কোর্ট অব রেকর্ড হবে এবং আদালত অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ দান বা দণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতাসহ সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

(৫) কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ ঃ সংসদের যে কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের কর্মকর্তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারিত হবে।

(৬) সহায়তা দান ঃ রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী বিভাগ ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করবে।

অধস্তন আদালত
Subordinate Court

সুপ্রীম কোর্ট ছাড়াও আইনের বিধান অনুযায়ী অন্যান্য অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে। বিচার বিভাগের পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি।

জেলা বিচারকের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশক্রমে নিয়োগ দান করবেন রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারি কর্মকমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে তিনি নিয়োগ দান করবেন।

কোন ব্যক্তি জেলা বিচারকের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন যদি তিনি নিয়োগ লাভের সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত থাকেন এবং উক্ত কর্মে অন্যূন সাত বছরকাল বিচার বিভাগীয় পদে বহাল থাকেন অথবা অন্যূন দশ বছরকাল অ্যাডভোকেট হয়ে থাকেন।

বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত কোন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণ, কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান ও অন্যান্য বিষয়ে শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকবে।

জেলার প্রধান আদালত

দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তির জন্য জেলায় সর্বোচ্চ আদালত জেলার প্রধান বিচারকের আদালত। ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য জেলায় রয়েছে প্রধান বিচারালয়, দায়রা বা সেসন জজের আদালত। জেলার প্রধান বিচারককে সাহায্য করবেন সাব-জজ ও অতিরিক্ত জজগণ। সাব-জজের আদালত ও সহকারী বিচারকের আদালত থেকে জেলা জজের আদালতে আপীল পেশ করা যাবে। জেলার প্রধান বিচারকের আদালত জেলার অন্যান্য আদালতগুলোর কার্যাবলি তদারক করবে এবং তাদের কার্য পরিচালনার জন্য আদেশ দান করবে।

দায়রা জজের প্রধান আদালতে আসামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। তবে মৃত্যুদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। জেলার প্রধান বিচারকের আদালত বা দায়রা জজের আদালত থেকে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল পেশ করা চলবে।

সাব-জজের আদালত

জেলার প্রধান বিচারকের আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা সদরে সাব জজের আদালত রয়েছে। এই আদালতে দেওয়ানী মকদ্দমার শুনানি হবে। অধিক অর্থসংক্রান্ত মামলা সরাসরি সাব-জজের আদালতে পেশ করা যাবে। তাছাড়া, সহকারি জজের আদালত থেকে সাব-জজের আদালতে আপীল গৃহীত হয়।

সহকারি বিচারকের আদালত

সাব-জজের ও জেলা-জজের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যেক জেলা সদরে সহকারি জজের আদালত আছে। এই সকল আদালতে দেওয়ানী মামলার বিচার হয়ে থাকে। অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশও এই সকল আদালত থেকে জারি করা হয়। এসব আদালত থেকে আপীল রুজু করা হয় সাব-জজের আদালতে।

উপজেলার আদালত

১৯৮২ সালের ২৩ অক্টোবর এক নির্দেশ জারি করে এরশাদ সরকার থানা পর্যায়ে প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস করেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী উপজেলা হয় শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

উপজেলায় নিয়ন্ত্রণমূলক (regulative) কার্যক্রমের অধীনে দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচারকার্য পরিচালনার জন্য উপজেলায় সহকারি জজ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি এক ঘোষণায় বলা হয় যে, উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে দেশে মাত্র ১২০টি সহকারি জজের আদালত ছিল। পরে আরও ৩২২টি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব আদালতে দেওয়ানী মামলার বিচার সম্পন্ন হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার উপজেলা ব্যবস্থা রহিত করে। ফলে এ সব আদালতের অবসান ঘটে। পরে অবশ্য তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সালিশী আদালত

ছোটখাট মামলা-মকদ্দমা বিচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই আদালতের চেয়ারম্যান। বিবাদমান দুই দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করাই এই সকল আদালতের লক্ষ্য। পৌরসভা সংশ্লিষ্ট এলাকার ছোট ছোট বিবাদ বিসংবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য সালিশী আদালত গঠন করবে।

এ গুলোকে অবশ্য আদালত বলা ঠিক নয়। স্থানীয় নেতৃবর্গ তাঁদের আপোষমূলক মনোভাবের মাধ্যমে গ্রাম্য বা স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধান করেন।

প্রশাসনিক ন্যায়পীঠ
Administrative Tribunals

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ন্যায়পীঠ প্রতিষ্ঠা এক অভিনব পদক্ষেপ। সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ন্যায়পীঠ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।"

কোন ক্ষেত্রে কোন প্রশাসনিক ন্যায়পীঠ প্রতিষ্ঠিত হলে তার এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করবে না বা কোন আদেশ প্রদান করবে না। অবশ্য সংসদ আইনের দ্বারা কোন ন্যায়পীঠের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করতে পারবে।

সংবিধান মোতাবেক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বা সেই সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য জাতীয় সংসদ এক বা একাধিক প্রশাসনিক ন্যায়পীঠ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ঃ

(এক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি, অর্থদণ্ড ও অন্যান্য শাস্তিদান সম্পর্কে।

(দুই) কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তি অর্জন, প্রশাসক, ব্যবস্থাপনা ও বিলি ব্যবস্থা।

(তিন) সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে সব বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের কার্যকারিতা থাকে না।

প্রশাসনিক ন্যায়পীঠ ব্যবস্থা অনেকটা ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচলিত বিভাগীয় আদালতের অনুরূপ। বৃটেনেও অনুরূপ আন্তঃবিভাগীয় বোর্ড রয়েছে এবং এ ধরনের প্রশাসনিক ন্যায়পীঠ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ন্যায়নীতির পক্ষে সহায়ক।

বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা
Judicial Review

বাংলাদেশ সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের উপর সংবিধান বিরোধী বিধি বিধানকে অবৈধ ও বিধিবহির্ভূত ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এটি হলো সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সামনে বিচার প্রার্থী হয়ে যদি কেউ বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধান বিরোধী এবং সেই অবৈধ আইনের ফলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তা হলে বিচারকেরা সেই আইনের বৈধতা বিচার করবেন। বিচারকেরা মামলার রায়ে যদি বলেন, সেই আইন অবৈধ তা হলে অন্যান্য মামলায় তা অবৈধ বলে গণ্য হবে।

বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার মূলে রয়েছে সংবিধানের প্রাধান্য। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন, নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।"

সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তা হলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।" সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিলের জন্য তাই সুপ্রীম কোর্টের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে তাই ঘোষণা করা হয়েছে, "যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তি কৃত কোন কার্য আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে এবং তার কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করে হাইকোর্ট বিভাগ আদেশ দান করতে পারবেন।"

১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং মোঃ জালালউদ্দীন এক রিট আবেদনে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত অষ্টম সংশোধনী আইন বাতিলের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট শেষ পর্যায়ে প্রার্থনা জানায়। সুপ্রীম কোর্ট রায়ে অষ্টম সংশোধনী আইনের ২নং বিধি অর্থাৎ বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনকে সংবিধান বিরোধী এবং ফলে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। এ ভাবে সুপ্রীম কোর্ট তাঁর বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণে ঢাকার বাইরে স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন বেঞ্চে বিচারপতিগণের নিয়োগ, প্রেষণ এবং হাইকোর্ট বিভাগের এলাকা পুনঃনির্ধারণ প্রভৃতিকে সংবিধান বিরোধী বলেছেন।

এ ভাবে সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ সংবিধান তথা বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও বিচার বিভাগের এই ক্ষমতা রয়েছে।

১। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে? তাঁদের কার্যকাল সম্বন্ধে কী জান? (What qualifications should the judges of the Supreme Court have? What do you know about the tenure of the judges?)

২। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগীয় এখতিয়ার সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the jurisdiction of the High Court Division of the Supreme Court.)

৩। আপীল বিভাগের এখতিয়ারের বিবরণ দাও। (Describe the jurisdiction of the Appcllate Division.)

৪। বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (Describe the subordinate courts of Bangladesh.)

৫। প্রশাসনিক ন্যায়পীঠের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the working of the Administrative Tribunals.)

৬। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে কী জান? (What do you know about the judicial review of the Supreme Court in Bangladesh?)

৭। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। (Describe the composition and functions of the Supreme Court of Bangladesh.) [N.U. 1995]

সংবিধানের সংশোধন ও নির্বাচন কমিশন

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION AND ELECTION COMMISSION

সংবিধান সংশোধন

গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হলে যে কোন সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা থাকতে হয়। অগ্রগতি ও প্রগতির সাথে সাথে সংবিধানে যদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সূচিত না হয়, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এবং বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে।

বাংলাদেশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় নয়। এই সংবিধানে কোন সংশোধন করতে হলে তা সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। এ জন্য বিশেষ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তথাপি বলা প্রয়োজন যে, এই সংশোধন পদ্ধতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার পদ্ধতির মত তেমন জটিল নয়।

বাংলাদেশে সংবিধানের কোন বিধান সংসদের আইন দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হবে এবং তার জন্য নিম্নলিখিত দুটি শর্ত পালন করা প্রয়োজন।

প্রথম, সংশোধন বা রহিতকরণের জন্য আনীত বিলের শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন্ বিধান সংশোধন বা রহিত করা হবে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয়, সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে।

উল্লিখিত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হলে তা সম্মতি দানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি উপস্থাপনের সাতদিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের পর তিনি সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির পনেরতম সংশোধনী আদেশে অবশ্য বলা হয় যে, **সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা** সম্পর্কে কোন সংশোধনী সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হলে রাষ্ট্রপতি এক গণভোটের আয়োজন করবেন। গণভোটে ঐ প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে। অন্যথায় তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করবে না।

সুতরাং সংশোধনের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে সহজ ও সরল। আশা করা হচ্ছে, জাতীয় জীবনে তা শুভ ফল আনয়ন করবে।

নির্বাচন
Election

বাংলাদেশের সংবিধানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় জাতীয় জীবনে নির্বাচন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে (১১ অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।"

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রিপরিষদের অন্তত নয়-দশমাংশ সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত হবেন জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে। শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ে নয়, স্থানীয় পর্যায়েও নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি (Universal Adult Suffrage) গৃহীত হয়েছে। এটি সর্বজন স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং এই সংবিধানে বর্ণিত সকল নির্বাচন এই গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

ভোটদাতাদের যোগ্যতা
Qualifications of Electors

সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অধিষ্ঠিত হবে। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার (constituencies) একটি ভোটার তালিকা থাকবে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল যোগ্য ভোটদাতার নাম সেই তালিকায় থাকবে।

নিম্নলিখিত যোগ্যতার ভিত্তিতে যে কেউ যোগ্য ভোটদাতা বলে বিবেচিত হবেনঃ

(এক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক।

(দুই) তার বয়স আঠার (১৮) বছরের কম নয়।

(তিন) কোন যোগ্য আদালত তাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করেনি।

(চার) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বলে বিবেচিত।

নির্বাচন কমিশন
Election Commission

নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সংগঠিত হবে। তাই বাংলাদেশ সংবিধানে নির্বাচন ব্যবস্থার সংগঠন, নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। নির্বাচনী ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।

কমিশনের গঠন প্রণালী
Composition

একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ দান করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই কমিশনের সভাপতি।

সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর কাল হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর মেয়াদের পর প্রজাতন্ত্রের অন্য কোন কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। তবে কোন নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন।

সংসদ প্রণীত আইনের বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ করবেন। কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগ পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন। তাছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং সংবিধান ও আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব
Functions of Election Commission

কমিশন প্রধানত নিম্নলিখিত কার্যগুলো সম্পন্ন করবে ঃ

(এক) সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ দান ও নিয়ন্ত্রণ।

(দুই) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান।

(তিন) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান।

(চার) সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ।

তাছাড়া, সংবিধান ও অন্যান্য আইনের দ্বারা কোন কর্ম এই কমিশনের উপর ন্যস্ত হলে তাও নির্বাচন কমিশন সম্পন্ন করবে।

নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে, রাষ্ট্রপতি কমিশনকে সেরূপ কর্মকর্তা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন
Election for the Post of the President

(এক) রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই থেকে ষাট দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদে।

(দুই) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে নব্বই দিনের মধ্যে তা পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদ সদস্যের নির্বাচন
Election of Members of the Jatiya Sangsad

(এক) মেয়াদ অবসানের জন্য সংসদ ভেঙ্গে গেলে ভেঙ্গে যাবার পর নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের ক্ষমতা
Power of the Jatiya Sangsad about Election

সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জাতীয় সংসদ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

এই সম্পর্কে প্রণীত নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বা আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

তাছাড়া, সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত বা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

১। বাংলাদেশ সংবিধান কীভাবে সংশোধিত হবে তা বর্ণনা কর। (Describe how an amendment can be brought in the Bangladesh Constitution.)

২। বাংলাদেশ সংবিধানে নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।. (Describe the importance of election in the Bangladesh Constitution.)

৩। নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলির বিবরণ দাও। (Describe the composition and functions of the Election Commission.)

৪। রাষ্ট্রপতি ও সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the election issues of the President and members of the Jatiya Sangsad.)

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেল ও মহাহিসাব-নিরীক্ষক

THE SERVICES OF BANGLADESH, ATTORNEY GENERAL AND AUDITOR GENERAL

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ
The Services of Bangladesh

মন্ত্রিপরিষদ শাসন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থায়ী কর্মকর্তাদের। স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারীদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মেধার উপর রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা নির্ভর করে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ শাসন কার্য পরিচালনায় তেমন দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হন না, কারণ তাঁদের কার্যকাল অত্যন্ত অস্থায়ী। তাঁরা জনপ্রিয়তার মাধ্যমে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। কিন্তু স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হন এবং দক্ষতার ভিত্তিতে অগ্রগতি লাভ করেন। কার্যত স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ।

কর্মের শর্তাবলি ও মেয়াদ
Conditions of Service and Tenure of Office

কর্মের শর্তাবলি সম্বন্ধে সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে "সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।" এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ করে রাষ্ট্রপতি বিধি প্রণয়ন করবেন। নিচে শর্তাবলির বিবরণ দেয়া হলো ঃ

(এক) বাংলাদেশের নাগরিক ব্যতীত কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের কর্মে বহাল থাকতে পারবেন না। তবে সরকার অন্য দেশের নাগরিককেও নির্দিষ্ট শর্তে নিয়োগ করতে পারবেন। বাংলাদেশের জন্মের পূর্বে যারা এই অঞ্চলে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা কার্যরত থাকতে পারবেন।

(দুই) এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী সময় পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন।

(তিন) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হবেন না।

(চার) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁর সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ দর্শাবার সুযোগ দান না করা পর্যন্ত তাঁকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাবে না।

তবে কোন ব্যক্তি যে আচরণের জন্য ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হতে পারেন সে আচরণের জন্য বরখাস্ত হতে পারেন অথবা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাঁকে কারণ দর্শাবার সুযোগ না দেয়াও যেতে পারে অথবা বরখাস্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট কারণ দর্শাবার সুযোগ দান করা যুক্তিসংগতভাবে সম্ভব নয় প্রতীয়মান হলে তাঁর প্রয়োজন থাকবে না।

(পাঁচ) কারণ দর্শাবার সুযোগ দানের সকল প্রশ্নে বরখাস্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত।

(ছয়) কোন ব্যক্তি কোন চুক্তির অধীনে কোন কর্মে নিযুক্ত হলে এবং সেই চুক্তি সম্পন্ন হলে তাঁর কার্যকাল শেষ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি অপসারিত হয়েছেন বলে গণ্য হবে না।

(সাত) চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলি একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তা পরবর্তীকালে কর্মচারীদের অসুবিধা ঘটিয়ে পরিবর্তন করা যাবে না।

(আট) আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বিভাগসমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একত্রিকরণসহ পুনর্গঠনের বিধান করা যাবে এবং অনুরূপ আইন কর্মচারীবৃন্দের কর্মের শর্তাবলির তারতম্য করতে পারবে।

সরকারি কর্ম কমিশন
Public Service Commission

সংবিধানে ১৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। কমিশনের লক্ষ্য শাসন কার্য পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ, দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগ। তারা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবাহকে উপেক্ষা করে এবং সকল দলাদলির ঊর্ধ্বে থেকে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। এর আর একটি লক্ষ্য কর্মকর্তাদের মনোনয়ন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল প্রকার দুর্নীতি, অসৎ উপায়, তোষণ ও স্বজনপ্রীতির মূল উচ্ছেদ করা।

কমিশনের গঠন
Composition of the Public Service Commission

একজন সভাপতি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে কর্মকমিশন গঠিত হবে। কমিশনের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। কমিশনের অর্ধেক সদস্য এমন ব্যক্তি হবেন যাঁরা কুড়ি বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে কার্যরত ছিলেন।

১৯৭২ সালের ৯ মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি **বাংলাদেশ সরকারি (প্রথম) কর্মকমিশন ও বাংলাদেশ সরকারি (দ্বিতীয়) কর্মকমিশন** নামে দুটি কমিশন গঠন করার উদ্দেশ্যে এক আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৩৪) জারি করেন। এই আদেশ বলে বাংলাদেশে দুটি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে দুটি কর্মকমিশন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করে। ১৯৭৭ সালের ২৮ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ৫৭ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (Bangladesh Public Service Commission) গঠিত হয়। এই অধ্যাদেশ ১৯৭৭ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। অন্য কথায়, ১৯৭৭ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশে দুটি কর্ম কমিশনের পরিবর্তে একটি কর্ম কমিশন কার্যকর রয়েছে।

সংসদ প্রণীত আইন সাপেক্ষে সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন। দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা বাষট্টি (৬২) বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কমিশনের সদস্যগণ স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি এবং কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্য অপসারিত হবেন না।

কর্ম কমিশনের সভাপতি বা সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগপত্র পেশ করে পদত্যাগ করতে পারেন। কর্মের মেয়াদ শেষ হলে সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না। তবে কেউ দুই মেয়াদের জন্যও নিযুক্ত হতে পারেন এবং কোন সদস্য সভাপতি পদে নিযুক্ত হতে পারবেন।

সরকারি কর্মকমিশনের দায়িত্ব (Functions of the Commission) ঃ সরকারি কর্ম কমিশন নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবেন ঃ

(এক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা।

(দুই) রাষ্ট্রপতি কোন বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাইলে বা কমিশনের নিকট প্রেরণা করা হলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান।

(তিন) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(চার) তাছাড়া, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন ঃ

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তার নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়।

(খ) নিয়োগদান, বদলিকরণ বা পদোন্নতির নীতি সম্পর্কিত বিষয়।

(গ) কর্মরত কর্মচারীদের কার্যকাল ও চাকরির শর্তাবলি এবং তাঁদের বৃদ্ধ বয়সের ভাতা সম্পর্কে।

(ঘ) কর্মের শৃংখলা সম্পর্কিত বিষয়।

(পাঁচ) কমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বছরে স্বীয় কার্যাবলি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং তা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রদান করবেন।

রিপোর্টের সাথে একটি স্মারকলিপি থাকবে এবং তাতে উল্লিখিত হবে কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে এবং পরামর্শ গৃহীত না হবার কারণ এবং যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ করা হয় নি এবং তার সম্ভাব্য কারণ ইত্যাদি।

এই রিপোর্ট এবং স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতি ৩১ মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত করবেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল
Attorney General

প্রজাতন্ত্রের আইন সম্পর্কিত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন অ্যাটর্নি জেনারেল থাকবেন। সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদে তাঁর নিয়োগ ও কার্যকাল সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করবেন। তাঁর কর্মের মেয়াদ ও শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন এবং তাঁর সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
The Comptroller and Auditor Generel

প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদে এর বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তাঁর নিয়োগ ও কার্যকাল
His Appointment and Tenure of Office

মহাহিসাব নিরীক্ষককে নিয়োগদান করবেন রাষ্ট্রপতি। তিনি সংবিধান ও সংসদ আইন সাপেক্ষে মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ করবেন। তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগ পত্র পেশ করে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন। তিনি ষাট (৬০) বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকবেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, কেবল সেরূপ পদ্ধতি ও কারণে মহাহিসাব নিরীক্ষক অপসারিত হতে পারবেন। কর্মাবসানের পর তিনি প্রজাতন্ত্রের জন্য অন্য কোন পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না।

কোন সময়ে মহাহিসাব-নিরীক্ষকের পদ শূন্য হলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি কার্যভার পালনে অক্ষম হলে রাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে মহাহিসাব নিরীক্ষকরূপে কার্য করার জন্য উক্ত পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্য নিয়োগ দান করবেন।

তাঁর দায়িত্ব
His Functions

মহাহিসাব-নিরীক্ষক নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবেন ঃ

(এক) তিনি প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকারের হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করবেন।

(দুই) এই উদ্দেশ্যে তিনি বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষা করতে পারবেন।

(তিন) আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রেও আইনের বিধান সাপেক্ষে তিনি হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দানের ব্যবস্থা করবেন।

(চার) উল্লিখিত দায়িত্ব ব্যতীত সংসদ আইনের দ্বারা মহাহিসাব নিরীক্ষকের উপর নতুন দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন এবং সংসদ আইনের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি নতুন বিধির দ্বারা তা করবেন।

(পাঁচ) তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহাহিসাব-নিরীক্ষক অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন হবেন না।

(ছয়) রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহাহিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে।

(সাত) প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহাহিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

১। বাংলাদেশে সরকারি কর্মের শর্তাবলি ও মেয়াদ সম্পর্কে কী জান? (What do you know about the conditions and tenure of public services in Bangladesh?)

২। বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে কী জান? (What do you know about the composition and functions of the Public Service Commission in Bangladesh?)

৩। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the appointment and functions of the Attorney General.)

৪। বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষকের নিয়োগ ও দায়িত্বের বিবরণ দাও। (Describe the appointment and functions of the Comptroller and Auditor General in Bangladesh.)

প্রশাসন ব্যবস্থা ও জেলা শাসনব্যবস্থা

ADMINISTRATIVE SYSTEM AND DISTRICT ADMINISTRATION

১৪

সূচনা
Introduction

ব্রিটিশ ভারত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামো প্রধানত দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপযোগী ছিল। বিদেশী শাসকদের নিকট জাতীয় উন্নতির ধারণা ছিল অনেকটা অমূলক ও কল্পনাবিলাস। রাষ্ট্র ছিল তখন পুলিশী রাষ্ট্র (Police State)। শাসন সম্পর্কে বর্তমানে সেই ধারণার অবসান ঘটেছে। আধুনিককালে রাষ্ট্র এক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদনই বর্তমান রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্বকালের প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান উন্নয়নমূলক কার্যের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয় নি। পাকিস্তান আমলেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণমুখী হয়ে ওঠে নি। সেই ব্যবস্থায় দ্রুততর গতিতে কার্য সম্পাদন এবং জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তাছাড়া, পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ ছিল এক উপনিবেশতুল্য। তাই ব্যাপক উন্নতিমূলক কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুপযোগী হয়ে ওঠে।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন সরকার শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশে 'প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি' গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকর করে ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় সে গুলো অত্যন্ত অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এর কারণও রয়েছে। **প্রথম,** বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করার প্রয়োজনীয়তায় প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। **দ্বিতীয়,** বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়েছে।

শাসন ব্যবস্থা
Administration

(ক) রাষ্ট্রপতি ঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি। তিনি শাসন ব্যবস্থার শীর্ষমণি। তাঁর নামেই সকল প্রশাসনিক কার্য সম্পন্ন হয়।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers) ঃ রাষ্ট্রপতিকে তাঁর শাসন কার্যে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এবং পরামর্শ দান করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের প্রধান প্রধানমন্ত্রী।

সেক্রেটারিয়েট (Secretariat) ঃ সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় শাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্রস্বরূপ। সেক্রেটারিয়েট সরকারের কার্যকলাপের উৎস। সচিবালয়ে শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ প্রণীত হয়, পর্যালোচিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই সকল ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় প্রধানদের নিকট প্রেরিত হয়।

সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের (Ministry) সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি একজন মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারী বা সচিব। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হয়েছেন মন্ত্রী।

১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় ছিল। ১৯৫৮ সালে এর সংখ্যা হয় ১৯। সামরিক শাসন আমলে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা হয় ১৬। ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এই সংখ্যা হয় ১১। ১৯৮২ সালের পূর্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ছিল ৪২টি। ১৯৮৪ সালে এরশাদ সরকার এর পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমিয়ে করেছিলেন ২৬টি। বর্তমানে এই সংখ্যা হলো ৪২।

(গ) মন্ত্রণালয় সংগঠন (Organisation of Ministry) ঃ বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলি কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত। শাসন সংক্রান্ত এক বা একাধিক বিভাগ একটি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রীর উপর মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান সেক্রেটারী বা সচিব। তিনি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্রীকে পরামর্শ দান করবেন। মন্ত্রণালয়ের একাধিক বিভাগ থাকলে এক একটি বিভাগের ভার অর্পিত হয় এক একজন যুগ্মসচিবের উপর অথবা অতিরিক্ত সচিবের উপর। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে কয়েকটি শাখা থাকে, যা একজন উপসচিবের পরিচালনাধীন থাকে। তার অধীনে কয়েকজন সহকারী সচিব কার্যরত থাকেন। মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কর্মকর্তাদের সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

রেখাচিত্র ও মন্ত্রণালয়ের কাঠামো

মন্ত্রণালয়ের কাঠামো
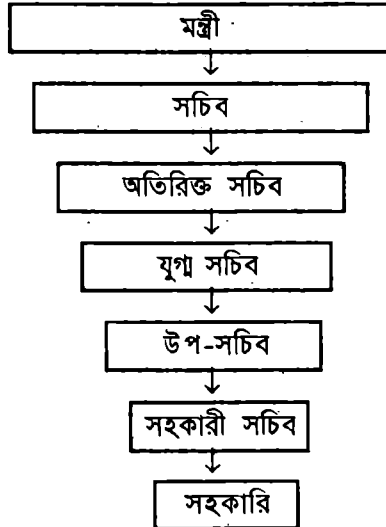
মন্ত্রী সচিবালয়ের সর্বপ্রধান নিয়ন্ত্রক। তার উপদেষ্টা হিসেবে সচিবের পদমর্যাদা মন্ত্রীর পরেই। সেক্রেটারীকে সাহায্য করার জন্য যুগ্মসচিব তার নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করেন। জয়েন্ট সেক্রেটারীর অধীনস্থ উপ-সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে সহকারি সচিব কার্যরত রয়েছেন। কোন কোন মন্ত্রণালয়ে একাধিক জয়েন্ট সেক্রেটারী, একাধিক ডেপুটি সেক্রেটারী এবং বহুসংখ্যক সহকারি সচিব নিযুক্ত হতে পারেন। কোন

মন্ত্রণালয়ের কার্যের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হলে সেক্রেটারীকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত সেক্রেটারীও নিযুক্ত হতে পারেন।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কার্যাবলির বিবরণ নিচে দেয়া হলো। মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলি অন্যত্র বিবৃত হয়েছে। এখানে শুধু প্রশাসনিক কর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো ঃ

সেক্রেটারী বা সচিব (Secretary) ঃ সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তাকে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পন্ন করতে হয়।

প্রথম, তিনি শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে এবং নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা।

দ্বিতীয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জন্য সঠিক নীতি নির্ধারণের জন্য যে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ, কার্যাদির সমন্বয় সাধন, পর্যালোচনা ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের দরকার হয়, সেক্রেটারী তাদের সব কিছুর জন্য দায়ী থাকবেন।

তৃতীয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, তার বিভাগ ও শাখাসমূহের সুপরিচালনা, সুষ্ঠু ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও মিতব্যয়িতার সাথে পরিচালনার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

চতুর্থ, সেক্রেটারী তার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সকল নীতির বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হবেন। এ জন্য তিনি বিভাগীয় প্রধানের নিকট প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করবেন।

সর্বশেষ, তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করবেন, কেননা মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রশাসনও তার নিয়ন্ত্রণাধীন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিবরণীর জন্য সেক্রেটারীকে আইন পরিষদের একাউন্টস কমিটির (Accounts Committee) কাছে জবাব দিতে হয়।

অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপ-সচিব
Additional Secretary, Joint Secretary and Deputy Secretary

যে মন্ত্রণালয়ের কার্যের ব্যাপকতা ও জটিলতা বর্তমান রয়েছে যেমন-অর্থ মন্ত্রণালয়ে, সেই সকল ক্ষেত্রে একজন সচিব ছাড়াও অতিরিক্ত সচিব (Additional Secretary) নিযুক্ত থাকেন। তিনি সচিবের কার্যে সহায়তা করবেন এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্যপরিচালনা করবেন। কোন কোন সময় তিনি স্বাধীনভাবে মন্ত্রণালয়ের কোন বিভাগ পরিচালনাও করতে পারেন।

যুগ্ম সচিব সাধারণ মন্ত্রণালয়ের কোন বিভাগের কার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হবেন। তিনি সেক্রেটারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে কার্য করেন অথবা সেক্রেটারীর পূর্ব নির্দেশ লাভ করে স্বাধীনভাবে বিভাগটি পরিচালনা করেন।

ডেপুটি সেক্রেটারী কতিপয় সেকশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি তাঁর কার্যকলাপের জন্য জয়েন্ট সেক্রেটারী অথবা অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট দায়ী থাকবেন এবং তার কার্যকলাপের বিবরণী তাদের নিকট পেশ করবেন। কোন কোন সময় ডেপুটি সেক্রেটারীও স্বাধীনভাবে কোন বিভাগ দেখাশুনার দায়িত্ব লাভ করেন।

প্রত্যেকটি বিভাগ কতকগুলো সেকশনে বিভক্ত থাকে। এক একটি সেকশন এক একজন সহকারী সচিবের দায়িত্বে দেয়া হয়। সহকারী সচিব ডেপুটি সেক্রেটারীর নিকট দায়ী থাকেন এবং সেকশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ডেপুটি সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট পেশ করেন।

সহকারী সচিবের নিয়োগের ব্যবস্থা সম্প্রতি গ্রহণ করা হয় এবং অত্যন্ত লাভজনকভাবে তা প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে একদিকে যেমন আণ্ডার সেক্রেটারী ও আপার ডিভিশানর কেরানীদের

ন্যায় অনেক কর্মচারীর প্রয়োজন শেষ হয়েছে তেমনি অন্য দিকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়ে উঠেছে। ফলে কার্যাদি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দ্রুততর গতিতে সম্পাদিত হয়।

সেক্রেটারিয়েটের সাথে মন্ত্রণালয়সমূহ ব্যতীত অনেক সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংযুক্ত কার্যালয় ও অধীনস্থ অফিসও রয়েছে। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য শাসন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্তরে বহু সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।

দেশে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রসারের নিমিত্তে বহু জনসংস্থার (Public Corporation) জন্ম হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য তাদের স্বাধীনভাবে কার্য সাধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং তাদের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই সকল জনসংস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা (Bangladesh Agricultural Development Corporation), বাংলাদেশ বিমান প্রভৃতি জনসংস্থা দেশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সেক্রটারিয়েটের সাথে সাংগঠনিক একক হিসেবে ডাইরেক্টরেট বা পরিদপ্তর সংযুক্ত আছে। অতীতে উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। বর্তমানে পুনর্বিন্যস্ত শাসন ব্যবস্থায় সেক্রেটারিয়েট ও ডাইরেক্টরেটের কর্তৃত্ব এবং কার্যাবলি পৃথক করা হয়েছে। সেক্রেটারিয়েট হলো নীতি নির্ধারক সংস্থা এবং ডাইরেক্টরেট সেই নির্ধারিত নীতিকে বাস্তবায়িত করে থাকে।

ডাইরেক্টরেটের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথম, সরকারি নীতি বস্তবায়ন।

দ্বিতীয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।

তৃতীয়, পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বাস্তবায়নের জন্য সুচিন্তিত উপদেশের ব্যবস্থা।

চতুর্থ, কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং তাদের বিভাগওয়ারী বণ্টন।

পঞ্চম, অধস্তন কর্মচারীদের চাকরি নিয়ন্ত্রণ।

ষষ্ঠ, কিছু প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন।

বিভাগীয় শাসন
Divisional Administration

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে ৬টি বিভাগে (Division) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিভাগকে কয়েকটি জেলায় (District) বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগের শাসনভার বিভাগীয় কমিশনারের উপর ন্যস্ত।

বিভাগীয় কমিশনার ও তাঁর কার্যাবলি
Divisional Commissioner and His Functions

বিভাগীয় কার্যকলাপ সাধারণত চার প্রকার ; যথা–(ক) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত, (খ) পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধন সম্পর্কিত, (গ) সেবামূলক ও (ঘ) উন্নয়নমূলক।

(ক) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ঃ রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে। বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ রাজস্ব আদায় বিষয়ে তাঁকে অবহিত রাখবেন। তিনি বিভাগের মধ্যে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করবেন। ডেপুটি কমিশনারদের রাজস্ব আদায়মূলক কার্যাবলি তিনি তদারক করবেন এবং তা কার্যকর করার জন্য তৎপর হবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দান করবেন।

(খ) পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত কার্যাবলি ঃ জেলার জেলা প্রশাসক এবং প্রয়োজনবোধে উপজেলা প্রশাসকদের কার্যাবলি তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সকলের কার্যাদির সমন্বয় সাধন করবেন। বিভাগীয় কমিশনার তার এলাকার যে কোন কর্মচারীর নিকট থেকে তাদের প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্বন্ধে রিপোর্ট চাইতে পারেন। তিনি প্রয়োজন মত সকলকে নির্দেশ দান করতে পারবেন। তিনি সকল বিভাগের যাবতীয় কার্যের সমন্বয় সাধন করবেন এবং প্রত্যেক বিভাগের উপর নজর রাখবেন।

(গ) সেবামূলক কার্যাবলি ঃ বিভাগীয় কমিশনারকে অনেক সেবামূলক ও সাহায্যমূলক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে হয়। বন্যা, ঝড়, তুফান, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তিনি দ্রুত গতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন।

(ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি ঃ জনকল্যাণকর কার্যের ব্যাপারে তার দায়িত্ব রয়েছে। বিভাগের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনমূলক কার্যের অগ্রগতির প্রতি তিনি বিশেষ নজর দেবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য তিনি কোন পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে পারবেন এবং তা বস্তবায়নের জন্য তিনি সরকারের নিকট সুপারিশ করতে পারবেন। কোন বিভাগীয় কর্মচারীকে জনস্বার্থে কোথাও কোন পদে বহাল রাখা সমীচীন মনে না করলে তাঁর বদলির জন্য সুপারিশ করতে পারবেন।

(ঙ) বিবিধ ঃ শিক্ষার প্রসার, দুর্নীতি দমন, কালোবাজারী বন্ধ ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কার্যে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন। বিভাগীয় কমিশনারের পদটি গুরুত্বপূর্ণ। এই পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারী তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও কর্মচারীবৃন্দকে উল্লেখযোগ্য কোন কর্মের অতি সহজে অনুপ্রেরণা দান করতে পারবেন এবং কল্যাণকর কার্যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

জেলা শাসন
District Administration

প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি জেলায় এক বা একাধিক থানা রয়েছে। বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। জেলা ও থানা বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থার মৌলিক ও প্রাথমিক একক (basic and primary unit)। প্রত্যেক জেলার শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের উপর।

ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক
Deputy Commissioner

ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক জেলার শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। শাসন কার্যের কেন্দ্রবিন্দু বললেই বুঝি জেলার ডেপুটি কমিশনারের প্রকৃত গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়, কেননা এই কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে জেলার শাসনচক্র আবর্তিত হতে থাকে।

তিনি সাধারণত সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য।

তাঁর কার্যাবলি ও ক্ষমতা
His Functions and Powers

ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের কার্যাবলিকে প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে; যথা-**(ক) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত, (খ) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত, (গ) উন্নয়নমূলক কার্যাদি ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত, (ঘ) স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত এবং (ঙ) বিবিধ।**

(ক) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত (Collection and Administration of Revenue) ঃ রাজস্ব আদায় ব্যাপারে অতীতে তিনি কালেক্টর নামে পরিচিত ছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁকে নিম্নলিখিত ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় ঃ

(১) রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে, (২) কৃষি উন্নয়নে সাহায্যকারীরূপে, (৩) ভূমির উপর নাগরিকদের অধিকার রক্ষাকারী হিসেবে, (৪) ভূমির উন্নয়নকারীরূপে এবং (৫) রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে।

তিনি রাজস্ব আদায়কারীরূপে জেলার রাজস্ব আদায় সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সম্পর্কে তাঁকে বিবিধ কর্ম সম্পন্ন করতে হয়।

প্রথম, তিনি ভূমি রাজস্ব, পানি কর ও অন্যান্য সরকারি কর আদায়ে সচেষ্ট থাকেন। রাজস্ব আদায় পদ্ধতিসমূহের তিনি তদারক করেন। জেলার সরকারি কোষাগার তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে হিসাব নিকাশের জন্যও দায়ী থাকেন।

দ্বিতীয়, রাজস্ব আদায়কারিরূপে তিনি জমির রেজিস্ট্রেশন, বণ্টন, নাম খারিজ প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভূমি সম্পর্কিত দলিল দস্তাবেজ তাঁর কার্যালয়ে হেফাজতে রক্ষিত হয়।

তৃতীয়, তিনি রাজস্ব বিষয়ে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ভূমির জোর দখল, দখল উচ্ছেদ, পদ্ধতিগত অন্যান্য বিষয়ে তিনি বিচার করেন।

জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, সার্কেল ইন্সপেক্টর প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ ও রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ তাঁকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন। বছরে অন্তত একবার তিনি জেলার সকল এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। খাসমহল ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তিনি তত্ত্বাবধান করেন।

(খ) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি (Preservation of Law and Order) ঃ জেলার প্রধান প্রশাসক হিসেবে তিনি জেলার সকল স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শান্তি রক্ষা, নিরাপত্তা বজায় রাখা, আইনের অনুশাসন সংরক্ষণ করা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব এবং জেলা প্রশাসক হিসেবে তাঁর উপর এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে।

জেলার ডেপুটি কমিশনারকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট। এ ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট খবরাখবর ও তথ্যাদি পরিবেশন করে ডেপুটি কমিশনারকে সাহায্য করেন। কার্যত জেলার এই দু'জন প্রধান কর্মচারী একযোগে কাজ করে থাকেন।

(গ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development Works) : জেলা প্রশাসকের উন্নয়নমূলক কার্যাবলি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষামূলক কার্যাদি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্রের সেবামূলক কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার ফলে ডেপুটি কমিশনারকে বর্তমানে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়।

তিনি জেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উন্নয়নমূলক কার্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করেন। শুধু তাই নয়, তাকে জেলার মধ্যে কার্যরত কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, রাস্তাঘাট ও গৃহাদি নির্মাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। এই সকল দিক বিচার করলে তার অবস্থা খুব সুখের বলে মনে হয় না। বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে রাউল্যাণ্ডস কমিটির রিপোর্টে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অবস্থাকে "হাস্য কৌতুকোদ্দীপক থিয়েটারের পুলিশের" সাথে তুলনা করা হয়েছে। জেলার সব কিছু ঠিক রাখার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত, অথচ দায়িত্ব ও সময়ের দিক দিয়ে বিচার করলে সেই কাজকে অসম্ভব বলে মনে হয়।

(ঘ) স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত (Local Self Government) : বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটির শিল্প ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকার উপরই জেলা প্রশাসনের সাফল্য অনেকটা নির্ভরশীল এবং তাঁর নেতৃত্বের ফলে এর কার্যক্রম সফলতা অর্জন করে।

কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে অথবা দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বন্যা সংঘটিত হলে জনগণের জন্য সেবামূলক কার্যের দ্বারা তাদের দুঃখ দূর করতে তিনি সচেষ্ট হন এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দকে নির্দেশ দান করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

বর্তমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গৃহীত হবার ফলে তিনি সরকার ও জনগণের মধ্যে মিলন সূত্র বা সেতুর ন্যায় কাজ করেন। সরকারি নির্দেশ তাঁর মাধ্যমে জনগণের নিকট আসে এবং তাঁর মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজন সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি জনগণের প্রকৃত **বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শকে** (friend, philosopher and guide) পরিণত হয়েছেন।

তাঁকে সুবক্তা হতে হয় এবং ধৈর্যশীল কর্মকর্তা হতে হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সভাসমিতিতে যোগদান করতে প্রায় সারাক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিমেলা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষি-শিল্পের অগ্রগতি আনয়নে তিনি সচেষ্ট হন।

তাছাড়া, পদমর্যাদার খাতিরে তাঁকে অনেক প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপেও যোগদান করতে হয়। কার্যত তিনি জেলায় সরকারের **হাত, পা, মুখ, চোখ ও কানের** ন্যায়। জনগণের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি বাস্তব পন্থা গ্রহণ করে উভয়কে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেন।

ডেপুটি কমিশনারের কার্য ও ক্ষমতা সত্যই তেমনি হয় যেমনি এই পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীটি তাকে রূপান্তরিত করতে পারেন।

জেলা প্রশাসন একটা ছোট খাট সরকারের মত এবং জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার ঐ সরকারের প্রধান। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের তিনি নেতৃত্ব দান করেন। নিচের কাঠামোয় তা প্রকাশিত হলো ঃ

জেলা প্রশাসন

(ক) প্রত্যক্ষ

১। জেলা প্রশাসক
↓
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
↓
৩। সহকারী জেলা প্রশাসক
↓
৪। প্রশাসনিক অফিসার
↓
৫। সহকারীবৃন্দ

(খ) পরোক্ষ ঃ সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান

১। জেলা শিক্ষা অফিস
২। জেলা খাদ্য সরবরাহ অফিস
৩। গণস্বাস্থ্য অফিস
৪। গণপূর্ত বিভাগীয় অফিস
৫। মৎস্য বিভাগীয় অফিস
৬। বন বিভাগীয় অফিস
৭। কৃষি অফিস
৮। পুলিশ বিভাগ
৯। রেজিস্ট্রেশন অফিস
১০। পোস্ট অফিস
১১। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন
১২। সমবায়
১৩। কারাগার
১৪। বিচার বিভাগ
১৫। ব্যাংক ও বীমা অফিস
১৬। অন্যান্য

১। বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ের কাঠামোর বর্ণনা দাও। (Describe the structure of a ministry in Bangladesh.)

২। বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারিয়েটের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the composition of the Secretariat of the Bangladesh Government.)

৩। বিভাগীয় কমিশনারের পদমর্যাদা ও কার্যাবলি সম্বন্ধে যা জান লিখ। (Write what you know about the position and functions of the Divisional Commissioner.)

৪। ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the powers and functions of the Deputy Commissioner.)

৫। ডেপুটি কমিশনার জেলা শাসনের কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ—আলোচনা কর। (Deputy Commissioner is the Pivot of the District Administration—Discuss.)

৬। বাংলাদেশে জেলা প্রশাসনে ডেপুটি কমিশনার-এর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the role of the Deputy Commissioner in the administration of a district in Bangladesh.)

[R. U. 1983]

৭। উন্নয়নমূলক কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ডেপুটি কমিশনারের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the role of the Deputy Commissioner in Bangladesh with special reference to development activities.)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

LOCAL SELF-GOVERNMENT

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব
Importance of Local Self-Government

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং দেশের শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচিত্রভাবে তা দেশের শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং বিচিত্ররূপে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জনকল্যাণমূলক কার্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে দেশের বৃহত্তর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা দান করে। এ ব্যবস্থা যেমন একদিকে স্থানীয় সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের পথ প্রশস্ত কর, অন্যদিকে তেমনি জনগণকে প্রশিক্ষণ দানে সাহায্য করে। শাসন কার্যে যেমন তা বিকেন্দ্রীকরণ সংঘটিত করে, তেমনি অন্যদিকে গণতন্ত্রকে সার্থক করতে সহায়ক হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ এই সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জনগণ লাভ করে। জনগণের অংশগ্রহণে গৌরবান্বিত এই সকল সংস্থার কার্যকারিতার সাফল্য দেশের বৃহত্তর শাসন ব্যবস্থার সফলতার সূচনা করে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির বিবর্তন
Evolution of the Local Self-Government

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৮৭০–১৮৮০ সালের মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে যাতায়াত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় কমিটি জনসাধারণকে স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছিল। গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো সর্ব প্রথম এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। লর্ড রিপনের (Lord Ripon) হাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনে ১৮৮২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়। কালক্রমে স্থানীয় সংস্থাসমূহের সদস্য মনোনয়ন প্রথার সাথে নির্বাচনও সংযুক্ত হয়। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে প্রাদেশিক আইন পরিষদের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। এই আইন অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশে পরিণত হয়। সংস্থাগুলোর কার্যের পরিধি বিস্তৃত হয়। তাদের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। দেশের শাসন ব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা হয় উল্লেখযোগ্য।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দুই ধারায় বিকশিত হয়েছে; যথা—(ক) **পৌর সমস্যাদি সমাধানের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ,** যেমন—মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা, করপোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, এবং (খ) **গ্রাম্য সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ,** যেমন-ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড।

পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি শহর এলাকার জনসাধারণের স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধান করা, যেমন-আলোর ব্যবস্থা, পথঘাট পরিষ্কার রাখা, বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা। কিন্তু গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রামীণ জনসাধারণের স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, যেমন—রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পুল তৈরি, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে নতুন এক অধ্যায় শুরু করে তাদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হয়। তবে আর্থিক অনটন ও অন্যান্য ত্রুটির জন্য তাদের কার্যপ্রণালী ও কার্যক্রম তেমন সন্তোষজনক হয়ে ওঠেনি। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে শাসনব্যবস্থায় যে পরিবর্তন নেমে এলো তার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবনেও নেমে আসে এক অন্ধকারময় অধ্যায়। প্রচলিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাতিল করে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ১৯৫৯ সালের ৭ই অক্টোবর ১৮নং নির্দেশ জারি করে **মৌলিক গণতন্ত্র** প্রথা (Basic Democracy) প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রের কতকগুলো প্রশংসনীয় দিক থাকলেও তা অচিরে স্বার্থান্বেষী মহলের প্রকৃত রাজনৈতিক অস্ত্রে রূপান্তরিত হয় এবং কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কার্যরত রইল না, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীতে পরিণত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত হয় যে, এর সর্বস্তরে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালক্রমে তা দুর্নীতি ও অনিয়মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে এই ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য সরকার সচেষ্ট হয়ে উঠে। তাই ১৯৭২ সালের অস্থায়ী শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এক নির্দেশ জারি করে প্রচলিত সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং দেশে পঞ্চায়েত প্রথা চালু করেন। এই নির্দেশ ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। এই ব্যবস্থা ছিল অস্থায়ী।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা আইনে এই ব্যবস্থায় কিছু রদবদল করা হয় এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে চূড়ান্তভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা ব্যবস্থা চালু হয়। এই আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েতগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নামে চিহ্নিত হয় এবং নগর পঞ্চায়েতগুলো পৌরসভায় রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। এই সকল বিষয় সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। এভাবে নির্ধারিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে ঃ

(এক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যে সহায়তা দান।

(দুই) জনশৃঙ্খলা রক্ষা।

(তিন) জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করতে পারবে, বাজেট প্রণয়ন করবে এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে দেশে সামরিক আইন প্রশাসন সংগঠিত হলে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালে "স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স" জারি করে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভাগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে নতুন সূত্র সংযোজন করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার বিধির ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ১৯৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এরশাদ সরকার **স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩** জারি করে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলিতে কিছু পরিবর্তন সূচিত করেছেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের ৪,৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ৭৮টি পৌরসভা ও তিনটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইনও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আইনে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন এবং কার্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৯৭ সালের আইনে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনে আরো পরিবর্তন আনা হয়।

স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন

১৯৮৩ সালের **স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ** অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে। পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ জারি করে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করেন। ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর সরকার স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এক স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন গঠন করেন। দীর্ঘ আট মাস পর্যালোচনার পর এই কমিশন ১৯৯২ সালের ৩১ জুলাই গ্রামাঞ্চলে দু'স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার এবং শহরাঞ্চলের জন্য পৌরসভা/কর্পোরেশনের সুপারিশ করে। গ্রামাঞ্চলে এই কমিশন গ্রামভিত্তিক ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলায় জেলা পরিষদের সুপারিশ করে। থানায় একটি সমন্বয়কারী এককের সুপারিশ করা হয়। আরও সুপারিশ করা হয় যে, স্থানীয় সরকারের এ সব প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। তারা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট থাকবে সর্বতোভাবে দায়ী। স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সব গড়ে উঠবে। কেন্দ্রের সকল নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য আর একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৯৭ সালে স্থানীয় পর্যায়ে চারটি স্তরে স্থানীয় সরকার গঠনের সুপারিশ করে: গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। শুধুমাত্র গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদের সদস্যদের মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয় যারা ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবেন। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের কাঠামো ও কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে জাতীয় সংসদে। গ্রাম পরিষদের গঠন বিতর্কিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ হাইকোর্টে সংবিধানিক বিধি সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে দেশে গ্রামীন সংস্থাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এবং শহর, নগরের জন্য রয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন।

ইউনিয়ন পরিষদের বৈশিষ্ট্য

ইউনিয়ন পরিষদ অনেক কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। **প্রথম,** এ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। **দ্বিতীয়,** স্থানীয় সংস্থাগুলো গণতান্ত্রিক সংস্থারূপে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অতীতে মৌলিক গণতন্ত্রের সংস্থাগুলোতে সরকারি কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দান করা হয়েছিল। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র জন প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। **তৃতীয়,** এই ব্যবস্থা জনগণের স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দান করে এবং শাসন ক্ষমতা উপভোগ করার ব্যবস্থা করে জনগণের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব বিকাশের পথ সুগম করেছে। শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তারা অধিকতর দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। **চতুর্থ,** স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচী স্থানীয় জননেতাদের নেতৃত্বে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এবং জাতীয় উন্নয়ন অধিকতর ত্বরান্বিত হবে। **সর্বশেষ,** শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতার উন্মেষ ঘটবে। এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় ও স্বায়ত্তশাসন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের আধিপত্য বজায় ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার জের হিসেবে। এই ব্যবস্থায় তার অবসান হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Aims and Objectives of the Union Parishad System

ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এ ব্যবস্থা এক বিশেষ আদর্শ বাস্তবায়িত করার উপলক্ষ মাত্র। এ ব্যবস্থা কোন পরিসমাপ্তি নয়। এই ব্যবস্থা সূচনা মাত্র।

এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের আদিম শাসন ব্যবস্থা। কোন সমস্যার উদ্ভব হলে অতীতে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে পঞ্চায়তের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই সমস্যা সমাধান করতেন। বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করে বরং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আপোষমূলক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করেছে। তাই এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের এক অংশ মাত্র। চার্লস মেটকাফ (Charles Metcalf) তাই অতীতের এই শাসন পদ্ধতি লক্ষ্য করে এই অঞ্চলের গ্রামগুলোকে 'পরিবর্তনহীন গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র' ('Changeless Village Republics') রূপে বর্ণনা করেন। তাই বলা যায়, এই ব্যবস্থার মূল শূন্যে নয়,স্বর্গে নয়, বরং রয়েছে ধূলির ধরণীতে, বাংলার সনাতন মাটিতে। বাংলার যে কোন গ্রামবাসী এই ব্যবস্থার সাথে পরিচিত। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

(১) গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ঃ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় শ্রমের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং স্থানীয় সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারবে। ফলে পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি অতি সহজেই সংঘটিত হবে। বিশেষভাবে পরিচিত পরিবেশ ও পরিমিত এলাকায় কাজ করার সুযোগ লাভ করলে একদিকে যেমন—জনসাধারণ দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি সকলের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে গ্রামীণ সমস্যার সমাধান ঘটবে।

(২) দায়িত্বশীল নেতৃত্বের বিকাশ ঃ স্থানীয় শাসনকার্যে অংশগ্রহণ এবং শাসন ক্ষমতা উপভোগ করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে। শাসন ক্ষমতায় প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার হয়ে তারা অধিক দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে।

(৩) শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগণ স্থানীয় শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ফলে শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং স্থানীয় সমস্যার ক্ষেত্রে সাধারণত জনগণ স্বল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প সময়ে সমাধান খুঁজে পেতে পারবেন।

(৪) গণচেতনার উন্মেষ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার ফলে জনগণের মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। স্বশাসনের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ও সুনাগরিকতার সূচনা হয়।

(৫) শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতা ঃ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারীদের কোনরূপ স্বৈরাচারী কার্যকলাপের অবকাশ নেই, কেননা সরকারি ও বেসরকারি কর্মীবৃন্দের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত।

(৬) রাজনৈতিক শিক্ষা ঃ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে, কেননা বিভিন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

ইউনিয়ন পরিষদ
Union Parishad

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় পরিচ্ছেদ 'স্থানীয় শাসন' পর্যায়ে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের শাসনভার নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর দেয়া হবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবে। সংবিধানে এই বিধি অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের জুন মাসে জাতীয় সংসদ **ইউনিয়ন পরিষদ** ও **পৌরসভা** সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করেন। এই আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েতগুলো ইউনিয়ন পরিষদরূপে পরিচিত হয় এবং নগর পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটিগুলো 'পৌরসভা' নামে পরিচিত হয়। জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অডিন্যান্স জারি করে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভাগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এরশাদ সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন প্রণালী নতুনভাবে নির্দেশ করা হয়।

১৯৯৩ সালের ২০ নং আইন হিসেবে জাতীয় সংসদ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশোধন করে একটি আইন প্রণয়ন করে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই আইনে কিছু পরিবর্তন এনে ১৯৯৭ সালে জাতীয় সংসদ আর একটি আইন প্রণয়ন করে। বর্তমানে এই আইনটি কার্যকর রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন
Composition

১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হবে একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে। সমগ্র ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ৩ জন মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র এলাকায় তিনটি নির্বাচনী এলাকা সংগঠিত হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলিতে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্য পরিষদের চেয়ারম্যান মাসিক ৩০০ টাকা করে এবং সদস্যগণ মাসিক ১০০ টাকা করে সম্মানী (honorarium) পাবেন। পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। তা গণনা করা হবে পরিষদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে। একজন ব্যক্তি সদস্য বা চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন যদি তিনি অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হন, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকাভুক্ত

হন, সরকারি কর্মচারী না হয়ে থাকেন ও আইনে ঘোষিত কোনভাবে অযোগ্য বিবেচিত না হন। চেয়ারম্যান বা একজন সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থের ক্ষতি বা অপপ্রয়োগের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে এবং যদি সে প্রস্তাব মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হয় তা হলে তিনি অপসারিত হবেন।

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিষদের কর্ম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিচে বর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করবে ঃ

(ক) অর্থ এবং সংস্থাপন ;
(খ) শিক্ষা ;
(গ) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণ ;
(ঘ) নিরীক্ষা এবং হিসাব রক্ষণ ;
(ঙ) কৃষি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কর্ম ;
(চ) সামাজিক কল্যাণ এবং কম্যুনিটি কেন্দ্র ;
(ছ) কুটির শিল্প এবং সমবায়।

তাছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিটি গঠন করতে পারবে। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি তার সদস্য নির্বাচন করবে।

অতীতে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ছিল ৪,০৪৩। বর্তমানে এই সংখ্যা ৪,৫০২।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি
Functions of the Union Parishad

নতুন আইনে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বহুমুখী। নিচে এর বিবরণ দেয়া হলো ঃ

(১) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ঃ কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদি পশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অগগ্রতি সাধন।

(২) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

(৩) শান্তিরক্ষামূলক ঃ পল্লী অঞ্চলে শান্তিরক্ষা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দেশের সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান নিরোধকল্পেও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য পুলিশ সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনকে সহায়তা করবে।

(৪) পরিবার পরিকল্পনা ঃ ইউনিয়ন পরিষদ জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক কাজকে অগ্রাধিকার দান করবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে সাহায্য দান, উপযুক্ত শিক্ষাদান, মাঝে মাঝে বন্ধ্যাত্বকরণ মেলা অনুষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রে জন্মনিরোধ ব্যবস্থার প্রচার ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

(৫) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ ইউনিয়নে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব।

(৬) পানি সরবরাহ ঃ জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম মুখ্য কাজ। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন, দীঘি ও পুকুর খনন ও তাদের তত্ত্বাবধান ইউনিয়ন পরিষদের করতে হবে।

(৭) স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ঃ সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইনের মত সরকারি সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ইউনিয়ন পরিষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(৮) ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম যাচাই, ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং তাদের তৎপরতা সম্পর্কে উপজেলা পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ করাও ইউনিয়ন পরিষদের একটি কাজ।

(৯) জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের হিসাব সংরক্ষণ ও অন্যান্য পর্যায়ে শুমারি পরিচালনা ইউনিয়ন পরিষদকে করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস

১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব বাজেট থাকবে। উপজেলা পরিষদের পূর্ব অনুমোদনসহ নিচে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর ইউনিয়ন পরিষদ কর আরোপ করতে পারবে ঃ (ক) গৃহস্থালী ও আবাসিক জমির মূল্যের উপর কর ; (খ) গ্রাম্য পুলিশের রেট ; (গ) জন্ম, বিবাহ ও উৎসবের উপর ফী ; (ঘ) জনগণের সুবিধার্থে পূর্ত কাজের উপর কম্যুনিটি কর ; (ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবামূলক কাজের জন্য ফী।

পৌরসভা
Pourashava

ইউনিয়ন পরিষদ পল্লী অঞ্চলের জন্য প্রতিষ্ঠিত। এই আইনে শহর এলাকার জন্য পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতীতে যেখানে শহর কমিটি ছিল এবং যে যে ক্ষেত্রে পৌরসভা ছিল সেই ব্যবধান দূর করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৌরসভা চালু হয়েছে। ফলে দেশে পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অতীতে এই সংখ্যা ছিল ২৮। বর্তমানে তা হয় ১৯৮টি। তাছাড়া রয়েছে ছয়টি পৌর করপোরেশন।

পৌরসভার গঠন
Composition

যে সকল ছোট ছোট শহরে শহর কমিটি ছিল সেই সকল শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক পৌরসভায় একজন চেয়ারম্যান, এবং কয়েকজন নির্বাচিত কমিশনার এবং নির্বাচিত কমিশনারগণ কর্তৃক নির্বাচিত মহিলা কমিশনার থাকবেন। নির্বাচনের জন্য তা কয়েকটি নির্বাচিত এলাকায় বিভক্ত। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। পৌরসভার নির্বাচিত সদস্যকে কমিশনার বলা হবে। নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।

যে সকল শহরে পৌরসভা ছিল তাদের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে কয়েকজন করে কমিশনার নির্বাচিত হবেন। সুতরাং প্রত্যেকটি পৌরসভার সদস্য সংখ্যা সমান থাকবে না।

পৌরসভার চেয়ারম্যান পৌরসভার সমগ্র এলাকার নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। কমিশনার ও চেয়ারম্যান নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পৌরসভায় কয়েকজন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হবেন।

পৌরসভার কার্যকাল ৫ বছর। অবশ্য অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য বা পৌরসভার কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের জন্য তারা অপসারিত হতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোট।

পৌরসভার কার্যাবলি
Functions of Pourashava

পৌরসভার কার্যাবলিকে সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(ক) উন্নয়নমূলক, (খ) শান্তি রক্ষামূলক, (গ) বিচার সংক্রান্ত, (ঘ) শিক্ষামূলক, (ঙ) জনস্বাস্থ্যমূলক এবং (চ) বিবিধ কার্য।

(ক) উন্নয়নমূলক

১। বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা।
২। জনসাধারণের জন্য খোলা জায়গা, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ।
৩। পথঘাট ও রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও এর সংরক্ষণ।
৪। সাধারণ মিলনায়তনের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।
৫। জনসাধারনের রাস্তাঘাট, পথ ও সাধারণ স্থানে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
৬। পথ, রাস্তাঘাট ও সাধারণ স্থান পরিষ্কার রাখা, মৃত জন্তুর দেহ অপসারণ করা।
৭। জনস্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেয়া, সাধারণ ব্যবহার্য কোন পুকুর, দীঘি, কূপ প্রভৃতির পানি দূষিত হলে তার পানি পান নিষিদ্ধকরণ, পানীয়ের জন্য জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পুকুরে, দীঘিতে বা অন্য কোথাও গবাদি পশুর গোসল নিষিদ্ধকরণ।
৮। জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করা।
৯। বন্যা, ভূমিকম্প, বাত্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি দুর্যোগের সময় সাহায্য ও সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা।
১০। এতিম, দুঃস্থ ও বিধবাদের সাহায্য করা ও এতিমখানা পরিচালনা।
১১। জনসাধারণের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা ও তার মান উন্নয়ন করা।
১২। ফল-মূল, শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।
১৩। কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন ও সমবায় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা।
১৪। প্রাথমিক সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন।
১৫। লাইব্রেরী, পাঠাগার ও ক্লাব গঠন।
১৬। ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা করা।
১৭। নারী, শিশু ও দুঃস্থদের কল্যাণমূলক কার্যের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৮। শ্রেণীবিদ্বেষ, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিরসন করা।
১৯। শহরে বসবাসকারী বা কোন আগন্তুক বা পর্যটকদের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা।

(খ) শান্তিরক্ষামূলক ঃ শহরাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, বেসরকারি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থা গঠন করবে। শহর এলাকায় সরকারি কর বা ভূমি রাজস্ব আদায় ব্যাপারে সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য করাও এর অন্যতম কাজ।

(গ) বিচারসংক্রান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছোট ছোট বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করার জন্য সালিসী আদালত গঠন করবে। কমিটির চেয়ারম্যান হবেন এই আদালতের চেয়ারম্যান।

(ঘ) শিক্ষামূলক ঃ শহরের শিক্ষা বিস্তারের জন্য পৌরসভা বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন, অন্যান্য শিক্ষায়তন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য দান, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

(ঙ) জনস্বাস্থ্যমূলক ঃ পৌরসভায় শহরের জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করবে। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ, কলেরা ও বসন্তের টিকাদান ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া, পৌরসভা শহরের পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শহরের মধ্যে খাদ্য ও পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ করবে।

(চ) বিবিধ ঃ পৌরসভা শহরাঞ্চলে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে মনোযোগী হবে। তাছাড়া, পৌরসভা শহরের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ, শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

উপজেলা পরিষদ আইন, ২০০৯

উপজেলা প্রশাসন
Upazilla Administration

(ক) উপজেলা ব্যবস্থার বিবর্তন

ব্রিটিশ শাসনামলে এবং পাকিস্তান আমলে থানা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক। জেলা এবং মহকুমা প্রশাসনের পরেই ছিল এর অবস্থান। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় থানা কাউন্সিলের নাম হয় থানা উন্নয়ন কমিটি। ১৯৭৬ সালের "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ" অনুযায়ী থানা উন্নয়ন কমিটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় থানা পরিষদ। এই পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন মহকুমা প্রশাসক। ১৯৮৩ সালে থানার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় উপজেলা এবং থানা পরিষদ হয় উপজেলা পরিষদ। এই পরিষদের চেয়ারম্যান হন উপজেলা চেয়ারম্যান। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (Upazila Nirbahi Officer—UNO) হলেন এই পরিষদের সচিব। তিনি উপজেলায় কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৯৮৫ সালের মে মাসে সর্বপ্রথম উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় বার উপজেলায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বাতিল আইন প্রণীত হয়। ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ আবার উপজেলা পরিষদ পুনর্বহাল করে। কিন্তু উপজেলা পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০৮ সালের ২৯ জুনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার "স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮" প্রণয়ন করে এবং ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরে নির্বাচন কমিশন "স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮" জারি করে। ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিলে সেই অধ্যাদেশের কিছু সংশোধন ও সংযোজন করে জাতীয় সংসদ একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনটি **"উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯" নামে অভিহিত।** এই আইনে দেশে ৪৮২টি উপজেলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) উপজেলা পরিষদের গঠন
Composition of Upazila Parishad

এই আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি সমন্বয়ে ঃ

(১) উপজেলার ভোটদাতাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, একজন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান এবং একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।

(২) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাময়িকভাবে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি।

(৩) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভার, যদি থাকে, মেয়র বা সাময়িকভাবে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি।

(৪) উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং কাউন্সিলারগণের দ্বারা নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ।

(গ) উপজেলা পরিষদের কার্যকাল
Tenure of Upazila Parishad

উপজেলা পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের দিন থেকে পাঁচ বছর সময়কাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(ঘ) চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিল সদস্যগণের যোগ্যতা

উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের যোগ্য হবেন যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁর বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হয়; এবং

(গ) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভোটার তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

অন্যদিকে যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন, অথবা কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন, অথবা দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায়মুক্ত না হয়ে থাকেন, বা কোন ফৌজদারি বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমপক্ষে দুবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে, অথবা উপজেলা নির্বাচনে প্রতিযোগিতার জন্যে অন্য কোন বিধিমত অনুপযুক্ত ঘোষিত হয়ে থাকেন তাহলে চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যপদের জন্যে অযোগ্য হবেন।

(ঙ) চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব

নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তার পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সরকারের নিকট পেশ করবেন।

চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নিজ নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন। তারা দৈহিক এবং মানসিক অক্ষমতার জন্যে বা মারাত্মক অসদাচরণ বা পরিষদের আর্থিক কোন ক্ষতি সাধন করলে পরিষদের প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্যদের চার-পঞ্চমাংশের ভোটে সমর্থিত প্রস্তাবের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অপসারিত হবেন।

উপজেলা পরিষদ গঠিত হবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানগণ নিজেদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকারক্রমে একটি চেয়ারম্যানের প্যানেল নির্বাচিত করবেন। অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। পদত্যাগ, অপসারণ মৃত্যুজনিত বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে এবং নতুন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতা
Executive Power of Upazila Parishad Chairman

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিম্নবর্ণিত কাজগুলি সম্পন্ন করবেন।

১। তিনি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভা পরিচালনা করবেন।

২। তিনি উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির কার্যক্রম তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

৩। তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করবেন।

৪। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে পরিষদের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা করবেন।

৫। পরিষদের ব্যয় মেটানো এবং পাওনা আদায়ের জন্যে তিনি কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করবেন।

৬। তিনি এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় সকল বিবরণী ও প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

৭। উপজেলা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানগণ প্রচলিত আইন বা বিধি-বিধানের পরিপন্থী নয় এরূপ জনস্বার্থ বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোন জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন এবং এই ধরনের কাজের ব্যয়ভার পরিষদের তহবিল থেকে বহনের নির্দেশ দিতে পারবেন। এরূপ কার্যক্রম সম্পর্কে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ পরিষদের পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন প্রদান করবেন এবং তা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৮। এই আইনের অথবা তার অধীনে প্রণীত কোন বিধির পরিপন্থী কোন কাজের জন্যে পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন চেয়ারম্যান। তবে পরিষদের পরবর্তী সভায় তা অনুমোদিত হতে হবে।

(ছ) কমিটি গঠন

Formation of Committees

উপজেলা পরিষদ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করবে ঃ

১। আইন-শৃঙ্খলা;
২। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;
৩। কৃষি ও সেচ;
৪। শিক্ষা;
৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা;
৬। যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন;
৭। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন;
৮। সমাজকল্যাণ;
৯। ভূমি;
১০। মৎস্য ও পশু সম্পদ;
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়;
১২। তথ্য ও সংস্কৃতি;
১৩। বন ও পরিবেশ;
১৪। বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা এই ধারার অধীনে গঠিত স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব হবেন।

(জ) উপজেলা পরিষদের সচিব

Secretary of the Upazila Parishad

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO) পরিষদের সচিব হবেন। তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি উপজেলা স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান। তিনি সরকারি নির্দেশের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

(ঝ) পরিষদের উপদেষ্টা

Advisers to the Parishad

সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য ঐ উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং উপজেলা পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। সরকারের সাথে কোন বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি উপদেষ্টাকে অবহিত রাখতে হবে।

(ঞ) উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি

Functions of Upazila Parishad

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা।
২। উপজেলা পর্যায়ে জনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা।
৩। জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি পরিচালনা।
৪। স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

উল্লিখিত চারটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় তফসিলে উপজেলা পরিষদের ২১টি কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হলো ঃ

১। পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।

৩। আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারি রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬। স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান।

৮। ক্ষুদ্র শিল্পস্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা দান এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন।

১০। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা দান।

১১। বেসরকারিভাবে কৃষি, গবাদিপশু মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২। উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইন-শৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

১৩। উপজেলায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধন।

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দান।

১৫। এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৬। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয় সাধন।

১৯। ই-গভর্নেন্স (E-Governance) চালু ও এক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান।

২০। উপজেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা সাধন।

২১। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

(ট) উপজেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Financial Management of Upazila Parishad

উপজেলা পরিষদের প্রধান আয় হলো উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহল ও ফেরিঘাট থেকে ইজারালব্ধ আয়ের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। যে সব উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয়নি সেখানে অবস্থিত সিনেমা হলের উপর করও ঐ উপজেলার আয়। ঐ এলাকায় অনুষ্ঠিত নাটক, যাত্রার ওপর করের অংশ এবং রাস্তায় প্রদত্ত আলোর উপর নির্ধারিত করের অংশও উপজেলার আয়। এছাড়াও, বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী

ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর, ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবস্থা, বৃত্তি ও পেশার ওপর পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য ধার্যকৃত ফিস, পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ওপর ধার্যকৃত ফিস এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন খাতের ওপর আরোপিত কর, রেট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস থেকে অর্জিত আয় উপজেলা পরিষদের আয়। সরকারের অনুদানও উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস।

উপজেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরিষদ তার অর্জিত অর্থ ব্যয় করবে। পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মাহিনা ও সংস্থাপন ক্ষেত্রে ব্যয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

(ঠ) উপজেলা প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রের সম্পর্ক

উপজেলা প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রের সম্পর্ক পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়। উপজেলা প্রশাসন গ্রামীণ পর্যায়ের প্রশাসন। এর উপরে রয়েছে জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসন। তাই উপজেলা প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ হয় বিভাগীয় এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে নির্দেশ বা সুপারিশ আসে তা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উপজেলায় পৌঁছে। উপজেলা-কেন্দ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে জেলা প্রশাসন।

তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির এবং মাঝে মাঝে মন্ত্রী বা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপজেলা পর্যায়ে সফর এই দুই এর মধ্যে দূরত্বকে বহুল পরিমাণ হ্রাস করেছে।

(ড) মূল্যায়ন

উপজেলা প্রশাসন হচ্ছে গ্রামীণ পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রশাসন। বিভিন্ন ইউনিয়নের জনসমষ্টির নিকট উপজেলা প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই তারা লাভ করেন দিকনির্দেশনা। কোন সমস্যায় পড়লে তারা তা সমাধানের লক্ষে উপজেলা প্রশাসনের নিকট ছুটে আসেন। কেন্দ্র ও উন্নয়নমূলক কর্মের জন্যে উপজেলাকেই বেছে নেয়। এদিক থেকে বলা যায়, উপজেলা প্রশাসন হচ্ছে উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। উপজেলায় অগ্রগতির ছোঁয়া লাগলে বাংলাদেশ হবে উন্নত। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে এবং স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টারূপে দায়িত্বপালন করলে উপজেলা প্রশাসনের সুদিন ফিরবে। এজন্যে অবশ্য উপজেলার প্রশাসনকেও দায়িত্ব পালনের লক্ষে দক্ষ ও প্রবীণ কর্মকর্তা সহযোগে নতুনভাবে সাজাতে হবে।

জেলা পরিষদ

১৯৮৮ সালে প্রণীত **স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনের** পূর্ব পর্যন্ত দেশের পুরাতন ২২টি জেলায় জেলা পরিষদের কাঠামো বিদ্যমান ছিল, ৪২টি নতুন জেলায় জেলা পরিষদ সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া, যেসব জেলায় জেলা পরিষদ বিদ্যমান ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবার ফলে তাও পরিচালিত হত ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কর্তৃক।

জেলা পরিষদের গঠন

১৯৮৮ সালের স্থানীয় সরকার **(জেলা পরিষদ) আইন** অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত হবে **প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য এবং কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে।** জেলার নির্বাচিত সংসদ সদস্য, উপজেলার চেয়ারম্যান এবং জেলার অন্তর্ভুক্ত পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ এর প্রতিনিধি সদস্য। মনোনীত এবং মহিলা সদস্যগণ সরকার কর্তৃক জেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। জেলা প্রশাসক এবং জেলায় কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে সরকার জেলা পরিষদের কর্মকর্তা সদস্যদের নির্দিষ্ট করবেন। তারা পদাধিকার বলে সদস্য পদ লাভ করবেন। তাদের ভোটাধিকার থাকবে না।

জেলা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা হবেন চেয়ারম্যান। তিনি সরকার কর্তৃক প্রতিনিধি সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন। তার কার্যকাল তিন বছর। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে তিনি মাহিনা এবং অন্যান্য সুযোগ লাভ করবেন।

প্রত্যেক জেলা পরিষদের সদস্য সমান হবে না। জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। কিন্তু মহিলা এবং মনোনীত সদস্যের সংখ্যা প্রতিনিধি সদস্যের অধিক হবে না।

জেলা পরিষদের লক্ষ্য ঃ

জেলা পরিষদের লক্ষ্য হবে ত্রিবিধ ঃ

প্রথমত, জেলায় সকল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন।

দ্বিতীয়ত, জেলার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ এবং কোন উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হলে তাহার বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ।

তৃতীয়ত, জেলার বিভিন্ন শাসন বিভাগের উন্নয়ন তত্ত্বাবধান ও শাসন ব্যবস্থার সকল শাখার স্থানীয় সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

এর কার্যাবলি

জেলা পরিষদের দ্বিবিধ কার্য রয়েছে; যথা—

(ক) প্রাথমিক বা মৌল, (খ) ঐচ্ছিক কার্য।

(ক) প্রাথমিক বা মৌল কার্যাবলি ঃ

১। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ;

২। লাইব্রেরী, অধ্যয়ন ক্লাব ইত্যাদির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

৩। হাসপাতাল, ডিস্‌পেনসারী ও পশু চিকিৎসায় পরিচালনা এবং তার উন্নয়ন।

৪। রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও তার সংরক্ষণ।

৫। জনসাধারণের জন্য পার্ক, উদ্যান ও মাঠ নির্মাণ ও এদের সংরক্ষণ।

৬। খেয়াঘাটের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

৭। গবাদি পশুর খোয়াড় নির্মাণ ও পরিচালনা।

৮। পর্যটক ও আগন্তুকদের জন্য বিশ্রামাগার ও ডাক বাংলো প্রভৃতি নির্মাণ এবং পরিচালনা।

৯। মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

১০। খেলাধূলার ব্যবস্থা করা ও মান উন্নত করা।

১১। জাতীয় দিবস ও সরকারি দিবস উদ্‌যাপন করা।

১২। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৩। বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ।

১৪। পানি সরবরাহের ব্যবস্থা।

১৫। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি।

১৬। গ্রাম্য শিল্প, কুটির শিল্প ও সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটানো।

১৭। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও বাত্যা প্রভৃতি দুর্যোগের সময় সাহায্য এবং সেবার ব্যবস্থা করা।

১৮। শিশু জন্ম রেজিস্ট্রেশন।

১৯। সরকারি নির্দেশে অন্যান্য কার্য করা।

(খ) ঐচ্ছিক কার্যাবলি ঃ জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যাবলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা– **(ক) উন্নয়নমূলক, (খ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক, (গ) অর্থনৈতিক, (ঘ) সেবামূলক** এবং **(ঙ) জনস্বাস্থ্যমূলক।**

ঐচ্ছিক কার্যাবলিতে জেলা পরিষদ শিক্ষাগত, সংস্কৃতিগত, সমাজকল্যাণমূলক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য সম্পাদন করবে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় ছাত্রাবাস নির্মাণ, ছাত্রদের বৃত্তিদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মঞ্জুরিদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান, শিক্ষার উন্নতির জন্য সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ, সাংস্কৃতিক কার্য সংগঠন, পাবলিক হল এবং কম্যুনিটি সেন্টার নির্মাণ, জাতীয় ভাষার উন্নতি বিধান উল্লেখযোগ্য।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন এই তিনটি পার্বত্য জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে চতুর্থ জাতীয় সংসদ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৮৯ সালের ৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে এ আইন কার্যকর হয়। এই আইনের লক্ষ্য প্রধানত তিনটি ঃ

(ক) উপজাতি অধ্যুষিত অনগ্রসর এই অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(খ) শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে **বিশেষ এলাকা হিসেবে** এই অঞ্চলকে চিহ্নিত করে এখানকার প্রশাসন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা।

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে উপজাতীয়দের সম্পৃক্ত করা। রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলায় এ আইনে বিশেষভাবে গঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদ বা পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যকর হবে।

এর পটভূমি

স্বাধীনতার বহু পূর্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই এলাকা একটি স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয় ১৮৬০ সালে। ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিধানে এই অঞ্চলকে বহির্ভূত এলাকা (Excluded Area) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে পার্বত্য এলাকার অধিবাসীবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় বটে, কিন্তু জনসমষ্টির অধিকাংশ অমুসলিম বলে পাকিস্তানের আদর্শের সাথে ঐকমত্য পোষণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান পার্বত্য এলাকার বিশেষ মর্যাদার (বহির্ভূত এলাকা হিসেবে) অবসানে এই অঞ্চলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলে উপজাতীয় নেতৃবর্গ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট ৪ দফা দাবি পেশ করেন। পার্বত্য এলাকার স্বায়ত্তশাসন, বাংলাদেশ সংবিধানে ১৯০০ সালের বিধিবিধান সংরক্ষণ, উপজাতীয় প্রধানদের সুনির্দিষ্ট মর্যাদাদান এবং এই অঞ্চলে অ-উপজাতীয়দের স্থায়ী বসবাস বন্ধ ছিল তাদের দাবি। শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং সকলকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অন্তর্ভুক্ত হতে উপদেশ দেন। জিয়া সরকারের আমলেও উপজাতীয়দের দাবি

গৃহীত হয়নি। ফলে এই অঞ্চলে উপজাতীয় ব্যক্তিবর্গের আন্দোলনের সূচনা হয় এবং শেষ পর্যায়ে শান্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। শান্তিবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সংগঠন উপলক্ষে জনগণকে সংগঠিত করা, স্থানীয় প্রশাসনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা, শান্তিপ্রিয় উপজাতীয়দের দেশ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা। প্রথম পর্যায়ে শান্তিপ্রিয়ভাবে এই দাবিগুলো উত্থিত হলেও শেষ পর্যায়ে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র আন্দোলনে রত হয়।

এরশাদ সরকার উপজাতীয় নেতৃবর্গের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র রচনা করেন এবং সর্বশেষে পার্বত্য এলাকার জন্য বিশেষ সুযোগ–সুবিধা সম্বলিত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রণয়ন করেন।

১৯৮৯ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হলেও কিন্তু উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের একটি অংশ এতে খুশী হয়নি, বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ। তাদেরই প্ররোচনায় এবং অন্যান্য কারণে তখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো ব্যক্তি ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছিলেন। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতাসীন হয়ে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় ওরফে সন্তু লারমার সাথে যোগাযোগ করে এবং অন্যূন ১১ বার অধিবেশনে মিলিত হয় এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পায়। ফলে ভারতে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের কিছু অংশ বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তখন জনসংহতির নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল প্রধানত চারটি ঃ (১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে ঐ অঞ্চল থেকে বাঙালিদের অপসারণ : (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসন দান; (৩) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিধিবিধানের আলোকে শাসন পরিচালনা ; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সৈন্যবাহিনীর অপসারণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বীকৃতি দানই ছিল জনসংহতির মূল লক্ষ্য। বিএনপি সরকার জনসংহতি সমিতির এরূপ জাতীয় স্বার্থবিরোধী দাবির মুখে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি পুনর্গঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির সাথে কয়েক দফা আলোচনা–পর্যালোচনার পরে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে জাতীয় কমিটির নেতা জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং সেই চুক্তিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার চারটি আইন প্রণয়ন করেন। এই চারটি আইনের তিনটি হলো ১৯৮৯ সালে গৃহীত স্থানীয় সরকার পরিষদের সংশোধিত রূপ এবং আঞ্চলিক পরিষদ সংগঠন সম্পর্কিত আইনটি সম্পূর্ণ নতুন।

পরিষদের গঠন

পার্বত্য এলাকার তিনটি জেলায় তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে পরিষদের কার্যকাল তিন বছর। ১৯৯৮ সালের আইনে পরিষদের কার্যকাল হয় পাঁচ বছর। এই তিনটি পরিষদের চেয়ারম্যান উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। নির্দিষ্ট সংখ্যক উপজাতীয় এবং অ–উপজাতীয় সদস্য এবং চেয়ারম্যান সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হবে। রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হবে চেয়ারম্যান, বিশজন উপজাতীয় সদস্য এবং দশজন অ–উপজাতীয় সদস্য

সহযোগে। খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হবে চেয়ারম্যান, একুশজন উপজাতীয় সদস্য ও নয়জন অ-উপজাতীয় সদস্য সমন্বয়ে এবং বান্দরবন জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হবে চেয়ারম্যান, উনিশজন উপজাতীয় এবং এগার জন অ-উপজাতীয় সদস্য সমন্বয়ে। উপজাতীয় সদস্যগণ আবার পূর্ব নির্ধারিত হারে বিভিন্ন উপজাতি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। উদাহরণস্বরূপ, রাংগামাটি জেলা পরিষদে ১০ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ৪জন মারমা উপজাতি হতে, ২ জন তনচৈংগা উপজাতি হতে, ১ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন লুসাই, ১ জন পাংখু এবং ১ জন খেয়াং উপজাতি থেকে। পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য থেকে কোন সদস্য সভাপতিত্ব করবেন। পরিষদে উপজাতীয় প্রধানের বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাংগামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে চাকমা প্রধান ইচ্ছা করলে বা আমন্ত্রিত হলে যোগদান করতে পারবেন এবং কোন আলোচ্য বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন। তেমনি খাগড়াছড়ি পরিষদে মং উপজাতি প্রধান এবং বান্দরবন জেলা পরিষদে বোমং উপজাতি প্রধানের এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে পরিষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

পরিষদের কার্যাবলি

প্রথম তফসিলে বর্ণিত বিষয়ে পরিষদ কার্যক্রম নির্ধারণ করবেন। পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ (ক) জেলায় আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তার উন্নতি বিধান, (খ) উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়ন, (গ) শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন, (ঘ) স্বাস্থ্য রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ, (ঙ) কৃষি ও বন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, (চ) পশুপালন এবং মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, (ছ) শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, (জ) সমাজকল্যাণ এবং (ঝ) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠন এবং সংরক্ষণ। পরিষদের নিজস্ব তহবিল থাকবে এবং পরিষদ তা বিধি-বিধান অনুযায়ী বর্ধিত করতে পারবে।

পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা

১৯০০ সালের চট্টগাম পার্বত্য এলাকার বিধান অনুযায়ী বহির্ভূত এলাকা হিসেবে এই অঞ্চল কতকগুলো বিশেষ সুযোগ লাভের অধিকারী হয়। এই আইনে স্থানীয় জনগণ যথাসম্ভব অনুরূপ সুবিধা লাভে যেন সক্ষম হয় সেজন্য পরিষদকে কতকগুলো বিশেষ সুবিধা দান করা হয়। নিচে তা উল্লিখিত হলো ঃ

(১) জেলা পুলিশ ঃ সহকারি সাব-ইন্সপেক্টর ও তার নিম্ন স্তরের সকল পুলিশ কর্মকর্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তাছাড়া, সকল স্তরের পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

(২) ভূমি হস্তান্তরে বাধা-নিষেধ ঃ জেলার কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না এবং অনুমোদন ব্যতীত কোন জায়গা জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নন এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।

(৩) বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঃ উপজাতীয়দের মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করতে হবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন। প্রয়োজনবোধে হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপজাতীয় প্রধান এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাবে।

(৪) ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ আইনে খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্র বা বাট্টা সূত্রে প্রাপ্ত রয়ালটির অংশ জেলা পরিষদের তহবিলে জমা হবে। এই প্রক্রিয়া দেশের অন্যত্র চালু হলে দেশে শুধু বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা শক্তিশালী হবে তাই নয়, জাতীয় অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৫) জেলার ভূমি উন্নয়ন করও পরিষদের তহবিলে জমা হবে।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন তিনটি পার্বত্য জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে রাংগামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে গৌতম দেওয়ান, খাগড়াছড়ি পরিষদে সমীরণ কুমার এবং বান্দরবনে স্যা চিং প্রু নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালের ২ জুলাই চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ উপজাতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি, সম্পদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

গঠন ঃ ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে (ক) চেয়ারম্যান, (খ) ১২ জন উপজাতীয় সদস্য, (গ) ৬ জন অ-উপজাতীয় সদস্য, (ঘ) ২ জন উপজাতীয় মহিলা সদস্য, (ঙ) ১ জন অ-উপজাতীয় মহিলা সদস্য সহযোগে। তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে এই পরিষদের সদস্য হবেন। এর কার্যালয় হবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পার্বত্য জেলাসমূহের যে কোন স্থানে। আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা, ১ জন মুরং ও তনচৈংগা, ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খেয়াং উপজাতি থেকে। অ-উপজাতীয় সদস্যগণ প্রতিটি পার্বত্য জেলা থেকে দু'জন করে নির্বাচিত হবেন। দু'জন মহিলা সদস্যের একজন চাকমা এবং অন্যজন অন্যান্য উপজাতির মহিলাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। অ-উপজাতীয় মহিলা সদস্য তিনটি জেলার অ-উপজাতীয় মহিলাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য সদস্য পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন একজন উপজাতীয়। তিনি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে উপজাতীয় সদস্যদের মধ্য থেকে একজন অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হবেন।[১]

আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি

আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে। পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনও এর অন্যতম কাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করবে আঞ্চলিক পরিষদ। পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনও এর কাজ। তাছাড়া,

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, এমাজউদ্দীন আহমদ, *শান্তিচুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা ঃ ইনকো প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৯-৩০।

উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের নিষ্পত্তি, পার্বত্য জেলায় ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রানকার্য পরিচালনাও আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত। পরিষদ কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি গঠন করতে পারবে। পরিষদের একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন। তিনি সরকারের যুগ্মসচিবের পদ মর্যাদার কর্মকর্তা। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনিও হবেন একজন উপজাতীয়। পরিষদের কার্য নির্বাহের জন্য পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপজাতীয় হবেন।

আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল

আঞ্চলিক পরিষদের স্বতন্ত্র তহবিল থাকবে। পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে প্রদেয় অর্থ, পরিষদের উপর ন্যস্ত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ, সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান, কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ এই তহবিলে জমা হবে। বাজেটের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের আয়-ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

আঞ্চলিক পরিষদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

যে লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে তা পূরণকল্পে সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদ বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ, পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা

বাংলাদেশ সরকার আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য জেলাসমূহ সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সমালোচনা

আঞ্চলিক পরিষদ আইন বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।

(১) কারো মতে, এই আইন বাংলাদেশ সংবিধানের পরিপন্থী, কেননা একক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ৬৪টি জেলা পরিষদের ৩টির সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন অনেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র গঠনের সামিল।

(২) আঞ্চলিক পরিষদ সংগঠনে উপজাতি ও অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে যে পার্থক্য রচনা করা হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক। চেয়ারম্যানের পদ শুধুমাত্র উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষণ এবং উপজাতীয়দের জন্য আনুপাতিক হারে অধিক সদস্যপদ দান গণতন্ত্র সম্মত নয়।

(৩) আঞ্চলিক পরিষদের বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দানের ক্ষমতা অগ্রহণযোগ্য এজন্য যে, বৃহৎশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন।

(৪) তহবিল গঠনেও যে স্বাধীনতা আঞ্চলিক পরিষদকে দেয়া হয়েছে তা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

(৫) আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে জাতীয় পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনার শর্ত জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করে।

(৬) তাছাড়া, এই আইনের যে প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল তা ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালি জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে।

তাই অনেকের ধারণা, যেভাবে এবং শর্তে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে তা বিচ্ছিন্নতা প্রবণতার সহায়ক।
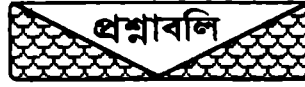
১। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলির আলোচনা কর। [R. U. 1981]

২। ইউনিয়ন পরিষদ কিভাবে গঠিত হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় রাজনীতিতে তা কী ভূমিকা পালন করে? আলোচনা কর। [C. U. 1981]

৩। ১৯৯৮ সালে প্রণীত আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলির বিবরণ দাও।

৪। উপজেলা পরিষদের গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে কী জান?

৫। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির বিবর্তন সম্পর্কে একটি রচনা লিখ।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন আইন

CONSTITUTIONAl AMENDMENT ACTS

সূচনা
Introduction

সংবিধান গতিশীল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তন সূচিত হলে সংবিধান অচল থাকতে পারে না। তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রত্যেক দেশের সংবিধানে পরিবর্তন ও সংশোধনের ব্যবস্থা থাকে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সংবিধানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিচে সংশোধন আইনগুলোর বিবরণ দেয়া হল ঃ

বাংলাদেশ সংবিধান (প্রথম) সংশোধন আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই এই সংশোধন আইন প্রণীত হয় গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দী পাকিস্তানি সৈনিকদের বিচারের প্রেক্ষাপটে। এই সংশোধনের ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে (২) দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা যুক্ত হয়। "এই সংবিধানে যাহা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক,ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করবার বিধান সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সাথে অসমঞ্জস বা তার পরিপন্থী, এ কারণে বাতিল বা বে-আইনী বলে গণ্য হবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বে-আইনী বলে গণ্য হবে না।"

এই সংশোধন আইন প্রণয়নের পর যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে পাকিস্তানী বন্দী সৈনিকদের বিচারের পথ প্রশস্ত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বিতীয়) সংশোধন আইন, ১৯৭৩

দ্বিতীয় সংশোধন আইনটি প্রণীত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। এটি ছিল ১৯৭৩ সালের ২৪ নম্বর আইন। এই সংশোধন আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো "জরুরি বিধান" সম্বলিত নতুন ভাগের সংযোজন।

জরুরী বিধানাবলীতে ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোন অংশের নিরাপত্তার বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবার আশংকা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। এরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। এই সংশোধনীতে (৯)ক সংযোজন করে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করা হয়।

এই জরুরী অবস্থার ঘোষণা পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা হবে অথবা জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে অথবা ১২০ দিন অতিবাহিত হবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর থাকবে না। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করার অধিকার স্বল্পকালের জন্য স্থগিত থাকবে। তাছাড়া, নাগরিকদের চলাফেরার অবাধ অধিকার, সমবেত হবার অধিকার, সমিতি গঠনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের অধিকার, ব্যবসায় ও কারবার পরিচালনার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও পরিচালনার অধিকার জরুরী অবস্থায় ব্যাহত হবে। এই সময়ে গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে যে রক্ষাকবচ ছিল তার অবসান ঘটে।

বাংলাদেশ সংবিধান (তৃতীয়) সংশোধন আইন, ১৯৭৪

এই সংশোধন আইনটি গৃহীত হয় ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর। এটি ছিল ১৯৭৪ সালের ৭৪ নম্বর আইন। বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ চুক্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এই সংশোধন আইনটি গৃহীত হয়।

মিজোরাম–বাংলাদেশী সীমা, ত্রিপুরা, সিলেট, ভাগলপুর, রেলওয়ে লাইন, শিবপুর–গৌরাঙ্গলা সীমা, মুহুরী নদী এলাকা, ফেনী নদী সীমান্ত, হাকার খাল, বৈকারী খাল, হিলি, বেরুবাড়ী ও লাঠিটিলা–ডুমাবাড়ী সীমান্ত এলাকা সম্পর্কে ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয় তারই প্রেক্ষাপটে এই সংশোধন আইন গৃহীত হয়।

এই সংশোধনীতে বলা হয় যে, চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যবর্তী ভূ–সীমানা নির্ধারণের পর সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করবেন সে তারিখ হতে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত "অন্তর্ভুক্ত এলাকা" বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অংশ হবে এবং বহির্ভূত "এলাকা" তার অংশ থাকবে না।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ) সংশোধন আইন, ১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশ সংবিধানের (চতুর্থ) সংশোধন আইন জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি এই সংশোধন আইনকে "দ্বিতীয় বিপ্লব" নামে অভিহিত করেছিলেন। এটি ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শনিবার জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ ভোট এবং বিপক্ষে কোন ভোট ছিল না।

এর গুরুত্ব
Its Significance

সংবিধান (চতুর্থ) সংশোধন আইন বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম, এই সংশোধন যে আইনে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে জাতীয় সংসদের যে প্রাধান্য ছিল তা রাষ্ট্রপতির অধিকার, ক্ষমতা ও প্রাধান্যের নিকট ম্লান হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়, মন্ত্রিসভা অতীতে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী ছিল। মন্ত্রিসভা তার কার্যাবলি, বিধিবিধান ও নীতির জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল। প্রয়োজনবোধে জাতীয় সংসদ অনাস্থাসূচক প্রস্তাব প্রণয়ন করে মন্ত্রিসভাকে বাতিল করতে পারতেন। এই সংশোধনীর ফলে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী হয়।

তৃতীয়, অতীতে মন্ত্রিসভা গঠিত হত জাতীয় সংসদের দ্বারা। মন্ত্রী নির্বাচিত হবার সময় কেউ সংসদের সদস্য না থাকলে অন্যূন ছয় মাসের মধ্যে তাকে সদস্য নির্বাচিত হতে হত। এই আইন অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সদস্য হতে হলে জাতীয় সংসদের সদস্য না হলেও চলত।

চতুর্থ, এই সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতি হন নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তিনি আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন না। তারই ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ কাজ করবেন।

পঞ্চম, এই সংশোধনী আইনে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

ষষ্ঠ, এই সংশোধনী আইনে বিচার বিভাগের কর্তৃত্বের হ্রাস হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অপসারণ সার্বিকভাবে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। অবশ্য বলা হয় যে, কোন বিচারককে অসদাচারণ ও অনুপযুক্ততার জন্য কোন সময় অপসারণ করা হলে তার পূর্বে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়া হবে। ১১৬(ক) অনুচ্ছেদে এও বলা হয় যে, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন।

সপ্তম, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যে দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর অর্পিত হয়েছিল এই আইনে তা বাতিল করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে সাংবিধানিক আদালত অথবা কমিশন বা ট্রাইব্যুনাল গঠন করে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করতে পারবেন।

অষ্টম, এই সংশোধনী আইনে একটি জাতীয় দল গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। জাতীয় দল (The National Party) সংগঠিত হলে দেশে অন্যান্য রাজনৈতিক দল বাতিল ও বে-আইনী ঘোষিত হবে। এই জাতীয় দলের সংগঠন, তার নামকরণ, নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা, সদস্যভূক্তি, অর্থসংগ্রহ বা অন্যান্য বিষয়সমূহ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। এই একক রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যবস্থা।

এই সংশোধন আইনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হয়।

সংশোধন আইনের বিভিন্ন দিক

রাষ্ট্রপতি (President)

এই সংশোধন আইনে বলা হয় যে, বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপ্রধানরূপে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন
Election

রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে তিনি কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদে পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তবে পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন। উপরাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের ১৮০ দিন পূর্বে শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের কারণে এই পদ শূন্য হলেও একই নিয়ম অনুসৃত হবে।

এই পদের যোগ্যতা
Qualifications

রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে হলে কোন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে ঃ

(এক) তাকে অন্যূন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক হতে হবে।

(দুই) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

(তিন) সংবিধানের বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হলে চলবে না।

রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন
Impeachment of President

এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে। এ জন্য সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিস স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হবে। স্পীকারের নিকট নোটিস প্রদানের দিন থেকে চৌদ্দ দিনের পূর্বে অথবা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না। এই নোটিস পেয়ে স্পীকার সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।

অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকতে অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবেন। অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে তা যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হবে। শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণেও রাষ্ট্রপতি অপসারিত হতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অভিযোগ আনয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্পীকার একটি চিকিৎসা পর্ষদ গঠনের ব্যবস্থা করবেন। শেষ পর্যায়ে সংসদের মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশের ভোটে পর্ষদের রিপোর্ট গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

রাষ্ট্রপতির পদশূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব
Powers and Functions of the President

চতুর্থ সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতির উপর যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে; যথা—**(ক) শাসনমূলক, (খ) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, (গ) অর্থ সংক্রান্ত, (ঘ) বিচার বিভাগীয়, (ঙ) জরুরী ক্ষমতা** এবং **(চ) বিবিধ।**

(ক) শাসনমূলক কার্যাবলি (Executive) ঃ রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান। তাঁর নামে প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তিনি সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও বটে।

বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। এই কর্তৃত্ব তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। তিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন।

তাছাড়াও, তিনি এক বা একাধিক উপ-প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রপতি সাধারণত মন্ত্রিদের নিয়োগ করবেন, তবে তিনি এমন ব্যক্তিদেরকেও মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করতে পারবেন যারা সংসদের সদস্য নন, কিন্তু সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। এভাবে নিযুক্ত মন্ত্রিদের সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হবে না। তিনি বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রধান নির্বাচনী কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগ করবেন। তিনি বাংলাদেশের হাইকমিশনার, রাষ্ট্রদূত, কন্সাল ও অন্যান্য কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করবেন এবং বাংলাদেশে আগত হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন। তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত।

(খ) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative) ঃ রাষ্ট্রপতি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত এবং ভঙ্গ করবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে তিনি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিল পরিষদের পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে। অন্যদিকে, তাঁর ফেরত পাঠানোর বিলটি সংসদ পুনর্বিবেচনার পর পুনরায় গ্রহণ করলে পুনরায় তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হবে এবং ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে ৭দিন পর তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

যখন সংসদের অধিবেশন থাকে না তখন আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করলে তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন এবং তা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। তবে অধ্যাদেশ জারি হবার পর অনুষ্ঠিত

সংসদের প্রথম বৈঠকে তা উপস্থাপিত হবে এবং ইতিপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে তা ৩০ দিন অতিবাহিত হলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে অনুমোদিত না হলে বাতিল হবে।

(গ) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers) ঃ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন অর্থবিল সংসদে উত্থাপন করা যাবে না এবং কোন মঞ্জুরি দাবি পেশ করা যাবে না। সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয় সংসদের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তিনি প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে সরকারের আয় ও ব্যয় দেখিয়ে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী উত্থাপন করবেন। মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ঠ না হলে তিনি অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ সংবলিত একটি সম্পূরক আর্থিক বিবরণী বা অতিরিক্ত আর্থিক বিবরণী সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। ব্যয় মঞ্জুরির ক্ষমতাও তাঁর থাকবে।

(ঘ) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers) ঃ রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগদান করবেন। তাছাড়া, তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের চরমাধিকার প্রয়োগ করবেন। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে।

রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশের কোন নাগরিক অন্য দেশ প্রদত্ত কোন উপাধি বা পদবী সম্মান গ্রহণ করতে পারবেন না। এই দিক দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সম্মানের উৎস (Source of honour)।

(ঙ) রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা (Powers of the President During Emergency) ঃ ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানে বিধিবদ্ধ কতকগুলো মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে এবং ঐ সকল মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করার অধিকার নির্ধারিত স্বল্পকালের জন্য স্থগিত থাকবে। সমগ্র বাংলাদেশ বা তার কোন অংশে জরুরী অবস্থায় গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী অবস্থার ঘোষণা (ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাবে। (খ) সংসদে উপস্থাপিত হবে, এবং (গ) একশত কুড়ি দিন অতিবাহিত হবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হলে উক্ত সময়ের অবসানে কার্যকর থাকবে না।

(চ) বিবিধ (Miscellaneous) ঃ প্রথম, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, পানি বা আকাশপথে প্রকৃত বা আসন্ন আক্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের ব্যবস্থাপনা সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি বিধি প্রণয়ন করে তা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

দ্বিতীয়, বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইনের বিধানাবলিকে এই সংবিধানের বিধানাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দুই বছরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা ঐ সব বিধানের সংশোধন বা রহিত করতে পারবেন।

তৃতীয়, তিনি বৃটেনের রাজা বা রানীর ন্যায় সকল প্রকার সম্মানের উৎস। জনহিতকর ও সামরিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রপতি যে কাউকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করতে পারবেন। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশের কোন নাগরিক বিদেশী প্রদত্ত কোন উপাধি বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

চতুর্থ, প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পাদিত চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে সম্পাদিত হবে।

পঞ্চম, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা মুখ্য। যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হবে। বিদেশী কূটনৈতিকদের তিনি গ্রহণ করবেন।

ষষ্ঠ, তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী তাঁর খুশিমত পদে বহাল থাকবেন।

সপ্তম, রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগদান করবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির খুশিমত পদে বহাল থাকবেন।

অষ্টম, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

নবম, তিনি সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

জাতীয় দল-বাকশাল
The National Party-Bksal

এই সংশোধনী আইনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলাদেশে একটি 'জাতীয় দল' গঠনের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে পূর্ণরূপ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতি একটি জাতীয় দল গঠনের নির্দেশ দিবেন। এই নির্দেশ জারি হবার পর দেশে প্রচলিত সকল রাজনৈতিক দল বাতিল এবং বে-আইনী ঘোষিত হবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী জাতীয় দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দল সংগঠন করা যাবে না।

এর নামকরণ, সংগঠন, আর্থিক ভিত্তি, কার্যক্রম, সদস্যভুক্ত প্রভৃতি সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী হবে। এ জাতীয় দলের নাম ছিল **বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল -BKSAL)**। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এর সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। জাতীয় দল গঠিত হবার পরে জাতীয় সংসদের কোন সদস্য এর সদস্য পদ লাভ না করলে সংসদে তার সদস্যপদ শূন্য হবে। জাতীয় দল কর্তৃক মনোনীত না হলে কোন ব্যক্তি জাতীয় সংসদের সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না অথবা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারবেন না।

কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

এক দলীয় ব্যবস্থা নতুন নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের এটি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কমিউনিস্ট পার্টিকে সংবিধানে একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। তা ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এখানে স্বীকার করা হয় না।

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শাসনব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষে ছিলেন একজন পার্টির সদস্য, যিনি দলীয় প্রধানের নির্দেশে পরিচালিত হন। কমিউনিস্ট পার্টি মেহনতি জনগণের পার্টি এবং তার সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণে দেশে 'মেহনতি জনগণের একানয়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পার্টি নির্দেশের নিকট অন্যান্য সংস্থার নির্দেশ মূল্যহীন। শাসন ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তির গুরুত্ব নির্ধারিত হয় তিনি পার্টিতে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তার দ্বারা। দলীয় কংগ্রেস ১২৫ জন সদস্য নির্বাচন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে। কেন্দ্রীয় কমিটি আবার ১৪ জন সদস্য বিশিষ্ট দলীয় প্রেসিডিয়াম গঠন করে। তা ব্যতীত, পার্টির সচিবালয় থাকবে।

এক দলীয় ব্যবস্থা শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই সুনির্দিষ্ট হয় নি। অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, যেমন- পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, কিউবা প্রভৃতি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃত হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় দলের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্য রয়েছে। **প্রথম,** কমিউনিস্ট পার্টি এক আদর্শগত পার্টি। এর লক্ষ্য **প্রথম,** সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কোথাও মার্কসবাদ, কোথাও বা 'মাওবাদ'-এর ভিত্তিতে পার্টি সুসংগঠিত। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা হলেও এক 'মিশ্রিত' অর্থনীতি পরিচালনা ছিল রাষ্ট্রীয় আদর্শ। **দ্বিতীয়,** কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহে জাতীয়তাবাদের আবেদন কম বরং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদই তার প্রধান সুর। বাংলাদেশে সেই সুরের প্রভাব কম। **তৃতীয়,** বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সমানভাবে জনমনকে উদ্বুদ্ধ করে। এসব কারণে বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের সংগঠন, কার্যক্রম এবং পরিচালনা নীতি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে স্বতন্ত্র।

বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগকে মিসরের (Egypt) দলীয় ব্যবস্থা ও তানজানিয়ার (Tanzania) একদলীয় ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা চলে। মিসরের আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন (Arab Socialist Union) এমনি এক জাতীয় দল। এটি চারটি স্তর সম্বলিত এক রাজনৈতিক দল। সর্বনিম্নে রয়েছে গ্রাম্য ফ্যাক্টরী, স্কুল, শহরতলীতে বিস্তৃত ৭০০০ (সাত হাজার) দলীয় সংগঠন। দ্বিতীয় স্তর হলো তার কতকগুলো সম্মিলিত আঞ্চলিক সংগঠন, যা 'মারকাজ' (Marcaz) নামে পরিচিত। তৃতীয় স্তর হলো-প্রাদেশিক সংগঠন এবং সর্বোচ্চে রয়েছে সাধারণ জাতীয় কংগ্রেস (General National Congress)। এই পর্যায়ে সদস্যদের সংখ্যা ১৫০০ জন। দুই বছরে একবার অধিবেশনে মিলিত হয়। তাই এর নির্বাচিত 'সাধারণ কেন্দ্রীয় কমিটি' (General Central Committee) রয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। তা ২৫০ থেকে ৩০০ জনের মধ্যে। এ কমিটি বছরে দুবার অধিবেশনে মিলিত হয়। সর্বোচ্চ সংস্থা সুপ্রীম কার্যকরী কমিটি (Supreme Executive Committee)। এটি ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

মিসরের জাতীয় দলের সাথে বাংলাদেশের মিল দুই দিক থেকে। **প্রথম,** মিসরে আরব জাতীয়তাবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে, এবং **দ্বিতীয়,** সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তবে সদস্যভুক্তির ক্ষেত্রে আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন একটু স্বতন্ত্র। মিসরের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই তার সদস্য। বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য কিন্তু সাধারণভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, যদিও কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মচারী এবং সামরিক কর্মকর্তা তার সদস্য ছিলেন।

বাংলাদেশের জাতীয় দলের সাথে আর একটি রাষ্ট্রের জাতীয় দলের প্রচুর মিল লক্ষ্য করা যায় এবং তা তানজানিয়া (Tanzania)। তানজানিয়া প্রজাতন্ত্র ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার এ দু'ভূখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত। এখানেও রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার শীর্ষমণি। একাধারে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ও সামরিক বাহিনীর পরিচালক। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ৫ বছরের জন্য জাতীয় দলের মনোনয়নে। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন। রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদকেও ভেঙ্গে দিতে পারেন।

এখানেও একটি জাতীয় দল তৈরি হয় এবং তা ট্যাঙ্গানিকা আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন (Tanganyika African National Union-TANU) এবং জাঞ্জিবারের আফ্রো-সিরাজী (Afro-Shirazi) পার্টির সমন্বয়ে গঠিত। এর কয়েকটি স্তর রয়েছে। নিম্ন পর্যায়ে ৭০০০ (সাত হাজার) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৭টি আঞ্চলিক এবং ৬০টি স্থানীয় কমিশন, তৃতীয় পর্যায়ে ১৩টি শহর পরিষদ ও ৫৮টি জেলা পরিষদ রয়েছে। দলের সর্বোচ্চ সংস্থা হলো জাতীয় কার্যকরী কমিটি (National Executive Committee)। এর সদস্য সংখ্যা ১২ জন। জাতীয় দল জনসাধারণ এবং সরকারি কর্মকর্তারা প্রত্যেক স্তরে সম্মিলিত হয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইনের সমালোচনা

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন ছিল চরম এক পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং শাসনব্যবস্থার অনিশ্চয়তার ক্রান্তিলগ্নে এই সংশোধন আইন গৃহীত হয়। এর লক্ষ্য যাই থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত কারণে এই সংশোধন আইন সকলের শ্রদ্ধা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

প্রথম, স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম মুহূর্তগুলোতে গণতন্ত্রের যে আদর্শ সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আন্দোলনের গতিবেগকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল, এই সংশোধন আইন তার কণ্ঠ রোধ করে এবং তা অগণতান্ত্রিক এক ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছিল।

দ্বিতীয়, এর ফলে রাষ্ট্রপতির একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। জাতীয় আদর্শ অপেক্ষা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণ সর্বক্ষেত্রে অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তৃতীয়, কমিউনিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত না হয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ জাতীয় দল হিসেবে ক্ষমতার একমাত্র ধারক ও বাহক হবে অনেকটা ফ্যাসিস্ট দলের মত জাতীয় জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছিল । একমাত্র জাতীয় দল জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে তা শুভ ফলের সৃষ্টি করে। কিন্তু তা যদি ক্ষমতাভিত্তিক হয়ে উঠে, তবে তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

চতুর্থ, এই আইনে বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা সঙ্কুচিত হওয়ায় বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তার অবসান ঘটে।

পঞ্চম, এই আইনে সংসদের ক্ষমতা খর্ব করা হয় এবং তা জনপ্রতিনিধিদের পদমর্যাদার পক্ষে ছিল হানিকর। তবে এই আইনের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমালোচনা এই যে, এই আইনে গৃহীত ব্যবস্থায় নতুন কোন সম্ভাবনাময় ব্যবস্থার জন্ম না দিয়ে প্রচলিত কার্যকর পদ্ধতির অবসান ঘটায়। নতুন পথের সন্ধান না দিয়ে তা প্রচলিত পথটি বন্ধ করে দেয়, যদিও সে পথটি ছিল অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ।

বাংলাদেশ সংবিধান (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৭

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে শাসন কাঠামোর পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট, ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর ও ১৯৭৫ সালের ২৯ নভেম্বরের ঘোষণা উল্লেখযোগ্য। এ সব ঘোষণায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণাকালে বাংলাদেশ সংবিধানে কিছু সংশোধনী সংযোজন করে ১৯৭৭ সালের সংশোধনী আদেশ জারি করেন। এই আদেশ সংবিধানে কয়েকটি মৌল পরিবর্তন সূচিত করে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

(এক) বাংলাদেশের নাগরিক এখন থেকে বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

(দুই) বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মৌল নীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংযোজিত হয় আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। আল্লাহ্ই সকল কর্মের মূল হিসেবে স্বীকৃত হয়। তাই সংবিধান শুরু করা হয়েছে আল্লাহ্র নামে–বিস্‌মিল্লাহির রাহমানুর রাহিম দিয়ে।

(তিন) সংবিধানের অন্য মৌলনীতি–সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে নতুন করে। এই অর্থে সমাজতন্ত্র হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার।

(চার) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ক্ষেত্রে নবম ও দশম অনুচ্ছেদে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তিত অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে।

(পাঁচ) মূলনীতির ক্ষেত্রে পঁচিশতম অনুচ্ছেদকে পরিবর্তিত করে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশ ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন সংহত ও সংরক্ষণ করবে।

(ছয়) মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে বিয়াল্লিশতম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।

(সাত) আরও একটি সংশোধনীতে বলা হয় যে, বাংলাদেশে একটি বিচার পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদ সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করবেন। এই পরিষদের উপদেশ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তথা তাদের অপসারণ করতে পারবেন।

(আট) রাষ্ট্রপতির এই সংশোধনী আদেশে আরও ঘোষণা করা হয় যে, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার পরও সমস্ত বিধিবিধান ও সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল ব্যবস্থা বৈধ থাকবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (পনেরতম সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৮

১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৭৮ সালের **দ্বিতীয় ঘোষণা (পনরতম সংশোধন)** শিরোনামে বাংলাদেশ সংবিধানে এক সংশোধনী আদেশ জারি করেন। এই সংশোধনী আদেশ সংবিধানে কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করে। পরিবর্তনগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(এক) রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী, এক বা একাধিক উপ-প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রিদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে। মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতিকে কোন্ ধরনের উপদেশ দিয়েছেন বা কি প্রকারের সহায়তা করেছেন এই সকল বিষয় কোন আদালত অনুসন্ধান করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের অধিকাংশের আস্থাভাজন বলে প্রতীয়মান সদস্যকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ দান করবেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে রাষ্ট্রপতি উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ দান করবেন। রাষ্ট্রপতি অবশ্য এমন ব্যক্তিদেরকেও

মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করতে পারবেন যারা সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু সংসদের সদস্য নন। তবে এ ভাবে নিযুক্ত মন্ত্রিদের সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হবে না। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির খুশিমত স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন।

(দুই) মন্ত্রিপরিষদের সভায় রাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করবেন অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতিত্ব করার জন্য নির্দেশ দান করবেন।

(তিন) জাতীয় সংসদের ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এবং তাও ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছরের জন্যে।

(চার) এই সংশোধনী আদেশ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে রাষ্টপতির নাকচ করার ক্ষমতা (Veto Power) রইল না।

(পাঁচ) সরকারি কর্মকর্তাদের সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার কোন যোগ্যতা রইল না, কেননা এই সংশোধনী আদেশে ঘোষণা করা হয় যে, যারা বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন তারা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(ছয়) যে সকল অধস্তন বিচারালয় রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল, এখন থেকে ঐ সকল বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(সাত) বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble), রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সম্পর্কে কোন সংশোধনী বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে এবং তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হলে সেই বিলে সম্মতি দেয়া সঙ্গত কিনা তা যাচাই করার জন্য রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে এক গণভোটের ব্যবস্থা করবেন। এই গণভোট (Referendum) পরিচালনা করবেন নির্বাচন কমিশন। গণভোটে সেই বিল অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন লাভ করলে ধরে নিতে হবে যে, রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দান করেছেন। তবে অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন লাভে তা ব্যর্থ হলে সেই বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান করবেন না।

(আট) যদি জাতীয় সংসদ কোন অর্থ বছরে শাসন পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দে ব্যর্থ হয় অথবা অক্ষমতা প্রকাশ করে অথবা প্রস্তাবিত পরিমাণ হ্রাস করা হয় তা হলে অনূ্ন ১২০ দিনের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় অর্থের মঞ্জুরি দান করবেন।

(নয়) যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হবে। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, সেই চুক্তি বা সন্ধি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয় তবে তিনি তা জাতীয় সংসদে প্রেরণ করবেন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য।

বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম) সংশোধন আইন, ১৯৭৯

১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল বাংলাদেশ সংবিধান (পঞ্চম) সংশোধন আইনটি গৃহীত হয়।

এই সংশোধন আইনের ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে (উভয় দিনসহ) প্রণীত সকল আদেশ, সামরিক আইন, প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন আদেশ দ্বারা সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হয়েছে তা বৈধভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষিত হলো। এই সংশোধন আইনে আরও বলা হয় যে, ঐ মেয়াদের মধ্যে সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক

আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন থেকে আহরিত ক্ষমতা বলে কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ বা দণ্ডাদেশ কার্যকর করার জন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত সকল ব্যবস্থা ও কার্যধারা বৈধভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে এই সম্পর্কে কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন করা চলবে না।

এই বিলটি উত্থাপন করেন সংসদ নেতা শাহ্ আজিজুর রহমান। তখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন আসাদুজ্জামান খান। সুদীর্ঘ আলোচনা, তুমুল বিতর্ক এবং বিরোধী দলের একাংশের সংসদ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সংশোধনী আইনটি গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধনী) আইন, ১৯৮১

বাংলাদেশ সংবিধান (ষষ্ঠ) সংশোধন আইনটি জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৮১ সালের ৮ জুলাই। ১৯৮১ সালে ৩০ মে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একাংশের বিদ্রোহজনিত সংকটে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হলে তদানীন্তন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে হয় ১৮০ দিনের মধ্যে। উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন স্থির হয়। কিন্তু তিনি যেহেতু বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদটি ছিল লাভজনক তাই সাধারণ নির্বাচনে তার পথ প্রশস্ত করার জন্য ষষ্ঠ সংশোধনী আইন প্রণীত হয়।

এই সংশোধনী আইনে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫১(৪) এবং ৬৬ (২ক) উপধারা সংশোধিত হয়। এই সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ৫১ (৪ক) উপধারায় প্রতিস্থাপন করা হয় যে, উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে তিনি যে তারিখে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে তাঁর পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। তাছাড়া ৬৬(২ক) উপধারায় প্রতিস্থাপন করা হয়, কেবল রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।' ষষ্ঠ সংশোধনী আইনে ৫১ ধারার ৪ উপ-ধারার সাথে আরও দুটি উপ-ধারা সংযোজিত হয়। ৫ উপ-ধারায় বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি সদস্য হবার যোগ্য হবেন না।' ৬ উপধারায় বলা হয়, 'একজন সংসদ সদস্য যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বা উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন তা হলে তাকে সাথে সাথে সংসদ সদস্য পদত্যাগ করতে হবে।'

বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম) সংশোধন আইন, ১৯৮৬

১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তৃতীয় জাতীয় সংসদের ৬ ঘন্টা ব্যাপী ১ দিনের অধিবেশনে বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম) সংশোধন আইন গৃহীত হয়। ৩৩০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ২২৩ জন সদস্য এই আইনের পক্ষে ভোট দেন। এই সংশোধন আইনের লক্ষ্য ছিল জেনারেল এরশাদ ও তার সরকার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত যে সমস্ত বিধিবিধান ও সামরিক আইন প্রবর্তন করেন এবং ঐ সকল বিধিবিধান এবং আইনের ভিত্তিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেন তাদের সাংবিধানিক বৈধতা দান। ঐ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের করা চলবে না। এক কথায়, সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণই ছিল এই আইনের লক্ষ্য।

বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম) সংশোধন আইন, ১৯৮৮

চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন এই আইনটি গৃহীত হয়। এই সংশোধন আইনের ধারাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) ইসলামকে বাংলাদেশে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা ঃ এই আইনের ফলে সংবিধানের ২ ধারার পর ২(ক) ধারা সংযোজন করা হয়। ২(ক) ধারায় বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তি ও সদ্ভাবের পরিবেশে চর্চা করা হবে।'

(২) হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন ঃ এই সংশোধন আইনে সংবিধানের ১০০ ধারাটি সংশোধন করে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয়। সংশোধনের পর ১০০ ধারাটি নিম্নে বর্ণিতভাবে সংগঠিত হয় ঃ

(ক) সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন ঢাকায় স্থাপিত।

(খ) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণ সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী বেঞ্চ আসন গ্রহণ করবেন।

(গ) বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং সিলেট হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপিত হবে।

(ঘ) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি প্রত্যেকটি স্থায়ী বেঞ্চের পরিধি, কার্যক্রম এবং ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন।

(ঙ) স্থায়ী বেঞ্চ সম্পর্কে অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন রাষ্ট্রপতি।

(চ) মনোনয়নের মাধ্যমে বিচারপতিগণকে স্থানান্তরিত করা হবে।

(৩) বিদেশী রাষ্ট্র থেকে কোন ভূষণ বা উপাধি গ্রহণ ঃ এই সংশোধন আইনে সংবিধানের ৩০ ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের কোন নাগরিক রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কোন ভূষণ, উপাধি বা সম্মানসূচক ডিগ্রী গ্রহণ করতে পারবেন না।

(৪) রাজধানীর বানান এবং ভাষার নাম পরিবর্তন ঃ এই আইনে সংবিধানের ৩ ধারাটি পরিবর্তন করে ভাষার নাম স্থির করা হয় ইংরেজীতে Bangla এবং ৫ ধারা পরিবর্তন করে রাজধানী ঢাকার নাম স্থির করা হয় ইংরেজীতে Dhaka। এর পূর্বে এই নাম ছিল Bengali এবং Dacca.

এই আইনটি প্রণয়নের পর সংসদ নেতা মওদুদ আহমদ বলেন, 'এই আইনটি এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।' দীর্ঘ সাতদিন ধরে বিতর্কের পর তা গৃহীত হয়। এর পক্ষে ভোটদান করেন ২৫৪ জন সদস্য।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং মোঃ জালালউদ্দীন নামক দুজন নাগরিকের রিট পিটিশনের ফলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট অষ্টম সংশোধন আইনের ২নং বিধি অর্থাৎ ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়টি সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর। ফলে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চের কার্যকারিতা আর রইল না।

সংবিধানের (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সংবিধানের নবম সংশোধন আইন অনুমোদন করেছে। এই বিল গ্রহণের পক্ষে ২৭২ ভোট এবং তার বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি। এই সংশোধনীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

(১) উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(২) রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন এক সাথে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) একাদিক্রমে দুই মেয়াদ তথা ১০ বছরের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

(৪) ৫ বছর পর পর নিয়মিত রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংসদ অধিবেশনে বসবে।

এই আইনে সংবিধানের ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৮, ১৫২ অনুচ্ছেদ এবং সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধিত হয়েছে। চলমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই আইন প্রণীত হয়। ১৯৯১ সালের ১লা মার্চ বা তার পূর্বে এই বিধান কার্যকর হবে। সংবিধানের ৫১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।' সংবিধানের ৫৫ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় ঃ মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণ হেতু যদি উপ-রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা হলে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করবেন এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক তা অনুমোদিত হলে উপ-রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সেই পদে অধিষ্ঠিত হবেন।' সংবিধানের ৭২(৪)ক অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয় যে, 'সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা অধিবেশনে রত না থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা দেখা দিলে উক্ত তারিখের পরদিন মধ্যাহ্নে সংসদ ভবনে উক্ত সংসদ স্বতঃই আহুত হয়ে অধিবেশনে মিলিত হবে এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়নের পর তা স্বতই পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।' সংবিধানের ১২৩ এবং ১৪৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় যে, 'রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একই সাথে একই সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'

জাতীয় সংসদে যদিও এই বিন্যাস সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তথাপি সংসদের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গ এই আইনকে ক্ষমতাসীন সরকারের 'স্থায়ীকরণের পন্থা' হিসেবে বর্ণনা করেন। উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং দুই মেয়াদের অধিক কাল কোন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত না থাকায় এই সাংবিধানিক পদক্ষেপ অভিনন্দনযোগ্য।

সংবিধানের দশম সংশোধন আইন, ১৯৯০

১৯৯০ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সংবিধানের দশম সংশোধন আইন, ১৯৯০ গৃহীত হয়। সংসদে এই বিলটি গৃহীত হয় ২২৬ ভোটে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে এই সময় বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন। এই সংশোধন আইনের ধারাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(এক) সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আসন আরও দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানে দশ বছরের জন্য সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টি

আসন নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৭৮ সালে ১৫ ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতি **কর্তৃক** জারিকৃত সংবিধানের **দ্বিতীয় ঘোষণা (পনরতম) সংশোধন আদেশে** মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ১৫টি আসনের পরিবর্তে ৩০টি আসন নির্ধারিত হয় এবং তা ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছরকাল সুনির্দিষ্ট হয়।

এই সময় উত্তীর্ণ হবার ফলে এই সংশোধন আইনের প্রয়োজন হয়। দশম সংশোধন আইনে সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা হয়েছে ৩০টি এবং এই ব্যবস্থা দশ বছর চালু থাকবে।

(দুই) সংবিধানের ইংরেজি এবং বাংলা ভাষ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধানে যে অসংগতি বিদ্যমান ছিল এই সংশোধন আইনে তার নিরসন ঘটল। এই আইনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হবার তারিখের ১৮০ দিনের (ছয় মাস) মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

১৯৯০ সালে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি এরশাদের পতন ঘটে। গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান দাবি ছিল দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে দাবি ছিল এক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় দেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন (free, fair and neutral) অনুষ্ঠান। জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করার পূর্বে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং তাঁর নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ দেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে। তিনি নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাল ধরেন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১-এর ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাঁর উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ এবং ঐ সময়ে কৃত এবং গৃহীত কাজকর্ম অনুমোদনের জন্য এ সংশোধন আইন প্রণীত হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্টে।

একাদশ সংশোধন আইনের ধারা

একাদশ সংবিধান সংশোধন আইনে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২০ অনুচ্ছেদের পর ২১ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়।

(এক) ২১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ, শপথ প্রদান এবং তার নিকট পদত্যাগ প্রদান বৈধ বলে গণ্য হবে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে একাদশ সংশোধন আইন প্রবর্তনের তারিখ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন এবং অধ্যাদেশ এবং কৃত, প্রদত্ত ও গৃহীত সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো এবং আইনানুযায়ী কৃত ও গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষিত হলো।

(দুই) ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়, একাদশ সংবিধান সংশোধন আইন প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার গ্রহণ করার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার এবং দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন।

এ সংশোধন আইনের পক্ষে ভোট পড়ে ২৭৮টি। বিপক্ষে কেউ ভোট দেননি। এ আইনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন বৈধ বলে স্বীকৃত হলো। এরপর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রধান বিচারপতি পদে পুনর্বহালের পথ প্রশস্ত হলো।

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঃ দ্বাদশ সংশোধন আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রবর্তিত সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চতুর্থ সংশোধন আইনে রূপান্তরিত হয় রাষ্ট্রপতিক সরকার পদ্ধতিতে। দীর্ঘ ষোল বছর পর এ আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরে এলো সংসদীয় ব্যবস্থা।

(২) মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতা ঃ এ সংশোধন আইনে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা। মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী হয়। মন্ত্রিগণ তাঁদের কার্যক্রম এবং নীতির জন্য ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে দায়ী হয় সংসদের নিকট। রাষ্ট্রপতিক সরকারে মন্ত্রিপরিষদ দায়ী ছিল রাষ্ট্রপতির নিকট, সংসদের নিকট নয়।

(৩) প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী ঃ এ আইনে সংসদীয় ঐতিহ্য অনুসারে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী হন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দ্বারা অথবা তাঁর কর্তৃত্বে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রয়োগ হবে। প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষস্থানীয়, সংসদের নেতা এবং নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এ আইনে রাষ্ট্রপতি আলঙ্কারিক-প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান।

(৪) রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত ঃ এ আইনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক, পাঁচ বছরের জন্য। রাষ্ট্রপতিক সরকারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন জনগণ কর্তৃক, প্রত্যক্ষ ভোটে। এ আইন অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন প্রকাশ্য ভোটে। নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকলের উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন।

(৫) রাষ্ট্রপতির সীমিত ক্ষমতা ঃ এ সংশোধন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তিনি পদত্যাগ করতে পারবেন।

(৬) রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ঃ বাংলাদেশ সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যেতে পারে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অভিযোগ পেশ করা যাবে। সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দু'-তৃতীয়াংশের ভোটে তা গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(৭) উপ-রাষ্ট্রপতি পদের বিলুপ্তি ঃ এ আইনে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের বিলুপ্তি ঘটে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদের কার্যক্রম ঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। মন্ত্রিপরিষদের নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন। এক-দশমাংশ নিযুক্ত হবেন সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। মন্ত্রিপরিষদে থাকবেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রী। উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত হয়।

(৯) মন্ত্রিপরিষদের কার্যকাল ঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ সংসদের আস্থাভাজন থেকে কার্য পরিচালনা করবে। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করবে। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী অবশ্য রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন। সাধারণভাবে

সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। তাই মন্ত্রিদের কার্যকালও সাধারণ অবস্থায় পাঁচ বছর। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিপরিষদের আয়ু শেষ হয়।

(১০) স্থানীয় শাসনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঃ এ আইনে ব্যবস্থা করা হয়, নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর স্থানীয় শাসনভার অর্পিত হবে। চতুর্থ সংশোধন আইনে তা রহিত করা হয়।

(১১) দলীয় আনুগত্যের বন্ধন সুদৃঢ় ঃ এ আইনে দলীয় আনুগত্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কোন নির্বাচনে কেউ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়ে সেই দলের নির্দেশ অমান্য করলে বা সংসদে উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকলে বা সংসদের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে দলের বিপক্ষে ভোটদান করেছেন বলে ধরা হবে এবং সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

(১২) সংসদের অধিবেশন ঃ সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি বিরতি থাকবে না।

(১৩) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির নব্বই দিন পূর্বে সেই পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(১৪) জাতীয় নিরাপত্তা ঃ জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা যেতে পারে।

সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আইন। এই সংশোধন আইন প্রণয়ন করে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এই সংশোধন আইন প্রণীত হয়। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পর এই সংশোধন আইন নতুন পরিচ্ছেদ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২৫-২৬ মার্চে এই সংশোধন আইনটি ষষ্ঠ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) জাতীয় সংসদ ভেংগে দেয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হবার পর যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করার সময়কালে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবে।

(৩) উল্লিখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা সংবিধানের ৫৮ (ঘ) (১) অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে প্রযুক্ত হবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তা প্রয়োগ করা হবে।

(৪) নতুন সংসদ গঠিত হবার পর প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

(৫) প্রধান উপদেষ্টার কর্তৃত্ব সংবিধানে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ন্যায় [৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত] একই বিষয়াবলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

কার্যত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ঐ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন শুধু সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। ঐ সময়ে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক লাভ করবেন। অন্যান্য উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন

(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগ দান করবেন রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রধান উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করে অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ দান করবেন।

(২) সংসদ ভেংগে দেয়া বা ভংগ হবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হবেন।

(৩) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তবে তিনি যদি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন।

(৪) যদি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে সম্মত না হন তাহলে আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি তাঁকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে না পাওয়া যায় বা তাঁরা যদি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কোন সম্মানিত নাগরিককে এ পদে নিয়োগ দান করবেন। তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁর স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ পদত্যাগ করতে পারেন অথবা সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা হারালে তিনি বা তাঁরা ঐ পদে আর অধিষ্ঠিত থাকবেন না। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণের যোগ্যতা

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ নিচে বর্ণিত শর্তাবলির প্রেক্ষাপটে নিয়োগ লাভ করবেন। তাঁদের যোগ্যতা নিম্নরূপ ঃ

(ক) সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতার অধিকারী ;

(খ) কোন রাজনৈতিক দল বা দলের সাথে সংযুক্ত কোন সংগঠনের সদস্য না থাকা ;

(গ) আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না- এই মর্মে লিখিতভাবে অংগীকার প্রদান ;

(ঘ) বাহাত্তর বছরের অধিক বয়স্ক নন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলি

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাহায্য ও সহায়তায় সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ব্যতীত এই সরকার কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্দশ সংবিধান) আইন ২০০৪

বাংলাদেশ সংবিধান (চতুর্দশ সংবিধান আইন ২০০৪ বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০৪ সালের ১৪নং আইনরূপে ২০০৪ সালের ১৭মে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে। এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশোধনগুলো সম্পন্ন করা হয়। এদের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো নিম্নরূপ ঃ

(এক) মহিলা সদস্যদের জন্যে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত ঃ পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে শুরু করে দশ বছর কাল অতিবাহিত হবার পরে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ৪৫টি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। এই আসনগুলো পূর্ণ হবে সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে উল্লিখিত তথ্য সম্বলিত (৩) দফা সংযোজিত হবে। এর পূর্বে জাতীয় সংসদে ১৫ বছরের জন্যে ৩০টি আসন মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত ছিল।

(দুই) বিচারপতিদের পদের মেয়াদ ঃ বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণের কার্যকাল হবে পঁয়ষট্টি বছরের পরিবর্তে সাতষট্টি বছর। মহা হিসাব নিরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের কার্যকাল বর্ধিত হয় পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত। এর পূর্বে তাদের কার্যকাল ছিল বাষট্টি বছর। এই লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৬,১২৯ এবং ১৩৯ অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়।

(তিন) রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন সম্পর্কে ঃ (ক) রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্পীকারের কার্যালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারের কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

(চার) সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হবার তারিখ থেকে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট

কোন ব্যক্তি কোন কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে বা না করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনের তিনদিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন।

১। বাংলাদেশ সংবিধানের পরিবর্তনকারী সংশোধনী আইনগুলোর বিবরণ দাও। (Describe the Amendment Acts that changed the Bangladesh Constitution.) [D. U. 1984]

২। চতুর্থ সংশোধনী আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (Explain the significance of the Fourth Amendment Act.)

৩। চতুর্থ সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার বিবরণ দাও। (Describe the changes in the power and status of the President which were brought about by the Fourth Amendment Act.)

৪। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী প্রস্তাবের সাথে দ্বাদশ সংশোধনী আইনের তুলনামূলক আলোচনা কর। (Compare and contrast between the fourth amendment twelfth amendment of Bangladesh Constitution.) [N. U. 1996]

৫। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান সংশোধনীসমূহ আলোচনা কর। (Discus the main amendments to the Bangladesh Constitution.) [N. U. 1997, 1999, 2002]

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ও তার কার্যকারিতা

PARLIAMENTARY SYSTEM OF GOVERNMENT IN BANGLADESH AND ITS WORKING

সূচনা

সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ সব সময়ই ছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। এমন কি আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর প্রথম দফাই ছিল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি সংক্রান্ত। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটি হলো, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সংসদীয় ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয় ১৯৭৫ সালে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত

১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি **অস্থায়ী সংবিধান আদেশ** (Provisional Constitution Order) অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারও (government in-exile) ছিল সংসদীয় সরকার, তবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই সরকারের কার্যক্রম ছিল সীমিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে এই প্রক্রিয়া জোরদার হয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর নতুন সংবিধান প্রণীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর হতে তা কার্যকর হয়। এই সংবিধানের মৌল বিষয়বস্তু ছিল জাতীয় সংসদের (House of the Nation) প্রাধান্য। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল হিসেবে ক্ষমতাসীন হয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

যদিও আওয়ামী লীগ ছিল একটি মধ্যবিত্ত শহরভিত্তিক রাজনৈতিক দল, তথাপি দলকেন্দ্রিক অনেকগুলো স্বার্থগোষ্ঠী অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠে এবং দলের পক্ষে জনমত সংগ্রহ এবং দলীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় যুব লীগ ও জাতীয় মহিলা লীগ।

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ছিল বিশিষ্ট এক দৃষ্টিকোণ। প্রথম থেকেই দলীয় নেতৃবর্গ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবকাঠামো গঠন ও দৃঢ়তর করার জন্য মনোযোগী হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক দলই হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মুখ্য নিয়ামক। শেখ মুজিবের সেরা উপদেষ্টাদের সকলেই ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। তার সাথে যারা ভ্রমণে বাহির হতেন তাদের সকলেই ছিলেন দলীয় নেতা এবং কর্মী। তাজুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামাল হোসেন, তোফায়েল আহমদ, শেখ ফজলুল হক মনি তার সাথে চলাফেরা করতেন।

সরকার ব্যবস্থায় দলটি তার অবস্থান সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট ছিল। প্রধানমন্ত্রীর অফিস সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী অফিসে রূপান্তরিত হয়। শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি একাধারে ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক, 'জাতির জনক', 'মহান সম্মোহনী নেতা' (Charismatic leader) এবং সবার উপরে 'বঙ্গবন্ধু'। অনেক পর্যালোচকের ধারণা ছিল বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার দীর্ঘদিন চালু থাকবে।

প্রবাসী সরকার ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে আসেন এবং শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি নির্ধারণ করেন। ঐ সময় সরকার প্রধান ছিলেন তাজুদ্দিন আহমদ। সরকারের কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারণ করতেন তিনি। পাকিস্তানের বন্দীশালা হতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। ফিরে এসে তিনি **অস্থায়ী সংবিধান আদেশ** জারি করেন ১১ জানুয়ারি। এই সংবিধান অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধান রচিত হলে সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান।

নতুন সংবিধান কার্যকর হলে সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ ছয়-দফা কর্মসূচীর ওপর গণভোট বলে আখ্যায়িত করেছিল এবং ১৯৭৩ সালের নির্বাচনকে বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতির–জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার–উপর গণভোট বলে অভিহিত করে।

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করে। নিচের সারণিতে এই নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো ঃ

সারণি ঃ ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফলাফল

দল	মোট আসন	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১। আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯৩	৭৩·১৭
২। জাতীয় আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)		—	৮·৫৯
৩। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল		১	৬·৪৮
৪। জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	"	—	৫·৪২
৫। স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	"	৬	৬·৩৪
		৩০০	১০০

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূলে কতকগুলো বিষয় কাজ করে। **প্রথম,** শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মোহনী ক্ষমতা (Charisma) জনগণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। **দ্বিতীয়,** স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রবাহিনী হিসেবে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি তখনও ছিল প্রাণবন্ত। **তৃতীয়,** বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতা তখনও প্রকাশিত হয়নি। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে শতকরা ৫৫ জন ভোটার ভোটদান করেন এবং আওয়ামী লীগ লাভ করে মোট ভোটের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩·১৭ ভাগ)। এই নির্বাচনে অবশ্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে হঠকারিতা, ভয় প্রদর্শন, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগ আসে।

সংসদীয় ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয় কেন

এই নির্বাচনের পর দলীয় নেতৃত্ব ও সংসদ সদস্য ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্ববর্তী জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য এই নির্বাচনে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল আওয়ামী লীগের শাসনক্ষমতার বৈধতা অর্জন। কিন্তু আওয়ামী লীগ বৈধতা অর্জনে সক্ষম হলেও অতি অল্পদিনের মধ্যে বহুমুখী সংকটের আবর্তে পতিত হয়। এর কারণ ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। এই সকল কারণে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে আসে।

অর্থনৈতিক কারণ

১৯৭৪ সালের প্রথম থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সংকট গুরুতর আকার ধারণ করে। **প্রথম,** ১৯৭২ সালের আরব-ইস্রাইল যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায় অভাবিতরূপে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুরু হয় মুদ্রাস্ফীতি। বাংলাদেশেও এর প্রচণ্ড ঢেউ আছাড় খায়। **দ্বিতীয়,** অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় দলীয় কার্যক্রম ও নেতৃত্বের অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিও এর জন্য দায়ী ছিল। ১৯৭২ সালের দেশের শতকরা ৮৬ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শতকরা ৮৭ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হয় এবং জাতীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদের অনেকেই ছিলেন দলীয় কর্মী ও অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি। তাদের প্রশাসনিক কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং ছিল না কোন দক্ষতা। ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। **তৃতীয়,** চোরাচালানও এর জন্য দায়ী ছিল। চোরাচালান ও অবৈধ ব্যবসায়ের ফলে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাচার হয় ভারতে। ফলে দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় প্রচুর পরিমাণে। **চতুর্থ,** ১৯৭৪ সালের শেষ ভাগে দেশে দেখা দেয় মারাত্মক বন্যা। ফলে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারের বৈধতা ক্ষুণ্ন হয় ভয়ঙ্কররূপে।

রাজনৈতিক কারণ

দেশের অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হলে রাজনৈতিক সংকটও দেখা দেয় ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর নিকট থেকে সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় সরকার ১৯৭২ সালের গৃহীত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত করে। বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগের সীমারেখা বৃদ্ধি পায় এবং আগামী ১৫ বছরের মধ্যে অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে না, তা ঘোষণা করা হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলো সরকার বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), বাংলা জাতীয় লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে এক যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এই যুক্তফ্রন্টের দাবি ছিল—রক্ষীবাহিনীর বিলোপসাধন, কালোবাজারীর অবসান, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সমগ্র দেশে রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠে দেশের বৈপ্লবিক দলগুলোর কার্যকলাপ। এই বৈপ্লবিক দলগুলোর (Radical Parties) মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলার সমাজবাদী দল-মার্কস্‌বাদী-লেলিনবাদী এবং ইস্ট বেঙ্গল কম্যুনিস্ট পার্টি-মার্কস্‌বাদী-লেলিনবাদী। এ সব দল 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' (Second Revolution)

মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। **এই দলগুলোর মতে**, বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের বিপ্লব ছিল অসম্পূর্ণ (Unfinished Revolution)। তাই তারা দলীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে মনস্থ করে। ফলে দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ শুরু হয়। অস্ত্র লুট ও ব্যাংক ডাকাতি বৃদ্ধি পায়। এক সরকারি হিসেবে বলা হয়, দেশে ৬০০০ ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের সহযোগী এবং সমমনা দলগুলো—ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্‌ফর) ও সোভিয়েতপন্থী বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি—সমন্বয়ে এক ঐক্যজোট গঠন করে। তাতে কোন ফল না হলে একের পর এক চরম পন্থা গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে **বিশেষ ক্ষমতা আইন** প্রণীত হয় এবং তার মাধ্যমে বহুসংখ্যক ব্যক্তি ও দলীয় নেতাকে আটক করা হয়। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার দেশে **জরুরী আইন** ঘোষণা করে এবং মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। শেষ পর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগ দেশের সংবিধানে আমূল পরিবর্তন সাধন করে **চতুর্থ সংবিধান সংশোধন আইন** প্রণয়ন করে এবং সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করে। এভাবে বাংলাদেশ যে সম্ভাবনা নিয়ে সংসদীয় সূচনা হয় তার সমাপ্তি ঘটে।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন আইন প্রবর্তনের কারণ
Reasons that Led to the Fourth Amendment Act

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংবিধান সংশোধন আইন প্রণীত হয়। সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় সংসদে এই আইন গৃহীত হয় ২৯৪ ভোটে। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে কোন ভোট প্রদান করা হয় নি। কেন এই সংশোধনী আইন গ্রহণ করা হয়? আওয়ামী লীগ তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করে। কেন এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল ছাত্র-ছাত্রীর জানা উচিত। এর কারণ অনেক।

প্রথম, দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব বহু দলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার সম্মুখে ছিল মিসরে প্রবর্তিত **আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন** (Arab Socialist Union) ও তানজানিয়ায় প্রবর্তিত **উজামা** (Ujama) আদর্শ। তাই তিনি চতুর্থ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে **বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ** (বাকশাল) নামক একটি **জাতীয় দল** গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রসংগে তিনি বলেন, দারিদ্র-অভিশাপে অভিশপ্ত বাংলাদেশে নিষ্ঠুর রাজনৈতিক খেলার কোন সুযোগ নেই। অসংখ্য রাজনৈতিক দল ও অসংখ্য আদর্শ রাষ্ট্রীয় জীবনে অনিশ্চয়তার সূচনা করেছে।[1] তাই তিনি অনুভব করেন, বাকশাল গঠিত হলে দলীয় রাজনীতির ঘটবে অবসান।

দ্বিতীয়, অসংখ্য রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম, বিশেষ করে বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দলগুলোর (radical political parties) কার্যক্রমকে তিনি সংসদীয় ব্যবস্থার জন্য বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত করেন। তার মতে, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শর্ত হলো জাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের। বাংলাদেশে সেই অবস্থা বিদ্যমান না থাকায় রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতার অভাব ঘটেছে। তাই তিনি রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন।

---

১. জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি।

তৃতীয়, চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণয়নের পশ্চাতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক ধরনের সুযোগ-সন্ধানী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। সংসদীয় ব্যবস্থায় পূর্বশর্ত হিসেবে দেশে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দল বর্তমান থাকায় বিভিন্ন দল সভা, শোভাযাত্রা, অন্যান্য সমাবেশে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের মুখরোচক বর্ণনা দিত। এ কারণে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন, কেননা এ ব্যবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ একনায়কের মত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

চতুর্থ, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতায় আওয়ামী লীগ সরকার হতচকিত হয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেও এ সব দলের কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক নেতৃবর্গ এসব দলের কার্যক্রমে বৈদেশিক চক্রান্তের প্রতিফলন মনে করেন। শেখ মুজিব নিজেই বলেছেন, "স্বাধীনতার শত্রুরা এখন নিরস্ত হয় নি। আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে ষড়যন্ত্র করে স্বাধীনতার শত্রুরা দেশকে বিপথগামী করতে বদ্ধপরিকর।"[১]

পঞ্চম, চতুর্থ সংশোধনী আইনে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন এবং এক দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মূলে ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার বৈপ্লবিক বৃদ্ধি (revolution in popular expectations)। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বের ঐকমত্য (consensus) বিধ্বস্ত হয়। এর প্রত্যক্ষ কারণ,—স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। তার ফলশ্রুতি ১৯৭২ সালে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর প্রবর্তন। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৪ সালের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত করতে শুরু করে। ফলে বামপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সকল দল বিলোপ করে একটি জাতীয় দল গঠন করেন।

ষষ্ঠ, চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রবর্তিত হবার বহু পূর্ব থেকে অনেক নেতা এই ধরনের মত প্রকাশ করেন। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ ফজলুল হক মনি বলেন, "এই দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশে আর একটি বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছে।" ১৯৭৪ সালের নভেম্বর থেকে সোভিয়েত পন্থী দলগুলোও সংসদীয় ব্যবস্থা বিলোপের কথা বলতে থাকেন। সোভিয়েত পন্থী বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি দেশে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে জনমত সংগঠন শুরু করে। চতুর্থ সংশোধনী আইনকে আওয়ামী লীগ **দ্বিতীয় বিপ্লব** নামে অভিহিত করে।

সপ্তম, এই সংশোধনী আইনের মূল কারণ হলো দেশে অর্থনৈতিক সংকট এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর অরাজকতা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে উৎপাদনের গতি হ্রাস পায়। দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে দেশ পতিত হয়। অন্যদিকে সংসদীয় ব্যবস্থার শ্লথ গতি, রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং নেতাদের লোভাতুর দৃষ্টি এবং জনগণের মধ্যে আশা ভঙ্গের যে নমুনা তাই চতুর্থ সংশোধনী আইনের মূল কারণ।

---

১. জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বিবৃতি।

চতুর্থ সংশোধনী আইনে পরিবর্তন ধারা
Changes brought about by the Fourth Amendment Act

চতুর্থ সংশোধনী আইনে সরকার পদ্ধতি, দলীয় ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। নিচে তার বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সরকার ঃ

এই সংশোধনী আইনের সরকার পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধিত হয় ঃ

(এক) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে বাংলাদেশ প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে জাতীয় সংসদের যে প্রাধান্য ছিল তা রাষ্ট্রপতির অধিকার, ক্ষমতা ও প্রাধান্যের নিকট ম্লান হয়ে ওঠে।

(দুই) ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী ছিল। তার নীতি, কার্যক্রম ও বিধিবিধানের জন্য জাতীয় সংসদ অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করতে পারতেন। এই সংশোধনী আইনের ফলে মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী হলো।

(তিন) মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হত জাতীয় সংসদের সদস্য কর্তৃক। মন্ত্রী নির্বাচিত হবার সময় কেউ যদি সংসদের সদস্য না থাকেন তা হলে অন্যূন ছয় মাসের মধ্যে তাকে সদস্য নির্বাচিত হতে হত। এই আইন অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হতে হলে জাতীয় সংসদের সদস্য না হলেও চলত।

(চার) এই আইনে রাষ্ট্রপতি হন নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন পাঁচ বছরের জন্য এবং কোন কার্যক্রম বা নীতির জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন না। তাঁর সন্তোষ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ কাজ করবেন।

(পাঁচ) এই আইনে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর সন্তোষানুযায়ী কার্যরত থাকবেন।

দলীয় ব্যবস্থা ঃ

চতুর্থ সংশোধনী আইনে একটি জাতীয় দল (National party) গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। জাতীয় দল সংগঠিত হলে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল বে-আইনী এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। এই জাতীয় দলের সংগঠন, তার নামকরণ, নিয়ম-শৃংখলার ব্যবস্থা, সদস্যভুক্ত, অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। জাতীয় দলটির নাম হয় **বাংলাদেশ কৃষকশ্রমিক আওয়ামী লীগ** (বাকশাল)।

বিচার ব্যবস্থা ঃ

এই সংশোধনী আইনে বিচার বিভাগের কর্তৃত্বের হ্রাস হয়। **(এক)** বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অপসারণ সার্বিকভাবে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। **(দুই)** মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের যে দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত হয়েছিল এই আইনে তা বাতিল করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে সাংবিধানিক আদালত, কমিশন অথবা কোন ট্রাইব্যুনাল গঠন করে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করতে পারবে।

জাতীয় দল ঃ বাকশালের প্রকৃতি ও সংগঠন
The National Party : Nature and Organization of BKSAL

চতুর্থ সংশোধনী আইনে একটি জাতীয় দল গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। জাতীয় দল (National party) সংগঠিত হলে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল বাতিল ও বে-আইনী ঘোষিত হবে। জাতীয় দলের সংগঠন, তার নামকরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা, সদস্যভুক্তি, অর্থ সংগ্রহ ও অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সম্পন্ন হবে। সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যবস্থা। তা বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে পরিচিত।

এর প্রকৃতি (Nature)

প্রকৃতিগত দিক থেকে বাকশাল ছিল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এবং বাংলাদেশে কম্যুনিস্ট পার্টির (মনি সিং) একটি ঐক্যজোট। সমাজতান্ত্রিক দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি যেভাবে শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে ঐ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে বাকশাল গঠন করা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি মেহনতি জনগণের পার্টি এবং মেহনতি জনগণের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাই ঐ পার্টির লক্ষ্য। বাকশাল ছিল মধ্যবিত্তের স্বার্থে ধারক এবং বাহক। এই দিক দিয়ে বাকশাল ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রথম, কম্যুনিস্ট পার্টি একটি আদর্শ ভিত্তিক দল, কিন্তু বাকশালের সে লক্ষ্য ছিল না। কম্যুনিস্ট পার্টি এক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু বাংলাদেশে বাকশালের লক্ষ্য ছিল এক মিশ্রিত অর্থনীতি (mixed economy) পরিচালনা করা।

দ্বিতীয়, শেখ মুজিবুর রহমান চতুর্থ সংশোধনী আইনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন, কিন্তু কিভাবে বিপ্লব হবে, কোন্ ধরনের বিপ্লব হবে, বিপ্লবের লক্ষ্য কি—এই সকল বিষয়ে বাকশালের কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্দেশিত হয় নি এবং বাকশালের সদস্যদের মধ্যেও বিপ্লবী চেতনা বিকাশের কোন ব্যবস্থা হয় নি।

তৃতীয়, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মাধ্যম হিসেবে নয় বরং ফ্যাসিস্ট দলের মত বাকশাল রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকল্পে গঠিত হয়। তবে সংগঠনের দিক দিয়ে তা কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে তুলনীয়।

চতুর্থ, বাকশালের মাধ্যমে বাংলাদেশে শুধুমাত্র একদলীয় ব্যবস্থা এবং দলের শীর্ষে এক ব্যক্তির শাসনকে দৃঢ়তর করার ব্যবস্থা হয়েছিল শুধু তাই নয়, তার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করা হয়। উল্লেখ্য, বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বাকশালের সংগঠন (Organization of BKSAL)

বাকশালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, জাতীয় দল—বাকশাল, বাংলাদেশের মূলনীতির বাস্তবায়ন এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। সংগঠনের দিক দিয়ে বাকশাল ছিল অনেকটা কম্যুনিস্ট পার্টির মত। বিভিন্ন স্তরে সুনির্দিষ্ট সংগঠনের মাধ্যমে এই দল কার্যকর

হবে। কিন্তু কর্মপদ্ধতি এবং পরিচালনার দিক থেকে বাকশাল ছিল ফ্যাসিস্ট পার্টির মত। বিভিন্ন পর্যায়ে বাকশালের নিম্নবর্ণিত স্তরগুলো বিদ্যমান থাকার কথা ছিল ঃ

(এক) কার্যনির্বাহী কমিটি।
(দুই) কেন্দ্রীয় কমিটি।
(তিন) দলীয় কাউন্সিল।
(চার) জেলা কমিটি।
(পাঁচ) থানা/আঞ্চলিক কমিটি।
(ছয়) ইউনিয়ন/প্রাইমারী কমিটি।

বিভিন্ন স্তরে যেভাবে বাকশালের সংগঠন চিন্তা করা হয়েছিল তা অনেকটা ইজিপ্টের আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের (Arab Socialist Union) মত। আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন চার স্তর বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক দল। এই দলের **সর্বনিম্নে** রয়েছে গ্রাম ও শহরতলীর সংগঠন। **দ্বিতীয়** স্তরে বিদ্যমান রয়েছে মারকাজ (Marcaz) নামক সম্মিলিত আঞ্চলিক সংগঠন। **তৃতীয়** স্তরে প্রাদেশিক সংগঠন, এবং সর্বোচ্চ স্তরে সাধারণ জাতীয় কংগ্রেস (General National Congress)। জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সুপ্রীম কার্যকরী কমিটি বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee) ও কার্যকরী কমিটির (Executive) মত ছিল। বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১৫ এবং ১৫ জন।

সংগঠনের ক্ষেত্রে বাকশাল আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের সাথে তুলনীয় হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে ঐক্য ও সংহতি অর্জনের জন্য বাকশাল কম্যুনিস্ট পার্টির মৌল নীতি **গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতি** (Democratic Centralism) অনুসরণ করে। এই লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, **(এক)** দলের নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরের সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **(দুই)** প্রত্যেক স্তরের সংগঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। **(তিন)** নিম্ন স্তরের কমিটিগুলো প্রতিনিয়ত রিপোর্ট ও যোগাযোগের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের কমিটিগুলোকে বাস্তব অবস্থা অবহিত রাখবে। **(চার)** উচ্চ পর্যায়ের কমিটিগুলো নিম্নস্তরের কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন করে পন্থা গ্রহণ করবে। **(পাঁচ)** বাকশালের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বাকশালের সদস্যপদ বাংলাদেশের আঠার ও তদুর্ধ্ব বয়স্ক যে কোন সৎ, দেশপ্রেমিক ও জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে দুর্নীতিপরায়ণ, সমাজবিরোধী ও জন নিরাপত্তা এবং ১৯৭২ সালের **বাংলাদেশ যোগসাজসকারী আইনে** দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য বাকশালের সদস্যপদ নিষিদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রে কর্মরত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বাকশালের সদস্যপদ লাভ করবেন। বাকশাল গঠনের পর শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিদের বাকশালের সদস্য হতে হত। সংবিধানে বলা হয়, বাকশাল গঠিত হবার পর জাতীয় সংসদের কোন সদস্য বাকশালের সদস্যপদ লাভ না করলে সংসদে তাঁর পদ শূন্য হবে। বাকশাল কর্তৃক মনোনীত না হলে কোন ব্যক্তি জাতীয় সংসদের সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না অথবা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারবেন না। এ দিক দিয়ে বাকশাল ছিল অনেকটা কম্যুনিস্ট পার্টির মত।

বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেলসহ অন্যূন ১৫ জন সমন্বয়ে গঠিত হবে। চেয়ারম্যান এই সকল সদস্যকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে মনোনীত করবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে ১১৫ জন সদস্য সহযোগে। দলীয় কাউন্সিলে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য ছিলেন না, তবে তা গঠিত হত কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য, জেলা কমিটির প্রতিনিধি, অঙ্গসংগঠনগুলোর প্রতিনিধি এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ৫০ জন সদস্য সহযোগে। অনুরূপভাবে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ছিল বাকশালের সংগঠন।

তাছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে বাকশালের কতকগুলো অঙ্গ সংগঠন ছিল। তাদের নাম জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুব লীগ এবং জাতীয় ছাত্র লীগ।

সংক্ষেপে, বাকশাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অসম্পূর্ণ পদক্ষেপ, যদিও অভিনব। অসম্পূর্ণ এই অর্থে যে, বাকশাল গঠনের অল্পদিনের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একাংশের আক্রমণে সপরিবারে নিহত হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে খন্দকার মুস্তাক আহমদ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন তখন খন্দকার মুস্তাক আহমদ বাকশাল পরিকল্পনা বাতিল ঘোষণা করেন। এভাবে বাকশালের সমাপ্তি ঘটে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য
Achievement of the Awami League Government

স্বাধীনতার পর কয়েক বছরে (১৯৭২-৭৪) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। নিচে তার বিবরণ দেয়া হলো ঃ

(এক) বিভিন্ন মহলের আশঙ্কা ছিল স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে অনাহারে বহু লোকের মৃত্যু ঘটবে। আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ বাংলাদেশে জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থার (United Nations Relief Organization in Bangladesh) মাধ্যমে এবং অন্যান্য সাহায্য সংস্থার সহায়তায় দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সক্ষম হন।

(দুই) স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধান রচনাও আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ (Provisional Constitution Order) জারি করেন। পরে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান রচনা করেন। ডঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রথম গণপরিষদে গঠিত সংবিধান কমিটি ৭১টি বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রায় ৩০০ ঘণ্টা কর্মরত থেকে সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন এবং ৪ নভেম্বর তা গৃহীত হয়। পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান তৈরি করতে সময় লাগে ৯ বছর, কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় স্বাধীনতার পর মাত্র ৯ মাস পরে।

(তিন) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ সরকারের কৃতিত্ব অসামান্য। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর অবনতি ঘটে তখন ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিব ১০ দিনের সীমারেখার মধ্যে অস্ত্র জমা দিবার নির্দেশ দেন এবং ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয়। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করে সরকার অবস্থার প্রভূত উন্নতি করেন।

(চার) স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তি বাহিনীর সহায়তায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী অস্ত্রধারণ করে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ীর বেশে রাজধানী ও অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় বাহিনীকে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ ত্যাগ করতে সম্মত করেন।

(পাঁচ) আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৯ মাসের মধ্যে শুধু যে বাংলাদেশ সংবিধান রচিত হয় তাই নয়, নতুন সংবিধান অনুযায়ী ছয় মাসের মধ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের ২৯৩টিতে বিজয়ী হয়।

(ছয়) শুধু তাই নয়, এই আমলে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ১ বছর ৬ মাসের মধ্যে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five-Year Plan) প্রণয়ন করে।

(সাত) আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধকালে বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন। ৩০০টি রেলওয়ে পুল, ৭০টি রাস্তার পুল, ৬টি বিমান বন্দর এবং চট্টগ্রাম ও চালনা নৌ-বন্দরের মেরামত করে যাতায়াত ও নৌ-চলাচল ব্যবস্থা সহজতর করা হয়।

(আট) স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা জাতীয়করণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা করেন এবং ঐ সব জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য প্রায় ১৪২টি জনসংস্থা (Public Corporation) গঠন করে।

(নয়) আওয়ামী লীগ সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বাংলাদেশের জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি (Non-Aligned Foreign Policy)। দেশের উন্নয়নমুখী কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব ঃ কারো সাথে বৈরীভাব নয়'—এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করে জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন।

(দশ) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধর্মনিরেপেক্ষতা নীতি অনুসরণ করে এই সরকার দেশে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে এক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের এই সাফল্যের মূলে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী প্রভাব।

সুতরাং দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ সরকার মাত্র দুই বছরের মধ্যে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তা মোটেই সামান্য নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সাফল্যের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া, কৃতিত্বের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতার তালিকাও দীর্ঘ। এই ব্যর্থতার জন্য যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, বিশেষ করে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে, স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং বিজয়ও অর্জিত হয় তাঁর পতনও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পতনের কারণ
Causes of Downfall of the Awami League Leadership

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা এবং আবেগ-উচ্ছল ভালবাসা প্রদর্শিত হয় তা ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। কিন্তু মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে সামরিক বাহিনীর একাংশের হাতে

তিনি সপরিবারে অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হন। তাও ইতিহাসের এক নিষ্ঠুরতম ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেরও অবসান হয়। নিচে এই সকল কারণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমানের পতনের মূলে কতকগুলো কারণ প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে এবং কতকগুলো পরোক্ষভাবে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। তাই এই কারণগুলোকে—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করাই সঙ্গত।

প্রত্যক্ষ কারণ (Direct Causes)

আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমানের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থান এবং সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে খন্দকার মুস্তাক আহ্‌মদকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে তাঁর হস্তে ক্ষমতা ন্যস্তকরণ। তাই জানা প্রয়োজন—কী কারণে সামরিক বাহিনী এই ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য প্রধানত দায়ী নিম্নবর্ণিত কারণগুলো ঃ

(১) বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতনতা ঃ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর উত্তরসূরী বাংলাদেশ বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ছিল ভয়ানক সচেতন (Politicized)। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ, বিশেষ করে গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা, তার পূর্বে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, পাকিস্তান আমল ও স্বাধীন বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে সহায়তা দান প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ বরাবর ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে এই চেতনা ছিল আরও প্রবল। মুজিব আমলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্বলতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের সীমাহীন লোভ এবং এই সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য, সামরিক বাহিনীর একাংশকে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাই তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুধু শেখ মুজিবকে নয়, তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের অন্যান্য সকলকে হত্যা করে রাজনীতি ক্ষেত্রে 'সৎ ও দক্ষ' নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

(২) বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর অভিযোগ ঃ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু অভিযোগ ছিল। শেখ মুজিবকে হত্যার পিছনে এই সকল অভিযোগ কার্যকর ছিল।

প্রথম, আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধিতে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোতে সর্বমোট ৩৬,০০০ জন সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে ৩০,০০০ জন ছিলেন পদাতিক বাহিনীতে, ৫০০ জন নৌ-বাহিনীতে এবং ৫,৫০০ জন ছিলেন বিমান বাহিনীতে। তাছাড়া, ২০,০০০ জন ছিলেন বাংলাদেশ রাইফেলস্ এবং ১৬,০০০ জন ছিলেন রক্ষী বাহিনীতে। ঐ বছর সামরিক বাহিনীতে অফিসারদের সংখ্যা ছিল ১২০০ জন। এই ৩৬,০০০ জনের মধ্যে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮,০০০ জন। ১৯৭১—৭৫ সালের মধ্যে সামরিক বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈনিক ভর্তি করার কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নি।

দ্বিতীয়, শুধু যে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি হয় নাই তা নয়, স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন অংশ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম পর্যন্ত দ্রুতগতিতে মেরামত বা নতুনভাবে নির্মাণ করা হয় নি।

তৃতীয়, সামরিক বাহিনীকে অধিক দক্ষ ও কর্মতৎপর করার জন্য আধুনিক অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম পর্যন্ত ক্রয় করা হয় নি।

চতুর্থ, ঐ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের যে অনীহা ছিল তা প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের পর প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় যে শুধু সর্বনিম্ন ছিল তাই নয়, তা ক্রমশ কমিয়ে দেয়া হচ্ছিল। ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল মোট বরাদ্দের শতকরা ১৬ ভাগ। ১৯৭৩-৭৪ সালে তা নেমে আসে শতকরা ১৫·৫ ভাগে এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে ঐ হার হয় শতকরা ১৫। ১৯৭৫-৭৬ সালের বরাদ্দে তা হয় শতকরা ১৩।[১] এর ফলে সামরিক বাহিনীর মধ্যে দেখা দেয় তীব্র অসন্তোষ।

পঞ্চম, আওয়ামী লীগ সরকার সামরিক বাহিনীর সমান্তরালে রক্ষী বাহিনী নামক এক প্যারা-মিলিটারী বাহিনী গড়ে তোলে। এর লক্ষ্য ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা দান। ১৯৭৫ সালে রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১৬,০০০ জন। পরিকল্পনা ছিল ১৯৮০ সাল নাগাদ এই বাহিনীর সংখ্যা ১,২০,০০০ বৃদ্ধি করে প্রত্যেক জেলায় তার একটি ইউনিট স্থাপন করা হবে। রক্ষীবাহিনীর দ্রুত উন্নয়ন এবং তার প্রতি আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্বলতাও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

(৩) আওয়ামী লীগ সরকারের ভারত-সোভিয়েত ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতি ঃ আওয়ামী লীগ সরকারের ভারত-সোভিয়েত ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতিও সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এর কারণ ছিল বহুমুখী ঃ **প্রথম,** বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের অনেকে অনুভব করতেন, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগ সরকারের অনীহার মূলে ছিল আওয়ামী লীগের ভারত ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতি। ভারতীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর মধ্যে ছিল তীব্র অসন্তোষ। (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর নিকট থেকে দখল করা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ভারত বাহিনী সাথে করে ভারতে নিয়ে যায়। (খ) স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে তখন ভারতীয় সামরিক বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সহজে বিজয় ছিনিয়ে আনে। এর ফলে মুক্তি বাহিনী তার যথার্থ পুরস্কার লাভে ব্যর্থ হয়। (গ) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত রক্ষীবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সৃষ্টি। (ঘ) তাছাড়া, সামরিক বাহিনীর অনেকে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের সাথে গোপন চুক্তির ফলে আওয়ামী লীগ সামরিক বাহিনীকে উন্নত করছে না।

এর সকল কারণে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ ভারত সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। ফলে **সামরিক বাহিনীর ভারত বিদ্বেষকালে মুজিব বিদ্বেষে রুপান্তরিত হয়।**

(৪) ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিহিংসা চিন্তা ঃ প্রত্যক্ষভাবে যে কয়জন সামরিক কর্মকর্তা ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ঐ অভ্যুত্থানে ৩ জন মেজরের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনজনই আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক চাকরিচ্যুত হয়। শফিকুল ইসলাম ডালিম তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ করার জন্য শেখ মুজিবের নিকট বিচারপ্রার্থী হলে তিনি অপমানিত হন এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক কিছু সংখ্যক চোরাচালানীকে বন্দী করার অজুহাতে তিনি শেষ পর্যন্ত চাকরিচ্যুত হন। মেজর নূর ও মেজর শাহরিয়ার

১। বাংলাদেশ সরকার, বাজেট বরাদ্দ, ১৯৭২-৭৬

খুলনায় শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসেরের অবৈধ চোরাচালানী ব্যবসাকেন্দ্র উদ্ঘাটনের জন্য শেষ পর্যন্ত চাকরিচ্যুত হন।

এই তিনজন মেজর, আরও ২০ জন মেজর ও ক্যাপ্টেনের সহযোগিতায় দুই ব্যাটেলিয়ন সৈনিকসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট একই সাথে শেখ মুজিবের বাসভবন, শেখ ফজলুল হক মনি ও আব্দুর রব সারনিয়াবাতের বাসভবনে আক্রমণ করেন এবং পরিবারের সকল সদস্যসহ তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অবসান ঘটান।

পরোক্ষ কারণ

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অবসানে প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও কতকগুলো পরোক্ষ কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে যার ফলে বাংলাদেশে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার জনপ্রিয়তা হারায়। আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাসের ক্ষেত্রে এ সব কারণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই কারণগুলোকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

রাজনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক কারণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

(এক) ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ১৯৭৪ সালে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের সীমারেখা বৃদ্ধি করে, বৈদেশিক বিনিয়োগ আমন্ত্রণ করে এবং জাতীয়করণ প্রক্রিয়াকে ১৫ বছরের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অর্থহীন করে তুলেন। ফলে বামপন্থী চিন্তাধারার ব্যক্তিবর্গ এই সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন।

(দুই) ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি গৃহীত চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রবর্তন তথা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এবং একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশে গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিবর্গ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

(তিন) চতুর্থ সংশোধনী আইনের ফলে সংবাদপত্রের সংখ্যা হ্রাস, বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস এবং সর্বোপরি মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হবার ফলে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী ক্ষুব্ধ হন।

(চার) আওয়ামী লীগ সরকারের জেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন তত্ত্বগত দিক থেকে সঠিক হলেও যেভাবে জেলা গভর্নর মনোনীত হন তাকে অনেকে মনে করেন, এই ব্যবস্থা আওয়ামী লীগের আধিপত্য স্থায়ী করার একটা মাধ্যম মাত্র।

প্রশাসনিক কারণ

(এক) ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধার কোন সাংবিধানিক নিরাপত্তা ছিল না। ফলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন।

(দুই) ১৯৭২ সালে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯-এ যেভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল তার ফলেও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই ব্যবস্থার অধীনে ১৯৭২ সালে ৫৩ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তা বরখাস্ত হন।

(তিন) চাকরি ও বেতন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মকর্তাদের যে মাহিনা নির্ধারিত হয় তাও ছিল অপর্যাপ্ত।

(চার) অতীতে যে সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত হতেন, আওয়ামী লীগ সরকার ঐ সব ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কর্মীদের নিয়োগ দান করেও কর্মকর্তাদের মধ্যে এক অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করেন।

সামাজিক কারণ

(এক) আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে যেভাবে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে তার ফলেও জনমনে একদিকে অনিশ্চয়তা অন্যদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

(দুই) আওয়ামী লীগের কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মীর সীমাহীন দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার গণমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে।

(তিন) বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে চোরাচালানী কর্মকাণ্ড ব্যাপক হয়ে উঠে। ফলে দেশে একদিকে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং অন্যদিকে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি রাতারাতি প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে উঠে।

অর্থনৈতিক কারণ

(এক) আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয়করণ নীতি তত্ত্বগত দিক থেকে সঠিক হলেও জাতীয়কৃত খাতের পরিচালনার জন্য কোন ক্যাডার (cadre) সৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ ব্যর্থ হয়। ফলে সরকারি খাতে লোকসানের পাহাড় জমতে থাকে।

(দুই) এসব খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপরে দায়িত্ব না দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর দায়িত্ব দেয়ার ফলে পরিচালনা ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠান হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

(তিন) ১৯৭৪ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় এবং এই সময় সরকারের ব্যর্থতার ফলে জনমন সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে।

(চার) আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।

সংক্ষেপে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তথা শেখ মুজিবের পতনের মূলে রয়েছে বহু সংখ্যক পরোক্ষ কারণ যার ফলে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং সরকারের জনপ্রিয়তা ভয়ঙ্করভাবে হ্রাস পেলে সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানের ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। এভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের অবসান ঘটে।

১। বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে কী জান? (What do you know of the working of the parliamentary system in Bangladesh?) [D. U. 1984]

২। বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয় কেন? (Why did the parliamentary system become ineffective in Bangladesh?)

৩। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন কী কী কারণে প্রণীত হয়? (What were the reasons that led to the enactment of the Fourth Amendment Act?)

৪। চতুর্থ সংশোধনী আইনে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়? (What changes were brought about by the Fourth Amendment Act?) [D. U. 1984]

৫। বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রকৃতি ও সংগঠন সম্বন্ধে কী জান? (What do you know of the nature and organization of the BKSAL?)

৬। আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যের বিবরণ দাও। (Describe the achievements of the Awami League Government.)

৭। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পতনের কারণ কী কী? (What were the reasons that led to the downfall of the Awami League leadership?)

৮। ১৯৭২-৭৫ সালে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থা প্রকৃতি ও কার্যকারিতা আলোচনা কর। (Examine the nature and working of the parliamentarng system during 1972-75)। [N. U. 1997]

বাংলাদেশে সামরিক শাসন ঃ জিয়া সরকার

MARTIAL LAW IN BANGLADESH : ZIA REGIME

সূচনা

১৯৭৫ সাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের প্রাণকেন্দ্র ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র ছিল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে জাতীয় সংসদ। রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন আলংকারিক প্রধান। ১৯৭৫ সালের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত পট-পরিবর্তন হতে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণীত হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আমূল পরিবর্তন হয় এবং দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মাত্র আট মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাও পর্যুদস্ত হয় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সংগঠিত এই অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন সপরিবারে।

১৫ই আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থান।

তিনগুচ্ছ কারণ অথবা তার যে কোন একটি কারণ কোন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মূলে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের অন্তত ২৫০টি সামরিক অভ্যুত্থান পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

প্রথম, প্রথম কারণ বা প্রথম গুচ্ছ কারণ সামরিক বাহিনীর সংগঠন সংক্রান্ত। সামরিক বাহিনীর সংগঠনে বিদ্যমান শৃঙ্খলা, পদ সোপান, ঐক্যবদ্ধ নির্দেশ দান কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে ঐক্য—এসব কিছু সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব। দেশের অন্য সংগঠনের এই সুবিধা থাকে না। ফলে সামরিক বাহিনী যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে সংকল্পবদ্ধ হয় তা হলে ঐসব গুণের জন্য ঝটিকা বেগে তা সম্পন্ন হতে পারে।[১]

দ্বিতীয়, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের মৌল কারণ নিহিত থাকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ সংরক্ষণ বা স্বার্থ আদায়ের দাবিতে (Corporate Interest)। প্রাতিষ্ঠানিক বা সামরিক বাহিনীর সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলে উদ্বুদ্ধ করে।[২]

তৃতীয়, সামরিক বাহিনী কিন্তু যে কোন অবস্থায় ক্ষমতা দখলে অগ্রসর হয় না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি দুর্বল থাকে, অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যদি অস্থিতিশীলতার লক্ষণ বিদ্যমান থাকে অথবা যদি ক্ষমতাশূণ্যতা বিরাজ করে অথবা যদি ক্ষমতা প্রয়োগকারী গ্রুপের জনপ্রিয়তা না থাকে তবেই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে।[৩]

১। S. E. Finer, *The Man on Horseback*, Penguin : 1975

২। S Decalo, *Coups and Army Rule In Africa*, New Haven, 1976.

৩। Eric A. Nordlinger, *Soldiers in Poitics : Military Coups and Government*, Englewood cliffs : 1977

এই কারণগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায়, তিন বছরের আওয়ামী লীগ শাসনে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ব্যাহত হয় বিভিন্নভাবে। সামরিক বাহিনীর উন্নতিতে সরকারের ঔদাসীন্য, ক্রমান্বয়ে বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ হ্রাস, সামরিক বাহিনীর সমান্তরালে রক্ষী বাহিনী সংগঠন, নানা অজুহাতে সামরিক কর্মকর্তাদের বরখাস্ত—এই সকল সামরিক বাহিনীর সার্বিক স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ব্যাপক দুর্নীতি, বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন, আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের দুর্নীতিপরায়ণ কার্যক্রম প্রভৃতির ফলে সরকারের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

এই ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ভোর রাত্রিতে সামরিক বাহিনীর ২৫ জন মেজর এবং ক্যাপ্টেন, গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রায় ১৪০০ জন সৈন্যের সমর্থনে এক অভ্যুত্থান ঘটায়। সমগ্র অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন মেজর ফারুক ও মেজর রশীদ এবং তাঁদের সহকর্মী ছিলেন মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর নূর ও মেজর হুদা। একই সাথে শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রব সারনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল হক মনির বাড়ি আক্রমণ করে সকলকে সপরিবারে নিহত করেন।

মুস্তাক সরকার

এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ও মুজিব মন্ত্রিপরিষদের ডানপন্থী সদস্য খন্দকার মুস্তাক আহমেদ বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। মুস্তাক সরকারকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে পাকিস্তান। সৌদি আরব এবং চীন পরবর্তী পর্যায়ে মুস্তাক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। এই অভ্যুত্থানের পর পর অনেকে এই আশঙ্কা করেন, ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হয়তো হস্তক্ষেপ করবে। এই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়। ভারত প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে, এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এই অভ্যুত্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট মেজররা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রসহ বঙ্গভবনে অবস্থান করতে থাকেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়। এর পর দেশে ক্রমান্বয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত হয়। অনেকে এই অভ্যুত্থানকে "রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড" (political murder) বলে চিহ্নিত করেন, কেননা এই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একাংশ মাত্র সংশ্লিষ্ট ছিল এবং অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে মেজর পর্যায়ের উর্ধ্বে কোন কর্মকর্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। অন্যদিকে, এই সকল মেজরের প্রত্যক্ষভাবে দেশ শাসন করার যেমন ছিল না কোন যোগ্যতা, তেমনি ছিল না কোন আন্তরিক আগ্রহ। শেখ মুজিবুর রহমানের দুই প্রবাসী কন্যা ব্যতীত তাঁর পরিবারের সকলকে হত্যা করে তাঁরা মুজিব মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খন্দকার মুস্তাক আহমদকে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণে আহ্বান জানান। খন্দকার মুস্তাক দ্রুত তা গ্রহণ করেন এবং নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। এই মন্ত্রিপরিষদে কোন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন না। বরং এই মন্ত্রিপরিষদে মুজিব মন্ত্রিপরিষদের ১৯ জন মন্ত্রীর ১১ জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর ৮ জন যোগদান করেন। মৌলনীতি সম্পর্কেও তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। যদিও সামরিক আইন জারি করা হয় এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়, তথাপি খন্দকার মুস্তাক ১৯৭৫ সালের ৩ অক্টোবর ঘোষণা করেন যে, দেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে রাজনৈতিক কার্যক্রম আবার চালু হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় সংসদ অক্ষত থাকে। রাষ্ট্রের চারিটি মূলনীতি—জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—অপরিবর্তিত থাকে। তিনি শুধু বাকশাল সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান বে-আইনী ঘোষণা

করেন, জেলা গভর্নর ব্যবস্থার অবসান ঘটান এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অপসারণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯ (PO—9) বাতিল ঘোষণা করেন। সামরিক বাহিনীতে অবশ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট এম. এ. জি. ওসমানীকে খন্দকার মুস্তাক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিয়োগ করেন, সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর প্রদান করেন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিযুক্ত করেন। রক্ষী বাহিনীর বিলুপ্তি ঘোষণা করে তিনি রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। মুস্তাক সরকার ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশে দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর নেতৃত্ব দান করেন খালেদ মোশাররফ। তিনি সাফাত জামিলের নেতৃত্বে ঢাকা ব্রিগেডের সহায়তায় ৩রা নভেম্বর রাত্রিতে বেতার ও টেলিভিশন ভবনসহ ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন। তিনি নিজেই সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধানের পদে উন্নীত হন। খন্দকার মুস্তাক আহমদ পদত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন।

খালেদ মোশাররফ মন্ত্রিপরিষদ বতিল করেন, জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে অভ্যুত্থানকারী মেজরদের বোঝাপড়ার মাধ্যমে তিনি নিরাপদে তাঁদের দেশ ত্যাগের ব্যবস্থা করেন। এভাবে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফ ক্ষমতাসীন হন যদিও তিনি মাত্র চারদিন তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে তিনি দলবলসহ পরাজিত হন এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হন।

অনেক পর্যালোচক ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে মুজিবপন্থী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। কেউ আবার একে ভারতের সমর্থনপুষ্ট মস্কোপন্থী অভ্যুত্থান বলেছেন। নভেম্বরের ৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক মিছিলে খালেদ মোশাররফের মাতা ও ভ্রাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় এই অভ্যুত্থানকে প্রধানত মুজিববাদী অভ্যুত্থান বলা হয়; কেননা এই মিছিলের মৌল দাবি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা' বলে নতুন করে ঘোষণা দান এবং ১৫ আগস্টের অভুত্থানের নায়কদের উপযুক্ত শাস্তি দান। তাছাড়া, এই অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে আওয়ামী লীগ খন্দকার মুস্তাককে নিন্দা করে ইস্তাহার জারি করে।

কিন্তু আসলে এই অভ্যুত্থান মুজিববাদী বা ভারতপন্থী অভ্যুত্থান ছিল না। খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগের সাথে কোন বোঝাপড়া করেননি। ভারতের নিকট থেকেও তিনি কোন সমর্থন চাননি অথবা সমর্থন লাভ করেননি। বরং তার অজান্তে ৩ নভেম্বর রাত্রিতে চারজন আওয়ামী লীগ নেতা– তাজুদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান জেলখানায় নিহত হন এবং ১৫ আগস্টের নায়কগণ দেশত্যাগের পূর্বে এই নির্মম কার্যটি সম্পন্ন করেন।

এই অভ্যুত্থানের মূলে ছিল সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক প্রচেষ্টা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেন তাঁরা বঙ্গভবনেই থেকে যান। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বারে বারে ফিরে আসার আদেশ সত্ত্বেও এই সব কর্মকর্তা বঙ্গভবন ত্যাগ করেন নি, কেননা তাঁদের আশঙ্কা ছিল—ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেলে তাঁদের অস্ত্র পরিত্যাগ করতে হবে। এতে সামরিক বাহিনীতে আদেশ সূত্র

(Chain of Command) ভঙ্গ হয় এবং নিম্ন পদস্থ হওয়া সত্ত্বেও ঐ সব মেজর উচ্চপদস্থদের নির্দেশ অমান্য করেন। এই অবস্থাকে খালেদ মোশাররফ "রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র" (state within a state) বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি এই অবস্থার বিলোপসাধন করে সামরিক বাহিনীকে শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধান সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ায় খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন।

জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা লাভ

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে সংঘটিত সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে কর্নেল তাহের ও কর্নেল জিয়াউদ্দীনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা (Revolutionary Soldiers Association) গঠিত হতে থাকে। কর্নেল তাহের ও কর্নেল জিয়াউদ্দীন সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশে বিপ্লব ঘটানোর জন্য গণবাহিনী সংগঠনে মনোযোগী হন। কর্নেল তাহের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সামরিক সংস্থা সংগঠন করেন এবং কর্নেল জিয়াউদ্দীন পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সদস্য হিসেবে ঐ দলের সামরিক শাখা সংগঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে সামরিক বাহিনীতে ১৯৭৩—৭৫ সালের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পর দেশের শাসনক্ষেত্রে স্থিতিহীনতা দেখা দিলে এই সকল কার্যক্রম মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

৩ নভেম্বরের ঘটনায় ঐ সব বিপ্লবী সংস্থা নতুন সম্ভাবনায় সচকিত হয়ে উঠে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবর্গ, বিশেষ করে হাসানুল হক ইনু এবং কর্নেল তাহের এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে তাঁরই নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠন করে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের চিন্তা করা হয়।

খালেদ মোশাররফকে রুশ-ভারতের দালাল ও জাতীয় বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করা হয় এবং সেনাবাহিনীর একাংশ কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে জনতার সাথে একযোগে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাত্রা করে। খালেদ মোশাররফ দলবলসহ পর্যুদস্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন। জিয়াউর রহমান মুক্ত হন। ৭ নভেম্বর তিনি সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধানের (Chief of Army Staff) পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হন। খালেদ মোশাররফ কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (Chief Martial Law Administrator) নিযুক্ত হন এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি. তাওয়াব উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

সিপাহী-জনতার বিপ্লবের লক্ষ্য

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিপাহী-জনতার বিপ্লবের ফলে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ৬ই নভেম্বর কর্নেল আবু তাহেরের সভাপতিত্বে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ৭ই নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিপ্লবের লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এই লক্ষ্যগুলো ছিল।

(এক) খালেদ মোশাররফকে দলবলসহ পর্যুদস্ত করা।

(দুই) জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা।

(তিন) সামরিক বাহিনী পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী সামরিক পরিষদ (Revolutionary Military Command Council) গঠন করা।

(চার) দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান।

(পাঁচ) বাকশাল ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা।

(ছয়) বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বার দফা দাবির (twelve-point demands) স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন। বার-দফা দাবির মূল কথা ছিল 'শ্রেণীহীন সমাজ" গঠনের পদক্ষেপ হিসেবে 'শ্রেণীহীন সামরিক বাহিনী' গঠন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান থেকে আরম্ভ করে সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি, সৈনিকদের বিনা ব্যয়ে আবাসিক সুবিধা, ব্যাটমান (batman) ব্যবস্থার বিলুপ্তি, সাধারণ সৈনিকদের মধ্য হতে অফিসার নির্বাচন এবং সর্বোপরি সামরিক বাহিনী পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সামরিক সংস্থা গঠন ছিল বার-দফা দাবির উল্লেখযোগ্য দাবি।

জেনারেল জিয়া প্রথমে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও কর্নেল তাহেরের প্রস্তাব অনুযায়ী রাজবন্দীদের মুক্তি দেন। ফলে ৮ই নভেম্বর আ. স. ম. আব্দুর রব, মেজর জলিল প্রমুখ নেতার মুক্তি পান। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সামরিক বাহিনীতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে জেনারেল জিয়া তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে দাঁড়ান এবং ২৪ নভেম্বর কর্নেল তাহেরসহ সকল জাসদ নেতাকে বন্দী করেন এবং ২৫ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এবং দেশের বিরুদ্ধে বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। পরে তাহেরসহ অন্যান্য ৩৩ জনের বিচার করা হয় এবং ১৯৭৬ সালের ২০ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিযুক্ত তাহেরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন

Martial Law

বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১২ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন যে, তাঁর সরকার 'নির্দলীয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন এক ব্যবস্থা।" তাঁদের সরকার দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় বিচারপতি সায়েম ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌ-বাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এম. জি. তাওয়াব। এই সামরিক আইন প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষে যদিও ছিলেন রাষ্ট্রপতি তথাপি প্রধান শক্তিকেন্দ্র ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও দেশের সামরিক বাহিনী।

জিয়াউর রহমানের শাসনকালকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় মূলত **সামরিক শাসন** (Martial Law)। এই পর্যায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় পর্যায়কে জিয়াউর রহমানের **বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া** (Civilianisation Process) বলে চিহ্নিত করা চলে। এই প্রক্রিয়া ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১৯৮১ সালের মে পর্যন্ত বিস্তৃত।

তাঁর সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্য

জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক ঃ জিয়ার শাসন ছিল অনেকটা রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ এবং উদারনীতি ভিত্তিক যদিও বাকশাল বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এতে মিলে। ১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ (Council of Advisors) গঠন করেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথমে নিয়োগ লাভ করেন আবুল ফজল, কাজী আনোয়ারুল হক, ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ডঃ মীর্জা নূরুল হুদা। তিন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকও এই পরিষদের সদস্য হন। পরবর্তী পর্যায়ে এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা হয় ২২ জন। এই সকল উপদেষ্টা প্রধানত ছিলেন পেশাদারী, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ ও প্রবীণ প্রশাসক। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রিদের বেতন ও সুবিধা উপভোগ করতেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয়।

(২) আইন শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ ঃ এই সামরিক শাসন আমলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমান **প্রথম,** আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেন। **দ্বিতীয়,** সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মোট রেভিনিউ বাজেটের শতকরা ১৩ ভাগ। ১৯৭৬-৭৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে মোট বাজেটের শতকরা ২৯ ভাগে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ রাইফেলসে নতুন নিয়োগদানের মাধ্যমে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সংখ্যা ৪০ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭০ হাজার। এর মধ্যে ছিল ১২,৫০০ জনের এক বিশেষ পুলিশ বাহিনী (Special Police Force)। সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে তিনি মনোযোগ দেন। সমগ্র দেশকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে একটি সামরিক ছাউনী প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে নবম ডিভিশন গঠন করেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন নতুন নিয়োগের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ১৯৭৫ সালের আগস্টে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৬,০০০, কিন্তু ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০,০০০।[১] তাছাড়া, প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তা সংস্থা (DFI) এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (NSI) দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

(৩) প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুশৃঙ্খল বাহিনীতে রূপান্তর ঃ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জিয়াউর রহমান শৃঙ্খলা এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নি, বরং অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, বিশেষ করে ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে।

১। Zillur Rahman Khan, *Leadership Crisis in Bangladesh*, Dhaka : U P L 1984,

ফলে প্রথম থেকেই জিয়াউর রহমানকে সামরিক বাহিনীর মধ্য থেকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই তাহেরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পর এই বিরোধিতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমান বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সামরিক বাহিনীতে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। **প্রথম,** তিনি বার দফা দাবিনামার কয়েকটি অরাজনৈতিক দাবি, যেমন সামরিক বাহিনীতে ঔপনিবেশিক আমল থেকে প্রচলিত ব্যাটমান প্রথা বাতিল করেন, বিভিন্ন পর্যায়ে সামরিক কর্মকর্তাদের মাহিনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেন এবং সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করে ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা করে পেশাদার (Professionalism) এক মনমানসিকতা গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(৪) নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ঃ জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা। সামরিক শাসনে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেন। বাংলাদেশেও তাই হয়েছিল। মুজিব আমলে কর্মকর্তাদের প্রাধান্য ভয়ঙ্করভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল, কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সচিবালয়, জনসংস্থা এবং জেলা পর্যায়ে এলিট কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করে তাঁদের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। জিয়া সরকার সচিবালয়ের পুনর্গঠন করে তাকে ২৪টি মন্ত্রণালয় ও ৩৯টি বিভাগে বিভক্ত করেন এবং এলিট ক্যাডার থেকে ২৮ জন সচিব ও ১১ জন অতিরিক্ত সচিবের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করেন। দেশের অধিকাংশ জনসংস্থায় (Public corporations) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা চেয়ারম্যান পদে ঐ সব কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন। পরিকল্পনা কমিশনেরও শফিউল আজম ও এম. এ. খায়ের প্রমুখ কর্মকর্তা নিয়োগ লাভ করেন।

জিয়া সরকারের আর্থ-সামাজিক নীতি

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জিয়া সরকার কতকগুলো নীতি নির্ধারণ করেন যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। নিচে তার আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো।

(১) উন্নয়ন কৌশল হিসেবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঃ তিনি উন্নয়ন কৌশল (Development Strategy) হিসেবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির (Economic growth) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জেনারেল জিয়ার উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ **(এক)** বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার দান, **(দুই)** বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা, **(তিন)** বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, এবং **(চার)** বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিতরণের মাধ্যমে কৃষির অগ্রগতি সাধন।

এই উন্নয়ন কৌশল অনুসৃত হবার ফলে ১৯৭২ সালে জাতীয়করণকৃত বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান বে-সরকারি শিল্প মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৫৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্প মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। মুজিব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেসরকারি খাতে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করা হয় এক কোটি টাকায়। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য জাতীয়করণ নীতি পরিহার করা হয় এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কর

মওকুফের ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৭ নভেম্বর ব্যাংক অব ক্রেডিট অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল ইণ্টারন্যাশনাল (B. C. C. I) প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ভূমি মালিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিতরণ করা হয়। সরকারি ভর্তুকীসহ সার, পানিসেচ, উত্তম বীজ কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

(২) সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা ঃ এই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করে বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো হয়। সংবিধান সংশোধন করে সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এই অর্থে সমাজতন্ত্র হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার। এই অর্থে উৎপাদনের উপাদানসমূহ আর জাতীয়করণ করার প্রয়োজন রইল না। ফলে ব্যবস্থা গৃহীত হলো যে, জাতীয় প্রয়োজনে জাতীয়করণ প্রয়োজনীয় হলে মালিককে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

এই ব্যবস্থার ফলে বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরায় সংযোজিত হয়। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৭৩–৭৪ সালে সকল উৎস থেকে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার। কিন্তু ১৯৭৫–৭৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৩ কোটি ৪ লক্ষ ডলার। ক্রমে ক্রমে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৩) খাল কাটা বিপ্লব ঃ ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় খাল কাটা বিপ্লব। প্রথম বছর ৫০ লক্ষ একর জমিতে পানি সেচযোগ্য ১০৩টি প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালে ১৮০ লক্ষ একর জমিতে পানিসেচযোগ্য ২৫০টি প্রকল্প চালু হয়। ১৯৮১ সালে এই কর্মসূচী আরও বৃদ্ধি পায়।

(৪) গণশিক্ষা কর্মসূচী ঃ খাল কাটা বিপ্লবের সাথে সংযুক্ত হয় ১৯৮০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গণশিক্ষা কর্মসূচী। ৩ লক্ষ ৯২ হাজার সাক্ষরতা শিক্ষক সহযোগে দেড় লক্ষ শিক্ষা বাহিনী সহযোগে ৫৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পঠন–পাঠনের উপযোগী করা ছিল এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অবশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়।

(৫) শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য ক্ষমতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য জিয়া সরকার চট্টগ্রাম থেকে শিল্প বিপ্লবও শুরু করেন।

(৬) জনসংখ্যা রোধ ঃ জিয়া সরকার বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা রূপে চিহ্নিত করেন এবং ১৯৮০ সালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল ১৯৮৫ সাল নাগাদ জনসংখ্যার বৃদ্ধি হারকে শতকরা ১·৫ ভাগে স্থিতিশীল করা। সরকারের এই লক্ষ্য অবশ্য অর্জিত হয় নি, যদিও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম সমগ্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। বিশ্বময় তা প্রশংসিত হয়।

সংক্ষেপে, আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে জিয়া সরকারের পদক্ষেপ ছিল মুজিব আমলে গৃহীত উন্নয়ন কৌশলের পরিবর্তন এবং সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানো—তথা পুঁজিবাদী বিশ্বের সাথে বাংলাদেশকে সংশ্লিষ্ট করা। জিয়া এ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হন। বাংলাদেশ এসব কারণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে অগ্রসর হয়।

জিয়ার ১৯-দফা নীতি ও কর্মসূচী

Nineteen Point Programme

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল ১৯ দফা নীতি ও কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচী নিম্নরূপ ঃ

(এক) সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

(দুই) সংবিধানের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলন করা।

(তিন) সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

(চার) প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(পাঁচ) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত করে তোলা।

(ছয়) দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা।

(সাত) দেশে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য কাপড়ের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(আট) কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(নয়) নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা।

(দশ) সমাজে নারীদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

(এগার) সকলের জন্য যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(বার) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি প্রচেষ্টায় উৎসাহ দান করা।

(তের) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিক ও মালিকদের সম্পর্ক উন্নতি করা।

(চৌদ্দ) সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোভাব গড়ে তোলা।

(পনের) জনসংখ্যার বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করা।

(ষোল) সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(সতের) প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের সরকারগুলোকে শক্তিশালী করা।

(আঠার) দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

(উনিশ) ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করা।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উল্লিখিত উনিশ দফা নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনসাধারণকে উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টার আহ্বান করেন। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তারিখে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে গণসমর্থন ও আস্থা ভোটের ব্যবস্থা করা হয় তার মূলে ছিল রাষ্ট্রপতির উনিশ দফা নীতি এবং কর্মসূচী। এই আস্থা ভোটে তিনি বিপুলভাবে সমর্থিত হন।

উনিশ দফা নীতি ও কর্মসূচীর মূলকথা মোটামুটি চারটি ঃ

(এক) বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে বাজার অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

(দুই) জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করা এবং জনসাধারণের মধ্যে নতুন চেতনা সৃষ্টি করা।

(তিন) জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সীমিত করা।

(চার) শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করে অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত করা।

জিয়া আমলে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঃ

জিয়া সরকার বাংলাদেশের সংবিধান এবং শাসন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন।

১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল এক ঘোষণা বলে তিনি সংবিধানে কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। তাছাড়া ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক ঘোষণাবলে মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্ক কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পঞ্চম সংশোধনী আইন গ্রহণ করে জিয়া সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল ব্যবস্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।

বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বাংলাদেশ সংবিধান এবং পদাধিকারীদের ক্ষমতায় গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। চতুর্থ সংশোধনী আইনে গৃহীত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপরিবর্তিত থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল বিধিবিধান গৃহীত হয়েছিল তার বিলুপ্তি ঘটে এবং সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের অবসান হয়। অন্যদিকে সমাজের বিভিন্ন দুর্বল ও অবহেলিত শ্রেণীর জন্য অধিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়।

(এক) ১৯৭৫ সালের ৮ এবং ২৯ নভেম্বর ঘোষণায় বলা হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হলেও আইনগতভাবে তিনি নিয়োগ লাভ করে উপযুক্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবেন এবং তাঁর সকল কাজ বৈধভাবে স্বীকৃত হবে।

(দুই) ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণাবলে সংবিধানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন ঃ

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবে।

(খ) বাংলাদেশের দুটি মৌলনীতি সম্পর্কে গভীর পরিবর্তন সাধন করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়, আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। আল্লাহ সকল কর্মের মূল হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং সংবিধান শুরু হয় বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম দিয়ে।

বাংলাদেশের এই মূলনীতি সংশোধনের কারণ ছিল প্রধানত দুটি ঃ **প্রথম,** দেশের ডানপন্থী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে আকৃষ্ট করে জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন নিজের ক্ষমতার ভিত্তি শক্ত করতে। **দ্বিতীয়,** বাংলাদেশ সম্বন্ধে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে। তাছাড়া, তিনি বাঙালী মুসলমানদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিকে এই সংশোধনের মাধ্যমে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

(গ) বাংলাদেশের আর একটি মূলনীতি সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হয় নতুনভাবে। এই অর্থে সমাজতন্ত্র হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার। এই অর্থে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশে এই মূলনীতি সংশোধনের কারণ ছিল অনেক। **প্রথম,** আর্থিক সংকট মোকাবেলার জন্য পাশ্চাত্যের নিকট থেকে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণের জন্য। **দ্বিতীয়,** দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদের

ভিত্তিতে সংগঠিত করার জন্য। **তৃতীয়,** দেশের বাকশাল বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজের কাছাকাছি আনার জন্য। চতুর্থ, বাংলাদেশ জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে।

(ঘ) বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ক্ষেত্রে সংশোধন করে বলা হয় যে, দেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন।

(ঙ) সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়।

(তিন) ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর একটি ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানে নিম্নলিখিত পরিবর্তন আনয়ন করেনঃ

(ক) রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে এবং তা প্রধানমন্ত্রী, এক বা একাধিক উপ-প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিকাংশের আস্থাভাজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণও জাতীয় সংসদের সদস্য হবেন। তবে রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তিদেরকেও মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করতে পারবেন যারা সংসদ সদস্য নন কিন্তু সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। এভাবে নিযুক্ত মন্ত্রীদের সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক হবে না। মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

(খ) মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করার নির্দেশ দান করতে পারবেন।

(গ) জাতীয় সংসদে ১৫ বছরের জন্য মহিলাদের ৩০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এর পূর্বে ১০ বছরের জন্য মহিলাদের ১৫ আসন সংরক্ষিত ছিল।

(ঘ) বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সম্পর্কে সংশোধনী বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে এবং তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হলে রাষ্ট্রপতি এক গণভোটের আয়োজন করবেন। গণভোটে তা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) যদি জাতীয় পরিষদ কোন অর্থ বছরে শাসন পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দে ব্যর্থ হন বা বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট না হয় তবে রাষ্ট্রপতি অন্যূন ১২০ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করবেন।

(চ) যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হবে। যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, ঐ চুক্তি বা সন্ধি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয় তবে তা জাতীয় সংসদের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে।

(চার) পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এই সংশোধনী আইনের ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিলের মধ্যে প্রণীত সকল আদেশ, সামরিক আইন প্রতিবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত সময়ে ঐ সব বিধান বা আদেশের বলে সংবিধানে যে সকল সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়েছে, তা বৈধভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ধরতে হবে।

জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া
Civilianization Process

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে একজন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি সায়েম। বিচারপতি সায়েম ৮ নভেম্বর ঘোষণা করেন, তাঁর সরকার একটি নির্দলীয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তিনি আরও ঘোষণা করেন, জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিশ্রুত নির্বাচন অবশ্য অনুষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জেনারেল জিয়া সরকার বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রথম থেকেই আগ্রহী ছিলেন। নিম্নেবর্ণিত পন্থায় তিনি পর্যায়ক্রমে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন যা সমাপ্ত হয় ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সামরিক শাসন প্রত্যাহারের মাধ্যমে।

১৯৭৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জিয়াউর রহমান ছিলেন অন্যতম উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। অবশ্য কার্যত তিনিই ছিলেন শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম জাতীয় স্বার্থে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন এবং জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল যখন রাষ্ট্রপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণে রাষ্ট্রপতি পদ ত্যাগ করেন তখন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বে-সামরিকীকরণের আভাষ দেন। ঘোষণায় তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তাঁর প্রতি আস্থা যাচাইয়ের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে (universal adult suffrage) দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। দেশের পৌরসভা ও জেলা পরিষদগুলোতে ১৯৭৭ সালের আগস্ট ও ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও তিনি ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ গুলোই জিয়াউর রহমানের বে-সামরিকীকরণের পদক্ষেপ। নিচে তা আলোচিত হলো ঃ

(১) রাজনৈতিক দলবিধি ঃ রাষ্ট্রপতি সায়েম কর্তৃক প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচন ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত না হলেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্য জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই এক নতুন **রাজনৈতিক দলবিধি** (Political Parties Regulations 1976) প্রণয়ন করেন এবং এই বিধি সাপেক্ষে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুমতি দেয়া হয়। বিদেশী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত জাতীয় স্বার্থভিত্তিক এবং প্রতিটি অংগ সংগঠনসহ রাজনৈতিক দল এবং সীমিত পরিষদে ঘরোয়াভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা এই বিধিতে স্বীকৃত হয়। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের জন্য সমগ্র দেশকে বিভক্ত করা হয়। দেশের সর্বমোট ৫৩টি রাজনৈতিক দল অনুমোদনের জন্য আবেদন করে এবং ২১টি দল অনুমোদন লাভ করে। তবে প্রত্যাশিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে। মওলানা ভাসানীর মত নেতাও নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, "দেশের সামনে অসংখ্য সমস্যা ফনা উদ্যত করে রয়েছে। এই সময় এমন কিছু করা সম্ভব নয় যা দেশের শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত করতে

পারে অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত করতে পারে বা দেশে ঐক্য ও সংহতি বিপর্যস্ত হয়।" এভাবে সাধারণ নির্বাচন স্থগিত থাকে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ঃ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলেও ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে দেশের ৪,৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকার এবং সরকারের উন্নয়ন কৌশলের প্রতি পল্লীর প্রভাবশালীদের সমর্থন লাভ। জিয়া সরকার নির্বাচনের পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সম্মানী ১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করেন ৩০০ টাকায় এবং পরিষদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করেন।

(৩) উনিশ দফা কর্মসূচী ঃ ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর সরকারের ব্যাপক কর্মসূচী হিসেবে ১৯-দফা কর্মসূচী (19-Point Programme) ঘোষণা করেন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, কৃষি-শিল্পের উন্নতি, কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থার অগ্রগতি সাধন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারি খাতের অগ্রগতি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সকলের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি ছিল ঐ কর্মসূচীর মূল কথা। এই কর্মসূচী ঘোষণার পর চার সপ্তাহব্যাপী এক জনসংযোগ কর্মসূচীর সূচনা করেন এবং প্রায় ৭০টি জনসভার মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন শহর ও গ্রামাঞ্চলে।

(৪) গণভোট ঃ ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তাঁর শাসনকে বৈধকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী এক গণভোট অনুষ্ঠান করেন। এই গণভোটে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ভোটদাতার নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়, রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আপনাদের আস্থা আছে কি?' (Do you have confidence in President Major General Ziaur Rahman and in the policies and programmes enunciated by him?) দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসে। আওয়ামী লীগ নিশ্চেষ্ট থাকে এবং শুধুমাত্র জাসদ গণভোট বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। নির্বাচনে শতকরা ৮৮·৫ ভাগ ভোটাদাতা ভোট দেন বলে খবরে প্রকাশিত হয় এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৮·৮৮ ভাগ ভোট তিনি লাভ করেন।

(৫) পৌরসভা নির্বাচন ঃ গণভোট অনুষ্ঠানের পর দেশের ৭৭টি পৌরসভা ও ১টি পৌর কর্পোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা পৌর কর্পোরেশনে নির্বাচন হয় সেপ্টেম্বর মাসে। এই সকল নির্বাচনে ৭৭ জন চেয়ারম্যান ও ৮৬টি কমিশনারদের পদ পূর্ণ হয়। এই সকল পদে যথাক্রমে ৪২১ ও ৩৩৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন আওয়ামী লীগ পন্থী এবং বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম লীগের সমর্থক। এক হিসেবে বলা হয়, নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের ২৫ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং ১৭ জন ছিলেন মুসলিম লীগের। এইসব নির্বাচনে ডানপন্থী ও মধ্যম-ডানপন্থীদের বিজয় সূচিত হয়।

(৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৭৮ ঃ ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জিয়াউর রহমানের বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১৯৭৮ সালের ২৮ এপ্রিল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ জারি করেন। এই আদেশের অধীনে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতাও বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীকে (ক) অন্যূন ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে, (খ) তিনি জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন, এবং (গ) তিনি সংবিধানের অধীনের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারিত হন নি এমন ব্যক্তি হবেন।

১৯৭৮ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন ৩ জুন। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক তৎপরতার উপর আরোপিত বাধানিষেধ ২৪ এপ্রিল থেকে তিনি অপসারণের নির্দেশ দেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন গৃহীত হবে এবং সার্বভৌম সংসদ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত **জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের** প্রার্থী হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের অংগদলগুলো ছিল ঃ (ক) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল), (খ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), (গ) ইউনাইটেড পিপল্স পার্টি (ইউ. পি. পি.), (ঘ) বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, (ঙ) বাংলাদেশ লেবার পার্টি এবং (চ) বাংলাদেশ তফশিলী ফেডারেশন। জেনারেল জিয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন **গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের** মনোনীত প্রার্থী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী। এই জোটের অংগ সংগঠন ছিল ঃ (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, (খ) জাতীয় জনতা পার্টি (গ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), (ঘ) (বাংলাদেশ পিপল্স লীগ ও (ঙ) গণ আজাদী লীগ। তাছাড়াও গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি করেন বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ।

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর প্রতীক ছিল 'ধানের শীষ'। অন্যদিকে 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী জেনারেল ওসমানী 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এই নির্বাচনের সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ্য ৯৬ হাজার ২৪৭ জন (৩,৮৪,৯৬,২৪৭)। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী এই নির্বাচনে শতকরা ৫৩·৫৪টি ভোট প্রদত্ত হয় এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৬·৬৩ অংশ ভোট লাভ করে জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জেনারেল ওসমানী। তিনি প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২১·৭০ ভাগ ভোট লাভ করেন। অপর আট জন প্রার্থী লাভ করেন সর্বমোট ১·৬৭ ভাগ ভোট।

(৭) মন্ত্রিপরিষদ গঠন ঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে জেনারেল জিয়া গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৮ সালের ৩০ জুন ২৮ জন মন্ত্রী ও ২ জন প্রতিমন্ত্রী সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ১৯৭৮ সালের ৬ জুন তিনি ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ আরও সুসংহত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমার প্রধানতম লক্ষ্য।" ২৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৮ জন ছিলেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল থেকে, ৪ জন ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) থেকে, ২ জন ইউ. পি. পি থেকে, ৩ জন মুসলিম লীগ হতে এবং ১ জন তফশিলী ফেডারেশন হতে। মন্ত্রিদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা, ৮ জন ছিলেন বেসামরিক কর্মকর্তা, ১ জন সাংবাদিক এবং অন্যরা ছিলেন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ।

(৮) বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টি বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি.) গঠন ঃ ১৯৭৮ সালের ৩ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন ৬টি দলের সমন্বয়ে গঠিত

জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী। নির্বাচনের পর এই ফ্রন্টকে একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। কিন্তু জাগদলের নেতৃবর্গের বিরোধিতার মুখে এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২৮ আগস্ট জাগদলের আহ্বায়ক বিচারপতি সাত্তার এক নির্দেশে সকল অঙ্গদলসহ জাগদলকে বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় ঐক্য ভিত্তিক বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh Nationalist Party ঃ B. N. P.) গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বয়ং এই দলের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এ ভাবে দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের জন্ম হয় এবং দেশে রাজনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

(৯) দলীয় কার্যক্রমের সূচনা ঃ রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল ঃ ১৯৭৮ সালের ৩ জুনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭৮ সালের ২২ এপ্রিল এক ঘোষণায় ২৪ এপ্রিল হতে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর আরোপিত সকল বাধা নিষেধ অপসারণের নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক দলবিধি তখনও কিন্তু বাতিল করা হয় নি। ১৯৭৮ সালের ১৭ নভেম্বর এক ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি জিয়া রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল করেন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ যে দলীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ তার পথ প্রশস্ত করেন।

(১০) ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন ঃ ১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ভাষণে বলেন, ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এটি ছিল দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের সর্বশেষ পন্থা।

রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী অবশ্য ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জাতীয় লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল ঃ নির্বাচনের পূর্বে রাজবন্দীদের মুক্তি, অবাধ প্রেসের নিশ্চয়তা, সামরিক আইন প্রত্যাহার, সার্বভৌম জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ক্ষেত্রে সকল বাধানিষেধ প্রত্যাহার। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর কতকগুলো বাস্তব পন্থা গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক রাজবন্দীকে মুক্তি দান, রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সামরিক আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি-নিষেধ স্থগিতকরণ, সংবাদপত্র ও প্রচার ক্ষেত্রে উদার নীতি, সভাসমিতি অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন প্রত্যাহার ছিল গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। সরকার প্রথমে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পবির্তন করে ১১ ফেব্রয়ারি ধার্য করেন। পরে তা ১৮ ফেব্রুয়ারিতে ধার্য করা হয়।

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল ও উপ-দল অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের জন্য সর্বমোট ২,৩৫২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এই সকল প্রার্থীর মধ্যে ৮ জনের মনোনয়নপত্র বাছাইতে বাতিল ঘোষিত হয়, ২১৯ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন এবং ২,১২৫ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২,১২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ৪২৫ জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ১,৭০০ জন ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী।

সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০৭টি আসন লাভ করে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি আসন লাভ করে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

নিচের সারণীতে ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দল কর্তৃক প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দেয়া হল ঃ

সারণী ১৮/৯/ বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা

দল	আসন সংখ্যা
১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—	২০৭
২। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক)—	৩৯
৩। মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডিমোক্র্যাটিক লীগ—	২০
৪। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—	০৯
৫। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)—	০২
৬। বাংলাদেশ জাতীয় লীগ—	০১
৭। গণফ্রন্ট—	০১
৮। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—(মোজাফফর)—	০১
৯। জাতীয় একতা পার্টি—	০১
১০। সাম্যবাদী দল—	০১
১১। গণতান্ত্রিক আন্দোলন—	০১
১২। স্বতন্ত্র প্রার্থী—	১৭
	সর্বমোট = ৩০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন ভোটদাতাদের শতকরা ৪৯·৭৩ ভাগ ভোট দিয়েছেন। সর্বমোট ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল ৩,৮৪,৯৬,২৪৭ জন এবং ১,৯১,০৬,২২৫ জন ভোটদাতা ভোট দান করেন। এই নির্বাচনে ১১টি রাজনৈতিক দল সদস্য নির্বাচনে সমর্থ হয়, কিন্তু ১৮টি দল কোন সদস্য নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৯ সালের ৩১ মার্চে জাতীয় সংসদের ৩০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সব কয়টি আসন বাংলাদেশ জতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা লাভ করেন।

(১১) জাতীয় সংসদের অধিবেশন (Jatiya Sangsad Meets) ঃ ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না। নির্বাচন অনেকটা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক জায়গায় ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসন লাভে

সক্ষম হলেও সারাদেশে গৃহীত ভোটের অধিকাংশ লাভে সক্ষম হয় নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ এই নির্বাচনের ফলাফলকে স্বীকার করেন।

সংবিধানের ৭২ (১) ধারামতে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল জাতীয় সংসদ আহ্বান করেন। ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংসদ বাতিল ঘোষিত হয়, যদিও সেই সংসদের কার্যধারা সমাপ্ত হয় ১৯৭৫ সালের ৩০ জুন—১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট প্রণয়নের পর পরই।

(১২) পঞ্চম সংশোধনী আইন, ১৯৭৯ (Fifth Amendment Act 1979) ঃ জাতীয় সংসদের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে তুমুল বিতর্ক, সুদীর্ঘ আলোচনা, সমালোচনা ও বিরোধী দলের একাংশের সংসদ কক্ষ ত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল **বাংলাদেশ সংবিধান পঞ্চম সংশোধনী আইনটি** গৃহীত হয়। এই সংশোধনী আইনের ফলে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন আদেশ দ্বারা সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হয়েছে তা বৈধভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষিত হলো। এই বিলটি উত্থাপন করেন সংসদের নেতা শাহ আজিজুর রহমান। তখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন আওয়ামী লীগের (মালেক) নেতা আসাদুজ্জামান খান।

(১৩) সামরিক আইন প্রত্যাহার (Withdrawal of Martial Law) ঃ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সংবিধানের (পঞ্চম সংশোধনী) আইনটি গৃহীত হলে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ক্ষেত্র রচিত হয়। রাষ্টপতি জিয়াউর রহমান ৬ এপ্রিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। বাংলাদেশে সামরিক আইন চালু ছিল সুদীর্ঘ তিন বছর সাত মাস একুশ দিন পর্যন্ত। সামরিক আইন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুর্যোদয় ঘটল।

জিয়ার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন

সংক্ষেপে ইহাই জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের পদক্ষেপ।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এ সব পদক্ষেপ অত্যন্ত উন্নয়নমুখী, কেননা তিনি যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয়েছিল, মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করা হয়েছিল এবং সংবিধান স্থগিত ঘোষিত হয়েছিল। তিনি সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তখন বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। এই অবস্থা থেকে তিন বছর সাত মাস পর দেশে আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা সত্যই প্রশংসনীয়।

জিয়া সরকারের বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য জিয়ার গণতন্ত্রকে কেউ বলছেন **"সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র"** (Constitutional Autocracy); কেউ আবার বলছেন **"সামরিক গণতন্ত্র"** (Martial Democary)।

প্রথম, জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে যে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন, তার প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ৪জন সামরিক কর্মকর্তা এবং ৮ জন প্রবীণ বেসামরিক কর্মকর্তা। এমন কি

১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি যে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন তারও সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা এবং ৭ জন সিভিল সার্ভিসের সদস্য।

দ্বিতীয়, শুধু মন্ত্রিপরিষদেই নয়, দেশের গুরুত্বপূর্ণ জনসংস্থার (Public Corporation) শাসনক্ষেত্রে, এমন কি জেলা প্রশাসনেও তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন। ১৯৮০ সালের জুন মাসে দেশের ১০১টি জনসংস্থার চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের ৪২ জন ছিলেন কর্তব্যরত বা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে জেলায় কর্তব্যরত ৪০ জন পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের ২২ জন ছিলেন সামরিক কর্মকর্তা। ১৯৭৯ সালের ১ মার্চে দেশের প্রধান নীতি নির্ধারণী সংস্থা—বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬২৫ জন সিনিয়র সার্ভিস পুল কর্মকর্তার মধ্যে ২৫ জন ছিলেন সামরিক কর্মকর্তা। তাছাড়া, প্রায় ৫০০ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা শিল্প, ইণ্ডেন্টিং, বৈদেশিক বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জিয়ার প্রভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করে। এমন কী, ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১২ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। এই সকল কারণে জিয়ার সমালোচকরা বলেন, **"রাষ্ট্রপতি জিয়া ইচ্ছাপূর্বকভাবে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ইন্দোনেশিয়ার মডেল কার্যকর করতে চেয়েছিলেন।"**

তৃতীয়, শুধুমাত্র গণভোটের জোরে তিনি বাংলাদেশ সংবিধানে অনেক বেশি সংশোধন আনয়ন করেন। সংশোধনী আইনে তিনি রাষ্ট্রপতির প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি অন্তত ১২০ দিনের ব্যয় নির্বাহের জন্য জাতীয় সংসদের আপত্তি সত্ত্বেও অর্থ বরাদ্দ করতে পারতেন। তাছাড়া, মন্ত্রিপরিষদের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের বাহির থেকে নিয়োগ দান করতে পারতেন।

তবে এও উল্লেখযোগ্য, জিয়ার শাসন কাল বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

(ক) তিনি একজন সামরিক কর্মকর্তা হয়েও প্রচলিত একদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে বহু দলীয় গণতন্ত্রের চর্চা পুনরায় শুরু করেন। অন্যদিকে জননেতা শেখ মুজিব সংসদীয় গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেশে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

(খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করে এবং ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্র উর্বর করে তথাকথিত দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে অবাধ অর্থনীতি প্রবর্তনে উদ্যোগী হন।

(গ) সংবিধানকে জনগণের চিন্তা-চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(ঘ) দেশের ডান-বামকে সমন্বিত করে জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেন।

(ঙ) সর্বোপরি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রাণবন্ত করে দক্ষিণ এশিয়ায় হাজার বছরের জমাট বাঁধা সন্দেহের মধ্যে সাতটি রাষ্ট্রকে মিলনের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) মাধ্যমে। এই দিক থেকে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

জিয়া সরকার ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জিয়া সরকারের কৃতিত্ব অসামান্য। যখন তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন প্রতিবেশী ভারত ছিল বৈরীভাবাপন্ন। শেখ মুজিবর রহমান যদিও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিলেন তথাপি কার্যত তখন ভারতের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখনও চীন, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মত রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি। ফলে বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্নমুখী পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পর পরই পাকিস্তান, সৌদি আরব ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। ঐ মুহূর্তে অবশ্য বাংলাদেশের সামরিক নেতৃবর্গ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর অভ্যুথানকে অনেকে সোভিয়েত-ভারত পন্থীয় অভ্যুথান বলে চিহ্নিত করেছেন। ৭ নভেম্বরের ভারত বিরোধী অভ্যুথানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়া ক্ষমতা লাভ করেন এবং ক্ষমতা লাভ করে দুটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন।

প্রথম, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের অভ্যুথানের পর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একদল মুজিব সমর্থক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত সরকার ৩০ থেকে ৩৫টি ক্যাম্প খুলে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে সহায়তা দান করতে থাকেন। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি থেকে তারা ভারতের সীমানা নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের সীমান্ত ফাঁড়িগুলো আক্রমণ ও অভ্যন্তরে যানবাহন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করার কাজে নিয়োজিত হয়।

দ্বিতীয়, ভারত ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিলের চুক্তি ভঙ্গ করে ফারাক্কার মাধ্যমে গঙ্গার প্রবাহ ভারতে একতরফাভাবে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করে। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য চাষ ভয়ঙ্করভাবে বিঘ্নিত হয় এবং বাংলাদেশের শতকরা ৩৩ ভাগ জনসংখ্যা অধ্যুষিত শতকরা ৩৭ ভাগ ভূ-খণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জিয়া সরকার ভারতের সাথে সীমানা সমস্যা ও ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা শুরু করেন কিন্তু অচিরে তা ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষিতে জিয়া সরকার কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। **প্রথম,** মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক জোরদার করার উদ্যোগ। **দ্বিতীয়,** জোট নিরপেক্ষ গ্রুপের সাথে আরও সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। **তৃতীয়,** চীনের সাথে সৎপ্রতিবেশীমূলক সম্বন্ধ স্থাপন। **চতুর্থ,** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা।

১৯৭৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৪২-জাতি ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রিদের অধিবেশনে গঙ্গার পানি সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। তারপর কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ৮৫-জাতি জোট নিরপেক্ষ অধিবেশনে বাংলাদেশ আশাতীত সাড়া লাভ করে। এর পর বাংলাদেশ গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা আন্তর্জাতিক সংস্থায় উথাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তা আলোচনার ব্যবস্থা হয়।

পরে অবশ্য দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে এই সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করা হয়। এদিকে ভারতে কংগ্রেসের পরিবর্তে জনতা পার্টি ক্ষমতাসীন হলে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই প্রতিবেশীদের সাথে ভারতের সম্পর্ক উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের মার্চে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ফারাক্কা সমস্যা আলোচিত হয় এবং ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে এই সম্পর্কে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সমাধান সম্বন্ধে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

তাছাড়া, ১৯৭৭ সালের জুন মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের পর জিয়াউর রহমান ও মোরারজী দেশাই আলোচনায় মিলিত হয়ে বাংলাদেশ সীমানায় মুজিব অনুরাগীদের দ্বারা বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঐসব ব্যক্তিদের কোনরূপ সহায়তা দান করবেন না এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও জিয়ার অন্যতম কৃতিত্ব। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও শুভেচ্ছা মিশন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরিভ্রমণ করেন। জিয়া নিজেই ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে সৌদি আরব ভ্রমণ করেন এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। তারপর থেকে বাংলাদেশ ইসলামিক সম্মেলন সংস্থায় (O. I. C.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারপর থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। **প্রথম,** বাংলাদেশ ৩-সদস্য বিশিষ্ট আল কুদ্স (Al-Quds) শীর্ষ কমিটির সদস্য হয়। **দ্বিতীয়,** ১৫-সদস্য বিশিষ্ট জেরুজালেম মন্ত্রী-কমিটির সদস্য হয়। **তৃতীয়,** ১৩-সদস্য বিশিষ্ট ইসলামিক সলিডারিটি কমিটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। **চতুর্থ,** ১৩-সদস্য বিশিষ্ট সংবাদ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য, এবং **পঞ্চম,** ইরাক-ইরান শান্তি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনী মুক্তি যোদ্ধাদের ন্যায়সংগত দাবিকে সব সময় সমর্থন করে এসেছে।

চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নও জিয়া সরকারের একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ। ১৯৭৬ সালের মে এবং জুন মাসে বাংলাদেশ থেকে দুটি শুভেচ্ছা মিশন চীন ভ্রমণে যায় এবং রাষ্ট্রপতি জিয়া স্বয়ং ১৯৭৭ সালের ২ জানুয়ারি চীন ভ্রমণে যান। এ সব ভ্রমণের ফলে চীন বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে চীন থেকে একটি প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসে। চীন ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘে ফারাক্কা সমস্যায় বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য পেশ করেন।

দূর প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনে জিয়া সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠলেও ১৯৮০ সাল থেকে তা সৎপ্রতিবেশী সুলভ হয়ে উঠে। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি নে উইন বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। ঐ

বছর বাংলাদেশ ও বার্মা সীমান্ত চুক্তি এবং ঢাকা–রেঙ্গুন সহযোগিতা ও বার্মার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা ভ্রমণ—দুই দেশের সম্পর্ক মধুরতর করে তুলে। ১৯৭৯-৮০ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়ার জাপান, উত্তর কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সফর এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্নমুখী বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি দূর প্রাচ্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুলে। বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি জিয়া ১৯৭৭ সালের ১ আগস্ট যা বলেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ পররাষ্ট্র নীতির অগ্রগতির মূলকথা হলো বাংলাদেশ এখন তার ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।"

বাংলাদেশের গতিশীল বৈদেশিক সম্পর্কের আর একটি দিক দর্শন হলো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার (Regional Cooperation in South Asia ঃ SAARC) উদ্যোগ গ্রহণ। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই প্রস্তাব পেশ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি রাষ্ট্র—পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান—এই বিষয়ে মত বিনিময় করে এবং সচিব পর্যায়ে ৪টি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে তিনটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি পত্তন করে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে।

জিয়া সরকার ঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক অগ্রগতি

জিয়া আমলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হলো কি না তা পর্যালোচনার পূর্বে রাজনৈতিক অগ্রগতির স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, দক্ষতা, ক্ষমতা ও বিশেষত্বশীলতাই অগ্রগতির নমুনা বা লক্ষণ।[১] অন্য কথায়, যে সকল কার্যক্রম রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনয়ন করে, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দান করে, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে সামাজিক প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় তা উন্নয়নমুখী কার্যক্রম। এই সকল কার্যক্রম কি সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা সম্ভব? এডওয়ার্ড ফিটের (Edward Feit) মত বিশ্লেষণকারিগণ বলেন, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় খুব জোর স্বল্পকালীন "সংহতি" (cohesion) সম্ভব হতে পারে, কিন্তু "সহমত" (consensus) অর্জন সম্ভব নয়, যদিও কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে সেই সামরিক শাসন সার্থক যা কালক্রমে "বেসামরিক নেতৃত্বকে" (Civilian leadership) সুদৃঢ় করে।"[২]

এই মানদণ্ডে বিচার করলে জিয়া সরকারের নীতি ছিল উন্নয়নমুখী যদিও তা ছিল সীমিত এবং বিভিন্নক্ষেত্রে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে পরিচালিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করা হয়। সামরিক আইন জারির ৫০ দিন পরে ১৯৭৫ সালের ৩ অক্টোবর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুস্তাক আহমদ ঘোষণা করেন, দেশে পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হবে। তিনি আরও বলেন, ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা ও কার্যক্রমের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশে সেই প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচন হয় নি বটে, তবে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তা সম্পন্ন হয় এবং রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে জন প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১। G. Almond and B. Powell, *Comparative Politics : A Developmental Approach*, Boston : 1966

২। Edward Feit, *the Armed Bureaucrats*, Boston : 1973

যখন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ ছিল না। সংবিধানও স্থগিত ছিল। দেশের সামরিক বাহিনী ছিল বহুধা বিভক্ত এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সিভিল সার্ভিসের অবস্থাও তেমন সন্তোষজনক ছিল না। অন্যদিকে দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল হতাশা, নেতৃত্ব ও আদর্শের দ্বন্দ্ব। এই অবস্থায় তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথমে রাষ্ট্রীয় গঠনমূলক (State building) প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্ষম ও কার্যক্ষম করতে তৎপর হন।

প্রথম, তিনি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নানারকম সুযোগ–সুবিধা দান করে এবং তাদের অসন্তোষ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়, সামরিক বাহিনীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের পেশাদারী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং কয়েকটি নতুন ডিভিশন সৃষ্টি করে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ও পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত কর্মকর্তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, অন্যদিকে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করে সামরিক বাহিনীকে এক দক্ষ বাহিনীতে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

তৃতীয়, পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হন।

চতুর্থ, দেশে বেসামরিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করে এলিট কর্মকর্তাদের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

সর্বশেষ, শাসনক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা চিহ্নিত করে সিভিল সার্ভিসের মধ্যে এক ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতি গঠনমূলক (Nation building) প্রতিষ্ঠান রচনায় তিনি অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন।

প্রথম, তিনি দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও টেকনোক্র্যাটদের সমন্বয়ে এক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন এবং ইচ্ছাপূর্বক রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তার কারণ ছিল অনেক। যখন তিনি রাজনৈতিক দল বিধি (PPR) প্রবর্তন করে দল রেজিস্ট্রীকরণের আহ্বান জানান তখন কমপক্ষে ৫৩টি রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসে, যদিও অধিকাংশের সমর্থন–ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি।

দ্বিতীয়, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল খুব বেশি। তিনি বহুবার গণতন্ত্রের প্রতি সেই আস্থা প্রকাশ করেন। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি ঘোষণা করেন ঃ "আমি এবং আমার সরকার গণতন্ত্রের উপর পূর্ণরূপে আস্থাশীল এবং যথাসময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার প্রতিষ্ঠায় আমরা দৃঢ়সংকল্প।" এই লক্ষ্যে তিনি তাঁর আর্থ সামাজিক ১৯–দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল এবং তার ভিত্তিতে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে এক গণভোটের ব্যবস্থা করেন। গণভোটে বিপুলভাবে সমর্থিত হয়ে তিনি দেশে বে–সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেন। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের (জাগদল) ভিত্তি পত্তন করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা তাঁর বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বি. এন. পি.) সূচনা হয়।

তৃতীয়, তিনি ১৯৭৮ সালের ৩ জুনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে বাংলাদেশে আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

চতুর্থ, তিনি সামরিক শাসন থেকে বিভিন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু যে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করেন তাই নয়, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কিছু কিছু নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh Nationalist Party : BNP) এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি। তার নেতৃত্বে জাতীয়বাদী ছাত্রদল, জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, জাতীয়তাবাদী যুব দল এবং যুব কমপ্লেক্স (Youth Complex) এবং গ্রামাঞ্চলে গ্রাম সরকার (Gram Sarkar) সৃষ্টি করে বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ এবং তাদের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার পন্থা নির্দেশ করেন।

এই দিক থেকে বলা যায়, জিয়া সরকারের আমলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে এই সম্পর্কে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, তিনি নিজে একজন সামরিক কর্মকর্তা এবং এই হিসেবে ক্ষমতা লাভের পর সামরিক বাহিনীকেই তিনি শক্তিকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি নিজেও বসবাস করতেন সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধানের বাসভবনে। মন্ত্রিপরিষদে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে, এমন কী তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচিত জাতীয় সংসদে ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক কর্মকর্তা।

দ্বিতীয়ত, তাঁর উন্নয়নমুখী কর্মসূচীর ফলে জনগণের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, গ্রাম সরকার বা যুব কমপ্লেক্স স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে নি। সবকিছু জেনারেল জিয়াকে কেন্দ্র করে প্রাণ পায়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিকতার গতি প্রাণবন্ত হয়নি।

উপসংহারে এও বলা যাইত যে, জিয়াউর রহমান একদিকে যেমন ছিলেন একজন কৃতি সংগঠক, একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়কও। তিনি বর্তমানে শক্তভাবে পা রেখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্পে ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। একজন সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যা করেছেনে তার তুলনা নেই।

১। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানের কারণ কী কী? (What were the reasons that led to the 15 August Coup?)

২। জিয়াউর রহমান কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেন? (How did Zia get into political power?)

৩। জিয়ার সামরিক আইন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (Describe the characteristics of Martial Law Administration of Ziaur Rahman.)

৪। জিয়া সরকারের আর্থ-সামাজিক নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (Discuss the socio-economic policies of Zia Government.)

৫। জিয়া আমলে সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিবরণ দাও।(Describe the constitutional changes that took place during the Zia Regime.)

৬। জিয়া সরকারের বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা কর। (Disucss the civilianization process of the Zia Government.) [D. U. 1984]

৭। জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the foreign policies of the Zia Government?)

বাংলাদেশে সামরিক শাসন ঃ এরশাদ সরকার

MARTIAL LAW IN BANGLADESH : ERSHAD GOVERNMENT

সূচনা ঃ

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর একাংশের বিদ্রোহজনিত সংকটে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন। পরে সংবিধানের ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বাংলাদেশের অষ্টম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মাত্র ৪ মাস পরেই সাত্তার সরকারকে পদচ্যুত করে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে। এই অধ্যায় জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর কারণ,১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা লাভ ও তাঁর কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলো।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিলেন তখন ভোর রাত্রিতে প্রায় ২০ জন সামরিক কর্মকর্তার একটি বিদ্রোহী দল ঝটিকা আক্রমণে রাষ্ট্রপতির প্রহরীদের পর্যুদস্ত করে নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে। তারপর বিদ্রোহীরা চট্টগ্রাম রেডিও থেকে চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি ও সি ৪১ বছর বয়স্ক মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরের নেতৃত্বে ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি বিপ্লবী পরিষদ (Revolutionary Council) গঠনের কথা ঘোষণা করে। বিপ্লবী পরিষদের নামে জারিকৃত ১৩টি নির্দেশে বাংলাদেশ সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদ এবং মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। এ অর্থে তা ছিল একটি সামরিক অভ্যুথান এবং চট্টগ্রাম নগরী ও চট্টগ্রাম সেনাছাউনি দুদ্দিন ব্যাপী ছিল বিপ্লবী পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে দেশের সাংবিধানিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৯৮১ সালের ৩০ মে সকালে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং অভ্যুথানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধান মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ সাত্তার সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। ঐ দিকে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের জেনারেল মঞ্জুরের সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান বাহিনীর মোকাবিলার জন্য জেনারেল মঞ্জুরের সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান বাহিনীর মোকাবিলার জন্য জেনারেল মঞ্জুর তার সমর্থকদের ফেনীর নিকট ঢাকা—চট্টগ্রাম মহাসড়কের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে

আত্মসমর্পণ করে। ফলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য সমর্থন না পেয়ে দলবলসহ জেনারেল মঞ্জুর সব প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন এবং অবশেষে ১৯৮১ সালের ১ জুন তিনি বন্দী হন ও পরে নিহত হন। এভাবে জেনারেল মঞ্জুরের অভ্যুত্থানের সমাপ্তি ঘটে।

জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর কারণ হিসেবে কয়েকটি "ষড়যন্ত্র তত্ত্বের" (Conspiracy Theory) অবতারণা করা হয়েছিল। **প্রথম,** ভারতীয় সাংবাদিক জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন, ১৯৮১ সালের ৩০ মে'র অভ্যুত্থানের ফলে জিয়ার মৃত্যু এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিনা বিচারে আবুল মঞ্জুরের মৃত্যু একটি ষড়যন্ত্রের ফল।" এই ষড়যন্ত্র ছিল পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত কিছু সামরিক কর্মকর্তা ও কিছু রাজনৈতিক নেতৃবর্গের। তাঁরা বাংলাদেশে পাকিস্তান পন্থীদের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ও আবুল মঞ্জুর নিহত হন এবং মীর শওকত আলী সামরিক বাহিনী থেকে বহিষ্কৃত হন।[১] এই তত্ত্ব তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা এই তত্ত্বে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান খান বলেন, ঐ সময়ে জিয়া 'সনাতন ক্ষমতা কাঠামোয়' এমন সব পরিবর্তন সূচিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন যা তদানীন্তন "সামরিক-বেসামরিক-শিল্পপতিদের সমন্বয়ে সংগঠিত শাসনকারীদের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়। তাই তারা ষড়যন্ত্রমূলক পন্থায় জেনারেল জিয়ার ধ্বংস সাধন করে সনাতন শাসকদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করেন।"[২] এই তত্ত্বও তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা জেনারেল জিয়া এমন কোন বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি যা ক্ষমতার অধিকারীদের সন্ত্রস্ত করতে পারে।

জিয়া হত্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার দুটি ট্রাইব্যুনাল এবং একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেন। তদন্তকারী ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন মেজর জেনারেল মোজাম্মিল হোসেন এবং সাত সদস্য বিশিষ্ট ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শালের সভাপতি ছিলেন মেজর জেনারেল আব্দুর রহমান। বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনের নেতৃত্বদান করেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রুহুল ইসলাম। সরকারি ভাষ্যে বলা হয়, মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর ছিলেন সমগ্র হত্যাকাণ্ডের নায়ক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং জেনারেল জিয়ার তীব্র সমালোচক। তিনি পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সুপরিকল্পিতভাবে সংহত করেন এবং যেহেতু জেনারেল জিয়া প্রত্যাগত কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতার বন্ধনে ছিলেন আবদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে ছিলেন লিপ্ত, তাই তিনি জেনারেল জিয়াকে হত্যা করে দেশের সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

জেনারেল কোর্ট মার্শাল বিভিন্ন পদমর্যাদার ৩১ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচার করে ১৯৮১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

১। Jyoti Sen Gupta; *Bangladesh : In Blood and Tears*, New Delhi: 1981

২। Zillur Rahman, *Martial Law to Martial Law*, Dhaka : 1984

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৮১

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। সংবিধানের ১২৩ (২) ধারামতে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। সংবিধানের এই ধারা মোতাবেক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ধার্য করেন ১৯৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।

২১ সেপ্টেম্বর অবশ্য এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। কেননা বিরোধী দলসমূহ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের কয়েকটি পূর্বশর্ত আরোপ করে। শর্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তিদান এবং সকল দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ। এই সকল দাবির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হয় ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর। ১৫ই নভেম্বর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে প্রার্থী

এই নির্বাচনে সর্বমোট ৮৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেন। চূড়ান্ত বাছাই পর্বে ১১ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। পরবর্তীকালে ৩৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন এবং ৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে এই নির্বাচনে সর্বমোট ৩১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বিচারপতি আবদুস সাত্তার

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মনোনীত হন। উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে যেহেতু তিনি লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থেকে যেহেতু নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্ভব নয় এজন্য ১৯৮১ সালের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী আইন প্রণয়ন করেন। এর ফলে ঘোষিত হয় যে, উপরাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকলে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে গণ্য হবে না। এভাবে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি জেনারেল জিয়া প্রবর্তিত ১৯-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

কামাল হোসেন

দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ডঃ কামাল হোসেন। তিনি এই নির্বাচনে ১৭-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন, সকল কালাকানুন বাতিল, কৃষি, শিল্প ও সমবায় ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নীতি প্রবর্তন, বৈদেশিক ঋণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার, দেশে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন।

জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

নাগরিক কমিটি, আওয়ামী লীগ (মিজান), মজদুর পার্টি ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম. এ. জি. ওসমানী। তিনি ১৯৮২ সালের সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বতন্ত্রীকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নীতি প্রভৃতি কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন।

মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর)

ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি, জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টির সমন্বয়ে গঠিত উলেমা ফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর)। তিনি নির্বাচন উপলক্ষে ১৮-দফা কর্মসূচির ঘোষণা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি প্রবর্তন, খোলাফায়ে রাশেদিনের অনুকরণে সর্বজনীন প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে মজলিসে সূরা বা জাতীয় সংসদ গঠন, সুদমুক্ত শোষণহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইসলামী বিশ্বের সাথে অধিক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গঠন।

এম. এ. জলিল

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), ওয়ার্কার্স পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দলের সমন্বয়ে গঠিত ত্রি-দলীয় ঐক্য ফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক এম. এ. জলিল। তিনি যে কর্মসূচি দেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—সংবিধানের চতুর্থ ও পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংখ্যানুপাতে সংসদে পেশাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, জনগণের চিকিৎসা নিরাপত্তা, শিক্ষা ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ, ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের সহযোগে কর্মী শিবির গঠন, পাট শিল্প ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ, বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

তাছাড়াও এই নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মোজাফফর আহমদ, পিপলস্ লীগের ডঃ আলিম-আল রাজী এবং সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোয়াহা প্রার্থী ছিলেন। তবে এই নির্বাচনে দুজন প্রার্থীর মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সরকারি দলের প্রার্থী জিয়াউর রহমান ও আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেন দেশের প্রায় সর্বস্থানে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করেন।

নির্বাচনের ফলাফল

দেশের সর্বমোট ৩,৮০,৫১,০১৪ (তিন কোটি আশি লক্ষ একান্ন হাজার চৌদ্দ) জন ভোটদাতার শতকরা ৫৫·৪৭ ভাগ অর্থাৎ (দুই কোটি ষোল লক্ষ সাত হাজার দুইশত তিপান্ন) জন ভোট দান করেন। প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬৫·৮০ ভাগ ভোট লাভ করে (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সতর হাজার ছয় শত এক—১,৪২,১৭,৬০১) জাতীয়তাবাদ দালের প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জয়যুক্ত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন। তিনি সর্বমোট ভোটের শতকরা ২৬·৩৫ ভাগ (ছাপান্ন লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশত চুরাশী—৫৬,৯৪,৮৮৪) ভোট লাভ করেন। হাফেজ্জী হুজুর, এম. এ. জি ওসমানী ও মেজর এম. এ. জলিল লাভ করেন।—যথাক্রমে ৩,৮৭,২১৫; ৩,০২,০০৩ এবং ২,৪৯,৩৪০টি ভোট যা ছিল সর্বমোট ভোটের যথাক্রমে শতকরা .৭০, ১·৪০ ও ১·১৫ ভাগ।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও অন্যান্য প্রার্থীরা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনয়ন করেন। সরকার অবশ্য এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৮২ সালের সামরিক শাসন

পূর্বে বলা হয়েছে কোন দেশে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। **প্রথম,** সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব। **দ্বিতীয়,** সামরিক বাহিনীর সার্বিক স্বার্থ। **তৃতীয়,** দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্দল ও দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক এলিটদের জনপ্রিয়তা হ্রাস। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এই প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথম, বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন তা প্রমাণিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ও ১৯৮১ সালের ৩০ মের অভ্যুত্থান বা অভুথান প্রচেষ্টায়। এই সকল অভ্যুত্থান বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার প্রত্যেকটি সংঘটিত হয় সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা। ৩০ মে'র ঘটনা এই দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এই ঘটনার পর সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভাব প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। এর পরোক্ষ ফল হলো সামরিক বাহিনীর মধ্যে এক ধরনের ঐক্যানুভূতি এবং সংহতি। এই ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংহতিবোধ তীব্র হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়, যে কোন দেশে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সার্বিক স্বার্থ দেশের বৃহত্তম স্বার্থের সাথে জড়িত থাকে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শাসনামলে সামরিক বাহিনীর স্বার্থ বিভিন্নভাবে ব্যাহত হয়। মূলত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম লাভ করলেও তা কোন সময় একটি সুসংহত দলে রূপান্তরিত হয় নি। জন্মক্ষণ থেকে এই দল ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু সংখ্যক নেতার সম্মিলিত প্ল্যাটফরম মাত্র। পিকিংপন্থী জাতীয় আওয়ামী পার্টির একাংশ, মুসলিম লীগ, ইউ পি. পি. দলের কিছু নেতা, বাংলাদেশ শ্রমিক দলের কিছু কর্মী এবং তফসিলী ফেডারেশনের একাংশের সহযোগে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলটি দুটি সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তাদের একটি ছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্ব এবং অন্যটি ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার আকর্ষণ। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরই তাই জাতীয়তাবাদী দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। দলীয় সংহতি রক্ষার্থে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী হতে হয়, যদিও বয়স ও কর্মক্ষমতা কোন দিক থেকেই তিনি রাষ্ট্রপতির গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। ফলে নির্বাচনের পর মন্ত্রিপরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে দলীয় কোন্দল আরও বৃদ্ধি পায়। দূর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। দেশের সর্বস্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এভাবে দেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

তৃতীয়, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাসন ব্যবস্থায় বে-সামরিকীকরণের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তা ছিল সামরিক ও বে-সামরিক কর্মকর্তাদের আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে। ফলে সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ শাসন ব্যবস্থা ও সরকারের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান ছিলেন। বি. এন. পি. সরকারের দুর্বলতা ও জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুযোগে তারা প্রকাশ্যভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বরের নির্বাচনের পর ২৮ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ৪২-সদস্য বিশিষ্ট এক মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে ও দূর্নীতির ব্যাপকতায় তিনি মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তাঁর মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করেন। বাতিল ঘোষণাকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, "সামগ্রিকভাবে প্রশাসন ব্যবস্থাকে দূর্নীতি ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি বাধ্য হন।" ১৯৮২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮-সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিপরিষদ তিনি গঠন করেন। কিন্তু এতে অবস্থার উন্নতি হয় নি, বরং সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বুধবার বাংলাদেশে সামরিক বাহনীর স্টাফ প্রধান জেনারেল এরশাদ সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক আইন জারির কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "যেহেতু দেশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যখন অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেসামরিক প্রশাসন কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সকল স্তরে সীমাহীন দুর্নীতি জীবনের অংশ হওয়ায় জনগণের জন্য দুর্বিসহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে সম্মানজনক জীবন যাপন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। দেশের জনগণ চরম হতাশায় দিশাহারা অবস্থায় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর তার দায়িত্ব বর্তায়।

সাত্তার সরকারের ব্যর্থতা

কি কি কারণে সাত্তার সরকার ব্যর্থ হয় তা জানাও প্রয়োজন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬৫·৮০ ভাগ ভোট লাভ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যে তাঁকে দু বার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে হয় এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়।

সাত্তার সরকারের ব্যর্থতার কারণ

বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের সরকার বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়েছে ঃ

(১) দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঃ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার নিজেই বলেছেন, "সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের অনেকেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা ও দেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে নির্লিপ্ততা এবং দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে দেশের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।"

(২) সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতি ঃ ১৯৭৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদটি যেভাবে সুসজ্জিত হয় তা অত্যন্ত দক্ষ, কর্মক্ষম ও নিপুণ প্রশাসকের জন্যই ছিল সমধিক উপযোগী। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তাঁর বয়স এবং অন্যান্য কারণে এই পদের জন্য মোটেই যোগ্য ছিলেন না।

(৩) দলীয় কোন্দল ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় তাও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠে। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে দলের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নে ব্যর্থ হন।

(৪) দেশে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঃ দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটে তার ফলে শান্তিপূর্ণভাবে সৎ নাগরিকদের পক্ষে জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় অনেক দুষ্কৃতকারী অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়।

(৫) অর্থনৈতিক সংকট : দেশে অর্থনৈতিক সংকটের যে কালো ছায়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় তাও এই সরকারের পতনের জন্য দায়ী। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেন, "আর এক সপ্তাহ পর সামরিক আইন জারি করা হলে কিছু লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করত।"

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন এবং সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। তিনি দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

এই ঘোষণা অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ সরকার ও শাসন ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং নৌ-বাহিনী প্রধান রিয়ার এ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। তিনি ১৯৮২ সালের ২৭শে মার্চ বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

জেনারেল এরশাদ সমগ্র দেশকে পাঁচটি সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং পাঁচজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। এই অঞ্চলগুলো নিচে উল্লেখিত পন্থায় গঠিত হয়।

(ক) অঞ্চল : ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল ও জামালপুর সহযোগে এই অঞ্চল গঠিত হয়। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন নবম পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল আবদুর রহমান।

(খ) অঞ্চল : এই অঞ্চল গঠিত হয় বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা ও রাজশাহী সমন্বয়ে। একাদশ পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল আর এ. এম. গোলাম মোক্তাদির নিযুক্ত হন এই অঞ্চলে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক।

(গ) অঞ্চল : চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগাম এবং বান্দরবন নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত হয়। এর আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল আবদুল মান্নাফ।

(ঘ) অঞ্চল : কুমিল্লা, সিলেট ও নোয়াখালী সমন্বয়ে এই অঞ্চল গঠিত হয় এবং এর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ৪৪তম পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল আবদুস সামাদ।

(ঙ) অঞ্চল : এই অঞ্চলের অন্তর্গত হয় যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুর। এর আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন ৫৫তম পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ।

জেনারেল এরশাদ সমগ্র দেশকে শুধু পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন তাই নয়, তিনি আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের নিজ নিজ অঞ্চলের উপ-আঞ্চলিক ও জেলা সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেন এবং সামরিক আইনকে সর্বতোভাবে বলবৎ করার নির্দেশ দান করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আরও ঘোষণা করেন, সামরিক আইন দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে পরিগণিত হবে।

সামরিক আইন প্রশাসকের উপদেষ্টা পরিষদ

পরবর্তী পর্যায়ে জেনারেল এরশাদ প্রশাসনকে আরও দক্ষ ও কর্মক্ষম করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council) গঠন করেন। প্রথমে উপদেষ্টাবৃন্দ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১২-সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। পরে তার সদস্য সংখ্যা হয় ১৪।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের সম্পর্কে বলা যায়, তাঁরা সকলেই ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও ব্যবহারবিদ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ।

এরশাদ সরকারের কার্যক্রম

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ১১ এপ্রিল তাঁর সরকারের ৫ দফা কার্যক্রমের বিবরণ দান করেন। এগুলো ছিল ঃ **(এক)** শতকরা ৭% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন; **(দুই)** সরকারি পর্যায়ে অপচয়মূলক ব্যয় রোধ; **(তিন)** বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দান; **(চার)** অতি সত্বর খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন; **(পাঁচ)** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই পাঁচদফা কর্মসূচিকে বিস্তৃত করে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তা নিম্নরূপ ঃ

(১) সচিবালয় পুনর্বিন্যাস ঃ দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য সচিবালয়ের কাঠামো ও কার্যাবলির পুনর্বিন্যাস সাধন করা হয়। জিয়া সরকারের আমলে বিদ্যমান ৪৫টি মন্ত্রণালয় এবং ৬০টি বিভাগের স্থলে ২৬টি মন্ত্রণালয় এবং ৪৫টি বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া, সর্বস্তরে বিদ্যমান ১৫৫টি জনসংস্থাকে (Public Corporation) পুনর্বিন্যস্ত করে ১০৯টিতে নামিয়ে আনা হয়।[১]

(২) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ঃ ১৯৮২ সালের ২৮ এপ্রিল প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি গঠন করা হয় এবং তার সুপারিশক্রমে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সনাতন থানা প্রশাসনকে উন্নীত করে, থানাকে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, থানা পর্যায়ে প্রচুর সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ করে এবং থানা পরিষদে নির্বাচিত প্রধানের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর প্রথম পর্যায়ে ৪৫টি থানাকে উন্নীত করে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর বিভিন্ন পর্যায়ে থানা প্রশাসন উন্নীত হয়। ৪৬০টি থানা উপজেলায় উন্নীত হয়েছিল। ১৯৮৩ সালের ১৪ই মার্চ থানার নামকরণ হয় উপজেলা।[২]

(৩) মহকুমাকে জেলায় উন্নীতকরণ ঃ প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দেশের কিছু সংখ্যক মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা হয় ৬৪। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে এক দিকে যেমন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থানীয় পর্যায়ে প্রণীত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

১। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়, *New Horizon*, ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠায়—১।

২। উপজেলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন **"স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যায়।"**

(৪) বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ বিচার ব্যবস্থাকে সহজলভ্য ও দক্ষ করার লক্ষ্যে এরশাদ সরকার দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল ঃ **(এক)** প্রত্যেক উপজেলায় স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল আদালত উপজেলায় সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক (regulative) কার্যালয়। তাদের উপর উপজেলা পরিষদের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। **(দুই)** দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী রংপুর, যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক রায়ে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়।

(৫) শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী এবং উৎপাদনমুখী করার জন্য এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারটি স্তরে বিন্যস্ত—মৌলিক স্তর, প্রস্তুতি স্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চশিক্ষা—শিক্ষানীতির মৌল উপাদান ছিল সাক্ষরতা, দায়িত্বশীলতার পাঠ, বৃত্তিমূলক এবং মানসিক প্রবৃদ্ধি ও দক্ষতা অর্জন। তাছাড়া, প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা, আরবী এবং অন্যান্য পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিভিন্ন কারণে এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশে বিক্ষোভ দেখা দেয়। নতুন শিক্ষানীতি চালু করার পূর্বে তাই জনমত যাচাই ও নতুনভাবে তা পুনর্গঠনের প্রয়াস সরকার গ্রহণ করেছেন।

(৬) শিল্পনীতির পরিবর্তন ঃ শিল্প ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে এরশাদ সরকার দেশের শিল্পনীতিতে পরিবর্তন সাধন করেছেন। জিয়া সরকার কর্তৃক সূচিত বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দান প্রক্রিয়া এরশাদ সরকার অব্যাহত করেছেন, কেননা ১৯৮৪ সালের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ বেসরকারি মালিকানায় ফেরত দেয়া হয়। বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৮২—৮৫ সালের মধ্যে ১৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ফলে অবাধ বিনিয়োগ খাতের সংখ্যা ২২ থেকে ৪৯ হয়েছিল এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অধিক উৎসাহিত করা হয়। ব্যবস্থাপনার অগ্রগতিও সাধন করা হয়।

(৭) কৃষির অগ্রগতি ঃ কৃষি খাতকে অধিক উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষির সার্বিক উন্নতির চেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে সেচ ব্যবস্থার অগ্রগতি, কৃষি ঋণ বিতরণ, উত্তম বীজ ও সারের ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। অন্যদিকে, কৃষকদের উৎসাহ দানের জন্য কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

(৮) ভূমি সংস্কার ঃ ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের অবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ৯-সদস্য বিশিষ্ট একটি ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী এ, জেড. এম. ওবায়দুল্লাহ খান। ১৯৮৩ সালের ২০ মার্চ কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেন। কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে দেশে ভূমি সংস্কার সাধিত হয়। ভূমি মালিকানার সীমা নির্ধারণ, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন, বর্গা চাষীদের অধিকার সংরক্ষণ, ভূমি শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ ছিল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

(৯) ঔষধ নীতি নির্ধারণ ঃ এরশাদ সরকার ডঃ নূরুল ইসলামকে সভাপতি করে ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেশে ঔষধ নীতি নির্ধারণ করেন। এই কমিটি দেশে ব্যবহার উপযোগী ১৫০টি ঔষধের নাম সুপারিশ করেছেন এবং প্রায় ১৭০০টি ঔষধের আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাছাড়া, ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার এক প্রকল্প গ্রহণ করেন।

সরকারের আঠার-দফা

সামরিক সরকার জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের এক পরিকল্পনা রচনা করেন। আঠার-দফা তার পরিচায়ক। ১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ কুমিল্লায় জেনারেল এরশাদ তাঁর ১৮-দফা কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ১৮-দফা কর্মসূচি নিম্নরূপ ঃ

(১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা ঃ দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে এবং অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জন করে জনগণের নিকট রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করে তোলা।

(২) ইসলামিক আদর্শ ও মূল্যবোধ ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সাম্য, সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সততা ও ন্যায়বিচারের ন্যায় ইসলামিক আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিফলনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির যথোপযুক্ত চর্চার মাধ্যমে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা।

(৪) জাতীয় সংহতি ঃ জনসাধারণের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি নিশ্চিত করা।

(৫) অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান ঃ দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে প্রত্যেকের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের মত মৌলিক চাহিদা মিটানো।

(৬) বাসস্থান ঃ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গৃহের মত মৌলিক চাহিদার সন্তুষ্টি বিধান।

(৭) শিক্ষা ঃ দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করে, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে এবং শিক্ষার মান উন্নত করে এ দেশের উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

(৮) স্বাস্থ্য ঃ সকল নাগরিকের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক কর্মসূচির ব্যাপক বৃদ্ধি এবং প্রত্যেক উপজেলায় আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের ব্যবস্থা।

(৯) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঃ শিল্প, কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রসার এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তির দেশে এবং বিদেশে চাকরির পথ সুগম করা।

(১০) কৃষির অগ্রগতি ঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুলভে সেচ ব্যবস্থা, সার ও উন্নত বীজ সরবরাহ এবং কৃষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রযুক্তির প্রসার। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা।

(১১) ভূমিসংস্কার ঃ ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, ভূমি-মালিক এবং বর্গাদারদের মধ্যে উৎপাদনের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভূমি-মালিকানার সর্বোচ্চ সীমারেখা নির্ধারণ, ভূমিহীনদের অ-হস্তান্তরযোগ্য ভূমি প্রদান এবং কৃষি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ।

(১২) জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন ঃ স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের ব্যবধান হ্রাস করা। এই লক্ষ্যে শিল্পক্ষেত্রে বে-সরকারি মূলধন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে সুষম সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(১৩) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল লাভের জন্য জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ এবং পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। তাই দুই বছরের জরুরী কর্মসূচির ভিত্তিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১·৫ ভাগে নামিয়ে আনা।

(১৪) নারীদের পূর্ণ মর্যাদা দান ঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা।

(১৫) দূর্নীতির অবসান ঃ দূর্নীতি দমনের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ থেকে দূর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা এবং এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

(১৬) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের মূল সুদৃঢ় করার জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিটি উপ-জেলায় ও ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তাবায়নের দায়িত্ব অর্পণ এবং পর্যায়ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৭) বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ জনসাধারণের নিকট ন্যায্যবিচার সহজলভ্য করার জন্য বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা।

(১৮) নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ঃ দেশের সর্বাধিক কল্যাণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার মহান লক্ষ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা। এই লক্ষ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বজায় রাখা, মুসলিম দেশগুলোর সাথে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বের সকল দেশের সাথে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে সুসংহত করা।

এরশাদ সরকারের বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া
Civilianisation by Ershad Government

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখলের পরই জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি তাঁর সামরিক শাসনকে জনগণের সামরিক শাসন রূপে আখ্যায়িত করেন। তাই তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন।

(১) ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন ঃ জেনারেল এরশাদ এই লক্ষ্যে **ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ** ১৯৮৩ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের ৪,৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৯৮৪ সালের জানুযারি মাসে। তাছাড়া ৭৬টি পৌরসভা ও ৩টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

(২) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন ঃ উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত চেয়ারম্যান দ্বারা উপজেলা পরিষদ পরিচালনার জন্য ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। দেশের বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার মুখে সেই নির্বাচন স্থগিত হয়। রাষ্ট্রপতি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করেন ১৯৮৫ সালের ১৬ এবং ২০ মে। এই নির্বাচনে দেশের

৪৬০টি উপজেলায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নির্বাচনে ভোটারদের স্বল্প উপস্থিতি এবং সরকারের অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই নির্বাচন তীব্রভাবে সমালোচিত হয়, তবে উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

(৩) সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ ঃ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দেশের স্থগিত সংবিধানের বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য করেন ১৯৮৪ সালের ২৭ মে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ১৫-দলীয় ঐক্যজোট, ৭-দলীয় জোট এবং জামাতে ইসলামের বিরোধিতার মুখে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয় ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর। বিভিন্ন বিরোধী দলের বিরোধিতার মুখে এ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় নি। তারপর রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের দিন পুনরায় ধার্য করেন ১৯৮৫ সালের ৬ই এপ্রিল। এই নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় নি।

(৪) গণভোট অনুষ্ঠান ঃ এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৮৫ ১লা মার্চ **সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত** না হওয়া পর্যন্ত জেনারেল এরশাদকে **রাষ্ট্রপতি** হিসেবে এবং **তাঁর কর্মসূচিকে জনগণ সমর্থন করেন কি না তা যাচাই-এর জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ এক গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। এই গণভোটে** (Referendum) **নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৪০ জন এই** গণভোটে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ **করেন। তার মধ্যে জেনারেল এরশাদের প্রতি আস্থাসূচক** ভোটের সংখ্যা ৩ কোটি **২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার** ২৬৪। **অপরদিকে অনাস্থাসূচক ভোটের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ১ হাজার** ২১৭টি। অন্য কথায়, **জেনারেল** এরশাদ প্রদত্ত **ভোটের শতকরা ৯৪·১৪ ভাগ ভোট লাভ** করেন এবং **তাঁর** বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র **শতকরা** ৫·৮৬ ভাগ।

(৫) রাজনৈতিক দল গঠন ঃ জেনারেল এরশাদের বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার আর **একটি উপাদান** তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার একটি রাজনৈতিক দল গঠন। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে জনদল নামে একটি নতুন দলের জন্ম হয়। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক দলটি অংগ সংগঠন হিসেবে ছাত্র সমাজ, যুব সংহতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হয়। এই সকল সংগঠনের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ **নতুন বাংলাদেশ** (A New Bangladesh)—শোষণমুক্ত, কর্মতৎপর, গতিশীল এক সমাজগঠনের সংকল্প করেন।

১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে জনদলের সাথে সংযুক্ত হয় দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অং‥ ‥ কিছু ব্যক্তিত্ব এবং কালক্রমে তা জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় **জাতীয় পার্টি** নামে আত্মপ্র‥ ‥ করে। ১৯৮৬ সালের ৭ মে তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে **জাতীয় পার্টি** সরকারি দল হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

(৬) ১৯৮৬ সালের ৭ই মে সাধারণ নির্বাচন ঃ ১৯৮৫ সালের গণভোট ও উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সমগ্র দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সীমিত পর্যায়ে রাখা হয়। ১৯৮৬ সালের প্রথম থেকে অবাধ রাজনীতির আশ্বাস দিয়ে রাষ্ট্রপতি দেশে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন ২৬ এপ্রিল। কিছুসংখ্যক বিরোধী দলের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৮৬ সালের ৭ মে এবং ঐদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার ছিলেন ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন (৪, ৭৮, ৭৬, ৯৭৯ জন)। ভোটদাতাদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ২ কোটি ৫২ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৮৫ এবং অবশিষ্ট ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৯৪ জন ছিলেন মহিলা। এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনে সর্বমোট ২,১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। প্রার্থীদের মধ্যে ১০৭৪ জন ২৮টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ছিলেন। ৪৫৩ জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। উল্লেখ্য যে, দেশের কয়েকটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নি। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩ আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে গণ্য হয় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসন লাভ করে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিচে প্রদত্ত তালিকায় অন্যান্য দলের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচন

দল	আসনসংখ্যা
১। জাতীয় পার্টি	১৫৩
২। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬
৩। জামায়াতে ইসলাম	১০
৪। বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	৫
৫। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (এন. এ. পি)	৫
৬। মুসলিম লীগ	৪
৭। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৪
৮। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	৩
৯। বাকশাল	৩
১০। ওয়ার্কার্স পার্টি	৩
১১। ন্যাপ (মোঃ)	২
১২। স্বতন্ত্র	৩২
	মোট ৩০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

(৭) জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ১০ জুলাই। অধিবেশনের পূর্বে সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জাতীয় পার্টির সদস্যগণ এই ৩০ আসন লাভ করেন। জাতীয় সংসদ অধিবেশনের পূর্বদিন অর্থাৎ ৯ জুলাই রাষ্ট্রপতি এইচ. এম এরশাদ জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৬—সদস্যের এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১০ জুলাই রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে দেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশ্বাস দেন।

(৮) নতুন মন্ত্রিসভা গঠন ঃ স্থগিত সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা পুনরুজ্জীবিত করে ২৬-সদস্যের এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং এভাবে সাংবিধানিক সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এই ২৬—সদস্যের মন্ত্রিসভায় আরও ছিলেন ৬ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৩ জন উপমন্ত্রী। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতির অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এম, সাইদুজ্জামান একজন মন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতেন।

(৯) বাংলাদেশে সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৬ ঃ ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদের ৬ ঘণ্টা স্থায়ী ১ দিনের অধিবেশনে বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন প্রণীত হয়। ৩৩০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ২২৩ জন সদস্য (জাতীয় পার্টি ২০৮, মুসলিম লীগ—৪, জাসদ (রব)—৪, জাসদ (সিরাজ)—৩, বাকশাল—২ এবং স্বতন্ত্র—২) এই আইনের পক্ষে ভোটদান করেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

এই সংশোধনী আইনের লক্ষ্য ছিল জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর সরকার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত যে সকল বিধিবিধান ও সামরিক আইন জারি করেছেন এবং ঐ সকল বিধিবিধান ও সামরিক আইনের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, তার বৈধতা দান করা এবং সব কিছুকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা। এর পর ঐ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালতে কোন মামলা করা চলবে না। সহজ কথায়, সামরিক শাসনকে বে-সামরিকীকরণই ছিল এই সংশোধনী আইনের লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী এই সংশোধনী আইনকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রথম পদক্ষেপ এবং সাম্প্রতিককালের রাজনীতির এক "উজ্জ্বলতম অধ্যায়" বলে চিহ্নিত করেন, যদিও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এই আইনকে এক "কালো অধ্যায়" বলে আখ্যায়িত করেন।

(১০) সামরিক আইন প্রত্যাহার ঃ তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সপ্তম সংশোধনী আইন গৃহীত হলে সামরিক আইন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ক্ষেত্র তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ এক ভাষণে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সামরিক আইন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ফলে যে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তার অবসান ঘটে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত হয়।

এরশাদ আমলে বিরোধীদলের ভূমিকা

প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে বিরোধীদলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা বিরোধীদলগুলো কোন সময় এককভাবে এবং অধিকাংশ সময় জোট গঠন করে পালন করে। তাই বিরোধী দলের ভূমিকা পর্যালোচনার পূর্বে দলীয় জোট সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ১৫-দলীয় জোট, ৮-দলীয় জোট, ৭-দলীয় জোট ও ৫-দলীয় জোটের ভূমিকা সর্বজন বিদিত।

রাজনৈতিক জোট

রাজনৈতিক জোট বলতে বুঝায় কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীতে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সুসমন্বিত কার্যক্রম। যখন কোন রাজনৈতিক দল এককভাবে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় অথবা লক্ষ্য অর্জনে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তখন রাজনৈতিক জোটের জন্ম হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটাতে অথবা আসন্ন নির্বাচনে সরকারি দলের পতনকে নিশ্চিত করার জন্য জোট গঠিত হয়। এক বা একাধিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে জোটের কার্যক্রম শুরু হয়।

রাজনৈতিক জোট কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হলে অথবা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক জোটের অবসান ঘটে। সমমনা রাজনৈতিক দল জোট গঠন করে। জোটের রাজনীতি বা আন্দোলন সাধারণত নেতিবাচক হয়। এই দেশের রাজনীতিতে জোট গঠনের প্রবণতা সুস্পষ্ট। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট বা বামপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালে গঠিত আওয়ামী লীগের ঐক্য ফ্রন্ট এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জোটের রাজনীতি কোনদিন শুভফল আনয়ন করে না। তথাপি জোট গঠিত হয় এই কারণে যে রাজনৈতিক দলগুলো সাময়িকভাবে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে উদ্যোগী হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলের প্রায় শুরু থেকে বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জোট গঠনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

পনর দলীয় জোট ও সাত দলীয় জোটের সূচনা

১৯৮৩ সালের ১৪ জানুয়ারি কয়েকটি দলের এক যুক্ত বিবৃতি প্রণয়নকে কেন্দ্র করে পনর দলীয় জোটের সূচনা হয়। মাওলানা মান্নান পরিচালিত শিক্ষক সমিতির এক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রপতির এক বক্তব্যের প্রতিবাদে এই বিবৃতি রচনা করা হয়। তখন সামরিক আইনের অধীনে দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল। তাই আ স ম আব্দুর রব, হায়দার আকবর রনো, রাশেদ খান মেনন ও সিদ্দিকুর রহমানের উদ্যোগে মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের বাসভবনে ১৯৮৩ সালের ১৬ জানুয়ারি সর্বদলীয় নেতৃবর্গের এক সভা আহ্বান করা হয়। ঐ সভায় ১৫ দলের এক বিবৃতি তৈরি হয়। এভাবে পনর দলীয় জোটের জন্ম হয়, যদিও ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেয় ১৪টি দলের নেতৃবর্গ। স্বাক্ষরকারী দলগুলো ছিল আওয়ামী লীগ (হাসিনা), আওয়ামী লীগ (মিজান), জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ, কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল, মজদুর পার্টি, সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), সাম্যবাদী দল (আব্বাস), সিপিবি, ন্যাপ (মাঃ), ন্যাপ (হারুন), একতা পার্টি ও গণ আজাদী লীগ। পরে আওয়ামী লীগ (ফরিদ গাজী) যোগ দিলে তা পনর দলে রূপলাভ করে।

গত কয়েক বছরে ১৫ দলের সংখ্যা কখনও বৃদ্ধি পেয়েছে, কখনও হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু পনর দল নামটি রয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে বাকশাল গঠন, বাসদের দ্বিধা বিভক্তি, ওয়ার্কার্স পার্টির ভাঙ্গনের ফলে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর জোট ত্যাগ, দুই সাম্যবাদী দলের একত্রীকরণ, দুই ন্যাপ ও একতা পার্টির একত্রীকরণের ফলে সংখ্যা কমেছে।

পাঁচ দলীয় জোটের জন্ম

১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ দেশে সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পনর দলীয় জোট ভেঙ্গে যায় এবং ফলে আট দলীয় জোট ও পাঁচ দলীয় জোটের উৎপত্তি হয়। দেশে সামরিক শাসন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে এই বিভক্তি দেখা দেয়। নির্বাচনে যে সকল দল অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের সমষ্টি আট দলীয় জোট। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ন্যাপ,

বাকশাল, সাম্যবাদী দল, ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল), জাসদ (সিরাজ) ও গণ আজাদী লীগ। ওয়ার্কার্স পার্টি (বাশার–মেনন), জাসদ (ইনু), বাসদ (মাহবুব), বাসদ (খালেকুজ্জামান) ও কৃষকশ্রমিক সমাজবাদী দল নির্বাচনের অসম্মতি জ্ঞাপন করে জোট থেকে বেরিয়ে আসে এবং পাঁচ দলীয় জোট গঠন করে। ১৯৮৬ সালের পর থেকে এই পাঁচদলীয় জোট এ ভাবেই থাকে।

সাত দলীয় জোট

যখন পনর দলীয় জোটের সূত্রপাত ঘটে তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐ জোটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বি. এন. পি.), অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু বি. এন. পি. পনর দলীয় জোটে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে একই কর্মসূচীর ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র মঞ্চ থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করে বি. এন. পি, জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান), ইউ. পি. পি. (কাজী জাফর), কম্যুনিষ্ট লীগ, কে. এস. পি. (আজিজুল হক), গণতান্ত্রিক পার্টি এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নূরুর রহমান) ১৯৮৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সাত দলীয় জোটের ভিত্তি রচনা করে। পনর দলীয় জোটে যেমন সব সময় ১৫টি দল থাকে নি, সাত দলীয় জোটেও তেমনি সব সময় সাতটি দল থাকে নি। জাতীয় লীগ, ইউ. পি. পি, গণতান্ত্রিক পার্টি এবং কে. এস. পি. সরাসরি সরকারের সাথে যোগদান করে। তবে এই জোটে বি. এন. পি'র প্রাধান্য সব সময় প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন জোটের কর্মতৎপরতা

পনর দলীয় ও সাত দলীয় জোট ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ৫–দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যুগপৎ আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ৫–দফা দাবি উভয় জোটকে অনুপ্রাণিত করে। এই দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নির্বাচনের পূর্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাষ্টপতি নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন, সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দান। এই জোটের সাথে সমান্তরাল আন্দোলনে যোগ দেয় জামায়াতে ইসলাম।

দুই জোটের প্রভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল। আন্দোলনের ফলে সরকার ১ এপ্রিল থেকে প্রথমে ঘরোয়া রাজনীতি এবং পরে নভেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির দাবি মেনে নেয়।

১৯৮৩ সালের নভেম্বরে প্রকাশ্য রাজনীতির দাবি স্বীকৃত হলে বিরোধী জোটসমূহ ৫–দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলনের ডাক দেয় এবং তা বিভিন্ন সময়ে জটিল রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর এমনি এক সংকট সৃষ্টি হয়। বিরোধী দল ও জোটসমূহ ঐদিন সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই অবস্থান ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ লাভ করে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশকে গুলী চালাতে হয়। বহুসংখ্যক ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে রাজনৈতিক তৎপরতা আবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ রেখে সরকার ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। পনর ও সাত দলীয় জোট এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দাবি করে। বিরোধী দলের দাবির মুখে উপজেলা নির্বাচন স্থগিত হয় বটে, কিন্তু সরকার রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের দিন স্থির করে ১৯৮৪ সালের ২৭ মে। বিরোধী দল এই পরিকল্পনা প্রত্যাখান করলে সরকার নির্বাচনের দিন প্রথমে পিছিয়ে দেয় ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিল। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ থেকে সামরিক আইনের বিধিসমূহ কড়াকড়িভাবে পুনরায় আরোপ করা হয়।

সরকার এই সময় অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট ও ১৬ এবং ২০ মে উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে এবং গণভোট ও উপজেলা নির্বাচন উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে আবার ঘরোয়া রাজনীতি এবং ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে অবাধ রাজনীতি প্রবর্তিত হয়। সাথে সাথে আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র দেশে উত্তাল হয়ে উঠে। ৫-দফা দাবি জোরদার করা হয় এবং সারাদেশে সভা-সমিতি এবং হরতাল মিছিলে উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

এই প্রেক্ষাপটে সরকার ঘোষণা দান করে যে, ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন জোটের দাবি ছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা দান এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার। এই অবস্থায় সরকার ঘোষণা দান করে যে, বিরোধী দলসমূহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি পদত্যাগ করবেন, আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ বিলুপ্ত হবে এবং সামরিক আদালতসমূহের অবসান হবে। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নির্বাচনের দিন ধার্য হয় ১৯৮৬ সালের ৭ মে। আওয়ামী লীগের এই সিদ্ধান্তের ফলে পনর দলীয় জোট বিভক্ত হয়ে নির্বাচনের পক্ষে আটদলীয় জোটের সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক পাঁচ দলীয় জোটের জন্ম হয়। বিএনপি'র নেতৃত্বে সাতদলীয় জোট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নি।

তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ১৯৮৬ সালের ১০ জুলাই সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ সংবিধান (সপ্তম) সংশোধন আইন ১৯৮৬ গৃহীত হয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে তিনবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি নিহত হলে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

এই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ করার তারিখ ছিল ১৯৮৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলাম এবং কোন জোট প্রার্থী মনোনয়ন করে নি। এই নির্বাচনে সর্বামোট ১৬ জন প্রার্থী নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। তবে শেষ পর্যন্ত ৪ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। ১২ জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং ধর্মীয় নেতা মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর। অন্যান্য বিরোধী দল এই নির্বাচনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জেনারেল এরশাদ প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮৩·৫৭ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং হাফেজ্জীহুজুর লাভ করেন শতকরা ৫·৬৯ ভাগ ভোট। জেনারেল এরশাদ লাভ করেন ২,১৭,১৭,৭৭৪ ভোট। এক হিসাব মতে, সর্বমোট ভোট দাতার শতকরা ৫৪ ভাগ ভোটার ভোট দেন, যদিও কোন কোন বিরোধী দলের মতে এই সংখ্যা শতকরা ৫-এর বেশি ছিল না।

বিরোধী দল ও বিভিন্ন জোটের নতুন আন্দোলন

তৃতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন সমাপ্ত হয় ১৯৮৭ সালের জুন মাসে। এই অধিবেশনে জেলা পরিষদ বিলটি গৃহীত হয়। এই বিলে জেলা পরিষদে সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল। সংসদে বিতর্কের সময় এই শর্তটি তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতিতে এই বিল গৃহীত হয়। ফলে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৯৮৭ সালের জুলাই-আগস্ট বিরোধী দলীয় জোটগুলো নতুন আন্দোলনের সূচনা করে, তবে দেশে অভূতপূর্ব বন্যার ফলে তা তেমন প্রবল হয়ে ওঠে নি।

১৯৮৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে এই আন্দোলনের গতিধারা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিমাসে গড়ে ১৫ দিন ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, এবং দুবার ধর্মঘটের স্থিতিকাল ৩৬ ঘণ্টার উর্ধ্বে ছিল। সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। সরকারি সম্পদ ধ্বংস, অফিস-আদালত জোরপূর্বক বন্ধ রাখা, বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের হয়রানি প্রভৃতির মাধ্যমে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন জোট ও বিরোধী দলগুলো অতীতের ৫ দফার পরিবর্তে আকস্মাৎ এক-দফার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠে। এই এক-দফা দাবি ছিল রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। অসংখ্য সভা-সমিতি এবং মিছিলের মাধ্যমে এই দাবি সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রচারিত হতে থাকে। সভা-সমিতি ও মিছিল বোমা-গোলা বারুদের মত আধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ২৭ নভেম্বর সমগ্র দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং ৬ই ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন। সরকার আশা করেছিল, জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিলে এবং নির্বাচন সূচী ঘোষণা করলে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা

ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হবে। এই প্রেক্ষাপটে এক সাংবিধানিক সংকটও দেখা দেয়। জাতীয় সংসদ বাতিল করলে ৯০ দিনের মধ্যে নতুন সংসদের নির্বাচন অবশ্যই অনুষ্ঠিত হতে হবে। অন্যথায় এক ধরনের সাংবিধানিক শুন্যতা সৃষ্টি হবে।

তাই সরকারের নির্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচনের দিন ধার্য করেন এবং পরে তা ৩ মার্চ সুনির্দিষ্ট হয়। আট দলীয়, সাত দলীয় ও পাঁচ দলীয় জোটসমূহ, এমন কি জামায়াতে ইসলাম, সরকারের সব পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলের দিনে ধর্মঘট আহ্বান করে এবং নির্বাচন বানচালের সংকল্প ঘোষণা করে। কোন কোন স্থানে প্রার্থীদের নাজেহাল করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার দেশের ইউনিয়ন পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলোতে নির্বাচনের দিন ধার্য করে ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে। যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্পোরেশনে দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না এ জন্য ঐ পর্যায় বহু প্রাণহানির মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে নি, যদিও সম্মিলিত বিরোধী দল শিরোনামে কিছু সংখ্যক অখ্যাত রাজনৈতিক দল সরকারের পরিকল্পনাকে সফল করতে অগ্রসর হয়।

এই আন্দোলনে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা কারারুদ্ধ হন। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান ও বি. এন. পি'র সভানেত্রীও নিজেদের গৃহে অন্তরীণ হন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি, আ. স. ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল, ফ্রিডম পার্টি, শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে জাসদ (সিরাজ), গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পার্টি ও কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী। তুমুল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু দেশী-বিদেশী পত্র পত্রিকায় এই নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশিত হয়। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী সমগ্র দেশে ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ, কিন্তু ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। বিরোধী দলের মতে এই সংখ্যা শতকরা ৫-এর অধিক ছিল না, যদিও সরকারি হিসাব মতে এই সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ।

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সর্বাধিক সংখ্যক আসন লাভ করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ সংসদে ২৫টি আসন লাভ করে। নিচে ফলাফল দেয়া হলো।

১৯৮৮ সালের নির্বাচনে সংসদে পার্টি ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা

পার্টি	সদস্য সংখ্যা
জাতীয় পার্টি—	২৫১
সম্মিলিত বিরোধী দল—	১৯
ফ্রিডম পার্টি—	২
জাসদ (সিরাজ)—	৩
স্বতন্ত্র—	২৫
	মোট — ৩০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার সাংবিধানিক সংকট এড়াতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু বিরোধী দলগুলোর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই চতুর্থ সংসদের অধিবেশন আহ্বানের দিনও সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৮৮ সালের ১৬ এপ্রিল চতুর্থ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে এবং সংবিধানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আইন গ্রহণ করে। আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো **স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন এবং পল্লী পরিষদ আইন, ১৯৮৯**। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

(এক) জেলা পরিষদ আইন ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদে প্রণীত আইনের একটি স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮। এই আইন গৃহীত হবার পূর্ব পর্যন্ত দেশের পুরাতন ২২টি জেলায় জেলা পরিষদের কাঠামো বিদ্যমান ছিল, কিন্তু দেশের ৪২টি নতুন জেলায় জেলা পরিষদ সৃষ্টি হয় নি। তাছাড়া, যে সব জেলায় জেলা পরিষদ বিদ্যমান ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবার ফলে তাও পরিচালিত হত ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কর্তৃক। তাই দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা পরিষদ গঠন, গঠিত জেলা পরিষদ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন মূলক প্রকল্প সঠিকভাবে তদারকির জন্য ১৯৮৮ সালের স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন প্রণীত হয়।

(দুই) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ঃ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন এই তিনটি পার্বত্য জেলার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে চতুর্থ জাতীয় সংসদ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৮৯ সালের ৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে এই আইন কার্যকর হয়। এই আইনের লক্ষ্য প্রধানত তিনটি ঃ

(ক) উপজাতি অধ্যুষিত অনগ্রসর এই অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(খ) শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে বিশেষ এলাকা হিসেবে এই অঞ্চলকে চিহ্নিত করে এখানকার প্রশাসন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা।

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে উপজাতীয়দের সম্পৃক্ত করা।

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলায় এই আইনে বিশেষভাবে গঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদ বা পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যকর হবে।

(তিন) পল্লী পরিষদ ঃ গ্রামীণ জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এই আইনটি প্রণীত হয়। একজন পল্লীপ্রধান এবং আটজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে পল্লী পরিষদ। পল্লী প্রধান এবং সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। ১৯৮৯ সালের ২০ জুন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে তা হয় ১৯৮৯ সালের ৩৩ নং আইন।

(চার) অষ্টম সংশোধনী আইন ঃ চতুর্থ সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আইন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন এই আইনটি প্রণীত হয়। এই সংশোধনী আইনের ধারাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা ঃ বাংলাদেশের অষ্টম সংশোধনী আইনের ফলে সংবিধানের দুই (২) ধারার পর দুই-ক [২ (ক)] ধারার সংযোজন হবে। ২ (ক) ধারায় বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তি ও সদ্ভাবের পরিবেশ চর্চা করা হবে।"

(২) হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন ঃ এই সংশোধনী আইনে সংবিধানের ১০০ ধারা সংশোধন করে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী আসন বা বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অবশ্য এই সংশোধনী আইনটি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়।

১। রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে কী জান? (What do you know of the assassination of President Zia?)

২। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর। (Discuss the Presidential Election of 1981.)

৩। ১৯৮২ সালের সামরিক শাসনের কারণগুলো কী কী? (What are the reasons that led to the military take over in 1982?)

৪। সাত্তার সরকারের ব্যর্থতার কারণগুলো কী কী? (What are the reasons for the failiure of the Sattar Government?)

৫। এরশাদ সরকারের কার্যক্রমের বিবরণ দাও। (Describe the activities of the Ershad Government.)

৬। এরশাদ সরকারের ১৮–দফা কর্মসূচীর পর্যালোচনা কর। (Analyse the 18-Point Programme of Ershad Government.)

৭। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের বিবরণ দাও। (Describe the General Elcction of 1986.)

৮। ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Describe the fourth National Assembly Election in 1988.)

৯। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণসমূহ চিহ্নিত কর। সামরিক শাসন কী রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে? (Identify the causes that lead to military intervention. Does the martial law help political development?) [N. U. 1997]

বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঃ বি. এন. পি. সরকার

RE-INTRODUCTION OF PARLIAMENTARY SYSTEM IN BANGLADESH

সূচনা
Introduction

দীর্ঘ ষোল বছর পর বাংলাদেশে আবার প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় ব্যবস্থা। শুরু হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের জয়যাত্রা। দীর্ঘ নয় বছর পরে বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের পতন ঘটে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরে। প্রতিষ্ঠিত হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার (Caretaker Government)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন (Free, Fair and Neutral Election)। নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় সংবিধানের একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধন আইন, ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট। একাদশ সংশোধন আইনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পূর্বপদে অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাবার পথ হয় প্রশস্ত। অভূতপূর্ব সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে প্রণীত দ্বাদশ সংশোধন আইনে বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত হয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তা জনগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয় সাংবিধানিক গণভোটে (Referendum)। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হলেন আবদুর রহমান বিশ্বাস, ৮ অক্টোবরে।

১৯৭২ সালের সাময়িক সংবিধান আদেশে (Provisional Constitutional Order, 1972) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় সরকার। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এ ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন টিকে নি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয় এক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় (authoritarian system)। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধন আইনের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতিক সরকারের নামে 'রাষ্ট্রপতিক কর্তৃত্ববাদ' (Presidential Leviathan)। দ্বাদশ সংশোধন আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তিত হলো সংসদীয় সরকার।

জেনারেল এরশাদের পতনের কারণ

জেনারেল এরশাদের উত্থান যেমন নাটকীয় তার পতনও তেমনি। ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবরে পাঁচ, সাত এবং আটদলীয় ঐক্যজোটের সচিবালয় অবরোধের মাধ্যমে শুরু হয় এক দুর্বার গণ-আন্দোলন। ঐ দিন বিকেলে ঢাকার বাইরে এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেছিলেন ঃ 'বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীরা সচিবালয় অবরোধ করতে আজ পথে নেমেছেন। আজকে সত্যই তাঁরা পথে বসেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ "অবরোধ করে সরকার পরিবর্তন করা যায় না। হরতালের মাধ্যমে সরকারের পতন হয় না।"

মাত্র সাত সপ্তাহের মাথায় অবশ্য এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। আন্দোলনের ঢেউ দেশব্যাপী এমন এক উত্তাল গণ-অভ্যুত্থান রচনা করে যার ফলে রাষ্ট্রপতি এরশাদকে পথে বসতে হয়। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ। কেন এমন হলো? এর অনেক কারণ রয়েছে। জেনারেল এরশাদের পতনের মূলে কতকগুলো কারণ প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে এবং কতকগুলো কারণ পরোক্ষভাবে তার ক্ষেত্র রচনা করেছে। তাই এই কারণগুলোকে **প্রত্যক্ষ** এবং **পরোক্ষ** এ দু ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা সঙ্গত।

প্রত্যক্ষ কারণ (Direct Cause)

জেনারেল এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে জনগণের মনে সঞ্চিত হয় ক্ষোভ, ঘৃণা এবং ক্রোধ। ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর থেকে যে অব্যাহত আন্দোলন শুরু হয় তা ঐ ক্ষোভ, ঘৃণা এবং ক্রোধের প্রতিফলন। বিভিন্ন কারণে এ সবের জন্ম হয়। কারণগুলো জনগণের নিকট যতই স্পষ্ট হয়েছে ততই তারা আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ১৯৯০ সালের আন্দোলনে ঐ সকল কারণের সাথে সংযুক্ত হয় সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং স্বতঃস্ফূর্ততা। ফলে ১০ অক্টোবরে যে আন্দোলনের সূচনা হয় ২ নভেম্বর—৪ ডিসেম্বর পর্যায়ে তা গণ-অভ্যুত্থানের আকারে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত ভাসিয়ে দেয় এরশাদের স্বৈরাচারী সরকারকে। তাই বলা হয় গণ-আন্দোলনই এরশাদের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু গণ-আন্দোলনকে প্রভাবিত করে কতকগুলো কারণ পরোক্ষভাবে।

(এক) গণ-আন্দোলন (Popular Uprising)

১৯৯০ সালের ১০ আক্টোবর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৫৫ দিন। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ দিনগুলো অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রত্যেক দিনে ঢাকার রাজপথ ছিল উত্তাল। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ যে কত দৃঢ় হতে পারে তা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। হত্যা, ষড়যন্ত্র কিছুই জনতার অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে বাধা দিতে পারে নি।

১০ অক্টোবরে জেহাদসহ পাঁচজনের হত্যাকাণ্ড যে আগুন জ্বালিয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটে ৪ ডিসেম্বরে, জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের পর। জেহাদের মৃতদেহকে স্পর্শ করে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহ্বানে ৫, ৭ এবং ৮ দলীয় রাজনৈতিক জোটের নেতৃত্ব সংহত হয় নিজেদের সকল বিভেদ ভুলে। আত্মনিয়োগ করে আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে অংশগ্রহণ করেন সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গ—শিক্ষক, ব্যবহারজীবী, সংস্কৃতিসেবী, এমনকি শেষ পর্যায়ে সরকারি কর্মচারীবৃন্দও। এ আন্দোলনে নিহত হন ৪৪ জন, আহত হন কয়েক শত। তাঁদের রক্তসিক্ত পথেই নির্মূল হয় স্বৈরাচার এবং উদিত হয় নতুনভাবে গণতন্ত্রের সূর্য। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বরে গণ-আন্দোলন রূপ লাভ করে এক দুর্বার গণ-অভ্যুত্থানে। গণ-অভ্যুত্থানে ভেসে যায় এরশাদের সরকার। গণ-অভ্যুত্থানই এরশাদের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ।

পরোক্ষ কারণসমূহ (Factors Influencing Indirectly)

রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক বহু কারণ অবশ্য গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এজন্য দায়ী প্রধানত নিচে বর্ণিত কারণগুলো। এ সকল কারণ তিল তিল করে পটভূমি রচনা করে।

(দুই) রাজনৈতিক (Political)

রাজনৈতিক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জেনারেল এরশাদের অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, প্রশাসন এবং রাজনীতির সামরিকীকরণ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অর্থহীন করা, নির্বাচন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হলো ঃ

(ক) অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল ঃ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুথানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। মাত্র চার মাস পূর্বে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে তিনি পদচ্যুত করেন। মন্ত্রিপরিষদ এবং সংসদ বাতিল করেন। দেশব্যাপী জারি করেন সামরিক আইন। জেনারেল এরশাদ হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ২৪ মার্চে তিনি যা করেন তা যে অবৈধ তিনি তা জানতেন। তাই তিনি প্রথম থেকেই শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতার আবরণ দেবার চেষ্টা করেন। কখনও তিনি সামরিক শাসনকে "জনগণের শাসন" বলেছেন। কখনও বলেছেন, আর কিছু দেরি হলে দেশের "নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হত"। কখনও বলেছেন, "সীমাহীন দুর্নীতির কবল থেকে দেশকে মুক্ত না করলে দেশ ধ্বংস হয়ে যেত।" গণভোটের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সরকার অবৈধই রয়ে গেল। ঐ গ্লানি নিয়েই তাঁকে পদচ্যুত হতে হয়েছে।

(খ) শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঃ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জেনারেল এরশাদ সীমাহীন ও নিয়ন্ত্রণবিহীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন। হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ এবং শিক্ষানীতির মত মৌল বিষয়েও তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয় থেকে। প্রশাসন পুনর্বিন্যাসকরণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় তিনিই ছিলেন মুখ্য। ক্যাডার সার্ভিসের শতকরা ১০ভাগ পদে নিয়োগ তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। সচিবালয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নিজের একাধিপত্য। প্রশাসনের সর্বস্তরে তা ছিল পরিব্যাপ্ত।

(গ) প্রশাসন এবং রাজনীতির সামরিকীকরণ ঃ ১৯৮২ সাল থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বত্রই সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের উপস্থিতি এবং প্রভাব বিস্তার করেছেন। শুধুমাত্র সচিব, যুগ্মসচিব বা উপ-সচিব পর্যায়েই নয়, প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় তাদের প্রভাব। এক হিসেবে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনে চাকরিরত অবসরপ্রাপ্ত অথবা চাকরিরত সামরিক কর্মকর্তাদের সংখ্যা ২৫ জন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কর্মরত সামরিক কর্মকর্তাদের সংখ্যা ১৩। তাছাড়া ছিলেন কাউন্সিলর এবং মিনিস্টার পদে ১৫ জন। প্রশাসনের সামরিকীকরণের বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই জেনারেল এরশাদ ১৯৮৭ সালে জেলা পরিষদে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তা অবশ্য বাস্তবায়িত হয় নি।

(ঘ) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধ্বংস সাধন ঃ গণতন্ত্রের প্রতি এ জাতির দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের সংগ্রামের কাহিনী, গণতন্ত্রের জন্য জনগণের রক্তদানের ঐতিহ্য। জেনারেল এরশাদও তা জানতেন। তাই ক্ষমতা দখলের পর তিনি ঘোষণা করেন ঃ "অতি সত্বর দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবে।" তিনি আরো বলেন ঃ "আমি সামরিক পোশাক পরে রাজনীতি করব না।" কিন্তু তিনি কথা রক্ষা করেন নি। তাঁর শাসন আমলে যে কয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাদের কোন একটিও জনগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক দলটি গঠিত হয় তাও ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে দলছুট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। এ ক্ষেত্রে ডান, বাম, ও কেন্দ্র—সর্বক্ষেত্র থেকে তিনি দলছুটদের আকর্ষণ করেন। জাতীয় সংসদ ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় তাঁর আজ্ঞাবহদের সমন্বয়ে। বিচার বিভাগ পর্যন্ত ছিল তাঁর

নিয়ন্ত্রণে। এভাবে তিনি দেশে গণতান্ত্রিক চেতনার ধ্বংস সাধন করেন। ১৯৯০ সালে গণ-আন্দোলনের সূচনাও হয় যখন তিনি ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেন।

(ঙ) নির্বাচন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন ঃ জেনারেল এরশাদের শাসনামলে অনুষ্ঠিত হয় বহুসংখ্যক নির্বাচন এবং প্রত্যেকটি নির্বাচনে সংগঠিত হয় ব্যাপক কারচুপি, 'ভোট ডাকাতি', 'সীমাহীন হস্তক্ষেপ' এবং 'অন্তহীন দুর্নীতি'। ১৯৮৫ সালের ১৬ এবং ২০ মে অুনষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচন, ১৯৮৫ সালের ২১ মে অনুষ্ঠিত গণভোট, ১৯৮৬ সালে ৭ মে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, এবং ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচন ছিল কারচুপির নির্বাচন। ঐসব নির্বাচন দিবসে অধিকাংশে জনগণ পালন করেছে ধর্মঘট। অথচ ঐসব নির্বাচনে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ভোটারদের উপস্থিতি দেখানো হয় অবিশ্বাস্য রকম বেশি। ১৯৮৮ সালে সংসদ নির্বাচনে দেশের কোন বৃহৎ দল অংশগ্রহণ করে নি, যদিও ভোটদাতাদের পরিমাণ দেখানো হয় শতকরা ৫০-এর মত। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ৫ দলীয় এবং ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচনে 'ভোট ডাকাতির' অভিযোগ আনেন। ১৯৮৫ সালের গণভোটের বিষয়কে বিদেশি পত্র-পত্রিকায় 'এক হাস্যাস্পদ প্রহসন' বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ফল প্রকাশ হলে সরকারি হিসেবে দেখানো হয় প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ভোটদাতার প্রায় সাড়ে তিন কোটি ভোটদাতা ভোট প্রদান করেছেন যার পরিমাণ হয় জেনারেল এরশাদের পক্ষে শতকরা ৯৪·১৪ ভাগ। এভাবে গত নয় বছরে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের বিশ্বাস এবং আস্থার ভিত্তি শিথিল করা হয়, বিনষ্ট করা হয়।

(তিন) অর্থনৈতিক সংকট এবং অনিশ্চয়তা

দেশে সামরিক শাসন জারির পর থেকে দেশ যে ক্রমাগতভাবে এক সর্বগ্রাসী সংকট এবং অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তা অনুধাবনে কারো এতটুকু অসুবিধা হয় নি। একদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে প্রতি বছরে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ করের বোঝা জনজীবনকে পর্যুদস্ত করে তোলে। কৃষি উপকরণের ব্যক্তিকরণ, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়নের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন যাপন দুঃসহ হয়ে উঠে। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হয় সীমাহীন সম্পদ।

এক হিসাবে জানা যায়, ১৯৮০-৮১ সালে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ ছিল শতকরা ৬৫ ভাগ। ১৯৮৬-৮৭ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ৯৭·৯২ ভাগ। ১৯৮০-৮১ সালে উন্নয়ন খাতে বিদেশি সাহায্য ছিল শতকরা ৭৯ ভাগ। ১৯৮৮-৮৯ সালে তা হয় শতকরা ১২৬·৩ ভাগ। তথ্য সহকারে প্রমাণ করা যায়, এই বৈদেশিক সহায়তার সিংহভাগ গিয়েছে সরকারি আনুকূল্য ভোগকারী আমলা, সামরিক কর্মকর্তা, একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ এবং এরশাদ সৃষ্ট একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের হাতে।

আর এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭২-৮১ সময়কালে কৃষিখাতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৩·৭। '৮১-৯০ সালে তা নিয়ে আসে ১·৬৪ শতাংশে। শিল্পখাতে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় '৭২-৮১ সময়কালে ১২·৮৩ শতাংশ। '৮১-৯০ সালে তা নেমে আসে ২·৫৫ শতাংশে। '৮৪-৮৫ থেকে '৮৮-৮৯ সময়কালে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নি। '৭২-৮১ সময়কালে জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫·৯৫ শতাংশ। '৮১-৯০ সালে তা নেমে আসে ৩·১৯ শতাংশে। অন্যদিকে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায় অকল্পনীয় হারে।

এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯৭২–৭৩ সালে রাজস্ব ব্যয় ছিল প্রতি বছর গড়ে চলতি মূল্যে ২১৩.১১ কোটি টাকা। ১৯৯০–৯১ সালে তা হয় ৭৩০০ কোটি টাকা। ব্যয়ের সর্বোচ্চ বরাদ্দ হয় সামরিক, আধা–সামরিক এবং সাধারণ প্রশাসন ক্ষেত্রে। বিশ্ব ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানও চলতি ব্যয় বৃদ্ধিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছে।

(চার) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

(ক) এরশাদ শাসনামলে দেশ ক্রমান্বয়ে এক গভীর এবং সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হলেও এরশাদকে ঘিরে থাকা সংকীর্ণ এক চক্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হন। ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে তৈয়ারি জৌলুসপূর্ণ আবাসগৃহ, নিত্য নতুন মডেলের গাড়ি, ব্যবসা–বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রে কিছু পরিচিত ব্যক্তির ভাগ্যের উন্নয়ন প্রায় সকলের জানা।

শুধু তাই নয়, জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর পত্নীর 'দুর্নীতি' এবং 'লুণ্ঠনের' সংবাদও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। রাষ্ট্রপতির বিশেষ তহবিল, ত্রাণ তহবিল, নিজস্ব তহবিল, ফার্স্ট লেডির তহবিল, পথকলি ট্রাস্টের তহবিল, জাতীয় জনসংখ্যা কমিটির তহবিলের হিসাব কোন সময়ে প্রকাশিত হয় নি। অন্যদিকে দেশের এবং বিদেশের বহু পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাদের দুর্নীতির কাহিনী। জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর পত্নীকে ঘিরে পারিবারিক লুণ্ঠনের যে প্রক্রিয়া তা অনেকটা ফিলিপাইনের ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি মার্কোস এবং ইমেলদার মতই। অনেকেই এ প্রবণতাকে বলেছেন 'মার্কোস সিনড্রোম' (Marcos Syndrome)। এরশাদের বিস্ময়কর উত্থান এবং তার অঢেল সম্পদ দেখে বিদেশের অনেক স্থানে তাকে বলা হত 'সর্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশের সর্বাপেক্ষা ধনী রাষ্ট্রপতি' ('The richest president of the poorest country')।

(খ) জেনারেল এরশাদ সম্পর্কে প্রকাশিত অনেক রুচিহীন নগ্ন কাহিনীও জনমনে সৃষ্টি করে এক ধরনের ঘৃণা। তাঁর সন্তানকে নিয়ে রচিত বিবরণ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে দেশে এবং বিদেশে বহু নারী সম্পর্কিত অরুচিকর আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে জনপ্রিয় হয় মুখরোচক আলোচনা।

(পাঁচ) সাহায্য দাতাদের অনীহা

ডুবন্ত মানুষ চায় সাহায্য। সবার কাছ থেকে চায় সহযোগিতা। নভেম্বরের শেষ প্রান্তে, বিশেষ করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার সময় জেনারেল এরশাদও হাত বাড়িয়েছিলেন বিদেশি কূটনীতিকদের দিকে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নি। সাহায্যদানকারী দেশের প্রতিনিধিরা খুব কাছে থেকে দেখেছেন এরশাদকে। তাঁর শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা তাদের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সমাজে তাঁর নেতৃত্বে বিদেশি সম্পদের অপচয় সম্পর্কেও তাঁরা জানেন। তাঁরা দেখেছেন, প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য সত্ত্বেও দেশের দরিদ্র জনগণের দরিদ্র কিভাবে দিনে দিনে বেড়েছে এবং কিছুসংখ্যক সুবিধাভোগী সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছেন। একদিকে প্রচুর সংখ্যক জনসমষ্টি মানবেতর জীবনে বাধ্য হয়েছেন, অন্যদিকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্যে ইতর জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে বিদেশি কূটনীতিকদের সহায়তায় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে, তিনি প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। এবার তা সম্ভব হয় নি। এন জি ও (NGO) গুলো আন্দোলনের সময় তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় বেশ কিছু কূটনীতিক রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেন।

(ছয়) সামরিক বাহিনীর ভূমিকা

গণ-আন্দোলনের সময় জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীও পালন করে এক সম্মানজনক ভূমিকা। জেনারেল এরশাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামরিক বাহিনী তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে এক করে দেখেন নি। সামরিক বাহিনী গণ-আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখেছেন এবং চেয়েছেন তার রাজনৈতিক সমাধান। একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনী অত্যন্ত সঙ্গতকারণে জনগণকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারি করার যে ষড়যন্ত্র তা কার্যকর হয় নি।

দীর্ঘ নয় বছরে জেনারেল এরশাদ কিছুই করেন নি তা ঠিক নয়। তবে তিনি যে সব ভাল কাজ করেছেন তাও তাঁর দুর্নীতির দীর্ঘ ছায়ায় মলিন। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা ব্যবস্থা রচিত হয়। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয়েছে স্বৈরশাসনের সমর্থন ভিত্তি হিসেবে। গুচ্ছগ্রাম এবং পথকলির মত উত্তম প্রতিষ্ঠানও ব্যবস্থাপকদের লোলুপদৃষ্টিতে কলঙ্কিত। দেশে অর্থনৈতিক অব-কাঠামো নির্মাণে, বিশেষ করে সেতু ও সড়ক রচনায় জেনারেল এরশাদের ব্যাপক উদ্যোগ দুর্নীতি কবলিত। বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় তিনি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যতটুকু উজ্জ্বল করেছেন, তার অনেক বেশি কালিমালিপ্ত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত নগ্নতায়। দীর্ঘ নয় বছর ধরে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অসংখ্য গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলা তিনি পরিদর্শন করেন। সাথে সাথে বিস্তৃত হয়েছে দেশের সর্বত্র নীতিহীনতার ঝড়ো হাওয়ায় মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারী উদ্দামতা। এ প্রেক্ষিতে গণআন্দোলন ছিল অত্যন্ত স্বভাবিক।

নব্বই এর গণ-অভ্যুত্থান ঃ এর লক্ষ্য এবং প্রকৃতি

Popular Uprising of 1990 : Its Objectives and Nature

নব্বই শেষ হয়েছে। বছরের শেষ প্রান্তে শেষ হয় স্বৈরশাসন। সমাপ্তি ঘটে সীমাহীন দুর্নীতি এবং অনিয়মের। ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর যে আন্দোলন শুরু হয় মাত্র সাত সপ্তাহের মাথায় গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৪ ডিসেম্বর তা লক্ষ্য অর্জন করে। জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেন। ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ গ্রহণ করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্য বিজয়ী হয় রাজনীতি। বিজয়ী হয় শুভবুদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক চেতনা। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথ হয় প্র

এর লক্ষ্য (Its Objectives)

নব্বই-এর গণ-আন্দোলনের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন।

(খ) বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান।

(গ) জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) সংসদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে শাসন-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা।

জেনারেল এরশাদ যখন ১৯৯১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থিতা ঘোষণা করেন তখন থেকে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৯০ সালের ২৮ জুন সরকার পতনের দাবিতে তিন জোট ঐক্যবদ্ধভাবে হরতাল কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচিতে ঐক্যের ধারাবাহিকতায় ২৯ জুলাই গণ-বিক্ষোভ দিবস এবং ২৬ আগস্টে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করে। ১০ অক্টোবরে এভাবে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় এবং তা অব্যাহত কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ৪ ডিসেম্বরে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের প্রতিশ্রুতির পর তার সমাপ্তি ঘটে।

গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি (Nature)

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান যৌক্তিক পরিণতি লাভ করে নি। স্বৈরশাসনের দুর্গে ফাটল ধরেছিল ঠিকই কিন্তু গণতন্ত্রের শুভ সূচনা হয় নি। জেনারেল আইয়ুবের পতন ঘটে, কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় আর একজন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। নব্বই-এর গণ-আন্দোলন বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এবার সরকারের পরিবর্তন ঘটে শান্তিপূর্ণভাবে। অতীতে এমন হয় নি। এবারে রাজনীতির বিজয় হয়েছে। আন্দোলন শেষে রাজনৈতিক জোটগুলো হয়ে ওঠে বাংলাদেশ রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। এমনটি অতীতে ঘটে নি। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবার দলীয় জোটগুলোর মধ্যে ছিল ঐকমত্য। অতীতে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে।

এ আন্দোলনের রূপরেখা ছিল ভিন্ন। আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য থেকে শুরু করে দলীয় পর্যায় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল ঐকমত্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তত্ত্বধায়ক সরকার দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্রপতি এরশাদকে পদত্যাগ করতে হবে। দেশে সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে জবাবদিহিমূলক সরকার।

নব্বই-এর গণ-আন্দোলনে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এ আন্দোলনে যতটুকু ছিল প্রত্যাশা, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল প্রত্যাখ্যান। জেনারেল এরশাদকে প্রত্যাখ্যান, তাঁর স্বৈরশাসনের প্রত্যাখ্যান, সামাজিক দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের নিন্দনীয় ভূমিকার প্রত্যাখ্যানই ছিল এ আন্দোলনের মূল সুর। জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্রের সকল বাতায়ন বন্ধ করেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। নির্বাচনের মত প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশের এ অঞ্চলেই সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করে, কিন্তু জেনারেল এরশাদ পেশীর প্রতি এমন আকৃষ্ট হন যে তার দাপটে নির্বাচন হারায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা।

গণ-আন্দোলন থেকে গণ-অভ্যুত্থান

এরশাদ শাসনামলে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের শিক্ষাঙ্গন এবং বিচার বিভাগ। শিক্ষাঙ্গনে একাডেমিক পরিবেশ কলুষিত হয়। সন্ত্রাসের দ্বারা হয় ক্ষতবিক্ষত। বিচার বিভাগ হারায় তার স্বাতন্ত্র্য। দলিত-মথিত হয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। অথচ এ সকল প্রতিষ্ঠানের সুস্থতাই জাতীয় অগ্রগতির সূচক। জাতীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে শিক্ষাঙ্গনে। আইনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বলিষ্ঠ জীবন গড়ে ওঠে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মাধ্যমে। সঙ্গতকারণে তাই এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় শিক্ষাঙ্গন থেকে। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বিবেকবান ছাত্ররা দেন এর নেতৃত্ব। আন্দোলনে গভীরতা দান করেন দেশের আইনজীবীরা। গতি আনয়ন করেন সংস্কৃতিসেবিরা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সক্ষম হন এ আন্দোলনকে তার যৌক্তিক পরিণতি অর্জন করাতে। সাত সপ্তাহের মাথায় এরশাদ পদত্যাগ করেন।

সরকার ভেবেছিল, ১০ অক্টোবরের সচিবালয় অবরোধ অন্য কর্মসূচির মত ব্যর্থ হবে। তা হয় নি। ঐদিন পাঁচ জনের মৃত্যু ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দেয়। শহীদ জেহাদের রক্ত গায়ে মেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শপথ নিয়েছিল এরশাদের পতন ঘটাতে। গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য।

পরের দিন ছাত্র নেতৃবৃন্দ পুলিশের হামলায় আহত হলে তাদের মনে জন্ম হয় ইস্পাত কঠিন সংকল্প। ১৩ অক্টোবরে ছাত্রদের জঙ্গি মিছিলে আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত হয়। আন্দোলনকে থামিয়ে দেবার জন্য ১৩ অক্টোবর এক অধ্যাদেশ বলে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। এতে সর্বমহলে ক্রোধ আরও উদ্দীপ্ত হয়। সরকারের এ অবৈধ ঘোষণা অস্বীকার করে ছাত্র-শিক্ষকগণ ১০ নভেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই খুলে দেন। ২৭ অক্টোবর রাজপথ-রেলপথ অবরুদ্ধ হলে দেশের যাতায়াত এবং পরিবহন ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। ১৭ নভেম্বরে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের গণ-দুশমন বিরোধী দিবসের কর্মসূচি আন্দোলনকে আর একধাপ এগিয়ে নেন। ১৯ নভেম্বর ঘোষিত হয় সকল রাজনৈতিক জোটের ফর্মূলা। উপ-রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবেন। তাঁর স্থলে নিযুক্ত হবেন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্রপতি এরশাদ নব নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করবেন।

২৭ নভেম্বর সন্ত্রাসীদের গুলীতে নিহত হন প্রতিভাবান তরুণ চিকিৎসক ডঃ সামসুল আলম মিলন। ঐ দিন সন্ধ্যায় দেশে জারি করা হয় বহু সমালোচিত জরুরি আইন এবং ঢাকাসহ বড় বড় শহরে সান্ধ্য আইন। জনগণের প্রচণ্ড ক্রোধে অমান্য করা হয় জরুরি আইন এবং সান্ধ্য আইন। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয় দশদিক। ৩ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ বলেন, তিনি রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচনের ১৫ দিন পূর্বে তিনি পদত্যাগ করবেন যেন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব হয়।

রাজনৈতিক জোটগুলো তা প্রত্যাখ্যান করে। গত্যন্তর না দেখে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। বাঁধভাঙা স্রোতের মত জনতা বিজয় উল্লাসে মুখরিত করে আকাশ-বাতাস। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিন জোটের মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। এভাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ হলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্থায়ী প্রধান। এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসান হলো।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২৭ নভেম্বর থেকে তা গণ-অভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। তা চূড়ান্ত পর্যায়ে এরশাদের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার মূল উৎপাটিত করে দেশে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ
Acting President and his Advisers

সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে নিযুক্ত করা হয় উপ-রাষ্ট্রপতি। এর পূর্বে মওদুদ আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে পদত্যাগ করেন। সদ্য নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ফলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ হন 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। তাঁর কার্যকাল শুরু হয় ৬ ডিসেম্বর এবং শেষ হয় ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবরে। ৮ অক্টোবরে সংসদীয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন আবদুর রহমান বিশ্বাস।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর কার্যকালে দুভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (Chief Executive)। দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ১৯ সেপ্টেম্বরে। ফলে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। ঐ সময়ে নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী হন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ৫, ৭ এবং ৮ দলীয় জোট এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ১৭ জন প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে এক উপদেষ্টা পরিষদ তিনি গঠন করেন। ৯ ডিসেম্বরে ৬ জন সদস্য এ পরিষদের সদস্য হন। পরবর্তীতে আরও ১১ জন সদস্যকে তিনি উপদেষ্টা পরিষদে মনোনয়ন দান করেন। তিন দলীয় জোট হতে পেশকৃত তালিকায় যে ৩১ জন ব্যক্তির নাম ছিল তাঁদের মধ্য থেকে তিনি ১৭ জনকে বাছাই করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ গঠন করা। নির্বাচনকে অবাধ এবং নিরপেক্ষ করার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের পুনর্বিন্যাস করেন। অস্ত্র উদ্ধার আইনকে আরও শক্তিশালী করেন। দেশের বিভিন্ন জেলখানায় উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ১৪ ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। প্রথমে ঘোষণা করা হয়, জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২ মার্চ। কিন্তু শবে-ই-বরাত উপলক্ষে ছুটির জন্য তিনি পরে নির্বাচনের দিন ধার্য করেন ২৭ ফেব্রুয়ারি।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল দেখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বি. এন. পির

দলনেত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন ১৯ মার্চ ১৯৯১ সালে। ২০ মার্চ বেগম জিয়া ১১ জন মন্ত্রী এবং ২১ জন প্রতিমন্ত্রীসহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদের উদ্বোধন করে সংসদে প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে।

একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধন আইন সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় ৬ আগস্টে। দ্বাদশ সংশোধন আইন জনগণের অনুমোদনের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় দেশব্যাপী গণভোট। এ গণভোটে দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুমোদিত হলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি। ১৮ সেপ্টেম্বরে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেষবারের মত কেবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী হন প্রধানমন্ত্রী।

পঞ্চম সংসদের নির্বাচন

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ কোন দিন কার্যকাল শেষ করে নি। ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সংসদের কার্যকাল সমাপ্ত হয় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরে। জেনারেল এরশাদ একাই ভেঙেছেন ৩টি সংসদ— ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ, ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বরে এবং ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বরে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। এ নির্বাচনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ঃ

(এক) এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গণ-আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে। বাংলাদেশে এ ধরনের সরকার এই প্রথম। অতীতে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

(দুই) তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়। কঠোরভাবে নিয়ম-শৃংখলা পালন করা হয়। নির্বাচন কমিশন এমনভাবে গঠিত হয় যার বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল পরিপূর্ণ।

(তিন) এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সর্বাধিক সংখ্যক দল এবং প্রার্থী। এক হিসাব অনুযায়ী ৭৬টি রাজনৈতিক দল এতে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া ছিল নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী।

১৯৯১ সালের ১৩ জানুয়ারি ছিল মনোনয়নপত্র পেশের তারিখ। নির্বাচনের দিন স্থির হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। এ নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭৭৪ জন। এ নির্বাচনে সর্বমোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৬,১৮,৫৪,৩৫০ জন (ছয় কোটি আঠার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত পঞ্চাশ জন)। তাদের মধ্যে ভোটদান করেন ৩,৩০,৮৮,৫৬০ জন (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার পাঁচশত ষাট)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সকল আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করায়। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২টি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত থাকে। আওয়ামী লীগের প্রতীক ছিল নৌকা এবং জাতীয়তাবাদী দলের প্রতীক ছিল ধানের শীষ। পঞ্চম সংসদের নির্বাচনে শতকরা ৫২.৩৭ ভাগ ভোটদাতা ভোট প্রদান করেন।

এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সর্বোচ্চ ভোট এবং ১৪০টি আসন লাভ করে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ সংসদে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে

লাভ করে ৮৮টি আসন। জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী খালেদা জিয়া ৫টি আসনে, জাতীয় পার্টির নেতা জেনারেল এরশাদ ৫টি আসনে, আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ ২টি আসনে এবং বাকশাল নেতা আবদুল রাজ্জাক ২টি আসনে বিজয়ী হন। তাঁদের পরিত্যক্ত ১০টি (৪+৪+১+১) এবং জনৈক সংসদ সদস্য পরলোক গমন করলে ঐ ১১টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ সেপ্টেম্বর। উপ-নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল লাভ করে ৫টি, জাতীয় পার্টি ৪টি এবং আওয়ামী লীগ লাভ করে ২টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জাতীয়তাবাদী দল পরবর্তীতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে লাভ করে ২৮টি আসন এবং জামায়াত-ই-ইসলাম লাভ করে ২টি আসন। ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের প্রাপ্ত ভোট ছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩১.৪৪ ভাগ এবং আওয়ামী লীগের ছিল শতকরা ৩১.১৩ ভাগ।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী জাতীয় সংসদে ছিল জাতীয়তাবাদী দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বৃহত্তম বিরোধী দল হয় আওয়ামী লীগ (সারণি-২)

সারণি—২০·১

পঞ্চম জাতীয় সংসদে দলগত অবস্থান

দল	আসন সংখ্যা
১। বি. এন. পি—	১৪০
২। আওয়ামী লীগ—	৮৮
৩। জাতীয় পার্টি—	৩৫
৪। জামাত ই-ইসলাম—	১৮
৫। বাকশাল—	০৫
৬। সি. পি. বি—	০৫
৭। গণতন্ত্রী পার্টি—	০১
৮। ওয়ার্কার্স পার্টি-	০১
৯। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন—	০১
১০। এন. ডি. পি—	০১
১১। জাসদ (সিরাজ)—	০১
১২। ন্যাপ (মোজাফফর)—	০১
১৩। স্বতন্ত্র—	০৩
	সর্বমোট— = ৩০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

এ নির্বাচনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর নিরপেক্ষ চরিত্র এবং অবাধ গতি। দেশের এবং বিদেশের বহু পর্যালোচক এবং পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে অতীতে এমন নির্বাচন হয় নি। কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক টিম, ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিষয়ক জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্থার সদস্যগণ, সার্কভুক্ত দেশের পর্যবেক্ষক, এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান থেকে আগত পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনের নিরপেক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আওয়ামী লীগের নেত্রী অবশ্য অভিযোগ করেন যে, সূক্ষ্ম কারচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এ নির্বাচনে।

এ নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য, সর্বপ্রথম জাতীয় সংসদে তৈরি হয় শক্তিশালী বিরোধী দল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ছিল ১৬০টি আসন।

সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন
Re-introduction of the Parliamentary System

দেশে সংসদীয় সরকারের দাবি বহুদিনের। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাজনৈতিক জীবন শুরু করে সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমেই। ১৯৭২ সালের সাময়িক সংবিধান আদেশে তার সূচনা। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এ ধারা অব্যাহত থাকে। সংসদের প্রাধান্য, সংসদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ এবং জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া সংসদীয় ব্যবস্থার মর্মবাণী। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধন আইনে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি সরকারের নামে এক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা।

এ ব্যবস্থা কিন্তু সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করে নি। তাই এর পরিবর্তে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলীয় প্রার্থী এম. এ. জি. ওসমানী এ দাবিকে সম্মুখে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিরোধী দলীয় প্রার্থী ড. কামাল হোসেন নির্বাচনী ইস্তেহারে এ দাবি ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে, ভাষায় ও ফোরামে এর প্রকাশ ঘটতে থাকে।

নব্বই-এর গণ-আন্দোলনে তিন দলীয় জোটের অঙ্গীকারেও ছিল বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি। সংসদকে সার্বভৌম করা, সংসদের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ ছিল ১৯ নভেম্বরে রচিত তিন দলের অঙ্গীকারের মৌল শর্ত। তাই নির্বাচনের পর থেকে এ দাবি জাতীয় দাবিতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন বিলের নোটিস দেয়া হয় ১৯৯১ সালের ১৪ এপ্রিল। সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কিত আরও দুটি বিলের নোটিস দেয়া হয়, ৩০ জুন। ৪ জুলাই ওয়ার্কার্স পার্টিও ৪টি বিল উত্থাপন করে। ৯ জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে ৭টি বিল ১৫ সদস্যের বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়। বাছাই কমিটির সভাপতি ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। বাছাই কমিটি ২৯টি বৈঠকে প্রায় ১০০ ঘণ্টা আলোচনা-পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ২৮ জুলাই রিপোর্ট প্রদান করে। ঐ রিপোর্টের উপর আলোচনার পর একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধন আইন সংসদে গৃহীত হয় ৬ আগস্ট।

এক অভূতপূর্ব সৌহার্দ, সমঝোতা এবং আনন্দঘন পরিবেশে এ সংশোধন আইন দুটি প্রণীত হয়। একাদশ সংশোধন আইনের পক্ষে ছিল ২৭৮টি ভোট এবং দ্বাদশ সংশোধন আইনের পক্ষে ছিল ৩০৭টি ভোট। বিপক্ষে কোন ভোট ছিল না। ডেপুটি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী এ ঐতিহাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ৪৮ অনুচ্ছেদে দুটি সংশোধনী প্রস্তাবসহ তা গৃহীত হয় মধ্য রাত্রির পর।

সাংবিধানিক গণভোট
Constitutional Referendum

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২(১)ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংবিধানের প্রস্তাবনা অথবা, ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০, ৯২(ক) বা ১৪২ অনুচ্ছেদের কোন বিধান সংশোধনের জন্য সংসদের আইনই যথেষ্ট নয়। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদানের পূর্বে গণভোটের ব্যবস্থা করবেন। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইন ছিল এমনি একটি আইন। দ্বাদশ সংশোধন আইনে সংবিধানের ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ক অনুচ্ছেদের কিছু বিধান সংশোধিত হয়েছে। তাই রাষ্ট্রপতি সম্মতিদানের পূর্বে দেশব্যাপী এক গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

এর পূর্বেও বাংলাদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়া তাঁর নীতি এবং কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি না তা যাচাই এর জন্য এক গণভোট অনুষ্ঠিত করেন। ঐ গণভোটে তিনি প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৮·৮৮ 'হ্যাঁ' ভোট লাভ করেন। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চে রাষ্ট্রপতি এরশাদও তাঁর কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে কিনা তা যাচাই এর জন্য গণভোটের আয়োজন করেন। প্রদত্ত ভোটে ৯৪·১৪ ভাগ ভোট তিনি লাভ করেন।

১৯৯১ সালের গণভোটের প্রকৃতি ভিন্ন। অতীতের গণভোট ছিল প্রশাসনিক, কিন্তু ১৯৯১ এর গণভোট সাংবিধানিক। অতীতের গণভোটের লক্ষ্য ছিল শাসন ক্ষমতার বৈধকরণ। এবারের গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সংসদের-বৈধ ক্ষমতা জনগণের দ্বারা অনুমোদনের জন্য। অতীতে গণভোটের মাধ্যমে শাসকদের জনপ্রিয়তা যাচাই করা হয়েছে। এবারে কিন্তু জনপ্রিয় এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদের প্রস্তাবে জনগণের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। অতীতে গণভোটের লক্ষ্য ছিল শাসকদের নীতি এবং কার্যক্রম। এবারে গণভোটের লক্ষ্য ছিল সংসদের সংশোধন প্রস্তাব।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে এ গণভোটের ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও বিপুল সংখ্যক ভোটদাতা উপস্থিত হন। সরকারি হিসেবে জানা যায়, সর্বমোট ৬,২২,০৪,১১৮ (ছয় কোটি বাইশ লক্ষ চার হাজর একশত আঠার) জন ভোটারের মধ্যে ২,১৭,২৮,৫৯৫ (দুই কোটি সতের লক্ষ আঠার হাজার পাঁচ শত পঁচানব্বই) জন ভোট দেন। এটি ছিল প্রদত্ত বৈধ ভোটের শতকরা ৩৪·৯৩ ভাগ। বৈধ ভোটের মধ্যে ১,৮৩,৪২,৮৮২টি (এক কোটি তিরাশি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আট শত বিরশি) ছিল 'হ্যাঁ'–সূচক। অন্যদিকে, ৩৩,৮৫,৭১৩ (তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার সাত শত তের) ভোট ছিল 'না' সূচক। অন্য কথায়, ১৯৯১ সালের সাংবিধানিক গণভোটে 'হ্যাঁ সূচক ভোট ছিল শতকরা ৮৪·৪২ এবং 'না' সূচক ভোট ছিল শতকরা ১৫·৮৫ ভাগ।

সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাহী কর্তৃত্ব
Executive Authority Under Parliamentary System

১৫ সেপ্টেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হলে দ্বাদশ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করেন। এর পর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তিত হয় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, দীর্ঘ ১৬ বছর পরে। এ ব্যবস্থায় রষ্ট্রপতি আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ।

এ বিধান অনুযায়ী ১৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শপথ গ্রহণ করেন।

রাষ্টপতি নির্বাচন
Election of the President

১৯৯১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন অনুযায়ী সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবরে। এ নির্বাচনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনী কলেজ (Electoral College) হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন। সদস্যদের প্রকাশ্য ব্যালটে (open ballot) এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী। রাষ্ট্রপতি পদের দলীয়করণের প্রতিবাদে বিচারপতি চৌধুরীকে প্রার্থী করা হয়।

এ নির্বাচনে আবদুর রহমান বিশ্বাস লাভ করেন ১৭২ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী লাভ করেন ৯২ ভোট। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলাম, সিপিবি, ন্যাপ (মো), ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (সিরাজ) এবং এনডিপি ভোটদানে বিরত থাকে। সংসদের ৩০০ সদস্যের মধ্যে ভোটদান করেন ২৬৪ জন। একজন ছিলেন দেশের বাইরে। অন্য ৬৫ জন উপস্থিত থেকেও ভোট দান করেন নি।

এ নির্বাচনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পূর্ব পদে ফিরে যাওয়ার আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইলো না। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের জয়যাত্রা শুরু হয় এ ভাবে।

বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১
একাদশ সংশোধন আইনের প্রেক্ষিত

১৯৯০ সালে ব্যাপক গণ-অভ্যুথানের পর স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি এরশাদের পতন ঘটে। গণ-অভ্যুথানের প্রধান দাবি ছিল দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে এক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় দেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন (free, fair and neutral) অনুষ্ঠান। এ উদ্দেশ্যে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করার পূর্বে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং তাঁর নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে। তিনি নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাল ধরেন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১-এর ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাঁর উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ এবং ঐ সময়ে কৃত এবং গৃহীত কাজকর্ম অনুমোদনের জন্য এ সংশোধন আইন প্রণীত হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্টে।

একাদশ সংশোধন আইনের ধারা

একাদশ সংবিধান সংশোধন আইনে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২০ অনুচ্ছেদের পর ২১ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়।

(এক) ২১ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ, শপথ প্রদান এবং তাঁর নিকট পদত্যাগ প্রদান বৈধ বলে গণ্য হবে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে একাদশ সংশোধন আইন প্রবর্তনের তারিখ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন এবং অধ্যাদেশ এবং কৃত, প্রদত্ত ও গৃহীত সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো এবং আইনানুযায়ী কৃত ও গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষিত হলো।

(দুই) ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়, একাদশ সংবিধান সংশোধন আইন প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার গ্রহণ করার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার এবং দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন।

এ সংশোধন আইনের পক্ষে ভোট পড়ে ২৭৮টি। বিপক্ষে কেউ ভোট দেন নি। এ আইনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন বৈধ বলে স্বীকৃত হলো। এর পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রধান বিচারপতি পদে পুনর্বহালের পথ প্রশস্ত হলো।

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১

বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য :

(১) সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন : দ্বাদশ সংশোধন আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রবর্তিত সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চতুর্থ সংশোধন আইনে রূপান্তরিত হয় রাষ্ট্রপতিক সরকার পদ্ধতিতে। দীর্ঘ ষোল বছর পর এ আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরে এল সংসদীয় ব্যবস্থা।

(২) মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতা : এ সংশোধন আইনে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা। মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী হয়। মন্ত্রিগণ তাঁদের কার্যক্রম এবং নীতির জন্য ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে দায়ী হয় সংসদের নিকট। রাষ্ট্রপতিক সরকারের মন্ত্রিপরিষদ দায়ী ছিল রাষ্ট্রপতির নিকট, সংসদের নিকটে নয়।

(৩) প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী : এ আইনে সংসদীয় ঐতিহ্য অনুসারে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী হন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দ্বারা অথবা তাঁর কর্তৃত্বে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রয়োগ হবে। প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষস্থানীয়, সংসদের নেতা এবং নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এ আইনে রাষ্ট্রপতি আলঙ্কারিক প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান।

(৪) রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত ঃ এ আইনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক, পাঁচ বছরের জন্য। রাষ্ট্রপতিক সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন জনগণ কর্তৃক, প্রত্যক্ষ ভোটে। এ আইন অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন প্রকাশ্য ভোটে। নির্বাচন পরিচালনা করেন নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতি অন্য সকলের উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন।

(৫) রাষ্ট্রপতির সীমিত ক্ষমতা ঃ এ সংশোধন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৫৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তিনি পদত্যাগ করতে পারবেন।

(৬) রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ঃ বাংলাদেশ সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যেতে পারে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অভিযোগ পেশ করা যাবে। সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে তা গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(৭) উপ-রাষ্ট্রপতি পদের বিলুপ্তি ঃ এ আইনে উপরাষ্ট্রপতি পদের বিলুপ্তি ঘটে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদের কার্যক্রম ঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। মন্ত্রিপরিষদের নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন। এক-দশমাংশ নিযুক্ত হবেন সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। মন্ত্রিপরিষদে থাকবেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী। উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত হয়।

(৯) মন্ত্রিপরিষদের কার্যকাল ঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ সংসদের আস্থাভাজন থেকে কার্য পরিচালনা করবে। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করবে। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী অবশ্য রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন। সাধারণভাবে সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। তাই মন্ত্রিদের কার্যকালও সাধারণ অবস্থায় পাঁচ বছর। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিপরিষদের আয়ু শেষ হয়।

(১০) স্থানীয় শাসনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঃ এ আইনে ব্যবস্থা করা হয়, নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর স্থানীয় শাসনভার অর্পিত হবে। চতুর্থ সংশোধন আইনে তা রহিত করা হয়।

(১১) দলীয় আনুগত্যের বন্ধন সুদৃঢ় ঃ এ আইনে দলীয় আনুগত্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কোন নির্বাচনে কেউ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়ে সে দলের নির্দেশ অমান্য করলে বা সংসদে উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকলে বা সংসদের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে দলের বিপক্ষে ভোটদান করেছেন বলে ধরা হবে এবং সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

(১২) সংসদের অধিবেশন ঃ সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি বিরতি থাকবে না।

(১৩) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির নব্বই দিন পূর্বে সে পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(১৪) জাতীয় নিরাপত্তা ঃ জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা যেতে পারে।

সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬

সূচনা ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আইন। এ সংশোধন আইন প্রণয়ন করে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এ সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পর এ সংশোধন আইন নতুন পরিচ্ছেদ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২৫-২৬ মার্চে এ সংশোধন আইনটি ষষ্ঠ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হবার পর যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সে তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ি থাকবে।

(৩) উল্লিখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা সংবিধানের ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে প্রযুক্ত হবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তা প্রযুক্ত হবে।

(৪) নতুন সংসদ গঠিত হবার পর প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

(৫) প্রধান উপদেষ্টার কর্তৃত্ব সংবিধানে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ন্যায় [(৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত)] একই বিষয়াবলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে।

কার্যত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ঐ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন শুধু সেই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। ঐ মেয়াদে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক লাভ করবেন। অন্যান্য উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতির হাতে এ বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত হবার কারণ হল তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিনি একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তি।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন

(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগ দান করবেন রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রধান উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করে অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ দান করবেন।

(২) সংসদ ভেঙে দেয়া বা ভঙ্গ হবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হবেন।

(৩) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তবে তিনি যদি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন।

(৪) যদি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে সম্মত না হন তাহলে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি তাঁকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন।

(৫) যদি আপিল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে না পাওয়া যায় বা তাঁরা যদি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কোন সম্মানিত নাগরিককে এ পদে নিয়োগ দান করবেন। তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপতি এ সংবিধানের অধীন তাঁর স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ পদত্যাগ করতে পারেন অথবা সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা হারালে তিনি বা তাঁরা ঐ পদে আর অধিষ্ঠিত থাকবেন না। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণের যোগ্যতা

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলির প্রেক্ষাপটে নিয়োগ লাভ করবেন। তাঁদের যোগ্যতা নিম্নরূপ ঃ

(ক) সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতার অধিকারী ;

(খ) কোন রাজনৈতিক দল বা দলের সাথে সংযুক্ত কোন সংগঠনের সদস্য না থাকা ;

(গ) আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না—এ মর্মে লিখিতভাবে অঙ্গীকার প্রদান ;

(ঘ) বাহাত্তর বছরের অধিক বয়স্ক নন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলি

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাহায্য ও সহায়তায় সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ব্যতীত এ সরকার কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে যুক্তি

কোন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ হতে পারে না–এ যুক্তির ভিত্তিতে এ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা অনুপস্থিত। আপাত দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে হয়। কারণ অনেক ঃ

(১) দলীয় সরকার সর্বত্রই, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য সরকারি সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রয়োগ করে নির্দ্বিধায়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর মূলোচ্ছেদ করবে।

(২) এ ব্যবস্থা নির্বাচনে দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি রোধেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(৩) তৃতীয় বিশ্বের নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর নির্বাচন ক্ষেত্রে অর্থ, দুর্নীতি এবং সহিংসতা (Cash. Corruption and Criminality) যেভাবে অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার মূল শিথিল করবে।

(৪) নির্বাচনে যোগ্যতর ব্যক্তিদের নির্বাচিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সমালোচনা

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ব্যতিক্রমধর্মী এক ব্যবস্থা। এর কতকগুলো কুফলও রয়েছে ঃ

(এক) এ ব্যবস্থা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর অনাস্থার সামিল। তাঁরা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে যেন কিছু সংখ্যক নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন। এ মনোভাব গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। এক রাজনৈতিক নেতার কথায়, "এই ব্যবস্থায় এগারজন ফেরেশ্‌তা যেন তিনশত জন মন্দ ব্যক্তিকে নির্বাচন করছে"।

(দুই) গণতন্ত্র এক অর্থে দলীয় ব্যবস্থা। সকল রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হয় জনসাধারণের নিকট। যে দল জনগণের রায় লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকে। এভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। দলীয় নেতৃবর্গ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম হলে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবেন না কেন ?

(তিন) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু সংসদের সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করবেন। উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি। ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এক অপূর্ণ এবং আংশিক ব্যবস্থা।

(চার) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এক দুর্বল ব্যবস্থা। এর পেছনে শুধু রয়েছে সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তির শুভেচ্ছা। সরকার পরিচালনার জন্য কিন্তু প্রয়োজন সর্ব মহলের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। জাতীয় সংকটকালে এ ব্যবস্থার দুর্বলতা আরো প্রকট হয়ে উঠতে পারে।

(পাঁচ) এ ব্যবস্থা সরকারের রূপ পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলেছে। নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। সংসদীয় ব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য ঐ সময়ে বিলুপ্ত হয়। রাষ্ট্রপতি হন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু।

সংবিধান (ত্রয়োদশ সংবিধান) আইনের পটভূমি

দলীয় সরকারের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়-এ রাজনৈতিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে **সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬** প্রণীত হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর সকলে বিশ্বাস করেছিলেন, এ দেশে গণতন্ত্রের সুদিন ফিরে এসেছে। ঐ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ একমত হয়ে দ্বাদশ সংশোধন আইনের

মাধ্যমে দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সংসদীয় ব্যবস্থা। জাতীয় সংসদ হয়ে উঠেছিল জাতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন জাতীয় সমস্যা সমাধানের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণে। দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল–বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ–অতীতের বৈরিতা পরিত্যাগ করে মনোযোগী হয়েছিল জাতীয় কল্যাণের নিমিত্তে। অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সংবিধান সংশোধন আইন প্রণীত হলো। জাতীয় রাজনীতি বন্দী হলো জাতীয় সংসদে। সংসদীয় কমিটিসমূহ সরকারের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মমুখর হয়ে উঠলো। সংসদীয় বিতর্ক ও উন্নততর অবয়ব লাভ করলো। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যে এ অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলো। সর্বপ্রথম, মিরপুর উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বৃহৎ দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সৃষ্টি হলো পারস্পরিক অনাস্থার ভাব। শেষ পর্যন্ত তৈরি হলো দুয়ের মধ্যে অনতিক্রম্য দূরত্ব।

১৯৯৪ সালের মার্চের অধিবেশনে তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমূল হুদার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের সদস্যগণ সংসদ থেকে বেরিয়ে আসেন। ঐ যে বেরিয়ে এলেন তাঁরা আর সংসদ অধিবেশনে যোগদান করেন নি। ঐ 'ওয়াক আউটের' পর পরই মাগুরার একটি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি এবং ভোট ডাকাতির অভিযোগ উথাপিত হয়। নির্বাচন কমিশনের নিকট কেউ কোন অভিযোগ উথাপন না করলেও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কারচুপির লজ্জাজনক ঘটনা। এরপর থেকে শুরু হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন। ঐ দাবিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত হয় জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত-ই-ইসলাম।

এর পরের দু'বছর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের ইতিহাস। দাবি একটাই–জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে হবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, কোন দলীয় সরকারের অধীনে নয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রথমে এ দাবিকে অযৌক্তিক হিসেবে অগ্রাহ্য করে। তাদের ধারণা ছিল, কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মসূচির পর এ দাবি আপনাআপনি স্তিমিত হয়ে পড়বে। এ দাবিকে নিয়ে অগ্রসর হলে তিনদল জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের এ ধারণা পরে ভুল প্রমাণিত হয়। ধর্মঘট, অবরোধ এবং হরতালের ফলে দেশে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হয় সংঘাতময় অধ্যায়। ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় ১৪৭ জন সংসদ সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে আপস মীমাংসা বা পারস্পরিক বুঝাপড়ার আর কোন সুযোগ রইলো না। একদিকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অনড় অবস্থান, অন্যদিকে প্রথমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত-ই-ইসলাম এবং পরে অন্যান্য ছোট দলগুলোরও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবির ফলে রাজনীতি নেমে এলো রাজপথে।

অবশ্য সরকার এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আপোষ মীমাংসার জন্য দু'বছরে অন্ততঃপক্ষে ১৫টি দেশি-বিদেশি উদ্যোগ এবং ২০টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৯৯৪ সালের মে মাসে তদানীন্তন স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সর্বপ্রথম এ সংকট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঐ বছর জুন-জুলাই মাসে

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এবং সংসদ উপ-নেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যর্থ হন। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমনওয়েলথ মহাসচিব প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ পর্যায়ে কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান ৪২ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করে সমঝোতার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী রবিন র‍্যাফেলও উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জন মেরিল এবং তাঁর সহযোগী ইউরোপের রাষ্ট্রদূতগণ। এক পর্যায়ে সমঝোতার চেষ্টা করেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য বিল রিচার্ডসন। সর্বশেষে রাষ্ট্রপতিও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশের বুদ্ধিজীবীগণও পাশাপাশি উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সমঝোতার ফর্মূলা উত্থাপন করেন।

এ দিকে সংকট নিরসনের লক্ষ্যে দু'বছরে চলমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেশে হরতাল-অবরোধ হয়েছে ১৭৩ দিনের মতো। ৬ ঘণ্টা, ১২ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা, ৭২ ঘণ্টা, ৯৬ ঘণ্টা, এমনকি ১০৬ ঘণ্টা পর্যন্ত একটানা হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শেষ পর্যায়ে ৯ মার্চ থেকে শুরু হয় একটানা অসহযোগ আন্দোলন। এ সব কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক ব্যক্তি। আহত হয়েছেন এক হাজারেরও বেশি। চরম অবনতি ঘটেছে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয় ক্ষত-বিক্ষত ও বিপর্যস্ত।

এ সংকটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অবস্থান ছিল ভিন্নরূপ। প্রথমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তারা অযৌক্তিক আখ্যা দেন। পরে অবশ্য তাদের সুর নরম হয়ে আসে। তারা বলেন, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এ সংকটের সমাধান হবে। কিন্তু ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগের ফলে সংবিধান সংশোধনেরও কোন অবকাশ নেই। ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপনের মাধ্যমে এর সমাধান করা হবে।

এ লক্ষ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার কিছুদিন পূর্বে পঞ্চম সংসদ ভেঙে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এবং ষষ্ঠ সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়। কয়েকবার নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে নির্বাচন কমিশন। এ নির্বাচন যেন অনুষ্ঠিত হতে না পরে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলাম এবং অন্যান্য দল এ নির্বাচন প্রতিরোধের সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিনে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিনে, ভোট প্রদানের আবেদনের সময়, এমনকি নির্বাচনের দিনও হরতাল ডেকে ভোটারদের নিরস্ত করতে থাকে। ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমগ্র সমাজব্যাপী সহিংসতার এক রুদ্ররূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অনেক কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে এসব কারণে ভোটদানকারীর সংখ্যা হয় অত্যন্ত নগণ্য। কোন কোন কেন্দ্রে ভোট পড়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ, কোন কোন কেন্দ্রে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। এদিকে কিছু কিছু উৎসাহী প্রার্থী এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যাপক ভোট কারচুপিরও আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েকটি আসনে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে প্রার্থী যে পরিমাণ ভোট পায়, এবারে তার চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। দেশের এবং বিদেশ থেকে আগত সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণে এ নির্বাচনকে 'অগ্রহণযোগ্য' নির্বাচন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সরকারের অবস্থা ফলে আরো নাজুক হয়ে উঠে। চারদিক থেকে প্রতিবাদের

ঝড় উঠে। ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন প্রমাণ করলো যে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। ষষ্ঠ সংসদকে বিরোধী দলসমূহ 'অবৈধ সংসদ' রূপে আখ্যায়িত করে এবং এ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং দাবি ওঠে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল হলেই শুধু রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য আলোচনা হতে পারে। এ দাবি চারদিক থেকে উঠে আসে। সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে।

এ প্রেক্ষাপটে এবং এভাবে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংসদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপন করে ২৫ মার্চ ১৯৯৬ সালে। ২৫-২৬ মার্চ এই বিলের উপরে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন প্রণীত হয়। এ আইনের ভিত্তিতে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী দেশের প্রখ্যাত দশজন নাগরিককে উপদেষ্টারূপে নিয়োগ দান করা হয়। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সপ্তম সংসদের সদস্যগণকে ১২ জুন নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ষষ্ঠ সংসদের নির্বাচন

ষষ্ঠ সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। এ নির্বাচনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

(এক) এ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচনকে "অবৈধ", "অগ্রহণযোগ্য" এবং "নির্বাচনের ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায়" হিসেবে চিহ্নিত করে। বিরোধী দলগুলোর অসহযোগিতা সত্ত্বেও তা অনুষ্ঠিত হয়।

(দুই) এ নির্বাচনে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক ভোটদাতা ভোট প্রদান করেন। দেশি এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মতে এ নির্বাচনে ভোট পড়েছে মাত্র শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগের মতো। কোন কোন কেন্দ্রে কোন ভোট প্রদত্ত হয় নি। বিরোধী দলগুলোর তীব্র বিরোধিতা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তীব্রতার ফলে দেশব্যাপী ভয়ংকর সহিংসতা এবং এক ধরনের নৈরাজ্যের মুখে ভোটদাতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটদানে আগ্রহী হয় নি।

(তিন) কোন কোন ভোট কেন্দ্র সন্ত্রাসীদের দখলে যাবার ফলে এবং অন্যত্র স্বল্প সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হলেও আশাতীতভাবে অধিক ভোট লাভের ঘটনা ঘটে। তাই ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। দেশ-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোয় তাই এ নির্বাচনকে "অগ্রহণযোগ্য" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

(চার) এ নির্বাচনে প্রধানত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরাই বিজয়ী হন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশব্যাপী সহিংস আন্দোলনের মুখে ঘোষণা করে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৯৪ সালের শেষ প্রান্তে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের ফলে পঞ্চম সংসদে কোন সাংবিধানিক সংশোধন আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় নি। তাই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার জন্য, বিশেষ করে ষষ্ঠ সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য, এ নির্বাচন ছিল অপরিহার্য। সুতরাং ষষ্ঠ সংসদের নির্বাচনকে এ আলোকে দেখা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রায় সব ক'টি আসনে বিজয়ী হন। জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এন ডি এ) লাভ করে ১টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করেন ৩টি আসন। এ সংসদের আয়ু ছিল সর্বক্ষিপ্ততম, মাত্র ১১ দিন।

ষষ্ঠ সংসদের অবদান ঃ ষষ্ঠ সংসদ বিভিন্নভাবে সমালোচিত হলেও এর অবদান ছিল ঐতিহাসিক। ১৯৯৬ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ সংসদে গৃহীত হয় বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন এবং এ আইনে বিধিবদ্ধ হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারই সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল ১৯৯১-১৯৯৬

তাঁর কার্যকাল ঃ ১৯৯৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল দেখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দান করেন ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চে। ২০ মার্চে বেগম খালেদা জিয়া ১১ জন মন্ত্রী এবং এবং ২১ জন প্রতিমন্ত্রীসহ প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন। ষষ্ঠ সংসদে ত্রয়োদশ সংশোধন আইন গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালের ২৫-২৬ মার্চে। ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। ঐদিন রাষ্ট্রপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে সপ্তম সংসদের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষে ত্রয়োদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

তাঁর কার্যকালে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। নিচে তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ হল।

(এক) বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঃ দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার দাবি বহুদিনের। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি সাময়িক সংবিধান আদেশে তার সূচনা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধন আইনে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের নামে এক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী এমএজি ওসমানী এ দাবিকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও বিরোধী দলীয় প্রার্থী ড. কামাল হোসেনের নির্বাচনী ইস্তেহারেও ছিল এই দাবি। নব্বই-এর গণ-আন্দোলনে তিন দলীয় জোটের অঙ্গীকারেও ছিল বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পরে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ, অভূতপূর্ব সৌহার্দ, সমঝোতা ও আনন্দঘন পরিবেশে জাতীয় সংসদে একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধন আইন প্রণীত হয়। একাদশ সংশোধন আইনের পক্ষে ছিল ২৭৮টি ভোট এবং দ্বাদশ সংশোধন আইনের পক্ষে ছিল ৩০৭টি ভোট। বিপক্ষে কোন ভোট ছিল না। ডেপুটি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী এ ঐতিহাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

(দুই) সাংবিধানিক গণভোট ঃ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২(১)ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮,৪৮,৫৬, ৫৮, ৮০, ৯২ (ক) এবং ১৪২ অনুচ্ছেদের কোন বিধান সংশোধনের জন্যে জাতীয় সংসদের আইন যথেষ্ট নয়। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদানের পূর্বে গণভোটের ব্যবস্থা করবেন। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইন ছিল এমনি একটি আইন। দ্বাদশ সংশোধন আইনে সংবিধানের ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ক অনুচ্ছেদের কিছু বিধান সংশোধিত হয়। তাই রাষ্ট্রপতি সম্মতিদানের পূর্বে দেশব্যাপী এক গণভোটের ব্যবস্থা করেন। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি হিসাবে জানা যায়, সর্বমোট ছয় কোটি বাইশ লক্ষ চার হাজার একশো আঠার জন ভোটারের মধ্যে দুই কোটি সত্তর লক্ষ আটাশ হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই জন ভোট দেন। তা ছিল বৈধ ভোটের শতকরা ৩৪.৯৩ ভাগ। বৈধ ভোটের মধ্যে এক কোটি তিরাশী লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো বিরাশী জন "হাঁ" ভোট দেন। অন্যদিকে তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশী হাজার সাতশো তের জন "না" ভোট দেন। ফলে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালের সাংবিধানিক গণভোটে "হাঁ" সূচক ভোট ছিল শতকরা ৮৪.৪২ এবং "না" সূচক ভোট ছিল শতকরা ১৫.৫৮ ভাগ।

(তিন) প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী কর্তৃত্ব ঃ ১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত গণভোটে সমর্থিত হলে দ্বাদশ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করেন। এরপরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র, দীর্ঘ ষোল বছর পরে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একজন আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। এ বিধান অনুযায়ী ১৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শপথ গ্রহণ করেন।

(চার) রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত ঃ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর। এ নির্বাচনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনী কলেজ (Electoral College) হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন পরিচালিত হয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক। সদস্যদের প্রকাশ্য ভোটে (Open ballot) এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী এবং জাতীয় সংসদের স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী।

(পাঁচ) বাংলাদেশ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন এবং বাংলাদেশ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন প্রণয়ন ঃ বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ দেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। তিনি বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনী একাদশ আইনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ এবং ঐ সময়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কৃত এবং গৃহীত কাজ কর্মের অনুমোদন দেয়া হয়। একাদশ সংবিধান সংশোধন আইনে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২০ অনুচ্ছেদের পর ২১ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়, একাদশ সংবিধান সংশোধন আইন প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার গ্রহণ করার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। দ্বাদশ সংশোধন আইনে, আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সংসদীয়

গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী। রাষ্ট্রপতি হলেন প্রজাতন্ত্রের আলঙ্কারিক প্রধান। স্থানীয় শাসন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

(ছয়) বাংলাদেশ সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন ঃ বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন ১৯৯৬ প্রণীত হয়। একটি সংসদ সমাপ্ত হলে অথবা ভেঙে গেলে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (Non-Party Caretaker Government) সৃষ্টির জন্যে এ সংশোধন আইন প্রণীত হয়। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পর এ সংশোধন আইন নতুন পরিচ্ছেদ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২৫–২৬ মার্চে এ আইনটি ষষ্ঠ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এ আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তাঁকে পরামর্শ দানের জন্যে রাষ্ট্রপতি দশজন নির্দলীয় নাগরিককে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের কার্যকাল ছিল ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলের মূল্যায়ন ঃ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা হিসেবে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়নের পর তিনি ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চে পদত্যাগ করেন। এই পাঁচ বছরে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হল ঃ

(এক) তার শাসনামলে দীর্ঘ ১৬ বছর পরে বাংলাদেশে আবারো সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

(দুই) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার লক্ষে জাতীয় সংসদের প্রাধান্যের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংগঠিত মন্ত্রিপরিষদের হাতে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব আবার ন্যস্ত হয়।

(তিন) ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

(চার) দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাঠামোগত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের পথও রচিত হয় এ আমলে। উদারনীতি গৃহীত হলে বাংলাদেশ পরিচিত হতে থাকে "উঠতি ব্যাঘ্র" (An Emerging Tiger) রূপে।

(পাঁচ) এ আমলে বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তা লাভ করে সর্বাধিক। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে।

(ছয়) বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সমধিক অগ্রগতি অর্জন করে।

(সাত) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। জাতিসংঘের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর একাংশ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি মধ্য ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহে শান্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়।

সপ্তম সংসদের নির্বাচন, ১৯৯৬

সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ জুন। এ নির্বাচন বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রকৃতিগত দিক থেকে এ নির্বাচন স্বতন্ত্র নিম্নে বর্ণিত কারণে ঃ

(এক) এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে প্রণীত ত্রয়োদশ সংশোধন আইনে গৃহীত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন ছিল তিন দলীয় জোটের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে সৃষ্ট এক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো সাংবিধানিকভাবে সৃষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বিশ্বে এর কোন নজির নেই।

(দুই) এ দেশে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট দাতা এ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদত্ত হয় মোট ভোটের শতকরা ৫৫·৫৪ ভাগ। ১৯৯৬ সালে প্রদত্ত হয় শতকরা ৭৩·৬১ ভাগ ভোট। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পড়ে খুলনা বিভাগে, শতকরা ৮২·০ ভাগ এবং সর্বনিম্ন ভোট প্রদত্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে, শতকরা ৬৪·০ ভাগ। ভোটের এই হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের চেয়ে অনেক বেশি। ইউরোপ, আমেরিকার সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজেও এমনটি সচরাচর ঘটে না।

(তিন) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলে ভোট কেন্দ্রগুলোতে সন্ত্রাস এবং ভোটকেন্দ্র দখলের মত ঘটনা এবারে ঘটে সব চেয়ে কম। সরকারি এবং বেসরকারি মহলের রিপোর্ট অনুযায়ী এ নির্বাচন ছিল সবচেয়ে মুক্ত, অবাধ এবং নিরপেক্ষ।

(চার) প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রচারণা ক্ষেত্রে এবার নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঋণখেলাপীদের এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না।

(পাঁচ) এবার সংসদ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে বিরাট সংখ্যক দেশি এবং বিদেশি পর্যবেক্ষক ভোটকেন্দ্রে গমন করেন। অবাধ নির্বাচন এভাবে সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

(ছয়) এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন সর্বাধিক সংখ্যক দল এবং দলীয় প্রার্থী। এক হিসেব অনুযায়ী, এ নির্বাচনে ৩০০টি আসনে অংশ গ্রহণ করেন ৮১টি দলের ২,২৯৩ জন প্রার্থী। তাছাড়াও ছিলেন ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। এবারে প্রতীক বরাদ্দ করা হয় ১৩৮টি।

(সাত) নির্বাচনে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য সেনা, বিডিআর, পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সর্বমোট ৪০,০০০ সদস্য মোতায়েন করা হয়।

সপ্তম সংসদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল ১২ মে ১৯৯৬। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ছিল ১৮ মে ১৯৯৬। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ জুন। ২৭টি আসনে ১২২টি ভোট কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯ জুন। ২২ জুন একটি আসনে পুনঃনির্বাচনের মাধ্যমে সার্বিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

নির্বাচনে ৩০০টি আসনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের ২,২৯৩ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮১ জন। এ নির্বাচনে সর্বমোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৫৭৪ জন। তাঁদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৪৮ জন এবং সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৭১ জন।

এ নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৭ জন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ভোটার ছিলেন ২,৭৯,৫৬,১৪২ জন এবং পুরুষ ভোটার ছিলেন ২,৮৭,৫৯,৯৯৫ জন। দেশে সর্বমোট ভোটকেন্দ্র ছিল ২৫,৯৬৭টি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং জামায়াত-ই-ইসলাম ৩০০টি আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দান করে। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি মনোনয়ন দান করে ২৯২টি আসনের জন্য। জাকের পার্টি ২৪১টি আসনের জন্য প্রার্থী মনোনীত করে এবং গণফোরাম ও ইসলামী ঐক্যজোট মনোনীত করে ১০৪ ও ১৬৫টি আসনে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতীক ছিল ধানের শীষ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতীক ছিল নৌকা।

চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী এ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১১৬টি আসন লাভ করে সংসদে বৃহত্তর বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবার ভোট পায় শতকরা ৩৭·৫৩ ভাগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল লাভ করে শতকরা ৩৪·৪০ ভাগ ভোট। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে ২৭টি আসন লাভ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন। জাতীয় পার্টি বিজয়ী হয় ৩২টি আসনে এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ৩টি লাভ করে সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াত-ই-ইসলাম লাভ করে মাত্র ৩টি আসন।

নিচে সপ্তম জাতীয় সংসদে বিভিন্ন দলের বিজয়ী সদস্যের সংখ্যা দেয়া হলো :—

সারণি—২০·২

সপ্তম সংসদে দলগত অবস্থান

দল	আসন সংখ্যা
১। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৬
২। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১১৬
৩। জাতীয় পার্টি	৩২
৪। জামায়াত-ই-ইসলাম	০৩
৫। জাসদ (রব)	০১
৬। ইসলামী ঐক্যজোট	০১
৭। স্বতন্ত্র	০১
মোট	৩০০

উৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

এই নির্বাচনের গুরুত্ব

বিভিন্ন দিক থেকে এ নির্বাচনের গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য।

(এক) সপ্তম জাতীয় সংসদে বিজয়ী দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় ২১ বছর পর আবারো ক্ষমতায় আসীন হলো। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে নিহত হবার পর এই প্রথম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হলো।

(দুই) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংসদে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে ফিরে আসে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর পঞ্চম সংসদ তার কার্যকাল পূর্ণ করেছে। ষষ্ঠ সংসদ ছিল মধ্যবর্তী এক পর্যায়ের সংসদ। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন প্রণয়ন ছিল এর এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে এ সংশোধন আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

(তিন) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে সপ্তম সংসদের নির্বাচনে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সর্বপ্রথম এ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। তখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ১৪৬ এবং ৮৮ আসনে বিজয়ী হয়ে সংসদে দু'টি প্রধান দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সংসদীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রায় অপরিহার্য। এবারেও এ দু'টি দল সংসদে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আশা করা যায়, এভাবে আরো ক'টি নির্বাচনে সংসদে দু'টি দলের প্রাধান্য অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ রাজনীতি সুস্থতার আশীর্বাদ লাভ করবে।

(চার) জামায়াত-ই-ইসলাম এবারের নির্বাচনে প্রায় বিপর্যস্ত হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়ী হলেও এবারে লাভ করে মাত্র ৩টি আসন।

(পাঁচ) সামগ্রিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন কয়েকজন রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে এসেছেন। ১৯৯১ সালের মতো ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে এবং হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ৫টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ৩টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। তাছাড়াও, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ নাসিম এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অলি আহমদ এবং সাইফুর রহমান ২টি আসনে বিজয়ী হন।

(ছয়) এই নির্বাচনের ফলে দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়। জনপ্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য গঠনে সক্ষম হলে গণতন্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রকার অনিশ্চয়তার অবসান হতে পারে।

সপ্তম সংসদের সূচনা

সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই। রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে এ অধিবেশনের সূচনা হয়। প্রথম অধিবেশনে সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হন জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন এডভোকেট আবদুল হামিদ।

সংসদের এই অধিবেশনে সংসদ সদস্যগণ পরবর্তী মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তপসিল অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখ ছিল ২২ জুলাই, মনোনয়নপত্র বাছাই এর তারিখ ছিল ২৩ জুলাই এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তারিখ ছিল ২৪ জুলাই। নির্বাচনের তারিখ ছিল ১ আগস্ট। এই নির্বাচনে একমাত্র প্রার্থী ছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ। নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১-এর সপ্তম অনুচ্ছেদ এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধি ১৯৯১-এর ১২(৬) অনুযায়ী তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালে তিনিই ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

শেখ হাসিনার শাসনামল

শেখ হাসিনার কার্যকাল : সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ জুন। এ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই। ২০০১ সালের ১৪ জুলাই জাতীয় সংসদের কার্যকাল শেষ হলে ১৫ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান। ফলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার কার্যকাল শেষ হয় ২০০১ সালর ১৪ জুলাই।

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ২৩ জুনে ক্ষমতাসীন হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একাংশের সমর্থন লাভ করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১১৬টি আসন লাভ করে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে প্রস্তুত হয়। শেখ হাসিনার সরকার পাঁচ বছরে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(এক) গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি : শেখ হাসিনার শাসনামলে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের অন্যতম হল ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বরে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত ৩০ বছরের গঙ্গার পানি চুক্তি। ৩০ বছরের এই পানি বণ্টন চুক্তিকে শেখ হাসিনা সরকারের বিরাট সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যদিও এ চুক্তিতে কোন গ্যারান্টি সূত্র (Guarantee Clause) নেই এবং নেই কোন সংকটকালে মধ্যস্থতাকারী তৃতীয় পক্ষের অবস্থান।

(দুই) পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি : পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি এই শাসনামলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ

সরকারের এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। আয়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম (বান্দরবান, রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়ি) বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌশলগত অবস্থানও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে গ্যাস ও জ্বালানি তেল পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। দেশের এই তিনটি জেলা আয়তনে বৃহৎ হলেও জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত কম। এ এলাকায় দেশের ৫৭টি উপজাতি ও আদিবাসী গোষ্ঠির ১২টি উপজাতি বাস করে থাকেন। তাদের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। তাছাড়াও ৫ লক্ষের কিছু কমসংখ্যক বাঙালি জনসমষ্টি বসবাস করেন। ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত চুক্তির লক্ষ্য ছিল—এর মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ উপজাতীয়দের কিছু দাবি মেনে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় এবং বাঙালিদের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করা। তবে এও উল্লেখযোগ্য যে, চুক্তিতে কিছু শর্ত সংযোজন করা হয়েছে যার কয়েকটি দেশের সংবিধান বিরোধী। বাংলাদেশের মত একক এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ৬৪টি জেলা পরিষদের ৩টি সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন অনেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র গঠনের সামিল।

(তিন) একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঃ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনেসকো (UNESCO—United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) বা জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বিশ্বে প্রায় চার হাজারের মত মাতৃভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Languages Day) রূপে ঘোষণা করেছে। কানাডায় বসবাসকারী বাংলাদেশের প্রবাসী নাগরিকদের উদ্যোগ, বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আন্তরিকতায় এদেশের জনগণের আবেগবিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারিতে সংযোজিত হয় নতুন এক মাত্রা।

(চার) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে ১৯৯৬ সালের ২২ আগস্টে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদের সদস্যদের দ্বারা, অনেকটা উন্মুক্ত ভোটে। এ নির্বাচন ছিল সর্বসম্মত এই অর্থে যে, বিরোধী দল বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দেয় নি।

(পাঁচ) সংসদীয় কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঃ শেখ হাসিনার শাসনামলে সংসদীয় কমিটি পর্যায়ে এক কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়। সংসদে ৩৫টি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বা সভাপতি হন বিভাগীয় মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদের সদস্যগণ।

(ছয়) প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রবর্তনও আর একটি নতুন পদক্ষেপ।

শেখ হাসিনার শাসনামলে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে যেভাবে, সঙ্গোপনে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এড়িয়ে, জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মত "নব্য গণতন্ত্রে" গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হলেও এ সরকার মনোযোগী হয়ে ওঠে ক্ষমতা স্থিতিশীল করার জন্যে "ঐকমত্যের সরকার" গঠনে এবং বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে মন্ত্রিত্বের প্রলোভন দিয়ে দলছুট করতেও এ সরকার কুণ্ঠিত হয় নি। এ আমলে জাতীয় ঐক্য তেমন সুদৃঢ় হয় নি। স্বাধীনতার পক্ষের এবং বিপক্ষের শক্তি—এই প্রকরণে জাতিকে ক্ষমতাসীন সরকার বিভক্ত করেছে। যারা আওয়ামী পন্থী, তাদের কথায়, তাদের অতীত কর্মকাণ্ড যাই হোক না কেন, তারা সকলেই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। এভাবে সামাজিক শক্তিগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সরকারের আমলে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের (Transparency International) 2000 সালের বাৎসরিক বিবরণে বাংলাদেশকে দেখানো হয় বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র হিসেবে।

শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকলেও, বেতার এবং টেলিভিশনের মত তথ্যমাধ্যমগুলো দলের মুখপাত্র হিসেবে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে দীর্ঘ পাঁচ বছর। এই অভিযোগ এনেছে প্রায় প্রত্যেকটি বিরোধী দল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু ১৯৯৬ সালের শেষ প্রান্তে শেয়ার বাজারে নেমে আসা ধস, টাকার অবমূল্যায়ন যা ঘটেছে অন্তত ১৮ বার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে আসা ছিল অনেকগুলো প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তবে এ সময়ে বাংলাদেশে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে উন্নীত হয়। এ আমলে প্রশাসনকে দলীয়করণের অভিযোগ ছিল খুব দৃঢ়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

অষ্টম জাতীয় সংসদ সংগঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে। এ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বিচারপতি লতিফুর রহমান। ২০০১ সালের ১৫ জুলাই তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০১ সালের ১০ অক্টোবরে চারদলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকাল সমাপ্ত হয়।

এই সরকারের উপদেষ্টাবৃন্দ

প্রধান উপদেষ্টারূপে বিচারপতি লতিফুর রহমান নিয়োগ লাভ করেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক। তাঁর পরামর্শ ক্রমে আরও দশজন উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান উপদেষ্টারূপে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন। অন্যান্য উপদেষ্টারা ছিলেন মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন। দশজন উপদেষ্টার সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিক, নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতি ব্যক্তিত্ব। দশজন উপদেষ্টার মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা।

অন্যান্যরা ছিলেন ব্যবহারবিদ, বিচারক, প্রশাসক, শিল্পপতি, চিকিৎসকদের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব

বিচারপতি লতিফুর রহমানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল সংবিধানে উল্লিখিত ৯০ দিনের মধ্যে দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অষ্টম জাতীয় সংসদ সংগঠন করা। নির্বাচনকে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ঃ (এক) নির্বাচন কমিশনকে আংশিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন। (দুই) পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষে অনুগত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যেভাবে কেন্দ্রে ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করেছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করেন। (তিন) অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। (চার) যে সকল স্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভীষণ অবনতি ঘটেছিল সেসব স্থানে দশ দিন পূর্বে এবং অন্যান্য স্থানে সপ্তাহ খানেক পূর্বে সামরিক বাহিনী সদস্যদের মোতায়েন করে ভোটদাতাদের মনে নির্ভয়ে ভোটদানের আস্থা জাগ্রত করেন। (পাঁচ) তাছাড়া, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাও প্রদান করা হয় এজন্যে যে, কোন অন্যায়কারী নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করে জনরায়কে যেন বিকৃত করতে না পারে। (ছয়) নির্বাচনী বিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয়। (সাত) তাছাড়া, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান তার বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতিতে সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেন। ফলে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন হয় অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চার দলীয় ঐক্যজোট এ নির্বাচনে লাভ করে ৩০০টি আসনের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক, সর্বমোট ২১৬টি আসন এবং এককভাবে বিএনপি লাভ করে ১৯৩টি আসন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লাভ করে মাত্র ৬২টি আসন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এসব পদক্ষেপকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে, বিশেষ করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ব্যাপক রদবদলকে, নির্বাচনের সপ্তাহ খানেক পূর্বে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ভোট কেন্দ্রে মোতায়েনকে এবং নির্বাচনী বিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তাদের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাপ্রদানকে। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে আওয়ামী লীগ এ ফলকে অস্বীকার করে এবং নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনয়ন করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনে। ১৯৯১ সালে এ দলটি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে এনেছিল "সূক্ষ্ম কারচুপির" অভিযোগ। এবার তারা বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আনে "স্থূল কারচুপির" অভিযোগ।

সারণি ২০·৩ ।
২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের ফলাফল

দল	আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা)
১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৯৩	৪০.৯৭
২। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬২	৪০.১৩
৩। জামায়াত-ই-ইসলাম	১৭	৪.২৮
৪। জাতীয় পার্টি (এ)	১৪	৭.২৫
৫। জাতীয় পার্টি (ম)	০১	০.৪৪
৬। কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ	০১	০.৪৭
৭। ইসলামী ঐক্যজোট	০২	০.৬৮
৮। স্বতন্ত্র	০৬	০.৬৬
মোট	৩০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

লতিফুর রহমানের শাসনামলের মূল্যায়ন

বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে দেশের এবং বিদেশের পর্যবেক্ষকগণ ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাদের মতে, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন হয়ে ওঠে সার্বিকভাবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য। এ সরকারের নেতৃত্বে দেশের প্রশাসন ছিল নিরপেক্ষ। নির্বাচনী বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়। দেশ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সম্পূর্ণরূপে সফল না হলেও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার নির্বাচনকালে হ্রাস পায় আশাতীতভাবে। বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের সমর্থন লাভ করে এ সরকার। গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য অত্যন্ত উঁচুমানের।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে চার দলীয় ঐক্যজোট জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২১৬টি আসন লাভ করে ক্ষমতাসীন হয়। প্রধানমন্ত্রীরূপে ১০ অক্টোবরে শপথ গ্রহণ করেন বেগম খালেদা জিয়া। আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল মাত্র ৬২টি আসন। এ নির্বাচনে ২৬৯ আসনে বিএনপির প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বিএনপি, জাতীয় পার্টি (নাফি) এবং ইসলামী ঐক্য জোটের প্রার্থী এবং ৩১টি আসনে জামায়াত-ই-ইসলামের প্রার্থী নিজেদের প্রতীক দাড়িপাল্লা নিয়ে। ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবরে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবে এ সরকারের ব্যর্থতাও উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোট জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসন লাভ করে শুধু আত্মবিশ্বাসী হয় নি, হয়েছিল অতি-আত্মবিশ্বাসী (Over-Confident)। ফলে যে ক্ষেত্রে সংযত হবার কথা, সেক্ষেত্রে হয়েছিল অতি উৎসাহী এবং যে ক্ষেত্রে অধিক উদ্যোগী হবার কথা, সে ক্ষেত্রে থেকেছিল নীরব। তাই এ আমলে অগ্রগতি হয়েছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নানা সমস্যাও। নিচে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ হল।

(এক) বেগম খালেদা জিয়ার আমলে দেশে সর্বাধিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি নির্দেশক ছিল উর্ধ্বমুখী। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রতি বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হয়েছিল শতকরা পাঁচ এর উপরে। শেষ বছরে এ হার হয় শতকরা ৬.৭। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। বিশ্বময় বাংলাদেশ পরিচিত হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে "এক উঠতি ব্যাঘ্র" রূপে ('An Emerging Tiger')।

(দুই) এ সময়কাল দেশের বেকার এবং আধা-বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এবং তাও দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে। বিদেশে কর্মরত অদক্ষ শ্রমিকদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পায় প্রচুর পরিমাণে। এক হিসাবে দেখা যায়, এ আমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় প্রায় কুড়ি লক্ষের মত।

(তিন) এ আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জিত হয় বিরাট সাফল্য। নারী শিক্ষার জন্য উপ-বৃত্তি প্রচলিত হয়। শিক্ষার জন্য খাদ্য-কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বহুসংখ্যক মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায়তন। প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক শিক্ষায়তনে ইংরেজি হয়ে ওঠে শিক্ষার মাধ্যম। অতীতে পরীক্ষা ক্ষেত্রে যে অনিয়ম চালু ছিল তা শক্ত হাতে দমনের ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

(চার) স্বাস্থ্য সেক্টরে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বহু সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে এসব কেন্দ্রে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

(পাঁচ) জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে পলিথিনের ব্যবহার এবং উৎপাদন নিষিদ্ধ হয়। রাজপথ পরিচ্ছন্ন এবং যানজট নিরসনের জন্য যানবাহনের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যানবাহনে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মাণ ও সংক্ষিপ্ত পথে চলার জন্যে বাইপাস তৈরি করে রাজপথে গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হয়।

(ছয়) দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা RAB তৈরির মাধ্যমে দেশের কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ গ্রহণ করা হয়।

(সাত) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম স্বাধীন দুর্নীতিদমন কমিশন গঠন করা হয়, যদিও তা তখন কার্যকর হতে পারে নি কোন এক অদৃশ্য কারণে।

(আট) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'পূর্বমুখী নীতি' ('Look East') প্রবর্তিত হলে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ বহুসংখ্যক বন্ধু তৈরিতে সক্ষম হয়। পাশ্চাত্যেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভারতের সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

(নয়) বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঢাকায় সার্কের ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সার্কের পিতৃভূমি ঢাকায়। দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসকারী প্রায় দেড়শো কোটি জনসমষ্টির মধ্যে দক্ষিণ এশীয় পরিচিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাউথ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ এ অঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার যে সংকল্প তা ঐতিহাসিক।

(দশ) মুসলিম জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণও এ আমলের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্জন। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৬৩টির বিভিন্ন অংশে পাঁচ শতাধিক বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল এবং তাও পবিত্র ইসলামের নামে, দেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, শায়ক আবদুর রহমান ও বাঙলা ভাই সিদ্দিকুল ইসলামের নেতৃত্বে। বেগম জিয়ার সরকার ক্ষিপ্রগতিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এভাবে দেশকে জঙ্গীবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখার সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পদক্ষেপ বিশ্বময় নন্দিত হয়েছে। জামায়াত-উল-মুজাহেদিনের (JMB) শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ফাঁসি দেয়া হয়।

এ সরকারের ব্যর্থতাও রয়েছে প্রচুর। বেগম জিয়ার শাসনামলে জাতীয় সংসদ কার্যকর হয় নি। সম্ভব হয় নি বিরোধী দলের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা অপরিহার্য তা সম্ভব হয় নি। দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হলেও দুর্নীতি দমনের কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নি, বরং তা যেন আরো ডালপালা বিস্তার করে সমগ্র সমাজকে গ্রাস করেছে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে পরপর চার বছর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। বিরাট মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি এ সরকার। পক্ষপাতিত্ব এবং অনুগতদের প্রতি দুর্বলতা সরকারের অর্জিত কৃতিত্বগুলোকে ধুলি ধূসরিত করে তুলেছিল অনেকটাই।

ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের শাসনকাল

Non-Party Caretaker Government Under Dr. Iajuddin Ahmed

২০০৬ সালের ২৯ অক্টোবর রাত্রিতে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রপতির এ অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের বিরোধিতা করলেও তখনকার কঠিন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে রাষ্ট্রপতি এ দায়িত্ব পালনে রাজি হন। ১ নভেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারূপে ১০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ড. ইয়াজউদ্দিনের সরকার প্রথম থেকেই আস্থার সংকটে ভুগছিলেন। ১৪-দলীয় জোট এ সরকারের উপর কোন সময় আস্থা স্থাপন করে

নি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণসহ একগুচ্ছ দাবি উপস্থাপন করে। তারা এক পর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিনেরও পদত্যাগ দাবি করে। তাদের দাবি ছিল নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ হোক। সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি হোক, নির্বাচন পরিচালনার জন্য দলীয় ক্যাডারের পরিবর্তে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা নিযুক্ত হোক। ১৪ দল কর্তৃক ১১টি করণীয় সুস্পষ্ট করে প্রথমে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এবং শেষ পর্যায়ে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এসব দাবি আদায়ের জন্য তারা দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে দেশের রাস্তাঘাটসহ, স্থলবন্দর, গার্মেন্টস শিল্প, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে। অর্থনীতি গতি হারায়। নাগরিক জীবন পর্যুদস্ত হয়ে ওঠে। উপদেষ্টাগণও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ২০ নভেম্বর থেকে অবরোধ কর্মসূচি আরো কঠোরভাবে পালনের জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমনকি বঙ্গভবন অবরোধেরও সিদ্ধান্ত হয়। ফলে বঙ্গভবন হুমকির মুখে পড়ে। সুপ্রিম কোর্ট নিরাপত্তাহীন হয়ে ওঠে। অর্থনীতির জীবন রেখা (Lifeline) অচল হয়ে আসে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় বহু ব্যক্তি নিহত এবং আহত হতে থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে (১০ ডিসেম্বর) বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গৃহীত হয়। তাতেও পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি, বরং প্রধান উপদেষ্টা এবং কিছু উপদেষ্টার মধ্যে মতানৈক্য এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের ৪৩তম দিনে ১১ ডিসেম্বর ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহণ করে চার জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। নতুনভাবে চার জন উপদেষ্টার নিয়োগ সম্পন্ন হলেও পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি। ১৪-দলীয় জোট, জাতীয় পার্টি এবং এলডিপি-এর যোগদানের ফলে মহাজোটে রূপান্তরিত হয়, ১৮ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এক মহাসমাবেশে। সেই মহাসমাবেশ থেকে ২১ ডিসেম্বর সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেয়া হয়। দাবি করা হয়-ভোটার তালিকা হাল নাগাদ করতে হবে। প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে পদত্যাগ করতে হবে। তা না হলে মহাজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এ দাবি পূরণে ২৪ ঘণ্টার চরমপত্রও দেয়া হয়। ৩ জানুয়ারির মহাজোটের সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একই দাবিতে ৭ ও ৮ জানুয়ারি দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। দাবি আদায় না হলে বঙ্গভবন অবরোধ করা হবে বলেও ঘোষণা দেয়া হয়। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা এভাবে তিরোহিত হয়ে আসে। ২০০৭ সালের ১০ জানুয়ারি নির্বাচনের সময় দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সারাদেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ১১ জানুয়ারি রাত্রি ১১টায় রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ তিনি ত্যাগ করেন। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তার শাসনামলে বিরোধী দলসমূহের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন নি। উপদেষ্টাদের সাথে তার সম্পর্ক সুখকর ছিল না।

ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার
Non-Party Caretaker Government of Fakhruddin Ahmed

২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আরো ১০ জন উপদেষ্টা পরবর্তীকালে শপথ গ্রহণ করেন। উপদেষ্টাদের সকলে ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতি ব্যক্তিত্ব। উপদেষ্টামণ্ডলীর দুজন ছিলেন মেজর জেনারেল, দুজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, দুজন প্রবীণ প্রশাসক, একজন খ্যাতনামা ব্যবহারিক এবং একজন শিল্পপতি। জরুরি অবস্থা জারির পরে, বিশেষ করে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সক্রিয় সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভ করে এ সরকার অনেকগুলো উত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণ করে এ সরকার প্রথমে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে দুর্নীতি দমন কমিশন এতদিন প্রাণহীন অবস্থায় নামসর্বস্ব হয়ে টিকেছিল সরকার তাকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলেন। বাংলাদেশ কর্ম কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, মঞ্জুরি কমিশনের মত সরকারি সংস্থাগুলো পুনর্গঠন করেন।

তাছাড়াও বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া ১৯৯৯ সাল থেকে যেভাবে আটকে ছিল তার সকল জট একটা একটা করে খুলে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে উন্মুক্ত করে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। **দ্বিতীয়** গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন যা জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে। এমন পদক্ষেপ দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রথম। **তৃতীয়,** রাজনীতি ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষে নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন উদ্যোগসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের কাঠামোগত এবং আচরণ সম্পর্কিত পরিবর্তন সাধন। এসব পরিবর্তনের ফলে দেশে গণতন্ত্রের ক্ষেত্র আরো উর্বর হয়ে উঠবে। **চতুর্থ,** আগামী সাধারণ নির্বাচনের জন্য এ সরকার এক সড়ক চিত্র (Road map) ঘোষণা করেছেন। যে কোন অবস্থায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০০৮ সালে। **পঞ্চম,** দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রেও এ সরকার কঠোর এক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আইনের চোখে সবাই সমান— এ নীতির ভিত্তিতে ছোট–বড় এবং উঁচু–নিচু মর্যাদা নির্বিশেষে সকল সন্দেহভাজনকে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছেন এ সরকার। ফলে দেশের দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীও কারারুদ্ধ হয়ে বিচারের মুখোমুখি হতে বাধ্য হন। **ষষ্ঠ,** এ সরকারের আমলে ৪টি নগর কর্পোরেশন এবং ৯টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, ফখরুদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে উল্লিখিত ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় নি। এ প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে, এ সরকার সংবিধানসম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয় বরং এটি হল এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে এর বৈধতা নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন, ২০০৮

নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এ নির্বাচন বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিচে তার বিবরণ দেয়া হলো।

(এক) এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারের তত্ত্বাবধানে। সাধারণভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ৯০ দিনের মধ্যে, কিন্তু এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্দিষ্ট ৯০ দিনের বহু পরে, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে। নির্বাচিত সরকারকে তাই জাতীয় সংসদের মাধ্যমে এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত শুধু নির্বাচন নয়, এর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিতে হয়েছে।

(দুই) এদেশে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনের মধ্যে এ নির্বাচনে সর্বাধিকসংখ্যক বৈধ ভোট দাতা ভোট দিয়েছেন। ভোটদানের এ হার দক্ষিণ এশিয়া কেন, অনেক উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায়ও বেশি। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদত্ত হয় মোট ভোটের শতকরা ৫৫.৫৪ ভাগ। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে তা ছিল শতকরা ৭৩.৬১ ভাগ। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে এই ছিল শতকরা ৭৫.৩৭ ভাগ। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রদত্ত হয় মোট ভোটের শতকরা ৮৭.১৫ ভাগ। বৈধ ভোটের সংখ্যা শতকরা ৮৬.৩৭ ভাগ। দেশে মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩৫,২৬৩।

(তিন) এ নির্বাচনের পূর্বে ভোট দাতাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করা হয়। জাতীয় পরিচয়পত্রের আদলে ভোটারের সকল তথ্য সন্নিবেশ করে এবং হাতের ছাপযুক্ত করে এমন ব্যবস্থা গৃহীত হয় যেন ভোটের কারচুপির সকল পন্থা বন্ধ হয়। এবার মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৮০৮৩৯৫৯৬ জন (আট কোটি তিরাশী লক্ষ নয় হাজার পাঁচশত ছিয়ানব্বই)। এবারে ভোটার তালিকায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল পুরুষ ভোটারদের চেয়ে প্রায় ২০ লক্ষ বেশি।

(চার) এবার সর্বপ্রথম ভোটারদের সামনে না-ভোটের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ভোটদাতা কোন প্রার্থীকে পছন্দ না করলে না-ভোট দিতে পারবেন। কোনক্রমে না-ভোটের সংখ্যা সর্বাধিক হলে সেই ক্ষেত্রে নতুনভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হত। এমনটি অবশ্য ঘটে নি, তবে এ নির্বাচনে সর্বমোট ৩৮১৪৪৮ (তিন লক্ষ একাশী হাজার চারশত আট চল্লিশটি না-ভোট রেকর্ড করা হয় যা হয় মোট ভোটের শতকরা ০.৫৫ অংশ।

(পাঁচ) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নবম সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ফলে ভোটকেন্দ্রগুলোতে সন্ত্রাস বা কেন্দ্র দখলের মত ঘটনা ঘটে নি। সরকারি এবং বেসরকারি মহলের রিপোর্ট অনুযায়ী এ নির্বাচন ছিল সবচেয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ।

(ছয়) এ নির্বাচনটি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন এবং শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় সফলভাবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নির্বাচনী আচরণবিধি, নির্বাচনে ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলি, নির্বাচনী কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক তদারকি-সব মিলিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল পদক্ষেপ গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য।

(সাত) নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিবন্ধনের পরেই কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর শর্ত হিসেবে দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণে এবং মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণের

অধিকার, প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কিত বেশ কিছু অবশ্য করণীয় বিধিবদ্ধ রয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এভাবে ৩৭টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধন করার পরেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এটিও এ নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(আট) ২৯ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৯৯ জন সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্যে। একজন প্রার্থী নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হলে সেই নির্বাচনী এলাকায় (২৬৮ নোয়াখালী-১) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পরে। ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে সর্বমোট দলীয় প্রার্থী ছিলেন ১৫৫৬ জন। তাছাড়াও ১৪৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে ৬০ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাভ করে ২৩০টি আসন। আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হয় ৩,৩৫,৫৩,৯৭১ যা প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৮.০৬ ভাগ। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এমএল) লাভ করে সর্বনিম্ন সংখ্যক ভোট-মাত্র ২৯৭টি। ৩৭টি রাজনৈতিক দলের মাত্র ৮টি দল জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচনে সক্ষম হয়। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ৪ জন নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদের সদস্য।

সারণি ২০.৪ ।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল

দল	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা)
১। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৩	২৩০	৪৮.০৬
২। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৫৯	২৯	৩২.৪৪
৩। জাতীয় পার্টি	৪৮	২৭	৭.০৬
৪। জামায়াত-ই-ইসলাম	৩৯	০২	৪.৬০
৫। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	০৬	০৩	০.৭৩
৬। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০৫	০২	০.৩৮
৭। লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-এলডিপি	১৮	০১	০.২৭
৮। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপি	১২	০১	০.২৬
৯। স্বতন্ত্র	১৪৯	০৪	২.৯৫
	২৯৯	২৯৯	

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

(নয়) পূর্বের জাতীয় সংসদের নির্বাচনগুলোতে কোন প্রার্থী একই সময়ে পাঁচটি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। এবারে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিনটি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ লাভ করেন। যে তিনজন জনপ্রিয় প্রার্থী তিনটি আসন থেকে একই সাথে নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হাসিনা, জাতীয়তাবাদী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া এবং জাতীয় পার্টির নেতা এইচ এম এরশাদ।

(দশ) এবারের নির্বাচনের সময় সমগ্র দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিশ, আনসার এবং সশস্ত্র বাহিনীর লক্ষাধিক সদস্য নিয়োজিত থাকেন। এ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে প্রায় লক্ষাধিক দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরেফিরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সবার আন্তরিকতা এবং পরিশ্রমের ফলে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন হয়ে ওঠে অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ।

১। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী ? এর রূপরেখার বিবরণ দাও।

২। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন সম্পর্কে কী জান ? এর পটভূমির বিবরণ দাও।

৫। ষষ্ঠ সংসদের নির্বাচন সম্পর্কে কী জান ?

৬। সপ্তম সংসদের নির্বাচনের বিবরণ দাও।

৭। সপ্তম সংসদের নির্বাচনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৮। জেনারেল এরশাদের পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর।

৯। নব্বই-এর গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কী জান ? এর লক্ষ্য এবং প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

১০। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলির বিবরণ দাও।

১১। পঞ্চম সংসদের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২। বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৩। একাদশ সংবিধান সংশোধন আইন সম্পর্কে কী জান ?

১৪। দ্বাদশ সংবিধান সংশোধন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ?

১৫। দ্বাদশ সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কার্যক্রম এবং ক্ষমতা পর্যালোচনা কর।

১৬। দ্বাদশ সংশোধন আইনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলি ও ক্ষমতার বিবরণ দাও।

১৭। দ্বাদশ সংশোধন আইনে জাতীয় সংসদের কার্যাবলি এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৮। ত্রয়োদশ সংশোধন আইন, ১৯৯৬-এ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

১৯। ত্রয়োদশ সংবিধান আইনের পটভূমি আলোচনা কর।

২০। ১৯৬৯ এবং ১৯৯০ এর গণ–অভ্যুত্থানের তুলনামূলক আলোচনা কর। (Make a comparative study of 1969 and 1990 people's uprising.) [I. N. U. 1997]

২১। ১৯৯১–১৯৯৬ সময়কালে বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ দাও।

২২। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে কী জান? নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

২৩। ১৯৯৬–২০০১ সময়কালে শেখ হাসিনার সরকারের কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

২৪। ২০০১–২০০৬ সময়কালে বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

২৫। ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলির বিবরণ দাও।

২৬। নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন ২০০৮ সম্পর্কে কী জান? এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোকপাত কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–প্রথম পত্র
(রাজনৈতিক তত্ত্ব)

[দ্রষ্টব্য ঃ সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিবর্তনমূলক মতবাদটি বিশ্লেষণ কর।

৩। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি? রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৪। সমাজতন্ত্রবাদ কি? এর সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

৫। আইনের সংজ্ঞা দাও। আইনের উৎসসমূহ আলোচনা কর।

৬। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দাও। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৭। প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব আলোচনা কর।

৮। রাষ্ট্রদর্শনে অ্যারিস্টটলের অবদানসমূহ আলোচনা কর।

৯। সেন্ট অগাস্টিনের রাজনৈতিক দর্শন আলোচনা কর।

১০। মানব প্রকৃতি ও প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে টমাস হবসের ধারণা আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–দ্বিতীয় পত্র
(রাজনৈতিক সংগঠন এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা)

[দ্রষ্টব্য ঃ সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সংবিধান প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। বাংলাদেশের সংবিধান কিভাবে প্রণীত হয়েছে?

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি? যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলি আলোচনা কর।

৩। জনমত কাকে বলে? বিভিন্ন সরকার ব্যবস্থায় জনমতের ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। গণতন্ত্র বলতে কি বুঝ? গণতন্ত্রের সাফল্যের পূর্বশর্তসমূহ আলোচনা কর।

৫। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা কর।

৬। "ব্রিটিশ সংবিধান গড়ে উঠেছে, তৈরি হয়নি" মন্তব্য কর।

৭। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকার যুক্তিসমূহ আলোচনা কর।

৮। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বুঝায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর।

৯। আমেরিকার সংবিধান কিভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির নিশ্চয়তা বিধান করে? ব্যাখ্যা কর।

১০। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মধ্যে কাকে তুমি বেশি ক্ষমতাধর বলে মনে কর? কেন?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' বলতে কি বুঝ? ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি আলোচনা কর।

২। ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। কেন ইহা ব্যর্থ হয়।

৩। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ কর।

৪। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণসমূহ আলোচনা কর।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৬। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

৭। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

৮। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর।

৯। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদীয় সরকারের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৪

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–প্রথম পত্র

(রাজনৈতিক তত্ত্ব)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। জাতি কি? জাতীয়তার উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

৩। সমালোচনাসহকারে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সামাজিক চুক্তি মতবাদটি আলোচনা কর।

৪। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

৫। স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতার রক্ষাকবচসমূহ আলোচনা কর।

৬। সার্বভৌমিকতার একত্ববাদ কি? কোন কোন ভিত্তিতে বহুত্ববাদীরা এই মতবাদের সমালোচনা করেন?

৭। সাম্যবাদ সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা আলোচনা কর। আধুনিক সাম্যবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য নিরূপণ কর।

৮। এরিষ্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ কি কি? বিপ্লব প্রতিকারের জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা সুপারিশ করেছেন?
৯। ম্যাকিয়াভেলীকে প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বলা হয় কেন? ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা কর।
১০। সমালোচনাসহকারে রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান–দ্বিতীয় পত্র
(রাজনৈতিক সংগঠন ও যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সংবিধান কি? উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।
২। এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কি বুঝ? এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ–গুণ আলোচনা কর।
৩। নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কি বুঝ? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা আলোচনা কর।
৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কি? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?
৫। ক্ষমতা পৃথকীকরণ বলতে কি বুঝ? "ক্ষমতা পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবও নয় কাম্যও নয়"—আলোচনা কর।
৬। প্রথা বলতে কি বুঝ? প্রথা মান্য করা হয় কেন?
৭। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।
৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।
৯। যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমনস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা কর।
১০। মার্কিন সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান–তৃতীয় পত্র
(বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
২। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার স্বরূপ ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন কর।
৩। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা একটি অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।—বক্তব্যটি পরীক্ষা কর।
৪। ঐতিহাসিক 'ছয়–দফা' সম্পর্কে কি জান? 'ছয়–দফা' দাবীর সরাসরি ও আনুষংগিক কারণগুলো কি কি? আলোচনা কর।

৫। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত মূলনীতিসমূহ আলোচনা কর। পরবর্তীতে উক্ত মূলনীতিসমূহে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল উল্লেখ কর।

৬। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৭। জিয়াউর রহমান কিভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন? জিয়া সরকারের বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

৮। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণগুলো আলোচনা কর।

৯। ক্ষমতাসীন দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বের চরিত্র, সমর্থন ভিত্তি ও কর্মসূচি বিশ্লেষণ কর।

১০। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কি? বর্তমানে এদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা-২০০৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান-প্রথম পত্র

(রাজনৈতিক তত্ত্ব)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি পরিমাণ বিজ্ঞান?

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর। তোমার কাছে কোন মতবাদটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়?

৫। আইনের সংজ্ঞা দাও। আইনের উৎসসমূহ বর্ণনা কর।

৬। সাম্য বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন ধরনের সাম্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দাও। জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী? আলোচনা কর।

৮। আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা বর্ণনা কর।

৯। সেন্ট অগাস্টিনের রাষ্ট্রীয় দর্শন আলোচনা কর।

১০। ম্যাকিয়াভেলিকে প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বলা হয় কেন? ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে তার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–দ্বিতীয় পত্র

(রাজনৈতিক সংগঠন ও যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সংবিধান প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। বাংলাদেশের সংবিধান কিভাবে প্রণীত হয়েছে? ১৫+৫=২০

২। গণতন্ত্র বলতে কি বোঝ? গণতন্ত্রের সাফল্যের পূর্ব–শর্তসমূহ আলোচনা কর। ৫+১৫=২০

৩। সংসদীয় সরকার বলতে কি বোঝ? সংসদীয় সরকারের দোষগুণ আলোচনা কর। ৫+১৫=২০

৪। আধুনিক যুগে সরকারের শাসন বিভাগের ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধির কারণগুলো আলোচনা কর। ২০

৫। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা কর। ৫+১৫=২০

৬। জনমত কি? জনমতের বাহনগুলোর ভূমিকা আলোচনা কর। ৫+১৫=২০

৭। ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ২০

৮। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বুঝায়? যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৫+১৫=২০

৯। মার্কিন সিনেটকে কেন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয়—ব্যাখ্যা কর। ২০

১০। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ২০

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব কি? লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৩। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪। বাংলাদেশের ১৯৭৫ সালের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৫। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

৬। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

৭। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা কর।

৮। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

৯। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচি আলোচনা কর।

১০। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৬

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–প্রথম পত্র

(রাজনৈতিক তত্ত্ব)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি? রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৩। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দাও। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৪। স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতার রক্ষাকবচসমূহ আলোচনা কর।

৫। জাতি কি? জাতীয়তার উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

৬। অধিকার বলতে কি বুঝায়? অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক আলোচনা কর।

৭। প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব আলোচনা কর।

৮। এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণসমূহ কি কি? বিপ্লব প্রশমনের উপায়সমূহ আলোচনা কর।

৯। মানব প্রকৃতি ও প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে টমাস হব্‌সের ধারণা আলোচনা কর।

১০। জন লককে গণতন্ত্রের জনক বলা হয় কেন?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৬

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–দ্বিতীয় পত্র

(রাজনৈতিক সংগঠন ও যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সংবিধান কি? একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কি বোঝ? যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের শর্তাবলি আলোচনা কর।

৩। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? কিভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়?

৪। নির্বাচকমণ্ডলী কি? নির্বাচকমণ্ডলীকে কেন সরকারের চতুর্থ অঙ্গ বলা হয়?

৫। সমালোচনাসহ ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ মতবাদ আলোচনা কর।

৬। প্রথা বলতে কি বোঝ? ব্রিটেনে প্রথা মান্য করা হয় কেন?

৭। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকে থাকার যুক্তিসমূহ আলোচনা কর।

৮। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

৯। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন? তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলির বর্ণনা দাও।

১০। ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৬

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গের কারণগুলো আলোচনা কর। এটি কেন বাতিল করা হয়েছিল?

২। ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৩। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৪। ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা কর। পূর্ব–বাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে এই নির্বাচনের প্রভাব কি ছিল?

৬। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৭। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৮। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

৯। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান দুটি সংশোধনী আলোচনা কর।

১০। বাংলাদেশে এত অধিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠার কারণ কি? উপযুক্ত উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–প্রথম পত্র

(রাজনৈতিক তত্ত্ব)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে কি বোঝ? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্র কি? রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। এ মতবাদ কি গ্রহণযোগ্য?

৪। আইন কি? আইনের উৎসসমূহ আলোচনা কর।

৫। সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝ? সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের ধারণা আলোচনা কর।

৬। সাম্য বলতে কি বোঝ? বিভিন্ন ধরনের সাম্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। সাম্যবাদ সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা কি ছিল? আধুনিক সাম্যবাদের সঙ্গে প্লেটোর সাম্যবাদের পার্থক্য নিরূপণ কর।

৮। রাষ্ট্রদর্শনে এরিস্টটলের অবদান আলোচনা কর।

৯। মেকিয়াভেলিকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কেন? আলোচনা কর।

১০। সাধারণ ইচ্ছা সম্পর্কে রুশোর ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–দ্বিতীয় পত্র

(রাজনৈতিক সংগঠন ও যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সংবিধান কি? সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।

২। সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। এই সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা কিভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?

৩। আইন সভা কি? আইন সভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণসমূহ আলোচনা কর।

৪। রাজনৈতিক দল কি? একটি আধুনিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। জনমত কি? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচা কর।

৮। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বুঝায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কিভাবে কাজ করে?—আলোচনা কর।

১০। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও যুক্তরাজ্যের লর্ড সভার কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ১৯০৯ সালের মর্লি–মিন্টো সংস্কার আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

২। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। এই আইনের প্রতি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কর।

৪। ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

৫। পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল এবং গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। তুমি কি মনে কর যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী ছিল? ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

৭। বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বরূপ কি? কয়েকটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ করে আলোচনা কর।

৮। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সংবিধানে কি কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল?—আলোচনা কর।

৯। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার চরিত্র ও প্রকৃতি বিচার কর।

১০। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে রাজনৈতিক জোটের ভূমিকা আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৮

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–প্রথম পত্র

(রাজনৈতিক তত্ত্ব)

[**দ্রষ্টব্য ঃ** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি আদৌ বিজ্ঞান?

২। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। সমালোচনাসহ রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনা কর।

৪। সার্বভৌমত্ব কি? সমালোচনাসহ অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব আলোচনা কর।

৫। স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ? স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো বর্ণনা কর।

৬। জাতীয়তাবাদ কি? জাতীয়তাবাদ কি সভ্যতার প্রতি হুমকিস্বরূপ?

৭। প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা কর।

৮। এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণগুলো কি? বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য কি কি প্রতিবিধান সুপারিশ করেছেন?

৯। সেন্ট টমাস একুইনাসের আইনের প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।

১০। রাষ্ট্রদর্শনে জন লকের অবদান আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৮

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–দ্বিতীয় পত্র

(রাজনৈতিক সংগঠন ও যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা)

[**দ্রষ্টব্য :** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সংবিধানের সংজ্ঞা দাও। একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

২। গণতন্ত্র বলতে কি বুঝ? একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের শর্তগুলো আলোচনা কর।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি? যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো আলোচনা কর।

৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝ? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়গুলো আলোচনা কর।

৫। নির্বাচকমণ্ডলী কি? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা আলোচনা কর।

৬। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎসগুলো বর্ণনা কর।

৭। ব্রিটেনের কমন্সসভার গঠনপ্রণালি ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।

৮। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন? তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটকে কেন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষ বলা হয়?—ব্যাখ্যা কর।

১০। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা–২০০৮

রাষ্ট্রবিজ্ঞান–তৃতীয় পত্র

(বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি)

[**দ্রষ্টব্য :** সকল প্রশ্নের মান সমান। যে–কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা কর। কেন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল?

২। মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি? শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

৩। ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণগুলো বর্ণনা কর।

৪। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

৬। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের উপর একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

৭। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

৮। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।

৯। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

১০। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।